শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস

২

শতবর্ষের সেরা

প্রেমের উপন্যাস

২

সম্পাদনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
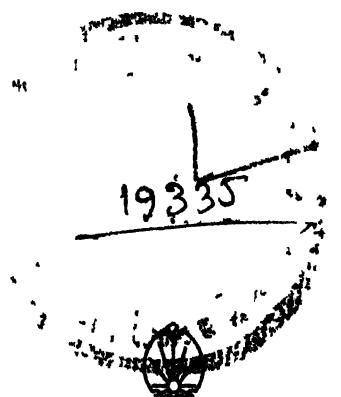
পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

SHATABARSHER SERA PREMER UPANYAS 2

Edited by

Sunil Gangopadhyay

পবিশিষ্ট

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায

অলংকবণ

বিজন কর্মকাব

Publisher

PATRA BHARATI

3/1 College Row, Kolkata 700 009

'পত্র ভাবতী'ব পক্ষে ত্রিদিবকুমাব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

"ভালোবাসি, ভালোবাসি—
এই সুরে কাছে দূরে
জলে স্থলে বাজায় বাঁশি ॥..."

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকের নিবেদন

শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস ঃ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় গত জানুয়ারি মাসে। ঠিক একবছরের মুখেই প্রকাশিত হল দ্বিতীয় খণ্ড।

পাঠকের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি, বাংলাসাহিত্যের এই বিশেষ ধারার প্রামাণ্য সঙ্কলন-গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে বরেণ্য সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, দুটি খণ্ড মিলিয়ে মোট যে ১৬টি উপন্যাসকে উনি নির্বাচন করেছেন, সেখানেই সমাপ্ত হবে এই বৃহদাকার সঙ্কলন। পরবর্তী যুগের উপন্যাস নিয়ে এই বইয়ের আর কোনও খণ্ড সম্পাদনার অভিপ্রায় আপাতত তাঁর নেই।

শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর কিছু মতামতও উঠে এসেছে। কেউ-কেউ প্রশ্ন করেছেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'আরণ্যক' কোন অর্থে প্রেমের উপন্যাস? আবার এই দ্বিতীয় খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে বনফুল-এর 'অগ্নীশ্বর' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'চতুষ্কোণ' উপন্যাস। বনফুল-পুত্র চিরন্তন মুখোপাধ্যায় অগ্নীশ্বর উপন্যাসটি নির্বাচন করার জন্য বিস্মিত। তাঁর মতে 'অগ্নীশ্বর' প্রেমের উপন্যাস নয়। মানিক-পুত্র সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'চতুষ্কোণ'কে প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক উপন্যাস মনে করেন। আমাদের মনে হয়েছে, হয়ত অনেক প্রিয় পাঠক-পাঠিকা এই বিষয়ে সহমত পোষণ করবেন।

কথাপ্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন, এই বৃহৎ সঙ্কলন-গ্রন্থকে উনি কেবলমাত্র নরনারীর নিছক প্রেমের উপন্যাস হিসাবে ভাবেননি। মানসিক-শারীরিক ভালোবাসার পাশাপাশি উনি খুঁজেছেন জীবনের নানাদিক, নানাস্তর, বিভিন্ন আঙ্গিক। তাই এখানে গাঁথা হয়েছে প্রকৃতি-প্রেম, মানব-প্রেম, সমাজ-প্রেম, অপত্যপ্রেম...। অর্থাৎ প্রেমের ব্যাপক-বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে সম্পাদক ধরে রাখতে চেয়েছেন বাংলাসাহিত্যের কালজয়ী সৃষ্টির হীরক-সম্ভার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় '...যা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়'।

আমরা মনে করি, বিতর্ক সবসময়েই স্বাস্থ্যকর। আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্কের মধ্যে দিয়েই সঠিক দিশা নির্দেশিত হয়। বিতর্ক চলুক, আলোচনা হোক। আর তার মধ্য দিয়ে 'পত্র ভারতী'র বিনম্র নিবেদন 'শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস' চিরস্থায়ী স্থান পেয়ে যাক পাঠকসমাজের হৃদয়ে। সেটাই হবে আমাদের পরম প্রাপ্তি।

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

বাংলা উপন্যাসের যে-কোনও আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম অবশ্যই সর্বাগ্রগণ্য। শুধুমাত্র পথিকৃৎ হিসেবেই তিনি অনেক সম্মান পেতে পারতেন, কিন্তু তাঁর ভূমিকা তার চেয়েও অনেক বেশি। আমাদের অতি সৌভাগ্য এই যে বঙ্কিমের মতন এক মহৎ প্রতিভাধর লেখক বাংলা ভাষায় শুধু যে উপন্যাস রচনা শুরু করলেন তা নয়, প্রথম থেকেই এই রচনার মান অনেক উচ্চ তারে বেঁধে দিলেন। অর্থাৎ পরবর্তী লেখকদেরও সেই মানে পৌঁছোবার চেষ্টা করে যেতে হল।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় সারা ভারতে সাড়া পড়ে যায়। অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাতেই তখনও ঠিক উপন্যাসের আঙ্গিকে কিছু লেখা শুরু হয়নি। অন্যান্য ভাষার লেখকরা বঙ্কিমকে দেখে উদ্বুদ্ধ হন। গোড়ার দিকে বেশ কয়েকজন লেখক সরাসরি বঙ্কিমকেই অনুসরণ করেছেন। সুতরাং শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় শীর্ষ স্থানে আছেন।

এই প্রেমের উপন্যাস সংকলনে বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' কিংবা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কোন্‌টি গ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে দ্বিধা থাকতে পারে। বঙ্কিমের ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলিতেও প্রেমের স্থান যথেষ্টই, কিন্তু সেগুলি রোমান্স-ধর্মী, তাঁর এই দুটি উপন্যাসই সমসাময়িক বাস্তবতা ভিত্তিক, দুটিই খুব জোরালো। তবে, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিমের নিজের জীবনের কিঞ্চিৎ ছায়া আছে, সেই কারণেই বেশি মর্মস্পর্শী মনে হয়।

উপন্যাসের বিষয়বস্তু বহু বিচিত্র বিষয়ের হতে পারে। একেবারে নরনারীর প্রেম বর্জিত উপন্যাসও হতে পারে, কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ, যেগুলি স্মরণীয় হয়ে আছে, সেগুলিতে অবশ্যই প্রেম অন্তর্লীন। এবং আশ্চর্যের বিষয়, এই সব প্রণয় কাহিনিতে মিলনের সার্থকতার চেয়ে অতৃপ্তি এবং মিলনের জন্য গোপন হাহাকারই প্রধান হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-তেও রয়েছে সেই অচরিতার্থ প্রেম এবং বিচ্ছেদ বেদনার প্রবল সুর। রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি উপন্যাসও এই নিরিখে সার্থক, কিন্তু 'শেষের কবিতা' এই সংকলনে গ্রহণের কারণ, এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর পূর্বতন লেখক সত্তা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আবার নবীন হয়ে উঠেছেন। কল্লোল যুগের নবীন লেখকরা যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রাচীন পন্থী বলে নিজেদেরই আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা বলে দাবি করছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতায় সকলকে বিস্ময়াপন্ন করে দিয়ে হয়ে উঠলেন আধুনিকদের চেয়েও বেশি আধুনিক। এই তথ্য ছাড়াও, 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি বড়ই বিষাদ-মধুর।

শরৎচন্দ্রের প্রায় সবকটি রচনাই প্রেম-কেন্দ্রিক। এমনকী 'পথের দাবি'-কেও তা বলা যায়। সুতরাং এমন সংকলনে তাঁর একটি রচনা নির্বাচন করা বেশ শক্ত। এবং তাঁর প্রায় সবকটি লেখাই চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে বলে একালের যে-সমস্ত পাঠক তাঁর লেখা পড়েননি, তাঁদের কাছেও সব কাহিনিই পরিচিত। সেই জন্যই 'পরিণীতা' বেছে নেওয়ার কারণ, ভাষার দিক থেকে এই উপন্যাসোপম বড় গল্পটি খুবই সুলিখিত, কাহিনির থেকেও সাহিত্যের স্বাদ এখানে মুখ্য।

রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের যুগের পর বাংলা উপন্যাসে দীর্ঘদিন শীর্ষস্থানে সৃষ্টিশীল থেকেছেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা মনুষ্য হৃদয়ের গভীরে যেমন অনুসন্ধান চালিয়েছেন, তেমনি উপন্যাসের পটভূমিকা ও পরিধিও বাড়িয়েছেন অনেকখানি। সেইজন্যই এঁদের তিনজনের তিনরকম রসের কাহিনি স্থান পেয়েছে এই সংকলনে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' এক অসাধারণ গ্রন্থ। এক হিসেবে গ্রন্থটি প্রকৃতি-প্রেমের কাহিনি মনে হলেও, সেই অরণ্যে বিচরণশীল নারী-পুরুষগুলিও অপ্রধান নয়। এসেছে চকিত প্রেমের মুহূর্ত।

এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ই নিম্নবর্গীয়, দরিদ্র কিংবা অতি সাধারণ মানুষকে মহত্ত্বে উন্নীত করেছেন। বিভূতিভূষণ যেমন 'আরণ্যকে' এনেছেন আদিবাসী রমণীর কথা, তেমনি তারাশঙ্কর তাঁর 'কবি'-তে এক কবিত্ব প্রতিভাসম্পন্ন অভাজন, রেল স্টেশনের কুলিকে নায়কের মর্যাদা দিয়ে রচনা করেছেন এক ক্লাসিক উপন্যাস।

নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্প। তাঁর ছোট উপন্যাস 'চতুষ্কোণ' সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী। এবং অল্প পরিচিত। তাঁর প্রথম জীবনের এই রচনাটিতে আছে মনস্তত্ত্বের জটিলতা এবং সেইসঙ্গে শরীরের ভাষাতেও প্রেমকে খোঁজা।

কল্লোল যুগের লেখকরা প্রেমের সঙ্গে শরীরের সম্পর্কের কথা নিয়ে এলেন সরাসরি-ভাবে। তার আগে সব প্রেম কাহিনিতেই শরীরকে উহ্য রাখার একটা প্রবণতা ছিল। অবশ্য একেবারে শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে নায়িকার বক্ষ-আবরণী ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ শরীরসঙ্গী ভালোবাসার কথা লিখে দারুণ আলোড়ন তুলেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রও ছিলেন এই দলে। তবে তিনি যত মন দিয়ে ছোটগল্প লিখেছেন, তেমন মন দেননি উপন্যাস রচনায়।

কল্লোল গোষ্ঠীর বাইরেও কিছু-কিছু শক্তিশালী লেখক ছিলেন, যেমন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ। গোয়েন্দা গল্প ও ভূতের গল্পের জন্য বিখ্যাত হলেও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলিই ভাষার গুণে ও কল্পনার মাধুর্যে স্মরণীয়। বনফুল বহু রকমের কাহিনি লিখেছেন, চাঁছা-ছোলা প্রেমের কাহিনিও অপরূপ করে তুলেছেন। সুবোধ ঘোষের রচনাগুলিকে বলা উচিত নির্মাণ। বিষয় বৈচিত্র্য তো আছেই, শব্দ দিয়ে গেঁথে-গেঁথে তিনি চরিত্রগুলিকে ছবি ঠিক নয়, ভাস্কর্য করে তোলেন। সৈয়দ মুজতবা আলী লেখা শুরু করেছেন বেশি বয়েসে এবং শুরু থেকেই শীর্ষে অবস্থান করছেন। তাঁর অন্যান্য রচনার তুলনায় 'শবনম' উপন্যাসটি একেবারে অন্যরকম।

যেমন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে সবাই কৌতুক রসের লেখক বলেই জানত। হঠাৎ তিনি 'নীলাঙ্গুরীয়'র মতন এক নরম, স্নিগ্ধ রসের উপন্যাস লিখে ফেললেন, যা আজ ক্লাসিকের পর্যায়ে পড়ে।

এক হিসেবে জীবনানন্দ দাশের তুলনা বিশ্ব সাহিত্যে নেই। কবি হিসেবে তিনি অতুলনীয় তো বটেই, তাঁর বিপুল গদ্য-সম্ভার জীবৎকালে গোপন করে গেছেন। অন্তত ১৭টি উপন্যাস, প্রায় পঞ্চাশটি ছোট গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার একটিও তিনি প্রকাশ করেননি। তাঁর পাণ্ডুলিপির খাতায় এরকম আরও রচনা উদ্ধার করার কাজ চলছে। কোন প্রেরণায় একজন লেখক ১৭টি উপন্যাস রচনা করেন কিন্তু প্রকাশ করেন না? যথা সময়ে প্রকাশিত হলে তিনি কবি ও কথা-সাহিত্যিক হিসেবেও গণ্য হতেন।

জ্যোতিবিন্দ্র নন্দীর প্রায় সমস্ত রচনাতেই কাহিনিব অংশ অকিঞ্চিৎকর, তাঁর সন্ধানী চোখ সবসময় বিচরণ করেছে চরিত্রগুলির মনোজগতে। অন্ধকারের মধ্যে ফেলেছেন আলো। অসুন্দরেব মধ্যেও খুঁজেছেন রূপ।

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসটি আগে স্থান পেলেও এর আলোচনা আমি সব শেষে রেখেছি একটি বিশেষ কাবণে। প্রেম বিষয়ক আলোচনায় প্রেমের নানা বর্ণের কথাই আমাদের মনে পড়ে। সে বর্ণগুলিও আমাদের জানা হয়ে গেছে। তার মধ্যে নতুন কোনও বর্ণ যোগ করা নিশ্চিত বিস্ময়কর ব্যাপার। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'অচিন রাগিনী' উপন্যাসে সেই কাজই কবেছেন। ভালোবাসার এই রাগিনীটির রেখাচিত্র সর্বাংশে নতুন।

নতুন প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকারা সাধারণত সমসাময়িক কালের সাহিত্য রচনাই পাঠ করে। ক্লাসিকের কিছু-কিছু নমুনা থাকে স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকে। কেউ কেউ হয়তো স্ব-শিক্ষিত হওয়ার জন্য বঙ্কিম-রবীন্দ্র সাহিত্য অনেকখানি পড়ে নেন। কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষায় এমন বেশ কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে, যা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়। সেই সব বচনা বিস্মৃত হওয়া খুবই দুঃখজনক। বরং পারিবারিক সম্পদেব মতন বারবাব দেখাব মতন। সব বিখ্যাত বইগুলিও অবশ্য সবসময় সহজলভ্য নয়। সেখানেই এই ধবনেব সংকলনের সার্থকতা। নির্বাচনের জন্যও পাঠককে সাহিত্যের ইতিহাস হাতড়াতে হবে না। এ বই একটানা পড়বার মতনও নয়, শিয়রেব কাছে রেখে দিতে হবে, পড়তে হবে যখন বসগ্রহণের জন্য পাঠকেব মন থাকবে প্রস্তুত।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অগ্নীশ্বর

বনফুল

এক

ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় সার্থকনামা ব্যক্তি। জানিনা এখন তাঁহার চেহারা কেমন আছে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর পুর্বে তিনি দেখিতে মূর্তিমান অগ্নিশিখার মতোই ছিলেন, যেমন উজ্জ্বল তেমনি প্রখর। কিন্তু অগ্নির সহিত তাঁহার সাদৃশ্য ওইখানেই শেষ হইয়াছে। তাঁহার বাহিরের খোলসটার অন্তরালে, তাঁহার মর্মভেদী ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ তীব্রতার নেপথ্যে যে স্নেহাতুর আদর্শবাদী ন্যায়পরায়ণ পরার্থপর সত্তাটি ছিল লেলিহান অগ্নিশিখার তাহা থাকে না। তাঁহার এই সত্তাটি কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই নয়নগোচর হইত না। তিনি যখন কাহারও হৃদয় বা মস্তক লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তখন সে বেচারীর মনে রাগ ছাড়া অন্য কোন ভাবোদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। তিনি অন্য ভাবোদ্রেক করিতে চাহিতেনও না। লোকে যেমন মশা, ছারপোকা, সাপ, ব্যাঙকে ঘর হইতে তাড়ায়, তিনি তেমনি অধিকাংশ লোককে নিজের সান্নিধ্য হইতে বিতাড়িত করিতেন। কোন প্রকার বোকামি, গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, ন্যাকামি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রায়ই বলিতেন— বাইবেলে পড়েছি মানুষের মুখে একটা ডিভাইন লুক (Divine look) আছে, কিন্তু আমি তো বোভাইন লুক (Bovine look) ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না। তার সঙ্গে পেজোমিরও মিশেল আছে। সব বোকা বদমাইসের দল।

এঁর সঙ্গে আমার প্রথম সংস্পর্শ ছাত্র-জীবনে। ইনি তখন ছিলেন রেলের মেডিকেল অফিসার। সে যুগে গভর্ণমেণ্ট অফিসারই রেলের মেডিকেল অফিসাররূপে কাজ করিতেন।

অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় কাজে যোগদান করিয়াই এমন একটা কাণ্ড করিলেন যে রেলের বাবুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। তিনি আসিয়াই শুনিলেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তী মেডিকেল অফিসার অন্নদা ঘোষালের সহিত রেলের বাবুরা নাকি বড়ই দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। ডাক্তার ঘোষাল ভালো-মানুষ লোক ছিলেন, সকলকে বিনাপয়সায় দেখিতেন, বিনাপয়সায় সার্টিফিকেটও দিতেন। যে যখন ডাকিত তখনই ছুটিতেন। কিন্তু সাধারণত যাহা হয় তাহাই হইল। সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি সকলকেই অসন্তুষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার নামে ওপরওলার কাছে দরখাস্ত গেল, তিনি যে মিথ্যা সার্টিফিকেট দেন তাহাও প্রমাণিত হইল। ডাক্তার ঘোষাল হতমান হইয়া বদলি হইয়া গেলেন। তাঁহার সার্ভিস-রেকর্ডে কলঙ্কের ছাপ পড়িল। অগ্নীশ্বর যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, ডাক্তার ঘোষাল তখন সেখানে হাউস-সার্জন ছিলেন। তাই তাঁহাকে তিনি মাস্টার মশাই বলিয়া ডাকিতেন এবং তাহার উদার স্বভাবের জন্য ভক্তিও করিতেন। চার্জ লইবার সময় ডাক্তার ঘোষালের মুখে অগ্নীশ্বর সমস্ত শুনিলেন এবং তাহার চোখে জল দেখিয়া বিচলিতও হইলেন। ঘোষাল ধরা-গলায় বলিয়া গেলেন, "বিশ্বাস কব, ওদের ভালর জন্যেই এসব করেছিলাম আমি। ওরা শেষটা যে আমাকে এমন দাগা দেবে, তা আমি ভাবতে পারিনি।"

পরদিন সকালে অগ্নীশ্বর আফিসে গিয়া দেখিলেন যে, একটি স্থূলকায়, বেঁটে, কালো লোক একটি চেয়ারে গদিয়ান হইয়া বসিয়া আছে।

"নমস্কার, আপনিই নতুন ডাক্তারবাবু নাকি—"

"হ্যাঁ। আপনি কে—"

"আমার নাম সর্বেশ্বর সান্যাল। আমি এখানকার ডি-টি-এস আফিসের বড়বাবু—"

"আমার সঙ্গে কি দরকার আপনার—"

"আজ তিনদিন থেকে আমার ছোট্ট মেয়েটার হুপিং কাশি হয়েছে—"

"আপনি এখানে কেন। বাইরে বারান্দায় ওই কাঠের রেলিংটার ওপারে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর ডাক্তার লতিফ আপনার মেয়ের কথা শুনে ওষুধের ব্যবস্থা করে দেবেন। এখানে রোগীদের বসবার জায়গা নয়, বাইরে যান—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ধ্বনিত হইল যে সর্বেশ্বরবাবু উঠিয়া পড়িলেন।

"আমরা এখানেই তো বরাবর বসে এসেছি।"

"আর বসতে পাবেন না।"

"কারণটা জানতে পারি কি—"

"কারণ আপনি চেরিটেব্‌ল হাসপাতালে ওষুধ ভিক্ষে করতে এসেছেন। ভিকিরিদের কেউ চেয়ারে বসতে দেয় না। বসতে দেবার নিয়ম নেই। ওই দেখুন, লেবেল লটকানো রয়েছে—ফর আউটডোর পেশেণ্টস—ওইখানে যান।"

"আপনি কোন প্রেসক্রিপশন দেবেন না?"

"এখন দেব না। ডাক্তার লতিফের ওষুধে যদি না সারে আর তিনি যদি আমাকে দেখতে বলেন তখন দেখব, তার আগে নয়।"

অগ্নীশ্বর টং করিয়া টেবিলের ঘণ্টা বাজাইলেন। চাপরাশি প্রবেশ করিল।

"বাবুকে আউটডোরে নিয়ে যাও। আমার বিনা হুকুমে এখানে কাউকে ঢুকতে দেবে না। যদি দাও, চাকরি যাবে।"

চাকরির প্রথম দিনেই তিনি যে চাবুক হাঁকড়াইলেন, তাহা সেখানকার রেলওয়ে কলোনীর সকলের পিঠে জ্বালা ধরাইয়া দিল। কিন্তু তিনি চাবুক সম্বরণ করিলেন না, সপাসপ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটিল সেইদিনই সন্ধ্যায়।

"ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটার সাতদিন থেকে জ্বর ছাড়ছে না, যদি—"

"আজ তো হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। কাল সকাল আটটায় ডাক্তার লতিফের কাছে যাবেন—"

"আমি আপনাকে 'কল' দিতে এসেছি।"

"আমি ষোল টাকার কম ফি নিই না, সেটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। আর টাকাটা অগ্রিম জমা করতে হবে।"

ভদ্রলোক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অগ্নীশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অগ্নীশ্বর অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি অন্নদা ঘোষাল নই, আমি অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে। আমার নিয়মকানুন অন্য রকম—"

ভদ্রলোকটি সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি ডাক্তার না পিশাচ—"

"পিশাচ।"

"বেশ, এই নিন ষোল টাকা। চলুন—"

অগ্নীশ্বর তাহার বাসায় গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া ছেলেটিকে পরীক্ষা কবিলেন, তাহার পর একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া চলিয়া আসিলেন।

ঘণ্টাঘানেক পরে সেই ভদ্রলোকটি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন. "আপনি রুগীর বিছানায় আপনার ফি'টা ফেলে এসেছেন সার।"

"না, আমি ফেলে আসিনি। ও আর কেউ ফেলে গেছে বোধহয়—"

ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন। যে জ্বর সাতদিনে ছাড়ে নাই তাহা তাহার পরদিনই ছাড়িয়া গেল।

তৃতীয় চাবুকটি পড়িল বীরু মিত্তিরের পিঠে। তিনিও অগ্নীশ্বরকে কল দিয়াছিলেন স্ত্রীর জ্বরের জন্য। অগ্নীশ্বর তাঁহাকে একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলেন, কুইনিন মিকশ্চার। ছয় দাগ। তিন দাগ খাইয়াই জ্বর ছাড়িয়া গেল। হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী বীরু মিত্তির আবার অগ্নীশ্বরের কাছে গেলেন।

"সার, তিন দাগ খেয়েই জ্বরটা ছেড়ে গেছে। বাকী তিন দাগ খাওয়াব কি? শুনেছি কুইনিন,

ওষুধটা একটু তীব্র—"

অগ্নীশ্বর একটা বই পড়িতেছিলেন। বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আপনার গালে যদি ঠাস ঠাস করে ছ'টা চড় মারা দরকার হয় তিন চড়ে শানাবে কি? ছ'টা চড়ই মারতে হবে। তিন দাগ ওষুধে হলে আমি ছ'দাগ দিয়েছি কেন—"

অগ্নীশ্বর চোখ পাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বীরু মিস্তির অবিলম্বে সরিয়া পড়িলেন।

চতুর্থ যে ঘটনাটি পল্লবিত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সেটি ঘটিয়াছিল প্রায় মাসখানেক পরে।

স্থানীয় রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিত রেলওয়ে কোম্পানীতে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। গোঁফ-জোড়া বেশ পুষ্ট, বুকের ছাতি বেশ চওড়া, হাত-পায়ের পেশীগুলি বেশ সমৃদ্ধ। চোখ দুটি বেশ বড় বড় এবং লাল। দেহের বর্ণ মসীনিন্দিত। তাঁহার গর্ব যে তিনি যার-তার সহিত মেশেন না। আলাপ করিবার মতো লোকই নাই শহরে, এই তাঁহার ধারণা। মাঝে মাঝে ফিরিঙ্গি ডি-টি-এস মিস্টার স্কটের বাড়িতেই যান, যখন সময় পান। ডাক্তার অন্নদা ঘোষালকে তিনি মানুষের মধ্যেই গণ্য করিতেন না। বলিতেন, উনি হচ্ছেন কাদার গোঁজ। যে দিকে টান সেই দিকেই হেলিয়া থাকিবে। যদিও অগ্নীশ্বরের কড়া ব্যবহারে সকলে প্রথমটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু অগ্নীশ্বর নিজের ব্যক্তিত্ব, চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং চরিত্রের জোরে সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, মাখনের তালের ভিতর ছুরির মতো। তাঁহাকে অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। তিনি কড়া লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু ডাক্তারও অসম্ভব রকম ভাল। তাছাড়া, কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল তিনি লেখকও। ছবিও আঁকিতে পারেন। ছদ্মনামে সে-সব লেখা আব ছবি ছাপাও হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আশঙ্কা-সম্মান-কৌতূহল-মিশ্রিত একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন তিনি নিজের চারিদিকে। তিনি কখনও কাহারও বাড়িতে যাইতেন না। অবসর সময়ে নিজের ড্রইংরুমের ইজিচেয়ারে বসিয়া থাকিতেন, আর পা দোলাইতেন, মুখে চুরুট, হাতে বই।

ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিত একদিন স্থির করিলেন, তিনি অগ্নীশ্বর ডাক্তারের উপর অনুগ্রহ করিবেন, অর্থাৎ তাঁহার বাড়ি গিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিয়া আপ্যায়িত করিবেন তাঁহাকে। গেলেন একদিন। অগ্নীশ্বরের সহিত তাঁহার সাধারণভাবে আলাপ ছিল, একজন অফিসারের সঙ্গে আর একজন অফিসারের যেমন থাকে।

"গুড মর্নিং ডাক্তারবাবু, কেমন আছেন—"

"প্রবলভাবে ভাল আছি। 'ঘরে-বাইরে' পড়ে শেষ করলুম একটু আগে—"

"ঘরে-বাইরে? সেটা আবার কি।"

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, ওই যিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতন করেছেন তিনিই তো—"

"হ্যাঁ, তিনি বইও লেখেন।"

"ও।"

ইহার পর রক্ষিত মহাশয় যে-সব গল্প ফাঁদিলেন তাহা ইঞ্জিনিয়ারিং গল্প এবং সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে তাঁহার 'আমিত্ব' কলকল-নিনাদে আত্মজাহির করিতে লাগিল। তিনি কোথায় কোথায় ব্রিজ ডিজাইন করিয়াছেন, কোন কোন বিলাতী-ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনিয়ারকে 'থ' করিয়া দিয়াছেন, তিনি না থাকিলে রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট কিভাবে অচল হইয়া যাইত—এইসব গল্প।

হঠাৎ অগ্নীশ্বর বলিলেন, "দেখুন দেখুন, কেমন একটা অদ্ভুত পাখী। ল্যাজটা ঠিক সাপের মতো—"

"কই—"

"ওই যে তেঁতুলগাছের ডালটায় বসে আছে।"

রক্ষিত মহাশয় ভালো করিয়া দেখিবার জন্য জানলার ধারে গেলেন এবং ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

"কই মশায়, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"পাবেন না, চলে আসুন।"

"পাব না কেন। দেখি দাঁড়ান, কোন ডালটায়—"

"ওরকম পাখী নেই ওখানে। চলে আসুন। আমি আপনার বাক্যস্রোতে 'ড্যাম' দিয়ে দিলুম একটা। কথার তোড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আসুন, চা খান—"

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম আনিয়াছিল। অগ্নীশ্বর নিজেই চা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

গল্প আর জমিল না।

"আজ উঠি। টেবিলের উপর ও বইটা কি?"

"ঘরে-বাইরে।"

"ও, সেই যেটার কথা বলছিলেন। নিয়ে যেতে পারি কি?"

"যান।"

"আপনার নানারকম বইটই কেনার বাতিক আছে, না?"

"তা আছে। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গ তো জোটে না বড় একটা। বইটই নিয়েই থাকি।"

রক্ষিত মহাশয় দুই দিন পরেই 'ঘরে-বাইরে' খানি হাতে লইয়া আবার দেখা দিলেন।

"কি একটা বাজে বই দিয়েছেন মশাই। যাকে বলে ইম্মরাল, এ একেবারে তাই। আমাদের ঝক্‌সু সর্দার কিছুদিন আগে একটা কুলির বউকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিল, এ যে দেখছি সেই গল্পই। আরে ছি ছি ছি। একটা ভালো বই দিন এবার।"

"ভালো বই? ভেবে দেখি দাঁড়ান, ভালো বই কি আছে আমার? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে একখানা—"

অগ্নীশ্বর ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন এবং একটা মোটা পাঁজি বাহির করিয়া আনিলেন।

"এইটে নিয়ে যান, অনেক ভালো ভালো কথা আছে এতে, ভালো লাগবে আপনার—"

যোগেশ রক্ষিতের চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

"আমাকে ঠাট্টা করছেন?"

"পাগল! অতটা বেরসিক আমি নই। হিজড়ের সঙ্গে প্রেম করা যায় নাকি।"

অগ্নীশ্বর আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। সেইদিন হইতে যোগেশ রক্ষিতও তাহার শত্রু হইয়া গেল। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইত তাঁহাকে। বাড়িতে আসন্নপ্রসবা কন্যা, স্ত্রীর হাঁপানি, নিজেরও হাই ব্লাডপ্রেসার, অগ্নীশ্বরকে তিনি পুরাপুরি বয়কট করিতে পারিলেন না। আর যাই হোক, লোকটা ডাক্তার ভালো। তাঁহার কচি মেয়েটা কাসিয়া কাসিয়া সারা হইতেছিল, শহরের কত ডাক্তারের কত ওষুধই খাওয়ানো হইল, কিছুতেই কিছু হয় নাই। অগ্নীশ্বরকে ডাকা হইল, তিনি বলিলেন, "নাকে একটু করে তেল বা লিকুইড্‌ প্যারাফিন দিন তাহলেই সেরে যাবে। কোন ওষুধ খাওয়াতে হবে না।"

তাই করা হইল এবং মেয়েটা সারিয়া গেল। সুতরাং অগ্নীশ্বরের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে ঝগড়া তিনি করিতে পারিলেন না। কিন্তু হৃদ্যতাটা আর রহিল না। অগ্নীশ্বর কাহারও সহিত হৃদ্যতা করিতে চাহিতেনও না।

পঞ্চম যে ঘটনাটি ঘটিল তাহা আরও চাঞ্চল্যজনক। সাহেবমহল পর্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল।

ডি-টি-এস মিস্টার স্কটের স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। অগ্নীশ্বর একদিন গিয়া তাঁহাকে যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া উপদেশ প্রভৃতি দিয়া আসিয়াছিলেন।

দিন দুই পরে এক বেয়ারা সাহেবের এক চিঠি লইয়া আসিল।

Doctor, come immediately. My wife is not feeling well.

একটা প্লীজ পর্যন্ত লেখে নাই লোকটা।

অগ্নীশ্বর গেলেন না। তাঁহার অধীনে আবদুল লতিফ নামে যে সাব-এসিস্টেন্ট সার্জন ছিলেন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি গিয়ে দেখে আসুন ব্যাপারটা কী। যদি দরকার হয় আমি যাব। যে অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস কেসটা রেডি করতে বলেছিলাম সেটা রেডি হয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"ওটা এখুনি অপারেশন করব। সব ঠিক করতে বলুন। আর আপনি গিয়ে চট করে দেখে আসুন মিসেস স্কটের কি হয়েছে—"

ডাক্তার আবদুল লতিফ প্রবীণ ব্যক্তি, সেকেলে মুসলমান। লম্বা দাড়ি, চুস্ত পাজামা-আচকান পরা, মাথায় লাল রঙের টিকিওলা মুসলমানী টুপি। পান জরদা খান, দাঁতগুলি কালো। অতিশয় সজ্জন।

তিনি অগ্নীশ্বরের আদেশ শুনিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "হুজুর, আমাকে উনি ডাকেননি, আপনাকে ডেকেছেন। সাহেবটা একটু বাঘা গোছের। আমি গেলে কিছু বলবে না তো—"

আধঘণ্টা পরে আবদুল লতিফ ফিরিয়া আসিলেন। মুখ থমথম করিতেছে।

"আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে তাড়িয়ে দিলে হুজুর। এমন অপমানিত আমি জীবনে হইনি। আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম—"

আবদুল লতিফের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

"I am extremely sorry, Dr. Latif. লোকটা যে এরকম বর্বর তা আন্দাজ করতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন।"

ডাক্তার লতিফের দুই হাত ধরিয়া তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একটু পরেই মিস্টার স্কটের নিকট হইতে আর একটি পত্র আসিল। চিঠির সুরটি একটু গরম। চিঠির বাংলা মর্ম এই—

"আমি চাই তুমি আসিয়া আমার স্ত্রীকে দেখ। ওই জরদ্‌গব লতিফকে দেখাইবার ইচ্ছা নাই। তুমি অবিলম্বে চলিয়া এস।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিলেন।

"সরি, আমার এখন যাইবার উপায় নাই। একটি অপারেশন লইয়া ব্যস্ত আছি। যদি আমার দেখা নিতান্তই প্রয়োজন মনে করেন, মিসেস স্কটকে এখানেই পাঠাইয়া দিবেন! আমি একটি নার্স, চারটি বেয়ারা এবং একটি স্ট্রেচার পাঠাইয়া দিতেছি।"

বলা বাহুল্য, মিসেস স্কট স্ট্রেচারবাহিত হইয়া আসিলেন না। তাঁহার পেটের একধারটা সামান্য কুন্‌ কুন্‌ করিতেছিল মাত্র। স্ট্রেচার যখন গেল তখন তাহাও কমিয়া গিয়াছিল।

ডি-টি-এস কিন্তু চটিয়া আগুন হইয়া রহিলেন। একটা নেটিভ ডাক্তার, তা হউন না তিনি মেডিকেল অফিসার, তাঁহার এতবড় স্পর্ধা! হাসপাতাল কমিটির তিনি একজন সদস্য ছিলেন। একটি মিটিংয়ে তিনি অগ্নীশ্বরকে বলিলেন, "দেখ ডাক্তার, তোমার বিরুদ্ধে অনেক নালিশ শুনিতেছি। এমন কি, আমার সহিতও তুমি যে ব্যবহার করিয়াছ তাহা ভদ্রজনোচিত নহে, তুমি যদি—"

অগ্নীশ্বর তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "আপনারা সুসভ্য জাতির প্রতিভূ। আপনাদের ব্যবহার, পোশাক, ভাষা সব আমরা নকল করি। সেদিন আপনি আপনার পিতার বয়সী ডাক্তার লতিফের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা কি ভদ্রজনোচিত?"

বলিয়াই অগ্নীশ্বর উঠিয়া যাইতেছিলেন, সাহেব বলিলেন, "দেখ ডাক্তার মুখার্জি, আমিই এই রেলওয়ে কোম্পানীর দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, আমি যদি ইচ্ছা করি, তোমাকে খুব বিপদে ফেলিতে পারি, একথাটাও ভুলিও না।"

"না ভুলিব না, আমার স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ নয়।"

সাতদিন পরেই এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিল। ওই জংশনটি হইতে প্রত্যহ কুড়িটি গাড়ি ছাড়িত। একদিন দেখা গেল, একটি গাড়িও ছাড়িবার আশা নাই। অগ্নীশ্বর সমস্ত ড্রাইভারগুলিকে সিক্ সার্টিফিকেট দিয়াছেন। একটিও বাড়তি ড্রাইভার নাই। ডি-টি-এস আপিসেও এত অধিকসংখ্যক কেরাণী সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে যে আপিস বন্ধ হইবার উপক্রম।

মিস্টার স্কট অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের নিকট ছুটিয়া আসিলেন।

"এ কি কাণ্ড ডাক্তার মুখার্জি। এতগুলি লোক একসঙ্গে 'সিক্' হইল কি করিয়া?"

"চট করিয়া তো ইহার জবাব দিতে পারি না, বইটই ঘাঁটিয়া দেখিতে হইবে। তবে এদেশে ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা এইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকেই হয়। গোটা দুই অ্যাপেনডিকস, গোটা ছয়েক হেপাটাইটিস, কয়েকটা প্লুরিসিও আছে—"

"উহারা কি কাজ করিতে অক্ষম—"

"আমাদের শাস্ত্রানুসারে উহাদের শুইয়া থাকা উচিত। কিন্তু আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আপনি হুকুম করিলে হয়তো উহারা কাজে যোগ দিবে। তবে যদি কেহ মরিয়া যায় তাহার দায়িত্ব আপনার, আমার নয়। কারণ আমার মতে উহাদের এখন শুইয়া থাকা উচিত। আমি এখন উহাদের একজনকেও ফিট্ সার্টিফিকেট দিব না।"

মিস্টার স্কট অনন্যোপায় হইয়া অগ্নীশ্বরের চাকরির যিনি হর্তা-কর্তা বিধাতা সেই আই-জি'কে টেলিগ্রাম করিলেন। আই-জি আসিয়া অগ্নীশ্বরকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যালো, আগ্নী, তুমি এখানে। হোয়াট্স দি রাউ অ্যাবাউট?"

অগ্নীশ্বর যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন এই আই-জি ছিলেন সেখানকার অধ্যাপক। প্রায় সব বিষয়ে স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত অগ্নীশ্বরকে সেকালের কোন অধ্যাপকই ভোলেন নাই। এই আই-জি তো তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি!"

"ব্যাপাব কিছুই নয়। আমি যাদের সিক্ মনে করেছি, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। এর জন্যেই আমি মাইনে পাই। রেলগাড়ি চলবে কি না, ডি-টি-এস আপিস চলবে কি না, দ্যাট ইজ্ নট্ মাই কনসার্ন, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয় আমার—!"

আই-জি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। অগ্নীশ্বরকে তিনি চিনিতেন।

"এ সব তো শুনেছি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি—"

অগ্নীশ্বর এবার হাসিয়া ফেলিলেন, "সেটা তো সার কথায় বলা যাবে না। এই রেলওয়ে কলোনীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তার ভদ্রতা-জ্ঞানের সমালোচনা আমার মুখে মানাবেও না।"

"কি হয়েছে বল না। স্পীক্ দি ট্রুথ—"

তখন অগ্নীশ্বর তাঁহাকে আগাগোড়া সব বলিলেন। সেকালে সাহেবদেব মধ্যেও ভাল লোক অনেক ছিল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ঠিক করেছ তুমি!"

লিখিয়া গেলেন ইনফ্লুয়েঞ্জা আর ম্যালেরিয়া এপিডেমিকের জন্যই এতগুলি লোক একসঙ্গে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। রেলের কাজ চালাইবার জন্য বাহির হইতে লোক আনানো হউক। যাইবার পূর্বে তিনি ডি-টি-এস মিস্টার স্কটকে আড়ালে বলিয়া গেলেন—"অগ্নি খাঁটি ইস্পাতের তৈরি শাণিত তরবারি। উহাকে যদি ঠিক মতো ব্যবহার করিতে পার অনেক উপকার পাইবে। বোকার মতো নাড়াচাড়া করিলে কিন্তু রক্তারক্তি হইবার সম্ভাবনা।"

এই ব্যাপারে অগ্নীশ্বরের খাতির আরও বাড়িয়া গেল। অমন দুঁদে স্কটকে নাজেহাল করিয়াছে, একি সোজা লোক।

যে স্টেশনে অগ্নীশ্বর মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন, তাহার দুই স্টেশন পরে এক গ্রামে আমি থাকিতাম। আমি তখন স্কুলে পড়ি। কিন্তু অগ্নীশ্বরের কীর্তিকলাপ আমার অবিদিত ছিল না। তাঁহার চতুর্দিকে যে মহিমা-দ্যুতি বিকিরিত হইতেছিল, তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁহার সম্বন্ধে প্রতিটি গল্প পল্লবিত হইয়া আমাদের চিত্তকে রঞ্জিত করিয়া দিত।

এই লোকটিকে প্রত্যক্ষ দেখিবার সুযোগ একদিন আমার ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়িতে আমাদের দূর সম্পর্কীয়া একটি ভগ্নী আসিয়াছিলেন, তিনি সাংঘাতিক নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন। স্থানীয় ডাক্তার কুলদাবাবুর চিকিৎসাসত্ত্বেও রোগ বাড়িতে লাগিল। শেষে স্থির হইল ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে ডাকা হোক। আমার উপর ভার পড়িল তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার। আমার বয়স তখন ষোল বছর, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে বেকার বসিয়া আছি। কুলদাবাবুর পত্র লইয়া গেলাম তাঁহার কাছে, তাঁহার চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সত্যিই এ যে জ্বলন্ত অগ্নি।

পত্র পড়িয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যাব চারটের ট্রেনে। তুমি খেয়ে এসেছ?"

"জলখাবার খেয়ে এসেছি। খেয়ে নেব এখানে কোথাও হোটেলে—"

"হোটেলে কেন। আমার এখানে খেতে আপত্তি আছে তোমার? ও, আমি মুরগি খাই, সেটা টের পেয়ে গেছ বুঝি—"

কি বলিব, কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিলাম।

"মুরগি খেয়েছ এর আগে?"

"না"।

"খেতে আপত্তি আছে?"

"আছে।"

"বিপদে ফেললে দেখছি। মাছ খাও তো?"

"খাই।"

"বেশ, মাছের ঝোল ভাতেরই ব্যবস্থা হবে।"

খাইতে বসিয়া অনুভব করিলাম, আমার জন্য মৈথীল পাচক দিয়া আলাদা রান্না করানো হইয়াছে। তিনি নিজে খান বাবুর্চির হাতে, সাহেবী খানা। তখনও বিবাহ ক'রেন নাই, বাড়িতে স্ত্রীলোক নাই। বাবুর্চি আর খানসামার সংসার। উঠানের একধারে দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড খাঁচায় কতকগুলি মুরগি।

আমি সমস্ত দিন ছিলাম, কিন্তু তাঁহার সহিত কথাবার্তা বিশেষ হয় নাই। তিনি হাসপাতালেই প্রায় সর্বক্ষণ ছিলেন। পড়িবার জন্য আমাকে খানকয়েক বই দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' খানাও ছিল। সেটা আগে পড়ি নাই, পড়িয়া ফেলিলাম। ট্রেন ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্বে আসিয়া হাজির হইলেন তিনি। স্নান করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "চল এইবার। ট্রেনের আর বেশি সময় নেই। বইগুলো পড়েছ?"

"ঘরে-বাইরেটা পড়েছি—"

"কেমন লাগল?"

"ভাল লেগেছে। কিন্তু সন্দীপ আর একটু বেপরোয়া হ'লে আরও ভাল লাগত।"

"বাঃ ছোকরা, তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি। খুব খুশী হলুম।"

আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া টাই বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, "আরও খুশী হয়েছি তুমি মুরগি খাওনি দেখে। আমার গোড়ে গোড় মিলিয়ে তুমি যদি মুরগি খেতে আই উড্ হ্যাভ হেটেড্ ইউ।"

কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার বোনকে ভাল করিয়া দেখিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া গেলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া আমাদের বলিলেন, "এর তো বাঁচবার আশা নেই। এখানকার ডাক্তারবাবু কি কি ওষুধ দিয়েছেন দেখি।"
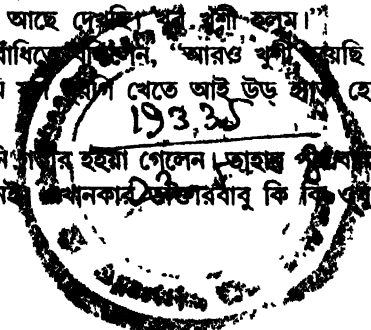
প্রেসক্রিপশন বাহির করিয়া দিলাম। কুলদাবাবু ডাক্তারও নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

"আপনি বসুন।"

প্রেসক্রিপশনের উপর চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "কোন ওষুধই তো বাদ রাখেননি দেখছি। এ ওষুধগুলো কেন দিয়েছেন।"

তিনি প্রেসক্রিপশনের কয়েকটা ঔষধ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। কুলদাবাবু কোন উত্তর না দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন কেবল। ভাবটা যেন, কেন দিয়াছি তাহা তোমার মতো অর্বাচীনকে বলিয়া লাভ কি?

অগ্নীশ্বর কিন্তু না-ছোড়।

"কেন দিয়েছেন এগুলো?"

সহসা কুলদাবাবুর জরা-কুঞ্চিত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"দিলে ক্ষতি তো নেই—"

"ও, আপনার চিন্তাধারা নতুন রকম দেখছি। কিন্তু রোগী যে খাটে শুয়ে আছে, তার নৈঋত কোণেব পায়াটায় একজন বসে যদি দিনর ত হাওয়া করে যায়, তাতেও রোগীর কোন ক্ষতি নেই, সেটা তো আপনার প্রেসক্রিপশনে দেখছি না।"

কুলদাবাবুর ছোট ছোট চক্ষু দুইটি অন্ধকাবে বিড়ালের চোখের মতো জ্বলিতে লাগিল, মুখের কালো রঙে বেগুনির ছোপ পড়িল।

"আপনার বয়স কি সত্তর পেরিয়েছে?"

"বাহাত্তর চলছে।"

"আর কেন, এইবার কাশীবাস করুন গিয়ে। ভাল কথা, আপনি কি এখানকার হাসপাতালে চাকরি কবেন? এত বয়স পর্যন্ত তো চাকরি থাকবার কথা নয়।"

"না। প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস করি। এখানকার ডাক্তারবাবু ছুটিতে গেছেন, তাই তাঁর হয়ে হাসপাতালে কাজ করছি।"

"ও। আচ্ছা, উঠি।"

ফি কত দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "পঞ্চাশ টাকা—"

টাকা আনিবার জন্য বাড়ির ভিতর ছুটিলাম। টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, অগ্নীশ্বর ভুটুনের সহিত আলাপ করিতেছেন। ভুটুনের বয়স ছয় বৎসর। আমার ভাগনা। ইহারই মায়ের নিউমোনিয়া হইযাছে। কানে গেল—"তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কে!"

"আমার ছোট মাসী।"

"কোথা থাকেন।"

"পাটনায়।"

"পুরো নাম কি?"

ভুটুন বলিতে পারিল না।

আমিই বলিলাম, "কমলা বসু"।

টাকা লইয়া অগ্নীশ্বর চলিয়া গেলেন। দিন সাতেক পরে একটি মনি-অর্ডার আসিল ভুটুনের নামে। তাহার ছোট মাসী তাহাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছে। আমরা অবাক হইয়া গেলাম। সে তো ইতিপূর্বে কখনও টাকাকড়ি পাঠায় নাই। টাকাটা পাইয়া অবশ্য সুবিধাই হইয়া গেল। ভুটুনের মায়ের শ্রাদ্ধের খরচটা কুলাইয়া গেল। শ্রাদ্ধে কুলদাবাবু ভুরি-ভোজন করিলেন, তাঁহার খাওয়াটা সত্যই দেখিবার মতো হইয়াছিল। আরও কয়েকদিন পরে কমলার চিঠি আসিল। সে লিখিয়াছে, সে তো টাকা পাঠায় নাই।

অগ্নীশ্বরের ওই এক ধরন ছিল, তিনি যখন কাহারও উপকার করিতেন তখন কাহাকেও

সেটা জানিতে দিতেন না। এমন কি উপকৃতকে পর্যন্ত নয়। তাঁহার প্রিয় শিষ্য সুবিমল তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল তিনি কেন এমন করেন।

অগ্নীশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন—"ওরে বাপরে, এরকম না করলে রক্ষে ছিল আমার। বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়নি? যদি কারও উপকারটি করেছ, অমনি সে শত্রু হয়ে গেছে তোমার। মেরেই ফেললে ও লোকটাকে শেষ পর্যন্ত। এমনিই তো দু'বেলা খাচ্ছি-পরছি, মোটামুটি সুখে আছি, এতেই তো অগণিত শত্রুসৃষ্টি হয়েছে, তার উপর তাদের পিঠে যদি উপকারের চাবুক পড়ে তাহলে তো ক্ষেপে যাবে তারা, দেশছাড়া করবে আমাকে। অথচ উপকার না করেও পারি না, ওটা একটা রোগ বিশেষ, a sort of exhibitionism, যখন চাগাড় দেয়, তখন বে-এক্তার হয়ে পড়তে হয়। তাই যথাসাধ্য লুকিয়ে করি।"

দুই

ছাত্রজীবনে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই। দ্বিতীয়বার দেখা হইয়াছিল আরও কয়েক বছর পরে একেবারে বিভিন্ন পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে। তবু তাঁহার সব খবর আমি পাইতাম সুবিমলের কাছে। সে আমার সহপাঠী ছিল, দুজনে একসঙ্গে আই, এস, সি পড়িয়াছি। সে আই, এস, সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে গেল, আমি বি, এস, সি ক্লাশে ভর্তি হইলাম। সুবিমল যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র সেই সময় অগ্নীশ্বর সেখানে ছিলেন। সুবিমল ছাত্রজীবনেই কবিতা-গল্প লিখিয়া সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। অগ্নীশ্বর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি যখন মেডিকেল কলেজ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং সুবিমল যখন বারকয়েক ডাক্তারি ফেল করিয়া শেষ পর্যন্ত সাহিত্যকেই পেশারূপে গ্রহণ করিল, তখনও তাঁহার এই আকর্ষণ সমানভাবে প্রবল ছিল।

সুবিমলকে লেখা তাঁহার চিঠিপত্র হইতে বোঝা যায়, তিনি তাহাকে কতটা ভালোবাসিতেন এবং কিভাবে ভালোবাসিতেন। তাঁহার সর্বদা ভয় হইত—ওই যাঃ পাঁচজনে মিলিয়া এমন একটা প্রতিভাকে বুঝি নষ্ট করিয়া ফেলিল। মেডিকেল কলেজে যতদিন ছিলেন ততদিন যাচ্ছেতাই করিয়া গালাগালি দিতেন তাহাকে। বলিতেন, "দেখ, আর পাঁচজনের মতো গালে ঠোঁটে রং মেখে, রাংতার গয়না পরে, ফিনফিনে রঙীন শাড়ির বাহার দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়াতে যেও না। সত্যিকার রসিকের জন্য লেখ, তারই আশাপথ চেয়ে থাক, তপস্যা কর। মতঙ্গমুনির আশ্রমে শবরী যেমন প্রতীক্ষা করেছিল রামচন্দ্রের জন্য, তোমার প্রতীক্ষাও তেমনি হবে।"

সুবিমলকে লেখা কয়েকটা চিঠি আমি পাইয়াছি। পরে বিভিন্ন স্থান হইতে চিঠিগুলি তিনি তাহাকে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিগুলির মধ্যে তাঁহার মনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে পরিচয় বাহিরের লোক কখনও পায় নাই। কারণ, সে পরিচয় তিনি কখনও কাহাকেও দেন নাই, দিতে চাহেন নাই।

একটা চিঠিতে লিখিয়াছেন—'আমার লেখা সম্বন্ধে আমি unconcerned থাকতে চাই। কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর যে সম্বন্ধ, আমার লেখার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা সেইরকম। ভবিষ্যদ্বংশীয়দের goggle eyes এবং সিনেমা screen এ দুয়ের মাঝখানে আমার এ ভাগ্যহত অপত্যকে দাঁড় করাবার মতো বুকের পাটা আমার নেই। তুমি লিখেছ, আমার লেখা তোমার ভাল লাগে। আরও দু'একজনের লেগেছে। আমর ছবির একজন সমজদার আছে জানি। আমার ডাক্তারিও একটা আর্ট এবং তাকে আর্ট বলে কেউ কেউ হয়তো চিনতে পেরেছে। কিন্তু এদের কেউ পপুলার হবে না। যদি হয় তো নিজেদের রাধাপুত্র বলে পরিচিত করে তবে হবে। আমার লেখা আর একজনের হাত দিয়ে বেরুলে এত অপাংক্তেয় হবে না। আমার ছবি একদিন আর একজনের নামে ছাপা হবে

এবং নাম করবে। আমার ডাক্তারী কোন ছাত্রের মারফত হয়তো তাক লাগাবে। কিন্তু আমার নামেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে এদের কোন কল্যাণ নেই। বার্ধক্যের ব্রেন সফনিংয়ের (brain softening) সঙ্গে সঙ্গে এইরকম একটা বিশ্বাস আমার দাঁড়িয়েছে। তোমার লেখা আমাকে পাঠাতে পার। সমালোচনা করব, from my point of view সমালোচনা মানেই তাই, আমার কেমন লাগল সেইটে স্পষ্ট করে বলা, ম্যাথু আর্ণল্ড বা রবীন্দ্রনাথের কথার চর্বিতচর্বণ করা নয়। প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনেই কিছু না কিছু tragedy আছে। তোমারও নিশ্চয় আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না অভিজ্ঞতা কম বলে। তাছাড়া তোমার নিজের চোখের দেখা জিনিসই তোমার আঁকায় ফুটবে ভালো, আমার impression হয়তো তোমার কাজে লাগবে না। আমার red হয়তো তোমার green। এ সব শোনবার পরও যদি লেখা পাঠাতে ইচ্ছা হয় পাঠিও—"

চিঠিপত্র হইতে মনে হয় সুবিমল তাঁহাকে লেখা পাঠাইত। একটা চিঠিতে দেখিতেছি—

"তোমার ওই ভুতুড়ে বইটার সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু বলবার আছে। কিন্তু চিঠিতে বলা যাবে না। এ রকম লেখায় তুমি অদ্বিতীয়। যেখানে তুমি অদ্বিতীয় সেখানে আমি কোন ত্রুটি সহ্য করব না। তুমি লিখেছ খুব ভালো, কিন্তু সবটা এক setting এ লিখেছ। একটু রয়ে বসে যদি লিখতে তো five hundred times better হত। বই যত ভালো লাগে তত অস্বস্তি হতে থাকে। A beautiful bust, blinding love, an opportune moment and a ruptured perinium! মনেব ভিতর হায় হায় করতে থাকে, কেবল মনে হয়, আহা, যদি দুটো Stitch লাগানো হত।

...চিঠিতে আব সমালোচনা কবব না। চিঠি এক sitting এ লিখে ডাকে ফেলে দিই। তারপব মনে পড়তে থাকে, ঐ যাঃ, এখানটায় তো মনের ভাব পরিষ্কার করা হয়নি। ওখানটায় আর এক বকম করে লিখলে হত, ওখানটায় দুটো লাইন কম পড়েছে—ইত্যাদি। তারপব বুক চাপড়ানো আব রাত্রে অনিদ্রা, এ আর সহ্য হবে না।

তবু চিঠিতে সমালোচনা করিতে তিনি ছাড়েন নাই।

আর একটা চিঠিতে দেখিতেছি—"তোমার লেখার অনেক লাইন বদলাতে ইচ্ছে করে, অনেক Para rewrite করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাছবার সময় আর সাহস হল না। এরকম বাছা একজনেব কাজ নয়। তোমার চাল ডাল মশলাপাতি খুবই ভালো। কেবল কাঁকর বাছা হয়নি। কাঁকর বাছবার সময় তোমার নেই। আমারও নেই। আশা আছে বাংলা দেশের ফোকলা দাঁতে কাঁকরগুলো অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে...।"

আর একটা চিঠি।

তোমার সঙ্গে সুরে মিললে মনে কর স্নেহ প্রকাশ করছি, সুরে না মিললে মনে কর রাগ করেছি—এ তো মহা মুশকিল দেখছি। সুর মেলা না মেলার সঙ্গে স্নেহ বা রাগের কি সম্পর্ক?

আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ও আমার রুচি বিভিন্ন। তোমার সঙ্গে আমার সুর মিলবে না। যৌবনের ঐশ্বর্যে তুমি অজস্র অসংযত বোল ফুটিয়ে চলেছ। আর আমি বৃদ্ধ, কানে কলম আর হাতে হিসাবের খাতা নিয়ে তোমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম—"হায়, হায়, এত অপচয় কেন? সমস্ত energyটা একাগ্র হয়ে একটা বোলে নিয়োজিত হলে যে বিশ-মণি আম ফলানো যেত।" তোমার সৃজন-তাণ্ডবে আমার হিতোপদেশ শতধা হয়ে দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল দেখে আমি থমকে দাঁড়ালুম। ভেবে দেখলাম, এইটেই ঠিক হয়েছে। তোমার genius তোমাকে যে পথে নিয়ে যাবে সেইটেই তোমার পথ। সে পথে আমার interference হয় নিজে ব্যর্থ হবে, নয় তোমাকে ব্যর্থ করবে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে বার্ধক্যের মুখরতা সংযত করলুম, with a jerk, এর মধ্যে রাগ কোথায়? মাইকেল, বঙ্কিমকে আমি genius মনে করি। কিন্তু তাঁদের প্রতিভা আমার 'বিজনবাসে সিগারেটের সহচরী' হয়নি। তা বলে কি তাঁদের উচিত ছিল আমার পছন্দমতো

লেখা? মনে করেছিলুম তুমি ধীরভাবে বসে চিন্তা করলে হয়তো ভালো ছবি আঁকতে পারবে। কিন্তু দেখছি ধীরভাবে বসে ভাবা তোমার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং আমি তোমার আশা ছেড়ে দিলুম। তোমার উপর নিজের রুচির জোয়াল চাপাবার স্পর্ধাও ছাড়লুম। এ থেকে কি বুঝলে আমি রাগ করেছি? বুঝলেও উপায় নেই।"

এরপর আর একটা চিঠি।

"সমালোচনার শেষকথা বলেছি বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখছি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারছি না। কারণ একটা কুকর্ম করে ফেলেছি—চিঠিটা বড় রূঢ় হয়ে গেছে। অতটা রূঢ় করবার ইচ্ছা ছিল না। হয়ে গেল শুধু উপমার খাতিরে। ওই আকারান্তের মন জোগাতে দু'-একটা খুনখারাপি করা বিচিত্র নয়। তাছাড়া লোককে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার মজ্জাগত স্বভাব। তোমরা সব কলা গাছ কিংবা পেঁপে গাছ, প্রশস্ত চওড়া-চওড়া পাতা, সুমিষ্ট ফল ফলাও। আর আমি হচ্ছি খেজুর, প্রত্যেক পাতার ডগায় ছুঁচ আছে, ফল যদি বা কখনও ফলে তা প্রায়ই কষা আর আঁটিসর্বস্ব। আমাকে চেঁছে যে সুমিষ্ট রস বার করতে পারবে, সেরকম পাশী তো দেখতে পাই না। রূঢ়তার জন্য ক্ষমা চাইছি—"

এইসব চিঠি পড়িয়া কাহারও যদি ধারণা হয় যে, সুবিমলের লেখা তিনি ভালবাসিতেন না, তাহা হইলে ধারণাটা ভুল হইবে। কারণ আমি তাঁহার একজন বন্ধুর নিকট ঠিক উল্টা কথা শুনিয়াছি। কথায় কথায় সুবিমলের কথা উঠিল। ভদ্রলোক বলিলেন, "কাল অগ্নীশ্বর মুকুজ্যেব কাছে গিয়েছিলাম। সুবিমলের লেখার কথা ওঠাতে তাকে বললাম, সুবিমলের evolutionটা দেখছো?"

অগ্নীশ্বর বললে—"হ্যাঁ, দেখবার মতো। আমি মাঝে মাঝে তার নিন্দে করেছি। লম্বা লম্বা উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখি।" আমি বললাম, "কিছু দরকার হবে না, পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ বিদীর্ণ করি—he is bound to come out."

অগ্নীশ্বর শুনে লাফিয়ে উঠল, বলল, আমি add করছি yes, resplendent ruthless and irresistible—এই আমার বিশ্বাস। কারুর কাছে সমালোচনার কাঙাল হবার তার দরকার নেই। He has grown beyond it and above it."

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "অগ্নি এখনও ঠিক তেমনি আছে। আমার সামনে এক প্রবীণ ডেপুটিকে যেভাবে অপমানটি করলে তা আর কহতব্য নয়। এই জন্যে ওর কিছু হল না। তা না হলে অত ভালো ডাক্তার, অমন বিদ্বান লোক, ওর কি টাকাব ভাবনা হবাব কথা? ওর নিজের অবশ্য ভাবনা নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় ওর চেয়ে অনেক বেশি নিকৃষ্ট ওব সহপাঠীরা যতটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কবে ও ততটা পারে না। মাইনেটিই ওর সম্বল। ওই আগুনের কাছে কে যাবে বল ছ্যাঁকা খাবার জন্যে। প্রবীণ ডেপুটিকে দেখে কষ্ট হল আমার—"

প্রশ্ন করিলাম, "কি হয়েছিল কি—"

"যা সাধারণত হয় তাই, human weakness, কিন্তু human weaknessকে ক্ষমা করার লোক তো অগ্নীশ্বর নয়। ভদ্রলোকের হাঁটুতে ব্যথা হয়েছিল। বোধহয় অনেকদিন আগেই হয়েছিল। তিনি বললেন, "অগ্নিবাবু, এ হাঁটু তো সারল না, কত আর নেংচে নেংচে বেড়াই বলুন, আপনার প্রেসক্রিপশনটাই দিন, ট্রাই করে দেখি ওটা—"

"আপনাকে তো প্রেসক্রিপশন দিয়েছিলাম একটা মাস তিনেক আগে—খাননি সে ওষুধ?"

অগ্নীশ্বরের প্রশ্ন শুনেই বুঝলাম গতিক ভালো নয়।

ডেপুটি বললেন, "না, সেটা আর খাওয়া হয়নি। আমার বেয়াই বললেন বিধানবাবুকে দেখাতে। তিনি ব্লাড কেমিস্ট্রি করালেন, পাইখানা পেচ্ছাবও পরীক্ষা করালেন। তারপর এমন এক ওষুধ লিখে দিলেন যে, ওষুধ জোগাড় করতেই মাসখানেক লেগে গেল, এখানে পাওয়া গেল না, বম্বে থেকে আনাতে হল, একটি গাদা দাম লাগল, কিন্তু কিচ্ছু হল না। তারপর গেলাম ব্রাউন

সাহেবের কাছে, তিনি মালিশ দিলেন, ইনজেকশ্‌ন দিলেন, ওষুধও খাওয়ালেন চার-পাঁচরকম—"

অগ্নীশ্বর জিগ্যেস করলেন, "আমার প্রেসক্রিপশনটা ব্যবহারই করেননি?"

"না, সেটা আর ব্যবহারই করা হয়নি। হারিয়েও ফেলেছি সেটা। দিন আর একবার লিখে দিন, ট্রাই করে দেখি এবার ওটা—"

"আর তো লিখব না। সেবারই একটা অন্যায় করে ফেলেছিলুম ফি নিইনি—"

ডেপুটিবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন. "বেশ, এবার ফি দেব। কত ফি নেন আপনি—?"

"লক্ষ টাকা দিলেও আর লিখব না"—গর্জন করে উঠল অগ্নীশ্বর। তারপর একটু থেমে বলল—"একটি শর্তে লিখতে পারি, যদি ওই ফোলা হাঁটু গেড়ে করজোড়ে প্রার্থনা করেন—'দয়া করে সেই প্রেসক্রিপশনটা আবার লিখে দিন।' তবেই দেব, তা না হলে নয়—"

ভদ্রলোক গুম হয়ে বসে রইলেন মিনিট খানেক। তারপর উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, "আপনি যে এত অভদ্র তা জানা ছিল না আমার—"

অগ্নীশ্বর বসে বসে পা দোলাতে দোলাতে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এ লোকের কখনও প্র্যাকটিস হয়?

সত্যই অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্র্যাকটিস হয় নাই। মাঝে মাঝে দুই-এক জায়গায় তাঁহার নাম হইয়াছে, হৈ হৈ করিয়া প্র্যাকটিসও হইয়াছে, কিন্তু তাহা অল্পদিন মাত্র। বদলির চাকরি, এক জায়গায় বেশি দিন তিনি থ'কিতে পান নাই।

তিন

ইংরেজের কবল হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার জন্য যে সব বাঙালী ছেলেমেয়ে একদিন জীবনপণ করিয়াছিল, যাহারা দলে দলে জেল ভরতি করিয়াছিল, ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়াছিল, দ্বীপান্তরে গিয়াছিল, পুলিশের অত্যাচাবে জর্জরিত হইয়াছিল, যাহাদের ঘরে-বাহিরে কোথাও শান্তি ছিল না, মা-বাপ আত্মীয়-বন্ধুরাও যাহাদের আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করিতে ভয় পাইতেন, একটা বিরাট আদর্শের প্রেরণায় যাহারা নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছিল, কিন্তু সর্বহারার গান গাহিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই, বরং যাহারা নিজেদের সর্বতোভাবে লুকাইয়া রাখিয়াই লোকচক্ষুর আড়ালে বিলীন হইয়া গিয়াছে, আমার মতো লোকও যে একদিন তাহাদের সঙ্গে ছিল একথা ভাবিলে আজও বিস্ময় এবং লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়ি। লজ্জার কারণ আমি এখন নামজাদা পুলিশ অফিসার বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সহিত আমার প্রথম যখন আলাপ হয় তখন আমার যে নাম ছিল সে নাম এখন আমার নাই, সে নামের ব্যক্তিটি বহুপূর্বে মারা গিয়াছে।

আজ জীবনের অপরাহ্নে বসিয়া অতীত দিনেই সেই ঘটনাগুলি ভাবিতে গিয়া একটি কথাই কেবল মনে হইতেছে, এ সবের মধ্যে আমার কি কোন হাত ছিল? অজানা কোন উৎস হইতে অপ্রত্যাশিত ঘটনার ধারা প্রবলবেগে আসিয়া বারবার আমার জীবনের সবকিছু ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে, পুরাতন পরিবেশ বারম্বার বিপর্যস্ত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে, পরিচিত লোক অপরিচিতের পর্যায়ে পড়িয়াছে, অপরিচিত লোক অত্যন্ত পরিচিত হইয়াছে। কখনও গৃহকে শ্মশান করিয়াছে, কখনও শ্মশানই গৃহ হইয়াছে, ছবির পর ছবি বদলাইয়াছে, একদিন যাহাকে সুখ-শান্তির আদর্শ বলিয়া ভাবিয়াছি, দুইদিন পরে তাহাই অসুখ ও অশান্তির আকর হইয়াছে। আমার এই সদাপরিবর্তনশীল জীবনে একটিমাত্র ছবির কেবল পরিবর্তন দেখি নাই, সে ছবি অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের। আমার জীবনে কয়েকবারই তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে আসিয়াছেন ও চলিয়া গিয়াছেন,

প্রতিবারই তাঁহাকে একরকম দেখিয়াছি। তরবারির মতো তীক্ষ্ণ, অগ্নির মতো উজ্জ্বল, অন্তরের অন্তস্থলে কিন্তু স্নেহ-করুণার ফল্গু বহমান। বজ্রের মতো কঠোর অথচ কুসুমের মতো মৃদু এক তাঁহাকেই দেখিয়াছি।

আজ তাঁহার জীবন-কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি নিজের দায়ে। কারণ ঋণশোধ করিবার অন্য উপায় নাই।

মনে হইতেছে, আমার মতো তিনিও সারাজীবন একটা আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন। সে আলেয়াটা কখনও ডাক্তারি, কখনও সাহিত্য, কখনও নাস্তিকতা, কখনও শাস্ত্রবিচার, কখনও দেশভক্তি, কখনও স্বদেশবাসীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা—নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পথে-বিপথে লইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ভাবিয়াছি, এই আলেয়ার মধ্যে তিনি কি পাইতে চাহিয়াছিলেন। সত্য? আনন্দ? জনপ্রিয়তা? অর্থ? আমার মনে হয়, ইহার একটাও তিনি চাহেন নাই। জনপ্রিয়তা তো তাঁহার দু'চক্ষের বিষ ছিল। তিনি যখন সিনেমা দেখিতে যাইতেন, খোঁজ লইতেন কোন্ সিনেমাটায় সবচেয়ে কম ভীড়, যখন কোনও হোটেলে যাইতেন, মেনুর কোন্ খাদ্যটা লোকে সবচেয়ে কম খায় সেইটা খোঁজ করিয়া তাহাই আনিতে বলিতেন। তাঁহার সহপাঠী এক ডাক্তারের মুখে এরূপ নানা গল্প শুনিয়াছি। তাঁহার ধারণা ছিল পেটের দায়ে বা পপুলারিটির লোভে কোনও প্রথম শ্রেণীর গুণী কখনও নিজেদের সুর নামাইয়া ফেলেন না। সুবিমলকে একবার লিখিয়াছিলেন—"তোমার গল্পের সাহিত্যিক নায়ক পেটের দায়ে পয়সার জন্যে অপরের নামে গল্প-কবিতা লিখতে লাগল, এটা আমার তত ভালো লাগেনি। কি জাতের সাহিত্যিক লোকটা? আমি তো ভাবতেই পারি না যে, রবীন্দ্রনাথ বা গোপেশ্বর বাঁড়ুয্যে পেটের দায়ে গান গেয়ে গেয়ে চানাচুর ফেরি করে বেড়াচ্ছেন! তুমি ওকে যদি সত্যিকার ভালো সাহিত্যিক করতে চাও, ও ছবি মুছে ফেল।"

সত্য অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি এবং সত্যনিষ্ঠা তাঁহার ছিল নিশ্চয়, না থাকিলে তিনি অত বড় ডাক্তাব হইতে পারিতেন না। কিন্তু সত্যকেই তিনি আকুল হৃদয়ে সারা জীবন সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন তাহা তো মনে হয় না। আমার নিকট আজ যে তিনি নমস্য তাহা তো তাঁহার মিথ্যা আচরণেব জন্যই। তিনি সুন্দরকে ভালবাসিতেন, সত্যকে নয়। তাঁহার সত্যের আদর্শ তাঁহার নিজের কাছে ছিল, তাহা আর পাঁচজনের সত্য নয়, আইনের সত্য নয়, ধর্মের সত্য নয়, শাস্ত্রের সত্য নয়, তাহা তাঁহার নিজের সত্য এবং সে সত্যের প্রধান গুণ, (সম্ভবত একমাত্র গুণ) তাহা সুন্দর।

আমি যতদূর খবর জানি জীবন তাঁহার নিরানন্দ ছিল। তাঁহার এই জীবনী লিখিবার জন্য আমি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের সহিত দেখা করিয়া যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে মনে হয় পারিবরিক জীবন তাঁহার সুখের ছিল না। পারিবারিক জীবনের মেরুদণ্ড যে স্ত্রী, তাঁহার সহিত তাঁহার জাতে মেলে নাই। শতকরা নিরানব্বুই জনেরই মেলে না। বিবাহের সুসজ্জিত মণ্ডপে শঙ্খধ্বনি-উলুধ্বনির মধ্যে যে-সব শুভমিলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের অধিকাংশই অসবর্ণ বিবাহ, কঠিনের সহিত কোমলের, কবির সহিত অকবির, সরলতার সহিত প্রতারণার, লম্পটের সহিত সতীর, অসতীর সহিত সাধুর, কতরকম গরমিলই যে হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অধিকাংশ লোকই দুর্ভাগ্যটাকে আব-আঁচিলের মতো মানিয়া লইয়া ভবিতব্যের দোহাই দিয়া সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করেন। অগ্নীশ্বরের প্রকৃতি ছিল ঠিক উল্টা ধরনের, কোন-কিছু নির্বিচারে মানিয়া লওয়া তাঁহার ধাতে ছিল না। বিশেষত তিনি যখন উপলব্ধি করিতেন যে, যে-ফাঁদে তিনি পড়িয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই তখন তিনি যেন ক্ষেপিয়া যাইতেন। তাঁহার বিবাহ ব্যাপারটা অনেকটা ফাঁদের মতোই হইয়াছিল। নিজে বিবাহ করিবার পূর্বে তিনি তাঁহার বিধবা বোনের আবার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেজন্য কিছুকাল তাঁহাকে গোঁড়া-সমাজে একঘরে হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পাত্র হিসাবে তিনি প্রথম শ্রেণীর পাত্র ছিলেন, দুই-একটি ভালো ঘর হইতে তাঁহার সম্বন্ধও আসিয়াছিল, কিন্তু যেই তাহারা খবর পাইল যে ইনি বিধবা বোনের আবার বিবাহ দিয়াছেন অমনি সরিয়া পড়িল। অগ্নীশ্বর

তাঁহাদের একজনকে নাকি বলিয়াছিলেন, "দেখুন, তামাক খাবার যদি ইচ্ছে হয়, নিজের হুঁকো কেনবার পয়সা আমার আছে। আর শাল-পাতায় বসে আপনাদের ওই ছ্যাঁচড়া-চচ্চড়ি-বোঁদে-দই মাখামাখি পঙ্ক্তি ভোজনে বসবার প্রবৃত্তি আমার কোনকালে নেই। আমার বক্তব্যটা ডি. এল. রায় নামক লেখক আরও ভালো করে বলেছেন তাঁর 'একঘরে' প্রবন্ধে। পড়ে দেখবেন—ও, বেগ ইওর পার্ডন, যা আপনার পক্ষে অসম্ভব তাই করতে বলছি, আপনি ব্রাহ্মণ যে, পড়াশোনা তো আপনার ধাতে সইবে না!"

আঃ, এসময়ে আবার কে ফোন করিল।

"হ্যাঁ, আমি কথা বলছি। কি বলুন, ও দলকে দল ধরা পড়েছে? বাঃ, সুখবর খুব। এখন লক্‌আপে রেখে দিন সবাইকে। জামিন যাতে না পায় সে চেষ্টাও করতে হবে। ওরা ছাড়া পেলে ওদের আর ধরতে পারবেন না। আচ্ছা, গুড্ নাইট। থ্যাঙ্ক ইউ—"

যাক্, মস্ত একটা শিরঃপীড়া সহসা সারিয়া গেল। একটা বেদে-বেদেনীর দল বহুদিন হইতে জ্বালাইতেছিল।

হ্যাঁ, কি বলিতেছিলাম? অগ্নীশ্বরের পারিবারিক জীবনের কথা। শেষ পর্যন্ত একটা পরিবার তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়া ছিল। একটু ভণ্ডামী করিলেই যে অগ্নীশ্বরের মতো সৎপাত্র পাওয়া যায় এ বুদ্ধি অন্তত একটি ভদ্রলোকের মাথায় খেলিয়াছিল। তিনি একদিন বিবাহের প্রস্তাব লইয়া অগ্নীশ্বরের কাছে গেলেন। অগ্নীশ্বরের পিতা-মাতা তখন কেহই বাঁচিয়া নাই, অগ্নীশ্বর নিজেই তখন নিজের বিবাহের কর্তা। শুনিয়াছি, কন্যার পিতা যখন অগ্নীশ্বরের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন তখন নাকি বলিয়াছিলেন, 'আমার একটি সুলক্ষণা গৃহকর্মনিপুণা মেয়ে আছে, সেটিকে আপনার হাতে সমপর্ণ করতে চাই।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিলেন, "শাস্ত্রে সুলক্ষণা মেয়ের যা বর্ণনা পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে সুলক্ষণা মেয়ে মানে কেষ্টনগরের পুতুল একটা। পুতুল বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই। আর গৃহকর্মনিপুণা মানে যদি কমবাইণ্ড চাকরানি আর রাঁধুনি হয় তাহলেও—"

"না, না অতটা কিছু নয়। গেরস্ত ঘরের মেয়েরা সাধারণত যেমন হয়, তেমনি আর কি। দেখুনই না একদিন—"

"পাঁচ মিনিটের চোখের দেখা দেখে কি হবে বলুন। তার রক্তে সিফিলিস আর ফুসফুসে টি. বি. আছে কি না, টনসিল দুটো কেমন এই সবই দেখতে হয়। এসব দেখতে দেবেন?"

"বেশ, ইচ্ছে হয়তো দেখুন। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি গরীব লোক, ওসবের জন্য বেশি পয়সা খরচ করা আমার ক্ষমতায় কুলোবে না—"

এই সরল উক্তিতে গলিয়া গেলেন অগ্নীশ্বর। বলিলেন, "বেশ, দেখব না কিছু। কিন্তু আপনি একটা কথা জানেন কি? আমার বিধবা বোনের আমি বিয়ে দিয়েছি।"

"জানি। তাতে আমার আপত্তি নেই।"

"আমি মুর্গি, শুয়ার, গরু সব খাই। জাত মানি না। আমার রাঁধুনি মুসলমান বাবুর্চি, আমার যে চাকর জল তোলে সে মেথর। এসবে আপনার আপত্তি নেই তো?"

"কিছুমাত্র না। এই সবই তো দরকার আজকাল। সেকেলে গোঁড়ামি না থাকাই তো বাঞ্ছনীয়।"

অগ্নীশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'বেশ, দিন ঠিক করুন। আপনার মেয়েকেই আমি বিয়ে করব।"

"কবে দিন ফেললে সুবিধে হবে—"

"কালই ফেলতে পারেন, কাল পরশু দু-দিন ছুটি আছে। আমাকে অবশ্য রুগী দেখতে বেরুতে হবে, তবে আপিসের ছুটি আছে। জগু আর কার্তিককেও পাওয়া যাবে—অন্তরঙ্গ লোক। অবসর

পেলে ওদের সঙ্গে বসেই পর-চর্চা করি। ওদের দুজনেরই কাল ছুটি—"

"অত তাড়াতাড়ি আমি পারব না। অন্তত মাসখানেক সময় দিতে হবে আমাকে—"

"বেশ, তাই নিন।"

ওই পাত্রীর সহিতই অগ্নীশ্বরের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরদিন তিনি তাঁহার বন্ধুদের বলিলেন, "তোমরা শুভদৃষ্টির সময় আমার চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিলে, বৌয়ের মুখ দেখে কি মনে হল জান? মনে হল সারা মুখময় পক্‌সের (pox) গুটি বেরিয়েছে, আর প্রত্যেকটি গুটির মুখে পুঁজ। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম, ওগুলো চন্দনের ফোঁটা।"

তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহার আর এক উক্তি তাঁহার এক বন্ধুর চিঠিতে পাইয়াছি।

"আমাদের কি রকম মিল হয়েছে জান? একেবারে রাজযোটক। আমি সজারু আর উনি তুলতুলে খরগোস। একটি ছোট্ট খাঁচায় পাশাপাশি বাস করছি। কারও পালাবার উপায় নেই। যতদিন না একজনের মৃত্যু হচ্ছে, ততদিন আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। ঘৃণ্যতম খুনেরাও কি জেলে এত কষ্ট ভোগ করে? ইচ্ছে করলে ওকে খাঁচাটা থেকে দূর করে দিতে পারি, আমাদের দেশে এ রকম পৌরুষের অনেক নজীর আছে। কিন্তু ওর ভীরু ভীতু চোখ দুটোর দিকে চাইলে সব কেমন গুলিয়ে যায়। অথচ ওর জ্বালায় আমাকে বাবুর্চি তাড়াতে হয়েছে, ফাউল রোস্টের বদলে সুক্তো খেতে হচ্ছে, দুঘণ্টা ধরে পূজো করে, হঠাৎ আচমকা মাথায় গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেয়। বকলে বোকার মতো চেয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে! এর চেয়ে বেশি দুর্গতি কল্পনা করতে পার? সেদিন একটা দূরের কলে গেছি, রুগীর বাড়িতে পকেট থেকে স্টেথোসকোপ বার করতে গিয়ে কতকগুলো শুকনো ফুল আর বেলপাতা ঝরঝর করে মাটিতে পড়ে গেল। পাছে আমার অমঙ্গল হয়, এইজন্যে লুকিয়ে পুজোর ফুল দিয়ে দিয়েছে আমার প্যান্টের পকেটে। ভাবলুম বাড়ি গিয়ে খুব বকব। কিন্তু পারলুম না। দূর থেকেই দেখতে পেলুম, সে জানলার ধারে বসে আছে আমার আশাপথ চেয়ে। চোখে পড়ল ঢলঢলে মুখখানা, যৌবন উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। বকতে পারলুম না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ছি, ছি এ কি degradation, কি শোচনীয় অধঃপতন। খানিকটা মাংস-স্তূপের লালসায় আমার ভিতরকার পশুটা আমার মনুষ্যত্বের গলা টিপে ধরছে, আর আমি সেটা সহ্য করছি। যার সঙ্গে আমার মনের মিল নেই, বুদ্ধির সমতা নেই, চিন্তার যোগ নেই, তার সঙ্গে ক্রমাগত প্রেমের ভান করে যেতে হচ্ছে। আমার মনে হয়, এ শুধু আমার ট্রাজেডি নয়, বিশ্বব্যাপী ট্রাজেডি। কিন্তু এর থেকে তুমি যেন মনে করে বস না যে আমি সেক্‌স-বিরোধী। মোটেই তা নয়, এ বিষয়ে আমি সাবেক আর্যঋষিদের সঙ্গে একমত। আমিও তাঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, 'প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ'। মহাভারতের বীররা মামাতো বোনদেরও বিয়ে করতেন, অর্জুন সুভদ্রাকে, শিশুপাল ভদ্রাকে, পরীক্ষিৎ ইরাবতীকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা কন্যারত্ন পেলেই আহরণ করতেন সেটি, ভীম রাক্ষসী হিড়িম্বাকে পর্যন্ত ছাড়েনি, অর্জুন মণিপুরী চিত্রাঙ্গদাকে, অনার্যা নাগকন্যা উলুপীকে পর্যন্ত বাগিয়েছিলেন। ধীবর কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে পরাশর ঋষির কাণ্ডকারখানা তো জানই। জীবন্ত আর্যদের এইসব প্রাণোচ্ছল বীর্য-গর্ভ কাহিনীর সঙ্গে পরবর্তী যুগের স্মৃতি শাসিত সাবধানী সমাজের তুলনা করলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। ওই, বিরাট-পক্ষ আকাশচারী মহাবিহঙ্গের দল কি করে কোন মন্ত্রে মুখস্ত-বুলি-আওড়ানো খাঁচার পাখী হয়ে গেল সব! না, আমাকে তুমি ওই নিন্‌কম্‌পুপ্‌দের দলে

ফেল না। আমি ওই সতীত্ববিলাসী ফোঁটা-তিলকধারী মতলববাজ ভণ্ডদের কাছ থেকে সহস্র হস্ত দূরে থাকতে চাই। বাজী শৃঙ্গীদের চেয়েও ভয়ানক ওরা। কিন্তু আমি যে কথাটা তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি সে কথাটা হচ্ছে এই যে, শুধু আমাদের দেহ নেই, মনও আছে। দেহের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বারবার সে মনটার টুঁটি টিপে ধরতে হচ্ছে এইটেই দুঃখ। প্রাচীন গ্রীক বা আর্যদের মতো ফলাও কারবার করবার সুযোগ তো আমাদের নেই, তাগদও নেই। ওই একটি পরিবার নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমি যখন আইনস্টাইনের বই বা রুপার্ট ব্রুকের সনেট নিয়ে মত্ত, তখন আমার অর্ধাঙ্গিনী মত্ত সিনেমা-স্টারদের নিয়ে। আমার মন যখন নর্থ পোলে জ্যাক লন্ডনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার অর্ধাঙ্গিনীর মন তখন ব্যস্ত শাড়ির পাড়, ব্লাউসের ছিট, আর ধোপা-দর্জি নিয়ে। দু-জন দু-জগতে বাস করি। 'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে। জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে'। মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় বীণা বাজাচ্ছি, না, ক্যানেস্তারা পিটছি! কে জানে। অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি কিন্তু—যাই করি।"

সজারুর কাঁটার খোঁচায় রক্তাক্ত কলেবর হইয়া খরগোসটি কিছুদিন বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু বেশী দিন নয়। শুনিয়াছি, স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি নাকি তাঁহার এক ভাইকে বলিয়াছিলেন, "আমার কাছ থেকে পালাও তোমরা। আমি খুনে। কথায়, ভঙ্গীতে, ব্যবহারে সারাজীবন ছোরাছুরি চালিয়ে এসেছি, কিন্তু যে শত্রুর উদ্দেশ্যে চালিয়েছি, সে মরছে না, সে অমর, মারা যাচ্ছে আমার নিজের লোকেরা। তোমরা বাঁচতে চাও তো পালাও আমাব কাছ থেকে—"

তাঁহার কয়েকটি ছেলেমেযে হইয়াছিল জানি। শুনিয়াছি ছেলেমেয়েদের তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন, রূপে গুণে অমন ছেলেমেয়ে নাকি আর কাহারও হয় না। আমি জানি এটি অসুখী লোকের লক্ষণ। যাঁহারা আত্মপ্রশংসার ঢাক বাজাইয়া অপরের কান বধির করিয়া তোলেন, তাঁহারা আসলে নিজেদের অন্তরের হাহাকারটাকেই আত্মপ্রশংসার ঢক্কা নিনাদে স্তব্ধ করিয়া দিতে চা'ন। আসল সত্যটা অন্তর্যামী মন ঠিক জানিতে পারে; কিন্তু সে সত্য যদি বেদনাদায়ক হয়, বাহিরে সেটা স্বীকার করিতে পারে না অনেকে, প্রশংসার মুখোশ পরাইয়া সেটা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। অগ্নীশ্বরের মতো লোকও যে ইহা করিতেন তাহা বিশ্বাস হয় না। তাঁহার পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, হয়তো যাহা শুনিয়াছি তাহা ভুল। একটি ঘটনা কিন্তু জানি যাহা ভুল নয় এবং যাহার তীব্র আলোকে অগ্নীশ্বর আজও আমার নিকট অদ্ভুত বিস্ময়ের মতো হইয়া আছেন। যখনই তাঁহাকে কল্পনা-নেত্রে দেখি, মনে হয়, তিনি এমন একটা আলোকের পরিবেশের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন যে, তাঁহার কাছাকাছি যাইবার সাধ্যও আমাদের নাই। তাঁহার ছেলে বিবাহ করিয়াছিল এক ভিন্ন জাতের মেয়েকে। ভিন্ন জাত বলিয়া অগ্নীশ্বরের আপত্তি ছিল না, কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন কন্যার পিতা খুব বড় লোক, জামাইকে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা, একটি মোটরকার এবং কলিকাতায় একখানা বাড়ি যৌতুক স্বরূপ দিবেন, অমনি তিনি সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করিলেন। তখন তাঁহার নিজের অবস্থা খুব খারাপ, চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করাতে আয় অর্ধেকেরও কম হইয়া গিয়াছে, কোথাও প্র্যাক্‌টিস জমে নাই। কলিকাতায় একটা সরু গলিতে স্যাঁতসেঁতে একতলা ঘরে বাস করেন।

ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ বিয়েতে আমি মত দিতে পারলুম না।"

ছেলে বলিল, "কেন, আগে তো মত দিয়েছিলেন, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, এখন আবার অমত করছেন কেন—"

"আগে মত দিয়েছিলুম, আমার ধারণা হয়েছিল তুমি একটা আদর্শের জন্য বিয়ে করছ। ঝুটো ব্রাহ্মণত্বের মাথায় লাথি মেরে প্রেমকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসাচ্ছ। এখন দেখছি তা নয়, তুমি

বিয়ে করছ টাকার লোভে।"

'কিন্তু বিয়ের দিন তো ঠিক হয়ে গেছে—"

"ও বিয়েতে আমি যাব না। আমাকে বাদ দিয়ে যদি তোমার বিয়ে করবার প্রবৃত্তি হয়, যাও গিয়ে করে এস—"

অগ্নীশ্বরের এক ছোট ভাই তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—"বিয়ের যখন সব ঠিক হয়ে গেছে তখন তোমার না যাওয়ার কোন মানে হয় না। তুমি না গেলেও বিয়ে হবে, তুমি গেলে দেখতে শুনতে একটু শোভন হত। তুমি যাচ্ছ না কেন—"

"আমার ছেলেকে চাঁদির জুতো মারতে মারতে গলায় গামছা দিয়ে হিড় হিড় করে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য দেখা আমার পক্ষে শক্ত।"

"কেন, বড়লোক হওয়াটা কি অন্যায়? কোন ধনী যদি তার জামাইকে গাড়ি বাড়ি টাকা দেয় সেটা কি তার অপরাধ?"

"পায়ের অপরাধ কখনও থাকে না। যে পা চাটে অপরাধ তারই।"

"এটাকে পা-চাটা বলে মনে করছ কেন। সিধু সত্যিই ভালবেসেছে কমলাকে। এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন—"

"তোমার সিধু ওই রেবা নার্সের সঙ্গে যখন ঘোরাঘুরি করত তখনও লক্ষ্য করেছিলাম, তার মুখের ভাবটা রসে-ডোবানো মালপোর মতো হয়েছিল। আমি প্রত্যাশা করেছিলুম বিয়ের প্রস্তাব এল বুঝি। কিন্তু যেই তোমার সিধু কমলার সন্ধান পেলে অমনি সব বদলে গেল। রসে ডোবানো মালপো দেখতে দেখতে হয়ে গেল কেঠো লেড়ো বিস্কুট। রেবার বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স যদি কমলার বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের চেয়ে বেশী হত তাহলে তোমার সিধু ওই দিকেই ঝুঁকত—"

"এটা তুমি গায়ের জোরে বলছ। এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে কি যুক্তি আছে তোমার।"

"যুক্তি দিতে পাবব না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ আমি ডাক্তাব। এক নজরেই অনেক সময় ঠিক রোগটা ধরতে পারি। প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক পরে। এ বিষয়ে আমার ভুল হয়নি।"

"দেখ, সিধুর মা নেই, বৌদি বেঁচে থাকলে কি তুমি—"

"তোমার বৌদি বেঁচে থাকলে এ বিয়ে হত না। সোনার বেনের মেয়েকে সে কিছুতেই পুত্রবধু করতে রাজি হত না। সিধু জোর করলে সে গলায় দড়ি দিত, তবু রাজী হত না।"

তাঁহার ভাই তবু ছাড়েন নাই।

"তুমি তো অত অবুঝ নও। তলিয়ে ভেবে দেখ না ব্যাপারটা, অনিবার্যকে নিবারণ কববার চেষ্টা করছ কেন? ছেলে বড় হয়েছে, ছেলেও খুব ভালো—তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটা যদি ভালো করে ভেবে দেখ, তাহলে—"

অগ্নীশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিলেন। তাহাব পর বলিলেন, "না, আমি পারব না। যে দুধে কেরোসিন তেলের গন্ধ ছাড়ছে, সে দুধ আমি গিলতে পাবব না। কিছুতেই পারব না।"

বিবাহ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু অগ্নীশ্বর সে বিবাহে যোগদান করেন নাই। এই ঘটনার সমস্ত বিবরণ আমি তাঁহার ভাইয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি।

এ ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরে তাঁহার নববৈবাহিক তাঁহাকে একটি পত্রাঘাত করিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম—"আমার কয়েকটি চায়ের বাগান এবং কোলিয়ারি আছে। তাছাড়া একটা কাপড়ের কলও আমাকে চালাইতে হয়। প্রত্যেক জায়গায় আমাকে ডাক্তার রাখিতে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, এইসব ডাক্তারদের ঠিকমত চালাইবার জন্য একজন চীফ মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত করা। আপনি একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসক। আপনি যদি এই ভারটি গ্রহণ করেন, আমি অনুগৃহীত হইব। এ সমস্ত সম্পত্তি তো আপনারই পুত্রের, আপনি ইহার তত্ত্বাবধানের ভার লইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিলেন,

"আপনার চিঠি পেলাম, কিন্তু আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না। আমি একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের লোক। রবি ঠাকুরের ক্ষ্যাপা পরশ-পাথর খুঁজে বেড়াত, আমি সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছি স্বাধীনতা, যা এদেশে পাওয়া অসম্ভব। যখন ডাক্তারী পাশ করে বেরুলাম, তখন মনে হয়েছিল এটা স্বাধীন ব্যবসা, এবার বোধ হয় স্বাধীনতার আস্বাদ কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝলুম, ও বাবা, এদেশে স্বাধীন ব্যবসা করা মানে সক্কলের মন রেখে চলা। পদি পিসি থেকে আরম্ভ করে গুরুঠাকুর, দালাল, দোকানদার সক্কলের পায়ে তেল দিতে হবে। খোশামোদ করতে হবে গাঁয়ের কোয়াক্‌দের, প্রতিযোগিতা করতে হবে কম্পাউণ্ডার, হোমিওপ্যাথ আর কবরেজদের সঙ্গে। মাদুলি, কবচ, ওলাবিবি সক্কলের সঙ্গে আপস করে চলতে হবে। সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে লোকে লাথাবে, অপমান করবে, তুমি টু শব্দটি করতে পাবে না। দেখলাম, এ রকম স্বাধীন ব্যবসা করা আমার পোষাবে না। সুট সুট করে গিয়ে চাকরি নিলুম। সারাজীবন চাকরিই করেছি। চাকরিতেও খানিকটা গ্লানি ছিল বটে, কিন্তু একটি মনিবকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে আর কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না, আর সে মনিবটি সাধারণত শিক্ষিত সাহেব হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুণের কদর করত তারা। চাকরি করে খানিকটা স্বাধীনতা ভোগ করেছিলুম। রামা শামা যদুর পায়ে তেল দিয়ে অন্নসংস্থান করতে হয়নি, কিম্বা উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে রুগী ধরতে বেরুতে হয়নি। আপনিও আমাকে চাকরি অফার করেছেন। কিন্তু আমি যাদের অধীনে এতকাল চাকরি করেছি তাদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যেত না, তাদের সভ্যতা, সাহিত্য, তাদের শৌর্য বীর্য, রাজনীতের দাপটে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, তাদের কলমের এক খোঁচায় অসম্ভব সম্ভব হত—সুতরাং আমার মেজাজটা অনেকটা সেই রকম হয়ে গেছে। আপনার অধীনে আপনার চা-বাগানে বা কোলিয়ারিতে চাকরি করা আমার পোষাবে না। তাছাড়া আপনার চাকরিটি আসলে একটি টোপ, আমি যদি মাছ হতুম, গিলে ফেলতুম, কিন্তু আমি মাছ নই মানুষ তাই একটু মুচকি হেসে এড়িয়ে গেলুম। নমস্কার জানবেন।"

চিঠিটা অগ্নীশ্বরের ভাই-ই আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে—বোধহয় মাস তিনেক পরে—একদিন সকালে একটি ফুটফুটে সুন্দরী বধূ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অগ্নীশ্বর তাহাকে পূর্বে কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না।

"কে তুমি, তোমাকে চিনতে পারছি না।"

"আমি কমলা।"

অগ্নীশ্বর নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন মেয়েটির দিকে। লক্ষ্য করিলেন, মেয়েটির চোখের কোণে জল টলমল করিতেছে। তাঁহার চোখেও হঠাৎ জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না।

কমলা বলিল, "বাবা, আপনি এত কষ্ট করে এখানে আছেন, আমার কাছে চলুন, আপনাকে নিতে এসেছি।"

"সে তো অসম্ভব।"

"আমরা এখানে আসব?"

"আসতে পার। কিন্তু একটি শর্তে। যদি তোমার বাবার ওই ত্রিশ হাজার টাকা, মোটর গাড়ি আর বাড়ি ফেরত দাও।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল, "আমাদের তাহলে চলবে কি করে? উনি কোথাও চাকরি পাননি, পাবার আশাও তো কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।"

"আমি যা পেনশন পাই তাইতে কুলিয়ে নিতে হবে। তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে সিধুকে এই পেনশনের উপরই নির্ভর করতে হত।"

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, বেশ আসব—"

সত্যসত্যই তাহারা টাকা গাড়ি বাড়ি ফেরত দিয়া অগ্নীশ্বরের স্যাঁতস্যাঁতে একতলা বাসায় আসিয়া উঠিল একদিন। বাড়িটিতে দুইখানি মাত্র ঘর ছিল, একটিতে অগ্নীশ্বর শয়ন করিতেন, অপরটি ছিল তাঁহার বাথরুম। নিজে তিনি বাথরুমে গিয়া খাটিয়া পাতিলেন ছেলে বউকে ছাড়িয়া দিলেন নিজের শুইবার ঘরটি। তাঁহার মেয়েদের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরই তাহার একমাত্র পুত্র। সুতরাং খুব বড় বাড়ির দরকারও ছিল না তাহার। কিন্তু কিছুদিন সে বাড়িতে বাস করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন কমলার খুব কষ্ট হইতেছে। কমলা তাঁহার সেবা করিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। রাঁধিবার চাকরটি আসিয়াই সে ছাড়াইয়া দিল। নিজে হাতে সমস্ত করিত, এমনকি, অগ্নীশ্বরের 'পিস্‌পট্' পরিষ্কার করা পর্যন্ত। অগ্নীশ্বরের অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হইত না, তিনি শুইয়া শুইয়া বই পড়িতেন। ঠিক পাশের ঘরটিই কমলা আর সিদ্ধেশ্বরের, অগ্নীশ্বর উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, যদি তাহাদের হাসির গিটকিরি বা গল্পের টুকরা তাঁহার কানে ভাসিয়া আসে। কিন্তু কিছুই আসিত না, টু শব্দটি পর্যন্ত না। হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে হইল—'ওটাতে কারা শুয়ে আছে? নতুন-বিয়ে করা বউ ছেলে না দুটো মড়া! আমার ভয়ে ওইরকম করছে না কি—।'

তাহার পরদিন হইতে তিনি সকাল সকাল আলো নিভাইয়া দিতেন। ঘুম আসিত না, বিনিদ্র নয়নে চুপ করিয়া জাগিয়া থাকিতেন। দিন দুই পরেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার 'ডায়াগ্‌নোসিস্' ঠিক। তাঁহার ভয়েই উহারা চুপ করিয়া থাকে। দুইটি ঘরের মাঝখানে যে পার্টিশন ছিল, তাহা ছাত পর্যন্ত ছিল না। সেই ফাঁক দিয়া পুত্র-পুত্রবধূর বিশ্রম্ভালাপ তিনি দিন কয়েক শুনিলেন, সম্ভবত উপভোগও করিলেন।

একদিন সকালে উঠিয়া কিন্তু দেখা গেল তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। সিদ্ধেশ্বরকে তিনি যে পত্রটি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই—

সিধু,

আমি তোমাদের মুক্তি দিয়ে গেলুম। নিজেকেও মুক্ত করলুম। তোমাদের সঙ্গে বাস করতে হলে যে অনভ্যস্ত সংযমের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হবে সে কারাগারে বাস করা এ বয়সে আমার পক্ষে অসম্ভব। রাত্রি একটা দেড়টা পর্যন্ত বই না পড়লে আমার ঘুম হয় না, অথচ পাশের ঘরে আলো জ্বেলে বই পড়লে তোমাদের প্রেমালাপ জমে না। সামান্য চারটি আলো চালের ভাত, একটু মুগের ডাল, গাওয়া ঘি, দু'একটা ভাজাভুজি এই খেয়ে আমি তৃপ্তি পাই। কিন্তু তোমার কমলা যখন সেবা করবার আতিশয্যে মশলা গরগরে তরকারি তৈরি করে আনে, তখন সোনামুখ করে সেটা খেতে হয়, খেয়ে বাহবাও দিতে হয়, না দিলে অভদ্রতা হয় সেটা। রান্না যে খারাপ হয় তাও নয়, কিন্তু ও ধরনের রান্না খেয়ে আমার তৃপ্তি হয় না। আমার নিজের রুচির কথা ওকে বলতে ভয় পাই, কারণ ও একা হাতে আবার সব করতে যাবে আমাকে খুশি করবার জন্য। তোমরা মশলা-গরগরে রান্না পছন্দ কর, হজমও করতে পার, আমিও এককালে পারতুম, এখন আর পারি

না, ভালও লাগে না। তোমার কমলা নাকি সুরে যে আধুনিক গান গায়, তা একেবারে ভালো লাগে না আমার, আমার কান যে গান শুনতে অভ্যস্ত, তা ওস্তাদী গান, আধুনিক গান শুনলে মনে হয়, কতকগুলো উইচিংড়ে ফড়িং জাতীয় পোকা তাদের antics দেখাচ্ছে লাফালাফি কোরে। আমার এই ব্যক্তিগত অ্যাকোয়ার্ড রুচিকে বদলাতে পারি না, জোর করে তোমাদের উপর চাপাতেও পারি না। কিন্তু রেডিওতে যখন ভালো কানাড়ার আলাপ হচ্ছে, তখন সেটা ক্যাঁক করে বন্ধ করে তোমরা যখন অমুকবালা বা তমুকনাথের সিনেমার গান শোন, তখন আমার সর্বাঙ্গ রিরি করতে থাকে, অথচ মুখের হাসিটি ফুটিয়ে রেখে পা দুলিয়ে দুলিয়ে তাল দিতে হয়। হিটলার না মুসোলিনী কে যেন তাদের পলিটিকাল প্রিজনারদের শাস্তি দেবার জন্যে এই ধরনের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এ আমার আর সহ্য হল না, তাই পালাচ্ছি। নিজের ব্যক্তিত্বের শূলে চড়িয়ে একটি নারীকে তো হত্যা করেছি, আর করবার ইচ্ছা নেই। কমলা ভালো মেয়ে, আশা করি ওকে নিয়ে তুমি সুখে ঘর-কবনা করতে পারবে। নিজের জন্যে পঞ্চাশ টাকা রেখে আমার পেনশনের বাকি টাকাটা তোমাকে প্রতিমাসে পাঠিয়ে দেব। আমি একটা নামজাদা দাতব্য চিকিৎসালয়ের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছিলাম। কয়েকদিন আগে তাঁরা জানিয়েছেন যে, আমাকে তারা 'অনাহারী' সার্জনের পদে বহাল করতে রাজী আছেন। মাসে শতখানেক টাকা অ্যালাউন্স হিসেবে দেবেন, থাকবার বাড়ী দেবেন, চাকরও দেবেন একটা। এর সঙ্গে পেনশনের পঞ্চাশ টাকা যোগ দিলে আমার ভালই চলে যাবে। সেখান থেকে আমাকে যেন আর টানাটানি করে আনবার চেষ্টা করো না। বাইরে থাকলেই আমি সুখে থাকব এবং আমার ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্বের আঁচটা সরে গেলে তোমরাও সুখে থাকবে আশা করি। ইতি—

যে আলেয়ার পিছনে তিনি সারাজীবন ছুটাছুটি করিয়াছেন, সে আলেয়া তাঁহাকে কিসের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহাই আমি বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। ধন মান ধর্ম মোক্ষ এসব কিছুই তিনি চাহেন নাই। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তিনি সম্ভবত স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন—সেই নিবঙ্কুশ স্বাধীনতা, যাহা সামাজিক মানুষের পক্ষে দুর্লভ।

চার

আপনাদের অনেকের মনে এ প্রশ্ন হয়তো জাগিতেছে যে, আমি একজন পুলিশ অফিসার, অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে লইয়া আমি এত মাথা ঘামাইতেছি কেন। ঘামাইতেছি, কারণ, আমার এই মাথাটা তিনিই একদিন রক্ষা করিয়াছিলেন।

সেই কথাটাই এবার বলিব। পূর্বে একটু আভাসমাত্র দিয়াছি, এইবার খুলিয়া বলিব। বোমার দলে কেন যোগ দিয়াছিলাম, কবে যোগ দিয়াছিলাম, তাহা এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। সে যুগে যে উন্মাদনা বাংলার আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করিতেছিল, সে উন্মাদনার প্রভাব আমিও এড়াইতে পারি নাই। আমি যে-দলে ছিলাম, সে-দলের কাজ ছিল নানা স্থানে স্বদেশী ডাকাতি করা এবং সেই ডাকাতির টাকা দিয়া বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা। বহুকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত বাহ্য ডাকাতিই ছিল আমাদের আদর্শ। ডাকাতি করার ফাঁকে ফাঁকে সাহেব অথবা গোয়েন্দা মারিবার চেষ্টা। ইহাই ছিল মোটামুটি আমাদের কার্যক্রম। কিন্তু হায়, একদিন ধরা পড়িলাম। আমাদেরই দলের একজন

বিশ্বাসঘাতকতা করিল। বাঙালীদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমিক কম ছিল না, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকও অনেক ছিল। মানবসভ্যতা যেমন কৃষিসভ্যতা ও যাযাবর সভ্যতায় ভাগ হইয়া দুইটি বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে, বাঙালী সমাজও যেন অনেকটা তাই। একদল চাকরিবিলাসী শান্তশিষ্ট সুবিধাবাদী কেরাণীর দল। বড় সাহেবের মন রাখিয়া, গৃহিণীর গহনা গড়াইয়া, বংশ বৃদ্ধি, দোল-দুর্গোৎসব, পুত্রকনার বিবাহ প্রভৃতি নিষ্পন্ন করিয়া জীবনের অপরাহ্নে পরচর্চা, পরলোক-চর্চা, দলাদলি, ঘোঁট প্রভৃতিতে মত্ত থাকিয়া হরিনাম করিতে করিতে শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করা—ইহাই মোটামুটি তাহাদের জীবনের আদর্শ। কিন্তু এই বাঙালীর ঘরেই আবার এমন একদল ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, গৃহের বন্ধন, গৃহস্থালীর মায়া যাহাদের বাঁধিতে পারে নাই, আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যাহারা যুগে যুগে গৃহত্যাগ করিয়াছে। এই দলে চৈতন্য ছিলেন, ক্ষুদিরাম, কানাইলালেরাও এই দলের লোক। ইহাদের সহিত প্রথমোক্ত দলের ঘোর শত্রুতা। কারণ, ইহাদের নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জনের আগুন, ইহাদের ভূমাকাঙ্ক্ষা প্রাণের প্রচণ্ড ঝড়, গৃহস্থের সুখের সংসারকে বারবার শ্মশান করিয়া দিয়াছে। তাই যখনই এইরূপ ত্যাগী আদর্শ-পাগল লোক সমাজে দেখা দিয়াছে, তখনই তাহাদের বিরোধিতা করিবার লোকও দেখা দিয়াছে সংরক্ষণশীল সমাজে হইতে। সংখ্যায় বাঙালী বিপ্লবী এবং বাঙালী গোয়েন্দা প্রায় সমান।

দলের একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমরা ধরা পড়িয়া একটি মফঃস্বলের জেলে বন্দী হইলাম। আমাদের বিরুদ্ধে চার্জ—সশস্ত্র ডাকাতি এবং হত্যার। কোনাটাই মিথ্যা নয়। ফাঁসি সুনিশ্চিত। মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় বিধাতা দয়া করিলেন। আমাদের দলের লোক জেলের চাকরদের হাত করিয়া আমাদের কাছে গোটা দুই লোডেড রিভলবার পৌঁছাইয়া দিল। যে পাত্রে করিয়া মেথররা প্রতি 'সেল' হইতে বিষ্ঠা পরিষ্কার করে, সেই পাত্রের মধ্যে বিষ্ঠার স্তূপে আত্মগোপন করিয়া আমাদের উদ্ধারকর্তারা আসিলেন। নরেন গোঁসাইকে খুন করিবার জন্য কানাইলালের নিকটও একদা তিনি আসিয়াছিলেন। আমরা আর কাল বিলম্ব করিলাম না, দুইজন ওয়ার্ডারকে হত্যা করিয়া পরদিনই জেল হইতে পলায়ন করিলাম। জেলেরই চাকররা আমাদের সহায়তা কবিয়াছিল। তাহা না করিলে পারিতাম না। সেকালে জেলের অনেক চাকরেরা স্বদেশীদের মনে মনে ভক্তি করিত। অনেকে বাহির হইতে টাকাও পাইত প্রচুর।

পাগলা ঘণ্টা যখন বাজিয়া উঠিল, তখন আমরা জেলের বাহিরে। প্রাণপণে ছুটিতেছি। আমাদের তাড়া করিয়াছে রাইফেলধারী মিলিটারী পুলিশ। ঘোড়ায়, মোটরে, পদব্রজে। অধিকাংশই লালমুখ টমি। জেলের নিকটেই তাহাদের একটা ছাউনি ছিল।

কতক্ষণ ছুটিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ একটা গুলি খাইয়া পড়িয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ধরাও পড়িলাম।

...যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি হাসপাতালের একটা বিছানায় শুইয়া আছি। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় আমার ক্ষতটা পরীক্ষা করিতেছেন। কাছেই একজন টমি দাঁড়াইয়া আছে। কথাবার্তায় মনে হইল, সেই ক্যাপ্টেন। অগ্নীশ্বর বলিলেন, "এর পেটে বুলেট ঢুকেছে। সেটা বার করে না দিলে বাঁচবার আশা নেই। তোমরা কি একে বাঁচাতে চাও?"

"নিশ্চয়—"

"তাহলে এখুনি অপারেশন করতে হবে। আমি কিন্তু আমার আপিসে তোমাদের ডিনারের ব্যবস্থা করেছি। দু বোতল হুইস্কিও পেয়েছি। তুমি আগে ডিনার খাবে, না আমার সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে যাবে—"

"আমি অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে কি করব? ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার, আমি খাই গিয়ে। আই হোপ, আই ক্যান ট্রাস্ট্ ইউ। ইউ আর মাই ওল্ড ফ্রেণ্ড।"

"অফ কোর্স—"

সাহেব ডিনার খাইতে চলিয়া গেলেন। অগ্নীশ্বর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন অন্য একটা দরজা

দিয়া। তিনি কি করিলেন জানি না, একটু পরে দুইটি বেয়ারা একটি স্ট্রেচার লইয়া আসিল। স্ট্রেচারে চড়িয়া আমি যে ঘরে উপস্থিত হইলাম, তাহা অপারেশন থিয়েটার নয়, মর্গ। অগ্নীশ্বর সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মেথর দুইজনকে বলিলেন, "যে আনক্লেম্‌ড্ বডিটা এখানে রয়েছে, সেইটা তুলে নিয়ে যা অপারেশন থিয়েটারে। তুমি শিগ্‌গির নাব—"

স্ট্রেচার হইতে আমাকে নামইয়া দিয়া আমার কানে কানে বলিলেন, "তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি পালাও—"

স্ট্রেচারবাহিত হইয়া আন্‌ক্লেম্‌ড্ মৃতদেহটি অপারেশন থিয়েটারের দিকে চলিয়া গেল। আমি অজানার উদ্দেশ্যে আবার অন্ধকারে পা বাড়াইলাম। বুলেট আমার পেটে প্রবেশ করে নাই, পেটের চামড়া ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছিল, খানিকটা চামড়া তুলিয়া লইয়াছিল, আর কিছু করিতে পারে নাই। কয়েকদিন পরে কাগজে দেখিলাম, হাসপাতালে আমার মৃত্যু হইয়াছে। পেটে বুলেট ঢুকিয়াছিল, তাহা বাহির করিবার জন্য আমার পেট কাটা হয়। সার্জন এ. মুখার্জি অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও বুলেটটি পান নাই। অপারেশনের ফলে আমার মৃত্যু হইয়াছে।

...কিছুদিন পরে দাড়ি, লুঙ্গী আর চাটগাঁয়ের ভাষার সাহায্যে ভোল বদলাইয়া ফেলিলাম। তখন মুসলমানদের উপর ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট খুব প্রসন্ন ছিলেন, তাই মুসলমানের ছদ্মবেশ গ্রহণ করাই নিরাপদ মনে হইল। চট্টগ্রামের এক মুসলমানের বাড়িতেই চাকর হিসাবে বাহাল হইয়া গেলাম। পরিচয় দিবার সময় বলিলাম, কলিকাতায় আমার বাবা বাবুর্চির কাজ করিত, হিন্দু-মোসলেম রায়টের সময় হিন্দুর ছুরিতে মারা গিয়াছে, মা কোথায় পলাইয়া গিয়াছে জানি না। ভাই বোন কেহ নাই।

হায়রে, আমার নিজের বাবা মা তখন হয়তো তাঁহাদের শহীদ পুত্রের মৃত্যুশোকে ভালো করিয়া কাঁদিতেও পারিতেছেন না, কারণ আমার আর একটি ভাই ছিল, সে যে আমার ভাই, একথা পুলিশের কানে গেলে তাহাকেও লইয়া পুলিশ টানাটানি করিবে, এই ভয়ে তাঁহাদের পুত্রশোকও হয়তো ভাষা পাইতেছে না, এই রকম একটা কল্পনা করিয়া আমি সুখ পাইতাম। কিন্তু সত্য যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আরও নিদারুণ। আমার বাবা মা ভাই কেহই রক্ষা পায় নাই। আমার বাবা মা পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন, যে বিশ্বাসঘাতক আমাদের ধরাইয়া দিয়াছিল, আমার ভাই তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথে কুকুরের মতো হত্যা করিয়া ফাঁসি গিয়াছে। পুলিশের লোকেরা আমার মা বাবাকেও রেহাই দেয় নাই। আমি যখন বিলাত হইতে ফিরিলাম, তখন তাঁহাদের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত। আমাদের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে না, রাজানুগৃহীত এক ব্যক্তি সেখানে বাড়ি করিয়াছেন, তাঁহার অ্যালশেসিয়ান কুকুরের দাপটে সেখানে কেহ ঘেঁষিতে পারে না। আমি বাবা মায়ের শ্রদ্ধা তপর্ণও করিয়াছি লুকাইয়া। সহজে তাহা সম্ভব হয় নাই। বাংলা-বিহার-উত্তরপ্রদেশে আমি মুসলমান বলিয়া পরিচিত, প্রকাশ্যে হিন্দুমতে বাবা মার শ্রাদ্ধ করিব কি করিয়া? তবু করিয়াছিলাম। ধনুষ্কোটি যাইতে হইয়াছিল।

হ্যাঁ, আমি শেষ পর্যন্ত বিলাত গিয়াছিলাম। ব্যাপারটি সম্ভব হইয়াছিল বড় অদ্ভুত উপায়ে। আমি যে হাজি সাহেবের বাড়িতে চাকররূপে বাহাল হইয়াছিলাম তাঁহার বৃহৎ পরিবার। তাঁহার নিজের চারটি বিবি! দুইটি বয়স্ক পুত্রও পিতৃ-পন্থা অনুসরণ করিয়া একাধিক বিবাহ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, একটি কন্যা এবং একটি ভাগ্নী সপরিবারে তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতেন। বৃহৎ পরিবার। আমাকে বাসন মাজিতে হইত, বাহিরের ঘর ঝাড়ু দিতে হইত, পুরুষদের কাপড় কাচিতে হইত, ইহা ছাড়া ফাই ফরমাস তো ছিলই। বাজারও করিতে হইত। বাজার করিতে গিয়া লক্ষ্য করিতাম, একটি ভিখারিণী প্রায় প্রতি দোকানেই গিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। কেহ ভিক্ষা দিতেছে, কেহ দিতেছে না, কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি প্রলুব্ধ। মেয়েটির বয়স আন্দাজ ত্রিশ বত্রিশ হইবে। যুবতী নয়, কিন্তু রূপসী। তাহার চোখের দৃষ্টি ঠিক পণ্যরমণীর দৃষ্টি নহে। কিন্তু অদ্ভুত সে দৃষ্টি। তাহার ভাষাও চট্টগ্রামের ভাষা নহে, পশ্চিমবঙ্গের ভাষা। মনে হইল মেদিনীপুরের। মেদিনীপুর বিপ্লবীদের চক্ষে তীর্থস্থান। মেয়েটির কথায় মেদিনীপুরের টান শুনিয়াই প্রথমে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহার পর একদিন সে আমার কাছেও ভিক্ষা চাহিল।

বলিলাম, "আমি তো নিজেই গরীব। তোমাকে আর কি দিতে পারি।"

"যা পার তাই দাও—"

আরও দিন দুই পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভিক্ষা কর কেন। রোজগাব করতে পার না?"

মেয়েটি তাহার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। তাহার পর বলিল, "আমার মতো মেয়ের পক্ষে রোজগারের একটি পথই খোলা আছে। অনেকেই আমাকে সে চাকরি দিতে চায়। কিন্তু আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, চোখের দুটি তারা যেন দুটি ছররা। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার ছেলে হবে? আমাকে মা বলে ডাকবে? আমাকে কেবল খেতে পরতে দিও, তোমার সব কাজ আমি করে দেব—"

"আমি যে মুসলমান মা, আমার ছোঁয়া খাবে তুমি?"

"তুমি যদি মা বলে আমাকে ডাক, তাহলে তো জাতের বিচার আর রইলো না। মায়ের চোখে সব ছেলেই এক জাত।"

"বেশ তাই হবে। তোমার দেশ কোথা?"

"মেদিনীপুর জেলা, কন্টাই সাবডিভিসন।"

শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"এখানে কি করে এল।"

"ভাসতে ভাসতে। এক স্বদেশী আন্দোলনে সায়েবরা এসে পেট্রোল দিয়ে আমাদের ঘর-বাড়ী সব পুড়িয়ে দিলে। আমার স্বামীর মুখের উপর গুলি করলে একজন সাহেব। তার অপবাধটি কি জান? সে বলেছিল 'বন্দে মাতরম'। আমার ছেলেটাকেও মেরে ফেললে। মারলে না কেবল আমাকে।"

তাহার চোখের ছর্‌রা দুইটি প্রখর হইয়া উঠিল। মনে হইল, এখনই বুঝি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

"আমাকে তারা ফেলে চলে আসছিল। কিন্তু আমি সঙ্গ ছাড়িনি। খবর পেয়েছি, ওরা এখানে এসেছে। তাই আমিও এসেছি—"

"ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছ কেন—"

"এখনও বকশিস পাইনি যে"

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল সহসা।

"তুমি ছেলে বলেই তোমাকে সব কথা বললুম। বলা বোধহয় উচিত ছিল না, না? মাথার ঠিক নেই। তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে তো? একবেলা দুটি খেতে দিও কেবল, কেমন? কোথা থাক তুমি।"

"হাজি সাহেবের বাড়িতে। সেখানে যেও না যেন। আমি তোমার খাবার এইখানেই নিয়ে আসব। তুমি কোথায় থাক?"

"কোথাও না। দিন-রাত ঘুরি। ফাঁক খুঁজি। শোবার বসবার কি জো আছে কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ দাঁড়াবে কাছে এসে। খালি ঘুরে বেড়াই। সকালবেলা বাজারে আসি। এইখানেই খাবার দিয়ে যেও, কেমন?"

অভিভূত হইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

তাহার পরদিন হইতে রোজই আমার খাবারের খানিকটা অংশ তাহাকে দিয়া আসিতাম। ও অঞ্চলে সকলে তাহাকে পাগলী বলিত। প্রথম প্রথম অনেকে তাহাকে বিরক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, শেষে আর করিল না। সে একজনকে নাকি কামড়াইয়া দিয়াছিল।

এইভাবেই চলিতেছিল। ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। একদিন নদীতে স্নান করিতেছি, হঠাৎ সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। দেখিলাম একটি ছেলে ডুবিতেছে। ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে

পড়িয়া গিয়াছে। বাঁচিবার আশা প্রায় নাই। প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলাম এবং অনেক কষ্টে ছেলেটার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে তীরে তুলিলাম। অনেক জল খাইয়াছিল, হাসপাতালে গিয়া কোনরকমে রক্ষা পাইয়া গেল। শুনিলাম একজন সারেং-এর ছেলে। সারেং একদিন আসিয়া আমার সহিত দেখা কবিলেন এবং আমাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহিলেন। পুরস্কার লইলাম না। বলিলাম, "আপনার ছেলের জান' বাঁচাতে পেরেছি এই তো আমার যথেষ্ট বকশিস। খোদাতালা ওকে বাঁচিয়ে রাখুন, এর জন্যে আমি টাকা নিতে পারব না। গোস্তাকি মাপ করবেন।"

দিনকতক পরেই কিন্তু বকশিসটা লইতে হইল অপ্রত্যাশিতরূপে এবং অন্য প্রকারে। একদিন বাজারে সেই পাগলীটা বলিল, "তুই যে আমাকে মা বলিস, পেন্নাম করলি না তো একদিন। পেন্নাম কর আজ—"

ভঙ্গীভরে শাড়িটা তুলিয়া পা বাড়াইয়া দিল। দেখিলাম, তাহার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি, চোখের কোণে জল।

"পেন্নাম কর। মাকে পেন্নাম করবি তাতে আর লজ্জা কি—"

চারিদিকে লোক জড় হইয়া গিয়াছিল। আমি সত্যই একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শেষে তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই তাহাকে একটা প্রণাম করিলাম। সে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। সহসা তাঁহার চিবুক ও নিচের ঠোঁটটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল—"মানুষের মতো মানুষ হও। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি হবে।"

মেয়েটির নাম ছিল বিশাখা। বাঁ হাতে উলকি দিয়া নামটি লেখা ছিল। সে আজ কত দিনের কথা। তাহার হাসি কান্না মাখা মুখখানি আজও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে। এতটুকু ম্লান হয় নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, তাহার আশীর্বাদ কি আমার জীবনে ফলিয়াছে? সত্যই কি মানুষের মতো মানুষ হইতে পারিয়াছি?

প্রণাম করার পরদিনই ঘটনাটি ঘটিল। একজন মিলিটারি সাহেব বাজারে আসিয়াছিল, বিশাখা ছুটিয়া গিয়া একেবারে তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল। সে কামড় সাংঘাতিক মরণ কামড়। বুলডগ যেমন একবার কামড়াইয়া ধরিলে সে কামড় আর খোলে না, এ কামড় তেমনি কামড়। অনেক টানাটানি ধস্তাধস্তি করিয়াও বিশাখাকে ছাড়ানো গেল না। তাহার পিঠের উপর লাঠি জুতা ঘুষি চড় বর্ষিত হইতে লাগিল, তবু সে ছাড়িল না। শেষে একজন সার্জেন্ট তাহার কাপড় খুলিয়া সর্বাঙ্গে শপাশপ হান্টার চালাইতে লাগিল। তবু কোন ফল হইল না। শেষে তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইল। বিশাখা মরিল, কিন্তু তাহার মৃতদেহটা সাহেবের টুঁটি কামড়াইয়া ঝুলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করিয়া তাহার রক্তাক্ত মুখটা সাহেবের গলা হইতে যখন ছাড়াইয়া লওয়া হইল, তখন দেখা গেল, সাহেবের টুঁটিটা সে একেবারে চিবাইয়া দিয়াছে, একাধিক বড় বড় শিরাও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আধঘণ্টা পরে সাহেবেরও মৃত্যু হইল।

বাংলার অগ্নিযুগের ইতিহাসে বিশাখার নাম লেখা নাই। আরও অনেকের নাই। ইচ্ছা করিয়া অনেকে নিজেদের পরিচয় মুছিয়া দিয়া গিয়াছে। কাজটাই তাহাদের কাছে বড় ছিল, নামটা নয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে আমাদের সেই পলাতক জীবনে যখন বন্যপশুর মতো আমরা একস্থান হইতে আর একস্থানে পালাইয়া বেড়াইতাম, যখন পথের বদলে বিপথ এবং গৃহের বদলে অরণ্যই আমাদের নিকট বেশি নিরাপদ মনে হইত, যখন ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, বিশ্রামের শয্যা দুর্লভ বিলাসের মতো ছিল, সেই সময় কত অপরিচিত গৃহে আশ্রয় পাইয়াছি, কত অচেনা মা-বোনেদের সেবা পাইয়াছি, তাহার ইতিহাসও কোথাও লেখা থাকিবে না। তাঁহারা জানিতেন আমরা বোমার দলের লোক, তাঁহারা জানিতেন আমাদের আশ্রয় দেওয়া নিরাপদ নয়, তবু আশ্রয় দিতেন, হয়তো একঘণ্টার জন্য, হয়তো এক রাত্রির জন্য, আজ কোথায় তাঁহারা, ইতিহাসে তাঁহাদের নাম নাই।

বিশাখারও নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবন আমার ধন্য হইয়া গিয়াছে। তাহাকে একবারও অন্তত প্রণাম করিয়াছি।

বিশাখা মরিয়া কিন্তু আমাকে বিপদে ফেলিয়া গেল। পুলিশের খবর পাইতে বিলম্ব হইল না যে, আমি তাহাকে রোজ খাইতে দিতাম। বাজারে যাইতেই একজন আমাকে বলিল, "তুমি শিগ্‌গির এখান থেকে পালাও। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে—"

বাজার না করিয়াই বাড়ি ফিরিয়া গেলাম। হাজি সাহেবকে খুলিয়া বলিলাম সব। তিনি বলিলেন, "পুলিশ তোমার খোঁজে এখানেও এসেছিল, আমি বলে দিয়েছি তুমি এখানে নেই। তোমাকে আমি জবাব দিয়েছি। তুমি এদেশ ছেড়ে পালাও।"

"কোথা পালাব হুজুর। আমি গরীব মানুষ—"

হাজি সাহেব গম্ভীরমুখে দাড়ির ভিতর আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

"কিন্তু আমি তো বাপু তোমাকে আর আমার বাড়িতে থাকতে দিতে পারি না। তুমি তাহলে এক কাজ কর, সারেং সাহেবের কাছে যাও। তাঁর জাহাজ দু'একদিনের মধ্যেই ছাড়বে। তিনি যদি তোমাকে জাহাজে তুলে নিয়ে কোথাও পার করে দেন তাহলে বেঁচে যাবে তুমি এ যাত্রা—"

"কোন সারেং—"

"আরে, যার ছেলেকে তুমি বাঁচিয়েছিলে—"

সারেং বলিল, 'নিশ্চয় তোমার জান বাঁচাব বইকি। তুমি আমার আলীকে বাঁচিয়েছ। আমার জাহাজ বিলেত যাবে। যেতে রাজী আছ তো? জাহাজের খোলের ভিতর লুকিয়ে থাকতে হবে কিন্তু।"

"আপনি যা করতে বলবেন, তাই করব। খোলের ভিতর কতদিন থাকতে হবে?"

"বেশিদিন হয়তো না-ও হতে পারে। কাপ্তেন সাহেবকে বলব, আমি একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি হয়তো আপত্তি করবেন না।"

কাপ্তেন সাহেব আপত্তি করিলেন না। শুধু তাহাই নয়, দিনকয়েক পরে আমি কাপ্তেন সাহেবেরই প্রিয় ভৃত্য হইয়া পড়িলাম। তিনি মদটা একটু অধিক মাত্রায় খাইতেন এবং মত্ত অবস্থায় আমাকে গালাগালি দিয়া সুখ পাইতেন। এটা বোধহয় তাঁহার চাটের কাজ করিত। দুই এক পেগ পেটে পড়িবামাত্র তিনি আমাকে সন্ অব্ এ বিচ বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং ধাপে ধাপে গালাগালি যে ভাষায় গিয়া শেষ পর্যন্ত পৌঁছিত তাহা লেখা যায় না। আমার কাজ ছিল সোডার বোতল খোলা, মদের বোতল খোলা, বরফ ভাঙা, গালাগালি শোনা এবং তিনি যখন বে-এক্তার হইয়া পড়িতেন, তখন তাহাকে লইয়া গিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দেওয়া। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে লাথিও মারিতেন। সবই আমি নির্বিকারভাবে সহ্য করিতাম। অভিনয় ভালই করিতেছিলাম। যে কোনও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে বেমালুম খাপ খাওয়াইয়া লইবার শিক্ষা বিপ্লবী জীবনেই লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু বিপ্লবী জীবনে বাহিরে যেভাবেই আত্মপ্রকাশ করি না কেন, ভিতরে ভিতরে স্বকার্যসাধনের লক্ষ্য ঠিক থাকিত। এক্ষেত্রে তাহা ছিল না। তাই মনে মনে একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছিলাম। নিজেদের দলের লোকেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদের ধরাইয়া দিয়াছে এই গ্লানিতে বিপ্লবীজীবনের সম্বন্ধেই আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। তখনও জানিতাম না যে, আমার ভাই সেই বিশ্বাসঘাতকটাকে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইয়াছে। জানিলে হয়তো আবার বিপ্লবী জীবনেই ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু তখন জানিতাম না। বিশাখার মৃত্যু মনকে নাড়া দিয়াছিল, বিশাখার মৃত্যুর জন্যই এই জাহাজে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছে, অদৃষ্ট যে কোন পথে আমাকে চালিত করিতেছে, ইহার পর কোথায় কি করিব, চিরকাল পলাতকের ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হইবে কি না, এই সব অনিশ্চিত ভাবনায় মনটা সর্বদাই অবসন্ন হইয়া থাকিত। এমন সময় হঠাৎ একটা পথের নির্দেশ মিলিয়া গেল। জীবনে হঠাৎই এইরূপ

পথের নির্দেশ মেলে। জীবনে যাহা হইয়াছিল তাহা আকস্মিক যোগাযোগের ফলেই হইয়াছিল। পুরুষকার না থাকিলে অবশ্য কিছুই হয় না। কিন্তু পুরুষকার প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় এইরূপ আকস্মিক যোগাযোগের ফলে। কোথা হইতে কে আসিয়া একটা বিশেষ পথে কেন যে লইয়া যায় তাহা কে বলিবে।

একদিন চোখে পড়িল, ডেকে বসিয়া একটি যুবক নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছে। চেহারাটা ভারতীয় তো বটেই, বাঙালী বলিয়া সন্দেহ হইল। আস্তে আস্তে পিছন দিকে গিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কি বই পড়িতেছে। দেখিয়া বিস্মিত এবং চমকিত হইলাম। বাংলা বই, কিন্তু ছাপা নয়, হাতে-লেখা। লেখাটাও আমার চেনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল, তাহার পর সহসা মনে পড়িল। এ যে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের হস্তাক্ষর। সুবিমলকে লেখা তাঁহার অনেক চিঠি যে আমি পড়িয়াছি। এ ভদ্রলোক কে? অগ্নীশ্বরের কোনও আত্মীয় না কি। তখন আর কিছু বলিলাম না। আস্তে আস্তে সরিয়া গেলাম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা ঔৎসুক্য জাগিয়া রহিল। ভদ্রলোকটির পরিচয় সংগ্রহ কবিতে হইবে। পরদিন ঝড়বৃষ্টি নামিল। ডেকে কেহই বাহির হইতে পারিল না। তাহার পরদিনও ভদ্রলোকটিকে পাইলাম না। তাহার পর চোখে পড়িল তিনি জাহাজের ডাক্তারবাবুটির ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছেন। একটু পরেই তাঁহার সহিত দেখা হইল। তিনি ডাক্তারবাবুর ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, আমি আগাইয়া গিয়া নমস্কার করিলাম এবং বাংলায় বলিলাম, "নমস্কার, গায়ে পড়ে আলাপ করছি বলে ক্ষমা করবেন। আপনি বাঙালী, তাই আলাপ করবার লোভ সামলাতে পারলুম না।"

"আপনিও বাঙালী?"

তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। আমার পোশাকে এবং চেহারায় বাঙালীত্ব কিছু ছিল না। মুখময় দাড়ি, গোঁফ কামানো, পরনে আধময়লা পাজামা, গায়ে লম্বা নীল কোট একটা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মুসলমান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"জাহাজে চাকরি করেন?"

"হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। হয়তো আত্মীয়তাও বেরিয়ে পড়তে পারে—"

"আমি হিন্দু। আপনি তো মুসলমান।"

হাসিয়া বলিলাম, "হিন্দুর সঙ্গেও মুসলমানের আত্মীয়তা হয় বই কি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি কেবল জাত বা রক্তের সম্পর্ক দিয়েই ঠিক হয়?"

আমার মুখে এ ধরনের কথা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয় নয়। মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্বের সম্পর্কটাই সব চেয়ে বড়। বেশ, আসবেন, নম্বর আঠারো আমার কেবিন। যখন সুবিধে হবে আসবেন। আমি ঘরেই থাকি প্রায়।"

সেইদিনই একটু পরে অবসর মতো তাঁহার কেবিনে গিয়া দেখা করিলাম। তিনি তখনও অগ্নীশ্বরের লেখাটা পড়িতেছিলেন।

"আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। কোথা বাড়ি আপনার—"

হাসিয়া বলিলাম, "রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া' আমার অবস্থা অনেকটা তাই। কোথায় যে আমার বাড়ি তা জানি না। সর্বত্র সেইটেই খুঁজছি।"

সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন তিনি।

"আপনি তো গুণী লোক দেখছি মশাই। আমার সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা আছে একথা তখন হঠাৎ মনে হল কেন—"

"আপনি যে বইটা পড়ছেন, তার হাতের লেখাটা আমার চেনা। সেদিন ডেকে বসে যখন পড়ছিলেন তখন চোখে পড়েছিল লেখাটা।"

"ও, কার লেখা বলে মনে হয়েছিল আপনার?"

"ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের।"

"ঠিক বলেছেন তো। তাঁরই লেখা। আপনার সঙ্গে এঁর আলাপ কি করে হয়েছিল—"

"ছাত্রজীবনে ওঁকে প্রথম দেখি আমি। তখনই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কোলকাতায় যখন কলেজে পড়তে গেলাম, তখন ওঁর আরও পরিচয় পেলাম। আমার এক সহপাঠী সুবিমল সাহিত্যচর্চা করত, এখনও করে বোধহয়, অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে তার লেখার সমালোচনা করতেন। সুবিমল আমাকে দেখাতো সে সব। তখনই তাঁর ধারালো মনের পরিচয় পেয়েছিলাম। খাপখোলা তলোয়ার যেন। যদিও তখন ওঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমার হয়নি, কিন্তু মনে হয়, পরে আমি যে পথে পা বাড়িয়েছিলাম তা ওঁরই প্রভাবে।"

আবেগের মুখে এই পর্যন্ত বলিয়া সহসা থামিয়া গেলাম। ভয় হইল, এ কি করিতেছি। অপরিচিত একটা লোকের কাছে এসব কথা বলা তো নিরাপদ নয়।

ভদ্রলোক বলিলেন, "আমিও অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের ছাত্র। এফ-আর-সি-এস পড়ব বলে বিলেত যাচ্ছি। সত্যিই তিনি অসাধারণ লোক, অসাধারণ ডাক্তার, অসাধারণ মানুষ। বাংলা দেশে ওরকম লোক বেমানান। ওঁর কদর করবার লোক নেই আমাদের দেশে। বিদেশে জন্মালে ইনি ভলটেয়ার কশো হতে পারতেন, এদেশে ওঁর নাম পর্যন্ত জানে না কেউ।"

"ওটা ওঁর কি লেখা পড়ছেন?"

"এটা একটা অদ্ভুত লেখা। লেখাটার নাম হচ্ছে 'আধুনিক পঞ্চকন্যা।' যখন কলেজে পড়তুম, ওঁর সঙ্গে প্রায়ই আমার তর্ক হত আমাদের ধর্ম পুরাণ নিয়ে। উনি আর্যসভ্যতার একজন গোঁড়া ভক্ত, গীতা রামায়ণ মহাভারতের অনুরাগী পাঠক এবং সমালোচক। আমি ওঁকে একটা চিঠিতে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম যে, আমাদের দেশে যে পঞ্চকন্যাকে রোজ সকালে স্মরণ করতে বলা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকটিই তো একাধিক পুরুষের সঙ্গে ঘর করেছেন। এঁদের স্মরণ করার মানে কি? তার উত্তরে উনি ছোটোখাটো একটা বই লিখে পাঠিয়েছেন। এটা পেয়েছি অনেকদিন আগে, কিন্তু ভালো করে পড়া হয়নি তখন। তাই সঙ্গে করে এনেছি ভালো করে পড়ব বলে। আপনি তো মুসলমান, পঞ্চকন্যার কথা জানেন না, নামই শোনেননি বোধহয়—"

হঠাৎ কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। ইচ্ছা হইল বলিয়া ফেলি—গীতা আমার কণ্ঠস্থ, রামায়ণ-মহাভারত গুলিয়া খাইয়াছি, পঞ্চকন্যা আমার নিকট্য দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মতো বিস্ময়জনক। শুধু পঞ্চকন্যাই নয়, মহাভারত-রামায়ণের অনেক চরিত্রই; কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া ফেলিলাম। ভয় হইল, ভাবিলাম, 'না, এখন ধরা ছোঁয়া দেওয়া ঠিক নয়'।

বলিলাম, "নাম শুনেছি বই কি। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী এদের কথা বলছেন তো? খুবই শুনেছি। গোঁড়া হিন্দুরা হয়তো ওদের অসতী বলবেন, কিন্তু মুসলমানরা বলবে না। শের আফগানের বিবি মেহেরুন্নিসার জগদ্বিখ্যাত নূরজাহান হতে আটকায়নি—লেখাটা আপনার পড়া হলে যদি দয়া করে দেন আমাকে, একটু পড়ে দেখব—"

"আপনার মনের চেহারার সঙ্গে বাইরের চেহারার তো মিল নেই দেখছি। এ জাহাজে আপনি কতদিন চাকরি করছেন?"

"বেশি দিন নয়। এ জাহাজ ছাড়বার সময়ই বহাল হয়েছি—"

"কি কাজ করতে হয়।"

"ক্যাপ্টেন সাহেবের ফাই-ফরমাস খাটতে হয়। ওরই চাকর হয়ে যাচ্ছি—"

"আপনি এ কাজ নিয়েছেন কেন বুঝতে পারছি না। আপনার কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় আপনি শিক্ষিত লোক। লেখাপড়া কতদূর করেছেন?"

"বি এস সি পাশ করেছি। দেশে কিছু জুটল না, তাই ভাগ্যঅন্বেষণ করতে বেরিয়ে পড়েছি। প্রথম এই চাকরিটাই জুটল, তাই করছি। তারপর দেখি অদৃষ্টে কি আছে—"

দুয়ারের কাছে কাহার যেন পদশব্দ পাওয়া গেল। পরমুহূর্তেই ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া দুয়ারে টোকা পড়িল।

"মে আই কাম্ ইন্ ডক্?"

"ও ইয়েস।"

যিনি প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে দেখিয়া আমার গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। ইনি সেই মিলিটারি ক্যাপ্টেন, যিনি আমাদের পিছনে তাড়া করিয়া আমাদের উপর গুলি চালাইয়া অবশেষে অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারই চোখে ধুলা দিয়া অগ্নীশ্বর আমাকে অপারেশন থিয়েটারে না লইয়া গিয়া মর্গে লইয়া যান এবং সেখান হইতে আমাকে ছাড়িয়া দেন। এ লোকটা এখানে আসিল কোথা হইতে। আমি ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করিয়া অবলম্বে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে আসিলাম বটে, কিন্তু চলিয়া গেলাম না। দরজার বাহিরে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বলা বাহুল্য, আলাপ ইংরেজিতেই হইতে লাগিল।

"ডাক্তার, আমার লিভারের ব্যথাটা আবার বেশ বেড়েছে। জাহাজের মেডিকেল অফিসার যে ওষুধটা দিয়েছে তাতে তো কিছু হচ্ছে না। তুমি কিছু বাতলাতে পার?"

"পারি। কিন্তু তাতো তুমি শুনবে না। মদটা ছাড়।"

"সে তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। কাল আধ বোতলের বেশি খাইনি তো—"

ডাক্তারবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

"কিছু বলছ না যে, কি পড়ছ তুমি ওটা। হাতের লেখা দেখছি। লাভ্ লেটার?"

"না—"

"পর্ণোগ্রাফি না কি! হাতে-লেখা কেন?"

"ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখার্জি আমার শিক্ষক ছিলেন, তিনিই লিখে পাঠিয়েছেন। খুব ভালো লেখেন।"

'ওয়েট্, ওয়েট্, অগ্নীশ্বর মুখার্জি? যিনি সিভিল সার্জন ছিলেন?"

"হ্যাঁ—"

"গ্রেট ম্যান ছিলেন তিনি। হি ওয়াজ এ নাট্"।

তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, 'আমাকে খুব বাঁচিয়েছিলেন একবার। একবার একাই শিকারে গেছি এক মফঃস্বলে। আমার সঙ্গে একটা ইণ্ডিয়ান বয় আমার জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে একটা গাছতলায় বসিয়ে আমি তিতিরের সন্ধানে ঢুকলাম গিয়ে একটা জঙ্গলে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও কিছু সুবিধে হল না। ছিল অনেক তিতির, একটাও মারতে পারলুম না। ফুর্‌র ফুর্‌র করে ঝোপঝাপে ঢুকে পড়ল সব। টেম্পার খারাপ হয়ে গেল খুব। তিন-চার মাইল হাঁটতে হয়েছিল বনে-বাদাড়ে, আবার হেঁটে হেঁটে ফিরলুম। খুব ক্ষিধেও পেয়েছিল। তবে আশা ছিল, আমার কিটের ভিতর কিছু বিস্কুট আর খানিকটা পোর্ট আছে, তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাবে। ফিরে গিয়ে কি দেখলুম জান? কিট্ ব্যাগ খোলা, বিস্কুটের টিন খালি। সেই ছোঁড়া সব বিস্কুটগুলি খেয়েছে। কিট্ ব্যাগটা ঘাঁটাঘাটি করতে পোর্টের বোতলের ছিপিটাও ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। পোর্টও দেখলাম পড়ে গেছে অনেকটা। লুক্ অ্যাট্ দি চীক্ অব দি বয়। জিজ্ঞেস করলাম, বললে, আমি কিছু জানি

না। আমার আর সহ্য হল না, বুটসুদ্ধ এক লাথি ঝেড়ে দিলাম তার মাথায়। হল কি জান? ডিমের মতো মাথাটা ফেটে গেল। এটা প্রত্যাশা করিনি। এক লাথিতে মরে যাবে এ কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু ছোঁড়া মরে গেল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি স্টোন ডেড্। কি করি, তখন এক ডুলি ভাড়া করে নিয়ে গেলাম তাকে হাসপাতালে। সেখানে তাকে ফেলে রেখে যেতে পারি না, দ্যাট্ উড্ হ্যাভ বিন্ ক্রিমিন্যাল। হাসপাতালে ছিল অগ্নীশ্বর দি গ্রেট। পুলিশে খবর দিতে হল অবশ্য। কিন্তু অগ্নীশ্বর এমন রিপোর্ট দিলে যে আমি বেঁচে গেলাম, হি ওয়াজ এ স্পোর্ট।"

একটু থামিয়ে সাহেব আবার বলিলেন, 'অবশ্য, আমারও পরে একটা সুযোগ এসেছিল, অগ্নীশ্বরের এ ঋণ আমি শোধ করে দিয়েছি। উই আর কুইট্স্।"

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছিল?"

"এখন আমি রিটায়ার করে ফিরছি, বলতে আর বাধা নেই। তবে কথাটা আর কাউকে বোলো না। আমি একবার একদল টেররিস্টকে তাড়া করেছিলাম। জেলে দুটো ওয়ার্ডারকে খুন করে পালাচ্ছিল তারা। গুলি খেয়ে পড়ে গেল কয়েকজন। তাদের ফার্স্ট এড দেবার জন্য নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। কাছেপিঠে ও ছাড়া আর হাসপাতাল ছিল না। সেখানে গিয়ে দেখি, সেখানকার ডাক্তার অগ্নীশ্বব। আগে আলাপ ছিল, খুব খাতির করে বসালে আমাদের নিজের কোয়ার্টাসে নিয়ে গিয়ে। বললে, যদি আপত্তি না থাকে ডিনারের ব্যবস্থা করতে পারি। তখন রাত আটটা হবে। ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। বললাম, কর। কিন্তু আগে চল, যাদের ধবে এনেছি, তাদের একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। অগ্নীশ্বর যখন ওদের পবীক্ষা করছিল তখনই সন্দেহ হল, ওদের মধ্যে একটা ছোকবা যেন ওর চেনা। ওর চোখমুখের ভাবভঙ্গী থেকে বুঝলাম সেটা। সে ছোকরার পেটের উপর দিযে একটা বুলেট চলে গিয়েছিল। অগ্নীশ্বর বললে, বোধহয় পেটে ঢুকেছে, পেট কাটতে হবে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি অপারেশন থিয়েটারে আমার সঙ্গে যাবে, না, ডিনার খাবে গিয়ে। আই টুক্‌দি হিন্ট্। বললাম, অল রাইট, তুমি অপারেশন কর গিয়ে, আমরা ডিনার খেতে যাচ্ছি। ফিরে এসে দেখলাম, সে ছোকরা পালিয়েছে, অগ্নীশ্বর একটা মড়ার পেট কেটে ঢাকা দিয়ে রেখেছে। সম্ভবত কোনও আন্‌ক্লেমড্ বডি ছিল মর্গে। আমি বুঝতে পারলুম সবই, বাট্ আই ওভারলুক্‌ড্। আর জান? এই জন্যে তার উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। হি ওয়াজ এ নাট্—"

আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ মনে হইল না। দূরে কাপ্তেন সাহেবের গলার আওয়াজ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি সেই দিকেই চলিয়া গেলাম।

পরদিন আবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, লণ্ডনে তাঁহার এক আত্মীয় স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং লইতেছেন। ইনি তাঁহারই বাসায় গিয়া উঠিবেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করবেন? ফিরে আসবেন না নিশ্চয়। আপনার পাসপোর্ট আছে তো?"

"না। আমি সারেং সায়েবের দয়ায় লুকিয়ে জাহাজে ঢুকেছি। আমাকে নাবতে দেবে না, বোধহয়।"

"ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আপনি কি নাবতে চান?"

"চাই। কিন্তু কি করে সম্ভব হবে জানি না।"

"যে সারেং আপনাকে এনেছে, তিনিই কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন হয়তো। বলেছেন তাঁকে কিছু?"

"না, এখনও বলিনি।"

"বলে দেখুন। আমার কাছে কাল আসবেন একবার। আপনার ফোটো তুলে নেব একখানা।"

ভয় পাইয়া গেলাম।

"ফোটো? কেন?"

"এমনি নেব। আপনাকে ভালো লেগেছে আমার। একজন বি. এসসি পাশ ছেলে যে দরকার হলে চাকরের কাজও করতে পারে এটা—"

প্রশংসা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অগ্নীশ্বরবাবুর লেখাটা কি আপনার পড়া হয়েছে?"

"একটু বাকি আছে।"

"পড়া হলে আমাকে দেবেন দয়া করে।"

"দেব।"

পরদিন আবার একফাঁকে তাহার কেবিনে গেলাম। তিনি অগ্নীশ্বরের লেখা খাতাটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "নিন্। পড়া হয়ে গেলে ফেরত দেবেন। হারায় না যেন।"

"আমার ইচ্ছে আমি এটা টুকে নি। এতে আপনার আপত্তি নেই আশা করি।"

"টুকে নিতে পারেন, আপত্তি নেই, কিন্তু আগেই অত কষ্ট করতে যাবেন কেন। পড়েই ফেলুন না আগে। ভালো লাগলে টুকবেন।"

"আচ্ছা।"

"আসুন, এবার আপনার একটা স্ন্যাপ তুলে নি। অদ্ভুত জিনিসের ফোটো সংগ্রহ করার বাতিক আছে আমার।"

"আমার মধ্যে কি এমন অদ্ভুত দেখলেন।"

"অদ্ভুত বই কি। বাঙালীর ছেলে হয়ে বি. এসসি. পাশ করে আপনি এই চাকরি করছেন, এরকম আমি অন্তত দেখিনি।"

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "আপনি হিন্দু হলে বোধহয় পারতেন না, মুসলমান বলেই পেরেছেন। হিন্দু বাঙালীর ছেলেরা বড় বিলাসী।"

"হিন্দু বাঙালী ছেলেদের সম্বন্ধে আপনার এ হীন ধারণা কেন?"

ক্যামেরাটা ঠিক করিতে করিতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা হয়েছে। হিন্দু বাঙালীর ছেলেরা পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেবানি হবার জন্যে আপিসের দরজায় মাথা কুটে বেড়াবে, রকে বসে আড্ডা মারবে, সিনেমায় ভীড় করবে, রাজনীতি নিয়ে হুজুক করবে, কিন্তু গতর খাটিয়ে পরিশ্রম করে কিছু করবে না। ওদের স্বাধীন ব্যবসার দৌড় মণিহারী দোকান পর্যন্ত, সেখানে সকাল-সন্ধে একদল ছোঁড়া জুটিয়ে বেশ আড্ডা মারা যায়, ওদের স্বাধীন পেশার দৌড় বার-লাইব্রেরী পর্যন্ত, যেখানে পয়সা না থাক রাজা-উজির মারবার সুযোগ আছে, এম এসসি. পাশ করেও উকিল হচ্ছে দলে দলে। আপনার মতো বেঠিক পথের পথিক হওয়া হিন্দু বাঙালীর ছেলের পক্ষে শক্ত। তাই আমার মনে হয়, বাংলা দেশে কার্নেগী, ফোর্ড যদি কোনও কালে জন্মায় তা জন্মাবে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে। ওরাই দুঃসাহসী, বেপরোয়া, ওরাই মরীয়া হয়ে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, ওদের মধ্যে আরব বেদুঈনদের রক্ত আছে। আপনাকে দেখে তাই খুব ভালো লাগলো—"

আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। বলিয়া ফেলিলাম, "আমি মুসলমান নই, আমি হিন্দু বাঙালী।"

"বলেন কি, তাহলে মুসলমান বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন কেন?"

"কারণ আছে—"

"কারণটা কি?"

"আমার জীবন-মরণ সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত। আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন একথা গোপন রাখবেন, তাহলে সব খুলে বলতে আমার আপত্তি নেই। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রাখেননি, এ রকম লোক অবশ্য আমি দেখেছি। আপনার প্রতিশ্রুতি পেলেও আমি হয়তো নির্ভয় হতে পারব

না। কিন্তু আপনার মতো লোকের চক্ষে হিন্দু বাঙালীর ছেলে এতো হীন হয়ে আছে, এ আমি সহ্য করতে পারলাম না। তাই হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছি। যে হিন্দু-বাঙালীর ঘরে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, যতীন দাস, বিনয়, সুভাষ জন্মেছে, যাদের কীর্তি অমাবস্যার আকাশে নগণ্য নক্ষত্রের মতো ঝলমল করছে, তাদের আপনি ছোট বলবেন? বাঙালীর ছেলে রিক্‌শা-ওলা, মুটে-মজুর হতে পারছে না বলে আপনারা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করছি, সোনা দিয়ে কখনও কোদাল হয়? ভালো ইস্পাত তাও কি হয়? যারা আজ ভারতে কুলি, রিক্‌শা-ওলা, মুটে-মজুর হয়েছে, তারা শ্রমের মহিমা-মর্যাদায় মুগ্ধ হয়ে তা হয়েছে? তারা হয়েছে, তাদের অন্য কিছু হবার যোগ্যতা নেই বলে, তারা প্রচ্ছন্ন কার্নেগী বা ফোর্ড বলে নয়। এটা সত্যি কথা, হিন্দু বাঙালীর ছেলেদের শারীরিক পরিশ্রমে রুচি নেই, তার কারণ তারা অন্য ধাতুতে গড়া। পেটের জন্যে তারা শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারে না। করতে উৎসাহ পায় না। কিন্তু আদর্শের জন্যে পারে। স্বদেশীর সময় ওই হিন্দু বাঙালীর ছেলেরাই জেলে যে শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছে তার তুলনা আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর নেই। তাদের জেলে নিয়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতে হাতকড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, উঠ-বোস্‌ করিয়েছে, দাঁড় করিয়ে পা দুটো টেনে যতদূর সম্ভব ফাঁক করা যায় তার চেয়েও বেশি করেছে, হান্টার মেরে ক্ষতবিক্ষত করেছে, ক্ষিধের সময় খেতে দেয়নি, তেষ্টার সময় জল দেয়নি, অসুখ হলে ওষুধ দেয়নি। গোঁফ ভুরু চুল টেনে টেনে উপড়ে ফেলেছে, তবু ওই হিন্দু-বাঙালীর ছেলেদের দমাতে পারেনি। শারীরিক কষ্টকে তুচ্ছ করেছিল তারা আদর্শের জন্যে। তারা আজ বাসন মাজা, চাকর, মুটে, রিক্‌শাওলা আর ফ্যাকটারির কুলি হচ্ছে না বলে তাদের আপনি অবজ্ঞা করবেন? এ আমি সহ্য করব না—"

"বড্ড উত্তেজিত হয়েছেন। বসুন। দাঁড়ান, আমি কপাটটার খিল লাগিয়ে দি—"

সত্যিই আমি উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ডাক্তারবাবু কপাটটা ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি যে হিন্দু বাঙালীদেব কথা বললেন, তাঁরা নমস্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা তো নিঃশেষ হয়ে গেছেন। হিন্দু-বাঙালীর ঘরে ওরকম ছেলে আর আছে কি এখন?"

"নিশ্চয়ই আছে। বাঘের বংশে বাঘই জন্মায়। কিন্তু আপনারা ব্যাঘ্রবংশধরদের নতুন বুলির কারাগারে বন্দী করে, অনাহারে জরাজীর্ণ করে শেষে বলছেন, তোমরা লাঙল টানো, ঘানি টানো, গাড়ি টানো। তা তারা পারবে কেন? তারা গরু হতে পারেনি বলে আপনারা তাদের গালাগালি দেবেন এ আমি সহ্য করতে পারব না। তবে এই খানেই একটা কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই। হিন্দু-বাঙালীদের সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে বলেই তাদের কথা বললাম। এর থেকে এটা যেন মনে করবেন না যে, অহিন্দু বা অবাঙালীদের প্রতি আমার ঘৃণা আছে। তাঁদের কাছেও অনেক ঋণে ঋণী হয়ে আছি আমরা। সে ঋণ সারা জীবন অকুণ্ঠিত-কণ্ঠে স্বীকার করব। মুসলমান হাজি সাহেব, মুসলমান সারেং আমাকে যদি না সাহায্য করতেন, আমি কোথায় থাকতাম আজ। তাঁদের অনেকের কাছে এত ভালোবাসা পেয়েছি, যা নিজের লোকের কাছেও পাইনি। হিন্দু-বাঙালীর ছেলের এ-ও একটা বৈশিষ্ট্য, তারা সবাইকে আপন করে নিতে পারে—"

"বসুন, বসুন, ভালো করে বসুন। সব কথা শুনি আপনার। ভয় নেই, আমার কাছ থেকে কোনও কথা বেরুবে না।"

হাসিয়া বলিলাম, "ভয় আমার নেই। বেগতিক দেখি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়।"

তাঁহাকে আমার জীবন-কাহিনী শুনাইতে লাগিলাম।

কাহিনী শেষ হইলে উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর ডাক্তারবাবু বলিলেন, "অদ্ভুত! আপনার কথাবার্তা শুনে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এতটা কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু একটা খটকা আমার এখনও আছে। বঙ্গব?"

"বলুন।"

"আপনি বলছেন, বাঙালী বিদ্রোহীর জাত। বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবার সুযোগ পেলেই তার প্রতিভার মশাল দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত করে জ্বলতে থাকে। এ সুযোগ না থাকলে স্তিমিত হয়ে পড়ে সে। কিন্তু এরকম অগ্নিকাণ্ড করে করে একটা জাত কতদিন বেঁচে থাকতে পারে?"

"পারে বইকি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই তো একটা জাত বেঁচে রয়েছে, যারা চির-বিদ্রোহী। এরা বৈদিক সভ্যতা, বুদ্ধ সংস্কৃতি, গ্রীক আক্রমণ, মুসলমান আক্রমণ, তৈমুর, নাদিরশাহ সব হজম করে বসে আছে। ইংরেজের কাছেও মাথা নোয়ায় নি। আমান-উল্লা এদের আত্মার আধুনিক নমুনা। এখনও তারা অপমানের জবার দেয় রাইফেলের গুলি চালিয়ে, আবেদন-নিবেদন করে নয়। ওরা মুসলমান, কিন্তু ওরা বাঙালীর স্বগোত্র, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ওদের কাছেই গিয়েছিলেন সেইজন্য —"

"কিন্তু এরকম করে কি একটা জাত বাঁচবে?"।

"হয়তো বাঁচবে না। রানা প্রতাপ সিং বাঁচেনি, শিবাজী বাঁচেনি, লক্ষ্মীবাঈ বাঁচেনি, আমি যে সব বাঙালীকে বাঙালী জাতির গৌরব বলে মনে করি, তারাও বাঁচবে না। কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে যে দাগটা তারা রেখে যাবে, সেটা সোনার দাগ।"

"কিন্তু কেউ যদি না বাঁচে, তাহলে শুধু সোনার দাগ নিয়ে কি হবে—"

"আপনার ভয় নেই, ওই বাঙালীরই মধ্যে এমন একদল লোক আছে, যারা চাকরি করে, সেলাম করে, খোশামোদ করে, অপরের মন জুগিয়ে ঠিক বেঁচে থাকবে আর শুয়োরের পালের মতো বংশ বৃদ্ধি করে যাবে। এদের কথাই কবিগুরু একটা কবিতাতে বলে গেছেন, 'ভদ্র মোরা শান্ত বড় পোষমানা এ প্রাণ, বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান। দেখা হলেই মিষ্টি অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি, অলস দেহ ক্লিষ্টগতি, গৃহের প্রতি টান!' এদের কেউ মারতে পারবে না। এরা পোকামাকড়ের মতো অমর! এদের মারবার মতো ডি. ডি. টি. বেরোয়নি এখনও।"

"কিন্তু এদের নিয়েই তো জাত। এদের কথা ভাবতে হবে বই কি।"

"এরা জৈবিক নিয়মে চলে। প্রকৃতিই এদের জন্যে ভাবছেন। আমাদের ভাবনা প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তানদের জন্যে, যারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে না।"

ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাই আপনার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের উপর এত ভক্তি। এ লেখাটা পড়ে সুখ পাবেন। এটা আপনার যদি খুব ভালো লাগে, আপনার কাছে রেখে দিতেও পারেন। আমি হয়তো কোথাও হারিয়ে ফেলব।"

"উনি কোথায় আছেন এখন—"

"কোথাও সিভিল সার্জন হয়ে আছেন। কিছুদিন আগে চব্বিশ পরগণায় ছিলেন, এখন কোথায় আছেন, ঠিক জানি না।"

"আমি এবার উঠি তাহলে আজ।"

"আচ্ছা, আপনি বিলেতে গিয়ে যদি পৌঁছতে পারেন, কি করবেন তা কি ঠিক করেছেন কিছু?"

"কিছু ঠিক করিনি। কিন্তু কাল রাত্রে একটা কথা মনে হচ্ছিল। যদি ওখানে সুযোগ পাই, পুলিশের লাইনে ট্রেনিং নেব।"

"পুলিশের লাইনে?"

"হ্যাঁ। পুলিশ হয়ে এদেশেই ফিরে এসে পুলিশের চাকরি করব। যে পুলিশ আমাদের এত লাঞ্ছনা করেছে, তাদেরই একজন হব।"

"উদ্দেশ্য কি?"

"বিপ্লবী এদেশে চিরকালই থাকবে। যতটা পারি তাদের বাঁচাব। এই আশা। অবশ্য দুরাশাই এটা।"

"আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের সুপারিশে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং নিচ্ছেন। তিনি ভারতবর্ষে পুলিশেরই চাকরি করেন, বড় অফিসার, উপরওলার নেক নজরে পড়ে বিলেতে যেতে পেরেছেন। আমি তো তাঁর বাসাতেই উঠব। আপনার কথাটা মনে রাখব। যদি অবশ্য বিলেতে নেবে আপনার নাগাল পাই।"

"নাগাল নিশ্চয়ই পাবেন। আমার নিজের গরজেই আমি আপনার পিছু নেব। কিন্তু আপনার যে দাদা ভারতবর্ষে পুলিশের চাকরি করে গভর্নমেন্টের পেয়ারের লোক হয়েছেন, তিনি তো আমাকে হাতে পেলে সন্দেশের মতো মুখে ফেলে দেবেন টপ্ করে। হয়তো আমার ফোটো তাঁর অ্যালবামে আছে।"

"যদি থাকেও, কিছু এসে যাবে না। আপনার চেহারা তখন অন্যরকম ছিল নিশ্চয়। অতি বিচক্ষণ ডিকেকটিভও এখন আপনাকে দেখে হিন্দুর ছেলে বলে সন্দেহ করবে না।"

আমি উঠিতেছিলাম, এমন সময় ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি চাকরবাবুর্চির কাজ করেছেন। রান্নাবান্না কিছু শিখেছেন কি?"

"খুব। হিন্দুদের শুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা এসব তো জানাই ছিল, হাজী সাহেবের বাড়িতে মুসলমানী রান্নাও শিখেছি কিছু কিছু। শিককাবাব, সামিকাবার, মুর্গ মুসল্লম, বিরিয়ানি--"

"তাহলে একটা রাস্তা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।"

"কি রকম?"

"পরে বলব।"

পাঁচ

ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক পঞ্চকন্যা' সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি।

কল্যাণবরেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হল। কারণ তোমার অজ্ঞতার পাহাড় ওড়াতে হলে যে ডিনামাইটের দরকার তা হাতের কাছে ছিল না। জোগাড় করতে দেরি হয়ে গেল। তুমি পঞ্চকন্যাব মহিমা বুঝতে পারনি, তার কারণ যদিও তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, এম-বি পাশ করেছ, সাহেবী পোশাক পরে বেড়াও, হয়তো লুকিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খাও, পরের পয়সায় পেলে ভালো মদেও অরুচি নেই, কিন্তু আসলে তুমি একটি পদিপিসি। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে এই পদিপিসিরা যে কাণ্ড করেছে তার একমাত্র তুলনা মেলে বোধহয় বর্বরসমাজের ডাইনী আর উইচ্ ডক্টরদের কার্যকলাপে। সভ্যসমাজ এদের পুড়িয়ে মেরেছে, সেই খাণ্ডব দাহনে জোয়ান অব আর্কের মতো দু-চারটে ভালো লোক পুড়ে মরেছে হয়তো, কিন্তু এতে ওদের সমাজ থেকে বন্যবর্বর আগাছাগুলো দূর হয়েছে। ওদের বাড়ির উঠোন এখন তক্তকে ঝক্‌ঝকে, ওদের সবুজ লন আর ফুলেব বাগান দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে ওই পদিপিসির দল এখনও সশবীরে প্রবল প্রতাপে বর্তমান। এই পদিপিসিবা অসামান্য লোক, অসামান্য তাদের শক্তি। এর প্রমাণ আর্যসংস্কৃতির বিরাট মহা-মাতঙ্গকে এবা হিন্দুধর্মের ঘোরো শুয়োরে পরিণত করেছে। আর্যসভ্যতার আকাশচুম্বী হর্ম্যের গা বেয়ে উঠেছে উইয়ের মতো। ধসিয়ে দিয়েছে সে হর্ম্যকে। সেই ধ্বংস স্তূপের উপব গজিয়েছে ঘেঁটু, ফণীমনসা, বুনো ওল আর কুটকুটে কচুর

বন। আব সেই বনেব আড়ালে বাস কবছে, সেসব শামুক-ব্যাং, টিকটিকি-গিবগিটি, ইঁদুব-ছুঁচো, সাপ-তক্ষকেব দল তাবাই টিকি-তিলক গেকযা-গুরুব ভড়ং কবে আলো কবছে তোমাদেব বক্ষণশীল সনাতন হিন্দুধর্মেব চণ্ডীমণ্ডপগুলো। আগে এই চণ্ডীমণ্ডপগুলো গ্রামে গ্রামে থাকত। এখন তাবা শহবেও এসেছে। ইউনিভার্সিটিতে, সাহিত্য সভায, বাজনীতিব আসবে, খববেব কাগজেব পাতায পাতায এদেব খুব দবদবা আজকাল। তোমবা এদেব বক্তৃতা শুনে গদ্‌গদ। উচ্ছ্বাসেব আবেগে এবং তর্ক কববাব মুখে তোমবা মাঝে মাঝে নিজেদেব আর্যবংশধব বলে জাহিব কব, কিন্তু আর্যবা, মানে বৈদিক যুগেব আর্যবা, কি ছিল আব তোমবা কি হযেছ, তা তুলনা কবে দেখেছ কখনও? তাবা গরু, শুযোব, কচ্ছপ কিছু বাদ দিত না। তোমবা লাউ খাবে তা-ও পাঁজি দেখে, অলাবু ভক্ষণ নিষেধ আছে কিনা বিচাব কবে। তাদেব আকাঙ্ক্ষা ছিল শত শবৎ বাঁচব, বীবেব মতো বাঁচব, বেগবতী প্রস্তবাকীর্ণ নদী সামনে পড়লে সাঁতবে পাব হব, পৃথিবীকে ভোগ কবব, মৃত্যু এলে তাকে বীবেব মতো ববণ কবব। কিন্তু তোমবা দিন বাত কাঁদুনি গাইছ 'লোহাবি বাঁধনে বেঁধেছে সংসাব, দাসখৎ লিখে নিযেছে হায,' তোমবা গাইছ—'এ সংসাব-কাবাগাবে আব কতদিন আমাবে এমন কবে বেঁধে বাখবি মা তাবা,' কিন্তু মা-তাবা যেই সদয হযে মুক্তিব ব্যবস্থা কবলেন অমনি বাবাবে মাবে বলে মুক্তকচ্ছ হযে দে দৌড়। সিন্নি মেনে, মাদুলি বেঁধে, ঠাকুবেব দোব ধবে, শান্তি-স্বস্ত্যযন কবিযে বাঁচবাব জন্যে হাস্যকব সে কী করুণ প্রযাস। তোমবা ভালো কবে বাঁচতেও জান না, মবতেও জান না। তোমবা পেট ভবে খেযেছ কখনও? প্রাণভবে কোনও মেযেব সঙ্গে প্রেম কবেছ? প্রাণভবে ভালোবাসতে পেবেছ কাউকে? প্রাণভবে ঘৃণা কবতে পেবেছ? কিছুই পাবনি। অপবে যখন ভোগ কবে তখন তোমবা আড়নযনে চেযে দেখ আব আড়ালে মুখ ঢোকাও। আব মুখে বল, 'হবি হে সবই মাযা'। নাবী তো তোমাদেব কাছে নবকেব দ্বাব। অনেক কষ্টে, অনেক খতিযে, অনেক অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা কবে, সপ্তমে বা অষ্টমে মঙ্গল বা শনি আছে কিনা দেখে, পণ নিযে মেযেব বাবাকে সর্বস্বান্ত কবে, তোমবা হাড় ডিগ্‌ডিগে একটি বালিকাব পাণি পীড়ন কব আব সেই নবকেব দ্বাবটিব চৌকাটে বসে সাবা জীবন হন্যে হ্যাংলাব মতো বংশবৃদ্ধি কবে যাও, আব ক্রমাগত খববদাবি কবতে থাক ওই নবকেব দ্বাবে এসে আব কেউ উঁকি দিচ্ছে না তো। উঁকি দিলেই সর্বনাশ। তাকে ঝেঁটিযে বাড়ি থেকে যতক্ষণ না বিদায কবতে পাবছ ততক্ষণ তোমাদেব শান্তি নেই। তোমাদেব সমাজেব গোলক চাটুজ্যেবা তা না হলে তোমাদেব একঘবে কববে, তোমাদেব উর্ধ্বতন অধস্তন চোদ্দ পুরুষবা স্বর্গেব পথে যেতে যেতে হঠাৎ হোঁচট খাবে। তোমবা কি বলে নিজেদেব আর্যবংশধব বল তা তো বুঝি না, তাদেব সঙ্গে কোনখানটায মিল তোমাদেব? স্ত্রী দ্বিচাবিণী হলে তাদেব ব্যবস্থা ছিল—তাকে উপদেশ দিও, বোঝাবাব চেষ্টা কোবো, তিবস্কাব কোবো, দবকাব হলে প্রহাবও কোবো। তাতেও যদি কোন ফল না হয তাহলে তাকে বর্জন কোবো, কিন্তু অন্নবস্ত্রেব ব্যবস্থা কবতে ভুলো না। তাকে গলাধাক্কা দিযে একেবাবে বেশ্যা-পল্লীতে পাঠিযে দেবাব নিযম তাঁদেব সমাজে ছিল না। সতীত্ব জিনিসটা তাঁবা যে অপছন্দ কবতেন তা নয, কিন্তু ও নিযে তোমাদেব মতো ছুঁই-ছুঁই গেল-গেল ভাব ছিল না। এ বিষযে অত্যন্ত ব্যাশনাল ছিলেন তাঁবা। ক্ষেত্রজ পুত্রে আপত্তি ছিল না তাঁদেব। এমন কি দবকাব হলে বিধবার গর্ভেও তাঁবা পবপুরুষকে দিযে পুত্র উৎপাদন কবিযে নিতেন, তাতে যে বিধবাব ব্রহ্মচর্য নষ্ট হতে পাবে একথা তাঁবা

মানতেন না। তোমরা এঁটো পাতে বসে মাছি তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভাত খাও, অপরের ব্যবহার করা পায়খানা বা গামছা-তোয়ালে ব্যবহার করতে তোমাদের আপত্তি নেই, সিফিলিস-গণোরিয়া গ্রস্ত বেশ্যাদের সহবাসেও তোমরা আনন্দ পাও, কিন্তু স্ত্রীর যদি একবার পা ফস্‌কেছে অমনি সর্বনাশ। অমনি তোমাদের চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যায়, কুলে কালী পড়ে, পূর্ব-পুরুষরা নরকস্থ হন।

তোমাদের আর্যত্ব কোথায়? তাদের নকলে তোমাদের বিয়ে-পৈতেটা হয় বলছ? কিন্তু কী হাস্যকর কাণ্ডটা হয় তা ভেবে দেখেছ কখনও। আর্যদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম জীবনের প্রথম আশ্রম, যে সময়ে ছাত্ররা গুরুগৃহে বাস করে নিজেদের চরিত্র গঠন করত। তোমরা সেটা সেরে দাও ন্যাড়ামাথা ছেলেটাকে একটা গুদোম ঘরে তিনদিন বন্ধ করে রেখে। তিনদিন সে শূদ্রের মুখ দেখবে না। তারপর বছরখানেক খেতে বসে বোবার অভিনয় করবে। গায়ত্রীর মানে সে বুঝবে না, কেবল আউড়ে যাবে। এই হল তোমাদের উপনয়ন। পৈতেতে পরে চাবি বাঁধা থাকবে। আর বিয়ের সময় তোমাদের স্ত্রী-আচারটা বড়, না বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর ভোজটা বড়, না একটা মূর্খ পুরুতের সামনে বসে নামতা-ঘোষার মতো কতকগুলো অশুদ্ধ উচ্চারণের মন্ত্র আওড়ানোটা বড় তা আজও বুঝিনি। দিনের বেলা কতকগুলো ভিজে-কাঠ জ্বেলে চতুর্দিকে একটা ধূম্রলোক সৃষ্টি করে তোমাদের কুশণ্ডিকা হয়। পুরোহিত যখন বলেন, ওই দেখ সপ্তর্ষি উঠেছে, ওই দেখ বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতী, তখন তোমরা দেখ রঙীন কাপড়-পরা কতকগলো মেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে কিম্বা যদি ঘাড় তুলে আকাশের দিকে চাইতে যাও, দেখতে পাও ঘরের কোণে অরুন্ধতী নয়, একটি মাকড়শা জাল পেতে বসে আছে। তোমবা বিয়ের সময় শুধু যে পণ নাও তা নয়, প্রজাপতি আর ব্রহ্মার ছাপ-দেওয়া কতকগুলো নিমন্ত্রণপত্রও ছাপ আর চেনা অল্পচেনা অচেনা সবার নামে সেগুলো পাঠাও বুকপোষ্ট করে—উদ্দেশ্য যদি কিছু লৌকিকতা পাওয়া যায়। অনেকে যদিও নীচে ছেপে দেন, 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়', কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ যদি সে প্রার্থনার মর্যাদা রেখে লৌকিকতা না পাঠিয়ে আশীর্বাদ জানায়, তাহলেই মনোমালিন্য হয়ে যায় তার সঙ্গে। এই তোমাদের বিয়ে। এর সঙ্গে আর্য-বিবাহের কোন মিল নেই।

আর্যদের সঙ্গে কোনখানটায় তোমাদের মিল নেই। হয়তো আর্য-সভ্যতা একদিন বাংলাদেশের আদিবাসী পক্ষীজাতি বা বগধজাতিকে জয় করে তাদের আর্যত্বের ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেছিল, কিছুলোক হয়তো আর্য-ধর্ম আর্য-সভ্যতা বরণও করেছিল। এটাও একটা লক্ষ্য করবার মতো জিনিস, বাইরে থেকে নতুন কিছু একটা এলেই তাকে বরণ করে নেবার জন্যে একদল লোক বাংলাবেশে সর্বদা উদ্বাহু হয়ে থাকে। ওরা আর্য হয়েছে, বৌদ্ধ হয়েছে, মুসলমান হয়েছে, বৈষ্ণব হয়েছে, ক্রিশ্চান হয়েছে, ব্রাহ্ম হয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে বাঙালী সেই বাঙালীই থেকে গেছে। ওদের মধ্যে আদ্যিকেলে সেই পদিপিসি আছে যে! সে তার জারক রসে সব্বাইকে মোরব্বা বানিয়ে ফেলেছে। ওই পদিপিসির সাংঘাতিক শক্তি। শঙ্করাচার্যের মতো বৈদান্তিকও ওর পাল্লায় পড়ে "প্রভুমীশ মনীষ" আউড়েছে, ছন্দের জলতরঙ্গ বাজিয়ে গঙ্গার মহিমা-কীর্তন করেছে। ক্রীশ্চান অ্যানটনি কবিয়াল হয়েছে, মুসলমান রাধাকৃষ্ণের গান গেয়েছে, বৈষ্ণবের ধর্ম নেড়া-নেড়ীর ধর্ম হয়েছে, নিরাকারবাদী ব্রাহ্মদের বাড়ির অনেক মেয়েরা দুর্গাপূজার মণ্ডপে ভীড় করেছে শাড়ী-গয়না-খোঁপার বাহার দেখিয়ে, ঠাকুরকে প্রণাম করেছে, মানত করেছে, সিন্নি মেনেছে।

তবে এইখানেই তোমার একটা ভুল ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। আমার এই লম্বা বক্তৃতা শুনে তুমি যেন ভেব না যে, আমি খুব একটা আর্যভক্ত। মোটেই তা নয়, আমি বাঙালী and I am proud of it. তোমার চিঠিতে 'আর্য' শব্দটা অনেকবার ছিল বলে এই বক্তৃতাটা দিলুম। আর্যদের চেয়ে আমাদের নিকটতর সম্পর্ক নিগ্রেট, অস্ট্রিক, আর দ্রাবিড়দের সঙ্গে। আমি আর্যদের মহিমা প্রত্যক্ষ

করেছি বই পড়ে, মুগ্ধ হয়েছি তাদের বলিষ্ঠ চরিত্রে, তাদের মানবতার প্রবল প্রকাশে। তারা দেবতা নয়, তারা ভোগী বীর। তারা তাদের দেবতাদেরও নিজেদের ছাঁচে ফেলে তৈরি করেছিল। তাদের দেবতা 'অব্রণং অস্নাবিরং' ব্রহ্ম নয়, তাদের দেবতা তাদেরই মতো শক্তিমান, তাদেরই মতো খোশামোদে তুষ্ট, অপমানে রুষ্ট, তাদেরই মতো কামুক এবং ভোগী। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম এদের কাহিনী কেচ্ছার মতো মনে হয় ভদ্রসমাজে। কিন্তু এদের বলিষ্ঠতায় আমি মুগ্ধ। গ্রীকদের সঙ্গে অনেক মিল আছে এদের। গ্রীক সভ্যতাও মুগ্ধ করেছে আমাকে। ইজিপ্টের অনেক জিনিসও খুব ভালো লেগেছে। চীনেদেরও। কিন্তু আমার যা ভালো লাগে তা আমি হতে পারি না, অনেক সময় হতে চাই-ও না। যুগপৎ আর্য, গ্রীক, মিশরী এবং চীনে হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনান ডয়েলের শার্লক হোম্‌সকেও খুব ভালো লেগেছে বলে কি শার্লক হোম্‌স হতে পারি? পারি না, হতে চাইও না। আমি অতি বিশুদ্ধ জিনিস খুব পছন্দ করি না। তোমাদের মরাল কোডের অতি-বিশুদ্ধতা থেকে শত-হস্ত দূরে থাকতে চাই। একটা গল্প মনে পড়ল।

বিহারে যখন ছিলুম তখন এক ভোজপুরী ভদ্রলোকের ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম। জমিদার লোক তিনি। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে করজোড়ে প্রত্যুদ্গমন করে আমাকে এনে বসালেন। ভদ্রলোকের শুধু গা, গলায় হলদে রঙের পৈতে, পায়ে খড়ম, কপালের মাঝখানে, দুই বাহুর উপর, চন্দনের ডোরা-কাটা। আমি যতক্ষণ না বসলুম ততক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এরকম নির্ভেজাল ভদ্রতা ভালো লাগা উচিত, কিন্তু আমার কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। এর চেয়ে আমাদের বাঙালী ভদ্রতা অনেক নীচু স্তরের। বাড়ির মালিক হয়তো মুচকি হেসে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন, বড়জোর বললেন, 'আসুন'। কিম্বা কেউ যদি উচ্ছ্বসিত হন, বলবেন—'আরে আরে আসুন। আজকের কাগজটা দেখেছেন। চা বাগানে কি কাণ্ড!' এই ভালো লাগে কিন্তু। তারপর তাঁরা যখন খেতে দিলেন আমাকে, তখন তো আমার চক্ষুস্থির। ব্রাউন রঙের মোটা মোটা লুচি, তার সঙ্গে দাগড়া-দাগড়া করে কাটা কুমড়োর তরকারি, কাঁচকলার তরকারি, উচ্ছের তরকারি। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা, এক তরকারির সঙ্গে আর এক তরকারি মেশায় না ওরা। তারপর দু'তিন রকমের আচার। তারপর ছালি-সমেত ধোঁয়াগন্ধ একনাদা দই, তার উপর লালচে রঙের দেশী চিনি। একটু পরে টেনিস বলের সাইজের হলদে রঙের লাড্ডুও এল আধ ডজন। এরা যেন আমার দিকে চেয়ে নীরবে চ্যালেঞ্জ করতে লাগল—চলে আয়, দেখি তোর মুরদ। খাওয়া ব্যাপারে আমার মুরদ চিরকালই কম। আমি টুকিটাকি খেয়ে থাকতেই ভালোবাসি। নিমন্ত্রণ বাড়িতে প্রায় বাঁ দিকটা খাই না, ডানদিকের তরকারিগুলো খাই। ভোজপুরী ভদ্রলোকের ভয়ানক আয়োজন দেখে 'থ' হয়ে বসে রইলুম। ভদ্রলোকর ভাইপো কলকাতার কলেজে পড়েন, বাংলাও বলেন। তিনি আমাকে বললেন, "আপনি খাচ্ছেন না কেন ডাক্তারবাবু। সবই ঘরের জিনিস, একেবারে বিশুদ্ধ। আমাদের জমিতে যে গম হয় তাই ঘরে জাঁতায় পিষিয়ে আমরা আটা করি, তরিতরকারি সবজি সব আমাদের বাগানের, ঘি দুধ দই সব ঘরের, পঁচিশটি মোষ আছে আমাদের, লাড্ডুও ঘরে বানিয়েছি আমরা। খেয়ে দেখুন।"

করুণকণ্ঠে বললুম "আমি পারব না।"

"পারবেন না কেন?"—সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেল ছোকরা। তখন তাকে খুলে বলতে হল। বললাম, "আমি যে বাঙালী। বিশুদ্ধ জিনিস বরদাস্ত করতে পারি না। ভেজাল ঘিয়ে-ভাজা ভেজাল কলের ময়দার ধবধবে শাদা ফুরফুরে লুচি আমাদের পছন্দ, কলকাতার দোকানে দোকানে মাটির ভাঁড়ে করে যে দই বিক্রী হয় তাতে আসল মাল কিছু নেই, কিন্তু তাই খেয়েই আমরা মুগ্ধ। খাঁটি জিনিস আমাদের ধাতে সয় না, পেটেও সয় না।"

আর্য-সভ্যতার বিশুদ্ধ বলিষ্ঠতাও আমার সহ্য হয় না, বই পড়ে নকল আর্য হবার বাসনা আমার নেই। ভীম-ভীষ্মকে বাহবা দিতে পারি, কিন্তু আমি একটা ভীম হয়ে দুঃশাসনের রক্তপান করছি বা ভীষ্ম হয়ে অম্বা-অম্বালিকা হরণ করছি একথা কল্পনা করলেও গায়ে জ্বর আসে। না, আমি

খাঁটি বাঙালী, খাঁটি বাঙালীই থাকতে চাই। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পরনে শান্তিপুরের ধুতি, পায়ে পাম্‌সু এর চেয়ে জবরজং পোশাক পছন্দ করি না। কোন শিরস্ত্রাণও নয়, তা সে গান্ধি ক্যাপই হোক, বা মাড়োয়ারি গোল টুপিই হোক। শিরোভূষণ নিয়ে বাঙালীরা অনেক experiment করেছে, রামমোহন বঙ্কিমের ছবিতেও টুপি দেখতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশের সেরা মানুষ বিদ্যাসাগরের মাথায় টুপি নেই। শুনেছি অমৃতলাল বসু নাকি বলেছিলেন—"We do not want to load our head with anything but intelligence." কথাটা শুনতে ভালো। কিন্তু আমি বলি, আমরা আমাদের মাথা আর আকাশের মাঝখানে কোন পার্টিশন দিতে রাজি নই। খোলা হাওয়ায় আমাদের মাথা, আমাদের প্রতিভা, আমাদের মনের সবুজ শোভা সুস্থ থাকে। বদ্ধ হাওয়ায় মারা যাই আমরা। কোন রকম 'ইজ্‌মে'র খোঁয়ালে ঢুকলেই আমাদের মৃত্যু, তা সে ধর্মের 'ইজ্‌ম্'ই হোক বা রাজনীতির 'ইজ্‌ম্'ই হোক। অনেকবার এরকম মরেছি আমরা, আবার কি মন্ত্রবলে জানি না, বেঁচেও উঠেছি অনেকবার। সে মন্ত্রটা কি জানো? বিদ্রোহের মন্ত্র। কারও ভাঁওতায় পড়ে কিছুক্ষণ একটা আড়গড়ায় ঢুকে যখন আমরা হাঁপিয়ে উঠি, তখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, সেখান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাই মরীয়া হয়ে, ফ্রাইং প্যান থেকে লাফিয়ে হয়তো 'ফায়ারে' পড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাই অনেকে, তবু লাফাতে ছাড়ি না। ওরই মধ্যে দু'চারজন বেঁচেও যায় আর শেষে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় সেই অচলায়তনকে। এইরকম করেই আমরা যুগে যুগে বেঁচেছি এবং বাঁচবও। আর এই মন্ত্রের সাধক বলেই আমি বাঙালী, এই অগ্নিকে সযত্নে লালন করি বলেই আমি সাগ্নিক! মাতৃজঠরে এই আগুন আমার মনে আমার অজ্ঞাতসারে জ্বালিয়ে দিয়েছেন জানি না আমার কোন পূর্বপুরুষ, কিন্তু এটা জানি—চিতার অগ্নিশিখার সঙ্গে মিলে যাবার পূর্বে এর শিখা নিভবে না, নিভতে দেব না।

কিন্তু দেখ, কি কাণ্ড করছি। পঞ্চকন্যা নিয়ে আলোচনা করব বলে কলম ধরেছিলুম, কিন্তু নিজের কথাই সাতকাহন করে বলে যাচ্ছি। এটাও বাঙালীর একটা বৈশিষ্ট্য।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যম্ মহাপাতকনাশনম্।।

এই হচ্ছে শ্লোক। এর একটা অর্থ এ-ও হতে পারে যে, মহাপাতক থেকে যদি বাঁচতে চাও, তাহলে এই পাঁচটি পাজি মেয়ের কথা মনে রেখ। এরা দাগী। এটাকে ব্যাজস্তুতি মনে করলেই বা ক্ষতি কি?

কিন্তু আরও কয়েকটি ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি। একাধিক পুরুষের সঙ্গে কোনও স্ত্রীলোকের সংস্রব থাকলে সেকালের আর্যরা তেমন কিছু মনে করতেন না। তাঁরা পাপপুণ্যের বিচার করতেন তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থেকে। হত্যা করা মহাপাপ, কিন্তু মাংসলোলুপ অতিথির সেবার জন্যে কর্ণ যখন তাঁর ছেলেকে হত্যা করলেন, অমনি বাহবা বাহবা পড়ে গেল। মাংসলোলুপ অতিথি ভগবানে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন, বর দিলেন কর্ণকে। "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—এটা আর্যদেরই উক্তি, আবার দেখছি, আর্যদের মহাকাব্য রামায়ণে সূর্যবংশের উজ্জ্বলতম রত্ন, নর-রূপী নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সতী স্ত্রীকে নিরপরাধিনী জেনেও বনবাসে পাঠাচ্ছেন আর সেজন্য সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য করছে। এর কারণ, দেশের যে আইন তখন প্রচলিত ছিল সেই আইন অনুসারে তিনি নিজেও চলেছিলেন, নিজের বেলায় আইনের অপলাপ করেন নি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, তাই সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন বলেই তাঁর কদর আরও বেড়ে গেল। মাতৃহত্যা মহাপাপ। কিন্তু আর্য-সভ্যতায় মাতার চেয়ে পিতার স্থান বেশি উঁচুতে। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপ। সেই পিতার আদেশে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিলেন। বংশরক্ষা করা আর্যদের একটা অবশ্য কর্তব্য পুণ্যকর্ম, কিন্তু পিতার সুখের জন্যে ভীষ্মের মতো অত বড় একটা তাগড়া পুরুষ চিরকুমার রয়ে গেল, এজন্য তার নিন্দা করেনি কেউ, সাধুবাদই করেছিল। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ খুঁজলে এরকম অনেক উদাহরণ মিলবে। আর্যরা পাপ-পুণ্যের বিচার করতেন শুধু ঘটনাটি দেখে নয়, ঘটনার পিছনের প্রেরণা দেখে। শুধু আর্যরা কেন, সব সভ্যদেশেই বোধহয় এই আইনে পাপ-পুণ্যের বিচার হয়, ক্ষুদিরাম,

কানাইলাল তাই আমাদের চোখে খুনী নয়, শহীদ। এখন এই পটভূমিকায় ওই পঞ্চকন্যার বিচার করা যায়। এ সম্বন্ধে আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত—বৈদিক আর্যদের কাছে দেবতা এবং রূপবতী নারীর সাত খুন মাফ ছিল। অহল্যা ছিলেন পরম রূপবতী এবং অহল্যাকে নষ্ট করেছিলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। আজকাল যেমন ভোটের জোরে কেষ্ট-বিষ্টু হওয়া যায়, তখন তেমনি তপোবলে ইন্দ্রত্ব লাভ করা যেতো। তাই কোন মানুষ তপোবলে বলীয়ান হয়ে উঠেছে এখবর পেলে, দেবকুল, বিশেষ করে ইন্দ্র, একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। ক্রমাগত চেষ্টা করতেন, কিসে লোকটার তপোবল কমিয়ে দেওয়া যায়। সাধারণত স্বর্গের অপ্সরাদের তাঁরা কাজে লাগাতেন। অপ্সরা দেখলেই বেসামাল হয়ে পড়তেন তপস্বীরা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের তপোবল কমে যেত, ইন্দ্র নিশ্চিত হতেন। অহল্যার স্বামী মহর্ষি গৌতমকে কিন্তু অপ্সরা পাঠিয়ে কাবু করা সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর স্ত্রী অহল্যা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। অহল্যাকে দেখে ইন্দ্র নিজেই কামার্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে একদিন গৌতমের ছদ্মবেশে গেলেন তিনি অহল্যার কাছে গৌতমের অনুপস্থিতিতে। তিনি যে আসল গৌতম নন তা অহল্যা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তবু প্রত্যাখ্যান করেনি। এইখানেই তার পাপ। কাজ সেরে নকল গৌতম যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন আসল গৌতমের সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল তপোবনের প্রান্তে। আসল গৌতম তপোবলে নিমেষে বুঝতে পারলেন কি ঘটেছে। তৎক্ষণাৎ রেগে অভিশাপ দিয়ে তিনি ইন্দ্রকে করে দিলেন নপুংসক আর অহল্যাকে করে দিলেন ভস্মীভূত, কোনও কোনও পুরাণে আছে পাষাণ। ইন্দ্র একটু বেকায়দায় পড়লেন বটে, কিন্তু তির্যকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেল। রাগলে তপোবল কমে যায়। গৌতম রেগেছিলেন, তাঁর তপোবল কমে গেল। ইন্দ্র ফিরে গিয়ে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের বললেন, আমি মহর্ষি গৌতমের ক্রোধ সমুৎপাদন করে তাঁর তপস্যার বিঘ্ন সৃষ্টি করেছি। এতে দেবকার্য সাধিত হয়েছে। রেগে অভিশাপ দেওয়াতে মহর্ষির দীর্ঘকালীন তপোবল অপহৃত হয়েছে। কিন্তু এজন্য আমার ও অহল্যার যে দুর্গতি হলো তার ব্যবস্থা করুন আপনারা। দেবকার্য যখন সাধিত হয়েছে তখন আর কথা কি। ইন্দ্রের নপুংসকত্ব মোচনের ব্যবস্থাও তাঁরা করলেন, আর রামচন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে অহল্যাকেও পরে উদ্ধার করলেন। যে নারী দেবকার্য সাধনের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছে, তাকে কি তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন? সুতরাং সে যে প্রাতঃস্মরণীয়দের পুরোভাগে স্থান পাবে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! এ যুগেও তো এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। আজকাল দেবতাদের আমরা বরখাস্ত করেছি। তার জায়গায় বসিয়েছি দেশকে, রাজনীতিকে, সাহিত্যকে, আর্টকে, বিজ্ঞানকে। এইসব দেবকার্য সাধনের জন্যে যেসব নারীরা কৃচ্ছ্র-সাধন করেছেন, তাঁদের কি তোমরা সম্মানের আসনে বসিয়ে রাখনি? তাঁদের কি প্রচলিত সতীত্বের মাপ-কাঠি দিয়ে মাপতে গেছ? অহল্যার বেলাতেই তোমাদের এই শুচিবাই কেন।

মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র অপূর্ব। অসাধারণ। ওই একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন বলে মহাকবি বেদব্যাস নমস্য হয়ে আছেন আমার কাছে। তিনি তাকে আর্যকন্যা করেননি। দ্রৌপদী যাজ্ঞসেনী, যজ্ঞের অগ্নিশিখা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল সে। অগ্নিশিখার মতোই তার মহিমা উদ্ভাসিত করে রেখেছে মহাভারত কাব্যকে। তার তুলনা নেই। ওই কৃষ্ণাঙ্গিনী রূপসী সমস্ত ভারতবর্ষের পুরুষ জাতকে মাতিয়ে তুলেছিল। স্বয়ম্বর সভায় ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরের লোলুপদৃষ্টি পড়েছিল ওই একটি মেয়ের উপর। অর্জুনকে সে বরণ করেছিল, সম্ভবত ভালোও বেসেছিল, কিন্তু অর্জুনের আর চারটি ভাই যে তার সম্বন্ধে নির্বিকার ছিল তা মনে করবার কোন কারণ নেই। মনে রেখ, পঞ্চ পাণ্ডবরা তখন বিপন্ন। অজ্ঞাতবাস করছেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তাঁরা গিয়েছিলেন স্বয়ম্বর সভায়। এ অবস্থায় একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে যদি পাঁচ ভায়ের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগে যেতো তাহলে যে কাণ্ডটা হতো ইংরেজী ভাষায় তার নাম disaster of the first magnitude, বাংলায় বললে বলতে

হয় সর্বনাশ। তাই সম্ভবত কুন্তী বলেছিল, তোমরা পাঁচজনেই ওকে ভোগ কর। অর্জুনকেই দ্রৌপদী ভালোবাসত, এর প্রমাণ সুভদ্রাকে দেখে তার ঈর্ষা হয়েছিল। কিন্তু অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের খুব বেশি উদাহরণ মহাভারতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা ভেবে দেখ। সে ভালোবাসে একজনকে, কিন্তু মুখটি বুজে সমানভাবে ঘর করতে হয় তাকে আর চারজনের সঙ্গেও। প্রণয়ের অভিনয় করতে হয়, একজনের সঙ্গে নয়, চারজনের সঙ্গে। আর এটা করতে হচ্ছে কেন? তার নিজের দায়ে নয়, পারিবারিক অশান্তি নিবারণের জন্যে। যে চওড়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, তাকে বাহবা দেবার দরকার নেই, কিন্তু যে দু-হাতে দুটো ছাতা নিয়ে সরু তারের উপর দিয়ে সোজা হেঁটে যাচ্ছে একবারও না পড়ে—তাকে তুমি বাহবা দেবে না?

কৌরবসভায় দুর্যোধন দুঃশাসনরা যখন তাকে উলঙ্গিনী করবার চেষ্টা করছিল, তখন ভ্রাতৃভক্ত স্বামীদের প্রতি তার উক্তি, আলুলায়িত-কুন্তলা থেকে দুঃশাসন বধে ভীমকে উত্তেজিত করা, কৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে যখন সন্ধির প্রস্তাব করছিলেন, তখন তার তেজোদৃপ্ত প্রত্যাখ্যান—এসব বাদ দিয়েও সে প্রাতঃস্মরণীয়া, কারণ একা মেয়েমানুষ হয়ে পাঁচটা বড় বড় ওয়েলার হর্স জুতে সে বগী হাঁকিয়ে গেছে সবেগে এবং সগৌরবে, একটাও accident না করে। একে তুমি বাহাদুরি দেবে না? স্মরণ করবে না?

কুন্তীর সবচেয়ে বড় বাহাদুরি, সে দুর্বাসার মতো দুর্ধর্ষ শঙ্খচূড়কে বশ করতে পেরেছিল। গল্পটা আশা করি জান। কুন্তীর বাবার নাম শূরসেন। তিনি তাঁর প্রথম সন্তান কুন্তীকে (তখন তার নাম ছিল পৃথা) তাঁর পিসতুতো ভাই কুন্তীভোজকে দিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে। কুন্তীভোজের বাড়িতে মানুষ বলেই ওর নাম কুন্তী। এই কুন্তীভোজের বাড়িতে মহর্ষি দুর্বাসা একদিন এসে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কুন্তী তখন তাঁর সেবা করেছিল। যে মহর্ষি শকুন্তলার জীবনকে মরুভূমি করে দিয়েছিলেন, যাঁর রগ-চটা স্বভাবের কাহিনী ত্রিভুবন-বিদিত, যাঁর পান থেকে সামান্য চুন খসলেই সর্বনাশ, সেই লাইভ ইলেকট্রিক ওঅ্যার (live electric wire) মহর্ষিকে সন্তুষ্ট করতে পেয়েছিল ওই কিশোরী কুন্তী। এইটেই তো আমার মনে হয় ওর প্রধান কৃতিত্ব আর এরই জোরে ও ওর জীবনের পরবর্তী সমস্যাগুলো (ইংরেজীতে যাকে বলে crisis) সমাধান করতে পেরেছে। সন্তুষ্ট হয়ে মহর্ষি ওকে বর দিলেন—"বৎস, আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে এক মহামন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। এই মন্ত্র পাঠ করে তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করবে, তিনিই তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হবেন এবং তোমার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করবেন।"

মহাভারতকার লিখেছেন, কুন্তী প্রথমে ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারেনি। কিন্তু কৌতূহলের বশে মন্ত্রপাঠ করে সূর্যকে আহ্বান করতেই সূর্যদেব সশরীরে এসে হাজির হলেন। সূর্যকে দেখে ভীত হয়ে পড়ল কুন্তী। হাতজোড় করে বলল—"আমাকে ক্ষমা করুন। মহর্ষি দুর্বাসা আমাকে বর দিয়ে এই মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন, মন্ত্র সফল হয় কিনা জানবার জন্যে আমি আপনাকে আহ্বান করেছি।" এরপর সূর্য যা করেছিলেন তা তোমরা সবাই জানো। কর্ণের জন্ম হল। মহাভারতকার লিখেছেন, সূর্যের সঙ্গে মিলনের সঙ্গে সঙ্গে—তৎক্ষণাৎ কর্ণের জন্ম হল। ঘাবড়ে গিয়ে কুন্তী কর্ণকে ভাসিয়ে দিলে। ব্যাপারটা জানাজানি হল না। এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। রামায়ণ মহাভারতে এরকম অনেক আজগুবি কথা আছে। যাই হোক, কিছুদিন পরে স্বয়ম্বর সভায় কুন্তী পাণ্ডুকে বরণ করলেন। অনেকে সন্দেহ করেন পাণ্ডুর কুষ্ঠ ছিল, কিম্বা ধবল ছিল। সেইজন্যে কুন্তী তার বাহুপাশে ধরা দেননি। দূর থেকে ভক্তি করতেন। কিন্তু বংশরক্ষা হয় কি করে? বংশরক্ষা করা আর্যদের এক মহাকর্তব্য। পাণ্ডুর রোগের কথা সম্ভবত কাছেপিঠে রটে গিয়েছিল, তাই পাণ্ডুর জন্যে হস্তিনাপুরের কাছাকাছি দ্বিতীয় কন্যা আর পাওয়া গেল না। ভীষ্ম হস্তিনাপুর থেকে ছুটলেন মদ্রদেশে। সেখান থেকে মদ্ররাজ শল্যের বোন মাদ্রীকে কিনে নিয়ে এলেন। মাদ্রীকে আনবার জন্যে রথ, গজ, তুরগ, বসন, ভূষণ, মণিমুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শুল্কস্বরূপ দিতে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর মাদ্রীও যখন দেখলেন পাণ্ডুর সাংঘাতিক রোগ আছে, তখন তিনিও পাণ্ডুকে আমল দিতে চাইলেন না। এ সম্বন্ধে

মহাভারতে একটা গল্প লেখা আছে, পাণ্ডু মৈথুন-রত এক মৃগদম্পতীকে নাকি শরাঘাতে মেরে ফেলেছিলেন। সে মৃগদম্পতী কিন্তু আসলে ছিল ঋষিদম্পতী। তাদেরই অভিশাপে পাণ্ডু নাকি স্ত্রী-সঙ্গ-বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এটা শুধু আজগুবি নয়, অসম্ভব। আসলে পাণ্ডু রোগগ্রস্তই ছিলেন। কারণ যাই হোক—সমস্যা দাঁড়াল বংশরক্ষা হবে কি করে। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র-পিণ্ড প্রয়োজনম্—দু'দুটো ভার্যা মজুত, অথচ পুত্র হবার সম্ভাবনা নেই। তখন ওই কুন্তীই সমস্যার সমাধান করে দিলে। স্বামীকে খুলে বললে সব কথা। পাণ্ডু রাজী হয়ে গেলেন। দুর্বাসা-দত্ত মন্ত্রের জোরে কুন্তী তখন একে একে ধর্মকে, বায়ুকে এবং ইন্দ্রকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুনকে সৃষ্টি করলেন। মাদ্রীকেও বঞ্চিত করেননি তিনি, তাঁর অনুরোধে অশ্বিনীকুমাররা এসে মাদ্রীর গর্ভেও নকুল-সহদেবের জন্মদান করে গেলেন। একটা মেয়ের পক্ষে এটা যে কত বড় কীর্তি (ইংরেজীতে যাকে বলে achievement), তা কি ভেবে দেখেছ কখনও? শুধু যে সে সমস্যার সমুদ্র পার হয়ে গেল তা নয়, একেবারে এরোপ্লেনে চড়ে বোঁ করে পার হয়ে গেল। বংশরক্ষার জন্যে ক্ষেত্রজপুত্রের ব্যবস্থা তো অনেকেই করে, কিন্তু তার জন্যে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্রকে কাজে লাগাতে পারে ক'জন? আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা অমন সব হোমরাচোমরা দিব্যকান্তি দেবতাদের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে এসেও তাঁদের প্রতি এতটুকু আসক্তি হয়নি কুন্তীর। তাঁদের ব্যবহার করেছে যন্ত্রের মতো। পাণ্ডুর প্রতি কর্তব্য থেকে একচুল সে নড়েনি। এ মেয়েকে প্রাতঃস্মরণীয় বলবে না তো আর কাকে বলবে?

এইবার তারা-মন্দোদরীব কথায় আসা যাক। পুরাণে নামজাদা তারা দু'জন আছে। একটি হলো বালীর স্ত্রী, আর একটি হলো বৃহস্পতির স্ত্রী। বালী অনার্য, বড়জোব কনভারটেড (converted) আর্য, আর বৃহস্পতি হলেন দেবগুরু। দু'টি তারাই মহীয়সী মহিলা। এযুগে ওঁরা বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর সিনেমা তারাও হতেন।

প্রথমে বালীর স্ত্রীর কথাই বলি। রামচন্দ্র যখন স্বকার্যসাধনের জন্যে সুগ্রীবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গুপ্তভাবে বালীকে মেরে ফেললেন, তখন তারা সুগ্রীবের প্রেয়সী হয়ে পড়ল। তাকে বিয়ে করেছিল কিনা রামায়ণে লেখা নেই। বালীর তুলনায় সুগ্রীব, ঠিক যেমন হিমালয়ের তুলনায় উই-ঢিবি। বালী অনেক আগেই ওকে পিঁপড়ের' মতো মেরে ফেলতে পারতো, কেবল ভাই বলেই দয়া করে মারেনি। লোকটা এত অপদার্থ ছিল যে, নিজের স্ত্রী রুমাকে পর্যন্ত বালীর কবল থেকে রক্ষা করতে পারেনি। বালী ছিল অমিতবিক্রম বীর বানর একটি। অবশ্য মানুষই ছিল সে, বানর ছিল ওদের টোটেম। বাঙালীদের টোটেম ছিল বোধহয় পক্ষী। আর্য-অনার্যদের যখন ভাব হয়ে যায় তখন এই টোটেমগুলো হিন্দু দেব-দেবীদের বাহন হয়ে পড়ে। তাই মহাদেব ষাঁড়ে চড়েছেন, কার্তিক ময়ূরে, লক্ষ্মী পেচকে, সরস্বতী হাঁসে, গণেশ ইঁদুরে। ওই দেখ, আবার আর একটা বক্তৃতার তোড় এসেছে মনে। এটাকে আর প্রশ্রয় দেব না।

হ্যাঁ, কি বলছিলুম, বালী অমিতবিক্রম বীর ছিল। আধুনিক ভাষায় যাকে হি-ম্যান বলে। দাবড়ে দুনিয়াটা ভোগ করে বেড়াতো। মরালিটির কোন বালাই ছিল না। হি-ম্যানরাই সাধারণত যুবতী স্ত্রীলোকদের হৃদয়-বল্লভ হয়। বালীও তারার হৃদয়-বল্লভ ছিল, বালীর অসংখ্য কুকীর্তি অগ্রাহ্য করে তারা তাকে যে ভালোবেসেছিল এর অনেক বর্ণনা বামায়ণে আছে।

বালী যখন রেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, তখন তার আকুলি-বিকুলি বারণ থেকে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত বালীর বুকের উপর পড়ে তার আকুল কান্না থেকে হনুমানের

সঙ্গে যেভাবে সে বালীর বিষয়ে আলোচনা করেছিল তার থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সত্যিই সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত বালীকে। বালীর মৃতদেহকে আঁকড়ে সে শেষ পর্যন্ত পড়েছিল। রামকে বারবার বলছিল—"যে শর দিয়ে আপনি আমার স্বামীকে বধ করেছেন, সেই শর দিয়ে আমাকেও বধ করুন। আপনি যেমন সীতার বিরহে কষ্ট পাচ্ছেন, আমার স্বামীও তেমনি স্বর্গে গিয়ে আমার বিরহে কষ্ট পাবেন। স্বর্গের অপ্সরীরাও তাঁর এ বিরহ লাঘব করতে পারবে না। আমাকে বধ করলে স্ত্রীবধজনিত পাপও আপনার হবে না। কারণ, বাইরেই আমি স্ত্রীলোক, আসলে আমি বালীর আত্মা, বালীর কাছেই আমি ফিরে যেতে চাই, আপনি দয়া করে আমাকে বধ করুন। আমি কাঞ্চনমালী, ধীমান, মাতঙ্গগামী বানরশ্রেষ্ঠ বালীকে ছেড়ে থাকতে পারব না, পারব না।"

এর পরই রামায়ণে তারার যে খবর পাই, তা এই—সুগ্রীব স্বীয় পত্নী রুমা ও স্পৃহনীয়া তারাকে নিয়ে দেবেন্দ্রের ন্যায় দিবারাত্রি বিহার করছেন। অর্থাৎ বালীকে পুড়িয়ে এসে তারা সোজা গিয়ে সুগ্রীবের কোলে উঠে বসেছিল। পরে আরও প্রমাণ পাচ্ছি সুগ্রীবের অন্তঃপুরে তারাই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। সুগ্রীবের কাছে কোনও দরবার করতে হলে আগে তারার চরণ-চন্দনা করতে হয়। রাজ্যলাভ করে সুগ্রীব মদ আর মেয়েমানুষে এত মত্ত হয়ে পড়েছিল যে, সে রামকে সীতা-উদ্ধাবের জন্যে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা তার আর মনে ছিল না। বর্ষা পেরিয়ে শরৎ এসে গেল, তখনও সুগ্রীবের কোনও সাড়া নেই দেখে খুবই দমে গেলেন রামচন্দ্র। বর্ষায় সীতার বিরহে খুবই কাবু হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হনুমান তাঁর অবস্থা দেখে ভদ্রভাবে সুগ্রীবকে তাগাদা দিলেন দু'একবার। কিন্তু তেমন কোনও ফল হলো না। তখন ক্ষেপে উঠলেন লক্ষ্মণ। ধনুর্বাণ হস্তে ধনুকের জ্যা-তে টঙ্কার দিতে দিতে তিনি গিয়ে হাজির হলেন একেবারে সুগ্রীবের অন্দরমহলের সামনে। ভদ্রতাবশতঃ তিনি অন্দরমহলে ঢুকলেন না, কিন্তু অন্দরমহলের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে সিংহনাদে আর্যভাষায় যা বললেন, তাতে সুগ্রীবের নেশা ছুটে গেল, পিলে চমকে উঠল। অন্তঃপুরের দ্বারদেশে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সঙ্গে কে দেখা করলো জান? সুগ্রীব নয়, তারা। সন্নতাঙ্গী, স্খলিতগমনা, মদপান-বিহ্বল-নয়না, সুলক্ষণ সমন্বিতা তারা স্বীয় কাঞ্চীদাম প্রলম্বিত করে লক্ষ্মণের সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। আর্যযুবকরা, তা তিনি যত বড় হোঁৎকাই হোন, সুন্দরী যুবতী দেখলে বেশ ভদ্র হয়ে পড়তেন। 'শিভাল্‌রি' জিনিসটা এখনকার চেয়ে তখন বেশি ছিল। তারাকে দেখে লক্ষ্মণ মোলায়েম হয়ে গেলেন। তারার যুক্তিও মেনে নিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারারই প্ররোচনায় সুগ্রীবও উৎসাহিত হয়ে মন দিলেন বানর-সৈন্য সংগ্রহে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, সীতা-উদ্ধার-রূপ দেবকার্যসাধনে তারা কত সাহায্য করেছিল। অতএব দেবভাষায় রচিত সংস্কৃত শ্লোকে তারা প্রাতঃস্মরণীয়া হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। আর একটা কথাও আমার মনে হয়। যে কবি এই শ্লোকটি রচনা করেছিলেন, তিনি জানতেন যে, রামচন্দ্র মুখে যতই লম্বা বক্তৃতা দিতে থাকুন, আসলে বালীবধ কাজটি অন্যায় হয়েছিল তাঁর। তারা যে বালীকে কত ভালোবাসত তা-ও তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই মৃত সোলজারের বিধবাকে যেমন বকশিশ দেওয়া হয়, তেমনি তারার নামটাও দ্রৌপদী কুন্তীর সঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়ে তার কিছু ক্ষতিপূরণ (compensation) করবার চেষ্টা হয়তো তিনি করেছিলেন। আর একটা কথাও মনে হয়। আর্য-অনার্যদের ঝগড়া যখন মিটে গেল; তখন আর্যদের পংক্তিতে অনার্যদের বসাবার একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল সম্ভবতঃ, এখন যেমন আমরা শিডিউল্‌ড্ কাস্ট বা হরিজনদের জন্যে বা কোন কোন জায়গায় মুসলমানদের জন্যে সীট রিজার্ভ করে রাখি—ওঁরাও অনার্যদের জন্যে তেমনি রাখতেন। একটা শ্লোকে প্রাতঃস্মরণীয়া পাঁচটি কন্যার নাম দিতে হবে? আচ্ছা, গোটা দুই অনার্যকন্যার নামও থাক।

কিন্তু তারার এই ব্যবহারের কারণ কি। যে বালীর মতো বীরকে সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিল

সে সুগ্রীহের মতো নপুংসকের মন ভোলাতে গেল কেন? তারার কথা যখন পড়েছিলুম তখন কার কথা মনে হয়েছিল জান? ক্লিওপেট্রার। বালী যখন মারা গেল তখন তারার আর আপনার লোক কেউ রইল না, তার ছেলে অঙ্গদ ছাড়া। ওই অঙ্গদকেই বড় করা, প্রতিষ্ঠিত করা তার জীবনের লক্ষ্য হয়েছিল তখন! কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সুগ্রীবকে খুশি করতে হয়। ক্লিওপেট্রাও অ্যান্টনির কাছে গিয়েছিল ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে Antioch শিবিরে, সেখানে অ্যান্টনিকে সে বিধিসঙ্গতভাবে বিয়েও করেছিল, কিন্তু কেন? আমার মনে হয়, সিজারের ঔরসজাত পুত্র সিজারিয়োঁর ভবিষ্যতের জন্যে। বিয়ের যৌতুক হিসেবে রোম সাম্রাজ্যের বেশ বড় একটা অংশও সে আদায় করে নিয়েছিল অ্যান্টনির কাছ থেকে। নূরজাহানও ওই রকম কি একটা যেন করেছিল তার প্রথম পক্ষের মেয়ের জন্যে। এরা যদি জগদ্বিখ্যাত হতে পারে, তারাই বা হবে না কেন?

দ্বিতীয় তারা যা করেছিলেন, তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে হেলেন-হরণের। বৃহস্পতির বউ ছিলেন এই তারা। সোম অর্থাৎ চন্দ্রের সঙ্গে ইলোপ্ (elope) করেছিলেন তিনি। এ নিয়ে তখনকার স্বর্গীয় সমাজে এমন চাঞ্চল্য হয়েছিল যে, প্রকাণ্ড যুদ্ধই বেধে গিয়েছিল একটা, ট্রয়ের যুদ্ধের মতো। স্বয়ং ব্রহ্মা এসে শেষটা মিটিয়ে দেন সব। তারা আবার বৃহস্পতির ঘরে ফিরে এলেন। বৃহস্পতি একটুও আপত্তি করলেন না, তোমাদের মতো ছুঁই-ছুঁই বাতিক ছিল না দেবতাদের। তারা ফিরে এসে পুত্র প্রসব করলেন একটি। ছেলে কার তা নিয়ে গোলমাল বেধেছিল একটু। বৃহস্পতি বললেন, আমার ছেলে, চন্দ্র বললেন আমার। তারা যা বললেন তাই শেষে গ্রাহ্য হল। তারা বললেন, ছেলে চন্দ্রের। তার নামকরণ হলো বুধ।

আমার মনে হয়, এ তারা স্মরণীয়া পঞ্চ-কন্যাদের কেউ নন। কারণ, ইনি দেবতাদের বিপদে ফেলেছিলেন, কোনও উপকার করেননি। উপকার বা খোসামোদ না করলে অনার্স লিস্টে সেকালেও নাম উঠতো না।

রাবণের স্ত্রী এবং মেঘনাদের মা মন্দোদরীকেও স্মরণীয় পঞ্চকন্যাদের মধ্যে ধরা হয়েছে। আমার সন্দেহ হয় ওটা কনসোলেশন্ প্রাইজ। আর একটা সন্দেহও হয়। মন্দোদরী বোধহয় বিভীষণকে ভালোবাসত। কারণ রাবণের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে মন্দোদরী যে লম্বা বক্তৃতা দিয়েছিল তাতে বিভীষণের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা অনেকবার আছে। সীতার সুখ্যাতিও আছে। রাম যে নররূপী ভগবান একথাও সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল তখন। তাছাড়া রাবণ যে-সব দুষ্কৃতি করেছিল, তারও একটা লম্বা লিস্ট দিয়েছিল সে। এইসব কারণেই সম্ভবত সে এই অনার্স লিস্টে জায়গা পেয়ে গেল। তাছাড়া, বুড়ো বয়সে স্বামীর শত্রু ঘরভেদী বিভীষণকে বিয়ে করে সে আর্য-আধিপত্যকেই মেনে নিলে। এটাও একটা মস্ত কথা।

কিন্তু একটা কথা, বৎস, সর্বদা মনে রেখ। এরকম পঞ্চকন্যা এযুগেও আছে। মোটে পঞ্চ কেন, হয়তো পঞ্চ সহস্র আছে। সব যুগেই ওরা থাকে। আমি আমার ডাক্তারি জীবনে এরকম পাঁচটি কন্যাকে দেখেছি। এই আধুনিক পঞ্চকন্যার পরিচয়ও তোমাকে দিচ্ছি, অবশ্য তাদের নামধাম গোপন করে। আর্যরা যেমন motive থেকে পাপপুণ্যের বিচার করতেন, এদের সম্বন্ধেও তাই যদি কর, তাহলে দেখতে পাবে এরাও কম নয়।

বহুকাল আগে, তখন আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে অগ্নিযুগ চলছে, একটি পরিবারের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পরিবারটি ছিল একটু ব্রাহ্ম-ঘেঁষা, তাই অভিভাবকরা বাড়ির প্রত্যেকটি মেয়েদের নামের সঙ্গে একটি করে 'সু' জুড়ে দিয়েছিল। সুমতি, সুনন্দা, সুষমা, সুছন্দা—এই চারটি মেয়ে ছিল ভদ্রলোকের। পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা আড়ালে এদের নামকরণ করেছিল—গল-গল, টল-মল, ঢল-ঢল আর জ্বল-জ্বল। সব কটি মেয়েই সুন্দরী চলনে বলনে হাবভাবে মোহিনীও। প্রথম তিনটি মেয়ের টপটপ করে বিয়ে হয়ে গেল, সব লভ ম্যারেজ। হলো না কেবল সুছন্দার, যার ডাকনাম ছেলেরা দিয়েছিল জ্বল-জ্বল। সেই সবচেয়ে বেশি সুন্দরী ছিল। ছিপছিপে গড়ন, ধপধপে

ফরসা রং, চোখের তারা মিশ কালো, মনে হতো দু'টুকরো কালো ভেলভেট যেন কেউ বসিয়ে দিয়েছে চোখের ভিতরে। কখনও কারও দিকে চোখ তুলে চাইতো না। যখনই তাকে দেখেছি, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে বই পড়ছে। ভাবতাম, নভেল নাটক পড়ে বুঝি। একদিন তার জ্বর হল, দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি শুয়ে শুয়ে পড়ছে। জিগ্যেস করলুম, কি বই পড়ছো ওটা। মুচকি হেসে বইটা পাশে রেখে দিলে। উলটে দেখলুম, গ্যারিবল্ডির জীবন-চরিত। একটু আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ওই তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভা নবোদ্ভিন্নযৌবনা তন্বীর এ কি মতিচ্ছন্ন! মেয়েটি কলেজে পড়তো। জিগ্যেস করলুম—ইংরেজি পোয়েট্রি কি কি বই পড়া হয় তোমাদের। বললে—শেলী, কীটস্ আর মিলটন। বললাম, "তাই পড় ভালো করে। ওসব ছেড়ে এই কাঠখোট্টা বই পড়ছ কেন?" মেয়েটি যা উত্তর দিলে তাতে ঘাবড়ে গেলুম। বললে—'এদের জীবনী না পড়লে ওসব কবিতার মানে স্পষ্ট হয় না।' মনে হলো মেয়েটি একেবারে খরে' গেছে। সেকালে নিরামিষ খেয়ে টিকি রেখে একদল কলেজের ছোকরা ধর্ম-ধ্বজী হবার চেষ্টা করতো। কুসংস্কারগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দিত। টিকি ইলেক্‌ট্রিসিটির কন্ডাক্‌টার, পাটের কাপড় পরলে মন্দ লোকের দুষ্ট দৃষ্টির ইলেক্‌ট্রিসিটি সাধনায় ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না, সূর্যগ্রহণের সময় ভাতের হাঁড়িতে ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মায়, এই রকম অনেক কিছু বলতো তারা। এই ধরনের ভূয়ো স্বদেশী ছেলে-মেয়েও হয়েছিল একদল। তারা বাইরে 'পোজ' করতো যেন তারা অনুশীলন সমিতির সভ্য। আমি মনে করলুম, এই মেয়েটি শেষোক্ত দলের। আড়ালে তার বাপ-মাকে বললুম, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন। তাঁরা বললেন, আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না, কিন্তু মেযে যে পছন্দ করছে না কাউকে। সত্যিই দেখলুম তাদের বৈঠকখানায় হরেক রকমের চিড়িয়া আমদানি হচ্ছে, কিছুদিন করে থাকছে, আবার চলে যাচ্ছে। ঢিলে-পাজামা-পরা মোটা কালো এক ভদ্রলোক ছিনেজোঁকের মতো লেগেছিলেন অনেক দিন। তাঁর অগাধ পয়সা, কোলকাতায় বাড়ি, বড় পদস্থ চাকরে একজন—কিন্তু তার দিকে ফিরেও চাইলে না সুছন্দা। তিনি সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত এসে ধরনা দিতেন। সুছন্দা তাঁর দিকে ফিরেও চাইত না। ঈষৎ ভুরু কুঁচকে বই পড়ে যেত খালি। মাঝে মাঝে বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিত। একটি কথা বলত না, একবার চোখ তুলে চাইত না। ভদ্রলোক হাল ছেড়ে দিলেন শেষে। তারপর এলেন প্যাঁশনে চশমা-পরা বাবরি-ওলা এক কবি। তারপরে এলো এক গাঁট্টাগোঁট্টা ফুটবল খেলোয়াড়। আধুনিক স্বয়ম্বর সভা বসতে লাগল তাদের বৈঠকখানায় এইভাবে। মেয়েটা পালাল শেষটায় একদিন। খোঁজাখুঁজি হলো, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, যথাবিধি যা যা হওয়া উচিত সবই হলো। কিন্তু সুছন্দা আর ফিরল না। আমিও দিনকতক পরে বদলি হয়ে গেলাম কোলকাতা থেকে।

প্রায় বছর দুই পরে সন্ধ্যার পর একদিন নিজের কোয়ার্টারে বসে আছি, এমন সময় হাসপাতাল থেকে খবর এল, একটি স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে। অনুমতি পেলে সে আমার কোয়ার্টারেই আসবে। অনুমতি দিলুম। কে এল জান? সেই জ্বল-জ্বল। প্রথমটা চিনতে পারিনি। বেশ মোটা হয়েছে, চোখের কোলে কালী। পরনের কাপড়খানা রঙীন যদিও, কিন্তু বেশ ময়লা। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলুম তার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ চিনতে পারলুম।

"আরে, এ কি সুছন্দা যে—!"

সাধারণ মেয়ে হলে চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত এর পর। কিন্তু সে সন্নত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। তারপর স্থির মৃদুকণ্ঠে বললে—"খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি কোথা আছেন তা খুঁজে বার করতেই কিছু সময় গেছে আমার। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?"

"বিপদটা কি শুনি আগে—"

"আমি সন্তান-সম্ভবা।"

"সে কি!"

তখন তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম। পেটের কাছটা একটু উঁচু বলেই মনে হলো। বললুম, "চল, পরীক্ষা করে দেখি—"

দেখলাম নদ্‌গদে পোয়াতি। মাসখানেকের মধ্যেই ছেলে হবে।

"কি ব্যাপার! কবে বিয়ে হলো তোমার—"

"বিয়ে হয়নি।"

"তবে?"

চোখ নীচু করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সুছন্দা। তারপর বললো, "ধরে নিন ভ্রষ্টা হয়েছি।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "তাই আপনার কাছে এসেছি।"

রোমাঞ্চিত হয়ে দাঁড়িযে রইলুম তার মুখের দিকে চেয়ে। আনন্দে নয়, ভয়ে। বৈঠকখানার সোফায় বসে বলা চলে—'সিংহকে আমি থোড়াই কেয়ার করি'। কিন্তু সত্যি সত্যি সিংহের সম্মুখীন হলে প্রত্যেকের যা অবস্থা হয় আমারও তাই হল।

একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলুম, "আমাকে কি করতে হবে? ছেলেটা প্রসব করিয়ে দেওয়া?"

"তা যদি দিতে পারেন তাহলে ভালোই হয়। কিন্তু আমি সেজন্য আসিনি। আমি অন্য একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি।"

"কি বল—।"

"আমার যদি জ্যান্ত ছেলে হয়, তাহলে সে ছেলের ভার আপনাকে নিতে হবে। আপনার জানাশোনা অনেক অনাথালয় নিশ্চয় আছে। সেইখানে কোথাও দিয়ে দেবেন—।"

"তুমি নিজের ছেলের ভার নেবে না কেন।"

"নেবার উপায় নেই বলে।"

"একথাটা কি আগে ভাবা উচিত ছিল না?"

"ভেবেছিলাম। সাবধানতাও অবলম্বন করেছিলুম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিপদে পড়ে গেছি।"

কি বলব, চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ।

তারপর বললুম—"এত লোক থাকতে তুমি আমার কাছে এলে কেন?"

"কারণ আমি আপনাকে চিনি।"

এই বলে চোখ নীচু করে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি করি, মহামুশকিল। জিগ্যেস করলাম—"তোমার বাবার খবর কি—"

"কাগজে দেখেছি তিনি রায়বাহাদুর হয়েছেন। আর কোন খবর জানি না।"

চোখ নীচু করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বললুম—"তুমি আমাকে যে ভার দিতে চাইছ তা যদি না নিতে পারি?"

"আমি জানি আপনি নেবেন। আর নিতান্তই যদি তাড়িয়ে দেন, চলে যাচ্ছি। অন্য কোন হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হব। তারপর ছেলে হলে ছেলেটাকে ফেলে পালিয়ে যাব। তাঁরা যা হয় ব্যবস্থা করবেন। ছেলের ভার নেবার আমার উপায় নেই।"

"তাহলে ওকে রক্ষা করবার চেষ্টাই বা করছ কেন?"

সুছন্দা হঠাৎ চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল মুহূর্তকাল। তারপর স্থিরকণ্ঠে বললে, "কে জানে, ও কর্ণও তো হতে পারে—"

আমি মুখে যদিও বললুম, "কেন, সূর্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল না কি"—কিন্তু মনে মনে আশ্চর্য হয়ে গেলুম ওর সাহস দেখে।

"তা ঠিক জানি না। হতেও পারে—"

"সব খুলে বল দিকি—"

"আমি কিচ্ছু বলতে পারব না। বানিয়ে মিছে কথা বলতে পারি। কিন্তু আপনার কাছে তা বলব না। আর এমনিতেই মিছে কথা আমি বড় একটা বলি না—"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তার মুখের দিকে।

"আমার অনুরোধটা রাখবেন না?"—আবার বললে সে।

এরপর আমি আর 'না' বলতে পারলুম না। ভর্তি করে নিলাম হাসপাতালে। বেশি ভুগতে হয়নি। দিন কয়েক পরে একটা মরা ছেলে প্রসব করল সে। তারপর হঠাৎ একদিন চলে গেল কাউকে কিছু না বলে।

অনেকদিন ওর আর কোনও খবর পাইনি। বোধহয় বছর দুই হবে। তখনও আমি সেই হাসপাতালেই আছি। হঠাৎ একদিন দুপুরে রেড-ক্রসের মোটরকার দাঁড়াল এসে হাসপাতালে। তার থেকে নাবল একটি স্ট্রেচার। স্ট্রেচারে চাদর-ঢাকা-দেওয়া রোগী একটি। আমার এ্যাসিস্টেন্ট সার্জনই দেখেছিল তাকে প্রথমে। সে এসে আমাকে বললে—রোগীটি স্ত্রীলোক, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। গিয়ে দেখি সুছন্দা। দুটো পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সর্বাঙ্গে ঘা, চোখ দুটো টকটকে লাল। সিফিলিসের ভয়াবহ পরিণাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "সুছন্দা, এ কি কাণ্ড—?"

"আপনার কাছে মরবার জন্যে এসেছি। আমার আর বাঁচবার দরকারও নেই। আমি আমার জীবন দিয়ে যতটুকু করবার তা করেছি। আপনার কাছে এসেছি আর একটা অনুরোধ নিয়ে। আমার সঙ্গে ছোট একটা স্যুটকেশ আছে। সেটা আপনি আপনার কাছে রেখে দিন। খগেন নামে আমার এক বন্ধু ওটি নিতে আসবে। এলে তাকে দিয়ে দেবেন। তার ডান গালে একটা কালো জড়ুল আছে।—"

যদিও তার অবস্থা দেখে মনে মনে আমি খুব দমে গিয়েছিলুম, কিন্তু সব ডাক্তারের যা করা উচিত আমিও তাই করলুম। মুখে তাকে আশ্বাস দিলুম।

"ঘাবড়াচ্ছ কেন, ভালো হয়ে যাবে তুমি।"

তার দৃষ্টিতে যেন একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। পরে বুঝলাম, ওই স্যুটকেশটা আমার হাতে দেবার জন্যেই সে এসেছিল, চিকিৎসা করাবার জন্যে নয়। চিকিৎসা করবার সুযোগই সে দেয়নি আমাকে। সেই রাত্রেই সায়ানাইড খেয়ে মারা গিয়েছিল।

স্যুটকেশটা অনেকদিন পড়েছিল আমার কাছে। সেটা খুলেও দেখেছিলাম আমি। আশা করেছিলুম রঙীন-কাগজে-লেখা এক বাণ্ডিল প্রেমপত্র পাব। কি পেলুম জান? দুটো রিভলবার। মাস ছয়েক পরে গালে-জড়ুল-ওলা সেই ছোকরা এল। তাকে জিগ্যেস করলুম—

"আপনার নাম কি ?"

"খগেন ।"

"সুছন্দার স্যুটকেশটা নিতে এসেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"কী আছে ওতে জানেন?"

"বোধহয় ওর জামা-কাপড় কিছু। ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেছিল—"

"স্যুটকেশের ভিতর দুটো রিভলবার আছে। সব কথা যদি খুলে না বলেন, তাহলে আপনাকে পুলিশে দেব।"

যুবকটি বললে, "ভয় দেখিয়ে আমার কাছে কিছু আদায় করতে পারবেন না, কারণ আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। পুলিশের লোক এসে পৌঁছবার আগেই আমার মৃতদেহটা আপনার মর্গে পৌঁছে যাবে।"

"বেশ, তাহলে ভয় দেখাব না। সুছন্দাকে আমি শ্রদ্ধা করতুম। তাই, ব্যাপারটা কি জানবার খুব কৌতূহল হচ্ছে। তার সম্বন্ধে মনে মনে যে ছবি এঁকে রেখেছিলুম, এ ঘটনাগুলোতে সেটা কেমন যেন বিশ্রী হয়ে গেল। তাই জানতে চাইছি—"

"আপনাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, আপনি একজন গভর্নমেন্ট অফিসার! সুছন্দা যখন প্রথমে আপনার কাছে এসেছিল, তখন সে নিশ্চয় কিছু বলেনি।"

"না কিন্তু তার সম্বন্ধে যে কুৎসিৎ ধারণাটা হয়েছে, সেটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলে খুশী হতুম। কিন্তু আপনি যদি না বলেন তাহলে আর উপায় কি। আমি যে গভর্নমেন্ট অফিসার সে কথাও অস্বীকার করব কি করে। তবে একটা কথা মনে রাখবেন—all that glitters is not gold—আমি আপনাদের মতোই সাধারণ লোক। রাজহংসদের মধ্যে আছি বটে, কিন্তু আমি বক ছাড়া কিছু নই। একটু দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি আপনাকে স্যুটকেশটা। চা খাবেন?"

আমার কথাবার্তা শুনে ছেলেটি যেন একটু নরম হল।

চা খেতে খেতে সে জিজ্ঞেস করল, "সুছন্দার সম্বন্ধে কি ধারণা হয়েছে আপনার?"

"যে ধারণা অনিবার্য তাই হয়েছে। খুব ভদ্রভাষায় বললেও বলতে হয়, মনে হয়েছিল সে অসংযত জীবন যাপন করত—"

"সে দেহ-বিক্রি করে টাকা রোজগার করত। সংযম অসংযমের কোন প্রশ্নই ছিল না। সেই টাকা সে নিজের জন্যে খরচ করত না কখনও, সে টাকা জমিয়ে রিভলবার কিনত চোরাবাজার থেকে। আমি সে রিভলবার নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে আসতাম। তিনি আবার অন্য উপায়ে সেগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিতেন। ওর কেনা রিভলবারের গুলিতে অনেক নামজাদা সাহেব মারা গেছে। কিন্তু সে কথা কেউ জানে না। জানবেও না। নিজেকে ও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে রাখত। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না এ কথা। ওর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলুম, ওর এ পরিচয় কারো কাছে বলব না। আজ প্রথম আপনার কাছে বললুম—"

"আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় কি সূত্রে হয়েছিল? জানতে পারি কি?"

"আমরা সহপাঠী ছিলাম। ও পড়ত বেথুনে, আমি স্কটিশে। ওর রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, যেচে গিয়ে আলাপ করেছিলাম। তারপর ক্রমশ ওর আসল পরিচয় পেলাম।

হঠাৎ ছেলেটির চোখ থেকে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা। তার পরই টপ করে উঠে পড়ল সে। স্যুটকেশটা নিয়ে চলে গেল। আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। আমি তো এ মেয়েকে দ্রৌপদী কুন্তীর চেয়ে ঢের বেশী উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছি।

দ্বিতীয় যে কন্যাটির কথা মনে পড়ছে, সেটি একটি বাগ্‌দির মেয়ে। আমরা ভদ্রলোকরা যাদের ছোটলোক বলি তাদের মেয়েদের যৌবনোদ্‌গম লক্ষ্য করেছ কখনও? দেখবার মতো জিনিস একটা। ওরা ধুলোয়-কাদায় রোদে-জলে মোটা খাবার খেয়ে প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়; তাই ওদের রূপও প্রকৃতিদত্ত। সতেজ, সবুজ, প্রাণরসে টল-মল, কিশোরী লতার মতো, বন্য-হরিণীর মতো। ওরা রুজ পাউডার মেখে ওদের রূপের গালিচায় তালি দেবার চেষ্টা করে না। সে দরকারই হয় না, ওদের, মত্ত মাতঙ্গদের যেমন দরকার হয় না শুঁড়ির দোকান থেকে মদ কেনবার। এদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সেকালের তন্ত্রকারেরা। এই অপরাজিতাদের তাঁরা সাধন-সঙ্গিনী করবারও উপদেশ দিয়েছেন। নীচু-কুলোদ্ভবা বলে ঘৃণা করেননি। কবি বাণভট্ট তাঁর কাদম্বরী কাব্যে চণ্ডালকন্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে মনে হয়, এই অনার্যকন্যারা (যাদের আমরা ছোটলোক বলি) সেকালে আর্যদের সভাতেও মোটেই অপাংক্তেয় ছিল না। বাণভট্ট লিখেছেন—সেই চণ্ডালকন্যার কেশদাম বর্ষার জলভরা মেঘের মতো, চোখ দুটি যেন শরৎকালের বিকশিত পুণ্ডরীক, অনঙ্গদেবের মতো তার কটিদেশ মুঠোর মধ্যে

ধরা যায়। তাকে দেখে মনে হয়, নীলপদ্মবনে সন্ধ্যার রক্তরাগ যেন ছড়িয়ে পড়েছে। আমি যে বাগদির মেয়ে পদ্মাবতীর কথা বলছি, আমার বিশ্বাস, বাণভট্ট তাকে দেখলেও মুগ্ধ হতেন এবং যে ভাষায় তার বর্ণনা করতেন তার উপমা অলঙ্কার-বিশেষণের জৌলুসও বিদগ্ধ রসিকদের চিত্ত হরণ করত।

পদ্মাবতী আমার কাছে যখন এল তখন তার গণোরিয়া হয়েছে। একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আউটডোরে রোগীর ভীড়ে তার দিকে আমার নজর গিয়েছিল সে অসামান্যা রূপসী বলে। কালো মেয়ের অত রূপ এর আগে চোখে পড়েনি। মহাভারতের কৃষ্ণাকে কল্পনায় দেখেছিলাম। পদ্মাবতীকে দেখে মনে হল, সেই কৃষ্ণাই সশরীরে এসে হাজির হল নাকি?

ওরকম একটা নারীরত্ন দাগী হয়ে গেছে দেখে কষ্ট হল খুব। সে যুগে গণোরিয়ার সুচিকিৎসা আমার যতটা জানা ছিল তা করলাম। ফলে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল একটু। অর্থাৎ আমি ক্রমশ সেই পর্যায়ে গিয়ে পড়লুম যে পর্যায়ে গেলে মুরুব্বীর মতো উপদেশ দেওয়া চলে।

তাকে একদিন জিগ্যেস করলুম, "এ বিশ্রী রোগ তোমার হল কি করে? তোমার স্বামী কি দুশ্চরিত্র লোক?"

"খুব। দিনরাত তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এ রোগটি ওর কাছ থেকে হয় নি—মিথ্যে কথা বলব না আপনার কাছে ডাক্তারবাবু—"

একটু অবাক হয়ে গেলুম। এমন একটা দুশ্চরিত্র স্বামীর ঘাড়ে দোষটা চাপাবার সুযোগ ও অনায়াসে ত্যাগ করল! আশ্চর্য তো!

"কী করে হল তাহলে—"

ঘাড় নীচু করে মুচকি হেসে বলল, "ওই যে আমাদের জমিদারবাবুর বড়ছেলে শুকদেববাবু, চেনেন না তাঁকে, ওই যে বড় ফিটনে চড়ে রোজ মাছ ধরতে যায়, আপনাদের হাসপাতালের সামনে দিয়েই তো যায়—"

শুধু যে সরলভাবে কথাটা স্বীকার করলে তা-ই নয়, এটা যে খুব একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করেছে সে-বোধও যেন নেই—এইটে আমার মনে হল ওর বলবার ধরন থেকে। ও যেন লুকিয়ে কারো গাছ থেকে পেয়ারা চুরি করে খেয়েছে কিম্বা কারো ভাঁড়ার থেকে আচার চুরি করে খেয়েছে—ভাবটা অনেকটা এই রকম। আমি বাঙালী, সুতরাং আমার মধ্যে সেই আদ্যিকেলে পদিপিসি আছে। পিসি উপদেশ দেবার জন্যে খোঁচাতে লাগল আমাকে।

বললাম, "কাজটা খুব খারাপ করেছ। এ কাজ কেন করতে গেলে? টাকার জন্যে?"

"ছি ছি, ওকি বলছেন? আমি বাজারের মেয়েমানুষ নাকি? একটি পয়সা নিই নি ওর কাছে—"

"তাহলে এ পাপ কাজ করতে গেলে কেন। অভাবে পড়ে করলে তবু একটা মানে বোঝা যেতো—"

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করে বসেছিল। ঘাড় হেঁট করেই রইল। আর কিছু বলল না।

কিন্তু আমার অন্তরনিবাসিনী পদিপিসি তখন এর হাঁড়ির খবরটি জানবার জন্যে খুব উৎসুক হয়ে পড়েছেন, সুতরাং আমাকে থামতে দিলেন না। আমি একজন পদস্থ ডাক্তার, আর ও একটা সামান্য বাগ্‌দির মেয়ে একথা ভুলিয়ে দিলেন আমাকে।

জিগ্যেস করলুম, "ওকে ভালোবাস নাকি—"

পদ্মাবতী মাথা নেড়ে জানাল বাসে না।

"তবে?"

হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে, একটু মুচকি হেসে বললে, "আপনারা কি ভিখিরিকে ভিক্ষে দেন না কখনও?"

এইবার চুপ করে যেতে হল আমাকে। এ উত্তর প্রত্যাশা করিনি।

যতদিন ওখানে ছিলুম, খোঁজ রাখতুম মেয়েটার। যিনি ফিটন হাঁকিয়ে রোজ মাছ ধরতে

যেতেন, সেই শুকদেববাবুর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল পরে, তাঁর গণোরিয়া এবং সিফিলিস চিকিৎসা করবার জন্যে। অনেক টাকা কামিয়েছিলুম তাঁর কাছ থেকে। ভাগ্যে এই অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেগুলো আছে তাই আমরা ডাক্তাররা, দুপয়সা করে খাচ্ছি। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর আর দাদের চিকিৎসা করে ক'পয়সা পেতুম। টি-বি হয় খুব গরীবদের। এ দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা তারা করাতে পারে না। বড়লোকেরা স্যানাটোরিয়ামে চলে যায়। সিফিলিস গণোরিয়াই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। শুকদেবের সঙ্গে যখন অন্তরঙ্গতা হল, তখন তাকে পদ্মাবতীর কথা জিগ্যেস করেছিলুম। বলা বাহুল্য, পদিপিসির ওস্‌কানিতে।

শুকদেব বললেন, "জীবনে ওই একটি মেয়ের কাছেই হাতজোড় করেছিলুম। এখনও হাতজোড় করেই আছি। একবার সে দয়া করেছিল, দ্বিতীয়বার আর করেনি। মনে হয়, আর করবে না। আমার ধারণা কি জানেন?"

"কি?"

"ও গরীবের ঘরে জন্মালে কি হবে, মেয়েটি সত্যই অসাধারণ। যে স্বামী দুবেলা ঠেঙিয়ে ওর গতর চূর্ণ করে দিচ্ছে, সেই স্বামীর পা আঁকড়ে পড়ে আছে মশাই। শুধু আমি নয়, অনেকেই ওকে রাজরাণী করে রেখে দিতে প্রস্তুত, ও কিন্তু রাজী হয় না। আমার ধারণা, হয় ও কোনও শাপভ্রষ্টা অপ্সরা, কিম্বা খুব গভীর জলের মাছ, আমাদের মতো লোকের জাল সেখানে পৌঁছয় না।"

আর একবার পদ্মাবতীর চূর্ণ-গতর মেরামত করবার সুযোগ পেয়েছিলাম কিছুদিন পরে। তাকে দেখে মনে হয়েছিল, যেন একটা উন্মত্ত ষাঁড়ে তাকে গুঁতিয়েছে। তার স্বামী বিশু বাগ্‌দিকেও দেখবার সুযোগ হয়েছিল সেই সূত্রে, কারণ পদ্মাবতী তার হাতে কামড়ে দিয়েছিল। কামড়ে না দিলে বিশু বাগ্‌দি সম্ভবত খুনই করে ফেলতো তাকে। কারণ, সে ছিল মনুষ্যরূপী একটি মহিষাসুর। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, তেমনি জোয়ান, ইয়া গোঁফ, ইয়া জুলফি।

এরপর আমি বদলি হয়ে গেলাম সেখান থেকে। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অবশেষে একটা কুষ্ঠ হাসপাতালে গিয়ে ঠেকলুম প্রায় বছর দশেক পরে। ওপরওলার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল একটু, তিনি আমাকে ওই ভাগাড়ে পাঠিয়ে দিলেন। বছরখানেক সেখানে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। একটি পরম লাভ হয়েছিল কিন্তু। পদ্মাবতীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল সেখানে। একদিন আউটডোরে এসে দেখি, একটা একচোখ কানা বুড়ি বসে আছে। পদ্মাবতীকে আমি চিনতে পারিনি প্রথমে। সে উঠে এসে যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে, তখন জিগ্যেস করলাম, "কে তুমি—"

"চিনতে পারছেন না ডাক্তারবাবু, আমি পদ্ম—"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তার দিকে। তার যে চোখ দেখে বাণভট্টের সৃষ্টি পুণ্ডরীকনয়নার কথা মনে পড়েছিল, সেই চোখের একটি নেই। যেটা আছে সেটাও বীভৎস হয়ে উঠেছে সঙ্গীহীন হয়ে। বাঁ গালের উপর, কানা চোখটার নীচেই 'স্কার' একটা, গালের মাংসটাকে কুঁচকে দিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। সেই ঢলঢলে মুখের শোভা একটুও নেই।

"একি, এরকম চেহারা কি করে হল তোমার? চোখটা গেল কি করে?"

"ওই ওকে জিগ্যেস করুন। মদের ঝোঁকে আমার মুখের উপর আগুনের নুড়ো চেপে ধরেছিল।"

"কিন্তু এখন যা হয়েছে, তা তো চিকিৎসার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে যদি আসতে—"

"আমি এর জন্যে আসিনি। আমার পায়ের হাঁটু দুটোর যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, সে জন্যেও আসিনি, আমি ওর জন্যেই এসেছি। আপনি ওকেই দেখুন ভালো করে, ওর একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিন। আপনি পুরোনো চেনা লোক, এখানে আছেন ভালোই হয়েছে—ওকে দেখুন একবার—"

বিশু বাগ্‌দি এককোণে গায়ে কাপড়চোপড় ঢাকা দিয়ে বসেছিল, তখনও ভালো করে দেখিনি তাকে।

"এদিকে এস, দেখি কি হয়েছে—"

তাকে দেখেও চমকে উঠলুম। বন্যমহিষ যেন মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-গাড়ি-টানা মহিষে পরিণত হয়েছে। তার মুখের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝলাম কি হয়েছে তার। কুষ্ঠ। ওই ফোলা-নাক, ফোলা কানের পাতা, ওই সিংহবদন আর কোন রোগে হয় না।

পদ্মাবতী বললে, "আমার গয়নাগাঁটি সব বিক্রি করে চল্লিশটি টাকা জোগাড় করে এনেছি ডাক্তারবাবু। দরকার হলে বাজার থেকেও ওষুধ কিনতে পারব আমি—"

বিস্ময়ের ঘোরটি কাটতে মিনিটখানেক লাগল। তারপর ব্যবস্থা করে দিলুম। বেহুলা সাবিত্রী রূপবান চরিত্রবান স্বামীদের যমের কবল থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন বলে তাঁদের আমরা বাহবা দিই। কিন্তু পদ্মাবতীর এই কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত শয়তান পাষণ্ড স্বামীকে বাঁচাবার আকুল আগ্রহ কি ওদের আগ্রহের সঙ্গে তুলনীয়? তোমার ক্ল্যাসিক্যাল পঞ্চকন্যাদের চেয়ে এ কি কোনও অংশে কম?

এইবার তৃতীয় যে কন্যাটির কথা বলব, তাকে তোমরা সবাই দেখছ, কিন্তু চিনতে পারনি। এ কন্যা মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে ঘরে আছে। এরা অনাহারে বা অর্ধাহারে থেকে, বছরের পর বছর তোমাদের খেয়াল অনুসারে মন যুগিয়ে দিনের পর দিন শরীর পাত করছে, কিন্তু এদের তোমরা চেনও না, শ্রদ্ধাও কর না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ হয়তো সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে হাততালির লোভে ওদের সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছ, কিন্তু ওদের সত্যিকার মর্যাদা তোমরা দাওনি, দেবার সামর্থ্যও তোমাদের নেই। ওই সতী-লক্ষ্মীরা তোমাদের বাড়িতে কুমারী অবস্থাতেও চাকরাণী-রাঁধুনী, সধবা অবস্থাতেও তাই, আর বিধবা হলে তো কথাই নেই। তখন তার খাবারের এক-আধটুকরো মাছ আর তার কাপড়ের পাড়ের সামান্য রংটুকুও তোমরা মুছে নিয়ে তাকে একবেলা খাইয়ে উপদেশ দাও— 'এখন কেবল পতিদেবতার চরণ ধ্যান কর, নির্বিকার হয়ে আমার সংসারের বাসন মাজা, কাপড় কাচা আর রান্না করে যাও। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেল। রূপে, রঙে, গানে, কবিতায় খবরদার মুগ্ধ হয়ো না। অবসর পেলে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ শুনতে পার। ওসবেও নানা রকম অশ্লীল গল্প আছে বটে, কিন্তু ধর্মরসে জারিত হয়ে নির্দোষ হয়ে গেছে সে সব। ফর্মালিনে-ডোবানো মরা-গোখরো কামড়ায় না। কাঁচা তেঁতুল খেলেই অসুখ হবার সম্ভাবনা, কিন্তু পুরানো পোকাধরা-তেঁতুল ঔষুধ পথ্য দুই-ই। সুতরাং সংসারের কাজকর্ম সেরে বিনা পয়সায় কোথাও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ শোনবার সুযোগ পেলে শুনো।' তাই করছে তারা।

এই স্লেভ ট্রেড (slave trade) তোমরা চালিয়ে যাচ্ছ অনাদি কাল থেকে। কোনও আইন তোমাদের রুখতে পারেনি। কারণ ওই স্লেভরাই স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাদের চাবুকের তলায় পিঠ পেতে দিচ্ছে। দিচ্ছে, কারণ ওই দেওয়াটাকেই ওরা পুণ্য মনে করছে, বহুকালের সংস্কারের জগদ্দল পাথরের তলায় চাপা পড়ে নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে ওদের স্বাধীন সত্তা, ক্রীতদাসী হয়েই কৃতার্থ ওরা। মানছি, ওদের মধ্যে অনেক খাণ্ডারণী আছে। এ-ও মানছি ওদের ভয়ে অনেক স্বামীও সন্ত্রস্ত। ইতিহাসে এ নজীরও আছে যে ইংরেজরা প্রথম যখন এদেশে আসে, তখন এদের মধ্যে থেকেই একদল তাদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল যার সারমর্ম হচ্ছে—আমাদের বাঁচাও।

তোমরা শুনেছি সভ্য দেশের লোক, এই পিশাচ পাষণ্ডদের হাত থেকে বাঁচাও আমাদের। সংসারের চাপে নিষ্পিষ্ট হলেও সকলের স্বাধীন সত্তা একেবারে মরে যায় না, নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা। কিন্তু এ-ও ঠিক যে, এখনও ওই মধ্যবিত্ত সংসারেই লক্ষ লক্ষ নারী 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' তোমাদের দাসীবৃত্তি করে চলেছে। আত্মবিলোপ করেই ওদের তৃপ্তি।

আমি একটি মেয়ের কথা জানি। একটা বুড়ো কেরানীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। অপূর্বচন্দ্র আমারই

আপিসের কেরানী ছিল। বেগুনপোড়ার মতো মুখটা, তার উপর একজোড়া সাদা ঝোলা গোঁফ, চোখ দুটো ফোলা-ফোলা, ঠোটের উপর ধবলের আভাস।

একদিন লক্ষ্য করলুম, লোকটা উপর্যুপরি আপিসে লেট করে আসছে। জবাবদিহি তলব করলুম। সে হাত কচলাতে কচলাতে বললে, "বড় বিপদে পড়েছি সার, নিজে রান্না করে খেয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে তবে আসি। আমার পরিবারটি অসুখে পড়েছে—"

"কি হয়েছে—"

"বলে তো জ্বর হয়। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। বলে বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, মাথায় ব্যথা। ওই নিয়েই কাজ করছিল এতদিন, ক'দিন থেকে শয্যা নিয়েছে। আমাকেই রাঁধতে হচ্ছে। একটা রাঁধুনীর চেষ্টায় আছি—আর লেট হবে না—"

"ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন কিছু?"

হরেন সাণ্ডেলকে খবর দিয়েছ। তিনি আসবেন বলেছেন—"

"এ ব্যক্তিটি কে?"

"হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একজন। খুব হাতযশ—"

তারপর আরও বার দুই হাত কচলে বললে, "আপনাকে বলতে তো ভরসা পাই না। গরীব মানুষ আমি—"

"আচ্ছা, আমি যাব আপনার স্ত্রীকে দেখতে।"

গেলাম। গিয়ে দেখলাম, মানুষ নয়, একটি কঙ্কাল শতছিন্ন একখানা গোলাপী র‍্যাপার গায়ে দিয়ে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছে। মুখের মধ্যে আছে শুধু ভাসা-ভাসা চোখ দুটি, আর সে চোখে কি উৎসুক করুণ দৃষ্টি। বুঝতে দেরি হল না যে কালরোগে ধরেছে—যক্ষ্মা।

বললাম, "ওষুধের চেয়ে এর খাওয়ার দরকার বেশি। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে রেখেছেন কেন, খুলে দিন। ভালো খাওয়া আর ভালো হাওয়া—এই চাই এখন। জানালা বন্ধ করছেন কেন—"

"মথুর কবরেজ বললেন, কফের অসুখ কিনা, হাওয়া লাগলে বেড়ে যাবে—"

"খুলে দিন।"

লোকটার মুখ দেখে মনে হল খোলবার ওর ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমি ওর মনিব, ত্রস্ত হয়ে খুলতে লাগল। ছিট্‌কিনি টানার কর্কশ আওয়াজ থেকে অনুমান করলাম, এ জানালা জন্মে কখনও খোলা হয় না।

"কি খাচ্ছে ও—"

"জল বার্লি—"

"দুধ টুধ দেন না?"

"আজ্ঞে না। দুধে শুনেছি কফটা বাড়ে—"

ধমকে উঠলুম।

"আপনি তো মহাপণ্ডিত লোক দেখছি! দুধ দেবেন ওকে রোজ সেরখানেক করে। ডিমও দেবেন—"

"হাঁসের ডিম বলছেন? কিন্তু ওর বাঁ হাঁটুটাতে বাতের ব্যথা আছে।"

"বেশ, মুরগীর ডিম দিন তাহলে। একটা করে শুরু করুন প্রথমে—"

"মুরগীর ডিম তো চলবে না সার। গোঁড়া ব্রাহ্মণের বংশ আমাদের—"

"ও। তাহলে ফলটল দিন। কলা, পেঁপে—"

তারপর হঠাৎ আমার মনে পড়ল, ফরমাস তো করে চলেছি লম্বা লম্বা কিন্তু লোকটার মাইনে যে মাত্র পঁচাত্তর টাকা।

"দুধ কতটা করে নেন আপনারা—ওকে দুধই একটু বেশি দিতে হবে।"

মুখ কাচুমাচু করে অপূর্বচন্দ্র বললেন, "দুধ নিতে পারি না সার। যা দাম—"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এর চিকিৎসা তাহলে কি করে হবে। জল বার্লি খাইয়ে যক্ষ্মারুগী বাঁচানো যায় না। রোক চড়ে গেল, বাঁচাতেই হবে ওকে।

বললুম, "হাসপাতালে যে লোকটা দুধ দেয় তাকে বলবেন, আপনার বাড়িতে যেন রোজ একসের করে দুধ দিয়ে যায়। আর দুধের বিলটা যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর এর ওষুধপত্র যা লাগবে তা হাসপাতাল থেকেই পাবেন, আমি বলে দেব ডাক্তার ঘোষকে—"

"যে আজ্ঞে।"

হাসপাতাল থেকে দামী ওষুধ সাধারণ রোগীদের দেওয়ার নিয়ম ছিল না। তবে স্পেশ্যাল কেস হলে দেওয়া যেতো। ওর নামটা হাসপাতালের খাতায় লিখে সেই বন্দোবস্তই করে দিলাম।

অপূর্বচন্দ্র এসে খবর দিতে লাগল রুগী বেশ ভালোই আছে। পরে বুঝেছিলাম মিথ্যে খবর দিয়েছে।

মাসখানেক পরে একদিন ওদের বাড়ির কাছেই আর একটা রুগী দেখতে গিয়েছিলুম। মনে হল অপূর্বচন্দ্রের স্ত্রী কেমন আছেন একবার দেখে যাই। গিয়ে দেখলুম যাকে পই পই করে বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেছিলুম, সে বারান্দায় বসে একটা তোলা উনুনে ক্ষীর করছে। পাশে একটা বাসনে খানিকটা ছানাও কাটানো রয়েছে।

আমি যে এমনভাবে সে সময়ে গিয়ে পড়তে পারি এ কথা ভাবতেই পারে নি সে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়াল।

"কি খবর কেমন আছ। এ কি, ছানা, ক্ষীর কার জন্যে? শুধু দুধ ভালো লাগছে না বুঝি—"

মেয়েটি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

"ক্ষীর হজম হবে তোমার? ছানাটা অবশ্য চলতে পারে—"

আমি তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে ও ক্ষীর করছে ওর আফিং-খোর স্বামীটির জন্যে, আর ছানা কাটিয়ে রেখেছে ওর ছেলেমেয়েদের সন্দেশ করে দেবে বলে। নিজে একফোঁটা দুধ একদিনও খায়নি। জেরা করতেই সব বেরিয়ে পড়ল।

বলল, "উনি বুড়োমানুষ সমস্ত দিন খেটেখুটে আসেন, সন্ধেবেলা আফিং খান, একটু ক্ষীর হলে ওঁর শরীরটা ভালো থাকে। আর ছেলেমেয়েগুলো ইস্কুল থেকে এসে রোজই মুড়ি চিবোয়, সন্দেশের উপর ওদের কি যে লোভ, ময়রাটার খোঞ্চা থেকে একদিন ফটিক সন্দেশ চুরি করে কি মারটাই যে খেয়েছিল, তাই ওদের জন্যে দু'চারটে সন্দেশ করে রাখি—"

তখন জানতুম না যে ছেলেমেয়েগুলো ওর একটাও নয়, সব সতীনের।

বললাম, "কিন্তু তুমি রুগী, দুধ তো তোমারই খাওয়া আগে দরকার। তোমার জন্যেই দুধ হাসপাতাল থেকে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আর তুমি ক্ষীর ছানা করে ওদের খাওয়াচ্ছ।"

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে রইল।

"হাত দেখি তোমার—"

কঙ্কালসার হাতটা বার করে দিলে। রক্তহীন শির-বার-করা হাত। পাল্‌স রেট একশ কুড়ি।

'না, এ রকম উপোস করে থাকলে তোমার চিকিৎসা করতে পারব না। হাসপাতাল থেকে দুধ যদি আর একসের করে বাড়িয়ে দিই তাহলে তুমি খাবে?"

ঘাড় নেড়ে জানাল খাবে।

ফিরে গিয়ে আপিসে তার স্বামীকে ডেকে যাচ্ছেতাই বকলুম।

"আপনার অসুস্থ স্ত্রীর জন্যে হাসপাতাল থেকে দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, আর আপনি

তাই মেরে ক্ষীর করে খাচ্ছেন, লজ্জা করে না আপনার?"

হাত কচলাতে কচলাতে অপূর্বচন্দ্র বললে, "খুবই করে সার। কিন্তু কি করব, ও যে কিছুতেই খাবে না। বলে দুধ খেলে ওর পেট ভুট্‌ভাট্ করে। দুধ ওর সহ্য হয় না।"

"যাতে হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।"

"তাহলে ওকে হাসপাতালে এনেই রাখুন সার। আমি একটা রাঁধুনীর সন্ধান পেয়েছি।" হাসপাতালে একটা কেবিন খালি ছিল। পয়সা দিতে হবে বলে সেখানে সাধারণতঃ কোন রুগী জুটত না। মফস্বলের হাসপাতালে সকলেরই ইচ্ছে সম্পূর্ণ চিকিৎসাটা বিনা পয়সায় হোক। সেই কেবিনে এনে ভরতি করলুম সরমাকে। মেয়েটির নাম ছিল সরমা। হাসপাতালে এনে দেখলুম দুধ ওর বেশ হজম হয়। প্রায় সের দেড়েক দুধ অনায়াসে হজম করতে লাগল। দিন সাতেক পরে মেয়েটি একদিন সকাতরে আমাকে বললে, "দুধ আমার মুখে রুচছে না ডাক্তারবাবু। ওরা সবাই বাড়িতে শাকচচ্চড়ি আর ফ্যান-মেশানো কলাইয়ের ডাল খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, আর আমি একলা ভালো ভালো খাবার খাচ্ছি—এ আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমি যদি মরেই যাই তাতেই বা ক্ষতি কি। আমার চেয়ে ওঁর বাঁচাটা বেশি দরকার। অতগুলো ছেলেমেয়ের বাবা উনি। সমস্তদিন কলম পিষে ক্লান্ত হয়ে পড়েন—উনি একটু দুধ খেতে পান না—আর আপনি আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।"

আমি বললুম, "তোমার পতি-ভক্তির প্রশংসা করছি। কিন্তু তুমি রুগী, আমি ডাক্তার। তোমার রোগ যাতে সারবে আমাকে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। তোমার স্বামী বা ছেলেমেয়েরা কি খাচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামালে তো চলবে না। তুমি আগে সেরে ওঠ, তারপর ওসব ভাবা যাবে। অপূর্ববাবু এতদিন যা খেয়ে কাটিয়েছেন, বাকী জীবনটাও তাই খেয়ে বেশ কাটিয়ে দিতে পারবেন। ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার যা ব্যবস্থা করেছি সেই মত চলতে হবে তোমাকে—"

এর দিন কয়েক পরে শুনতে পেলুম কেবিনের সামনে হাল্লা উঠেছে একটা। সুহাসিনী নামে ঘোড়ামুখী একটা নার্স ছিল, সে খুব চেঁচামেচি করছে। গেলুম এগিয়ে।

"কি হয়েছে—"

"সরমাকে রোজ যা খেতে দি, তার আদ্ধেকের উপর ও সরিয়ে রেখে দেয়। রুটি, মাখন, ছানা, সব। আর আমরা যখন দুপুরে খেতে চলে যাই, ওই ছেলেটা এসে নিয়ে যায় রোজ—"

দেখলাম, আট-দশ বছরের ফটিক দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝোলা হাতে করে। বমাল সুদ্ধ ধরা পড়েছে। কি আর বলব, ছেড়ে দিলাম। সুহাসিনী গজগজ করতে করতে চলে গেল।

সরমাকে বললাম, "তোমার উদ্দেশ্যটা কি বলতো? এরকম করলে তো তোমাকে হাসপাতালে রাখা যাবে না—"

সরমা ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, "সেই ভালো, আমি বাড়িই চলে যাই। ওসব একলা আমি খেতে পারব না।"

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম মিনিটখানেক। তারপর বললাম, "আচ্ছা, সুহাসিনীকে বলে দিচ্ছি তোমাকে বেশি বেশি করে দেবে। তুমি পেট ভরে খেয়ে বাকীটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিও—"

এরকম সাধারণতঃ হয় না, এরকম করা নিয়মও নয়, কিন্তু আমাব রোক চড়ে গিয়েছিল। দিন পনেরো পরে আর একটা ঘটনা ঘটল। একদিন শুনলাম, ফিটফাট একটি সুদর্শন যুবক ফল-টল নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

সুহাসিনী বলল, "সরমা কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করলে না, ফল-টল ছুঁলেও না। অদ্ভুত মেয়ে বাবা।"

আমি রাউন্ড দেবার সময় যখন ওর কেবিনে গেলাম, তখন দেখি বসে বসে কাঁদছে।

"কি হল, কে এসেছিল আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে—"

ঘাড় হেঁট করে বসে রইল খানিকক্ষণ, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, "কেউ না—"

"অচেনা লোক কখনও ফল-টল নিয়ে দেখা করতে আসে? ভালো ভালো ফল এনেছিল শুনলাম, ফলগুলো ফেরত দিলে কেন?"

উত্তর দিলে না, চুপ করে বসে রইল।

আমার এ্যাসিস্‌টেন্ট সার্জন ডাক্তার ঘোষ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়তে ভালোবাসতেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যেও একটু ডিটেক্‌টিভ-ভাব ছিল। তিনিই একদিন ব্যাপারটার রহস্যোদ্ভেদ করলেন। বললেন, "ওই ছেলেটি খুব বড়লোকের ছেলে। সরমার বাপের বাড়ির লোক। সরমাকে খুব ভালো লেগেছিল, বিয়েও করতে চেয়েছিল কিন্তু বিয়ে হয়নি।"

"কেন, জাতে আটকালো?"

"না। পালটা ঘরই ছিল। আটকালো কুষ্ঠিতে।"

"বল কি। এত খবর তুমি জোগাড় করলে কি করে?"

"ভদ্রলোক আজ আমার আপিসে এসেছিলেন। হাসপাতাল ফাণ্ডে দুশো টাকা দান করে গেছেন, আর আমাকে অনুরোধ করে গেছেন, সরমার চিকিৎসার কোন ত্রুটি যেন না হয়। আমি বললুম, কোন ত্রুটি হচ্ছে না। ওর জন্যে আপনাকে টাকা দিতে হবে না। তিনি বললেন, না, আমি টাকা দিচ্ছি নিজের তৃপ্তির জন্যে। তারপর গল্প করতে করতে সব কথা বেরিয়ে পড়ল।"

সরমার চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। তবু তাকে বাঁচাতে পারিনি। পরে প্রকাশ পেল সে অন্তঃসত্ত্বা। মাস পাঁচ-ছয় পরে একটা মরা ছেলে প্রসব করে সে-ও মারা গেল। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সে খোঁজ নিয়েছে তার স্বামী আর সতীনের ছেলেমেয়েরা তার খাবারের ভাগ পাচ্ছে কি না।

সেই বড়লোকের ছেলেটি মাঝে মাঝে এসে সরমার খোঁজ নিতেন, কিন্তু সরমার ঘরে ঢুকতে সাহস পেতেন না।

সরমার সেই ভাসাভাসা চোখ দুটো আর কঙ্কালসার চেহারাটা এখনও মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে আমার মনে। রাত্রে একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম তাকে। আমাকে যেন বলছে, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, শুনেছি জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ যখন যেখানে হবার তাই হয়। জন্মাবার সময় আমরা কুষ্ঠি দেখে জন্মাই না, মরবার সময়ও আমরা কুষ্ঠি দেখে মরি না, বিয়ের বেলাতেই কুষ্ঠির এত বাড়াবাড়ি করি কেন বলুন তো—"

স্বপ্নের সরমা একথা বলেছিল, কিন্তু বাস্তবের সরমা বোধহয় একথা ভাবতেও পারত না। তবু ওই অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জেদী মেয়েটা আজও আমার কাছে প্রণম্য হয়ে আছে।

চতুর্থ যে কন্যাটির কথা মনে পড়ছে, তার কথা বলব কি না ভাবছি। কারণ তোমরা বাল্যকাল থেকে মনে মনে যে ছক এঁকে রেখেছ, তার সঙ্গে এটা মিলবে না। কারণ মেয়েটি মুসলমানী, তার উপরে বাঈজি। হিন্দুদের ধারণা যা কিছু হিন্দু তাই ভালো, মুসলমানদের ধারণা যা কিছু মুসলিম তাই ভালো। এমনি করে তোমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা খোপ-খোপ করে ভাগ করে ফেলেছ তোমরা। আমার নিজেরও যে এই ধরনের কুসংস্কার নেই তা নয়। ডাক্তারি করতে করতে, আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ দোষ খানিকটা কমেছে অবশ্য, এটা বুঝতে পেরেছি যে, শিশির গায়ের লেবেল দেখেই সব সময় ওষুধের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না, যাচাই করে দেখতে হয়। এই সূত্রে একটা গল্প মনে পড়ল। সমর দে নামে আমার এক বন্ধু ছিল। তার বাড়িতে একদিন সন্ধেবেলা বেড়াতে গেছি। ছুরি দিয়ে নখ কাটতে কাটতে হঠাৎ একটা আঙুলে রক্তারক্তি হয়ে গেল। সামনেই একটা সেলফ্ ছিল। তাতে দেখলাম টিঞ্চার আইয়োডিন লেবেল দেওয়া একটা শিশি রয়েছে। উঠে গিয়ে সেটা নিয়ে ছিপি খুলতে যাচ্ছি, সমর বললে, "ওটা নিও না। ওতে আইয়োডিন নেই।" তার পাশেই আর একটা শিশি রয়েছে দেখলাম—গায়ে লেবেল ডেটল্। বললাম, "তাহলে এইটে নি। একটু জল আনাও।" সমর বললে, "ওটা ডেটল্ নয়।" পাশে আর একটা শিশির গায়ে লেখা দেখলাম টিনচার বেনজোইন। সমর বললে, "ওটাও বেনজোইন নয়।" অবাক হয়ে গেলাম। শেলফে আরও

নানারকম শিশি ছিল সারি সারি। কোনটাতে লেবেল—সিরাপ হিমোগ্লোবিন, কোনটায় জোয়ানের আরক, কোনটা চিরেতার জল। সমর বললে, 'লেবেলে যা লেখা দেখছ, তা একটা শিশিতেও নেই।" জিগ্যেস করলুম, "এতগুলো খালি শিশি রেখেছ কেন?" সমর বললে, "একটিও খালি নয়, প্রত্যেকটিতে ব্র্যান্ডি আছে। বাবা মা সর্বদাই এ ঘরে ঢোকেন কি না, প্রকাশ্যে কি করে রাখি বল। তা ছাড়া চন্ডেটাও আসে প্রায়। ও যদি ব্র্যান্ডির বোতলের সন্ধান পায় তাহলে কি আর রক্ষে আছে। তাই এই ফন্দি করেছি।"

সুতরাং লেবেল সব সময় বিশ্বাসযোগ্য নয়। মুসলমান বাঈজি শুনে আমারও নাকটা কুঁচকে গিয়েছিল প্রথমে। সে বহুদূর থেকে আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে এসেছে, অনেক টাকা ফি দিয়ে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করাবে—এসব জানা সত্ত্বেও নাকটা কুঁচকেই ছিল। গঙ্গার ধারে শ্মশানের কাছাকাছি প্রকাণ্ড একটা কম্পাউণ্ড-ওলা বাড়ি ছিল, সেইটে ভাড়া নিয়েছিল সে। বেশ জমজমাট ব্যাপার। আট দশটা চাকর, আট দশটা চাকরাণী, আয়া বাবুর্চি মোটরকার শফার।

প্রথম যেদিন তাকে দেখতে গেলুম সেদিন নজরে পড়ল একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে বসে আছে তার বিছানায়। বয়স বছর দশেক আন্দাজ হবে। আমি ঘরে ঢুকতেই বাঈজি ছেলেটিকে বললে, "ডাক্তার সাহেবকে প্রণাম কর—"

ছেলেটি এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম কবল। প্রত্যাশা করেছিলুম, মুসলমান যখন, আদাব করবে। তারপর মনে হল বাঈজিদের কোন জাত থাকে না বোধহয়, হিন্দুকে হিন্দুর মতো অভ্যর্থনা করে, মুসলমানকে মুসলমানদের মতো। কিন্তু আমার এ থিয়োরি খাটল না, আমি যখন উঠে আসছি তখন সে নিজে আমাকে মুসলমানী কায়দাতেই আদাব করল।

রোজই দেখতে যেতুম তাকে দুবেলা। অপারেশন করবার তেমন তাড়া-হুড়ো ছিল না।

পেটে ছুরি বসাবার আগে দেখছিলুম, এমনি চিকিৎসা করে ব্যথাটা যদি কমে যায়, তাহলে পরে ধীরে সুস্থে অপারেশন করে দেব।

একদিন আমার যেতে একটু রাত হয়েছে, দেখি সে গঙ্গার দিকের প্রশস্ত ছাতে বসে সেতারে কি একটা সুর আলাপ কবছে। মনে হল কানাড়া। আমাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হল, কারণ আমি তাকে শুয়ে থাকতে বলেছিলাম।

"আজ অনেক ভালো আছি। ব্যথা একেবারেই নেই। তাই সেতারটা নিয়ে বসেছি। আপনাব জন্যে চা আনতে বলি?"

সাধারণতঃ রুগীর বাড়িতে আমি খাই না, কিন্তু সেদিন আর আপত্তি করলাম না, অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম।

চা-পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর সে আমাকে বললে, "ডাক্তারবাবু, এতদিন তো আপনাকে কেবল রোগের কথাই বলেছি, আজ একটা অন্য কথা বলতে চাই। যদি আপনি এ বিষয়েও আমাকে একটু সাহায্য করেন, তাহলে বড়ই উপকার হয় আমার। শুনবেন কথাটা? এই সময়েই বলা ভালো, কারণ ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে—"

"কি বলুন—"

"আমি ছেলেটার পৈতে দিতে চাই। এখানে কি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ?"

"পৈতে? আমার ধারণা ছিল আপনি মুসলমান।"

"আমি মুসলমান। কিন্তু ছেলেটি ব্রাহ্মণের ছেলে। শুধু ব্রাহ্মণ নয়—খুব উঁচুদরের ব্রাহ্মণের ছেলে—"

আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম শুধু। দৃষ্টির প্রশ্ন যখন রসনায় বাঙ্ময় হল, তখন সেটা ঠিক ভব্যতাসূচক হল না। কোন লেডির কাছে এরকম প্রশ্ন করা কায়দা-দস্তুর নয়।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "বাপের খবর পেলুম। কিন্তু মা-টি কে?"

"আমিই ওর মা।"

"তাহলে ও ছেলে কি আর ব্রাহ্মণ আছে?"

"জবালার গর্ভজাত পুত্রকে ঋষি গৌতম তো অব্রাহ্মণ বলেননি।"

তারপর একটু হেসে বললে, "আমি মুসলমান, কিন্তু আমি রামায়ণ মহাভারতের পুরাণ কিছু কিছু পড়েছি। পড়েছি বলেই জানি হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ বলতে কি বোঝায়। ওর বাবা খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, আমার ইচ্ছে ছেলেও খাঁটি ব্রাহ্মণ হোক। তাই প্রথমে ওর পৈতেটা দিতে চাই। আমি যেখানে থাকি সেখানে দেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ কোনও ভালো ব্রাহ্মণই আমার বাড়িতে এসে পৌরহিত্য করতে রাজি হননি। আমার এখানে আসার এ-ও একটা কারণ। ওর পৈতের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? ভালো ব্রাহ্মণ পুরোহিত চাই একটি। যজন-যাজন করেন এরকম ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে তো? সে রকম পেলেই যথেষ্ট। একটিমাত্র আদর্শ ব্রাহ্মণ দেখেছিলাম জীবনে—"

"কে তিনি—"

"ওই ছেলের বাবা।"

আমার মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে পড়েছিল, 'ব্রাহ্মণটি তোমার খপ্পরে পড়লেন কি করে,'—কিন্তু সামলে নিলুম।

ভদ্রভাষায় বললুম, "আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় কি করে হয়েছিল? বলতে যদি অবশ্য বাধা থাকে, শুনতে চাই না—"

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলল, "বলতে আর বাধা কি। তবে একটা ভয় শুধু হয়, পাছে তাঁকে ভুল বোঝেন। সেইজন্যে গোড়াতেই বলছি দোষটা সম্পূর্ণ আমার।"

তারপর একটু হেসে বললে, "রামায়ণ মহাভারত তো পড়েছেন, স্বর্গের অপ্সরীরা এসে বড় বড় মুনি-ঋষিদের তপোভঙ্গ করত। আমার কৃতিত্ব শুধু এইটুকু যে, আমি মর্ত্যের সামান্য মানবী হয়েও তাঁর মতো লোককে ভুলিয়ে রাখতে পেরেছিলাম কিছুদিনের জন্য—"

আমি হেসে বললুম, "আমার তো মনে হয় পোড়-খাওয়া সংসারী লোকদেরই ভোলানো শক্ত। মুনি-ঋষিজাতীয় লোকরা এত বেশি সরল আর এত বেশি ভাব-প্রবণ যে একটুতেই তাঁরা গলে যান।"

মেয়েটি বলল, "ঠিক বলেছেন, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির সঙ্গেই ওঁর উপমা দেওয়া চলে। আমি ওঁকে অবশ্য সন্দেশ দিয়ে ভোলাইনি, রূপ দিয়েই ভুলিয়েছিলাম। রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়াটা পাপ নয় নিশ্চয়, কারণ দেবতার কাছে আপনারা যে প্রার্থনা করেন তার প্রথমেই আছে রূপং দেহি—"

মেয়েটির কথাবার্তা শুনে ক্রমশই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল না যে আমি একজন মুসলমানী বাঈজির সঙ্গে আলাপ করছি। বরং মনে হচ্ছিল, যেন একজন শিক্ষিত বিদগ্ধ অধ্যাপকের কাছে বসে আছি। কথা কইতে কইতে একবার মনে হয়েছিল গ্রীস দেশের গল্পে যে স্যাফোর কথা পড়েছি সে কি এই রকম ছিল? মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলুম।

হঠাৎ কানে গেল মেয়েটি বলছে, "রূপ দেখে হয়েছিলেন বলে উনিও ক্ষুব্ধ হননি। রূপের মন্দিরে উনি সরল বিশ্বাসে দেবতাকেই সন্ধান করছিলেন, কিন্তু উনি যখন জানতে পারলেন আমি ওঁকে প্রতারণা করেছি, তখনই ফুরিয়ে গেল সব। সেই মুহূর্তে উনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন।"

"প্রতারণার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না ঠিক—"

"ওঁকে দেখে আমিই প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে একগলা জলে দাঁড়িয়ে উনি সূর্য-অর্ঘ দিচ্ছিলেন। সেই প্রথম ওঁকে দেখি। তারপর ওঁকে দেখবার জন্যে রোজই গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম। উনি চেয়ে থাকতেন সূর্যের দিকে আর আমি চেয়ে থাকতাম ওঁর দিকে। প্রায় দশ পনর দিন আমি ওঁর চোখেই পড়িনি। উনি যখন স্নান করে উঠে যেতেন, আমি ওঁর পিছু পিছু

যেতাম। তারপর একদিন হঠাৎ উনি আমাকে দেখতে পেলেন। তখন আমার কিছু রূপ ছিল। ক্রমশঃ এটাও উনি লক্ষ্য করলেন যে, আমি রোজ ঘাটে আসি, রোজ ওঁর পিছু পিছু যাই। একদিন উনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে, কেন ওঁর পিছু পিছু আসি। তখন আমি ওঁকে বলতে পারলাম না আমার সত্য পরিচয় কি। বানিয়ে মিথ্যে একটা গল্প বললাম। বললাম আমি অনাথিনী, গরীব ব্রাহ্মণের কুমারী মেয়ে। বিয়ে দেবার জন্যে বাবা-মা আমাকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা দুজনেই হঠাৎ মারা গেছেন। আমি এখন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আছি। আমার লেখাপড়া শেখবারও খুব ইচ্ছে। একজন আমাকে বলেছিল, আপনি যদি দয়া করেন, তাহলে আমার লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। সংস্কৃত শেখবার খুব ইচ্ছে আমার। তিনি চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে—।' গেলাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। বুঝতে দেরি হল না যে, আমাকে তাঁর—ভালো লেগেছে। একথা বুঝতে দেরি হয় না মেয়েদেব, বিশেষত আমাদের মতো মেয়েদের, যারা রূপ নিয়ে ব্যবসা করে। তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখলাম, তিনি একটি গলিতে ছোট্ট একটি বাড়ি নিয়ে একাই থাকেন। আমাকে বললেন এই আমার বাড়ি, তোমার দূর সম্পর্কের যে আত্মীয় আছেন বলছ, তাঁকে নিয়ে এখানে এস, তাঁর সঙ্গে কথা কইব। এক নকল পিসেমশাই খাড়া করা অসম্ভব হল না। কিছু অর্থের বিনিময়ে তিনি বানিয়ে যা বললেন, তা শুনে আমিই অবাক হয়ে গেলাম। ওঁর বাড়িতে আমি আশ্রয় পেলাম এবং ক্রমশঃ বাড়িব কর্ত্রীই হয়ে উঠলাম। পুরুষরা, বিশেষত প্রতিভাবান পুরুষরা, শিশুর মতো অসহায়। সেবা কবে মা যেমন শিশুর হৃদয় অধিকার করে, সেবা করে তেমনি বয়স্ক লোকেব হৃদয়ও অধিকাব কবা খুব সহজ। বস্তুত, ও-ই বোধহয় হৃদয় জয় করবার একমাত্র উপায়। কিছুদিন পরে তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি খুব মেধাবিনী, তোমাকে আমি পড়াব। কিন্তু তার আগে তোমাকে আমি ধর্ম-পত্নী-রূপে গ্রহণ করতে চাই। তা না হ'লে নানা রকম বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। তোমার পিসেমশাইকে বোলো, তিনি যেন এসে তোমাকে আমাব হাতে সম্প্রদান করেন শাস্ত্রবিধি অনুসারে। তোমার আপত্তি নেই তো?' আমার আপত্তি! আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। নকল পিসেমশাই আরও কিছু টাকা খেয়ে নকল বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। ওঁর পক্ষের পুরোহিত উনি নিজেই হলেন। বিয়ে হয়ে গেল। সংস্কৃত পড়তে শুরু করলাম ওঁর কাছে। মাস ছয়েক কাটল। তারপর একদিন সত্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ল ওঁর কাছে। আমাবই এক পুরাতন প্রণয়ী কথাটা ফাঁস করে দিল এসে। লোকটি অনেকদিন থেকেই আমাকে চাইছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। তারপর আমি যখন ওঁর গৃহিণী হয়ে পড়লাম, তখন আর রাস্তায় বেরুতাম না। খোঁজ নিয়ে অবশেষে সে একদিন হাজির হল এসে। কথাটা শুনে উনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, কথাটা সত্যি কি না। আমি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপব সত্যিই কথাটাই বললাম। তাঁব এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আর মিথ্যে কথা বলতে পারলাম না। আমার কথা শুনে তিনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তাবপব বেবিয়ে চলে গেলেন। আর ফিরলেন না। আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তার পরদিন আমিও কাশী ছেড়ে চলে গেলাম। অনেক জায়গায় খুঁজেছি তাঁকে। কিন্তু আর তাঁর নাগাল পাই নি। শুনেছিলাম পুষ্করতীর্থে গিয়ে তিনি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। পুষ্করেও গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু আমি যখন গেলাম, তখন তিনি চলে গেছেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথাটা নাকি সত্যি। খোঁজ নিতে ওরা বললে, 'একটি সাধু নিজের চারিদিকে আগুন জ্বেলে অনাহারে কি একটা কঠোর ব্রত করেছিলেন।' সাধুর চেহারার বর্ণনা থেকে মনে হল, উনিই সেই সাধু—"

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলল, "এখন ওঁর ছেলেকে ওঁর মতো করে মানুষ করাই আমার জীবনের ব্রত হয়েছে—"

"ছেলে কিছু জানে না?"

"না। সে জানে আমি তার মায়ের বন্ধু। মা-বাবা দুজনেই প্লেগে মারা গেছে, আত্মীয়স্বজনও

কেউ নেই, আমি ওকে মানুষ করছি। এও জানে যে ও ব্রাহ্মণের ছেলে, আর আমি মুসলমান।"

"আপনার সঙ্গে থাকতে আপত্তি করেনি কখনও?"

"ও তো আমার সঙ্গে থাকে না। ও কাশীতে থাকে আলাদা বাসায়। ওর জন্যে হিন্দু চাকর-চাকরাণী, রাঁধুনী সব রেখে দিয়েছি আমি। আমার নিজের দুধও খাওয়াইনি ওকে। ব্রাহ্মণের মেয়ে ওয়েট নার্স ওকে মানুষ করেছে। ওকে আমি আমার ছোঁয়াচ থেকে যতদূর সম্ভব বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। এখন ওর ছুটি, আর আমাব অসুখের খবর পেয়েছে, তাই এসেছে। ওর চাকর-রাঁধুনীও সব সঙ্গে এসেছে। এই যে এতগুলো চাকর দেখছেন, এর অর্ধেক ওর বাসার। আমি ওঁকে একদিনও খাওয়াইনি, খাওয়াতে সাহস হয়নি—"

হঠাৎ তার গলার স্বরটা একটু কেঁপে গেল। আমি চুপ করেই ছিলুম, প্রশ্ন করে গল্পের রসভঙ্গ করিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারলুম না।

"আপনার এত খরচ চলে কি করে? আপনি কি—"

"আমার জাত ব্যবসা আমি বন্ধ করিনি। তিন চারটে বড় বড় স্টেটের বাঁধা গাইয়ে আমি। বাঁধা মাইনে আছে। তাছাড়া উপরি রোজগারও হয়। আপনাদের লাইনে যেমন, আমাদের লাইনেও তেমনি, একবার নাম হয়ে গেলে টাকার অভাব হয় না।"

"কিন্তু—"

আমাকে কথা শেষ করতে দিলে না সে। বললে, "আপনি যা জিগ্যেস করবেন তা বুঝতে পেরেছি। আপনার মনে হচ্ছে, যার জীবনে অত বড় একটা লোকের আবির্ভাব ঘটেছিল, সে আবার কি করে এই জঘন্য ব্যবসা করতে পারে। যদি নিষ্ঠাবতী বিধবার মতো থাকতুম, তাহলে ওঁর ছেলেকে ওঁর মতো করে আমার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে মানুষ কবতে পারতুম না। এর জন্যে টাকা চাই। দ্বিতীয় কথা, মনের দিক থেকে আমার আর পতন হবার ভয় নেই। স্পর্শমণিব স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে গেছে, তাতে আর মরচে লাগবে না।

সেদিন রাত্রে দুজনেই আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। মাথার উপর অসংখ্য তাবা জ্বলছিল, রাত্রির অন্ধকার মুখরিত হয়ে উঠছিল ঝিল্লী রবে। মনে হচ্ছিল, অব্যক্ত যেন ব্যক্তের সীমায় ধরা দেব-দেব করছে।

তার ছেলের পৈতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম। মহাসমারোহে হয়েছিল। সীতাবাম স্মৃতি তীর্থ, যিনি পাঁজি দেখে ট্রেনে চড়েন, হাঁচি টিকটিকি কাক-খঞ্জন দেখে দিনটা কেমন যাবে ঠিক কবেন, বেরুবার মুখে রজক দেখলে থেমে যান, সেই ভদ্রলোক এক বাঈজীর ছেলের উপনয়নে পৌরোহিত্য করতে ইতস্ততঃ করলেন না, যেই শুনলেন দক্ষিণার পরিমাণ হাজার টাকার কম হবে না। শহরসুদ্ধ লোক খেয়েছিল। ধনী দরিদ্র আপামর ভদ্র সবাই।

আমি তার অ্যাপেন্‌ডিক্‌সও কেটে দিয়েছিলাম। বেশ মোটা ফি দিয়েছিল। তারপর যাবার আগে সে আমাকে আরও পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে কি বললে জান?

"ছাত থেকে দাঁড়িয়ে রোজই দেখি শ্মশানে মড়া নিয়ে যেতে বড় কষ্ট হয় সকলের। রাস্তাটা খুব খারাপ। বর্ষাকালে নাকি আরও খারাপ হয়ে যায়। ওটা পাকা করিয়ে দিন। যদি আরও টাকা লাগে জানালেই আমি পাঠিয়ে দেব।"

তার নাম ছিল বেগম রৌশন আরা। তার রূপের বর্ণনা আমি করিনি, করবও না। এইটুকু শুধু বলব, ওই মেয়েটি আমার ডাক্তারি জীবনের পরম অভিজ্ঞতা একটি। এ কথাও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, ভাগ্যে ডাক্তার হয়েছিলুম, তাই তো ওর পরিচয় পেয়ে ধন্য হয়েছি।

আমার একটা কথা কি মনে হয় জান? মেয়েদের আমরা যুগে যুগে নানা রকম করে দাবাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি, ওদের কাছে হেরে গেছি। আমাদের অত্যাচারের হিমালয় ঠেলে যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছে অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তীরা, দেখা দিয়েছে সরমা-রৌশন আরারা, শুধু দেখা দেয়নি,

তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মুখে যাই বলি, মনে মনে স্বীকার করতে হয়েছে, ওই অবস্থায় পড়লে আমরা ঠিক ওরকমটি করতে পারতুম না। সেইজন্যেই শাস্ত্রে ওদের শক্তি বলে পুজো করেছি। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা ওদের এই বিশেষ শক্তিটাকে কাজে লাগাতে পারলুম না। হয় সারাজীবন রাঁধুনী-চাকরানী করে রাখলুম সতীত্বের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, না হয় পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করিয়ে শ্রমিক করবার চেষ্টা করলুম সংসারের সুবিধে হবে বলে। আমাদের নিজেদের সংসারের কিসে সুবিধে হবে এই নিয়েই আমরা ব্যস্ত, ওদের বিশেষ শক্তিকে ফুটিয়ে তোলবার কোনও চেষ্টা আমাদের নেই, ওদের যে আর কোন শক্তি আছে এ দেখবার চোখও অনেকের নেই, বুদ্ধিও নেই। অর্থনৈতিক সমস্যা? হ্যাঁ জানি, ওইটেই তো তোমাদের বাঁধা বুলি। ওই সমস্যা মেটাবার জন্যে তোমরা বউকে রাঁধুনি করেছ, কেরানী করেছ, ওই সমস্যার সমাধান করবার জন্যে কাপড় ছেড়ে হাফপ্যান্ট পরেছ, মিছে কথা বলেছ, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস করে প্রতিবাদ করনি, এত করেও তবু তোমাদের আর্থিক সমস্যার আর সমাধান হল না। খাবার সময় সেই শাকচচ্চড়ি আর ভাত, আর যেখানে সেখানে এর-ওর-তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নাকিকান্না, এ আর তোমাদের ঘুচল না। ঘুচবেও না। মানুষকে বাসন কাপড় চেয়ার টেবিলের মতো ব্যবহার করলে দুর্দশা বেড়েই চলে, কখনও কমে না। কিন্তু ওই রৌশন আরা-সরমারা তোমাদের নিয়মকানুনের মুখে লাথি মেরে নিজেদের পথে নিজেদের মতো বেঁচে কিম্বা মরে প্রমাণ করে দিয়েছে যে পৃথিবীতে আইনের চেয়ে মানুষ বড়। সেই বৃহত্বে পৌঁছবার জন্যে আইন ভাঙাটাই মহত্ব, মনুষ্যত্ব।

আমার ভয় হচ্ছে, তুমি বোধহয় এতক্ষণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ। মধুর রসের আশায় সম্ভবত পঞ্চকন্যার গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলে (পর্ণোগ্রাফিই যে তোমাদের প্রিয় জিনিস, তা পপুলার কতকগুলো বই আর ফিল্‌ম থেকেই বোঝা যায়), কিন্তু যে বস্তু আমি তোমাকে গিলিয়ে যাচ্ছি, তা শুগার-কোটেড কুইনিনের বড়ি, মাঝে মাঝে চিনির পলেস্তারাটাও হয়তো উঠে গেছে কোথাও কোথাও।

কিন্তু এখন তো আমার পক্ষে থামা শক্ত। চারটে বড়িই যখন গিলেছ, তখন পঞ্চমটাও দুর্গা বলে গিলে ফেল। হয়তো আখেরে উপকারই হবে।

তখন আমি বিহারের একটা বড় শহরে আছি। কার পরামর্শে এখন ঠিক মনে নেই, একটা পুরোনো মোটরকার কিনে অশেষ দুর্গতি ভোগ করছি। মোটরটা মোটর না হয়ে যদি মানুষ হতো তাহলে ওর খামখেয়ালী ব্যবহারে হয়তো আনন্দ পেতাম। যখন খুশী থামতো, যখন খুশী চলতো। হর্ন যখন বাজবে না, তখন কিছুতেই বাজবে না, আবার বাজতে আরম্ভ করলে থামানো শক্ত। এই মোটরে চড়ে একদিন দুপুরবেলা এক পতিতা পল্লীর ভিতর দিয়ে আসছি, হঠাৎ মোটরটা থেমে গেল। দু'চার জন লোক ডেকে ঠেলাবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ কানে গেল—"ওগো মা গো, কোথায় তুমি গো, আমায় বাঁচাও গো, এরা যে আমায় মেরে ফেলছে।" বিহারের এই পাড়ায় এরকম বাংলা কান্না শুনে একটু অবাক হয়ে গেলুম। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলুম—একটা ঘরের সামনে একটা ষণ্ডা কাবুলী আর একটা খাণ্ডারনী মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটা হিন্দী ভাষায় অশ্রাব্য গালাগালি দিচ্ছে, তর্জন গর্জন করছে আর শাসাচ্ছে যে, কপাট না খুললে কপাট ভেঙে তারা ঘরে ঢুকবে। কপাটটা ভিতর থেকে বন্ধ।

আমার মাঝে মাঝে মতিচ্ছন্ন হয়। ঠেলাঠেলি করে মোটরটা স্টার্ট নিয়েছিল, আমি সটান চলে গেলেই পারতুম। কিন্তু যেতে পারলুম না। ওই বন্ধ দরজার ওপারে বাংলা ভাষায় এমন বুকফাটা হাহাকার কে করছে, তা জানবার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল। একটা পুলিশ কনেস্টবল, একটু দূরে নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি তখন সেখানে সিভিল সার্জন। সুতরাং আমাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। তার দিকে চাইতেই সে পায়ে পা ঠুকে মিলিটারি কায়দায় সেলাম করলে। তাকে ডাকলাম। বললাম, "দেখ তো এখানে হাল্লা কিসের, ঘরের ভিতর অমন করে কাঁদছে কে।"

আমি গিয়ে মোটরে বসলাম। মিনিট দশেক পরে সে এসে বললে, "এই জবরদস্ত আওরৎটি হচ্ছে বাড়ি-উলী। আর ওই আগা সাহেব হচ্ছে ওর খদ্দের। বাড়ি-উলী আগা সাহেবের কাছ থেকে অগ্রিম একশ টাকা নিয়েছে। এক 'বাঙালীন্' খুবসুবৎ লেড়কি বাড়ি-উলীর কাছে এসেছে দিন কয়েক আগে। আগা সাহেবের 'খাইশ' (ইচ্ছে) হয়েছে ওই মেয়েটিকে রাখেন। কিন্তু 'বাঙালীন্' লেড়কিটি কিছুতে রাজী হচ্ছে না। এখন হুজুর আমাকে যা করতে বলেন তাই করব।" বললাম, "তুমি ওই আগা সাহেবকে ভাগিয়ে দাও। বল যে তার টাকা মার যাবে না, আমি তার জিম্মাদারি রইলাম। আর বাড়ি-উলীকে ডেকে নিয়ে এস আমার কাছে।"

আগা সাহেব চলে গেল। তার সুখ-স্বপ্নের মাঝখানে একটা বুড়ো সিভিল সার্জন ভাঙা ঝরঝরে মোটবে চড়ে এসে হাজিব হবে এটা সে ভাবতেই পারেনি। কিন্তু ওরা প্র্যাক্‌টিক্যাল লোক, খামাখা বড়লোক বা 'অফ্‌সর'দের সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় না। সে আমাকে একটা সেলাম করে চলে গেল এবং একটু দূবে গিয়ে আব একটা খোলার ঘরে ঢুকে পড়ল। বাড়ি-উলীটি কনেস্টবলের সঙ্গে এসে যখন হাজির হল, তখন তার মুখের চেহারা ভাবভঙ্গী সব বদলে গেছে। একেবারে অন্য লোক যেন। চোখমুখের সে কী সম্ভ্রমাত্মক ভাব, পানেব-ছোপ-লাগা ঠোঁটের ফাঁকে মিসি মাখানো দাঁতে সে কি হাসির ঝলক। খদ্দের হিসেবে আগা সাহেবের চেয়ে যে আমি ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়, একথা সে কিছু না বলেই যেন আমাকে বুঝিয়ে দিলে। বললে, "হুজুর, ফরমাইয়ে, অব্ ক্যা করু" অর্থাৎ ফরমাস করুন এবার কি করব। বললাম, "ওই মেয়েটিকে কপাট খুলতে বল। বল, এখানকার বাঙালী ডাক্তার সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা কবতে চায়, আগা সাহেব চলে গেছে।" বাড়ি-উলী গিয়ে কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলা সত্ত্বেও কপাট খুলল না খানিকক্ষণ। মেয়েটার সম্ভবত সন্দেহ হল যে, একটা মিথ্যে ছুতো করে বাড়ি-উলী কপাট খোলাচ্ছে, কপাট খুললেই ওই কাবুলীওলা ঢুকে পড়বে। তখন আমি নিজেই নামলুম। বন্ধ দ্বাবে আঘাত করে চেঁচিয়ে বললুম, "কপাট খোল। তোমার কোন ভয় নেই। কাবুলীওলা চলে গেছে।"

ভাষার যাদু যে কি অদ্ভুত, ভাষা যে আমাদের কি নিবিড় বন্ধনে বেঁধে রাখে, তা বিদেশে গেলে বোঝা যায়। কারও মুখে বাংলা ভাষা শুনলেই মনে হয়, সে যেন আমার আপনার লোক। আমার কথা শুনে ওই মেয়েটিরও বোধহয় তাই মনে হল। বন্ধ কপাট খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এমনটা যে দেখব, তা কল্পনা করিনি। মনে হল অজন্তার ছবি এমন জীবন্ত হয়ে কি করে অবতীর্ণ হল এখানে! ঠিক সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ, সেই চাহনি,— আমি ঘরে ঢুকতেই মেয়েটি আমার পা দুটো ধরে বললে, "আপনি আমার বাবা, আমাকে বাঁচান আপনি। এরা আমাকে মেরে ফেলছে। মাত্র সাত দিন এখানে এসেছি—চল্লিশ পঞ্চাশটা নানা জাতের নানা বয়সের লোক এনে ঘরে ঢুকিয়েছে বাড়ি-উলী। আজ একটা কাবলেকে এনেছে আমাকে রক্ষা করুন আপনি, আমি আর পারছি না।"

আমার পা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। বেশ একটু বেকায়দায় পড়ে গেলুম। ঘড়ি দেখলুম দেড়টা বেজেছে। মনে পড়ল, আমার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী আমার অপেক্ষায় অনাহারে বসে আছেন এখনও, আর বেশি দেরি করলে অনর্থকাণ্ড হবার সম্ভাবনা। জঠরাগ্নির উত্তাপের সঙ্গে সতীত্বের তেজ মিলে যে অগ্নিকাণ্ড হবে, তা নেবাবার ক্ষমতা কোন দমকলেরই নেই। সুতরাং শর্টকাট্ ব্যবস্থা করলুম একটা। সেদিন অনেকগুলো 'কল' পেয়েছিলুম। পকেটে কিছু টাকা ছিল। মেয়েটিকে পঁচিশ টাকা আব বাড়ি-উলীকে পঁচিশ টাকা দিয়ে বললাম, 'এখন তোমরা এই টাকা রাখ। আমি সন্ধের পর আবার আসব। এসে সব শুনে একটা ব্যবস্থা করে দেবো। কিন্তু এর ঘরে এখন আর কোনও লোক যেন না ঢোকে।"

সেই কনেস্টবলকে ডেকে বললুম, "তুমি দেখো, এর উপর কেউ যেন বলাৎকার না করে। আমি এস-পি-কেও খবর পাঠাচ্ছি।"

তখন এস-পি ছিলেন একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি। মনুষ্যরূপী বাঘ একটি। যাকে ছুঁতেন তাকে শুধু আঠারো ঘা নয় অনেক বেশি ঘা দিতেন। এস-পি'র নাম শুনে কনেস্টবল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। পায়ে পা ঠুকে আমাকে আর একবার সেলাম করে বলল, "আমি ওর দরোওয়াজায় খাড়া পাহারা থাকব। এক তিতলিকো ভী ঘুসনে নেহি দেউঙ্গা।" তিত্‌লি মানে আমি তখন বুঝেছিলাম পিঁপড়ে, কিন্তু পরে জেনেছি প্রজাপতি। সেদিন ওই ভোজপুরী কনেস্টবল আর আফগানী আগা দুজনেই রস-বোধের পবিচয় দিযেছিল।

সন্ধের পর খুব জরুরী 'কল' না থাকলে আমি কোথাও বেরুতাম না। সাধারণত সন্ধের পর বড় বড় অফিসাররা ক্লাবে যেতেন। সেকালে সাহেবদেরই প্রাধ্যন্য ছিল। সাহেবরাই ডিস্ট্রিক্ট্ অফিসারের পদ অলঙ্কৃত করতেন। আমাদের মতো 'নেটিভ্' থাকতো দু'-একজন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ক্লাবেও যেতো সাহেবদের খোশামোদ করবার জন্যে, আবার কেউ কেউ যেতো মদ খাবার লোভে। বাড়িতে বসে মদ খাবার তাগদ অনেকেরই ছিল না সেকালে। একালেও নেই। এই জন্যেই হোটেল আর ক্লাবগুলো টিকে আছে সম্ভবত। আমি ক্লাবে যেতাম না। মাঝে মাঝে দু'এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি খাবার ইচ্ছে হলে ঘরে বসেই খেতুম। সন্ধ্যাবেলা আমার একমাত্র কাজ ছিল স্নান করে ভাল এক কাপ চা খেয়ে একটি ইজি-চেযারে গা এলিয়ে দিয়ে বই পড়া। সেদিন তা না করে গেলুম ওই মেয়েটির কাছে। ফিবে এসেই এস-পি'কে ফোন করেছিলাম, ফোনেই সব কথা খুলে বলেছিলাম তাকে। সে আমাকে বললে, "আমি সেখানে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সেখানে গিয়ে দেখলুম, শুধু কড়া পাহারারই বন্দোবস্ত করেনি, বাড়ি-উলীকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। কপাটে কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করার পর সে কপাট খুলে দিলে। অগাধে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল।

"কি খবর, ঘুমুচ্ছিলে? বেশ। কেউ বিরক্ত করেনি তো।"

তাব মুখেই শুনলুম বাড়ী-উলীকে থানার দারোগা এসে ধরে নিয়ে গেছে।

"এইবার তোমার ব্যাপারটা কি! বল্‌তো শুনি—"

মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে যে কাহিনীটি বললে তা যেমন করুণ, তেমনি নিষ্ঠুর।

হুগলী জেলার এক গ্রামে ওর বাড়ী, জাতে কৈবর্ত। বিধবা মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। গ্রামে মেয়েদের একটা স্কুল ছিল, সেই স্কুলে সে পড়তে যেত। অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য মেয়েও পড়ত সে স্কুলে। পড়াশুনা ওর তত ভালো লাগত না। ওর কেবলি মনে হত কবে আমার বিয়ে হবে। কবে আমি মায়ের দুঃখ ঘোচাতে পারব। ছেলে হয়নি বলে তার মায়ের মনে একটা দুঃখ ছিল। প্রায়ই সে এ কথা বলতো। বলতো, 'যদি পেটের একটা ছেলে থাকত তা হলে তার বিয়ে দিতুম, নাতি নাতনিতে ঘর ভরে যেত। আর মেয়ে তো পরের জন্যেই মানুষ করা। কাকের বাসায় কোকিলের ছানার মতো। বড় হলেই পর হয়ে যাবে। ওর ছেলে-মেয়ে ওর কাছে থাকবে, সে কি আমার ঘর আলো করতে আসবে।' সে তখন তার মাকে আশ্বাস দিয়েছিল, 'আমার প্রথম সন্তান, তা সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, তোমাকেই দেবো আমি। ঠিক দেবো, দেখো—'

তার সহপাঠিনীদের একে একে বিয়ে হয়ে যেতে লাগল। কি চমৎকার বর তাদের। কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ মাস্টার। আর কি সব চেহারা! দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

তার কিন্তু আর বিয়ে হয় না। ভাল ছেলেই কোথাও পাওয়া গেল না। একটি ভালো ছেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিলে কিন্তু তারা এত টাকা চেয়ে বসল যে সাধ্যে কুলাল না তার মায়ের। বয়স বাড়তে লাগল। চৌদ্দ, পনের, ষোল, তবু তার বিয়ে হল না। স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিল সে। রাস্তায় বেরুতে লজ্জা করতো। পাড়ার বখাটে ছেলেগুলো জ্বালাতন করতো রাস্তায় বেরুলে। ছড়া কাট্‌ত, শিস দিত। বাড়ীতেই দিনরাত থাকতে লাগল সে। বাড়ীতে বসে ওই একটি চিন্তাই সে দিনরাত

করতো, কবে তার বিয়ে হবে, কবে তার নিজের ঘর হবে, ছেলে হবে, কবে সে মাকে তার একটি ছেলে দিতে পারবে। এইভাবেই দিন কাটছিল, এমন সময় সর্বনাশ হয়ে গেল। তাদের ঘরে সিঁদ কেটে চোরে নিয়ে গেল তাদের যথাসর্বস্ব। তার মায়ের যা দু'-একখানা গয়না ছিল, ভালো কাপড় ছিল, যার উপর নির্ভর করে মা ভেবেছিল তার বিয়ে দেবে, তা সমস্ত চুরি হয়ে গেল। বিয়ের আশা নির্মূল হয়ে গেল একেবারে। বিনা পয়সায় এদেশে মেয়ের বিয়ে হয় কি কখনও? পাশের গাঁয়ে থানা, সেখান থেকে দারোগাবাবু এলেন চুরির তদন্ত করতে। আমাকেই বেশি করে জেরা করতে লাগলেন। আমি কোথায় শুয়েছিলাম, রাত্রে কোন শব্দ শুনেছিলাম কিনা, বাড়ীর আশেপাশে কোন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি কি না, আমাদের বাড়ীতে কারা আসে—এইসব। তারপর থেকে দারোগাবাবু রোজই আসতে লাগলেন, আর আমাকে ডেকে সামনে বসিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। দিনকতক পরে তাঁর আসল মতলবটি বোঝা গেল। তিনি মাকে একদিন বললেন, আমি আপনার স্বজাতি। চুরির কোন কিনারা করতে পারলুম না, তবে আপনার একটি উপকার আমি করতে পারি। আপনার মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি, আমারও বিয়ে হয়নি, আপনার মেয়েটিকে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, ওকে আমি বিয়ে করতে পারি। আপত্তি? মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। শুধু মা নয়, আমিও। কি সুন্দর সুপুরুষ, তার উপর দারোগা। দারোগাবাবু কিন্তু বললেন যে এখনই তিনি বিয়ে করতে পারবেন না, কারণ তাঁর এক কাকা মারা গেছেন, কালাশৌচ চলছে, সেটা শেষ হয়ে গেলে তবে বিযে হবে। খুবই সঙ্গত কথা। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে রইল। দারোগাবাবু প্রায়ই আসতে লাগলেন এবং আমার সঙ্গে এমন ব্যবহাব করতে লাগলেন যেন আমি তাঁর বউ হয়ে গেছি। রোজই জিনিষ-পত্র পাঠিয়ে দিতেন, মাছ, দই, দুধ, তরিতরকারি।

মাকে টাকাও দিতেন মাঝে মাঝে। আমরা যা কখনও কল্পনাও কবিনি তাই ঘটতে লাগল। এইভাবেই চলছিল, কিন্তু মাসখানেক পরে দারোগাবাবু আরো বেশি দাবী করলেন আমার উপর। একদিন একটা পালকি পাঠিয়ে দিলেন। একটা চাকর চিঠিও নিয়ে সঙ্গে এসেছিল। মায়ের নামে চিঠি। মা তো পড়তে জানে না, আমিই পড়লাম। লিখছেন, 'আমি কদিন থেকে জ্বরে পড়ে আছি। ওকে যদি পাঠিয়ে দেন ভালো হয়। পালকি পাঠালাম।' মা একটু বিপদে পড়ে গেলেন। যাওয়াটা ভালো দেখায় না। অথচ এতবড় একটা হিতৈষী বন্ধুর এ অনুরোধ অগ্রাহ্য কবাও শক্ত, বিশেষতঃ সে যখন হবু জামাই। আমাদের সৌভাগ্যে পাড়ার লোকেরা হিংসেতে ফেটে পড়ছিল। সুতরাং তাদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করতে যাওয়া বৃথা মনে হল।

মা খানিকক্ষণ ভাবলেন, শেষে বললেন, "চল, আমিও তোর সঙ্গে যাই। যদিও সে আমাকে যেতে বলেনি, কিন্তু তোকে একা পাঠাই কি করে?" আমার সঙ্গে মাও গেলেন। আমরা গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাঁর একটু জ্বর হয়েছে। কিন্তু এমন বাড়াবাড়ি কিছু নয়। দারোগাবাবু মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি কেন এলেন কষ্ট করে? তা এসেছেন বেশ করেছেন, থাকুন।"

মা আর আমি দুজনেই তাঁর বাসায় থাকতে লাগলুম। আমার কিন্তু বড় অস্বস্তি লাগতো, কারণ আমাকে আড়ালে পেলেই দারোগাবাবু এমন সব অসভ্য ইঙ্গিত করতেন যে আমার লজ্জাও করতো, খারাপও লাগতো। কিন্তু কি করব, আমরা সঙীন ফাঁদে পা দিয়েছিলুম। পালাবার উপায় ছিল না। শেষকালে দারোগাবাবু মাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমি যদি তাঁর কাছে স্ত্রীর মতো থাকি তা হলেই বা ক্ষতি কি। কিছুদিন পরে শাস্ত্রমতে বিয়ে তো হবেই। মা মত দিয়ে দিলেন এতে। না দিয়ে উপায় ছিল না। গরীব পাড়াগেঁয়ে মূর্খ বিধবা, দারোগার বিষদৃষ্টিতে পড়বে কোন্ সাহসে। একদিন মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কিছু টাকাও নাকি দিয়েছিলেন। টাকা বড় অদ্ভুত জিনিষ ডাক্তারবাবু। টাকার লোভে মাও নিজের সন্তানকে বিক্রি করে দেয়। মা টাকা পেয়ে চলে গেলেন।

আমি বললুম, 'টাকার লোভে তুমিও তো এই নরকে এসেছ।"

"না, আমি টাকার লোভে আসিনি। আমি ঘর বাঁধার আশায় এসেছিলাম। মাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, তাঁর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আমাদের সমাজই এমনি, সমাজই আমাকে তুলে দিলে ওই দারোগাটার হাতে। আমরা তো বেশি কিছু চাইনি। ছোট একটা সংসার পাততে চেয়েছিলাম, ছোট একটু বাসা, আর কিছু নয়—"

হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটা লাইন মনে পড়ে গেল—'ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা, করেছিনু আশা।' কিন্তু সে কথা আর তাকে বললুম না। যদিও বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, যা তুমি চেয়েছিলে তা দুর্লভ এদেশে। রবীন্দ্রনাথের মতো লোক যা জোগাড় করতে পারেননি, তা তুমি পারবে কি করে। ছোট বাসা ছোট নয়, অনেক বড়। শান্তিপূর্ণ ছোট একটু বাসা জোগাড় করা অসম্ভব এদেশে। তার চেয়ে তাজমহল হোটেলে ফ্ল্যাট ভাড়া করা সহজ।

"তারপর?"

"তারপর যা ঘটবার তাই ঘটল। কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলুম পেটে ছেলে এসেছে। তখনও বিয়ে হয়নি।"

"শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল কি?"

"না, পরে শুনলুম, উনি বিবাহিত। জাতেও কৈবর্ত নন, উত্তর-রাঢী কায়স্থ। তিন চারটি ছেলেমেয়ে আছে ওঁর।"

"কি করে খবরটা পেলে?"

"থানার এক হাবিলদার ছিলেন রমজান আলী। দারোগাসাহেব একদিন টুরে বেরিয়েছিলেন। সেদিন তিনি আমাকে ডেকে সব কথা খুলে বললেন, রমজান আলী অবশ্য নিঃস্বার্থভাবে আমার উপকার করবার জন্যে একাজ করেননি। তাঁরও লোভ ছিল আমার উপর। তিনি দারোগাবাবুর স্ত্রীর ঠিকানাও এনে দিলেন আমাকে। বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাঁকে চিঠি লিখলেই সব জানতে পারবেন। তিনি অসুস্থ, ধরমপুর স্যানাটোরিয়মে থাকেন।' এ শুনে আমার মনের যে কি অবস্থা হল তা বুঝতেই পারছেন। স্যানাটোরিয়মের ঠিকানায় চিঠি লিখলাম একটা। সব কথা খুলেই লিখলাম। রমজান আলী ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পোষ্ট করে দিয়ে এলেন।

চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমি দারোগাবাবুকে আর কিছু বললাম না। ভাবলাম, ঠিক খবর আগে জানা দরকার। আমার মনে ক্ষীণ একটা আশা ছিল খবরটা মিথ্যে হবে। কিন্তু হল না, দারোগাবাবুর স্ত্রী তাঁর তিনটি মেয়ে আর একটি ছেলে নিয়ে সশরীরে এসে পড়লেন একদিন। এসেই তিনি কি করলেন জানেন? আমাকে ঝাঁটাপেটা করে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। পেটে এমন লাথি মারলেন যে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

ওই রমজান আলীই শেষে আশ্রয় দিলে আমাকে, হাসপাতালে নিয়ে গেল, অনেক সেবা শুশ্রূষাও করলে। পেটের ছেলেটা কিন্তু বাঁচল না। মাও খবর পেয়ে হাসপাতালে এল। রোজ আসত। এসে কাঁদত খালি। কোন কথা বলত না, খালি কাঁদত। রমজান আলী আমার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছিল। শেষকালে সে এক কাণ্ড করে বসল। মাকে হাত করে সে এক মোকর্দ্দমা রুজু করিয়ে দিলে দারোগার নামে। উপরওলার কাছে এক দরখাস্ত করে দিলে মায়ের নাম দিয়ে। উপর থেকে সায়েব এলেন, আমার সাক্ষী নিলেন, মায়ের সাক্ষী নিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর সাক্ষী নিলেন। ফলে দারোগাবাবুর শুধু চাকরীই গেল না, দু'বছর জেল হয়ে গেল। দারোগাবাবু জেলে যাবার পর আমি পড়লাম রমজান আলীর পাল্লায়। রমজান আলী মাকে বললেন, "দেখ, তোমার মেয়ের চিকিৎসার জন্যে, মোকর্দ্দমার জন্যে আমার দুহাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। আমার যা কিছু পুঁজি ছিল সব নিঃশেষ করেছি ওর জন্যে। তোমার মেয়েটি আমাকে দাও। ও এমনিই আমার কাছে থাকতে পারে, কিম্বা যদি বল ওকে বিয়েও করতে পারি। অবশ্য আমার আরও দুটো বিবি আছে।

কিন্তু আমাদের সমাজে বহু বিবাহে দোষ নেই। আর এতে যদি তোমরা রাজি না থাক, তোমার মেয়ের জন্যে যে টাকা আমি খরচ করেছি সেটা আমাকে ফেরত দাও।"

মা আমাকে আড়ালে ডেকে জিগ্যেস করলেন, "কি করবি?"

বললাম, "আমি ওর কাছে থাকব না, বিয়েও করব না, চল বাড়ী ফিরে যাই।"

মা বলেন, "কিন্তু সেখানে কি আর মুখ দেখাবার উপায় আছে? ঢিঢিক্কার পড়ে গেছে চতুর্দিকে।"

"তাহলে চল অন্য কোথাও যাই। আমি তোমাকে ভিক্ষে করে খাওয়াব। কিন্তু মুসলমান হতে পারব না—"

"মুসলমান হলেই বা ক্ষতি কি। হিন্দুরাই কি তোমাকে মাথায় করে রেখেছে? না রাখবে? দুপায়ে তো খালি থ্যাঁৎলাচ্ছে। হিন্দু থেকেই তোমার বিয়ের চেষ্টা করলুম এতদিন, কিন্তু পেলুম কি একটাও ভালো ছেলে? তোমাকে শেষকালে যে নষ্ট করলে সে-ও হিন্দু। ঝাঁটা মারি এমন হিন্দু সমাজের মুখে—"

আমি কিন্তু তবু রাজি হ'তে পারলাম না। মা শেষে রেগে-মেগে চলে গেল। রমজান আলীকে বলে গেল বটে যে আমি তোমার টাকার জোগাড় করতে যাচ্ছি—কিন্তু সেটা স্তোকবাক্য।

রমজান আলী আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আমি কিন্তু কিছুতেই রাজী হলাম না। মাকে যদিও বলেছিলাম যে ও মুসলমান বলে আমার আপত্তি কিন্তু আমার আপত্তি ছিল অন্য জায়গায়। আমি এটা ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম যে-ঘর আমি বাঁধতে চাইছি, যা আমার জীবনের স্বপ্ন, তা ওকে বিয়ে করলে আমি পাব না। রমজান আলী বললে, "আমাকে বিয়ে যদি না কর আমার টাকা ফেরত দাও। তোমার মা তো পালিয়েছে, আর এও জানি তার কাছে একটি কানা-কড়িও নেই—"

বললুম, "আমি রোজগার করে তোমার টাকা শোধ করে দেব। তুমি কোথাও আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দাও। তুমি যখন আমার জন্যে এতই করেছ—এটাও করে দাও দয়া করে।"

সে বললে, "এখানে চাকরি হবে না তোমার। এখানে কে তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে! আমার সঙ্গে বিদেশে যদি যাও সেখানে কিছু ব্যবস্থা হতে পারে।"

আমি রাজি হয়ে গেলাম এতে। দিন সাতেক পরে রমজান আলী বললে, "আমি ছুটি নিয়েছি। চল, তোমাকে পশ্চিমের একটা শহরে নিয়ে যাই। সেখানে আমার এক চেনা-শোনা আত্মীয়া আছে, তার কাছে তোমাকে রেখে দেব, সে তোমার রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবে।"

সাতদিন আগে রমজান আলী আমাকে এই বাড়ি-উলীর হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেছে। তারপর থেকে আমার উপর যা নির্যাতন হচ্ছে তা তো আপনি সব শুনেছেন—

জিগ্যেস করলুম, "রমজান আলীও কি তোমার উপর অত্যাচার করেছিল?"

"করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। আমি চেঁচামেচি করে উঠতেই ছেড়ে দিয়েছিল। তারপরই এখানে নিয়ে এল—"

বুঝলাম বদমাইস ঘোড়াকে 'ব্রেক' করবার জন্য ঘোড়ার ব্যবসাদাররা যে কৌশল অবলম্বন করে, রমজান আলী তাই করেছে।

জিগ্যেস করলাম, "আমার কাছে তুমি কি চাও? যদি সাধ্যের মধ্যে হয় নিশ্চয়ই করব—"

"আমি একটি ছোট্ট ঘর বাঁধতে চাই ডাক্তারবাবু। আপনি দয়া করে সেই ব্যবস্থা করে দিন। জাতের বিচার আমার আর নেই। যে কোনও লোক ভদ্রভাবে স্ত্রীর মতো যদি আমাকে রাখে আমি তার কাছেই থাকব। সে যদি বিয়ে করে ভালোই, না-ও যদি করে তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু তার বাড়ীতে আমি ভদ্রভাবে থাকতে চাই। আছে এরকম কোনও লোক আপনার জানা? আপনারা তো কত জায়গায় ঘোরেন, এরকম লোক চোখে পড়েনি আপনার? আমাদের দেশে একটাও ভদ্রলোক

নেই এ কি হতে পারে? দয়া করে দেখুন না একটু চেষ্টা করে—”

তার মিনতিটা যেন কান্নার মতো শোনাতে লাগল। কিন্তু আমি তখন মহাসমস্যায় পড়লুম। এই বিরাট কসাইখানায় জীবন্ত একটি নধর পাঁঠা পাই কোথায়! একটাও তো বেঁচে নেই।

“আচ্ছা, চেষ্টা করব”—বলে সেদিন চলে এলাম। পুলিশ পাহারা ছিল, সুতরাং অন্য কোন ভয়ের কারণ ছিল না। তা ছাড়া বাড়িউলী ছিল হাজতে।

তার পরদিনই আমার কাছে সোহনলাল এল। কাক-তালীযই বল, আর যাই বল, এই রকম আকস্মিক অপ্রত্যাশিত যোগাযোগই পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তর এনেছে। টেলিফোন, এক্‌স্‌-রে প্রভৃতি এর উদাহরণ। সোহনলালকে দেখেই আমাব মনে হল, বিধাতা বোধহয় ওই মেয়েটার এইবার একটা গতি করে দিলেন।

সোহনলালের পরিচয়টা শোন আগে। সোহনলালকে দেখলেই মনে হয় সে একজন 'রইস' অর্থাৎ অভিজাত বংশের ছেলে। পরনে ভালো কাপড়, ভালো জুতো, ভালো পাঞ্জাবী। সিল্কের বা আদ্দির পাঞ্জাবী ছাড়া অন্য কোন পাঞ্জাবী তাকে পরতে দেখিনি কখনও। মাথায় ফুলদার বিহারী-টুপি, একটু বাঁকা করে পরা, গোঁফটি চমৎকার, সুপালিত, সুলালিত। শুধু কালো নয়, চকচকে কালো, ডগা দুটি ফণার মতো। দোহারা গড়ন, বেশ লম্বা চওড়া। কানে আতরসিক্ত তুলো থাকত সর্বদা। পানও খেত সুগন্ধী জরদা দিয়ে। মাথার সামনের দিকে ঈষৎ টাক ছিল। চোখ ছোট ছোট ছিল, কিন্তু সর্বদা হাসিতে চিকমিক করতো বলে খারাপ দেখাত না।

সে জমিদাব বা জমিদারেব ছেলে ছিল না। ছিল স্থানীয় মহাবীব প্রেসের হেড মেশিন ম্যান। ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বিলেত যাবে বলে। কিন্তু বিলেত পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। আট্‌কে গিয়েছিল বম্বেতে। সেইখানে এক বিলিতি প্রেসের সাহেব ম্যানেজারের সুনজরে পড়ে প্রেসে ঢুকে মেশিনের কাজ শেখে। নিখুঁত ভাবে শিখেছিল কাজটি। মহাবীর প্রেসেব সেই ছিল আসল পরিচালক। প্রেসেব মালিক মহাবীর ঝুন্‌-ঝুন্‌-ওয়ালা মাসে আড়াই শো টাকা মাইনে দিয়ে ওর কাছে হাত জোড় করে থাকত, কারণ সোহনলাল না থাকলে প্রেস অচল।

সোহনলাল বাস করত চামার পাড়ায়, তাদের সঙ্গেই ওর আত্মীয়তা ছিল বেশী। চামার রোগীদের নিয়ে আমার কাছে আসত বলেই আমার সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল।

ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল কযেকটি। ঘুড়ি ওড়াতো। ঘুড়ি তৈরি করতো, ঘুড়ি আনাতোও নানা জায়গা থেকে নানা রঙের, নানা মাপের। ওব লাটাইটি ছিল দেখবার মতো, চমৎকার কারুকার্যে অলঙ্কৃত। ভালো সুতো, সুতোর মান্‌জা, এই সবেব ব্যবস্থা করতো চামারের ছেলেমেয়েগুলো, ওদেরও প্রত্যেককে ঘুড়ি লাটাই কিনে দিয়েছিল সে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোজ ঘুড়ি ওড়াতো। ওর আর একদল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শাহসাহেবের ছেলেরা, তারা লক্ষ্ণৌ কায়দায় ঘুড়ি ওড়াতো।

ওর দ্বিতীয় শখ ছিল পাখী আর পায়রা পোষার। প্রতি বছর হরিহর-ছত্রের মেলায় গিয়ে পাখী কিনে আনতো। কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, হরেক রকমের। পায়রাও নানা জাতের।

প্রেস থেকে ফিরে এই সব নিয়েই মশগুল হয়ে থাকত সোহনলাল। আর ওর সঙ্গী সহচর ছিল ওই চামারগুলো। সন্ধে হলেই মদ নিয়ে বসতো। যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যেতো ততক্ষণ মদ খেতো বসে। ওই ছিল ওর দিবা-রাত্রির কার্যক্রম।

বিয়ে করেছিল। একবার নয়, দু'বার। কিন্তু দুটো বউই পালিয়েছিল। বউরা সাধারণত চায় স্বামীরা স্বপনে জাগরণে সব সময়ে তাদের কথাই ভাবুক, কিন্তু এরকম অখণ্ড মনোযোগ দেওয়া সোহনলালের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঘুড়ি, পায়রা, কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, মদ, আর চামারদের ছেলেমেয়েরা তার মনের অনেকখানি দখল করে রেখেছিল অনেক আগে থেকেই। ওর বউদের এটা ভালো লাগেনি সম্ভবত। বউদের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারে এমন লোকেরও অভাব ঘটেনি, তারা তাদের সঙ্গেই ভেগেছিল। এতে কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল সোহনলালের। আর মনে

হয়েছিল, লোকে তাকে হয়তো নপুংসক মনে করছে। তার নিজেরও একটু সন্দেহ হয়েছিল বোধহয়। কারণ সে আমার কাছে এসে নিজেকে ভালো করে পরীক্ষা করিয়েছিল যে তার পারুষ্যে কোন রকম দুর্বলতা আছে কিনা। আমি পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, নেই। সুযোগ পেলে সে অনায়াসে শতপুত্রের পিতা হতে পারে।

সেদিনও সোহনলাল এসেছিল একটি চামার ছোকরাকে নিয়ে। ছোকরা তাড়ি খেয়ে মারামারি করে হাত ভেঙ্গেছে। তার হাতের ব্যবস্থা করে দিয়ে সোহনলালকে বললুম, "তুমি একটু বস, তোমার সঙ্গে কথা আছে একটু।"

সব খুলে বললুম তাকে।

সে বললে, "হুজুর আমি মেশিন বুঝি, ঘুড়ি বুঝি, চিড়িয়া বুঝি, এই সব চামারদেরও বুঝি, কিন্তু আওরৎকে বুঝি না। দু'বার বোঝবার চেষ্টা করেছি পারিনি। ওরা আজব ধরনের মেশিন। আমাকে মাফ করুন ডাক্তার সাহেব।"

আমি বললুম, "কিন্তু আমার মনে হয় একে তুমি বুঝতে পারবে, কারণ ও নিজেকে বোঝাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। তুমি যদি ওকে ভদ্রভাবে ঘরে স্থান দাও, ও তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। জীবনে ও কেবল অভদ্র লোকেদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। তোমার মতো ভদ্র 'রইস্' যদি ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তাহলে বর্তে যাবে ও—'

সোহনলাল দোনো-মোনো হয়ে চুপ করে রইলো।

"ও পতিতা বলে আপত্তি করছো?"

"না। জাতের বিচার আমার নেই। আমি জানি ময়লা বাসন ধুয়ে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। আমার মেশিনে তো রোজই ময়লা জমে, রোজই সাফ করতে হয়, তবে ভয় হয়, কোন খারাপ অসুখ টসুখ নেইতো—"

"সে আমি দেখে দেবো। অসুখ থাকলেও তা সারিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়—"

"হ্যাঁ, মেশিনও ভেঙ্গে যায়, সারাতে হয়।"

সোহনলাল মেশিনের উপমা দিয়েই কথাবার্তা চালাতে লাগল।

বললাম, "তুমি আগে তাকে দেখ একবার, যদি পছন্দ হয় ঘরে নিয়ে যেও। ওর কোন অসুখ টসুখ আছে কিনা তা আমি দেখে দেবো।"

"বহুত খুব।"

সেলাম করে চলে গেল সোহনলাল।

সেই দিনই সন্ধের সময় নিয়ে গেলাম তাকে সরস্বতীর কাছে। মেয়েটির নাম ছিল সরস্বতী। তাকে দেখে সোহনলাল আর "না" বলতে পারল না। সত্যই মেয়েটি অপরূপ লাবণ্যময়ী ছিল, বিশেষত যৌবনের অমন প্রবল প্রকাশ ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

সেই দিনই সোহনলাল সরস্বতীকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। প্রতিশ্রুতি মতো সরস্বতীকে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, কোন অসুখের চিহ্ন দেখতে পাই নি। রক্তও পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলুম, কোন দোষ পাওয়া যায়নি।

সোহনলালের সঙ্গে সরস্বতীর বিয়েও হয়েছিল একটু নতুন ধরনের। পুরুত টুরুত ডাকা হয়নি। মন্ত্রও পড়া হয়নি। সোহনলালের বাড়ীর কাছে একটা শিব-মন্দির ছিল। সেই শিব-মন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় হাত রেখে তারা শপথ করেছিল যে, তারা আমরণ পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশী হবে। কেউ কাউকে প্রতারণা করবে না।

এ শপথ রক্ষা করেছিল তারা। শুধু তাই নয়, সোহনলালকেও বদলে দিয়েছিল সরস্বতী। কিছুদিন পরে শুনলাম সোহনলাল মদ ছেড়ে দিয়েছে। বিয়ের মাসখানেক পরে একদিন তাদের বাড়ি গিয়ে দেখলুম সোহনলাল পুজো করছে।

সরস্বতী হেসে বললে, "উনি আমাকে ঘুড়ি ওড়াতে শিখিয়েছেন, আমি ওঁকে পুজো করতে শিখিয়েছি। আমরা দুজনেই এখন ঘুড়ি ওড়াই, দুজনেই পুজো করি।"

দেখলুম ঘরের শ্রী-ও ফিরিয়ে ফেলেছে সে। উঠোনে একটি তুলসী গাছ। পাখীর খাঁচাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাঁসার বাসনগুলি ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। পরিষ্কার কাপড়গুলি পাট করে আলনায় রাখা। প্রকাণ্ড উঠোনটা আগে শ্রীহীন হয়ে পড়ে থাকতো, এখন গোবর দিয়ে নিকিয়ে তার চেহারাই বদলে দিয়েছে সরস্বতী। উঠোনের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছও দেখলাম। গাঁদা, সন্ধ্যামণি, রজনীগন্ধা। মনে হল—যাক্, সরস্বতী এবার তার মনের মতো ছোট একটা বাসা পেয়েছে তাহলে।

সোহনলাল একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। দেখলাম সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে বাস করছে। জিগ্যেস করলাম, "মদ ছেড়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?"

সে বললে, "দু'চার দিন হয়েছিল। কিন্তু কষ্ট হলই বা! সরস্বতীর জন্যে একটু কষ্ট সইতে যদি না পারলাম, তবে আর কি পারলাম। আমার ওই মেশিনের জন্যে কষ্ট করতে হয় না? এমন দিনও গেছে যখন সমস্ত দিন না খেয়েও সেবা করেছি। যাকে ভালোবাসি তার জন্যে কষ্ট করতে হয় বই কি। কিন্তু আমি যে জন্যে আপনার কাছে এসেছি সেইটে আগে বলি। সরস্বতীর খুব ইচ্ছে কোনও একটা পুজো করে। দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী—আপনি যা বলবেন। সরস্বতী আপনাকেই জিগ্যেস করতে বলেছে।"

বললাম, "দুর্গা কালীর দরকার কি, ওর নাম সরস্বতী, সরস্বতী পুজোই করুক—"

"ঠিক বলেছেন।"

মহাসমারোহে সরস্বতী পুজো হল। শুধু আমি নয়, শহর সুদ্ধ লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, চামার সব।

আরও মাস দুই পরে শুভ সংবাদটি জানতে পারলাম। সরস্বতী অন্তঃস্বত্বা।

যথাসময়ে সুন্দর একটি ছেলে হল। আবার একচোট সবাইকে খাওয়ালে সোহনলাল।

মাস কয়েক পরে বদলি হয়ে গেলাম আমি সেখান থেকে। ওদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার মতো হয়ে গিয়েছিল। ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়েছিল বেশ। যাবার সময় বলে গেলুম, মাঝে মাঝে তোমাদের খবর দিও।

বছর খানেক পরে হঠাৎ সোহনলাল নিজেই সশরীরে এসে হাজির হল একদিন।

বললে, "সরস্বতীও ভেগেছে।"

"বল কি!"

"হ্যাঁ হুজুর। আমি আগেই আপনাকে বলেছিলুম, মেয়েমানুষ এক আজব মেশিন।"

"কোথায় গেছে তা জান?"

"কিছু বলে যায়নি কাউকে। ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে।"

"তোমার সঙ্গে ঝগড়া টগড়া হয়েছিল?"

"কিচ্ছু না।"

একটু চুপ করে থেকে বললে, "আপনি কি ওর দেশের ঠিকানা জানেন?"

ঠিকানা সংগ্রহ করবার আমার বাতিক নেই।

বললাম, "না, ঠিকানা তো জানি না।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এইজন্যই বোধহয় অজ্ঞাত-কুলশীলদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে গেছেন। কিন্তু সরস্বতী যে এমন দাগা দেবে তা ভাবতে পারিনি।

খানিকক্ষণ বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থেকে সোহনলাল চলে গেল।

মাস তিনেক পরে সবস্বতীর চিঠি পেলাম একখানা। বানান-ভুলে পরিপূর্ণ বাংলায় লেখা চিঠি। চিঠিতে যা লিখেছিল তা শুদ্ধ করে লিখলে এই দাঁড়ায়।

শ্রীচরণেষু,

না জানি আপনি আমার সম্বন্ধে কি ভাবছেন। কিন্তু কি হয়েছিল শুনুন। আপনার মনে হয়তো আছে, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আমি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, যে আমার প্রথম সন্তান মাকে দিয়ে দেবো। আমার ছেলে যখন বড় হতে লাগল তখন বার বার এই প্রতিজ্ঞার কথাটা আমার মনে হত। মায়ের জন্যে মন কেমন করতো খুব, তবে মনকে স্তোক দিতুম যে মা বোধ হয় বেঁচে নেই। কিন্তু স্তোক দেওয়া আর চলল না। হঠাৎ রাস্তায় আমাদের গাঁয়ের নবীন স্যাকবার সঙ্গে দেখা হল একদিন। সে এক বিয়েতে বরযাত্রী এসেছিল। সে বললে, মা বেঁচে আছে, আর আমার জন্যে রোজই নাকি কান্নাকাটি কবে।

ওঁকে পাকে-প্রকারে একদিন জিগ্যেস করলুম, আচ্ছা, খোকনকে যদি আমি আমার মায়েব কাছে দিয়ে দি তাহলে তুমি কি আপত্তি করবে? উনি বাঘের মতো গর্জন কবে উঠলেন। আমার এও মনে হতে লাগল, আমার ছেলে যদি এখানে মানুষ হয় তাহলে ওর সঙ্গী হবে এই চামাবের ছেলেমেয়েগুলো। এই সব ভাবছি এমন সময় আবার একদিন নবীন স্যাকবাব সঙ্গে দেখা হল। সে বললে, মা-ই তাকে এবার পাঠিয়েছে। আমি যেন ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা কবে আসি মায়ের সঙ্গে। উনি তখন বাড়ি ছিলেন না, প্রেসে গিয়েছিলেন। আমি ভাবলুম, উনি ফিবলে ওঁকে জিগ্যেস করে তবে যাব। কিন্তু আবার ভয় হল উনি যদি যেতে না দেন। নবীন স্যাকরা বললে, 'যাবে তো চল, তিনটের সময় গাড়ি। আমি তোমার মায়ের কাকুতি মিনতিতে একটি দিনের জন্যে এসেছি। যদি না যাও আমি আজই চলে যাব। অনেক কাজ পড়ে আছে আমাব'। শেষে চলেই গেলুম ওর সঙ্গে। কাজটা খুবই অন্যায হয়েছিল বুঝতে পারছি। কিন্তু যখন কুমারী ছিলাম, তখন মাকে যে কথা দিয়েছিলাম, সেটা যদি না রাখি তাহলে কি সত্যভঙ্গ হয না? তাছাড়া যে ছেলেকে আমি দশমাস পেটে ধরেছি, বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছি, তাব উপবে আমার কি কোন অধিকাব নেই? সব অধিকার ওঁর? পাকে-প্রকারে একদিনই কথাটা পেড়ে বুঝেছিলাম ওঁর কি মনোভাব। তাই বাড়িতে এসেও তাঁকে ভয়ে আর খবর দিতে পারিনি। যদি এসে হৈ-হল্লা করেন, তাহলে গাঁয়ের ভেতর সে এক বিশ্রী কাণ্ড হবে। একে আমাকে নিয়ে আগে নানা কাণ্ড হয়েছে। আমি আর একটা কথাও ভেবিছিলুম, মাকে বুঝিযে সুঝিয়ে আমার কাছেই নিয়ে যাব। তাহলে দু-কূলই বজায় থাকবে। কিন্তু তাও হল না। মা বাস্তু ভিটে ছেড়ে আসতে রাজি হল না। কিছুতেই। আর আমার ছেলেটির সঙ্গে ইতিমধ্যেই মা বেশ ভাব করে ফেলেছিল, সে রাত্রে তাঁর কাছে শুতো। মাস-খানেকের মধ্যে খুব ন্যাওটা হয়ে পড়ল। তখন আমি ভাবলুম, এইবার ফিরে যাই। উনি হয়তো একটু রাগ টাগ করবেন, কিন্তু পায়ে ধরলে আমার মনের কথাটা বুঝবেন হয়তো। মায়ের কাছে ছেলেকে রেখে একাই ফিবে গেলুম। গিয়ে দেখি আমাদের বাড়িতে আর একজন লোক রয়েছে। চামারেরা বললে, আমি চলে যাওয়ার দিন পনেরো পরেই উনি প্রেসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সব জিনিসপত্র জলের দামে বিক্রী করে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না। মহা আতান্তরে পড়লুম। কেউ কেউ বললে কলকাতা গেছেন, কেউ বললে বোম্বাই। একবার ভাবলুম বাড়িতে ফিরে যাই আবার। কিন্তু মাসখানেক মায়ের কাছে থেকেই পাড়ার ছোঁড়াগুলোর, বিশেষত জমিদারের নায়েব মশায়ের চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলুম, তাতে মনে হল ওখানে যদি ফিরে যাই তাহলে মাকে আবার নতুন করে বিপদে ফেলা হবে। ইতিমধ্যে পাড়ার

চেনা একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল, সে যা খবর দিলে তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সে কয়েকদিন আগেই কলকাতা গিয়েছিল, বললে, সোহনলাল অপঘাতে মারা গেছে। মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে রাস্তার ধারে পড়েছিল, একটা মোটরলবি এসে তার মাথাটা চুরমাব করে দিয়ে চলে গেছে। শুনে যেন পাথর হয়ে গেলুম। চিরকালের মতো যদি পাথর হয়ে যেতুম তা হলেই ভালো হতো। কিন্তু তা হল না। কপালে তখনও অনেক দুর্গতি লেখা ছিল। কি করি, কোথা যাই, মহা দুশ্চিন্তায় পড়লুম। আমাদের বাড়িতে যিনি নতুন ভাড়াটে এসেছিলেন, তাঁর স্ত্রী আমার দিকে একনজর চেয়ে তাঁর বাড়ীর বাবান্দাতেও খানিকক্ষণের জন্যে বসতে দিলেন না, অথচ এই বারান্দা একদিন আমারই ছিল। ওই বারান্দা কতবার ধুয়েছি, পুঁছেছি, নিকিয়েছি। এখন ওখানে আব আমার বসবার অধিকারও নেই। চামাবরা অবশ্য খুব ভদ্র ব্যবহার করেছিল। বলেছিল, মাইজি তুমি যতদিন খুশী আমাদেব কাছে থাকো। কিন্তু চামারদের সঙ্গে থাকতে আমার প্রবৃত্তি হল না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম, কোথাও যদি চাকরাণী হয়ে বাহাল হতে পারি এই আশায। এমন সময় সেই বাড়িউলীর সঙ্গে আবাব দেখা। সে খুব ভদ্র ব্যবহার করলে আমাব সঙ্গে। তাব কাছেই শুনলাম, রমজান আলীও নাকি মারা গেছে। যে দারোগাকে ও ষড়যন্ত্র করে জেল দিয়েছিল, তারই পেয়ারের কোন গুণ্ডা নাকি ওকে খুন করেছে। সোহনলালের কথা শুনে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল। বললে, ওরকম দিলদরিয়া লোক দেখা যায না। আমি ওঁকে না বলে চলে গিয়েছিলুম বলেই আমাকে বকতে লাগল খুব। তারপর বললে, 'তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও তোমাকে রাখতে পারি। যদিও তোমাকে রেখে একবার খুবই হাঙ্গামায় পড়তে হয়েছিল আমাকে।' আমি বললুম, 'আমাকে যদি ভদ্রভাবে রাখ, আমাব উপব যদি জোবজুলুম, জবরদস্তি না কর, তাহলে আমি থাকতে পারি।' বাড়িউলী জিব কেটে বলল, 'ছি, ছি, যা হয়ে গেছে তা আব কখনও হবে না। তাছাড়া অত বড় বড় 'অপ্‌সর' তোমার সহায়, আমি কি তোমার উপর আর জবরদস্তি করতে সাহস করি?' আমি ওই বাড়িউলীর কাছে থেকে গেলুম, দেখলুম এ ছাড়া আমাব আব পথ নেই।

আপনি রাগ করবেন জানি। তবু আপনাকে বাবা বলে ডেকেছি, আপনার দয়াতেই কিছুদিনেব জন্যেও সুখেব সংসার পাততে পেবেছিলুম, একথা আমি কোন দিনই ভুলব না। তাই আবার আপনাব সাহায্য ভিক্ষে করছি।

যা কবছি তা আমাব একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু কি করব, বাধ্য হয়েই করছি। যদি আপনি দয়া করে আমাকে অন্য কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে দেন এখুনি চলে যাব। আপনাদের হাসপাতালে শুনেছি, দাই, নার্স, এসব কাজ পাওয়া যায়। জুটিয়ে দিতে পারেন আমাকে একটা? কম মাইনে হলেও যাব। আমার নিজের সাদাসিধে খাওয়া পরার খরচটা চলে গেলেই হল। আপনার কাছে সাহায্য চাইবার আমার আর মুখ নেই তা জানি, তবু চাইছি, কারণ সত্যিই আমি নিরুপায়। আর কি দয়া পাব আপনার? আমার শত কোটি প্রণাম জানবেন। ইতি—

আপনার মেয়ে সরস্বতী

চিঠিখানা পড়ে পণ্ডিতেরা যাকে "জুগুপ্সা" বলেন তাই জেগে উঠল আমার মনে। ঠিক করলুম, ওই কালভুজঙ্গিনীর সঙ্গে আর কোন সংশ্রব রাখব না। হাসপাতালের অ্যাপ্রেনটিস নার্স করে ওকে বাহাল করে নিতে পারতুম কিন্তু ক্রোধান্ধ হয়েছিলুম, তাই ওর চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিলাম না।

চিঠি পাওয়ার প্রায় বছর চারেক পরে আর একবার সরস্বতীর দেখা পেয়েছিলুম। তখন আমি আর এক জায়গায় বদলি হয়ে গেছি। দুপুর বেলা, একটা গাঁয়ে গেছি রোগী দেখতে। যাওয়ার সময় নজরে পড়েনি। ফেরবার সময় দেখলুম, গাঁয়ের বাইরে একটা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একটা গেরুয়া ধ্বজা উড়ছে। ধ্বজায় লাল অক্ষর দিয়ে লেখা—'সোহনলাল আশ্রম'। গাড়ী থামালুম। তারপর দেখতে পেলুম, অনেকগুলো ছেলে কাছেই ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। একটু দূরে ছোট্ট একটি মাটির ঘর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘরের পিছনে অনেক উঁচুতে কয়েকটা পায়রার টং। নানা জাতের পায়রাও চরে বেড়াচ্ছে। নেবে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, মাটির ঘরের দাওয়ায় পাখীর খাঁচাও ঝুলছে কযেকটা। একটা ময়না বলে উঠল, 'সোহনলাল, সোহনলাল কী জয়'। যে ছোঁড়াগুলো ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল তাদের একজনকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, এখানে কে থাকে। সে বললে, ভৈরবী মাইজি। এমন সময় সরস্বতী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে গেরুয়া। যৌবনের সে উদগ্র-ভাব নেই, তার বদলে একটা শুদ্ধ শান্ত শ্রী বিকীর্ণ হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ থেকে। আমাকে এখানে দেখতে পাবে তা সে প্রত্যাশা করেনি। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর চিনতে পেবে একমুখ হেসে এগিয়ে এল আমার দিকে, প্রণামও করলো।

"বাবা! আপনি এখানে কি করে এলেন?"

"কিছুদিন আগে বদলি হয়ে এসেছি। আমার তো জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ানোই চাকরী। তুমি কি করে এখানে এলে তাই বল — "

"আমি বাড়ি-উলীর কাছে কিছুদিন ছিলাম। যখন হাতে কিছু টাকা জমল তখন মনে হল আর পাপের ভোগ করি কেন। একজনের কাছে খবর পেলুম, এখানে বেশ শস্তায় জমি পাওয়া যায়। খানিকটা জমি কিনে ছোট একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছি এইখানেই।"

"কি কর এখানে?"

"তিনি যা ভালোবাসতেন তাই করি। ছেলেদের ঘুড়ি কিনে দি, পাযরা আব পাখীব সেবা কবি।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কয়েক সেকেণ্ড।

তারপর জিগ্যেস করলুম, "তোমার ছেলে কোথায়?"

"সে তো মায়ের কাছে। এখন আর নেই।"

"এখন কোথা?"

"মারা গেছে ম্যালেরিয়ার ভুগে।"

যে ছেলেগুলো ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, তারা এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল আমাদের। তাদের দেখিয়ে সরস্বতী বললে, "এখন এরাই আমার ছেলে—"

হঠাৎ ইচ্ছে হল ওকে একটা প্রণাম করি। কিন্তু ঝুঁকতে পারলুম না, টাইট প্যান্ট পরা ছিল। নিজের প্যান্ট নয়, ঝুটো আত্মসম্মানের প্যান্ট।

দেখ বৎস, তোমাকে যে এত বড় লম্বা চিঠি লিখলাম, তা তোমাকে গল্প শোনাবার জন্যে নয়। চিঠিটা লিখতে প্রায় পনেরো দিন লেগেছে। রাত জেগে জেগে লিখেছি। লিখেছি, কারণ তুমি আমার ছাত্র, শুধু তাই নয়, তুমি ডাক্তার হয়েছ অর্থাৎ তুমি সেই সম্প্রদায়ের একজন হয়েছ যারা বিদ্রোহী সভ্য মানবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিদ্রোহী। প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করেই মানুষ সভ্য হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির যেটা সবচেয়ে কড়া নিয়ম, যা অনিবার্য, যা অমোঘ, ডাক্তাররা অস্ত্রধারণ করেছে তারই বিরুদ্ধে। তাদের লড়াই মৃত্যুর সঙ্গে, এই লড়াই করতে করতে ওরা নিজেরাও দলে দলে মরছে, কিন্তু তার পিছনে আসছে আবার একদল। বহুকাল থেকে এই চলছে, তুমিও এবার সেই

দলে যোগ দিয়েছ। ডাক্তারদের বাজার দর আজকাল ক্রমশঃ কমছে, কিন্তু তাদের আসল দর কখনও কমবে না, যদি তারা অমানুষ না হয়। মানুষ অসুখে পড়বেই এবং সে আর্ত হয়ে তোমার কাছে আসবেই, তখন তুমি যদি তাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার কর তাহলে তুমি শুধু যে তাদের রোগ চিনতে পারবে, তা নয়, তাদেরও চিনতে পারবে। ডাক্তাররাই দেশের লোকদের স্বরূপ চিনতে পারে, আর্ত হলেই মানুষ তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে ফেলে। কাউকে যখন বাঘে ধরে তখন সে তার বগলের নীচে লুকানো দাদটাকে ঢাকবার চেষ্টা করে না, যে তাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে তার কাছে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হলেও তার আপত্তি নেই। সে যখন উলঙ্গ হয়ে তোমার কাছে আসবে তখন তার কদর্যতা দেখে নাক সিটকো না, তাকে মরাল লেকচার দিতে যেও না, শুধু একটি কথা মনে রেখ সে বিপন্ন মানুষ। ডারবিন আমাদের জীবনটাকে যুদ্ধ বলেছেন। সত্যিই আমরা জন্ম-মুহূর্ত থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই ঘোরাফেরা করি সবাই। এই যুদ্ধক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টাই গোলাগুলি চলছে, শুধু অসুখের জীবাণু নয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য এই ছ'টা শত্রুর কারখানায় তৈরি নানা জাতের নানা আকারের গোলাগুলিও। ইন্দীবর নয়নের সলজ্জ কটাক্ষও আমাদের কম ঘায়েল করে না। আর একটি কথাও মনে রেখো, এই যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র দুই শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায়, তাদের তোমরা ভাল-মন্দ, ধার্মিক-অধার্মিক, হিন্দু-অহিন্দু, বাঙালী-অবাঙালী এই কায়দায় ভাগ করতে অভ্যস্ত হয়েছো। কিন্তু তাদের ভাগ করা উচিত এইভাবে, (ক) যারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছে, (খ) যারা এখনও হয়নি। এই সত্যদৃষ্টি দিয়ে যদি মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হও, তাহলে তাদের ঠিক স্বরূপটি দেখতে পাবে। আর তা না করে, যদি ঠিক করতে যাও ইনি মনুর বিধান মেনে টেনে চলেন কিনা, এঁর টিকি আছে কি নেই, মুরগী খান, না কুমড়ো খান, কার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, কংগ্রেসী না মুসলিম-লীগী, আর সেই অনুসারে তোমার মানস-থার্মোমিটার সহানুভূতির পারা যদি ওঠা-নামা করতে থাকে, তাহলেই তোমার পতন হলো। তাহলেই তুমি আর বিজ্ঞানী ডাক্তার থাকলে না, চণ্ডীমণ্ডপের দা-ঠাকুর হয়ে গেলে।

তুমি পঞ্চকন্যার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছিলে, সেই সুযোগে আমিও তোমাকে আমার দেখা পাঁচটি কন্যার কথা বললুম। আমার বক্তব্যটা আশা করি স্পষ্ট হয়েছে তোমার মনে। আমি বলতে চেয়েছি, ওদের তোমরা যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছ, ওরা ঠিক তাই নয়। ওদের যদি শুধু অ্যানাটমি বা ফিজিওলজির ফরম্যুলায় ফেল, তোমার ক্ষুধা মেটাবার বা বংশবৃদ্ধি করবার যন্ত্র মাত্র মনে কর, তাহলে ওদের আসল পরিচয়ই পাবে না কখনও। ওরা যন্ত্ররূপেই ধরা দেবে তোমাদের কাছে, যেমন রোজ দিচ্ছে। কিন্তু ওদের সেই শক্তিকে তোমরা কখনও কাজে লাগাতে পারবে না যে শক্তি ওদের বৈশিষ্ট্য, আর যা কাজে লাগাতে পারলে দিগ্বিজয় করা যায়। ওদের সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করবার চোখ নেই তোমাদের। আমি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে তোমার সেই চোখ ফুটিয়ে দিতে চাই। তোমাদের একাটা মহদ্দোষ কি জান? শুধু দোষ নয়, নির্বুদ্ধিতা। তোমরা ওদের প্রতি অনুকম্পা কর। মনে কর, আহা ওরা অতি দুর্বল, ওদের ব্রেনের ওজন কম, গায়ের জোর কম, তোমাদের কৃপাকণা না পেলে ওরা বাঁচবে না। তাই ওরা তোমাদের দাসী হয়ে আছে আর তোমরা দয়া করে ওদের প্রভু হয়েছ। কিন্তু, ইউ ফুল্‌স্‌, তোমরা এটা বোঝ না যে প্রতি সংসারে ওরাই আসল কর্ত্রী। মা-রূপে, কন্যারূপে, বধূরূপে, প্রণয়িনীরূপে, নানা রূপে ওরা তোমাদের মতো হাঁদাদের নাকে দড়ি পরিয়ে নাচাচ্ছে? তোমরা যখন হাম্বা-রব করে গর্জন ছাড় "আমরা প্রভু", তখন ওরা মনে মনে হাসে, কারণ ওরা জানে যে আসলে ওরাই শক্তির আধার। তাই চুপ করে থাকে, পূর্ণকুম্ভের মতো। ইচ্ছে করলে ওরা সতী-সাবিত্রীও হতে পারে, আবার ক্লিওপেট্রা ক্যাথারিনও হতে পারে। ঘর বাঁধতেও জানে, ঘর ভাঙতেও জানে। ঘোমটা টেনে রান্নাঘরের কোণে বসে তোমাদের সুক্তো বেগুন ভাজা খাইয়েও মুগ্ধ করতে পারে। আবার স্টেজে উঠে ওড়না উড়িয়ে, কোমর দুলিয়ে তোমার মুণ্ডুও ঘুরিয়ে দিতে পারে। সব পারে ওরা। চণ্ডী পড়েছ কখনও? যদি না পড়ে থাক পোড়ো। দেখবে, সেখানে

কবি নারীকে কি মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁরা জানতেন যে ইচ্ছে করলে ওই নারীশক্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকেও মোহগ্রস্থ করতে পারে।

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোহষি নিদ্রা বশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।

এই তামসী দেবীকে তাঁরা আরাধনা করেছিলেন, মধু ও কৈটভকে মোহগ্রস্থ করবার জন্যে। ওদের মোহগ্রস্থ না করতে পারলে বধ করা যেত না। চণ্ডীতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবার মতো আছে। ওঁরা মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভর মতো জাঁদরেল দৈত্যদের মারবার জন্যে কোনও হোমরা-চোমরা পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করেননি। করেছেন নারীকে। অম্বিকা শুম্ভ-নিশুম্ভকেও মোহগ্রস্ত করেছিল। শুম্ভ-নিশুম্ভের দূত যখন তাকে এসে বললে—আপনি স্ত্রী-রত্ন, শুম্ভ-নিশুম্ভও ত্রিলোকজয়ী বীর, আপনি তাঁদেরই ভজনা করুন। এর উত্তরে অম্বিকা শাড়ি গয়না চাননি, বলেছিলেন—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি।

যিনি আমাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারবেন, যিনি আমার দর্পচূর্ণ করবেন, যিনি জগতে আমার তুল্য বলশালী, তাঁকেই আমি পতিত্বে বরণ করব। যে দেশে নারীর এই রূপ কল্পনা করেছেন কবিরা, সেই দেশে তোমরা তাদের অবলা দুর্বলা বলে অনুকম্পা কর? তোমাদের স্পর্ধা তো কম নয়। আই বেগ ইওর পার্ডন, ওটা স্পর্ধা নয়, বোকামি। তোমরা ওদের চেন না, জান না, জানবার চেষ্টাও কর না। চণ্ডী যদি পড় তাহলে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবে। যে বীর্যবতী মহিয়সী সিংহবাহিনী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, তাঁর জন্মকাহিনীটাও ভালো করে পড়ে দেখো। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের তেজ এবং সমস্ত দেবকুলের তেজ একত্রিত হয়ে যে তেজোময়ী নারী সম্ভব হলেন, তাঁকে আরও প্রদীপ্ত করলেন সূর্য-চন্দ্র, দক্ষ প্রজাপতিরা, সমুজ্জ্বল করলেন সন্ধ্যা-দেবীগণ। বরুণ তাঁকে শঙ্খ দিলেন, অগ্নি শক্তি দিলেন, পবন দিলেন ধনুর্বাণ। ইন্দ্র নিজের বজ্র থেকে আর একটা বজ্র তৈরি করে দিলেন, ঐরাবত দিলেন ঘণ্টা, যম দিলেন কালদণ্ড। ক্ষীরোদ সমুদ্র তাঁকে সাজিয়ে দিলেন নানা অলঙ্কারে। তাঁর গলায় দুলিয়ে দিলেন উজ্জ্বল মুক্তাহার, কানে দিব্য কুণ্ডল, মাথায় পরিয়ে দিলেন চূড়ামণি, হস্তে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, পায়ের নূপুর, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়। সমুদ্র দিলেন তাঁকে অম্লান পদ্মের মালা, বিশ্বকর্মা তৈরি করে দিলেন কুঠার—হিমালয় দিলেন সিংহ, বাসুকী দিলেন নাগহার। অর্থাৎ ত্রিভুবনের সমস্ত পুরুষ-শক্তি একাগ্র হয়ে পুঞ্জীভূত হল ওই তেজোসম্ভবা নারী-শক্তির মধ্যে। তাই তিনি আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠলেন। 'সম্মানিতা, ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ।' তাই তাঁর গর্জনে ত্রিভুবন কেঁপে উঠল। 'বুক্ষুভাঃ সকলা লোকাঃ, সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে। চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ।' সপ্ত-সমুদ্র কেঁপে উঠল, পাহাড় বিচলিত হল। পুরুষদের তেজ, পুরুষদের আগ্রহ, পুরুষদের প্রতিভা—নারীশক্তির সঙ্গে মিললে তবেই মহিষাসুরকে বধ করা যায়। কোনও পুরুষ বীর মহিষাসুরের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি, কিন্তু যেই তাদের প্রতিভা, প্রেরণা, আগ্রহ নারীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করল অমনি তা সম্ভব হয়ে গেল। এখনও আমাদের দেশে বহু মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ জন্মাচ্ছে, যুগে যুগে জন্মাবে, তাদের মারবার একমাত্র উপায় ওই চণ্ডীতে লেখা আছে। নারী-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, রিইনফোর্স করতে হবে, সেই নারী-শক্তির উৎস কোথায় সন্ধান করতে হবে, তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, তবেই দুর্দান্ত মহিষাসুরদের বধ করা সম্ভব হবে। অন্য উপায় নৈব নৈব চ।

তুমি ডাক্তার। এই নারী-শক্তির নানা রূপ দেখবার সুযোগ তুমি পাবে। কখনও দেখবে বাল্‌ব, কখনও দেখবে মোটর, কখনও বা সরু তার শুধু। কিন্তু বিদ্যুতের কথাটা ভুলে যেও না। এটা সর্বদা মনে রেখ, কারেন্ট পেলেই ওরা সক্রিয় হয়ে ওঠে, এটম্ বম তৈরী করাও অসম্ভব নয় ওদের শক্তিতে। আর এটাও মনে রেখ মহিষাসুর বধ করতে হবে, আর তা তোমরা একা পারবে না, 'মেয়েদের শক্তির সাহায্য নিতে হবে।

মনের ভিতর অনেকদিন থেকে অনেক রকম গ্যাস জমেছিল, এই চিঠির সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্ দিয়ে তার অনেকখানি বেরিয়ে গেল। আরাম বোধ করছি। থামবার আগে আবার বলছি, মনে রেখ মহিষাসুর বধ করতে হবে।

আশীর্বাদ জেনো, বিলেত যাচ্ছ নাকি? দেখো, বিলিতি বাঁদর হয়ে এসো না যেন। ইতি— শুভার্থী অগ্নীশ্বর।

ছয়

পাসপোর্ট না থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া আমি লণ্ডনে পৌঁছিলাম, কি করিয়াই বা আমি সেখানকার পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিলাম এ সবের বিশদ বিবরণ এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। অবশ্য ইহা কল্পিত কাহিনী নহে, আমার জীবনেরই কাহিনী, কিন্তু কাহিনীর এই অংশটুকু আমার প্রাণদাতা ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-তর্পণ। তাঁহার নিকট আমি যে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ, অক্ষম লেখনীতে তাঁহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া সে ঋণ যে শোধ করা সম্ভব নয় তাহা আমি জানি, এ প্রয়াসও যে হাস্যকর সে বোধও আমার আছে, কিন্তু আমার দিক হইতে ইহার কৈফিয়ত, ইহা লিখিয়া আমি তৃপ্তি পাইতেছি।

পাসপোর্ট না থাকা সত্ত্বেও আমি লণ্ডনে পদার্পণ করিতে পারিয়াছিলাম। সেই সারেং-এর সহায়তায়। আর সেই ডাক্তারবাবুটি যিনি এফ, আর, সি, এস পড়িতে যাইতেছিলেন, তাঁহার নিকটও আমি অসীম ঋণে ঋণী। তিনি আমাকে তাঁহার দাদার বাসায় লইয়া যান এবং বলেন, আমি দেশ হইতে এই গরীবের ছেলেটিকে লইয়া আসিয়াছি, ভালো রান্না করিতে পারে। যদি কোন সুযোগ পায় এখানে লেখাপড়া বা কোনও কাজকর্ম শিখিবে। আগেই বলিয়াছি তাঁহার দাদা একজন বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন, বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং লইতেছিলেন। খাদ্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। আমি তাঁহাকে নানরকম দেশী তরকারি রাঁধিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। সুক্তো, শাকের ঘণ্ট, তিতার ডাল, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি লণ্ডনে দুষ্প্রাপ্য তরকারিগুলি খাইয়া তিনি খুবই খুশী হইয়া উঠিলেন। বস্তুত, উদর-পথে প্রবেশ করিয়াই আমি তাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিলাম। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সে স্থান হইতে আমি চ্যুত হই নাই। কিছুদিন থাকিবার পর তাঁহার নিকট আমি আমার মনোভাবটি প্রকাশ করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা ব্যবস্থা করিয়া দিব। বিলাতে অনেক প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্রতিষ্ঠান আছে। এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তার সহিত তাঁহার হৃদ্যতা ছিল। সেইখানেই তিনি আমাকে ঢুকাইয়া দিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে করিতেই আমি আমেরিকা যাইবার সুযোগ পাই। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তারও আমি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম, তাঁহার সুপারিশে সেখানে একটি বৃহত্তর পুলিশ বিভাগে আমার একটি চাকরি জুটিয়া গেল। কিছুদিন চাকরি করিবার পর বাধিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখন যুদ্ধেই আমি গোয়েন্দা বিভাগে কাজ পাইয়া গেলাম। পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরিবার সুযোগ পাইলাম। কার্যে শুধু যে দক্ষতা অর্জন করিলাম তাহা নহে, বেশ সুনামও হইল। জঙ্গী বিভাগের বড় বড় অফিসাররা আমার কাজের প্রশংসা করিয়া সার্টিফিকেট দিলেন। এই যুদ্ধের সময়ই ভারতীয় বিপ্লবীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য আমাকে ভারতবর্ষে বড় চাকরি দিয়া বদলি করা হইল। আমেরিকান সরকারের সুপারিশেই বৃটিশ গভর্নমেন্ট আমাকে এই চাকুরিটি দিলেন। আমি আসিয়া বিপ্লবীদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে সময় আমি কি করিয়াছিলাম তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিব না।

বাংলাদেশে ফিরিয়াই আমি ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের খোঁজ করিয়াছিলাম। খোঁজ করিয়া যতটুকু খবর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। তাঁহার শেষ খবর পাইয়াছিলাম

তিনি পুত্র-পুত্রবধূকে সংসারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া কোনও হাসপাতালের ডাক্তার হইয়া গিয়াছেন। সেইখানেই নাকি আধুনিক পদ্ধতিতে বাণপ্রস্থ জীবনযাপন করিবেন। সেইখানেই গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু ছুটি পাইতেছিলাম না বলিয়া হইয়া ওঠে নাই।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া গেল।

আমরা অখণ্ড স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, পাইলাম খণ্ডিত স্বাধীনতা। ঠিক তাহার পূর্বেই ডাইরেক্ট্‌ অ্যাকশনের উন্মত্ত তাণ্ডবে দেশের মাটি দেশের লোকের রক্তেই রঞ্জিত ও সিক্ত হইল। আমার পরিচয় ছিল মুসলমান, সুতরাং আমি পূর্ব-পাকিস্তানে নীত হইলাম। ইহাতে আমার দুঃখ হয় নাই। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানকে আমি এখনও বাংলা দেশ বলিয়াই মনে করি। আমার প্রথম যৌবনের লীলা-ক্ষেত্র ওই পূর্ব-বঙ্গ, স্বাধীনতা মন্ত্রে ওইখানেই আমি দীক্ষা লইয়াছিলাম। অশ্বিনী দত্ত, পুলিন দাস, শান্তি দাস, প্রীতি ওয়াদ্দেদার, সূর্য সেন এবং আরো অসংখ্য বিখ্যাত-অখ্যাত আত্মত্যাগী বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের জন্মভূমি যে দেশ, সে দেশকে রাজনৈতিকরা যে নামেই অভিহিত করুন, আমার কাছে তাহা বাংলা দেশ। র‍্যাডক্লিফ দেশের মাটির উপর একটি লাইন টানিযা দিলেই কি দেশের আত্মা বিভক্ত হইয়া যাইতে পারে? পারে না। পাকিস্তানে গিয়া আমার মনে হইযাছিল মায়ের কোলেই ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু ডাক্তার অগ্নীশ্বরের নিকট হইতে আমাকে অনেক দূরে চলিয়া যাইতে হইল। তাঁহার হাসপাতালের যে ঠিকানা পাইয়াছিলাম তাহা উত্তর প্রদেশের শেষ সীমান্তে। হিমালযের কাছাকাছি।

স্বাধীনতা পাইবার অনেকদিন পরে তাঁহার সন্ধানে বাহির হইবার সুযোগ হইল। সেখানে পৌঁছিয়া কিন্তু হতাশ হইলাম। শুনিলাম, বছর খানেক পূর্বে তিনি কাজে ইস্তাফা দিযা চলিযা গিযাছেন। চলিয়া আসিবার কারণ যাহা শুনিলাম তাহাতে মনে হইল, অগ্নীশ্বরের উপযুক্ত কাজই হইযাছে। একমাত্র অগ্নীশ্বরই ইহা পারেন।

হাসপাতালটি আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের নামের সহিত যুক্ত। নামটা আমি আর করিব না। সেখানে অগ্নীশ্বর সুখেই ছিলেন। কিন্তু একদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

তিনি একটি গরীব রোগীর অপারেশন করিবেন বলিযা আগের দিন হইতে তাহাকে ঔষধ এনিমা প্রভৃতি দিয়া একটি আলাদা খালি ঘরে রাখিযাছিলেন। পরদিন গিয়া দেখেন রোগী সেখানে নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথা গেল।" হাসপাতালের ছোট ডাক্তারবাবু বলিলেন, "মহারাজের আদেশে তাঁহাকে জেনারেল ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।"

"কেন?"

"হাসপাতালের একজন বড় পেট্রন আসবেন। টেলিগ্রাম করেছেন, তাঁর জন্যে যেন একটা ঘর খালি রাখা হয়। অন্য ঘর ছিল না, তাই ওই রুগীটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—"

অগ্নীশ্বর মহারাজের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপারটা সত্য কিনা, হাসপাতালের যিনি অধ্যক্ষ তাঁহাকে সকলে মহারাজ বলিয়া ডাকিত। মহারাজ বলিলেন, "কি করব বলুন, একে অতবড় লোক, তায় আমাদের একজন পেট্রন। তাঁর অনুরোধ এড়ানো শক্ত। যেখানে আপনার রুগীকে দিয়েছি সে বেডটাও ভালো, বেশ ফাঁকা—"

"ভালো কি মন্দ সেটা আমি ঠিক করব। যাক, আমার এখান থেকেও চাকরিটা গেল তাহলে। এতবড় মহাপুরুষের নামে হাসপাতাল, এখানেও ধনী-দরিদ্রের ভেদ। এখানে আমার থাকা পোষাবে না। কালই আমি চলে যাব।"

মহারাজ তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "দেখুন, অপরের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের চলতে হয়, যাঁরা দাক্ষিণ্য দেখান তাঁরা কিছু সুবিধাও প্রত্যাশা করেন। সুতরাং আমরা নিরুপায়।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন, "তা বুঝতে পারছি। ওদেশে কিন্তু ওরা এমন নিরুপায় হয় না।

আমেরিকার মেয়ো ব্রাদার্সের ক্লিনিকের ইতিহাস পড়ে দেখবেন। সেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্টও যদি যান, তাঁর জন্যেও কোন পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয় না। তিনি চানও না—"

অগ্নীশ্বর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় যে গিয়াছেন তাহা কেহ বলিতে পারিল না। নিকটেই একটা শহরে একটা হোটেলে কিছুদিন ছিলেন শুনিলাম। সেখানে গিয়াও তাঁহাকে পাই নাই। অবশেষে তাঁহার ছেলের নিকট গিয়া হাজির হইলাম একদিন। ছেলে যাহা বলিল তাহা আরও বিস্ময়কর।

সে বলিল, "বছর চারেক বাবার কোনও খবর জানি না। তিনি তাঁর পেন্‌সন্ অর্ধেকটা অগ্রিম নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যে চিঠিটা সেই সঙ্গে লিখেছিলেন সেটা দেখাতে পারি আপনাকে, যদি দেখতে চান।

চিঠিতে লেখা ছিল—

কল্যাণবরেষু,

আমি আর তোমাদের কাছে ফিরব না। চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলুম, তথাকথিত ভদ্রসমাজে কোথাও আমার স্থান নেই। কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলুম না। হতচ্ছাড়া দেশকে গালাগালি দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আবার হঠাৎ আবিষ্কার করেছি, এই দেশকেই ভালোবাসি এর শত দোষ সত্ত্বেও। এ দেশ ছেড়ে কোথা যাব। তাই ঠিক করেছি, তোমরা যাদের অপাংক্তেয় করে রেখেছ তাদের মধ্যে গিয়েই এবার থাকব। বিদ্যাসাগর মশাই শেষ জীবনে সাঁওতালদেব মধ্যে এসে বাস করেছিলেন। তিনি নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন তোমাদের ভালো করতে গিয়ে, আমি নাস্তানাবুদ হয়েছি কিছু না করেই। তাই ঠিক করেছি, যে কটা দিন বাঁচি ভদ্রসমাজের আওতা থেকে দূরে থাকব। জানি না তুমি কোনও কালোবাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হযেছ কিনা, যদি না হয়ে থাকো আশ্চর্য হব। কালোবাজারের আলকাতরা তো সকলের গায়েই লেগেছে। কালোবাজারের আঁস্তাকুড়ে যাদের কিলবিল করতে দেখি, তারা তো সবাই সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রসন্তান। তাদের তোমরা বয়কট্ কর না, বরং সেলাম কর, কারণ তারা ধনী। গুণীদের নয়, ধনীদের পুজো করাই ভদ্রসমাজের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি দূর থেকে প্রণাম করে সে সমাজ থেকে সরে পড়েছি।

আমাকে খোঁজবার চেষ্টা কোরো না। যে মহাসমুদ্রে এবার গা ভাসিয়ে দিতে চললুম, তার চেয়ে বড় সমুদ্র ভূগোলে নেই। এ সমুদ্রের ঢেউ দীন হীন আর্ত অসহায়েরা। এদের ত্রাণ করবার জন্যেই ভগবান নাকি মাঝে মাঝে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন, তাঁরও খোঁজ করবার ইচ্ছে আছে।

আমার পেন্‌সনের অর্ধেকটা 'কমিউট্' করে দিয়ে গেলাম তোমাকে। আশীর্বাদ জেনো সকলে। ইতি—

শুভার্থী অগ্নীশ্বর

ইহার বেশী আর কিছুই জানিতে পারি নাই। আসিবার সময় তাঁহার ছেলের নিকট হইতে তাঁহার একটি ফোটো জোগাড় করিয়া আনিয়াছিলাম। সেইটেই আমার শুইবার ঘরের একমাত্র ছবি। সকালে উঠিয়া ছবি দেখি, আবার রাত্রেও সেই ছবি দেখিয়া শুইয়া পড়ি।

অগ্নীশ্বরের কাহিনী শেষ হইল। কিন্তু তিনি আমার কাছে আজও অশেষ। ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছিলেন—অগ্নি পরমাত্মার সঙ্কেত, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সে অগ্নির আহুতি। অগ্নি নিজে বলিয়াছেন, 'আমি দেব, যেখানে দেব-ভাব নাই সেখানে আমি থাকি না, যে যজ্ঞস্থল অপবিত্র সে স্থান পরিত্যাগ

করিয়া আমি শুষ্ক অরণীর মধ্যে আত্মগোপন করি। যে আমাকে প্রার্থনা করে, সেই আমাকে দেখিতে পায়। তাহার নিকটই আমি অমৃতরূপে প্রকাশিত হই। আমি শুধু পৃথিবীতেই নিবদ্ধ থাকি না, দ্যুলোকেও আমি নিয়ত গমন করি। সেখানে সূর্যই আমার সঙ্গী, তাঁহারই সহিত আমি পৃথিবীকে রূপ হইতে রূপান্তরে লইয়া যাই নানা ঋতুতে। আমি পবিত্র করি, অলঙ্কৃত করি এবং ধ্বংসও করি। যাহা নশ্বর তাহাকে দগ্ধ করিয়াই আমি বিকীর্ণ করি অবিনশ্বর জ্যোতি, যাহা অম্লান, নিষ্কলুষ, চিরদীপ্ত।'

ছবিটির দিকে চাহিয়া আমি অগ্নির এই ভাষা যেন শুনিতে পাই। যেন দেখিতে পাই, তিনি এক জ্যোতির্ময় অনন্ত পথে ঋজুপদবিক্ষেপে চলিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ, তাঁহার মস্তক আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহার রূপে দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত।

আমি নির্বাক হইয়া চাহিয়া থাকি আর মনে মনে বলি,—

"হে অগ্নীশ্বর, তোমার নাম সার্থক, তোমার কর্ম সার্থক, তোমার জীবন সার্থক। তোমাকে আমি প্রণাম করি।"

সত্য সত্যই তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া আছে, কিন্তু কোথায় তিনি? অনেক খুঁজিয়াছি, কিন্তু কোন সন্ধানই তো পাইলাম না। তিনি মারা গিয়াছেন একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অতবড় একটা আগ্নেয়গিরি সে কি লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্ষুদ্র প্রদীপের মতো নিবিয়া যাইতে পারে? বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু কোথায় তিনি?

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, পাকিস্তানে কিছুদিন থাকিবার পর আমি হিন্দুস্থানে চলিয়া আসিয়াছিলাম। এ কাহিনী বিহারে বসিয়া লিখিতেছি।

যে বেদের দল ধরা পড়িয়াছিল, জামিনে তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই। যে দারোগা সাহেব তাহাদের ধরিয়াছিলেন, তিনি একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলিলেন, 'ওরা তো কিছুই কবুল করতে চাইছে না। সনাতন উপায় অবলম্বন করব কি?"

"কি উপায়—"

"মারধোর—"

"ওদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পেয়েছ কি?"

"না। হাতেনাতে তো ধরা যায়নি। সন্দেহের উপর ধরা হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা, সম্প্রতি যে ক'টা খুন হয়েছে তা ওরাই করেছে।"

"এ ধারণা হল কেন তোমার—"

"ওরা যেখানেই গেছে সেখানেই খুন হয়েছে। লালারাম, বিশ্বেশ্বর ঘোষ, রাঘব দালাল, জাফর আলী এদের প্রত্যেকের বাগান বাড়িতে ওই মেয়ে তিনটে নাচগানও করেছে—"

"ক'টা মেয়ে আছে?"

"তিনটে। মানে, তিনটেকে আমরা ধরেছি। কিন্তু শুনছি নাকি ওদের দল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। অদ্ভুত ওদের মোহিনী শক্তি, স্যার। জেলের ওয়ার্ডারগুলোকে সব বশ করে ফেলেছে। আমার মনে হয় বেশীদিন ওদের আটকে রাখা যাবে না, জেল থেকে ঠিক ওরা পালাবে। ওই ওয়ার্ডাররাই ওদের ছেড়ে দেবে। আজ সকালে দেখি সেলের ভিতর একটা মেয়ে গান গাইছে, আর ওয়ার্ডারগুলো বাইরে বসে তাল দিচ্ছে। আমার মনে হয় সনাতন উপায় অবলম্বন না করলে ওদের কাছ থেকে কিছুই বার করা যাবে না—"

সনাতন উপায়ের নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই ছিল, সুতরাং আমি কোন কারণেই কোন কয়েদীর উপর শারীরিক অত্যাচার করিতে দিতাম না।

"না, মারধোর কোরো না। সেটা আইন নয়।"

"কিন্তু এমনিতে ওরা কিছু বলতে চায় না। মেয়ে তিনটি খালি মুচকি মুচকি হাসে, আর

ওদের দলপতি খাখা-বাবা বলেন, আমি কিছু বলব না। আমার মনে হয় ওই লোকটাই সমস্ত অর্গানিজেশনের ব্রেন। মেয়ে তিনটি প্রায়ই যেতো ওঁর কাছে।"

"খাখা-বাবা থাকেন কোথা? মুঙ্গেরেই?"

"না, মুঙ্গেরে আমরা ওঁকে ধরেছি, কিন্তু উনি মাত্র সাতদিন আগে সেখানে এসেছেন। মেয়ে তিনটেও ওঁর বাড়িতেই ছিল। তারা বলে, উনি নাকি ওষুধ দেন। যাই হোক, আমরা সবাইকে ধরে এনেছি। প্রমাণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই চারটে খুনের মূলেই ওরা আছে।"

"আচ্ছা, ওদের সঙ্গে আমিই কথা কইব। এইখানেই নিয়ে এস।"

একটু পরেই দারোগা আসিয়া খবর দিলেন, "ওদের এনেছি। পাশের ঘরে বসাব?"

"বসাও।"

আমি বিবাহ করি নাই, প্রকাণ্ড কোয়ার্টারে একাই থাকিতাম। ঘরের অভাব ছিল না। আমার আপিসও আমার কোয়ার্টারেরই একধারে ছিল।

একটা লোডেড্ রিভলভার পকেটে পুরিয়া পাশের ঘরে গেলাম। গিয়া কিন্তু চমকাইয়া উঠিলাম। খা-খা বাবা? এ যে ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায। মেয়ে তিনটিও অপরূপ, যেন তিনটি অপ্সরা। নির্নিমেষে খা-খা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। না, আমার ভুল হয় নাই। এ ছবি যে রোজ দেখি।

দারোগা সাহেবকে বলিলাম, "আমি একে একে এদের সঙ্গে কথা বলব। মেয়ে তিনজনকে অন্য ঘরে বসাও। তুমিও ওদের কাছেই থাক গিয়ে, এখানে কাউকে থাকতে হবে না।"

সকলে চলিয়া গেলে প্রশ্ন করিলাম, "আমাকে চিনতে পারছেন?"

খা-খা বাবা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "কই না, আপনাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"আমি কিন্তু আপনাকে চিনেছি। আপনি খা-খা বাবা নন্, আপনি ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়।"

তাঁহার মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "না, আপনার ভুল হয়েছে! চেহারার সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয়। আমি অগ্নীশ্বর নই, আমি খা-খা বাবা।"

"এ রকম অদ্ভুত নাম নিয়েছেন কেন?"

"যে নাম নিয়েছি, সে নামের উপযুক্ত আমি নই। কিন্তু আপনারা রোগা ভীতু ছেলের নামও তো বীরেন্দ্র বা রুস্তম রাখেন। এইটেই রেওয়াজ এদেশে। যার অন্তরে বাইরে ময়লা ঠাসা তার নাম নির্মল, বিমল বা অমল। দিগ্বিজয়ী বীর চেংগীস্ খাঁর নাম ছিল খা-খা খাঁ। আমার বাবা বোধহয় ভেবেছিলেন, আমি দিগ্বিজয়ী বীর হব তাই ও-নাম রেখেছিলেন।"

"আপনারা কি মুসলমান?"

"না, আমি ব্রাহ্মণ। ও খাঁ শুনে মুসলমান ভাবছেন বুঝি? চেংগীস্ খাঁও মুসলমান ছিলেন না। সেকালে যাযাবর নোম্যাড্দের যাঁরা দলপতি হতেন তাঁদের উপাধি হতো খাঁ। কিম্বা খান্। চেংগীস্ খাঁ নামটাও আসলে নাকি ঘেগিংস খাঁ—"

কথা শুনিয়া আমার আর সন্দেহ রহিল না। এ রকম কথা অগ্নীশ্বর ছাড়া আর কেহ বলিতে পারেন না।

বলিলাম, "চেহারার সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয় তা জানি। কিন্তু অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে চিনতে পারব না, এতবড় ভুল আমার হতে পারে না।"

"আপনার এতবড় আত্মপ্রত্যয়ের হেতুটা কি—"

"তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর ছবি আমার শোবার ঘরে টাঙানো আছে।"

"প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন? কি রকম?"

"সব বলছি। আপনি অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় এ বিশ্বাস যদি আমার দৃঢ় না হতো তাহলে যা বলতে যাচ্ছি তা আপনাকে বলতাম না। কারণ একথা জানাজানি হলে আমাব চাকরি যেতে পারে। দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, তবু যেতে পারে। কারণ আমি যা করেছি তা প্রতারণা।"

অগ্নীশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে একটা কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। আমি তখন তাঁহাকে অকপটে সব খুলিয়া বলিলাম। শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে তিনি বলিলেন, "আপনি যার কথা বলছেন, আমি সে লোক নই।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা, আপনার আসল পরিচয় তাহলে জানতে পারি কি? আপনি কি করেন, কোথায় থাকেন, এই দলে কি করে এলেন, পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে যে সব চার্জ এনেছে সে সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে কি না—"

"আমি আমার সম্বন্ধে কিছুই বলব না। সত্য আপনিই বেরিয়ে পড়বে। এইটুকু বলতে পারি, যে মেয়ে তিনটিকে ধরে এনেছেন তার আমার কন্যাস্থানীয়া।"

"ওদের নিয়ে আপনি বেদের দল গড়েছেন?"

"ধরুন গড়েছি। তাতেই বা ক্ষতি কি?"

"আপনার মতো লোক বেদের দল গড়েছেন একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে কবে না।"

"কেন, বেদেরা কি হেয়? ওবাই তো সবচেয়ে বেশী স্বাধীন। ওদের কোন বন্ধন নেই। বন্ধনেব যে দু'টো প্রধান শিকল 'কর্তব্য' আব 'সম্পত্তি' সে দুটো কথাই নেই ওদের অভিধানে। ওদের সঙ্গে যদি যোগ দিয়ে থাকি অন্যায়টা কি হয়েছে তাতে?"

"আপনাদের চলে কি করে?"

"ওই মেয়ে তিনটি নেচে গেয়ে অনেক টাকা রোজগার করে। ওদের গান শুনবেন?"

"না। কিন্তু আপনি যা বলেছেন তা মনে নিচ্ছে না। আপনি যে ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনি যদি বেদের দল গড়েও থাকেন তাহলে তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। হয়তো সেটা ন্যায়সঙ্গত নয়। আপনি আমাকেও অন্যায়ভাবেই ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পিছনে একটা দেশভক্তির প্রেরণা ছিল। এর পিছনেও নিশ্চয়ই কিছু আছে একটা। সেইটে কি আমি জানতে চাই। বিশ্বাস করুন, আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। কিন্তু সত্যকথাটা আমি শুনতে চাই। যে অগ্নীশ্বরকে আমি মনের মন্দিরে দেবতার মতো সাজিযে রেখেছি তাকে এমনভাবে বিসর্জন দিতে পারব না।"

অগ্নীশ্বরের ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত হইল।

"দেবতার মতো সাজিয়ে রেখেছেন? সত্যি?"

"সত্যি। আপনার সত্য পরিচয়টা দিন।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া অগ্নীশ্বর বলিলেন, "একটা জিনিস যদি লক্ষ্য করে দেখেন, তাহলে হয়তো সত্যের কিছু আভাস পেতে পারবেন। যে চারটে লোক খুন হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই দেশের শত্রু, প্রত্যেকেই ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার। লক্ষ লক্ষ গরীব লোককে বঞ্চিত করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে ওরা—"

"তাহলে কি—"

"হ্যাঁ, মনে করুন না তাই। আমি বাঙালী, বিদ্রোহ আমার মজ্জাগত। মনে করুন, দেশের শত্রু নিপাতের আমি অভিনব পন্থা বার করেছি। ধরুন আমার মনে হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বাঙালী একদিন ইংরেজের সঙ্গে লড়েছিল এইবার তার দুর্নীতির সঙ্গে লড়া উচিত। যদি দরকার হয় তার জন্য প্রাণ দিক—"

তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, "আমি আমার শেষ জীবনে দেশকে শত্রুমুক্ত করবার এই উপায় অবলম্বন করেছি এই ভেবে যদি আপনি তৃপ্তি পান, তাহলে তাই ভাবুন—"

"আমরাও তো আইনের সাহায্যে ওই কাজই করছি। দুর্নীতি দমন আমাদের একটা প্রধান কাজ—"

"তা জানি। কিন্তু এটাও তো মিছে কথা নয় যে, সবাই আপনাদের জালে ধরা পড়ছে না। শুম্ভ-নিশুম্ভ, মহিষাসুর এরাও সাধারণ আইনের জালে ধরা পড়েনি। তাদের ধ্বংস কববার জন্যে অম্বিকা চণ্ডীর দরকার হয়েছিল। মনে করুন, আধুনিক উপায়ে আমি তাই করছি। ওই বেদের মেয়েদের মধ্যেই অম্বিকা আর চণ্ডীর রূপ প্রত্যক্ষ করেছি আমি—"

"কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ, ওই সব নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া কি আপনার সাজে?"

"ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আপনার পুরো ধারণা নেই তাহলে। নৃশংসতার ভয়ে ব্রাহ্মণেরা কোন কালে অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পিছ্‌পা হয়নি। পরশুরামকে কুঠার ধারণ করতে হয়েছিল, চাণক্যকে ষড়যন্ত্র করতে হয়েছিল নন্দবংশ ধ্বংস করবার জন্যে। এদেশে ব্রাহ্মণদের অধঃপতন হয়েছে বলেই এত দুর্দশা চতুর্দিকে। মনু পতিত ব্রাহ্মণদেব অপাংক্তেয় করেছিলেন কিন্তু এরাই আজ আসর জাঁকিয়ে বসেছে সব জায়গায়। ধরুন, যদি আমি ভেবে থাকি যে আমাদের স্বাধীনতাকে অম্লান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এদের সরাতে হবে, তা করতে গিয়ে যদি দু'একটা ভালো লোকও মারা পড়ে তাতেও ক্ষতি নেই, ফ্রেঞ্চ রিভল্যুশনের সময় ওরা রোব্‌সপেয়ার ড্যানটনের মতো লোককেও বলি দিয়েছিল।"

হঠাৎ অগ্নীশ্বর চুপ কবিয়া গেলেন।

বলিলাম, "বলুন, শুনতে খুব ভালো লাগছে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে ছেড়ে দেব—"

"দেখুন জীবনে কখনও কারো কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিনি। আপনাব কাছেও করছি না। আমাকে জেলে পুরে রাখলে বা ফাঁসি দিলে যদি আপনার চাকরির সুবিধা হয তাহলে তাই করুন। ওই বেদের মেয়েদের সঙ্গে আমি নরকে যেতেও রাজি আছি। ওরা নরককেও স্বর্গ কবে তুলবে। জিপ্‌সিদের ইতিহাস পড়েছেন? অনেকে বলেন, ওদের আদি নিবাস ছিল ভারতবর্ষ। আমাব মনে হয়, ওরাই রামায়ণ মহাভারতের গন্ধর্ব। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ওদের নিয়ে গিয়েছিলেন গ্রীসে। সেখান থেকে ওরা সারা ইয়োরোপে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি দেশে ওদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তা অবর্ণনীয়। কিন্তু তবু ওরা প্রত্যেক দেশেই টিকে আছে এখনও। শুধু টিকে নেই, নেচে গেয়ে মাত করে রেখেছে প্রত্যেক দেশকে। ওদের রঙ ওদের রূপ ওদের শিল্প, ওদের সঙ্গীতনৈপুণ্য আজও অলঙ্কার হয়ে আছে প্রত্যেক দেশের। ওই অবহেলিত অবজ্ঞাত কিন্তু দুর্জয়-প্রাণরসে-ভরপুর শিল্পীর দলে যদি ভিড়েই থাকি তাহলে ক্ষতি কি—"

আমার মনে হইল, আসল অগ্নীশ্বরকে এইবার যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। দেখিলাম তাঁহার চোখের দৃষ্টি হাসিতে ঝলমল করিতেছে। অনেক দিন হইতেই তাঁহার পাদস্পর্শ কবিয়া প্রণাম করিবার ইচ্ছা ছিল। উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আমার ভুল ভেঙেছে। আপনার কথায় অবিশ্বাস করেছিলাম বলে আমাকে ক্ষমা করুন।"

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন তিনি।

"একটা বক্তৃতার ধাক্কায় সব বদলে গেল। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল অতবড় যুক্তির ইমারত? সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস হয়ে গেল, আমি ওই বেদে মেয়েগুলোর সাহায্যে লোক খুন করে বেড়াচ্ছি? উঃ বৃক্ততার উপর কি ভক্তি, কি ভক্তি। একেবারে গদগদ হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ফেললেন! হা হা হা হা—"

তাঁহার অট্টহাস্যে সমস্ত বাড়িটা যেন কাঁপিতে লাগিল। দারোগা সাহেব পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে ইঙ্গিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। সত্যই আমি অপ্রস্তুত হইয়া

পড়িয়াছিলাম। বলিলাম, "আপনার কথায় অবিশ্বাস করবার শক্তি আমার নেই। আপনার সত্য পরিচয়টা দিন—"

"কি হবে সত্য পরিচয় জেনে? পৃথিবীতে ক'টা জিনিসের সত্য পরিচয় জানেন?"

"না, তবু বলুন।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কিছুতেই যখন ছাড়বেন না, তখন শুনুন। আমি মশাই ডাক্তার। মানুষকে বাঁচানোই আমার কাজ, মারা নয়। দুরাত্মা, মহাত্মা সতী-অসতী যে কেউ আমার কাছে অসুস্থ হয়ে আসবে তাকেই আমি সুস্থ করতে চেষ্টা করব। নেপোলিয়নের সেই গল্পটা মনে আছে? একবার এক যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন খুব বিব্রত হয়েছিলেন কতকগুলি মুমূর্ষু সৈন্য নিয়ে। তাদের খেতে দিতে হচ্ছে, অথচ তারা কোন কাজে লাগছে না। তখন তিনি আর্মি ডাক্তারকে ডেকে বললেন—'ওদের তুমি মেরে ফেল। কি লাভ ওদের বাঁচিয়ে রেখে।' ডাক্তার উত্তর দিয়েছিলেন—'আমার কাজ বাঁচানো, মারা নয়। আপনার হাতে অস্ত্র আছে, নিধন করাই আপনার কাজ, আপনিই মেরে ফেলুন না ওদের। আমি পারব না।" আমি সেই ডাক্তারের সগোত্র। এই হতভাগা দেশের রুগ্ন, খিটখিটে, বদমাইস, বেকারগুলোকে বাঁচিয়ে লাভ নেই জানি, কিন্তু তবু ওদের বাঁচাবারই চেষ্টা করি। ও ছাড়া আর কিছু পাবি না, জানি না। ওই জিপ্‌সি মেয়েগুলো আমার রুগী। আমার খগেশ্বর নাম ওদের মুখ দিয়ে বেরোয় না বলে ওরা আমাকে খাগা বাবা বলতো! সেটা ক্রমশ খা-খা - বাবা হয়ে গেছে? নামটার একটা ঐতিহাসিক মহিমা আছে বলে ও নাম আমি ত্যাগ করিনি। আমি এক জায়গায় থাকি না, নানা শহরে ঘুরে বেড়াই। ওই জিপ্‌সিগুলো কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়ে না। যেখানেই যাই খুঁজে বার করে আমাকে। ওদের নিজের চিকিৎসা ওরা নিজেরাই প্রায় করে নিজেদের ওষুধ দিয়ে। হালে পানি না পেলে আমার কাছে যাওয়া আসা করে বলে আপনার বুদ্ধিমান অফিসারটি আমাকেও ওদের সঙ্গে জড়িয়েছেন। ভক্তিটা হঠাৎ কমে গেল, নয়? চললুম গুড্ বাই।"

পরে সত্যই প্রমাণিত হইয়াছিল যে, খগেশ্বর মুখোপাধ্যায় ডাক্তারিই করেন। গরীবের ডাক্তার তিনি। দীন দরিদ্র অসহায় যাহারা, তাহাদেরই তিনি চিকিৎসা করেন। যে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করেন। মহত্ত্ব আস্ফালন কবিয়া কাহারও ফি ফেরৎ দেন না, জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু আদায়ও করেন না। সত্যই এক শহরে বেশী দিন থাকেন না। এক মাসের বেশী কোথাও না। সারা দেশময় তিনি ঘুরিয়া বেড়ান। একবেলা খান, স্বপাক। পরনে শাদা থান, লংক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে চটি।

যে ভদ্রসমাজ হইতে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, সেই ভদ্রসমাজ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই সম্ভবত তিনি খগেশ্বর নামের আড়ালে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।

এ অজ্ঞাতবাস হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করি নাই। কারণ, বুঝিয়াছি ইহাতে তিনি কষ্ট পাইবেন।

কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে জানি, তিনি খগেশ্বর নহেন, অগ্নীশ্বর। তিনি যেখানে যে নামেই থাকুন না কেন, তিনি পাবক, তিনি পবিত্র, তিনি উজ্জ্বল।

তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করি।

একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এক

'হ্যাঁ গো, কেন এলে মরতে এ পথে? এ ধারের পথই দূর, অনেক ব্যাঁক। বাবাঃ, বালি কি তাত তেতেছে! পা পুড়ে গেল! ও হেমা মাসী, আর যেন জেবনে এ পথে হাঁটিস নে। ওরে বাবা! দৌড়ে-দৌড়ে চল—'

'ওলো ভালখাগি, পা শক্ত হবে। তোর কি আঙা চরণ? তাই চেহারে বসে থাকবি? আর পাঙ্খার বাতাস খাবি? এতটুকু পথ আর যেতে পারবি না? চল ঐ গাছতালাতে সবাই মিলে একটু বসব, তার পব ধীরে-সুস্থে ছেমায়-ছেমায় যাব। আর কতক্ষণ চোখ বুজে দে ছুট—'

হাট থেকে ঝাঁকা-মাথায় বাড়ি ফিরছে মেয়েরা। এক পাড়ার এক দল। হেমাঙ্গিনী সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে ছোট কুড়ানি। কুড়ানি আগে-আগে ছোটে, হেমাঙ্গিনী চলে ঢিকোতে-ঢিকোতে।

কেনই বা ছুটবে না কুড়ানি? পাতলা, ছিপছিপে পড়ন, বয়স কুড়ির এখনও চার-পাঁচ বছর বাকি। তার চরণ না বাঙা হোক, চলনটুকু রাঙা।

তিন মাইলের পথ ঐ সুজনতলার হাট। মাঝপথে নদী পড়ে। নদী পেরিয়ে বাগান। আব বাগান পেরিয়ে সামান্য কয়েক বিঘে জমির মাথায়ই এদের বাড়ি।

গা-হাত-পা-মেলা প্রকাণ্ড জাম গাছ। ফলেছে যেন মেঘ করে আছে।

উপর-ডাল থেকে কে হঠাৎ ডেকে উঠল ঃ 'ও মাসী, জাম খেয়ে যা—'

কে গাছে কে জানে! তবু হেমাঙ্গিনী দূর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'ওরে বাবা, পাড়, পাড়! ঢের করে পাড়। যাই—যাচ্ছি আমরা! বাবা! রোদে চিনচিন করছে।'

কুড়ানি আগেই গেছে গাছের তলায়। পাতার আড়ালে কোথায় কে লোক, ঘাড় তুলে এদিক-সেদিক তাকিয়েও খুঁজে পাচ্ছে না।

'ওগো, এই ধারে এসো।' উপর থেকে আবার কথা এল ঃ 'গাছতলায় বোসো। গা-টা জুড়োও। দুটো পাকা জাম খেয়ে মন ঠাণ্ডা করো।'

লোকের তবু দেখা নেই।

কুড়ানি ঘাড় বেঁকিয়ে উপরে তাকিয়ে ছড়া কাটল ঃ

'জিভ শুকিয়ে জরজর
গুপীনাথ ফলার করো।'

উপর ডাল থেকে অমনি কে চাপান দিলে ঃ

'জিভের উপর পড়লে জাম
জিভ অমনি কালো শ্যাম।'

লোকটা কী ফিচেল রে বাবা!

'এই দেখ, সরে যাও, গায়ে জাম পড়বে, কাপড়ে দাগ লাগবে। আমাব কিন্তু দোষ নাই।'

মুচকে হেসে কুড়ানি আবার উপরে তাকাল। আর অমনি দড়বড়িয়ে তার উপর জাম পড়তে লাগল।

কুড়ানি হাসে, নীচু হয়ে কুড়োয় আর দু-একটা মুখে পোরে।

'আঁচল মেলো—' নীচু ডালে নেমে এসেছে গাছের লোকটা।

কেন কে জানে, আঁচল পাতল কুড়ানি। তিন-চার থোকা জাম ঝুপ করে অমনি পড়ল সেই আঁচলে।

'ওরে ও কেশর। আচ্ছা সময়—তুইও ঠিক হয়েছিলি। পাড়, পাড়, দু'টো বেশি করে পাড়।' হেমাঙ্গিনীর দল চলে আসছে গাছের নিচে। 'ও আক্কুসী, খেতে নেগেছিস? কই রে, আমাদের দু'টো নড়িয়ে দে—'

হেমাঙ্গিনীর দল বসল গতর ছড়িয়ে।

'আজ বেপাড়ায় কেন মাসী? এ তো তোদের পাড়ায় যাবার পথ লয়।'

'ওরে বাবা, দুখ্‌কের কথা বলব কারে। যত গাঁয়ের লোক খাতায়-খাতায় আসছে, একটো বিড়ি খাবার জো নাই। তাই বুলি, চো, এই ধারে একটু ঘুরেই চো। ওরে! গাছে জাম কত রে! দে, দে, দু'টো নড়িয়ে দে। আঃ, রস কত রে! সময়ে বেশ কাজ।'

ঢের হয়েছে। আই নেমে আই।

এক ডাল এক-ডাল আস্তে আস্তে নেমে এল কেশর। নীচের দিকে চোখ সজাগ রেখে যেন নেমে আসাটা কত বড় হুঁসিয়ারির কাজ।

নেমে আসতেই হেমাঙ্গিনীর পাশ ঘেঁসে বসল গিয়ে কুড়ানি, আর বসল একেবারে বিমুখ হয়ে।

'দ্যাখ্ হেমা মাসী, এমন দোপর বেলায় নদীর এ ধারে আসতে নাই।'

'ক্যানে?'

'এই সব ধারে ভূত থাকে।'

হেমা মাসী উত্তর না দিয়ে জাম খেতে লাগল।

'হ্যাঁ গো, জ্যান্ত ভূত। ওই দেখছিস না শ্মশান, ঐখানে সব মড়া পোড়ায়। আমি ছোঁড়াগুলোকে গরু ঘিরতে বলে এই ধারে এসে পড়েছি। নিজ্জন জায়গা, গা ছমছম করে।'

'গাছটার জাম কিন্তু খুব ভাল।' হেমা মাসী ও-সব কথা কানেও তোলে না।

'কই, দে একটা বিড়ি।' কেশর হাত বাড়ায় ঃ 'বৌটা কাদের মাসী?'

'ক্যানে, চিনিস নে? ন্যাকা!'

'কি করে চিনব?'

'ক্যানে, হরাং-এর বৌ লয়? ও আমার কি হবে—'

মনে মনে হিসেব করতে লাগল হেমাঙ্গিনী। সম্পর্কের খেই ছাড়াতে না পেরে বললে, 'হ্যাঁ রে, তোদের পাড়া আর আমাদের পাড়ায তফাৎ কত?'

'নদীর এ-ধার আর ও-ধার।'

'হাঁ রে, তু যে অবাক কল্লি। দ্যাখ লো দ্যাখ, কেশরার কান্ড দ্যাখ—'

'তোদের পাড়া আর আমাদের পাড়া অনেক দূর।' কেশর বললে অন্যমনার মত ঃ 'আবার অনেক কাছে। এই দ্যাখ, যখন বান মরে যায় তখন হয় কাঁদর, কাছে, আর যখন বান বাড়ে তখন হয় নদী, তখন কত দূর হয় বল দিকি? আমি ডাক্তারবাবুর বাড়ি থাকি, কালে-কস্মিনে এক-আধ বার যাই। কি করে সকলকে চিনব?'

'তা বটে বাবা, তা বটে। তোমার যে-আসা খুবই কম। এই দ্যাখ না কেনে, তু তো ছেলেমানুষ, তত দূর জানিস নে বোধ হয়—তুর মা আমার সোদর পিসির বিটি—পর-পত্যাশা লয়। গাছটার মাইরি জাম কিন্তু বেশ ভাল।' হেমাঙ্গিনী জাম খেতে লাগল।

'ওরে হেমা, চল, আর আরামে কাজ নাই। বাড়ি গিযে আঁদতে হবে।'

মেয়েরা আবার পথ ধরল।

কুড়ানি ফাঁকে-ফারাকে থাকছে না, বুড়িদের গায়ের সঙ্গে লেপটে-লেপটে থাকছে। ভর-দুপুরে তাকে ভূতের ভয়ে ধরেছে।

গলা ছেড়ে গান ধরল কেশর—

আমার মন কেড়ে পালিয়ে

গেলে ভাল তো হবে না

ভালো তো হবে না—

ওহে ভাল তো হবে না—

কুড়ানি আপন মনে পথ চলে, কিন্তু পায়ে হোঁচট লাগে। হাওয়াতে গায়ের কাপড় টেনে ধরে।

অনেক দূর গিয়ে ফিরে তাকাল একবার। গাছের আড়ালে নজর চলল না।

২

ময়লা চিট-ধরা কাঁথা গায়ে দিয়ে উঠানের রোদে পড়ে আছে হোরাং। ঘণ্টা তিনেক আগে জ্বর এসেছে হু-হু করে, হয়তো আধ ঘণ্টাটাক পরেই আবার ছেড়ে যাবে।

তা হলেই আজকের মত ছুটি। আজকের মত ভাল-থাকা।

তার পর কাল। কালকের কথা কাল দেখা যাবে।

দাওয়ার এক কোণে হেঁসেল। কুড়ানি সেই যে ঘরে ঢুকেছে আর বেরোয় না। হেঁসেল খটখট করে।

'কি গো, আঁদবে না আজ?' হোরাং একবার কাতরে উঠল।

'দাঁড়াও গো দাঁড়াও। সব দিন সমাবি দেহ সমান থাকে না। আমার গা মাথা ঘুচ্চে—'

হোরাং চুপ করে গেল। জ্বরটা বুঝি ছেড়ে যাচ্ছে। ঘাম দিয়েছে কুলকুল করে।

তবু কুড়ানি বেরোয় না। দেয়ালে পিঠ রেখে চুপ করে বসে থাকে।

'তবে চাট্টি মুড়ি দে খাই—' হোরাং উঠে এল দাওয়াব উপর।

'মুড়ি নেই।'

'এই তো সে দিন ভাজলি—'

'খরচ হয় না? পিতি দিন দু'খোরা করে যে সেবা করছ তাতে ক'দিন চলে শুনি?'

জ্বরটা ছেড়ে গেলেই ভীষণ খিদে পায়। যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড খাওযা যায় এক গেরাসে। আর তখন খাবার না পেলে মেজাজ ত্যাড়া হয়ে ওঠে।

'যা না, মালো-বাড়ি থেকে ধার করে আন।'

'মালো-বাড়িতে কি দাদন দিয়ে থুয়েছ যে রোজ-রোজ ধার করে আনব? কাজের বেলায় নাই ভোজনে দেড়া। ধার করতে হয় তুমি কর গে।'

সমস্ত ঘরে জানলা নেই একটা। তবু মাঠের মধ্যে যে হাঁটা-পথ সে পায়ে-পায়ে ফেলে এসেছে তাই যেন একবার বোজা চোখে খুঁজে বেড়ায়।

'একটু আগুন পেলেও না হয় তামাক খেতাম—'

বড় বাজল এসে কথাটা।

ঝটকা মেরে উঠে পড়ল কুড়ানি। শরীরের আদর-আরাম নেই, আবার এখুনি উনুন কোলে নিয়ে বসতে হবে। তোমার কি। খালি মুখ-সাপট। তাই মাঠও তোমার ঠকঠকে। যার মুখ ফলে তার খ্যাত ফলে না।

'তরকারিতে নুন দাওনি নাকি? অম্বলে নুন দেখি খুব বেশি। ব্যাপার কি? ওদে তোমার মাথা খারাপ হয়েছিল নাকি?' হোরাং খায় অথচ আপত্তি করে।

'বলবার ভাবনা কি। আমার দেহ তো আর দেহ লয়। পুড়ে গেলেই বা কি, ভেসে গেলেই বা কি। কাল থেকে নিজে আন্না করে খেয়ো।'

'বাবা, একটা কথা বুলতে পারব না তুকে।' হাত তুলে বসে রইল হোরাং।

'আমার আসতে দেরি হল, কই, কেউ চাপাতে পারেনি? মা কই আজো এলো না। বাবা! বিটির বাড়ি অমনি সবারই।' ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়াল কুড়ানি ঃ 'লাও, খাবা তো খাও, আমি শুয়ে পড়ব। আমার গা-মাথা ঘুচ্চে—'

ঘুম আসে না, শুধু ছটফট করে। সত্যিই কি অসুখ হল নাকি? হোরাং কতবার শুধাল, ও বৌ, ও বৌ! বৌ সে-কথা কানেও তুলল না। একবার শুধু বললে, 'আমার গায়ে হাত দাও। ধর। দেখ তো, জ্বর এল না কি?'

গা তো নিটুট ঠান্ডা। জ্বর কই।

৩

'কাকি ঠাকরুন।'

'কে গা?'

'আমি কেশরেব মা, কেশবের ভাত লিতে এয়েছি।'

ডাক্তার-গিন্নি মোটা মানুষ, নদপদ করে চলে। ভেতরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললে, 'কেনে, কি হল কেশরের?'

'কেশব আমার গরু চরিয়ে এসে প্যাট ব্যথা করছে বলে শুয়ে পড়েছে। আর আপনাদের বাড়ি আসতে পাল্লে না। কি হলো কে জানে। ডাক্তাব বাবু তো বুঝি বাড়িতে নাই।'

'না, শহরে গেছে। এক বেলার একটু কি অসুখ, একেবারে ডাক্তারের খোঁজ! তোর ছেলের দেখছি যে নবাবী চালের কথা।'

'না মা, তার জন্যে লয়। বেশি বাড়াবাড়ি হলে আপনারাই তো দেখবেন-শুনবেন। আমি এসেছিলাম আমাদের ধানের খুব টানাটানি হচ্ছে। আমাদের ধানটা কবে পাব? ডাক্তার বাবু থাকলে একবাব শোদাতেম।'

'যা, যা, হবে এখন ধান। কেশরাকে কাল সকালবেলা পাঠিয়ে দিস। ও বাড়ি না থাকলে সব অচল হয়ে ওঠে। ছোট বাখালটা তো আর সব গরুর যত্ন নিতে পারবে না। বুঝলি? আমার বরাতি কাজ একটা এখনো বাকি আছে। কত দিন থেকে বলছি।'

ভাত নিয়ে চলে যাচ্ছিল কেশরেব মা, ডাক্তার-গিন্নি আবার ডাকল। বললে, 'এবার কেশরেব বিয়ের জোগাড় দ্যাখ। অসময়ে এমন কাজ-কামাই ভালো নয়। যোগ-সময় হলে বিয়ে দিয়ে দে ঝট কবে।'

কেশরের মা বাঁ-হাতে আঁচল হাটকে চোখ মুছল। বললে, 'আমি কি আর বিয়ে দিতে পারব মা? মাতা-ছাতা নাই। ঘর থেকে দু'পয়সা বার কত্তে পারব না। আপনাদের দুযোর ধরে পড়ে আছি। আপনাদের দয়ায়ই এই আকাল তরলাম। কেশরের বাপ মরে থেকে কি কষ্টই হল মা—'

একবার যখন সুরু করেছে তখন থামবে না শিগগির!

ডাক্তার-গিন্নি এক কথায় থামিয়ে দিলে। 'যা বাছা যা, আমি ওর বে-তে কিছু দেব। ডাক্তার বাবুকে ধরবি, বুঝলি? বলবি একখানা গয়না দিতে হবে।' বলে এক গাল হেসে সে হাত ঘুরাল। ঝলসে উঠল নতুন-কেনা চপটলতা চুড়ি।

কেশরের ভাত ক'টি কেশরের মা-ই সাবাড় করল। কেশর শুধু বলে, জল দাও, জল খাব।

রাত ঝমঝম করছে। গাছের পাতা, মাঠের ঘাস পর্যন্ত ঘুমিয়ে। কেশরের ঘুম নাই। কেবল যুক্তি আঁটছে কি কৌশলে তার দেখা পাব, দুটো কথা কয়ে জীবন জুড়াব। হা আশা। হা নেশা। কেন ছুঁড়িকে দেখলাম! কেন দু'-চাবটে কথা বলতে গেলাম! হায় ভগবান, মানুষের মধ্যে কি মমতার সোঁত ঢেলে দিয়েছ। নইলে কেন এমন হয়? কোত্থেকে আসে এই মমতা? কে বলবে? কে আমায় উপায় করে দেবে? একবার কি হেমা মাসীকে বলব?

না, ছি—এ কি বলা যায় মুখ ফুটে? রাত তো আর পো-তে চায় না। রাত পোলে নদী পার হয়ে যাব না কি কুড়ানিদের পাড়া?

'মা, জল ঢালা আছে? দাও তো একটু খাই।'

'রাত তো আর পেভাত হয় না। কাক-কোকিল কি সব উড়ে গেছে?' ঘুমের মধ্যে মা বলে উঠল।

'কই মা, জল কই?'

'এ্যাঁ! কি বুলছিস রে কেশর? জল খাবি? আমার বাবা একটু কালনিদ্দিরে এয়েছিল। ঐ দ্যাখ, দেয়াল ধারে ঘটে আছে, খা। পিদিম জ্বালব?'

'জ্বালো মা, জ্বালো। পিদিমের আলোয় যদি ঘুম আসে।'

'কি হচে তোর বোল দিকিন?'

'কি হবে মা? জ্বর-জ্বালা তো বুঝতে পারছি না। শুধু বুকটা ধস-ধস করছে।'

মা পিদিম জ্বালালো।

'আমার হুঁকো-কলকেটা কোথায় একটু সরিয়ে দাও তো। জল-তামাক খেয়ে যদি একটু ঘুম আসে।'

ঘুম নাই। চিন্তায় হৃদয় বোঝাই। দেখা করতে যাব কি যাব না। দেখা করতে পাব কি পাব না! শুধু একটু চোখের দেখায় কি দোষ আছে?

কাক-কোকিল রা কেড়েছে এতক্ষণে। কেশব ধুড়মুড়িয়ে উঠল। রেলগাড়িতে সিটি দিয়েছে বুঝি। বুঝি এখখুনি ছেড়ে দেবে।

'মনিব-বাড়ি চললাম মা।'

'হ্যাঁ রে, এখন কি আত্রি পেভাত হয়েছে; ঝাড়ে-ঝোড়ে এখনো আত আছে। ওরে, আর একটু থেকে যা—'

হাওয়ার আগে ছুটল কেশর। ডোঙা নেই, ধারে-পারে, কাপড়-জামা মাথায় বেঁধে কাঁদর পাব হয়ে গেল।

এপারে এসে আবার ঠিকঠাক হল। ভিজে গা শুকিয়ে গেল।

ঢুকল কুড়ুর পাড়া। হোরাং-এর বাড়ি কোনটা?

পাড়ার মেয়েরা সংসারের কাজে লেগেছে। কেউ মাড়ুলি দিচ্ছে, কেউ ঝাঁট দিচ্ছে আঙনা। কেউ বা বালতি হাতে চলেছে গোড়ের ঘাটে।

'কে তুমি?' কুড়ানির হাত থেকে পড়ে গেল বালতি।

'আমি সেই জাম গাছের ভূত।' কেশর তৃপ্তিব হাসি হাসল : 'ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে পেলাম কাছে। কি, উত্তোর দাও।'

ভয়ে পাঁশুটে হয়ে গেল কুড়ানি। বললে, 'ওগো, পালাও, পালাও।'

'ভয় নেই। আমি ঘাড় ভাঙবো না, ঘাড়ে চাপবো।'

'কি পাগলের মত বকে তার ঠিক নাই, পালাও। আমার স্বামী উঠবে এখুনি। পাড়ার লোকে দেখে ফেলবে পালাও।'

'শুধু একটা কথা বল একটা কথা। তা হলেই চলে যাই।'

'কি?'

'ভরা-নদীতে সাঁতার দিতে পারব?'

এক মুহূর্ত এদিক-ওদিক তাকাল কুড়ানি। বললে, 'তুমি যদি পার আমিও পারব। জীবনের ভয় করব না।'

তার তার গলা নামিয়ে বললে তাড়াতাড়ি : 'যেমন গম্ভীরে এসেছ তেমনি গম্ভীরে চলে যাও। কেউ দেখে ফেলবে।'

৪

আশে-পাশের গাঁ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসছে। সন্দেহপুর গ্রামে রথের মেলা। সং বেরুবে অনেকগুলি। বেজায় ধুমধাম।

দোকান-পসার মন্দ আসেনি। তেলে-ভাজা, সপ-মাদুর, দিশি কামারের দা-বঁটি, বাঁশী, পুতুল, কাঠের খেলনা। দেবদেবীর ছবি। খাবারের দোকান এসেছে শহর থেকে।

লালচে ধূলো উড়ছে চার দিকে।

সর সর—ঐ পুতনো রাক্ষুসীর সং বেরিয়েছে!

কি কদাকার মূর্তি রে বাবা। কেষ্ট ঠাকুরের পুতুল বুকে লাগিয়ে চীৎকার করতে-করতে ছুটে আসছে! কি বিকট টুঁটি একখানা।

বা, কেষ্ট ঠাকুবের দংশন, যন্ত্রণাটা কেমন ধারা—দেখতে হবে তো!

সর সর সর—ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। মেয়েদের গোলের মধ্যে মেয়েরা দলা পাকিয়ে গেল। মজা পাবে কি ভয় পাবে বুঝতে পেল না।

'পুতনো এল ছুতনো করে
এখন প্রাণ বাঁচাবে কিসের জোরে।'

এধার ওধার ঘুরছে আব চেঁচাচ্ছে রাক্ষুসী ঃ

'বিষের জ্বালায় গেলাম মরে
এখন প্রাণ বাঁচাবে কিসের জোরে।'

বলতে-বলতে রাক্ষুসী পড়-তো-পড় একেবাবে মেয়েদের গোলেব মধ্যে গিয়ে পড়ল।

'সর সর, পালা! কাণ্ড দেখ দিকিন।'

'মরণ নাই? ওপবে এসে পড়েছে।'

বেছে-বেছে কোন একটা মেয়ের মাথায় চাপড় মেরে বসল রাক্ষুসী।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল মেয়েটা ঃ 'দূর হতভাগা! তিব্দুষে জকা!' বলতে-বলতে ভিড়ের চাপে পড়ে গেল মেয়েটি।

হৈ-হৈ কাণ্ড!

বাক্ষুসী এক লাফে পালিয়ে গেল মুলুক ছেড়ে।

'ওর আর কেউ লয় লো—ও কেশরা খালভবা। গেদে মদ ঠুকেছেন, দিগ-বিদিগ নাই।' বলাবলি করতে লাগল মেয়েরা ঃ 'বাবা! ওপরে এসে পড়েছে। থাকত বাঁশ, বসিয়ে দিতাম।'

এই লাও, কালী বেবিয়েছে এবাব।

'ওগো, আমার নাকের আপেল কই? এ্যাঁ! কি হবে গো?' গায়ের ধূলো ঝাড়তে-ঝাড়তে কেঁদে উঠল কুড়ানি।

কি সর্ব্বনাশ! আশে-পাশের মেয়েবা নড়ে-চড়ে উঠল। পড়ে ঝরে গেছে বোধ হয়।

'না লো না। ঐ যে রাক্ষুসী তোর মাথায় চাপড় মারলে তখুনিই সেটা টেনে লিয়েছে নিশ্চয়।' ফোড়ন দিলে নাথু কেওটের বউ, এককড়ি।

'তু অত লপ-লপ করে বলবি নে।' চোখ পাকিয়ে ঝিকিয়ে উঠল কুড়ানি ঃ 'আমার মাথায় আবার চাপড় মারলে কখন! এই তো দেখলাম এখুনি গায়ের ওপর। এখুনি পড়ে গেল আঁচল ঝাড়তে। ওগো, তোমরা খুঁজে দাও গো—তোমাদের পায়ে পড়ছি।'

সকলে খুঁজতে লাগল। এককড়ি পর্যন্ত।

কালী বেরিয়েছে, কালী দ্যাখ কেনে। এক দিকে কালী, আরেক দিকে কৃষ্ণ। আবার গান ধরেছে সং ঠাকুর।

আমি কালা কালী জানি না
ভিন্ন কিছুই দেখি না
যে শ্যাম সেই শ্যামা—
আর তো কিছুই বুঝি না।

কে দেখে ও-সব। বসে-বসে ঘুরে ঘুরে এপাশ-ওপাশ খুঁজছে কুড়ানি।

'কি মুস্কিলে পড়লাম! বাড়িতে কি বলবে বল দিনি।'

এককড়ির মনটা ভিজে উঠল। বললে, 'বা, তুর কি দোষ! গায়ে পড়ে ডাকাতি করে কেউ যদি ছিনিয়ে লেয় তুই কি কত্তে পাবিস? সাপের লেখা বাঘের দেখা। বাঘ অমনি না বলে-কয়েই এসে পড়ে।'

'তোর ঢং থো। বুকে যেন কে ঢেঁকি কুটছে।'

'কেনে, হারিয়ে গেছে বুলবি। আবার কিনে দেবে। অত কি।'

'কিন্তুক সোনা হারানো তো পাপ।'

'আর মন হারানো?'

৫

'তুমি অত সকাল-সকাল ফিরলে যে মেলা থাকে?'

'শরীরে বেজুত ধরেছে। জ্বরটা আজ আর লরম পড়ল না।' হোরাং বললে ধুঁকতে ধুঁকতে।

কুড়ানি হাঁপ ছাড়ল। রাতে আর হোরাং হাঁটবে-উঠবে না, গোঁজ হয়ে শুয়ে থাকবে। পিদিমের আলো এখন আড়াল করে রেখে খানিক বাদে হাতের থাবড়ায় নিবিয়ে দিতে পারবে। মুখের উপর আলো পড়তে দেবে না।

মুখের উপর আলো পড়লে কি। মুখটা কেমন না-জানি, অচেনা-অচেনা লাগবে। মনে হবে কি যেন নেই। চাঁদের যে কলঙ্কটুকু শোভা তাই যেন হঠাৎ মুছে গিয়েছে?

'শুনলাম মেলায় নাকিনি ডাকাত পড়েছিল?'

'ডাকাত?' কুড়ানির বুকের ভেতরটা আঁক করে উঠল। 'মেয়েদের গোলের মধ্যে ঢুকে নাকিনি কার গা থেকে গয়না কেড়ে লিয়েছে একখানা।'

'যত সব গাঁজা-গুলির গল্প! কি হয়, আর কি রটে। সেই যে গো, নাথু জেলের পরিবার— এককড়ি, তার নাকি আপেলটা হারিয়ে গেছে। তাও হারিয়ে গেছে কি নাই। একবার বলে, ছিল নাকে, আবার বলে ছিল বাড়িতেই আছে প্যাঁটরার মধ্যে—'

'এই?' একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হল হোরাং। পাশ ফিরল।

বিশ্বাস করেছে। যদি ধরা পড়ত কুড়ানি, আর যদি বলত, এককড়িকে একটা রাতের জন্যে ধার দিয়েছি তা হলেও হয়ত বিশ্বাস করত। কিংবা যদি বলত, তার মার কাছে আছে তা হলেও নালিশ করত না।

আশ্চর্য, তার তো কোনো ঘাট নেই, তবু বলতে-কইতে ঠকছে কেন? যে চোর, যে হতচ্ছাড়া, তাকে চোর আর হতচ্ছাড়া বলতে দুঃখু কি?

অথচ সোয়াস্তিও নেই এক কড়া। যা বলবে তাই মেনে নেবে। তবু কেন এমন ভয়-ভয় করছে? হিয়ের মধ্যে কেন আগুন জ্বলছে কুলকাঠের?

আঁধারে শুতে এসে কুড়ানি বললে, 'শুনছ?'

'শুনছি। ঘুম নাই।'

'আমার মার খুব অসুখ। বাবা খবর পাঠিয়েছে। লোকটার সঙ্গে মেলায় আমার দেখা।'

'কে লোক?' কোনো আটা নেই হোরাঙের।

'আমাদের গাঁয়ের লোচন কুনাই। ছোট ছেলে গো ছোট ছেলে। সটান আসছিল এ কড়ে, মেলাখেলা দেখে ঢুকে পড়ল। আমাকে দেখে হেঁকে বললে, কুড়ান দিদি, তোর মার খুব জ্বর—জ্বরে একেবারে বেমার—'

সাড়া নেই ধারা নেই চুপ করে পড়ে আছে হোবাং।

'আমি কাল যাব বাপের বাড়ী। মাকে না দেখে থাকতে লারব।'

বেশ কথা। তপ্ত অঙ্গ শীতল হয় শুনে। মা এখনো বোনের বাড়ি থেকে ফিরল না। হোরাঙেব দেহেব এই তো হাল। হর-দিন মুনিষ খাটতে পারে না। রোজগারপাতি কাহিল। তার উপর বউ চললেন বাপেব বাড়ি। তার মানে, নিজের পিণ্ডি নিজে চটকাও। নিজের ভাতেই বেগুনপোড়া দাও।

'বেশি দেরি করব না, ঝট করে চলে আসব। কিছু কাড়ছ না কেন?'

'বেশ তো, যাবে।' হোরাং পাশ ফিরল ঃ 'পাখাতো নাই যে উড়ে পালাবে ফুড়ুৎ করে। রাতটা আগে পো'ক।

'না গো, ভোর রাতেই রওনা হব। পাখা নেই পা তো আছে। ভয় নাই কুনু, সঙ্গে হেমা মাসীকে লিয়ে যাব।'

'না, ভয় কি। হোরাঙের ভয় কি। যে পাখি ছুট দেয় সে পাখি কি পোয মানে?

বা, মায়ের অসুখে মেয়ে যাবে না? মেয়ের অসুখে তাব মা যায়নি? তা ছাড়া অদেষ্টে পালকি-গাড়ি যখন করেনি তখন গা-গতরের উপরই তো ভরসা রাখতে হবে। গড়ন পিটন ভাল আছে কুড়ানিব। জ্বরে ঝুরো-ঝুরো করেনি তাকে। তরতরে জলের মত ঠিক চলে যেতে পারবে। সঙ্গে যদি হেমা মাসী থাকে চুলের ডগাটি কেউ ছুঁতে পাবে না।

না, ভয় কি। ছেলেমানুষ, মার অসুখ শুনে তাড়াতাড়ি তা করবেই। যাক, দু'দিন হেসে-খেলে আসুক। ক্ষেমা-ঘেন্না করে হোরাং পারবে'খন দু'টো ফুটিয়ে নিতে। জ্বর যদি বেশি চাপে, না হয় দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকবে।

জ্বরটা বুঝি ছেড়ে গেল হোরাঙের। ঘামেব সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এল।

কিন্তু এত নিশ্চিন্ত হয়েও কুড়ানির ঘুম নেই কেন?

রোগও নেই বালাইও নেই, তবু কেন সে ছটফট করছে? তার দোরের ছিটকিনি নিটুট আছে, ঘরের একটা বাঁশ-খুঁটিও তার নড়েনি, তবে তার ভয় কিসের?

অনেকগুলো মিথ্যে কথা বলেছে, তাই?

সংসারি-গৃহস্থি করতে হলে অমন দু'চারটে কথা বলতেই হয় ইদিক-সিদিক। তাকে মিথ্যে কথা বলে না।

৬

'এই সময় একটু সময় আছে বাবুদিদি। আপনার সেই বরাতি কাজটা—'

'এখন সময় হয়েছে শালো?' মুনিব-গিন্নি তেড়ে এলেন ঃ 'আজ কত দিন থেকে খোসামুদি করছি, ওরে কেশোর, যা রে—শালোর আমার কাজই ফুরোয় না—'

'চাষের কাজ এক রকম সারা। কেবল কালকের দিন আক ক'টা বাঁধতে পারলেই খালাস। যদি বলেন তো কাল-পোরশুর মধ্যেই যেতে পারব।'

'কালই যা। আমি চিঠি লিখে রাখব।'

'তিন-চার দিন ছুটি দিতে হবে কিন্তুক।' চোখের খুশি ছিটকে পড়ল কেশরের।

'কেনে, মতলবখানা কি?'

'দূরের পথ তো। গাঁ-ঘরও ঘুরে আসব এই ফাঁকে।' বলেই তাড়াতাড়ি কথা পালটাল কেশর ঃ 'আচ্ছা বাবুদিদি, কোন পথটা সুবিধের হবে বলুন দিনি। সোনার ডিহির কাঁদরটা পার হওয়া কঠিন ঠেলা। সব সময় নৌকো-ডোঙা থাকে না। আসলপুরের ভেতর দিয়ে গেলে অনেকটা ঘুর হয়—'

'আমি রাস্তার কি জানি রে শালো? আমি গাঁয়ের পেসিডেন?'

হোঁচটটা সামলে নিল কেশর। 'যা হয় তাই হবে। জয় গুরু বলে চলে যাব। মরা কোয়োর আবার চড়কের ভয়!' বলেই আবার এক পা ফিরল। 'হ্যাঁ, আমার সেই টাকা ক'টা বাবুদিদি—'

'কেনে, টাকা দিয়ে কি করবি?'

'ধার শুধব।'

'কত ধার?'

'এই গোটা কুড়ি।'

'বলিস কি ভেষণ কথা? কার ঠেঁয়ে ধার? তোর মা জানে?'

'ঠিক ধার লয়।' থতমত খেল কেশর। 'এই এক জনকে দিতে হবে। তার বড় ঠেকা। খাজনার দায়ে জমি লাটে চড়েছে।'

'আমার সঙ্গে চালাকি? পরের জমি লাটে উঠুক তোব তাতে কি? কি হয়েছে লুকোস নে বলছি।'

কেশর আরো একটা মিথ্যে কথা বলল ঃ 'আসল কথা কি, জমি ধবব একখানা। কাঠা দশেক। দোফসলী জমি। তারই জন্যে আগাম বায়না দিতে হবে।'

'সোজা কথা খোলামেলা না বলে তা-না-না-না করছিস কেনে? আমি তোর টাকার তবিলদার, আর আমারই সঙ্গে লুকোচুরি?'

'নিজে জমি লিলে নিজেই নিজেরটা চষা-খোঁড়া করব তো! তখন তো এই বাড়ির চাকরি ছাড়তে হবে! যদি তাই শুনে রাগ করেন—'

'উঁহু, হল না। ঐ এক-টুকরো জমির জন্যে এমন খোর-পোশাকের চাকরি ছাড়ে কেউ? ও জমি থেকে পাবি কি নিট? অমনি লাগিয়ে দিবি কাউকে।'

'বা, নিজের জমি নিজে চাষ করব না? ইস্তকনাগাদ পরের বাড়ি চাকর খাটব?'

'ও শালো! তোমার তলে-তলে এত সোঁত। ভাতে হাত ভাল লাগছে না বুঝি, ছাইয়ের গাদায় হাত দিতে চাও? বলি, তোর মা জানে?'

'মা মেয়েমানুষ, জমির মোকদ্দমা সে কি বোঝে?'

'তুই বুঝিস! বল শালো, জমিদার কে? কোথায় জমি কোন মৌজা? দাগ-খতেন কত? স্বত্ব কি? নিরিখ কত খাজনার?'

কেশরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। মুখে আর কথা ফোটে না।

'সত্যি কথা কি, বল আমাকে গোপে-চুপে।' ডাক্তার-গিন্নি চোখে-মুখে শাসনের ঝলক আনলেন ঃ 'কোনো খিটকেল বাধিয়েছিস বুঝি?'

কেশরের মাথায় কি বুদ্ধি এল, এক গল্প বানিয়ে ফেললে। স্পস্ট মনে হল বাবুদিদির মুখে তেমনি গল্প শোনার ঝোঁক।

'সমাজে জরিমানা ধরেছে আমার।'

'জরিমানা? তোর মা থাকতে তোর জরিমানা? কেনে, কি করেছিস?'

'একটা মেয়ের সঙ্গে পেনয় হয়েছে বাবুদিদি।' ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে কেশর মাটি খুঁটতে লাগল।

'কে মেয়ে? কাদের মেয়ে? আইবুড়ো না বেধবা? বয়েস কত? কড়ে রাঁড়ী বুঝি কেউ?'

'না, সোয়ামী আছে। সোয়ামীটা ভেড়ুয়া। আগুন তুলে তামাক সেজে দিত আমাকে। কত চলা-বলা কত ওঠা-বসা—'

ডাক্তার-গিন্নি রসান দিতে লাগল। গল্পের জিলিপি চাপাল কেশর।

আসল কথায় আসে না। কেবল আগড়ম-বাগড়ম।

'মেয়েটার সঙ্গে কি হল?' ডাক্তার-গিন্নি দাবড়ি মেরে উঠলেন।

'কিছুই হয়নি বাবুদিদি। এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।

এই একটু এসরাতে কথা হয়েছে। আর ফাঁকে-ফুঁকে কখনু একটু ঠাট্টা-ঠুট্টি—'

'তার পর?'

'কি চোখে কি দেখে ফেলল কে জানে, বৌটার সোয়ামী সমাজে গিয়ে লাগান-ভজান দিলে। নানান কেচ্ছা করলে আমার নামে।'

'শেষে হল কি?'

'মিটিং হল। আমার আগুন-কলকে হুঁকো-পুরুত বন্ধ—'

'তোর কেন?' ডাক্তার-গিন্নি ঝাঁজিয়ে উঠল : 'ঐ বৌটাও তো সমান দোষে দুষী। ও কেন পতিত-রহিত হবে না?'

'বৌটার কি দোষ? দোষ তো ঐ ভেড়ুয়ার। ও কেন নিজের পরিবারকে শাঁসতে পারল না? শাঁসতে পারবি না তো দড়ি লম্বা করে দিস কেন? দড়ি লম্বা দিস তো আবার আঁধারে ফাঁস লাগাস কেন? খেতে দিয়ে পাতা কেড়ে নেবার মানে কি?

'ঠিকই তো। ওদেরই তো শাস্তি হওয়া উচিত ছিল।'

'ওরা যে আগে নালিশ করলে তাই ওরা বেয়াৎ পেলে। ঘুস যে দেয় আর ঘুস যে নেয় দু'জনেই এক কাঠরার আসামী। কিন্তু, এমন মজা, যে তাক বুঝে আগে গিয়ে নালিশ করতে পারবে. সেই ছাড়ান পেয়ে যাবে, দুষী হবে অন্য জন। এ-ও তেমনি। আমি যদি গিয়ে বলতাম, ঐ ভেড়ুয়া উয়ার পরিবারকে দিয়ে ঘেরে-ঘেরে ঘিরে ফেলতে চায় আমাকে, তা হলে সমাজের রাগ ওর ওপর গিয়ে পড়ত। ওরা থাকত ঠেকো হয়ে। কার হল পাপ আর কার হল মোক্ষন!' কেশর কাতর ভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

'নাপিত বন্ধ হয়নি?'

'নাপিত হয়নি আমাদের এখনো। আমার চুল মা কেটে দেয়।'

কেশরের মাথার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ডাক্তার গিন্নি। বললে, 'এত বড় কাণ্ড, তোর মা তো কিছুই বললে না আমাকে!'

'মাকে জানতে দিইনি। পতিত-রহিত হলে পাছে গাঁ-ঘরে ডঙ্কার পড়ে যায় তাই ওটাকে ঠেকিয়েছি। শুধু জরিমানা করল—দু'সনজে পাকা ভোজ, তার সঙ্গে পাকা মদ—কুড়ি টাকা লাগনা। সেই টাকাটাই চাই বাবুদিদি।' কেশরের চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

'তা দিচ্ছি। তোর আমানতী টাকা তোর শ্রাদ্ধে-বিয়েতে লাগবে বলেই ছিল। তা না হয় প্রাশ্চিত্তিতেই যাক। কিন্তু বন্ধুতার লোককে ছেড়ে দিতে পারবি? মনটা ছোঁক-ছোঁক করবে না? হু-হু করবে না বুকের মধ্যে?'

কেশর মিটিমিটি হাসতে লাগল।

'ঐ ভেড়ুয়াটি কে? নাম বল। আমি লাগিয়ে-পটিয়ে বউ ছাড়ান নি ওর কাছ থেকে। তার পর তুই ওকে সাঙা কর।'

'আপনি পাগল হয়েছেন বাবুদিদি? যে মেয়ে সোয়ামী থাকতে অন্য লোকের সঙ্গে পেনয় করে সে তো ঢেমনি। তাকে সাঙা করতে যাব কেনে? বিয়ে করি তো, চৌকস খাঁটি মেয়ে বিয়ে করব। ভোজ জরিমানা দিয়ে নাক-কান-মলা খাব—পর-গোয়ালে আর জাবনা খেতে যাব না।'

বাবা, কত পাঁয়তারা ভেজে টাকা ক'টা বের করা গেল! খুব পাপ হল, না? মুনিব-গিন্নির কাছে এতগুলি মিথ্যে কথা বলা?

মিথ্যে কথা না বললে কুড়ানির নাকে নতুন আপেল হবে কি দিয়ে?

৭

'দেখছিস ভাসানি—'

'কি?'

'ঐ যে নদী—ঐ নদী পার হয়ে ববাব্বর দখিন দিক যাবি। দখিন দিকে যেয়ে আর একটা কাঁদর। কাঁদর পার হবি। কাঁদর পার হয়ে আর পারাপার নাই। তার পর ঐ রাস্তায় ববাব্বর সন্দেপুর—আমার শ্বশুরবাড়ীর গাঁ। এবার কালীপুজোর সময় যাবি। বুললি?'

'কালীপুজোয় বুঝি খুব ধুমধাম?'

'খুব। রং-বেরঙের সং বেরোয়। ভারি মজার সং।' বলতে-বলতে কুড়ানির গা-গতর থমথম করে উঠল।

হঠাৎ নজর পড়ল দখিন দিগন্তের দিকে।

'হ্যাঁ রে ভাসিনি, ঐ একটা কে লোক আসছে না?'

রাঙা মাটির কলসী কাঁখে করে দু'বোন পুকুরে জল নিতে এসেছে। তাল-বোনা পুকুর। সেই পুকুরের পশ্চিম ধার দিয়েই রাস্তা। ভরাভর্তি বেলায় সমস্ত গাঁ মাঠ ধু-ধু করছে।

'হ্যাঁ দিদি, একটা লোকই তো বটে।'

'গায়ে হাপসার্ট, না রে?' কুড়ানি এক-পা এক-পা করে নিজেরো অজান্তে এগিয়ে গেল খানিকটা।

'মাথায় নীল গামছা, হাতে পোঁটলা—'

'থমকে-থমকে দাঁড়াচ্ছে, না রে?' স্রোতের জলে যেন পা পড়েছে কুড়ানির। টান দিয়েছে আঁচলে।

হ্যাঁ, সেই-ই তো। কেশরই তো বটে। এমন বিঘটনও হয় না কি পৃথিবীতে?

উঁচু গলায় ডাকব না কি? দোষ কি? এখানকার কেউ চেনে না, কেউ জানে না। নিমনিষ্যি এখন মাঠ-ঘাট। আর জানলে-চিনলেই বা কি? আঁতের লোক চলে যাবে সুমুখ দিয়ে আমি আঁধলার মত পড়ে থাকব? যাই, আর একটু এগিয়ে যাই। গলা ঝাড়া দিয়ে হাঁক দিই।

বুকের মধ্যে ঢেঁকি কুটোনা। ধয্য ধর। পরের বাড়ির বউ তুমি। ইচ্ছে করলেই ড্যাঙডেঙিয়ে চলে যেতে পার না। তোমার এখন বুঝ-সুঝের বয়স হয়েছে, রীত-নীত মানো তুমি। আচম্বা লণ্ডভণ্ড ঘটাতে পার না।

না গো, সন্তর্পনে এগুচ্ছি। ঠাহর রাখছি চার দিকে।

ওগো, ওধারে পথ নাই। এই দিকে এস। এই দিকে। ভাল পথ দেখিয়ে দেব।

মেঘ চাইতেই জল! কেশর থ হয়ে দাঁড়াল।

এই তো সেই কুড়ানি—টেঁস্কেলে মাণিক কুড়িয়ে পাওয়া। সাজ-সজ্জে নেই অথচ সোনার পিতিমে।

সঙ্গে ঐ হাস্যমুখীটি কে? যেন এক ঢালাইয়ের কাজ। এক হাতের কারিগরি।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল কেশর।

'যা হোক ভাই তুমি মানুষ বটো। কবে এখানে এসেছ একটু বলে আসতে হয় না? তক্কে-তক্কে সন্ধান জানলাম, বাপের বাড়ি এয়েছ। কোন পাড়ায় তোমাদের ঘর?'

'চলো, ঘরকে চলো।' উথল হয়ে বললে কুড়ানি। চোখে চাপা হাসির ঝিলিক দিলে।

'না, আমি এখন সোনার ডিহি চলেছি।'

'সেখানে মেলা-খেলা আছে বুঝি? সং সেজে বুঝি খুব কেড়ামাতন করবে?'

'না, গো, আব সং সাজব না। মনে রং ধরলে কি আর সং সাজা যায়?'

'জানো, সেই থেকে গায়ে আমার ব্যথা লেগে আছে। শরীরে কি বল বেঁধেছ বল দিনি। কি ডাকাবুকো বে বাবা!'

'কেনে, মনে একটুও লাগেনি সেই ব্যথার ছোঁয়াচ? আগুনে দগ্ধে যাচ্ছ না একটুও? দাঁড়াও, বোঝাটা একটু নামাই। একটা পিঁড়ি ধরাই। গামছা দিয়ে হাওয়া করি।

'চলো, বাড়ি দিয়ে চলো। কিছু জলটল খেয়ে যাও।'

'জলখাবাব আমার সঙ্গেই আছে। সোনার ডিহি যাচ্ছি ডাক্তাব-গিন্নির বরাতি কাজে, কুটুম্বিতেয়। মনের ঝোঁকে এসে পড়লাম এই ধাবে—আব ভগবানের কি দয়া, গাঁয়ে না ঢুকতেই তোমার দেখা পেয়ে গেলাম। ক'দিন আছ এখানে?'

'ক'দিন আর! কাল-পরশুই ফিরে যাব। রোগা-ভোগা স্বামী ফেলে কদ্দিন বসে থাকা যায়?'

'তবে আসাই বা কেন ঢং করে?'

'না এসে উপায় কি। ডাবপার ডাকাত পড়ে নাকের আপেল কেড়ে নিয়েছে এ তো আর বলতে পারি না। যে শুনবে সেই ভাববে, একাবেঁকা। এবার বাপের বাড়ি থেকে ফিরে গিয়ে বলতে পারব মার কাছে বেখে এসেছি।'

'ডাকাত বলবে কেনে? বলবে জাম গাছের ভূত।'

বলে কিশোর জামার পকেট থেকে কাগজে-মোড়া কি একটা বের করলে। বললে, 'দেখ দিকি, এই তোমার সেই হাবানিধি কি না—'

'ওমা, তার চেয়ে যে অনেক ভাল, অনেক সুন্দর! ওমা, ই পেলে কুথা?'

'ভূতের কাণ্ড, তুমি-আমি কি বুঝব? এস এগিয়ে, পরিয়ে দিই।'

'না, না—' এগিয়ে আসতে-আসতে পিছিয়ে গেল কুড়ানি : 'পরের সোনা নিয়ো না কানে, কেড়ে লেবে হেঁচকা টানে। চলো ঘরে চলো।' পিছিয়ে যেতে-যেতে কুড়ানি আবার এগিয়ে এল। খপ করে কেশরের হাত ধরে ফেললে।

কুড়ানির হাতের মধ্যে কাগজের মোড়কটা গুঁজে দিল কেশর। বললে, 'নাও গো, হারানো ধন ফেলতে নাই।'

'হারানো ধন কি আমার ঐ নাকের আপেল?' আঁচলের খুঁটে কুড়ানি বাঁধল সেই কাগজের পুঁটলিটা। বললে, 'চলো মাইরি। বাড়ি চলো। কিছু ভয় নেই। তোমার ওই জলখাবার ক'টা আমি খাব। তুমি আমাদের বাড়ির জলখাবার খাবে চলো, ও কি, ও পুঁটলি আবার খুলছ কেনে?'

'ওগো, মায়ের জন্যে ক'টা সরু চাল লিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম ফেরবার সময় বাড়ি দিয়ে ফিরব। তা আর হবে না। ফেরবার সময় এ পথ দিয়েই ফের ঘুরতে হবে।' কেশরের চোখে হাসির ঝিলিক খেলল : 'তখন যাব তোমাদের বাড়ি।'

'আর ই চাল?'

'ই থাক তোমার কাছে। যখন গাঁয়ে ফিরবে তখন এক দিন দিয়ে এসো গে আমার মার কাছে।'

'ওমা, আমি যাব কি, ওরা তো আমাকে চেনে না কেউ—'

'ওরা না চেনে, তুমি তো চিনে রাখো। আমি তোমার ঘর-বাড়ি চিনে রাখছি, তুমি আমার ঘর-বাড়ি চিনে রাখবে না? সমান-সমান না হলে এক খেয়ার জল হব কি করে?'

'ওরে ভাসানি, শোন তো বোন। চো, ই পুঁটলিটা লিয়ে চো তো। ঐ দেখছ বাড়ি, চিনে থাকা ভালো। বেশ, এখন যদি নাই যাও, ফিরে এসো গা। রাত্তিরে এখানে থাকবে। আমি খাবার ঠিক করে রাখব। যদি না আস ভাল হবে না। আমার মরা-মুখ দেখবে। মাথার দিব্বি লাগে। হ্যাঁ, আর শোনো, এলে পরে একটি খুব গোপনের কথা বলব। মানুষ চেনা যাবে। দেখা যাবে পাণের টান। চো লা ভাসানি, জল লিয়ে বাড়ি যাই। মা এতক্ষণ ভাবছে। ওষুধ দিতে হবে। এই দেখ, মনে থাকে যেন, তুমি না এলে আমি খাবনা। ঐ দেখ আমাদের বাড়ি, ঐ বড় নিম গাছ। যাও, পরাণ যা চায় তা যেন অমান্যি কোরো না। ঠিক এসো কিন্তু। তোমার ধম্ম তোমার ঠাঁই।'

৮

কই, এখনো এলো না। বেলা শেষ হল। সুজ্জি ডুবতে দেরি নাই। ঐ পথে কত লোক আসছে, সে তো কই আসে না। বোধ হয় আসবে না। আসতে ভয় করছে। পরের বাড়ি কেউ যদি কিছু বলে! কে কি বলবে? বাড়িতে বাবা আর মা আর ভাসানি। বলাবলি কিসের! শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের লোক, জাত-জ্ঞাতের সামিল। কেন আসবে না? বাধাটা কি! ইখানকার লোকেরা কিছু বলবে?, কেউ কি তাকে চেনে, না, জানে? অত ভয় কিসের? মানুষের বাড়িতে আত্ম-কুটুম আসে না? ভাবী-সাবী থাকতে নাই কারুর খেতে বসে খেতে পারলাম না। ছিঃ, এমন মানুষ, একটা কথা রাখে না! দরদ বোঝে না। সুযোগ বোঝে না। ছাই মন আমার। পরের লেগে ভেবে-ভেবে শরীর মাটি। 'চেয়ে চেয়ে চোখের ক্ষয়, পর ভরসা কিছুই নয়।'

যাই বাড়ি যাই। আন্ধারে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

দু'পা যায় আবার দু'পা ফেরে। থেকে থেকে পেছন দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে। জ্ঞানও নেই, ঘেন্নাও নেই, মরণ কাকে বলে! ছি!

কতক্ষণ পরে গলাঝাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। বাইরে কে যেন পথ দেখিয়ে দিল ঃ 'এধারে লয় ওই ধারে। পাকুড় গাছ লয় নিম গাছ।'

কুড়ানি ছুটে এল বাড়ির ভেতর থেকে ঃ 'কে ডাকছে গো? কে গো?'

'ওগো, আমার বাড়ি সন্দেপুর—'

'ওমা, তাই না কি? কোনো খবর আছে না কি গো—'

হঁসফাঁস করে কুড়ানির কাছেই হাজির হল কেশর।

'এসো, এসো। আঁধারে চেয়ে-চেয়ে চোখ ঠিকরে গেল। বাড়ি চিনতে পারনি, কেমন?'

বলতে-বলতে আগুনের উপর নিয়ে এল কুড়ানি। কাঁধ থেকে পিঠের উপর দিয়ে আঁচল-টানলে।

ঘরের দাওয়ায় বসে কুড়ানির বাপ অনন্ত তামাক খাচ্ছে চোখ বুজে। কুড়ানির সঙ্গে-সঙ্গে একটা লোক ঢুকছে বাড়ির মধ্যে ব্যাপার কি। কে জানে কি ব্যাপার—তুমি যেমন তামাক খাচ্ছ তেমনি তামাক খাও। চোখ মেলতে হবে না। বুড়ি তো ঘরের মধ্যে ধুঁকছে জ্বরের ঘোরে, তুমিও তামাকের নেশায় বুঁদ হয়ে থাক। কলির ভর-সনজে এখন।

এসো কেনে, লজ্জা কিসের? জাত-গিঁয়াতের বাড়ি।' বলে বাপের দিকে মুখ ফেরাল কুড়ানি ঃ 'আমাদের গাঁয়ে আমাদেরই লোক। এ-পাড়া আর ও-পাড়া—মাঝে একটা কাঁদর—'

'বোসো বাবা বোসো। লাও, হুঁকো লাও।' অনন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল ঃ 'কোথা থেকে আসছ বাবা?'

'আজ্ঞে মনিবের কাজে সোনারডিহি গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরতে রাত হবে তাই ভাবলাম আমাদের গাঁয়ের কুটুম হোরাং-এর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উঠি। হোরাং তো আমাদেরই এক গাঁয়ের লোক। এ-পাড়া আর ও-পাড়া—'

মাঝখানের কাঁদরটুকু বাদ দিয়ে দিল। কুড়ানির কালো চোখের হাসির ছটা অন্ধকারেই যেন টের পেল কেশর।

'তা বেশ করেছ বাবা, বেশ করেছ। কুটুম লোকের ছেলে, আসবে বৈ কি। একশো বার আসবে। অমত-আপত্তি করবে না। রাত্রিটা থেকে সকাল বেলায় চলে যাবে।'

কালো চোখের ঝলকানিটা আবার যেন মনের অন্ধকারে দেখতে পেল কেশর।

'এই দেখ বাবা, বাড়িতে সব অসুখ-বেসুখ। যোগ্য ছেলে নাই। বুড়ো বয়সে কত খাটব। চাষ-বাস আছে। কোনো রকমে সংসার চলে। বাড়িতে আমার ভারী হিসেবী লোক, তাই টিকে আছি টিমটিম করে। আবার দেখ, ছোট মেয়েটার বিয়ের জোগাড় দেখতে হবে—'

মুখের কথা কেড়ে নিল কুড়ানি। বললে, 'বাবা, ভাসানির বিয়ে আমাদের ঐখানেই দেবে গো। দুই বোনে এক জায়গায় থাকব। এক খবরে সব হবে।'

'তাই হবে বাবা, তাই হবে। সমাই মেলে দেখেশুনে দাও কেনে। হাঁ গো, তোমার মায়ের জ্বর ছেড়েছে?'

'আজ যেন জ্বরটা ছেড়েছে বলে মনে হয়।' কুড়ানি হেঁসেলের দিকে যেতে যেতে বললে, 'হাঁ বাবা? ভাত খেয়ে নাও কেনে।'

'হাঁ গো, সব রোগারুগির ঘর, দিয়ে দাও।'

কেশর কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তার কি ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন?'

দু'খানাই জায়গা করেছে, ভাত বেড়েছে দুই থালায়।

সারাদিন ভাত খায়নি কেশর। প্রবল খাটনি গেছে। কিন্তু শুধু পেট পূরে ভাত খেয়েই কি তার তৃপ্তি হবে?

কুড়ানি-ভাসানির মা যোগমায়া বা যগ দাসী দোর-গোড়ায় এসে বসল টলতে-টলতে। বললে,'খাও বাবা খাও। গরিবের ঘর, কিই বা আছে, তাই দেবো। দশ-বারোটি লঙ্ঘন হল। শরীলে বল মাত্র নাই—'

কত রান্না! কলাইর গুঁড়ো, তিল-আমড়া, খরচা মাছ—

'কুটুম লোকের ছেলে, যত্ন-আত্তি করার আছে কি! তুমি জামাইকে গিয়ে বোলো, এখন কুড়ানি দশ-বারো দিন যাবে না। একটু সুস্থ হলে পরে যাবে।'

'বলব, বলব। এখানে না থাকলে চলবে কি করে? তার তো মা-ই আছে, মা এখন চলে এলেই পারে মেয়ের বাড়ি থেকে। অত কি!'

বোধহয় এখানে থাকলেই কাছাকাছি আসতে পারা যাবে কুড়ানির। এখানেই যেন কুড়ানিকে ভালো মানায়। এটাই ঠিক জায়গা। যেখানকার যা। যখনকার যেমন!

তালাই পেতে দাওয়ায় শুতে দিয়েছে কেশরকে। ঘরের মধ্যে আর সবাই। ঠিক দরজার কাছে অনন্ত। দরজা খোলা। পূবের বাতাস আসছে ঝাপটা দিয়ে। যতক্ষণ বাতাস ততক্ষণ মশা নেই। তারপর একবার ঘুমিয়ে পড়তে পারলে মশাকে আর কে কেয়ার করে।

খাওয়ার পর এবার বোধ হয় ঘুমের সন্তোষ।

কিন্তু ঘুম আসে কই? রাত গম্ভীর হয়ে এল। শেয়াল-কুকুরের রা নেই, বাতাসও বন্ধ হয়ে এল। তবু এতটুকু পা-টিপে আসার শব্দ নেই, নেই চাপা-গলার আওয়াজ। ঘুমের মধ্যে শরীর

একেকবার ডুব খায়, আবার তখুনি চেতনার চড়ার ওপর এসে ঠেকে। কই সেই গোপন কথা!

রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল।

'চললাম গো—' কেশর দাওয়া থেমে নেমে পড়ল ঝটকা দিয়ে। 'আরেক দিন থেকে যাও না।' বলল অনন্ত।

যগ দাসী ধুয়ো ধরল ঃ 'হ্যাঁ, বাবা, থাক না। কুটুম লোকের ছেলে—'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে কুড়ানি।

বেশ তো থাকো না। থাকা করে থাকো না। কাঁটার শয্যেতে শয়ন করতে আর রাজী নই। তার চোখের চাউনিতে যেন সেই লিখন।

মিথ্যে কথা। এক রাত্রির কড়ার, তা এমনি করে মাটি হত না তা হলে।

'থাকবার উপায় নাই, মা। পরের চাকর!'

আগুন পেরিয়ে ফাঁকায় আসতেই কুড়ানি ছুটে এসে পাশে দাঁড়াল কেশরের।

'গোপন কথা বলবে বলেছিলে—বেশ, বললে যা হোক।' কেশর খোঁটা দিল।

'সেই কথাই তো বলতে এলাম—'

'কি কথা?'

'তোমাকে আমি খুব আপন করতে চাই।'

কেশর থমকে দাঁড়াল।

'কি রকম আপন? শুধু কথায়?'

'না গো না। কাজে।'

'কি রকম কাজ?'

কুড়ানি হাসির লহর তুলল ঃ 'আমার বোন ভাসানির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাই। করবে?'

কুড়ানির একটা হাত খপ করে ধবে ফেলল কেশর ঃ 'তুমি বিয়ে কর কেনে!'

হাত আলগোছে ছাড়িয়ে নিল কুড়ানি। বললে, 'আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে।'

'আমারও হয়ে গেছে।'

'ওমা, কার সঙ্গে?'

'তোমার সঙ্গে।'

'পোড়ামুখো! আমার সঙ্গে বিয়ে হলো! সকাল বেলায়!' হাসিব আবার লহর তুলল কুড়ানি ঃ 'এক মুর্গি কি দু'বার জবাই হয়?'

৯

'হা গো, ঘর-সংসার বলে মন দাও না—এখনো উড়ো পাখি। আজ পেরায় এক কুড়ি দিন পার হল, বাড়ি ঢুকলে।'

হাটের থেকে ফিরে এসেছে নারায়ণী—নর-দাসী, হোরাঙের মা। ফিরেই দেখে বাড়িতে বউ।

'আমাদের অসুখ হলে কে কয় দিন দেখে বলো দিকিন। আমি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কে এঁদে-ভেজে দেয় বল তো? কলিকালের বৌ-ঝি, কিছু বুলবার জো নাই। আমার যেই দুঃখ-কে-সেই।'

'নিজের বাপ-মাকে দেখতে যাব না?' কুড়ানি ফোঁস করে উঠল।

'আহা-হা, তা যাবে বৈ কি। নিজের মা-বাপ! তা তোমার মায়ের বেশ গরম পড়েছে তো?'

'কি করে পড়বে! কে তালাস-তদবির করে! যুগ্যি ছেলে নাই। জামাই করেছে এমন এক জন—'

'হোরাং আমার কাজ নিয়ে কত্থ যেতে পারে না। রোগা-ভোগা মানুষ—দুখ-মেহনত করে খায়! সে আর পাঁচজনের মত লয়। কি করবে বল, সব কপালের নেকন। তা তুমি এলে কখন? ভাত খেয়েচ?'

'আপনি আসুন ডুব দিয়ে। রাঁধব এবার।'

'আমি কারু আঁদা ভাতে পিত্যাশা করি না। দাও, ঘড়াটা দাও দিকিন, ডুব দিয়ে আসি। আজ হাট থেকে আসতে বেলা গিয়েছে।'

মুনিষ খেটে বাড়ি ফিরেছে হোরাং। হা-ক্লান্ত হয়ে।

দেখলে হেঁসেলে রান্না করছে বউ। নজরে পড়ল তার ময়লা শাড়ির চওড়া পাড়টা। ঝুলে-পড়া চুলের ক'টা গুছি। কানে এল তার বাসন-কোসনের টুং-টাং শব্দ। নড়া-চড়ার খসখস। মনটা খুশি হয়ে উঠল।

'হা গো, এলে কেনে? থাকলেই হতো। দরকার কি।'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে গা-পা ছড়িয়ে বসল হোরাং। একটা বিড়ি ধরাল।

'ভাল মজার লোক কিন্তু। আমি ভাবলাম বুঝি আর আসবেই না।'

'কেন, বিয়ে ছেড়ে দিয়েছ? না, খুলে নিয়েছ হাতের লোহা?' খুন্তি-হাতে ঝামটা মেরে উঠল কুড়ানি।

'কেনে, ছাড়াবিড়া হয়ে গেলে বুঝি খুব ভালো হয়, লয়? মনের মত বুঝি লাগর জুটেছে?'

'জুটবে না কেনে? রূপ-যৈবন থাকলেই জোটে। আর লাগর জোটাতে হলে জোটাব কি তোমার এই সব ছোটলোক চাষা? কুরু-কুনাই কাহার-কেওট? বড়লোক চাকরে বাবুর আদরিণী হব, থাকব পাকা কোঠাবাড়িতে। কত ঘরে ষোল আনা গিন্নির পিঁড়ি পাতা আমার।'

একবার তেরছা চোখে তাকাল হোরাং। বললে, 'তাই ভালো। ষোল আনা গিন্নি ভালো। গোপ্ত অঙ ভালো লয়।'

'খেতে দিতে পারে না, পরতে দিতে পারে না, কাণা-খোঁড়া কুঁড়ে-বুড়োর ঘরে সোমত্থ বয়সের মেয়ে পচে-ধসে মরবে তাই না?'

'যতই ঢেকে কর পাপ, পাপ মানে না আপন বাপ। বুঝলে? এক সময় না এক সময় ঠিক বেরিয়ে পড়বেন। তাই বলি—' ঃ 'যার যা মন বলো।' হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কুড়ানি ঃ 'মা-বাপের অসুখ-বেসুখ বলে কেউ তো জগতে দেখে না! জগতে কেউ তো বিয়ের পর যায় না বাপের বাড়ি আমিই শুধু ছিষ্টিছাড়া!'

হকচকিয়ে উঠল হোরাং। 'হাঁ হাঁ, আছে কে কেমন? অসুখ কার?'

'আমি ছিলাম বলে মা জেবন পেয়েছে। তিন বার করে ওষুদ দিতে হয়েছে। চোদ্দ-পনেরোটা লঙ্ঘনা। হাড়-পাঁজর ঝুর-ঝুর করছে। সহজ কথা, বলতে চাও?'

হোরাং অপ্রস্তুতের মত তাকিয়ে রইল। বললে, 'সত্যি, তাই না কি?'

'জামাই হয়ে কই একবারও তো খোঁজ-খবর লিলে না। তা বুঝি লিতে নাই! পরের মা তো, মলো আর থাকল! দরদের জিনিস হলে দেখে।'

'সত্যি, অল্যায় হয়ে গেছে তো। শুনেছিলাম বটে অসুখ। কিন্তু এত বেপদ তা ত বুঝিনি। বাড়ি আর মাঠ এই লিয়ে শুধু তাঁত-বোনাবুনি করছি—ফুরসুৎ কুথা? তার উপর দু-দু'বার জ্বর হল ইরি মধ্যে—'

মন-মেজাজ খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হোরাঙের। রাগের চেয়ে আপশোষের ভাবটাই বেশি। কুড়ানি যে কৃপা করে বাড়ি ফিরে এসেছে এই তার ঢের। বলে, ঢের খাবে তো অল্প চষো। বেশি খুঁড়তে-ধসতে গেলে সব রস চটে যাবে। এই বেলা ভাব করো। অল্প-অল্প রাগের সঙ্গেই রঙ্গটা ভালো জমে।

'যাক, এখন ভালো হয়েছে তো? বাঁচলাম। সাধের কাজল হারিয়ে গেছল আমার, আবার ফিরে পেলাম চোখের কোলে। একটু হাসো কেনে বউ।'

'মরণ দশা।' বলে ফিক করে হেসে ফেলল কুড়ানি।

এই ভালবাসার হাওয়া চলল সন্ধে-রাত পর্যন্ত।

'এই দেখ, মা নাকের আপেলটা নতুন করে গড়িয়ে দিয়েছে।'

'মা দিলে না বাবা দিলে! দেখি। বাঃ, আগেকার চেয়ে বড় বড় লাগছে। ক'টাকা দাম?'

'দামের খবর কে রাখে? টাকা তো এখনো দেয়নি, দফায় দফায় দেবে। সোনাটা পাকা সোনা, না? খাবাপ লয়। তুমি কই এবার এক জোড়া কানপাশা গড়িয়ে দাও দেখি।' ছলকে উঠল কুড়ানি।

হোরাং হঠাৎ চুপসে গেল। বললে, 'পেটে ভাত নাই ধম্মের উপোস।' কতক্ষণ থম্ব হয়ে থাকার পর গলায় ঝাঁজ মিশিয়ে বললে, 'মায়ের থেকে গয়না না লিয়ে শাড়ি লিলেই পারতে! পরনে মোটে তো ঐ একখানা আস্ত শাড়ি, আর সব ত্যানা। আষ্টাঙে নাই, পাষ্টাঙে নাই, কানে দুটো পাশা।'

মুখিয়ে উঠল কুড়ানি। 'কেনে, তুমি আছ কি করতে? তুমি শাড়ি-কাপড় কিনে দিতে পার না? তুমি সোয়ামি না ভাগাড়ের মড়া?'

হোরাং জানে তার অক্ষমতার কথা। তবু এ যেন সহ্য করবার নয়। আপেল তো নাকে একখানা ছিলই। ওর উপর আবার খোদকারি করার দরকার কি। মেয়েকে কিছু দিতে চাস, হাতে পয়সা এসে থাকে, গা-ঢাকবাব জন্যে একখানা আস্ত-মস্ত শাড়ি কিনে দে। নব যৌবনের উপযোগী নব বস্ত্র।

'কত সাধের একটি বিটি, চুল নাই তাই দড়ির ঝুঁটি।' হোরাং মুখ বেঁকাল, মুখের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত ঃ 'গয়না দিয়েছেন! কোমরে কাপড় নাই গায়ে গয়না। শির নাই তার শিরঃপীড়া।'

পয়সা হলে তবে সোনা-রুপো কিনতে পারো, কাপড় পাবে কোথায়? কোন বাজারে? কোন মুল্লুকে?

কথাটা সত্যি। কত মাস পব এই হোরাং সেদিন তার নিজের জন্যে একখানা কাপড় কিনতে পেয়েছিল। তাও লাল ইঞ্চি পাড়, ন'হাত। ঠিক হয়তো বেটাছেলের উপযুক্ত নয়। তা, উপায় কি। অত বাছ-বিচার পরখ-দবখের সময় যা পাও তাই কিনে নাও। খানিকটা দীঘ-পাশ হলেই যথেষ্ট, পাড় দিয়ে কি হবে?

সেদিন মুখ টিপে হেসেছিল কুড়ানি। বলেছিল, 'ঘোমটা দাও, হেঁসেলে ঢুকে কাজ-কাম পাটকাম করো।'

হোবাংও হেসেছিল। বলেছিল, 'পাড় দিয়ে আমি কি করব, আমাব নদী দিয়ে কথা! বউয়ের আমার রূপ-যৌবন দিয়ে কি হবে, তার ভালবাসাটুকু পেলেই যথেষ্ট।'

এই সেই ভালবাসা! মা যদি মেয়েকে কিছু দিতেই চেয়েছিল, মেয়ে তবে তেমন দ্রব্য নিলে না কেন যাতে সত্যি সংসারের উপকার হয়, সোয়ামীর সাশ্রয় হয়! যা আছে তার উপর আবার চেকনাই দিয়ে লাভ কি।

কি বুদ্ধি! 'জয়-কালে ক্ষয় নাই।' হাতে যার সোনা আছে তার সব আছে। এই সোনা থেকেই কাপড়, এই সোনা থেকেই ধান-চাল। তোমার কি আছে শুনি? 'ধনের মধ্যে ধন, তিন মোড়া শন।' এক পোয়া চালের ভাত ছ'মাস খাও আর মেজেয় মাছ মারো! বাপের জন্মে সোনা দেখেছ কখন?

দেখিনি, কিন্তু তোমার মাও দেখেনি। এ দেখেছ—হ্যাঁ, বুঝি না বুঝি কিছু। শালোর কম্বল মাথার দিকে বাড়ে। আচ্ছা দেখে লোব!

লিও দেখে লিও। দেখব কত মুরোদ। যে সোনা পরবার সে ঠিক পরবে। 'যে খায় চিনি তার চিনি জোগান চিন্তামণি।'

কথা মিথ্যা নয়। হোরাং কি দিতে পেরেছে কুড়ানিকে? কিন্তু কেমন মানাত না জানি তাকে

গয়না-শাড়িতে! অন্তরে ভালোবাসা বাইরে সাজ-সজ্জে—সে মেয়ের মহিমের কি অন্ত আছে! কত সামান্য অথচ কত বেশি! তেমন কেন হয় না? কেন অবস্থাটা একটু ভালো করা যায় না? কেন হাত দিয়ে ঠেলে ফেলা যায় না এই অভাবের হাতিটাকে? কাজের মধ্যে চাষ আর রোগের মধ্যে কাশ! কেন হোরাং চাকরে-বাবু হতে পারল না? কেন জন্ম নিল এই হাজা-মজার দলে কোন পাপে?

ঘুমের গড়ানে কুড়ানি কখন পিছলে এসেছে হোরাঙের গা ঘেঁষে। বলছে, 'সোনার দোষ-তুটি ধরতে নাই। ধম্মের ঘরে অধিক রাতে আজকাল আর ভাত হয় না, সোনার ঘরে হয় বুঝলে?'

১০

মজলিস বসেছে কালীতলায়। চাষী কুনাইপাড়াব মাঝখানে এই কালীতলা।

মায়ের স্থানটি বাঁধানো। মস্ত বড় একটা পাকুড় গাছ ঘিরে আছে জায়গাটাকে। ঠাণ্ডা ছায়া করা। পাতাটি কিন্তু পড়ে নেই। সব নিকোনো-চুকোনো। পাড়ার মেয়েরা তদবিব করে দু'বেলা।

মন্দিরটি কিন্তু ভাঙা। দরজা-কপাট নেই, জায়গায়-জায়গায় দেয়াল ধসে পড়েছে। ছাদ ফুটো, জল পড়ে জায়গায়-জাযগায়। এসব কেউ বড় দেখে না। যে দেখে সে মাকেই দেখে।

ভয়ংকবী মূর্তি কিন্তু বড় স্নেহময়ী।

কালীপুজোব আগখানে সভা বসেছে। কে কত চাঁদা দেবে এ বছর। এবার কবিগান হবে কি না। জ্ঞাতি সম্বন্ধে কোনো রহিত-পতিত আছে কি না। গত বছরের চাঁদা এখনো কার বাকি আছে?

'ওহে কত্তারা, গত বছরের জমাখরচ কি?' হৃদয় কুনাই হাঁক দিল ঃ 'কিছু টাকা তো জমা ছিল। তা আছে তো? শ্যাম মুদির মেয়ে কুনীব জরিমানার টাকা কে আদায় করেছে?

সবকারী ধান আদায়ের ভার কাব হাতে? কে কে ফাঁকি দিলে? সব কথা পাড়ো! চুপচাপ বসে থাকলে কী হবে? আমার বলতে গেলে দোষ হয়! গেল বার ঢুলীর টাকা মেটাতে অত দেরি হয়েছিল কেনে?'

নিমাই কুনাই এগিয়ে এল ঃ 'খুড়ো তো অনেক পশন্ন কল্লে। উত্তরটা আমিই দিই। এটা একটা সৎকাজের ভার। দশ সকলে যখন আমচরণের দ্যা আছ তখন সেই বলুক কেনে কি সব গোড়াকার খবর।'

রামচরণ রাগ করে উঠল। বললে, 'সে টাকা-পয়সা যে খাবে তার শূল হবে, সে নিব্বংশ হবে, নিব্বুনেদ হবে, মা কালী তার মহা বেহাদি দেবেন। এই দ্যাখ, বহু কুনাই সব কাগজে কলমে লেখে থুয়েছে। শ্যাম মুদির টাকা আজো আদায় হয়নি। মজুত টাকার মধ্যে আমার কাছে দশ আর বহুবল্লভের কাছে সাত আব আমাদের পাড়ার হেমা কুঁদলির কাছে সাড়ে-চার—আর তো কই দেখি না। এবারকার চাঁদা এখন যা হয়—'

'জায়গাটা বালি-সিমেন্ট করতে হবে, দরজা-কপাট মেরামত করতে হবে।' বহুবল্লভ হিসেব খতাতে বসল ঃ 'একে একে ধর কেনে সব। কবিগান পঞ্চাশ টাকার কম হবে না—তারপর পিতিমে খরচ, পুজোর খরচ, মেরাপ বাঁধা, আলো ভাড়া কবা—আগে আয় দেখ, তাবপর ব্যাবোস্তা। হ্যাঁ, ও পাড়ার কেশর কোতা? তার কাছে গেল বছরের ধান আদায়ের ভার ছিল। তার থেকে হিসেব লাও। সব একসঙ্গে না জুটলে কি করে কথা হয়!'

একে-একে আরো লোক এসে বসতে লাগল। প্রণাম করে হোরাংও এসে বসল এক ধারে চুপ করে।

'কেশরাকে ধরে নিয়ে আয়—'

এর আবার ধরাধরি কি। এই তো আমি এইখেনে। আমার মুখস্ত হিসেব।' কেশর উঠে দাঁড়াল। বললে, 'ধান আদায় আর তিন লম্বর বাকি। এক লম্বর ঐ হোরাং—'

আমি মাপ চাই মজলিসের কাছে।' হোরাং উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করলে ঃ 'আমার জমি-জায়গা নাই, পরের মাঠে আমি সামান্য কিরষানি করি। খাইদ ধান যা পাই তাইতে খোরাক হয় না—'

'গেল বছর বর্গাভাগে চযেছিল জমি—ধান মজুত আছে ঘরের মধ্যে।' কেশর লাফিয়ে উঠল।

'মিথ্যে কথা।'

'খানাতল্লাসি করব—দশ জনে সাক্ষী।' কেশর বললে ঘুরে-ঘুরে ঃ 'ঘরের মধ্যে থেকে বের করে আনব সোনার ধান।'

হ্যাঁ বাবা, মাপ-রেয়াৎ নেই, সবাইকে দিতে হবে সাধ্যমত। ছোটবড় সবাই আমরা এক মায়ের সন্তান—গাঁয়ে জাতেব মধ্যে এই একখানাই আমাদের বুনো কালী। ও-সব হবে-হচ্ছে দেব-দিচ্ছি আর চলবে না। সম্বৎসর টাল-বাহানা করেছ, এবার যার যা কি সব এক মুস্তে ফেলে দাও, গত বছরেব টাকা আমরা আজকের মজলিসেই আদায় চাই। কি গো আমদাদা। হাঁ হাঁ, রাত পোলেই খরচ, তা আর বলতে! টাকা আদায় না হলে কিছু করা যাবে না। ছড়াদার ঢুলিদার সব বায়না করতে হবে। লতুন বছরের চাঁদার ফর্দি ধর এবার। ওরে কেশর, কালকের মধ্যে বাকি ধান ক'টা উশুল করতে হবে। রেহাই-বেয়াৎ নাই। আর ডাক্তার বাবুকে বলে ডেলাইটটা ঠিক করে নাও। পরশু রাত্রেই মায়ের পুজো। পরের রেতে অমাবস্যা থাকবে না। বুঝলে হে সব—

ফর্দি ধরা হল মুখে-মুখে। রামচরণের উপর টাকা আদায়েব ভার, কেশরের উপর ধান-আদায়ের। অন্তত গেল বছরের ধানটা চাই। যাদের ধান নাই তারা অন্য ভাবে শোধ দিক। কাটান-ছিড়ান নাই কিছুতেই।

সব আদায় চাই কালকের মধ্যে। আজকের মত সব বাড়ি চল হে। মা কালীব নামে সব একবার হরি-হরি বল।

সবাই চলে গেল যে যার দিকে। শুধু কেশর মন্দিরের দুয়ারে চুপ করে বসে রইল।

মন্দিরের পিছনে আকাঠ-আগাছার জঙ্গল। আর তাব পর একটু ফাঁক দিয়েই হোরাঙের বাড়ি। রাত ভার হয়ে আসছে। পাড়াব মধ্যে কারু আর সাড়া-শব্দ নাই। কোথাও আলো নাই ছিটে-ফোঁটা। শুধু মাথার উপরে ক'টা তারার ঝকমকি কি বাহাব দিয়েছে আকাশখানা! কালো মলমলের গায়ে কে যেন চুমকি টেঁকে দিয়েছে!

বোধ হয় সেব দশ-পনেরো বরাদ্দ হোরাঙের। কোনো দিন তেমন তাগাদাও করেনি। এক বার বোধ হয় গাঁয়ের তেরাস্তার মোড়ে দেখা হয়েছিল, সেই গেল মাঘ মাসে। কালীতলার ধানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল কেশর। হোরাং খোসামোদ করে বলেছিল, দু-পাঁচ দিন পরে ভেন্ন হবে না। ভাগের জমির ধান সব এখনো মাড়া হয়নি ভাই। তার পর সেই দু-পাঁচ দিন আর কাটল না। পাকে-প্রকারে আর দেখাই হয়নি কেশরের সঙ্গে।

মোট কথা, বিষয়টা কেশরেরই আর মনে ছিল না। বিষয়টা অমন কিছু নয় যা মনে করে রাখতে হবে। নিজে গায়ে পড়ে বাড়িতে গিয়ে ডাক-হাঁক করতে হবে, বা গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিতে হবে দশের সামনে। বেশি কিছু হয়, নিজের থেকে পূরণ করে দেবে না হয়। ভারি তো দশ-পনেবো সের ধান!

পাওনা বস্তু ছেড়ে দেয়া হবে না। আর, এ কার পাওনা?

নিজের পাওনা নয়। মা-কালীর পাওনা। এর আর ছাড়ছুড় নাই। এর তামাদি হয় না কোনো দিন। মা-কালীকে যে বিমুখ করে তার সুখ হয় না জীবনে।

কিন্তু কোথা থেকে দেবে? গেল-বছরের মত এবার ভাগ-পত্তন পায়নি হোরাং। লোকটা

বড় রোগা-ভোগা, কেউ গা পেতে তাই নির্ভর করতে চায় না। অধর্ম কবে না হোক অসুখ-বিসুখের জন্যেই হয়তো চাষে কামাই দেবে। তাই এবার 'খাইদ' ধানের বদলে কিরষানিতে লেগেছে। ধান কেটে মাড়া-মলা শেষ হলে পর পাবে সে তার 'খাইদ' বা খোরাকির ধান। তার উপর এবার দেবতা জল দেয়নি ঠিক মত। ভাদ্র মাসে পোঁতা ধান কাঠি হয়ে যাবে। এক কাঠিতে এক শিব। থোপা ধরবে না। মহাজনের সঙ্গে নিশ্চয়ই ঝগড়া লেগে যাবে। শেষে না দেওয়ানিতে গিয়ে পড়ে ফৌজদারির চেয়ে আদালতে বেশি ভয়!

তোমার তার জন্যে অত ভাবনা কিসের বাপু! 'পরের ভাতে পেট নষ্ট!' মজুত ধান আছে বাড়িতে, নইলে চলছে কিসে? আনাজপাতির ক্ষেত আছে বাড়ির কোলে, হাটবারে বেচতে যায় শাশুড়ি-বউ। করাকম্মার সংসার, খেটে-খুটে খেয়ে আছে দস্তুরমত। তাব জন্যে অত দরদ কিসের? মা-কালীর কড়ারী ধান না দিয়ে তাকে আর পাব পেতে হবে না।

দেবে গো, দেবে। কিন্তু তুমি বসে আছ কোন তালে? পাড়ার সকলে যখন গেল তখন তাদের সঙ্গে গেলে না কেন? এখন ভবা রাতে কাঁদর পেরোবে কি করে?

নদী-নালা ভয় করি না। সাঁতরে পাব হয়ে যাব।

কিন্তু এখানে বসে এ কোন চিন্তাব নদীতে সাঁতাব কাটছে?

মা-কালীর কাছে নির্জনে নিবেদন কবতে এসেছি। সব নিঝুম হয়ে না এলে মনে যে ভাব আসে না।

'মা! হে মা কালী। তোমার মূর্তি তা গঠন হল। তোমার পূজা হবে। তুমি আমাদের কী মঙ্গল কর মা। তোমার দয়া কই? দয়ামহী! তুমি কারু মনেব বাসনা পূর্ণ কর, মা? কারু ডাক তোমার অন্তরে পৌঁছয়? একটা পাখিবও সাড়া নাই, বাত্রি ঝন-ঝন করছে। যদি এই নিঃসাড়ের মধ্যে আমার কথাটা তোমাব কানে যায! যায় না, যাবেও না, তবে আমি কিসের আশায় তোমার দুয়োরে বসে আছি? এই সংসাব তোমাব কথায় চলছে, মা, কিন্তু সে কি কখনো আমার কথায় চলবে? আমার যেমন মন পুড়ছে তার কি তা পোড়ে? যদি পাপ হয়ে থাকে মা, পাপটি খণ্ডে দিও। তাকে পাই-না-পাই, শুধু এইটুকু করো মা, তারও যেন মন পোড়ে। বনের আগুন সবাই দেখে, মনেব আগুন কেউ দেখে না—'

১১

'এই দ্যাখো, মানুষ মাত্রেই অল্প-বিস্তর জ্ঞান-বুদ্ধি আছে। কে কি ভাবে চলে তা ঠিক বুঝতে পারা যায়।'

'কেনে, আমাব আবার বেচালটা কি দেখলে শুনি?' কুড়ানি ফোঁস কবে উঠল।

'না, তোমার কথা বুলছি না। ঐ ও-পাড়ার কেশরার কথা বলছি। তুমি আবার ওর সঙ্গে তোমাব বুনের বিয়ে দেবে বলে মেতে উঠেছ! ও-সব মাতামাতি আমি ভালবাসি না। দুনিয়াতে আব পাত্র নাই? দিনরাত কেবল কেশর আর কেশব।' হোরাং হাত বেঁকিয়ে মুখ ভেঙচিয়ে উঠল।

'কেনে, করেছে কি কিশোর? তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছে?'

'বিয়ে হবে তো তোমার বুনের সঙ্গে, তবে আমার বাড়ির সামনে ঘুর-ঘুব করছে কেনে?'

'বোঝ না, কেনে! তোমাকে ধরতে পাচ্ছে না বলেই ঘুর-ঘুর করছে। পালিয়ে না বেড়িয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াও, ধানটা দিয়ে দাও, 'আর ঘুর-ঘুর কববে না। সটান চলে যাবে।'

ধান দেবে। ধান কোত্থেকে দেবে শুনি? কায়েমী জমি-জমা কিছু নেই। হাল গরু নেই। গত বছর ভাগে জমি পেয়েছিল কিছু, ফলন ভাল হয়নি বলে এ বছব ছাড়িয়ে নিয়েছে। এ বছর ছুটো

লাঙলে ছুটো মুনিষ খাটছে। খোরাকি বা 'খাইদ' ধান সাড়ে চার বিশ। তা সব পূরণ করে দেবে ধান কেটে-বেড়িয়ে মলন করে দেবার পর। তার এখন কি। গৃহস্থ তো এখন থেকেই গড়িমসি সুরু কবে দিয়েছে, আগাম ধান ছাড়তে চাচ্ছে না। বলছে, বর্ষণ ভাল হয়নি এ বছর, চাষ হয়নি সুচারু। আগে ধান পাকুক, দেখি কতটা হয়, তা-পরেতে তোর পূরণ হবে। শোন কথা! বর্ষা এবার কম হল বলে হোরাং ছিঁচে দিয়েছিল নিজের খরচে, কত কষ্ট করে, অথচ ছেঁচার খরচ গৃহস্থের দেবার কথা, কামার-ছুতার সমান-সমান। তবু সব খরচ নিজে চালিয়ে নেবার পরও খোরাকির ধান মিলছে না আগাম। গৃহস্থ বলছে, জমিতে জল লাগেনি, মাঠ এবার ধানের ভারে থমথম করবে না। তবু দেখি, পাকুক আগে, কাটা-মাড়া হোক, দেখি কেমন আবাদ করেছিস, তা-পরেতে হিসেব হবে। একবার বিচারটা দেখ। তার উপরে সাধের পাওনাদার জুটেছে। ধার নেই কর্জ্জ নেই, গায়ে-পড়া পাওনাদার। খাবার ধান নেই তো নবিদ্যির ধান! বুঝলি বউ, এ আচোটে খুঁড়ে-খুসে জল ঢেলে কিচ্ছু হবে না— হোরাং নিজের কপাল দেখাল—জমির মাথা ছাড়তে হবে, জমি ধরতে পারব না কোনো দিন, কল-কারখানায় চলে যাব।

'তার আগে যেমন করে হোক মা-কালীর মানত ধান দিয়ে যেও। দেবতা-গোঁসাই নিয়ে খেলা কোরো না!' মুখ গম্ভীর করলে কুড়ানি।

'খাওয়াবেন না, নিজে খাবেন, মা-কালীর এ কেমন রীতকরণ। অতান্তরে ফেলেছেন কেনে তবে? খাবেন যদি কুদিষ্টি সরিয়ে নিন—'

'তাই তো বলি', কুড়ানি চোখে হাসির ঝিলিক আনল : 'আমার বুনের সঙ্গে কেশবের বিয়ের তদবির করো, সুদিষ্টি পড়ে যাবে, চার দিকে বইবে সুবাতাস। বাইরের পাওনাদার তখন ঘরের কুটুম হয়ে যাবে। তুমি তখন শত্তুর নও গো, ভায়রা—'

খেপে উঠল হোরাং। 'ও শালোর সঙ্গে কোনো সমন্ধ না আমার—'

'তা হলে ধান কটা হয়তো কাটান যেত। নিজেই জুটিয়ে-পাটিয়ে এনে দিত যাহোক করে।'

দরকার নাই ওর দয়া চেয়ে। অদেষ্টের লীলে-লেখন যা আছে তা হবে। শালো এমন হারামজাদা, সভার মাঝখানে বলে বসল হোরাঙের ধান বাকি। আচ্ছা, আমার দিন আসবে, দেখে লোব ওর কত বেক্কম।'

'না, তার চেয়ে মেয়েটার সদগতি কর ওর হাতে। মেয়েটা সেয়ানা হল, কখন অজলে-অখালে পা দেয় ঠিক নাই।'

চোখের তারায় ঘুরন দিয়ে ঘাড়ঝাড়া দিয়ে রুখে দাঁড়াল হোরাং। বললে, 'উ সব বায়না ছেড়ে দাও। উ শালার নাম করতে পাবে না বুলে দিচ্ছি—'

'কেনে, কেশর তোমার কি সব্বনাশটা কল্লে ভাই—' হঠাৎ বাইরে থেকে কেশর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। যেন কাছাকাছিই ছিল কোথাও আড়ি পেতে। সর্বক্ষণই ঘুরছে বুঝি এমনি আড়ালে-বিড়ালে।

মুখে মিষ্টি হাসি, গলার স্বরে মোলায়েম আত্মীয়তা।

কিন্তু হোরাঙের অন্য রকম চেহারা। কোমরে দু'হাত রেখে তেরিয়ার মত ভঙ্গি করে বললে, 'হা শালো, আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিস কেনে?'

প্রথমটা হঠাৎ ঘাবড়ে গেল কেশর। দেখল কুড়ানি আলগোছে কখন গা-ঢাকা দিয়েছে। নেই কোথাও আত্মীয়তার নামগন্ধ।

দেখতে-দেখতে কেশরের মুখ-চোখ কঠিন হয়ে উঠল। বললে, 'কেনে ঢুকেছি জানিস না?'

'কেনে ঢুকেছিস? আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন? তুই আমার মহাজন, না জমিদার? আমি তোরটা খাই, না, তোরটা ধারি?'

'জানিস না কারটা খাস, কারটা ধারিস?'

'সে মা-কালীর জিনিস মা-কালী বুঝবে। তুই কেনে আমার বাড়ি ঢুকবি? চোর কোথাকার! বেরো!'

'মুখে লাগাম দিয়ে কথা বল। আমি চোর? গেল বছর ভাগের জমির ধান বেড়িয়ে ক' পন খ্যাড় বেশি আনলি? সাধে আর জমি ছাড়িয়ে লিয়েছে? সাধে কি আর ছুটান মুনিষ খাটছিস? আমি চোর? আর ওঁর ধম্মজ্ঞান কি টনটনে। মা'র দুয়োরের ধান ফাঁকি দিচ্ছেন—'

'একশো বার চোর! না বলে-কয়ে বাড়ির ভেতর যে ঢোকে সে চোর, তার গুষ্টি চোর! সব দেখা আছে আমার। যা, বেশি বুজরুকি করিস নে—'

'আমি ধান আদায় করে যাব।'

'কি, জোর দেখাচ্ছিস না কি? ও জোর আমাকে দেখাস নে। এ তোর বোলানের দলে বয়েলি করা লয়। তোর ঐ জোরকে হোরাং ক্যারায় না, বুঝলি? কিসের তেজ দেখাস? যা, আমার বাড়ি থেকে বলছি। নেকাল যা। নইলে ঠেঙিয়ে সোমান করে দেব।'

'শরীরে খুব বল বেঁধেছিস দেখছি। আয কেনে, মার কেনে দেখি? এই আরো ভালো করে তোর বাড়ি এলাম।' কেশর ঘরের দিকে আরো ক' পা এগিয়ে এল। 'দেখেই যাই কত দূর গড়ায়!'

'শালো, বাঁদির বাচ্চা! আরো আসছিস এগিয়ে? দে তো রে লাঠিখান।' দৌড়ে ঘরের মধ্যে থেকে এক গাছি লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল হোরাং।

'তবে রে—' বেড়ার একটা গোঁজ তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়াল কেশর ঃ 'আও শূয়োরকে বাচ্চা। ধর লাঠি। আজ যদি পাড়ার লোক এক হয়ে লাঠি ধরে তা হলেও কেশর পেছু হটবে না। দিই মাথা ফাটিয়ে।'

দু'জনেই তাল ঠুকে রুখে দাঁড়াল।

কোত্থেকে কুড়ানি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জনের মাঝখানে। দু'জনকে ঠেলে দিলে দু'দিকে। খালি গা, কেশরের বুকের উপর কুড়ানির হাত পড়ল। কিন্তু কেমন যেন অনুনয়ের হাত নয়, ঠেলে ফেলার হাত। হোরাংকে সরিয়ে নিলে নিজের দিকে আর কেশরকে স্পষ্ট গলা ধাক্কা দিয়ে দূর করে দিলে। সঙ্গে গালাগালের গর্জানি ঃ 'বাড়ি চড়ে মার করতে এসেছে! মদ-মাতালির আর জায়গা পাওনি? মায়ের দোরে তুটি হয় তো, আমাদের হবে। তোদের কি রে হতভাগা? নিলেজো—বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকেছে! গঙ্গাজলে! ববভুলে!'

পাড়ার লোক জমতে লাগল ক্রমে ক্রমে।

হেঁটমুখে বেরিয়ে এল কেশর।

ব্যাপার কি?

কেশর কোন কথা বলে না। সে জানে, ধর্ম তার দিকে, তবু কথা বলে না।

শুধু বাইরের এক জন টিপ্পনি ঝাড়ে ঃ 'যে যা চায় সে তাই পায় না হে, তাই পায় না। কপালে নাইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি।'

১২

জয় মা-কালী মঙ্গলদায়িনী—

সরিৎবাবু চাষীপাড়ায় কবি শুনতে এসেছেন।

আসুন, আসুন। ওরে মোড়া এনে দে, টুল এনে দে। সিগারেট কোথা? কী ভাগ্য আমাদের! আপনার পায়ের ধূলো এই গরিবের আসরে।

দূর শহরে কাঁকরের নতুন কল খুলেছেন সরিৎবাবু। নতুন টাকায় জমকে উঠেছেন। ধুমুল দিয়েছেন চার দিকে, আমার কলে খাটবি আয়, দুখ-মেহনৎ কম, আয়-আদায় বেশি। হ্যাঁ, স্ত্রী-পুরুষে

চলে আয়, থাকা করে থাকবি কুলি-গ্যাঙের লাইনে। দু'জনে খাটবি, ডবল রোজগার। কাপড়-জামা পরতে পাবি গা ঢেকে। নেশা করতে পাবি ইচ্ছেমত। ফূর্তির লহর ছোটাবি। মাঠের খাটনিতে হাড়-পাঁজর আর ঝুরঝুরে হবে না।

তা ছাড়া ডাক্তার পাবি মাগনা। ম্যালোয়ার দূর হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, থাকা করে থাকবি। চলে আয় স্ত্রী-পুরুষে কে আছিস নগদা মুনিষ, কে আছিস মাঠ-ছুট দিনমজুর।

কবিগান শুনতে এসেছেন সরিৎবাবু কিন্তু চোখ তাঁর মেয়েদেব গোলের দিকে। ঘেরা-ঢাকা কিছু নেই, সব বসেছে জড়-পুঁটুলি হয়ে। কলে খাটবার মত কার আছে আঁটুনি-বাঁধুনি তাই একটু দেখছেন হয়তো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।

শহর থেকে বন্ধু এসেছিল সঙ্গে। কবিগানের মজলিসে সে এল না। বারো রাজপুতের তের হাঁড়ি—ওখানে কি ভদ্দরলোকে যায়?

কিন্তু যখন তোমার চাষার দরকার, মজুরের দরকার, চালবারুই-দেয়ালবারুইর দরকার, দরকার যখন টাটকা আনাজ পাতির, তরি-তরকারির—

সে কথা আলাদা। তোমার দরকার তুমি দেখ।

বড্ড গুমসা ধরেছে। জল আসবে লাগছে।

কই হে, একটা পাখা নিয়ে আয়। বাবুকে হাওয়া দে।

বাঁশের ডাঁটওয়ালা তালপাতার পাখা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কে হাওয়া করতে লাগল পিছনে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ একটা মেয়ের মুখের উপর সরিতের চোখ আটকে পড়ল। বেশ তো দেখতে। মুখের ধাঁচা ভারি সুন্দর। আলোয় মুখ ঘুরুলেই নাকের আপেলটি ঝিলিক মেবে উঠছে। নিখুঁত ছবিটি। সারকুড়ের পদ্মফুল। শাপভ্রষ্টা।

'ও বৌটি কার রে?' ঝাপসা গলায় পাখাদারকে জিগগেস করলেন সরিৎবাবু।

পাখাদারের চোখও ওই খোঁটাতেই বাঁধা। তাই প্রশ্ন করাটা সহজ হল।

'ও তো হোরাঙের বউ।'

'কে হোরাং?'

'এই এ-পাড়ার এক মুনিষ। আগে চাষা ছিল এখন কিরষান হয়েছে। তার মানে জমি-জায়গা নেই, যখন যে ডাকে খাটনি দেয়, লাঙল বয়, নিড়েন-কুটেন করে। মানুষও সহজ সুস্থ লয়। চিরকেলে রোগ, দেহটাকে কোনো রকমে ঠেকো দিয়ে রেখেছে।' গলার স্বরে দরদ নেই বরং যেন ঝাঁজ মেশানো।

'কেন, জমি-জিরাত খোয়াল কিসে?'

'খোয়াবে না? একে রোগ, তায় বেজায় কুঁড়ে। তার উপরে চোর এক নম্বর। না খেটে ভাগ মারার চেষ্টা । দাদন নিয়ে অস্বীকার করার ফিকির। বেলেল্লা বদমাস।'

'কিন্তু বউটি তো খাসা। তার উপরে নাকের ঐ আপেলটিতে যেন আরো খুলেছে। অবস্থা ভাল নয় ঠিক বলিসনি। তবে সোনা আছে কি করে?'

'ওসব রঙ-রসের বেপার। বাইরে থেকেই দেখতে অমন ঠাণ্ডা ছিল্লি-ছাঁদ, আসলে একটি ঘাগী শয়তান। 'দিনে বউ কোয়ো দেখে ডরায়, রেতে বউ গাছে গাছে বেড়ায়।' ধুরন্ধর মেয়ে বটে। 'দুর্ধর্ষী।'

'পাওয়া যায়?' আরো গভীরে গলা নামালেন সরিৎবাবু।

'ঠিকমত ধরতে পারলে পাওয়া যায় বৈ কি।'

'বলিস কি, আসবে?'

'যাচা ভাত আর কাচা কাপড় ছাড়বার মত ও মেয়ে লয় মাশাই।'

কটা লোক এদিক পানে ঘাড় ফিরিয়েছে। মাছ গেঁথে খেলবার সময় ডোর না ছিঁড়ে যায়। সরিৎবাবু উঁচু গলায় বললেন 'যদি আসতে চায় আসতে পারে স্বচ্ছন্দে। মেয়ে-পুরুষ দু'য়ের জন্যেই

কাজ পড়ে আছে। রোজগার অনেক বেশি। বেশ তো, বলিস, পাঠিয়ে দিস, অনায়াসে কাজ পাবে। আমার কিসের কারখানা জানিস তো? লোকে বলে, কাঁকরের। আসলে পাথরকুচির। লোকে বলে ঐ কাঁকর না কি চালে মেশানো হয়। বাজে কথা। ঐ পাথরকুচি লাগে রাস্তা তৈরি করতে। বুঝলি? সবাইকে বলে দিস।'

'আপনার হুজুর আজব কারখানা।'

এক বিন্দু মেঘ নেই আকাশে। কুচকুচে কালো আকাশে খুদি-খুদি তারা মিট-মিট করছে।

'বৃষ্টি আসবে লাগছে।' সরিৎবাবু তাকালেন আকাশের দিকে। মুহূর্তে নিজেকে সংশোধন করলেন ঃ 'বেজায় গরম পড়েছে। এক ফোঁটা হাওয়া নেই।' আবার সংশোধন করবার জন্যে তাকালেন পিছনের দিকে। পাখাদারকে বললেন, 'আয় একটু আমার সঙ্গে।'

আকাঠা-আগাছা জঙ্গলের দিকে যে পথ সেই পথের মুখে দাঁড়ালেন সরিৎবাবু। বললেন, 'কি করে পাওয়া যায় বল দেখি। বুদ্ধি দে।'

এ তো সোজা কথা। শ্যাম মুদির মেয়ে কুনীকে পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে। পয়সা পেলে নাকবেঁধা পশুর মত ওকে যাই বলবেন ও তাই করবে।'

'তোর নাম কি?'

'আমার নাম কেশর। আমাকে খুঁজতে হবে না। কুনীকে ঠিক পাঠিয়ে দেব।'

কেশরের পিঠে ফুলো চাপড় মারলেন সরিৎবাবু। কাজের আঞ্জামের জন্যে টাকা দিলেন দশটা। বললেন, 'এক দিনে না হয় দশ দিনে। শুধু দাঁড় টেনে যেতে হবে, ঝাঁ করে পাড়ি জমে যাবে এক সময়।'

'অত কিছু লয়।' ঘেন্না-মেশানো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কেশর বললে, 'এক টানেই ধরে যাবে কলকে।'

১৩

'হা হে বিয়ান! বলি, কত কথাই হল, সেকথাটা একবার বললে হয় না?'

মানুষ কাজে ব্যস্ত। জুৎ হয়ে বসুক, তার পর বুলছি। তায় আবার কি।'

হোরাঙের মা নর-দাসী আর কুড়ানির মা যগ-দাসী কেশরের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। কয়েক দমক কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আসল কথাই পাড়া হয়নি।

কেশরের মা। তাই বুলছি, ঘুরে বেড়াছো, একবার বসো কেনে?' নরদাসী হাঁক দিল ঃ 'আমার বিয়ান যে তনছট করছে।'

কেশরের মা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বললে, 'ও আমার কপাল। মানুষের বাড়ি এসেছ, উঠোন চচ্চড়ি কেনে? আমি একটু জলখাবার জোগাড় করছি। যাই ভাই, একটুকুন ধয্য। গুড়ের জালায় পিঁপড়ে পড়েছে, তাই কানি বাঁধছি।'

বলতে বলতে নেমে এল উঠোনে। বললে, 'ঘরে চারটি মা-লক্ষ্মী আছেন, তা ইঁদুরের বড় উপরদপ।'

ইঁদুর কত কি লষ্ট করবে। ভগবানের দয়ায় কেশর তোমার চারটি জোগাড় করছে। তোমার ভাবনা কি!' নরদাসী ভরা গলায় বললে।

সপের উপর একধারে কেশরের মাও বসল। বললে, 'তা ছাড়া ঘরের তিন-চার বিঘে আছে, আর আমি ভাই বসে থাকি নে। যখন যেমন পাই তাই নিয়ে হাটে যাই। কিছু না পেলে এক পেছে ঘসি নিয়েই যাই।'

'তোমার এখন উঠতি সংসার। মণ্ডল-মাতব্বর'—নরদাসী টিপ্পনী কাটল।

'দু বছর যে কষ্ট গেল।' বলতে লাগল কেশরের মা! 'এই দেখ, পাপমুখে বলতে পারছি নে, গেল বার চিক্কেত্তর করতে পেরাই তিন কুড়ি টাকা খরচ হয়েছে। এবাবটা যদি সুস্থ হতে পারি তবে দশ জনার চরণ একবার ধরক। কেশর বলে, এখন দু'চার বছর বিয়ে পা করব না। আমি বলি বাবা, যা ভাল হয় তাই কববি, তায় আবার কি। তা ডাক্তার বাবুরা আমার কেশরকে যথেষ্ট ভালবাসে। কেশর আমার যা করে তাতেই সই। দন্তে-ওষ্ঠে কিছু বলে না। তা এবারে গিন্নি আমাকে বললে, তা জানো হোরাঙের মা, ওরে, এবার কেশরের বিয়ে দিবি, আমরা একখান সোনাব গহনা দেব। টাকাও অনেকগুলি পাব এক থোকে—পেরাই পাঁচ কুড়ি। আমার গায়েরও দু-চারখানা রাং-চুটকি আছে।—একেবারে নাথাকা লয়। তা কি বুলচ—এই দেখ ভাই কথা না লতা, বলতে বলতে আসল কাজ বাদ পড়েছে। ও ভাই আগে জল খাও।' কেশরের মা উঠি-উঠি বসে রইল।

হোরাঙের মা বললে, 'ওগো, আমাব বিয়ান বুলছে ওব ছোট বিটি ভাসানিব সঙ্গে কেশরের বিয়ে দিতে। জানো? তাই আমাকে সঙ্গে করে এসেছে।'

'তা তোমবা পাঁচ জনা আছ, যা ভাল হয় তাই করবে। আমি তো সে মেয়েটি কখুনু দেখিনি। দেখতে শুনতে কেমন বটে? বেশ সাজন্ত হবে তো?'

কুনে ভাল। আমার বৌমার চেয়ে নাক-মুখের ঢোল অনেক ভাল। এগাবো-বাবো বছর হবে, কি বল হে বিযান?' যগদাসী নিশ্বাস ছাড়ল। বললে, 'তা কি আব বলতে পাবি ভাই? নিজের ছেলের গল্প কি আর নিজে সাজে? পাঁচ জনায় দেখবে, তবে বলবে। আমার বড় বিটি কুড়ানির খুব মন এইখানে বিয়ে দিতে। বলে এক খবরে খবর হবে, আপদে বিপদে হামবাই হয়ে দাঁড়াব। আমাবও মন তাই। তবে ভাই আমরা তো গরিব। স্বামীটি আর তেমন খাটতে পাবে না। হাল একখানা আছে, বলদ জোড়াও বুড়ো, খাটিয়ে লয়। কোনো রকমে চলে। যদি ক্ষেমা ঘেন্না করে তো হবে।'

এ বাপু বিধির বেপার, আমি বুললেই কি হয়? কলিকালেব ছেলেপিলে সব, পছন্দ-অপছন্দ আছে। ছেলের মন হলেই হবে।'

ছেলেটি ঘর আসে কখন?'

এতক্ষণে নিশ্বাস ছাড়ল কেশরের মা। এতক্ষণ সৌভাগ্যের কথা বলছিল এবার বেরিয়ে এল বিষাদের সুর।

'ছেলের আমার কি হয়েছে কিছু বুঝছি না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতেও যায় না হররোজ। তারা খোঁজ লিতে লোক পাঠায়। এদিকে ঘরেও আসে না সবদিন। যে দিন বা আসে ভাল করে খায় না, ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমায় না, কেমন বাউণ্ডুলে চেহারা। জিগগেস করলে কিছু বলে না। অনেক সাধ-সাধনার পর বলে, 'বাড়ির চাকরি করব না, দূর শহরে কাঁকরের কারখানায় মজুরি খাটতে যাব।'

'বুঝলে না? যে বয়সেব যা। যেমন শুয়োর তেমনি খেটে। বিয়ে দিয়ে দাও।' নরদাসী চোখ বেঁকিয়ে ঘাড় নাড়লে।

'আন-চিত্ত রাধার মন, শাকে বালি পায়েসে নূন দিয়ে দাও।' সায দিল যগদাসী : 'যেমন বেহাদি তেমন চিকিচ্ছে।'

১৪

সন্ধ্যে বেলায় অতিথ এলো গো। হরিবোল!'

তুলসীতলায় বাতি দেখিয়ে ঘরের মা· এসে কুড়ানি প্রণাম কবছে, মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে বাইরে এল।

'আরে কুনী দিদি! আই ভাই, আই! কি ভাগ্যি আমাব, বোসো ভাই বোসো, এই চাটাইয়ে বোসো!'

দাওয়ায চাটাই বিছিয়ে দিল কুডানি।

কুনি বসে ঘবেব মধ্যে তাকিয়ে গলা লম্বা কবে জিগগেস কবলে 'শুযে কে?'

'দুপুব বোদে হাট থেকে এসে শবীব খাবাপ কবেছে, তাই ঘুমিযে আছে। তা ভাই কুনীদিদি, কি মনে কবে ভাই?'

'কেনে, ভয লাগছে না কি লো?'

তুমাকে আমাব ভয কি? 'ক'নো দিন তো আস না—

'এলাম একবাব বেডাতে। অনেক কাজ, বহুৎ দবকাব, ঢেব কথা আছে।' বলে কুনী এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

ছমছম কবে উঠল কুডানিব।

ভগমান মেযেমানুয গডে কেনে? আব যদি গডলেই তাহলে রূপ-যৌবন দেয কেনে? শুধু পাপেব শাস্তি ভোগ কবতে আসা।'

কুডানিব আবাব রূপ যৌবন আছে না কি? সব আখাব ছাই। 'কী লেখন মেযেমানুষেব। মনেব কথা মনেই বাখতে হবে, দুনিযাব কোনো নোককে বলা হবে না—'

তবে কি কুডানিব মনেব কথা পাডাব পাঁচ জনে জানতে পেবেছে? এত কবে গোঁজা দিযে মনেব ফাঁক ফোকব বন্ধ কবে দেবাব পবেও কান্নাব আওযাজ শোনা যায? শুনতে পেযেছে এবা?

'সুন্দবী হযে জন্মেছিস কেনে? আগুন যে ছাইচাপা থাকে না।'

কুনীব হাত আঁকডে ধবল কুডানি। বললে 'কুনী দিদি তোব কথাগুলি আমি ভাল বুঝতে পাবছি না। ব্যাপাব কি বল দেখি? সত্যি কথা বলবি কিছু গোপন কববি নে'

'বলি, বিডি-বাঁধা ছেডে দিলি কেন? বাডিতে বসে থেকে দু' পযসা হত।'

'বিডিব ব্যবসা ছাডলেম ভদ্দবনোকেব অত্যাচাবে। বিডি ঘবে নাই, তবুও গাহেক। ব্যাপাব দেখে বন্ধ কবে দিযেছি।'

'মেযেমানুষ যত অন্দবে ভবা থাকে ততই ভাল, বাইবেব হাওযা গাযে লাগলে গা কেমন ছমছম কবে। ছোটলোকদেব মবণ। তাঁদেব তো আব আবরু থাকে না। লোকেবও সাহস খুব হয ভাবে ওদেব আব মানসম্মান কি।'

'বাডি হতে আমি কোথাও যাই না, কেবল ঘাট আব বাডি—তাও কত ভযে-ভযে থাকি। বাজপাখিকে পাযবাগুলো যেমন ভয কবে—'

'তা কেন বলিস। হাটে যাস, বাপেব বাডি যাস—'

সে কালে-কস্মিনে। হাটে যেযেছি মা যখন মেযেব বাডিতে ছেল—তাও লিত্যি লয।'

'মাব থানে যাস। গান শুনিস।'

'মাব মন্দিবে যাব না? যাই তো এই কালি-ঝুলি মেখে। গযনা নেই, ভাল কাপড তো নেই-ই। এই একখানা মোটে কাপড যা পবে আছি, তাও সেদ্দ কবে পবিষ্কাব কবি না। চিমটি কাটলে মযলা ওঠে।'

'তুই যে সাবকুডেব পদ্মফুল।'

'তোমাব মুণ্ডু। ব্যাপাবখানা কি খুলে-খেলে বল দিনি।'

'ব্যাপাবও ঐ মুণ্ডু।' কুনী আবো ঘেঁসটে এল। ফিসফিসিযে বললে, 'হোবাঙ কোথা? এখুনি আবাব আসবে না কি?'

'না। সে তো আজ বাড়িতে নাই। মনিব-বাডিতে ধান আনতে গেছে। খোবাকিব ধান নাই।'

'ওটা একটা ভূত। শোন।' কুনী কুডানিব একখানা হাত ধবল 'বাবুপাড়াব সবিৎবাবুকে চিনিস? মস্ত লোক, কাঁকবেব পেকাণ্ড কাবখানা খুলেছে—কাল গিযেছিল কবি শুনতে—'

'হবে। তাব আমি কি জানি।'

সে মুদমিই আমাকে বলে, আমি কিন্তু কথা গা-গোছ করি না। কাল ভাই আমাকে দশ টাকা দিয়ে বামুনের ছেলে জোড় হাত করে বলেছে। তাই তোর কাছে আসা। আজি থাক তো দ্যাখ।'

নিশ্চিন্ত হল কুড়ানি। এ তেমন কিছু ঘোরালো-প্যাঁচালো নয়। এ তার নিজের এক্তারের মধ্যে। হাঁ-না—এ দুয়েরই মালিক সে নিজে। এ বাইরের ব্যাপার। মনের ব্যাপার নয়। মনের ব্যাপারেই যত ঝঞ্ঝাট। হাঁ-না কিছু বোঝা যায় বলা যায় না। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ দিশপাশ নাই। ঠাণ্ডা, কখনো কুল কাঠের আগুন। যে ডালে বসে সে ডালই কাটে। কখনো বা শুষ্ক মূল ছেড়ে পাতায় জল ঢালে। যে পাখি ছুট দেয় তারই পিছু ধাওয়া করে। তার না পাওয়া যায় ঠাঁই, না পাওয়া যায় ঠিকানা।

কুড়ানি দেখল, গায়ে তার হাত পড়লেও তা মনের দুয়ারের আগড় তেমনি অটুট আছে।

গায়ে হাত? হ্যাঁ, তার স্বামীর হাত। দুর্বল মানুষ হলেও সেদিন তাকে মারতে কসুর করেনি। কেন মেরেছিল কে জানে? আর কুড়ানিই বা সে মার সহ্য করেছিল কেন নিঝুমের মত। কে বলবে?

অনেক দুঃখ ছিল হোরাঙের। নিজের খাবার সংস্থান তো নেই-ই মার দুয়ারের মানত ধান ক'টাও দিতে পারে না। শুধু দুঃখ নয়, লজ্জা। আর সেই লজ্জা তাকে যে দিচ্ছে তাকেই কি না তার স্ত্রী আপন করতে চায় বোনের বিয়ে দিয়ে। তারই জন্যে খোসামুদি!

এ আবার আরেক রকম প্রসঙ্গ। কিন্তু মনের নাগাল পাবে কোথায়? পাঁকাল মাছটি হয়ে আছি। পাঁকের মাঝে বাস করছি কিন্তু গায়ে নাই পাঁকের ছোঁয়াচ। ঘ্রাণ থাকে তো দেখবে, ফুলের বাস উঠছে। বুনো পাতার আড়ালে মিষ্টি ফুল।

তোকে কিছুই করতে হবে না। সব চাকরে করবে। যা চাবি তাই পাবি। জোত, জমা, শাড়ি, গয়না, লগদ টাকা, কোলকাতায় গিয়ে থাকবি। রানির মত থাকবি। সম্পত্তি আগে তোর নামে লিখে-পড়ে রেজেস্টারি করে দিতে আজি আছে—'

কুড়ানি ফাঁপরে পড়ে আমতা-আমতা করতে লাগল ঃ 'সে হল গে বামুন, আর আমরা হলাম কুকুর! এ কি কখনো হয়?'

'খুব হয়। কত হচ্ছে গাঁ-ঘরে। উঁচু জাতের ব্যাপারে অধর্ম নাই। অধর্ম হচ্ছে নিচে নামলে। এই দ্যাখ কেনে—'

'তুমি কি যে বল তার ঠিক নাই। আমার এই দেশ-গাঁ বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যাব? দুনিয়ায় টাকাই কি সব?'

কুনী বললে, 'টাকাই সব বোন, টাকাই সব।' বলে দুলে-দুলে ছড়া কাটল ঃ

'কড়িতে ইষ্টি কড়িতে মিষ্টি কড়িতে মেলে হরি
অঘটন বটে, সব দেশে রটে, কড়িই আঁধার লড়ি।'

'ঠিক হল না কুনী দিদি, কড়িই গলায় দড়ি।' কুড়ানি মুখ আঁধার করে রইল।

বেশ তো, গাঁ-ঘর ছাড়তে না চাস এখানেই থাক কেনে। গোপ্ত অঙের খেলা চালা। আমি আছি, ধরা পড়বি না। হোরাঙ যদি বুঝতে পারে বুঝবে। সে অবুঝের সোয়ামী হবে না।'

কুড়ানি হাত ছাড়িয়ে নিল। বললে, 'তুমি যা বুলছ তা অঙ নয়, তা কাদা। আমি ও-সবের মধ্যে নাই। খাটব খাব, মন পাতিয়ে সংসার করব। তোমার সেই এঁটোখেকোর ব্যাটাকে গিয়ে বোলো, দুনিয়ায় মেলাই আছে, তাদের দিকে নজর দিক, আমি লয়। আমি দোকান খুলে বসিনি। আমি টুসকির মাল নই।'

কুড়ানি উঠে দাঁড়াল ঝপ করে।

কুনী বুঝল এখানে কোন ফল হবে না। শুধু পাথরে কোপ মারা। বললে, 'আমার ভাই দোষ নাই। বড় লোক—ধরেছে, তার মানের খাতিরে বলতে হল।'

'তোমার আর দোষ কি? বরঞ্চ ভালই হল। সাবধান হব।'

'আমার দোষ ভাই ধরিসনি।' কুনীও উঠে দাঁড়াল, 'আমি বুঝিয়ে বলে আসব বাবুকে। এ

আপনাব ঠুনকো জিনিস লয, এ একেবাবে খাঁটি সোনা—'

'ঠাট্টা কবছ কুনী দিদি?'

'ছি, ঠাট্টা কেনে। নিজেব থেকে অঙ হয সে আলাদা কথা, যেচে কেনে বেচে দেব নিজেকে? তাব টাকা আমি ফিবিযে দেব। জোড হাত কচ্ছি ভাই, মনে কিছু কবিস নে। নিজে দোষী সেই ভাল। পবকে দোষী কবা ভাল লয। যাই ভাই, বাত হচ্চে—'

১৫

ডাক্তাব বাবুব একখানা ডাঙা জমিতে কোদাল দিযে মাটি কোপাচ্ছে কেশব। দু'খানা জমি থুযে দূবে দাঁডিযে কে তাকে ডাকছে ঃ 'ওগো। শুনচ।'

কেশব শুনছে না।

'কাজ তো খুব কবছ। এদিকে শোনো কেনে একবাব।'

এক কিত্তে জমি পাব হযে আলেব উপব দাঁডাল কুডানি ঃ 'কবে থেকে আবাব কান-কালা হযেছ। ওগো ও কালা মানুষটি। শোনো। আচ্ছা লোক বটে। লাগিযে টাটক বাজি, বসে বসে বঙ্গ দেখি। শুধু কালা লয, বোকা। বুঝলে না, মালিকেব মন না জোগালে কি আব ভালবাসা যায?'

নিজেবো অলক্ষ্যে ঘাড ফেবাল কেশব। কোদাল বেখে সোজা হযে উঠে দাঁডাল। বললে, 'এখানে এ মাঠেব মধ্যে তুমি কি কবে এলে? কে সন্ধান দিলে? কেনে, আমাব কাছে আবাব কেনে এসেছ?'

'তবে ঐ কাঁকবেব কাবখানাব বাঁশবুকো বামনেব কাছে যাবো না?'

কে যেন গালে চড মাবল কেশবেব। তাকাল কুডানিব দিকে। জ্বল-জ্বল কবছে তাব চোখ দু'টো। মযলা শাডি আব মযলা গাযেব বঙ, তবু মনে হয আগুনেব খাপবাব মত দপদপে।

'দবকাব হলেই মানুষ মানুষেব খোঁজ কবে। এসো একটু, সবেই এসো। কেউ গিলে খাবে না।'

এতটুকু ভয নেই। সাবধান নেই।

'এত দিন আমাদেব দিকে যাওনি কেনে? দেখিনি কেনে চাঁদমুখ?'

'যাব কি মাব খেতে?' কেশব ঝামটা দিযে উঠল।

'আহা, কি মাব তুমি খেযেছ শুনি? হাডগোড একেবাবে চোর্ণ হযে যেযেছে, না? তোমাব সঙ্গে পাব্‌ত ঐ বোগা মানুষটা? এক ঘাযেই খুন হযে যেত। বেশ হত আমাব। এক জন যেত মবে, আবেক জন জেহেলে। বেশ হত।'

'কিন্তু গালাগালটাও তো কম খাইনি।'

'এখন কিছু বুলছি না-হয মিঠে বুলি—পিবিতেব ডাক—!'

'ঐ গাছটাকে বলো গে।'

'তুমি কিছু বোঝ না, বুঝবেও না। তুমি যদি তখন অত বোক কবে না যেতে তা হলে অত দূব হত না। স্বামীব মান বজায বাখতে আমি শুধু ছল কবেছি। আমাব চোখেব কোণে তুমি দেখনি সে ইসাবা? গালাগালেব ফাঁকে দেখনি আমাব দপ্পানি? তুমি আবাব যদি যেতে, আবাব তোমাকে গালাগাল দিতাম, আবার তোমাকে গাযে হাত দিযে ঠেলে দিতাম। তবু একটু দেখতাম তোমাকে, ছুঁতাম তোমাকে।'

'আর তোমার স্বামী আমাব নামে ফৌজদাবি কবত!'

'কবলে করত। তা বলে তুমি তোমাব পাওনা ধান ছেড়ে দেবে কেন? একবার যখন রোক কবেছ তখন ঠিক আদায় কবে ছাড়বে।'

'ও ধান আমি নিজের থেকে দিয়ে দিয়েছি হোরাঙেব হয়ে।'

'জানতাম তুমি দেবে।'

'হ্যাঁ, সব শোধবোধ করে দিয়েছি। শেষ করে দিয়েছি। পর কখনো হয় না আপন, কেবল দু'দিন লাচন-ভাচন। বেশ হল, মনের ময়লা ধুয়ে গেল।' কেশর আবার কোদাল চালাতে লাগল।

'জগতে সবারি মন তো সমান হয় না। মন মানে না তীর্থি করা, মিছেমিছি ঘোরা-ফেরা। একটা উপকার যদি করেছ আরেকটা কর।' কুড়ানি আল ছেড়ে জমির উপব নেমে এল।'

'কি?' আবার উঠে দাঁড়াল কেশর।

'শাশুড়ির আর ওর জ্বর! আমি এখন কি কবি? ডাক্তার বাবুকে বলে একটু ওষুধ এনে দাও। বিকার আছে জ্বরের সঙ্গে।'

এতক্ষণে নজবে পড়ল কুড়ানির হাতে একটি খালি শিশি। যেন শুধু এক জনের জন্যেই তাব ওষুধ দরকার!

'শিশি রেখে যাও। বুলব ডাক্তার বাবুকে।'

'আর ডাক্তার বাবুকে নিযে এস আমাদের বাড়ি। ওব পেটে ফাঁপ হয়েছে। সুবিধের মন হল না।'

'বুলবো।'

'তুমিও যেও।'

'কেনে, ফৌজদারি করতে না কি? ঢের শিক্ষা হয়েছে আমার। আমি আব যাব না।'

এক মুহূর্ত কাঠ হয়ে রইল কুড়ানি। বললে, 'তুমি এখন সবে পড়তে চাও, না? মাঝ-দরিযায় ভাসিয়ে না, পারী এবার চলে যা। ভালো! বেশ! চমৎকার ভালবাসা! আগে বুঝি নাই যে পিবিতেব এমনি ধারা—'

'আগে কে বুঝেছে? যাও, কাজ কবতে দাও। মাথাব কাপড় খুলে পড়েছে, তুলে দাও।'

'দেব না তুলে। আমি মাথার কাপড় ইচ্ছে করে ফেলেছি। আমি আর কাউকে ভয় কবি না।' কুড়ানির চোখে জল দাঁড়িয়ে গেল : 'যে যত ভয় কবে তাকেই তত চেপে ধরে। নবমকেই সবাই ধরম দেখায়।'

'তাই না কি? চোখে পানি দেখি লেগেই আছে। কি দিযে চোখ মুছিয়ে দেব? ডুমুরপাতা দিয়ে দেব না কি? কেশর আবার কোদাল ধরল। বললে, 'দাঁড়িও না আর। লোকে দেখলে কি বুলবে। এবার বাড়ি যাও।'

'তুমিও যাবে বলো এক দিন। কাল। পর্শু!'

'এই অসুখের মধ্যে?' কোদাল ছেড়ে দিল কেশর।

'এই অসুখের মধ্যেই তো ভাল। মারামারি হবে না। শরীরে আর এক তিল বল নাই। কালীর কাছে পাপ, এ ব্যামো কি সারবে? আর কি উঠতে পাবে কোনোদিন? তাই ভয়েরই বা কি, বাধাই বা কোনখানে?'

তার মানে, হোরাঙ খ্যান্ত হলে কুড়ানি সাঙা করবে কেশরকে। কিন্তু যদি সেরে ওঠে হোরাঙ?

হঠাৎ কুড়ানির একটা হাত খপ করে ধরে ফেলল কেশর। টান মেরে বললে, 'আমার সঙ্গে যাবে? হ্যাঁ, এক্ষুনি। এই এক কাপড়ে। এই ঢালা মাঠ ভেঙে। যাবে?'

'কোথায়?' খালি শিশিটা বুকের কাছে আঁকড়ে রইল কুড়ানি।

'যে দিকে চোখ যায়।'

'সে আবার কোথায়! জায়গার নাম নাই?'

'সে অনেক দূর। নাম নাই।'

'বাড়িতে যে উগী, উগী ফেলে কি যেতে পারি? কঠিন অবস্থা। কখন কি হয় না-হয় তার কিছু ঠিক নাই—'

'তা তো ঠিকই। তবু কেশর হাত ছাড়ল না। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। দুপুরের রোদে ক'টা গরু শুধু ঘাস খাচ্ছে চরে-চরে।

'হাত ছাড়ো। লোকে দেখলে কি ভাববে বলো দিনি।' অন্য হাতে কুড়ানি মাথার উপর কাপড় তুলে দিলে।

হাত ছেড়ে দিল তক্ষুনি।

কেশরের পায়ের কাছে শিশিটা রেখেই কুড়ানি পথ ধরল। একবার শুধু বললে, 'তুমি এক দিন যেও কিন্তু ইরি মধ্যে। জানবে, এই সুসময়। কালীর দেওয়া বেহাদি, এর যে নিস্তার আছে এমন মনে হয় না। তবু ডাক্তাব বাবুকে লিয়ে যেও। তোমার মনিব, তুমি বললেই টাকা লেবে না। তুমি তো ফিরেও তাকাও না, আমাব কি টাকাকড়ি কিছু আছে? যদি তুমি বলো তো, নাকের আপেলটা বিক্রি করে দি। কেমন?'

১৬

'বাবুদিদি।'

'কে রে? কেশর? কখন দেখি কখন দেখি না। কি হল তোর? আমাদের ছেড়ে দিলি?'

'আপনারা আমার আপ্তজন, আপনাদের কি ছাড়তে পাবি? সেই ব্যাপারটায় খুব লটাপটি খেয়ে যাচ্ছি—তাই কাজ-কামে ঠিকমত আসতে পারছি না।' কেশর মাথা নামাল।

'ডাক্তার বাবু তো তোর উপর খাপ্পা হয়ে আছে। বলেছে তোকে আর রাখবে না, ছাড়িয়ে দেবে।'

'তাই তো তাঁর চরণ ধরতে এসেছি বাবু দিদি। চাকরি যাক কিন্তু চরণ যেন না যায়।'

'কিন্তু হয়েছে কি? কি লটাপটি খাচ্ছিস?' ডাক্তার-গিন্নীর গলা নরম হয়ে এল : 'এমন মনমরা হয়ে আছিস কেনে?'

'ক'টা টাকা চাই বাবুদিদি।'

'তোর টাকা তুই লিবি তাতে আবার অত দাঁতে কুটো করা কেনে? মাকে বুঝি জানতে দিবি নে? তোর মাইনের টাকা, তাতে মায়ের কি? কেনে, টাকা কেনে, কত টাকা!'

'তিরিশ টাকার কম লয়। দেখেছি হিসেব করে!'

'অত? কেনে? মেলে-খেলে বল সব আমাকে। লুকো-ছাপা করিস নে। ঐ মেয়েটাকে লিয়ে পালাবি বুঝি? দেশান্তরী হবি?'

'না, পালাবার আর দরকার হবে না।'

হতাশায় যেন ভেঙে পড়ল ডাক্তার-গিন্নী : 'কেনে, হল কি? অঙের খেলা ভেস্তে গেল? লাচুনী মেয়ে আর কোথাও লাগর ধরলে?'

'না। মেয়েটার ঐ ভেড়ুয়া স্বামী খ্যানত হয়েছে।'

'মরে গেছে? সাবড়ে গেছে?' খুশির ঢেউয়ে উথলে উঠল ডাক্তার-গিন্নী : 'তবে তে তোর মজা রে—ভরা নদীর জোয়ার। হা রে শালো, মজা না? এবার সাঙা করতে পারবি না?'

কেশর চুপ করে রইল।

'কি রে আকাট, আ কাড়িস না কেনে? এখন তো আর ভোজ-জরিমানা নেই, কাজিয়া-কোন্দল নেই। এখন তো চোখ বুজে নিশ্চিন্ত হয়ে সাঙা করতে পারবি।'

'তা হয়তো পারব।'

'তবে? মুখ নামিয়ে আছিস কেনে? মনে ফুর্তি নাই কেনে?'

'না, ফুর্তি আছে বৈ কি। তবু ইর চেয়েও বেশি সুখ ছিল বাবুদিদি। সোয়ামী মরে যাবার

পর সাঙা—ই তো মুদমিই হলছে গাঁয়ে-ঘরে। ই তো ভাত ঠাণ্ডা করে কালা করে খাওয়া। উবোজ্বলন্ত তো আর খেতে পেলাম না। সোয়ামী বেঁচে থাকতে-থাকতে তো আর আমার সঙ্গে যেতে পারল না বিদ্যাশে। ই তো বিয়ে ফুরিয়ে বাজনা, কিস্তি ফুরিয়ে খাজনা।'

'হা রে শালো, জাতনাশা।' ডাক্তার-গিন্নি কৃত্রিম রোষে হাত তুলল মারতে ঃ 'ভাত পায় না ভাতার চায়, তার উপরে গয়না চায়! অমনি যে পাচ্ছিস কালীর দয়ায় তাই ঢের, তা না, যত সব ইয়ে—' ডাক্তাব-গিন্নি আবাব একটা হুমকি দিল ঃ ছুঁচ চলে না বেঁটু চালায়!'

'তা ঠিক। এক ভাবে না এক ভাবে হোক পেলেই হল।'

'ইর মধ্যে আর দু'ভাব নেই। বউ নিয়ে ঘর বাঁধবার কথা, তিথ্যি করার কথা লয়। তা টাকা দিয়ে কি করবি?'

'অনেক খরচ। সেই ভেড়ুয়ার আগে শ্রাদ্ধশান্তি করতে হবে। জাত-গিঁয়াত খাওয়াতে হবে। তার পবে সাঙাব জোগাড়-জান্তি। মেয়েটাব একখানা বেশি দু'খানা শাড়ি নাই—'

'লিশ্চয। খবচ আছে বৈ কি। তা তোর মা জানে?'

'জানবে বৈ কি। কিন্তু মাব মন কি উঠবে ইতে?'

'কেন উঠবে না? আমি তার মত করিয়ে দেব। এ কি চাট্টিখানি কথা?' ডাক্তার-গিন্নি গদগদ হয়ে উঠল ঃ ভালবাসাব মানুষেব সঙ্গে মিলন হতে পাবা কি কম ভাগ্যি? এ পেবায ভক্তের ভগবান পাবার মত। এ কি সকলের অদেষ্টে জোটে? তুই যদি তা পাস তোর মা তাতে বাদ সাধবে কেন? তোর মা কি তোর শত্তুর? তোকে তোর মা পেটে ধরেনি?'

ডাক্তার-গিন্নি টাকা দিল তিরিশটা। বললে, 'আর বেশি রইল না। 'তা ঘবে এখন লক্ষ্মী আসবে টাকা-পয়সার অভাব হবে না। দিন ঠিক হলে তোব মাকে পাঠিয়ে দিস, লতুন শাড়ি দেব, পারি তো ছোটখাট গযনা দেব একখানা। আব শোন, এক দিন দেখিয়ে যাস মেয়েটাকে। দেখব তোর পছন্দ!'

টাকা নিয়ে বেরিয়ে এল কেশর। ডাক্তার বাবু কোথায়? ডাক্তার বাবু বৈঠকখানায় বসে পাশা খেলছেন।

ঝাঁপিয়ে পড়ে কেশর তাঁর পা জড়িয়ে ধরল।

প্রথমটা আঁৎকে উঠেছিলেন, পরে দেখলেন কেশর। পা গুটিয়ে নিয়ে বললেন, 'উঁহু, হবে না, তোকে আমি আর রাখব না। থেকে-থেকে অমন কামাই করা পোষাবে না এখানে। তুই বাড়িতেও থাকিস না নিয়মমত। তুই বকে যাচ্ছিস—আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াস।'

'আমার নিজের জন্যে বুলছি না বাবু। আমাদের গাঁয়ের পচি পাড়ায় এক জনের বড় অসুখ। তাকে একবারটি আপনি দেখতে যাবেন।'

ডাক্তার বাবু ধাতস্থ হলেন। 'কার অসুখ?'

'হোরাং। হোরাং কুরুর। জ্বব বোধ হয় সান্নিপাতিক। তার মারও অসুখ—আমোশা।'

'তাতে তোর কি মাথাব্যথা?' ডাক্তাব বাবু ধমকে উঠলেন।

'আমাকে পাঠিযে দিলে আপনাকে লিয়ে যেতে।'

'আট টাকা লাগবে আগাম।'

'টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে আমার সঙ্গে।' ট্যাকের থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করলে কেশর।

'বেশ, কাল সকালে যাব।'

'না বাবু, আজকেই যেতে হবে। খুব কান্না-কাটি করছে। অবস্থা তত ভাল লয়।'

'এখন রওনা হলে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। নদী পড়বে না কি? ঘোড়া পার করা যাবে? এখন যেতে হলে বারো টাকা।'

'তাই দেব।' ট্যাকে আবার হাত রাখল কেশর ঃ 'শুধু একটা লিয়ম রক্ষা। মরার আগে

একবার ডাক্তার দেখানো। নিজের মনকে চোখ ঠারা। আসলে বাঁচবে না কেউ।'

'কে হয় তোর হোরাং?'

'কেউ লয়। অমনি আঁতের লোক। বন্ধু।'

১৭

ছোট কাহি ঘরটাতে শুয়ে নরদাসী পেটের যন্ত্রণায় কুঁ-কুঁ করছে। আর এদিকের কোঠা ঘরে জ্বরের ঘোরে চেঁচাচ্ছে হোরাং।

'ওমা আর বাঁচি না। ও বাবা কি করব। আমি বনে বসে চেঁচাচ্ছি। আমাকে বাঘে খেয়ে যাক। আমার কেও নাই। একা মানুষ দু'-দু'টো উগী লিয়ে পড়েছে। কোন দিক সামলাবে? কখন ডাক্তার আসবে? ডাক্তার এসেই বা করবে কি! এ বেহাদি মা-কালী দিয়েছেন। এ একেবারে নেপাট করে ছাড়বে। আমি আর বাঁচব না। আমাকে বাঁচাও। মা-কালীর ধান শোধ হয়ে গিয়েছে বুলছ? কে শোধ কল্লে? কেশর? ডাক্তার আনতে গেছে কে? সেই কেশর? এত ভাল? এত আত্ম? ওর ঋণ আমি শোধ করব কি করে?'

দিন-রাত্রির মধ্যে একটু অবসর নেই কুড়ানির যে একটু বসে চিন্তা করে। কিন্তু এখন এক ফাঁকে কেশরের নামটা পাড়তে পেরে মনটা হালকা হয়ে গেল। আরো আরাম লাগল যখন হোরাঙ ও-নামে আগুন হয়ে উঠল না। গা পেতে মেনে নিলে।

ঠ্যালায় পড়লে ন্যালারও জল খেতে হয়। তাই কেশর এখন খুব ভাল লোক। আত্মজন!

যেমন মন্তন্না তেমনি যন্তন্না। সহজে মেনে নিলেই তো হয়। গরিব যে, অক্ষম যে, তার পক্ষে আড়বুঝ হলে চলবে কেন? এই যে লোকটা এত খাটনি দিচ্ছে, খেসারৎ দিচ্ছে, কিসের লোভে? একটু আসতে যেতে দিলে ক্ষতি কি? হলই বা একটু বন্ধুতার লোক, করুকই না একটু বসু-উঠু? কি এমন মা-ভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? এত যে করছে সে একটু পেতিদান পাবে না?

ডাক্তার বাবু ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। ওষুধের বাক্স মাথায় কেশর।

'ঘোড়াটা বাঁধ।'

'আজ্ঞে বাঁধছি, আপনি নামুন।' কেশর হাঁক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল : 'ওরে কে আছিস একটা মোড়া এনে দে।'

আশ-পাশের অনেক বাড়ির লোক জড় হতে লাগল। ব্যাপার কী হে? একটু কি অসুখ করেছে, একেবারে যে ঘোড়ায়-চড়া ডাক্তার। বলি, কথাটা কি? কথা আর কি, ডাক্তার বাবুর চাকর ঐ কেশরের কেরামতি। কিন্তু, কেনে, কেনে তার এই হামখোদাই? আর কেনে! বোঝো না? যার ক্ষেত তার শস্য। যার লাঠি তার মাটি।

কিন্তু ডাক্তার বাবু ভিজিট লেবেন না? ছেড়ে দেবেন? চাকরের এত খাতির? কে জানে! জাঁতা জানে আর পিযুনী জানে।

'না হে, কথাটা ডাক্তার বাবুর কানে তোলা হক এ সময়। হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। ভূতেশ কুনাই তো দেখেছে স্বচক্ষে। সে সাক্ষীপ্রমাণ দিতে পারবে। কি রে ভূতেশ? দিনে-দুপুরে মাঠের মধ্যে ঘোমটা ফেলে—কি রে সেই ঘটনাটা? হ্যাঁ বাবা, কেচ্ছা লয়, সত্যি ঘটনা। চর্মচক্ষুতে দেখা।'

'দরকার নাই। নিজের চাকরের দোষ বিশ্বাস করবে না। উলটে মন্দ ভাববে আমাদের। হ্যাঁ বাবা, সবসে চুপ ভাল। দ্যাখো শোনো বোলো না, রাঁধো বাড়ো খেয়ো না। নিজেরাই জোট বাঁধো, পতিত-রহিত কর।'

ডাক্তার বাবু রুগী দেখে বেরুলেন গলায় রবারের নল ঝুলিয়ে।

'উগী কেমন দেখলেন?' সবাই গোল হয়ে দাঁড়াল।

'ছোকরাটির ব্যারামই শক্ত হয়েছে। বুড়িরও ভরসা কম। আরো আগে ওষুধ দিতে হত।

'বাঁচবে তো?'

'যদি কপাল জোব হয়, ওষুধ ধরে তো বাঁচতে পারে। এখন বিশেষ তদবির দরকার। টাকা-পয়সা খরচ করতে হবে। দু'চার টাকায় হবে না। এদের আছে কে?'

'এজ্ঞে আমরাই আছি। আমবাই ইদেব জাত-গিঁয়াত, পাড়া-পড়শি। আমাদেরই সব করতে-কম্মাতে হবে। চাঁদা তুলতে হবে ঘর-ঘর। তবে দেখছেন তো, আমবা সব গবিব মানুষ, আপনাদেরই জমি চষে আমরা খাই—'

'ব্যায়রামটি তো গবিব নয়। ওষুধের দাম যে খুব চড়া—বাজার যে বড় কঠিন হয়েছে আজকাল। ঠিকমত ওষুধ না পড়লে ছোকরাটা যে টেঁসে যাবে।'

বাড়ির ভিতর থেকে হঠাৎ কান্নার রোল উঠল ঃ 'ওগো আমার সব যাক, দুঃখু নাই। আমাব স্বামীকে বাঁচাও। লোকে যে যা বলবে বলুক, তোমার পায়ে ধরছি। তুমিই আমার সব। তুমি ডাক্তার বাবুকে একটু বলে-কয়ে দাও. পাড়ার লোক সব আমাদের শত্তুর। তুমি ছাড়া আর কেউ নাই। আমি সমাজ মানি না, আমার স্বামীকে বাঁচাও। দেখ না কেমন করছে। আমার এ বেপদে কে করবে? কে দেখে? ওগো হেমা মাসী, আমার মাকে এনে দে মা—'

কেশর এসে ঘোড়া খুলে দিল। বাক্স মাথায় করে ফিরে চলল ডাক্তারের সঙ্গে।

নদী পেরোবার পর ডাক্তার বললে, 'তুই এবার ফিরে যা।'

'বাড়ি?'

'বাড়ি ফিরবি না যে তা আমি জানি। শোন, রাত জেগে কঠিন সেবা করতে হবে। সেবার কমতি হলেই আর বাঁচানো যাবে না। আমার ফি না-হয় কমিযে নেব, কিন্তু ওষুধ? অত টাকা পাবি কোত্থেকে?'

বুকটা ভরে গেল কেশরের। না, বাঁচুক, বাঁচুক, জীবন ফিরে পাক হোরাঙ, কুড়ানি খুশি হোক—সারা পথ আসতে-আসতে মনে-মনে বলতে লাগল বার-বার। এক জন জীবন পাবে আরেক জন খুশি হবে—এটাই যেন কত বড় সুখ।

কেশরকে ফিরে আসতে দেখল বুঝি কেউ-কেউ। এক জন বললে চেঁচিয়ে, 'লোহায়-লোহায় জোড় লাগে গো কামার মিনসেই পর।'

১৮

কিসের অসুখ! এদিকে জ্ঞানখানা টনটনে।

রাত জমাট হয়ে আসছে। কই এখন রোগ বৃদ্ধি পাবে, তা নয়, স্পষ্ট খরখরে গলায় হোরাঙ জিগগেস করলে, 'কেশর কুথা?'

'এই আছে বাইরে বসে। কখন কোন কাজে লাগে—'

'না, অনেক কষ্ট দিয়েছ ওকে। ওকে এখন ছুটি দাও। ও বাড়ি যাক।'

'বুলছি।'

'আর কুনীকে খবর দিয়েছ? সে এসে থাকবে'খন তোমার কাছে।'

'খবর দিয়েছি।'

'শোনো, কিছু খেতে দিয়েছ কেশরকে?'

'কি দোব? ঘরে কিছু নাই।'

'মাহা বিপদ। হুঁকো কলকে তো আছে, একটু তামাক দাও কেনে।'

কাহি ঘরের খুঁটিতে পিঠ দিয়ে আচ্ছন্নের মত বসে ছিল কেশর। পিছনে দাঁড়িয়ে তার মাথা ভরা চুলের মধ্যে কুড়ানি তার দুই হাত ডুবিয়ে দিলে। মাথাটা লুটিয়ে পড়ল তার কোলের কাছে।

কুড়ানি বললে, 'এবারে বাড়ি যাও।'

'বাড়ি যাব? ডাক্তার বাবু বলে গেলেন বাড়ি যাস নে। রাত জেগে পাহারা দে।'

'কিন্তু ও বললে বাড়ি চলে যেতে।' কুড়ানি হোরাঙের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলে ঃ 'ওর অনেক যন্তন্নার মাঝে আবেক যন্তন্না বাড়িয়ে কাজ নাই।'

'তবে উঠি।' কেশর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল ঃ 'তোমার কাছে কে থাকবে?'

'কুনী দিদি আসবে বলেছে। কাল হেমা মাসী যাবে মাকে আনতে।'

'বেশ, আমাকে তবে আর দবকার নাই।'

'তোমাকে দরকার নাই? তবে বল আকাশের দেনমণিকে দরকার নাই। কিশোর, তুমি পুরুষ মানুষ, অল্পে তুমি তাই বুঝতে চাও না। তুমি একবাব আমার এই অন্তরটা দেখবে?' বুকের মধ্যিখান থেকে কাপড়টা সরাতে লাগল কুড়ানি।

'অন্তর কি দেখা যায়?'

'যায়। যদি, যে দেখবে তার অন্তব থাকে। কেশব, তোমাকে শুধু এই গায়ের বস্ত্রটাই দিতে পারিনি। নইলে সব দিযেছি। মন-প্রাণ, চিন্তা-ভাবনা, আশা-ভরসা—সব।'

'মুখের কথা।' কেশর চলে গেল অন্ধকাবে।

ফুলে-ফুলে অনেকক্ষণ কাঁদলে কুড়ানি।

দেখলে, কুনী এসে দাঁড়িয়েছে আঙিনায়।

'কেমন আছে হোবাং? আর মাসী?'

'ভাল লয়।'

'তাই আগুতেই কাঁদছিস কেনে? এখনো তো সময় আছে। সময় থাকতে বাঁধ বাঁধা ভাল।'

না, কাঁদবার কি হয়েছে? স্বামী তার ভাল হবে ঠিক। সে অধর্ম করেনি, পাপ-পথে পা দেয়নি। শত ঝড়-তুফানেও সে ঠিক আছে। কান্না মুছে উঠে দাঁড়াল কুড়ানি।

'হ্যাঁ বে, সত্যি?' কুনী তাকে গায়ের কাছে টেনে আনল।

'কি সত্যি?'

'তোর নামে যে কলঙ্ক রটে গেল। পাড়ায় যে সব জ্ঞাতের ডাক হয়ে গেল।'

'কেনে, সেই কেশরেব লেগে তো?'

'হ্যাঁ, সেই ছোঁড়া আসে না কি তোর কাছে? কবে থেকে? কুথা? সব খুলে বল আমার কাছে। আমি তোর আপনার নোক।'

'কি আর বুলব কুনী দিদি। যত গর্জে তত বর্ষে না। তবে যা রটে তা কিছু বটে। জ্ঞাত-মজলিস তো ভাল-মন্দ বিচার করে না, লরমকে শুধু ধরম দেখায়।'

'কদ্দুর গড়িয়েছে বল দিকি? হোরাং জানে?'

'গড়াবার জিনিস লয় এ কুনী দিদি। থির আছি। এ হিয়ের তাপ কি বেউ জানে না বোঝে?

'আমাকে বল খুলে-খেলে। দায়েব কাছে পেট লুকোস নে।'

'কেশরের সঙ্গে আমি থাকিনি। তাকে ভালবাসি। তাকে বোনের বিয়ে দেব বলে আপন করতে চাই। তা সে শোনে না তা কি আমার দোষ? এর জন্যে যদি পতিত হই তো হব। এ গাঁয়ে আর থাকব না। চলে যাব ভিন গাঁয়ে—'

'কেশর কি বলে?'

'পুরুষ মানুষ আবার কি বলে. তা কুনী দিদি, যদি থেকেই থাকি কেশরের সঙ্গে, আপন

জাত তো বটে। তোমার ঐ বামুন বজ্জাতের মত জাতবেজাত তো লয়; তবে তসকিরটা কি? পতিত করবে! বেশ! যদি জরিমানা দিই তাহলেই আবার সব দোষ খণ্ডে যাবে। হায় রে টাকা!'

'বলিনি সেদিন, কড়িতে ইষ্টি কড়িতে মিষ্টি—'

'পতিত করে কি করবে বলো দিনি? তোমার বেলায় কি করেছিল?'

'উঃ, ত্যাশলারা কি আমাকে কম জ্বলন দিয়েছে। এই ঘর-বাড়ি আসবে না, ভোজে-কাজে খাবে না, আগুন-পানি দেবে না। অন্য বাড়ি যেতেও দেবে না, ডেকে শুধুবেও না মরে গেলে।'

'আবার জরিমানা দিলে শান্তি তো?'

'পঁচিশ টাকা লেবে তবে চলতে দেবে। আমার ঠেঁয়ে দু'-তিন বার জরিমানা লিয়েছে তবে ছেড়েছে। তা মোড়ল আমার লোক ভাল। টাকার জোগাড়-জান্তিও আছে মন্দ লয়। দু'-চার খানা গয়নাগাটি দিয়েছে, দু'-বিঘে জোলান জমি করে দিয়েছে ধানের। এখন তো খোলা ভাটি—আসে থাকে যায়, কোনো কথা নাই। পেথম ঠোকে একটু কষ্ট হয়, তার পর আর ভয় নাই। সমাজের মুখের উপব তুড়ি মারতে হলে টাকা-পয়সা চাই। তা কেশর আনছে কিছু জোগাড় করে?'

'যা আনছে তা দিয়ে আগে সোয়ামীর চিকিচ্ছে করতে হবে তো? মাথার উপরে কি একটা বেপদ কুনী দিদি? সঙ্গে-সঙ্গে শাউড়িও শক্ত কাহিল। এদিকে খোরাকির ধান চাই, চাল দিয়ে জল পড়ে। ঘর বাঁধি না মন বাঁধি? কিশোরের আমার সাধ্য কি? কিশোর আমার কয় দিক্ সামলাবে? তার উপরে আবার যদি জরিমানা হয়—ঐ মা ডাকছে কুনী দিদি। চলো।'

একটু আড়ালে গিয়ে কুড়ানি চোখের উপর আঁচল চাপা দিল।

১৯

সন্ধেবেলা হেমাঙ্গিনী এসে হাজির।

'আসতে আসতে সন্দে হল। তোর মা কুথা রে ভাসানি?'

'এসো গো মাসি এসো। মা ঘাটে গেছে। এই দেখ, এই সপে বস। তা বাড়ির সব কেমন আছে?'

'ভাল সব নাই মা। পাড়াশুদ্ধু সব জ্বর-জ্বালা। আমাব আসবার জো নাই। গা-গতরে বেদনা—'

'এসো গো এসো বিয়েন, কি মনে করে?' ঘাটের থেকে এল যগদাসী।

'যত তাল আমাব মাথার উপর দিয়ে। আমি বলে কোথায় পড়ে থাকি তার ঠিক নাই, তবু বেপদকালে হেমা ছাড়া আর কারুর টিকি দেখা যায় না।'

'কি হয়েছে?'

'তোমাকে লিয়ে যেতে এসেছি। তোমার মেয়ে পাঠায়েছে আমাকে।'

'কেনে?'

'হোরাং-এর শক্ত অসুখ। তার মাও পড়েছে ভারী হাতে। ঘোর বেপদে আঁধার দেখছে কুড়ানি। কেঁদে কেঁদে মিনুতি করছে, আমার মাকে ডেকে দে, আমার মা ছাড়া কেউ নাই।'

যগদাসী কাঁখের কলসীটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল। বললে, 'কেনে মেয়ে আমার চলে আসতে পারে না আমার কাছে? ওটা ও কিসের সোয়ামী? বছরের মধ্যে ছ'র মাস কেবল ভোগে। এক পয়সা কামাতে পারে না। চাষী ছিল, জমি-জমা খুইয়ে এখন মুনিষ হয়েছে! ওটাকে ও ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে পারে না?'

হেমা মাসী বললে, 'ওমা সে কি কথা? এখন আবার ছাড়া ছাড়ি কি?'

'লিশ্চয়। এখনই তো ছাড়াছাড়ি। পরনে একখানার বেশি শাড়ি নাই, গায়ে গয়না ঠেকায়নি

একখানা, এক বেলাও খেতে পায় না পেট ভরে। ও ভাতারের ভাতে কে হাত দিতে যাবে। তার উপরে না কি সন্দ করে, মারে। ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারবার গোঁসাই। সন্দ করিস তো, ছাড়বিড় করে দে বিয়ে। আর ভাতার যদি না ছাড় দেয়, তুই, বিটি, ভাত খাব না বলে চলে আয় ছেড়ে-ছুড়ে। আমি তোকে উপযোক্ত লোকের কাছে সাঙা দেব।'

'তোমার মেয়ের কথায় আমি এসেছি। মাথায় পড়ে এসেছি। সাত-পাঁচ অত জানি না কিছু।'

'খুব জানো। তোমাদের গাঁয়ে আর কুটুম্বিতে করতে যাব না। এই শেষ। মেয়েকে যদি একবার হাত করতে পারি তবে দেখাব একবার ও জাতনাশাকে। ও ভেবেছে কি? আমার মেয়ে কি পরের বাড়িতে চাকরানি হবে? দোরে দোরে দুখ ভিখ করবে?'

'বেশ তো চলো কেনে, মেয়েকে লিয়ে আসবে।'

'ওর লিজের বুঝ-সুঝ নাই, ও চলে আসতে পারে না লিজের থেকে? কিসের মজায় মজে আছে সেখানে? ওর কি মান নাই শরীলে? ও কি ম্যাড়া?'

'তুমি মিছিমিছি আগ করছ বিয়েন, যত বড় শত্তুর হোক এ ভরা অসুখের সময় কেউ চলে আসতে পারে?'

'খুব পারে। ও বাশচাপা এবার খ্যাস্ত হোক। মেয়ে আমার এমনিতেও বেধবা অমনিতেও বেধবা।'

উত্তেজনার ঝোঁকে কখন কাছে বসে পড়েছিল যগদাসী, হেমাঙ্গিনী তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বললে, 'আতখানটা কিন্তু আমি থাকব ইখানে।'

'তা থাকবে বৈ কি।' গলার স্বর নামিয়ে ফেলল যগদাসী।

নিশ্চিন্ত হল হেমাঙ্গিনী। গলার স্বরে দরদ ঢেলে বললে, 'এ আগাআগির জিনিস লয় বিয়েন, শলা-পরামশ্যের জিনিস। আমি বলি কি, জামাই দেখবার নাম করে তুমি চলো মেয়ের বাড়ি। জামাই যদি খ্যান্ত হয় তো হল আর না-হয় অনা নানা করে মেয়ে নিয়ে আস। মেয়ে নিয়ে এসে আটকাও। বল, যাবে না, ও ভাতারের ভাত খাবে না। বিটি তোমার ছেলেমানুষ, তত পাকা লয়।'

'আর বলো কেনে। মুরুব্বিকে পাঠিয়েছিলাম একবার আনতে। বলে পাঠাল মেয়ে, সোয়ামীর ওজগার পাতি নাই এখন লিজে কাজ ধরতে হবে। হয় বিড়ি বাঁধব, লয় ধান কুটব। মেয়েটা নিজ্জস বোকা। তেমন চালাক মেয়ে হলে স্বামীর থেকে ছাড় নিয়ে আসত, খুলিয়ে লিত হাতের নোয়া।' কানের কাছে মুখ নিয়ে এল যগদাসী : 'এ বয়সের মেয়েরা দু'একটা অঘটন বিঘটনও তো করে, করে বিয়ে ছাড়বিড় করিয়ে নেয়। তা এ মেয়ের জ্ঞানও নেই ঘেন্নাও নেই—'

'তবু তুমি চলো। এ যোক্তি পরামশ্যের কথা। হাঁকিয়ে চেঁচিয়ে বলবার মত লয়। মেয়েকে কাছে বসিয়ে মন্তর পড়াবার মত।'

'তুমি তাকে গিয়ে তাই পড়িয়ে দিও। আমার নড়বার জো নাই। এই দেখ, মুরুব্বিটি বাড়ি নাই। গরু বাছুর ঘরকন্না এই সেয়ানা মেয়ে কাকে দিয়ে যাই বলো তো?' বলেই ভাসানির উদ্দেশে হাঁক পাড়ল : খেঁদার কটা ভেজেছিস? সানি দিয়েছিস বলদকে?' বলে আবার হেমাঙ্গিনীকে লক্ষ্য করলে এ মেয়েটা কি দাঁড়ায় কে জানে? আজকালকার মেয়েগুলো যেন ক্রেমে ক্রেমেই বোকা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বয়সকালে—'

'চাপা দাও বিয়েন চাপা দাও।' হেমাঙ্গিনী নিশ্বাস ছাড়ল। বললে, 'আমি তা হলে খামোকাই এলাম।'

'খামোকা কেনে? তুমি আমার বাড়ি ধুলোপায়ে হেটে এসেছ, আমি মাথায় কল্লেম। আমার যেমন হয় খুশি মনে খাও, থাকো।'

'তা আতখানাটা শুদু থেকে সকাল বেলা চি-হরি চি দুগগা বলে আমি চলে যাব। আমার কি? শির নাই তার শিরঃপীড়া। কিন্তু মেয়ে জামাই কেউ যদি কাউকে না ছাড়ে তবে তো বড় বেপদের কথা।'

২০

হোরাং সেরে উঠে পথ্য পাবার দুদিন পর নরদাসী মারা গেল।

মায়ের সৎকাজ হয় কেমন করে? বুড়ো মানুষ, গঙ্গা না দিলে লোকে বলবে কি? কিন্তু টাকা কোথা? হোরাঙের শরীরে সামর্থ্য কোথা?

হেমা মাসী বললে, 'বাবা, দুর্বল শরীল, কেঁদো না। জাত-গিঁয়াত পাঁচ জন আছে, ভয় কি, উদ্ধার করে দেবে।'

'উদ্ধার তো হবে, টাকার ব্যাবোস্তা কই?' অসহায়ের মত বলে উঠল কুড়ানি ঃ 'অসুখ বেসুখে সব্বসান্তি। ছিল কিশোর তাই রক্ষে। কিশোর না লাগলে বাঁচাতেই পারতাম না। কিন্তু একটা লোক বারে বারে কত দিতে পারে?'

কথাটায় ভুল নাই। হোরাং স্বীকার করে, বোঝে হাড়ে-নাড়ে। কৃতজ্ঞতার তার শেষ নেই। কিন্তু লোকটার দেবার তো একটা শেষ থাকবে।

কেন যে এত দিচ্ছে, মনকে চোখ ঠেরে জিগগেসও করে না একবার। জিগগেস করে না, কেন না, না দিলে উপায় কি? দায় উদ্ধার হয় কি করে?

কিন্তু একটা কথা জিগগেস না করে পারে কই? এ সব কি শোধ করতে হবে না হোরাংকে।

'পাড়ায় তো সবাই আপন-আপন কাজে ব্যস্ত। কাকেই বা পাব! এমনি একটিও লোক নেই যে উবকার করে। ও-বাড়ির কুনীর বাবাকে ডাকতে পাঠিয়েছি। এক জনে কি হবে? হ্যাঁ গো, বসে কাঁদলে আর চলবে না। কি যুক্তি করছ তাই করো। কুড়ানি ছটফট করতে লাগল ঃ 'আমি মেয়ে মানুষ, কি করবে বলো দিকিনি—এ্যাঁ। পাড়ায় কেউ নেই আমাদিকিন অক্ষে করে।'

কেশর ঘুরে এলো পাড়া থেকে। বললে, 'পাড়ার কেউ আসবে না। কারুর রা-বোল নেই। মাহা তসকির হয়ে গেছে না কি, পঁচিশ টাকা জ্ঞাত-দণ্ডি লাগবে।'

'কেনে, কি আমাদের অল্যায় হয়েছে যে এমন বিধেন হবে? তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল কুড়ানি ঃ 'কুনী যে কুনী, তার বেলায় দশ টাকায় মিটল। আমাদের বুঝি মাতা-ছাতা নাই বলে যার যা মনে আসে তাই করবে? একটা বিচার নাই?'

'তার উপরে পতিত-রহিত করেছে না কি। মড়া তো ছোঁবেই না, ছাদ্দ কিরিয়ায়ও আসবে না কেউ।'

কুড়ানি সর্বাঙ্গে কাঠ হয়ে রইল।

কি অপরাধ সে করেছে যার জন্যে তার এই শাস্তি? আব শাস্তিই যদি তার হল, অপরাধ সে করলে না কেন?

'ভেবে কোনো ফয়সালা হবে না। আমি রাখাল-বাগাল নিয়ে এসেছি—আমার দলের লোক। আমরাই কাকীকে ঠিক গঙ্গায় দিয়ে আসব।'

কুড়ানির পাথরজাঁতা বুকটা হালকা হয়ে গেল। সে জানত কেশর ঠিক তাকে বাঁচিয়ে দেবে। বাঁচিয়ে দেবে সমস্ত লজ্জা, সমস্ত অপমান থেকে।

হোরাং কেশরের দু'হাত জড়িয়ে ধরল। বললে, 'বড় কঠিনে পড়েছি। তুই ছাড়া কেউ নাই এই বেপদ থেকে অক্ষা করে। টাকার জোগাড় কি করে হল?'

'সে আর তোকে ভাবতে হবে না। তু আগুন দিতে পারবি?'

'শরীল যে দুব্বল, চলতে পারব না।'

'তবে তোর বউই মুখে আগুন দিক। ওগো ওঠ কেনে। ভাবলে মা-গঙ্গা তরা দেবে? একটা ব্যাবোস্তা তো যাহোক করেছি।'

'হেমা মাসী সঙ্গে যাক।' হোরাং বলবে না ভেবেছিল তবু বলে ফেললে।

'ও বাবা, গঙ্গা অবধি না কি?' আঁৎকে উঠল হেমাঙ্গিনী।

'না না, শ্মশানখোলা পয্যন্ত।' হোরাং বললে, 'তুমি আবার ফিরবে তো বাড়িতে! সেই সঙ্গে—'

শ্মশানখোলা নদীব পারে, গঙ্গা সেখান থেকে পাকা দশ মাইল। যারা গঙ্গায় দেবে তাবা শ্মশানখোলায় মুখাগ্নি করিয়ে নেয—সবাই কি আর হাঁটতে পারে এত পথ? তা ছাড়া কুড়ানি তো মেয়েছেলে!

দুপুব গড়িয়ে গেছে। নির্জন হয়ে এসেছে গেঁয়ো পথ। নালার জলে সবুজ কঞ্চির ছিপ ফেলে কে একটা ছেলে মাছ ধরছে। আর গান গাইছে ঃ

'পিবিতি উড়ে গেল, সাঁঝবেলাকার ঝড়িতে,
আলগা কবে বেঁধেছিনু, বাঁধি নাই তো দড়িতে।'

হেমা মাসী পিছিয়ে পড়েছে—কেশব-কুড়ানি চোখ তাকাতাকি করলে।

কুড়ানি বললে, 'গান-টান আব গাও?'

'পেরানে রং-তামাসা থাকলে তো গাইব।'

'কেনে, বেথা-বেদনা থাকলেও তো নোকে গায়।'

'সে গান এখনো শিখিনি।' কেশব একটু ঘেঁসাঘেঁসি করে বললে, 'তুমি গঙ্গা পয্যন্ত হাঁটতে পাব? একা ভাল লাগে না। একা লদী বিশ কোশ। পাব হাঁটতে?'

'খুব পাবি। তুমি সঙ্গে থাকবে আমার ভয কি? তোমার পায়ে-পায়ে ঠিক চলে যাব। আবার ফিবব কখুন?'

'আর ফিরব না। মড়া খালাস কবে দিয়ে দু'জনে চলে যাব কলকাতা।'

এক লহমা ভেবে দেখল না। কুড়ানি হেসে ফেলে বললে, 'সে কি কথা। বাড়িতে দু'দিন মোটে পথ্য পেয়েছে। আমি ফিবে না গেলে তাকে এঁদে-ভেজে দেবে কে?' পবে ফোড়ন দিলে ঃ 'আমাকে যখন এমনি কাঁধে কবে নিযে গঙ্গায় দিযে আসবে, তখন আর তুমি ফিরে এসো না। চলে যেও বম ভোলানাথ হযে।'

কথাটা কানে গেছে হেমাঙ্গিনীর। সে পিচ কেটে বললে, 'কত কলা জানিস তুই। ষোলর উপর আবো দুই।'

মুখাগ্নি হযে গেলে পর ফিরতি-মুখে কুড়ানি বললে, 'গঙ্গা পয্যন্ত ঠিক যেও কিন্তু, দারকা নদীতে ফেলে দিযে এস না। এসে বোলো কি কল্লে। আমি পথ চেয়ে থাকব।'

হেমাঙ্গিনী বললে, 'চল কেনে, তুব মাব কাছে এখে আসি।'

'বাড়িতে তুমি কি কথা দিযে এসেছ?' কুড়নি চোখ-মুখ গম্ভীর কবল ঃ 'কথা দিলে কথাব খেলাপ কবতে নাই।'

২১

আগুন তুলে তামাক সেজে দিলে হোরাং। বললে, 'খা।'

কেশর বললে, 'ইচ্ছে করছে না।'

'কেনে?'

'শরীল ভাল নাই। বেতে একটু করে বুঝি জ্বর হয়। মুখ একেবারে যেন ভাকুচ নিম।'

'না, ও কিছু লয়। কড়া তামাক এক ছিলিম খেলে ঠিক সেরে যাবে।'

'তবে দে, তুই ধরিয়ে দে।'

ধরিয়ে দিল হোরং। কেশর টানতে লাগল।

হোরাং বললে, 'আমার লেগে তু এ পয্যন্ত কত টাকা খরচ কল্লি কেশর? ক' কুড়ি?'

'কে হিসেব করে!'

'কিন্তু সব টাকা তুই জলে ফেলেছিস—'

কেশর চমকে হোরাঙের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'আমার শোধ করার আর পথ আখিসনি। কি করে দিই তোর টাকা। আমার কি আছে?'

'এক ভাবে না এক ভাবে শোধ করা যাবে এক সময়, ব্যস্ত কি।' কেশর কথাটা চাপা দিতে চাইল।

'না। তার চেয়ে কিছু সেলামি দিয়ে একখানা পাকাপাকি জমি ধবিয়ে দিতে পাত্তিস তা'লে কাজের কাজ হত। জমায় বন্দোবস্ত লিতে পারলে দাঁড়াবার ঠাঁই হত একটা। আর নিজের বলে কায়েমী জমি পেলে বুক পেড়ে চাষ করতাম, পলেন মাটিতে সোনা ফলাতাম। তোর এত কষ্টের টাকা শোধ দিতাম এক মুস্তে।' হোরাঙের নিশ্বাসটা ধোঁয়া ছাড়বার পরও খানিকটা জের টানল ঃ 'তা না, লগদা মুনিষ খাটছি পরের জমিতে। পরের চাকর হয়ে আছি। সব সময়েই পয়সার টানা। চলতির কাল আর কখনু আসবে না।'

'আগে জেবন, পরে জমি।' কেশর বললে।

'তা বটে। জেবন না পেলে সব মিথ্যে। তা বটে। তু আমার জেবন ফিরিয়ে দিয়েছিস বটে, কিন্তু একখানা জমি পাইয়ে দিবি ভাই? ভাগ-বর্গা লয়, খাজনার জমি?'

'আমার আর টাকা কই?'

'তা তো ঠিকই।' হোরাং ঢোক গিলল ঃ 'তবু যদি পাকা করে একখানা জমি ধরিয়ে দিতে পাত্তিস ভাই, আমি লতুন মাতনে খাটতাম। তোর ধার আমি মিটিয়ে দিতাম সুদে-আসলে। লইলে, দেখছিস তো, ঘরে খোরাকির ধান নাই। বউ পরের বাড়িতে ধান ভানছে। দশে আমাকে ছি করছে। টাকা আর তোর নাই তা জানি—তবু—'

কেশর চুপ করে রইল।

হয়তো ভাবতে লাগল কি করে জমি ধরবার টাকা ধরা যায়।

অনেকক্ষণ এসেছে কেশর। এমনি প্রায়ই আসে। হোরাঙের কথাতেই আসে। এসে তামাক-টামাক খায়, গল্পগাছা করে চলে যায়। এটা-ওটা কুড়ানির সঙ্গে কথা কয়, হোরাঙের সামনেতেই কয়, হবু সম্পর্কের খাতিরে দু'চারটে শুকনো ফষ্টি-নষ্টি করে। এটুকুতে হোরাং আপত্তি করে না, আপত্তি করার আর জোরও নাই। এতখানি যে উপকার করেছে তার প্রতি এতটা নেমকহারামি করতে তার মন কিষকিষ করে। সে অবুঝ হতে পারে না।

কিন্তু, আজ, এই ঝিকিমিকি বেলায় হোরাঙের মনে হল, ওরা যেন আরো একটু কাছাকাছি এসে কথা বলতে চায়। এতক্ষণ ওরা একটা মামুলি কথাও কিছু বলেনি। ঘরের মধ্যে কুড়ানি খুসখুস করেছে আর কেশর মাথা নিচু করে বসে উঠোনের মাটিতে কাঠি দিয়ে দাগ কেটেছে। কি যেন কথা বলতে চায় ওরা। কথাই তো কইবে, কো'ক না যা মন চায়, যাতে মন খুশি হয়। এটুকু না দিলে চলবে কেন? হয়তো কুড়ানি জমির কথাই বলবে। আর কেশর বলবে, তুমি যখন বলছ তখন দেখি চেষ্টা করে।

গোপে-চুপে এক-আধটু কথা বললে কি হয়!

হোরাং বললে, 'যাই, কুবের মুচির ছেলে সুবল কাঁকরের কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিল। এসেছে নাকিনি ছুটি লিয়ে। যাই, ওর কাছে শহরের হালচালের গপ্প শুনে আসি গে। তুই ততক্ষণ তামাক খা। লতুন করে সাজ। আমি আসছি এখুনি।'

কুবের মুচির বাড়ি বিঘে দুই তফাৎ। এখুনি চোখের নিমিষেই ঘুরে আসতে পারবে হোরাং।

হোরাং চলে যেতেই কেশর ঘরের মধ্যে ঢুকে কুড়ানির একখানা হাত চেপে ধরল। বললে, 'চলো, এখান থেকে আমরা পালাই। এখুনি। এই ফাঁকে।'

'কোথায় পালাব? এই ঘর-বাড়ি ছেড়ে যাব কোন চুলোয়?' কুড়ানির মুখে মিঠিমিঠি হাসি।

'জানি না। তবে এইখানে নয়। এখানে আর টিকতে পাচ্ছি না। দম আটকে আসছে।'

'যেখানে যাবে সেখানেও এমনি দম আটকে আসবে।'

'মিথ্যে কথা।' সামনের দিকে হাতে টান দিল কেশব।

'এক সোয়ামীর ঘর ছেড়ে যে মেয়ে পালিয়ে এসেছে সে আবার তোমার ঘর ছেড়ে কখন পালিয়ে যায় সেই ভয়ে তোমার দম আটকে আসবে। শান্তি পাবে না, সুখ পাবে না।' বলতে বলতে আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিল কুড়ানি। 'হোবাংকে যেমন কুরে কুরে খাচ্ছে, তোমাকেও তেমনি কুরে-কুরে খাবে।'

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় কুড়ানির মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল কেশব। বলল, 'সব তোমার মুখের কথা। তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না।'

'বাসি না? সব মুখের কথা?' দু' চোখ টলটল করে উঠল কুড়ানির : 'বেশ, তুমি কাল এসো। ভর সনজে বেলায় এসো। স্বামীকে আমি পাঠিয়ে দেব বাইরে। বুলব, ঠিক বুলব তোমাকে। মুখের কথা।'

হোবাং কি কুবেরের বাড়ি পর্যন্ত যায়নি? কাছাকাছি ওৎ পেতে ছিল? না, সঙ্গে তার কেশবের মা। আধা পথে দেখা হয়ে গিয়েছে।

'এক লক্কার পথ, হাঁটতে পারি না, তবু এসেছি। কই সে হতভাগা কই? এখানে তুই কি যোঁসে পড়ে আছিস? কে তোকে বিষমন্তর দিলে? সোনার মনিব ছেড়ে দিলি, ঘর-সংসারে মন নাই। নিত্যি বাড়ি-ঘর যাস না, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াস। আমাকে গলা টিপে মার। মেরে তু আজা হ। কালী ঠাকরণের কাছে তোর পাঁচ কুড়ি টাকা জমা ছিল, সব টাকা তুই লিয়ে এসেছিস। কাকে দিছিস কি করিছিস মা গঙ্গাই জানে। শুধু তাই? তার পর আবার তু জমি বাঁধা থুয়ে টাকা লিয়েছিস। এমন দুষমন তুমি, এমন কাল মুদ্দর তুমি—এ্যাঁ। এরি লেগে তোকে পেটে ধরেছিলাম। তুমি মার রাগে ফিরে চাও না। আমি গোবর-ঘসি কুড়িয়ে কত কষ্টে তোকে মানুষ করেছি, তার এই পিতিফল।'

কেশব বাইরে বেরিয়ে খানিকক্ষণ থম্বার মত দাঁড়িয়ে রইল। পরে মার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'চলো মা বাড়ি যাই। এখানে আর মুখ করো না।'

'মুখ করব না? তোমার উপর আমার এমন আগ উঠছে যে কি আর বুলবো? তুমি অধঃপাতে যেতে বসেছ, পরের ফোঁসে তোমার যা মনে হচে তাই করছ। তুমি আমার সাজানো ঘর ছারকার কত্তে নেগেছ। আগে তুমি ভাল ছিলে, এখন দিন-দিন খুব বজ্জাত হচো। চলো, বাড়ি চলো, মোড়ল পারামানিকদের ডাকাই—তোমার ভালরূপ শাসন হক। আমাকে কাঁদালে তোমার ভাল কখুন হবে না, আগুনে দগুধে মরে যাবে—

সাহস করে বাইরে বেরিয়ে এসে কুড়ানি চ্যাটাই দিল।

'থাক, আর ভালমানসি করতে হবে না। ভেবেছ তোমার বুনের সঙ্গে আমার কেশবের বে দেবে? তা কখুন হবে না। তোমাদের বংশ ভাল লয়। তোমরা লীচ জাত। লোকে অন্য রকম বলা-ক করছে, নানান কেছা রটাচ্ছে। বলছে, বুনের বিয়ের নাম করে নিজেই গেরাস করছ। গোপ্ত অঙে অস বেশি। জাত-গিঁযাত পতিত-রহিত করে দিয়েছে, তবু তোর জ্ঞান নাই। আমার গিঁযাতরা কোপ মাররার মুখে—তারা মা-মনসার উপরে আরেক কাটি ধুনোর ধুযো। বলছে—কে এক মাগী বশ করেছে কেশবকে। আরে রেখে দাও বশ-ফস, মারের আগে ভূত লাচে। মেরে গন্ধর্ব্ব ছুটিয়ে দেব।' বলতে বলতে হোবাঙের দিকে ঘুরে দাঁড়াল কেশবের মা : 'তুমি বাবু কি করতে আছ? শাঁসতে পার না পরিবারকে? টুটি টিপে ধরে গল্যায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে পারো না আড়ার সঙ্গে?'

যাঁহা মুস্কিল তাঁহাই আসান। এ যেন শাপে বর হল কেশবের। এ অপমানের পর কুড়ানি আর নিশ্চয়ই ঘর বাড়ির মায়ায় আটকা থাকবে না। এবার নিশ্চয়ই পথ নেবে কেশবের সঙ্গে।

ভয়ে-ভয়ে তাকাল একবার সে কুড়ানির মুখের দিকে। সে মুখে এতটুকু ছায়া নাই, ভয় নাই,—মুখখানি হাসি হাসি। বড় হাস্যময়ী মেয়ে।

আর হোরাং? হোরাং গুম হয়ে বসে কলকে-নেবা হুঁকোতে টান মেরে-মেরে মুখে গাঁজলা তুলছে। শব্দ নাই সান নাই, লজ্জা নাই ঘেন্না নাই—এ কেমনতরো লোক!

২২

সবাই বলছে, বউকে তুই ছেড়ে দে।

কেনে ছাড়ব? হোরাং মনে-মনে বিচার করতে বসে ঃ কেনে ছাড়ব? ও কি করেছে? সবাই বলে, ও অসৎ, ও খারাপ। কিন্তু কেও কি দেখেছে? এ্যাঁ? আন্দাজী বললেই হল! দুব্বলের বউ কি না, কলঙ্ক একটা রটিয়ে দিলেই হল। নিজেদের ঘরে-ঘরে কি! 'বড় বড় রথী, তারা গেল কতি!' আমার জনের জোরজার নাই, টাকার জোটপাট নাই, তাই এই জোর-জুলুম! বউ খাবাপ, ধরতে পারলি কেউ? চোর ধরবে বলে পাড়ার লোকেরা বাড়ির এরে ঘেরে পাহারা দিলে কত রাত, টহলদার চৌকিদাব লাগাল, দিনের বেলায়ও কত উঁকি-ঝুঁকি, কত আড়ি-পাতা, ধরতে পারলি চোর? জেতের ধরন যাবে কোথা? লোকও ছোট, মনও ছোট। যে খায় আমানি তার ঢেঁকুর উঠবে তেমনি? তাই বলে সে পরের কথায় মিথ্যেমিথ্যি মাগকে ছেড়ে দেবে? নিজের থেকে মুখ পোড়াবে তার? নাম খারাপ করে দেবে?

কুড়ানি কেশরকে ভালবাসে। সে তা ঠিক বোঝে হিয়ের মধ্যে। আর, কেশর তো কুড়ানির জন্যে সব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে। যাতে কুড়ানিব স্বামী হোরাং পর্যন্ত বেঁচে উঠতে পারে। যাতে সে থিত-ভিত ফিরে পায়!

মন থাকে তো যা, রোচে-পোচে তো খা। ইয়ের কী করবে হোরাং? মনেব ভালবাসা সে কি করে বন্ধ করবে? মারধোর করে ছাড়বিড় করে দিলে কি রঙের দাগ উঠে যাবে মনেব থেকে? আর, মারধোর করবেই বা কেন কিসের লেগে? অন্যায় তো কেউ করেনি, একটা খারাপ ইসাবা বা মাতালী ঠাট্টাঠুট্টি পর্যন্ত লয়। আর যে কেশর তার জন্যে এত করল, বুক দিয়ে পড়ল এসে বেপদের সময় তাকে সে অকারণে অপরাধী করবে? ভরা কলি বলে কি এতটুকুও ধম্ম নাই? এতটুকুও ক্ষমা নাই? যে এখন তার আঁতের লোক, বন্ধুতার লোক, তাকে সে বিনা দোষে দুষী করবে? মুখে চুণ-কালি মাখাবে?

কানের কাছে রাত-দিন লাগাল-ভজান কোরো না। জলজ্যান্ত প্রমাণ দাও। তবেই একটা বিহিত করি।

বা, বেশ, তবে এমনি করেই দিন যাবে? ঘরে আলো জ্বালাবে বউ, বন্ধু আসবে তামাক খেতে, আর হোরাং আগুন তুলে-তুলে তামাক সেজে দেবে বন্ধুকে?

সত্যিই, কি করবে হোরাং? ছাড়বেও না, ধরবেও না। কি করবে তবে? সমাজ তাকে পতিত-রহিত করেছে, মায়ের নামে দুখানা সে পাতা তুলতে পারল না। সমাজ ভাঙে তো নোয় না। জরিমানা দিয়ে জাতে ওঠ, রা-বোল চলাবলা ফিরিয়ে আনো! কিন্তু জরিমানা লিয়ে কি ভালবাসা খণ্ডাতে পারিস? বালির বাঁধ দিয়ে কি নদী ঠেকানো যায়? সবাই হোরাঙকেই ছি-ছি করছে। কিন্তু কি করবে হোরাঙ? যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি! হোরাঙ এ গাঁ থেকে চলে যাবে। সে কাউকে ছাড়বে না, ধরবে না, সেই সবাইর থেকে ছাড়ান নেবে। রইল কুড়ানি, রইল জাত-গিঁয়াত, রইল তার ভাঙ-পড়া বাড়ি-ঘর—সে চলে যাবে বিদ্যাশ-বিভূঁয়ে।

সত্যি-সত্যিই যখন কেশরকে ভালবাসিস তখন ছাড়বিড় করে একদিন চলে যা না হাত ধরে, লতুন গাঁয়ে গিয়ে ঘর বাঁধ। আর তোকেই বলি কেশর, এতই যখন তোর গায়ের জোর, টাকার

জোর তখন মেয়েটাকে লিয়ে যেতে পারিস না বেপাত্তা করে! ক'দিন না হয় খুঁজব-খাঁজব, কোথাও কোন উদ্দিশ পাব না। এক দিকে মন হায়-হায় করলেও অন্য দিকে খুশি হবে। আমার আর দোষ ধরবে না কেউ, বলবে বউটাই খারাপ, বন্ধুটাই নেমক হারাম।

তা, যখন তোরা কিছুই করবি না, তখন আমিই নিষ্পত্তি করি, আমিই চলে যাই। আমি চলে গেলে যদি তোরা মিলতে পারিস মনের মতন করে! বাড়ি-ঘর রইল, যত দিন সুবিধা-সুরাহা না হয়, তত দিন এখানেই থাক, শেষে মাকে ভজিয়ে-পটিয়ে লতুন বউ লিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে হাজির হ। গাঁয়ে-ঘরে খিটকেল বেশি হয়, ভিন গাঁয়ে চলে যা। চলে যা কলকাতায়। কেউ তোকে রুখবে না। তোদের সুখে বাদী হবে না কেউ।

হোরাং চলে যাবে কাঁকরের কারখানায় কাজ করতে। চাষা ছিল মজুর হবে। চাষার অনেক মান, তার জমি থাকে স্ত্রী থাকে—মজুর অনেক নিচু। নিচু হয়েছে বলেই মজুর হতে হবে। উপায় কি! সুবল বলে, আয়-আদায় ভাল, ঝঞ্ঝাট কম, নায়েব-গোমস্তা নাই, বৃষ্টির খামখেয়াল নাই। তাব উপর নিজের দেশের লোক বলে সরিৎ বাবু তাদের খুব ভাল নজরে দেখছেন। লোকও গিয়েছে বিস্তর। মেয়েছেলেও আছে মন্দ নয়। যে চায়, তারই চাকরি।

সন্ধে হয়-হয়।

কুড়ানি বললে, 'ধানের তাগাদায় যাবে না আরেক বার?'

'বলে, ধান পাকুক, কাটা হলে পরে পাবি কিছু।'

'তা বললে কি করে চলবে? ধান না দিক টাকা দিক। তুমি যাও।'

'না, আমি ও-বাগে যাব না। আমি সুবলদের কাছে যাব।'

'তাই যাও। যে কোনো এক জায়গায় যাও। একটা কিছু জোগাড়জান্তি কর।'

হোরাং উঠে চলে গেল বাইরে। সুবলের কাছ থেকে সব খবর জানা হয়েছে, শুধু কোথায় কোন ট্রেনে চড়ে যেতে হয় সেইটেই জানা হয়নি। সেইটে জানা দরকার।

আলো জ্বালাল না কুড়ানি। সাঁঝের প্রথম অন্ধকার থমথম করতে লাগল।

কোন ফাঁকে কোথা দিয়ে টুক করে ঢুকে পড়ল কেশর।

দাঁড়াল কুড়ানিব মুখোমুখি।

কুড়ানি তার ডান হাতটা কেশরের বুকের উপর রাখল আর কেশরের ডান হাতটা রাখল নিজের বুকের উপর। বললে, আমার এ-মন তোমার, তোমার ও-মন আমার। সব চেয়ে বড় দবা তোমাকে দিলাম, তোমার ঠেঁয়ে নিলামও সব চেয়ে বড় দব্য। কি, রাজি?'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কেশর। অন্ধকারে কুড়ানির চোখ জ্বল-জ্বল করছে। কেশর বললে, 'রাজি।'

'শোনো।' আরো ঘন হয়ে এল কুড়ানি ঃ 'তোমাকে আগেও বলেছি আজো বলি, গায়ের বস্ত্র তোমাকে দিতে পারি না। এ বস্ত্র নোংরা, ছেঁড়া। তোমাকে আমি আমার মন দিচ্ছি, সোনার মত খাঁটি, সোনার মত সুন্দর। তুমিও আমাকে তোমার মন দাও।

আমার যখন মন পোড়ে তোমারও মন পুড়ুক। তোমার মনে যখন সুখ, আমার মনে তখন শান্তি। কি, খুশি?'

'খুশি।'

কেশর এই প্রার্থনাই বুঝি সেদিন করেছিল কালীর কাছে।

হঠাৎ সে বলে উঠল ঃ 'এই কথা তুমি মা-কালীর দুয়োরে বলতে পার।'

'কোন কথা?'

যে তোমার মন আমার, আমার জন্যে তোমার মন পোড়ে?'

'একশো বার পারি। হাজার বার পারি।'

বেশ কাল অমাবস্যে। কাল রাতে যখন তোমার সুবিধে এসো তুমি মা-কালীর থানে। আমি

সারারাত সেখানে পড়ে থাকব। মার কাছে তুমি শপথ করে বলবে। সেই শপথটুকুই আমার শান্তি। আমার সারা জেবনের সুখ।

'বলব। তুমি যেও, ঠিক যেও।' কুড়ানি হাত নামিয়ে নিল। সরে গিয়ে বলল, 'নামুতে যাও। আলো জ্বালাই।'

২৩

মার থানে পাকুড় গাছের নিচে গায়ে-মাথায় কাপড় জড়িয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে কেশর। বেশ শীত পড়ে গিয়েছে। তা পড়ুক। কেশর নড়নাড়া হবে না। সমস্ত রাত হিমে পড়ে থাকবে বাইরে। দেখবে, সে কথা রাখে কিনা। আসে 'ক না শপথ করতে।

অন্ধকার অমাবস্যে রাত ছমছম করছে। শিউরে শিউরে উঠছে। একটা পাতার শব্দ নেই, পাখির পাখার ঝটাপট নেই। এই পাকুড় গাছে বসে হুতোম ডাকত একটা। সেটাও আজ চুপ। সবাই যেন কিসের অপেক্ষা করছে।

আবোল-তাবোল ভাবছে বসে কেশর। ঢুলুনির মধ্যে থেকে চমকে-চমকে উঠছে।

আচ্ছা, পাকুড় গাছ এত বড় হয় কি করে? ওর বীজ তো খুব ছোট। এক গাছের বীজ এত তেজী, আবার অন্য গাছের বীজে গাছ তো হিলহিলে। বৈশাখ মাসে এ গাছের গোড়ায় লোকে জল দেয় কেন? কে জানে! ওঃ বাবা, এ গাছটা একবারে এক কাঠা জায়গা নিয়েছে। ডালগুলো যেন এক একটা মোটা গাছের গদি। পরডালাগুলিতেও যেন হাতকে-মোড়া ডক্কো হয়। আচ্ছা, কেউ এই গাছের পাতাগুলি গুনতে পারে? আচ্ছা ভগবানের কাজ। যা ছিষ্টি করেছে তার সংখ্যা করা যায় না। আর, কেমন দেখ, সব গাছপালার পাতার রং সবুজ। কত রকমের যে গাছপালা আছে তার সংখ্যা নাই। কোনো গাছে ফল ধরে আবার কোনোটা ধরে না। কারো ফল খাওয়া যায়, আবার কোনো ফল বিষ, তেতো। ভগবান বসে-বসে কত ছিষ্টিই করেছে। বলিহারি যাই। পাতার উপরে ঐ আকাশের দিকে চেয়ে দেখ না। ফুটকি-ফুটকি কত তারা ঝকঝক করছে। যত শীত পড়বে ততই আকাশ ঝলমল করবে। কত তারা তার লেখাজোখা নেই। 'এক থাল শুপারি, গুনতে নারে বেপারী।' গোনে কার সাধ্যি?

হোরাঙের ঘুম আসছে না। ছটফট করছে। কাল সকাল বেলা চলে যাবে সে কাঁকরের কারখানায়। কি করে যেতে হয় হাট-হদ্দ জেনে নিয়েছে সব। বাস-এ করে যেতে হবে প্রথমটায় রেল-ইস্টিশন পর্যন্ত। যেখান থেকে বাস ছাড়ে সেখানে গিয়েই সে সটান উঠতে পারবে না, এত ভিড়! সে ছোটলোক, তাকে উঠতেই দেবে না ভদ্দর লোকেরা। তাকে তাই উজিয়ে যেতে হবে মাইল খানেক কি তারো কিছু বেশি। গোটা কয়েক সিট মাঝ-রাস্তার প্যাসেঞ্জারের জন্যে রিজার্ভ আছে এই ওজুহাতে বাসের খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখে কণ্ডাক্টর। সে সব জায়গা এ সব অপারগদের দিয়ে ভরতি করানো হয়—খেসারৎও নেয় দেড় গুণ। উপায় নেই; নইলে বাস-এ জায়গা পাওয়া তার ইহজন্মে ঘটবে না। রোগা মানুষ, অত পথ হাঁটতে গেলে হেদিয়ে পড়বে। বাস-এ বাইশ মাইল গিয়ে তবে ইস্টিশন। সেখানে পৌঁছে ধবলহাটির ট্রেন ধরবে দুপুরে। পৌঁছুবে সেই পরদিন সকালে। ইস্টিশানের হাতা পেরিয়েই একটু দূরে কাঁকরের কারখানা।

সুবল বলে দিয়েছে কারখানায় পৌঁছেই একেবারে সরিৎবাবুর খোঁজ করবি। ভিড় ভাড় ঠেলে সটান দাঁড়াবি তাঁর পায়ের কাছে। গড় হয়ে প্রণাম করে বলবি, আমি সন্দেপুরের লোক। ব্যস, কথা নেই। অমনি কাজ পেয়ে যাবি।

আস্তানা পেয়ে যাবি। তুই তো একা যাচ্ছিস। থাকবি তাই আর সবাইর সঙ্গে ঢালা ঘরে। যারা দোকা যায় তারা আলাদা কুঠুরি পায়।

হাতে-পায়ে ধরে সুবলের কাছ থেকে পথ-খরচের ক'টা টাকা ধার নিয়েছে হোরাং। বলেছে চাকরি পেয়ে প্রথম মাসের মাইনে থেকেই নির্ঘাৎ শোধ করে দেবে। তার চাকরি পাওয়া এত ঠিক যে শেষ পর্যন্ত সুবল না দিয়ে পারল না। কুড়ানির কাছে কেশরের দরুণ ক'টা টাকা এখনো হয়তো আছে। আছে নাকের সেই আপেলটি। কিন্তু তা সে কি করে চেয়ে নেবে? চেয়ে নিলে চলবেই বা কেন? প্রথম ক'টা দিন খাবে কী কুড়ানি। মনটা ঠিক ধাতে আনতে ক'টা দিন একটু সময় লাগবে তো!

ঘুমুচ্ছে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে। মাথা-ভরা কালো চুলে ঘুমন্ত মুখখানা অন্ধকারেও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে হোরাং। কাল ওর কি সুখের দিন, কি ফাঁকার দিন, তারই হয়তো এখন ও স্বপ্ন দেখছে। তাই ওর মুখখানা এত হাসি-হাসি। কাল সকালে উঠেই দেখতে পাবে, আর কোনো তার বাধা-বিপদ নাই, সব মাঠ-ময়দান ফর্সা হয়ে গেছে। সে আনন্দটাই হোরাং অনুভব করতে চায় তার ঘুমের মধ্যে। কিন্তু ঘুম আসে না।

ভাগ্যের লিখন আর গোপথে মরণ। কে জানে, কারখানা যাওয়াই ভাল হবে কি না। আর ভাল মন্দ! মরণ থাকলে হবে, উপায় কি। তার তো একটা স্বাধীন রোজকারের পথ মিলুক। কুড়ানিও পাক তার স্বাধীনতা। নিপরোয়া হয়ে করুক ওর মন যা চায়। ওর মন যা ভালবাসে।

একেক বার ঝিমিয়ে পড়ে আবার মশার কামড়ে জেগে ওঠে কেশর। কই, কুড়ানি তো এখনো এল না। রাত কত হল তার আর কিছু খেয়াল চলে না—দশ দিক এমন থমথম করছে। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছে একদম। কিংবা স্রেফ ধোঁকা দিয়েছে।

আরো কতক্ষণ পরে কে জানে, হঠাৎ যেন খসখস শব্দ হল। পাতার খসখস নয়, শাড়ির খসখস। ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল বুঝি কেশর। চকা হরিণের মতো সে উঠে দাঁড়াল। সত্যিই তো, সামনে কুড়ানি।

কেশর চাপা-গলায় বললে, 'এসো, এসো এই মার দুয়োরে, এসো।'

কুড়ানি তাড়াতাড়ি দুয়ারে উঠে পড়ল। ভয়ে-ভয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'দেখ ঠিক এসেছি। এতক্ষণে ঘুমুল, তাই দেরি হল ছুটি পেতে। এই শীতে একা চুপটি করে বসে আছ? তোমার কি মরব-বাঁচব জ্ঞান নাই?'

'কুড়ানি, এমন দিন বুঝি আর পাব না। চল মার মন্দিরের ভিতরে চল। দরজা-কপাট নেই মন্দিরে। চল, মন্দিরে ঢুকে মার পা ছুঁয়ে—'

'না, না, মন্দিরে নয়। এই বাইরে থেকেই বলি যা বলবার।'

'না, মন্দিরে ঢুকে মা'র পা ছুঁয়ে বলতে হবে। কেনে, সাহস হচ্ছে না কেনে?' এইবারই বোঝা যাচ্ছে কোনটা সত্য কথা, আর কোনটা মুখের কথা!'

'তুমি কি পাগল হয়েছ? দু' বেলা মাছ ভাত খাওয়া আকাচা বেছনা কাপড়ে মন্দিরে ঢুকে মার চরণ ছোঁব?'

'আমি ঠিক বলছি।' কেশর চাপা অথচ জোরালো গলায় বললে 'দেরি কোরো না। তৈরি হও। মনে ভক্তি আনো। শুভক্ষণ পার হয়ে যেছে—'

'আমি ভাই পারব না। ছি, তুমি যে কি মানুষ আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের বেছনায় শোওয়া কাপড়—তুমি ঠিক পাগল হয়েছ।'

'পাগল এখনো হইনি, বোধ হয় হব। বেশ, এই কাপড়ে মাকে ছুঁতে না চাও, কাপড় ছেড়ে ফেল—'

'তুমি কি বুলছ। তোমার মাথার ঠিক নাই।'

'ঠিকই বুলছি। আমিও ফেলে দিলাম ছুঁড়ে। চেয়ে দেখ আমাদের মারও কোনো কাপড় নেই লজ্জা নেই—চেয়ে দেখ এই অমাবস্যের রাত। এসো, ঢোকো মন্দিরে, মার পা ছোঁও। হ্যাঁ, মনে ভক্তি আনো। মন্তর বলো, মা, আমাদের পূজার সামগ্রী কিছুই নাই। মন্ত্র, ভক্তি, বিধি, আচার আমরা

কিছুই জানি না। দয়ামহী, আমরা তোমার অবোধ সন্তান। আমাদের সম্বল কেবল চোখের জল, হিয়ের তাপ। চোখের জলে তোর আঙা পা দু'টি ধুয়ে দেব জীবন-ভোর। আর কিছুই নাই মা— সব, এমন কি গায়েব বসনখানা পয্যন্ত তোকে নিবেদন করে দিয়েছি। বলো, ঝিমিয়ে পড়ছ কেনে, বলো,—আশীর্বাদ করো মা, আমাদের ভালবাসা যেন মরণ-কাল পয্যন্ত স্থায়ী হয়। বেশ, এইবার পুজা শেষ হল—এইবার বলো তোমার সেই শপথের কথা—'

'এ হেই—এ—' চৌকিদার হাঁক ছাড়ল লম্বা গলায়।

ধুড়মুড়িয়ে উঠল কুড়ানি। চোখ কপালে তুলে গলা কাঠ করে বললে, 'ওগো সব্বনাশ! চৌকিদার রনে বেরিয়েছে। কোন দিকে কেমন করে পালাব?' তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিল কুড়ানি। 'কি হবে? যদি ধরা পড়ে যাই?'

'দাঁড়াও, আরেকটা হাঁক দিক।' কেশরও কাপড় পরলে। 'তা-পরে বনের মধ্যে দিয়ে চলে যাও। ফাঁকা হাঁটা-পথ ধবে হেমা মাসীব বাড়ির পাশ দিয়ে ঝোপে-ঝাড়ে গা ঢেকে-ঢেকে চলে যাও! কোনো ভয় নাই।'

না, কোনো ভয় নাই। সারাক্ষণ কেবল মা-কালীর নাম করেছে। পথের কাঁটা-খোঁচা, কোনো কিছুর দিকে তার লক্ষ্য নেই। কতক্ষণে দবজা ঠেলে ঘরে ঢুকে স্বামীর পাশটিতে গিয়ে সে শুতে পাবে।

ঠিকঠাক দরজা ঠেলে কুড়ানি ঘরে ঢুকল। ঠিকঠাক শুয়ে পড়ল তার স্বামীর পাশটিতে। হোরাং ঘুমে বিভোর। মা-কালী বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল কুড়ানি।

কিন্তু সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে এ সে কি দেখছে? হোরাং এ কি দেখছে? তার পরণে তার সেই শাড়ি কই? এ সে কার ধুতি পরে আছে?

আরো জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ চাই হোরাঙের?

কুড়ানি কি করবে এক মুহূর্ত সে ভেবে পেল না। ঘর ছেড়ে তক্ষুণি পালিয়ে না গিয়ে হোরাঙের দিকেই সে এগিয়ে গেল। বনের গরু যেমন বাঘের দিকে যায়।

হোরাং কুড়ানির একটা নিস্পন্দ হাত তার হাতের মধ্যে টেনে নিল। বললে, 'তুই এখানে আর মুখ দেখাবি কি করে? আমার সঙ্গে তুই যাবি?'

'যাব।' কোথায়, জিগগেস করবার ফাঁক খুঁজল না কুড়ানি।

'আমি আজই, এখুনি, যাচ্ছিলাম। যাচ্ছিলাম কাঁকরের কারখানায় কাজ করতে। যাবি তু?'

'যাব। কাঁকরের কারখানায় তো মেয়ে-পুরুষ দু'জনেই কাজ করে।'

'তবে তাই চো। তোর কাপড়টা আমাকে দে' আমারটা তুই লে। আমার এটার ইঞ্চিপাড় আছে, তোকে ঠিক মানিয়ে যাবে। ভাগ্যিস তখন ইঞ্চিপাড় দেখে কিনেছিলাম, তাই এখুনি কাজে লাগল। বাস-এর রাস্তা হাঁটতে হবে তো? লে মানিয়ে যাবে ঠিক। কেউ ধরতে পারবে না।'

হোরাঙের ইঞ্চিপাড় ধুতিটা কুড়ানির গায়ের সঙ্গে মিশে গেল।

'যাবি তো, সামান্য কিছু যা আছে বাঁধাবুঁধি করে লে। চো লিয়েই যাই। মাগ মাথার পাগ, তাকে ফেলতে নাই। দেখি কপাল ফেরে কি না। কোথায় চললে গোপাল? না, সঙ্গে চলল কপাল! কপাল ভালই হবে, কি বলিস? সরিৎবাবুর সঙ্গে সটান গিয়ে দেখা করব। দেশের লোক শুনলে বাবু খুব খাতির করে। খাতির না করলেই বা কি? আমাদের দু'জনের এক-মন থাকলে কেউ আমাদের রুখতে পারবে না—কি বলিস?'

কুড়ানি বললে, 'লিশ্চয়। এক-মন হলে সমুদ্র শুকায়।'

শব্‌নম

সৈয়দ মুজতবা আলী

বাদশা আমানুল্লার নিশ্চযই মাথা খারাপ। না হলে আফগানিস্থানের মত বিদকুটে গোঁড়া দেশে বল্-ডান্সের ব্যবস্থা করতে যাবেন কেন? স্বাধীনতা দিবসে পাগমান শহরে আফগানিস্থানের প্রথম বল্-ডান্স হবে।

আমরা যারা বিদেশী তারা এ নিয়ে খুব উত্তেজিত হইনি। উত্তেজনাটা মোল্লাদের এবং তাদের চেলা অর্থাৎ ভিশ্‌তী, দর্জী, মুদী, চাকর-বাকরদের ভিতর।

আমার ভৃত্য আব্দুর রহ্‌মান সকালবেলা চা দেবার সময় বিড়বিড় করে বললে, 'জাত ধম্মো আর কিছু রইল না।'

আব্দুর রহ্‌মানের কথায় আমি বড় একটা কান দিই নে। আমি শ্রীকৃষ্ণ নই; 'জাত ধম্মো' বাঁচাবার ভার আমার স্কন্ধে নয়।

'ধেড়ে ধেড়ে হুনোবা ডপ্‌কি ডপ্‌কি মেনীদের গলা জড়িয়ে ধেই ধেই করে নৃত্য করবে।'

আমি শুধালুম, 'কোথায়? সিনেমায়?'

আর আব্দুর রহ্‌মানকে পায় কে? সে তখন সেই হবু ডান্সের যা একখানা সরেস রগরগে বয়ান ছাড়লে, তার সামনে রোমান কুকর্ম কুকীর্তি শিশু। শেষটায় বললে, 'রাত বারোটার সময় সমস্ত আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। আর তারপর কি হয় সে সব আমি জানি নে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার তাতে কি, ভেটকি-লোচন?'

আব্দুর রহ্‌মান চুপ করে গেল। 'ভেটকি লোচন', 'ওরে আমার আহ্লাদের ফুটো ঘটি' এসব বললেই আব্দুর রহ্‌মান বুঝতে পারত বাবু বদমেজাজে আছেন। এগুলো আমি মাতৃভাষা বাংলাতেই বলতুম। আব্দুর রহ্‌মান ঝাণ্ডু লোক; বাংলা না বুঝেও বুঝত।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার সময় বেরিয়েছি। পাগমানের ঝোপে ঝাপে হেথা হোথা বিজলি বাতি জ্বলছে। পরিষ্কার তকতকে ঝকঝকে পিচ-ঢালা রাস্তা। আমি আপন মনে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, এটা হল ভাদ্দোর মাস। কাল জন্মাষ্টমী গেছে। আমার জন্মদিন। মা'র মুখে শোনা। এখন সিলেটে নিশ্চয়ই জোর বৃষ্টি হচ্ছে। মা দক্ষিণের ঘরের উত্তরের বারান্দায় মোড়ার উপর বসে আছে। তার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে চম্পা তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর হয়তো বা জিজ্ঞেস করছে, 'ছোট মিয়া ফিরবে কবে?'

বিদেশে বর্ষাকাল আমার কাল। কাবুল কান্দাহার জেরুজালেম বার্লিন কোথাও মনসুন নেই। ভাদ্দোর মাসের পচা বিষ্টিতে মা অস্থির। তাঁর নাইবার শাড়ি শুকোচ্ছে না, ভিজে কাঠের ধুঁয়োয় তিনি পাগল, আর আমি দেখছি হুড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে আসছে, খানিকক্ষণ পরে আবার রোদ। আঙ্গিনায় গোলাপ গাছে, রান্নাঘরের কোণে শিউলি গাছে, পিছনের চাউর গাছের পাতায় পাতায় কী খুশির ঝিলিমিলি।

এখানে সে শ্যামল-সুন্দরের দর্শন নেই।

সর্বনাশ! পথ হারিয়ে বসেছি। রাত ন-টা। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। কাকে পথ শুধোই!

ডান দিকে ঢাউস ইমারতে নাচের ব্যাণ্ডো বাজছে।

ওঃ! এটা তাহলে আমার ভৃত্য আব্দুর রহ্‌মান খান বর্ণিত সেই ডান্স-হল। এ বাড়ির খানসামা-বেয়ারা তা হলে আমাকে হোটেলের পথটা বাতলে দিতে পারবে। পিছনের চাকর-বাকরদের দরজার কাছে যাই।

গেলুম।

এমন সময় গটগট করে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী।

প্রথম দেখেছিলুম কপালটি। যেন তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র। শুধু, চাঁদ হয় চাঁপা বর্ণের, এর কপালটি একদম পাগমান পাহাড়ের বরফের মতই ধবধবে সাদা। সেটি আপনি দেখেননি? অতএব বলব, নির্জলা দুধের মত। সেও তো আপনি দেখেন নি। তা হলে বলি, বনমল্লিকার পাপড়ির মত। ওর ভেজাল এখনও হয়নি।

নাকটি যেন ছোট বাঁশী। ওইটুকুন বাঁশীতে কি করে দুটো ফুটো হয় জানি নে। নাকের ডগা আবার অল্প অল্প কাঁপছে। গাল দুটি কাবুলেরই পাকা আপেলের মত লাল টুকটুকে, তবে তাতে এমন একটা শেড রয়েছে যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এটা রুজ দিয়ে তৈরী নয়। চোখ দুটি নীল না সবুজ বুঝতে পারলুম না। পরনে উত্তম কাটের গাউন। জুতো উঁচু হিলের।

রাজেশ্বরী কণ্ঠে হুকুম ঝাড়লে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খানের মোটর এদিকে ডাক তো।'

আমি থতমত খেয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলুম।

মেয়েটি ততক্ষণে আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছে আমি হোটেলের চাকর নই। তারপর বুঝেছে, আমি বিদেশী। প্রথমটায় ফরাসীতে বললে, 'জ্য ভূ দমাঁদ্ পারদোঁ, মঁসিয়ো—মাপ করবেন—' তারপর বললে ফার্সীতে।

আমি আমার ভাঙা ভাঙা ফার্সীতেই বললুম, 'আমি দেখছি।'

সে বললে, 'চলুন।'

বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। বয়স এই আঠারো উনিশ।

পার্কিঙের জায়গায় পৌঁছনর পূর্বেই বললে, 'না, আমাদের গাড়ি নেই।'

আমি বললুম, 'দেখি, অন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি কি না।'

নাসিকাটি ইঞ্চি খানেক উপরের দিকে তুলে মুখ বেঁকিয়ে অত্যন্ত গাঁইয়া ফার্সীতে বললে, 'সব ব্যাটা আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে বেলাল্লাপনা দেখছে। ড্রাইভার পাবেন কোথায়?'

আমার মুখ থেকে অজানতে বেরিয়ে গেল, 'কিসের বেলাল্লাপনা?'

মেয়েটি ঘুরে আমার দিকে মুখোমুখি হয়ে এক লহমায় আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিলে। তারপর বললে, 'আপনার কোনও তাড়া না থাকলে চলুন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন।'

আমি 'নিশ্চয় নিশ্চয়' বলে সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালুম।

মেয়েটি সত্যি ভারি চটপটে।

চট করে শুধালে, 'আপনি এদেশে কতদিন আছেন?—পার্দোঁ—আমার ফ্রেঞ্চ প্রফেসর বলেছেন, অজানা লোককে প্রশ্ন শুধাতে নেই।'

আমি বললুম, 'আমারও তাই। কিন্তু আমি মানি নে।'

বোঁ করে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'একজাক্‌ৎমাঁ একদম খাঁটি কথা। আপনার সঙ্গে চলছি, কিংবা মনে করুন আমার আব্বা-জান আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন, আর আপনি আমায় কোন প্রশ্ন শুধালেন না, যেন আমি সাপ-ব্যাঙ কিছুই নই, আমিও শুধালুম না, যেন আপনার বাড়ি নেই, দেশ নেই। আমাদের দেশে তো জিজ্ঞাসাবাদ না করাটাই সখ্‌ৎ বেয়াদবী।'

আমি বললুম, 'আমার দেশেও তাই।'

ঝপ্ করে জিজ্ঞেস করে বসলে, 'কোন্ দেশ?'

আমি বললুম, 'আমাকে দেখেই তো চেনা যায় আমি হিন্দুস্থানী।'

বললে, 'বা রে। হিন্দুস্থানীরা তো ফ্রেঞ্চ বলতে পারে না।'

আমি বললুম, 'কাবুলীরা বুঝি ফ্রেঞ্চ বলে।'

মেয়েটা খিলখিল করে হাসতে গিয়ে হঠাৎ যেন পা মচকে বসল। বললে, 'আমি আর হাঁটতে

পারছি নে। উঁচু-হিল জুতো পরা আমার অভ্যাস নেই। চলুন, ওই পাশের টেনিস কোর্টে যাই। সেখানে বেঞ্চি আছে।'

জমজমাট অন্ধকার। ওই দূরে, সেই দূরে বিজলি বাতি। সামান্য এক-ফালি পথ দিয়ে টেনিস কোর্টের দিকে এগুতে হল। একটু অসাবধান হওয়ায় তার বাহুতে আমার বাহু ঠেকে যাওয়াতে আমি বললুম, 'পার্‌দোঁ—মাফ করুন।'

মেয়েটির হাসির অন্ত নেই। বললে, 'আপনার ফ্রেঞ্চ অদ্ভুত, আপনার ফার্সীও অদ্ভুত।'

আমার বয়স কম। লাগল। বললুম, 'মাদমোয়াজেল—'

'আমার নাম শব্‌নম।'

তদ্দণ্ডেই আমার দুঃখ কেটে গেল। এ রকম মিষ্টি নামওয়ালী মেয়ে যা-খুশি বলার হক্ক ধরে।

বেঞ্চিতে বসে হেলান দিয়ে পা দুখানা একেবারে হিন্দুকুশ পাহাড় ছাড়িয়ে কাতাখান্-বদখ্‌শান্ অবধি লম্বা করে দিয়ে বাঁ পা দিয়ে শুট্‌স্ করে ডান জুতো এক লাথে তাশকন্দ অবধি ছুঁড়ে মেরে বললে, 'বাঁচলুম।'

আমি বললুম, 'আমার উচ্চাবণ খারাপ সে আমি জানি। কিন্তু ওটা বলে মানুষকে দুঃখ দেন কেন?'

চড়াক্‌সে একদম খাড়া হয়ে বসে, মোড় নিয়ে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'আশ্চর্য! কে বললে আপনার উচ্চারণ খারাপ! আমি বলেছি 'অদ্ভুত'। অদ্ভুত মানে খারাপ? আপনার ফার্সী উচ্চাবণে কেমন যেন পুরনো আতরের গন্ধ। দাঁড়ান, বলছি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঠাকুরমা সিন্দুক খুললে যে রকম পুরনো দিনের জমানো মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। অন্য হিন্দুস্থানীরা কি রকম যেন ভোঁতা ভোঁতা ফার্সী বলে।'

আমি বললুম, 'ওরা তো সব পাঞ্জাবী। আমি বাঙলাদেশের লোক।'

এবারে মেয়েটি প্রথমটায় একেবারে বাক্যহারা। তার পর বললে, 'বা-ঙ্গা-লা মুল্লুক। সেখানে তো শুনেছি পৃথিবীর শেষ। তারপর নাকি এক বিরাট অতল গর্ত। যতদূর দেখা যায়, কিছু নেই, কিছু নেই। সেখানে তাই রেলিঙ লাগানো আছে। পাছে কেউ পড়ে যায়। বাঙালিরাও নাকি তাই বাড়ি থেকে বেরয় না।'

আমি জানতুম, ভাবতবর্ষে যে-সব কাবুলী যায় তারা বাঙলা-দেশের পরে বড় কোথাও একটা যায় নি। এ সব গল্প নিশ্চয়ই তারা ছড়িয়েছে। আমি হেসে বললুম, 'কি বললেন? বাঙালীরা তাই বাড়ি থেকে বেরয় না? যেমন আমি? না?'

এই প্রথম মেয়েটি একটু কাতর হল। বললে, 'দেখুন মঁসিয়ো—?'

আমি বললুম, 'আমার নাম মজনূন।'

'মজনূন!!!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

'মজনূন মানে তো পাগল। জিন্ যখন কারো কাঁধে চাপে তখন 'জিন্' শব্দের পাস্‌ট্ পার্টিসিপ্‌ল্ মজনূন দিয়েই তো পাগল বোঝানো হয়। এ নাম আপনাকে দিলে কে?'

আমি বললুম, 'আমার বাবার মুরশীদ। দেখুন শব্‌নম বানু, সকলেরই কি আপনার মত্ত মিষ্টি নাম হয়! শব্‌নম মানে তো শিশিরবিন্দু, হিমকণা?'

'খুব ভোরে আমার জন্ম হয়েছিল।'

আমি গুনগুন করে বললুম,

"আমি তব সাথী
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশির সিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদ বেদনা।"

'বুঝিয়ে বলুন।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। কবি বলছেন, শরৎ-নিশি সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখেছে শিউলি ফোটাবার—আর ভোর হতেই গাছকে বিচ্ছেদ-বেদনা দিয়ে ঝরে পড়ল সেই শিউলি।'

শব্‌নমের কবিত্ব রস আছে। বললে, 'চমৎকার! একটি ফুল সমস্ত রাতের স্বপ্ন। আচ্ছা, আমার নাম যদি শব্‌নম শিউলি হয় তো কি রকম শোনায়?'

আমি বললুম, 'সে আপনি ধারণাই করতে পারবেন না, বাঙালীর কানে কতখানি মিষ্টি শোনায়।'

হেসে বললে, 'ফুল সম্বন্ধে কবি কিসাঈ কি বলেছেন জানেন?'

'আমি হাফিজ, সাদী আর অল্প রূমী পড়েছি মাত্র।'

'তবে শুনুন,

> "গুল্ নিমতীস্ত্ হিদ্‌য়া ফিরিস্তাদে আজ্ বেহেশৎ,
> মরদুম্ করীম্‌তর্ শওদ্ আন্দর্ নইম্-ই-গুল্;
> আয় গুল্-ফরূশ গুল্ চি ফরূশী বরায়ে সীম?
> ওয়া আজ্ গুল্ অজীজ্ তর চি সিতানী বি-সীম-ই-গুল্?"

> 'অমরাবতীর সওগাত এই ফুল এল ধরাতলে,
> ফুলের পুণ্যে পাপী-তাপী লাগি স্বরগের দ্বার খোলে।
> ওগো ফুলওয়ালী, কেন ফুল বেচো তুচ্ছ রূপার দরে?
> প্রিয়তর তুমি কি কিনিবে, বলো, রূপো দিয়ে তার তরে?'

আমি বললুম, 'অদ্ভুত সুন্দর কবিতা। এটি আমায় বাঙলাতে অনুবাদ করতে হবে।'

'আপনি বুঝি ছন্দ গাঁথতে জানেন?'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ। আমি মাস্টারি করি।'

'সে আমি জানি। এদেশে দু'রকমের ভাবতীয় আসে। হয় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, না হয় পড়াতে। তবে আপনাকে এর পূর্বে আমি কখনও দেখি নি। আচ্ছা, বলুন তো, আমানউল্লা বাদশার সব রকম সংস্কারকর্ম আপনার কি রকম লাগে?'

'আমার লাগা-না-লাগাতে কি? আমি তো বিদেশী।'

'বিদেশী হলেও প্রতিবেশী তো। আমি ফ্রান্স থেকে ফেরার সময়—'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'ফ্রান্স থেকে—'

'ইংরেজের কল্যাণে বাবাকে নির্বাসনে যেতে হয়। আমার জন্ম প্যারিসে। সেখানে দশ বছর আর এখানে ন'বছর কাটিয়েছি। যাক্‌গে সে-কথা। দেশে ফেরার সময় বোম্বাই পেশাওয়ার হয়ে আসি। দাঁড়ান, ভেবে বলছি। ঠিক এই আগস্টেই আমরা এসেছিলুম। সে কী বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি! বোম্বাই থেকে লাহোর পর্যন্ত। ঝপ্‌ঝপ্ ঝুপ্‌ঝাপ্। গাড়ির শব্দের সঙ্গে মিলে গিয়ে চমৎকার শোনায়। তা সে যাক্‌গে। কিন্তু ওই বোম্বাই থেকে এই পেশাওয়ার—এর সঙ্গে তো ফ্রান্সের কোনও মিল নেই। মিল আফগানিস্থানের সঙ্গে। দুটোই সুন্দর দেশ। আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইরানী কবি কি বলেছেন, জানেন?'

'হাফিজ যেন কি বলেছেন?'

'না। আলীকুলী সলীম। বলেছেন ঃ

'নীস্ত্ দর ইরান জমীন্ সামান ই তহ্সীল কামাল
তা নিযামদ্ সূ-ই হিন্দুস্তান হিনা রঙ্গীন্ ন্ শুদ্।''

'পরিপূর্ণতা পাবে তুমি কোথা ইরান দেশের ভুঁয়ে,
মেহ্দির পাতা কতা লাল হয় ভারতের মাটি ছুঁয়ে।'

আমি শুধালুম, এদেশের হেনাতে কি কড়া রঙ হয় না?'

'বাজে। ফিকে। হলদে।'

আমি বললুম, 'আপনি কথায় কথায় এত কবিতা বলতে পারেন কি করে?'

হেসে বললে, 'বাবা আওড়ান। আর ন' দশ বছরেও আমার আত্মসম্মান জ্ঞানটি ছিল অত্যুগ্র। প্যারিসে ক্লাসে ফরাসী কবিতা কেউ আওড়ালে আমি সঙ্গে সঙ্গে ফার্সী শুনিয়ে দিতুম।'

তারপর বললে, 'বড় রাস্তায় তো জন মানব নেই। শুধু মনে হচ্ছে একখানা মোটর বার বার আসা যাওয়া করছে। নয় কি? আপনি লক্ষ্য করেছেন?'

আমি বললুম, 'বোধ হয় তাই।'

বললে, 'তবে আমাকে বলেন নি কেন?'

আমি এক মাথা লজ্জা পেয়ে বললুম, 'আমার ভালো লাগছিল বলে।'

মেয়েটি চুপ করে রইল।

আমি শুধালুম, 'ওটা কি আপনাদের গাড়ি? আপনাকে খুঁজছে?'

'উঁ।'

'তবে চলুন।'

'না।'

'আচ্ছা। কিন্তু আপনার বাড়ির লোক আপনার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না?'

'তবে চলুন।' উঠে দাঁড়াল।

আমি বললুম, 'শব্নম বানু, আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'তওবা! আপনাকে ভুল বুঝব কেন?'

রাস্তায় যেতে যেতে বেশ কিছু পরে সেই কথার খেই ধরে বললে, 'বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করতে ওই তো আনন্দ। তার সম্বন্ধে কিছু জানি নে। সেও কিছু জানে না। সেই যে কবিতা আছে,

'মা আজ্ আগাজ ওয়া আনজামে জাহান বে খবরীম
আওওল ও আখির ই ঈন কুহ্নে কিতাব ইফতাদে অস্ত্।''

'গোড়া আর শেষ এই সৃষ্টির জানা আছে, বলো, কার?
প্রাচীন এ পুঁথি গোড়া আর শেষে পাতা কটি ঝরা তার।'

এমন সময় এই জ্বলজ্বলে আলোওলা পোড়ারমুখো মোটর এসে সামনে দাঁড়াল। শব্নম বানু বললে, 'চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি।'

এতক্ষণ দুজনাতে বেশ কথাবার্তা হচ্ছিল। এখন ওই ড্রাইভারের সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। প্যারিস থেকে এসে থাক, আর খাস কাবুলওলীই হোক, এরা যে কট্টর গোঁড়া সে কি কারও অজানা? বললুম, 'থাক। আমার হোটেল কাছেই।'

শব্নম বানু বুদ্ধিমতী। বললে, 'বেশ। তবে, দেখুন আগা, আপনি কোন কারণে কণামাত্র সঙ্কোচ করবেন না। আমি কাউকে পরোয়া করি না।'

পরোয়া শব্দটি আসলে ফার্সী। শব্‌নম ওই শব্দটিই ব্যবহার করেছিল।

'আদাব আরজ।'

'খুদা হাফিজ।'

হোটেলে ঢোকবাব সময় পিছনে শব্দ হওযাতে তাকিযে দেখি, আব্দুর বহ্‌মান। নিজের থেকেই বললে, 'একটু বেড়াতে গিযেছিলুম।'

আমি তার দিকে সন্দেহেব চোখে তাকিযে মনে মনে ভাবলুম ইনি একটি হস্তীমূর্খ না মর্কটচূড়ামণি?

সমস্ত রাত ঘুম এল না।

জানলা দিযে তাকিযে দেখি আদম-সুরৎ—কালপুরুষ। অতি প্রসন্ন বদনে যেন আমার দিকে তাকিযে আছেন। আকাশের পরিপূর্ণ শান্তি যেন তাঁব অঙ্গেব প্রতিটি তারায় সঞ্চিত করে আমাব দিকে বিচ্ছুরিত কবে পাঠাচ্ছেন।

একটি ফার্সী কবিতা মনে পড়ল।

ইবানেব এক সভাকবি নাকি চাঁড়ালদেব সঙ্গে বসে ভাঁড়ে করে মদ্যপান করেছিলেন। রাজা তাই নিয়ে অনুযোগ করাতে তিনি বলেছিলেন,

'হাজাব যোজন নিচেতে নামিয়া আকাশের ওই তারা
গোষ্পদে হ'ল প্রতিবিম্বিত; তাই হ'ল মানহারা?'

শেষবাত্রে কালো মেঘ এসে আকাশেব তারা একটি একটি কবে নিবিযে দিতে লাগল। আমার মন অজানা অস্বস্তিতে ভবে উঠতে লাগল। বিবেকানন্দ ইংরিজী কবিতায় লিখেছিলেন, 'দি স্টার্‌স্ আব্ ব্লাটড্ আউট।' সত্যেন দত্ত অনুবাদ করেছেন 'নিঃশেষে নিবেছে তাবাদল।' কেমন যেন, কি-হবে কি-হবে একটা ভাব মনকে আচ্ছন্ন কবে দিল।

শেষ বাত্রে নামল খাঁটি সিলেটি বৃষ্টি।

প্রসন্নাস্ত, প্রসন্নাস্ত আমার অদ্য সন্ধ্যার সবিতার।

খুদাতালা বেহদ মেহেববান। আমার শেষ মনস্কামনা পূর্ণ কবে দিলেন। কী মূর্খ আমি! আমার প্রত্যাশা যে করুণাময়েব অফুরন্ত দান ছাড়িযে যেতে পাবে, এ-দম্ভ আমি করেছিলুম কোন গবেটামিতে?

দুই

ঘুম-ভাঙা-ঘুম-লাগা কল্প-স্বপ্নে জড়ানো রাতের শেষ হল সূর্যোদয়ের অনেক পর। কাল রাত্রে তো পারিই নি, আজ সকালেও বুঝতে পারলুম না, কাল রাত্রে কি হয়ে গেল। এ কি আরম্ভ, না এই শেষ? এ কি অন্ধকার রাত্রে চন্দ্রোদয়েব মত আমার ভুবন প্রসারিত করে দেবে, না এ হঠাৎ চমক-মারা বিদ্যুল্লেখা শুধু ক্ষণেকের তরে সুদূর আকাশপটে আমার ভাগ্যের ব্যঙ্গচিত্র এঁকে লোপ পাবে।

আচ্ছন্নের মত জানলার ধারের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল চেয়াবে ঝোলানো আমার কোটের কাঁধের উপর এক গাছি লম্বা চুল।

কি করে এসে পৌঁছল? কে জানে, এ জগতে অলৌকিক ঘটনা কি করে ঘটে?

কিংবা এ ঘটনা কি অতিশয় দৈনন্দিন নিত্য প্রাচীন? যে বিধাতা প্রতিটি ক্ষুদ্র কীটেরও আহার জুগিয়ে দেন, তিনিই তো তৃষিত হিয়ার অপ্রত্যাশিত মরূদ্যান রচে দেন। কিন্তু তার কাছে তখন সেটা অলৌকিক।

কুবেরের লক্ষ মুদ্রা লাভ অলৌকিক নয়, কিন্তু নিরন্নের অপ্রত্যাশিত মুষ্টি-ভিক্ষা অলৌকিক। কিংবা বলব, সরলা গোপিনীদের কৃষ্ণলাভ অলৌকিক—ইন্দ্রসভায় কৃষ্ণের প্রবেশ দৈনন্দিন ঘটনা।

অথবা কি এই হঠাৎ লটারি-লাভ আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ করে দেবে! অন্ধকার রাতের দুশ্চিন্তা তার কালো চুলকে ভোরের সঙ্গে সঙ্গে সাদা করে দেবে?

কি করি? কি করি?

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি অল্প অল্প বৃষ্টি। এই বৃষ্টিকেই কাল রাত্রে কত সোহাগের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলুম। এখন কোন-কিছুর সন্ধানে বাইরে যেতে পারব না বলে সেই সোহাগের ধন বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কোথায় সন্ধান?

সর্দার আওরঙ্গজেবের বাড়ি খুঁজে আমি পাব নিশ্চয়ই। সেই সুদূর বাঙলাদেশ থেকে যখন কাবুল পৌঁছতে পেরেছি তবে এ আর কতটুকু! কিন্তু পেয়ে লাভ? সেখানে তো আর গট্‌গট্ করে ঢুকে গিয়ে বলতে পারব না, 'শব্‌নম বানুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' এ দেশের ছেলেই এটা করতে পারে না। আমি তো বিদেশী। আমি তো এমন কিছু স্বর্ণভাণ্ড নই যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মাটি চাপা পড়ে গেলেও লোকে জানতে পারলে খুঁড়ে বের করবে? বরঞ্চ শব্‌নমই স্বর্ণ-পাত্র। আমি ভিখারী তার দিকে নিষ্কাম হৃদয়ে তাকালেও সর্দার আমায় গর্দান নেবেন।

তা তিনি নিন। রাজারও একটা গর্দান, আমারও একটা। অথচ আশ্চর্য, রাজার গর্দান গেলে বিশ্বজোড়া হইহই পড়ে যায়—আমার বেলা হবে না। কিন্তু ওই কিশোরীকে জড়ানো?

এ তো বুদ্ধির কথা, যুক্তির কথা, সামান্য কাণ্ডজ্ঞানের কথা, কিন্তু হায়, হৃদয়েরও তো আপন নিজস্ব যুক্তিরাজ্য আছে, সে তো বুদ্ধির কাছে ভিখারীর মত তার যুক্তি ভিক্ষা চায় না। আকাশের জল আর চোখের জল তো একই যুক্তি-কারণে ঝরে না।

আব্দুর রহ্‌মান এসে খবর দিলে, আজ দুপুরে হোটেলে মাছ। অন্যদিন হলে আনন্দে আমি তাকে বখশিশ দিতুম—এ দেশে এই প্রথম মাছের নাম শুনতে পেলুম। আজ শুধু অলস নয়নে তাকিয়ে রইলুম।

খেতে গিয়েছিলুম। এদিক ওদিক তাকাই নি। কারণ, কাবুল পাগমানে এখনও মেয়েরা রেস্তরাঁতে বেরয় না। অনেক সর্দারই খেতে এসেছিলেন, হয়তো সর্দার আওরঙ্গজেবও ছিলেন।

হঠাৎ মৃদু গুঞ্জরন আরম্ভ হল। তারপর সবাই ধড়মড় করে ছুরি-কাঁটা ফেলে উঠে দাঁড়াল। ব্যাপার কি? 'বাদশা, বাদশা' আসছেন।

আমার বুকের রক্ত হিম। এই সর্বনেশে দেশে কি স্বয়ং বাদশা বেরন মজনূন—অর্থাৎ পাগলদের কিংবা আসামীর সন্ধানে।

না। এটা সরকারী হোটেল। লাভ হচ্ছে না শুনে তিনি স্বয়ং এসেছেন বড় ভাই মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে পেট্রোনাইজ করতে। রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীনও তা হলে তীর্থ দরশনে আসতে পারে। রাজার সঙ্গে গেলে দীনের রাহা-খরচাটা বাদ পড়ে বটে কিন্তু সেও তো পুরুত-পাণ্ডাকে দু পয়সা বিলোয়। পরে দেখা গেল তাঁর হিসেবটা ভুল নয়।

অনেক রকম খাবারই সেদিন ছিল। এমনকি সদ্য ভারতবর্ষ থেকে আগত এক পেশাওয়ারী

সদাগর পাতি নেবু পর্যন্ত বিলোলেন। অন্যান্য ঠাণ্ডা দেশের মত কাবুলেও কোন টক জিনিস জন্মায় না। আমারটা আমি গোপনে পকেটে পুরেছিলাম। পরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার গন্ধ শুঁকব বলে। দেশের গন্ধ কত দিন হল পাই নি। যে মাছটি খেলুম সেটি ভালো হলেও তাতে দেশের গন্ধ ছিল না।

রাজা উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কাবুলীদের অবশ্য-কর্তব্য ঢেকুরটি তুললেন না। আমরাও উঠলুম। আমার খাওয়া অনেকক্ষণ হল শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজা না ওঠা পর্যন্ত প্রজাকে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করে ভান করতে হয়, যেন তার খাওয়া তখনও শেষ হয় নি। রাজা তো প্রজার তুলনায় গোগ্রাসে গিলতে পারেন না। গিললে প্রজাকে আরও বেশী গেলবার ভান করতে হয়।

ইরান-তুরানে অতিথি নিমন্ত্রিত বাড়ি এলে গৃহস্থকে ওই ভান করতে হয়।

এসব আমার চিন্তা-ধারা নয়। আমার সঙ্গে বসেছিলেন তিনজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। এঁরাই গুনগুন করে এসব কথা উর্দুতে বলে যাচ্ছিলেন।

বেরিয়ে এসে দেখি বৃষ্টি থেমেছে। রোদ উঠেছে। গাছের ভেজা পাতা রোদের আলোতে ঝলমল করছে।

এখন বেরনো যায়। কিন্তু যাব কোথায়? সে চিন্তা তো আগেই করা হয়ে গিয়েছে। হলে কি হয়! পাগলামির প্রথম চিহ্ন, পাগল একই কথা বার বার বলে, একই গ্রাস বার বার চিবিয়ে চলে, গিলতে পারে না।

আর বেরতে গেলেই এই তিন ব্যবসায়ী দুশ্‌মন সঙ্গ নেবে। এরা এসেছে মাত্র কয়েকদিনের জন্য। কাবুলেব ডাস্ট্‌বিনের ছবি তোলে, হ্যাট-পিনের পাইকারী দর শুধোয়।

আর আমার ঘরে তো রয়েছে আমার সেই অমূল্য নিধি। আজ সকালের সওগাত।

এদেশের সবুজ চা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তিনটের সময় পা টিপে টিপে নিচে নামলুম। সেখানে চা খেয়েই বেরিয়ে যাব। এ সময় আর সবাই আপন আপন ঘরে চা খায়।

টী রুমে ঢুকেই এক কোণে এক সঙ্গে অনেক-কিছু দেখতে এবং শুনতে পেলুম। দেখি, আধ ডজনের বেশী কাবুলী তরুণী মাথার উপরকার হ্যাট থেকে ঝোলানে নেট্ বা বোরকার উত্তর-প্রান্ত—যাই বলা যাক না কেন—নামিয়ে, গোল টেবিল ঘিরে বসে কিচিরমিচির লাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলুম, এ সময় হোটেলের নিচের তলাটা নির্জন থাকে বলে এই সুবাদে বেচারীরা ফূর্তি করতে, নূতন কিছু-একটা করতে এসেছে। এবং এঁদের বুদ্ধিদায়িনীটি কে সেটা বুঝতেও বিলম্ব হল না। শব্‌নম বানু স্বয়ং দাঁড়িয়ে ওয়েটারকে তম্বিতম্বা করছেন ঝড়ের বেগে—'পেস্ট্রি নেই! কেন? কেক্ আছে। সে তো বলেছ। অর্ডারও তো দিয়েছি। ডিমের স্যাণ্ডউইচ! কেন? শামী কাবাব দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানাতে পার না? মাথায় খেলে নি? যত সব—'

আমার দিকে পাশ ফিরে কথা বলছিলেন। হঠাৎ কেন জানি নে আমার দিকে তাকাতেই তাঁর মুখের কথা আমাকে দেখার সঙ্গে কলিশন লেগে থেমে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে চক্কর খেয়ে বারান্দায়। রওয়ানা দিলুম গেটের দিকে।

সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই পিছন থেকে কি একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখি, সেই ওয়েটার।

'আপনাকে একটি বানু ডাকছেন।'

এসে দেখি, তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

হাসি মুখে বললে, 'পালাচ্ছিলেন কেন? দাঁড়ান।'

হ্যাণ্ডব্যাগ খুলতে খুলতে বললে, 'আজ সকালে বাবাকে জিজ্ঞেস করলুম, বাঙলাদেশ কোথায়?

তিনি বললেন, ওদেশের এক রাজা নাকি আমাদের মহাকবি হাফিজকে তার দেশে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি যেতে না পেরে একটি কবিতা লিখে পাঠান। সেটি আমি টুকে নিয়েছি। এই নিন।'

আমি তখন কিছুটা বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছি। ধন্যবাদ জানিয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে সেই নেবুটায় হাত ঠেকল।

হঠাৎ আমার কি হল? কোন চিন্তা না করে এই সামান্য পরিচিতা বিদেশিনীর হাতে কি করে সেটা তুলে ধরলুম?

'এটা কি? ও! নেবু? লীমূন। লীমূন-ই-হিন্দুস্তান!' নাকের কাছে তুলে ধরে শুঁকে বললে, 'পেলেন কোথায়? কী সুন্দর গন্ধ! কিন্তু ভিতরটা টক। না?' বলে আবার হাসলে।

ওয়েটার চলে গেছে। চতুর্দিক নির্জন। দূরে দূরে মালীরা কাজ করছে মাত্র।

তবু আমার মুখে কথা নেই।

মেয়েটি একবার আমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে।

আমি তাকিয়ে মাথা নিচু করলুম।

আস্তে আস্তে ভিতরে চলে গেল।

কী আহাম্মুখ! কী মূর্খ আমি!

প্রথম বারে না হয় বে-আদবী হত, কিন্তু এবারে এরকম অবস্থায়ও আমি শুধাতে পারলুম না, আবার দেখা হবে কি না? এবারে তো সে-ই ডেকেছিল। কবিতা দিলে। সেই কবিতাটি পড়ার ভান করে, ওই প্রশ্নটা ভালো করে বলার ধরনটা ভেবে নিলেই তো হত। না, না। ভালোই করেছি। যদি সে চুপ করে যেত তা হলেই তো সর্বনাশ। 'না' বললে তো আমি খতম হয়ে যেতুম। কিন্তু তবু কী মূর্খ আমি। এই যে আঠারো ঘণ্টা একই চিন্তায় বার বার ফিরে এসেছি তাব ভিতর একবারও ভেবে নিতে পারলুম না, হঠাৎ যদি দৈবযোগে আবার দেখা হয়ে যায় তা হলে কি করতে হয়, কি বলতে হয়, সে-ই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—আবার দেখা হবে কি!—সেইটে কি করে ভদ্রভাবে শুধাতে হয়?

ওরে মূর্খ! দিলি একটা নেবু!

তাও শুনতে হল ভিতরটা টক!

না, সে মীন করে নি।

আলবাৎ করেছে।

না।

তিন

আমি জানি, কাবুলের শেষ বল্‌-ডান্স কাল রাত্রেই হয়ে গিয়েছে। তবু সন্ধ্যার পর সেই অন্ধকার ভূতুড়ে বাড়ির চতুর্দিকে ঘোরপাক খেলুম। জানি, আজ আর টেনিস কোর্টে কেউ আসবে না। তবু সেখানে গেলুম। শুধু, সেই বেঞ্চিটিতে বসতে পারলুম না। বসলুম, একটা দূরের বেঞ্চিতে ওইদিকে তাকিয়ে। হায় রে, নির্বোধ মন। তোমার কতই না দুরাশা। যদি, যদি কেউ মনের ভুলে সেখানে এসে বসে।

টেনিস খেলার ছলে পৃথিবীর সব টেনিস-কোর্টেই বহু নরনারী আসে প্রিয়জনের সন্ধানে, তার সঙ্গ-সুখ মোহে। এই কোর্টেও আসে দেশী বিদেশী অনেক·জন। আমিও আসতে পারি।

কিন্তু আমার এসে লাভ? কাবুলী মেয়েরা তো এখনও বাইরে এসে কোন খেলা আরম্ভ করে নি।

আমার বন্ধু আসে যখন সব খেলা সাঙ্গ হয়ে যায়। এ খেলাতে তার শখ নেই। দিনের আলোতে খেলা তো সহজ—সবাই সবাইকে দেখতে পায়। তাতে আর রহস্য কোথায়? অন্ধকারের অজানাতে ঠিক-জনকে চিনে নিতে পারাই তো সব চেয়ে বড় খেলা। শিশু যেমন গভীরতম অন্ধকারে মাতৃস্তন খুঁজে পায়। তাই বুঝি মৃত্যুর ওপারে আমাদের জন্য সব চেয়ে বড় খেলা লীলাময় রেখেছেন।

মিথ্যা, মিথ্যা, সব মিথ্যা। কেউ এল না।

অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সে রাত্রি বাড়ি ফিরেছিলুম। তীর্থযাত্রী যে রকম নিষ্ফল তীর্থ সেরে বাড়ি ফেরে।

ডিনার শেষ হয়ে গিয়েছিল। আব্দুর রহ্‌মান কিছু স্যাণ্ডউইচ সাজিয়ে রাখছিল। তাড়াতাড়ি বললে, 'এখনও কিচেন বোধ হয় বন্ধ হয় নি? আমি গরম সূপ নিয়ে আসি।'

আমি বললুম, 'না।'

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ আব্দুর রহ্‌মান আমার কোট পাতলুন বুরুশ করতে করতে কথায় কথায় বললে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান কাল সন্ধ্যায়ই বিবি বাচ্চা-বাচ্চী সমেত কাবুল চলে গেছেন। তাঁর পিসী গত হয়েছেন।'

অন্য সময় হলে হয়তো শুনেও শুনতুম না, কিংবা হয়তো অলস কণ্ঠে নীরস প্রশ্ন শুধাতুম, 'সর্দারটি কে?'

এখন আমি আব্দুর রহ্‌মান কি জানে, কি করে জানে, কতখানি জানে, এসবের বাইরে। একদিন হয়তো আরও অনেকে জানবে, তাতেই বা কি? সেই যে ইরানী কবি বলেছেন,

"কত না হস্ত চুমিলাম আমি অক্ষমালার মত,
কেউ খুলিল না কিস্মতে ছিল আমার গ্রন্থি যত!"

'দস্ত-ই হর্‌-কস্‌রা ব্‌সানে সবহৎ বুসীদম্‌ চি সূদ
হীচ্‌ কস্‌ ন্‌ কশওদ আখির অক্‌দয়ে কারে মরা।'

অক্ষমালার মত পূতপবিত্র হয়ে সাধুসজ্জনের মন্ত্রোচ্চারণের পুণ্যকর্মে লেগেও যদি তার 'গেরো' থেকেই যায়, তবে আব্দুর রহ্‌মানের হাতে দু পাক খেতেই বা আপত্তি কি?

প্রথমটা সত্যিই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলুম।

অথচ দিনের আলো যতই ম্লান হতে লাগল, ততই মনে হতে লাগল এই জঙ্গলী পাগমান শহরটা বড়ই নোংরা। দুনিয়ার যত বাজে লোক জমায়েৎ হয়ে খামকা হই-হুল্লোড় করে। এর চেয়ে কাবুল ঢের ভালো।

দেখি, আব্দুর রহ্‌মানেরও ওই একই মত। অথচ এখানে সাত দিনের ছুটি কাটাবার জন্য সে-ই করেছিল চাপাচাপি। এখনো তার তিন দিন বাকি।

সকালে দেখি, আব্দুর রহ্‌মান বাক্স প্যাঁটরা গোছাতে আরম্ভ করেছে। মনস্থির করাতে সে ভারী ওস্তাদ।

হিন্দুস্থানী সদাগররা দুঃখিত হলেন। বললেন, 'কাবুলে আবার দেখা হবে।'

বাস্ পাগমান ছাড়তেই মনে হল, সর্বনাশ!
শব্‌নম বানু যদি আবার পাগমানে ফিরে আসে?
আর ভাবতে পারি নে রে, বাবা!

চার

পুরাতন ভৃত্যকে ছেড়ে বাড়ি ফেরা পীড়াদায়ক হলেও, সে সঙ্গে থাকলেই যে গৃহ মধুময় হয়ে ওঠে তার কোন প্রমাণ আমি পেলুম না। সেই নিরানন্দ নির্জন গৃহ। খান কয়েক বই। এগুলো প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

আচমকা একটা বুদ্ধি খেলল মাথায়। এক দোর বন্ধ হলে দশ দোর খুলে যায়; বোবার এক মুখ বন্ধ হলে দশ আঙুল তার ভাষা তর্জমা করে দেয়। আমার যদি সব দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়ে মাত্র একটি খুলে যায় তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সে দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আমি কোথায় পৌঁছব তার খবরও আমি জানতে চাই নে। দিগন্তের কাবা'র ছবি আমি দেখতে চাই নে, হে প্রভু! তুমি শুধু একটি কদম্ ওঠাবার মত আলো ফেলো।

ফার্সী শিখব—যে ফার্সীকে এত দিন অবহেলা করেছি।

তরুণরা এটা শুনে নিরাশ হবে। তারা ওই সময়ে স্বপ্ন দেখে অসম্ভব অসম্ভব বিষয়ের। প্রিয়ার ঘরে যদি আগুন লাগে, দমকলের লোকও তাকে বাঁচাবার জন্যে সাহসে বুক বেঁধে না এগোয়, সে তখন কি রকম লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাকে বাঁচাবার জন্য। ইংরেজকে খুন করে প্রিয়া ধরা পড়েছে; ফাঁসির জন্য তৈরি হয়ে সে সব দোষ আপন স্কন্ধে তুলে নিল—প্রিয়া জানতে পর্যন্ত পারলে না।

প্রবীণরা এসব স্বপ্নের কথায় হাসেন। আমি হাসি নে।

ধন্য হোক তাদের এ সুখ-স্বপ্ন। মৃত্যুঞ্জয় হোক তাদের এ দুরাশা! এগুলোই তো তপ্ত ভূতলকে সরস শ্যামল করে রেখেছে। নন্দন-কাননের যে হাসি মুখে নিয়ে শিশু মায়ের কোলে আসে, তরুণের সেই নন্দন-কানন থেকেই আকাশ-কুসুম চয়নে তার শেষ রেশ।

তার তুলনায় ফার্সী শেখা কিছুই নয়। বজ্র-নির্ঘোষে ঝিঁঝির নূপুর-নিক্বণ!

প্রবীণরা অবশ্য এটাকেই প্রশংসা করতেন। আজ যদি আমি শব্‌নম বানুকে চিঠি লিখতে যাই? আমার ফার্সী কাঁচা, ফরাসী দড়কচ্চা।

বেরলুম ফার্সী বইয়ের সন্ধানে, কাবুলী বন্ধুদের বাড়িতে। তারা খুশী হবে। নিরপরাধা অকারণে বর্জিতা প্রথমা প্রিয়ার সন্ধানে নির্গত প্রণয়ীর নব অভিসার প্রিয়জন প্রসন্ন বদনে আশীর্বাদ করে। ফার্সীকে আমি অকারণে বর্জন করেছিলুম।

এই বেরনোর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, এ কথা বলব না।

আজ কেন, সেদিনও আমার মাতৃভূমিতে ক্ল্যাসিক্স্ অনাদৃত। অনুন্নত কাবুলে তা নয়। সেদিনও স্বয়ং মাইকেল যদি কলেজ স্ট্রীটে এসে নিজের বইয়ের সন্ধান করতেন তবে সেগুলো বের করা হত পিছনের গুদোম থেকে। তিনি তখন ইরানী কবির মতই দুঃখ করে বলতে পারতেন,

"রাজসভাতে এসেছিলেম বসতে দিলে পিছে,
সাগর জলে ময়লা ভাসে, মুক্তো থাকে নিচে।"

মাইকেলের দুঃখ বেশী। পুস্তক-সভাতেও তিনি পিছনে।

এখানে হাফিজ সাদী কলীম পয়লা শেল্‌ফে। কিছু বই কিনলুম। ধারের বইয়ে নাকি বিদ্যার্জন হয় না।

ফেরার পথে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে দেখা। তারা চেপে ধরলে, কাবুল নদীতে সাঁতারে যেতে। মনে মনে বললুম, ওখানে যা জল তা দিয়ে কাশীরাম দাসের জলের তিলকও ভালে কাটা যায় না। শেষটায় ঠিক হল তিন দিন পর, ছুটির শেষ দিনে।

তীব্র আবেগে ফল আসন্ন। তিন দিনেও অনেকখানি ফার্সী শেখা যায়।

তিন দিন পরে সাঁতারে এসেছি।

খানিকক্ষণ পরেই ছেলেরা আমার কথা ভুলে গিয়ে আপন আনন্দে মেতে উঠল। আমি আস্তে আস্তে ভাটির দিকে বুকজল ঠেলে ঠেলে, কখনও বা দু দিক থেকে নুয়ে পড়া গাছের পাতা চোখের সামনে থেকে হাত দিয়ে ঠেলে এগুতে লাগলুম। সামনে একটু গভীর জল। সাঁতার কেটে ডান পায়ে উঠে গাছের ঝোপে জিরোতে বসলুম। যত মন্দমন্থরই হোক, স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে সম্মোহন আছে।

পিছন থেকে শুনি, 'এই যে!'

তাকিয়ে দেখি, শব্‌নম!

এক লম্ফে জলে নামলুম। ভেবে নয়, চিন্তা করে নয়—সাপ দেখলে মানুষ যে রকম লাফ দেয়। আমার পরনে সাঁতারের কস্ট্যুম। কত যুগ যুগ সঞ্চিত প্রাচ্যভূমির এ সংস্কার।

'উঠে আসুন, উঠে আসুন, এখ্‌খুনি উঠে আসুন।'

কোন উত্তর নেই।

'উঠবেন না? আচ্ছা, তবে দেখাচ্ছি।' বলেই হ্যাণ্ডব্যাগ হাতড়াতে লাগল।

মেরেছে! না—মারবে—পিস্তল খুঁজছে নাকি?

কাতর কণ্ঠে বললে, 'দেখুন, আপনি মীন্‌ এডভেন্টেজ নেবেন না। আমার পিস্তলে গুলি নেই।' একটু ভেবে বললে, 'ও, বুঝেছি। পরনে কস্ট্যুম। তা, উঠে আসুন। এই নিন আমার গায়ের ওড়না। এইটে জড়িয়ে বসবেন।'

এ তো আরও মারাত্মক। কাবুলিনীবেশে ওড়না শুধু অঙ্গাভরণ নহে, কিছুটা অঙ্গাবরণও বটে।

ততক্ষণে আমার বেশ বিষয়ের সংস্কার কেটে গিয়েছে। তার চেয়েও যে প্রাচীন সংস্কার সেইটে এসে সোনার বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করেছে। সে সংস্কারের সোহাগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নক্ষত্রলোক আপন গতি খুঁজে পায়।

'আপনি আমাকে কি করে খুঁজে পেলেন?'

প্রথমটায় চুপ করে গেলুম। মিথ্যে উত্তর দিতে যে একেবারেই ইচ্ছে যায় নি এ কথা বলব না।

শব্‌নম চুপ করে থাকতে পারে না। উত্তর না দিলে শাসায়। এবারে কিন্তু নীরব প্রতীক্ষায় বসে রইল।

ভালো ভাবেই বুঝে গেলুম এবারে সে উত্তর না নিয়ে ছাড়বে না। বললুম, 'আপনাকে আমি সবখানেই খুঁজছি।'

মুখ খুশিতে ভরে উঠল। হঠাৎ আবার আকাশের এক কোণে মেঘ দেখা দিল। শুধালে, 'আমাদের বাগানবাড়ি কাছেই, জানতেন?'

কেন জানি নে, বলতে ইচ্ছে হল না যে, তাদের কাবুলের বাড়ি বাইরে থেকে যতটুকু দেখা যায় তার সবটুকু ওর বানানেওলা রাজমিস্ত্রির চেয়েও আমি বেশী জানি। বললুম, 'না।'

এবারে যেন তার কান্না পেল। বললে, 'ওঃ! বুঝেছি। সাঁতার কাটবার ফুর্তি করতে এসেছিলেন।'

এই এত দিনে আমার সত্যকার বাজল।

আজ না হয় ঠাট্টা-মস্করা, রঙ্গ-রসিকতা করে মনের গভীর আবেগ, তার গোপন ক্ষুধা, তার অসম্ভব স্বপন-চয়ন, তার বদ্ধ পাগলামি যতখানি পারি ঢেকে চেপে বলছি কিন্তু তখন, হায়, এ হালকামি ছিল কোথায়?

বললুম, 'দেখুন, শব্‌নম বানু, আমি বিদেশী। বিদেশে অনেক মনোবেদনা। তার উপর যখন মানুষ ভালবাসে—'

সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে শব্‌নম তার হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরল।

আমি ভয়ে লজ্জায় মারা গেলুম। ছি, ছি! আমি কী করে এ কথাটা বলে ফেললুম? কোথা থেকে আমার এ সাহস এল? কিন্তু আমি তো সাহসে বুক বেঁধে এ-কথা বলি নি। এ তো নিজের থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে।

তার চেয়েও আশ্চর্য, শব্‌নম আমার মুখের উপর থেকে তার হাতের চাপও ছাড়ছে না।

'বলো না, বলো না। আমি ঠিক করেছিলুম ও কথাটা আমি আগে তোমাকে বলব।'

দু জনাই অনেকক্ষণ চুপ।

শব্‌নমই প্রথম কথা বললে।

বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, আমি প্রথম বলব, আর তুমি আমাকে অবহেলা করবে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি?'

তাড়াতাড়ি বললে, 'থাক্, থাক্! আজ এসব না। আরেক দিন এসব কথা হবে। আজ শুধু আনন্দের কথা বল। সব প্রথম বল, তুমি কখন আমাকে ভালবাসলে?'

আমি বললুম, 'সে কি করে বলি?' তুমি কখন বাসলে বল?'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'সে অতি সহজ। হোটেলের বারান্দায় যখন তোমাকে ডেকে পাঠালুম। তুমি যখন কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছিলে না, তখন। জান না ইস্‌ফাহানা কবি সাঈব কি বলেছেন,

> "খমুশী হুজ্জতে নাতিক্ বুদ্ জুইআই-ই-গওহর্‌হা,
> কি আজ গওওয়াস্ দর্ দরিয়া নফ্‌স্ বীরূন নমীআয়দ্।।"

> 'গভীরে ডুবেছে, যে জন জানিবে মুক্তার সন্ধানে,
> বুদ্বুদ হয়ে তার প্রশ্বাস ওঠে না উপর পানে।।'

আমি বললুম, এ কবি সত্যই জীবন দেখেছিলেন; কাবুলে এ কবি কিন্তু জন্মাতে পারত না।'

'কেন?'

'ডুব দেবার মত জল এখানে কোথায়?'

'সে কথা থাক্। আমার কিন্তু ভারী দুঃখ হয়, তুমি আমার বয়েতের পালটা বয়েৎ দিতে পার না বলে।'

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'সে কি। আমার হয় না।'

'চুপ। আবার ভুল করেছি। বলেছিলুম দুঃখের কথা তুলব না।'

'আমি কিন্তু জোর ফার্সী শিখতে আরম্ভ করেছি।'

'কী আনন্দ! বাবার মজলিসে কত বিদেশী আসে, কেউ ভালো ফার্সী বলতে পারে না। তুমি শিখলে আমার গর্ব হবে। তুমি আমারই জন্য শিখছ। সে আমি জানি।'

'তোমার মুখে 'তুমি' বড় সুন্দর শোনায়।'

বাধা পড়ল। কার যেন গলার আওয়াজ।

তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে বললে, এবার তুমি এস। তোমাকে খুদার আমানতে দিলুম।'

আমি জলে নামতে নামতে বললুম, 'আর কিছু বল।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

পাঁচ

"ঠেকেছিল মনোতরীখান
প্রাণনাশা সংশয়-চড়ায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়।

ছিল ঠেকে মনোতরীখান- -
চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে?
কে গো তুমি দুর্জ্জেয় মহান?
কে দেবতা এলে আজি চিতে?"

যে চার্বাক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, তিনি নাকি মঞ্জুভাষা'র কাছ থেকে তাঁর প্রেমের প্রতিদানের আশা পেয়ে একদিনের তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন।

"সেই একদিন শুধু জীবনে চার্বাক
নত হয়েছিল নিজে চরণে ধাতার
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন—
সে যে আনন্দের দিন—সে যে প্রত্যাশার।"

(সত্যেন দত্তের কবিতা)

আমি ছেলেবেলা থেকেই আল্লাকে ভয় করতে শিখেছি, কৈশোরে কাব্য পড়েছি, তাঁকে নাকি ভালবাসাও যায়, আর এই যৌবনপ্রদোষে এক লহমায় তিনি যেন হঠাৎ এক নবরাজ প্রেমরাজ হয়ে আমাকে ডেকে তাঁর সিংহাসনের পাশে বসালেন। শুধু তাই। ক্ষণে ক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে আমার প্রেম নিবেদনেরও প্রতীক্ষা করছেন। তাঁর চোখেও যেন পার-কি-পার-না'র ভয়। আশ্চর্য! আশ্চর্য!

"জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমের ভিখারী
দ্বারে দ্বারে মাগো প্রেম নয়নেতে বারি।"

সব দ্বার ছেড়ে তিনি যেন একমাত্র আমারই দ্বারে এসেছেন।

না, না, তিনি দ্বারে আসেন নি। মৌলা—প্রভু—যখন আসেন, তখন তিনি 'ছপ্পর ফোঁড় করকে আতে হ্যাঁয়'—তিনি ছাত ভেঙে আসেন।

একটি কথা, দুটি চাউনি, তাতেই দেহের ক্ষুধা, হৃদয়ের তৃষ্ণা, মনের আকাঙ্ক্ষা সব ঘুচে যায়, সব দিক পরিপূর্ণ হয়ে যায়!

ঘরে ফিরে দেখি সেখানে ভ্রমর গুঞ্জন করছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার রামধনু, তার-ই নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমার ছেলেবেলাকার নর্মসখী গ্রামের ছোট নদীটি, এবং সমুখে এক

গাদা শিউলি ফুল—সেই প্রথম সন্ধ্যার শিউলি ফুল—শব্‌নম শিউলি। আর না, আর না! থামো! থামো! আর আমার সইবে না।

পরদিন সন্ধ্যার সময় যখন আরাম চেযাবে শুয়ে শুয়ে ভানুমতীমন্ত্র দিয়ে সেই স্বপ্নকে সংঁ করছি এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন আপাদ-মস্তক ভারী কালো বোরকায় ঢাকা এক মহিলা।

আমি ভালো কবে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বোরকা এক ঝটকায় সরে গেল।

শব্‌নম!

হাত দুখানি এগিয়ে দিল।

আমি ছুটে গিয়ে তার হাত দু'খানি আপন হাতে তুলে নিলুম। তারপব কাবুলী ধরনে রাজা-বাদশা, গুরু-মুর্শীদের হাত দুটি যে ভাবে চুমো খাওয়া হয় সেই চুমো খেলুম।

বললে, 'হাঁটু গাড়ো।'

'জো হুকুম।'

'বল, "আমি সর্ব হৃদয় দিয়ে সর্বকাল তোমার সেবা করব"।'

'আমি সর্ব দেহ মন হৃদয দিয়ে সেবা করব।'

খিলখিল কবে হেসে উঠল।

ভানুমতীমন্ত্র নিশ্চয়ই মাত্রাধিক করা হয়ে গিয়েছিল। সে মন্ত্রে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়। এ যে সত্যজাল—না, সত্যের দৃঢ় ভূমি।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে আমার মাথার দু'দিক চেপে ধবে হাসতে হাসতে বললে, 'আমি ভেবেছিলুম তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা কবে চিৎকার করে বলবে, "না, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর"।'

আমি বললুম, 'আমাদের বাউল গেয়েছেন—একটু বদলে বলছি—

"কোথায় আমার ছত্র-দণ্ড কোথায় সিংহাসন?
প্রেমিকার পায়ের তলায় লুটায় জীবন।"

'বেশ. তো। তুমি ফার্সী শিখছ? আমি তা হলে বাঙলা শিখব।'

'সর্বনাশ! অমন কর্মটি করো না।'

'কেন?'

'তিন দিনে ধরে ফেলবে, আমি কত কম বাঙলা জানি।'

যেন আমার কথা শুনতে পায় নি। বললে, 'তুমি মুসাফির, কিন্তু ঘরটি সাজিয়েছ বেশ।' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেশ ঘুরে ঘুরে চতুর্দিক দেখলে। তারপর সোফাতে বসে বললে, 'এস।' আমি পাশে বসতে যেতেই বললে, 'না, চেয়ারটা সামনে টেনে এসে বোস।' আমি একটু ক্ষুণ্ন হলুম। বললে, 'মুখোমুখি হয়ে বোস। তোমার মুখ দেখব।' তদ্দণ্ডেই মনটা খুশী হয়ে গেল—মানুষ কত সহজে ভুল মীমাংসায় পৌঁছয়!

আমি কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললুম, 'তুমি ওই তাম্বু, মানে বোরকা পরো কেন?'

'স্বচ্ছন্দে যেখানে খুশী আসা-যাওয়া করা যায় বলে। আহাম্মুখ ইউরোপীয়ানরা ভাবে, ওটা পুরুষের সৃষ্টি, মেয়েদের লুকিয়ে রাখবার জন্য। আসলে ওটা মেয়েদেরই আবিষ্কার—আপন সুবিধের জন্য। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে পরি, এ-দেশের পুরুষ এখনও মেয়েদের দিকে তাকাতে শেখে নি বলে—হ্যাটের সামনে পর্দায় আর কতটুকু ঢাকা পড়ে?' তারপর বললে, 'আচ্ছা, বল তো, তুমি পাগমান থেকে পালিয়ে এলে কেন?'

বললুম, 'আমি তো খবর পেলুম, তুমি কাবুল চলে এসেছ।'

'আমি তার পরদিনই পাগমান গিয়ে শুনি, তুমি কাবুলে চলে এসেছ।'

আমি শুধালুম, 'আচ্ছা, বল তো, আমাদের বন্ধুত্ব এত তাড়াতাড়ি হল কি করে?

'আজব্ বাৎ শুধালে। তবে কি বন্ধুত্ব হবে যখন আমার বয়স ষাট আর তোমার বয়স একশ তিরিশ?'

আমি শুধালুম, 'আমাদের বয়সে কি এতই তফাত?'

'তোমার গম্ভীর গম্ভীর কথা শুনে মনে হয় তারও বেশী। আবার কখনও মনে হয়, তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু সেটা আসল উত্তর নয়। আসল উত্তর আরেক দিন বলব।'

'বলবে তো ঠিক!'

'নিশ্চয়।'

'আচ্ছা, এবারে তোমাকে একটা শেষ প্রশ্ন শুধাই। তুমি এত সাহস কোথায় পেলে? এই যে স্বচ্ছন্দে বল, কোন কিছুর পরোয়া তুমি কর না, সোজা আমার বাড়িতে চলে এলে—?'

'তুমি আমাকে ভালবাস—আমি তোমার বাড়িতে আসব না তো যাব কি গুল্-ই বাকাওলীর পরিস্তানে? জান, আমরা আসলে তুর্কী। আমাদের বাদশা আমানুল্লার গায়েও তুর্কী রক্ত আছে। আর তুর্কী রমণী কি জিনিস সেটা জানতেন আমানুল্লার বাপ শহীদ হবীবুল্লা। আমানুল্লার মায়ের প্যাঁচে তিনি পর্যন্ত হার মেনেছিলেন, জান? আমানুল্লার তো রাজা হওয়ার কথা ছিল না।'

'কিছু কিছু শুনেছি।'

'ভালো। গওহর্ শাদের নাম শুনেছ? ওই সুন্দর হিরাত শহরের চোদ্দ আনা সেই তুর্কী রমণীর তৈরি। তোমার আপন দেশে নূরজাহান বাদশা জাহাঙ্গীরকে চালাত না? মোমতাজ—আরও যেন কে কে? হারেমের ভিতরেই তুর্কী রমণী যে নল চালায় সেটা কতদূর যায় তার খবর রাখে কটা লোক?'

'তুমি অত ইতিহাস পড়লে কোথায়?'

'আমি পড়ি নি। আমি ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, এ-সব পড়ি নে। আমার আনন্দ শুধু কাব্যে। স্কুলে বাধ্য হয়ে 'তুর্কী রমণীর ইতিহাস' পড়তে হয়েছিল—তার থেকে বলছি। কিন্তু তাই বলে ভেবো না আমি আমাব বে-পরোয়া ভাব ইতিহাস থেকে পেলুম। আর জান না, কবি কামালুদ্দীন কি বলেছেন—

"মরণের তরে দুটি দিন তুমি করো নাকো কোনো ভয়,
যেদিন মরণ আসে না; সেদিন আসিবে সে নিশ্চয়।"

আমি বললুম, 'মৃত্যু ছাড়া অন্য বিপদও তো আছে।'

'কী আশ্চর্য! মৃত্যুর ওষুধই যখন পাওয়া গেল তখন অন্য ব্যামোর ওষুধ মিলবে না? তোমার বিপদ, আমার বিপদ, আমাদের দুজনের মেলানো বিপদ—তার দাওয়াই আমার কাছে আছে। কিন্তু বলব না।'

'কেন?'

'ওষুধের রসায়ন (প্রেসক্রিপশন) জানাজানি হয়ে গেলে রোগী সারে না—হেকিমদের বিশ্বাস।' তারপর সোফার কুশনগুলো জড়ো করে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ে বললে, 'তুমি পাশে এসে বোস।' একপাশে একটু জায়গা করে দিয়ে বললে, 'ওসব কথা কেন তোল? এখন বল, তুমি আমায় কোথায় কোথায় খুঁজলে? আমার শুনতে বড় ভালো লাগে।'

আমি বললুম, 'শব্‌নম বানু—'

'উহুঁ। হল না।'

'কি?'

'শব্‌নম শিউলি।'

এ নামে কত মধু ধরে। তাই বুঝি 'জপিতে জপিতে নাম অবশ হৈল তনু।'

কবার জপেছিলুম?

শব্‌নম বললে, 'উত্তর দাও।'

'তোমাকে আমি সবখানে খুঁজেছি।'

এতক্ষণ সে শিলওয়ার পরা ডান পা বাঁ হাঁটুর উপর তুলে দিয়ে মোজা-বিহীন ধবধবে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল আর তার পরের আঙুল নিয়ে খেলা করছিল; কখনও বা ওড়নাখানি বাঁ হাত দিয়ে তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে তার খুঁট পাকাচ্ছিল।

ধড়মড় করে সটান উঠে বসে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। নদী-পাড়ে বলেছিলে। আমি তখন অর্থ বুঝি নি। এখন কবি জামী বুঝিয়ে দিয়েছেন। এক্ষুনি বলছি, কিন্তু তার আগে বল, খোঁজার সময় যে-কোনো মেয়ে আসতে দেখলেই ভাবতে, আমি আসছি। না? শোন তবে;—

"আতুর হিয়ার নিদ্-হারা চোখে
অহরহ তুমি স্বামী,
দূর হতে দেখি যে কেহ আসিছে
তুমি এলে, ভাবি আমি।
মূর্খ দাঁড়ায়ে আছিল সেখানে
শুধাল, 'বাসভ এলে?'
কহিলেন জামী 'বলিব তো আমি
তুমিই এসেছ'—হেসে।"

প্রথমটায় আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। ভক্ত সাধকজন হঠাৎ একটা লোককে, আপন গা বাঁচিয়ে গাধা বানিয়ে দেবেন, এতখানি রসবোধ তাঁদের কাছে আশা করে কে?

সে কথা বলতে শব্‌নম বললে, 'বহু কাবুলীকে আধ ঘণ্টা ধরে বোঝাতে হয়।'

আমি বললুম, 'আমার একটা কথা মনে পড়েছে।'

'শাবাশ্।' বলে জানু পেতে বসে, ডান কনুই হাঁটুর উপর, হাত গালের উপর রেখে, কাত হয়ে, চোখ বন্ধ করে বললে, 'বল।'

"মজনূঁর শেষ প্রাণ নিশ্বাস করে লীন ধরাতলে
সেই নিশ্বাস ঘূর্ণির রূপে লায়লীকে খুঁজে চলে।"

'বুঝেছি। কিন্তু আরও বুঝিয়ে বল।'

আমি বললুম, 'মজনূঁ যখনই শুনত, তার প্রিয়া লায়লীকে নজ্‌দ্ মরুভূমির উপর দিয়ে উটে করে সরানো হচ্ছে, সে তখন পাগলের মত এ-উট সে-উটের কাছে গিয়ে খুঁজত কোন্ মহ্‌মিলে (উটের হাওদা) লায়লী আছে। মজনূঁ মরে গেছেন কত শতাব্দী হল। কিন্তু এখনও তাঁর জীবিতাবস্থার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস মরুভূমির ছোট ছোট ঘূর্ণিবায়ু হয়ে লায়লীর মহ্‌মিল খুঁজছে। তুমি বুঝি কখনও মরুভূমি দেখ নি? ছোট ছোট ঘূর্ণিবায়ু (বগোলে) অল্প অল্প ধূলি উড়িয়ে এদিকে ধায়, ওদিকে ছোটে, সেদিকে খোঁজে?'

'না। কিন্তু মানুষের কল্পনা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তাই দেখে অবাক মানছি। উর্দুটা বল।'

"মজনূঁকে দম্‌কী রওনক মুদ্দৎ হুঈ সিধারে
অব কোঁ নজ্‌দ্‌কে বগোলে মহ্‌মিল্‌কো ঢুঁঢতে হৈঁ?"

এর ছ'টা শব্দ ফার্সী। শব্‌নম বুঝে গেল। বললে, 'অতি চমৎকার দোহা।'

আমি একটু কিন্তু কিন্তু করে বললুম, 'বড্ড বেশী ঠাস বুনোট। আমার বুঝতে বেশ কষ্ট হয়েছিল।'

বললে, 'তারপর তুমি একে শুধালে "শব্‌নম বানু কোথায় থাকে?" ওকে শুধালে, "সে কখন বেড়াতে বেরয়?"—ভাবলে কেউই তোমার গোপন খবর জানে না।'

'আমি কি এতই আহাম্মুক!'

আমার ডান হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'শোন দিল-ই-মন (আমার দিল্)—মূর্খই হও আর সোক্রাৎই (সক্রাৎটিস্) হও, প্রেম কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। শোন,

"দিল গুমান দারদ কি পুশীদে অস্ত্ রাই-ই ইশ্‌ক্‌রা
শমরা ফানুস পন্‌দারদ্ কি পিনহান্ করদে অস্ত্।

সরল হৃদয় মনে করে প্রেম লুকায়ে রাখিতে পারে,
কাঁচের ফানুস মনে মনে ভাবে লুকিয়েছে শিখাটারে।"

কে পারে? কেউ পারে না। আজ না হয় কাল ধরা পড়বেই। আমি পারি? এই তো তুমি যে আমায় নেবুটি দিয়েছিলে—আমি সেটি নখ দিয়ে অল্প অল্প ঠোনা দিয়ে শুঁকছিলুম। হঠাৎ বাবা এসে শুধালেন, "নেবু যে! কোথায় পেলে?" আমি বললুম, "হোটেলে চা খেতে গিয়েছিলুম"—বাবা জানতেন, "সেখানে জুটল।" আমার মুখ যে তখন লাল হয়ে যায় নি, কি করে বলব? আব্বা বললেন যে, তিনিও লাঞ্চে একটা পেয়েছিলেন। কে দিলে, কি করে পেলে কিচ্ছু শুধালেন না। তিনিও একদিন জানবেন।'

'তখন?'

'তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি ত বিদেশী। আমার, শুধু আমার, আপন-দেশী। তোমার ভাবনা ভাববো আমি। বলেছি তো আমার কাছে ওষুধ আছে। ওসব কথা ছাড়। একটা কবিতা বল—আমাদের কথার সঙ্গে খাপ খাক আর নাই খাক।'

আমি বললুম, 'খাপ খাইয়েই বলছি। তোমার মুখ লাল হওয়ার সঙ্গে তার মিল আছে, আবার কাঁচের চিমনি যে গর্ব করে সে প্রদীপের আলো লুকিয়েছে তার সঙ্গেও মিল আছে। তবে এটা সংস্কৃতে এবং শ্লোকটার ভাবার্থ শুধু আমার মনে আছে;

"শুধাইনু 'হে নবীনা,
ভালোবাস মোরে কি না?'
রাঙা হ'ল তার মুখখানি;
প্রেম ছিল হৃদে ঢাকা!
তাই যবে হয় আঁকা
আকাশেতে লাল রঙ, জানি—
পাহাড়ের আড়ালেতে
সবিতা নিশ্চয় ভাতে
রক্তাকাশ তাই নেই মানি।"

শব্‌নম বললে, 'আবার বল।'

বললুম।

শব্‌নম বললে, 'এটি অতুলনীয়। বিশেষ করে প্রেমের সঙ্গে সূর্যেরই শুধু তুলনা হয়। আকাশ আর মুখ এক। ঘড়ি ঘড়ি রঙ বদলায়। সূর্য চিরন্তন। প্রেম সূর্য একবার দেখা দিলে আর কোন ভাবনা নেই।'

আমি বললুম, 'তোমার বেলা একটা নেবুতেই মুখ লাল হয়ে গেল। প্রেম হলে কি হত?'

বিরক্তির ভান করে বললে, 'কি বললে? প্রেম নেই?'

আমিও বেদনার ভান করে বললুম, 'তুমিই তো বললে নেবুর ভিতর টক।'

'ও! আমি বলেছিলুম, "আঙুরগুলো টক"—সেই অর্থে। তোমাকে পাব না ভয়ে শেয়ালের মত মনকে বোঝাচ্ছিলুম।'

'তোমার সঙ্গে কথায় পারা ভার। তবে আরেকটা ফরিয়াদ জানাই।'

গভীর মনোযোগসহকারে, অত্যন্ত দোষীর মত চেহারা করে বললে, 'আদেশ কর।'

আমি বললুম, 'আমার উচ্চারণে ঠাকুরমার সিন্দুকের গন্ধ।'

খলখল করে হেসে উঠল; 'আচ্ছা পাগল তো। সার্থক নাম রেখে ছিলেন তোমার আব্বা-জানের মুরশীদ। ওরে, মজনুন সেই ভাল। জানেমন্ বলছিল—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'সে আবার কে?'

দুষ্টু মেয়ে। বুঝে ফেলেছে। ভুরু কুঁচকে শুধালে, 'হিংসে হচ্ছে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

আনন্দে আলিঙ্গন করতে গিয়ে যেন নিজেকে ঠেকালে। হাসিতে খুশিতে কান্নাতে মেশানো গলায় বললে, 'বাঁচালে, আমাকে বাঁচালে।'

অবাক হয়ে শুধালুম, 'মানে?'

'বাঁচালে, বাঁচালে। গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, প্রিয়জনের মঙ্গলের জন্য তাকে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে তুলে দেবে, আত্মবিসর্জন করে নিজেকে মিলিয়ে দেবে—মানি নে, মানি নে, আমি একদম মানি নে। আজ যদি গওহর্‌শাদ্ কিংবা নূরজাহান তোমাকে ভালবেসে পেতে চান—'

আমি বললুম, 'শাবাস্।'

'কি বললে? শাবাশ্? দেখাচ্ছি। প্রথম মারব ওদের। তখন যদি 'শাবাশ্' বল তবে বেঁচে গেলে। না হলে তোমাকে মেরে থেঁতলে, পিষে শামী-কাবাব বানাব, নিদেন পক্ষে শিক।' হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে পিস্তল দেখালে।

আমি বললুম, 'ওতে বুলেট থাকে না।'

'সেদিনও ছিল।'

'জানেমন্ কে?'

'আমার জিগরের টুকরো, কলিজার আধা, দিলের খুন, চোখের রোশনাই, জানের মালিক—আমার জ্যাঠামণি। তোমার কাছে সিগারেট আছে। দাও তো।'

'শুধোবেন না, কোথায় পেলে?'

'উনি সব জানেন।'

'তুমি বলেছ?'

'না।'

'আরও কিছুক্ষণ বসি। সিনেমার লাইট নিবে গিয়েছিল বলে শো শেষ হতে দেরি হল। আমাকে বলতে হবে না।'

'জ্যাঠামণি?'

'তিনি বলেন, "সিনেমায় কেন যাও, বাছা? সিনেমা তো জীবনই দেখায়। তার চেয়ে জীবনটাকে সিনেমার মত দেখতে শেখ। অনেক হাঙ্গাম-হুজ্জৎ থেকে বেঁচে যাবে।" '

তারপর বললে, 'এবারে তুমি চুপ কর। আমি একটু দেখে নিই, ভেবে নিই।' লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে খানিকক্ষণ বড় চোখ আরও বড় করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ বন্ধ করল।

একবার শুধু বললে, 'বল তো—। না থাক্।'

তারপর অনেকক্ষণ একেবারে নিশ্চল নিথর।

বললে, 'আমার পেয়ালা একেবারে পরিপূর্ণ করে ভরে দিয়েছেন করুণাময়। এই তোমার

ঘর, তুমি পাশে বসে—এর বেশি কি বলব। নিশ্বাসে নিশ্বাসে আমি সব কিছু শুষে নিয়েছি।'

এই প্রথম দেখলুম, শব্‌নম কোন কবির কবিতা দিয়ে আপন ভাব প্রকাশ করল না। কোন কবিতা পারত?

'উঠি।'

আমি বললুম, 'আবার কবে দেখা হবে?' এবারেও ভুলতে বসেছিলুম শুধাতে। আনন্দের সময় মানুষ দুঃখের দিনের সম্বল সঞ্চয় করতে ভুলে যায়। আসলে তা নয়। পরিপূর্ণতা যদি ভবিষ্যৎ দৈন্যের কথা স্মরণ করতে পারে, তবে সে পরিপূর্ণ হল কই?

বললে, 'তুমি শুধু এইটুকু বিশ্বাস কর, তোমাকে দেখবার জন্য আমার যে ব্যাকুলতা, তুমি কখনও সেটা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'দয়া করে কর। শান্তি পাবার ওই একমাত্র পথ। না হলে পাগলের মত ছুটোছুটি করবে। আর দেখ, তুমি যদি আমার কথাটা বিশ্বাস কর, তবে যদি কখনও আমার শক্তিক্ষয় হয়, তবে তখন আমি বিশ্বাস করব যে আমাকে পাবার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা সেটা আমি ছাড়িয়ে যেতে পারব না। তখন আমি পাব শান্তি।'

দোরের কাছে এসে শেষ কথা বললে, 'আমার বিরহে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না—ওইটুকুতেই আমার চলবে।'

দ্বিতীয় খণ্ড

এক

সকলেই বলে, পলে পলে তুষানলে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে বহ্নিকুণ্ডে ঝম্প দেওয়া ভাল। আমি জানি, আমার সমুখে কত দীর্ঘ দিনের বিরহ—সেটা যদি আমি প্রথম দিনে জানতে পারতুম তা হলে সেটা কিছুতেই সইতে পারতুম না। আমার প্রার্থনামত আল্লাতাল্লা আমাকে এক সঙ্গে একটি কদমের বেশি ওঠাতে দেন নি। আলো দিয়েছিলেন, কিংবা বেদনা দিয়েছিলেন এক পা চলার—বিরহদিগন্ত কত দূরে দেখতে দেন নি। তাঁকে দোষ দিই কি করে?

আর শব্‌নম। সে তো শিউলি। শরৎ নিশির স্বপ্ন—প্রভাতের বিচ্ছেদ-বেদনা। সে যখন ভোরবেলা সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সে কি স্বেচ্ছায়?

ওই কঠিন কঠোর সময়েও সে একবার ঝড়ের মত আমার ঘরে এসেছিল।

এক নিশ্বাসে কথা শেষ করে কেঁদেছিল। ওই প্রথম আর ওই তার শেষ কান্না। তার বাবাকে আমানুল্লা কান্দাহারের গবর্নর করে পাঠাচ্ছেন। ফ্রান্সের নির্বাসন শেষ হওয়ার পর দেশে ফিরলেন বটে, কিন্তু আমানুল্লা আর সর্দার আওরঙ্গজেব খানেতে বনাবনি হল না, বিশেষত তিনি আমানুল্লার উগ্র ইউরোপীয় সংস্কার পদ্ধতি আদপেই পছন্দ করতেন না। এখন ইউরোপ যাবার মুখে তিনি বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আওরঙ্গজেব নাকি প্রথমটায় যেতে চান নি। এখন স্থির হয়েছে, তিনি মাত্র তিন মাসের জন্য যাবেন। আওরঙ্গজেবের পিতৃভূমি কান্দাহার তিনি ভাল করে চেনেন—তিন মাস পরে অবস্থা দেখে আমানুল্লাকে জানাবেন, ঠিক কোন্ লোককে তাঁর পরের গবর্নর করে পাঠালে সে কান্দাহারের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে।

এত দুঃখের মাঝখানেও ওইটুকু ছিল আনন্দের বাণী। কাবুলে রাজনৈতিক মরুভূমিতে বাস

এক রকম অসম্ভব। হয় তুমি রাজার পক্ষে, রাজার প্রিয়ভাজন—নয় তুমি কারাগারে কিংবা ওপারে; শব্‌নম যদিও বললে তাঁর আব্বা এ-সব ব্যাপারে ঈষৎ উদাসীন। ফ্রান্সে নির্বাসনকালে তিনি সেখানকার স্যাঁ সীর মিলিটারি কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মিলিটারি স্ট্রাটেজি সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন, এখনও করেন—আর তার ফাঁকে ফাঁকে কাব্য-চর্চা।

সেদিন শব্‌নম তেজী তুর্কী রমণীর মত কথা বলে নি, কথায় কথায় কবিতা বলতে পারে নি। শুধু অনুনয় বিনয় করেছিল।

আমি শুধু একটি কথা বলেছিলুম, 'তোমার না গেলে হয় না?'

বেচারী ভেঙে পড়ে তখন।

টসটস করে, কোন আভাস না দিয়ে, ঝরে পড়েছিল অনেক ফোঁটা মোটা মোটা চোখের জল।

আমার দু হাত তুলে ধরে তাদেরই দু পিঠ দিয়ে আপন চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিল, 'ওইটেই তুমি শুধু শুধিয়ো না, লক্ষ্মীটি। এই একটা প্রশ্ন আমার মাথার ভিতর ঢুকে যেন পোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে। না গেলে হয় না? না গেলে হয় না?—অসম্ভব, অসম্ভব। কিস্মৎ কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে, তুমি ওকে বুদ্রতর করো না।'

দরজার কাছে এসে তার কথামত দাঁড়ালুম।—বললে—যেটা সে আগের বারও বলেছিল, 'আমার বিরহে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

ওর তো কথা বলার অভাব নেই। বুঝলুম, প্রাণের কথা মাত্র একটি।

ভোরবেলা আমি আধো ঘুমে। সমস্ত রাত অনিদ্রায় কেটেছে। আমার শিয়রে বসে শব্‌নম। আমি চোখ মেলতেই সে দু হাত দিয়ে আমার চোখ বন্ধ করে দিল।

যেন শুনলুম, 'ব্‌ আমানে খুদা'—তোমাকে খুদার আমানতে রাখলুম। 'ব্‌ খুদা সর্পুদমৎ'—তোমাকে খুদার হাতে সর্পোদ করলুম।

'আমার বিরহে—'

সমস্ত ব্যাপারটা কয়েক সেকেণ্ডের। দীর্ঘতম স্বপ্নও নাকি মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের।

বলতে পারব না, সত্য না স্বপ্ন। শব্‌নমকে শুধোবার সুযোগ পাই নি। বোধ হয় সত্য-স্বপ্ন। কিংবা স্বপ্ন-সত্য।

প্রথমে তিন মাস, তার পর চার মাস, তার পর ছ-মাস। আমানুল্লা বিদেশ থেকে এক এক দু দু মাসের ম্যায়াদ বাড়ান; আর শব্‌নমরা ফিরতে পারে না।

সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল।

শব্‌নমদের প্রাচীন ভৃত্য তোপল্‌ খান দু-তিন মাস অন্তর অন্তর একবার করে কাবুল আসে আর শব্‌নমের চিঠি দিয়ে যায়—ডাককে অবিশ্বাস করার তার যথেষ্ট ন্যায্য হক্ক ছিল।

সে চিঠিতে কি ছিল আমি বলতে পারব না। ফার্সীতে ফরাসীতে মেশানো চিঠি। যে শব্‌নম কথায় কথায় কবিতা বলতে পারত সে বিদায়ের সময়কার মত একটি কবিতাও উদ্ধৃত করে নি কিংবা করতে পারে নি। মাত্র একবার করেছিল। তাও আমি আমার চিঠিতে সে-কথায় উল্লেখ করেছিলুম বলে। তখন লিখেছিল ঃ

''আজ্ হুনরে হালে খরাব্‌মমন্ শুদ্ ইস্‌লাহ্ পজীর
হমচু ওয়রানে কি আজ গন্‌জে খুদ্ আবাদ ন্ শুদ্।''
'এত গুণ ধরি কি হইবে বলো দুরবস্থার মাঝে?
পোড়া বাড়িটাতে লুকনো যে ধন—লাগে তার কোনো কাজে?'

আর ছিল কান্না আর কান্না।

প্রত্যেকটি শব্দে, প্রত্যেকটি বাক্যে। এমন কি আমাকে খুশি করবার জন্যে যখন জোর করে কোন আনন্দ ঘটনার খবর দিত তখনও সেটি থাকত চোখের জলে ভেজা।

থাক্। আমার এ গুপ্তধনে কী আছে তার সামান্যতম ইঙ্গিত আমি দেব না। এখন এটি আমার চোখের জলে ভেজা।

এক বছর ঘুরে যাওয়ার পর আমি একদিন রোজা করলুম। সন্ধ্যার সময় গোসল করে, সামান্য ইফ্‌তার (পারণা) করে নমাজে বসলুম। দুপুর রাত্রে ঘুমুতে গেলুম। স্বপ্নে সত্যপথ নিরূপণের এই আমাদের একমাত্র পন্থা।

স্বপ্নাদেশ হল, কান্দাহার যেয়ো না। ভোর রাত্রে।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত। আমি ভেবেছিলুম, কোন আদেশই পাব না এবং বিবেককে সেই পন্থায় চালিয়ে দিয়ে আমি কান্দাহারের পথ নেব।

অবশ্য কুরান শরীফে এ প্রক্রিয়ার উল্লেখ নেই। কাজেই না মানলেও কোন পাপ হবে না। কোন কোন মৌলানা এ প্রক্রিয়া অপছন্দও করে থাকেন।

এমন সময় আব্দুর রহ্‌মান এসে ঘরে দাঁড়াল। আমি তার দিকে তাকালুম। বললে, 'কাল আমি কান্দাহার যাবার অনুমতি চাই।'

আব্দুর রহ্‌মান সেই যে পাগমানে গোড়ার দিকে একদিন বলেছিল আওরঙ্গজেব-পরিবার কাবুল চলে গিয়েছেন তারপর সে ওই বিষয়ে একটি কথাও বলে নি।

আমি শুধালুম, 'কেন?'

'ওখানে আমার এক ভাগ্নে আছে। তোপল্ খান দু-মাস হল আসে নি।'

এ দুটো কথাতে কি সম্পর্ক আছে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।—একটু চিন্তা করে স্থির করলুম, আব্দুর রহ্‌মানকে দিয়ে চিঠি লিখে কান্দাহার আসবার অনুমতি চাইব, আর আজ রাত্রে যদি কোন প্রত্যাদেশ না আসে তবে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেও পারি। আব্দুর রহ্‌মান চলে গেল।

আমি নত মস্তকে শ্লথ গতিতে টেবিলের দিকে চললুম, চিঠিখানা তৈরি করে রাখতে। এই এক বৎসর আমি ফার্সী শিখেছি প্রাণপণ---সেই ছিল আমার বিরহে সান্ত্বনার তীর্থ—তবু চিঠি লিখতে সময় লাগে।

টেবিলের কাছে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি, শব্‌নম।

দুই

পরে শব্‌নমের কাছ থেকেই শুনেছি, আমি নাকি জাত-ইডিয়টের মত শুধু বিড়বিড় করে কি যেন একটা প্রশ্ন বার বার শুধিয়েছিলুম। 'তুমি কি করে এলে? আমি তো কোন শব্দ শুনি নি। তুমি কি করে এলে? আমি তো কোন শব্দ শুনি নি।' আমার বিস্ময় লাগে, এইটেই কি আমার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল!

অপমানিত, পদদলিত, ব্যঙ্গ-কশাঘাতে জর্জরিত নিরাশ দীনহীন জনকে যদি রাজাধিরাজ ধর্মরাজ সহসা আদর করে ডেকে নিয়ে সিংহাসনের এক পাশে বসান তখন তার কি অবস্থা হয়?

আশৈশব অপমানিত, যৌবনেও আপন নীচ-জন্ম সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন সূতপুত্র কর্ণ যেদিন মহামান্যা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠা কুন্তীর কাছে শুনতে পেলেন তিনি হীনজন্মা নন, তখন তাঁর কি অবস্থা হয়েছিল?

শব্‌নম এতটুকু বদলায় নি। সৌন্দর্যহর কাল যেন তার সমুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। গাত্রস্পর্শ করতে পারে নি। যাবার দিন যে রকমটি দেখেছিলুম, ঠিক সেই রকম। আমার বুকের ভিতর যে ছবি আমি এতদিন হিয়ার রক্ত দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলুম সে যেন আজ মুক্তিস্নান সেরে আমার সমুখে দেখা দিল। তার মুখে সব সময়েই শিশির-মধুমাস, আফগানিস্থান-হিন্দুস্থান বিরাজ করত; কপাল আফগানিস্থানের শীতের বরফের মত শুভ্র আর কপোল বোলপুরের বসন্ত কিংশুকের মত রাঙা। হুবহু সেই রকমই আছে।

শুধু কোথায় যেন তবু পরিবর্তন হয়েছে। চোখে? সেইখানেই তো সর্বপ্রথম পরিবর্তন আসে। না। ঠোঁটের কোণে? না। গালের টোল ভরে গিয়েছে? না। সর্বসুদ্ধ? তাও না।

অকস্মাৎ বুঝে গেলুম ওর ভিতর আগুন জ্বলছে। সে আগুন সর্বাঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আমার কাছে এসে, দুহাত আমার কাঁধে রেখে মস্তকাঘ্রাণ করল। বনবাসমুক্ত রামচন্দ্রকে কৌশল্যা যে-রকম মস্তকাঘ্রাণ করেছিলেন।

বললে, 'ছিঃ! তুমি রোগা হয়ে গিয়েছ।'

বুঝলুম, ওকে পুড়িয়েছে বেশি। এবং সইবার শক্তিও তার অনেক, অনেক বেশি আমার চেয়ে। হৃদয়ঙ্গম করলুম, ওর কথাই ঠিক। ওর ব্যাকুলতাই বেশি। এ জীবনে বিশ্বাস ওকেই করতে হবে। মরুভূমিতে মাত্র দুজনার এই কাফেলাতে সে-ই নিশানদার সর্দার।

বড় ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, 'আমাকে একটু ঘুমুতে দেবে?'

ঘুঙুরওয়ালা চরণচক্রপরা বাড়ির নতুন বউ চলাফেরা করার সময় যে রকম দক্ষিণী বীণা বাজে, ওর গলার শব্দ সেই রকম।

শুয়ে পড়ে একটি অতি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি কিন্তু কোথাও যেয়ো না।'

আশ্চর্য এ আদেশ! আমি আবার যাব কোথায়? তখন বুঝলুম, যে-আদেশ দেবার পূর্বেই প্রতিপালিত হয়ে গেছে সেইটেই সত্যকার আদেশ, যে বাক্য অর্থহীন সেইটেই সব অর্থ ধরে।

তবে শুনেছি, স্বয়ং লক্ষ্মী এলেন ভাগ্যহীন চাষার কপালে ফোঁটা দিতে। সে গেল নদীতে মুখ ধুতে। ফিরে এসে দেখে তিনি অন্তর্ধান করেছেন। ওরে মূর্খ, ঘামে ভেজা কাদা-মাখা কপালেই তখন ফোঁটা নিয়ে নিতে হয়। এক বছরের অবহেলায় গৃহ শ্রীহীন। তাই বলে আমি কি এখন ছুটব ডেকোরেটরের দোকানে!

শব্‌নমের ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছিল। তারপর সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি জানি, রোমান্টিকেরা, আমার তরুণ বন্ধুরা, মর্মাহত হবেন। দীর্ঘ অদর্শনের পর এই অপ্রত্যাশিত মিলন; আর একজন গেলেন ঘুমুতে। আর আমি কি করলুম? সত্যি বলছি, একখানা বই নিয়ে পড়তে লাগলুম। এক ঘণ্টা পরে দেখি, এক বর্ণও বুঝতে পারি নি। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান? এক ঘণ্টারও বেশি সে ঘুমিয়েছিল। কতদিনের জমানো ঘুম কে জানে? কত দুশ্চিন্তা, কত দুর্ভাবনা সে ওই ঘুমে চিরকালের তরে গোর দিতে চায় কে জানে? ঘুম থেকে উঠে চুপ করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি লাজুক ছেলে বিপদে পড়লে যে রকম হয় সেই গলায় বললুম, 'কিছু বলছ না যে?'
বললে—

'''ওয়াসিল্ হরফ্-ই চুন্ ও চিরা বস্তে অস্ত্‌লব্
চুন রহতমাম গশ্‌ৎ জর্স বি-জবান শওদ।

কাফেলা যখন পৌঁছিল গৃহে মরুভূমি হয়ে পার
সবাই নীরব। উটের গলায়ও ঘণ্টা বাজে না আর।'''

বড় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। যা বললে তাব ভিতরই তার প্রতিবাদ বয়ে গিয়েছে। নিজের নীরবতা বোঝাতে গিয়ে শব্‌নম সরব হয়েছে। আর শুধু কি তাই? সেই পুরনো শব্‌নম—যে কবিতা ছাড়া কথা কইতে পাবে না। যে পরওয়ানা প্রদীপের পানে ধায় না সে আবার পরওয়ানা! পরক্ষণেই বললুম, হে খুদা, এ কি অপয়া চিন্তা এনে দিলে আমাব মনে—এই আনন্দের দিনে? মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপলুম।

শুনতে পেয়েছে। শুধালে, 'কি বলছ?'

আমি পাছে ধরা পড়ে যাই তাই বললুম, 'তুমি ঘুমোবার আগে আমাকে কি যেন বলছিলে?'

'ও! বাড়ি ছাড়তে বাবণ কবেছিলুম, আর বলেছিলুম—

'''দীরূনে খানা-ই খুদ্ হর্ গদা শাহানশাহ্-ইস্ত্
কদম্ বারূন মনহ্ আজ হদ্দ-ই-খওয়িশ ও সুলতান বাশ্।

ভিখারী হলেও আপন বাড়িতে তুমি তো রাজার রাজা—
সে রাজ্য ছেড়ে বাহিরিয়া কেন মাত্র শুধু রাজা সাজা!'''

'কী রকম?'

'এই মনে কব ইরানের শাহ্-ইন্‌শাহ—রাজার রাজা, মহারাজা। তিনি যদি আজ এদেশে আসেন তবে আমরা বলব ইবানের শাহ্—রাজামাত্র। কারণ আমাদের তো রাজা রয়েছেন। আমাদের শাহের তিনি তো শাহ্ নন।'

'আর যদি বশ্যতা স্বীকার কবেন?'

'কী বোকা!'

'হ্যাঁ! যেমন মনে কর তুমি তোমার আপন বাড়িতে অন্য অনেক জনের ভিতর শাহ্‌জাদা, কিংবা শাহজাদী, কিংবা ধরলুম শাহই। কিন্তু এ বাড়িতে তুমি শাহ্ ইন্ শাহ্—মহারাজা।'

'ওতে আমার লোভ নেই।'

আমি দুঃখ পেলুম।

বললে, 'ওরে বোকা, ওরে হাবা, ওইখানে, ওইখানে'—বলে তার আঙুল দিয়ে আমার বুকের উপর বার বার খোঁচা দিতে লাগল। তারপর বললে, 'এবারে তুমি বড় লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গিয়েছ। এখনও একটা ফরিয়াদও কর নি।'

'করি নি? তা হলে কি করেছি এতদিন, প্রতি মুহূর্তে? হাফিজ সেটা জানতেন না? আমার হয়ে সেটা করে যান নি?—

'''তুমি বলেছিলে 'ভাবনা কিসের? আমি তোমারেই ভালবাসি;
আনন্দে থাকো, ধৈর্য সলিলে ভাবনা যে যাক ভাসি।'
ধৈর্য কোথায়? কিবা সে হৃদয়? হৃদয় কাহারে কয়?
সে তো শুধু এক বিন্দু শোণিত আর ফরিয়াদ-রাশি।'''

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, 'ফরিয়াদ রাশি' নয়, আছে 'ভাবনার রাশি'।'

আমি বললুম, 'সে কি একই কথা নয়?'

বললে, 'কথাটা ঠিক। হৃদয় মানেই চিন্তা, ভাবনা, ফরিয়াদ—অতি কালেভদ্রে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা—। সেই সান্ত্বনাটুকু না থাকলেই ভালো হত। বেদনাবোধটা হয়তো আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যেত। কিস্মতের এ কী বিঘ্নসন্তোষী প্রবৃত্তি! নিরাশায় নুয়ে নুয়ে গাছটা মরে যাচ্ছে। মরতে দে না। তা না হলে তো বাঁচি। না; তখন দেবে সান্ত্বনার এক ফোঁটা জল। আবার বাঁচ, আবার মর। যেন বেলাভূমির সঙ্গে তরঙ্গের প্রেম। দূর থেকে সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে হেসে আসে, আবার চলে যায়, আবার আসে, আবার যায়।' হঠাৎ হেসে উঠে বললে, 'কিন্তু আমি শতবার মরতে রাজী আছি—একবার বাঁচবার তরে।' এটা যেন আপন মনের কথা। তারপর আমাকে শুধালে, 'এখন ফরিয়াদ কবছ না কেন?'

আমি বললুম, 'কাজল যতক্ষণ দূরে থাকে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে ফবিযাদ—সে কালো। চোখে যখন মেখে নিই তখন তো তাব কালিমা আব দেখতে পাই নে। সে তখন সৌন্দর্য বাড়ায়। এটা আমার নয়—কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত তিরুবল্লুবেরের।'

'চমৎকার। আমাদেরও তো সুর্মা আছে, কিন্তু কেউ কিছু লিখেছে বলে তো মনে পড়ছে না। আরও একটা বল।'

'ওঁর কাব্য তো আমি সঙ্গে আনি নি। আচ্ছা দেখি।' একটু ভেবে বললুম, 'নিঠুর প্রিয়ের সম্বন্ধে প্রিয়া বলছেন, "সে আমার হৃদয-বাড়িতে দিনে ঢোকে অন্তত লক্ষ বাব কিন্তু তার বাড়িতে কি আমাকে একবারও ঢুকতে দেয়? আমিই তাকে স্মবণ করি লক্ষ বাব, সে একবারও করে না।"'

হঠাৎ দেখি শব্‌নম গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কবিতাটি ভাল হোক মন্দ হোক এতে তো গম্ভীর হওয়ার মত কিছু নেই।

কান্নার সুরে বললে, 'আমার বাড়িতে নিয়ে যাই নি—তোমাকে? কবে যাবে বল?'

আমি প্রথমটায় বুঝতে পারি নি 'বাড়ি' বলতে সে 'হৃদয়' বুঝেও সত্যকার আপন বাড়ি বুঝেছে।

আমি কাণ্ডজ্ঞান হাবিয়ে তার দু হাত চেপে ধবলুম। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরল না। কি যেন একটা 'হারাই হারাই' ভাব বুকটাকে ঝাঁঝবা কবে দিলে। আবার কথা বলতে গেলুম, পাবলুম না।

আস্তে আস্তে তার হাত দুটি ছাড়িয়ে নিয়ে আমার হাতের উপর বুলোতে বুলোতে বললে, 'আমি পাগল, না, কি? বন্ধু, তুমি কিছু মনে করো না। এই এক বছর ধরে—'

বাধা দিয়ে অতি কষ্টে বললুম, 'আমার উপর মেহেরবান হও—প্রসন্ন হও। আমি কি জানি নে আমি কত অভাজন। তুমি এ শহরে—'

এবারে হেসে উঠে বাধা দিয়ে বললে, '—সবচেয়ে সুন্দরী (আমি কিন্তু তার কুল-গোষ্ঠীর কথা বলতে যাচ্ছিলুম)। না? আমি কুৎসিত হলে তুমি আমায় ভালবাসতে না—সে তো কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু আমি মাঝারি হলে কি করতে, বল তো?'

আমি ঝড় কাটাতে ব্যস্ত। হালের সঙ্গে পাল। বললুম, 'এ রকম প্রশ্ন আমি কোনও বইয়ে পড়ি নি। সাধারণত মেয়ে শুধায়, সে সুন্দরী না হলে ভালবাসা পেত কি না?'

'উত্তর দাও।'

'আমি নিজে তো মাঝারি। তুমি তো বেসেছ। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তুমি তুর্কী রমণী। তুমি—'

'ব্যস্, ব্যস্, থাক্ থাক্। এবার এদিকে এস। আমার ব্যাগটা খোল তো। হ্যাঁ ওই রুমালে বাঁধা জিনিস।'

সামনের টেবিলে সেটি রেখে রুপোতে সিল্কেতে কাজ করা কিংখাপের রুমালের গিঁট আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে খুলতে লাগল—যেন তীর্থের প্রসাদী। আমি এক দৃষ্টে দেখছিলুম, তার আঙুলের খেলা। প্রত্যেকটি আঙুল যেন এক একটি ব্যালে নর্তকী। হাতের কব্‌জি দুটি একদম নড়ছে না—আঙুলগুলো এখানে যায়, সেখানে যায়, একটা অসম্ভব অ্যাঙ্গল করে চট করে আরেক অসম্ভব অ্যাঙ্গেলে চলে যায়। পিয়ানো বাজানো এর কাছে কিছুই নয়; সে তো শুধু ডাইনে বাঁয়ের নড়ন চড়ন।

দুখানা রুমাল খোলার পর বেরল গাঢ় নীল রঙের চামড়ায় বাঁধানো একখানি ছোট্ট বই। চামড়ার উপর সূক্ষ্ম সোনালী কাজ। চার কোণ জুড়ে ট্যারচা করে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল-লতা-পাতার নক্‌শার কাজ—তারই মাঝে মাঝে বসে আছে ক্ষুদে ক্ষুদে পাখি। বইয়ের মাঝখানে একটি জোরালো গোল মেডালিয়ন, নামাঙ্কন-স্বাক্ষরলাঞ্ছন সহ।

বললে, 'আরও কাছে এস।'

আঙুলের ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে এক একটি করে পাতার প্রান্ত বুলিয়ে সেটিকে উল্টোয় আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে যেন একটি করে নূতন বাগান। পাতার মাঝখানে কুচকুচে কালো কালিতে হাতের লেখা ফার্সী কবিতা আর তার চতুর্দিকের বর্ডারে আবার সেই লতা আর পাখির মতিফ। অতি ছোট্ট ছোট্ট গোলাপী রজেটের পাশে ডালের উপর বসে ক্ষুদে ক্ষুদে বুলবুল। কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে লতার উপর দুলছে, কখনও বা ঘাড় নিচু করে গোলাপ কুঁড়ির সঙ্গে কানে কানে কথা কইছে। সখী, জাগো, জাগো। পাঁচ ছটা রঙের এক সপ্তকেই সঙ্গীত বাঁধা হয়েছে, কিন্তু আসল পকড়্ সোনালী, নীল আর গোলাপীতে।

বললে, 'লেখাটা করে দিয়েছেন আগা-ই-আগা ওস্তাদ সির্‌-বুলন্দ্ কিজ্‌ল্‌বাশ। উনিই আমাদের শেষ জরীন্ কলম, সোনার কলমের মালিক। তাঁর ছেলে পর্যন্ত হিন্দুস্থান চলে গিয়েছে ছাপাখানার কাজ শিখতে!' একটি ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

প্রতি দু পাতার মাঝখানে এক একখানি করে অতি পাতলা সাদা কাগজ। আতর মাখানো।

বুঝিয়ে বললে, 'পোকায় কাটবে না আর আতরের তেলের স্নেহ কাগজকে শুকনো হতে দেবে না।' আমার মনে পড়ল সত্যেন দত্তের ফার্সী কবিতার অনুবাদ।

'তবু বসন্ত যৌবন সাথে দু'দিনেই লোপ পায়
কুসুমগন্ধী যৌবন পুঁথি পলে উলটিয়া যায়।'

আবার এ কী অপয়া বচন? না, না। সৃষ্টির প্রথম দিনের প্রথম বুলবুলের সঙ্গে প্রথম গোলাপের মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণীর কানাকানি এখনও আছে, চিরকাল থাকবে।

শব্‌নম কিন্তু কিন্তু করে কি যেন বলতে চাইছে, বলছে না। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সে-মুখ একেবারে সিঁদুরের মত টকটকে।

আমি তাকাতেই সেই মুখে যেন ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। শব্‌নমের মুখে শব্‌নম! ঘাড় ফিরিয়ে অপরাধীর মৃদুকণ্ঠে বললে, 'আর বর্ডারগুলো আমার আঁকা।'

বলেই ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে।

আমি হরিণশিশুকে নর্‌গিস বনের ভিতর দিয়ে নাচতে দেখলুম। আমার বুখারা-কার্পেট ছিল নর্‌গিস মতিফ।

সিঁড়ির মুখে গিয়ে হাঁকালে, 'আগা আব্দুর রহ্‌মান। চা খাবে?'

আব্দুর রহ্‌মান হুঙ্কার ছাড়লে, 'চশ্‌ম্!'—যেন হুকুমটা কান্দাহার থেকে এসেছে, জবাব সেখানে পৌঁছনো চাই।

কী সৌজন্য! 'চা খাবে?'—'চা আন', নয়। অর্থাৎ 'তুমি যদি খাও, তবে আমিও যেন এক পেয়ালা পাই।' ভৃত্যকে সহচরের মত মধুর সম্ভাষণ। আর আমার আব্দুর রহ্‌মানও কিছু কম নয়।

'চশম'—অর্থাৎ 'আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছা আমার 'চশ্‌ম', চোখের মত কিম্মৎবার, মূল্যবান।'

আমার মূল বিস্ময় কিন্তু এতে তো চাপা পড়ে না।

'তুমি এঁকেছ?'

নীরব বীণা।

'তুমি এঁকেছ?'

যেন অতি দূরে সে বীণার প্রথম পিড়িং শোনা গেল। 'বড় কাঁচা।'

আমি সপ্তমে বললুম, 'কাঁচা? আশ্চর্য! কাঁচা? তাজ্জব! ক-টা ওস্তাদ এ রকম পারে?'

এবারে কাছে এসে হেসে বললে, 'তুমি কিছু জান না। তাই তোমাকে কবিতা শুনিয়ে সুখ, তোমাকে ছবি দেখিয়ে আনন্দ।'

আমি রাগ করে বললুম, 'তুমি কি আমাকে অজ গাঁইয়া পেয়েছ? দিল্লির মহাফিজখানাতে আমার দোস্ত রায় আমাকে কলমী কিতাব দেখায় নি?'

আমাকে খুশি করার জন্য বললে, 'তাই সই, তাই সই ওগো তাই সই। কিন্তু আমার ওস্তাদ আগা জমশীদ বুখারী বলেন, "রোজ আট ঘণ্টা করে ত্রিশ বছর আঁকার রেওয়াজ করলে তবে ছবি আঁকার কল রপ্ত হয়। এবং তারপর চলে যাবে চোখের জ্যোতি।" '

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'বল কি?'

'হ্যাঁ। এবং বলেন, "কিন্তু কোনও দুঃখ নেই। তুমি নিজেই জান না তোমার মূল্য কি?"'

'মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে?'

খুশি হয়ে বললে, 'বিলকুল্!—"প্রকৃত জহুরী সমঝে যাবে তোমার প্রথম ছবিতে কোন্ শেষ কথা লুকনো আছে, আর তোমার শেষ ছবির সব মিলে যাবে প্রথম ছবির প্রথম ঠেকায়।" তারপর তিনি খুব জোর দিয়ে বলতেন, "হুনরে যখন পরিপূর্ণতাই এসে গেল তখন আর পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি? এবং যদিস্যাৎ তার পরেও কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যায় তবে সেইটে ভাঙিয়ে খাবে তোমার শিষ্যেরা—তাদের জন্যও তো কিছু রাখতে হয়। তখন তোমার পাকা গম-রঙের বেহালার সুর শোনা যাবে তাদের কাঁচা সবুজ বেহালার রেওয়াজে।" '

আমি বললুম, 'চমৎকার।'

'আমি তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ কণ্ঠস্থ করে রেখেছি।'

আমি শুধালুম, 'কার কাব্য আছে এতে?'

'অনেকের। তোমাকে যেগুলো শুনিয়েছি আর যেগুলো শোনাব। তুমি যে ক-টি বলেছ তাও আছে। তবে বেশির ভাগ আবু তালিব কলীম কাশানীর। ইনি আসলে ইরানী কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাদের বাদশা জাহাঙ্গীরের সভাকবি হন। আর আছে সাঈব্ তবরীজীর। ইনিও হিন্দুস্থানে কিছুকাল ছিলেন—কলীমের বন্ধু। তখন ইরানে রব উঠেছে—

"সকল মাথায় তুর্কী নাচন তোমার লাগি, প্রিয়ে,
লক্ষপতি হবে সবাই হিন্দুস্থানে গিয়ে!"

এসব আমি এবারে কান্দাহারে শিখেছি। পরে বলব।'

বললে, 'তুমি কখনও জানবে কি, বুঝবে কি, ছবি আঁকার সময় প্রতিটি মুহূর্তে তুমি আমার সামনে ছিলে? প্রতিটি তুলির টানে আছে তোমার চুল, প্রতিটি বাঁকা রেখায় আছে তোমার ভুরু। তোমার হাসি থেকে নিয়েছি গোলাপী, তোমার স্বর থেকে নিয়েছি রূপালী।'

আমি বললুম, 'দয়া কর।'

'আমায় বলতে দাও। এই একবারের মত।'

'শেষ বুলবুলের চোখ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে জানেমন্—বড় চাচা—ঘরে ঢুকে বললেন, "চলো মুসাফির, বাঁধ গাঁটুরিয়া, বহুদূর জানে হোয়েগা।" কাল সকালেই কাবুল যাত্রা। বাদশা আপন

গাড়ি পাঠিয়েছেন। তাঁর সবুব সইছে না। তাই তো তোমাকে খবর দিতে পারি নি।'

আব্দুর রহ্‌মান চা নিয়ে এল। শব্‌নম বললে, 'আগা রহ্‌মান, তুমি তোপল্ খানকে প্রতিবারে কোর্মা-কালিয়া খাইয়েছ আর সিনেমা দেখিয়েছ। খুদা তোমার মঙ্গল করুন। এদিকে এস। এই নাও। কান্দাহার থেকে এনেছি।'

ব্যাগ খুলে শব্‌নম বের করলে তাবিজের মত ছোট্ট একখানি কুরান্ শরীফ। সঙ্গে আতশী কাচ। তাই দিয়ে পড়তে হয়।

আব্দুর রহ্‌মান নিচু হয়ে হাত ছুঁইয়ে হাতখানি আপন চোখে চেপে ধরল। তারপর কুরান্‌খানি দু-হাতে মাথার উপর তুলে ধরে আস্তে আস্তে চলে গেল। তার মুখের ভাব কি করে বর্ণাই! জোয়ানের ইয়া ব্বড়া মুখখানা যেন কচি শিশুর হাসিমুখে পরিণত হল।

কী অসাধারণ বুদ্ধিমতী এই শব্‌নম। জানত, অন্য কিছু আব্দুর রহ্‌মানকে গছানো যাবে না।

শব্‌নমের আঁকা বর্ডার দেখতে গিয়ে সে শুধালে, 'আচ্ছা বল তো, এই বুলবুলের নাম কি?'

আমি বললুম, 'বুলবুল তো এক রকমেরই হয়।'

'এই বুলবুল, এ বইয়ের সব বুলবুল শব্‌নম। বুলবুল এসেছিল বাগানে, সে-ই প্রথম গোলাপকে প্রেম নিবেদন করবে। এসে দেখে গোলাপ আগের থেকেই বাতাসে বাতাসে তার প্রেমের বারতা বিছিয়ে রেখেছে। গোলাপের কাছে পৌঁছবার বহু পূর্বেই সে সৌরভের ডাক শুনতে পেল, "এস এস, প্রিয়া।" মনে আছে?'

'তুমি কেন দুঃখ কর, বুলবুল? শব্‌নম যদি সমস্ত রাত গোলাপের উপর অশ্রুবর্ষণ না করত তবে কি ফুটতে পারত?'

জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'সেই ভালো, ওগো শব্‌নমের-নিশির স্বপ্ন। এই নাও তোমার বই।'

আমি প্রতিবাদ করেছি।

শান্ত কণ্ঠে বললে, 'এতে আছে আমার চোখের ঝরা জল। সে জল তো আমি চোখে পুরে নিতে পারব না। এই জল দেখে যখন তোমার চোখে জল টলটল করবে তখনই তো এ তার চরম মূল্য পাবে।'

আমি বইখানা দুই হাত দিয়ে তুলে ধরে ঠোঁট চেপে চুমা দিলুম—

কিন্তু আমার চোখ দুটি অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে।

শব্‌নম আস্তে আস্তে, অতি ধীরে ধীরে, ঘাড় ঘোরালে। তার চোখে ছিল স্বচ্ছ জলের অতল রহস্য।

আমি বললুম, 'কিন্তু বন্ধু, তুমি তো এর আগেই আমাকে সওগাত দিয়েছ।'

অবাক হয়ে বললে, 'কখন?'

'প্রথম রাত্রেই।' বলতে বলতে আমি ওয়েস্ট কোটের বুক পকেট থেকে বের করলুম একটি সোনার ভিজিটিং-কার্ড কেস। এটি আমি সওগাত রাখবার জন্য প্যারিস থেকে আনিয়েছিলুম। শব্‌নমের হাতে দিলুম।

সে খুলে দেখে ভিতরে একখানি ভিজিটিং-কার্ড। সেই কার্ডে অতি সযত্নে জড়ানো একগাছি চুল।

'চোর চোর' বলে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ওস্তাদ সেতারী বাজন আরম্ভ করার পূর্বে যে রকম সব কটা ঘাটের উপর টুংটাং করে হাত চালিয়ে নেন সেইরকম পর্দার পর পর্দা হাসলে। বললে, 'তাই বল। আমি পরদিন সকালবেলা চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখি একগাছা চুল কম। খোঁজ খোঁজ, ঢোঁড় ঢোঁড় রব পড়ে গেল চতুর্দিকে। শাজাদীর একগাছা চুল চুরি গেছে। বাদশা জানতে পেরে কোটালকে ডেকে কোফতা কাবাব করেন আর কি। আমি স্বয়ং গেলুম টেনিসকোর্টে, তারপর গেলুম হোটেলে, তোমার ঘরে—'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমার ঘরে?'

'হ্যাঁ রে, জান্, হাঁ। আমার জান্ গিয়েছিল। তখন আকাশে আদম সুরৎ—কালপুরুষ। তারপর মেঘ। তারপর বৃষ্টি। আমার জান্ ভিজে নেয়ে বাড়ি ফিরল। সেই হৃদয়—যাকে তুমি বল, "সে তো একবিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি"।'

'তাই বল! আমি ভেবেছিলুম, তোমার চোখ থেকে ভানুমতী বেরিয়ে কালপুরুষের আয়োনোস্ফিয়ারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে ঢুকল আমার চোখে।'

'ওরে খোদর সিধে, তাহলে যে এ ব্রহ্মাণ্ডে যত লোক তাকিয়েছিল—' হঠাৎ থমকে গিয়ে বললে, 'ওই য্ যা। যে কাজের জন্য এসেছিলুম তার আসলটাই ভুলে গিয়েছিলুম। তুমি বুধবার দিন সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে পারবে? এই ধর, তিনটে নাগাদ।'

আমি বললুম, 'কি যে বল? কিন্তু কেন? আমি যে ভয় পাচ্ছি।'

'এখনও তোমার ভয় গেল না। ওরে ভীরু, আমাকে বিশ্বাস করতে শেখ।'

ব্যাগটা খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলেই বুঝতুম, এবারে তার যাবার সময় এসেছে।

শব্‌নম আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করলে।

আমি কাতর কণ্ঠে বললুম, 'ও-রকম তুমি হঠাৎ যেতে চাইলে আমার বড় বাজে। আমাকে একটু সয়ে নিতে দাও।'

বললে, 'আমি যখন আসি, তখন তো বল না, "বাইরে সিঁড়িতে গিয়ে বস, একটু সয়ে নিতে দাও"।'

তার বিদায়ের বেলা আমার কোন উত্তর জোগায় না।

দেউড়ির কাছে এসে আকাশের দিকে নাকটি তুলে দুবার শ্বাস নিলে। বললে, 'শব্‌নম পডছে।'

এবারে কথা বলার শক্তি দয়াময় দিলেন। বললুম, 'আমাব শব্‌নম যেন মাত্র একটি গোলাপে বর্ষে!'

'গোলাপে ঢুকে সে মুক্তো হয়ে গিয়েছে।'

তিন

আমি রোমান্টিক নই। এ-প্রেম আমার সাজে না। এ-প্রেম তারই জন্য, যে বেদনা সইতে জানে, যে সংগ্রামে ভয় পায় না।

আমি ছেলেবেলা থেকেই ভীরু। কৈশোরে সাহস করে কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে পারি নি। অনাদৃতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কোনও কোনও মেয়ের স্বভাব। তারা যেচে কথা কইলে আমি লজ্জায় ঘেমে নেয়ে কি উত্তর দিয়েছি তা আমি চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারব না।

চণ্ডীদাস পড়ে পেয়েছি ভয়। দিনের পর দিন শ্রীরাধার মত সইতে হবে আমাকে বিরহ দহন? দরকার নেই আমার কানুর প্রেম। গোপিনীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হওয়ার আমার কোনও প্রয়োজন নেই। বনস্পতির গৌরব নিয়ে, উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে, বিদ্যুৎপাত ঝঞ্ঝা-বাত সইবার মত শক্তি আর সাহস আমার নেই। আমি মেহদির বেড়া হয়ে থাকতেই রাজী। আর তিনি যদি তার উপর দয়া করে সাদা-মাটা দু-একটি ফুল ফোটান তবে আমি নিজেকে মহা ভাগ্যবান বলে তাঁকে বার বার নমস্কার করব।

আমি চেয়েছি ঘরের প্রেম, বধূর প্রেম—বঁধুর প্রেম আমি চাই নি। সংসারের অবহেলা অনাদরের মাঝখানে এইটুকু সান্ত্বনা যে, বাড়ি ফিরলে আমি সেখানে সবচেয়ে আদরের ধন। সারা

দিনমান সে আমার সঙ্গে থাকবে স্বপ্নের মত—আমি চলাফেরা করব সেই স্বপ্ন-সম্মোহনে, ঘুমে চলার রোগী যে রকম হাঁটে। আর রাত্রিকালে সে পাশে থাকবে—জানলার কাছে চাঁদ যে রকম অপলক দৃষ্টিতে নিদ্রিতের শিয়রে জাগে।

মণি ভরা, প্রবাল-হার-পরা নীলাক্ষী নীলাম্বুজের ঝড়-ঝঞ্ঝার অশান্তি-ঐশ্বর্য আমি চাই নি। গ্রামের নদীটি পর্যন্ত আমি হতে চাই নি। আমি হতে চেয়েছিলুম বাড়ির পিছনের ছোট্ট পুকুরটি। যেটি আমার বধূর, আমার নির্জনে পাতা সংসারের জননীর একান্ত আপন। সেখানে সামান্যতম তরঙ্গ উঠে আমাকে বিক্ষুব্ধ করে না, আমার বধূকে ভীতার্ত করে না।

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।

তবু ভাগ্যের কাছে স্বীকার করব, এই চল্লিশ ঘণ্টা আমার কেটেছে যেন এক অপূর্ব সঙ্গীতের সুরলোকে। চল্লিশ ঘণ্টার দিগন্তে দেখতে পাচ্ছি, আমার তীর্থাবসানের দবগা-চূড়ো। আর যেতে যেতে দেখছি, পথের দুপাশে কত অতিথিশালার বিশ্রান্তি, কত সাধু-সজ্জন-সঙ্গম, শুনছি মন্দিরের ঘণ্টা, দূর হতে ভেসে আসা ভোরবেলাকার আজান।

এবারে ঘরে ঢুকল ঝড়ের বেগে। যেন আসতে কত দেরি হয়ে গিয়েছে।

আমার সামনে এসে হিন্দুস্থানী কায়দায় নমস্কার-মুদ্রাতে হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'হামি তোঁকে ব্বালোবাসি।'

প্রথমটায় বুঝি নি। তারপর হো হো করে হেসে উঠেছিলুম।

'বুঝেছ?'

আমি বললুম, 'এ তুমি শিখলে কোথায়?'

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললে, 'আমি করলুম প্রেম নিবেদন, আর তুমি হাসলে।' চোখ থেকে আগুন বেরুচ্ছে না বটে, কিন্তু ভেজা দিনের দেশলাইয়ের মত কখন যে জ্বলবে ঠিক নেই।

আমি অতি কষ্টে তাকে শান্ত করলুম।

আমি কি মূর্খ! উচ্চারণ আর ব্যাকরণের দিকে গেল কান?—বক্তব্যটা উপেক্ষা করে গেলুম। ধন্য সেই রাজা যিনি ভিখারিনীর ছেঁড়া কাপড় দেখেন নি—দেখেছিলেন তার মুখ, তার হৃদয়, আর তাকে বসিয়েছিলেন সিংহাসনে। আমি আহাম্মুক, শাহজাদীকে দেখছি ভিখারিনীর বেশে।

নিজের গালে চড় মেরেছি বহুবার—একবার মারলুম লাথি!

বললে, 'হিংসে হল না কেন তোমার? কোনও ইয়াংম্যান্ আমাকে শিখিয়েছে সেই সন্দেহে?'

আমি বললুম, 'সে বাঙালী ইয়াংম্যান্ নয়।'

হার মেনে বললে, 'কান্দাহারে আমাদের এক চাপরাসী ছিল—সে যৌবনে কল্‌কাত্তায় নোকরী করত। তার কাছ থেকে শিখেছি।'

শব্‌নম ভালো করে উচ্চারণটা শিখল। কারণ এই কথাগুলো শুদ্ধভাবে বাঙলাতে বলতে বা উচ্চারণ করতে কোনও কাবুলীর অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। শুধু বাধল গিয়ে 'ভ' অক্ষরে। ভারতবর্ষের বাইরে মহাপ্রাণ বর্ণ নেই বললেও চলে—এমনকি দক্ষিণ ভারতেও নেই।

শেষটায় যখন বললুম 'ঠিক' তখন ভারী খুশি হল। শুধালে, 'আর তো তোমার কোনও ফরিয়াদ নেই?'

আমি চিন্তা করে বললুম, 'আমার আর কোনও ফরিয়াদ নেই। ভবিষ্যতেও থাকবে না।'

সন্দেহ নয়নে তাকিয়ে শুধালে, 'হঠাৎ?'

'হঠাৎ-ই। কাল রাত্রে মনে পড়ল একটি সংস্কৃত শ্লোক ঃ—

"শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো।
উভয়োর্দুঃখ দায়িত্বং কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ?

শত্রুর মিলনে মনে অতি কষ্ট হয়
বন্ধু বিচ্ছেদে হয় কষ্ট সাতিশয়।
উভয়েই বহু কষ্ট দেয় যদি মনে
শত্রু মিত্রে কিবা ভেদ তবে এ ভুবনে?'

(কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্রের অনুবাদ)

শব্‌নম বললে, 'পয়লা নম্বরী প্যারাডক্স্। এরপর আর কোনও ফরিয়াদ থাকার কথা নয়।' তারপব চিন্তা করতে করতে বললে, 'কিন্তু এর উত্তরটা কি?'

'তুমি বল।'

'দোস্ত মঙ্গল কামনা কবে, দুশমন বিনাশ কামনা কবে। আমি কামনাটা বড় করে দেখি। ফলটা অত বড় করে না।'

আমি বললুম, 'শাবাশ। দোস্ত-ই-কান্-ই-মন্—আমার দিলেব দোস্ত—শাবাশ। হিন্দুস্থানেব ধর্মগুরুও বলেছেন, মা ফলেষু কদাচন।'

আরও কিছু কথা হল।

আজ কিন্তু সমস্তক্ষণ লক্ষ করছিলুম, আজ যেন শব্‌নমেব মন অন্য কোনখানে। হয়তো কোনও কথা বলতে চায় কিংবা শুধাতে চায়।

এমন সময় বাস্তায় হঠাৎ চেঁচামেচি আর আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এত জোর যে আমরা দুজনেই শুনতে পেলুম। শব্দটা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল দেখে আমি একটু উৎকণ্ঠিত হলুম। এমন সময় দূর হতে একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল। দুজনাতে নিচে নেমে খবব নিয়ে জানা গেল, ডাকাতেব সর্দার বাচ্চায়ে-সকাও কাবুল আক্রমণ করতে এসেছে। আমানুল্লাকে তাড়াবে।

আফগানিস্থানের এ অধ্যায় বিস্ময়জনক। যে কোনও প্রামাণিক ইতিহাসে পাওযা যায়। এক বাঙালী মুসলমানও এ বিষয়ে লিখেছেন।

শব্‌নম আমাকে হাত ধরে উপরে নিয়ে এল।

ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘন ঘন পায়চাবি কবতে লাগল। একবাব বললে, 'আমানুল্লাকে বাবা বার বার বলেছেন, তিনি বারুদের পিপের উপব বসে আছেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে চান নি। যাক্‌গে, আমার তাতে কি?'

এ রকম আর্তনাদ আর গুলির আওয়াজ মেশানো অট্টরোল আমি জীবনে কখনও শুনি নি। একবার ভাবলুম, শব্‌নমকে বলি, আমি আর আব্দুর রহ্‌মান তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি কিন্তু সে সঙ্কটে আমার সত্য কর্তব্য কি, কিছুতেই স্থির করতে পারলুম না। ঘরের চেয়ে রাস্তা যে বেশি বিপজ্জনক। ওদিকে আবার শব্‌নমের আপন ভদ্রাসন নিশ্চয়ই আমার বাড়ির চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষিত। কি করি?

শব্‌নম পায়চারি করছে। আপন মনে বললে, 'কেউ জানতো না। বাবাও জানতেন না।'

পায়চারি বন্ধ করে বললে, 'শুনতে পাচ্ছ, বন্দুকের শব্দ এগিয়ে আসছে?'

বহু দূরের বন্দুকের শব্দ এগিয়ে আসছে না পিছিয়ে যাচ্ছে বোঝবার মত সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি সৃষ্টিকর্তা নিরীহ বঙ্গসন্তানকে দেন নি।

শব্‌নম আবার বললে, 'আমার তাতে কি?'

আমি তার মানে বুঝতে পারলুম না।

আধঘণ্টার উপর হয়ে গিয়েছে—প্রথম বন্দুকের আওয়াজ শোনার পর।

এমন সময় তোপল্‌ খান এসে ঘরে ঢুকল। সেলাম করে শব্‌নমকে শুধালে, 'বাড়ি যাবে না, দিদি?'

শব্‌নম বললে, 'যাব। পরে। এখন তুমি নিচে গিয়ে আব্দুর রহ্‌মানের সঙ্গে দেউড়ি দরজার উপর পাথর চাপাও। আর যা-যা সব করতে হয়।'

তোপল্‌ খান যেভাবে ঘাড় নেড়ে চলে গেল তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল শব্‌নমের প্রতি তোপলের নির্ভর মুর্শীদের উপর চেলার বিশ্বাসের মত। ভ্যালে-র কাছে তা হলে হিরোইন হওযাটা অসম্ভব নয়।

শব্‌নমের মুখে হাসি ফুটেছে। আমার একটু দুঃখ হল। আমার গায়ের জোর ওর মত হল না কেন।

শব্‌নম আমার সামনে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'তুমি বড় সবল। ভাবলে, তোপল্‌কে দেখে আমি ভরসা পেলুম। এই বন্দুক পিস্তলের জামানায়? যাকগে।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, 'শোন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

শান্ত কণ্ঠে, আমার চোখে চোখ রেখে বললে, 'আমি স্থির করেছি আমাদের বিয়ে হবে। তুমি?'

ধাক্কাটা কি রকম লেগেছিল আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব না। আমার মুখে কথা ফোটে নি এবং চেহারায় যদি কোনও ভাব ফুটে থাকে তবে সেটা হতভম্বের।

সেই শান্ত কণ্ঠেই বললে, 'তোমার চোখ আমি চিনি। তোমাকে কিচ্ছু বলতে হবে না। এবারে আমি জিতেছি।'

তারপর চেয়ারটা কাছে টেনে এসে আমার দু জানুর উপর দুহাতে ভর করে সামনের দিকে ঝুঁকে বললেঁ, 'এবারে সব কথা শোন।'

আমার মুখ দিয়ে তখনও কথা ফোটে নি।

বললে, 'আমি জানতুম, এর একটা বোঝা-পড়া একদিন করতেই হবে। তাই আজকের দিনটা ঠিক করেছিলুম, আস্তে ধীরে তোমার মনের গতি দেখে, প্রসন্ন মুহূর্তে আমি যে একান্ত সর্বস্বান্ত তোমার হতে চাই সেইটে জানাব। ইতিমধ্যে ডাকু এসে জিনিসটা যেমন কঠিন করে তুলল, তেমনি সহজও করে দিল। এখন কতদিন এ রকম চলবে, কেউ বলতে পারে না! আর সময় নেই। আজই, এখ্‌খুনি আমাদের বিয়ে।'

'হ্যাঁ, এখ্‌খুনি।'

আমি কিছু বলতে চাই নি।

'হ্যাঁ। এখ্‌খুনি। তুমি ভেবেছিলে, আমি উত্তেজিত হয়েছি, ডাকু এসেছে বলে। তা নয়। আমি খুঁজছিলাম বিয়ের দুজন সাক্ষী। আব্দুর রহ্‌মান তো আছেই কিন্তু ভিড় ঠেলে কাকে ডেকে নিয়ে আসি, রাস্তায় এই ভয়ে-পাগলদের ডাকলেও কেউ আসবে না। তোপল্‌ খান আসাতে আমার দুশ্চিন্তার অবসান হল।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি ওজু করে এস।'

মোহগ্রস্তের মত ওজু সেরে বাইরে এসে দেখি, তোপল্‌ আর রহ্‌মানে মিলে ড্রইং রুমের আসবাবপত্র সরিয়ে মাঝখানে আরেকখানা কার্পেট পেতেছে। শুনেছি চাকরবাকরদের বখশিশ দিলে তারা খুশি হয়। এদের মুখে আজ যে বদান্যতা দেখলুম, সে তো লক্ষপতির মুখেও আমি কখনও দেখি নি।

শব্‌নম এক কোণে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে কী যেন পড়ছে। তার মুখচ্ছবি বড়ই শান্ত। আমি কাছে যেতে কী কী করতে হবে বলে দিলে।

দুজনাতে মুখোমুখি হয়ে বসলুম। শব্‌নম মুখের ওপর ওড়না টেনে দিয়ে মাথা নিচু করলে। আমি বলুলম, 'আমি অমুক, অমুকের ছেলে, তুমি অমুক, অমুকের মেয়ে, তোমাকে স্ত্রীধন দিয়ে—'

তোপল্ খান শুধালে, 'স্ত্রীধন কত?'

আমি বললুম, 'আমার সর্বস্ব।'

তোপল্ খান বললে, 'একটা অঙ্ক বললে ভাল হয়।'

আমি জোর দিয়ে আবার বলুলম, 'আমার সর্বস্ব।'

'—স্ত্রীধন দিয়ে মুহম্মদী চার শর্তে তোমাকে স্ত্রীরূপে পেতে চাই। তুমি রাজী?'

এ যেন শব্‌নমের গলা নয়। দূর থেকে ভেসে আসছে, অতি মৃদুকণ্ঠে তার সম্মতি।

তিনবার ওই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হল। তিনবার সে সম্মতি জানালে।

আমি সাক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আপনারা এই বিবাহের শাস্ত্রসম্মত দুই সাক্ষী। আপনারা আমার প্রস্তাব আর মুসম্মৎ শব্‌নম বানুর সম্মতি তিনবার শুনেছেন?'

দুজনাই বললে, 'শুনেছি।'

শব্‌নমের কথা ঠিক হলে আনুষ্ঠানিক বিবাহ এইখানেই শেষ। তোপল্ খান বহু বিয়ে দেখেছে বলে দুহাত তুলে একটা প্রার্থনা করল। আমিও হাত তুললুম। শব্‌নম মাথা নিচু করে একেবারে মাটির কাছে নামিয়ে, দুহাত দিয়ে প্রায় মুখ ঢেকে।

প্রার্থনাতে মাত্র একটি কথা ছিল। 'হে খুদা, আদম এবং হবার মধ্যে, ইউসুখ ও জোলেখার মধ্যে, হজরৎ খাদিজার মধ্যে যে প্রেম ছিল, এ দুজনার ভিতর সেই রকম প্রেম হোক।'

আব্দুর রহ্‌মান উদ্বাহু হয়ে প্রার্থনার সময় জোর গলায় ঘন ঘন বললে, 'আমিন, আমিন— হে আল্লা তাই হোক, তাই হোক।'

আমিন! আমিন!! আমিন!!!

ওরা দুজনে চলে যাওয়ার পর আমি যেখানে ছিলুম সেখানেই বসে রইলুম। কিছুই তো জানি নে তারপর কি করতে হয়। শব্‌নম কিছু বলে নি।

উঠে গিয়ে সামনে বসে বললুম, 'শব্‌নম।'

তাকিয়ে দেখি ওড়না ভেজা।

কিছু না ভেবেই ওড়না সরালুম। সুস্থ বুদ্ধিতে পারতুম না। দেখি, শব্‌নমের চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

শুধালুম, 'এ কী?'

শব্‌নম চোখ মেলে বললে, 'বল।'

তখন দেখি, আমার বলবার কিছুই নেই।

তাকে তুলে ধরে সোফার দিকে নিয়ে যেতে গিয়ে দেখি সেটাকে সরানো হয়েছে। আমি সেদিকে যাচ্ছিলুম। বললে, 'না। ওদের ডাক। তোমার ঘর আমি সেই রকমই চাই।' ঘর ঠিক করা হল।'

বললে, 'তুমি শোও।'

আমার পাশে আধ-হেলান দিয়ে বসে আমার চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে বললে 'ঠিক এ-রকম হবে আমি ভাবি নি। আমি ভেবেছিলুম, হয়তো খানা-পিনা গান-বাজনা বোমা-বারুদ

ফ'টিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা আমি করতে পারব। আর তা সম্ভব না হলে আমি অন্যটার জন্যও তৈরি ছিলুম।'

আমি বললুম, 'এই তো ভাল।'

'সে কি আমি জানি নে? খানা-পিনা বন্ধু-সমাগম হল না, তার জন্যে আমাদের কি দুঃখ? তবে একটা পদ এত বেশি হচ্ছে যে আব সব পুষিয়ে দিচ্ছে। শুনছ শাদির 'শাদিয়ানা'? বোমা-বারুদ? কী রকম বন্দুক মেশিনগানের শব্দ হচ্ছে? আমানুল্লার শালীর বিয়েতেও এর এক আনা পরিমাণও হয় নি। ডাকাত আমাদের বিয়ের শাদিয়ানার ভার নিয়েছে—না? এও তো ডাকাতির বিয়ে!'

আমি কিচ্ছুটি বলি নি। আমার হিয়া কানায় কানায় ভরা। আমার জাহাজ বন্দরে ভিড়েছে। পাল দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হাওয়াকে মুক্তি দিয়েছে। হাল-বৈঠা নিস্তব্ধ। উটের ঘণ্টা আর বাজছে না।

বললে, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।'

এবারে আমাকে মুখ খুলতে হল।

ডান হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে বললে, 'আমার শওহর—স্বামী কথা বলে কম। শোন—

'তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি। তুমি আমাকে কতখানি চাও, সে আমি জানতুম। আরও জানতুম, সর্বশেষ চাওয়া, সমাজের সামনে পাওয়া, তুমি সাহস করে নিজের মনের কাছেই চাইতে পার নি। আমার কাছে বলা—সে তো বহু দূরে। আমার কিন্তু তখন বড্ড কষ্ট হয়েছে। যখন নিতান্ত সইতে পারি নি তখন শুধু বলেছি, আমার কাছে ওষুধ আছে। তুমি নিশ্চয়ই আস্‌মান জমীন হাতড়েছ, কী ওষুধ? তুমি বিদেশী, তুমি কী করে জানবে যে, যত অসুবিধেই হোক্ আমি আমার দেশের, সমাজের সম্মতি নিয়েই বিয়ে করতে চাই। আমার জন্য অতখানি নয়, যতখানি তোমার জন্যে। তুমি কেন ডাকাতের বেশে আমাকে ছিনিয়ে নেবে? মায়-মুরুব্বি-ইয়ার-দোস্ত এবং আরও পাঁচজনের প্রসন্নকল্যাণ আশীর্বাদের মাঝখানে, আমরা একে অন্যকে বরণ করব। গুল বুলবুল এক বাগিচাতেই থাকবে। চতুর্দিকে আরও ফুল আরও বুলবুল। আমি কোন্ দুঃখে আমার শাখা ছেড়ে তোমাকে ঠোঁটে করে নিয়ে মরুভূমির কিনারায় বসব।'

'সমাজ আপত্তি করলে?

'থোড়াই পরোয়া করতুম। ধর্মমতে তুমি আমি, সমাজ কেন, বাপ-মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে করতে পারি। কিন্তু সমাজ কি শের না বাবুর, বাঘ না সিংহ, যে তাকে হামেহাল পিস্তল দেখাতে হবে? সমাজ তেজী ঘোড়া। দানা-পানি দেবে, তার পিঠে চড়বে। বেয়াড়ামি করলে পায়ের কাঁটা দিয়ে অল্প গুঁতো দেবে, আরও বেশি হলে চাবুক, আর একদম বিগড়ে গেলে পিস্তল। তারপর নূতন ঘোড়া কিনবে—নূতন সমাজ গড়বে।'

'আর এখন?'

'এখন তো সব কিছু ফৈসালা হয়ে গেল। প্রথম বলি, কাবুলের সমাজ ঠিক আমাদের সমাজ নয়। আমাদের গুটিকয়েক পরিবার নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সমাজ। সে সমাজ এখন আমাদের আশীর্বাদ করবে। জান, এদেশে এরকম বিশৃঙ্খলা প্রায়ই হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই, শহরে শহরে লড়াই, রাজায় রাজায় লড়াই। রাজায়-ডাকুতে অবশ্য এই প্রথম। তখন ভিন্ মহল্লায় গিয়ে কখনও কখনও পনেরো দিন, এক মাস আটকা পড়ে যেতে হয়। সমাজ শুনে বলবে, "এই তো ভাল। তারা শাস্ত্রানুযায়ী কাজ করেছে।" পরে যখন সমাজপতিরা কানাঘুষো শুনবেন, আগের থেকে মহব্বৎ ছিল, তখন তারা আরও খুশি হয়ে দাড়ি দুলোতে দুলোতে বলবেন, "বেহ্‌তর্ শুদ্, খয়লী বেহ্‌তর্ শুদ্—আরও ভাল। লোকলজ্জার ভয়ে বিয়ে করার চেয়ে দিলের টানে বিয়ে করা অনেক ভাল—বহুৎ বেহ্‌তর্।"

'তুমি কিন্তু ভেবো না, তোমার বাড়িতে পনেরো দিন থাকতে হবে বলে সেই অছিলা

নিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছি। তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি আমার হৃদয়ের হয়ে মনের কাছে প্রস্তাব পেশ করি হোটেলের বারান্দায়। মন বিচক্ষণ জন। সে সায় দিল, অনেক ভেবে চিন্তে—নদী তীরে।

'আর এখন? এখন যে ভূতের নৃত্য আরম্ভ হল তার শেষ কবে কোথায় কে জানে? তাই বিয়েটা চুকিয়ে রাখলুম। ফ্যাতার্কপ্লি। আমার যা করার করা হয়ে গিয়েছে, এখন আর সবাই এর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াক।'

দুঃখ করে ফের বললে, 'ওরা দেখছে আমানুল্লার রাজ মুকুট। ওদিকে তার যে শক্তিক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সেটা কেউ লক্ষ্য করছে না। কবি সাঈব বড় বেদনাতেই বলেছিলেন ঃ

' "মোম বাতিটির আলোর মুকুট বাখানি কবি কী বলে!
কেউ দেখে না তো ওদিকে বেচারী পলে পলে যায় গলে।" '

তারপর শব্‌নমের মনে কী ভাবোদয় হল জানি নে। আমার কানের কাছে মুখ এনে সেটাতে দিল কামড়। বললে, 'ভেবো না। তোপল্ খানের প্রার্থনা তোমার কান কামড়ানোর স্বর্গদ্বার আমার জন্য খুলে দিল। ও জানে না, তুমিও জান না, আমি তার অনেক পূর্বেই স্বর্গের ভিতরে বসে আছি। কিন্তু বন্ধু, আমার মনে সন্দেহ জাগছে, তুমি আমার কথায় কানে দিচ্ছ না।'

আমি খোলাখুলি সব কিছু বলব বলে স্থির করেছি।

বললুম, 'দেখ শব্‌নম—'

'শব্‌নম শিউলি—না,—শিউলি শব্‌নম।'

আমি বললুম, 'শিশির সিঞ্চিত শেফালি—শব্‌নমে ভেজা শিউলি। হিমিকা—

'এটা কী শব্দ?' আগে তো শুনি নি।'

'শব্‌নমের অতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ। হিমালয় জান তো? তারই হিম। বাঙলায় শুধু হিমি।'

'আমার সব চেয়ে পছন্দ হয়েছে, "হিমিকা"।'

আমি বললুম,

"কানে কানে কহি তোরে
বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব হিমিকা নাম ধরে।"

বললে, 'ভারি মধুর। আমার ইচ্ছা হয়, সমস্ত রাত এই রকম কবিতা শুনি। কিন্তু এখন বল, তুমি কী ভাবছিলে।'

'তোমার বাবা কি তোমার জন্য চিন্তিত হচ্ছেন না।' আমি ভয়ে ভয়ে কথাটা তুলেছিলুম। ও যদি কিছু মনে করে। আমার ভয় ভুল।

নিঃসঙ্কোচে বললে, 'আগে হলে বলতুম, তুমি তোমার বাড়ি থেকে আমাকে তাড়াচ্ছ। এখন এটা তো আমাব বাড়ি। এটা আমার আশ্রয়। এক্ষুনি যে মুহম্মদী চার শর্তে আমাকে বিয়ে করলে তার এক শর্ত হচ্ছে স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়া।'

'আপন বাড়িতে আশ্রয় দেব তো বলি নি। সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়।'

চোখ পাকিয়ে বললে, 'এ কী হচ্ছে? চার শর্তের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার পূর্বেই তুমি শর্ত এড়াবার গলি খুঁজছ? তবে শোন, আমার আব্বাজান আমার জন্য এক দানা গম পর্যন্ত ভাববেন না। আমরা দু-দুটো-লড়াই-ফসাদ্ দেখেছি। একবার তিনি আটকা পড়েন। আরেকবার আমি। তিনি বয়েৎ-বাজি (কবির লড়াই) করেছিলেন কোন এক আস্তাবলে আর আমি পাশ বালিশ জাবড়ে ধরে ভঁস্‌ভঁস্ করে ঘুমিয়েছিলুম এক বান্ধবীর বাড়িতে। আসলে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি থাকবে না, যখন শুনবেন, তোপল্ খান বাড়ি ফেরে নি। ষণ্ডা হলে কী হয়, মাথায় যা মগজ তা দিয়ে মাছ ধরার একটা টোপ পর্যন্ত হয় না। এই দেখলে না, আজ সন্ধ্যায় আরেকটু হলে আমাকে কী রকম ডুবিয়েছিল। তুমি বলছিলে, তোমার সর্বস্ব দেবে, স্ত্রীধন হিসেবে, আর ওই অগা তোপল্‌টা কনে পক্ষের সাক্ষী

হয়ে "অঙ্ক" চেয়ে সেটা কমাতে যাচ্ছিল। আব্বা জানতে পেলে ওকে আইসক্রীম-ফালুদা করে ছাড়বেন।'

আমি শুধালুম, 'তিনি জানবেন নাকি?'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয়ই জানবেন। আজ না-হয় না-ই বা জানলেন।'

আমি শুধালুম, 'তখন?'

হেসে উঠে যা বললে সেটি রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর ছন্দে গেঁথে দিয়ে গিয়েছেন ঃ

"ওরে ভীরু, তোর উপরে নেই ভুবনের ভার।"

বললে, 'জানেমন্ জানে আমি প্রেমে পড়েছি। আর কিচ্ছু না। কিন্তু আমার সম্পর্কে এক দিদিমণি আছেন। ফিরিশ্‌তার মত পবিত্র পুণ্যবতী। তাঁকে সব খুলে বলে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি এক লহমামাত্র চিন্তা না করেই বললেন, "যাকে তোর হৃদয় চায় তাকে বিয়ে কব্বার অধিকার তোকে আল্লা দিয়েছে। আর কারও হক্ক নেই তোদের মাঝখানে দাঁড়াবার।" ব্যস। বুঝলে? আমার বাবা আমাকে ভালবাসেন।'

'সর্দার আওরঙ্গজেব খানকে আমি চটাতে পারি, দরকার হলে, কিন্তু আমার শ্বশুর মশাইয়ের বিরাগভাজন হতে চাই নে।'

খুশি হয়ে বললে, 'ঠিক তাই। আমিও তাই চাই বলে এত মারপ্যাচ। কিন্তু এ-বিষয়ে আজ এই শেষ কথা। গ্রামোফোনের এই শেষ রেকর্ড। বুঝলে?'

আর তার কী তুর্কী নাচ! কখনও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে কংগ্রেসী লেকচার দেয়, কখনও ঝুপ করে কার্পেটের উপর বসে দু হাঁটু জড়িয়ে ধরে চিবুক হাঁটুর উপর রেখে, কখনও আর্ম-চেয়ারে বসে আমার জানু জড়িয়ে ধরে আমার হাঁটুর উপর তার চিবুক রেখে, কখনও আমাকে দাঁড় করিয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দুহাত রেখে আর কখনও বা আমাকে সোফায় বসিয়ে একান্তে আমার পায়ের কাছে আসন নিয়ে।

আর ঘড়ি ঘড়ি আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, বল তো, তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস? এক্ খরওয়ার? এক্-ও নীম্ খরওয়ার?—এক গাধা-বোঝাই, দেড় গাধা-বোঝাই? বহ্‌র-ই-হিন্দ্— ভারত সাগরের মত? খাইবার পাসের যত আঁকাবাঁকা না দারুল-আমানের রাস্তার মত নাক-বরাবর সোজা? তোমার হিনিকার—ঠিক উচ্চারণ করেছি তো—গালের টোলের মত ভয়ঙ্কর গভীর না হিন্দুকুশ্ পাহাড়ের মত উঁচু?'

কখনও উত্তরের জন্য অপেক্ষাই করে না, আর কখনও বা গ্যাঁট হয়ে বসে গালে হাত দিয়ে অতি ঠাণ্ডাভাবে উত্তরের প্রতীক্ষা করে—যেন আমার উত্তরের উপর তার জীবন মরণ নির্ভর করছে।

আমি যদি একই প্রশ্ন শুধাই তবে ছোট্ট মেয়েটির মত চেঁচিয়ে বলে, 'না, না, আমি আগে শুধিয়েছি।'

আমি উত্তর দিতে গেলে স্কুল মাস্টারের মত উৎসাহ দিয়ে কথা জুগিয়ে দেয়, তুলনা সাপ্লাই করে, প্যাডিং টিমিং যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম দিয়ে ওটাকে, পুজোর বাজারে প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবার মত পোশাকী-দুরুস্ত করে। আর কখনও বা তীক্ষ্ণ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে, ডান ভুরু ঠিক জায়গায় রেখে বা ভুরুর বাঁ দিকটা ইঞ্চি খানেক উপরের দিকে তুলে আমাকে পইপই করে পাকা উকিলের মত ক্রস করে। 'হিমালয়ের মত উঁচু? সে আমার দরকার নেই। আমার হিন্দুকুশ্ হলেই চলবে। তার হাইট্ কত? জান না? তবে বলছিলে কেন অতখানি উঁচু?'

একবার নিজে দেখালে, সে আমাকে কতখানি ভালবাসে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বাহু প্রসারিত করে পিছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে ব্যালে-নর্তকীর মত দু হাতে দু পিঠ প্রায় ছুঁইয়ে ফেলে বললে, 'অ্যাত্তোখানি। প্লাস—প্লাস—' বলতে বলতে আমার কাছে এসে, আমার চোখের সামনে তার কড়ে আঙুল তুলে ধরে বুড়ো আঙুলের

নখ দিয়ে কড়ে আঙুলের ক্ষুদ্রতম কণায় ঠেকিয়ে বললে, 'প্লাস--অ্যাট্রুকুন্।' তারপর শুধালে, 'এর মানে বল তো?'

আমি বললুম, 'বলার একটা সুন্দর ধরন আর কী।'

'না। সবচেয়ে বেশি থেকে সবচেয়ে কম—দুয়ে মিলিয়ে, হল ইন্‌ফিনিটি।'

'ওই য্ যা ভুলে গিয়েছিলুম—' বলে ছুটে জানলার ধারে গিয়ে বললে, 'ওই দেখ আদম-সুবৎ—পাগ্‌মানের আদম-সুবৎ, কালপুরুষ। আমাদের বিয়ের ভোজে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—বেচারী।' আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি আমাদের প্রেমের সাক্ষী।'

আমি তাকে সপ্তর্ষির অরুন্ধতী বশিষ্ঠের গল্প বললুম। বৈদিক যুগে যে বব্‌কনেকে অরুন্ধতী দেখিয়ে ওঁরই মত তাকে পাশে পাশে থাকতে বলত সেটাও বললুম।

শব্‌নম উৎসাহেব সঙ্গে বললে, 'কোথায়? কোথায় দেখিয়ে দাও তো আমায়।'

আকাশে তখনও সপ্তর্ষির উদয় হয় নি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

চার

মাত্র একটি অঙ্গে আমাদের বিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

শব্‌নম এই প্রথম খবর দিয়ে আসছিল বলে আব্দুব রহ্‌মান কাবুল বাজার ঝেঁটিয়ে খানা-পিনার সাজ-সরঞ্জাম কিনে বেখেছিল। রাত বারোটায় দস্তরখান পাতা হল, পদের পর পদ আসতে লাগল। শব্‌নম ওদের নিমন্ত্রণ করল, আমাদের সঙ্গে বসে খেতে। সিন্ধুর ওপারে সেবকগণ প্রভু পরিবারের সঙ্গে বসে খেতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত নয়। ওরা কিন্তু রাজী হল না। শোনাবার মতলবে ওদের ফিসফিস থেকে বোঝা গেল, ওরা বাজি ধরেছে, কে বেশি পোলাও খেতে পারে—প্রচুর সময় লাগার কথা।

শব্‌নম মাথা গুঁজে খেল। রুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাংস, তরকাবি এমন কি ঝোল পর্যন্ত তুলে খেল, অথচ রুটি ছাড়া অন্য কোনও জিনিস হাতের সংস্পর্শে এল না, এ শুধু আমি দুজন লোককে করতে দেখেছি, শব্‌নম আর ভূপালের এক প্রধান মন্ত্রী। এদের খাওয়ার পর হাত ধোবার প্রয়োজন হয় না। রুটিব যেটুকু ময়দাব গুঁড়ো আঙুলের ডগায় লেগেছে সেটুকু ন্যাপকিনে মুছে নিলেই হল। শব্‌নম আমাকে কিছু না বলে হাত ধুয়ে এসে আমাব পাশে বসে বললে, 'তুমি কিছু মনে করো না; এসব ব্যাপারে আমার লজ্জা বোধ একটু বেশি।'

বাইরে ভয়ঙ্কর শীত। চিমনিতে আবার কাঠ দেওয়া হল।

আগুনের সামনে আমরা দুজনা কার্পেটের উপর বসে আছি।

শব্‌নম প্যারিসের গল্প বলছে। মাঝে মাঝে আমার হাতখানা কোলে তুলে নিয়ে আদর করছে। একবার হৃদয় সম্বন্ধে কী একটা বলতে গিয়ে বললে, 'এই তো তোমার হার্ট—' বলে তার ডান হাত আমার বুকের উপর রাখতে গিয়ে তার হাত সেই ভিজিটিং-কার্ড কেসটায় ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

আমি শুধালুম, 'কী হল?'

'তোমার ঘবে কাঁচি আছে?'

'বোস। শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলুম—এনে দিচ্ছি।'

বললে, 'বা রে। এখন আমি সর্বত্র যেতে পারি।' বলেই, পাখি যে রকম বসা অবস্থাতেই ওড়া আরম্ভ করতে পারে সেই রকম ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে কাচিখানা নিয়ে এল।

আমাকে মুখোমুখি বসিয়ে আমার হাতে কাঁচি দিয়ে বললে, 'আমার জুল্ফ্ কাটো।'

বাঙলা জুল্পি কথাটা 'জুল্ফ্' থেকে এসেছে। ইরান তুরানের কুমারীদের অনেকেই দু গুচ্ছ অলক শগ থেকে কানের ডগা অবধি ঝুলিয়ে রাখে। শব্নমের চুল ঢেউ-খেলানো বলে তার জুল্ফ্ দুটির সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ।

আমি ঠিক জানি নে, একদা বোধ হয় ইরান তুরানের বর বাসর ঘরে নববধূর জুল্ফ্ দুটি পুরোপুরিই কেটে দিত। এর পর যে নূতন চুল গজাত নববধূ সে চুল কানের পিছনে অন্য চুলের সঙ্গে মিলিয়ে দিত। জুল্ফে হক্ক কুমারীদের—ইরানে বলা হয় 'দুখ্তর্', সংস্কৃতে 'দুহিতৃ' স্পষ্ট বোঝা যায়, একই শব্দ। আজকাল এই জুল্ফ্ কাটার রেওয়াজ যেসব জায়গায় আছে সেখানেও বোধ হয় জুল্ফের শুধু ডগাগুলোই কেটে দেওয়া হয়।

আমি বললুম, 'আমার হাত কেটে ফেললেও তোমার জুল্ফ্ কাটতে পারব না।'

অনুনয় করলে, 'তা হলে ডগাগুলো কেটে দাও।'

আমি বললুম, 'আমায় মাপ কর।'

'আমি চিরকালই কুমারী থাকব?'

'তুমি চিরকালই আমার সামনে পাগমানের সেই ডান্স্-হল থেকে নামছ, তুমি চিরকালই আমার প্রথম সন্ধ্যার হিমিক। কিন্তু বল তো, তুমি এই জুল্ফ্ কাটা নিয়ে এত চাপ দিচ্ছ কেন?'

'তবে কাছে এস।'

আমি আমার দুই তর্জনী দিয়ে তার দুটি জুল্ফ্ আঙুল দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে তার মুখ তুলে ধরে বললুম, 'বল।'

'দেখ, চারদিকে এই অশান্তি এই অনিশ্চয়তা, এর মাঝখানে তোমাকে নিঃশেষে পাবার জন্য আমার হৃদয় আমাকে ভরসা দিচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'আমি তো চাই।'

আমার দু হাতে ধরা জুল্ফি-বন্ধনের মাঝখানে যতটা পারে মাথা দুলিয়ে বললে, 'না, না, না। তুমি আমাকে এত বেশি ভালবাস যে তোমার চাওয়া-না-চাওয়া সব লোপ পেয়েছে। আমার ভালবাসা তার কাছে দাঁড়াতেই পারে না।

'এবারে ভাল করে শোন। বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমি এমন কোনও আচরণ করি নি যার জন্যে আল্লার সামনে আমাকে লজ্জা পেতে হবে। কিন্তু তোমার অসাক্ষাতে, এখানে, কান্দাহারে, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, দুপুর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ না জ্বেলে গৃহকোণে কতবার আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি জান না। চতুর্দিকের বিশ্বসংসার তখন প্রতিবার লোপ পেয়ে গিয়েছে একেবারে নিঃশেষে। আমি যেন বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে, আর তুমি মহাসিন্ধু, দূর থেকে তরঙ্গে তরঙ্গে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছ। আমি দম নিয়ে নাকমুখ বন্ধ করার আগেই তুমি আমাকে তরঙ্গের আলিঙ্গনে আমার সর্বসত্তা লোপ করে দিলে। আর, কখনও তুমি এসেছ ঝড়ের মত। আমার ওড়না তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, আমার জুল্ফ্গুচ্ছের ভিতর ঢুকে গিয়ে তার প্রত্যেকটি চুল আলাদা আলাদা করে এদিকে ওদিকে উড়িয়ে দিয়ে, আমার চোখের প্রতিটি কাজলের গুঁড়ো কেড়ে নিয়ে, আর সর্বশেষে আমার প্রতিটি লোমকূপে শিহরণ জাগিয়ে আমাকে যেন তোমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে কোথায় কোথায় উধাও হয়ে গেলে—কালপুরুষের পাশ দিয়ে কৃত্তিকা, সাত-ভাই-চম্পার ঝাঁকের মাঝখান দিয়ে।

'জ্ঞান ফিরতে দেখি, আমি মাথা ঝুঁকে বর্ডারের উপর বুলবুলির চোখে তুলি লাগিয়ে বসে আছি।'

আমি চুপ করে শুনে গেলুম।

নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি পুরুষ, তুমি কী করে বুঝবে কুমারীর প্রেম। তুমি তো সমুদ্র তরঙ্গ, ঝড়ের ঘূর্ণি। আর আমার প্রেম?—স্বপ্নে স্বপ্নে বোনা শুক্তির মুক্তো। কত ছোট আর কত অজানার নিভৃত কোণে তার নীড়। কত আঁখি-পল্লব থেকে নিংড়ে নিংড়ে বের করা এক ফোঁটা আঁখি-জল। আর তার প্রতিটি ক্ষুদ্রতম কণাতে আছে কুমারীর লজ্জা, ভয়, সংকোচ।'

চুপ করে গেল।

আমি কাঁচি হাতে নিয়ে জুল্‌ফ্ থেকে তিন গোছা চুল কেটে নিয়ে বললুম, 'এই মুক্ত করলুম আমি তোমার লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়।'

আগুনের সামনে বসেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল বাইরে শীত কী রকম ঘনিয়ে আসছে। সে শীত যখন তার চরমে পৌঁছেছে তখনও শব্‌নম তার জুল্‌ফ্ কানের পিছনে ঠেলে দিতে দিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'এ কি নেমকহারামির চূড়ান্ত নয়—যে-বাড়িতে কুড়িটি বছর কাটিয়েছি সেটা আর নিজের আপন বাড়ি বলে মনে হচ্ছে না? আর এ বাড়ি আসলে তোমার আপন বাড়িও নয়—এ বাড়িতে তো আমার শাশুড়ি-মা তোমাকে জন্ম দেন নি। তবু মনে হচ্ছে, এ বাড়িতেই যেন শিশুকাল থেকে আমরা খেলাধুলা ঝগড়াঝাঁটি মান-অভিমান কবে করে আজ আমাদেব চরম মিলনে পৌঁছলুম।'

একটুখানি ভাবলে। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'উঁহু, এটাও যেন সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমরা দুটি শিশু এ বাড়ির আঙিনাতে খেলা করছি, আর ও বাড়িব ছাদে বসে আব্বাজান্, জানেমন্ একে অন্যের সঙ্গে গল্প কবতে করতে আমাদের দিকে স্নেহ দৃষ্টি রেখে সকল বিপদ আপদ ঠেকিয়ে রাখছেন। খেলা ছেড়ে ছুটে গিয়ে একবাব জানেমনের কোলে বসে জিবিয়ে আসি।'

আমার মোজাটা খুলতে খুলতে বললে, এই যে লাগল গোলমাল, এব শেষ কবে, আব কোথায়, কেউ বলতে পারে না। তোমাকে আবার কখন দেখতে পাব তাও জানি নে। তবে এখন আমার বুকভরা সান্ত্বনা। ওই বাচ্চা যদি কাল এসে যেত তা হলে আমাকে মহাবিপদে ফেলত। পাগলা-ভিড় ঠেলে এসে তোমাকে বিয়ে করতে হত। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছি।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'এই শীতে? এত রাত্তিরে?'

'এই সময়টাই সব চেয়ে ভাল। ডাকুদের দামী দামী ওভারকোট নেই যে এই শীতে বেরুবে। কাল সকালে দেখবে কাবুলে মেলার ভিড়। চোর ডাকাত বেবাক মৌজুদ। প্রথম লুট আরম্ভ হলেই ওরা সব ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাচ্চা তো উপলক্ষ মাত্র। তুমি এ দেশের হালহকীকৎ জান অতি অল্প। আমাকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হও।'

আমি সেদিন তাকে বিশ্বাস করেছি। আজও করি।

খুশি হয়ে বললে, 'এই তো চাই। আমি তোপল্ খানকে ডাকি। তুমি যাও শুয়ে পড়। কতক্ষণ ধরে সুট পরে আছ।'

শীতের দেশ বলে আমি শিলওয়ার, চুড়িদার পাঞ্জাবি পরে শুই।

শোবার ঘরে ঢুকেই বলে, 'বাঃ। কী চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে! কিন্তু এ আবার কী রকমের কুর্তা? দুদিকে চেরা কেন? দেখি?' হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, 'ও! পকেট! ভারী অরিজিনাল্ আইডিয়া তো! হাতে আবার পট্টি মেরে বোতাম। ও, বুঝেছি, খাবার সময় আস্তিন যাতে ঝোলে ডুবে না যায়। আমিও এরকম একটা করাব। সবাই বলবে, 'আমি কী অরিজিনাল। এবারে তুমি শোও দিকি নি।'

তিন দিকে লেপ গুঁজতে গুঁজতে বললে, 'তুমি কণামাত্র দুশ্চিন্তা করো না। তোপল্ খান একটা সার্ভে করে এসেছে। আমার কথাই ঠিক। রাস্তায় কাককোকিল নেই। আচ্ছা, তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখবে তো?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

মাথা, জুল্‌ফ্, কানের দুল দোলাতে দোলাতে বললে, 'না, তা করতে পারবে না। আমার কড়া মানা। আমি খাটে শুয়ে ড্যাব ড্যাব করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকব আর তুমি প্রেমসে তোমার স্বপনচারিণীর সঙ্গে লীলা-খেলা করবে—সেটি হচ্ছে না। ও আমার সতীন—দজ্জাল বেটী ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

আমি বললুম, 'তুমিও আমাকে স্বপ্নে দেখলে পার।'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'বল কী তুমি? তুমি পুরুষমানুষ চারটে প্রিয়েকে বিয়ে করতে পার, স্বপ্নে জাগরণে যে রকম খুশি ভাগাভাগি করতে পার। কিন্তু আমি মেয়েছেলে। আমার কেবল তুমি।'

আমি বললুম,

'স্বপন হইতে শতশত গুণে
প্রিয়তর বলে গুণি!'

অর্থ আব সুর দুইই তার মন পেল।

বললে, 'কান্দাহাবে তোমাকে প্রতি বাত্রে স্বপ্নে আহ্বান জানাতুম। তখন তোমাকে বিয়ে করি নি, তাই। আচ্ছা, এবারে তুমি চুপ কর, আর চোখ বন্ধ কব।' উঠে গিয়ে আলো নেবাল। ড্রইংরুম থেকে ও ঘরে সামান্য আলো আসে।

আমার ছোট্ট চারপাঈটির কাঠের বাজুতে হাল্কাভাবে বসে সেই আধো-আলো-অন্ধকারে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল—আমি বন্ধ চোখে সেটা চোখের তারাতে তাবাতে দেখতে পেলুম।

এবাবে তাব নিঃশ্বাস আমাব ঠোঁটে এসে লাগছে।

ভীরু পাখির মত একবার তার ঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করল—দুবার—শেষবারে একটু অতি ক্ষীণ চাপ।

এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম নয়।

কৈশোরে যখন ওষ্ঠাধরের গোপন রহস্য আধা আধা কল্পনায় বুঝতে শিখছি তখন আমি আকাশেব তারার সঙ্গে মিতালী পাতাবাব জন্য রাত্রিযাপন করতুম খোলা বারান্দায়। শরতের ভোরবেলা দেখতুম পাশের শিউলি গাছেব বিরহবেদনা—ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলেব শিউলি আমাব চতুর্দিকে ছড়ানো।

এক ভোরে অনুভব কবলুম ঠোঁটের উপর তারই একটি।

এ সেই হিমিকা-মাখা, শব্‌নম-ভেজা শিউলি!

পাঁচ

শব্‌নমের কথা অক্ষবে অক্ষরে ফললো। পরদিন সকাল থেকেই কাবুল শহরের আশপাশের চোর ডাকু এসে 'রাজধানী' ভর্তি করে দিলে। দাগী খুনীরাও নাকি গা-ঢাকা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে; কারণ পুলিশ হাওয়া, সান্ত্রী গায়েব।

এতে করে আর পাঁচজন কাবুলী যতখানি ভয় পেয়েছে, আমিও পেয়েছি ততটুকু। আসলে আমার বেদনা অন্যখানে। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দেখি, রাস্তা থেকে মেয়েরা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছে। বে-বোরকার তো কথাই হচ্ছে না, ফ্যাশনেব্‌ল্ বোরকাও দূরে থাক, দাদী-মা নানী-মার তাম্বুপানা বেঢপ বোরকার ছায়া পর্যন্ত রাস্তায় নেই।

শব্‌নম আসবে কি করে?

দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই মারাত্মক শীতে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ফাটিয়ে ফেলেছি—কখন প্রথম বোরকা বেরুবে, কখন প্রথম বোরকা দেখতে পাব? ব্যর্থ, ব্যর্থ, আর একটা দিন ব্যর্থ!

'জাগিনু যখন উষা হাসে নাই,
শুধানু "সে আসিবে কি?"
চলে যায় সাঁঝ, আর আশা নাই,
সে ত' আসিল না, হায় সখি!
নিশীথ রাতে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে,
জাগিয়া লুটাই বিছানায়;
আপন রচন ব্যর্থ স্বপন
দুখ ভারে নুয়ে ডুবে যায়।'

(সত্যেন দত্তের অনুবাদ)

জর্মন কবি হাইনে আসলে ইহুদী—অর্থাৎ প্রাচ্য দেশীয়। অসহায় বিরহ বেদনার কাতরতা ইয়োরোপীয়রা বোঝে না। তাদের কাব্য সঞ্চয়নে এ কবিতা ঠাঁই পায় না। অথচ এই কবিতাটিই ত্রিপদীতে গেঁথে দিলে কোন্ গোসাই বলতে পারবেন, এটি পদাবলী কীর্তন নয়? এ তো সেই কথাই বলেছে—'মরমে ঝুরিয়া মরি'।

এক মাস হতে চলল। তোপল্ খানই বা কোথায়?

আবার দাঁড়িয়েছি দেউড়িতে দুপুরবেলা।

ওই দূরের দক্ষিণ মহল্লার সদর দেউড়ি থেকে বেরল এই প্রথম বোরকা? ধোপানীদের কালো-বোরকা-সাদা-হয়ে যাওয়া পুরনো ছাতা রঙের। আমার ধোপানীও এই রকম বোরকা পরে আসে। দুঃখিনী বেরিয়েছে পেটের ধান্দায়। কতদিন আর বাড়ি বসে বসে কাটাবে? বেচারী আবার অল্প অল্প খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। আমার দেউড়ি পেরিয়ে উত্তর দিকে কাবুল নদীর পানে চলে গেল। শব্‌নমদের বাড়ি দক্ষিণ মহল্লারও দক্ষিণে। আমি আবার সেদিকে মুখ ফেরালুম। এবারে মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়েছে। প্রথম বোরকা তো বেরিয়েছে।

দু মিনিট হয় কি না হয়, এমন সময় কানের কাছে গলা শুনতে পেলুম, 'মিনিট দশেক এখানে দাঁড়িয়ে থেকে উপরে এস।'

আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। আমাব দাঁড়ানো যে শেষ হয়ে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকে দেখি শব্‌নম কোথাও নেই। কম্পিত কণ্ঠে ডাকলুম, 'শব্‌নম! হিমিকা!' উত্তর নেই। আবার ডাকলুম, 'হিমি।'

চারপাঈর তলা থেকে উত্তর এল 'কূ।'

আমি এক লম্ফে কাছে গিয়ে লেপ বালিশসুদ্ধ খাট কাত করে দিয়ে দেখি, শব্‌নম খাটের তলায় কার্পেটের উপর দিব্যি শুয়ে আছে। আমার চুড়িদার পাঞ্জাবিটা পরে। একটু ঢিলে-ঢালা হয়েছে বটে কিন্তু একটা জায়গায় ফিট হয়েছে চমৎকার—যেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কারিগর বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সৃষ্টির সময়েই ফিট করিয়ে দিয়েছিলেন।

আশ্চর্য এই বিরহ বেদনার অন্ধকার। মিলনের প্রথম মুহূর্তেই সব দুঃখ দূর হয়ে যায়—সে বিরহ একদিনের হোক্ আর একমাসেরই হোক্। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বাললে যে রকম সে

আলো তন্মুহূর্তেই অন্ধকারকে তাড়িয়ে দেয়—সে অন্ধকার এক মুহূর্তেরই হোক্ আর ফারাওয়ের কবরের পাঁচ হাজার বছরের পুরনো জমানো অন্ধকারই হোক্।

অভিমানের সুরে বললে, 'দশ মিনিট, আর এলে দশ ঘণ্টা পরে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, সে কি? আমি তো ঘড়ি ধরে আট মিনিট পরে এসেছি।'

বললে, 'তোমার ঘড়ি পুরনো। কাবুল মিউজিয়ামের গান্ধার সেক্‌শন্ থেকে কিনেছ বুঝি?'

আমি বললুম, 'পুরনো ঘড়ি হলেই বুঝি খারাপ টাইম দেয়?'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'দেবে না? পুরনো খবরের কাগজ আজকের খবর দেয় নাকি? খবরের কাগজের আসল নাম ক্রনিক্‌ল্, আর ঘড়ির আসল নাম ক্রনোমিটার। দুটোই ক্রনস্, সময়ের খবর দেয়। এতটুকু শব্দতত্ত্ব জানো না—প্যারিসের ক্লাস্ সিক্‌সে যা শেখানো হয়?'

আমি বললুম, 'তুমি বুঝি রোজ সকালে খবরের কাগজের সঙ্গে একটা নূতন ঘড়িও কেন?'

'তা কেন? আমার ঘড়ি তো এইখানে।' বলে নিজের বুকে হাত দিলে। 'প্রথম দিনের ঘড়ি, নিত্য নবীন হয়ে চলেছে। দেখি, তোমার ঘড়িটা কি রকমের।' আমার বুকে কান পেতে বললে, 'জান, কি বলছে।'

আমি বললুম, 'এক জাপানী শ্রমণ জীবনের দ্বন্দ্ব-ধ্বনি শুনতে পেয়ে বলেছেন, 'ভুল'—'ঠিক', 'ভুল'—'ঠিক', 'ভুল'—'ঠিক'?

'বাজে। বলছে, 'শব্'-'নম', 'শব্'-'নম্', 'শব্'-'নম'! এইবারে আমারটা শোন।'

আমি তার এত কাছে আর কখনও আসি নি। আমার বুক তখন ধপধপ করছে।

'বুঝতে পেরেছ নাকি?' নিজেই কথা জুগিয়ে দিচ্ছে। 'বুল্',-'বুল',-'বুল',-'বুল্', 'বুল্-বুল্' বলছে—না?'

আমি অতি কষ্টে বললুম, 'হ্যাঁ।'

বললে, 'কলটা কিন্তু খুব ভাল না। মা মরেছে ওতে, নানী-মাও। কিন্তু ওকথা কক্ষনো তুল না।'

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালে।

ডান পা একটু এগিয়ে দিয়ে, বাঁ হাতের মণিবন্ধ কোমরের উপর রেখে, ডান হাত আকাশের দিকে তুলে, অপেরার 'প্রিমা দন্না' ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বললে, 'মেদাম্ এ মেসিয়ো! এই মুহূর্তে কাবুলের রাজা হতে চায় দুজন লোক। আমানুল্লা খান আর বাচ্চা-ই-সকাও। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি দুজনাতে মিলে আপোসে মিটমাট করে আমাকে বলে, "কাবুল শহর তোমাকে দিলুম"—তা হলে আমি কি করি?' নাটকীয় ভঙ্গিতে আবার মৃদু হাস্য করলে। কী সুন্দর সে হাসি। গালের টোল দুটি আমার গাঁয়ের ছোট্ট মনু-গাঙের ক্ষুদে ক্ষুদে দ'য়ের মত পাক খেতে লাগল, অথবা কি বলব, নজ্‌দের মরুভূমিতে মজনূঁর দীর্ঘনিশ্বাস ঘূর্ণিচক্রের ছোট ছোট 'বগোলে'?

আমি চার আনী টিকিট-দারের মত চেঁচিয়ে বললুম, 'সি'ল্ ভু প্লে, সি'ল্ ভু প্লে—মেহেরবানী করুন, মেহেরবানী করুন, বলুন কি করবেন।'

একেবারে হুবহু 'প্রিমা দন্না'র ভঙ্গিতে গান গেয়ে উঠল,

si le roi m'avait donne
Paris, sa grand 'ville,
Et qu'il me fallut quitter
L'amour de ma mie,
Je dirais au roi Henri
'Reprenez votre Paris,
J'aime mieux ma mie, o gai !
J'aime mieux ma mie !'

'এবারে তার ফার্সীটা শুনুন, মেদাম্ এ মেসিয়ো!
'গব ব্-এক্, মোই, তুর্ক-ই-শীরাজী,
ব্দহদ্ পাদ্শাহ্ ব্-মন্ শীরাজ্,
গোইম 'আয় পাদ্শাহ্ গরচি বোওাদ্
শহ্র্ ই-শীরাজ শহ্ব্-ই বিআনবার,
তুর্ক্-ই শীরাজ কাফী অস্ত্ মরা—
শহ্র্-ই শীরাজ খইশ বসতান বাজ্।

'রাজা যদি, দেয় মোরে ওই, আজব শহর পারি (Paris)
কিন্তু যদি, শর্ত করে, ছাড়তে তোমায়, প্যারী,
বলবো, 'ওগো, রাজা আঁরি (Henri)
এই ফিরে নাও তোমার পারি (Paris)
প্যারীর প্রেম যে অনেক ভারি,
তারে আমি ছাড়তে নারি।
ওগো, আমার প্যারী।'

ফার্সী অনুবাদটা গাইলে একদম 'ফতুজান' স্টাইলের কাবুলী লোকসঙ্গীতে।

প্যারিসে চারআনী টিকিটের জায়গা হলের সক্কলের পিছনে, উপরে, প্রায় ছাত ছুঁয়ে। তাই সেটাকে বলা হয় 'পারাদি'—প্যারাডাইস্—স্বর্গপুরী। খাঁটি জউরী, আসল সমঝদার, খানদানী কদরদানরা বসেন সেখানে। ঘন ঘন সাধুরব, বিকল্পে পচা ডিম, হাজা টমেটো, শিটিফিটির খয়রাতি হাসপাতাল ওই স্বর্গপুরীতেই। স্টেজের ফাঁড়া-গর্দিশে বুদ্ধি বাতলে দেন ওনারাই। ভিরমি-খাওয়া ধুম্‌সী নায়িকাকে কাঁধে করে বয়ে নিতে গিয়ে যদি টিঙটিঙে নায়ক হিমশিম খায় তবে এই সব দরদী জউরীরাই চিৎকার করে দাওয়াই বাতলান—'দুই কিস্তিতে নিয়ে যা—ফ্যাৎ দ্য ভইয়াজ—মেক্ টু ট্রিপ্‌স্!'

আমি এদের অনুকরণে একাই এক শ হয়ে বিস্তর 'সাধু' সাধু, ব্রাভো, ব্রাভো' বললুম।

সদয় হাসি হেসে খাজেস্তেবানু শব্‌নম বীবী ডাইনে বাঁয়ে সামনের দিকে বাও করে শোকরিয়া জানালেন, চম্পক করাঙ্গুলির প্রান্তদেশে মৃদুচুম্বন খেয়ে আঙুলটি উপরের দিকে তুলে ফুঁ দিয়ে চুম্বনটি 'পারাদি'—স্বর্গপুরীর—দিকে উড্ডীয়মান করে দিলেন।

আমি 'স্টেজে'র দিকে ডাঁই ডাঁই রজনীগন্ধার গুচ্ছ ছুঁড়ে পেলা দেবার মুদ্রা মারলুম।

দেবী প্রসন্নবয়ানে 'স্টেজ' থেকে অবতীর্ণা হয়ে সর্বজন সমক্ষে আমার বিরহ-তপ্ত আপাণ্ডুর ক্লান্ত ভালে তাঁর ঈষতার্দ্র মল্লিকাধর স্পর্শ করে নিঃশ্বাসসৌরভঘন অগুরু-কস্তুরী-চন্দন-মিশ্রিত ভ্রমর-গুঞ্জরিত প্রজাপতি-প্রকল্পিত চুম্বনপ্রসাদ সিঞ্চন করলেন।

প্রসন্নোদয়, প্রসন্নোদয় আমার অদ্য উষার সবিতৃ উদয় প্রসন্নোদয়!

আমার জন্মজন্ম সঞ্চিত পুণ্য কর্মফল আজ উপারূঢ়!

আমি তার পদচুম্বন করতে যাচ্ছিলুম। 'কর কি?' 'কর কি?' বলে ব্যাকুল হয়ে সে আমায় ঠেকিয়ে দিয়ে দুখানি আপন গোলাপ-পাপড়ি এগিয়ে দিলে।

আশ্চর্য এ মেয়ে? দেখি, আর বিস্ময় মানি। ভয়ে আতঙ্কে তামাম কাবুল শহরের গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে—এই পাথর-ফাটা শীতে শহরের রাস্তার মুখ পর্যন্ত পরিশুষ্ক হয়ে গিয়েছে, আর এ মেয়ে তারই মাঝখানে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে কলকল খলখল করে হাসছে। প্রেমসাগরের কতখানি অতলে ডুব দিলে উপরের ঝড়ঝঞ্ঝা সম্বন্ধে এ রকম সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন হওয়া যায়?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবাব সব-কিছুব খবব বাখে।

বললে, 'এই যে ফ্রান্সেব গাঁইযা গান, এটাব মর্মও আমানুল্লা বুঝলেন না।

'বিদ্রোহীবা বলছে, তোমাব বউ সুবাইযা বিদেশে গিযে স্বৈবিণী হযে গিযেছে— দ্বিচাবিণী নয, স্বৈবিণী। একে তুমি তালাক দাও, আমবা বিদ্রোহ বন্ধ কবে দেব।

আমানুল্লা নাবাজ।'

আমি বললুম, 'তোমাদেব কবিই তো বলেছেন,

"কি বলিব, ভাই, মূর্খেব কিছু অভাব কি দুনিযায,
পাগডি বাঁচাতে হববকতই মাথাটাবে বলি দ্যায।" '

মাথা নেডে বললে, 'না। এখানে পাগডি অর্থ প্রিযা, মাথাটা কাবুল শহব।

'আমি বলি, "দিযে দে না বাপু, কাবুল শহব, চলে যা না বাপু, প্রিযাকে নিয়ে প্যাবিস্— যে প্যাবিসেব ঢঙে কাবুলেব চেহাবা বদলাতে গিযে আজ তুই এ-বিপদে পডেছিস। নকল প্যাবিস নিযে তোব কি হবে, আসল যখন হাতেব কাছে? একটা কপিবই যখন দবকাব তখন আসলটা নিযে কার্বন্ কপিটা ফেলে দে না। কাশ্মীবী শালেব উপবেব দিকটাই গাযে জডিযে নে, উল্টো দিকটা দেখিযে তোব কি লাভ?" আশ্চর্য। তাঁব এখন ডান হাতে তলোযাব, বাঁযা বগলমে প্রিযা—ডাকু পাকডাবেন কৈসে?'

মাথা ঝাঁকুনি দিযে বললে, 'আমাব বযে গেছে।

"কাজী নই আমি, মোল্লাও নই, আমাব কি দায, বল।
শীবাজী খাইব, প্রিয়াব চুমিব ওই মুখ ঢলঢল।"

এব প্রথম ছত্র হাফিজেব, 'দ্বিতীযটি আমাব।'

আমি বললুম, 'শাবাশ। লাল শীবাজী খেতে হলে তোমাব এই গোলাপী ঠোঁটেই মানাবে ভাল। আমাব কিন্তু দুটো মিশিযে দিতে ইচ্ছে কবছে।'

'কি বকম?'

'তুমি পাশ ফিবে শুযে মৃদু হাস্য কববে। তখন তোমাব গালেব টোল হবে গভীবতম— আমি সেটিকে ভর্তি কবব শীবাজী দিযে। তাবপব আস্তে আস্তে—অতি ধীবে ধীবে সেই শীবাজী চুমোয চুমোয তুলে নেব।'

বললে, 'বাপ্‌স্? কী লযে কল্পনা, লম্বা বসনা, কবিছে দৌডাদৌডি। তা কল্পনা কব, কিন্তু ব্যস্ত হযো না। খৃষ্টানদেব বঁ দিযো—ভগবান—তো এক মুহূর্তেই সৃষ্টি সম্পূর্ণ কবে দিতে পাবতেন, তবে তিনি ছ-দিন লাগালেন কেন?'

আমি বললুম, 'এবাবে তুমি আমাব কথাব উত্তব দাও।'

সুশীলা বালিকাব মত মাথা নিচু কবে বললে, 'বল।'

'আব্বাজান কোথায?'

'দুর্গে। আমানুল্লাকে মন্ত্রণা দিচ্ছেন। ট্যুব থেকে বেবিযে আসা ফালতো টুথপেস্ট ফেব ভিতবে ঢোকাবাব চেষ্টা কবছেন।'

'তোপল্ খান?'

'লডাইযে।'

'তুমি কি কবে এলে?'

'বেওযাজ কবে কবে। ধোপানীব তাম্বুটা যোগাড কবে প্রথম প্রথম কাছে পিঠে বান্ধবীদেব বাড়িতে ওদেব তত্ত্ব-তাবাশ কবতে গেলুম।'

একটু থেমে বললে, 'আচ্ছা বলতো, তোমাকে ভালোবাসাব পব থেকে আমি ওদেব কথা একদম ভুলে গিয়েছি। আমার যে সব সখীদেব বিযে হযে গিযেছে তাবাও আমাকে স্মবণ কবে না।

অথচ শুনেছি, পুরুষ-মানুষরা নাকি বিয়ের পর সখাদের অত সহজে ভোলে না? মেয়েরা তা হলে বেইমান নেমকহারাম?'

আমি বললুম, 'গুণীরা বলেন, প্রেম মেয়েদের সর্বস্ব, পুরুষের জীবনের মাত্র একটি অংশ। তাই বোধ হয় মেয়েরা ওই রকম করে। কিন্তু আমার মনে হয়, তা নয়। আমি বিদেশী, আমি অসহায়, আমি নিজের থেকে কোন কিছু করতে গেলেই হয়তো তোমাকে বিপদে ফেলা হবে মাত্র, এই ভেবে আমি হাত-পাঁ-বাঁধা অবস্থায় কিস্মতের কিল খাচ্ছি। তুমি সেটা জান বলে, সর্বক্ষণ তোমার চিন্তা, কি করে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা, আমার বিরহ-বেদনা, তোমাকে কাছে পাওয়ার কামনা আপন কাঁধে নিয়ে আমাকে আর্ত শিশুর মত আদর করে করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার। তোমার সখীরা আব্বা, জানেমন্ কেউই তো তোমার উপর কোন কিছুর জন্য এতটুকু নির্ভর করছেন না। আর আমি করছি সম্পূর্ণ নির্ভর তোমার উপর। তোমার জিম্মাদারী এখন বেড়ে গিয়েছে। জিম্মাদারী-বোধ বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে একাগ্রতা-বোধও বেড়ে যায়।'

বললে, 'সে না হয় তোমার আমার বেলা হয়—তুমি বিদেশী বলে।'

'অন্যদের বেলাও তাই। অধিকাংশ দেশেই মেয়ের জন্ম তো পরিবারের আপদ। সেই 'আপদ' যেদিন একটি লোককে পায়, যাকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বাকী জীবন তার উপর নির্ভর করতে হবে, তখন তার অবস্থা তোমারই মত হয়। কিন্তু আরেকটা কথা। এই একাগ্রতাটা মেয়েদের কিছু একচেটে নয়। লায়লীর জন্য মজনূঁর একাগ্রতাই তো তাকে পাগল বানিয়ে দিলে?'

শুধালে, 'কোন্ মজনূঁ?'

আমি বললুম, 'তার পর তুমি কি করলে বলছিলে?'

'ওঃ! পাড়ার সখীদের বাড়ি গিয়ে প্র্যাকটিস করলুম।'

আমি বললুম, 'শ্রীরাধা যে রকম আঙিনায় কলসী কলসী জল ঢেলে সেটাকে পিছল করে তুলে, বর্ষার রাতে পিছল অভিসার যাওয়ার প্র্যাকটিস করে নিতেন?'

ইরান তুরান আরবভূমির তাবৎ প্রেমের কাহিনী শব্‌নমের হৃদযন্ত্র। তাই আমি তাকে শোনাতুম হিন্দুস্থানী রমণীর বেদনাবাণী। সে সব কাহিনীর রাজমুকুট সুচির অভাগিনী অভিমানিনী শ্রীরাধার চোখের জলের মুক্তো দিয়ে সাজাতে আমার বড় ভাল লাগে। কিন্তু একাধিকবার লক্ষ করেছি, শব্‌নম যেন শ্রীরাধাকে ঈষৎ ঈর্ষা করে।

বললে, 'হুঁঃ। তোমার শুধু শ্রীরাধা শ্রীরাধা! তা সে যাক্‌গে। তার পর ধোপানীর তাম্বু পরে বেরিয়ে পড়লুম তোমার উদ্দেশে। আমার ভাবনা ছিল শুধু আমার পা দুখানা নিয়ে। ওদুটো বোরকা দিয়ে সব সময় ভাল করে ঢাকা যায় না।'

আমি বললুম, 'রজকিনী চরণ বাংলা সাহিত্যের বুকের উপর।'

'মানে?'

আমি চোখ বন্ধ করে হিমির পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে মুদ্রিত নয়নে গান ধরলুম,

'শুন রজকিনী রামী
শীতল জানিয়া ও দুটি চরণ
শরণ লইনু আমি!'

বললে, 'এ সুরটা সত্যি আমার প্রিয়। এর ভিতর কত মধুর আকুতি আর করুণ আত্মনিবেদন আছে।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা "শীতল চরণ" কেন বললে, বল তো?'

নাক তুলে বললে, 'বাঃ! সে তো সোজা। ধোপানী জলে দাঁড়িয়ে কাপড় আছড়ায় তাই।'

জাহাঁবাজ মেয়ে!

বললে, 'জান বঁধু, আজ ভোরবেলার আজান শুনে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন বুকের

ভিতরটা যেন একেবারে ঝাঁঝরা ফাঁকা বলে মনে হল। কিছু নেই, কিছু নেই, যেন কিছু নেই। পেটটাও যেন একেবারে ফাঁপা, যেন দাঁড়াতে পারব না। বুকের ভিতর কি যেন একটা শূন্যতা শুধু ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে। সব যেন নিঙড়ে নিঙড়ে নিচ্ছে। ওঠবার চেষ্টা করলুম, উঠতে পারলুম না। কোমরের সঙ্গে আমার বাকি শরীরের যেন কোন যোগ নেই।

'মোয়াজ্জিন তখন বলছে, "অস্-সালাতু খৈরুন্ মিন্ অন্-নওম্--নিদ্রাব চেয়ে উপাসনা ভাল।"'

'আমি কাতর নিবেদনে আল্লাকে বললুম, হে খুদাতালা, তোমার দুনিয়ায় তো কোনও কিছুরই অভাব নেই। আমাকে একটুখানি শক্তি দাও।'

আমি অনুনয় করে বললুম, 'থাক্ না।'

বললে, 'কাকে তা হলে বলি, বল। জানি, তুমি এ-সব শুনে কষ্ট পাও। কিন্তু তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য তো আমি আমার দুঃখের কথা বলছি নে। আবার না বলেও থাকতে পারছি নে। এ কী দ্বন্দ্ব, বল তো?'

আমি বললুম, 'তুমি বলে যাও। আমার শুনতেও ভালো লাগে যে সর্বক্ষণ আমি তোমাব মনের ভিতর আছি। এও তো দ্বন্দ্ব।'

'তবে শোন, আর শুনেই ভুলে যেযো। না' হলে আমাব বিবহে তোমার বেদনার ভার সেই স্মৃতি আরও ভারী করে তুলবে। নিজে কষ্ট তো পাবেই, তার উপর আমার কষ্টেব স্মরণে বেদনা পাবে বেশি।

'এই যে ফাঁকা ভাব ভোরবেলাকাব, এইটে বওয়াই সব চেয়ে বেশি শক্ত।'

'কে বল সহজ, ফাঁকা যাহা তাবে, কাঁধেতে বহিতে সওয়া?

জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায় ততই কঠিন বওযা।'

'ফাঁকা জিনিস ভাবি হয়ে যায, এর কল্পনা কি আমি কখনও করতে পেরেছি?

'কোন গতিকে এই দেহটাকে টেনে টেনে বাইরে এনে নমাজ পড়লুম। হায় রে নমাজ! চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেওযাকে যদি নমাজ বলে তবে আমার মত নমাজ কেউ কখনও পড়ে নি।'

আমি অতি কষ্টে চোখের জল থামিয়ে বলেছিলুম, 'সেই তো সব চেয়ে পাক্ নমাজ।'

যেন শুনতে পায নি। বললে, 'ইহ্ দিনাস্ সীরাতা-ল্ মুস্তকীমে" এলুম—"আমাকে সরল পথে চালাও"—তখন মন সেই সোজা পথ ছেড়ে চলে গেল নূতন অজানা দুর্ভাবনায়। তবে কি আমি ভুল পথে চলেছি বলে তাতে এত কাঁটা, বিভীষিকার বিকৃত ভাল?'

আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'বল তো গো তুমি, তোমাকে বিয়ে করার আগে যে আমি তোমার গা দু'তিনবার ছুঁয়েছি, তোমাকে হৃদয়-বেদনা বলেছি, তোমাকে স্বপ্নে কল্পনায় জড়িয়ে হৃদয়ে টেনে নিয়েছি, সেই কি আমার পাপ? আমি তো অন্য কোন পাপ করি নি।' এবারে উত্তরের জন্য চুপ করে গেল।

আমি বললুম, 'হিমি—'

'আঃ! বলে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার কোলে মাথা গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার মাথার চেয়ে বড় খোঁপাটা আস্তে আস্তে আলগা করে দিল। সমস্ত পিঠ ছেয়ে ফেলে তার চুল লম্বা কুর্তার অঞ্চলপ্রান্ত অবধি পৌঁছল। আমি আঙুল দিয়ে তাব গ্রীবা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উপরের দিকে তুলে বিলি দিতে দিতে অলকস্তবক অতৃপ্ত নিঃশ্বাসে শুষে নিয়ে বললুম, 'হিমিকা, আমি তো বেশি ধর্মগ্রন্থ পড়ি নি, আমি কি বলব?'

বললে, 'না গো, না। আমি মোল্লার ফৎওয়া চাইছি নে। তোমার কথা বল।'

'আমিও শুধাই, সবই শাস্ত্র, হৃদয় বলে কিছু নেই?'

স্পষ্ট অনুভব করলুম, তার চোখের জলে আমার কোল ভিজে গেছে।

বললুম, 'কেঁদো না, লক্ষ্মীটি।'

বললে, 'তুমি মেহেরবানী করে আজকের মত শুধু আমাকে কাঁদতে দাও। আজ আমার শেষ সম্বল উজাড় করে দিয়ে আর কখনও কাঁদবো না।'

উঠে বসল। চোখ তখন ভেজা। শব্‌নমের আঁখিপল্লব বড় বেশি লম্বা। জোড়া লাগার পর উপরের সারি উপরের দিকে আর নিচের সারি নিচের দিকে অনেকখানি চলে গিয়েছে।

'জান তুমি, যখন সব সান্ত্বনার পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন হৃদয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায়? আছে তোমার অভিজ্ঞতা? আমার আজ ভোরে হল।

'আমি নিজেকে বললুম, আমি যাচ্ছি আমার দয়িতের মিলনে, আমার স্বামী সঙ্গমে। আল্লা আমাকে এ হক্ক দিয়েছেন। আমাদের মাঝখানে কেউ যদি এসে দাঁড়ায় তবে সে শয়তান। আমি তাকে গুলি করে মারবো—পাগলা-কুকুরকে মানুষ যে রকম মারে, সাপের ফণা যে রকম রাইডিং বুট দিয়ে থেঁতলে দেয়।

'এই দেখ।'

পাশের স্তূপীকৃত বোবকার ভিতর থেকে বের করল এক বিরাট রিভলবাব। তার হ্যাণ্ড-ব্যাগের সেই ছোট্ট পিস্তলের তুলনায় এটা ভয়াবহ দানব।

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালুম। চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। কাঠের মত শুকনো প্রত্যেক চোখের প্রত্যেক পল্লব—আলগা আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে।

'প্রত্যেক শয়তানকে মারবো গুলি করে। অগুণতি, বেহিসাব—দরকার হলে। বোরকার ভিতরে রিভলবার উঁচু করে তাগের জন্য তৈরি ছিলুম সমস্ত সময়। কেউ সামনে দাঁড়ালেই গুলি। প্রশ্নটি শুধাবো না। বোরকার ভিতর থেকেই।

'তাদের মরা লাশের উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে আসতুম, তোমার কাছে।

'কী? আমার ছেলে হবে শুধু শান্তিব সুখময নীড়ে? বক্‌বীব কলিজা নিয়ে জন্ম নেবে তারা তা হলে। আমার নাতি কিংবা তার ছেলে হয়তো কোন কলিজা নিয়েই জন্মাবে না। শুধু রক্ত পাম্প করার জন্য এতখানি জায়গা জুড়ে এই বিরাট হৃদয়। আর আজ যদি আমি বিঘ্ন-বিপদ তুচ্ছ করে শয়তানকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তোমার কাছে পৌঁছই তবে আমার ছেলে হবে বাঘের গুর্দা, সীনা, কলিজা নিয়ে।'

আমি শব্‌নমকে কখনও এরকম উত্তেজিত হতে দেখি নি। কি করে হল? এ তো মাত্র এক মাস। কান্দাহারে এক বছর কাটিয়ে আসার পরও তো এরকমধারা দেখি নি। তবে কি সে কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে বনদেবতার শান্তিকামী অগ্রদূত বিহঙ্গের মত কলরবস্বরে সবাইকে সাবধান করে দিতে চায়? না, কোনও কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করেছে, এই এক মাস ধরে?

বললুম, 'তোমার রুদ্ররূপকে আমি ভয় করি, শব্‌নম। তুমি তোমার প্রসন্নকল্যাণ মুখ আমাকে দেখাও।

'আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বজনের শুভ আশীর্বাদ আমাদের মিলনের উপর আছে।'

কবিতা শুনতে পেলে সে ভারী খুশি হয়ে বলে আমি বললুম,

'দাবানল যবে বনস্পতির দগ্ধ দাহনে দহে
শুষ্কপত্র আর্দ্র পত্রে কোন না প্রভেদ সহে।'

শান্ত হয়ে গেল। বললে, 'কিস্মৎ!'

আমি তাকে আরও শান্ত হবার জন্যে চুপ করে রইলাম।

বললে, 'তুমি কিছু মনে করো না। ভেবেছিলুম বলব না, কিন্তু আমি পরপর তিনদিন উপোস করে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম, তাই এ-উত্তেজনা। উপোসের পরে মনে হল, তুমি যে সেই পাতি নেবুটি দিয়েছিলে সেইটে যদি তাজা থাকতো তবে শরবত বানিয়ে খেতুম।'

আমি বললুম, 'হা অদৃষ্ট! আমাব গাল টোল খায় না। তুমি কিসে ঢেলে খাবে? তা তুমি যত খুশি নেবু পাবে, আমাদের বাড়ির গাছে। আমরা যখন এক সঙ্গে হিন্দুস্থান যাব—'

দেখি সে তার বড় বড় চোখ আরও বড় করে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, 'কি হল?'

বললে, 'তাজ্জব! তাজ্জব। আমার দিবা স্বপ্নে তো এ-আইটেমটা বিলকুল স্থান পায় নি। দাঁড়াও, আমাকে বলতে দাও। ট্রেনে একটা কুপেতে শুধু তুমি আর অমি। না। তারই বা কি দরকার। তোমাকে তো কখনও ভিড়ের মাঝখানে আমি পাই নি। সে আনন্দ আমি পুরোপুরি রসিয়ে রসিয়ে চাখবো। ভিড়ের ধাক্কায় তুমি ছিটকে পড়েছ এক কোণে, দরজার কাছে, আর আমি আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তোমার পানে পিছন ফিরে। আয়নাতে দেখছি তোমার মুখের কাতর ভাব, আমার জন্য বার্থ পাও নি বলে। একটুখানি ঘাড় ফিরিয়ে তোমাকে হানবো মধুরতম কটাক্ষ—একগাড়ি লোকের কৌতূহল নয়নে তাকানোকে একদম পরোয়া না করে। আমার তখন কী গর্ব, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার জন্য কত ভাবছ।'

আমি বললুম, 'শোন শব্‌নম, তোমাকে একটা সত্য কথা আজ বলে রাখি। আমার মত লক্ষ লক্ষ হিন্দস্থানী আল্লার দুনিয়ায় রয়েছে। এমন কি এখানে যে কজন হিন্দুস্থানী আছে তার ভিতরও আমি অ্যাডোনিস্ বা রুডল্‌ফ্ ভালেন্টিনো নই। তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি ওদিকে আমুদরিয়া, পুবে পেশাওয়ারে, পশ্চিমে কান্দাহার, দক্ষিণে দক্ষিণ-পাহাড় ছাড়িয়ে কঁহা কহাঁ মুল্লুকে গেছে, কেউ জানে না। আমি শুনেছি ভারতীয় শিক্ষকদেব কাছে, তাঁরা শুনেছেন তাঁদের স্ত্রীদের কাছ থেকে। তাঁরা বলেন, বাদশা আমানুল্লা নিতান্ত একদারনিষ্ঠ বলে তুমি অবিবাহিতা—একই দেশে তো দুটো রাজা থাকতে পারে না, যদিও একই গাছ-তলায় একশ'টা দরবেশ রাত্রি কাটায়। গর্ব যদি কারও হয় তবে সে হবে আমার। তামাম হিন্দুস্থান তোমার দিকে তাকাবে আর ভাববে কোন্ পুণ্যের ফলে আমি তোমাকে পেয়েছি।'

বললে, 'শুনতে কী যে ভাল লাগে, কি বলব তোমায়। আমি জানি, আমার লজ্জা পাওয়া উচিত, মাথা নিচু করা উচিত, কিন্তু আমি এমনি বে-আব্রু বেহায়া যে এসব কথা আমার আরও শুনতে ইচ্ছে করছে। যদি কুপে পেয়ে যাই তবে আমি খোলা জানলার উপর মুখ রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকব, আর তুমি পিছনে বসে আমার পিঠের উপর খোলা চুলে মুখ গুঁজে এই সব কথা বলবে।'

তারপর আমার দিকে স্থির কিন্তু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'শুনে রাখ, আমি আমার ভালবাসা দিয়ে দেহের সৌন্দর্যকে হার মানাবো। সে হবে পরিপূর্ণ একটি হিমকণিকার মত—যার প্রেমের ডাকে আকাশের শত লক্ষ তারা হবে প্রতিবিম্বিত, আর দিনের বেলা গভীর নীলাম্বুজের মত নীলাকাশ—তার অন্তহীন রহস্য নিয়ে।'

তারপর শব্‌নম পড়লো তার সফর্-ই-হিন্দুস্তান অর্থাৎ ভারত ভ্রমণ নিয়ে।

হিন্দুস্থানের রেল লাইনের দু'পাশে অক্লেশে সে গজালে আঙুর বন, দিল্লিব কাছে এসে ব্লিজার্ডের বরফে ট্রেন আটকা পড়লো দু'দিন, ডাইনিং কারে অর্ডার দেওয়া মাত্র পেয়ে গেল কচি দুম্বার শিক্-কাবাব, ট্রেন পুরো পাক্কা একটা দিন ছুটলো ঘন চিনার বনের মাঝখান দিয়ে, আগ্রা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সে কিনলে নরগিস্ ফুল আর হলদে গুল-ই-দায়ুদী, মোমতাজের গোরে দেবার জন্য। আর সর্বক্ষণ পাশের গাড়িতে বসে আছে তোপল্ খান, উরুর উপর দু'খানি রাইফেল পাতা, পকেটে টোটা ভরা রিভলবার, বেল্টে দমস্কসের তলোয়ার—পাছে তার চার মুহম্মদী শর্তে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলার কেনা টিকিট স্বামীটিকে কেউ কেড়ে নেয়!

আমার তো ভয় হচ্ছিল, আবার বুঝি শব্‌নম বোরকার ভিতর থেকেই পিস্তল মারতে আরম্ভ করে—মার্কিন গ্যাংস্টাররা যে রকম পকেটের ভিতর থেকেই তাগ করে দুশমন ঘায়েল করতে পারে।

নানাবিধ মুশকিল যাবতীয় ফাঁড়া-গর্দিশ এবং তার চেয়ে প্রচুরতর আনন্দের ভিতর দিয়ে শব্নম বীবী তো শেষটায় পৌঁছলেন পূর্ব বাঙলায় তাঁর শ্বশুরের ভিটায়।

আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, 'বাঁচালে।'

'দাঁড়াও না, তোমার খালি তাড়া। হাফিজ বাঙলাদেশে না আসতে পেরে বাঙলার রাজদূতকে তার বাদশার জন্য কি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন? সেই যেটা তোমাকে হোটেলের বারান্দায় দিয়েছিলুম।'

আমি বললুম,

"হেরো, হেরো, বিস্ময়!

দেশ কাল হয় লয়!

সবে কাল রাতে জনম লইয়া এই শিশু কবিতাটি

রওয়ানা হইল পাড়ি দেবে বলে এক বছরের ঘাটি।"

'তুমিও এক মাসের বধূ, এক বছরের পথ পাঁচ দিনে পৌঁছলে।'

'চুপ, চুপ, ওই বৈঠকখানায় মুরুব্বীরা বসে আছেন। ওঁদের গিয়ে প্রথম সালাম করতে হবে, না সোজা অন্দরমহলে যেতে হবে? কী মুশকিল, কিচ্ছু যে জানি নে।'

আমি বললুম, 'এই বারে পথে এস—আমাকে যে কথা কইতে দাও না।'

'তোমার পায়ে পড়ি, বলে দাও না। এই কি দাদ নেবার সময়?'

আমি বললুম, 'প্রথম অন্দরে। মা বরবধূ বরণ করবেন যে।'

'সে আবার কি?'

'মা মোড়ায় বসবেন, আমি তাঁর ডান উরুতে বসব, তুমি বাঁ উরুতে বসবে—'

'সর্বনাশ! আমার ওজন তো কম নয়। তোমার কত?'

'একশ' দশ পৌণ্ড।'

'কিলোগ্রামে বল।'

'সে হিসেব জানি নে।'

'দাঁড়াও, কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসি।'

ওর আঁক কষার মাঝখানে আমি দরদ ভরা সুরে বললুম, 'হ্যাঁগা, তোমার হিসেবে তো দেখছি তোমার ওজন চার শ' পৌণ্ড। আমার চেয়ে চারগুণ ভারি। তা হতেও পারে।'

'ইয়ার্কি ছাড়। ওটা—ওটা—ওটা হল গিয়ে আউন্স।'

'তা হলে তোমার ওজন আমার চার ভাগের এক ভাগ, হবেও বা।'

'সর্বনাশ! তাও তো হয় না। এখন কি করা যায়?

আমি বললুম, 'আলতো আলতো বসলেই হবে।'

মা বরণ করলেন। কলাপাতা দিয়ে তেকোণা করে বানানো সমোসার মত পত্রপুটের ভিতর ধান—তিন কোণ দিয়ে বেরিয়ে আছে দূর্বা। আমাদের মাথার উপর অনেকগুলো রাখলেন। শব্নমের ওড়না তার হাঁটু পর্যন্ত নামানো।

আমার দুই ভাইঝি জাহানারা আর রানী—'কুটিমুটি'—প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়েছে নূতন চাচীর মুখ সব্ধলের পয়লা দেখবে বলে।

শব্নম স্বপ্ন দেখছে। আমি কথা বলে এক স্বপ্ন উড়িয়ে দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে আরেক স্বপ্নে ঢুকে যায়। কিন্তু সবচেয়ে তার ভাল লাগে মায়ের কোলে ওই বসাটা।

একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার রইল এ-জীবনে একটি মাত্র আশঙ্কা। মা যদি আমাকে ভালো না বাসে।'

আমি ব্যাকুল হয়ে বললুম, 'তুমি ওই ভয়টি করো না শব্নম—প্লীজ—লক্ষ্মীটি। তোমাকে

ভালবাসবে মা সবচেয়ে বেশি। তুমি কত দূরদেশ থেকে এসেছ, সব আপনজন ছেড়ে, শুধু আমাকে ভালবাস বলে। একথা মা এক মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারবে না। মাকে যদি কেউ ভালবাসে এক তিল, মা তাকে বাসে একতাল। আমাকে যদি কেউ ভালবাসে এক কণা, মা তাকে বাসবে দুই দুনিয়া—ইহলোক, পরলোক।'

'বাঁচালে। তুমি তো জান, আমার মা নেই।'

যাবার সময় শব্‌নম বললে, বিপদ ঘনিয়ে আসছে। শিগ্‌গিরই তার চরমে পৌঁছবে।'

আমি চিন্তিত হয়ে শুধালুম, 'তুমি কিছু জান?'

বললে, 'না। আমি শুধু আমার হাড়ের ভিতর অনুভব করছি।'

'আবার কবে দেখা হবে?'

'এরকম থাকলে রোজই আসতে পারব।'

তারপর দুজনাই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম, মুখোমুখি হয়ে। বলার কথার অভাব আমাদের কারোরই হয় না, কিন্তু বিদায়ের সময় যতই ঘনিয়ে আসে ততই আমরা শুধু একে অন্যের দিকে তাকাই আর আপন মনে মনে অজুহাত খুঁজি কি করে বিচ্ছেদ মুহূর্ত আরও পিছিয়ে দেওয়া যায়। শব্‌নম আমার মনের কথা আমার বেদনাতুর চোখ দেখেই বুঝতে পারে আর নিজের চোখ দুটি নিচের দিকে নামায়। হয়তো তার চোখে জল এসেছে। কখনও বা জড়িয়ে যাওয়া গলায় কি একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

এবারে বললে, 'তুমি প্রতিবারে আমাকে দাও আগের বারের চেয়েও বেশি। যত বেদনা নিয়েই বিদায়ের সময়টা আসুক না কেন, পথে যেতে যেতে ভাবি তুমি যে আনন্দ দিয়েছ এর বেশি আর আসছে বার কি দেবে? তবু তুমি দাও, প্রতিবারেই দাও, বেশি করে দাও, উজাড় করে দাও। কি দাও তুমি? আমি অনেক বার ভেবেছি। উত্তর পাই নি। এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, আমার রাজার রাজা, গোলামের গোলাম এই তো আমার আনন্দের পরিপূর্ণতার চরম সীমা। এর বেশি আমি কীই বা চাইতে পারি, তুমি কীই বা দিতে পার? তবু পাই, প্রতি বারেই অদ্ভুত অনির্বচনীয় রসঘন আনন্দ। আর যখন তুমি আমাকে বল, "আমি তোমাকে ভালবাসি" তখন আমার দুচোখ ফেটে বেরয় অশ্রু। আমার কানায় কানায় ভরা হৃদয়-পাত্র তখন যেন আর বেদনার কূল না মেনে উপছে পড়তে চায়। বল, তুমি আমায় কক্‌খনও ত্যাগ করবে না?'

আমি থতমত খেয়ে গেলুম। এত কথা বলার পর এই অর্থহীন প্রশ্ন? যেখানে আমরা পৌঁছেছি সেখানে এ-প্রশ্ন যে একেবারে অসম্ভব—পাগলেরও কল্পনার বাইরে।

বললে, 'তুমি আমাকে মার, সাজা দাও, ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দাও, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করো না।'

আমি কিচ্ছু বলি নি। শুধু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।

বললে, 'বড় দুঃখে আজ সকালে একটি কবিতা লিখেছি। নিজে কখনও এ জিনিস লিখি নি বলে প্রথম দু লাইন এক বিদেশী কবির কাছ থেকে নিয়েছি। কিন্তু আজ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কবিতাটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। তোমার কলমটা দাও। এটা কিন্তু গদ্যে লিখবো। এখন পড়ো না—আমি চলে যাওয়ার পরে পড়ো।'

দেউড়িতে এসে অবাক হয়ে শুধোলে, 'তুমি আবার চললে কোথায়?'

আমি বললুম, 'তোমাকে পৌঁছে দিতে।'

দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'অসম্ভব।'

আমি তর্ক করি নি।

ওই একটি দিন, একটি বার, আমি আমার জীবনে তার আদেশ লঙ্ঘন করেছি। তর্ক না করে, আপত্তি না তুলে। শেষটায় সে হার মানল। আমি বেশ কিছুটা পিছনে তার উপর নজর রেখে রেখে চললুম। বাড়ির দেউড়িতে পৌঁছে একবার ঘুরে দাঁড়াল।

সে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি, কিন্তু আমি শুনেছি সে বলেছিল, 'তোমাকে খুদার হাতে সমর্পণ করলুম।'

বাড়ি ফিরে এসে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলুম।

'তোমার আমার মাঝখানে বঁধূ অশ্রুর পারাবার
কেমনে হইব পার?
দুখ-রজনীর প্রেমের প্রদীপ ভাসায়ে দিলেম আমি
দীর্ঘ নিশ্বাস পালেতে দিলেম জানে অন্তরযামী।
শেষ দীপ-শিখা দিলেম তোমারে মোর কিছু নাহি আর
ত্বরা এস বঁধূ, বেগে এসে প্রভু, নামাও বেদনাভার।'

এর পর গদ্যে লেখা ঃ 'এর আর প্রয়োজন নেই
তুমি যে অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছ—'
বাকিটা শেষ করে নি।

পুরুষমানুষ হয়েও সে রাত্রে আমি কেঁদেছিলুম। 'হে পরমেশ্বর',—চোখের জলে বলেছিলুম, 'হে দয়াময়, আমাকে কেন পুরুষ করে জন্ম দিলে? এই বলহীনা সব বিপদ তুলে নেবে আপন মাথায় আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব? আমি কোনদিন তার কোনও কাজে লাগব না?'

ছয়

পর দিন সকালবেলাই খবর পেলুম, আমানুল্লার সৈন্যদল রাত্রিবেলা হেরে যাওয়াতে তিনি তাঁর বড় ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে কান্দাহার পালিয়ে গিয়েছেন!

রাস্তার অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। বোরকা তো অন্তর্ধান করেছেই, তাগড়া জোয়ানরাও একলা-একলি—বেরয় না—এক একটা দলে অন্তত পাঁচ-সাত জন না থাকলে মানুষ নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। বাচ্চার ডাকু সৈন্যদল রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে।

তিন দিন পর আমানুল্লার দাদাও সিংহাসন ত্যাগ করে চলে গেলেন। বাচ্চা সাড়ম্বরে সিংহাসনে বসল।

এসব খবর যে কোনও প্রামাণিক আফগান ইতিহাসে সবিস্তরে পাওয়া যায়—একথা পূর্বেই বলেছি। আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি; বাচ্চার আপন হাতে জ্বালানো দাবানল শব্‌নম ও আমার মত নিরীহ শুষ্ক পত্রের দিকে কি ভাবে এগিয়ে এল সেইটে বোঝাবার জন্য হ্রস্বতম খেইগুলো ধরিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

দু হাতে মাথা চেপে ভাবছি, কি করি, কি করি? কোন দিকে পথ, কোথায় আলো—আর কোনটাই বা আলেয়া?

সুখ চাই নে, আনন্দ চাই নে, এমন কি প্রিয়মিলনও চাই নে—কি করে এই দাবানল থেকে শব্‌নমকে রক্ষা করি?

আমি রক্ষা করবার কে?

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়িতে বুটের ধপাধপ শব্দ করে আব্দুর রহ্‌মান ঘরে ঢুকে প্রায়

অস্ফুট স্বরে বললে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।' আব্দুর রহ্‌মানের গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

আমি দু'বার শুনেও প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারি নি।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম।

মাথা নিচু করে কিচ্ছু না বলে নীরব অভ্যর্থনা জানালুম।

তিনি গম্ভীরে—এবং সেই অর্ধসংবিতেও আমার মনে হল—প্রসন্ন অভিবাদন জানালেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আপনার পরে'—অর্থাৎ 'আপনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।' তিনি কেন এসেছেন, এই ভাবনার ভিতরও আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, শব্‌নমের গলা মধুর, এঁর গলা গম্ভীর, অথচ দু'গলারই আদল এক, ঝংকার-সমধ্বনি। যেন শিশু শব্‌নম বাপের পাগড়ি জোব্বা গোঁফদাড়ি পরে এসেছে।

আমি আপত্তি না জানিয়ে শুধু 'খানা-ই শুমা অস্ত্—এটা আমার বাড়ি' বলে আগে আগে পথ দেখিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ইরানী কায়দায় একবার 'এটা আপনার বাড়ি' বলার পর অভ্যাগতজন আদেশ করবেন, গৃহস্থ তাঁর কথা মত চলবে।

আমাকে আসন দেখিয়ে নিজে সোফায় বসলেন।

আমি কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইরান আফগানের মুরুব্বীরা এতে খুশি হয়ে বলেন, 'বাচ্চা খিজালৎ মী কশদ্—ছেলেটার আব্রু-শরম-বোধ আছে।'

শুধালেন, 'আপনি আমার পরিচয় জানেন?'

আমি মৃদু কণ্ঠে বললুম, 'কিছু কিছু জানি।'

বললেন, 'তাই যথেষ্ট। আমিও আপনাকে কিছু কিছু চিনি। এদেশে এখন অল্প-বিস্তর বিদেশী আসতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু আমি সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার সুযোগ এখনও পাই নি। তবে গেল বছর আপনাদের কলেজের বাৎসরিক পরবে, আপনি এদেশে শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেইটে শোনবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আপনি বড় একাগ্র মনে অত্যন্ত দরদ দিয়ে আপনার বক্তব্য পেশ করেছিলেন, সেটা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার মনে হয়েছিল, আপনি এই পরদেশকে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছেন। নয় কি?'

আমি মাথা নিচু রেখেই বললুম, 'এদেশ আমাকে অবহেলা করে নি। এদেশে আমি আশাতীত ভালবাসা পেয়েছি। প্রতিদানের চেয়েও বেশি দেবার চেষ্টা করেছি।'

'এই তো ভদ্রজনের আচরণ।'

আমি তখন শুধু ভাবছি, তাঁর এখানে আসার রহস্য কি? তবে কি শব্‌নম তাঁকে কিছু বলেছে। তাই বা কি করে হয়?

নিজের থেকেই তিনি কাবুলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় আমাকে বোঝালেন। তাঁর যুক্তিধারা থেকে পদে পদে প্রমাণ হল তিনি সাধারণ সৈন্যদের কঠিন জিনিস বোঝাতে অভ্যস্ত।

সর্বশেষ বললেন, 'আমি সোজা কথা বলাটাই পছন্দ করি। আমার মনে হচ্ছে, আপনিও সরল লোক। তাই আপনার কাছে অন্য লোক না পাঠিয়ে আমি নিজেই এসেছি। যদিও এ অবস্থায় নিজে আসাটার রেওয়াজ এদেশে নেই।

'আমি আমার নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি নি। আমি সিপাই। প্রাণের প্রতি যাদের অত্যধিক মায়া তারা ফৌজে বেশিদিন থাকে না—অন্তত শুধুমাত্র দু'পয়সা কামাবার জন্য আমার ফৌজে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না।

'এবার আপনাকে যা বলছি তা গোপনে।'

'আমার একটি কিশোরী কন্যা আছে। লোকে বলে অসাধারণ সুন্দরী। অন্তত তার সে খ্যাতি

অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। আমি আজ বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি বাচ্চা-ই-সকাওয়ের দ্বিতীয় সেনাপতি—প্রথম সেনাপতির ছোট ভাই—বছর দুই পূর্বে কাৎ বেচতে এসে তাকে কাবুলে দেখতে পেয়েছিল—আমার মেয়ে সচরাচর পর্দা মানতো না। যে জিনিস তখন তার বদ্ধ উন্মাদাবস্থার ও উৎকট কল্পনার বাইরে ছিল আজ সৈন্যদল প্রয়োগে সেটা অসম্ভব নাও হতে পারে।

'আপনি হিন্দুস্তানী। আপনি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করেন তবে সে হিন্দুস্তানী ন্যাশনালিটি পেয়ে যাবে। আমি আপনাদের রাজ-দূতাবাসে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, ভারতীয় এক বড় রাজকর্মচারী বললেন, 'আইনত আমার মেয়ের যে অধিকার জন্মাবে সেটা তিনি রক্ষা করার সর্ব চেষ্টা করবেন।' যদিও প্রয়োজন ছিল না, তবুও কথা উঠেছিল, এখানে শিক্ষিত অবিবাহিত কে কে আছেন। সেই প্রসঙ্গে আপনার নাম যখন উঠল, মাত্র তখনই তিনি সন্তর্পণে তাঁর উৎসাহ দেখিয়েছেন।'

এই অভাবনীয় পরিস্থিতির সামনে পড়ে আমি বিস্ময়েই হোক, আনন্দেই হোক, কিছু না বুঝতে পেরেই হোক হয়তো একটা অস্ফুট শব্দ করেছিলুম।

তিনি বললেন, 'আপনি একটু চিন্তা করুন এবং তার পূর্বে বাকি কথা শুনে নিন।

'বাচ্চা-ই-সকাও এখন মোল্লাদের কথা মত চলে। অন্তত তারা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়াটাতে সম্মতি দিতে পারবে না।

'ব্রিটিশ অ্যারোপ্লেন ভারতীয় নারীদের আপন দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ভারতীয় কর্মচারী আমাকে সদয় আশ্বাস দিয়েছেন, প্রথম সুযোগেই তিনি আমার মেয়েকে হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দেবেন।

'এদেশে ফরাসী, জর্মন—বিদেশী প্রায় সবই অবিবাহিত। কিন্তু আমার মেয়ে কিছুতেই ইউরোপীয় বিয়ে করবে না। প্রথমত তারা খৃষ্টান, দ্বিতীয় তাদের সাম্রাজ্যবাদ প্রবৃত্তি এবং তৃতীয়—বোধ হয় এইটেই সর্বপ্রথম বলা উচিত ছিল—তাদের শারীরিক অশুচিতা সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। যদিও তার তমদ্দুন-ফরহঙ্গের, বৈদগ্ধের অর্ধেকেরও বেশী ফরাসী।

'এ কথাটা তুললুম, আপনি হয় তো শুধাবেন, আমার মেয়ের মত আছে কিনা। আপনি মত দিলে তাকে আমি জিজ্ঞেস করব, কারণ ধর্মত আইনত সে প্রাপ্তবয়স্কা। যদি সে অমত করে, আশা করি আপনার অভিমানে লাগবে না। যে রকম আমি আপনাকে সরল মনে বলছি, আপনি অমত করলে আমি কণামাত্র অপমানিত বোধ করব না।

'কারণ, হয়তো আপনারা আপনাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করেন না; আমরাও আমাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করি নে—যদিও ইসলাম এরকম গোষ্ঠী পাকানো নিন্দার চোখে দেখে। আপনি রাজী না হলে আমি কখনও ভাববো না, আপনি আমার মেয়েকে কিংবা আমি এবং আমার গোষ্ঠীকে খাটো করে দেখলেন।

'আমার মেয়ে সম্বন্ধে বাপ হয়ে আমি কি বলব। আমি প্রশংসা করতে চাই নে। সে আমার একমাত্র মেয়ে, ছেলেও নেই, তার গর্ভধারিণী—'

এই প্রথম তাঁর সরল দৃঢ় কথাতেও যেন একটু অতি ক্ষীণ কাঁপন শুনতে গেলুম।

'—অল্প বয়সে মারা যান। বাপ হয়ে তাই ইংরেজের মত ম্যাটার অব্ ফ্যাক্ট্ বা সাদামাটা ভাবে বলি, তার চারটে 'বি'-ই আছে। বিউটি, ব্রেন, বার্থ, ব্যাঙ্ক—অবশ্য চতুর্থটা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সর্বশেষে আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই, আপনি রাজী হলে ফলস্বরূপ বাচ্চার সেনাপতির বিরাগভাজন হবেন।'

এতক্ষণ তিনি আমার দিকে ঝুঁকে, উরুতে দুই কনুই রেখে, চিবুক দুই হাতের উপর রেখে কথা বলছিলেন। এবারে শিরদাঁড়া খাড়া করে ফৌজী কায়দায় সোজা হয়ে বসে বললেন, 'এবারে আপনি চিন্তা করে বলুন।'

তিনি যে ভাবে শান্ত হয়ে আসনে বসলেন তার থেকে বোঝা গেল, প্রিয় অপ্রিয় নানারকম

সংবাদ শুনতে তিনি অভ্যস্ত। আমার 'না' তাঁকে বিচলিত করবে না, আমার 'হ্যাঁ' তাঁকে প্রসন্ন করবে।

আমার 'হ্যাঁ', 'না', ভাববার কি আছে। তবু আমি এতই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম যে প্রথমটায় আমি কিছুই বলতে পারি নি। তারপর মাথা নিচু রেখেই নববরের কণ্ঠে বলেছিলুম, 'আপনার কন্যাকে আমি আল্লাতালার মেহেরবানীর মত পেতে চাই।' আমি ইচ্ছে করেই আমার সম্মতি প্রস্তাবের রূপ দিয়ে প্রকাশ করেছিলুম—কিন্তু আপন অজানতে। আমি বিশ্বাস করি, করুণাময় তাঁর অসীম দয়ায় মূককে যে শুধু ভাষাই দেন তা নয়, সৌজন্যের ভাষাও বলতে শেখান।

আওরঙ্গজেব খান দাঁড়িয়ে উঠে আমায় আলিঙ্গন করলেন।

আসন গ্রহণ করে বললেন, 'আমার কন্যার কিস্মৎ যদি ভালো থাকে তবে আপনি অসুখী হবেন না। আর আপনি আমার উপকার করলেন। জামাতার কাছে উপকৃত হওয়া বড় আনন্দের বিষয়।'

আমি বললুম, 'আপনি গুরুজন। যদি অনুমতি করেন তবে একটি নিবেদন আছে।' আমি আমার গলা ফিরে পেয়েছি।

প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'আপনি দয়া করে উপকারের কথা তুলবেন না। আমি আপনার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করছি, শিষ্য যে রকম মুর্শীদের কাছে গুরু-কন্যা কামনা করে।'

এবারে তিনি বিচলিত হলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন আমার মস্তক চুম্বন করতে করতে বললেন, 'বাচ্চা—বৎস—তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে, তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে। তোমার পিতামাতার আশীর্বাদ তোমার উপর আছে।'

আমি তাঁর হস্তচুম্বন করলুম।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'পাপাচার শুভবুদ্ধির চেয়ে দ্রুত গতিতে চলে। তাই শুভকর্ম শীঘ্র করতে হয়। বাচ্চার সেনাপতি জাফর খানের পাপবুদ্ধিকে হারাবার জন্য তোমাদের বিবাহ যতশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা উচিত। তুমি কি বল?'

আমি বললুম, 'আপনার কাছ থেকে আমার পরিচিত 'শুভস্য শীঘ্রম্' বাক্যের প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ বুঝলুম। এখন থেকে আমার আর কোন মতামত নেই।'

'আজ সন্ধ্যায়?'

'আজ সন্ধ্যায়।'

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সময় কম। ব্যবস্থা করতে হবে। কী-ই বা ব্যবস্থা করব? এই দুর্দিনে?'

আমি জানি শব্‌নম রাজী, কিন্তু ইনি কোন সাহসে সব ব্যবস্থা করার চিন্তাতে লেগে গেলেন। বোধহয় কন্যার জনকানুরাগে অখণ্ড বিশ্বাস ধরেন।

আমাকে কোনও কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে এক মুহূর্তেই অন্তর্ধান করলেন।

মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি। আমি মুক্তি পেয়েছি।

আর আমাকে হাত-পা-বাঁধা অসহায়ের মত মার খেতে হবে না। ওই আমলেই বাঙলাদেশে আমাদের মধ্যে রটেছিল যে টেগার্টের পুলিস বিপ্লবীদের হাত পা বেঁধে সর্বাঙ্গে মধু মাখিয়ে ডাঁশ পিঁপড়ের মাঝখানে ফেলে রাখে। আমাকে আর যে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না।

আমি এখন শব্‌নমের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব।

তার মিলনের জন্যে এখন আমাকে আর প্রহরের পর প্রহর গুনতে হবে না। আমি

যে কোন মুহূর্তে তার সম্মুখে উপস্থিত হতে পারি। আমার দশদিন এখন সত্যই নিরদ্বন্দ্বা হয়ে গেল।

পরিপূর্ণ আনন্দের সময় মানুষের মন ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধায় না। একটা আনন্দ নিয়ে সে পড়ে থাকতে ভালবাসে। শিশুর মত একটি পুতুলই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে যায়। আমি আমার মুক্তির আনন্দ নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ে রইলুম। আমার অন্য সৌভাগ্যের কথা ভাববারই প্রয়োজন হল না, ফুরসত হল না।

এক ঘণ্টা হয় কি না হয়, এমন সময় আব্দুর রহ্‌মান সৌম্যদর্শন এক অতি বৃদ্ধকে আমাব ঘরে নিয়ে এল। ধবধবে সাদা চাপ দাড়ি, সাদা গোঁফ—মোল্লাদের মত ছোট করে ছাঁটা নয়, সাদা বাবরী চুল, তার উপর সাদা পাগড়ি, চোখের পাতা এমনকি ভুরু পর্যন্ত বরফের মত সাদা। এবং সে সাদা বেয়ে যেন তেল ঝরে পড়ছে। এঁর বয়স কম হলে আমি বলতুম, এটা সাদা নয়, সত্যিকারের প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড।

আমি তাঁকে যত্ন করে বসালুম।

অতি সুন্দর ফার্সী উচ্চারণে বললেন, 'আমি আওরঙ্গজেব খানের গুরু। তার মেয়েবও গুরু। দু'জনাকেই ফার্সী পড়িয়েছি। এখনও আমাদের তিন জনাতে মুশাইরা হয়।

'এই খানিকক্ষণ আগে আওরঙ্গজেব খান এসে আমায় সুখবর শোনালে, আপনাব সঙ্গে শব্‌নমের শাদি আজ সন্ধ্যাবেলাতেই হবে। আমি বড় খুশি হয়েছি। আমি বড়ই খুশি হয়েছি।'

এইটুকু বলে তিনি দু'খানা হাত তুলে আল্লার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রার্থনা করলেন। আমিও হাত তুলে আস্তে 'আমিন' 'আমিন' বললুম।

বললেন, 'যেই শুনতে পেলুম, আপনার মুরুব্বী এখানে কেউ নেই, অমনি আমি বললুম আমার উপর এর ভার রইল। আওরঙ্গজেব চায় নি যে এই খুন-রাহাজানিব মাঝখানে আমি রাস্তায় বেরুই। আমি স্পষ্ট তাকে বলে দিলুম, এ সংসারে আমি এমনিতেই আর বেশি থাকব না—না হয় দু'দিন আগেই গেলুম।'

আমি বললুম, 'আপনি শতায়ু হন।'

বৃদ্ধের রসবোধ আছে। বললেন, 'আমার বয়স আশি হয়েছে। আবও কুড়ি বছব বাঁচতে চাই নে। বরঞ্চ ওই কুড়িটি বছর আপনি আপনার আয়ুতে জুড়ে দিন কিংবা শব্‌নম বানু আব আপনাতে ভাগ করে নিন। কোন জিনিস বরবাদ করাটা আমি আদপেই পছন্দ করি নে। এখন, প্রথম কথা ঃ আওরঙ্গজেব খান আপনাকে জানাতে বলেছেন, ''আজ সন্ধ্যায় আপনাদের বিবাহ।'' আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

'দ্বিতীয় কথা ঃ আপনার বন্ধুবান্ধব কে কে এখানে আছেন তাঁদের নাম-ঠিকানা বলুন। আমি কিংবা আমার বাড়ির লোক তাঁদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসবে উভয় পক্ষ থেকে। দু'জন করে লোক যাবে।'

আমি বললুম, 'এই দুর্দিনে নিমন্ত্রণ করে কাকে আমি বিপদে ফেলি? তাদের কারোর যদি ভালমন্দ কিছু একটা হয় তবে তার বাল-বাচ্চার সামনে আমি আমার মুখ দেখাতে পারব না। আর আমার সেরকম মিত্র সখাও কেউ নেই। এঁদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এখানে—তাও সহকর্মীরূপে। কিন্তু তার পূর্বে আমার উচিত আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ কবা।'

বৃদ্ধ ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'না, না, না। আপনি বিদেশী—এদেশের অবস্থা জানেন না। এখন শুধুমাত্র লৌকিকতা করার জন্য রাস্তায় বেরনো উচিত নয়। আমি আপনার হয়ে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাব। তারা সবাই বরপক্ষের হয়ে যাবে।

'এবারে আপনার খিদমতগার আব্দুর রহ্‌মানকে দাওয়াৎ করতে হবে।'

আমি বললুম, 'তাকে ডাকি।'

আবার ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'না, না, না। আমি তাকে হিন্দুস্তানী কায়দায় কনে পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ জানাব তার কাছে গিয়ে।

'তৃতীয় কথা ঃ আপনার জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা আমি করব। আমার মেয়ে আপনার মোটামুটি উচ্চতা আওরঙ্গজেব খানের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে এবং সেলাইয়ের কলে বসে গিয়েছে। এ-তো জোব্বাব ব্যাপার, হাঙ্গামা কম। এবার আপনি আমার বুকে বুক লাগিয়ে দাঁড়ান। আমি ঠিক ঠাহর করে নিই।'

মোকা পেয়ে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা আলিঙ্গনও দিলেন।

আমি তাঁর হস্তচুম্বন করে বললুম, 'আমার বলতে সাহস হচ্ছে না, কিন্তু কাপড়-চোপড়ের খরচটা?'

বৃদ্ধ সপ্রতিভ। বললেন, 'নিশ্চয়! খয়রাতী বা ধারের জামা জোড়ায় বিয়ে করাটা মনহূসী—অপয়া।'

আমি বললুম, 'এদেশে ভারতীয় কারেন্‌সির কদর আছে বলে শুনেছি।'

তাঁকে আমার মনিব্যাগটা দিলাম।

তিনি দু-একখানা নোট তুলে নিয়ে বললেন, 'বিয়ের পর শব্‌নম আর আমার মেয়েতে বোঝাপড়া করে নেবে।'

বৃদ্ধ উঠলেন।

এঁর কথা বলার ধরন শোনার মত। শব্‌নম বয়েৎ ছাড়ে মাঝে-মধ্যে, ইনি প্রায় প্রত্যেকটি কথা বললেন, বয়েতের মারফতে। ঠিক বলতে পারব না, বোধ হয় তাঁর মেয়ে যে সেলাইয়ের কলে বসে গেছেন সেটাও বয়েতেই বলেছিলেন। কিন্তু শব্‌নমের বেলা যেরকম তাকে থামিয়ে টুকে নিতে পারি, এঁর বেলা সেটা পারলুম না বলে দুঃখ রয়ে গেল।

আব্দুর রহ্‌মানকে দাওয়াৎ জানিয়ে বিদায় নেবার সময় আমাকে বললেন, 'আপনাকে কয়েকটি বয়েৎ শোনালুম, আপনি তো আমাকে একটিও শোনালেন না। আপনার বুঝি ওতে মহব্বৎ নেই।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনাকে শোনাবো আ মি? আপনার তো সব বয়েৎ জানা।'

তিনি বললেন, 'সে কি কথা? চেনা গান লোকে শোনে না? নূতন লাইব্রেরিতে গেলে আমরা সর্বপ্রথম চেনা বইয়ের সন্ধান করি নে? জলসা-ঘরে গিয়েও প্রথম খুঁজি চেনা মুখ এবং বলতে নেই গোরস্তানে গিয়েও প্রস্তরফলকে চেনা জনেরই নাম খুঁজি।'

বাপ্‌স্! চার চারটে তুলনা—এক নিঃশ্বাসে।

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'আমার এক বন্ধু একটি কবিতা লিখেছেন শুনবেন?' বলে নরগিসের...

তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অশ্রুর পারাবার
কেমনে হইব পার—?

কবিতাটি শোনালুম। বুড়ো একবারে থ' মেরে গেলেন। 'কাবুলের লোক এরকম লিখেছে? অসম্ভব! ওর সঙ্গে আমার আলাপ করতেই হবে। বয়সে নিশ্চয়ই কাঁচা। চিন্তাশীল এবং স্পর্শকাতর। ছন্দে মিলে সবুজ রঙের কাঁচা ভাব একটু রয়েছে। যদি লেগে থাকে তবে ইরান হিন্দুস্তানে একদিন নাম করবে। ইন্ শা আল্লা, ইন্ শা আল্লা—আল্লা যদি দেন, আল্লা যদি করান।'

দেউড়িতে বললুম, 'আমাকে দয়া করে আপনি বলবেন না।'

হেসে বললেন, 'নওশাহ্, নূতন রাজা, নববর, তাই বলেছি। কাল থেকে তুমি বলব। আওরঙ্গজেবও বলেছিলেন, 'বাচ্চা খিজালৎ মী কশদ'—ছেলেটির আব্রু-শরম বোধ আছে।' আমি

বড় খুশি হয়েছি, আগাজান। আর কানে কানে বলি, শব্‌নমের মত মেয়ে আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে দুটি দেখি নি। নাম সার্থক করে শব্‌নমের মত পবিত্র।'

অতি সত্য কথা তবু আমার অভিমান হল। সবই শব্‌নম, শব্‌নম—আমি যেন কিচ্ছুই না।

সাত

আমার প্রিয়া, আমার বউ, আমার বিবাহিত স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে চলেছি!

এ যেন একই দিনে দু'বার সূর্যোদয়। কিন্তু তাও হয়। সূর্যোদয়ের একটু পরে ঘন মেঘে সূর্য পড়ল সম্পূর্ণ ঢাকা। সব কিছু ভাসা-ভাসা অন্ধকার—সূর্যোদয়ের পূর্বে যে রকম। মেঘ কেটে পরিষ্কার আকাশে আবার পূর্ণ সূর্যোদয় হল।

কিংবা বলব, ভারতবর্ষে মানুষ যেমন একই দেহ নিয়ে দুইজন্ম লাভ করে 'দ্বিজ' হয়। প্রথম জন্ম তার ব্যক্তিগত, দ্বিতীয় বারে লাভ করে গুরুর আশীর্বাদ, সমাজের সম্মতি। আমাদের এই দ্বিতীয় বিয়েতে আমরা পাব পিতার আশীর্বাদ, সমাজের মঙ্গল কামনা।

সুস্থ বর স্বাভাবিক অবস্থায়ও পরের দিন ঠিক ঠিক বলতে পারে না, কি কি হয়েছিল, কোন্‌টার পর কি ঘটেছিল। আমার অবস্থা আরও খারাপ।

কিংখাপের জামা-জোব্বা পরে মাথা নিচু করে বসে আছি শাদির মজলিসের মাঝখানে। একবার মাথাটা অল্প উঁচু করে চার দিকে তাকালুম। মাত্র একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেলুম। আমার কলেজের আমারই ছাত্র। তারই কচি মুখটি শুধু হাস্যোজ্জ্বল। আর সকলের মুখে আনন্দ আতঙ্কে মেশানো কেমন যেন এক আবছায়া আবছায়া ভাব। আবার মাথা নিচু করলুম।

এবারের বিয়েতে শব্‌নম সভাতে এসে আমার মুখোমুখি হয়ে বসল না। আমার মুখপাত্র হয়ে একজন 'উকীল' দু'জন সাক্ষীসহ অন্দরমহলে গিয়ে বিবাহে শব্‌নমের সম্মতি নিয়ে এসে মজলিসে আমার সামনে মুখোমুখি হয়ে বসে বললেন, 'অমুকের কন্যা অমুক, আপনি, অমুকের পুত্র অমুককে এত স্ত্রীধনে মহম্মদী চার শর্তে বিবাহ করতে রাজী আছেন—আপনি কবুল আছেন?' বাকিটা প্রথম বারেরই মত।

হ্যাঁ, মনে পড়ল। এর আগে একটা দ্বন্দ্ব হয়ে গিয়েছে স্ত্রীধন কত হবে তাই নিয়ে। সাধারণত বর পক্ষ সেটা কমাতে চায়, কন্যা পক্ষ সেটা বাড়াতে চায়। এখানে হল উল্টো। পরিবারের ঐতিহ্য ও সম্মান বজায় রেখে আওরঙ্গজেব খান কমিয়ে কমিয়ে যে অঙ্ক বললেন আমি তাঁর গুরুর মারফতে ঢের বেশি অঙ্ক জানিয়ে দিলুম। গুরুই শেষটায় রফারফি করে দিলেন।

বড় দুঃখে তোপল্ খানের কথা মনে পড়ল।

বর বধূর মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করেছিলেন গুরু। সমস্তটা কবিতায়। এবং সব কবিতা মাত্র একজন কবি মৌলানা জালালউদ্দীন রূমী-র থেকে নিয়ে। আশ্চর্য, কি করে জানলেন উনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় কবি।

তারপর সব ঝাপসা।

আমার অপরিচিত এক ভারতীয় বোধহয় আমাকে মুরুব্বীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁদের সম্মান জানাতে তাঁরা আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সকলের পয়লা কার কাছে গিয়েছিলুম মনে নেই। শ্বশুরমশাই কিংবা জ্যাঠ-শ্বশুরমশাই—অর্থাৎ জানেমন্—আমি কারও মুখের দিকে তাকাই নি।

এসব কায়দা খাস আফগানী কিনা জানি নে। পরে শব্‌নমের কাছে শুনেছিলুম ওই অপরিচিত ভারতীয় মিত্রটি সব কিছু আধা-আফগান আধা-হিন্দুস্তানী কায়দায় করিয়েছিলেন।

জিরোবার জন্য আমাকে ছুটি দেওয়া হল। বেরুতেই দেখি আমার ছাত্রটি। সে আনন্দে, উৎসাহে সেখানে চেঁচামেচি লাগিয়েছে। আমার সম্বন্ধে তার গুণকীর্তনের যেটুকু কানে এসেছিল তার সিকি ভাগ সত্য হলে তুর্কীর খলিফার সিংহাসন ইস্তাম্বুল জাদুঘর থেকে বের করে এনে তার উপর আমাকে বসাতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নোবেল প্রাইজের সব কটা পুরস্কার নাগাড়ে এক শ' বছর ধরে আমাকে দিয়ে যেতে হয়।

আমাকে দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে এসে আমার হাত দু'খানার উপর তার দু'চোখ চেপে ধরে বার বার বলে, 'হুজুর, এ কী আনন্দ, আপনি আমাদের দেশে বিয়ে করলেন। হুজুর, ইত্যাদি।' শেষটায় বললে, 'কলেজের সবাই বড় পরিতৃপ্ত হবে, হুজুর, এ আমি বলে রাখছি।'

হায় রে কলেজ! আমরা তখনও জানতুম না বাচ্চা তিন দিন পরে কাবুলের তাবৎ ইস্কুল-কলেজ নস্যাৎ করে দেবে।

একটা ঘরে বসিয়ে তামাক সিগারেট আমার সামনে রাখা হল। শব্‌নমের সমবয়সী আত্মীয়-স্বজনবা প্রথমটায় কিন্তু কিন্তু করে পরে বাঁধন-ছাড়া বাছুরের মত লাফালাফি দাপাদাপি ঠাট্টা-রসিকতা করলে। আমার কবিতার শখ জেনে শেষটায় লেগে গেল বয়েৎ-বাজি, কবিতার লড়াই এবং মুশাইরা। শুধু ফার্সী না—দুনিয়ার যত সব ভাষায়। তবে মোলায়েম প্রেমের কবিতার অধিকাংশই ছিল ফার্সীতে।

খবর এল, জানেমন্ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমাকে সামনে বসিয়ে আমার সর্বাঙ্গে হাত বুললেন। এমন কি চোখে, নাকে, গালে, কপালে, ঠোঁটে পর্যন্ত। তখন দেখলুম, তিনি অন্ধ।

অতি মৃদু কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন, 'শোন বাচ্চা, তোমাকে সব কথা বলার মত লোক এ বাড়িতে আর কেউ নেই আমি ছাড়া। জন্মের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত শব্‌নম একদিনের তরেও আমার চোখের আড়াল হয় নি। আমি জন্মান্ধ নই, যৌবনে চোখের জ্যোতি হারাই। শব্‌নম সে জ্যোতি ফিরিয়ে এনেছে। আজ যদি কেউ বলে শব্‌নমের ভালবাসার পথে আমি একটিমাত্র কাঁটা পুঁতলে আমার চোখের জ্যোতি ফিরে পাব, তা হলে আমি সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দেব।

'প্রথম দিনই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, সে ভালবেসে ফিরেছে। যখন ফিরে এল, তখনই শুনি তার গলা বদলে গিয়েছে, তার হাসি বদলে গিয়েছে, আমাকে আদর করার ধরন বদলে গিয়েছে। যেন এতদিন ছিল পাতার আড়ালে লুকনো ফুল—এখন তার উপর পড়েছে প্রভাতবেলার স্নিগ্ধ আলো! ঘরের কোণের প্রদীপ হঠাৎ যেন আকাশের বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন নবীন মাধুরী এসে ধরা দিয়েছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নূতন তালে নেচে উঠেছে।

আমার থেকে দূরে চলে গেল? না, বাচ্চা, না। সেই তো প্রেমের রহস্য।

'এতদিনে বুঝতে পারল, আমি তাকে কতখানি ভালবেসেছি—তোমাকে ভালবাসার পর। আগে আমার কাছে আসত ঝড়ের মত, বেরিয়ে যেত তীরের মত। এখন আমার সঙ্গে কাটায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তোমার বিরহ থেকে বুঝেছে, যে আড়ালে গেলে আমার কী দুশ্চিন্তা হয়। যে-বেদনা সে পেয়েছে, সেটা সে আমাকে দিতে চায় না। অথচ দুই ভালবাসার কত তফাত। আমার ভালবাসা মরুভূমিতে মরণাপন্ন তৃষ্ণার্তকে সঞ্জীবনী অমৃত বারি দেওয়ার মত।

'আমাকে কিছু বলে নি। আমিও জিজ্ঞেস করি নি। প্রেম গোপন রাখতে যে গভীর আনন্দ আছে তার থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করতে যাব কেন? শুনেছি প্রথম গর্ভধারণ করে বহু মাতা সেটা যত দিন পারে গোপন রাখে। নিভৃতে আপন মনে সেই ক্ষুদ্র শিশুটির কথা ধ্যান করতে করতে সে চলে যায় সেই স্বর্গলোকপানে, যেখান থেকে মুখে হাসি নিয়ে নেমে আসবে এই শিশুটি।

'আমিও নিভৃতে অনেক চিন্তা করেছি, কে-সে বীর যে শব্‌নমের চিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছে। তার সঙ্গে যাদের বিয়ে হতে পারে তাদের সবাইকে তো আমি চিনি। এদের কেউই নয়, সে-কথা নিশ্চয়।

'বুঝলুম, কোন জায়গায় কোন বিপত্তি বাধা আছে তাই সে তোমাকে পুরোপুরি পাচ্ছে না। আমার বেদনার অন্ত রইল না। ওই একবার আমার নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাল, কেন আমি জ্যোতিহীন হলুম। না হলে আমি তোমাদের বাধাবিঘ্ন সরিয়ে দিতুম না, যার সামনে দু'জন দু'দিক থেকে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে?'

সে বেদনা আজ কেটে গিয়েছে বলে তার স্মরণে জানেমনের মুখ পরিতৃপ্তির স্মিতহাস্যে কানায় ভরে উঠল।

আমি বললুম, 'আমি বিদেশী। আপনারা আমাকে হিমি– শব্‌নমের উপযুক্ত মনে করেন কিনা সেই ভয়ে আমিও অসহায়ের মত মার খেয়েছি। আমি বুঝি।'

'তোমার গলাটি আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। এখন তো ওই দিয়েই আমি মানুষকে চিনি। আরও কাছে এস বাচ্চা। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দাও। শব্‌নম যে রকম দেয়। এ কি, তোমার হাত অত নরম কেন? প্রায় শব্‌নমের মত!'

আমি হেসে বললুম, 'বাঙলাদেশের লোক আপনাদের মত শক্তিশালী হয় না।'

'বাঙলাদেশ? তাই বল। তাই শব্‌নমের এত প্রশ্ন, হাফিজ বাঙলাদেশে গেলেন না কেন, হাফিজের অর্থকষ্ট বাঙলার রাজা তো দূর করে দিতে পারতেন, আরও কত কি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল, একদিন সে যখন এক অজানা কবির কবিতা পড়ে আমায় শোনাতে গেল। ভারী মধুর আর করুণ! ঠিক ফার্সী নয়, আবার ইউরোপীয় কবির ফার্সী অনুবাদও নয়। কেমন যেন চেনা চেনা অথচ অচেনা। আবার কেমন যেন এটা-ওটায় মেশান। যেন গন্ধ গোলাপের, চেহারা কিন্তু নরগিসের, এ আবার বসন্তে না ফুটে ফুটেছে যেন শীতকালে। একটি কবিতা আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে—''খুদ্-কুশী-ই সিতারা''। বৃদ্ধ থামলেন। যেন মনে মনে কবিতাটির চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে নিলেন।

বুঝলুম, এটা 'তারকার আত্মহত্যা'।

আমি বললুম, 'এ কবির পিতা সূফী সাধক ছিলেন এবং অতি উত্তম ফার্সী জানতেন। কবি বাল্যবয়সে পিতার কোলে বসে বিস্তর ফার্সী গজল-কসীদা শুনেছেন। আসছে গ্রীষ্মে এখানে তাঁর আসবার কথা ছিল; বোধহয় আপনাদের কবি হাফিজ বাঙলাদেশে যেতে পারেন নি বলে বাঙলার কবি তার প্রতিশোধ নিতে আসছিলেন। এখন তো সব কিছু উলোট-পালট হয়ে গেল।'

জানেমন্ বললেন, 'হাফিজের পাঁচ শ' বছর পরে যোগাযোগ এসেছিল তোমাদের কবির মাধ্যমে। আরও ক'শ' বছর লাগবে ফের এই যোগাযোগ হতে কে জানে? কে যেন এক বিদেশী জ্ঞানী দুঃখ করে বলেছেন, মানুষ একে অন্যকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে বেশী—দু'জনের মাঝখানে সেতু বাঁধার চেষ্টা করে তার চেয়ে ঢের ঢের কম;—

''হায় রে মানুষ,
বাতুলতা তব
পাতাল চুমি;—
প্রাচীর যত না
গড়েছ, সেতু তো
গড়ো নি তুমি।''

'তাই প্রার্থনা করি, শব্‌নমে তোমাতে আজ যে সেতু গড়লে সেটি অক্ষয় হোক।'

আমি বললুম, 'আমেন—তাই হোক।'

এমন সময় খবর এল, ভোজে বরকে ডাকা হচ্ছে।

উঠবার সময় জানেমন্ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার যদি একটা কথা বিশ্বাস কর, তবে বলি, শব্‌নমের মধ্যে এতটুকু খাদ নেই। ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলে তোমার কক্খনো

কোনও ক্ষতি হবে না। মিথ্যা কখনও তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। শিশিরবিন্দুর মত সত্যই সে পবিত্র, স্বর্গ হতে সে এসেছে সম্পূর্ণ কলুষ-কালিমা মুক্ত হয়ে। আমি বুঝেছি, তুমিও বড় সরল প্রকৃতি ধর। তোমাদের মিলনে স্বর্গের আশীর্বাদ থাকবে।'

আমাকে উপহার দিলেন এক বিরাট বদখ্‌শানী রুবি। তার উপরে খোদাই সম্পূর্ণ কাবা শরীফের ছবি। এত বড় রুবি আর এ রকম সূক্ষ্ম খোদাই আমি কাবুল জাদুঘরেও দেখি নি অথচ আমি জানতুম, বদখ্‌শান আফগানিস্থানের প্রদেশ বলে কাবুলের জাদুঘরে রুবির যে সঞ্চয় আছে সেটি পৃথিবীতে অতুলনীয়।

বললেন, 'মনে যদি কখনও অশান্তি আসে তবে এটি আতশী কাচ দিয়ে দেখো। শুনেছি, জমজমের কুয়ো পর্যন্ত দেখা যায়। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে নাকি জল ওঠাবার সাজসরঞ্জাম পর্যন্ত পরিষ্কার ফুটে ওঠে। এটি আমাদের পরিবারে ছ' শ' বছর ধরে আছে। প্রার্থনা করি, কাবা যতদিন থাকবে, তোমাদের ভালবাসা ততদিন অক্ষয় থাকবে।'

'আমেন।'

তারপর আবার সব ঝাপসা। আবছায়া আবছায়া মনে পড়ছে, ভোজে পাশে বসেছিল আমার ছাত্রটি। সে আমাকে এটা ওটা খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল আর তার উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত আনন্দ সে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না। আমি নিজের অপ্রতিভ ভাব ঢাকবার জন্য তাকে সংস্কৃতের 'হাঁহাঁং দদ্যাৎ, হুঁহুঁং দদ্যাৎ' এবং 'পরান্নং প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে—' ফার্সীতে অনুবাদ করে মৃদু কণ্ঠে শুনিয়েছিলুম।

রাত প্রায় বারোটার সময় এক অপরিচিত নওজোয়ান আমাকে হাত ধরে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তেতলার মুখে এক দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে বললে, 'বড়ই আফসোস, কি করে হৃদয়-দুয়ার ভেঙে নববরের—নওশাহের—নবীন বাদশার সিংহাসন লাভ করে অভিষিক্ত হতে হয় তার খবর আমি জানি নে। আমার সে সৌভাগ্য এখনও হয় নি। আপনাকে তাই কোন সদুপদেশ দিতে পারলুম না। তবে এটুকু জানি, শব্‌নম বানুর প্রসন্ন, অতিশয় সুপ্রসন্ন সম্মতি নিয়েই এই শুভ মুহূর্ত এসেছে। আজ পর্যন্ত কাবুল-কান্দাহার, জলালাবাদ-গজনীর কোন তরুণই সাহস করে শব্‌নম বানুর পাণি কামনা করতে পারে নি। আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই আপনি তরুণ সমাজের সুস্মিত অভিনন্দনসহ তাদের গর্বের ধনের সঙ্গে চারিচক্ষু মিলনে যাচ্ছেন। সুদিন এলে আমরা আপনাদের নিয়ে যে নয়া-পরব করব, তখন দেখতে পাবেন আপনি কারও দিলে এতখানি চোট না দিয়ে শব্‌নম বানুর দিল জয় করেছেন। এবকম সচরাচর হয় না। শব্‌নম বানু অসাধারণ বলেই এই অসম্ভবটা সম্ভব হল। আবার অভিনন্দন জানাই।'

দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

সে ছবি আমি জীবনে কখনও ভুলব না।

যবে থেকে আমাদের এ বিয়ে ঠিক হয়েছে তখন থেকে এ ছবিটি কিরকম হতে পারে তার নানা স্বপ্ন আমি সমস্ত দিন ধরে দেখেছি। বরযাত্রায় আসার সময়, বিয়েবাড়ির চাপা কলরব মৃদু গুঞ্জরন, শাদিমজলিসের গম্ভীর নৈস্তব্ধ্যে, এমন কি চাচা-জান যখন তাঁর স্নেহপ্লাবন দিয়ে আমার হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন তখনও—তখনও আমি একটার পর একটা ছবি মনে মনে এঁকেছি আর মুছেছি, মুছেছি আর এঁকেছি। কখনও দেখেছি সখীজন পরিবৃতা শব্‌নম বাসরঘরের কলগুঞ্জরন মুখরিত উজ্জ্বলালোকে নববধূর অতিভূষণে জর্জরিতা, আভূমি বিনতা। আর কখনও দেখেছি সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘরের একপ্রান্তে আমি জাত-মূর্খের মত দাঁড়িয়ে ভাবছি—কিংবা বলব, ভাবতেই

পারছি নে, কি করা উচিত। হয়তো অনেক কষ্টে এদিক ওদিক হাতড়ে হাতড়ে আসবাবপত্রের ধারাল খোঁচায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কোনও গতিকে শব্‌নমের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময়, এমন সময় হঠাৎ ঘরের চারিদিকে জ্বলে উঠল পঞ্চাশটা জোরাল টর্চ। সঙ্গে সঙ্গে অট্টরোল অট্টহাস্য। শব্‌নমের সখীরা চতুর্দিকের দেওযালের সঙ্গে গা মিশিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিলেন এই শুভ মুহূর্তেব জন্য। আলো জ্বালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাঁইয়া গান ধরলে,

'রুটি খায় নি, দাল খায় নি, খায় নি কভু দই,
হাড়-হাভাতে ওই এল রে—খাবে তোরে সই!
মরি, হায় হায় রে!'

কাবুলের বজ্র-বিগলন শীতে আমার মন ঘেমে ঢোল—না, না, ঢোল নয়, জগঝম্প।

সব ছবি ভুল, কুল্লে তসবির তালগোল পাকিয়ে প্রথমটায় পিকাস্‌সোতে পবিবর্তিত হয়ে অন্তর্ধান করল।

বিরাট ঘর। কাবুলের গৃহস্থ বাড়ির চারখানা বৈঠকখানা নিয়ে এই একটা ঘর।

তার সুদূরতম কোণে একটি গোল টেবিল। টেবিলক্লথ ভারী মখমলের—জমে-যাওযা রক্তের কাল্‌চে লাল রঙের। তার উপরে সেই প্রাচীন যুগের গ্লোবওলা এক বিরাট রীডিং-ল্যাম্প। সমস্ত ঘর প্রায়ান্ধকার রেখে তার গোল আলো পড়েছে শব্‌নমের মাথাব উপর, হাঁটুব উপর, পাদপীঠে রাখা তার ছোট্ট দুটি পায়েব উপর। ঠাণ্ডা, মোলায়েম আলো—আর সেই আলোতে শব্‌নম বাঁ হাতে তুলে ধরে একখানা চটি বই পড়ছে।

শান্ত, নিস্তব্ধ, নির্দ্বন্দ্ব, গ্রন্থিমুক্ত বিশ্রান্তি।

ত্রিভুবনে আব যেন কোনও জনপ্রাণী, কীটপতঙ্গ নেই। শুধু একা শব্‌নম। সে প্রশান্ত চিত্তে অপেক্ষা করছে তার দয়িতের জন্য। সে আসছে দূর দূরান্ত থেকে—যেখানে তৃতীযাব ক্ষীণচন্দ্র গোধূলি লগনের তারাকে পাণ্ডুচুম্বন দিয়ে বাঁশবনেব সবুজ নীড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আশ্চর্য! সে আমি! কে বিশ্বাস করবে সে আমি!

পা টিপে টিপে কিছুটা এগুতে না এগুতেই শব্‌নম মাথা তুলে আমার দিকে তাকালে। যত নিঃশব্দেই আমি এগুই না কেন, তার কান শুনতে পাক আর না-ই পাক, তার সদাজাগ্রত কোটিকর্ণ হৃদয় তো শুনতে পাবেই পাবে।

আমি দ্রুততর গতিতে এগুলুম। আমার হিযার বেগের সঙ্গে আমি পেবে উঠি কি করে?

শব্‌নম সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সিংহাসনই বটে। সেই কাল্‌চে লালের মখমলে মোড়া, সোনালী কাঁধ হাতলওলা, তার মাঝে মাঝে রয়েল ব্লু-ব মীনা দিয়ে আঙুরগুচ্ছ আঙুরপাতার নক্‌শা কাটা সুউচ্চ সিংহাসন। বসবার সীট মাটি থেকে আট দশ ইঞ্চি উঁচু হয় কি না হয, কিন্তু পিছনের হেলান মানুষের মাথা ছাড়িয়ে আরও দু'মাথা উঁচু।

এই প্রথম শব্‌নম আমার সঙ্গে লৌকিকতা করে উঠে দাঁড়ালে।

আমার দিকে তাকিয়ে চোখমুখ ঠোঁট গাল চিবুক নাসারন্ধ্র কানায় কানায় ভরে তুলে আমার দিকে তৃপ্তি দাক্ষিণ্য আর নর্মসম্ভাষণের মৃদু হাসি হাসলে।

গালের টোল কোন্ অতল গভীরে লীন হয়ে গিয়েছে। সেখানে অন্ধকার। আলো ঢুকতে পারে নি বলে? না, সেখানে কেউ এক ফোঁটা কাজল ঢেলে দিয়েছে বলে?

আজ শব্‌নম সেজেছে।

নববধূকে জবড়জঙ্ করে সাজানোতে একটা গভীর তত্ত্ব রয়েছে। রূপহীনার দৈন্য তখন এমনই চাপা পড়ে যায় যে সহৃদয় লোক ভাবে, 'আহা, একে যদি সরল সহজভাবে সাজানো হয় তবে মিষ্টি দেখাতো; আর সুরূপার বেলাও ভাবে ওই একই কথা—না সাজালে তাকে আরও অনেক বেশি সুন্দর দেখাতো।

শব্‌নমকে সেভাবে সাজানো হয় নি, কিংবা সেভাবে সে নিজেকে সাজাতে দেয় নি।

এ যেন পূর্ণচন্দ্রের দূরে দূরে কয়েকটি তারা ফোটানো হয়েছে—চন্দ্রের গরিমা বাড়ানোব জন্য। এ যেন উৎসব-গৃহের সৌন্দর্যের মাঝখানে ধূপকাঠি জ্বালানো হয়েছে। শব্‌নমের ভাষায় বলি, বাতাসে বাতাসে পাতা গোলাপ-সৌগন্ধের মাঝখানে বুলবুলের বীথি বৈতালিক!

তার চুলের বিচ্ছুরিত আলোর মাঝখানে থাকে থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ রূপালী শামা-প্রজাপতি। মাথায় অভ্র-আবীর ছড়ানো হয়েছে অশেষ সযত্নে, এক একটি কণা করে—তিন সখী বাসর গোধূলিতে আরম্ভ করে এইমাত্র বোধ হয় কুন্তল প্রসাধন সমাপন করেছেন।

চোখের কোল, আঁখিপল্লব, ধনু-ভুরু এত উজ্জ্বল নীল কেন? এ তো কাজল কিংবা সুর্মার রঙ নয়। এ যে এক নবীন জলুস। তবে কি নীলকান্তমণি চূর্ণ করে কাজলের কাজ করা হয়েছে। তারই শেষ কয়টি কণা টোলের অতলে ছেড়ে দিয়েছে।

এঁকে বেঁকে নেমে আসা দুই জুলফের ডগায় আবার সেই নীলমণি-চূর্ণ। একদিকে তুষার শুভ্র কর্ণশঙ্খ, অন্যদিকে রক্ত কপোল।

সে কপোল এতই লাল যে, আজ যেন কোনও প্রসাধন প্রক্রিয়া দ্বারা সেটাকে ফিকে কবা হয়েছে। বদখ্‌শানের রুবি চূর্ণ দিয়ে? তা হলে ঠোঁট দুটিকে টসটসে রসাল ফেটে যায়-যায় আঙুরের মত নধর মধুর করে লালের এ-আভা আনা হল কিসের চূর্ণ দিয়ে? এ রঙ তো আমি আমার দেশের বিশ্ববিটপীর উচ্চতম শাখাতে পল্লববিতানেব অন্তরালে দেখেছি—যেখানে মানুষের কলুষদৃষ্টি, দুষ্ট বালকের স্থূল হস্ত পৌঁছয় না।

ওষ্ঠ পূর্বভাগে, স্ফুরিত নাসারন্ধ্রের নিচে সামান্য, অতি সামান্য একটি নীলাঞ্জন বেখা। ভরা ভাদ্রের গোধূলি বেলা আকাশের বায়ু কোণে পুঞ্জে পুঞ্জে জমে ওঠা শ্যামাম্বুদে আমি দেখেছি এই রঙ। গভীব রহস্যে ভরা এই রঙ। তাবই উপরে স্ফুরিত হচ্ছে শব্‌নমের দুটি নাসারন্ধ্র। নিচে অতি ক্ষীণ কম্প্রমান স্ফুরণ লেগেছে তার ওষ্ঠাধরে।

এই প্রথম দেখলুম তার চোখ দুটি। এ দুটি থেকে আগুনের ফুলকি বেরুতে দেখেছি, এ আঁখি দুটিতে আচম্বিতে জল ভরে ফেটে পড়তে দেখেছি, কিন্তু এ চোখ দুটিকে আমি কখনও দেখি নি। আজ এই প্রাচীন দিনের ল্যাম্প আমাদের মিলনের শুভলগ্নে ঠিক সেই আলোটি ফেললে যার দাক্ষিণ্যে আমি শব্‌নমের চোখ দুটি দেখতে পেলুম।

সবুজ না নীল? নীল না সবুজ? অতৃপ্ত নয়নে আমি সে দুটি আঁখির গভীরতম অতলে অনেকক্ষণ ধরে তাকালুম তবু বুঝতে পারলুম না সবুজ না নীল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, দেখেছি বটে এই রঙ আসামের হাফলঙের কাছে। বড় বড় পাথরের মাঝখানে গিরিপ্রস্রবণ কুণ্ডের স্থির নীলজলের অতলে সবুজ শ্যাওলা। সেদিন ঠিক করতে পারি নি, কি রঙ দেখলুম, নীল না সবুজ—আজ বুঝলুম দুয়ের সংমিশ্রণে এমন এক কল্পলোকের রঙ প্রভাসিত হয় যে, সে রঙ ইহভুমের আর্টিস্টের পেলেটে তো নেই-ই, সৃষ্টিকর্তা যে আকাশে রঙ-বেরঙের তুলি বোলান তাতেও নেই।

শব্‌নমের স্মিতহাস্য ফুরোতে চায় না। কী মধুর হাসি।

কাবুলের মেয়েরা কি বিয়ের রাতে গয়না পরে না। শব্‌নম পরেছে সামান্য দু'তিনটি। তার সেই বিরাট খোঁপা জড়িয়ে একটি মোতির জাল। ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদামের উপর স্তরে স্তরে, পাকে পাকে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমানীকণা ঝিলিমিলি মেলা লাগিয়েছে।

দু' কানে দুটি মুক্তোলতা ঝুলছে আর তার শেষ প্রান্তে একটি করে রক্তমণি—রুবি। শুভ মরাল কণ্ঠের বরফের উপর যেন দু' ফোঁটা সদ্যঝরা তাজা রক্ত পড়েছে। এই, এখ্‌খুনি বুঝি রক্তের ফোঁটা দুটি ছড়াতে চুবসাতে আরম্ভ করবে।

কাবুলী কুর্তা গলাবন্ধ হয়—বিশেষ করে মেয়েদের। আজ দেখি, গলা অনেকখানি নিচে ঘুরিয়ে কাটা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে একটি মোতির মালা। তার শেষ প্রান্তে কি, দেখতে পেলুম না।

সেটি জামার ভিতরে। সে কী সৌভাগ্যবান। এই এতদিনে বুঝতে পারলুম কালিদাস কোন্ দুঃখে বলেছিলেন, 'হে সৌভাগ্যবান্ মুক্তা, তুমি একবার মাত্র লৌহশলাকায় বিদ্ধ হয়ে তার পর থেকেই প্রিয়ার বক্ষদেশে বিরাজ করছ; আমি মন্দভাগ্য শতবার বিরহ শলাকায় সছিদ্র হয়েও সেখানে স্থান পাই নে।'

শব্‌নমের পরনে সার্টিনের শিলওয়ার, কুর্তার রঙ ফিকে লাইলেক, ওড়না কচি কলা-পাতা রঙের, এবং দুধে-আলতা সংমিশ্রণের মত সেই কচি কলাপাতা রঙের সঙ্গে দুধ মেশানো। ইতস্তত রূপালী জরির চুমকি। কলাবনে জোনাকির দেয়ালি।

শব্‌নমের স্মিতহাস্য অন্তহীন। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি।

হাসতে হাসতে আমাকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটের উপর তার স্ফুরিতাধরোষ্ঠ চেপে ধরে যেন অতৃপ্ত আবেগে আমার পাণ্ডুর অধরের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিতে লাগল।

আমি মোহ্যমান, কম্প্রবক্ষ, বেপথুমান। আমার দৈহিক স্পর্শকাতরতা অস্তমিত। আমাব সর্বসত্তা শব্‌নমে বিলীন।

কোন্ দিগন্তে সে আমায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কোন্ তারা নির্ঝরের ছায়াপথে সে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে, কোন্ সপ্তর্ষিব তারাজাল ছিন্ন করে কোন্ কোন্ লোকে নিয়ে গিয়েছিল জানি নে। অচৈতন্য অবস্থায় দেখি, আমি শব্‌নমের সিংহাসনে বসে আছি, সে আমার কোলে আড়াআড়ি হয়ে বসে, তার বুক আমার বুকের উপর রেখে, ডান হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে, বাঁ হাত দিয়ে আমার গাল বুলোতে বুলোতে, তার মুখ আমার কানের উপর চেপে ধরে শুধোচ্ছে, 'খুশি? খুশি? খুশি? খু...???'

আমি আলিঙ্গন ঘনতর করে বলেছিলুম, 'আমি তোমার গোলাম। আমাকে তোমার সেবাব কাজ দাও।'

শুধিয়ে চলেছে, 'খুশি? খুশি? খুশি—?'

আমি বললুম, 'আল্লা সাক্ষী, আমি প্রথম যেদিন তোমাকে ভালবেসেছি, সেদিন থেকে শত বিরহ-বেদনার পিছনেও খুশি। তুমি জান না, তুমি আছ, এতেই আমি খুশি। প্রথম দিনের প্রথম খুশির প্রথম নবীনতা বারে বারে ফিরে আসছে।'

শব্‌নম গুনগুন করে ফরাসীতে গাইলে,

' "করেছি আবিষ্কার
তোমারে ভালবাসিবার
প্রথম যেমন বেসেছিনু ভালো, সেই বাসি প্রতিবার।"

নয় কি?'

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই বললে, 'দাঁড়াও! আলো জ্বালি।'

আমার কথায় কান না দিয়ে ঘরের প্রায়ান্ধকার কোণ থেকে নিয়ে এল আঁকশি। তার ডগার ন্যাকড়ায় কি মাখানো জানি নে। শব্‌নম আনাড়ী হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে সেটার কাছে নিতেই দপ করে জ্বলে উঠল। সেই জ্বলন্ত আঁকশি দিয়ে সে ঝাড়বাতির অগুনতি মোমবাতি জ্বালালে। ঘরের দেয়ালে দামী ফরাসী সিল্কের ওয়ালপেপারে সে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে।

আমার পায়ের কাছে পাদপীঠে বসে বললে, 'তুমি নূতন রাজা এসেছ, তোমাকে বরণ করার জন্য সব কটা আলো জ্বালতে হয়। যে বেশ পরেছ, তার জন্য এ আলোর প্রয়োজন। কী সুন্দরই না তোমাকে—'

'থাক্।'

'চুপ!—দেখাচ্ছে। আমার ওস্তাদের মেয়ের রুচি আছে।'

আমি বললুম, 'তোমাদের কবি হাফিজই তো বলেছেন

"বলে দাও বাতি না-জ্বালায় আজি, আমাদের নাহি সীমা,
আজ প্রেয়সীর মুখ চন্দ্রের আনন্দ পূর্ণিমা" ' (সত্যেন দত্ত)

শব্‌নম বলল, 'ওঃ হাফিজ। তিনি তো বলেছেন 'আজ বাতি জ্বালিয়ো না' —অর্থাৎ তার পরব মাত্র এক দিনের তরে। আমাদের পরব হবে প্রতি রাত্রি। তাই আজ রাত্রের আনুষ্ঠানিক আলো মাত্র একবারের তরে জ্বালিয়ে দিলুম। ভয় করো না, তাও নিবিয়ে দিচ্ছি এখ্‌খুনি।'

আমি খুশি হয়ে বললুম, 'টেবিল ল্যাম্পের ওই ঠাণ্ডা আলোতে তোমাকে কী অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল কি বলব? মাথার চুল থেকে খালি পায়ের নখের ডগাটি পর্যন্ত কী এক অদ্ভুত রহস্যময় অথচ কী এক অনাবিল শান্তিতে ভরপুর হয়ে বিভাসিত হচ্ছিল, কী করে বোঝাই? আচ্ছা, মোজা-ছাড়া পায়ে তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না—বাইরে যা শীত!'

অবাক হয়ে বললে, 'বারে! তুমি যে বলেছ আমার খালি পা দেখতে তোমার ভালো লাগে।'

আমি আপসোস করে বললুম, 'তোমার কতটুকু দেখতে পাই?'

চোখ পাকিয়ে বললে, 'চোপ! দুষ্টুমি করো না। চোখ ঝলসে যাবে। সেমেলে যখন জুপিটারের দেহরূপ দেখতে চেয়েছিলেন তখন তার কি হয়েছিল জান না?'

আমি শুধালুম, 'কি হয়েছিল?'

'আলোতে পোকা পড়লে যেরকম ফট করে ফেটে যায়—তাই হয়েছিল। প্রত্যেক মানুষই জুপিটার। তার দেহরূপ উন্মোচন করা বিপজ্জনক। জান, তাকাতে গিয়ে আমারই মাঝে মাঝে ভয় হয়।'

ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে কোথা থেকে সিগারেট এনে ঠোঁটে চেপে, আনাড়ী ধরনের দেশলাই ধরিয়ে কাশতে কাশতে আমায় দিয়ে বললে, 'ভালো না লাগলে ফেলে দিয়ো।'

এ দুর্দিনে এরকম সোনামুখী খুশবোদার মিশরী সিগারেট পেল কোথায়?

বললে, 'জানেমন্ তিন মাস অন্তর অন্তর তিন তিন হাজার করে মিশর থেকে আনায়। আমাকে ধরাবার চেষ্টা করেছিল -পারে নি। কিন্তু কেউ খেলে সিগারেটের গন্ধ আমার ভালোই লাগে। ন্যাকরা করে ওয়াক্, থুঃ বলতে পারি নে।'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ! এই সুপার স্পেশাল সিগারেট যিনি খান তাঁর জন্যে তুমি এনেছিলে আমার সেই ওঁচা সিগারেট।'

বললে, 'আমার বন্ধুর সিগারেট। জানেমন্ দুটো ধরিয়ে একটা আমাকে দিয়ে বললে, এ সিগারেট খেতে তো তোর আপত্তি হবে না।'

আমি শঙ্কিত হয়ে শুধালুম, 'তুমি কি বলেছিলে?'

'নির্ভয়ে বলেছিলুম, "লব্-সুখ্‌তে।" পোড়ার ঠোঁটো, পোড়ার মুখো, যা খুশি বলতে পার। ওই পোড়ার সিগারেট খেয়ে খেয়ে জানেমন্ তার ঠোঁট মভ্ করে ফেলেছে, দেখ নি?'

আমি শুধালুম, 'তন্ময় হয়ে কি পড়ছিলে? "গুড্ বাই টু ফ্রীডম্"?'

বললে, 'সে কি? বরঞ্চ তোমার লীলা খেলা বন্ধ হল। কিন্তু আগে বলি, তোমার নিশ্চয় হাসি পাচ্ছে, একই কনেকে দু' দু'বার বিয়ে করছ বলে? আমারও পাচ্ছিল।—হঠাৎ মনে পড়ল, তোমাকে বলেছিলুম, তুমি দ্বিচারী—তুমি বাস্তবে আমাকে আদর কর, আর স্বপ্নে আরেক জনকে। আল্লাতালা তাই একই শব্‌নমের সঙ্গে তোমার দু' দু'বার বিয়ে দিয়ে তোমাকে দ্বিচারী বদ্‌নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্বপ্নের শব্‌নম আর বাস্তবের হিমিকা এক হয়ে গেল। না?'

আমি বললুম, 'অতি সূক্ষ্ম যুক্তিজাল। কিংবা বলব হৃদয়ের ন্যায়-শাস্ত্র—নব্য 'নব্য-ন্যায়'। তোমাকে তো বলেছি, হৃদয়ের যুক্তি তর্কশাস্ত্রের বিধিবিধানের অনুশাসন মানে না। আকাশের জল আর চোখের জল একই যুক্তি কারণে ঝরে না।'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'এ কথাটা তুমি আমাকে কক্‌খনো বল নি। এ ভারী নূতন কথা।'

আমি বললুম, 'হবেও বা, কারণ কোনটা আমি তোমাকে বলি আর কোন্‌টা নিজেকে বলি এ দুটোতে আমার আকছারই ঘুলিয়ে যায়।'

আমার হাঁটুর উপর চিবুক রেখে শব্‌নম অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে লাগলুম, শব্‌নম কি গিরগিটি? সে যেমন দেহের রঙ বদলায় সেই রকম শব্‌নম চোখের রঙ ঘড়ি ঘড়ি বদলাতে পারে। আলোর ফেরফারে তো এতবেশি অদলবদল হওয়ার কথা নয়। এখন তো দেখছি, শ্যাওলার ঘন সবুজ, অথচ এই অল্প কিছুক্ষণ হল দেখেছি একেবারে স্বচ্ছ নীল। তবে কি ওর হৃদয়াবেগ, চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের রঙও বদলায়। স্থির করলুম, লক্ষ্য করে দেখতে হবে।

আমি মাথা নিচু করে, দু'হাত দিয়ে তার মাথা তুলে, তার ঠোঁটের উপর ঠোঁট রাখলুম। আমার চোখ দুটি তার চোখের অতি কাছে এসে নিবিড় দৃষ্টিতে তার চোখের অতলে পৌঁছে গিয়েছে। শব্‌নম অজানা আবেশে চোখ দুটি বন্ধ করলে।

কতক্ষণ চলে গেল কে জানে? বুকের ঘড়ি যেন প্রতি মুহূর্তে প্রহরের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। হিমিকাকে এই আমার প্রথম চুম্বন।

অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় একশ' বছর পরে, শব্‌নম তার ঠোঁট যতখানি সামান্যতম সরালে কথা বলা যায়, সেটুকু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'চুমো খাওয়া তোমাকেই সাজে। সেই নদীপাড়ে প্রথম হার মানার পর আমি মনস্থির করেছিলুম, সব জিনিস আমি দেব, আর তুমি নেবে। চুমো খাব আমি, আলিঙ্গন করব আমি, আর তোমাকে যে তোমার ছেলেমেয়ে দেব আমি, সে তো জানা কথা। এখন দেখছি, তা হয় না। চুমো খাওয়া পুরুষেই সাজে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমি যদি বলি, তুমি যখন আমাকে চুমো খাও তখন আমার কাছে সেটা অনন্তগুণ মধুময় বলে মনে হয়?'

'বাঁচালে'—বলে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চাপ দিলে নিবিড় আবেশে।

জানি নে, কতক্ষণ, বহুক্ষণ পরে দেখি, শব্‌নম আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। বললে, 'আমার খোঁপাটা খুলে দাও।'

তারপর হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে আবার উড়ে গিয়ে ফিরে এল ফিরোজা রঙের চীনা কাচের একটি ডিকেন্টার হাতে করে। কাচের ফিকে রঙের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কড়া লালের বেগনী আভা।

বললে, 'পার্দনে মোয়া, মঁশের্—মাপ কর দোস্ত্—একদম ভুলে গিয়েছিলুম, তুমি আমার গালের টোল ভরে শীরাজী খেতে চেয়েছিলে।'

আমি রীতিমত ভয় পেয়ে বললুম, 'করেছ কি? এটা যোগাড় করতে গিয়ে জানাজানি হয় নি?'

শব্‌নম হেসে ফেটে আটখানা। বললে, 'তুমি কি ভেবেছ, তুমি মোল্লাবাড়িতে বিয়ে করেছ? রাজা তিমুর থেকে আরম্ভ করে বাবর, হুমায়ুন—কে শরাব খেয়ে টং হয় নি বল তো? এ বাড়িতে আমার ঠাকুরদা পর্যন্ত। তাঁর জমানো মাল এখনও নিচে যা আছে তা দিয়ে তিন পুরুষ চলবে।'

আমি বললুম, 'আমার দরকার নেই। আমি হাফিজের চেলা। তিনি বলেছেন, "শর্করা মিঠা, আমারে ব'ল না, হিমি। আমি তাহা জানি"—' সঙ্গে সঙ্গে শব্‌নম গেয়ে উঠল,

"তবু সবচেয়ে, ভালবাসি ওই, মধুর অধরখানি।"

আমি বললুম, 'তুমি যে এত আলো জ্বালিয়েছ তারও দরকারও নেই ঃ—

"বলে দাও, বাতি না জ্বালায় আজি, আমাদের নাহি সীমা"—'

সেই আঁকশির উল্টো দিক দিয়ে আলো নেবাতে নেবাতে গুনগুন করে শব্‌নম বার বার গাইলে,

"আজ প্রেয়সীর মুখচন্দ্রের আনন্দ পূর্ণিমা।"

তারপর ঘরের কোণ থেকে সেতার এনে আমার কোলের উপর বসে তার খোলা চুল আমার বুকের উপর ছেড়ে দিয়ে সমস্ত গজলটি বার বার অনেকবার গাইলে। তন্ময় হয়ে শেষের দুটি ছত্র অনেকক্ষণ ধরে কখনও গুনগুন করে, কখনও বেশ একটু গলা চড়িয়ে গাইলে,

"প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফিজ! ছেড় না অধর লাল
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব কাল!"

আমি একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললুম, 'তোমার এত গুণ! তোমাকে আমি কোথায় রাখি। সুন্দর ইউসুফ শুধু যে সে-যুগের সবচেয়ে সুপুরুষ ছিলেন তাই নয়, তাঁর মত দূরদৃষ্টি নিয়ে জন্মেছিল অল্প লোকই, এবং সবচেয়ে বড় ছিল তাঁর চরিত্রবল। তাই তাঁর মা'র কোল থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁকে বসিয়ে দিলে, সেই সুদূর মিশরের রাজ-সিংহাসনে।'

শব্‌নম বললে, 'হ্যাঁ। আর তাই মাতৃভূমি কিনানের স্মরণে,

"মিশর দেশের সিংহাসনেতে বসিয়া ইসুফ্ রাজা
কহিত, হায়রে! এর চেয়ে ভাল কিনানে ভিখারী সাজা।"

দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল দক্ষিণের দেয়ালের দিকে। থিয়েটারের পরদার মত একখানা মখমলের পরদা ছিল ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ঝোলানো। একটানে সেটা সরাতেই সামনের খোলা পৃথিবী তার অসীম সৌন্দর্য নিয়ে আমাকে একেবারে বাক্যহারা করে দিল।

দু'খানা চেয়ার পাশাপাশি রেখে আমায় শুধালে, 'শীত করছে?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই পুস্তিনের একখানা ফারকোট দু'জনার জানু থেকে পা অবধি জড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

এ সৌন্দর্য শুধু শীতের দেশেই সম্ভব।

সমুদ্রের জল আর বেলাভূমির বালুর উপর পূর্ণিমার আলো প্রতিফলিত হয়ে যে জ্যোৎস্না চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এখানে যেন তারই পৌনঃপুনিক দশমিক—এখানে শত শত যোজন-জোড়া নিরন্ধ্র সর্বব্যাপী ধবলতম ধবল বরফের উপর প্রতিফলিত হয়ে এক পক্ষের পূর্ণচন্দ্র যে শত পক্ষের জ্যোতিঃ আহরণ করেছেন, হিমানী-যোগিনী উমারাণীর এক বদন-ইন্দু-চৌষট্টি যোগিনীর মুখেন্দীবর দীপান্বিতায় রূপান্তরিত হচ্ছেন।

দূরে পাগমান পর্বতের সানুদেশ, চূড়া—তারও দূর দিগন্তে হিন্দুকুশের অর্ধ-গগনচুম্বী শিখর, কাছে শিশির ঋতুর নিদ্রাবিজড়িত, বিসর্পিল কাবুল নদী, আরও কাছের সুপ্তিময় নিষ্প্রদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা, পল্লবহীন নগ্ন বৃক্ষ, হৃতপত্র শাখা-প্রশাখা, উদ্বাহু মিনার-মিনারিকা, বিপরীতার্ধডিম্ব গম্বুজ, গোরস্তানের শায়িত সারি সারি কবরের নামলাঞ্ছন-প্রস্তর-ফলক—সর্ব সৌন্দর্য সর্ব বিভীষিকা, সর্ব সর্বাধিকারীর অলঙ্কার, সর্ব সর্বহারার দৈন্য, ভদ্রাভদ্র সকলের উপর নির্বিচারে প্রসারিত হয়েছে তুষারের আস্তরণ। আকাশের মা-জননী যেন এক বিরাট শুভ্র কম্বল দিয়ে তাঁর একান্নপরিবারের ধনী দরিদ্র রাজা-প্রজা তাঁর সর্বসন্তানসন্ততিকে আবরিত করে তাদের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছেন।

কী নৈঃশব্দ্য, নৈস্তব্ধ্য! রাজপথের দ্বিতীয়যামের মদ্যানুরাগী, সখা, কদ্রূপ সঙ্গীতস্তনিত গণিকাবল্লভ সকলেই একই প্রিয়ার গভীর আলিঙ্গন-সোহাগে সুষুপ্ত—সে প্রিয়া গৃহকোণের তপ্ত শয্যা। রাজপ্রাসাদের দুর্গ প্রাকারের প্রহর ডিণ্ডিম নিস্তব্ধ।' কল্য উষার মধুর-কণ্ঠ মুআজ্জিন অদ্য নিশার নিদ্রাস্তরণে আকণ্ঠ বিলীন।

গম্ভীর প্রহেলিকাময় এ দৃশ্য। কে বলে একা, একটিমাত্র রঙ দিয়ে ছবি আঁকা যায় না? কে

বলে একা একমাত্র সা স্বর দিয়ে গান গাওয়া যায় না? কে বলে একা একটি ফুল ভুবন পুলকিত করতে পারে না? এই সর্বব্যাপী শুভ্রতা-সৌরভে যে সঙ্গীত মধুরিমা আছে সে তো মানুষের সর্বচৈতন্যে প্রবেশ করে তাকেও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মদেহ করে দেয়। সৃষ্টিরহস্য তখন তার কাছে আর প্রহেলিকা থাকে না—সে তখন তারই অংশাবতার। আমার হৃদয় তখন সে সৌন্দর্যে অবগাহন করতে করতে হিন্দুকুশ পেরিয়ে আমুদরিয়া তাশকন্দ ছাড়িয়ে বৈকালী হ্রদের কূলে কূলে সন্তরণ করছে।

আমাদের মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র। এতক্ষণে আমার চোখ থেকে টেবিল ল্যাম্পের শেষ জ্যোতিঃকণার রেশ কেটে গিয়েছে। দেখি, প্রখর চন্দ্রালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে' শব্‌নমের সিঁথি ভালে, স্ফুরিত নাসিকারন্ধ্রে, ঈষতার্দ্র ওষ্ঠাধরে, সমুন্নত কঞ্চুলিকা শিখরাগ্রে। বেলাতটের নীলাভ কৃষ্ণাম্বুর মত তার চোখের তারায় গভীর নৈস্তব্ধ্য। গিরিকুমারীর মরালগ্রীবা, হিন্দুকুশ গিরির মতই ধবল শুভ্র। এতদিনে বুঝতে পারলুম অক্ষতযোনি গৌরীকে কেন গিরিজাতনয়া বলে কল্পনা করা হয়েছে।

পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললুম, 'হে কম্‌রুল কওকাব্। এই কম্‌রুন্নিসাকে আশীর্বাদ কর। হে ইন্দুবর—না, না,—হে ইন্দুমৌলি, তুমি একদা গিরিকুমারীর শুভ্রশুচিতার চরম মূল্য দিয়েছিলে। আজ এই কাবুলগিরিকন্যাকে তুমি তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দেখাও। আমাদের বাতায়ন প্রান্তে এসে তোমার ইন্দীবর নয়ন উন্মীলন করে দেখ, এই কুমারীর কটিতট তোমারই মত, হে নটরাজ, তোমারই ডমরুকটির মত ক্ষীণচক্র—

"হেন ক্ষীণ কটি এ তিন ভুবনে নটরাজে শুধু বাজে
এ হিমা প্রতিমা আমারে বরিয়া নাহি যেন মরে লাজে।"

শব্‌নম আবার সেই প্রথম দর্শনের দীর্ঘ স্মিতহাস্য দিয়ে ঘরের ভিতর চন্দ্রালোক এনে শুধালে, 'আমার নূর-ই-চশ্‌ম্—'আঁখির আভা'—কি ভাবছ?'

আমি বললুম, 'গিরিরাজ হিন্দুকুশকে বলছিলুম, তোমার মঙ্গল কামনা করতে।'

'সে কি বুৎ-পরস্তী—প্রতিমাপূজার শামিল নয়?'

'আলবত নয়। আমি যখন আমার বন্ধুকে বলি, আমার মঙ্গল কামনা কর, তখন কি আমি পুজো করি? আমি যখন গিয়াস-উদ্-দীন চিরাগ-দিল্লির কবরে গিয়ে বলি, "হে খাজা, তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর," তখন কি আমি তাকে খুদা বানাই? অজ্ঞজন যখন মনে করে ওই গোরের কোনও অলৌকিক শক্তি আছে, অর্থাৎ গোরেই আল্লার অংশ বিরাজ করছে তখনই হয় বুৎ-পরস্তী।'

আপন মনে একটু হেসে নিয়ে বললুম, 'আর এই বুৎ-পরস্তী আরম্ভ হয় তোমাদের দেশেই প্রথম। আজ যে অঞ্চলের নাম জালালাবাদ তারই নাম সংস্কৃতে গান্ধার—'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। মনে পড়েছে। এখনও জালালাবাদের বকরী-ছাগলকে কাবুল-বাজারে বলে বুজ্-ই-গান্ধারী। তারপর বল।'

'আলেকজাণ্ডারের গ্রীক সৈন্যরা যখন সেখানে থাকার ফলে বৌদ্ধ হয়ে গেল তখন তারাই সর্বপ্রথম গ্রীক দেব-দেবীর অনুকরণে বুদ্ধের মূর্তি গড়ে তাঁর পুজো করতে লাগল—ভারতবর্ষের আর সর্বত্র তখনও বুদ্ধের মূর্তি গড়া কড়া মানা, এমন কি বুদ্ধকে অলৌকিক শক্তির আধার রূপে ধারণা করে তাঁকে আল্লার আসনে বসানো বৌদ্ধদের কল্পনার বাইরে। সেই গ্রীক বৌদ্ধমূর্তি হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়বার পর, পরবর্তী যুগে সেই আর্টের নাম হল গান্ধার আর্ট।'

ভারি খুশি হয়ে বললে, 'ওঃ! আমরা মহাজন।'

আমি আরও খুশি হয়ে বললুম, 'বলো। এখনও কাবুলীরা আমাদের টাকা ধার দেয়।

গম্ভীর হয়ে বললে, 'সেকথা থাক।' আরেকদিন এ কথা উঠলে পর শব্‌নম বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ভারত আফগান উভয় সরকারে মিলে এ বদামি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

'আর তোমাদের মেয়ে গান্ধারী আমাদের ছেলে ধৃতরাষ্ট্রকে বিয়ে করেছিল। তাদের হয়েছিল একশ'টা ছেলে আর একটি মেয়ে।'

'ক'টি বললে?'

'একশ এক।'

আমার হাঁটুতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'হায়, হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি স্থির করেছিলুম, আমিই তোমাকে একশ'টা আণ্ডা-বাচ্ছা দেব। এখন কি হবে?'

আমি আনমনে বাঁ হাত তার গ্রীবার উপর রেখে চুলে পাক মেরে ডান হাতে ডগাগুলো পাকের ভিতর ঢুকিয়ে চাপ দিতেই খাসা এলো-খোঁপা হয়ে গেল।

শব্‌নম আপন জীবন মরণ সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে, ফার্ কোটের ঢাকনা ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুধালে, 'তিনসত্যি করে বল, তুমি ক-জন মেয়ের খোঁপা বেঁধে দিয়ে দিয়ে এ রকম হাত পাকিয়েছ?'

আমি অপাপবিদ্ধ স্বরে বললুম, 'মায়ের হাত জোড়া থাকলে আমাকে খোঁপাটা শক্ত করে দিতে বলতেন।'

আস্তে আস্তে ফের পাশে বসে বললে, 'যাক্! তোমার উপস্থিত বুদ্ধি আছে।'

অর্থাৎ বিশ্বাস করল কি না তার ইস্‌পার-উস্‌পার হল না।

আমি বললুম, 'তুমি সেদিন আমার হাত টিপতে টিপতে বললে, আমার হাত বড্ড নরম। আমি সরল ইমানদার মানুষ—কই আমি তো শুধাই নি, তুমি ক-জন পুরুষের হাত টিপে টিপে এ তত্ত্বটা আবিষ্কার করলে?'

'বিস্তর। আব্বা, জানেমন্—এ যাবৎ। টিপে দেব আরও বিস্তর। তোমার আব্বা—বল তো ভাই, তোমার জানেমন্ ক'জন?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললে, 'ছিঃ। শওহরের সঙ্গে প্রথম রাত্রে তর্ক করতে নেই। তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না, কি বই পড়ছি, যখন ঘরে ঢুকলে? আমার এক সখী বইখানা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিলেন। "শব্-ই-জুফ্‌ফাফ্"—"বাসররাত্রি"। আল্লা রসুলের দোহাই দিয়ে বিস্তর ভালো কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ বইয়ের লেখক একটা উপদেশ দিয়েছে পঞ্চাশবার—"শওহরের ভালো মন্দ বিচার করতে যেয়ো না। তিনি আল্লার দেওয়া উপহার।" '

আমি পরম পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, 'এ লেখক শতায়ু হন, সহস্রায়ু হন। আমি নিশ্চিন্ত হলুম—কারণ আমি—'

বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি একটু চুপ কর তো। আমি তোমাকে যে-কথা বলবার জন্য জানলার কাছে নিয়ে এসেছিলুম সেইটের আখেরী সমাধান করতে চাই—এ নিয়ে যেন আর কোনোদিন কোনো বাক্-বিতণ্ডা না হয়।'

আমি সত্যই ভয় পেয়ে বললুম, 'আমি যে ভয় পাচ্ছি, হিমিকা।'

'আবার! শোনো! ওই যে পূর্ণচন্দ্র তাকে সাক্ষী রেখে বলছি,—'

আমি জুলিয়েটের মত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, 'না, না, ওকে না। বরঞ্চ তুমি ফজরের আজানের পূর্বেকার শব্‌নম হিমিকার নাম করে—'

'তা হলে তোমার প্রিয় গিরিরাজ হিন্দুকুশের উপর যে চির হিমিকা বিরাজ করছে, প্রচণ্ডতম নিদাঘেও যার ক্ষয়ক্ষতি হয় না—তাকে সামনে রেখে বলছি, তার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আত্মাবমাননা করো না, নিজেকে লঘু করে দেখো না। কুমারী কন্যা যে রকম প্রহরের পর প্রহর ধরে বছরের পর বছর আপন দয়িতের স্বপ্ন দেখে, মাতা যে রকম প্রথম গর্ভের কণিকাটিকে সোহাগ-কল্পনায় প্রতিদিন রক্তমাংস দিয়ে গড়ে তোলে, ঠিক তেমনি আমি তোমাকে তৈরি করেছি, সেই দিন আমি প্রথম বুঝলুম, আমি অসম্পূর্ণ, আমি নিদ্রিতা শাহ্‌জাদী, আমি অন্ধ প্রদীপ, আমার দয়িত রাজপুত্র দূরদূরান্ত আমার প্রতীক্ষা-দিনান্তের ওপার থেকে এসে আমাকে সঞ্জীবিত করবে, অশ্রুজল সিঞ্চন করে করে আমি যে প্রেমের বল্লরী বাড়িয়ে তুলেছি, তারই করুণ করস্পর্শে পুষ্পে পুষ্পে

মঞ্জরিত হবে সে একদিন—আকাশ-কুসুম চয়ন করে করে রচেছি তার জন্য আমার শব্-ই-জুফ্‌ফাফের ফুলশয্যা, প্রার্থনা করেছি, সে রাত্রে যেন পূর্ণচন্দ্র গিরিশিখরের মুকুটরূপে আকাশে উদয় হয়। সূর্যের প্রেম পেয়ে সে হয় ভাস্বর, আমার অন্ধবদনও তেমনি জ্যোতির্ময় হবে আমার বঁধুর ওষ্ঠাধরের সামান্যতম ছোঁয়াচ লেগে।

'তাই যখন তোমাকে প্রথম দেখলুম তখন আপন চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি।

'আমি আমার হৃদয়ে ঝাপসা ঝাপসা যে স্কেচ এতদিন ধরে এঁকেছিলুম এ যেন হঠাৎ ভাস্করের হাতে পরিপূর্ণ নির্মিত মূর্তি হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চিন্ময় মৃদু সৌরভ যেন মৃন্ময় নিকুঞ্জবনের কুসুমদামে রূপান্তরিত হল।

'টেনিস কোর্টে তাই অত সহজে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছিলুম কিন্তু সমস্তক্ষণই ভাবছিলুম অন্য কথা—'

'মৃন্ময় চিন্ময় হয় সে আমি জানি। কি যেন এক ফলের কয়েক ফোঁটা রসকে শুকিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে করা হল ধুঁয়ো। তারই আড়াই পাক মগজের সেল্‌কে আলতো আলতো ছুঁতে না ছুঁতেই পথের অন্ধ ভিখারী দেখে, সে রাজবেশ পরে শুয়ে আছে বেহেশ্‌তেরা হুরীর কোলে মাথা দিয়ে। প্রণয়পীড়ায় ব্যথিত আতুর ক্রন্দসী-প্রেয়সী হুরীরানী তারই দিকে তাকিয়ে আছে, করুণ নয়নে, পথের ভিখারীর মত, যেন অভাগিনীর প্রেম-নিবেদন পদদলিত না হয়।

'অতদূর যাই কেন, আর এ তো নেশার কথা।

'একটি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ কালো তিল। শীরাজবাসিনী তুর্কী রমণী সাকীর গালে সেইটি দেখে হাফিজ তন্মুহূর্তেই তার বদলে সমর্‌কন্দ্ আর বুখারা শহর বিলিয়ে দিয়ে ফকীর হয়ে গোরস্তানে গিয়ে বসে রইলেন।'

'কিন্তু চিন্ময় মৃন্ময় হয় কি করে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি। পরে বুঝেছি, আরও ভালো করে, মর্মান্তিকরূপে—কান্দাহারে। আমার হৃদয়-বেদনা তো সম্পূর্ণ চিন্ময়। তারই পেয়ালা যখন ভরে যায় তখন সে উপচে পড়ে আঁখি-বারিরূপে। তুমি সুন্দর বলেছ, "আকাশের জল আর চোখের জল একই কারণে ঝরে না"; আমি তাতে যোগ দিলুম—তাদের উপাদানও সম্পূর্ণ আলাদা, একটা মৃন্ময় আরেকটা চিন্ময়, একটা বাঙময়—সারা আকাশ মুখর করে তোলে, আরেকটা নৈস্তব্ধ্যে বিরাজ করে সর্ব মনময়।'

আমি স্থির করেছিলুম, কিছু বলব না। শব্‌নমের আত্মপ্রকাশের আকুবাকু আমার স্পর্শকাতরতাকে অভিভূত করে দিলে। আস্তে আস্তে বললুম, 'আমাদের এক কবি বলেছেন, তুমি আমার প্রিয়, কারণ "আমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।"

বললে, 'সুন্দর বলেছেন। কিন্তু আজ আমি কবিতার ওপারে।

'বিশ্বাস করবে না, ডান্‌স্ হলের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তোমাকে ভালো করে না দেখে হোটেলের বেয়ারা ভেবে যখন হুকুম দিয়েছিলুম, গাড়ি আনতে, তখনও ভেবেছিলুম এ কি রকম বেয়ারা—এর তো বেয়ারার বেয়ারিঙ নয়—ভালো করে তাকিয়ে দেখি, আজ পর্যন্ত যত মানুষ দেখেছি, যত বর্ণনা পড়েছি, যত ছবি দেখেছি এর বেয়ারিঙ তো তাদের একটার সঙ্গেও মিলছে না। তারপর কে যেন আমার বুকের ভিতরে ছবির খাতা মোচড় মেরে মেরে পাতার পর পাতা খুলে যেতে লাগল—তাতে ব্যথা—কিন্তু কী আনন্দ—এক এক বার তোমার দিকে তাকিয়ে দেখি আর ছবির দিকে তাকাই—কী অদ্ভুত—হুবহু মিলে যাচ্ছে। পথে যেতে যেতে, তোমার বাহুতে যখন আমার বাহু ঠেকল, খেলার জায়গায়, নদীর পাড়ে, তোমার ঘরে—এখনও দেখেই যাচ্ছি,' দেখেই যাচ্ছি, এ দেখা আমার কখনও ফুরবে না। যেমন যেমন পাতা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছি, সঙ্গে সঙ্গে আরও নয়া নয়া তসবীর আঁকা হয়ে যাচ্ছে।'

হঠাৎ সে হাঁটু গেড়ে আমার দুই জানু আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বললে, 'ওগো,

তুমি কেন ভাব, তুমি অতি সাধারণ জন? তোমার ওই একটিমাত্র জিনিসই আমার বুকের ভিতর যেন ঝড় এনে আমার বুকের বরফ ধুনরীর মত তুলো পেঁজা করে দেয়। আমার অসহ্য কষ্ট হয়। তুমি কেন আমার দিকে আতুরের মত তাকাও, তুমি কেন তোমার যা হক্ক তার কণাটুকু পেয়েও ভিখারীর মত গদ্‌গদ্ হও? তুমি কেন বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হতে না হতেই সদম্ভে কাঁচি এনে আমার জুল্‌ফ কেটে দাও না, তুমি কেন আমার মুখের বসন দু' হাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল না—সিংহ যে রকম হরিণীর মাংস টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়?'

আমি নির্বাক।

চাঁদ বহুক্ষণ হল বাড়ির পিছনে আড়াল পড়েছে। আবছায়াতেও শব্‌নমের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

হঠাৎ মধুর হেসে সুধীরে তার মাথাটি আমার জানুর উপর রেখে বললে, 'না, গো, না। সেইখানেই তো তুমি। তোমার অজানতে তোমার ভিতর একজন আছে যাকে আমি চিনি। সে বলে, "আমার যা হক্কের মাল আমার কাছে তাই এসেছে—আমার তাড়া কিসের!" আর জান, তুমিই একমাত্র লোক যে আমার প্রতি মুহূর্তে কবিতা উদ্ধৃতি শুনে কখনও শুধায় নি, তুমি বাস্তবে বাস করো, না, কাব্যলোকে? তুমিই একমাত্র যে বুঝেছে যে, কাব্যলোকে বাস না করলে বাস কি করব ইতিহাস-লোকে, না দর্শনলোক না ডাক্তারদের ছেঁড়া-খোঁড়ার শবলোকে? আর এ সব কোনও লোকেই যদি বাস না করি তবে তো নেমে আসবও সেই লোকে—গাধা গরু যেখানে ঘাস চিবোয় আর জাবর কাটে।

'কিন্তু এসব কিছু নয়, কিছু নয়। আসল কথা, সে তোমার মৃত্যুঞ্জয় প্রেম। আমি সুজাতা, সুচরিতা, সুস্মিতা আর আমার প্রেম যেন নববসন্তের মধু নরগিস—তোমার প্রেম ভরা-নিদাঘের বিরহরসঘন দ্রাক্ষাকুঞ্জ। তারই ছায়ায় আমি জিরবো, তারই দেহে হেলান দিয়ে আমি বসব, সেই আঙুর আমি জিভ আর তালুর মাঝখানে আস্তে আস্তে নিষ্পেষিত করে শুষে নেব। এই যে রকম এখন করছি।'

আমার মুখ কাছে টেনে নিল।

তারপর হঠাৎ হেসে উঠে শুধালে, 'বল দেখি মেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেতে পাবে না কেন?'

'কি করে বলব বল।'

'দু' মিনিট মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না বলে। কথা কইতে ইচ্ছে যায়। আর শোন, জানেমন্ আমাকে ডেকে কি বললে, জান? বললে, তুমি নাকি আমার আঁধার ঘরের অনির্বাণ বিজলি। তোমার বুকের ভিতর নাকি বিদ্যুৎবহ্নি। আমরা একশ' বছর বাঁচলেও নাকি তোমার প্রেম ক্ষণে ক্ষণে চমক দিয়ে আমাকে নিত্য নবীন করে রাখবে। আর সবচেয়ে মারাত্মক কথা কি বলেছে, জান? বলেছে, আমি যেন তোমার কাছ থেকে ভালবাসতে শিখি।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'তার মানে তুমি আমাকে বেশি ভালবাস। তাঁকে অবিশ্বাস করি কি করে? চোখের রোশনী নেই বলে তিনি হৃদয় দেখতে পান।'

আমার আহ্লাদের দুকূল প্লাবিত হয়ে গেল। শব্‌নমকে বুকে ধরে বললুম, 'বন্ধু, তোমার ক্ষুদ্রতম দীর্ঘনিশ্বাস আমাকে কাতর করে। কিন্তু এখন যে দুশ্চিন্তায় তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সেটা দীর্ঘতর হোক।'

কান্না-হাসিতে মিশিয়ে বললে, 'আমি স্বামীসোহাগিনী।'

কাবুল নদীর ওপারে সার-বাঁধা পল্লবহীন দীর্ঘ তন্বঙ্গী চিনার গাছের দল দাঁড়িয়ে আছে বরফে পা ডুবিয়ে। যেন নগ্না গোপিনীর দল হর্ম্যসারির পশ্চাতে লুক্কায়িত রাধামাধব চন্দ্রের কাছ থেকে বস্ত্র ভিক্ষা করছে। তাদের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগল। চন্দ্রাভা পাণ্ডুর।

'এ কি?' বলে উঠল হঠাৎ হিমিকা। 'এ কি? এদিকে বলছি স্বামীসোহাগিনী, ওদিকে তার আরাম সুখের খেয়ালই নেই আমার মনে। তোমার ঘুম পায় নি?'

আমি বললুম, 'না তো। তোমার?'

'আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন সমস্ত জীবন ঘুমিয়ে এইমাত্র জেগে উঠলাম।'

উঠে গিয়ে আলমারি খুলে আমার জন্য পাজামা কুর্তা নিয়ে এল। বললে, 'দেখ দিকি মোটামুটি ফিট হয় কি না। আমি আন্দাজে সেলাই করেছি।'

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে গেল, 'আমি তাকে নিয়ে যাব, আমার মায়ের বাড়িতে। মা আমায় শিখিয়ে দেবে। আমি তাকে পান করতে দেব সুগন্ধি মদিরা—আমারই ডালিম নিংড়ে বের করা রসের সুরভি মদিরা। তার বাম হাত রইবে আমার মাথার নিচে আর তার ডান হাত দিয়ে সে আমায় আলিঙ্গন করবে। আমার অনুরোধ, আমার আদেশ, অয়ি জেরুজালেম-বালা-দল আমাব প্রেমকে চঞ্চলিত করো না, তাকে জাগ্রত করো না, যতক্ষণ না সে পরিতৃপ্ত হয়।...আমি তাকে নিয়ে যাব আমার মায়ের ঘরে—যে ঘরে আমার মা আমাকে গর্ভে ধাবণ করেছিলেন। আমি তাকে পান করতে দেব আমারই ডালিম নিংড়ে—'

চার হাজার বৎসরের পুরাতন বাসর রাতি গীতি।

পুরাতন!

আট

তপ্ত শয্যায় শব্‌নমের গায়ে ঈষৎ শিহরণ। অচ্ছোদ সরসী নীরে রমণীর কম্পন?

মোতির মালাটি গলাতেই আছে। আমি সেটি দানা দানায় অল্প অল্প ঘোরাতে ঘোরাতে একটা লকেটে হাত ঠেকল। বললুম, 'এর ভিতরে কিছু আছে?'

চুপ।

আমি মালা ঘোরানো বন্ধ করে তার বুকের উপর হাত রেখে চুপ করে রইলুম।

হঠাৎ লেপ সরিয়ে উঠে পড়ল ঘরের কোণের অতিশয় ক্ষীণ শিখাটির দিকে। আমি দেখতে পেলুম, যেন ঝড়ে উড়ে গেল একটি গোলাপ ফুল, তার দীর্ঘ ডাঁটাটির চতুর্দিকে আলুলায়িত, হিল্লোলিত অতি সূক্ষ্ম, অতি ফিকে গোলাপী মসলিন? ক্ষীণালোকে তার প্রতিটি অঙ্গ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছেও না।

আলো জোর করে দিয়েছে। এখন প্রতি অঙ্গ—। আমি চোখ বন্ধ করলুম।

আমার পাশে শুয়ে লকেটটি খুলে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'এই আমার শেষ গোপন ধন। এবারে আমি নিশ্চিন্ত হব।'

খুলে দেখি আমারই একটি ছোট্ট ফটো! অবাক হয়ে শুধালুম, 'এ তুমি কোথায় পেলে?'

বললে, 'চোখের জলে নাকের জলে।'

'সে কি?'—এত দিনে বুঝলুম, শব্‌নম কেন কখনও আমার ছবি চায় নি।

'আব্বা ইংরেজী কাগজ নেন—হিন্দুস্থানী। জশ্‌নের কয়েকদিন পরে তারই একটাতে দেখি পরবের সময় ব্রিটিশ লিগেশনে আর কাবুল টিমে যে ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল তারই খান দুই তিন ফটো। কান্দাহার থেকে লিখলুম ওই কাগজকে ছবিটার কন্টাক্ট্‌ প্রিন্ট পাঠাবার জন্য। মূল্যস্বরূপ পাঠালুম, এ দেশের কয়েকখানা বিরল স্ট্যাম্প—বিদেশে পয়সা পাঠানো যে কী কঠিন সেই জ্ঞান হল চোখের জলে নাকের জলে। সান্ত্বনা এই, যে লোকটার হাতে চিঠিখানা পড়েছিল, সে নিশ্চয়ই স্ট্যাম্প বোঝে। আমাকে অনেক আবোল-তাবোল ছবির মাঝখানে ওই ছবিও পাঠালে খান তিনেক।

তোমার ছবি তুলে নিয়ে লকেটে পুরে দিলুম। হল?'

আমি কি বলব? আমি তার মুক্তামালারুদ্রাক্ষের শেষ প্রান্তের ইষ্টমন্ত্র!

দিনযামিনী সায়ম্প্রাতে শিশিরবসন্তে বক্ষলগ্ন হয়ে এ শুনেছে শব্নমের আকুলতা ব্যাকুলতা— প্রতি হৃদয়স্পন্দনে। একে সিক্ত করে রেখেছে শব্নমের অসহ্য বিরহশর্বরীর তপ্ত আঁখিবারি।

আমি কল্পনা করে মনে মনে সে ছবি দেখছি, না শব্নম কথা বলছে? দুটোর মাঝখানে আজ আর কোনো পার্থক্য নেই। কিংবা তার না-বলা-ব্যথা যেন কোন্ মন্ত্র বলে শব্দতরঙ্গ উপেক্ষা করে তার হৃদ্স্পন্দন থেকে আমার হৃদ্স্পন্দনে অব্যবহিত সঞ্চারিত হচ্ছে। কণ্ঠাশ্লেষে বক্ষালিঙ্গনে চেতনা চেতনায় এই বিজড়ন অন্য রজনীর তৃতীয় যামে আমা দোঁহাকার জ্যোতির্ময় অভিজ্ঞান, অপূর্বলব্ধ বৈভব।

কত না সোহাগে কত না গান গুনগুন করে শব্নম সে রাত্রে আমাকে কানে কানে শুনিয়েছিল। লায়লী মজনূঁর কাহিনী।

বাঙালী কীর্তনিয়া যে রকম রাধামাধবের কাহিনী নিবেদন করার সময় কখনও চণ্ডীদাস, কখনও জগদানন্দ, কখনও জ্ঞানদাস, কখনও বলরাম দাস, বহু পুষ্প থেকে মধু সঞ্চয় করে অমৃতভাণ্ড পরিপূর্ণ করে, শব্নম ঠিক তেমনি কখনও নিজামী, কখনও ফিরদৌসী, কখনও জামী, কখনও ফিগানী থেকে বাছাই বাছাই গান বের করে তাতে হিয়ার সমস্ত সোহাগ ঢেলে দিয়ে আমাকে সেই সুরলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল যেখানে সে আর আমি দু'জনা, যেখানে কপোতী কপোতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ঊর্ধ্বতর প্রেম গগনাঙ্গনে।

কপোত কপোতী দিয়েই সে তার কীর্তন আরম্ভ করেছিল। বয়ঃসন্ধিক্ষণে মুকুলিকা লায়লী পুষেছিল কপোত-কপোতী। যৌবন দেহলি-প্রান্তে সে কপোত-কপোতীকে দেখে আধো আধো বুঝতে শিখল প্রেমের রহস্য।

দেহ তখন আর লায়লীর সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারছে না। ওষ্ঠাধর বিকশিত হয়ে ডেকে এনেছে প্রথম উষার নীরব পদক্ষেপে গোলাপী আলোর অবতরণ। তারই দু'পাশে শুভ্র শর্করার মত তার বদন ইন্দুর বর্ণচ্ছটা, কিন্তু কপোল দুটির লালিমা হার মানিয়েছে বর্ষণ শেষের রক্তাক্ত সূর্যাস্তকে। রক্ত কপোল আর শুভ্র বদন-প্রান্তের মাঝখানে একটি কজ্জল-কৃষ্ণ তিল, যেন হাবশী বালক লাল গালের গোলাপ বাগানের প্রান্তদেশে খুলেছে শুভ্র শর্করার হাট। সে বালক তৃষিত। তারই পাশে লায়লীর গালের টোলটি। সে যেন আব্-ই-হায়াৎ, অমৃতবারির কূপ—অতল গভীর হতে উৎসারিত হচ্ছে অমৃতসুধা। স্মিত হাস্যের সামান্যতম নিপীড়নে উৎসমূলে যে আলোড়ন সৃষ্ট হয় তারই সৌন্দর্য প্লাবিত করে দেয় তার গুল্ বদন, ফুল্লবল্লরী। সমুদ্র-কুমারীর চোখের জল জমে গিয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নেয় যে মুক্তা সে-ই এসে আলোর সন্ধান পেয়েছে লায়লীর ওষ্ঠাধরের মাঝখানে। সে ওষ্ঠে আমন্ত্রণ, অধরের প্রত্যাখ্যান—মজনূর ওষ্ঠাধর যেদিন এদের সঙ্গে সম্মিলিত হবে সেদিন হবে এ-রাজ্যের চূড়ান্ত সমাধান।

তরুণ রাজপুত্র কয়েস দূর হতে প্রথম দর্শনেই অভিভূত হয়ে আকুলি-বিকুলি করে কি ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিল সে তার বাল্যসখাও বুঝতে পারে নি। সর্পদষ্টাতুরকে আত্মজন যে রকম স্বগৃহে নিয়ে আসে, সখা সেইরকম কয়েসকে নিয়ে গেল আপন দেশে।

অন্তঃপুরবাসিনী অসূর্যম্পশ্যা লায়লীকে প্রেমের পুকার, হৃদয়ের আহ্বান পাঠাবে কয়েস কি করে?

এখানে এসে শব্নম যে কাহিনী বর্ণনা করল তার সঙ্গে আমাদের নল-দময়ন্তী কাহিনীর প্রচুর সাদৃশ্য আছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে হৃদয়ের কন্দর্পভার ধারণে অসমর্থ নলরাজ কুসুমায়ুধের অগ্রদূত

রূপে পাঠিয়েছিলেন বন্য-হংসকে, আর শব্‌নমের কাহিনীতে কয়েস লায়লীর নবশ্যামদূর্বাদল-বক্ষতলে পালিত কপোতকে বন্দী করে তার ক্ষীণপদে বিজড়িত করে পাঠিয়েছিল প্রেমের লিখন।

কি উত্তর দিয়েছিল লায়লী? কে জানে? কিন্তু আরবভূমিতে আজও তাবৎ দরদী-হিয়া, শুষ্ক-হৃদয়, সবাই জানে, সেই দিন থেকে লায়লীর চোখে দেখা দিল এক অদ্ভুত জ্যোতি—ক্ষণে ক্ষণে কারণে অকারণে তার চোখে হিল্লোলিত হতে লাগল এক অদৃষ্ট-পূর্ব বিদ্যুল্লেখা।

রাজপ্রাসাদ থেকে যে দেওদার সারি চলে গেছে মরুভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত তারই শেষে ছিল ঝরনা ধারা। এ দেওদার সুদুর হিমালয় থেকে আনিয়েছিলেন লায়লীর এক পূর্বপুরুষ। কিংবদন্তী বলে, শস্যশ্যামল-সজল বনভূমির শিশু দেবদারু একমাত্র তাঁরই সোহাগ-মাতৃস্তন্য পেয়েছিল বলে এই অস্থিশুষ্ক খবভূমিতে পল্লবঘন বীথিকা নির্মাণ করতে পেরেছিল।

আর সেই ঝরনার জল আনতে যেত নগরিকার কুমারীগণ।

যুগ যুগ ধরে তরুণ প্রেমিক দেওদার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেণুরবে, কখনও বা গানে গানে প্রেমের আহ্বান পাঠিয়েছে প্রেমিকাকে।

দেবদারু অন্তরালে মরুভূমির সুদূর প্রান্তে ধীবে ধীবে উঠছে পূর্ণচন্দ্র। দীর্ঘ দেবদারুর ছায়ায় ছায়ায় যেখানে আলোছায়ার কম্প্রমান বেপথু আলিঙ্গন তারই পাশে গা মিশিয়ে দিয়ে মজনূঁর উদ্বাহু হয়ে ধীর স্থির কণ্ঠে লায়লীকে আহ্বান জানাচ্ছে অদৃশ্য গাতীগুলি স্তবকে স্তবকে নিবেদন করে।

এ আহ্বান জনগণের সুপরিচিত কিন্তু আজ সন্ধ্যাব এ আহ্বান যে বহসামষ মন্ত্রশক্তি নিয়ে বসন্ত সমীরণের চঞ্চলমুখরতা মৌন করে দিল, দেবদাকপল্লবদল স্তম্ভিত করে দিল সে যেন ইহলোকবাসী মর মানবের ক্ষণমুখর হৃৎপিণ্ড স্পন্দনজাত নয়। গৃহে গৃহে বাতায়ন বন্ধ হল। হর্ম্যশিখর থেকে নাগর নাগরী দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। বৃদ্ধেরা মক্কার উদ্দেশে মুখ কবে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে প্রার্থনায় রত হলেন।

কার ওই ছায়াময়ী অশরীরী দেহ? কার হৃদয ছুটে চলেছে দেহের আগে আগে—ওইখানে, যেখানে উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত উৎসধারা বিগলিত আলিঙ্গনে সিক্ত করে দিচ্ছে দেবদারুদ্রুমকে?

চৈতন্যের পরপারে অজরামর অন্তহীন আলিঙ্গন।

বেহেশ্‌ৎ ত্যাগ করে ফিরিশতাগণ তাঁদের চুম্বনের মাঝখানে এসে আপন চিন্ময়রূপ বিগলিত করে দিলেন।

সংস্কারমুক্ত-জনও প্রিয়াসহ তাজমহল দর্শনে যায় না। যমুনা পুলিনের কিংবদন্তী বলে, হংস-মিথুন পর্যন্ত বৃন্দাবন বর্জন করে—তাজমহলের উৎসজল এক সঙ্গে পান করে না। যমুনা বিরহের প্রতীক। অপিচ বাসরঘর প্রথম মিলনকে চিরঞ্জীবী করে রাখতে চায়। সেখানে বিরহ-গাথার ঠাঁই নেই। শব্‌নম অতি সংক্ষেপে ক্ষীণ কাকলিতে লায়লী মজনূঁর সে কাহিনী ছুঁয়ে গেল—কনিষ্ঠা যে রকম ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনে তার কনিষ্ঠতম ভীরু অঙ্গুলি দিয়ে গ্রামভারি সর্বাগ্রজের কপালে তিলক দেয়।

বর্ষাভোরের ঘন মেঘ হঠাৎ কেটে গেলে যে রকম শত শত বিহঙ্গ বনস্পতিকে মুখরিত করে তোলে ঠিক সেই রকম অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত হল শব্‌নমের আনন্দ গান?

মর্ত্যের ধুলার শরীর আর মৃত্যুঞ্জয় প্রেমকে ধরে রাখতে পারল না। দিগ্বলয় প্রান্ত থেকে যে রামধনু উঠেছে মধ্য-গগনের স্বর্গদ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত তারই উপর দিয়ে হাত ধরাধরি করে লায়লী মজনূঁ চলেছে অমর্ত্যলোকে। কখনও গহন মেঘমায়া, কখনও তরল আলোছায়ার মাঝে মাঝে, কখনও চূর্ণ স্বর্ণরেণু সূর্যরশ্মি কণা আলোড়িত করে, কখনও ইন্দ্রধনুর ইন্দুনিভ বর্ণবন্যায় প্রবহমান হয়ে তারা পৌঁছল স্বর্গদ্বারে। জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে বেহেশ্‌তের আনন্দাঙ্গনে। পরিপূর্ণ প্রণয়প্রতীক স্বর্গ হতে

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সেখানে প্রত্যাবর্তন করছে অনিন্দ্য, নবজন্ম নিয়ে, মরজীবনের জীর্ণ বাস ত্যাগ করে, সুরলোকের অসম্পূর্ণতা সর্বশ্রীময় করে দিতে।

সে কী ছবি! চতুর্দিকের হুরী ফিরিশতাগণের চোখে পলক পড়ছে না। দিব্যজ্যোতি ধারণ করে লায়লী মজনূঁ বসে আছেন মুখোমুখি হয়ে। ফিরিশতা-প্রবীণ জিব্‌রইল তাঁদের সম্মুখে ধরেছেন পানপাত্র—আল্লাতালা কুরান শরীফে যে শরাবুনতহূরা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছেন তাই জিব্‌রইলের হাত থেকে তুলে নিয়ে লায়লী এগিয়ে ধরেছেন মজনূঁর সামনে। দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই সুধাপাত্র হতে।

চতুর্দিকে মধুর হতে মধুরতর সঙ্গীত :

হে প্রেম, তুমি ধন্য হলে লায়লী মজনূঁর বক্ষমাঝে স্থান পেয়ে!

হে প্রেম, তুমি অমরত্ব পেলে লায়লী মজনূঁর মৃত্যুর ভিতর দিয়ে!

খুদাতালার সিংহাসন থেকে ঐশীবাণী উচ্চারিত হল ঃ

হে সুরলোকবাসীগণ। প্রেমের দহন দাহে দগ্ধ হয়ে অর্জন করেছ তোমরা সুরলোকের অক্ষয় আসন।

হে মর্ত্যবাসীগণ! সর্বচৈতন্য সর্বকল্পনার অতীত যে মহান সত্তা তিনি তাঁর বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপের একটি মাত্র রূপ স্বপ্রকাশ করেছেন মর্ত্যলোকে—তাঁর প্রেমরূপ।

তৃতীয় খণ্ড

এক

যে মানুষ ছেলে-বয়স থেকে অন্ধের সেবা করেছে তার সেবা হয় নিখুঁত। এতখানি পাওয়ার পরও যে আমি শব্‌নমের সেবার দিকে খুঁতখুঁতে চোখে তাকিয়েছিলুম একথা বললে নিজের প্রতি অপরাধ করা হয়। আমি দেখেছিলুম, অনুভব করেছিলুম তার সেবা নৈপুণ্য, আর্টিস্টের মডেল যে রকম ছবিটি যেমন যেমন এগোয় তাকে মাঝে মধ্যে সন্তুষ্ট নয়নে দেখে যায়।

ভোরবেলা অনুভব করলুম, চতুর্দিকে লেপ গুঁজে দেওয়ার সময় তার হাতের ভীরুস্পর্শ।

সকালবেলা সামনে যে ভাবে চায়ের সরঞ্জাম সাজালে তার থেকে বুঝলুম, কান্দাহারে যে হাত বুলবুল-গুলের মাঝখানে বিচরণ করেছে সে মাটিতেও নামতে জানে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, শব্‌নমের চোখ দুটি লাল। আমার হাতের পেয়ালা ঠোঁটে যাবার মাঝপথে থমকে দাঁড়াল।

শব্‌নম বুঝেছে। বললে, 'আজ অতি ভোরে বাবা কান্দাহারে চলে গিয়েছেন। তোপল্ খান এসে খবর দিলে, আমান উল্লা তাঁকে তাঁর শেষ ভরসায় মালিকরূপে চিনতে পেরেছেন। বাবা জানেন, আমান উল্লার সর্ব আমির-ওমরাহ্ তাকে বর্জন করেছেন, কুরবানীর ছাগলকেও মানুষ জল দেয়, তারা—থাক্‌গে।

'যাবার সময় বলে গেছেন, তুমি যেন সকালবেলাই ব্রিটিশ লিগেশনে নিজে গিয়ে আমাদের বিয়ের দলিল জিম্মা করে আসো।'

'আর কি বলেছেন?'

'বলেছেন, সুযোগ পেলে তুমি একাই হিন্দুস্থানে চলে যেয়ো।'

'তুমি? সেই তো ভালো।'

'না। তুমি।' তার মুখ খুশিতে ভরে গিয়েছে। বললে, 'জান, আব্বা এখন তোমাকে আমার চেয়েও বেশি ভালবাসেন। বললেনও, "কেন বেচারীকে আমাদের ঘরোয়া বিপদের ভিতর

জড়ালুম।" এই প্রথম দেখলুম, বাবা কোনও কাজের জন্য অনুশোচনা করলেন। তখন আমি তাঁকে বললুম—অবশ্য আমি আগেই স্থির করে রেখেছিলুম, একদিন না একদিন জানেমন্‌কে দিয়ে বলাব—যে তোমাকে আমি আগের থেকেই ভালবাসতুম। আমাদের প্রথম শাদির কথাটা কিন্তু বলি নি। সেটা বলব, যেদিন তাঁর কোলে তাঁর প্রথম নাতি দেব। বাবা ভারী খুশি হয়ে নিশ্চিন্ত মনে কান্দাহার গেছেন।'

আমি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলুম। শেষটায় বললুম, 'তোপলের সঙ্গে একবার দেখা হল না!'

বললে, 'সে আস্তে আস্তে তোমাকে দেখে গেছে। তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে। আর তোমাকে বলতে বলে গেছে, সব কিছু চুকেবুকে গেলে তার আপন দেশ মজার-ই-শরীফে আমাকে নিয়ে যেতে।'

ছোট্ট বাচ্চাকে মা যে রকম জামা-কাপড় পরাতে ইচ্ছে করে দেরি করে, প্রতিপদ চড়াবার পর বাচ্চাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, শব্‌নম ঠিক সেই রকম আমাকে জামা-কাপড় পরালে। যখন আমার জুতোর ফিতে বাঁধতে গেল মাত্র তখনই বাধা দিয়েছিলুম।

শব্‌নমের মুখে হাসি-কান্না মাখানো। তার পিছনে গাম্ভীর্য। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

দেউড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বললে, 'বেশি দেরি করো না।'

তারপর কানে কানে বললে, 'তুমি আমার মিলনে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

বয়স্করা বেরুচ্ছে না—বাচ্চারা রাস্তায় খেলা করছে ঠিকই।

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, 'দেবদূত যেখানে যেতে ভয় পান, মূর্খেরা সেখানে চিন্তা না করে ঢোকে।' এর উল্টোটাও ঠিক। মৃত্যুভয় শুধু মূর্খের, তাই বয়স্করা রাস্তায় বেরুচ্ছে না। বাচ্চারা দেবশিশু, তারা নির্ভয়ে খেলছে। যেটা খেলছে সেটা শুধু এই সময়েই এবং শীতের দেশেই সম্ভব। কাবুলের অষ্টাবক্রপৃষ্ঠ রাস্তার জায়গায় জায়গায় জল জমে যায়—সে কিচ্ছু নূতন কারবার নয়—সেই জমা জল ফের জমে গিয়ে বরফ হয়ে দিব্য স্কেটিং-রিঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। সাবধানী পথিকও সেখানে পা হড়কে দড়াম করে আছাড় খায়। বাচ্চাদের সেইটেই স্বর্গপুরী। অন্যত্র বলেছি, কাবুলীরা পয়জারে শত শত লোহার পেরেক ঠুকে নেয় বলে তার তলাটা সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে হয়ে যায় পিছল। বাচ্চারা শুকনো মাটিতে একটুখানি দৌড়ে এসে সেই বরফের উপর নিজেকে ব্যালানস্ করে সামনের দিকে একটু ভর দেয় এবং সাঁই করে বরফের অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়। আমরা দেশে যে রকম নদীর ঢালু পাড়েতে জল ঢেলে সেটাকে পিছল করে সুপুরির খোল দিয়ে আসন বানিয়ে হড়হড় করে নিচে নেমে যাই।

মাঝে মাঝে দেউড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কোনও কোনও মা ছেলেকে গালিগালাজ দিয়ে বাড়ির ভিতরে ডাকে—'আয় পিদর-সুখ্‌তে—ওরে পিতৃদহ (বাপকে যে পুড়িয়ে মারে), তোর বাপ নির্বংশ হোক—তোর যম বাড়ির ভিতর না বাইরে? এখ্‌খুনি ভিতরে আয় বলছি।'

'মাদর-সুখ্‌তে' বা 'মাতৃদহ' কখনও শুনি নি। বোধ হয় উড়ো খইয়ের মত নরকাগ্নিকুণ্ডও 'জনকায় নমঃ'।

ব্রিটিশ লিগেশনের যে কর্মচারীর সঙ্গে আমার শ্বশুরমশায়ের কথাবার্তা হয়েছিল তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমি কিছু বলার পূর্বেই আমাকে অভিনন্দন জানালেন, মিষ্টিমুখ করালেন। ইনি পেশাওয়ারের লোক। তবে কি কৌটিল্য ওই অঞ্চলের লোক? গুপ্তচর বিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে দাক্ষিণ্য পেয়েছেন? কিন্তু লোকটি চমৎকার। বিয়ের দলিলখানা লোহার সিন্দুকে তুলতে তুলতে বললেন, 'অনবদ্য হাতের লেখা। মনে হয়, দলিল নয়, ছন্দে গাঁথা অভিনন্দন পত্র। আমি যত শীঘ্র পারি বাচ্চাই-সকাওকে কথাচ্ছলে জানিয়ে দেব যে হিন্দুস্থানে আফগানিস্থানে যুগ যুগ ধরে যে 'আঁতাৎ

কর্দিয়াল'—'হার্দিক রাখীবন্ধন'—গড়ে উঠেছে, এই বিয়ের মারফতে তারই এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল।'

যিনি এতখানি সহৃদয় তাঁকে ওকীব-হাল করতে হয়। তবু একটু চিন্তা করে বললুম, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান আজ ভোরে কান্দাহার চলে গেছেন।'

চমকে উঠে বললেন, 'সে কি!' একটু ভেবে বললেন, 'নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে।'

আরও কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'এটা কি ভালো করলেন? আমি অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক চালের কথা ভাবছি নে, আমি ভাবছি, তিনি এই দুর্দিনে সবাইকে কার হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলেন?'

আমি কিছু বলবার পূর্বেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অবশ্য তেমন কিছু দুশ্চিন্তা করার নেই।'

এই ভদ্রলোক আমাকে সাধারণত সহজে ছাড়তে চান না। আজ অবশ্য দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

আমাদের দেশেই যখন বহু পাখি শীতকালে হাওয়া বদল করতে যায়, তখন এই শীতের দেশে লতাপাতা কীটপতঙ্গহীন ঋতুতে থাকবে কে? তবু হঠাৎ দেখি, একজোড়া ক্ষুদে পাখি একে অন্যাকে তাড়া করছে, বরফে লুটোপুটি খাচ্ছে, ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে পালক থেকে বরফের গুঁড়ো ঝাড়ছে। আমাকে দেখে উড়ে গিয়ে গাছের একটি ন্যাড়া ডালে বসল।

আমি জানি এসব পাখি মানুষের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে, এবং শুধু জৈনরাই পিঁপড়েকে চিনি খাওয়ায় তাই নয়, কঠোরদর্শন কাবুলী খানসাহেবকে আমি জোব্বার জেব থেকে শুকনো রুটি বের করে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে দিতে দেখেছি।

আমি গাছটার কাছে আসতে আবার উড়ে গিয়ে রাস্তার পাশের আরেক গাছে বসল। আমার পকেটে কিছু ছিল না বলে বড় দুঃখ হল। কাবুল শহরে না পৌঁছানো পর্যন্ত এরা উড়ে উড়ে আমাকে সঙ্গ দিল।

শব্‌নমের যত কাছে আসছি আমার হৃদয়ের ক্ষুধা ততই বেড়ে যাচ্ছে। কাল রাতে তাকে পেয়েছি পাওয়ার সীমা ছাড়িয়ে। আর আজ এই ঘণ্টা দুয়ের বিচ্ছেদে প্রাণ এত ব্যাকুল হয়ে উঠল? এতদিন পরে বুঝতে পারলুম, লাখ লাখ যুগ ধরে হিয়ায় চেপে রাখলেও হিয়া জুড়োয় না।

এ কি? বাড়ির সদর দরজা খোলা কেন? কাবুলে তো এরকম হয় না—শান্তির সময়ে, দিন দুপুরেও।

একটু ইতস্তত করে বাড়িতে ঢুকলুম। এ কি! এত যে চাকর দাস-দাসী আঙ্গিনা ভর্তি করে থাকে, আজও সকালে বিয়ের পরের দিনের কি এক পরব তৈরি করতে লেগে গিয়েছিল, তারা সব গেল কোথায়? জিনিসপত্র তেমনি ছড়ানো। সিঁড়ির মুখে একটা কলসী কাত হয়ে পড়ে আছে; তার জল জমা হয়ে খানিকটা বরফ হয়ে গিয়েছে। কাবুলীরা কি অমঙ্গল চিহ্ন চেনে না?

আমার বুকের ভিতর কি রকম করতে লাগল। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে।

কাকে ডাকি? আমি তো কারোরই নাম জানি নে।

হঠাৎ কি অজানা-অমঙ্গল আশঙ্কা মনে জেগে উঠল। ছুটে গেলুম আমাদের বাসরঘরের দিকে। খোলা দরজা খাঁ খাঁ করছে।

'শব্‌নম', 'শব্‌নম'—চেঁচিয়ে উঠলুম। কোনও উত্তর নেই।

সব কিছু সাজানো গোছানো। এক ট্রে চা পর্যন্ত। শুধু একদিকে একটি ছোট পেয়ালা চা—তার আধ পেয়ালা খাওয়া হয়েছে।

এঘর ওঘর সব ঘর খাঁ খাঁ করছে। সেই পাগলের মত ছুটোছুটির ভিতর একই ঘরে ক-

বার এসেছি বলতে পারব না। এমনকি জানেমনের ঘরেও গেলুম। সেখানেও কেউ নেই।

আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। আঙ্গিনায় নেমে শুষ্ককণ্ঠে চেঁচাতে লাগলুম, 'কে আছ, কোথায় আছ?' 'কে আছ, কোথায় আছ?'

কতক্ষণ কেটে গেল কে বলতে পারে।

আমার পিছন থেকে কে এসে আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। এ বাড়ির চাকর। আমি ভাঙা গলায় যতই তাকে প্রশ্ন করি সে আরও চিৎকার করে কাঁদে। সে বরফের উপর শুয়ে পড়ে গোঙরাতে আরম্ভ করেছে।

দেউড়ি দিয়ে আরও লোক ঢুকছে। বাড়ির দাস-দাসী। আমাকে ঘিরে তারা চিৎকার করে সবাই কাঁদছে। বুক-ফাটা কান্না—জিগরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। সবাই আমার পা, হাঁটু, জানু জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে।

এই অর্ধচেতন অবস্থায় বুঝতে পেরেছি, নিদারুণ অমঙ্গল না হলে এতগুলো মানুষ এরকম মাথা খুঁড়তে পারে না।

এরই মাঝখানে ভিড় ঠেলে সেই কলেজের ছোকরাটি আমার কাছে এগিয়ে এল। সেও পাগড়ির লেজ দিয়ে মুখ নাক ঢেকে সেটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে আত্মগোপন করছে। প্রথমটায় আমিও তাকে চিনতে পারি নি। তার চোখে আতঙ্ক, ঘৃণা আর কান্না। পাড়া-প্রতিবেশীর ভিতর একমাত্র সে-ই সাহস করে দুঃসংবাদ দিতে এসেছে। যত বড় দুঃসংবাদই হোক আমি সেটা শুনব। অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা থেকে হোক সেটা দুঃসহতর অসহ্য। কানের কাছে মুখ রেখে চেঁচিয়ে বললে, 'শব্‌নম বীবীকে বাচ্চার সেনাপতি জাফর খানের লোক নিয়ে গিয়েছে—।' আমার পায়ের তলায় যেন কিছু নেই। ছেলেটি আমার কোমর দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আকুল কণ্ঠে বললে, 'হুজুর, এ-সময়ে আপনি অবশ হবেন না। আপনার জ্যাঠা শ্বশুরমশাই তাঁর সন্ধানে আর্ক দুর্গে গিয়েছেন। আপনাকে বাড়িতে থাকতে বলে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন, আপনি যেন কিছুতেই না বেরোন।'

আমাকে ধরাধরি করে জানেমনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে বললে, 'আমি আর্কে চললুম খবর নিতে।'

কতক্ষণ কি ভাবে কেটেছিল বলতে পারব না। দাসদাসীরা কাঁদছে। দু-একজন যেন কথাও বলছে, কান্নার সঙ্গে সঙ্গে। কেন সর্দার আওরঙ্গজেব চলে গেলেন? তিনি থাকলে তো এরকম হত না। কেন তিনি কড়া মানা করে গেলেন, কেউ যেন ডাকুদের সঙ্গে লড়তে না যায়। তোপল্ থাকলে, হুকুম পেলে একাই তো বিশজনকে শেষ করতে পারতো। ওরা—নিজেরাও তো কিছু কাপুরুষ নয়। আরও অনেক ফরিয়াদ তারা করেছিল।

এদের ভিতর যে সবচেয়ে বৃদ্ধ সে আমাকে বিছানা থেকে তুলে একটা চেয়ারে বসালে। তার চোখ শুকনো। মনে হল সে কাঁদে নি, কথাও বলে নি। আমি কোনও কথা বুঝতে পারছি না দেখে আমাকে ধীর কণ্ঠে বললে, 'ছোট সাহেব, আপনি শক্ত হন। আপনি এ বাড়ির জোয়ান মালিক। আপনি ভেঙে পড়লে এই এতগুলো লোক পাগল হয়ে কি যে করবে ঠিক নেই। এরা প্রথমটায় প্রাণের ভয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে লুকিয়েছিল। এখন আবার ক্ষেপে গিয়ে কি করবে বলা যায় না। বাচ্চার ডাকুরা লুটপাট করে নি কিন্তু এখন আর সবাই আসবে বাড়ি লুট করতে। আমি কিছুই বলি নি! এ বাড়িটা রক্ষা করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য?'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, 'দেখুন হুজুর, এ বাড়ির কত সম্মান, কত বড় ইজ্জত। সর্দার আওরঙ্গজেব পরিবারের বাস্তুভিটে না হয়ে আর কারও হলে এতক্ষণে পাড়া-প্রতিবেশীরাই এ বাড়ির দোর জানলা পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যেত!'

আমি তখনও কোন সাড়া দিচ্ছি নে দেখে হতাশ কণ্ঠে বললে, 'এই যে এতগুলো লোক, এদের জীবন মরণ আপনার হাতে। সর্দার হুকুম দিয়েছিলেন, বাচ্চার লোককে যেন কোনও বাধা

না দেওযা হয। এখন অন্য লোক লুট কবতে এসে এদেব মেবে ফেলতে পাবে—আপনি হুকুম না দিলে এবা পাগলেব মত কি কবে ফেলবে তাব কোনও ঠিক নেই।'

ওই একই কথা বাব বাব বলে।

'আপনাব শ্বশুবমশাই, জ্যাঠাশ্বশুবমশাই আপনাদেব প্রতি যে আদেশ বেখে গেছেন সেটা পালন করুন। শব্‌নম বীবীব জন্য যা কবাব সে তাঁব জানেমন্ কববেন।'

এবাবে শেষ অস্ত্র ছাড়লো—'তিনি ফিবে এসে যদি শোনেন আপনি ভেঙে পড়েছিলেন তখন তিনি কি ভাববেন?'

আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ কবলুম, ব্রিটিশ লিগেশনেব সেই ভাবতীয কর্মচাবীকে সব খবব দিযে আসতে। কি ভাবে কি হযেছিল আমি এখনও জানি নে—লিখে জানাব কী?

এইবাবে তাব চোখে জল এল। অস্ফুট কণ্ঠে আল্লাব বিরুদ্ধে কি এক ফবিযাদ জানালে। বওযানা হওযাব সময তবু তাব মুখেব উপব কিবকম যেন একটা প্রসন্নতা দেখা গেল। বোধ হয ভেবেছে, তবু শেষটায বাড়িব কর্ণধাব পাওযা গেল।

হায বে কর্ণধাব।

একজনকে আদেশ দিতে বাকিবা কি জানি কি ভেবে, অন্ধভাবে কি যেন অনুভব কবে চলে গেল।

আমি শব্‌নমেব—আমাব—আমাদেব, আমাদেব মিলন বাত্রিব ঘবে আব যাই নি।

শবনম নাকি দাস-দাসীদেব হাতিযাব নিযে বাড়ি বক্ষা কবতে দেয নি। বোবকাটা পবে নিযে ওদেব সঙ্গে সঙ্গে চলে গিযেছিল। জানেমন ডাকাতদেব বলেছিলেন, শবনম বিবাহিতা বমণী। তাঁব কথায কেউ কান দেয নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বওযানা হন। দু'জন লোক তাঁকে ধবে নিযে গিযেছে।

আমাকে কি এঁবা বাড়িব তদাবকিব জন্যই বেখে গেলেন? আমি কি অন্য কোনও কাজেব উপযুক্ত নই?

আমি যাব আর্কে? এ বাড়িতে আমাব কি মোহ?

এই সমযে লোকে চা খায। দেখি, শব্‌নমেব বুড়ি সেবাদাসী চা নিযে এসেছে।

আমাকে একটি চিবকুট এগিযে দিলে। বোধ হয ভেবেছে, আমি কিছুটা প্রকৃতিস্থ হযেছি।

দুটি মাত্র কথা। 'বাড়িতে থেকো। আমি ফিবব।'

আমি কাপুরুষ নই, আমি বীবও নই। এবকম অবস্থায মানুষ ভানভণিতাও কবতে পাবে না। আমাব ভিতবে যা আছে, তা ধবা পড়বেই।

বৃদ্ধকে বাড়িতে বসিযে যেতে পাবতুম। আব কাউকে লিগেশনে পাঠালেই তো হত।

না, সর্দাব হওযাব মত ধাত দিযে বিধাতা আমাকে গড়েন নি।

কিন্তু লিগেশনে খবব পাঠাবাব মত সংবিৎমান লোক ওই তো একমাত্র ছিল। অন্য কাউকে পাঠালে যে দুশ্চিন্তা থাকত সে লোকটা খবব ঠিক জাযগায মত পৌঁছিযেছে কি না।

না, সর্দাব হওযাব মত ধাত দিযে বিধাতা আমাকে গড়েন নি।

শব্‌নমেব কোনও কথা তো আমি কখনও অমান্য কবি নি। অনেকে অনেক কথা বলবে, অনেকে অনেক উপদেশ দেবে, তাই সে যাবাব সময স্থিব বুদ্ধিতে পাকা আদেশ দিযে গিযেছে।

এখন না হয সবাই আমাকে বাড়িতে থাকতে বলছে, কিন্তু যদি বিপদ কেটে যায, হ্যাঁ, যদি বিপদ কেটে যায, তবে একদিন সবাই ভাববে না যে আমি ভীরুব মত বাড়িতে হাত-পা গুটিযে বসে বযেছিলুম, সবাই যখন আর্কে।

হায়রে আত্মাভিমান। সবাই যেন বোঝে আমি কাপুরুষ।

কাব কাছে আত্মাভিমান? শব্‌নম কি এতদিনে জানে না, আমি বীব না কাপুরুষ। সে তো প্রথম দিনে—না, প্রথম মুহূর্তেই—আমাকে চিনে নিতে পাবে নি?

লোকজনদের সবাই এখন আমার বাড়ি চেনে। একজনকে ডেকে বললুম, 'যাও তো, আব্দুর রহ্‌মানকে ডেকে নিয়ে এস।'

হে খুদাতালা, তুমি আমাকে পথ দেখাও। আমার আনন্দের দিনে তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে, তোমাকে স্মরণ রাখতে—আজ এই চরম সঙ্কটের দিনে সেই অনুগ্রহ কর, মহাবাজ। আমি তোমাকেই স্মরণ করছি।

খবর এল আব্দুর রহ্‌মান আমার ছাত্রের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্রতিবেশী কর্নেলের ছেলেকে বাড়িতে বসিয়ে আর্কে চলে গেছে।

তারপর আমার মতিভ্রম আরম্ভ হল।

স্বপ্ন দেখি নি, সে আমি ঠিক ঠিক জানি। যেন স্পষ্ট, স্পষ্ট কেন, স্পষ্ট হতেও স্পষ্টতর দেখতে পাচ্ছি, আমি মায়ের এক জানুতে, শব্‌নম অন্য জানুতে বসে আছে আর মা কলাপাতার সামোসাতে মোড়া ধান দূর্বা আমাদের মাথার উপর রেখে আশীর্বাদ করছেন। জাহানারা আর কুটি মুটি মাটিতে শুয়ে সক্কলের আগে নূতন চাচীর মুখ দেখবার চেষ্টা করছে।

সংবিতে ফিরেছিলুম বোধ হয় মায়েরই পুণ্যবলে, তাঁরই আশীর্বাদের ফলে।

মনসুর সামনে দাঁড়িয়ে। সেই কলেজের সহৃদয়, বীর ছেলে।

নতমস্তকে বললে, 'আপনার জ্যাঠশ্বশুর সোজা নূতন-বাদশা বাচ্চা-ই-সকাওয়েব দরবারে চলে যান। সে আর্কে ছিল না। তিনি মোল্লাদের উদ্দেশ্য করে জাফর খান এবং তার দলবলকে চিৎকার করে অভিসম্পাত দিতে থাকেন। তাঁকে একটা ছোট কুটুরিতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বুঝলুম, 'তুমি আমার অনেক উপকার করলে। এর চেয়ে মহত্তর কোনও গুরুদক্ষিণা নেই।'

রাস্তায় নেমে বললুম, 'এবারে তুমি বাড়ি যাও।'

বাড়ির লোক আবার অট্টরোল করে উঠেছে। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে আমাকে বারবার যেতে মানা করছে, আর বলছে সেখানে গিয়ে কোনও লাভ নেই।

আশ্চর্য! ওদের কথা, ওদের অনুনয় আমি ঠিক মত শুনি নি কিন্তু নেড়া চিনার গাছের ডগায় যে ষোড়শীর চাঁদ উঠেছে সেটা ঠিক লক্ষ্য করেছি। বুকে যেটুকু রক্ত ছিল সেও যেন জমে গেল। কাল রাত্রে শব্‌নম এই চাঁদের—

রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। আর্কে ঢোকে কার সাধ্য। ঘোড়সওয়ার অনেক। তারা বেপরোয়া মানুষের ভিতর দিয়ে, উপর দিয়ে, তাদের জখম করে চলেছে আরও বেপরোয়া হয়ে আর্কের দিকে, আর আর্কের ভিতর থেকে আরেক বিরাট জনধারা বেরিয়ে আসতে চাইছে শহরের দিকে। দু'দিক থেকেই জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই এবং দুই জনোচ্ছ্বাস মিলে গিয়ে যে খণ্ড খণ্ড আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে কোন দিকেই কেউ এগুতে পিছোতে পারছে না। অথচ চাপ দু'দিক থেকে বেড়েই যাচ্ছে ক্রমাগত। কেউ যেন আপন সংবিতে নেই।

এই প্রথম আমি আমার আপন সংবিতে ফিরে এলুম।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, এ জনতা ভেদ করে মনসুরের আসতে সময় লেগেছিল কেন?

হঠাৎ দেখি, দূরে তিন জন ঘোড়সওয়ার জনতার উপর মাথা তুলে আর্ক থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে আসছে। তাদের গতি অতি মন্থর, কিন্তু দৃঢ়। মাঝখানে সওয়ার নিষ্ক্রিয়, নিরুদ্বেগে বসে আছে। দু'পাশের দুই সওয়ার বল্লম না কি দিয়ে যেন নির্মমভাবে উন্মত্ত জনতাকে খোঁচা দিচ্ছে, পথ করে দেবার জন্য।

চাঁদের আলো মুখে পড়েছে। এ কি? এ তো জানেমন্‌।

চিৎকার করে উঠেছিলুম, 'জানেমন্‌, জানেমন্‌, জা—।'

কে শোনে?

আমার শরীরে হাতির বল থাকলেও আমি তাঁর দিকে এগুতে পারতুম না। জনতরঙ্গের যে সামান্যতম গতিবেগ সে আমাকে নিয়ে চলেছে বড় রাস্তার দিকে।

নিরঙ্কুশ দুর্ভাগ্য সারি বেঁধে আসছে দেখে নিপীড়িত জন পাছে অজ্ঞান হয়ে সর্ব যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায় তাই ব্যঙ্গরাজ কিস্মতাধিপতি মাঝে মাঝে অভাগার কপালেও লক্ষ্মীর অঞ্চল বুলিয়ে দেন। আমি জনপীড়ায় অনিচ্ছায় সরছি শহরের দিকে, জানেমনের গতিও সেদিকে—যদিও তিনি অনেক দূরে। একটুখানি কম ভিড়ে পৌঁছতেই আমি নেমে গেলুম রাস্তার পাশের বরফ জমা নয়ানজুলিতে। সেখানে তাঁর পৌঁছুতে লাগল যেন অনন্তকাল। চার-পাঁচজন লোক তাঁর ও অন্য দুই ঘোড়সওয়ারের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলেছে—এদের দলেরই হবে। এদেরই একজন আমাকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জানেমন্‌কে ডেকেছিলুম, কিন্তু আমাব গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় নি।

জানেমনের মুখের দিকে আমি এক লহমার তরে তাকিয়েছিলুম।

বিকৃত, বিকট, বীভৎস—যেন এর কোনটাই নয়—কিংবা সব কটাই—তিনি কিন্তু সেগুলো যেন সংহরণ করে নিয়েছেন রুদ্ররাজ পুষণের মত। এক চোখ দিয়ে রক্ত ঝবে বাম গালে জমে আছে।

তিনি নেমে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন আমি অনুভব করতে পারি নি। শুনেছি, যোগীবা নাকি স্বেচ্ছায় সেটা বন্ধ করে দিতে পারেন। মনে হল, তিনি স্বেচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে।

ঘোড়সওয়ার আর্কের দিকে ফিবে গেল। সঙ্গীরা পিছনে পিছনে এল। তাদেরই একজন শুধু বার বার বিড়বিড় কবে বলছে, 'আমার কোনও দোষ নেই।'

জানেমন্‌ আমাকে হাতে ধবে নিয়ে যে ভাবে দৃঢ়পদে চলেছেন তাতে আমাকেই জ্যোতিহীন বলে মনে হবে। তিনি কোনও কথা বলছিলেন না। তবু বুঝলুম, তিনি আমাদেব কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে শুধু আমার ডান হাতখানা তাঁব বুকের উপর চেপে ধরছিলেন। আমার অশান্ত ভাব দেখে শেষটায বললেন, 'শব্‌নম আর্কে নেই। তার সন্ধান পাওযা যাচ্ছে না।'

বাড়িতে ঢুকলে আবার কান্নার রোল পড়ল। শব্‌নমের বাড়ি ফেবার ক্ষীণতম আশাটুকুও আমাদের গেল।

সেই বৃদ্ধ লিগেশন থেকে ফিরে এসেছে।

দুই

জানেমন্‌ বললেন, 'বাছা, এবার নমাজের সময় হয়েছে। তুমি ইমাম হও।'

বয়োজ্যেষ্ঠ সচরাচর নমাজের ইমাম—অধিপতি—হন। বিকলাঙ্গ হন না। আমি আপত্তি জানাতে তিনি উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, 'আর, নমাজের শেষে দোওয়া মাঙ্‌বার সময় কোনও কিছু চেয়ো না। ওঁর যা প্রাপ্য তাঁকে তাই দেব।'

আল্লার উপর অভিমান।

মনসুরের কাছে সব শুনলুম।

বাচ্চা-ই-সকাও আর্কে ছিল না—জানেমন্‌ যখন সেখানে পৌঁছন। বাচ্চার খাস কামরার দিকে তিনি রওয়ানা হলে কেউ বাধা দেয় নি।

মনসুর বললে,

'আপনি জানেন না, হুজুর, এদেশের লোক বড়সাহেবকে কি সম্মানের চোখে দেখে। শুধু কি বাচ্চার জন্মভূমি?—ময়মনা হিরাত, মজার বদখ্শান সর্বত্রই লোকে জানে তিনি সূফী, তিনি আল্লার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ডাকাতদের ভিতরও জাফর খান কি সহজে অত ঘোরতর পাযণ্ড খুঁজে পেয়েছিল যারা শব্নম বীবীকে ধরে—' ঢোক গিলে বললে, 'আমি বলছি, নিয়ে যেতে? এবং তারাও কি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে?'

'বড়সাহেব বাচ্চার খাসকামরার শব্দ শুনে বুঝলেন, মোল্লারা সেখানে জমায়েৎ। এরা কাবুল শহরের সব চেয়ে অপদার্থ। আমান উল্লার আমলে এরা প্রায় ভিক্ষা করে জিন্দেগী চালাচ্ছিল। এদের কোন্ গোঁসাই বড়সাহেবের নুন-নেমক খায় নি—তিনি তো দানের সময় পাত্রাপাত্র বিচার করেন না।

'বড়সাহেব সেখানে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে অভিসম্পাত করতে লাগলেন।

'সে আমি আপনাকে বলতে পারব না, হুজুর; এ তো গালগালাজ, চিৎকার চেঁচামেচি নয়। তিনি শান্ত, দৃঢ়, উচ্চকণ্ঠে যেন আল্লার হয়ে পৃথিবীর সর্ব নরাধম পশুকে তাদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছিলেন।

'হঠাৎ তাঁর বন্ধ চোখ ফেটে রক্ত বেরল। আমার শোনা কথা, যৌবনে চোখের অপারেশন প্রায় শুকিয়ে গিয়ে জ্যোতি ফিরে পাবার মুখে তাঁর গলায় কি আটকে গিয়ে তিনি বিষম খান। তখন ব্যাণ্ডেজের উপর দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। সেই হয় সর্বনাশ। আজ আমি দেখি, কোনও কিছু না, হঠাৎ বন্ধ চোখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

'পাপ পুণ্যের কি জানি, হুজুর? আপনার কাছেই তো শিখছি। জানি কুমারী, বিধবা কোনও অবলাকে ধরে নিয়ে যাওয়া পাপ—আর ইনি তো বিবাহিতা রমণী। মোল্লারা, ওই অপদার্থ মোল্লারা—'

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'সব মোল্লাই কি—?'

বললে, 'সে আমি জানি, হুজুর। আপনিও তো একদিন ক্লাসে নিজেকে মোল্লা বংশের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আমিও মোল্লা, মোল্লার বেশে ওইখানে গিয়েছিলুম বলে।

'সেই মোল্লাদের প্রবীণ যিনি, তাঁর আদেশে বড়সাহেবকে একটা কুঠুরিতে নিয়ে বন্ধ করে রাখা হল। তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর সে বললে, "কি বলতে কি বলে ফেলবেন ইনি। হাজার হোক নূতন বাদশাকে চটিয়ে লাভ কি?" হয়তো এরা সত্যই আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিল।

'ফরসা লোকও ভয়ে পাংশু হয়—নির্লজ্জও লজ্জা পায়।

'সে সব কথা থাক।'

'সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ খবর এল—কি করে, কোথা থেকে জানিনে, শব্নম বীবী জাফর খানকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন।

'হুজুর, আপনি শক্ত হন।'

'আর জাফরের যে দেহরক্ষী শব্নম বীবীকে বন্দী-খানায় নিয়ে যাচ্ছিল সে ও শব্নম বীবী দু'জনেই অন্তর্ধান করেছেন।'

আমি বেরবার জন্য তৈরী ছিলুম। বললুম, 'বৎস, তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। এখন তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি সন্ধানে বেরুই।'

সে বললে, 'আপনি সব কথা শুনে নিন। বড়সাহেব সেই হুকুম করেছেন।'

'যে রক্ষী শব্নম বীবীকে নিয়ে যাচ্ছিল সে এখন বড়সাহেবের পা ধরে কাঁদছে। তাকে ডাকব, না আমি বলব? আদেশ করুন।'

আমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না।

বললে, 'ওর বাপদাদা সাহেবের নুন খেয়েছে কান্দাহারে। সে ডাকাত হয়ে বাচ্চার দলে ভিড়েছে। সে যা বলেছে তার মূল কথা শব্‌নম বীবীকে প্রথমটায় একটা কুঠুরিতে বন্ধ করে রাখা হয়। সন্ধ্যার দিকে জাফর তাকে ডেকে পাঠায়। জাফর সে ঘরে একা ছিল। ভিতরে কি হয়েছিল কেউ বলতে পারবে না একমাত্র শব্‌নম বীবী ছাড়া। হঠাৎ একটি মাত্র গুলি ছোঁড়ার শব্দ হল। দেহরক্ষীর দল যা দেখবে ভেবেছিল, তার উল্টোটা। জাফর খান ভুঁয়ে লুটিয়ে আর শব্‌নম বীবীর হাতে পিস্তল। হাসান আলী—আমাদের এই রক্ষী—বললে, সে কিছুই জানত না। আর পাঁচজন রক্ষীর সঙ্গে ছুটে গিয়ে সে এই প্রথম দেখলে তার মনিবদের ঘরের মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে।

'হাসান আলী ডাকাত—আহাম্মুখ নয়। সে তখন নাকি শব্‌নম বীবীকে বন্দীখানায় নিয়ে যাওয়ার ভান করে আর্কের দেউড়ির দিকে রওয়ানা দেয়।'

মনে পড়লো, শান্তির সময়ও জানতুম না, শব্‌নমকে কোথায় খুঁজতে হবে।

'ইতিমধ্যে বাচ্চা-ই-সকাও আর্কে ফিরেছেন এবং তার কিছুক্ষণ পর হাজার হাজার লোক, এবং শত শত ঘোড়া-গাধা-খচ্চর চড়ে গাঁয়ের লোক এসেছে নূতন বাদশাকে অভিনন্দন জানাতে—সোজা ফার্সীতে বলে, ইনাম, বকশিশ, লুটেরা হিস্যা কুড়োতে। এরা একবার আর্কে ঢুকতে পারলে বেশ কিছুটা খণ্ড-যুদ্ধ লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়। জাফর খান তাই আগেই হুকুম দিয়ে রেখেছিল, জনতা দুর্গে ঢোকবার চেষ্টা করলে তাদের যেন ঠেকানো হয়। লেগে গেল ধুন্ধুমার। আপনি তার শেষটুকু দেখেছেন, হুজুর—বুঝুন তখন কি হয়েছিল।

'বাচ্চা ফিরতেই মোল্লারা তাকে সব কিছু বলে শব্‌নম বীবীকে ছেড়ে দিতে বলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাকি খবর আসে জাফর খান খুন হয়েছে। এবং আশ্চর্য, শব্‌নম বীবীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চার হুকুমে সমস্ত আর্ক তন্ন তন্ন করে তালাশ করা হয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'হাসান আলী কি বলে?'

'ওই এক কথা—''আমার কোনও দোষ নেই, আমার কোনও কসুর নেই।'' ভিড়ের চাপে নাকি একে অন্যের কাছ থেকে ছিটকে পড়ে।'

'সে কতক্ষণ হল?'

'ঘণ্টা দুই হবে। আপনি তো সে ভিড়ের এক আনা পরিমাণ দেখলেন।'

'হাসান আলীকে ডাক।'

এল। আমার যা জানার সবচেয়ে প্রয়োজন সে কি আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুধিয়ে জিজ্ঞেস করি নি! ওই এক কথা। হাসান আলী হঠাৎ দেখে, শব্‌নম বানু তার কাছে নেই—ওই এক কথা।

আমি মনসূরকে বললুম, 'চল।'

দেউড়িতে এসে মনসূর শুধালে, 'কোথায় যাবেন, হুজুর?'

তাই তো। কোথায় যাব? 'চল, আর্কে। না। চল, আব্দুর রহ্‌মান কোথায় দেখি।'

কর্নেলের বাড়ি পৌঁছতে মনসূর সেখানে খবর নিলে। যখন ফিরলো তখন তার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারলুম, কোনও খবর নেই। মনসূর কিছুক্ষণ পরে বললে, 'কর্নেলের বীবী আপনাকে বলতে বললেন, শব্‌নম বীবীকে লুকোবার প্রয়োজন হলে তিনি প্রস্তুত আছেন। তাঁদের গাঁয়ের বাড়ি সম্পূর্ণ নিরাপদ।' তারপর মনসূর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'কর্নেলের মত সজ্জন লোক মারা গেলেন যুদ্ধে—আর বেঁচে রইল ডাকাতরা।' তারপর বিড়বিড় করে স্কুলপাঠ্য বই থেকে বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করলে, ''তন্বঙ্গী কুমারী লজ্জা নিবারণের ট্যান্া নেই বলে বাড়ি থেকে বেরুতে পারছে না, আর ওদিকে বড়লোকের কুকুর মখমলের বিছানায় শুয়ে আছে। হে সংসার, আমি তোমার মুখের উপর থুথু ফেলি।''

আমি কি বলব, কি ভাবব। মনসূরের দার্শনিক কাব্যাবৃত্তি আমার ভালোও লাগে নি মন্দও লাগে নি।

মনসূর শেষ কথা বললে, 'কিন্তু দেখুন হুজুর কর্নেলের স্ত্রী ভেঙে পড়েন নি।'

আমি গুরু সে শিষ্য।

মনে নেই, হয়তো কোনও দিন ক্লাসে চরিত্রবল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলুম।

আব্দুর রহ্‌মান বাড়ি ফেরে নি।

কাবুল নদীর পোলের উপর তার সঙ্গে দেখা। গায়ে ওভারকোট নেই। বাকি জামা-কাপড় টুকরো টুকরো। মনসূর তার সঙ্গে কথা বললে। বলার শোনার কিছু নেই। আব্দুর রহ্‌মান ঘণ্টা তিনেক ওই জনসমুদ্র মন্থন করেছে। গাল, বাহুতে হাতের কাছে জখমও তার দেখতে পেলুম। কোনও গতিতে পা টেনে টেনে চলে আসছিল। কিছুতেই বাড়ি যেতে রাজী হল না।

আর্কের সামনে দু-টি একটি লোক। সেখানে মার্শল ল। পাঁচজনের বেশি একত্র দেখলে সান্ত্রীদের গুলি চালানোর হুকুম। জায়গাটা এখন প্রায় ফাঁকা।

আব্দুর রহ্‌মান মনসূরকে বললে, 'হুজুরকে বলুন, এ জায়গার সব তন্ন তন্ন করে দেখেছি। এই পেয়েছি।'

তাকিয়ে দেখি আমার পাঞ্জাবির—আমারই হবে—এক পাশের ছেঁড়া কাপড়ের সঙ্গে একটি পকেট। এদেশে এরকম সাইড পকেটওয়ালা পাঞ্জাবি হয় না। এটা শব্‌নম আমাব কাছ থেকে নমুনা হিসেবে নিয়ে গিয়েছিল, একদিন ওইটে আমার ঘরে পরেছিল।

এইটে পরেই কি সে আর্কে এসেছিল?

দয়াময়, দয়া কর।

অনেকক্ষণ পর মনসূর মৃদুস্বরে ফের শুধালে, 'কোথায় যাবেন, হুজুর।'

'তোমার বাড়ি।'

ভারি খুশি হয়ে বললে, 'তাই চলুন হুজুর। আমি তাকে খুশি করার জন্য প্রস্তাবটি করি নি। তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। নেমক-হারামী? হ্যাঁ। কিন্তু আমি একা, একবার নিজের সঙ্গে একা হতে চাই।

আব্দুর রহ্‌মানকে নিয়েও বিপদ। শেষটায় যখন বললুম, কর্নেলের ছেলেকে বসিয়ে রাখার হক্ক আমাদের নেই—তার মা ওদিকে হয়তো ব্যাকুল হচ্ছেন তখন সে রাজী হল। বাড়িতে ঢোকবার সময় হঠাৎ তার মুখে হাসি ফুটল। কেন? হায় রে! যদি বীবী সাযেবা ওই বাড়িতে ওঠেন!

মনসূর আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, সে জানে, আমি সমস্ত দিন কিছু খাই নি। আগের রাত্রে কতখানি খেয়েছিলুম, সে পাশে বসে দেখেছে—সে তো বরের খাওয়া!

তার প্রত্যেকটি কথা আমার বুকে বিঁধছিল। কেন সে কাল রাত্রের কথা আমাকে স্মরণ করায়? আমি বললুম, 'বাবা, আমি এখন কিছু খেতে গেলে বমি হবে।'

কোথায় যাই? কোথায় সন্ধান করি? কোথায় গেল সে? একটা মানুষ কি করে হঠাৎ অদৃশ্য হতে পারে? কেন দেখা দিচ্ছে না? জাফরকে খুন করল কাদের ভয়ে? খবর পাঠাচ্ছে না কেন? আমাকে জড়াতে চায় না বলে। কিংবা—কিংবা—না, না, আমি অমঙ্গল চিন্তা করব না।

এই দুপুর রাত্রে কার কাছে গিয়ে আমি সন্ধান নিই? কড়া নাড়লে তো কেউ দরজা খুলবে না। নিশ্চয়ই ডাকাত—বাচ্চার ডাকাত। গৃহস্থ গুলি ছুঁড়তে পারে। তা ছুঁড়ুক।

মাত্র একটি প্রাণীর কথা মনে পড়ল। শব্‌নম বিয়ের রাতে বলছিল—না পরে?—আমার যে সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে—যে তার সখীদের সে ভুলে গিয়েছে। তখন একজনের নাম ও করেছিল।

সে-ই তা হলে সবচেয়ে তার প্রিয় সখী। বাড়িটা আবছা আবছা চিনি—স্বামীর নাম থেকে। তখন শুনেছিলুম কান না দিয়ে। সেখানেই যাই। আর্কের অতি কাছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আশ্রয় নিতে হলে সে-ই তো সবচেয়ে কাছে।

আর্কের কাছে এসেছি। ক্লান্তিতে পা দু'খানা অবশ হয়ে এসেছে—না শীতে। হঠাৎ মনে হল, শবনম যদি ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে থাকে? হে খুদা! পাগলের মত ছুটলুম বাড়ির দিকে।

বাড়ি থেকে আবার বেরিয়েছি। কেউ ছাড়তে চায় নি। জানেমন্ শুধু বলেছিলেন,—'বে-ফায়দা, বে-ফায়দা।' কিন্তু ঠেকাবার চেষ্টা করেন নি।

বাঁচালে। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে। রাত কটা হল? ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি। চাঁদটা কাল রাতের কথা বড্ড বেশি স্মরণ করিয়ে দেয়। যেন আমার আপন মন নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে কিছু কসুর করছে।

কাবুলে দিনদুপুরেও অপরিচিতজনকে কেউ কোনও বাড়ি রাতলে দেয় না। কে জানে তুমি কে? হয়তো রাজার গুপ্তচর তার বিপদ ঘটাতে এসেছে। বন্ধুজন যদি হবে তবে তো বাড়ি তোমার চেনা থাকার কথা।

এ রাজা আবার ডাকু। বেধড়ক লুটপাট হচ্ছে। তার উপর রাত দুপুর। তিনটেও হতে পারে।

তবু বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলুম। দরজাও খুলেছিল।

শবনমের নববরর গভীর রাতে নিজের থেকে এসেছে—যার সঙ্গে কোনও চেনাশোনা নেই। আনন্দোল্লাস হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এরা আর সব খবর ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে। শোকে আনন্দে মিশিয়ে তারা আমাকে যা অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সে রকম ধারা অপরিচিতের বাড়িতে কেউ কখনও পায় আমি কল্পনাই করতে পারিনি। মুরুব্বীরা কেমন যেন অপরাধীর মত ম্লান হাসি হেসে আমাদের একা রেখে চলে গেলেন। সখীর স্বামী বয়সে কম হলেও বিচক্ষণই লোক। আমাকে সখী—গুল্‌বদন বানুর কাছে বসিয়ে কি একটা অছিলা করে উঠে গেলেন।

সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি—শাস্ত্রে নিশ্চয়ই রাবণ—তবু সে আমাকে একা পাওয়া মাত্রই আমার হাত দু'খানা নিজের হাতে তুলে চোখে ঠেকিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নিয়ে সে কত সুখস্বপ্ন দেখেছিল সে কথা বলতে বলতে বার বার তার গলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আর কখনও বা হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল।

'কোথায় যেতে পারে? তাকে কে না স্থান দেবে? কিন্তু আমার বাড়িতে না এসে অন্য কার বাড়িতে যাবে? আমার শ্বশুর তার জ্যেঠার বিশেষ বন্ধু।'

হঠাৎ তার কি খেয়াল গেল জানি না। বলে উঠল, 'তাই হয়তো হবে, হ্যাঁ, তাই।' যেন আপন মনে চিন্তা করছে। আমি কোনও কথায় বাধা দিই নি। পাছে সামান্যতম কোনও দিক্‌নির্দেশ তারই ফলে কাটা পড়ে যায়, এবং পরে সেটা তার স্মরণে না আসে।

বললে, 'তাই বোধ হয় সে তার অতি অল্প চেনা কোনও লোকের বাড়িতে গিয়েছে।' একসঙ্গে দু'জনাতে বলে উঠলুম, 'তাহলে খোঁজ নেব কোথায়?'

গুল্‌-বদন বানুর শোক, দুশ্চিন্তা উদ্বেগের গভীরতা আমার ভাগ্য নিপীড়নের কাছে এসে দাঁড়াল যেন একাত্মদেহ সখার মত। এ তো সান্ত্বনা নয়, প্রবোধবাণী নয়, এ যেন আমার হয়ে আরেকজন আমার সমস্ত ভাবনা দুর্ভাবনা আপন কাঁধে তুলে নিয়ে দূর দূরান্তে তাকিয়ে দেখছে, কোথায় গিয়ে সে ভার নামানো যায়।

'কিন্তু খবর পাঠাচ্ছে না কেন? ধরা পড়ার ভয়ে, সুযোগ পায় নি বলে। কেউ তাকে আটকে রেখে সুযোগ দিচ্ছে না বলে?'—আপন মনে গুল্‌-বদন বানু কথা বলে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আমার হাত দু'খানা আপন হাতে তুলে নিচ্ছে।

'এই আমাদের প্রথম দর্শন—আর শব্‌নম কাছে নেই।'

এবার সে কেঁদে ফেললে।

তার স্বামী আপন হাতে খুঞ্চায় করে রুটি-গোস্ত নিয়ে এসেছেন। চাকরের মত হাত ধোবার জাম-বাটি ধারাযন্ত্র নিয়ে এলেন তারপর। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ওঁকে শান্ত করবে, না, তুমিই ভেঙে পড়ছ।' অতি শান্তকণ্ঠে, কোন অনুযোগ না করে।

আমি বললুম, 'আমার বমি হয়ে যাবে।'

সেই কণ্ঠেই বললে, 'তা যাক্। যেটুকু পেটে রইবে সেইটুকুই কাজে লাগবে।'

পাশে বসে বাঁ হাত দিয়ে পিঠে হাত বুলতে বুলতে ডান হাত দিয়ে খাবার মুখে তুলে দিয়েছিলেন। গুল্-বদন সামনে এসে হাঁটু গেড়ে খাড়া গোড়ালির উপর বসে সামনে তোয়ালে ধরে দাসীর মত সেবার অপেক্ষা করছিল।

এবা বড়লোক। সেবা করার সুযোগ পেলে এরা জন্মদাসকে হার মানায়।

আমি বললুম, 'এবার উঠি।' আমার সব শোনা হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে গুল্-বদন বানু জানুর উপরে কাগজ রেখে পরিষ্কার গোটা-গোটা অক্ষরে শব্‌নমের সম্ভব-অসম্ভব সব পরিচিতদের ফিরিস্তি তৈরী করেছেন। স্বামী মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করলেন। গুল্-বদন বার বার আমাকে বললে, 'তোমাকে কিছু করতে হবে না। এসব জায়গায় আমার শওহর—স্বামী—যাবেন।' তার স্বামী স্বল্পভাষী। বললেন, 'এ বাড়িতে আমার কোনও কাজ নেই। আমি ছোট ছেলে। আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার কোনও ত্রুটি হবে না। আমানুল্লার পরিত্যক্ত যেসব সত্যকার ভালো গোয়েন্দা ছিল তারাই আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু কঠিন কাজ। আমি শব্‌নম বীবীকে চিনি। তিনি যদি মনস্থির করে থাকেন কেউ যেন তাঁর খবর না পায়, তবে তিনি এমনই পরিপাটিরূপে সেটা করবেন যে সে গিঁট খোলা বড় কঠিন হবে।'

আমি ধন্যবাদ জানাই নি। উঠে দাঁড়ালুম। গুল্-বদন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ রাতে আপনি কোথায় যাবেন? ঝড় উঠেছে।'

তার স্বামী বললেন, 'চলুন।' ...মেলানো বাড়ির চত্বরে নামতে দেখি, উপরের বহু ঘরে আলো জ্বলছে। মুরুব্বীরা জেগে আছেন।

চত্বরেই বুঝলুম ঝড় কত বেগে চলেছে। যদিও চতুর্দিক তিনতলা ইমারতে ইমারতে নিরন্ধ্র বন্ধ।

দেউড়ি খুলতেই আমরা ব্লিজার্ডের ধাক্কায় পিছিয়ে গেলুম। বরফের সাইক্লোন। সামনে এক বিঘতও দেখা যায় না।

স্বামী বললেন, 'আপনি না দেখলে বিশ্বাস না করে ঘরের ভিতর শুধু ছটফট করতেন। এবারে চলুন। ঘরে গিয়ে আলো নেবাই। না হলে মুরুব্বীরা জেগে রইবেন।'

প্রথম আঘাতে মানুষ বিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর আসে ভাগ্যবিধাতার উপর দিগ্বিদিক্‌শূন্য অন্ধ ক্রোধ। তারপর নির্জীব অসাড়তা।

কিন্তু সে জাড্যে নিদ্রা আসে না।

দেশের মেঘলা ভোর তবু বোঝা যায়। এ দেশে বরফের ঝড়ের পিছনে সূর্যোদয় পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত ষড়যন্ত্রযোগে অনুভব করতে হয়।

ওরা বাধা দেয় নি। ঝড় থেমেছে কিন্তু যেভাবে একটানা বরফ পড়ছে তার ভিতর আমি কিছুতেই বাড়ির পথ খুঁজে পেতুম না। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, পথপ্রদর্শক আমাকে ঠিক উল্টো পথে নিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য! এমন জিনিসও মানুষ এসময় ভোলে। গুল্-বদনের ফিরিস্তি সঙ্গে আনি নি।

আমি কোথায় পৌঁছলুম?

তিন

বিরহের দিনে শব্‌নম বলেছিল, 'তুমি আমার বিরহে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।' আমি তার সে আদেশ পালন করেছি। বিধাতা ঘাড় ধরে করিয়েছিলেম।

যখন চিরন্তন মিলনের সুখ স্বপ্ন সে দেখেছিল তখন সে বলেছিল—ওই তার শেষ কথা এখনও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—'তুমি আমার মিলনে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।' এ কথা স্মরণ হলে ভাগ্য-বিধাতার মুখ ভেংচানি দেখতে পাই।

কিন্তু শব্‌নম তার কথা রাখে নি। সে তার শেষ আদেশ দিয়ে গিয়েছিল, আমি যেন বাড়িতে থাকি, সে ফিরে আসবে। সে আসে নি।

ক' বছর হল, আব্দুর রহ্‌মান?

কাবুল শহর আর তার আশপাশের গ্রামে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। লিগেশনের ভারতীয় কর্মচারী আমাকে বার বার পরিষ্কার বললেন, সে আর্কের ভিতর নেই। আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর গুপ্তচর তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। আমার সামনেই তাকে তিনি ক্রশ করলেন। এমন সব অসম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন যেগুলো কখনও আমার মাথায় আসত না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, অনুসন্ধানে কণামাত্র ত্রুটি হয় নি।

তার কিছুদিন পর তিনি একজন একজন করে তিনজন চর পাঠালেন। এরা কাবুল শহর ও উপত্যকার সব কটা গ্রাম ভালো করে দেখে নিয়েছে। ওগুলো আমি নিজে অনুসন্ধান করেছি বহুবার। কোনও কোনও গ্রামে আমার আপন ছাত্র আছে। মনসুরের কাছ থেকে খবর পেয়ে তারা সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খানা-তালাশী হাট-মাঠ তালাশী সব কিছু করেছে, কিন্তু আমার সামনে আসে নি—মনসুরকে নিষ্ফলতা জানিয়ে গিয়েছে। আমাকে তাদের গ্রামে, তাদের গৃহে অপ্রত্যাশিতভাবে আসতে দেখে তারা আমাকে কোথায় বসাবে, কি সেবা করবে ভেবে না পেয়ে অভিভূত হয়েছে। তিন শ' বছর আগে ভারতবর্ষে গুরু তার শিষ্যগৃহে অযাচিত আগমন করলে যা হত এখানে তাই হল। তারও বেশি। গুরুপত্নীর অনুসন্ধানে গাফিলি করবে এমন পাষণ্ড আফগানিস্তানে এখনও জন্মায় নি। লিগেশনের সব ক'জন চরই একবাক্যে স্বীকার করলে তারা এমন কোনও জায়গায় যেতে পারে নি, যেখানে আমি এবং আমার চেলারা তাদের পূর্বেই যায় নি।

এত দুঃখের ভিতরও মনসুর একদিন একটি হাসির কথা বলেছিল। তার ক্লাসের সব চেয়ে দুর্দান্ত ছেলে ছিল ইউসুফ। মনসুর বললে, 'এই কাবুল উপত্যকার প্রথম চেরি, প্রথম নাসপাতি—তা সে যেখানেই থাকুক না কেন—খায় ইউসুফ। শব্‌নম বীবী ইউসুফের আড়ালে বেশিদিন থাকতে পারবেন না। এ শহরের সব দুঁদে ছেলের সর্দার সে-ই। ওদের নিয়ে সে লেগেছে। কোন্ বাড়িতে কে বীবীকে লুকিয়ে রাখতে পারবে আর ক'দিন?'

আমি শুধালুম, 'আর সবাই আমাকে দেখতে এল, সে এল না?'

'সে বলেছে খবর না নিয়ে সে আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।'

আমি যে অবস্থায়, তখন আমার কাছে সম্ভব-অসম্ভব কোনও পার্থক্য নেই। তবু জানি, উপত্যকার বাইরে এখন কেউ যেতে পারে না, এবং বাইরের লোক আসতে পারছে না বলেই খাওয়া-দাওয়ার অভাবে গরীব দুঃখীদের ভিতর দুর্ভিক্ষ লেগে গিয়েছে। সিগারেট তো কবে শেষ হয়েছে ঠিক নেই—চালান আসে হিন্দুস্থান থেকে—এ বাড়ি ও বাড়িতে তামাকের জন্য হাত পাতা-পাতি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাবুলের পূর্বদিকের গিরিপথ বরফে সম্পূর্ণ বন্ধ। পশ্চিমের পথে গজনীর ডাকাতরা বসে আছে, বাচ্চা একটু বেখেয়াল হলেই উপত্যকায় ঢুকে লুটপাট আরম্ভ করবে এবং তারপর শহরের পালা। এই পশ্চিমের পথ দিয়েই আব্দুর রহ্‌মান গিয়েছে আওরঙ্গজেব খানকে খবর

দিতে। যাবার সময় সে দরবেশের পোশাক পরে নিয়েছিল, এ ছাড়া আর কোনও মানুষ ডাকাতদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

উত্তরের পথে বাচ্চা-ই-সকাওর গ্রাম। সে পথে তারই লোকজন ছাড়া কেউ আসা-যাওয়া করে না। দক্ষিণ দিকে পথ নেই, যেটুকু আছে তার উপর কত ফুট বরফ কে জানে।

পুরুষের পক্ষে বেরনো অসম্ভব, দরবেশবেশী আব্দুর রহ্মানও শেষ পর্যন্ত কান্দাহার পৌঁছবে কি না সে নিয়ে সকলেরই গভীর দুশ্চিন্তা, মেয়েছেলের তো কথাই ওঠে না। এই কাবুল উপত্যকাতেই শব্‌নম আছে, কিংবা—?

রাস্তায় যেতে যেতে একদিন সম্পূর্ণ অজানা লোককে কথা বলাবলি করতে শুনেছিলাম। একজন বললে, 'আওরঙ্গজেব খানের মেয়ে বোধ হয় কোনও বাড়িতে—গ্রামেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি—আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বোধ হয় খুন হয়েছেন।'

অন্যজন শুধালে, 'তাঁকে খুন করবে কেন?'

সে বললে, 'বাচ্চার ভয়ে, জাফরের সঙ্গী-সাথী আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে। ধরা তো পড়বেই একদিন। তখন তাব উপায় কী?'

আমি জানতুম বাচ্চা শব্‌নম বীবীর সন্ধানের জন্যে কোনও হুকুম দেয় নি। জাফরের আত্মীয়স্বজনের তার জন্য রক্তের সন্ধানে বেরবার কথা; তারাও বেরোয় নি।

কোন্ ভরসায় তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলুম সে কথা বলতে পারব না। আপন পরিচয় দিয়ে তাদের করজোড়ে শুধিয়েছিলুম, তারা আমাকে কোনও নির্দেশ দিতে পারে কি না? দু'জনাই অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বার বার মাফ চেয়ে বললে, তারা সত্যই কোনও খবর জানে না—চা-খানায় আলোচনার খেই ধরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল মাত্র। দ্বিতীয় লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে একাধিকবার বললে, 'আমার বাড়িতে যদি কোনও মেয়েছেলে একবার ঢুকে আশ্রয় নিতে পারে, তবে আমি খুন না হওয়া পর্যন্ত তার দেখ-ভাল করব।'

কোনও খবরের সন্ধানে মানুষ এ-দেশে যায় সরাইয়ে কিংবা বড়বাজারে। বাজার বন্ধ। সরাইয়ে নূতন লোক তিন মাস ধরে আসে নি। পুরনোরা আটকা পড়ে কষ্টেশ্রেষ্টে দিন কাটাচ্ছে। সরাইয়েব মালিক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে প্রচুর খাতির যত্ন করলে। বললে, 'ইউসুফ প্রায়ই এসে খবর নেয় নূতন কোনও মুসাফির কোনও দিক দিয়ে শহরে ঢুকতে পেরেছে কি না। ওকে আমরা সবাই খুব ভাল করে চিনি। আগে এলে আমাদের ভিতর সামাল সামাল রব পড়ে যেত। এখন এসে একবার সকলের দিকে তাকায়, নূতন কেউ এসেছে কি না আমাকে দু' একটি প্রশ্ন শুধায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে যায়। এই যে আমার চত্বরে বরফজল জমেছে, আগে হলে ইউসুফ স্কেটিং করে করে এখানে পুরো দিনটা কাটিয়ে দিত।'

আমি তাকে শুধালুম, 'তার কি মনে হয়, শব্‌নম কোথায়?'

অনেক চিন্তা করে বললে, 'দেখুন, আমি সরাই চালাই! তার পূর্বে আমার বাবা সরাই-ই চালাতেন। আমার জন্ম ওই উপরের তলার ছোট্ট কুঠরিতে। চোর-ডাকু, পীর-দরবেশ, ধনী-গরীব দূরদরাজের মুসাফিরদের উপর কড়া নজর রেখে তাদের দেখ-ভাল করে আমার দাড়ি পাকল; আমাকে সব খবরই রাখতে হয়। আমি অনেক ভেবেছি। এই সরাইয়ে শীতের রাতে আগুনের চতুর্দিকে বসে দুনিয়ার যত গুণী-জ্ঞানী ঘড়েল-বদমাশরা এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে, কিন্তু সবাই হার মেনেছে।'

তারপর অনেকক্ষণ ভেবে বললে, 'একমাত্র জায়গা কোনও দরবেশের আস্তানা। সেখানে অনেক গোপন কুঠরি গুহা থাকে। রাজনীতির খেলায় কেউ সম্পূর্ণ হার মানলে হয় পালায় মক্কা-শরীফে—সময় পেলে—না হয় আশ্রয় নেয় দরগা-আস্তানায়।'

আমি প্রত্যেক আস্তানায় একাধিকবার গিয়েছি।

আবার ভেবে বললে, 'তা-ই বা কি করে হয়? বয়স্ক লোকদের ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু বাচ্চাদের কাছ থেকে কোনও জিনিস গোপন রাখা অসম্ভব। ইউসুফ যখন লেগেছে তখন—? না, সে হয় না। আপনিও প্রত্যেক দরগায় গিয়েছেন। পীর-দরবেশরা অন্তত আপনাকে তো গোপন খবরটা দিয়ে আপনার এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতেন। দরবেশও তো মানুষ। দরবেশ হলেই তো হৃদয়টা আর খুইয়ে বসে না।'

বিদায় দেবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বার বার সহৃদয় নিশ্চয়তা দিলে, যে-কোনও সময়ে কোনও দিকে যদি সে খবর পায়, তবে নিজে এসে আমায় খবর দিয়ে যাবে।

জীবনই অভিজ্ঞতা, আর অভিজ্ঞতাই জীবন। অভিজ্ঞতাসমষ্টির নাম জীবন আর জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে এক-একটি অভিজ্ঞতা। এক-একটি অভিজ্ঞতা যেন এক এক ফোঁটা চোখের জলের রুদ্রাক্ষ। সব কটা গাঁথা হয়ে যে তসবীমালা হয় তারই নাম জীবন।

একটি অক্ষ দিয়েই আমার সম্পূর্ণ মালা।

সেই অক্ষবিন্দুতে দেখলুম প্রতিবিম্বিত হচ্ছে বহু জনের মুখ। এরা কেন এত দরদী? এদের কী দায়, আমি শব্‌নমকে খুঁজে পেলুম কি না? আল্লা আমাকে মারছেন। তাই দেখে তো ভয় পেয়ে এদের উচিত আমার সঙ্গ বর্জন করা। কই, তারা তো তা করছে না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ল এদের এই অঞ্চলের একটি কাহিনী ঃ—

বাচ্চারা পেয়েছে বাদাম। ভাগাভাগি নিয়ে লেগেছে ঝগড়া। পণ্ডিত নসর উদ্‌দীন খোজা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে করতে আল্লার প্রশংসাধ্বনি (*হাম্‌দ্‌*) উচ্চারণ করছিলেন। ছেলেরা তাঁকে মধ্যস্থ মানলে ভাগ-বখরা করে দেবার জন্য। তিনি হেসে শুধালেন, 'আল্লা যে-ভাবে ভাগ করে দেয় সেই ভাবে, না মানুষের মত ভাগ করে দেব?' বাচ্চারাও কিংবা বলব বাচ্চারাই আল্লার গুণ মানে বেশি, সমস্বরে বললে, 'আল্লার মত।'

খোজা কাউকে দিলেন পাঁচটা, কাউকে দুটো, কাউকে একটাও না। বাচ্চারা অবাক হয়ে শুধালে, 'একী? একে কি ভাগ করা বলে?' খোজা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখ, আল্লা মানুষকে কোনও কিছু সমান সমান দিয়েছেন কি না। সে-রকম সমান ভাগাভাগি শুধু মানুষই করে।'

তাই বুঝি করুণাময় আমার প্রতি অকরুণ হয়েছেন দেখে মানুষ সেটা সহানুভূতি দিয়ে পুষিয়ে দিতে চায়। তাই বুঝি তিনি যখন বিধবার একমাত্র শিশুকে কেড়ে নেন তখন স্বপ্নদেবী তাকে বার বার মা-জননীর কোলে তুলে দেন। তাই বুঝি সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিতে বার বার অসম্পূর্ণতা রেখে দেন—মানুষ যাতে করে সেটাকে পরিপূর্ণ করে তুলে ধরতে পারে।

কিন্তু আমার গুরু, আমার একমাত্র সাহেব, মুহম্মদ সাহেব যে বার বার বলেছেন, তিনি আল্লার পরিপূর্ণতা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন, শঙ্কর যে বলেন তিনিই পরিপূর্ণ সত্য, অন্য সব মিথ্যা—তার কী?

আমার এই দুঃসহ বিরহ-ভার আর অসহ অনিশ্চয়তা?

মিথ্যা।

মানলুম। কিন্তু এই যে এতগুলো লোকের অন্তরের দরদ তাদের কথায় ভাষায়, তাদের চোখের জলে টলটল্ করছে?

মিথ্যা।

মানি নে। আল্লা যদি তাঁর পরিপূর্ণতা কোনও জায়গায় প্রকাশ করে থাকেন তবে সেটা দরদী হৃদয়ে। সৃষ্টির সঙ্গেকার সেই প্রাচীন কথা আজ কি আমাকে নূতন করে বলতে হবে, 'বরঞ্চ আল্লার মসজিদ ভেঙে ফেল কিন্তু মানুষের হৃদয় ভেঙো না।'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, বাসর রাতে লায়লী-মজনূ কাহিনী শেষ করেছিল শব্‌নম ওই কথা

বলে, পরমেশ্বর এ সংসারে স্বপ্রকাশ হয়েছেন একটিমাত্র রূপে—সে প্রেমস্বরূপ।
আচ্ছন্নের মত বাড়ি ফিরেছিলুম।

জানেমনের ঘরে শব্‌নমের সখী।
তিনি বললেন, 'সেই ভালো। ওকে নিয়ে যাও সুফী সাহেবের কাছে।'
পাগলকে মানুষ নিয়ে যায় সাধুসন্তদের কাছে। আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছি?
সখী বর সঙ্গে চললেন। সখী অনুযোগের সুরে বললে, 'কোথায়, না তুমি জ্যোতিহীন বৃদ্ধ চাচাশ্বশুরের সেবা করবে, না তিনি তোমার চিন্তায় ব্যাকুল।'
স্বামী বললে, 'থাক্ না এসব কথা।'

এই প্রথম একটি লোক পেলুম, যিনি আমাদের কথা কিছুই জানেন না।
সব কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, তোমার চাচাশ্বশুর জানেন না, এমন কি কথা আমার আছে যা তোমাকে আমি বলব? তিনি সংসারে থেকেও বৈরাগী। তিনি 'সূফ' (*পশম*) না পরলেও সূফী।'
আমি অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললুম, 'তিনি আমাকে কিছু বলেন নি।'
বললেন, 'তিনিই বা বলবেন কী, আমিই বা বলব কী? আমরা যা-কিছুই বলি না কেন, তুমি তো সেটা বোঝবার চেষ্টা করবে তোমার মন দিয়ে। সেই মন কী, তুমি তাকে চেন? এ যেন একটা কাঠি দিয়ে কাপড় মেপে দেখলে বারো কাঠি হল। যদি সেই কাঠিটা কতখানি লম্বা সেটা তোমার জানা না থাকে তবে কাপড় মেপে বারো বার না বাইশ বার জেনে লাভ হল না। নিজের মন হচ্ছে মাপকাঠি। সেই মনকে প্রথম চিনতে শেখ।'
সখী বললে, 'সে মন চেনা যায় কী প্রকারে?'
সূফী সাহেব আমার দিকে তাকালেন। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলুম।
বললেন, 'মনকে শান্ত করতে হবে। বিক্ষুব্ধ জলরাশিতে বনানী প্রতিবিম্বিত হয় না।'
আমি শুধালুম, 'আরম্ভ করতে হবে কী করে?'
ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললেন, 'সূফী-রাজ ইমান গজ্জালী সকল সূফীদের হয়ে বলেছেন, "মন্দ আচরণ থেকে নিজেকে সংহৃত করে, বাহ্য জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গণের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, নির্জনে চক্ষু বন্ধ করে, অন্তর্জগতের সঙ্গে আত্মার সংযোগ স্থাপন করে, হৃদয় থেকে আল্লা আল্লা বলে তাকে স্মরণ করা।" '
আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'বুঝেছি। তুমি এখন আল্লার উপর বিরূপ। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের বিরূপ ভাব তাঁর প্রেমকে ছাড়িয়ে যেতে পারে—এ তার দম্ভ। কিন্তু সে-কথা এস্থলে অবান্তর। তুমি সেদিকে মন দিতে চাও না, তবে আপন আত্মার দিকে সমস্ত চৈতন্য একাগ্র কর। সেই আত্মা—যিনি সুখ-দুঃখের অতীত। হদীসে আছে, "মন্ অরফা নফ্‌সহু ফকদ্ অরফা রব্বাহু।" যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকে চিনতে পেরেছে।'
আরেক বার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল।
'মন সর্বক্ষণ অন্য দিকে যায়? তাতেই বা ক্ষতি কী? যাকে তুমি ভালবাস তার সঙ্গে যদি একাত্ম দেহ হয়ে গিয়ে থাক তবে নিজের আত্মার দিকে, না তার দিকে মন রুজু করেছ তাতে কী এসে-যায়। সে তো শুধু নামের পার্থক্য।'
বেদনা আমার জিহ্বার জড়তা কেটে ফেলেছে। বললুম, 'একাত্ম দেহ হতে পারলে তার বিরহে

বেদনা পেতুম না, তার চিন্তা অসহ্য হত না।'

গভীর সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় নেই। ঠিক পথে চলেছ। একাধিক সূফী বলেছেন, আল্লার দিকে মন যাচ্ছে না আত্মার দিকে মন যাচ্ছে না—? না-ই বা গেল। তোমার কাছে সব চেয়ে যা প্রিয় তাই নিয়ে ধ্যানে বস। সে যদি সত্যই প্রিয় হয় তবে মন সেটা থেকে সরবে কেন?—আর মূল কথা তো মনকে একাগ্র করা, অর্থাৎ মনকে শান্ত করা।

'আসলে কী জান, মন গঙ্গাফড়িঙের মত। খনে সে এদিকে লাফ দেয়, খনে ওদিকে লাফ দেয়। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে চায় না। কিংবা বলতে পার, কাবুল উপত্যকার চাষার মত ছায়ায় জিরোচ্ছে, কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতে-যেতেই রৌদ্রে গিয়ে কাজ করছে, ফের ছায়ায় ফিরে আসছে, ফের রৌদ্র ফের ছায়া।

'তার গায়ে জ্বর—তোমার মত। তাকে এক নাগাড়ে সমস্ত দিনই ছায়ায় শুইয়ে রাখতে হবে। তবে ছাড়বে তার জ্বর।

'তোমার মন হবে শান্ত।'

সূফী সাহেব থামলেন। আমি সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধালুম, 'তারপর?'

ইচ্ছে করে অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, 'তারপর আর কি বাকী রইল? তখন মালিক যা করার করবেন। তুমি তখন শান্ত হ্রদ—মালিক তাঁর ছায়া ফেলবেন। তোমার অজ্ঞেয় অগম্য কিছুই থাকবে না।'

হেসে বললেন, 'তাঁকে তো কিছু-একটা করবার দিতে হয়। সব দুর্ভাবনা কি তোমার?'

আমি সেই পুরাতন প্রশ্ন শুধালুম, যে প্রশ্ন আজ নয়, বহুকাল ধরে মনে জেগে আছে—বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা যখন চিন্তা করি, কল্পনাতীত অন্তহীন দূরত্বের পিছনে বিরাটতর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ যখন বৈজ্ঞানিকেরা দেয় তখন ভাবি, আমি এই কীটের কীট, আমার জন্য আর কে কতখানি ভাবতে যাবে?'

সূফী সাহেব বললেন, 'সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তোমার উপর।'

'এই যে কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা বললে—তুমি কল্পনা কর না কেন, তিনি আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তা হলেই তো তিনি সম্পূর্ণ একটা ব্রহ্মাণ্ড তোমার—একমাত্র তোমারই—দেখাশোনার জন্য মোতায়েন করতে পারেন। তা হলেই দেখতে পাবে লক্ষ লক্ষ ফিরিশতা-দেবদূত তোমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, তোমার প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব রাখছেন হাজার হাজার দেবদূত, তোমার প্রতিটি হৃদ্স্পন্দনের খবর লিখে রাখছেন লক্ষ লক্ষ ফিরিশতা। আর তুমি যদি কল্পনা কর তোমার খুদা মাত্র দশটা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তা হলে অবশ্য তুমি অসহায়।

'কিন্তু তিনি তো অনন্ত-রাজ। সংখ্যাতীতের মালিক।'

'কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ড চাও, একমাত্র তোমারই তদারকি করার জন্য?'

আমি অভিভূত হয়ে তাঁর কথা শুনে যাচ্ছি এমন সময় তিনি আমাকে যেন সর্বাঙ্গ ধরে দিলেন এক ভীষণ নাড়া। বললেন, 'কিন্তু এ সব কথা বৃথা, এর কোনও মূল্যই নেই। কারণ গোড়াতেই বলেছি, আপন মনকে না চিনে সেই মন দিয়ে কোনও কিছু বোঝার চেষ্টা করা বৃথা। তার প্রমাণস্বরূপ দেখতে পাবে, বাড়ি পৌঁছতে না পৌঁছতেই তোমার গাছতলার ছায়ার চাষা আবার রৌদ্রে ঘোরাঘুরি করছে—তোমার মন আমার কথাগুলোর দিকে আর কান দিচ্ছে না। এবং এগুলো আমার কথা নয়—বড় বড় সূফীরা যা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি আমি করেছি মাত্র।'

আমি নিরাশ হয়ে বললুম, 'তা হলে উপায়?'

বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'মনকে শান্ত করা। আর ভুলে যেয়ো না, সাধনা না করে কোন কিছু হয় না। পায়লোয়ানের উপদেশ পড়ে মাংসপেশী সবল হয় না, হেকিমীর কেতাব পড়ে পেটের অসুখ সারে না। মনকেও শান্ত করতে হয় মনের ব্যায়াম করে।

'আর ঠিক পথে চলেছে কি না তার পরখ—প্রতিবার সাধনা করার পর মনটা যেন প্রফুল্লতব বলে মনে হয়। ক্লান্তি বোধ যেন না হয়। পায়লোয়ানরাও বলেছেন, প্রতিবার ব্যায়াম করার পব শরীরটা যেন হাল্কা, ঝরঝরে বলে মনে হয়।

'না হলে বুঝতে হবে, ব্যাযামে গলদ আছে।'

আমাদের সামনে হালুয়া ধরে বিদায় দিলেন।

আমরা আসন ছেড়ে উঠেছি এমন সময় তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, তোমার একটি আচরণে আমি খুশি হয়েছি। গ্রামের চাষা তিন মাস রোগে ভুগে শহরে এসে হেকিমের কাছ থেকে দাওয়াই নিয়েই শুধায়, "কাল সেরে যাবে তো?"—তুমি যে সে বকম শুধাও নি, "ফল পাব কবে?"

'ফল নির্ভব কবে তোমার কামনার দৃঢ়তার উপর। দিল্‌কে একরুজু করে যদি প্রাণপণে চাও, তবে দেখবে নতীজা নজ্‌দিক্—ফল সামনে।'

ধর্মে ধর্মে তুলনা করার মত মনের অবস্থা আমার তখন নয়। তবু মনে পড়ে গেল, সংস্কৃত ব্যাকরণের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গুরুকে শুধিয়েছিলুম, 'অনায়াসে সংস্কৃত কাব্য পড়তে পারব কবে?' তিনি বলেছিলেন, 'তীব্র সংবেগানাম্ আসন্নঃ" অর্থাৎ "আবেগ তীব্র থাকলে ফল আসন্ন।"

তারপর বলেছিলেন, 'শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সর্বত্রই এটা প্রযোজ্য—পতঞ্জলি বলেছেন 'যোগসূত্রে', সাধনার ক্ষেত্রে।'

চার

আমার মন শান্ত হয় নি, অশান্তও থাকে নি। আমার মানস সরোবরের জল—জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

ওদিকে কাবুলের বরফ গলতে আরম্ভ করেছে। কাবুল উপত্যকার উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম গিরিপথে সঞ্চিত পর্বত প্রমাণ তুষারস্তূপও গলতে আরম্ভ করেছে। এবার জনগণের গমনাগমন আরম্ভ হবে। যে সব পণ্যবাহিনী এখানে আটকা পড়েছিল তারা হন্যে হয়ে উঠেছে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে বলে। কাবুল উপত্যকার বাইরে যারা আটকা পড়েছিল তারাও যে-করে হোকই শহরে ঢোকবার চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতিরও মরসুম গরম হয়ে উঠবে। বাচ্চার বাহুবল কাবুল উপত্যকার বাইবে সম্প্রসারিত নয়। কাজেই দু'দলে লড়াই লাগবে মোক্ষম। তার কারণ দেশের ডাকাত আর বণিকে তফাত কম। যে দু'দিন পূর্বে বণিক ছিল সে কিছুটা পয়সা জমিয়ে ডাকাতের দল গড়েছে। আবাব যে দু'দিন পূর্বে ডাকাত ছিল সে কিছুটা পয়সা করে আজ পণ্যবাহিনী তৈরি করেছে এবং এর পরও অন্য এক শ্রেণীও আছে। এরা দুটো একসঙ্গে চালায়। পণ্যবাহিনী নিয়ে যেতে যেতে সুযোগ পেলে ডাকাতিও করে।

কিন্তু এ সবেতে আমার কী?

আমার স্বার্থ মাত্র এইটুকুই—কাবুল উপত্যকা তো তন্ন তন্ন করে দেখা হয়ে গিয়েছে। এবার যদি বাইরের থেকে কোনও খবর আসে।

আব্দুর রহ্‌মান এখনও কান্দাহার থেকে ফেরে নি। তার থেকেই আমার বোঝা উচিত। এখনও গমনাগমন অসম্ভব।

জানেমনের সেবা করতে গিয়ে বার বার হার মানি।

তিনি ডান হাত বাড়িয়ে বাঁ দিকে কি যেন খুঁজছেন। আমি শুধালুম, 'জানেমা (*আমাদের*

জান্), কী চাই?'

'না বাচ্চা, কিছু না।'

পীড়াপীড়ি করি। নিমকদান—লবণের পাত্র।

শব্‌নম জানত।

তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন; আমি প্রত্যুত্তর দিতে পারি নে।

প্রতি পদে ধরা পড়ে সেবার কাজে আমার অনভ্যাস, অপটুত্ব। অথচ ঠিক সেই কারণেই আমি তাঁর কাছে পেলুম আরও বেশি আদর সোহাগ। শিশুর আধো-আধো কথা শুনে পিতামাতা যে রকম গদ্‌গদ্ হয়, আমার আধো-আধো সেবা তেমনি তাঁর হৃদয়ের দাক্ষিণ্যে যেন বান ডাকালে।

এক রকম লোক আছে যারা সর্বক্ষণ কথা বলে যাওয়ার পব দেখা যায়, তারা কিছুই বলে নি। অন্য দল সংখ্যায় কম। এদের নীববতা যেন বাঙ্ময়। এঁরা সেই নীরবতা দিয়ে এমন একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করেন যে, শুভ মুহূর্তে সেই ঘন বাষ্পে তাঁরা একটি ফোঁটা বাক্-বারির ছোঁয়াচ দেওয়া মাত্রই আকাশ-বাতাস মুখর করে ঝরঝর ধারে বারিধারা নেমে আসে।

এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে আমি তাঁকে শুধালুম, 'আপনি আমার শ্বশুর মশাইকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। আমাকে বলুন তো, তিনি কান্দাহার যাওয়ার সময় বাড়িতে কেন হুকুম রেখে গেলেন, ডাকাতদের যেন কোনও বাধা না দেওয়া হয়?'

জানেমন্ বললেন, 'আওরঙ্গজেব সাধারণ সেনাপতি নয়। প্রকৃত সেনাপতি যে রকম যুদ্ধ জয় করতে জানে, ঠিক সেই রকম জানে কখন আর জয়াশা করতে নেই। সেই সময় সে যতদূর সম্ভব স্বল্প ক্ষয়ক্ষতি হতে দিয়ে সৈন্যবাহিনী রণাঙ্গন থেকে হটিয়ে আনে।

'আওরঙ্গজেব জানত, বাধা দিলে এ বাড়ির কেউই প্রাণে বাঁচবে না। ওদিকে শব্‌নমের উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। এ সব ব্যাপারে সে যে-কোনও পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়।

'একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, শব্‌নম যদি অল্প কিছুক্ষণ জাফর খানকে আটকে রাখতে পারত তা হলেই তো ততক্ষণে বাচ্চার হুকুম পৌঁছে যেত যে তাকে যেন নিরাপদে আপন বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয।

'সুফীদের অনেকেই তাই পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তায় বিশ্বাস করেন। সৎকর্ম, অসৎকর্ম, প্রয়োজনীয় কর্ম, অপ্রয়োজনীয় কর্ম যাই কর না কেন, তার ফলস্বরূপ উৎপাদিত হবে নূতন কর্ম—এবং ক্রমাগত বাড়তে থাকে সেই কর্ম-জিঞ্জির—চেন্-অ্যাকশন। এই কিস্মতের অক্ষমালার কোনও জায়গায় তো গিঁট খুলতে হবে। না হলে এই অন্তহীন জপমালা তো ঘুরেই যাবে, ঘুরেই যাবে; এর তো শেষ নেই।

'অথচ এ-কথা আমি স্থির নিশ্চয় জানি, শব্‌নম ঠাণ্ডা-মাথা মেয়ে। ক্ষণিক উত্তেজনায় সংবিৎ হারিয়ে উন্মাদ আচরণ সে করে না। নিশ্চয়ই কোন কিছু একটা চরমে পৌঁছেছিল?'

আমি চিন্তা করে প্রত্যেকটি বাক্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি এমন সময় দাসীরা কলরব করে ঘরে ঢুকে বললে, একজন বোরকা-পরিহিতা রমণীকে হিন্দুকুশের গিরি উপত্যকায় দেখা গিয়েছে মজার-ই-শরীফের পথে যেতে।

চিৎকার চেঁচামেচির মাঝখানে এইটুকু বুঝতে আমাদের অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল।

জানেমন্ নীরব।

আমি তাড়াতাড়ি মনসূরকে চিঠি লিখলুম সে যেন পত্রপাঠ ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে আসে। অন্য লোক পাঠালুম সরাইখানাতে।

কিন্তু শব্‌নম আফগানিস্থানের উত্তরতম প্রদেশ সুদূরতম তীর্থ মজার-ই-শরীফের দিকে যাচ্ছে কেন? প্রাণ রক্ষার্থে? সে কি জানে না জাফর খানের খুনের জন্য বাচ্চা তার খুন চায় না?

ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর মনসুর এল। সহৃদয় সরাইওয়ালাও স্বয়ং এসে উপস্থিত। ইউসুফ আসে নি। খবর পাঠিয়েছে, বহু বোরকাপরা রমণী বহু তীর্থে একা একা যায়। এ রমণী কিছুতেই শব্‌নম বানু হতে পারেন না। আরও বলেছে, এ রকম গুজব এখন ঘড়ি ঘড়ি বাজারে রটবে—আমি যেন ও সবেতে কান না দিই।

মনসুর বললে, 'ইউসুফ তো আসবে না, পাকা খবর না নিয়ে। আমি এই গুজবটা শুনতে পাই কাল। সঙ্গে সঙ্গে গেলুম সরাইয়ে। তারা খবর পেয়েছে তার আগের দিন। তার পব গেলুম ইউসুফের কাছে। সে বললে, এসব পুরনো খবর। মিথ্যে—সে যাচাই করে দেখেছে। তারপর, হুজুর, আমাকে হিসেব করে দেখালে, কাবুল গিরিপথের বরফ গলতে যে সময় লাগে তার আগে সেটা ছাড়িয়ে কেউ হিন্দুকুশ পৌঁছতে পারে না। ও মেয়ে হিন্দুকুশ অঞ্চল থেকেই বেরিয়েছে। আরও অনেক কি সব প্রমাণ দিলে যেগুলো আমি বুঝতেই পারলুম না।'

সকলেই এক মত। ও মেয়ে কিছুতেই কাবুল থেকে বেরোয় নি। ওর সন্ধান করতে যাওয়া আর চাঁদের আলোতে কাপড় শুকোতে দেওয়া—একই কথা।

আমি সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকারের যুক্তিহীন তর্ক, এবং তর্কহীন নীরবতা দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব তা সম্ভব হতে পারে বোঝাবার চেষ্টা করলে সবাই এমন সব অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট আপত্তি তুললে যে শেষটায় আমি রেগে উঠলুম। তখন সবাই একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চুপ করে গেল।

আমি আমার আহাম্মুকি বুঝতে পারলুম। এদের না চটিয়ে এদেব কাছ থেকে আমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল, মজার-ই-শবীফ যাবার জন্য আমার কী প্রস্তুতির প্রয়োজন? এখন যখন শুধালুম, সবাই আশকথা পাশকথা বলতে বলতে বাড়ি চলে গেল।

কান্দাহার থেকে শব্‌নমের কোনও খবর না পেয়ে শেষটায় স্বপ্নে প্রত্যাদেশ ভিক্ষে করেছিলুম, কান্দাহার যাব কি না, আজ রাত্রে ঠিক তেমনি সমস্ত হৃদয় মন ঢেলে দিয়ে নামাজ পড়লুম মাঝ রাত অবধি। বার বার কাতর রোদনে প্রভুকে বললুম, 'হে করুণাময়, আমাকে দয়া কর, আমাকে দয়া কর।'

সেবারে প্রার্থনান্তে যেন তাঁরই কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলুম, 'কান্দাহার যেয়ো না'—আমার তখন সেটা মনঃপূত হয় নি।

তাই কি করীম-করুণাময় আমাকে শিক্ষা দিতে চাইছিলেন তাঁর কাহির রুদ্ররূপে?

সমস্ত রাত চোখে এক ফোঁটা নিদ্রা এল না।

সমস্ত দিন কাটল ওই ভাবে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে। ঘুমে প্রত্যাদেশ পাব আশা করে শুতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব নিদ্রার অন্তর্ধান। তিনদিন পর যখন নির্জীব, ক্লান্ত দেহে প্রত্যাদেশের শেষ আশা ছেড়ে দিলুম সেদিন সুনিদ্রা হল। আশা ছাড়লে দেখি ভগবান সমঝে চলেন।

শব্‌নম যে রকম পুব-বাঙলার স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসত—যখন-তখন পেশাওয়ার গিয়ে দিল্লি কলকাতা হয়ে পুব-বাঙলায় পৌঁছত, আমিও সে-রকম মজার-ই-শরীফের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতুম। প্রথম দিন সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি সত্যই জান না, হজরৎ আলী (*কর্রমল্লাহ ওয়াজহাহু—আল্লা তাঁর বদন জ্যোতির্ময় করুন*) মারা যান আরবভূমিতে এবং তাঁর গোর সেখানেই। অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকের মত বিশ্বাস কর তাঁর কবর উত্তর আফগানিস্থানে।'

আমি বললুম, 'যেখানে এত লোক তাদের শ্রদ্ধা জানায়, সেখানে না হয় আমি সেই শ্রদ্ধাটিকেই শ্রদ্ধা জানালুম।'

অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, 'তা হলে কাবুলী মুটেমজুর যখন নূতন কোনও সোনা-বানানেওলা গুরুঠাকুর মুর্শীদবাবাজীর সন্ধান পেয়ে তার পায়ের উপর গিয়ে আছাড় খায় তখন তুমিও সেদিকে ছুট লাগাও না কেন? যত সব!'

আমি বললুম, 'মজার-ই-শরীফে কিন্তু ইরান-তুরান-হিন্দুস্থান-আফগানিস্থানের বিস্তর কবি জমায়েৎ হয়ে কবর-চত্বরে সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেন—মুশাইরা সেখানে সুবো-শাম্‌।'

সঙ্গে সঙ্গে শব্‌নমের মুখ খুশিতে ভরে উঠল; 'তাই নাকি? এতক্ষণ বল নি কেন? চল।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল। যেন তদ্দণ্ডেই আমাদের যাত্রারম্ভ!

শব্‌নমের কাছে কল্পনা বাস্তবে কোন তফাত ছিল না। না হলে সে আমাকে ভালোবাসল কি করে?

আসলে আমার লোভ হত, হিউয়েন সাঙ তথাগতের দেশ ভারতবর্ষে যাবার সময় যে পথ বেয়ে মজার-ই-শরীফের কাছের বাহ্‌লীক নগরী—আজকের দিনে বল্‌খ্‌—থেমে বামিয়ানের কাছে হিন্দুকুশ পেরিয়ে কপিশ—আজকের দিনে কাবুল শহর—এসে পৌঁছেছিলেন সেই পথটি দেখার। তখনকার দিনে তুষারভূমি (*আজকের তুখার-স্থান*) পেরিয়ে যখন বৌদ্ধ শ্রমণ বাহ্‌লীকে পৌঁছলেন তখনই তাঁর চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল, তিনি তাঁর অসহ পথশ্রম সার্থক মেনে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন একশত সঙ্ঘারাম, তিন শত স্থবির আর কত হাজার শ্রমণ-ভিক্ষু কে জানে? এরই কাছে কোথায় যেন এক ভারতীয় মহাস্থবির প্রজ্ঞাকরের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন অভিধর্ম। আর বামিয়ানে পৌঁছে দেখেছিলেন, তারও বাড়া—হাজার হাজার—সঙ্ঘারাম—পর্বতগুহায়, সমতল ভূমিতে, উপত্যকায়। আর দেখেছিলেন পাহাড়ের গায়ে দণ্ডায়মান, আসীন, শায়িত শত শত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বুদ্ধ-মূর্তি। শ' দুশ' ফিট উঁচু!

তারপর তিনি পঞ্জশীর হয়ে পৌঁছেছিলেন কাবুল উপত্যকায়।

যবে থেকে এখানে এসেছি সেগুলোর সন্ধান করেছি এখানে। এখানে কীর্তিনাশা পদ্মা নদী নেই, এখানে কোনও কিছুই সম্পূর্ণ লোপ পায় না। নবীন যুগের অবহেলা পেলে এখানে প্রাচীন যুগ মাটির তলায় আশ্রয় নিয়ে প্রতীক্ষা করে, কবে নবীনতর যুগের লোক শাবল-কোদাল নিয়ে তাদের সন্ধানে বেরবে।

তারও আগের কথা। আমি বাঙলাদেশের লোক। হিউয়েন সাঙের ভারততীর্থ-পরিক্রমার সর্বশেষ প্রাচ্য-প্রান্ত ছিল বাংলা। বগুড়ার কাছে মহাস্থানগড় প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন বল্‌খ্‌ থেকে হিউয়েন সাঙ—আর কয়েক শতাব্দী পরে সেখানেই আসেন ওই বল্‌খ্‌ থেকে দরবেশ শাহ সুলতান বল্‌খী—কত কাছাকাছি ছিল সেদিনের বল্‌খ্‌ আর বগুড়া।

সেই খেই ধরে ধরে দেখেছি, বিক্রমশিলা, নালন্দা। কাবুলে আসার পথে ট্রেন থেমেছিল এক মিনিটের তরে তক্ষশিলায়। সেখানে নামবার লোভ হয় নি একথা বলব না। তারপর পেশাওয়ার—কণিষ্কের রাজধানী। সেখানেও সময় পাই নি। গান্ধারভূমি জলালাবাদে শুধু আখ খেয়েই চিত্তকে সান্ত্বনা দিয়েছি যে, এই আখ খেয়েই হিউয়েন সাঙ শতমুখে প্রশংসা করেছিলেন। ভেবেছিলুম পরবর্তী যুগে এই যে আখের গুড় চীনদেশে গিয়ে রিফাইন্‌ড হয়ে শ্বেতবর্ণ ধরে যখন ফিরে এল তখন চীনের স্মরণে এর নাম হল চিনি—তার পিছনে কি হিউয়েন সাঙ ছিলেন? একে উপহাস করেই কি আমাদের দেশে চীনের রাজার আম খাওয়ার গল্প হল?

আজ আবার এই সব কথা মনে পড়ছে। শব্‌নম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করত—পুব বাঙলায় তার শ্বশুরের ভিটেয় পৌঁছবার পথে এগুলো পড়ে বলে।

কিন্তু যখন কাবুল ছেড়ে আচ্ছন্নের মত বেরুলুম মজার-ই-শরীফের সন্ধানে তখন এসব কিছুই মনে পড়ে নি। কী কাজে লাগবে আমার এই 'পাণ্ডিত্যে'র মধুভাণ্ড। জরা-জীর্ণ অর্ধলুপ্ত বাড়ির নিচে লুকনো যে সোনার তাল আছে সেটা কি তার সামান্যতম উপকারে আসে? ওর শতাংশ ব্যয় করে বাড়িটা মেরামত হয়, কলি ফেরানো যায়, সে তার সুপ্ত যৌবন ফিরে পায়। শব্‌নমই বলেছিল,

'এত গুণ ধরি কী হইবে বল দুরবস্থায় মাঝে,
পোড়ো বাড়িটাতে লুকনো যে ধন লাগে তার কোনো কাজে?'

কবিতা আমার মুখস্থ থাকে না। শুধু শব্‌নমের উৎসাহের আতিশয্যে আমার নিষ্কর্মা স্মৃতিশক্তিও যেন ক্ষণেকের তরে জেগে উঠত। উর্দুতে বলেছিলুম,

দুর্দিনে, বল, কোথা সে সুজন হেথা তব সাথী হয়
আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হেরো, হয় লয়!

তঙ্গ-দস্তীমে কৌন কিস্‌কা সাত দেতা হৈ?
কি তাবিকীমেঁ সায়াভী জুদা হোতা হৈ ইনসাঁসে!

আমার নিজের সামান্য জ্ঞান, কাবুলে ফরাসী রাজদূতাবাসের প্রত্নতাত্ত্বিক যিনি জলালাবাদ গান্ধার এবং বামিয়ানে খোঁড়াখুঁড়ি করে শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনিন্দ্যসুন্দর বুদ্ধমূর্তি বের করেছিলেন— তাঁর দিনে দিনে দেওয়া অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান, আমার কোনও কাজেই লাগল না।

কাজে লাগল সে এক সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

কাবুল ছেড়ে আসার পর, হিন্দুকুশের চড়াই তখনও আরম্ভ হয় নি, এমন সময়—বেশ কিছুক্ষণ ধরে—ক্ষণে ক্ষণে আমার সেই আচ্ছন্ন অবস্থার ভিতরও আমার মনে হতে লাগল, এ জায়গায় আমি যেন পূর্বেও একবার, কিংবা একাধিকবার এসেছি। এ রকম অভিজ্ঞতা নাকি সকলের জীবনেই হয়— কেমন যেন স্বপ্নে না জাগরণে দেখা, আধচেনা-আধভোলা একটা জায়গা বা পরিবেষ্টনী এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হয় যে মানুষ পথে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আর ভাবে, সামনের মোড় নেওয়া মাত্রই একেবারে সম্পূর্ণ এক চেনা জায়গায় এসে পৌঁছবে।

তাই আমি বিশেষ কোনও খেয়াল করি নি।

হঠাৎ মোড় নিতেই দেখি, হাতে ঝুলনো ট্রাউট মাছ নিয়ে একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—এ জায়গা আব্দুর রহ্‌মানের পঞ্জশীর।

সামনেই বাজার। ঢুকেই বাঁয়ে দর্জীর দোকান, ডাইনে ফলওলা—তারপর মুদী—সর্বশেষে চায়ের দোকান। নিদেন একশ'বার দেখেছি। দোকানীর মেহ্‌দি-মাখানো দাড়ি, কালো-সাদায় ডোরাকাটা পাগড়ি আব্দুর রহ্‌মানের চোখ দিয়ে আমার বহুকালের চেনা আরেকটু হলেই তাকে অভিবাদন করে ফেলতুম। তার দৃষ্টিতে অপরিচিতের দিকে তাকানোর অলস কৌতূহলের স্পষ্টাভাস আমাকে ঠেকালে। এই চায়ের দোকানই আব্দুর রহ্‌মানের ফার্পো, পেলিটি।

আব্দুর রহ্‌মান নিরক্ষর। ফার্সী সাহিত্যে তার কোনও সঙ্গতি নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস অজানা পরিবেশ যদি সুদ্ধমাত্র কয়েকটি অতি সাধারণ আটপৌরে শব্দের ব্যবহারে চোখের সামনে তুলে ধরাটা আর্টের সর্বপ্রধান আদর্শ হয়—বহু আলঙ্কারিক তাই বলেন—তবে আব্দুর রহ্‌মান অনায়াসে লোতি দোদে মম্‌কে দোস্ত বলে ডাকবার হক্ক ধরে। এ বাজারের প্রত্যেকটি দোকান আমার চেনা—আর এখানে দাঁড়ানো নয়, আব্দুর রহ্‌মান সাবধান করে দিয়েছিল—ওই যে-কাঁচা-পাকা দাড়িওলা লোকটা তামাক খাচ্ছে সে বিদেশীকে পেলেই ভ্যাচর ভ্যাচর করে তার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে।

চায়ের দোকান পেরোতেই বাঁ দিকে যে রাস্তা তারই শেষ বাড়ি আব্দুর রহ্‌মানদের। বাড়িতে সে নেই—কান্দাহারে। তার বাপকে আমি জানি। ধরা পড়ার ভয় আছে।

সামনে খাড়া হিন্দুকুশ। আব্দুর রহ্‌মানদের মনে মনে সেলাম জানিয়ে একটু পা চালিয়ে তার দিকে এগোলুম।

হিন্দুকুশে এখনও বরফ তার সর্ব দার্ঢ্য নিয়ে বর্তমান। আসলে তার শরীর সাবুদানার চেয়েও সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরি আর হিমকণারই মত নরম। কিন্তু বসন্ত সূর্যও একে গলাতে পারে নি। শক্তকে ভাঙা যায়, নরমকে ভাঙা শক্ত।

ঝড়-তুফানে দিশাহারা হয়ে আসন্ন মৃত্যু সম্মুখে দেখেছি, তখন জানতুম না যে এখানে পথ মাত্র একটিই, নিরুদ্দেশ হবার উপায় নেই। বামিয়ানেও পৌঁছলুম। বিরাট বুদ্ধমূর্তি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বলেই চিনলুম, এ জায়গা বামিয়ান—না হলে কোনও জায়গার নাম আদি কাউকেও জিজ্ঞেস করি নি। মাঝে মাঝে শুধু জানতে চেয়েছি, কেউ বোরকা-পরা একটি মেয়েকে একা একা মজারের পথে যেতে দেখেছে কি না? 'হাঁ', 'না', 'কাবুলের দিকে গিয়েছে', 'না, মজারের দিকে গিয়েছে' 'কোন্ এক সরাইয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে'—সব ধরনের উত্তরই শুনেছি। দরদী জন আমাকে কাবুলে ফিরে যেতে বলেছে।

দেখি নি, দেখি নি, কিছুই দেখি নি। কয়েদীকে যখন পাঁচশো মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কি সে কিছু দেখে? সাইবেরিয়া নির্বাসনে গিয়েছেন সেরা সেরা সাহিত্যিক—তাঁরা কিছুই দেখেন নি। না হলে শোনাতেন না?

হায় রে হিউয়েন সাঙ। স্মৃতির কপালে শুধু করাঘাত।

হিউয়েন সাঙ এ পথে যেতে ঝড়-ঝঞ্ঝার মৃত্যুযন্ত্রণায় একাধিকবার তাঁর জীবন কাতর রোদনে তথাগতের চরণে নিবেদন করেছিলেন। আমি করি নি। তার কারণ এ নয় যে আমি ভিক্ষুশ্রেষ্ঠের চেয়েও অধিক বীতরাগ—দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন সুখে বিগতস্পৃহ—হয়ে গিয়েছিলুম। আমি হয়ে গিয়েছিলুম জড়, অবশ। ক্লোরোফর্মে বিগতচেতন রুগীর যখন পা কাটা যায় সে যে তখন চিৎকার করে না তার কারণ এ নয় যে, সে তখন কায়া-ক্লেশমুক্ত স্থিতধী মুনিপ্রবর। চিন্তামণির অন্বেষণে বিল্বমঙ্গল যা সব করেছিল সে সজ্ঞানে নয়—সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়। কী সুন্দর নাম চিন্তামণি! এ নাম বাঙালী মেয়ে অবহেলা করে কেন? অহল্যার মত 'অসতী' ছিল বলে? হায়! আজ যদি ওঁর শুদ্ধজ্ঞানের এক কণা আমি পেয়ে যেতুম!

ক্রমে আমার সময়ের জ্ঞান লোপ পেল। কবে বেরিয়েছি কবে মজার পৌঁছব কোনও বোধই আর রইল না।

সরাইয়ের এক কোণে ঠেসান দিয়ে বসে আছি। যে কাফেলার সঙ্গে আজ ভোরে যোগ দিয়েছিলুম তারা কুঠুরির মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে মৃদুস্বরে কথা বলছে। এদের বেশির ভাগই আমুদরিয়া পারের উজবেগ। বাঙলা ভাষায় এদের বলে 'উজবুক'। এরা যে কি সরল বিশ্বাসে ট্যারচা চোখ মেলে তাকাতে জানে। সে না দেখলে তুলনা শুনে বোঝা যায় না। এদের ভাষা আমার অজানা। কিন্তু এরা আমাকে ভালবেসেছে। আজ সকালে একরকম জোর করেই আমাকে একটা খচ্চরের উপর বসিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ কানে গেল কে যেন বললে, 'জশ্‌ন্।'

সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পেলুম, স্বপ্নমায়া—মতিভ্রম কিছুই নয়, পরিষ্কার দেখতে পেলুম, জশ্‌ন্ পরবের রাত্রে ডান্‌স্ হলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে শব্‌নম। সে রাত্রে তার ছিল ভ্রূকুটিকুটিল ভাল, আজ দেখি সে ভ্রূবিলাসী, তার মুখে আনন্দ হাসি।

তার পরই জ্ঞান হারাই।

কিন্তু যখন কাবুল ছেড়ে আচ্ছন্নের মত বেরুলুম মজার-ই-শরীফের সন্ধানে তখন এসব কিছুই মনে পড়ে নি। কী কাজে লাগবে আমার এই 'পাণ্ডিত্যে'র মধুভাণ্ড। জরা-জীর্ণ অর্ধলুপ্ত বাড়ির নিচে লুকনো যে সোনার তাল আছে সেটা কি তার সামান্যতম উপকারে আসে? ওর শতাংশ ব্যয় করে বাড়িটা মেরামত হয়, কলি ফেরানো যায়, সে তার সুপ্ত যৌবন ফিরে পায়। শব্‌নমই বলেছিল,

'এত গুণ ধরি কী হইবে বল দুরবস্থায় মাঝে,
পোড়ো বাড়িটাতে লুকনো যে ধন লাগে তার কোনো কাজে?'

কবিতা আমার মুখস্থ থাকে না। শুধু শব্‌নমের উৎসাহের আতিশয্যে আমার নিষ্কর্মা স্মৃতিশক্তিও যেন ক্ষণেকের তরে জেগে উঠত। উর্দুতে বলেছিলুম,

দুর্দিনে, বল, কোথা সে সুজন হেথা তব সাথী হয়
আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হেরো, হয় লয়!

তঙ্গ-দস্তীমে কৌন কিস্‌কা সাত দেতা হৈ?
কি তাবিকীমেঁ সায়াভী জুদা হোতা হৈ ইনসাঁসে!

আমার নিজের সামান্য জ্ঞান, কাবুলে ফরাসী রাজদূতাবাসের প্রত্নতাত্ত্বিক যিনি জলালাবাদ গান্ধার এবং বামিয়ানে খোঁড়াখুঁড়ি করে শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনিন্দ্যসুন্দর বুদ্ধমূর্তি বের করেছিলেন—তাঁর দিনে দিনে দেওয়া অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান, আমার কোনও কাজেই লাগল না।

কাজে লাগল সে এক সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

কাবুল ছেড়ে আসার পর, হিন্দুকুশের চড়াই তখনও আরম্ভ হয় নি, এমন সময়—বেশ কিছুক্ষণ ধরে—ক্ষণে ক্ষণে আমার সেই আচ্ছন্ন অবস্থার ভিতরও আমার মনে হতে লাগল, এ জায়গায় আমি যেন পূর্বেও একবার, কিংবা একাধিকবার এসেছি। এ রকম অভিজ্ঞতা নাকি সকলের জীবনেই হয়—কেমন যেন স্বপ্নে না জাগরণে দেখা, আধচেনা-আধভোলা একটা জায়গা বা পরিবেষ্টনী এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হয় যে মানুষ পথে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আর ভাবে, সামনের মোড় নেওয়া মাত্রই একেবারে সম্পূর্ণ এক চেনা জায়গায় এসে পৌঁছবে।

তাই আমি বিশেষ কোনও খেয়াল করি নি।

হঠাৎ মোড় নিতেই দেখি, হাতে ঝুলনো ট্রাউট মাছ নিয়ে একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—এ জায়গা আব্দুর রহ্‌মানের পঞ্জশীর।

সামনেই বাজার। ঢুকেই বাঁয়ে দর্জীর দোকান, ডাইনে ফলওলা—তারপর মুদী—সর্বশেষে চায়ের দোকান। নিদেন একশ'বার দেখেছি। দোকানীর মেহদি-মাখানো দাড়ি, কালো-সাদায় ডোরাকাটা পাগড়ি আব্দুর রহ্‌মানের চোখ দিয়ে আমার বহুকালের চেনা আরেকটু হলেই তাকে অভিবাদন করে ফেলতুম। তার দৃষ্টিতে অপরিচিতের দিকে তাকানোর অলস কৌতূহলের স্পষ্টাভাস আমাকে ঠেকালে। এই চায়ের দোকানই আব্দুর রহ্‌মানের ফার্পো, পেলিটি।

আব্দুর রহ্‌মান নিরক্ষর। ফার্সী সাহিত্যে তার কোনও সঙ্গতি নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস অজানা পরিবেশ যদি সুদ্ধমাত্র কয়েকটি অতি সাধারণ আটপৌরে শব্দের ব্যবহারে চোখের সামনে তুলে ধরাটা আর্টের সর্বপ্রধান আদর্শ হয়—বহু আলঙ্কারিক তাই বলেন—তবে আব্দুর রহ্‌মান অনায়াসে লোতি দোদে মম্‌কে দোস্ত বলে ডাকবার হক্ক ধরে। এ বাজারের প্রত্যেকটি দোকান আমার চেনা—আর এখানে দাঁড়ানো নয়, আব্দুর রহ্‌মান সাবধান করে দিয়েছিল—ওই যে-কাঁচা-পাকা দাড়িওলা লোকটা তামাক খাচ্ছে সে বিদেশীকে পেলেই ভ্যাচর ভ্যাচর করে তার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে।

চাযেব দোকান পেবোতেই বাঁ দিকে যে বাস্তা তাবই শেষ বাড়ি আব্দুব বহ্‌মানদেব। বাড়িতে সে নেই—কান্দাহাবে। তাব বাপকে আমি জানি। ধবা পড়াব ভয আছে।

সামনে খাড়া হিন্দুকুশ। আব্দুব বহ্‌মানদেব মনে মনে সেলাম জানিযে একটু পা চালিযে তাব দিকে এগোলুম।

হিন্দুকুশে এখনও বরফ তাব সর্ব দার্ঢ্য নিযে বর্তমান। আসলে তাব শবীব সাবুদানাব চেযেও সূক্ষ্ম কণা দিযে তৈবি আব হিমকণাবই মত নবম। কিন্তু বসন্ত সূর্যও একে গলাতে পাবে নি। শক্তকে ভাঙা যায, নবমকে ভাঙা শক্ত।

ঝড-তুফানে দিশাহাবা হযে আসন্ন মৃত্যু সম্মুখে দেখেছি, তখন জানতুম না যে এখানে পথ মাত্র একটিই, নিরুদ্দেশ হবাব উপায নেই। বামিযানেও পৌঁছলুম। বিবাট বুদ্ধমূর্তি চোখেব সামনে দাঁড়িযে ছিল বলেই চিনলুম, এ জাযগা বামিযান—না হলে কোনও জাযগাব নাম আদি কাউকেও জিজ্ঞেস কবি নি। মাঝে মাঝে শুধু জানতে চেযেছি, কেউ বোবকা-পবা একটি মেযেকে একা একা মজাবেব পথে যেতে দেখেছে কি না? 'হ্যাঁ', 'না', 'কাবুলেব দিকে গিযেছে', 'না, মজাবেব দিকে গিযেছে' 'কোন্ এক সবাইযে অসুস্থ হযে পড়ে আছে'—সব ধবনেব উত্তবই শুনেছি। দবদী জন আমাকে কাবুলে ফিবে যেতে বলেছে।

দেখি নি, দেখি নি, কিছুই দেখি নি। কযেদীকে যখন পাঁচশো মাইল হাঁটিযে নিযে যাওযা হয তখন কি সে কিছু দেখে? সাইবেবিযা নির্বাসনে গিযেছেন সেবা সেবা সাহিত্যিক—তাঁবা কিছুই দেখেন নি। না হলে শোনাতেন না?

হায বে হিউযেন সাঙ। স্মৃতিব কপালে শুধু কবাঘাত।

হিউযেন সাঙ এ পথে যেতে ঝড-ঝঞ্ঝাব মৃত্যুযন্ত্রণায একাধিকবাব তাঁব জীবন কাতব বোদনে তথাগতেব চবণে নিবেদন কবেছিলেন। আমি কবি নি। তাব কাবণ এ নয যে আমি ভিক্ষুশ্রেষ্ঠেব চেযেও অধিক বীতবাগ–দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন সুখে বিগতস্পৃহ–হযে গিযেছিলুম। আমি হযে গিযেছিলুম জড, অবশ। ক্লোবোফর্মে বিগতচেতন রুগীব যখন পা কাটা যায সে যে তখন চিৎকাব কবে না তাব কাবণ এ নয যে, সে তখন কাযা-ক্লেশমুক্ত স্থিতধী মুনিপ্রবব। চিন্তামণিব অন্বেষণে বিল্বমঙ্গল যা সব কবেছিল সে সজ্ঞানে নয—সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায। কী সুন্দব নাম চিন্তামণি। এ নাম বাঙালী মেযে অবহেলা কবে কেন? অহল্যাব মত 'অসতী' ছিল বলে? হায! আজ যদি ওঁব শুদ্ধজ্ঞানেব এক কণা আমি পেযে যেতুম।

ক্রমে আমাব সমযেব জ্ঞান লোপ পেল। কবে বেবিযেছি কবে মজাব পৌঁছব কোনও বোধই আব বইল না।

সবাইযেব এক কোণে ঠেসান দিযে বসে আছি। যে কাফেলাব সঙ্গে আজ ভোবে যোগ দিযেছিলুম তাবা কুঠুবিব মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিযে মৃদুস্ববে কথা বলছে। এদেব বেশিব ভাগই আমুদবিযা পাবেব উজবেগ। বাঙলা ভাষায এদেব বলে 'উজবুক'। এবা যে কি সবল বিশ্বাসে ট্যাবচা চোখ মেলে তাকাতে জানে। সে না দেখলে তুলনা শুনে বোঝা যায না। এদেব ভাষা আমাব অজানা। কিন্তু এবা আমাকে ভালবেসেছে। আজ সকালে একবকম জোব কবেই আমাকে একটা খচ্চবেব উপব বসিযে দিযেছিল।

হঠাৎ কানে গেল কে যেন বললে, 'জশ্‌ন্।'

সঙ্গে সঙ্গে পবিষ্কাব চোখেব সামনে দেখতে পেলুম, স্বপ্নমাযা—মতিভ্রম কিছুই নয, পবিষ্কাব দেখতে পেলুম, জশ্‌ন্ পববেব বাত্রে ডান্‌স্ হলেব সিঁড়ি দিযে নেমে আসছে শব্‌নম। সে বাত্রে তাব ছিল ভ্রূকুটিকুটিল ভাল, আজ দেখি সে ভ্রূবিলাসী, তাব মুখে আনন্দ হাসি।

তাব পবই জ্ঞান হাবাই।

পাঁচ

চোখে মেলে দেখি, শব্‌নমের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। শুচিস্মিতা শব্‌নম প্রসন্নবয়ানে আমার দিকে তাকিয়ে।

হায়, এই সত্য হল না কেন? আস্তে আস্তে তার চেহারা মিলিয়ে গেল কেন?

এই 'বিকারে' কত দিন কেটেছিল জানি না। শব্‌নমকে কাছে পাওয়া, তার মুখে সান্ত্বনার বাণী শোনা যদি 'বিকার' হয় তবে আমি 'সুস্থ' হতে চাই নে। আমি সুস্থ হলুম কেন?

মজার-ই-শরীফে হজরৎ আলির কবর-চত্বরের এক প্রান্তে চুপচাপ বসে থাকি গভীর রাত্রি পর্যন্ত।

কাবুলের সূফী সাহেব আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পেয়ে সেখানকার সরাইখানাতে আমার সন্ধান নিয়ে কিছুদিনের ভিতরই জানতে পারলেন, আমাকে মজারের পথে দেখা গিয়েছে। আমার কাবুল ফেরার মেয়াদ যখন ফুরিয়ে গেল তখন তিনি বেরলেন আমার সন্ধানে। আমাকে যখন পেলেন তখন আমি মজারের কাছেই। উজবেকদের সাহায্যে আমাকে অচৈতন্যাবস্থায় এখানে নিয়ে আসেন।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। মধ্যগগনে দশমীর চন্দ্র। হাওয়া আসছে উত্তর-পুব—আমুদরিয়া আর বল্‌খ্ থেকে। মসজিদচত্বরে পুণ্যার্থীরা এবার সমবেত উপাসনা শেষ করে এখানে ওখানে নৈমিত্তিক *(নফ্‌ল্)* আরাধনা করছে। সূফীরা স্থাণুর মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে, কিংবা মুদ্রিত নয়নে আপন গভীরে নিবিষ্ট। রাত গভীর হলে মজারের ছায়ায় কেউ বা মধুর কণ্ঠে জিক্‌র্ গেয়ে ওঠে।

এসব রোজ দেখি, আবার রোজই ভুলে যাই। আমার স্মৃতিশক্তি কিছুই ধারণ করতে পারে না। প্রতিদিন মনে হয়, জীবনে এই প্রথম আঁখি মেলে এসব দেখছি। কোনদিন বা সরাই থেকে এখানে আসবার সময় পথ খুঁজে পাই না। শহরের লোক আমাকে চিনে গিয়েছে। কেউ-না-কেউ পথ দেখিয়ে রওজাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়।

আমি মজনূন, আমি পাগল—এ কথা আমি সরাইয়ে, রাস্তায় ফিসফিস কথাতে একাধিকবার শুনেছি। এ দেশে প্রিয়বিচ্ছেদে কাতর জনকে কেউ বিদ্রূপের চোখে দেখে না। শুনেছি, 'সভ্য' দেশের কেউ কেউ নাকি এদের এ দৃষ্টান্ত হালে অনুকরণ করতে শিখছেন। এদের চোখে দেখি, আমার জন্য নীরবে মঙ্গল কামনা। দরগায় বসে বসেও যে আমি নমাজ পড়ি নে তাই নিয়ে এরা মোটেই বিচলিত নয়। 'মজনূনের'র উপর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আর একদিন শুনেছিলুম বোবকা-পরা দুটি তরুণীর একজন আরেক জনকে বলছে, 'কী তোর প্রেম যে, তাই নিয়ে হর-হামেশা আপসা-আপসি করছিস! ওই দেখ্ প্রেম কী গরল! শব-ই-জুফ্‌ফাফের ফুল শুকোবার আগেই এর প্রিয়া শুকিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। হয়েছিস ওর মত তুই মজনূন—পাগল?'

আমি মাথা হেঁট করে এগিয়ে গিয়েছিলুম। প্রেম কি গরল? প্রেম তো অমৃত। আমার মত অপাত্রে পড়েছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে পাত্র চিড় খেল। আমার নামের মিতা আরবভূমির মজনূন তো পাগল হন নি। তিনি প্রেমের অমৃত খেয়ে পেয়েছিলেন দিব্য রূপ। সংসারের আর কেউ সেটি খায় নি বলে ওঁর সে রূপ চিনতে না পেরে তাঁকে বলেছিল পাগল। যে দু-একটি চিত্রকর বুঝতে পেরেছিল, তারা ছবিতে সেই দিব্যজ্যোতি দেখবার চেষ্টা করেছে।

'সেরে উঠছি।' যদি এটাকে 'সেরে ওঠা' বলে। এতদিন অবশ ছিলুম, এখন এখানে ওখানে বেদনা পাচ্ছি। শব্‌নম এখন আর আমার সম্মুখে যখন-তখন উপস্থিত হয় না। হলেও তার মুখে বিষণ্ণ হাসি। সূফী সাহেবকে সেটা জানাতে তিনি ভারি খুশি হলেন। তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী, তিনি অতিপ্রাকৃতে এরকম বিশ্বাস করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন, শোকে কাতর অপ্রকৃতিস্থ লোকের মনে শান্তি এনে তাকে সবল সুস্থ করতে পারা এ পৃথিবীর সব চেয়ে বড় অলৌকিক ঐশী শক্তি।

এ কথা আমিও মানি। কিন্তু এই যে শব্‌নম আমাকে এসে দেখা দিয়ে যায়, এটাকে তিনি এত সন্দেহের চোখে দেখেন কেন? স্বপ্নে মায়ায় শব্‌নমের এই যে দান এ তো সত্যকে অসম্মান করে না—সে তো তখন অবাস্তব, অসত্যের পরীর ডানা পরে এসে আকাশ-কুসুম দিয়ে আমার গলায় ইন্দ্রমাল্য পরায় না। কৈশোরে এক সঞ্চয়িতায় পড়েছিলুম, কে যেন এক চীনদেশীয় ভাবুক বলেছেন, 'স্বপ্নে দেখলুম, আমি প্রজাপতির শরীর নিয়ে ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন জেগে উঠে আমার ভাবনা লেগেছে, এই যে আমি মানুষরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা কি কোনও প্রজাপতির স্বপ্ন নয়?—সে স্বপ্নে দেখছে যে সে মানুষের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?' সর্বসত্তা নিয়ে যেখানে সন্দেহ সেখানে তাঁর বিদ্বেষ আমার স্বপ্নের প্রতি।

সূফী সাহেব বললেন, 'জানেমন্ খবর পাঠিয়ে জানিয়েছেন, আমি কাবুল না ফিরলে তিনি নিজে আমার সন্ধানে বেরবেন। তাঁর লোক উত্তরের জন্য বসে আছে।'

আমি তাঁর দিকে তাকালুম।

তিনি আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছেন। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'তার কোনও খবর নেই; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সে ভাল আছে।'

আমি বললুম, 'চলুন।'

আব্দুর রহ্‌মানের পিতাকে এবারে আর ফাঁকি দেওয়া যায় নি। খেতখামারের কাজ করে বাকী সময় সে নাকি বাজারের চায়ের দোকানে বসে আমার প্রতীক্ষা করত। তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হলেও সমস্ত বাজার আমাকে দেখামাত্রই যে রকম হুলুধ্বনি দিয়ে উঠেছিল তা থেকেই বুঝেছিলুম, বিখ্যাত বা কুখ্যাত হওয়া যায় নানা পদ্ধতিতে, এবং কোনও চেষ্টা না করেও।

তার উপর সূফী সাহেব বুড়োর মুরশীদ বা গুরু।

শুনলুম, আমানুল্লা কর্তৃক ফ্রান্সে নির্বাসিত তাঁর সিপাহ্‌সলার বা প্রধান সেনাপতি নাদির খান বাচ্চাকে তাড়াবার জন্য গজনী পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। রঙরুটের অপেক্ষা না করে কান্দাহারেই আব্দুর রহ্‌মান তাঁর সৈন্যদলে ঢুকেছে।

শব্‌নমের কাছে শুনেছিলুম, ফ্রান্সের নির্বাসনে আমার শ্বশুরমশাই আর নাদির খানে তাঁদের পূর্বপরিচয় গভীরতর হয়েছিল। বহু যুগের পারিবারিক দ্বন্দ্ব ছিল বলেই একদিন যখন হঠাৎ মৈত্রী স্থাপিত হল তখন সেটা গভীরতম বন্ধুত্বের রূপ নিল। ফ্রান্সে সব মেয়েরই একটি করে গড-ফাদার থাকে, শব্‌নমের ছিল না বলে দুঃখ করতে নাদির নিজে যেচে তার গড্-ফাদার হবার সম্মান লাভ করেছিলেন—শব্‌নম বলেছিল। তবু আমার শ্বশুর আমানউল্লার আফগানিস্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত নাদিরের অভিযানে যোগ দেন নি।

আমার ভয় হল, বাচ্চা যদি জানেমনের উপর দাদ নেয়!

কুহ্-ই-দামন, জবল্-উস্-সিরাজ অঞ্চল পেরবার সময় দেখি বাচ্চার সঙ্গী ডাকাতরা তাকে ডেজার্ট করে পালাচ্ছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। অত্যাচারী মাস্টারের নিপীড়নে যখন নিরীহ শিশু ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে তখন করুণা হয়, কিন্তু সেই স্যাডিস্ট মাস্টার যখন হেড-মাস্টারের হুড়ো খেয়ে কেঁচোটি হয়ে যান তখন ঘেন্না ধরে, হাসি পায়। নিরীহ বাছুরের দুশমন শুয়োরকে বাঘ তাড়া লাগালে যেমন মনটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। রাস্তার উপরে, এদিকে ওদিকে ছড়ানো তাদের পরিত্যক্ত লুটের মাল, দামী দামী রাইফেল। নাদির-বাঘ আসছে, ওগুলো কুড়োবার সাহস কারও নেই। শুনেছি কোনও শান্ত জনপদবাসী নাকি নিরপরাধ প্রশ্ন শুধিয়েছিল এক পলায়মান ডাকাতকে, সে কোন্ দিকে যাচ্ছে, আর অমনি নাকি ডাকাত বন্দুক ফেলে নিরস্ত্র পথচারীর পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। ঐতিহাসিক খাফী খান তাহলে বোধ হয় খুব বেশি বাড়িয়ে বলেন নি যে, আবদালী দিল্লি আসছে শুনে মারাঠা 'সৈন্যরা' নাকি 'আইমা' 'কাইমা'—অর্থাৎ মায়ের স্মরণে—চিৎকার করতে করতে যখন দিল্লি থেকে পালাচ্ছিল তখন নাকি শহরের রাড়ী-বুড়ীরাও ধমক দিয়ে ওদের নিরস্ত্র করে মালপত্র

এখন আমার সামনে তার কথা আর কেউ তোলে না—পাছে আমার লাগে, বোঝে না তাতে আমি ব্যথা পাই আরও বেশি—তাই আমাকেই তো তুলতে হবে তার কথা।

আমার হাত দুখানি তাঁর কোলে নিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, শব্‌নম আমাকে দুঃখ দেবে কেন? আর দুঃখ যদি পেতেই হয় তবে তার হাতেই যেন পাই। যে বন্দীখানায় সোক্রাৎকে (সোক্রাতেস) জহর খেতে হয়েছিল তার কর্তা ছিলেন তাঁরই এক শিষ্য এবং বিষপাত্র সোক্রাৎকে এগিয়ে দেওয়া ছিল তাঁরই কাজ। পাত্র আনবার পূর্বে তিনি কেঁদে বলেছিলেন, 'প্রভু, আমাকেই করতে হবে এই কাজ?' সোক্রাৎ পরম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "আহা! সেই তো আনন্দ। না হলে যে ব্যক্তি আমার মৃত্যু কামনা করে সে যখন জিঘাংসাভরে পৈশাচিক আনন্দে ক্রূর হাসি হেসে আমার দিকে বিষভাণ্ড এগিয়ে দেয় সেটা তো সত্যই পীড়াদায়ক।" এই বেদনার পেয়ালা ভরা আছে শব্‌নমের আঁখি বারিতে—'

আমার বুকে আবার ডাঙশ। সেখানে যেন বিদ্যুৎ-বিভাসে ধ্বন্যালোক হয়ে ফুটে উঠল শব্‌নম। তার দুঃখের মুহূর্তে আমাকে একদিন বলেছিল, 'কত আঁখিপল্লব নিংড়ে নিংড়ে বের করা আমার এই এক ফোঁটা আঁখিবারি।' হায় রে কিস্মৎ! দুঃখের দিনেই তুমি বদ্-কিস্মতের স্মৃতিশক্তি প্রখর করে দাও!

শুনছি, জানেমন্ বলে যাচ্ছেন, 'সেই ভাল সেই ভাল।' ধীরে ধীরে আকাশের দিকে দুই বাহু প্রসারিত করে অজানার উদ্দেশে বললেন, 'সেই ভাল, হে কঠোর, হে নির্মম! একদিন তুমি আমার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়েছিলে—আমি অনুযোগ করেছিলুম। তারপর শব্‌নমরূপে সেটা তুমি আমায় ফেরত দিলে শতগুণ জ্যোতির্ময় করে—আমি তোমার চরণে লুটিয়ে জন্মদাসের মত বার বার তোমার পদচুম্বন করি নি? আজ যদি তুমি আবার সেই জ্যোতি কেড়ে নিতে চাও তো নাও—আমি অনুযোগ করব না, ধন্যবাদও দেব না। কিন্তু এই হতভাগ্য পরদেশী কী করেছিল, আমাকে বল, তাকে তুমি—'

দেখি, তাঁর চোখ দুটি দিয়ে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

একবার দেখেছি, একবারের কথা শুনেছি—এই তৃতীয়বার। এরপর আজ পর্যন্ত আর কখনও দেখি নি।

আমি আকুল হয়ে তাঁকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলুম। তাঁর চোখ মুছে দিতে দিতে মনে মনে শব্‌নমকে উদ্দেশ করে বললুম, 'হিমি, বিরহ-ব্যথায় যে আঁখি বারি ঝরে সেটা শুকিয়ে যায়—প্রিয়মিলনের সময় সেটা দেখানো যায় না। দেখাতে হলে সেটা বুকে করে বইতে হয়। তুমি যেদিন ফিরে আসবে সেদিন এই রক্তচিহ্ন দেখিয়ে তোমাকে বলব, 'জানেমন্ তোমার জন্য তাঁর বুকের ভিতর কী রকম রক্তরেখায় পদ্ম-আসন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, দেখ।'

আমি জানেমন্‌কে চুম্বন দিতে দিতে বললুম, 'আপনি শান্ত হন। আপনি জানেন না, আমার হৃদয় এখন শান্ত।'

আমি জানতুম, জানেমন্ শব্‌নম উভয়ই—অন্তত ক্ষণেকে তার শোক ভুলে যান—ঋষি কবিদের বাণী শুনতে পেলে। বললুম, 'আপনি সোক্রাতের যে কথা উল্লেখ করলেন, সেই বলেছেন, আমাদের কবি আব্দুর রহীমন্ খান-ই-খানান—

"রহীমন্! তুমি বলো না লইতে অনাদরে দেওয়া সুধা—
আদর করিয়া বিষ দিলে কেহ মরিয়া মিটাব ক্ষুধা।

রহীমন্! হমে না সুহায় অমি পিয়াওৎ মান বিন্।
জো বিষ দেয় বোলায় মান সহিত মরিব ভালো।।"

*

আমাকে, আরও কাছে টেনে এনে বললেন, 'সুন্দর। সুন্দর! দাঁড়াও, আমি ফার্সীতে অনুবাদ করি;—মুখে মুখেই বললেন,

"আয় রহীমন্‌; না গো মরা—"

সাত

অনেকক্ষণ যেন ধ্যানে মগ্ন থেকে আমাকে শুধালেন, 'তুমি পেয়েছ? কী পেয়েছ?'

'সে কি নিজেই ভাল করে বুঝতে পেরেছি যে আপনাকে বুঝিয়ে বলব। এর সাধনা তো আমৃত্যু, কিংবা হয়তো মৃত্যুর পরক্ষণেই বুঝব এতদিন শুধু বইয়ের মলাটখানাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছি, বইটার নাম পড়েই ভেবেছি ওর বিষয়বস্তু আমার জানা হয়ে গিয়েছে, তখন দেখব এতদিন কিছুই বুঝতে পারি নি। শব্‌নমই আমাকে একদিন বলেছিল, সামান্য একটু আলাদা জিনিস —

"গোড়া আর শেষ, এই সৃষ্টির
জানা আছে, বল কার?
প্রাচীন এ পুঁথি, গোড়া আর শেষ
পাতা কটি ঝরা তার!"

হিরণ্ময় পাত্রের দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হৃদয়ে কেটে গিয়েছে সমস্ত জীবন—ওর ভিতরকার সত্যটি দেখতে পাই নি। বিকলবুদ্ধি শিশুর মত এতদিন চুষেছি চুষিকাঠি—এই বারে পেলুম মাতৃস্তন্যের অনাদি অতীত প্রবহমান সুধা-ধারা। সেই যে শিশুহারা মা তার বাচ্চাকে কাঁদতে কাঁদতে খুঁজেছিল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি—চলার পথে যে ঝরে পড়েছিল তার মাতৃস্তন্যরস তাই দিয়েই তো দেবতারা তৈরী করলে, মিল্‌কিওয়ে—আকাশগঙ্গার ছায়াপথ।

'এ জীবনেই তো পৌঁছই নি পাহাড়চূড়োয়, যেখান থেকে উপত্যকার পানে তাকিয়ে বলতে পারব, এই যে উপত্যকার কাঁটাবন খানাখন্দ, কাদা-পাথর, সাপ-জোঁকে ক্ষতবিক্ষত চরণে এখানে এসে পৌঁছেছি—এই উপত্যকাই কত সুন্দর দেখায় গিরিবাসীদের কাছে, যাবা কখনও উপত্যকায় নামে নি—আমি কিছুটা উপরে এসেছি মাত্র, আর এর মধ্যেই কাঁটাবনকে নর্মকুঞ্জ বলে মনে হচ্ছে, কাদা-ভরা খালকে প্রাণদায়িনী স্রোতস্বিনী বলে মনে হচ্ছে। গিরিশিখরে পৌঁছলে সমস্ত ভুবন মধুময় বলে মনে হবে, এই আশা ধরি।

জানেমন্‌ স্মিতহাস্যে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু এইটুকুই পেলে কী করে?'

আমি বললুম, 'অদ্ভুত, সেও আশ্চর্য। মনে আছে মাসখানেক আগে সখী এসেছিল শব্‌নমের। ওর সঙ্গে দমকা হাওয়ার মত এল শব্‌নমের আতরের গন্ধ। গোয়ালিয়র না কোথা থেকে শব্‌নম আনিয়েছিল যে এক অজানা আতর, তারই সবটা দিয়ে দিয়েছিল তার সখীকে—মাত্র একদিন ওইটে মেখে এসেছিল আমার—আমাদের—না, আমাদের সকলের বাড়িতে আমাদের প্রথম বিয়ের দিনে—'

'সে কী?'

অজানতে বলে ফেলেছি। ভালই করেছি। আরও আগেই বলা উচিত ছিল।

কী আনন্দ আর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বৃদ্ধ যোগী শুনলেন আমাদের বিয়ের কাহিনী। হাসবেন, না, কাঁদবেন কিছুই যেন ঠিক করতে পারছেন না। খানাতে দোম্বা না মুর্গীর বিরিয়ানী ছিল সেও তাঁর শোনা চাই, তোপলের স্ত্রীধন নিয়ে আহাম্মুকির কথা ভাল করে জানা চাই। এক কথা দশবার

শুনেও তাঁর মন ভরে না। আর বার বার বলেন, 'ওই তো আমার শব্‌নম। কী যে বল, গওহর শাদ, কোথায় নূরজাহান!'

কতদিন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও তাঁর পরম মুখ-রোচক মজলিসের জৌলুস—আমাদের এই প্রথম বিয়ের কাহিনী।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালেন, 'আচ্ছা বিয়ের পর তোমাতে ওতে যখন একলা-একলি হলে তখন সে প্রসন্ন হাসি হাসলে, না কাঁদলে?'

আমার লজ্জা পাচ্ছিল, বললুম, 'কাঁদলে।'

'জানতুম, জানতুম। আমারই স্মরণে কেঁদেছিল। এবারে মুখে পরিতৃপ্তির উপর বিজয় হাস্য। বললেন, 'এইটুকুনই জানতে চেয়েছিলুম। এইবারে বল, তোমার সেই আতরের কথা!'

'চেনা দিনের ভোলা গন্ধের আচমকা চড় খেয়েছিলুম, সেদিন। এব পূর্বে আমি জানতুম না, স্মৃতির অন্ধকার ঘরে সুগন্ধ আলোর চেয়েও সতেজ হয়ে মানুষকে কতখানি অভিভূত করতে পারে। আমি অনেকখানি মুহ্যমান হয়ে সুবাস-বন্যায় যেন ভেসে চলে গিয়েছিলুম। আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই—প্রীতিসম্ভাষণ দান-প্রদান হয়েছিল—আমি কিছুই শুনতে পাই নি।

এইখানেই আরম্ভ।

শব্‌নম একদিন আমায় শুধিয়েছিল, "যখন সব সান্ত্বনার পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন হৃদয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায়"—এটা আমি জানি কি না? অমি উত্তর দেবার সুযোগ পাই নি। আমাদের যে কবির এদেশে আসার কথা ছিল, তিনি ছন্দে বলেছেন,

"দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেই ক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে; অমৃতের কণা
গ'লে আসে অশ্রুজলে;
সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায়।"

সঙ্গে সঙ্গে এক অবর্ণনীয় আনন্দ-মধুরিমা আমার সর্বদেহ-মনে ব্যাপ্ত করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল, পরীক্ষা পাসের জন্য মুখস্থ করা বিদ্যের একটা অংশ—সেটা তখন বুঝি নি, এখন সুগন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে ভেসে উঠল।

রাজপুত্র দারা শীকুহ্-কৃত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ তো আপনি পড়েছেন, কিন্তু সব উপনিষদ্ অনুবাদ করেন নি বলে বলতে পারব না বৃহদারণ্যক তাতে আছে কি না। তারই এক জায়গায় আমাদের দেশের এক দার্শনিক রাজা জনক গেছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে। ঋষিকে শুধালেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, মানুষের জ্যোতি কী—অর্থাৎ তার বেঁচে থাকা, তার কাজকর্ম ঘোরাফেরা করা কিসের সাহায্যে হয়—কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "সূর্য।"

জনক শুধালেন, "সূর্য অস্ত গেলে? অস্তমিত আদিত্যে?"

'চন্দ্রমা।"

"সূর্য চন্দ্র উভয়েই অস্ত গেলে—অস্তমিত আদিত্য, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?"

"অগ্নি।"

'অগ্নিও যখন নির্বাপিত হয়?"

"বাক্—ধ্বনি। তাই যখন অন্ধকারে সে নিজের হাত পর্যন্ত ভাল করে দেখতে পায় না, তখন যেখান থেকে শব্দ আসে, মানুষ সেখানে উপনীত হয়।"

এইবারে শেষ প্রশ্ন।

জনক শুধালেন, "সূর্য চন্দ্র গেছে, আগুন নিবেছে, নৈঃশব্দ্য বিরাজমান—তখন পুরুষের জ্যোতি কী?" সংস্কৃতটি ভারি সুন্দর, পদ্য ছন্দে যেন কবিতা। 'অস্তমিত আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমসাস্তমিতে শান্তেহগ্নৌ, শান্তায়াং বাচি. কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?'

যাজ্ঞবল্ক্য, শেষ উত্তর দিলেন, "আত্মা।"

আমাদের কবির ভাষায় অন্তরের 'অন্তরতম পরিপূর্ণ আনন্দকণা।' আরবী ফারসী উর্দুতে যাকে আমরা বলি 'রূহ্'। এ সব তো আপনি ভাল করেই জানেন।

আমার ধোঁকা লাগল অন্যখানে। যাজ্ঞবল্ক্য যখন চেনা জিনিস সূর্য থেকে আরম্ভ করে জনককে অজানা আত্মাতে নিয়ে যাচ্ছেন তখন 'অগ্নি'কে জ্যোতি বলার পর তিনি 'গন্ধ'কে মানুষের জ্যোতি বললেন না কেন? গন্ধ তো 'শব্দে'র চেয়ে অনেক বেশি দূরগামী। কোথায় রামগিরি আর কোথায় অলকা—কোথায় নাগপুর আর কোথায় কৈলাস—সেই রামগিরিশিখরে দাঁড়িয়ে বিরহী যক্ষ দক্ষিণগামী বাতাসকে আলিঙ্গন করেছিলেন। সেই বাতাসে হিমালয়ের দেবদারু গাছের গন্ধ পেয়েছিলেন, হয়তো এই বাতাসই তাঁর অলকাবাসী প্রিয়াঙ্গীর সর্বাঙ্গ চুম্বন করে এসেছে;

"হয়ত তোমারে সে পরশ করি' আসে,
হে প্রিয়া মনে মনে ভাবিয়া তাই
সকল অঙ্গেতে সে বায়ু মাখি লয়ে
পরশ তব যেন তাহাতে পাই।"

ফার্সী এবং সংস্কৃত ছন্দে প্রচুর মিল আছে। জানেমন্ তাই আমাকে একাধিকবার মূল সংস্কৃতটা আবৃত্তি করতে বললেন।

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
হে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।

আমি ভেবেছিলুম, এই খেই ধরে কাব্যালোচনাই চলবে কিন্তু জানেমন্‌ই বললেন, 'গন্ধের কথা বলছিলে।'

আমি বললুম, 'জী। আর যক্ষের সুবাসানুরাগ না হয় কবিত্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আমি এমন গন্ধকাতর লোক দেখেছি, যে বেহারে দক্ষিণমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসের গন্ধ নিতে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে বাতাসে বাংলা সাগরের নোনা গন্ধস্পর্শ। এটা কল্পনা নয়।

'তা সে যা-ই হোক, ঋষি গন্ধকে জ্যোতিরূপে বাকের চেয়ে ন্যূনতর মনে করেছেন, কারণ শব্দের সাহায্যে আমরা অন্ধকারে যে দিগ্‌দর্শন পেয়ে উৎপত্তিস্থলে পৌঁছতে পারি সুবাস দিয়ে অতখানি পারি নে, কিংবা হয়তো স্বীকার করেও সংক্ষেপ করেছেন—যেমন স্পর্শের কথাও বলেন নি।

কিন্তু আসল কথা এই একটুখানি সৌরভেই আমি যদি মুহ্যমান, অভিভূত হয়ে যাই তবে তার পরের সোপান এবং সেটা তো সোপান নয়, সে তো মঞ্জিল, সে তো সাগরসঙ্গম, সেই তো আত্মন্—সে তো দূরে নয়, কঠিন নয়। সেই তো এইমাত্র অনির্বাণ জ্যোতি, সেই তো নূর, ব্রহ্ম। সেই আলোতেই আমি অহরহ শব্‌নমকে দেখতে পাব। সূর্যচন্দ্র যখন অস্তমিত, অগ্নি যখন শান্ত তখন

যদি শব্‌নম সুরভিবাস দিয়ে আমাকে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত করে দিতে পারে তবে আর এইটুকুতে নিরাশ হবার কিছু নেই। বিশ্বাস করা কঠিন, তখন সে জ্যোতি পেলুম আমার অন্তরেই।'

আমি চুপ করলুম। জানেমন্‌ বললেন, 'এতে অবিশ্বাসের তো কিছুই নেই। আমি যেটুকু পেয়েছি, সেটুকু চোখের আলো হারানোর শোকে—এবং আপন অন্তর থেকেই, বহু সাধনার পর। তুমি পেয়ে গেলে অল্প বয়সেই—সে শুধু পিতৃপুরুষের আশীর্বাদের ফলে।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু চিরস্থায়ী নয় আমার এ সম্পদ। মাঝে মাঝে—'

জানেমন্‌ আমাকে কাছে টেনে এনে আমার মাথা তাঁর কোলের উপর রেখে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'আমারও তাই। আমাদের বন্ধু সূফী সাহেবেরও তাই। তারপর বল। আমার শুনতে বড় ভাল লাগছে। শব্‌নম ফিরে এলে তার সামনে আবার তুমি সব বলবে।'

কী আত্মপ্রত্যয়! যেন শব্‌নম এক লহমার তরে আমাদের জন্য তৃষ্ণার জল আনবার জন্য পাশের ঘরে গিয়েছে।

আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ তাকে অরুন্ধতী তারা দেখাবার সুযোগ পাই নি বলে। এই যে আমি মজার-ই-শরীফ এলুম গেলুম—রাত্রিবেলা একবারও আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি নি—যে-কোনও তারা দেখতে পেলেই সব বেদনা আবার এক সঙ্গে এসে আমাকে মুষড়ে ফেলবে বলে।

যে রাতে আমি প্রথম জ্যোতি পেলুম, তারই আলোকে আমি নির্ভয়ে অরুন্ধতীর দিকে তাকালুম। তিনি আমায় হাসিমুখে বললেন, "স্বর্গে আসতেই দেবতারা আমায় শুধালেন, 'তুমি কোন পুণ্যলোকে যাবে?' তাঁরা ভেবেছিলেন, যে-স্বামীর কোপন স্বভাব পদে পদে উভয়কে লাঞ্ছিত করেছে সেই কলহাস্পদ স্বামীর কাছে আমি যেতে চাইব না। কিন্তু আমি তাঁরই কাছে আছি। তুমি নিজের অসম্পূর্ণতার স্মরণে নিজেকে লাঞ্ছিত করো না। শব্‌নম আমারই মত তার বশিষ্ঠকে খুঁজে নেবে।"

সারা দিনমান কর্তব্যকার্য, নিত্যনৈমিত্তিক সব কিছু করে যাই প্রসন্ন মনে, দাসী যে রকম মুনির বাড়ির কাজকর্ম করে যায় নিষ্ঠার সঙ্গে, কিন্তু সর্বক্ষণ মন পড়ে থাকে তার আপন কুঁড়েঘরে, আপন শিশুটিকে যেখানে সে রেখে এসেছে—তার দিকে। সন্ধ্যায় ত্বরিত গতিতে যায় সেই শিশুর পানে ধেয়ে—মাতৃস্তনের উচ্ছ্বলিত মুখ সুধারসপীড়িত ব্যাকুল বক্ষ নিয়ে—তার ওষ্ঠাধর নিপীড়নে জননীর সর্বাঙ্গে শিহরণের সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তি, তার আনন্দ-নির্বাণ।

আমিও দিবাবসানে ধেয়ে যাই আমাদের বাসগৃহের নির্জন কোণে। এখানেই আমায় জয়, আর এ ঘরেই আমার সর্বস্ব লয়; তাই বহুকাল ধরে এ-ঘরের কথা ভাবতে গেলেই আমার দেহমন বিকল হয়ে যেত। এখন যাই সেই ঘরে, ওই মায়ের চেয়েও তড়িৎত্বরিত বেগে।

বিশ্বকর্মা যখন তিলোত্তমা গড়তে বসেছিলেন তখন সিংহ দিয়েছিল কটি, রম্ভা দিয়েছিল উরু, আর হরিণী যখন দিতে চাইলে তার চোখ, পদ্মকোরকও পেতে চাইলে সেই সম্মান, তখন নাকি বিশ্বকর্মা দুই বস্তুই প্রত্যাখ্যান করে, প্রভাতের শুকতারাকে দুই টুকরো করে গড়েছিলেন তিলোত্তমার দুটি চোখ। শব্‌নম যখন কান্দাহারে ছিল—'

জানেমন্‌ বললেন, 'বড় কষ্ট পেয়েছে সে তখন। অত যে কঠিন মেয়ে, সেও তখন ভেঙে পড়ার উপক্রম করেছিল। তারপর বল।'

আমি বললুম, 'আমাকে তখন বিশ্বকর্মার মত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ খুঁজে বেড়াতে হয় নি। তাকে স্মরণ করামাত্রই আস্তে আস্তে তার সমস্ত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। রাধার ধ্যান ছিল সহজ, কারণ তাঁর কালিয়া ছিলেন কালা, চোখ বন্ধ করা মাত্রই তাঁকে দেখতে পেতেন—আমার কালা যে গৌরী। কিন্তু বিশ্বকর্মার সঙ্গে আমি তুলনাস্পদ নই। কারণ তাঁর তিলোত্তমা গড়ার সময় তিনি সৃষ্টিকর, চিত্রকর। আমার চারুসর্বাঙ্গীকে গড়ার সময় আমি তুলি ফটোগ্রাফ। তবে হ্যাঁ, মূর্তি

গড়ার সময় আমার সামনে বিলাতী ভাস্করের মত জীবন্ত মডেল থাকত না—খাঁটি ভারতীয় ভাস্করের মত প্রতিমালক্ষণানুযায়ী মূর্তিটি নির্মাণ করে সর্বশেষে তার সম্মিলিত পদযুগলের দুই পদনখকণার উপর ধীরে ধীবে রাখতুম আমার দুই ফোঁটা চোখের জল। এই আমার বুকের হিমিকাকণা—শব্‌নম।

কিন্তু এবারে আর তা নয়। এবারে আমি মূর্তি গড়ি নে।

এবারে সে আমার মনের মাধুরী, ধ্যানের ধারণা, আত্মনেব জ্যোতি।

এবারে আমার আত্মচৈতন্য, লোপ পেয়ে কেমন যেন এক সর্বকলুষমুক্ত অখণ্ড সত্তাতে আমি পরিণত হয়ে যাই। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা সে নয়—অথচ সর্ব ইন্দ্রিয়ই সেখানে তন্মাত্র হয়ে আছে। কী করে বোঝাই! সঙ্গীত সমাপ্ত হওয়ার বহু পরেও তাকে যখন স্মরণে এনে তার ধ্বনি বিশ্লেষণ করা যায়—এ যেন তারও পরের কথা। রাগিণী, তান, লয়, রস সব ভুলে গিয়ে বাকী থাকে যে মাধুর্য—সেই শুদ্ধ মাধুর্য। অথচ বাস্তব জগতে সেটা হয় ক্ষীণ—এখানে যেন জেগে ওঠে বানেব পর বান—গম্ভীর, করুণ, নিস্তব্ধ জ্যোতির্ময় ভূর্ভুবঃস্বঃ।

ওই তো শব্‌নম, ওই তো শব্‌নম, ওই তো শব্‌নম।

আট

শুধু দুটি কথা আমার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ জেগে থাকে।

একটি উপনিষদের বাণী ঃ

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশো আনন্দো ন স্যাৎ।

আমার প্রথম আনন্দের দিনে হঠাৎ এটি আমার মনের ভিতবে এসেছিল—বহু বৎসর অদর্শনের পর প্রিয়জন আচমকা এসে আবির্ভূত হলে যে রকম হয়। তাকে কোথায় বসাব, কী দিয়ে আদর করব কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি নি। এই যে আকাশ-বাতাস, সে আনন্দে পরিপূর্ণ না থাকলে, কে একটি মাত্র নিশ্বাস নিতে পারত এর থেকে?

সেই রাত্রে আমি আমাদের বাসরঘরে যাই। শব্‌নম যেদিন চলে যায়, সেদিন কেন জানি নে তার কুরান-শরীফখানা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল।

প্রত্যাদেশের সন্ধানে অনেকেই কুরান খুলে যেখানে খুশি সেখানে পড়ে। আমার কোনও প্রত্যাদেশের প্রয়োজন নেই। আমি এমনি খুলেছিলুম।

'ওয়া লাওলা ফদ্‌লুল্লাহি আলাইকুম্ ও রহ্‌মমতহু ফীদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরা—'

'ভূলোক দ্যুলোক যদি তাঁর দাক্ষিণ্য ও করুণায় পরিপূর্ণ না থাকত তবে—' তবে? সর্বকালেব মানুষ সর্ব বিভীষিকা দেখেছে। তার নির্যাস—মানুষের অসম্পূর্ণতা তখন রুদ্রের বহ্নি (গজব) আহ্বান করে আনত, সৃষ্টি লোপ পেত।

মনে পড়ল, ছেলেবেলাকার কথা। দাদারা ইস্কুলে, আমার সে বয়স হয় নি। দুপুরবেলা মা আমাকে চওড়া লালপেড়ে ধুতি, তাঁরই হাতে-বোনা লেসের হাতাওয়ালা কুর্তা, আর জরির টুপি পরিয়ে সামনে বসিয়ে কুরান পড়ত। এই জ্যোতি অনুচ্ছেদটিই মার বিশেষ প্রিয় ছিল—বহু বহু বিশ্বাসীর

তাই। আমার স্মরণে ছিল শুধু দুটি শব্দ 'ফদল' আর 'রহমৎ'—উচ্ছ্বসিত দাক্ষিণ্য ও করুণা। তখন শব্দ দুটির অর্থ বা অন্য কোন কিছু বুঝি নি। আজও কি সম্পূর্ণ বুঝেছি?

* * *

আরও সহজে বলি।

বয়স তখন দশ কি বারো। চটি বাংলা বইয়ে গল্পটি পড়েছিলুম। বড় হয়ে এ গল্পটি আর কোথাও চোখে পড়ে নি।

এক ইংরেজকে বন্দী করে নিয়ে যায় বেদুইন দল। দলপতি খানদানী শেখ তার মেয়ের উপর ভার দেন বন্দীকে খাওযাবার।

ভাষাহীন প্রণয় হয় দুজনাতে। তাই শেষটায় বল্লভের বন্দীদশা আর সে সইতে পারল না।—শব্নমের লায়লী তো ওই দেশেরই মেয়ে। একদিন পিতা যখন পণ্যবাহিনী আক্রমণ করিতে বেরিয়েছেন তখন সে খাদ্য আর তেজী আরবী ঘোড়া এনে বল্লভের দিকে তাকালে। দুজনার পালানো অসম্ভব। যদি ধরা পড়ে তবে দুহিতাহরণকারীকে প্রাণ দিয়ে তার শোধ দিতে হবে—ওই একটিমাত্র আশঙ্কা ছিল বলে, সে সঙ্গ নিয়ে দয়িতের প্রাণ বিপন্ন করতে চায় নি। যাবার সময় ইংরেজ শুধু দুটি শব্দ বলে গিয়েছিল—'টম্' আর 'লণ্ডন'।

এক মাস ধরে দলপতির অনুচরগণ খবর আনল, ইংরেজ বন্দরে পৌঁছতে পেরে জাহাজ ধরেছে।

সরলা কুমারী চেষ্টা করেছিল তাকে ভোলবার—বহুদিন ধরে—পারে নি।

পালিয়ে গেল সমুদ্রপারে। সেখানে প্রতি জাহাজের প্রত্যেককে বলে 'টম্'—'লণ্ডন' 'টম্'—'লণ্ডন'।

এক কাপ্তেনের দয়া হল। এ-বন্দর ও-বন্দর করে করে তাকে লণ্ডনে নামিয়ে দিল। ইতিমধ্যে মেয়েটি ওই দুটি শব্দ ছাড়া আর এক বর্ণ ইংরিজী শেখে নি—সে কাউকে সঙ্গ দিত না। ওর দিকে কেউ তাকালে কিংবা প্রশ্ন শুধালে ম্লান হাসি হেসে বলত 'টম্'—লণ্ডন'।

সেই বিশাল লণ্ডনের জনসমুদ্র। তার মাঝখান দিয়ে চলেছে একাকিনী বেদুইন-তরুণী। মুখে শুধু 'টম্'—'লণ্ডন'। কত শত টম্ আছে লণ্ডনে, কে জানে, কত কোণে, কিংবা অন্যত্র, কিংবা ফের বিদেশে চলে গিয়েছে আমাদের টম্।

হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে আসছে টম্। চোখাচুখি হল। দুজনা ছুটে গিয়ে একে অন্যকে আলিঙ্গন করলে—সেই সদর রাস্তার বুকের উপর।

ঠিক তেমনি একদিন আসবে না শব্নম?

সে কি আমাকে বলে যায় নি, 'বাড়িতে থেকো। আমি ফিরব।'

।। তামাম্ ন্ শুদ্।।

অচিন রাগিণী

সতীনাথ ভাদুড়ি

পিলে, নতুন দিদিমা আর তুলসী, তিনজনকে নিয়ে এই 'টান-ভালবাসা'র গল্প। শোনা পিলের মুখে।

এখনও নতুন দিদিমার কথা বলবার সময় সে একেবারে গদ্‌গদ্‌ হ'য়ে ওঠে।

...কি সুন্দর কথা বলতে পারতেন তিনি। 'টান-ভালবাসা' কথাটি যে তাঁরই সৃষ্টি। লেখাপড়া-না-জানা কোন গ্রাম্য মহিলা যদি এইরকম সব অদ্ভুত ভাল কথা না ভেবে চিন্তে যখন তখন ব'লে যেতে পারেন, তা হ'লে পিলে অবাক না হ'য়ে পারে না।

আগে তার নাম ছিল খোকা। তারপর তুলসী তার নাম দিল পিলে। এই নতুন নামকরণের দিনটি বেশ মনে আছে।...ঘুঁটে-পক্ক পোরের ভাত ছাড়া আর কোন জিনিস খাওয়ার অনুমতি দেননি গণেশ কবিরাজ। গরুর চোনার সেঁক, হিং দিয়ে অড়রপাতার রস, শিউলিপাতার বড়ি ও গুলঞ্চের পাচনের দৌরাত্ম্যে জীবন দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। পিসিমার নজর এড়িয়ে রোদ্দুরে বেরুবার উপায় নেই। তিনি ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় আমসত্ত্ব দিচ্ছেন, রোগীর ঘরের বারান্দায় দিতে ভরসা পান না। মাঝে মাঝে তাঁর হাঁক শোনা যাচ্ছে ঃ ওরে ঘুমুস না; খেয়ে-দেয়ে ঘুমুলেই জ্বর আসবে। কানদোমড়ানো খাতাখান দিয়ে ব'স না কেন কিছুক্ষণ।" বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে 'সায়ান্টিস্ট' করাবেন। পিলে তখন সবে লিখতে শিখেছে। তখন থেকেই বাবার হুকুম, কবে কোথায় কোন ফল, ফুল, জানোয়ার, পাখী, সে দেখে, সব একখান খাতায় যেন লিখে রাখে। কোন কোন রবিবারে বাবার হঠাৎ মনে হয় যে ছেলেকে উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়ার তাঁর দিক থেকে গাফিলতি হচ্ছে। অমনি খাতাসুদ্ধু পিলের ডাক পড়ে। সেইখানাই পিসিমার উল্লিখিত কানদোমড়ানো খাতা। পিসীমার কথাতে পিলের খেয়াল হ'ল যে খাতা লেখা অনেকদিন বাদ পড়েছে। অনেক দিনের মিথ্যা তারিখ দিয়ে সেগুলোকে লিখে ফেলা দরকার। বাবাটার আবার যা মুখস্থ! গত মাসে, সে লিখেছিল, খঞ্জন পাখী দেখেছে। বাবা ধ'রে ফেলেছিলেন। "খঞ্জন পাখীতো আসে শীতের প্রথমে। তুই বৈশাখ মাসে দেখলি কি করে?" অভিজ্ঞতায় পিলের সড়গড় হ'য়ে এসেছে কোন কোন জিনিস লিখলে বিপদ নেই। "শুক্রবারে ঠিকেদারবাবুর বাগানে একটি মোচা দেখিয়াছি।" শনিবারে কাক না শালিখ কি দেওয়া যায় সেই কথা ভাবতে ভাবতে পিলে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছে।...যে ডাইনী বুড়ীরা গভীর জঙ্গলের কুটিরে ছেলে-পিলেদের বন্ধ ক'রে রেখে দেয়, তাদেরই কেউ হয়তো এ বাড়ীতে পিসীমা সেজে এসে আমসত্ত্ব দিচ্ছে।...পিলে বাগানের দিক্‌কার জানালা খুলে দিল—লাগুক রোদ্দুরেব ঝাঁজ। রোদ লাগিয়ে হ'ক তার জ্বর। বেশ হ'বে! খুব হ'বে পিসিমার।...বাগানের পাঁচিলের ওপারে ও কে? তুলসী না? ঐতো কাঁধের ওপর পোষা বেজিটা ব'সে। তুলসী পাঁচিল টপ্‌কে এই দিকেই আসছে পা টিপে টিপে। গাছতলায় শুকনো পাতাগুলোর ওপর আলগোছে পা না ফেললে বড় শব্দ হয়। সে পিলেকে জানলায় দেখেছে; কিন্তু কে জানে—ঘরের ভিতরে পিসিমারা থাকতেও পারেন—অনর্থক এই রোগা ছেলেটাকে বকুনি খাইয়ে লাভ কি! চোখে চোখে ইশারা খেলে গেল—চ'লে আয় জানলার কাছে; ঘরে কেউ নেই। তুলসীর গড়ন ছিপছিপে। কালো রঙের মধ্যে বেশ একটা চকচকে ভাব। অস্পষ্ট গুটিকয়েক বসন্তের দাগ সত্ত্বেও মুখখানি বেশ মিষ্টি—বোধ হয় তার চোখদুটির জন্যে। মুখের দাগ কয়টি বোধ হয় তার গর্বের জিনিস; কেন না, তাকে কেউ যখনই জিজ্ঞাসা করে যে তার বসন্ত হয়েছিল কি না—সে নিশ্চয়ই জবাব দেয় "হ্যাঁ। মিক্স।" এই ইংরাজী শব্দটির মানে তখন তাদের কেউই জানত না; বহুদিন পরে বুঝেছিল যে মিক্স মানে জলবসন্ত আর আসল বসন্ত মেশানো। শোনা ইংরাজী শব্দ ব্যবহারের ওপর একটা প্রবণতা তুলসীর ছোটবেলা থেকেই; আর কোন বিষয়ে একবার মত স্থির ক'রে ফেললে তার পক্ষে সেটা বদলানো শক্ত, সেই তখন থেকেই।

তুলসী এসে দাঁড়িয়েছে জানলার বাইরে হাসতে হাসতে। বেজিটাকে বেমালুম চাঁটি মেরে বলে, 'এই শালা! টেরি নষ্ট ক'রে দিস না। এইটাকে নিয়েই মুশকিল। দেখছিস না—আমি পা টিপে

টিপে এলে কি হয়, শালিখ পাখীগুলোর কিচিরমিচির বন্ধ হ'বে না, যতক্ষণ এটাকে দেখতে পাবে! কত ছোট এই আমটা দেখেছিস। টিপলে পুচ ক'রে আঁঠি বেরিয়ে আসে। ঠিকেদারবাবুদের বাগান থেকে পেড়ে আনলাম জমুরত আম—তোর জন্যে। নে, চট ক'রে খেয়ে ফেল্!" কবিরাজ আম খেতে বারণ করেছে, কিন্তু শুধু সেজন্যে নয়। পিলের আসল ভয় পিসিমাকে। জানতে পারলে আর আস্ত রাখবেন না। তাই সে মৃদু আপত্তি জানায়—"গণেশ কবিবাজ বলেছে যে, আমার পেটজোড়া পিলে।"

"কে? ঐ পেটরোগা মিস্টার গন্‌সন্ কবরেজ? পিলেতে ভরা ব'লে কি তোর পেটে আর এই পুঁচকে আমটা আঁটবার জায়গা নেই? কি যে বলিস! তুই সত্যিই একটা আস্ত পিলে;—ছেলে না। পিলে গলানোর হজমিপাচক হচ্ছে আম। ঐ কবরেজেব বৌ মিসেস গন্‌সন্ সেদিন শিউলিপাতার না কিসের যেন বড়ি শুকোতে দিয়েছিল। তাই খেয়ে ফুদি মিস্ত্রির ছাগলটা ব্যা ব্যা কবতে করতে মরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে। মাইরি বলছি। ওব আবার ওষুধ।'

তাব শ্লেষে নয়, লোভে পড়েই পিলে আমটা খেল। হাতমুখ ধুতে গেলে এখনই ধবা পড়ে যাবে পিসীমার কাছে।

"এই নে, মুছে ফেল্ আমার জামায়! আমি তো এমন হ'লে বেজির গায়ের বুরুশে মুখ মুছতাম। তোর আবার যেমন আটাশেপনা! তোকে এবার থেকে পিলে ব'লে ডাকবো। আবাব কাল আসবো—ঠিক এই সময়। বুঝলি!"

ভাল না লাগলেও তুলসীর দেওযা নামের কেউ প্রতিবাদ করে না কোনদিন। এর চেয়েও খারাপ নাম যে ও পিলের দেয়নি সেই যথেষ্ট। ঐ তো নবীন তোমার হাড়জিলজিলে ছেলেটাকে তুলসী "মড়া" ব'লে ডাকতো। এখন দেখলেই তা'কে ঐ নামেই ডাকে।

সেই থেকে নিজেদের বাড়িব বাইরে খোকার নাম হ'য়ে গেল পিলে।

সে বয়সে কারও সঙ্গে হৃদ্যতা এক নাগাড়ে বেশীদিন টেকে না। কিছুদিন দিদিকেই খুব ভাল লাগে, কিছুদিন তুলসীকে, কিছুদিন মিস্ত্রিদের ছেলেটাকে, কিছু দিন নতুন-দিদিমাকে, কিছুদিন নিতুদার কনে বউকে। যখন থাকে তখন মনে হয়, এ ভাল লাগা চিরস্থায়ী; কিন্তু কবে থেকে যেন একজনের বদলে আর একজনকে ভাল লাগা অভ্যাস হ'য়ে যায়। খেলার বেলাতেও যেমন হয় না। কখনও লাটিম, কখনও মার্বেল, কখনও ডাণ্ডাগুলির উপর ঝোঁক? এও সে রকম। এর আগেও নতুনদিদিমা আর তুলসীকে ভাল লাগার ঝোঁক বার-কয়েক এসেছে গিয়েছে। নতুনদিদিমাকে ভাল লেগেছে—সেই অনেক ছোটবেলায়, দিদির সঙ্গে যখন তাঁদের বাড়ির উঠনে রোজ খেলা করতে যেত। দিদি বড় হ'য়ে যাবার পর গত দুই তিন বছর থেকে আর খেলতে যায় না। তাই পিলেরও সেখানে যাওয়া বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। এই সময়, মনে রাখবার মত একটি ঘটনাব দিন থেকে সাময়িক ঝোঁকের পরিবর্তে একরকম স্থায়ী আকর্ষণ গ'ড়ে উঠতে আবম্ভ করে পিলের অন্তরের গভীরে।

পিলের অসুখ তখন একেবারে সেরে গিয়েছে। তুলসীর উপর অগাধ বিশ্বাস। "পিলে, নুন এনেছিস?"

"আনি আবার নি।"

তুলসী বলেছে নুন দিয়ে পাকাকলা খেতে "ফাইন" লাগে। কাজে তাদের সকলেরই, ফাইন লাগে, মাইরি!

জায়গা বাছতে তাদের ভুল হয়েছিল। ঠিকেদারবাবুর পশ্চিমবাগানের পিছনে পুরনো ইটের পাঁজার আড়ালে সবে কলা খাওয়া আরম্ভ করেছে সকলে এমন সময় জনকয়েক মিস্ত্রীমজুর এসে হাজির সেখানে। এরা ঠিকেদারবাবুর জমিতেই ঘর বেঁধে থাকে। আজ যে হঠাৎ তাঁর ইঁদারার পাড় বাঁধানোর জন্যে এই সাপের আড্ডা পাঁজাটার থেকে ইঁটের দরকার পড়বে, তা' কেউ স্বপ্নে ভাবেনি।

জনমজুররাও প্রথমটায় ছেলেদের এখানে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর একসঙ্গে সবাই উল্লসিত হ'য়ে ওঠে।

"তাই বল! এইগুলোরই কাজ তাহ'লে। নিত্যি কলা চুরি। নিত্যি কলা চুরি ঠিকেদারবাবুর বাগান থেকে! আর আমরা এখানে থাকি বলে আমাদেরই ওপর দোষ পড়ে! গত সপ্তাহেও ঠিকেদারবাবু আমাদের চোর ব'লে গালাগালি করেছেন।"...

এ কি ঠিকেদারবাবুর বাগানের কলা নাকি? বললেই হ'ল?"

কে তাদের প্রতিবাদ শুনছে! মিস্ত্রীরা কানেও তোলে না একথা। পালাতে পারে পিলেরা; কিন্তু তা' হ'লে দোষ প্রমাণ হ'য়ে যাবে। তা' ছাড়া সুরকিকোটা বুড়ী ভিখুয়ার মা আর ভখুরন মিস্ত্রী সকলকেই চেনে; পালিয়ে লাভ নেই। ছেলেরা সকলে চুপ ক'রে আছে; কারণ সকলেই জানে যে, যা করবার তা' তুলসীই করবে। কলা চুরি নিয়ে একটা হই চই না হয় এ সম্বন্ধে পিলেরই স্বার্থ সবচেয়ে বেশী। আর কারও বাড়িতে শাসনের বালাই নেই। এদের মধ্যে তুলসী আর পিলেই হচ্ছে পাড়ার ছেলে। বাকি সকলে পড়ে "বাজারের ছেলে"র পর্যায়ে। তাদের নাকি ছিল "যত সব বাজারী অসভ্যতা"। তাই তাদের সঙ্গে পাড়ার বড়দের সম্মুখে, মেশা বারণ।

"কিছু বলিস না এদের, তুলসী!" পিলে কাতর মিনতি জানায়।

"সে আর আমাকে ব'লে দিতে হ'বে না। তোকে নিয়েই তো যত ভাবনা! নইলে দিতাম য়্যাসা এক 'য়ুনিভার্সাল'এর বাড়ি ভখুরনটার মাথায়..."

তুলসীর কাছে সব সময় থাকে একটি রেলের চাবি, একখানি রুমালের সাইজের 'ইউনিয়ন জ্যাক"-এর সঙ্গে বাঁধা। এই চাবিটির নাম তুলসীর ভাষায় 'ইউনিভার্সাল"। রাজার অভিষেক উপলক্ষে প্রাইমারী স্কুলে যে সারি সারি নিশান টাঙ্গানো হয়েছিল, তারই একখানা নিয়ে সে রুমাল করেছে।

পিলেকে নিয়েই ভাবনা; নইলে তুলসী ক'রবে এদের ভয়! সে বলে "হাওয়াগাড়ী" সিগারেটের ধোঁয়া নাক দিয়ে বার করেছিল একদিন। হাতের কাছে এত ইঁট,...আচ্ছা মারামারির কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল...যা চমৎকার হিন্দি বলে, হিন্দুস্থানী গালাগালি দিয়ে এখনই এদের ভূত ছাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে হুকুম করল ভখুরন মিস্ত্রীকে।

"নে! তাকাচ্ছিস্ কি ড্যাব ড্যাব ক'রে! তুলে নে কলার কাঁদিটা। চল্ কোথায় যেতে হ'বে।"

চুরি করলে কি হয়। বাবুভাইয়াদের বাড়ির ছেলে; হুকুম করতেই পারে। ভখুরন মিস্ত্রী কলার কাঁদিটা হাতে ক'রে নেয়। সে-ই চলে সবচেয়ে আগে আগে। ইঁটের বোঝা মাথায় বীরের দলের সঙ্গে, বন্দীদের মিছিল গিয়ে ঢোকে ঠিকেদারবাবুর বাড়ির উঠনে।

"মাইজী কোথায়!"

বামাল চোর ধরতে পারলে বোবার মুখেও কথা ফোটে। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে ভখুরন মিস্ত্রী। মাইজী কুলোয় ক'রে কি যেন ঝাড়ছিলেন ভাঁড়ার ঘরে। বেরিয়ে এলেন। কালাপেড়ে আধময়লা শাড়ি পরণে।

"দাঁড়া, আজ তোদের মজা বার করছি!...বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান। এবার পড়েছ বামুনের ব্যাটারা দেখনঠাকরুণের পাল্লায়। চেন না তো আমাকে। এমনি দেখনঠাকরুণ কিছু বলে না তো বলে না; কিন্তু যখন বলে তখন একেবারে বুঝিয়ে ছাড়ে। ভদ্দর লোকের বাড়ির ছেলের এই কাজ! ছি ছি ছি ছি! আছে তো সব জিনিসেরই একটা..."

তুলসী আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না।

"এ কলায় আপনাদের বাড়ির নাম লেখা আছে নাকি?"

"তুই-ই বুঝি পালের গোদা? কলায় আবার নাম লেখা থাকে নাকি?"

"চলুন আপনাদের কলাবাগানে; কাঁদি মেপে দেখিয়ে দিচ্ছি যে, এ কলা আপনাদের বাগানের না।"

"ওরে আমার মেপে দেখানেওলা রে! সে গাছের থোড়ের কবে ছেঁচকি খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে; আজ এসেছেন গাছ মিলিয়ে দেখাতে!"

সকলেই বুঝতে পারছে যে, তুলসী এখানে জুত করতে পারছে না।

"আপনারা থোড়ছেঁচকি খেয়েছেন ব'লে কি আমরা চোর হ'য়ে যাব? আবদার!"

দেখনঠাকরুণ এ কথায় কান না দিয়ে 'বাজারের' ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন—"তোরা কে রে? চিনতে পারলাম না তো ঠিক। কি নাম বললি, মড়া? কি নামের ছিরি! 'বাজারের'? সেকরাদের বাড়ির ছেলে তোরা সব। তোরা আবার এ পাড়ায় এসে জুটেছিস্ কেন? পালা! চ'লে যা আমার সমুখ থেকে এখনই! নিয়ে যা তোদের এঁটো কলার কাঁদি! মিস্ত্রী! তোরা এখানে হাঁ ক'রে কি দেখছিস তখন থেকে! কাজে ফাঁকি দিতে পারলে হ'ল!"

ভখুরন মিস্ত্রীর দল লজ্জিত হ'য়ে ইঁদারাতলায় কাজ করতে চলে যায়।

যাক্, ব্যাপারটা আজ তাহ'লে অল্পের ওপর দিয়ে গেল। পিলে আছে, তুলসীও "বাজারের" ছেলেদের পিছনে পিছনে দরজার দিকে যাচ্ছে।

"বামুনের ব্যাটাদের যেতে বলেছে কে? বড় যে গুটি গুটি এগনো হচ্ছে!"

তুলসীকে আর ঠেকানো গেল না। সে রুখে দাঁড়িয়েছে।

"বাপ তুলে কথা বলবেন না বলছি! আমাদের বলতে এসেছেন বামুনের ব্যাটা! আপনারা কি? জানি না ভেবেছেন? সদ্‌গোপ হয়েও ভোজকাজেব সময় নিজেদের কায়স্থ ব'লে চালান সে খবর আমরা রাখি না ভেবেছেন? সদ্‌গোপরা তো ভাল লোক। আমি আপনাকে বলি বদ্‌গোপ। বুঝেছেন—বদ্‌গোপ!"

এত খবরও রাখে তুলসী। বাংলার বাইরে মানুষ তা'রা। এখানে সে বয়সে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে বামুন নয় তাকেই কায়স্থ ব'লে ধরা হ'ত। অপরের এঁটো পেয়ারা খাওয়ার সময়, এই জাতিবিভাগের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হ'ত। বামুনের ছেলেরই এই ব্যবস্থায় লোকসান। সুতরাং বামুনের ছেলে হ'য়ে জন্মানোর জন্যে নিজেকে ধিক্‌কার না দিয়ে উপায় ছিল না।

এতক্ষণ একটা হাসির বিজলী ঝিলিক মারছিল দেখনঠাকরুণের চোখে। বদ্‌গোপ! এইবার সত্যি হেসে ফেলেছেন তিনি। সে হাসি আর থামতে চায় না। তুলসীর মুখ দেখে বোঝা যায় যে, সে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়েছে।

"বেশ কথা বলতে শিখেছিস তো। দাঁড়া, তোকে আমি পিটোই।"

হাসতে হাসতে তিনি এগিয়ে এসে তুলসীর মাথাটি নিজের দিকে টেনে নিলেন। কনুই-এর উপরের নরম জায়গাটিতে তাঁর চারটি আঙুল চেপে বসেছে...বুড়ো আঙুলটি দেখা যাচ্ছে না। ফাঁক করা ঠোঁট দু'টির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছেন; আর তারই মধ্যে দিয়ে একটা অর্থহীন স্বর বেরুচ্ছে...হি-ই-ই-ই-ই...।

এই হচ্ছে দেখনঠাকরুণের আদরের নিজস্ব রূপ। পরে এ জিনিস পিলে বহুবার দেখেছে। ছোটবেলা থেকে রোগে ভুগতো ব'লেই বোধ হয়, একটু দূর থেকে পরিবেশের খুটিনাটিগুলো দেখবার, মনে রাখবার ও তা' নিয়ে জাবর কাটবার একটা সহজ ক্ষমতা জন্মে গিয়েছিল পিলের।

"তোর গা-টা তো খুব মোলায়েম রে!"

তুলসীর গা যে খুব মোলায়েম, তা পিলে এর আগে জানতো না। দেখনঠাকরুণের কথায় এখন লক্ষ্য ক'রে দেখে। সত্যিই তো। বেশ তেলা তেলা। নতুন জুতোর মত। এইজন্যেই কি তুলসীকে ছারপোকা কামড়ায় না? একদিন একখান চেয়ারে অনেকক্ষণ ব'সে দেখিয়ে দিয়েছিল। আর কেউ পারেনি। সেদিন সবাই ঠিক করেছিল যে, তুলসীর রক্ত তেতো। দূর। তা' কেন হ'তে যাবে। তেতো ওষুধ খেল পিলে; আর রক্ত তেতো হ'য়ে যাবে তুলসীর? এতদিনে পিলে বুঝেছে ব্যাপারটা। তেলা গা ব'লে ছারপোকার কামড় পিছলে যায়। নিজের গায়ের চামড়াও পিলে একবার দেখে নিল

আড়চোখে। তুলসীর মত নয়;—অন্য রকম। তবু যদি দেখনঠাকরুণ বলেন যে, তার গা-টাও বেশ মোলায়েম, তা' হ'লে খুব ভাল লাগবে তা'র। জিজ্ঞাসা করবে নাকি—"আর আমার গা-টা?" ধেৎ! তা' কি জিজ্ঞাসা করা যায়! পিসিমা টিসিমা হ'লেও না হয় হ'ত।

তুলসী জোর ক'রে মাথাটা ছাড়িয়ে নেয়; পিলের সমুখে বোধ হয় লজ্জা লজ্জা করছিল। ঠোঁটের কোণের নির্গতপ্রায় লালা টেনে নিয়ে দেখনঠাকরুণ ঢোক গিললেন।

"আচ্ছা, আপাতত ঐ বালতির জলে পা ধুয়ে আসুন বামুনঠাকুর। বামুনঠাকুর তো আমার বামুনঠাকুরই!" তারপর পিলেকে বললেন, "ওরে, ও সংক্রান্তির বামুন! তোকেও কি আপনি বলতে হ'বে নাকি রে? কি, কথা বলছিস না যে বড়? হাসি বেরিয়েছে দেখি এতক্ষণে মুখে। যা হাত-পা ধুয়ে আয়! ছিষ্টি সাত মুল্লুক ঘুরে বেড়াচ্ছে! ঐ পা না ধুয়ে আমি ভাঁড়ার ঘবের বারান্দায উঠতে দিই! আমি বরঞ্চ দেখি ভাঁড়ার ঘরে কিছু আছে টাছে নাকি। লেজওয়ালা বামুনঠাকুরের কলা খাওয়া বন্ধ করেছি আজ. ."

"দেখুন, বার বাব বামুনঠাকুর বামুনঠাকুর ব'লে ঠাট্টা করবেন না বলছি!"

"কি বলবো আপনাকে তা' তাহ'লে ব'লে দেন দয়া ক'রে। বামুনের ব্যাটা বলবো না, বামুনঠাকুর বলবো না, তবে কি বদ্‌বামুন বলবো?"

আবার সেই হাসি। দেখনঠাকরুণের হাসি যত বাড়ে তত তুলসীর চোখ ছলছল কবে।

"ওকি! রেকাবের ওপর মুখ গুঁজে ব'সে রইলি। খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। দ্যাখ্ তো বেলা প'ড়ে এলো। আমার কি আজ খাওয়া-দাওয়া নেই নাকি? তোকে আবার ছুঁয়ে ফেললাম—কাপড় ছাড়তে হ'বে। তুই চটিস, কিন্তু তোকে কি ব'লে যে ডাকি সে-ই হয়েছে মুশকিল। তোর নাম যে আমার শ্বশুরেরও নাম। তাই জন্যেই যে আমি ঠাকুরদেবতার গন্ধপাতার নাম নিতে পারি না। আচ্ছা, তোকে গন্ধপাতা ব'লেই ডাকবো এবার থেকে। আর যদি গন্ধবামুন বলি, তাহ'লে? তাহ'লে কেমন হয়? আবার হাসি হচ্ছে! হাসি! দ্যাখ্‌তো হাসলে পরে কি সুন্দর দেখতে লাগে। তা' নয়, রেগে হুম্-ম্-ম্! যা' দু'চক্ষে দেখতে পারি না।"

এরপর তুলসীর হাবভাব সহজ হ'য়ে আসতে আর দেরী হয় না। পিলে এই ফাঁকে কাজের কথা পাড়ে।

"কলার কাঁদির কথাটা যেন আমাদের বাড়িতে ব'লে দেবেন না। সত্যি বলছি, ওটা আপনাদের বাগানের নয়। ও আমাদের নিজেদের বাগানের। আমাদের বাগান থেকে এক রাতে কেটে নিযে গিয়েছিল তুলসী আর "বাজারের" ছেলেরা। আজ আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল সেই কলা খাওযার।"

"ও রে! নিজেদের বাগানের কলা চুরি করেছিস?" হাসতে হাসতে আবার তার দম বন্ধ হ'য়ে আসে। তুলসীর মুখে ততক্ষণে বেশ কথা ফুটেছে। মুখ ধুতে ধুতে বিজ্ঞের মত বলে, "উঠানের ভিতর আবার কামিনী ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে দেখছি।"

"কেন, কামিনী গাছ লাগালে কি হয়?"

"বৃষ্টির পর কামিনী ফুল থেকে পায়খানার গন্ধ বেরোয়।"

"সব শিয়ালের এক রা! আমি এনে শখ ক'রে লাগিয়েছি। বাড়ির মানুষ বলেন, সাপখোপ আসে। গন্ধপাতা বলছে পায়খানার গন্ধ। আর তুই-ই বা বাকি থাকিস কেন? তুইও একটা কিছু বল। ওল কচু মান, তিনই সমান। এ হয়েছে তাই। যার পায়খানার গন্ধ লাগে সে যেন নাক-মুখ বন্ধ ক'রে থাকে।"

পিলে নার্ভাস হ'য়ে পড়ে। আবার তুলসীটা চটালো বুঝি দেখনঠাকরুণকে। কি দরকার ছিল এত কাণ্ডের পর আবার কামিনী গাছের কথা তোলার। না না, ওঁর মুখখানাতো চটা চটা মনে হচ্ছে না। হাসি হাসি ভাব যেন।...

"এইবার আমার খাওয়া। আমার খাওয়া দেখবি নাকি রে তোরা?"

"ধ্যেৎ!"

পিলেরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

"আচ্ছা, আবার আসিস। কলার কথা কাউকে বল'ব না। গন্ধপাতা, তুই শুনেছি গান গাইতে জানিস। একদিন শোনাতে হবে কিন্তু।"

"আচ্ছা।"

বাড়ি থেকে সলজ্জ হাসিমুখে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই পিলে বলে, "ভারী ফাইন কথা বলেন উনি, না রে?"

"একেবারে হাসিয়ে হাসিয়ে মারেন, মাইরি! ওল কচু মান,...শুনলি না? গন্ধপাতা? গন্ধবামুন? এমন সুন্দর ক'রে কথা কেউ বলতে পারে না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—'আমার খাওয়া দেখবি নাকি রে'—তাহ'লে তা'কে ফাইন লাগে—না রে?"

"হ্যাঁ। আর কলার কথা কাউকে বলবেন না। উনি ভয়ঙ্কর আমাদের সাইডে, না রে?"

"ওঁর গায়ে কেমন যেন একটা হিং হিং গন্ধ না রে?"

পিলে জবাব দেয় না। নিজেকে একটু যেন ছোট ছোট মনে হচ্ছে তার। সে তো জানে না গন্ধটা কেমন। তাকে তো উনি অমন ক'রে কাছে টেনে নেননি—তুলসীর মত। বাবার তেল মাখবার কাপড়ের মত কোন গন্ধ হয়ত তুলসী পেয়ে থাকবে। উনি তুলসীকে কাঁদিয়ে ছাড়লেন, কথায় হারিয়ে দিলেন, নতুন নাম দিলেন;—তবু সে চটলো না তো ওঁর ওপর। অমন মিষ্টি যাঁর কথা, তাঁর ওপর কি চটে থাকা যায়?...পিলের সবচেয়ে ভাল লেগেছে, আপাতত, আর বরঞ্চ শব্দ দু'টি। বাংলার বাইরে তাদের জন্ম। এখানকার কারও মুখে এসব কথা শোনেনি। দেখনঠাকরুণের কথার সুরই আলাদা, ধরণই আলাদা; এখানকার সঙ্গে মেলে না।...খুব ভাল লাগে মাইরি! যে তুলসী, রাজ্যের লোকের নামকরণ ক'রে বেড়ায়, তাকে নতুন নাম দিয়ে দিলেন উনি! দেখনঠাকুরুণ কি যে-সে লোক! তার ওপর ভয়ঙ্কর আমাদের "সাইড"-এ, না রে?...

এই দেখনঠাকরুণই পিলেদের নতুন-দিদিমা। তিনি ছিলেন ঠিকেদারবাবুর বোধ হয় তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। 'বোধ হয়' এইজন্যে বলা হচ্ছে যে, পাড়ায় এ বিষয়ে দুই রকমের কথা শোনা যেত। পাড়ার সবজান্তার দল বলতো যে, ঠিকেদারবাবু প্রথম জীবনে রেলে পয়েন্টস্‌ম্যান-এর কাজ করতেন। দর্শনা ইস্টিশানে ছিলেন। সেকালের বিখ্যাত দর্শনা রেল দুর্ঘটনা সেই সময়েই ঘটে। দায়িত্ব ও ত্রুটি তাঁরই, একথা বুঝতে পেরে গাড়ু হাতে সেই যে পালিয়েছিলেন, আর ওমুখো হননি। এখানে এসে নাম বদলে নতুন ক'রে জীবন গড়া। আগেকার বউএর খোঁজও নাকি আর কখনও নেননি। ঠিকেদারবাবুর বন্ধুরা কিন্তু এসব কথা আগাগোড়া অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে ঠিকেদারবাবু এখানে এসে যে বিয়ে করেছিলেন, সেই তাঁর প্রথম বিয়ে। তাঁরা একথা বলতেন বটে; কিন্তু মনে একটা খট্‌কা লেগে থাকতো এই কারণে যে, ঠিকেদারবাবুর দেশের কোনও আত্মীয়স্বজনের কথা কেউ কোনদিন তাঁর মুখে শোনেনি; এখানে কেউ কোনদিন আসেননি। সাত কূলে কেউ নেই এমন লোক কি হয় পৃথিবীতে? যাক্ গে! এখানে এসে যাঁকে বিয়ে করেন, সে ভাগ্যবতী বছর পনর স্বামীর ঘর ক'রে ছেলেমেয়ে রেখে, স্বামীর কোলে মাথা দিয়ে স্বর্গে যান। পিসিমার কাছে সেদিনকার গল্প শুনেছে পিলে।..."হাসপাতালে সেদিন মেরামতের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন ঠিকেদারবাবু। মেম লেডীডাক্তার তাঁর গিন্নীকে দেখে হাসপাতালে ফিরে গিয়ে তাঁকে খুব বকেছে। শুনে ভদ্দরলোক হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন। এসেই বসলেন পরিবারের মাথা কোলে নিয়ে। কিন্তু তখন আর তার কোন সাড় নেই। আগেই বোধ হয় সব শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। তারপর ঠিকেদারবাবুর কি ইংরিজীতে কান্না! বুক চাপড়ে মরে। ইংরিজীতে কি সব যেন বলে, আর চোখের জলে বুক ভাসায়।"...

তখন এখানে সবচেয়ে নামডাক হরগোপাল উকিলের—ঐ যে যাঁর বাড়ির গেটে ইংরেজিতে "রায়বাহাদুর কটেজ" লেখা। একটা নামের মিলের সূত্রে তিনি ঠিকেদারবাবুকে ডাকতেন "শ্বশুর"

ব'লে। ঠিকেদারবাবু তাঁকে বলতেন "জামাই"। তাইজন্যে ঠিকেদারবাবুর স্ত্রীকে রায়বাহাদুরের ছেলেমেয়েরা দিদিমা বলতো। এর থেকেই তিনি পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের দিদিমা হ'য়ে যান। ইনি স্বর্গে যাবার মাস-খানেক পর যে নতুন বউ এ বাড়িতে তাঁর জায়গা নিলেন, তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে নাম পেয়ে গেলেন নতুন-দিদিমা। ঠিকেদারবাবু ছিলেন ভারিক্কী লোক। তবু তাঁকে বন্ধুবান্ধবেরা ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে আবার বিয়ে করতে বারণ করেছিলেন..."তা কি ঠেকানো যায়? বউ মরার ধাত কিনা ওঁর; তাই একদিন মধু নাপিতকে দিয়ে পায়রা কাটিয়ে, চ'লে গেলেন বিয়ে করতে।" পিসিমাকে আরও জেরা করলে জানা যায় যে, মন্ত্রপূত পায়রাটি নতুন বউ-এব প্রতীক। সেটাকে মেরে ফেলতে পারলে নতুন বউ-এর মরবার সম্ভাবনা থাকে না। সেই জন্যেই না নতুন দিদিমা বউ-মরা-ধাতের স্বামীর পরিবার হ'য়েও টিকে গেলেন এতকাল।...

স্থানীয় সমাজে ঠিকেদারবাবুর বেশ প্রতিপত্তি ছিল—কতকটা তাঁর রাশ ভারী স্বভাবের জন্যে, আর বেশীটা তাঁর পয়সার জোরে। কখনও তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নেয়নি এমন লোক পাড়ায় ছিল না। রায়বাহাদুরকে পর্যন্ত তাঁর কাছে হাত পাততে হ'ত কখন কখন। তৃতীয় পক্ষের বিয়ে নিয়ে এমন লোকের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাবার সাহস, তাই এখানকার কারও ছিল না। ঐ পুচকে নোলকপরা মেয়েটিকে ঠিকেদারবাবুর স্ত্রী ব'লে মানতে আমরা বাধ্য, কিন্তু তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে রাজী নই—এই দাঁড়িয়ে গেল পুরুষ মানুষদের মনোভাব। পাড়ার গিন্নীবান্নীরা ভাবলেন, অন্য লাইনে। আক্রোশ নয়, অপছন্দও ঠিক বলা চলে না, অথচ এক ধরণের মানসিক বিরোধ ছিল নতুন বউটির বিরুদ্ধে। আগের বড় আপন ছিল, কাজেই ইনি পর। তার ছেলে, তার মেয়ে, তারই নিজে হাতে গ'ড়ে তোলা সংসারের উপ্‌ছে-পড়া লক্ষ্মীশ্রীর মধ্যে কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে বসলো! "যে ছেলেমেয়ে দু'টোকে ফেলে রেখে সে বউ স্বর্গে গেল, সে দু'টোর ওপরও তো দশের একটা কর্তব্য আছে। আছে বললেই আছে! নেই বললেই নেই। সব জিনিসই কি অমনি ক'রে উড়িয়ে দিলে চলে!" সেইজন্যে নতুন বউকে আপন না ভাবা, ছেলেমেয়ে দু'টির ওপর পাড়াপড়শীর কর্তব্যের একটা অঙ্গ ব'লে মনে হয়েছিল তাঁদের।

আর নতুন মাকে আপনার লোক ব'লে নিতে পারেনি ঠিকেদারবাবুর বড় ছেলে তারা।

এ সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রামাণিক খবর পাওয়া যায় নতুন দিদিমার নিজের এখানকার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা থেকে। সে কথা তিনি আজও ভোলেন নি।

"মা-বাপে যে গলায় দড়ি বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে তা' বুঝবার কি তখন বয়স হয়েছে! আগেকার ছেলেপিলে আছে শুনেছি, কিন্তু ক'টি ছেলে, ক'টি মেয়ে সে-সব জানতাম-ও না, জানতেও চাইনি। কি-ই বা তখন বুঝি! 'এ-বাড়ির মানুষকে দেখে তখন ভয়ে মরি—অত বড় মানুষটা, অত বড় বড় গোঁফ! এদের সংসারে এসে তো ঢুকলাম। সংসার তো আমার সংসারই! ঢুকতেই 'এ-বাড়ির মানুষ' তারা আর গুটলিকে আমার কাছে এনে বললেন—'এরা যেন কোনদিন বুঝতে না পারে যে, এদের মা নেই।' প্রথম কথাই হ'ল এই! দেখ একবার? ভাল ভাবে বুঝবার বয়স না হোক, এতো জেনেই এসেছি। এ হুকুম দেবার দরকার ছিল না। কিন্তু সে কথা বলতে পারিনি তখন অত বড় মানুষটাকে। যত কম বয়সই হ'ক না কেন আমার, মনে মনে আগে থেকে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, তুল্যের তুল্য করে দিতে হ'বে এই ছেলেমেয়েদের; দিয়ে দিয়ে, দিয়ে দিয়ে একেবারে নিজের ক'রে নিতে হ'বে। যাতে কেউ কোনদিন একটুও ত্রুটি ধরতে না পারে আমার। দেখি, আর ভাবি, যে সে বয়সে আজকালকার মেয়েরা সামলে শাড়িখানা পর্যন্ত পরতে পারে না।...ঐ দেখ না! হাজার দিন বারণ করেছি না।...আর চোখের ইশারায় ফ্রক আর ইজ্যারপরা রায়বাহাদুরের নাতনীকে বকুনি দিতেই সে অপ্রস্তুত হ'য়ে ফাঁক-করা হাঁটু দু'টিকে এক ক'রে ব'সলো।

"সুরকিকোটা বুড়ী ভিখুয়ার মার কাছ থেকে তো গুটলিকে টেনে কোলে নিলাম! তারাটা আসতেই চায় না কাছে। কত বলি। গোঁজ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বাপে বললো 'প্রণাম কর মাকে।'

বাপের ভয়ে জুজু। টিপ ক'রে সমুখের ঘটিটার কাছে মাথা ঠেকাল। আমি ভাবি ছেলের লজ্জা হয়েছে বুঝি, বড় ছেলে তো; হ্যাঁ, তার বয়স তখন বছর দশেক হ'বে। বাপ চ'লে যেতেই, ছেলের লজ্জা ভাঙ্গানোর জন্যে আমি হেসে জিজ্ঞাসা করি, 'হ্যাঁরে, ঘটিকে প্রণাম করলি নাকি?'' তারা বললে, 'মাও যা ঘটিও তাই'। শোনো একবার জবাব! পোড়াকপাল অমন মায়ের! কেঁদে মরি; সে-ই প্রথম দিন থেকেই। পাড়ার লোকে বিষ ক'রে দিয়েছে ওর মন আমার বিরুদ্ধে। কেনরে বাপু, আমি কি করলাম। তোর বাবা ক'রে এনেছে বিয়ে! মন খারাপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ভিখুয়ার মা আমার কাছে এসে বলে, 'এই নাও মাইজী লেবু। তোমাদেরই বাগানের। তেতেপুড়ে এসেছ; একটু জল দিয়ে খেয়ে নাও। তাবপর এ সব তো আছেই সারা জীবন ধ'রে। এ কথাটুকু বলারও কোন লোক নেই এ বাড়িতে! যেমন বরাত নিয়ে এসেছ!' সেদিন ভিখুয়ার মাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদেছিলাম। কি ভাবলো কি জানি। যত আমি কাঁদি, তত সে কাঁদে, তত কাঁদে গুটলি। ছেলেমানুষ তো গুটলি তখন! তারপব গুটিগুটি একজন দুজন ক'রে উঠনে ঢুকলেন পাড়ার মেয়েবা, তারার মায়ের গুণের বিন্যাস করতে। না, মিছে বলবো না; তখন কি-ই বা বুঝি, কি-ই বা জানি; রায় বাহাদুরের গিন্নী সে সময় দিনকয়েক খুব উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে আমার দেখাশোনা করেছিল। রোজ খোঁপা বেঁধে দিয়ে যেত। যার কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছি, তা' স্বীকার করবো না কেন। তা'র কাছেই তো প্রথম শিখলাম সেইবার যে, এখানে জ্বরকাটিকে 'থার্মান্টার' বলে।

কান্নার মধ্যে দিয়ে এখানকার সংসারে ঢুকলে কি হয়, তিনি মানুষটি ছিলেন হাসির। না হেসে কথা বলতে পারেন না। যেমন পারতেন হাসতে, তেমন পারতেন কথা ব'লে হাসাতে। হাসিখুশি, গান, রঙ্গতামাশার আবহ তয়ের হ'য়ে যেত তাঁকে ঘিরে, যেখানে তিনি বসতেন সেখানেই। চেষ্টা ক'রে গান তিনি কোনদিনই শেখেননি; ঐ শুনে শুনেই যা। আর গান গাইবার সুযোগও মেয়েমানুষের ঘটত ভারী সেকালে! তবে তিনি সুরপাগল লোক ছিলেন। পাড়ায় তখন ঠিকেদারবাবুর বাড়ি ছাড়া আর কোনও বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল না। পাড়ার লোকে দিনের পর দিন 'ধিনতা ধিনা পাকা নোনা' গানের রেকর্ডখানি বাজতে শুরু তিক্তবিরক্ত হ'য়ে উঠতো; কিন্তু নতুন-দিদিমার ক্লান্তি আসতো না কোনদিন। রামলীলা, থিয়েটার, হিন্দুস্থানীদের 'যুগীরা'র গান, ধাঙড়দের 'কর্মাধর্মা'র নাচগান, মোহরমের লাঠিখেলা, 'ছটপরবের পিদিম ভাসানো,' রাজা সিংহাসনে বসবার মিছিল, বাড়ির উঠনে মেয়েদের চড়ুই-ভাতি, সব জিনিসে ছিল তার সমান উৎসাহ। পাড়ার গিন্নীবান্নীদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি চেষ্টা করতেন ভারিক্কি হ'বার; কিন্তু যার চোখ আছে সে-ই বুঝত যে এ, শুধু তার বুঝে-সুঝে চলবার প্রয়াস। তাই থসথসে বুড়িরা দু'জন একত্র হ'লেই একবার অবাক হ'য়ে নিতেন—'কি হুজুগেই নাচতে পারে ঠিকেদারের নতুন-বউ!' এই কথার পিছনে বোধহয় উহ্য থাকত—'অনেক খোয়ার আছে ঠিকেদারের কপালে...যেমন গিয়েছিল...!'

পাড়ার ছেলেমেয়েরা কিন্তু নতুন-দিদিমাকে ভালবেসেছিল প্রথম থেকেই। তাদের কাছে তিনি হ'য়ে যেতেন বয়সের চেয়েও ছোট। এ তাঁকে চেষ্টা ক'রে হ'তে হ'ত না, কারণ এই হচ্ছেন আসল নতুন-দিদিমা। বাড়ির উঠনে এক্কাদোক্কা খেলা থেকেই এ জিনিসের আরম্ভ। তারার মনের তিনি নাগাল পাননি। তাই বোধ হয় গুটলিকে বেশি ক'রে কাছে টানতে চেয়েছিলেন, এই সব ক'রে। 'বাড়ির-মানুষ' সাধারণত সন্ধ্যার আগে বাড়ি আসতেন না। সন্ধ্যার পর থেকে আরম্ভ হ'য়ে যেত হিসাবনিকাশ, মিস্ত্রী-মজুরদের মজুরি দেওয়া, জিনিসপত্র গুণে-গেঁথে তোলানো—আরও অনেক রকম আনুষঙ্গিক কাজ। প্রথম যেদিন হঠাৎ অসময়ে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নতুন-বউকে এক্কাদোক্কা খেলতে দেখেন, তখন কেশে তাকে সময় দিয়েছিলেন সামলে নেবার জন্যে। নতুন-বউ অপ্রস্তুত হ'য়ে মাথার কাপড় টেনে দিয়েছিলেন। ছেলে পিলেরা মুহূর্তের জন্যে থমকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল;—অন্যায় করতে গিয়ে যেন ধরা পড়েছে সকলে। 'বাড়ির-মানুষ' মুহূর্তের জন্যে কি ভাবলেন তিনিই জানেন।

'তোরা সব খেলা বন্ধ করলি কেন? কি গো খুদে চাটুজ্যে, দিদির কোলে চড়ে খেলতে আসা হয়েছে। অত ক'রে চুষলে বুড়ো আঙুলটা আর থাকবে না।'

বারান্দার উপর তারার বন্ধুরা ফুটবল পাম্প করছিল। ইনফ্লাটারটি তারার। সে নিজের অধিকার সম্বন্ধে খুব সজাগ। তাই এখানে এসেই বল পাম্প করতে হয় বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেদের। ঠিকেদার বাবুকে দেখেই ছেলেরা স্বাভাবিক বুদ্ধিতে ইনফ্লাটারটা লুকিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত বসেছিল। বারান্দার উপর দিয়ে ঘরে ঢুকবার সময়, তিনি তারাদের দলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে গেলেন 'সব একেবারে সাধুঃ সাধুঃ সাধবঃ।' ঠিকেদারবাবু আজ অন্য মানুষ। তারার বাবার আজ হ'ল কি? ভয়ে যাঁর কাছে কোনদিন সরস্বতীপুজোর চাঁদা পর্যন্ত চাইতে যাওয়া হয় না, তিনি তাহ'লে হাসিমস্করাও জানেন! একটা সংক্রামক হাসির গুঞ্জনে সারা উঠন মুখর হয়ে ওঠে।

ঠিকেদারবাবু যেন হঠাৎ উপলব্ধি করলেন তাঁদের দুজনের বয়সের তফাতটা। তেত্রিশ বছরের পার্থক্য দুজনের বয়সে! তাঁর চোখ দিয়ে কি নতুন-বৌকে এই জগতটা দেখাতে বাধ্য করা ঠিক হবে? নিজের মনের মধ্যে সংস্কারের বিরোধটুকুকে দূর করে দিতে চেয়েছিলেন হালকা হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে। এই ছাড়পত্র দেবার মধ্যে অন্য কোনও হিসাব ছিল না। তরুণী ভার্যার প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতাজনিত আচবণও এ নয়। হঠাৎ বুঝবার ঝলকে চোখে ফুটে উঠেছিল একটা নিবিড় কোমলতা যা নতুন-বউএর নজর এড়ায়নি।...বাপের বাড়িতে একবার একটা ছাগলছানার পায়ের উপর দিয়ে গরুর গাড়ি চলে গিয়েছিল। তাই দেখে বাবা তালুতে জিভ ঠেকিয়ে, দুবাব যখন চিক্ চিক্ শব্দ করেছিলেন, তখন তাঁর চোখের ভাব ঠিক এইরকমই হয়ে গিয়েছিল না? 'বেচারী।' বলবার সময়ের মুখের ভাব? কিন্তু সব জিনিসের খারাপ দিকটা ভাবা কি ভাল?...না না! এ দৃষ্টি হচ্ছে তাঁর আসল অধিকারের স্বীকৃতি। কেবল এই নতুন সংসারে নয়, ঐ মনেও তাহ'লে তাঁর জায়গা আছে! কর্তব্য আর নিয়মের গভীরেও তাহ'লে তাঁর স্থান আছে। একজনের চাউনির মধ্যে দিয়ে তিনি একটা নতুন মন দেখতে পেয়েছেন...।

ভুল হ'ক, ঠিক হ'ক, তখন এইরকমই ভাবতে ভাল লেগেছিল। মন উন্মুখ থাকলে, অপরের চোখের আয়নায় নিজের আকাঙ্ক্ষার ছায়া দেখতে পাওয়া যায়, এ বুঝবার বয়স তখনও নতুন-দিদিমার হয়নি।

পরে বুঝেছিলেন। স্বপ্ন কখনও ধোপে টেঁকে? ছোটদের সঙ্গে মিশবার ছাড়পত্রই ছিল তাঁর অধিকারের দৌড়। পরের জীবনে অন্তরঙ্গদের কাছে বলেছেন—

'আমাদের আবার বিয়ে। বিয়ে না ছাই। ছেলেপিলে তো কুকুর বিড়ালেরও হয়। বাপের বাড়ি থেকে আসবার আগে সবাই ঠাট্টা করে বলেছিল—বুড়োকে খুব নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবি। ও কেবল শুনতে! একদিন এ-বাড়ির-মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পেরেছি? সে সাহসই ছিল না। অত বড় লোকটার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে মরি। কি বলতে কি বলে ফেলব। তার সংসার; তারই সব; বাজার খরচ চাইতে হবে চোরের মত। আমার কি আর অন্য দশজনের মত? বিয়ে করে কেন, এসব লোকে? একটাকে ধরে এনে রাখলেই পারত। 'তুমি' বলতে পেরেছি কোনদিন। চিরকাল 'আপনি'। তারপর শেষের দিকে—এই ইদানীং—'আপনি' বলতে গেলেই জানাশোনা অন্য দশজনের ডাকবার ধরনের সঙ্গে নিজেরটার তুলনা এসে যেত মনে। তখন আরম্ভ করলাম—'আপনি'ও না, 'তুমি'ও না—ঐ একরকম শাটেশোটে। নিজের মা-বাবাকেই আপনি বললাম না কোনদিন। বাড়ির-মানুষ কি তার চেয়েও বড়? 'আপনি' বলবার সময় মনে হ'ত অন্য মেয়েরা আবার শুনলে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করবে। 'আপনি' বললে কেমন 'পুরুতমশাই পুরুতমশাই, গুরুঠাকুর গুরুঠাকুর লাগে না! করবো কি বলো, আমার কি অন্য দশজনের মত? লোকে আসল বয়সের চেয়ে নিজেকে ছোট দেখানোর চেষ্টা করে; বুড়োরা পাকা চুলে কলপ দেয়; রায়বাহাদুরের গিন্নীর বয়স দেখবে পঁয়তাল্লিশে আটকে গিয়েছে; আর বাড়ে না; অথচ তাঁর ছেলের

বয়স পঁয়তাল্লিশ হয়ে গিয়েছে; ওঁর ছেলেব বউকেই দেখ না—সাত ছেলের মা, তবু রঙীন কাপড় পরবে। আমার কিন্তু ঠিক এর উলটো। নিজেকে বয়সের চেয়ে বড় দেখানর চেষ্টা করতে করতেই জীবন গেল। কেউ জিজ্ঞাসা করলে সব সময় বয়স বাড়িয়ে বলি। ঠাকুরের কাছে চিরকাল বলে এসেছি, হে ঠাকুর আমার মাথার চুল পাকিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। পাড়ার কোন বড়সড় জামাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেই, কেবল ভাবি, ও কি আমার আসল বয়স বুঝতে পারছে। সেবার ট্রেনে একজন কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে তারা আমার ছেলে। কি ঘেন্না বল! খাটে চড়ে ছোট ছেলেরা বলে না যে আমি মায়ের চেয়েও বড়? আমার মনেরও সেই দশা!...আজকালকার মেয়েরা কেমন সবার সম্মুখে হেসে বরের সঙ্গ গল্প করে; না মাথায় কাপড়, না একটা কিছু। বেশ লাগে আমার। দিব্যি! খাসা! থাকত বেঁচে সে মানুষ এখন তাহ'লে আচ্ছা কবে শোনাতাম। শেষের দিকে কখনওসখনও শোনাতে আরম্ভও করেছিলাম একটু আধটু। তখন হেসে বলত, 'সুরেন বাড়ুজ্যের মত লেকচার দেওয়া আরম্ভ করলে যে দেখি।' শেষেব দিকে মানুষটা যেন একটু বদলাচ্ছিল। ঐ চেয়ারখানাতে ব'সে পা দুটোকে ঐ থামের গায়ে স্বগ্‌গে তুলে দিয়ে, ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক খাওয়া চলছে তো চলছেই। আর অনবরত সেখান থেকেই কেশে কেশে ফেলা হচ্ছে সারা উঠান ছিটিয়ে। উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ! তামাকখোর বুড়োদের নাড়ি হাঁটকানো কাশি শুনলেই আমার সারা গায়ের মধ্যে কেমন করে ওঠে! তা' আমি বলি যে একটা পিকদানি রাখলেই হয়। না, তা' নয়। যার যা রীত, না যায় কদাচিত। তবে হ্যাঁ, শেষের দিকে মানুষটা একটু নরম হয়ে আসছিল। কোনদিন একটা পয়সাও তো নাও বলে হাতে করে দেয়নি। শেষের দিকে সংসার থেকে বাঁচিয়ে দু-এক আনা নিলে কিছু বলত না। মজুর-মিস্ত্রী বিদায় করবার পর, রাতে বালিশের নীচেই তো এনে রাখতো খুচরো টাকা পয়সা। তার থেকে দু'চার আনা নেবার জন্যে বকুনি খাইনি কোনদিন। যার কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছি তা' বলব না কেন। নিলে, বুঝতে আবার পারত না! বুঝতো সব। এত লোক চরিয়ে যে খায়, সে আবার বোঝে না। মনে মনে সে মানুষের সব জিনিসের হিসাব ছিল, কড়ায় ক্রান্তিতে। আর আমি নিজেই কত সময় বলে দিতাম পরে ঐ পয়সা নেওয়ার কথা। শুনে হাসত। বলত—জমিয়ে রাখ; পরে আমায় ধাব দিতে হবে। আমি বলি হ্যাঁ, একেবারে তালুকমুলুক কিনবার মত টাকার আণ্ডিল নিয়েছি কিনা!...তুইও যেমন। সে আর ক'টা টাকা! সেও, তারাই চুরি কবে করে তার অর্ধেক শেষ করত। যেখানে লুকিয়ে রাখি, সব জানতে পরে ও ছেলে। কিন্তু কিছু কি বলবার জো ছিল তারাকে? অমনি হয়ত চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করবে। ও বাবা! পাড়াব লোকের কানে গেলে আমার রক্ষে আছে? আর বাড়ির-মানুষের কানে গেলে সে আবার আর এক বিপর্যয় কাণ্ড! তখনই খড়মপেটা করা হবে ছেলেকে। বল্! কি করেছিস বল্! কি কিনেছিস বল্! পারলে পরে গলায় আঙুল দিয়ে তখনই বুঝি বার করে! তারপর এ পালা শেষ হলে চলবে আমার উপর লেকচার,—তারার সঙ্গে না বনিয়ে চললে আমার ভবিষ্যতে অনেক খোয়ার আছে; নিজের কথা ভেবেই আমার উচিত তারাকে আপন করে নেওয়া; আরও কত কথা, কত কথা। নাও! হ'ল! এই ছিল সে মানুষের ধরন! এসব আমার নখদর্পণে। তাই লুকিয়ে রাখা পয়সা কমলে মুখ বুঁজে হজম করে যেতাম। ও ছেলে নিয়ে থুয়েও যা বাঁচত, সে পয়সা গয়লানি, মিস্ত্রীবৌ, ভিখুয়ার মা, এদের ধার দিতাম সুদে। এই এক টাকা, দু টাকা করে জমিয়ে জমিয়ে শেষ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ টাকা করেছিলাম। সে টাকাও গেল তারারই গভ্যে। এই সেদিন। ঐ যেবার তারার বৌয়ের ছেলে হ'ল সেইবার! সে ছেলে কি হয়। সাঁড়াশি দিয়ে তো লেডী ডাক্তার ছেলে বার করলে। ভয়ে মরি; ফল, গাছ, দুই-ই বুঝি যায়! গুরুদেবের কৃপায় দুটি প্রাণী তো কোন রকমে রক্ষা পেল। দিনরাত ঐ আঁতুড় নিয়েই থাকি। তখন দেখি তারা বারবার মা ব'লে ডেকে কাছে আসে। প্রথমটায় অবাক হয়ে যাই, হঠাৎ ছেলের এই ভক্তি উথলে উঠতে দেখে। তারপর ভাবি, হবেও বা; বউএর অসুখের সময় দেখেছে তো; দিন

কোথা দিয়ে, রাত কোথা দিয়ে কেটেছে তার হিসাব ছিল না মায়ের। সে সব দেখেই বুঝি মন গলেছে! বিদ্‌ঘুটে না হ'লে তো নজরে পড়ে না, এ বাড়ির লোকেদের! এতদিন ধরে একটু একটু করে, চব্বিশ ঘণ্টার দেওয়াটা কেউ তাকিয়ে দেখেনি; নজরে পড়েছে কেবল বিদ্‌ঘুটে অসুখের সময়ের সেবাটুকু! রোজকার ভাত বেড়ে যে খেতে দেয়, সে হচ্ছে রাঁধুনির সামিল; আর যে একদিন লুচি-ঘি-ভাত রেঁধে বাবা-বাছা বলে খাওয়ায়, তাকে মনে হয় আপন। এই হ'ল জগতের রীত। তাই দেখিস না, আজকালকার ছেলেদের মায়ের চেয়ে শাশুড়ী আপন? যাকগে মরুকগে! মন যে গলেছে ওর সেই ঢের। তারার মনের কেষ্টপক্ষ যে কোনদিন কাটবে তা আর ভাবিনি। আমি তখন আহ্লাদে ডগমগ। বলেই ফেললাম কথাটা গুটলিকে। সে ঠাট্টা করে বলে—'দেখি দেখি পা দুটো কোথায়, খাটের উপর তুলে বসেছ তো? গরবে আর মা'র পা পড়বে না মাটিতে'।...ঠাকুরকে প্রণাম করি, গুরুদেবকে প্রণাম করি। ও মা! দিনকয়েক যেতে না যেতেই একদিন তারা বলে—'মা তোমার টাকাগুলো দাও না। বড় একটা ঠিকে পেয়েছি; জজসাহেবের কুঠি-তয়েরের। রেলের রসিদ এসে পড়ে রয়েছে চুন-সিমেন্টের; ছাড়াতে পারছি না টাকার অভাবে।' আরও কি কি যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলল, অনেকদিনের কথা হ'ল; অত ছাই মনেও থাকে না।

তাই বল! এরই জন্য মায়ের উপর এত ভক্তি। 'আমি টাকা পাব কোথা থেকে? টাকা তুই কোথায় দেখলি আমার?' সেকথা ছেলে কি শোনে। বলে, 'মা তুমি আমায় অবিশ্বাস ক'র না। এক বছরের মধ্যে ফেরত দেব সুদসুদ্ধ। ফাগুন মাসে গভর্ণমেন্টের বছর শেষ; তার আগেই। এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।'

ছাড়বে না কিছুতেই। পা তো আমার পা-ই। পা না ঘটির খুরো। সেই টাকা নিল বাক্স-পেঁটরা হাঁটকে, তবেগে নিশ্চিন্দি। তারপর কত ফাগুন এল গেল। সে টাকা আজও দিচ্ছে, কালও দিচ্ছে। এখন বলে—'তোমার টাকা আবার কবে নিতে গেলাম আমি?' শোন একবার কথা। আমার একটা একটা করে জমানো পয়সা রে! লোক-লৌকিকতা, সখ-সৌখিন, দেওয়া-থোয়া আছে তো সবই! লাগে তো একটা মানুষের বেঁচে থাকতে গেলে! যতই শাঁখা-সিঁদুর না থাকুক। দুটো দুটো খেতেই না হয় দিচ্ছিস। কার কথা কে শোনে! মা-ও যা, ঘটিও তাই। দোষ আব কাকে দেবো। সে টাকা দিয়ে যদি দুখান গয়না গড়িয়েও রাখতাম। কপাল! কপাল! নইলে বাড়ির-মানুষও তো আমাকে কিছু দিয়ে যেতে পারত। দেয়ও তো লোকে অমন। আমি সে কথা মুখ ফুটে তোমার কাছে বলতে যাব কোন্ ঘেন্নায়? যার মন আছে সে নিজে থেকেই বোঝে। আমার জন্য কিছু ব্যবস্থা করে গেলে তারার কাছে ছোট হয়ে যাবে, পাড়ার লোকের চোখে ছোট হয়ে যাবে, তাই ভেবেই গেলে! এত যার ছেলের কাছে ছোট হয়ে যাবার ভয়, বিয়ে করবার সময় তার সে খেয়াল হয়নি? আশ্চর্য এই ব্যাটাছেলের দল!

বুড়োবয়সে আবার বিয়ে করবার জন্য বড় ছেলের কাছে ঠিকেদারবাবুর যে একটা সঙ্কোচ ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। মা-মরা ছেলে-মেয়ের উপর মায়া-মমতা একটু বেশী থাকা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু এ ছিল অন্য জিনিস। নিজের মনের এই দোষী ভাবের কথা তিনি বাইরের লোকের কাছে জানতে দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। সেইজন্য কেউ তারার বিরুদ্ধে নালিশ করলে, শাস্তি দিতেন দরকারের চেয়েও বেশী। নইলে তারার কোন দোষ একলা তাঁর চোখে পড়লে, তিনি দেখেও দেখতেন না। নতুন-বউকে একখান গয়না গড়িয়ে দেবার কথা ভাবতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ত, তারা আবার না জানি কি ভাববে? তাঁর মধ্যে সামান্য যা কিছু রসকষের অবশেষ ছিল, সেটুকুকেও বাড়িতে কখনও প্রকাশ করতেন না; ভয় হ'ত যে, নতুন স্ত্রী ও আগের পক্ষের ছেলেমেয়ের কাছে খেলো হয়ে যাবেন। এদের সত্যিকার মন তিনি আর কখনও পাবেন না, এ তিনি ধরে নিয়েছিলেন। তাই নিজের গাম্ভীর্যের আড়ালে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটা ভয় ও সমীহের সম্বন্ধ। একবার হালকা হলে নিজের দূরত্ব ও গুরুত্ব আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যাবে না। খেলো তিনি হয়ে গিয়েছেন,

বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত। তবে একটা দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিপক্ষদের এটা প্রকাশের সুযোগ না দেওয়া উচিত। এ জিনিস আরম্ভ হতেই যা দেরী। একবার আরম্ভ হলে আর সামলানো যাবে না। তা ছাড়া দূরে দূরে রাখবার আর একটা লাভ, এতে সত্যটার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা কম; পরিবারের মধ্যে সব ঠিক আছে, এই ব'লে মনকে স্তোক দেওয়া চলে। ঠিকেদারবাবু ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন না—তাই এত কথা কখনও গুছিয়ে ভাবেন নি। আর খুব ভেবে-চিন্তে তিনি যে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতেন, তা-ও নয়। একজন সফল ঠিকাদারের সহজ লোকচরিত্রজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে যে অবস্থা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এ হচ্ছে তারই বিশ্লেষণ। যে মোটা আটপৌরে চিন্তা তাঁব ভোঁতা মনকে সব সময় আশ্বস্ত রাখত, সেটা হচ্ছে যে—যতদিন পযসা রোজগার করতে পারবে, ততদিন সবাই হচ্ছে কাদার তাল—সে স্ত্রীই বলো, আর ছেলেপিলেই বলো! তবু নিজের তৃপ্তির জন্য মনের মধ্যে একটা জগৎ সৃষ্টি করেই নিতে হয়। রামায়ণ, মহাভারতে কে কে ছেলেপিলে থাকতে আবার বিয়ে করেছিল, পড়বার সময় সে নামগুলোর উপর নজর রাখতে হয। সমাজ তাঁকে দোষী বলছে না, ধর্ম তাঁকে অপরাধী বলে না। তবে কেন তিনি বাড়ির লোকের কাছে চোরের মত থাকেন? তাঁর জানাশোনা লোকদের মধ্যে যে যে বেশি বয়সে আবার বিয়ে করেছিল, তাদের কথা ভেবে ভেবে দেখতে ইচ্ছা কবে। কুলীন বামুন অতুল চাটুজ্যের কতগুলি বিয়ে সে খবর ঠিক কেউ জানে না। কত কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু লজ্জা করে। আগে হ'লেও বা হ'ত, কিন্তু এ বিয়ের পব সঙ্কোচ এসে গিয়েছে। নবীন সেকরা তো এক বউ থাকতেই আবাব বিযে কবে এনেছে। কিন্তু যত জিনিস জানতে ইচ্ছা হয়, সবকি জিজ্ঞাসা করতে পারা যায় লোককে?

মা-বোনের কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র কিনবার ভার ছিল তারার উপর। পূজোর আগে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন ঠিকেদারবাবু "গুটলির জন্য আলতা ফিতেটিতে যা লাগে কিনেছিস তো? কিসে কত খবচ হ'ল বলেছি না সেটা লিখে রাখতে।" পরে তিনি ফিতে কাঁটার হিসাব থেকে মনে মনে বুঝবার চেষ্টা কবেছেন যে. নতুন বউএর জন্যও কিছু কেনা হয়েছে কিনা। কিনে থাকবে বইকি। তবে পাড়ার বুড়ীরা কেউ জোর করে বেঁধে না দিলে নতুনবউ যে চুল বাঁধতেই চায় না। কেমন যেন! ঘুমন্ত স্ত্রীব মাথার দিকে তাকিয়ে দেখেছেন; এখন অল্প বয়স, ঘুম সজাগ নয়—এই ভরসা। স্ত্রীকে কোন জিনিস নিজে হাতে কিনে দিতে, শুধু ছেলেমেযের কাছে লজ্জা নয়; স্ত্রী যদি ভাবে যে, বুড়ো সোহাগ দেখাতে এসেছে। ভয় ভয় করে নতুনবউকে। তিনি আশা কবেছিলেন যে, অল্পবয়সী মেয়েদের মত নতুনবউও হবে শৌখীন, আর তাঁকে পদে পদে বোঝাতে হবে যে, যে ছেলেমেয়ের মা হয়ে এ সংসারে ঢুকেছে, তার এ জিনিস সাজে না। তাঁর ঠিকাদারী মাথা এই মেয়েই চেনে। কিন্তু নতুনবউ যেন হলপ খেয়েছে, নিজের জন্য কোন জিনিস চাইবে না, এদের সংসার থেকে। একদিনও রঙিন শাড়ী পরতে কেউ দেখেনি তাকে! অথচ নিজে শৌখিন জিনিস কিনে দিতে পৌরুষে বাধে বুড়ো বযসে।...

এই ছিল এ বাড়ির লোকদের মানসিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ।

তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করবার বছর সতর আঠার পবে ঠিকেদারবাবু মারা যান। এ পক্ষে তাঁর সন্তান একটি। কেষ্টর পর নতুনদিদিমার আর কোন ছেলেপিলে হযনি। বেঁচে থাকবার সময় স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁর হাতে স্বামী একটা পয়সাও দিয়ে যাননি, এইটাই বহুকাল পরে ঠিকেদাবাবুর বিরুদ্ধে নতুনদিদিমার সবচেয়ে বড় অভিযোগ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেন বোঝা যায় না। এ জিনিস তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। সাধারণ অর্থে নীচতা, স্বার্থপরতা বা টাকাকড়ির উপর লোভ বলতে যে জিনিস বোঝায়, তা, তাঁর মধ্যে কেউ কোনদিন দেখেনি। হয়ত স্বামীর বিরুদ্ধের সমস্ত অভিযোগগুলিকে তিনি প্রকাশ করতে পারতেন না। কিম্বা বোধহয় অষ্টপ্রহর চাপা ছোট ছোট মানসিক অশান্তিগুলো নিজের অজ্ঞাতে দানা বাঁধতে বাঁধতে শেষকালে এই নূতন রূপ নিয়েছিল। তাঁর বলা

কথা এত স্বতঃস্ফূর্ত যে তার আন্তরিকতায় সন্দেহের প্রশ্ন ওঠে না। "আজ কি রেঁধেছিল পিসিমা?"— এই বকম সাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে, সেই স্বরেই গল্পচ্ছলে বেরিয়ে আসত নিজের সুখ-দুঃখের কথাগুলো। এই প্রসঙ্গে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত। যখনই তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের কোন অভিযোগেব কথা বলেছেন, তখনই শেষকালটাতে উল্লেখ করেছেন যে, শেষবয়সে লোকটা যেন একটু বদলাচ্ছিল। বিবাহিত জীবনের শেষের দিকের কোন রঙিন দিনের কোন অনুক্ত অধ্যায় তাঁরই মনের মধ্যে রেশ রেখে গিয়েছিল জানা নেই। কিম্বা হয়ত স্বামীর নিন্দা করবার পর একটু প্রশংসা না করলে সংস্কারে বাধত। "বুঝলি পিলে, এ-বাড়ির মানুষ চলে যাবার দিন, সেই ঘোর ঘোর ভাবের মধ্যেও, হাত মুঠো করে আমাকে খুঁজছিলেন। তখন তাঁব কথা বোঝাও যায় না। তারা জিজ্ঞাসা করে, 'কি বলছেন বাবা?' কি বলছেন তা' অন্যলোকে বুঝবে কি; বুঝেছিলাম শুধু আমি। তখন আমার টাকা নেবাবই সময় বটে!"

এত প্রাণের আবেগে কথাগুলো বলা যে, এর পব আর কিছু বলা ভাল দেখায না। তবু নতুনদিদিমার চোখেব কোণে জল দেখে বলতে হয়, "থাকগে নতুনদিদিমা! এসব পুরনো কথা যেতে দিন এখন।"

"পুরনো কথা কি আর মন থেকে যাও বললেই যায়? যায়নারে পাগল, যায় না।"

এই জলভবা চোখের নতুনদিদিমা আবার অন্য মানুষ। পিলেব হাতখানাকে টেনে নিয়েছেন তিনি নিজের হাতের মুঠোব মধ্যে। চোখ নাক মুছতে মুছতে বললেন,—"আপন থেকে পব ভাল, পব থেকে জঙ্গল ভাল।"

বিচার বিশ্লেষণ করে মানুষেব মনের থই কে কবে পেয়েছে? পিলে তো কোন ছাব। শেষেব কথা কয়টির একটি মনগড়া মানে কবে নিয়ে তবু পিলে ভাবে যে, সে ঠিক বুঝেছে নতুনদিদিমাব গভীর অন্তবেব ব্যথা।

পিলে নামটাই থেকে গেল,—অবশ্য নিজেদের বাড়ির বাইরে। তুলসীব দেওযা নামের গুণই ঐ। কি কবে যে ওব দেওয়া ডাকনাম লোকেব আসল নাম ছাপিয়ে ওঠে বোঝা শক্ত। এতো তবু ভাল; এ হচ্ছে তুলসীর ভালবাসার দান। কারও উপর বেশী চটা থাকলে, সে তার নাম বদলাত না। শুধু বলত যে, দাঁড়া ও বেটাকে অপয়া ডিক্লেয়ার কবতে হবে। যেমন কবেছিল ও নলিনীবাবুকে এব বছব চারেক পরে। নিয়মিত স্কুলে যাবাব বাধ্যবাধকতা ছিল না তুলসীব কোনদিনই। পয়সাব দরকাবও তার বারোমাস। তাই সে একবার মণ্ডলদের গোটাকযেক আম গাছ জমা নিয়েছিল, ধারে। সেই গাছতলার মাচাতে গরমের ছুটির দুপুরে পিলেরা কয়েকজন গল্পগুজব করত, আম পাহাবাবত তুলসীকে সঙ্গ দেবার উদ্দেশ্যে। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত নলিনীবাবুর মনে হয় যে তাঁদের কুয়োতলাব বউঝিদের দেখবার জন্য বখাটে তুলসীর দল এখানে এই উঁচু মাচায় বসে জটলা কবে। তাঁব সন্দেহ অমূলক। তা' ছাড়া ছেলের দলের তখনও সে বয়স হয়নি। নলিনীবাবুকে আসতে দেখে সবাই মনে করেছে যে তিনি আসছেন আম কিনতে। অভিযোগ শুনেইতো সকলের চক্ষুস্থিব। তুলসী চেঁচামেচি করেনি; ঝগড়া করেনি; কেবল বলেছিল "দেখুন নলিনীকাকা, আমরা পাজি হতে পাবি, কিন্তু বদমাইস নই।" ছোট্ট কথাটি; কিন্তু তুলসীর প্রকাশভঙ্গী এত অপূর্ব যে এর অর্থ পরিষ্কার বুঝতে কারও কষ্ট হয়নি। নলিনীবাবু আমতা আমতা কবে ফিরে গিয়েছিলেন। বিপদের মুখে কি বলা উচিত, কি করা উচিত, সে কথা ভেবে নিতে তুলসীর এক মুহূর্তও সময় লাগে না। "ওটাকে শায়েস্তা করতে কতক্ষণ! দাঁড়া ওটাকে আজই অপয়া ডিক্লেয়ার করছি।" সেইদিনই ফুটবল মাঠে প্রথম সবাই লক্ষ্য করল যে নলিনী ঘোষের নাম নিলে পেনাল্টি শট্‌এও গোল হয় না। তাবপর থেকেই এই নাম জেলার ক্রীড়ামোদী লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, এবং

আজও টিকে আছে ফুটবল মাঠের বাইরের জীবনেব অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও, সবচেয়ে অলুক্ষণে শব্দ হিসাবে।

বদনাম দিয়ে নয়, এইরকম নাম দিয়ে কাউকে জব্দ করবার আর্টে তুলসীর সমকক্ষ ভূভারতে কেউ ছিল না। কিন্তু সেই কলাচুরির দিনে তুলসীর এই নিজস্ব অস্ত্র দিয়েই হারিয়ে দিয়েছিলেন তাকে নতুনদিদিমা। সেদিন প্রথম নতুনদিদিমাকে একেবারে অন্যবকম ভাল লেগেছিল। বড়দেব মধ্যেও একজন "ভীষণ আমাদের সাইডের" লোক থাকতে পারেন, এ ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। আর এই মানুষকে এতদিন বড়দের 'সাইড'এ ভেবে, ফাঁক পেলেই প্রত্যহ ঠিকেদারবাবুর বাড়ির বাইবেব টিউবওয়েলটা ঘটাং ঘটাং করে চালিয়ে দিয়ে এসেছে তাদের জ্বালাতন করবার জন্য। নতুনদিদিমাব চীৎকার শোনা গেলে তবে তারা পালিয়েছে।

এখন নতুনদিদিমাকে মনে হয় আপনাব লোক। দিদির সঙ্গে এরই মধ্যে গল্প করা হয়ে গিয়েছে তাঁর কথা। দিদিও বলেছে যে নতুনদিদিমা ভাবি মজার মজার কবে ডাকেন সকলকে। "ও নলিতে চাঁপাকলিতে!" "ও ছেলেটা!" "ওরে তোরা!"—আবও কতরকম করে। মজার মজাব গল্প কবে একেবারে হাসিয়ে মারেন। পিলের সঙ্গেও তাহলে দিদির মতেব মিল হয় কোন কোন বিষয়ে।

পিলে তুলসী দুজনেরই ইচ্ছা নতুনদিদিমাদের বাড়ি খেলা করতে যায়। কিন্তু সে বাড়ির উঠনে মেয়েরা আর ছোট ছেলেরা খেলা করে। সেখানে হঠাৎ খেলতে যাওয়া আরম্ভ কবতে তাদের পৌরুষে বাধে। তারা এখন বড় হয়েছে; কাপড় পরে। গান শোনানোর জন্য তুলসীকে যেতে বলে দিয়েছিলেন তিনি সেদিন। এই সূত্রে তুলসীর যাওয়া চলে বটে; কিন্তু একলা যেতে লজ্জা কবে। পিলেটা যে গান জানে না। তুলসীর ইচ্ছা, পিলেই যাবার কথাটা তোলে। পিলে তা তুলবে কেন? গান শোনানোব সূত্রে যেতে হলে তাকে যেতে হয়। তুলসীব লেজুড় হিসাবে। তা'হলে ও একা গেলেই পাবে। দুজনেই দুজনেব মনের ভাব বোঝে। সেই ছোটবেলার পরিচয়ে দুজনে মিলে নতুনদিদিমাব কাছে হঠাৎ যাওয়া চলে না কিছুতেই, এত দিনের পর।

"একটা কোবাস গান শিখবি পিলে?"

পিলেদেব বাড়িব কারও গানের গলা নেই। তবে তার মনে মনে বিশ্বাস যে শিখলেই পাববে। তুলসীর গানের সঙ্গে সঙ্গে পিলে সুব মেলাতে চেষ্টা কবে প্রাণপণে। 'দিয়ে করতালি, নাচ হরি বলি' গানখানি। তুসলী যেই থামে অমনি পিলেও থেমে যায়; তবু মনে হচ্ছিল যে বেশ এসে গিয়েছে সুরটি। মনের একাগ্রতায় গানখানি মুখস্থ হয়ে যায় তখনই। তুলসী বলল "এতেই হবে। একদিনেই কি আর বাবার মত ওস্তাদী গান শিখে যাবি নাকি? রায়বাহাদুরের বাড়িব বউভাতে তাঁব নাতিরা যে গেয়েছিল, তার চেয়ে তোর ঢের ভাল হচ্ছে। মনে আছে না গানটা?—জনসন মহোদয, সমাগত এ সভায়, দয়া করি এসেছেন শ্রীদেওনন্দন।—ঐ গানেই কি ক্ল্যাপ্ পেয়ে গেল মাইবি, ম্যাজিস্ট্রেট আর জজসাহেবের কাছ থেকে!"

গভীর আত্মপ্রসাদের মধ্যে পিলের গানের মহলা শেষ হল। কিন্তু একেবাবে গান করতে যাচ্ছি বলে কারও বাড়িতে তো হুড়মুড় করে ঢোকা যায় না! দুটি মনের এক রকম অব্যক্ত সহযোগিতায়, দুজনেই দুজনের মনের কথা ঠিক ধরতে পারছে।...তুঁতগাছটার তলা থেকে তারা তুঁত কুড়িয়ে নিল কোঁচড় ভরে! ঠিকেদারবাবুর পশ্চিমবাগানেব এই তুঁত গাছটা ছাড়া পাড়ায আর তুঁত গাছ নেই। অর্থাৎ পাড়ায় এমন কেউ নেই যে জানে না এ গাছটা কাদেব।

পিলে জিজ্ঞাসা করে "এ গাছটা ঠিকেদারবাবুদের নারে?"

"হ্যাঁ চল ওঁদের গাছের তুঁত খাব কিনা জিজ্ঞাসা করে নিই ওঁদেব বাড়িতে।"

এ গাছের ফল খেতে ঠিকেদারবাবুবা কোনদিন কাউকে বারণ করেননি। চিরকাল যার ইচ্ছা সেই খায়। অথচ নতুনদিদিমার কাছে যাবার একটা উপলক্ষ্য খুঁজে পেল ভেবে দুজনেই বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

ঢুকবার সময় দুজনেই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। তারই মধ্যেও তখন পিলে মনে মনে গানটিকে আউড়ে নেবার চেষ্টা করছে। নতুনদিদিমা শোবার ঘরের বারান্দায় শিউলিফুলের বোঁটার রঙে গুটলিদির শাড়ী রাঙিয়ে দিচ্ছেন। "কেরে? এ যে দেখি দুই 'গোস্ত' এক সঙ্গে।

হিন্দী 'দোস্ত' শব্দটিকে তিনি ঠাট্টা করে 'গোস্ত' বললেন।

তুলসী গম্ভীরভাবে আরম্ভ করল "একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম। তুঁত গাছটি কি আপনাদের?"

"হ্যাঁ, তারাদের। কেন?"

"ও গাছের তুঁত খাই আমরা?"

"খাবি না কেন? বেশী খাস না যেন—বড় পেট খারাপ হয় তুঁত খেলে। কোঁচড়ে কি রে? তুঁত? কোঁচড়ে ভরে নিয়ে এসেছিস জিজ্ঞাসা করতে? ও মা আমি কোথায় যাব! জিভ বার করতো দেখি দুজনে। ঐতো জিভ নীল। খেয়ে দেয়ে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিস?"

হেসে ফেটে পড়লেন তিনি! তবে এ ধরা পড়ায় লজ্জার কারণ নেই, সেকথা হাসির ধরন দেখেই বোঝা যায়। বরঞ্চ সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও হাসি আসে।

"তোদের কোঁচড়ের কাপড়েও যে দেখি রং হয়ে গেল তুঁত দিয়ে! ও রং কি আর উঠবে? শীগ্‌গির বাড়ি গিয়ে কেচে ফেল। আবার আসিস দুই গোস্ত মিলে।

দুই বন্ধুর এত ভেবেচিন্তে ঠিক করা হিসাব সব গুলিয়ে গিয়েছে। হতাশ হওয়ারই কথা। সেদিনকার গানের কথাটা নতুনদিদিমা একদম ভুলে গিয়েছেন নাকি? কিন্তু বাড়িব বাইরে এসে কেউ একথা তোলে না। এ বিষয় নিয়ে প্রাণখোলা আলোচনা করতে গেলে তাব যুক্তিসঙ্গত পরিণতি, আর এ বাড়িতে না আসা। সেটা কেউই চায় না। দুই বন্ধুকে আবার আসতে বলেছেন সেইটাই বড় কথা—একমাত্র কথা। "হাঃ হাঃ! গোস্ত টোস্ত দিয়ে এমন এমন কথা বলেন মাইরি, যে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যায়।"

কেউ মনের মত কথা না বললেও তবু তাঁকে খুব ভাল লাগতে পারে, এ জিনিসের অভিজ্ঞতা তাদের এই প্রথম।

এর পর, অর্থাৎ ঠিকেদারবাবুর বাড়ি তাদের যাতায়াত বেশ সহজ হয়ে আসবার পর, নতুনদিদিমার হঠাৎ চটে যাওয়ার বকুনিগুলো খুব ভাল লাগত। এ একটা নতুন খেলার মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল পরে। হয়তো পিলে ও'দের ঘরের মশারির দড়িটাতে হাত দিয়েছে অন্যমনস্ক ভাবে। অমনি তিনি চটে উঠেছেন, "আবার ওটার রাশে লাগলি কেন?" কোথায় অপ্রস্তুত হবে, তা নয় তিনজনই এক সঙ্গে হেসে ফেলে। এক সঙ্গে হাসির মধ্যে দিয়ে তিনজনে কত কাছে এসে যাওয়া যায়। হয়তো জলখাবার খেতে দিয়েছেন। বাঁ হাতে গেলাস নিয়ে জল খেতে হাত এঁটো হয় বলে তিনি খুব রাগ করেন। তবু তাঁকে চটাতে হবে, শুধু তাঁর বকুনিটা উপভোগ করার জন্য। পিলেরা ভালভাবেই জানে যে এরাগ সত্যিকারের রাগ; তাদের খুশী করবার জন্য কপটক্রোধ নয়। এঁটোকাঁটার ব্যাপারে পান থেকে চুন খসলে তিনি অন্তর থেকে বিরক্ত হন; কিন্তু খেলা—খেলা!

...আর এই পরের ছেলেদের উপর কি সত্যিকার চটে থাকা যায়! এত 'ভাবভালবাসা' এদের! বকলে পরে এমন দুষ্টুমি করে হাসবে যে চেষ্টা করেও তুমি হাসি চাপতে পারবে না। বল্লো। এইসব ছেলেমেয়েরা যে তাঁর টানেই আসে; তাঁকে কত ভালবাসে; নতুনদিদিমা বলতে অজ্ঞান। এদের দোষত্রুটিগুলোর সঙ্গে নিজের মনকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্যে বেশ একরকমের আনন্দ আছে না?...

দেশনঠাকুরুণ 'এদের সংসারে' আসবার পর থেকে এক বিশাল বিরোধের সঙ্গে নিজেকে

খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে চলেছেন অষ্টপ্রহব। তাঁর কাছে, এই ছেলেপিলেদের "অনাচার-মনাচারগুলোর" সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওযানর চেষ্টাটুকু একটা বিলাস মাত্র।

..."অন্যকে বোঝাই কি করে! বারব্রততে উপোস করায় একরকম আনন্দ আছে না? এও সেই রকম। কিছু পেলে যে দিতেও হয়। কেবল পাওয়া, কেবল পাওয়া, তা' কি কখনও হয় সংসারে? বরের দেওয়া ভাতকাপড়ের পর্যন্ত দাম দিতে হয় হাঁড়ি ঠেলে।...এই ছোঁড়াকেই দেখ না। একদিন যদি গন্ধপাতা কিম্বা গন্ধবামুন বলে না ডেকছ অন্তত একবারও অমনি মুখ হয়ে উঠবে হাঁড়ি—এই এতখানি! এত ছেলেমেয়ে তো আসে আমার কাছে নিত্যি তিরিশ দিন; একদিন তুই না ব'লে তুমি বলতো কাউকে, অমনি ফাটাফাটি লেগে যাবে। খেলাধূলা মাথায় চড়বে। এই মনটুকুইতো আসল। ভাত-কাপড় তো দাসীবাঁদীতেও পায়। সেই ভাত-কাপড়ের দাম দিতে দিতেই জীবন গেল।"...

যত ছেলেমেয়ের দল নতুনদিদিমার ওখানে যেত, তাদের সকলের মধ্যেই চেষ্টা ছিল বেশি কবে তাঁর নজরে পড়বার, আর ভালবাসা পাবার। যখনই বয়সে বড় কাউকে ঘিরে ছোটদের দল দানা বাঁধে, তখনই বোধ হয় ছেলেপিলেদের মধ্যে এই রকম হয়। তিনি যখন গল্প বলেন তখনও রেষারেষি চলে, কে সবচেয়ে জোরে হুঁ ব'লে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে বেশি। এত বড় সংসার দেখনঠাকরুণের মাথায়; বিকাল বেলায় তাঁর অনেক কাজ। তারই ফাঁকে-ফাঁকে চলে ছেলেপিলেদেব সঙ্গে হাসি-গল্প-খেলা। একটা কাজ সেরে এসে পাড়াতেই খেলার উৎসাহ যায় বেড়ে। ভাঁড়ার ঘরেব বারান্দায় ডাল ঝাড়তে ঝাড়তে উঠনের দিকে তাকালেই নিকার-বকার পরা বুধুবাবু দুটো ডিগবাজি খেয়ে নেয়। "চুলে ধূলো লাগালি তো আবার?" এই কথাটুকুতেই খুশি বুধুবাবু।

পুঁটির একবার ঠিকেদারবাবুর উঠানে পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে পা মচকে যায়। রটে গেল—পা একেবারে ভেঙ্গে দু টুকরো; ও মেয়ের এখন বিয়ে হ'লে হয়। পাড়ায় এ নিয়ে খুব হই চই। ঠিকেদারবাবুর বাড়িতে ছেলেমেয়েদের খেলতে আসা বন্ধ হয়ে যায়। দিনকয়েক পর একটি দুটি করে আবার তারা আসতে আরম্ভ করে। "আবার এসেছিস! বারণ করেছি না! আর তোরা আসিস না বলছি।" অত টুকু-টুকু ছেলেপিলেরাও বোঝে যে, একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে পুঁটিদির ঠ্যাং ভেঙে যাওয়া নিয়ে। তাই নতুনদিদিমা সত্যিকারের বকছে। রাগ করেছে। পুঁটিদিটা একটা যা-তা একেবারে! এমন করে পা ভাঙানোর কি দরকাব পড়েছিল?...

এদের ফিরে যেতে দেখে দেখনঠাকরুণের দুঃখ হয়।...বড় বেশি কড়া হয়ে গিয়েছে তাঁর কথাগুলো।...কচি কচি মুখগুলি একেবারে শুকিয়ে উঠেছে! এরা কিই বা বোঝে, কিই বা জানে।...

"ওরে তোরা! শোন! তোদের মা-বাবা এখানে খেললে বকবে বলে আমি বললাম, বুঝলি?"

"না, আজকে তো মা বকেনি।"

'নাও! হ'ল! এদের কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়?

"আজ বকেনি তো মা, কবে বকেছে রে? কাল?"

ত্রস্ত মুখগুলোয় ফুটে ওঠে বিস্ময়।...বলার সুরটা যেন অন্য রকম অন্য রকম লাগল।. .একেবারে চেনা নতুনদিদিমার।...ঐতো। মুখ গম্ভীর হ'লে কি হয়; চোখ দিয়ে হাসছেন!

মজার কথা বলেছেন নিশ্চয়।

হাসির বন্যায় জমাট থমথমানি কোথায় ভেসে যায়। 'ও ললিতে, চাঁপাকলিতে।' আবার আরম্ভ হয়ে যায় সাবেক দস্তুর।

...যে আসতে দিতে না চায় সে নিজের ছেলেমেয়ে আটকাক গিয়ে।...একেবারে খাঁ খাঁ করত বাড়িটা এ কয়দিন।...'ভাব-ভালবাসা' কি এমন করে উড়িয়ে দেওয়া যায়?...

এরপর যেদিন পুঁটি প্রথম এল এ বাড়িতে, সেদিন দুজনকে জড়িয়ে ধরে সেকি কান্না!

নতুন দিদিমার কথা কি মিষ্টি। শুধু মিষ্টি নয়, নতুন ধরনের। বাংলাদেশের লোকে হয়ত এর মাধুর্য ধরতে পারবে না। কিন্তু পিলের জন্ম বাংলার বাইরে। তারা অন্য রকম বাংলা কথায়

অভ্যস্ত। সে ভাষা হয়ত বইয়ের সঙ্গে বেশি মেলে, কিন্তু তার সুর হিন্দীর; ভঙ্গী আড়ষ্ট। তাই নতুন দিদিমার কথার সুরে তাদের চমক লাগে। কখনও বাংলাদেশ দেখেনি ব'লে তারা লজ্জিত। বাধ্য না হলে এ কথা তা'রা কারও কাছে স্বীকার করতে চায় না।

"পিলে তো দেশ দেখেই নি। হ্যাঁরে গন্ধপাতা, তুই গিয়েছিস তোদের দেশে!"

তুলসী কুণ্ঠা ঢাকবার চেষ্টা করে বলে, "আমি যখন মায়ের পেটে, তখন মা দেশে গিয়েছিল।"

"তবে তো তুই মায়ের পেটে চড়ে দেশে গিয়েছিস। পিলেটাই গেল হেরে দেখছি।"

মরমে মরে যায় পিলে, এই দুর্ভাগ্যে। কিন্তু এমন মিষ্টি করে, মায়ের পেটে চড়ে দেশ দেখবার কথা, নতুনদিদিমা ছাড়া আর কেউ কি বলতে পারে? একবার মনে হয় তুলসীকে ঠাট্টা করলেন; আবার মনে হয়—না তো! সত্যিই তিনি তুলসীকে উঁচুতে জায়গা দিয়েছেন! তুলসীই সমস্যাটি সমাধান করে দিল।

"ভাল হবে না বলছি! চালাকি করে আমায় 'আপ' (up) করা হচ্ছে।"

তিনজনের হাসির মধ্যে দিয়ে তখনকার মত কথাটি শেষ হ'ল। এমনিই হয় প্রত্যেক প্রসঙ্গে।

আর এই সব হাসি-ঠাট্টার মধ্যে মধ্যে যখন-তখন তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে নিজের দুরদৃষ্টের কথা।..

হয়তো হঠাৎ বৃষ্টি এল। ছেলেমেয়েরা উঠানের খেলা ছেড়ে তার ঘরে উঠে আসে। নতুন-দিদিমা তাদের সঙ্গে সুর মেলালেন "শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।" তারপর মেয়েদের বললেন "শিব পুজো করবি। কিন্তু খবদ্দার শিবের মত বর চাস না; বরং চাইবি কেষ্টঠাকুরের মত। নইলে আমার মত বুড়ো বর জুটবে। কি ধবধবে ষাঁড়টা দেখেছিস শিবঠাকুরের, আর কি তেজীয়ান।" ঘরের দেওয়ালের গঙ্গাবতরণের ছবিটির দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে। বুড়ো বর থাকবার জন্য লোকের কাছে তার সঙ্কোচের ভাবটা এত প্রবল ছিল যে, কথা বলতে বলতে তিনি ভুলে যেতেন, ছোট ছেলেমেয়েরা ও বিষয় নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না।

তাঁর ভালবাসা নিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে কাড়াকাড়ি চলত, পিলেও প্রথম দিন থেকেই সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। ছেলেপিলেরা যখন-তখন হিসাব করে নতুনদিদিমার ভালবাসা পাওয়ায় কে 'ফাস্', কে 'সেকেন', কে 'থাড়', কে 'ফোর'। পিলেও এইরকম হিসেব করে; বাচ্চাদের মত চেঁচিয়ে নয়; মনে মনে।...নতুনদিদিমার চোখে তুলসী 'ফাস্ট', সে 'সেকেন', গুট্‌লিদি' 'থাড়', কেষ্ট 'ফোর', তারাদা 'লাস্ট'। ক্ষীণজীবী লোকদের বোধ হয় মনের এই দিকটা জ্বালাতন করে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু একথা বাইরে প্রকাশ করতে পিলের স্বাভাবিক সঙ্কোচ ছিল। ছোট ছেলেপিলেরা অপরের নামে নালিশ ক'রে তাঁ'র কাছে নিজের উৎকর্ষের দাবি জানায়; বড় মেয়েরা বন্ধুদের নিন্দা ক'রে তাঁর কাছে আসবার চেষ্টা করে। পিলে কি তা' করতে পারে? পিসিমার কাছে কেঁদে জেতা যায়; কিন্তু সে জিনিস বাড়ির বাইরে অচল। রাগ করা যায়, কিন্তু দেখানো যায় না। কেননা, তোমার রাগ এখানে কে পোঁছে? রাগের কথা বলে ফেললে হয়তো নেণ্ডিগেণ্ডিগুলো সবাই ফ্যাকফ্যাক করে হাসবে অথচ কিছু না ব'লে রাগ করলে নতুনদিদিমা পর্যন্ত বোধহয় বুঝতেই পারবেন না যে সে চটেছে। বেমানান কিছু করতে পিলে ভয় পায়। নতুনদিদিমা আবার কি ভাববেন ভেবে লজ্জা লজ্জা করে। পৃথিবীসুদ্ধ সবাই যে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে; তার আচরণের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির উপর লক্ষ্য রেখেছে। তুলসীর এসব কুণ্ঠার বালাই নেই। জোর করে অধিকার আদায় করতে হয় কি করে, তা' সে জানে।

পাড়ার কোন মেয়ে হয়ত বাপের বাড়ি এসেছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে এলেই মেয়েরা নতুনদিদিমাকে পেয়ে বসে। শ্বশুরবাড়ির গল্প, বরের গল্প, বরের চিঠি দেখানো ইত্যাদির দাবিতে তাঁকে একেবারে একচেটিয়া ক'রে নেয়। এ গল্প পেলে নতুনদিদিমা আর কিছু চান না। এই সময়

পিলেবা কেউ তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত মনোযোগ পাবে না, এ একেবারে জানা কথা। খুব খারাপ লাগে। এই খারাপ লাগাটা পিলের বাইরে প্রকাশ করতে বাধে। কিন্তু তুলসী সে অবস্থায় নিশ্চযই নতুনদিদিমাকে শুনিয়ে বলবে, "চলরে পিলে! এখন ওরা বর-ফবেব গপ্পো জমিয়েছে দেখছিস না?"

"হবেরে হবে। তোদেরও টুকটুকে বউ আসবে একদিন। তখন ঘটিই বা কে, নতুনদিদিমাই বা কে।"

বলেন বটে একথা। কিন্তু তাদের বসতে বলেন না সেদিন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময় তুলসী জোরে শব্দ করে সদর দরজার কপাট বন্ধ ক'বে দেয়। জানা কথা যে, পবেব দিন আবার যখন এই উঠনে এসে ঢুকবে, তখন নতুনদিদিমা বলবেন, "বদবামুন-সাহেবের কাল যে বড় ফটফটিয়ে চলে যাওয়া হ'ল?"

"না, যাবে না তো কি!"

"উরে বাবা! দেখি দেখি, চটলে কেমন দেখায় গন্ধবামুনকে। গন্ধপাতাব মাথার গন্ধটা একটু শুঁকি।"

ইচ্ছে থাকলেও পিলে পারে না তুলসীর মত জোর ক'বে অধিকার নিতে।

তুলসীরা যাকে বলত, 'বর-ফবেব গপ্‌পো', নতুনদিদিমা তাকে বলতেন 'প্রেম-ভালবাসাব গপ্‌পো'। বড়দের। তাব মধ্যে ছোটদের থাকতে নেই। বাপেব বাড়িতে-আসা পাড়ার মেয়েদের বেলা যে নিয়ম, শ্বশুরবাড়িতে-আসা পাড়ার জামাইদেব বেলা নিয়ম ঠিক তাব উল্‌টো। তাঁরা শ্বশুববাড়িতে এলে প্রত্যহ নতুনদিদিমাব সঙ্গে গল্প কবতে আসতেন আর সেই সময পিলেদেব বাবণ কবা দূরে থাক, তিনি চাইতেন যে, তাবা সেখানে থাকুক। এখানকাব গল্পও তো সেই "বর-ফর" এরই বেশি। তবু কেন মধ্যে বসা বারণ নয়, এ প্রশ্ন পিলেকে অনেকদিন পীড়া দিয়েছে। তুলসী বুঝিয়েছে—"নাতজামাই যে বড় রে, তাই থাকতে বলে।" পিলে তবু ঠিক বুঝতে পারে না। বড় তো কি হ'ল? নতুনদিদিমা যখন নাতজামাইয়েব সঙ্গে নাতনীর চিঠি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা, আর অনেক 'বর-ফর' এর গল্প করেন, তখন পিলে জোর ক'রে হাসি চেপে থাকে। তুলসী কিন্তু সমানে তাল দিয়ে যায়; হো হো ক'বে হাসে; এর জন্য নতুনদিদিমা বিরক্ত হন না কেন, সেই কথা ভেবেই পিলে অবাক হয। পাড়া সম্পর্কে নাতজামাইয়েব ভিতর জনকয়েক ছিলেন প্রৌঢ়গোছের—বেশ কাঁচাপাকা গোঁফওয়ালা। তাঁদেব পর্যন্ত তিনি অনাযাসে "তুই" বলতেন। বুড়ো স্বামীর ঘর করতে করতে বয়সেব ব্যবধানজনিত আড়ষ্টতা যে কোন অবস্থায কাটিয়ে উঠবার একটা স্বচ্ছন্দ ক্ষমতা আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁব।

..."তুমি-আপনিতে কি আব গপ্‌পো জমে! অমন ওষুধগেলা ওষুধ গেলা গপ্‌পো আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এসেছ, বেশ, না আসতে তাও বেশ;—এমনি ভাব নিয়ে যাবা কথা বলে, তারা সম্বন্ধ রাখে তুমি-আপনির।"...

এমন হাসিখুশি নতুনদিদিমার সঙ্গে 'তুই'-এব সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ খাপ খায না। আর সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে যে, নিজেদের দেশে ঠিকেদারবাবুর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে শাশুড়ীরা জামাইদের সঙ্গে কথা বলতেন না। নতুনদিদিমা নতুন-বউ হয়ে এ বাড়িতে আসেন, তখন ঠিকেদারবাবু তাঁকে রায় বাহাদুরের জামাই-এর সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন। তিনি কিছুতেই যাবেন না জামাই-এর সম্মুখে লজ্জায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীর বকুনিতে তাঁকে কথা বলতে হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে-র সম্বন্ধটাই এমন যে, একজন আর একজনকে যত দূর যাবার অধিকার দেয়, সে ঠিক তার চেয়ে আরও অল্প খানিকটা এগিয়ে যায়। কিন্তু বেশী দূর নয়। সওয়া চাই। অধিকাংশ মেয়েরই একটা সহজ ক্ষমতা থাকে বুঝবার যে, ঠিক কতদূর পর্যন্ত সইবে। দেখন-ঠাকুরণেরও বুঝতে ভুল হয়নি। বয়স নির্বিশেষে পাড়ার সব জামাইদেব সঙ্গে স্ত্রীর হাসি-গল্পে ঠিকেদারবাবু খুশি হতেন কিনা জানা নেই; তবে তিনি একদিনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি।

..."বরের সঙ্গে 'প্রেম-ভালবাসা'র সম্বন্ধ কা'কে বলে তা'ও কোনদিন জানিনি আর আদর-আবদার-শখ-শৌখিনের অধিকার নেবার ইচ্ছাও কোনদিন ছিল না।"...

তাই বুঝি তাঁর মনের ঝোঁক গিয়েছিল অন্য কতকগুলো অধিকার নিতে। এরজন্য মন রাখতে হয় সজাগ। স্বামীর আচরণের খুঁটিনাটিগুলোর মধ্যে থেকে বেছে বেছে নজির হিসাবে কতকগুলোকে মনের মধ্যে জমিয়ে রাখতে হয়। স্বীকৃত অধিকারগুলোকে মরচে ধরতে দিতে নেই। ঠিক তার পরের অধিকারগুলো পাবার জন্য চেঁচামেচি করতে নেই; সেটাকে নিয়ে একেবারে ভাতডাল ক'রে ফেলতে হবে, অপর পক্ষ আপত্তি জানাবার সুযোগ পাবার আগেই। তারপর তার কানে কথাটা তুলতে হবে অতি সহজভাবে। ঢাকঢাক গুড়গুড় কিংবা আড়ম্বপনা দেখিয়েছ কি গিয়েছ! এই ছিল দেখন-ঠাকরুণের রণকৌশল।

একদিনের কথা। গুটলিদের এক বন্ধুর মা আর বাবা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছেন, ঠিকেদারবাবুর পরিবার বাড়ির মধ্যে এত জোরে জোরে হাসিগল্প করেন যে, এক মাইল দূরের লোক শুনতে পায়। বন্ধুর কাছ থেকে জেনে এসে গুটলিদি সে কথা মায়ের কাছে বলেছে। তা'র কিছুক্ষণ পরই পিলে গিয়েছে নতুনদিদিমার কাছে। ঠিকেদারবাবু শোবার ঘরের বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন।

"শুনেছিস তো পিলে পাড়ার লোকের কথা? আমি নাকি চীৎকার ক'রে পাড়া মাথায় করি। জোরে কথা বললে বাড়ির-মানুষ কিছু বলেন না; যত মাথাব্যথা পাড়ার লোকের।"

আসলে কথাটি পিলেকে শোনানোর জন্য নয়, ঠিকেদারবাবুকে শুনিয়ে রাখবার জন্য; যা'তে তিনি বাইরে থেকে আবার কিছু শুনে এসে, একটা স্বীকৃত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করেন। এমন সময়ে, এমন ভাবে, পিলের কাছে বলা যে, স্বামী এ সম্বন্ধে এখন কিছু বলতে পারবেন না, তা'ও সুনিশ্চিত।

এই ছিল তাঁর অধিকার বজায় রাখবার পদ্ধতি। এই সমস্ত ব্যক্তিগত অধিকারগুলোর সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সজাগ। কিন্তু স্বামীর মনের উপরের কিংবা 'তারার মায়ের সংসার'-এর উপরের দাবিগুলোর সম্বন্ধে তিনি দেখাতেন একটা নিস্পৃহতা। এই দিকটাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে তাঁর আত্মসম্মানে বাধতো। অন্যের গোছানো সংসার তিনি পেয়েছেন; কথাটি মনে করবার মধ্যেও খানিকটা আত্মগ্লানি আছে। সেইজন্য তিনি একে বলতেন, "তারার মায়ের সংসার", "এদের সংসার", "তারাদের বাড়ি"। এ সংসারকে নিজের বলে স্বীকার করতে তাঁকে কেউ কোনদিন শোনে নি। অন্য লোকদের শুনিয়ে বলবার জন্য প্রথম জীবনে এরকম বলতে আরম্ভ করেছিলেন; পরে অভ্যাসে এমন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল যে, দরকার পড়লেও "আমাদের বাড়ি" কথাটি ব্যবহার করতে পারতেন না, এখানকার সংসারের সম্বন্ধে। রেলগাড়ির অপরিচিতা সহযাত্রিনীর সঙ্গেও তিনি গল্প করতেন "তারাদের বাড়ি'র। তাঁর কাছে "আমাদের বাড়ি"র মানে ছিল বাপের বাড়ি।

..."বড় ছেলের কথা বাদ দাও। সে তো মনে করতেই পারে যে, তার মায়ের সংসারের উপর কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে ব'সল। এ আপদ বিদায় হওয়ারও নয়—অন্তত যতদিন বাপ বেঁচে আছে; কিন্তু যে লোক বিয়ে ক'রে আনলো, তার মনের সুদ্ধ খিচ্ গেল না! এদের সংসারে আসবার কিছুকাল পর নজরে পড়ল বাড়ির-মানুষের আলমারির পিছনের দেওয়ালে। কি রে! কাপড় দিয়ে ঢাকা দেখি! আমার আবার সব জিনিস খুলে দেখা বাতিক। পুরনো বাক্স-পেটরা ঘাঁটকাতে আমার খুব ভাল লাগে। এক ভাদ্দরে বাবার গরমজামা রোদ্দুরে দিতে গিয়ে পকেট থেকে একটা সিকি পেয়েছিলাম; সেই থেকেই হবে বোধ হয়। এই দ্যাখ্, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় এলাম। আলমারির পিছনের কাপড় সরিয়ে দেখি, তারার মায়ের ছবি—গয়নাগাঁটি-পরা ফটোগেরাপ। সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে বেশ গিয়েছে সে মানুষ। বুঝি যে আমাকে লুকনোর জন্যই বাড়ির-মানুষ ওখান অমনি ক'রে টাঙ্গিয়ে রেখে দিয়েছেন। আমি বলি, তা' কেন হবে? ছবিখানিকে এনে বাড়ির-মানুষের খাটের মাথার কাছে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম ভাল করে। কাউকে জিজ্ঞাসাও করিনি কিছুই না। চারটি চারটি খেতে দিচ্ছ সে-ই ঢের। এ না দিলেই বা কি করতাম? হিংসে করি না তারার মাকে। মুছে দিতে

চেয়েছিল এ-বাড়ির-মানুষ তা'কে মরবার সঙ্গে সঙ্গেই! পেরেছে? কিন্তু ঝাঁটা-মারি তা'র বরাতেও! হাড়েহাড়ে চিনেছি এই ব্যাটাছেলেদের। আমি মরলেও অমনিই ক'রত তো! আমি কি পেয়েছি সেকথা যাক্—আমার কথা বাদই দাও। আমার আগে যে মানুষ সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে ভেবে গিয়েছে যে খুব পেয়েছে, সে-ও পেয়েছে ছাই। এদের আদর সোহাগও বুঝি না; লাথিঝাঁটাও বুঝি না।...যাক্। গুটলিকে সেইদিনই ব'লে দিলাম—'তোদের মায়ের ছবিতে রোজ ফুলের মালা দিবি বুঝলি!' গুটলি কাঁদে।

'কাঁদিস কেন? ও গুটলি, কেন কাঁদিস রে?''

''ভয় করে।''

ছবিতে ফুলের মালা দিতে তার ভয় করে। এর কি করবে বলো! তবে আমি, ত্রুটি রাখিনি কিছুর। 'তুল্যের তুল্য' ক'রে দিয়েছি। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে পাড়াসুদ্ধ লোকের নজর রয়েছে ছেলেমেয়ের সঙ্গে ব্যবহারে আমার খুঁত ধরবার দিকে। বাড়ির-মানুষের কথা তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভেবেছি ছেলেমেয়েরা যেন বড় হয়ে কোনদিন বলতে না পারে, আমার কাছ থেকে নিজের মায়ের ব্যবহার পায়নি। বলবে কি? সব মনের মধ্যে লেখা আছে। বলুক তো!

এইদিন দিন নয়, আরও দিন আছে,
এই দিনকে নিয়ে যাব সেই দিনের কাছে।

সে সময়-সুযোগ যদি কোনদিন ভগবান দেন তো দেখিয়ে দেবো।

নতুনদিদিমার এখানে আসবার সময়ের কথা বলতে গিয়ে, পিসিমা এখনও বলেন, ''মানুষটা এসেছিল সাদা। ছোট তো তখন। হাবা-হাবা গোছের। গেলেই আগেকার বউয়ের কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করত। একদিন হয়তো জিজ্ঞাসা করল, তারার মায়ের সাবিত্রী ব্রত উদ্‌যাপনের দিন, তারার বাবা কি বলেছিলেন, কি করেছিলেন? অত কি মানুষের মনে থাকে!...''

আসলে কিন্তু এটা নতুনদিদিমার নির্বুদ্ধিতা নয়। তিনি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে চান যে স্বামীর কাছ থেকে যেটুকু পাচ্ছেন, আগের স্ত্রীও কি সেই জিনিসই পেয়েছিলেন? কম পেলেও দুঃখ; সমান পেলেও মনে হয় লোক-দেখানো। তারার মায়ের আগেও যে আর একজন ছিলেন! স্বামীর আদর-সোহাগ প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে একই রকম। প্রত্যেকেই হয়ত পাবার সময় ভেবেছে যে, এটি তার নিজস্ব প্রাপ্য! এই ঠাট্টাটি, এই ডাকনামটি স্বামী তাঁরই জন্য তয়ের করেছেন। ভুল! এক বউএর পাওয়া তুচ্ছতম চোখের ঈশারাটুকুও অন্য বউরাও পেয়েছে। তাই সরকির কোটাবুড়ি ভিখুয়ার-মাকে আজেবাজে গল্পের মধ্যে চালাকি ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে নেন, তারার মায়ের বড়ি দেবার সময় বাড়ির-মানুষ কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করতেন কিনা।...এঁটো ব্যবহার! গলায় দড়ি অমন পাওয়ার! ঘরের খাট-আলমারি রাখবার স্থান বদলে মনে হয়েছিল আক্রোশ তবু মিটলো কতকটা। নতুন পরিবেশে হয়ত পুরনো লোকটা একটু নতুন হ'ল। সেই খাট, সেই বিছানা! রাতে এক একদিন ভয়-ভয়ই করে!... তখন প্রথম-প্রথম কিনা!

...''তারপর তো ভাতডাল হয়ে গেল সব।'' কিন্তু সেই সময়কার অভ্যাসে, এখনও নতুনদিদিমা, মেজাজ খারাপ হলেই ঘর গুছতে বসেন।

পিলে বাংলাদেশ দেখল প্রথম দিদির বিয়ের সময়। ''বর-ফর''-এর ব্যাপার; তারা এ দূর দেশে আসতে চায় না। তাই বিয়ে হ'ল কলকাতা থেকে। তুলসী শিখিয়েছিল, মেয়েরা ব'লে কলকাতা; বেটাছেলেদের বলতে হয় ক্যালকাটা। ক্যালকাটায় দেখবার ট্রামগাড়ি, হাওড়ার পুল, চিড়িয়াখানা আর মিউজিয়ম। কিন্তু এগুলো তো একবার দেখলেই ফুরিয়ে যায়। তারপর শুধু গল্প করা চলে যে আমিও দেখেছি। পিলের আসল লোভ বাংলাদেশ দেখবার। আর কলকাতার আসল আকর্ষণ যে, সেখানে যেতে গেলে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশ! যেখানকার মুটে-মজুরও ফাইন বাংলা বলে, যেখানে ঘিয়ের রং হল্‌দে, যেখানকার মাছ ভাজতে গেলে গল্‌গল্‌

ক'রে তেল বেরয়, যেখানে সবাই গাবগাছ চেনে, যেখানে—বললে বিশ্বাস করবে না—চার বছরের ছেলেটা পর্যন্ত সাঁতার জানে! সেখানকার সম্বন্ধে আরও কত সময়ের কত শোনা কথার আকর্ষণ পিলের। সেখানকার সব ভাল; কিন্তু কলকাতা বাজে। সেখানকার বিয়েবাড়ির ছেলেরা পিলের বাংলা শুনে ঠাট্টা করে। মার্বেল খেলবার সময় "গাব্বুতে গুলি পেলা" কথাটি কেউ বুঝতে পারেনি। একজন বরযাত্রী সম্বন্ধে পিলে বলেছিল, "লোকটা বদ্‌মাস হচ্ছে"। তার সমবয়সী এক দূরসম্পর্কের ভাই শুনে হেসেই বাঁচে না।

"তোরা পশ্চিমে থাকিস কিনা, তাই জানিস না কথা বলতে। বলতে হয় 'লোকটা দুষ্টু'। হচ্ছে টচ্ছে নয়।"

মরমে মরে যায় পিলে; পশ্চিম না ছাই!

তবে মিছে কথা বলবে না; কলকাতায় গিয়ে তার এক অনেকদিনকার অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ হয়েছে। কাঁদাকাটি ক'রে পিসিমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে, সে একটা ডাব খেয়েছে! শুধু জলটুকু খেয়ে আস্ত ডাবটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, ওই দূরে! ঠিক খাঁটি বাংলাদেশের লোকরা যেমন ক'রে ফেলে। শাঁসটা খেতে ইচ্ছে করছিল; তাও খায়নি। 'নেয়াপাতি'র মত সুন্দর কথাটির মানে জানবার জন্য শাঁসটা দেখতে কি যে ইচ্ছা করছিল!...ক্যালক্যাটার কথা যেতে চাও; কিন্তু রেলগাড়িতে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে যাবার আর আসবার সময়? সে উদ্দীপনার কথা পিলে অন্যলোককে বুঝোতে পারবে না!...রামপুরহাট! রামপুরহাট! নামটিই অন্যরকম অন্যরকম। এসে গিয়েছে তা'হলে! কুলিতে বাংলা বলছে! বাইরে ফুটফুটে জোছনা, কিন্তু পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। তবু সে সারারাত গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। শুনে শুনে সব মুখস্থ; রাত্রে না দেখতে পাওয়াগুলোকে দেখতে পাচ্ছে মনে ক'রে কত আনন্দ! একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে অনেকগুলো; বিয়ে-টিয়ে হবে বোধ হয়। এমনি বাড়িতেই বোধ হয় খোকনবাবু বিয়ে করতে যায়। সঙ্গে হুলো বিড়াল নিয়ে। ওকি! জোছনার আলোতে দেখা গেল! ভুল দেখল নাকি? কুঁড়েঘর। আলপনায় আঁকা কুঁড়েঘরের মত! ধনুকের মত বাঁকা; মটকা, ছাঁচতলা দুই-ই! এরকম-ধনুকমার্কা কুঁড়েঘর যে সত্যি-সত্যি আছে সেকথা আগে ভাবতে পারত না। অথচ মনে হয় আগে যেন কোথায় দেখেছে। সেইরকমই চেনা চেনা...এসে গেল বর্ধমান! 'টিকি ধরে মারবো টান, উড়ে যাবি বর্ধমান।' 'বর্ধমানের রাঙামাটি, বুড়িকে ধরে ঘেঁচ করে কাটি।' রাতের বেলায় নাই-বা দেখা গেল এখানকার মাটির রং; কিন্তু এ যে লাল তা'তে সন্দেহ নেই!...করুক তো দেখি এসব খাবার পশ্চিমে! নতুনদিদিমা বলেন "পশ্চিমে পারে শুধু মজবুত আর টেকসই খাবার করতে। কি করবে বলো! যে দেশ যেমন, সে দেশ তেমন!"...গাড়িতে মুসলমানে পর্যন্ত বাংলা বলছে অনায়াসে। অদ্ভুত! ঐ বেঞ্চের ছেলেটি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের ইস্কুলে পড়ে। পিলেও যদি তার মত এখানকার ইস্কুলে পড়তে পেত। ও নিশ্চয়ই দাঁড় বাইতে জানে, আর হিজল গাছ দেখেছে। জিজ্ঞাসা করবে নাকি? ওর সঙ্গে গল্প করতে ভারি ইচ্ছে করছে। ওর কাছে নিজের পরিচয় দেবার সময় পিলে চেপে যাবে যে, তা'রা বাংলার বাইরের লোক। কিন্তু তার কথা থেকে যদি ধ'রে ফেলে! ভয়ে সে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করতে পারে না। এখানে মাস্টাররাও ইস্কুলে বাংলাতে পড়ায়! আচ্ছা ইস্কুলটা পাশ হয়ে নিতে দাও না; কলেজে পড়বার সময় সে নিশ্চয়ই বাংলাদেশে পড়বে!...সব জেনে নিয়ে দেখাবে মজা সকলকে একবার! বড় 'বরঞ্চ', 'আপাতত', 'নেয়াপাতি', দেখাতে আসে সকলে তা'কে!...

রেলগাড়িতে চড়লে বড় তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ ফুরিয়ে যায়। ফুরোবার সময় দুঃখ হয় বটে; কিন্তু তারপরই কতক্ষণে নিজেদের বাড়ি পৌঁছুব ভেবে মন উতলা হয়ে ওঠে। এ কয়দিনে কত বড় হয়ে গিয়েছে সে!—কত জেনেছে! নতুন দু'টো কথা শিখেছে—'ল্যাবা' আর 'ঘিন্টু'। তুলসী আর নতুনদিদিমাকে শুনিয়ে অবাক্ ক'রে দিতে হবে!...

বাড়ি পৌঁছে পিলে হতাশ হ'ল। তুলসী একজন নেপালীর সঙ্গে নেপালে গিয়েছে। লোকটার

বাবা যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, বছরে একবার ক'রে এখানে পেন্‌শন্‌ নিতে আসতো। তার সঙ্গে কি ক'রে যেন তুলসী আলাপ জমায়। সে তুলসীকে এখানে একদিন আড়মাছ-পোড়া খাওয়ার নেমন্তন্ন করে। পরদিন তুলসী বাড়িতে না ব'লে তার সঙ্গে নেপালে চলে যায়। এই হ'ল পাড়ার খাবার।

নতুনদিদিমার কাছ থেকে খবর পেল যে, তুলসীরা একদল উঠেছিল তাঁদের উঠনের পেয়ারা গাছে। সেই গাছের একটা ডাল গিয়েছে ঘুঁটেঘরের চালের উপর দিয়ে। "আমি কি জানি, কোন মূর্তিমান চড়ে আছেন গাছে। ইঁদারাতলা থেকে কানে এল মট্‌মট ক'রে খাপরা ভাঙবার শব্দ। সেখান থেকে চীৎকার করি—নেমে পড়। একটা পেয়ারা বাড়ির লোকে জ্বরো মুখেও চিবোতে পায় না, এই হনুমানগুলোর দৌরাত্মে। গাছ থেকে নেমে গন্ধপাতা চলে গেল। মুখ হুম্‌-ম্‌—এতখানি হাঁড়ি। পরদিনই শুনলাম নেপালীটার সঙ্গে চলে গিয়েছে। 'দাজু' পাতানো হয়েছে তার সঙ্গে। সাহস দেখ অতটুকু ছেলের। রাগ দেখ। যাবি, তা' বলে যা বাড়িতে। কি ছেলেই সব হয়েছেন। পান থেকে চুন খসবার জো নেই। রাগের মাথায় কি বলেছি জন্মযুগ ধ'রে সেইটাকে গিঁট বেঁধে মনের মধ্যে রেখে দিতে হবে? আছে তো সব জিনিসেরই একটা।"

তুলসীর ভয়ডর মোটেই নেই, এ কথা পিলের অজ্ঞাত নয়। পাঁচ মাইল দূরের বালুযামেলায় দশহরাতে রামলীলা দেখে, সে একা রাতদুপুরে হেঁটে ফেরে। আর পিলে? একবার পিসিমার অযথা বকুনির প্রতিবাদে সে বাড়ির পিছনের লিচুগাছের উপর লুকিয়ে বসেছিল। সন্ধ্যার পর আর সাহসে কুলোয় নি। তুলসী পরের দিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "অত তাড়াতাড়ি নেমে এলি কেন রে? গাছে খুব লাল পিঁপড়ে বুঝি? সেদিন যখন লিচু পাড়তে উঠেছিলাম তখন তো পিঁপড়ে দেখিনি।"

ভূতের ভয়ের কথা তুলসীর কাছে স্বীকার করতে লজ্জা করল পিলের। "একটা সাপের শব্দ পেলাম গাছে।"

"সাপে আবার গাছে শব্দ করে নাকি রে? তুই একটি ইডিযট। আর সাপে হ'লেই বা কি? লুকিয়ে থাকবার সময় কখনও সাপে কামড়ায়? চুরি করতে গিয়ে রাত্রে কোন চোরকে সাপের কামড়ে মরতে শুনেছিস?"

পিলে চুপ ক'রে গিয়েছিল। ভূতের ভয়ের কথা তুলসী সন্দেহও করেনি। সেইটুকুই বাঁচোয়া।

সেই তুলসীর নেপালে যাবার সাহস দেখে নতুনদিদিমা অবাক হতে পারেন, কিন্তু পিলে হয়নি। তুলসী যে কতদিন হেলে সাপের লেজ ধ'রে ঘুরিয়ে ম্যাজিক দেখায়। তবে সে নেপালে পালিয়ে গেল কেন? পিলের ক্যালক্যাটা আর বাংলাদেশ দেখবার গৌরব কমিয়ে দেবার জন্য সে নেপালে গেল নাতো? না। তা কেন হ'তে যাবে। বাহাদুরি দেখানোর ভাব সে তুলসীর মধ্যে কোনদিন দেখতে পায়নি তো। তুলসী নিজের খেয়ালে অনায়াসে যা কিছু করে, পাড়ার আর কোন ছেলে, বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করেও, সে রকম পারে না। সে চলে নিজের ঝোঁকে আগুপাছু না ভেবে, নতুনদিদিমাই ঠিক করেছেন। সে নিশ্চয়ই পেয়ারা খাওয়ার-বকুনিতে রাগ ক'রে চলে গিয়েছে। বাংলাদেশের গল্প করবার অর্ধেক উৎসাহ পিলের উবে গিয়েছে, তুলসী না থাকায়। নতুনদিদিমা যে বাংলাদেশের পোকা। তাঁকে আর সেখানকার নতুন কথা কি বলবে?—তবু পিলে লোভ সামলাতে পারে না।

"গেলই যদি, তবে নেপালের লাইনে না গিয়ে সাঁইতে' লাইনে গেলেই পারত।"

ব'লেই পিলে বোঝে যে, কথাটা একটু বিজ্ঞের মত হয়ে গেল। কিন্তু উপায় ছিল না। সাঁইতে নামটি কথার মধ্যে ব্যবহারের জন্যই এ প্রসঙ্গ তোলা। রেলগাড়ির সেই ছেলেটি সাঁইথিয়া ইস্টিশানে সাঁইতে বলছিল বারবার। নতুনদিদিমাকে পিলে জানাতে চায় যে, খাঁটি বাঙ্গালীর মত সে বাংলা কথা বলতে শিখে এসেছে এবার—একেবারে সাঁইতে টাঁইতে সব। সাইতে মাঠে মারা গেল। তিনি সেকথা কানেও তুললেন না।

"বর কেমন হয়েছেরে? বয়স কত? সত্যিই তো, তুই জানবি কি করে। জামাইষষ্ঠীর সময়

আসবে নাকি? নিশ্চয়ই দিদিকে নিয়ে যাবে যাবার সময়? তাদের জিনিস যত তাড়াতাড়ি নিয়ে যায় ততই ভাল। জামাই খুব হাসিখুশী—না? গোমড়ামুখো জামাইগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। রং কার মত? তোর দিদির মত হবে? ভাল হ'লেই ভাল। রায়বাহাদুরের ছোট নাতজামাই-এর কি রকম চোয়াড়ে চোয়াড়ে চেহারা দেখছিস তো? আচ্ছা বল, ঐ সুন্দর মেয়ের সঙ্গে কি ঐ জামাই সাজে? টাকা-পয়সাই কি জীবনে সব! মেয়ে দেখার এত ধূম—ছেলে দেখে না কেন লোকে! হ্যাঁরে নতুন জামাই তোর সম্মুখে দিদির সঙ্গে কথা ব'লল? খুব হাসি, খুব ফূর্তি। না? বেঁচে ব'র্তে থাকুক! একটু কচি কচি চেহারা না হ'লে কি জামাই মানায়। বেশ মানিয়েছে তো দু'জনে। মেয়ের মাথার উপর চার আঙুল লম্বা না হ'লে ঠিক মানানসই হয় না। এসব কি দেখে মা-বাপরা! একটা হ'লেই হল। বিয়ের পর ঠেকারে তোর দিদি বাড়ি থেকে বেরুবেই না বোধ হয়। আর এখন নতুনদিদিমাই বা কে, গুটলিই বা কে! এখন কি আর তারাদের বাড়িতে পা পড়বে! আজ সন্ধ্যায় যাব তোদের বাড়ি; দেখি শাঁখা-সিঁদুরে কেমন মানিয়েছে লিলিকে। এখন কথা ব'ললে হয় আমার সঙ্গে—নতুন বর পেয়েছে। গিয়ে যে দু'টো তার সঙ্গে ভালভাবে কথা ব'লব তারও উপায় নেই; তোর পিসিমা আগলে আগলে রাখে। ঐ এক ধরণের মানুষ! কেনরে বাপু, আমি কি তোদের হাঁড়ির খবর জানবার জন্য আকুলি বিকুলি ক'রে মরছি। যার যা রীত, না যায় কদাচিত।...ও কি আঙুলে আদা করছিস যে বড়? জ্বর আসছে নাকি? এদিকে স'রে আয়তো—দেখি তোর গা'টা!...হ্যাঁ! ভোজকাজের পর বাড়িতে এক প্রস্থ অসুখ-বিসুখ হবেই হবে! ওরে রামশরণা, এই খোকাবাবুকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আয়তো!"

জ্বর পিলের গা-সওয়া। এর জন্য দুঃখ নেই। আজকের মন্দার বাজারে, জ্বরের দৌলতে তার একটা মস্ত লাভ হয়েছে। 'আঙুলে আদা করা' কথাটি আজ সে প্রথম শুনল। একেবারে নতুনদিদিমাব দেশের কথা। পিসিমা জ্বর আসা বোঝেন তার রোদ্দুবে বসা দেখে; আর নতুনদিদিমা বোঝেন আঙুলে আদা করা দেখে। কত তফাত দু'জনে! উঠনের ঘটিটা সরিয়ে রাখবার সময় পিসিমা বলেন, "যা উটমুখো হয়ে চলবার ছিরি সকলের!" আর নতুনদিদিমা ঘটি সরিয়ে রাখবার সময় নিশ্চয়ই হেসে "মাও যা, ঘটিও তাই" বলবেন। তিনি ঠিকই বলেছেন—পিসিমাটা যেন কেমন। পিলে তাঁর 'সাইড্'-এ জানেন বলেই নতুনদিদিমা তার সম্মুখে পিসিমার নিন্দা করতে ভয় পান না। বুঝে গিয়েছেন যে, সে বাড়ি গিয়ে এ কথা বলে দেবে না। শুধু পিসিমার সঙ্গে কেন, পাড়ার অন্য যে কোন মেয়েমানুষের থেকে তিনি অন্য রকমের। এখানে আসবার সময় রায়বাহাদুরের বাড়ির জেঠিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বিয়েতে কি কি গহনা হ'ল? বরযাত্রী ক'জন এসেছিল? বর কি ক'রে? বিয়েতে কে কে এসেছিল। আরও এইসব কত কি! একটুও মেলে না নতুন দিদিমার সঙ্গে। এইসব কথা বড় বলতে ইচ্ছে করছে তুলসীকে। জ্বর আসবার মুখে কথা বলতে বড় ভাল লাগে তা'র।...

তুলসী নেপাল থেকে ফিরে এল মাস দেড়েক পরে। স্টেশান থেকে সোজা পিলের কাছে। পেয়ারা খাওয়া সংক্রান্ত গণ্ডগোলের পর একা যেতে লজ্জা করছিল বোধহয় নতুনদিদিমার কাছে। তুলসী একটি মুখোশ পরেছে—শিবের মুখ। কিছুই হয়নি; শুধু যেন একটা ফুটবল ম্যাচ দেখে আসছে ওপাড়া থেকে এমনি ভাব। হাতের খাঁচায় একটি নেপালী ময়না।

"তোর জন্য নিয়ে এলাম। দাজুর মা দিয়েছে। ভারি ভাল লোকরে। রেলগাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।"

"নতুনদিদিমার চাইতেও ভাল?"

"ধেৎ।"

'ধেৎ' বলবার সময় তুলসীর মুখখান একটু কি রকম যেন হয়ে গেল। পিলের মনে হ'ল যে হঠাৎ নতুনদিদিমার কথা তোলায় অপ্রস্তুত হয়ে গেল; নিশ্চয়ই সে তাঁর উপর রাগ ক'রেই তা'হলে নেপালে চলে গিয়েছিল।

"তবে? দাজুর মা ভালতে 'সেকেন'? নতুনদিদিমার মত ভালতে 'ফাস্ট' কেউ না, নারে?"

"হ্যাঁ। কিছুতেই আমাকে পাহাড়ের জঙ্গলে যেতে দেবে না। একদিন দাজুর সঙ্গে পাহাড় থেকে কাঠ নিয়ে এসেছিলাম। এমন 'ডাউন' করল দাজুকে আমার সম্মুখে। খুব আমার 'সাইডএ।'

"চল্।"

তুলসীর স্থান পিলের মনে চিরকালই খুব উঁচুতে। সেই মহিমা আরও উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে হঠাৎ—সে, যে কোন স্টেশনে টিকিট করতে পারে, নিজে কুলিকে জিজ্ঞাসা ক'রে গাড়ি বদল করতে পারে, এমন কি এঞ্জিন ড্রাইভারের কাছ থেকে গরম জল পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারে!...

"মুখোশটা কিনলি কত দিয়ে রে?"

"কিনিনি, দাজুর বোন দিয়েছে। দেওয়ালির দিন সেখানে ছেলেমেয়েরা মুখোশ প'রে দলে দলে ঘুরে বেড়ায়। আর জুয়ো খেলতে হয় সকলকে সেদিন। দাজুর বোন বাজি রেখেছিল যে অন্ধকারে তা'কে খুঁজে বার করতে পারলে সে বাজি হারবে। পয়সা কারও নেই। তাই সে আমার কড়ে আঙুলটা কামড়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, যে হারবে তা'র আঙুলটাকে একবার কামড়াতে দিতে হবে।"

"আস্তে, না জোরে রে?"

"আস্তে কুট্! ব্যস্!"

"ভারি মজার মজার বাজি রাখে তো নেপালে।"

"নেপালে না; পাহাড়ে। সে হেরে গেল বাজিতে। আমি কিছুতেই কামড়াব না। মেয়েমানুষের আবার আঙুল কামড়াবে! দেওয়ালির বাজির ধার রাখতে নেই। সেইজন্য শেষকালে আমাকে এই মুখোশটি দিলো।"

"অত লোকের মধ্যে রাত্তিরবেলা চিনলি কি করে মাইরি, দাজুর বোনটাকে?"

"সন্ধ্যেবেলায় বেরুনর আগে রসুন দিয়ে চিড়েভাজা খেয়েছিল যে সে, আমার সম্মুখে। আমি খুঁজছি কোন মুখোশের মধ্যে দিয়ে নিশ্বাসের সঙ্গে রসুনের গন্ধ বার হচ্ছে।"

ঠিকেদারবাবুর বাড়িব দোড়গোড়ায় এসে তুলসী দাঁড়াল, পিলেকে আগে ঢুকতে দেবার জন্য। তার ভাব একটু আড়ষ্টগোছের হয়ে উঠেছে, নতুনদিদিমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। পিলের মুখে মুখোশ পরা। "কি গুটলিদি!" বলে হাসতে হাসতে তুলসী উঠনে ঢুকল। নতুনদিদিমাকে ডাকতে লজ্জা লজ্জা করছে, সেইজন্য গুটলিদির খোঁজ পড়েছে।

"ওমা, দেখ কে এসেছে!"

নতুনদিদিমা ভাঁড়ারঘর থেকে বেরিয়ে এলেন; গলার স্বরে নিশ্চয়ই বুঝেছেন, কে এসেছে। মুখখান গম্ভীর থমথমে গোছের। মুখে হাসি না দেখলেই তাঁর চোখদুটিকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে, জানতে ইচ্ছা করে—ব্যাপার কি? জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে—এমন কেন? চোখে তাঁর জল আসছে নাকি? তুলসীর দিকে এখনও তাকাননি। পিলের সঙ্গেই প্রথম কথা বললেন।

"ভারি সুন্দর শিবের মুখখানা তো! ও আবার কোথা থেকে পেলি? খুলে ফেল্! ঠাকুরদেবতা নিয়ে খেলা!"

...এখনও তিনি কথা বলছেন না কেন তুলসীর সঙ্গে? চটে আছেন নাকি ওর উপর?...

"তুলসী মুখোশটা এনেছে নেপাল থেকে।"

এতক্ষণে যেন নতুনদিদিমার খেয়াল হয় তার কথা। "নেপালে যাওয়া হয়েছিল?"

"না, পাহাড়ে।"

"কবে আসা হ'ল?"

...এখনও ঘুরিয়ে কথা বলছেন; 'তুই' বলছেন না!...

"এই এখনই আসছি।"

"এখনই? বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে? অফিসে গিয়ে দেখা ক'রে এলেই হ'ত। খাওয়া-দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই? ওরে আমার কপাল!"

দৌড়তে দৌড়তে তিনি গিয়ে ভাঁড়ার ঘরের শিকল খোলেন...তুলসীর জন্য খাবার আনতেই গেলেন ঠিক।...তবু...মনে হয়, চোখের জল চাপবার জন্যই তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। পিলে, তুলসী, গুটলিদি, তিন-জনেই একথা বুঝে গিয়েছে। তুলসীর দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নিল। গুটলিদির চাউনি দেখেও ধরা যায়; সেও পিলের মত বুঝছে যে, মায়ের চোখে জল তুলসীর খাওয়া হয়নি ব'লে নয়...অন্য কারণে।

...পাড়ার ছেলে; রোজ দেখা না হ'লেও, দেখা হতে পারে যখন তখন; এ অবস্থায় কারও অভাবটা মনে না পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ছেলে যে চলে গিয়েছিল তাঁর উপর রাগ ক'রে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। যা গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে। ফিরে যে এসেছে সেই ঢের! না এলেই বা কি করার ছিল! ফিরে তাঁর কাছেই ছুটে এসেছে প্রথমে, এইটেই বোধ হয় ফেরবার চাইতেও বড় কথা।..

"গুটলি! জিজ্ঞাসা করতো, ছোঁড়ার স্নান হয়নি বোধ হয়। তাহ'লে একখান তারার কাপড়-টাপড় দে; প'রে স্নান করুক। আচ্ছা, না হয় আমার কাপড়ই দে একখান—তারা আবার এসে ফাটাফাটি করবে!"

ময়দা মাখতে মাখতে তিনি কথা ব'লে চলেছেন ভাঁড়ার ঘর থেকে। গলার স্বর স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এতক্ষণে নিশ্চিন্দি!

তুলসী 'ফাস্ট', সে কথা এখানকার প্রতিটি ছেলেমেয়ে জানে। পিলের কাছে এটা নতুন খবর নয়। তার নিজের হিসাবমতও তুলসী 'ফাস্ট', সে 'সেকেন', গুটলিদি 'থাড়'।...চিরকাল জানা। কিন্তু এত 'ফাস্ট'? এত উঁচুতে ফাস্ট্! আর সে এত নীচুতে 'সেকেন'? কত নীচে তার জায়গা এ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হ'ল পিলের আজ। সে যেদিন কলকাতা থেকে এ'ল সেদিন নতুনদিদিমা কি বলেছিলেন, কি করেছিলেন সব তা'র স্পষ্ট মনে আছে। তার সঙ্গে নতুনদিদিমার আজকের ব্যবহার সে মনে মনে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে। সেও অনেকদিন পর এসেছিল, তুলসীও অনেকদিন পর এসেছে!...

ও বারান্দা থেকে তাঁর কথা কানে আসছে। তুলসীকে বলছেন, "কোঁচা যে মাটিতে লুটচ্ছে। বাড়িতে ক'হাতী ধুতি পরিস? আট-হাতী? হিল্লি ডিল্লি ঘুরে এলেই কি বড় হওয়া যায়?"

পিলে আর থাকতে পারে না। কি কথা কোথায় বলা উচিত নয়, এ বিষয়ে সে বয়সের আন্দাজে একটু বেশী সজাগ। তবু সে মিথ্যে না ব'লে পারল না—"আমাকেও এবার পিসিমা ন'-হাতী ধুতি কিনে দেবে বলেছে"।

"তুমি হ'লে চাটুজ্যেবাড়ির বড় কর্তা। তোমার কথাই হ'ল আলাদা।"

নতুনদিদিমার এই কথা-এড়িয়ে-যাওয়া ঠাট্টার পর আর কিছু বলার মত খুঁজে পায় না সে। বোঝে যে, তার সঙ্গে বাজে কথা বলবার সময় নেই এখন তাঁর।

খাওয়ার সময় তুলসীকে ঘিরে ব'সে চলল নেপালের গল্প। গল্প মানে সকলের প্রশ্নের জবাব দেওয়া। যখনই কেউ বলে নেপাল, তখনই তুলসী কথাটিকে সংশোধন করে দেয়—"নেপাল নয়; পাড়াড়।" কিন্তু তফাতটা যে কি তা' বুঝোতে পারল না। "সে দেশে যে না গিয়েছে, সে বুঝতে পারবে না কোনকালে।" নতুনদিদিমার প্রশ্ন সবই দাজুর মা আর বোন সংক্রান্ত। "দেখতে কেমন? গায়ে দুর্গন্ধ নাকি? বিচার-আচার বোধ হয় কিছু নেই? শুয়োর রাখে বাড়িতে। বলিস কি! খেলি তো ওদের ছোঁয়া? বদবামুন কোথাকার! বোনটার নাম কিরে? নাক খেঁদা? খুদে খুদে চোখ তো?

ওরে বাবা! কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটে মেয়েমানুষ? দাজুর মাকে কি ব'লে ডাকতিস? ঐ একখানিই ঘর তাদের বাড়িতে? ওরা আবার গানও জানে নাকি? বোনটাও? গানে কথা বলতে পারে; সে আবার কি রকম? এ এক কলি, ও এক কলি গায়? শোনা দেখি।"

তুলসী এই অনুরোধের প্রত্যাশাতেই যেন ছিল।

পিলে গান বোঝে না মোটেই। এ আবার কি ছাই গান।

"কেন বেশ তো।"

নতুনদিদিমার খুব ভাল লেগেছে এ গান।

"এ গান শেখালো কে রে তোকে, গন্ধপাতা? মা, না বোন? নিজে নিজে শুনে শুনে। উঁহু! বললেই কি আমি বিশ্বাস কবি!" ..

গল্পে গল্পে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এখন বাড়ি ফিরতে হয়। দরজাব বাইবে এসে পিলেব মনে পড়ে মুখোশের কথা। "মুখোশটা যে ফেলে এলি?"

"থাক্‌গে। ও দিয়ে আমি কি কবব।"

তারপরই শোনা গেল নতুনদিদিমার গলা—"ওরে ফেলে গেলি যে শিবঠাকুরকে। নিয়ে যা।"

দু'জনে ছুটতে আরম্ভ করে যাতে তিনি ভাবেন যে, তাঁর কথা তুলসীরা শুনতে পায়নি; অনেক দূরে চলে গিয়েছে ততক্ষণে।

"দাঁড়া, দাঁড়া!"

তুলসীব আসল গল্প তখনও বাকি। দেরী হয়ে গিয়েছে--বাড়ি গিয়ে বোধ হয বকুনি খেতে হবে।

"কাউকে বলবি না মাইরি! আসল কথাটা,—নতুনদিদিমা যখন দাজুব মায়েব নাড়ীর খবর নিচ্ছিল না আমার কাছে, তখন ভয ভয় করছিল,—এই বুঝি বেরিয়ে যায়, এই বুঝি বেবিয়ে যায়।"

"কি রে মুরগির মাংস খেয়েছিস বুঝি সেখানে?"

"সে তো শূয়োরের মাংসও খেয়েছি সেখানে—সে কথা বলছি না। অন্য কথা। কাউকে বলবি না বল!"

"ব'লব না, ব'লব না, ব'লব না!"

"বোতাম ছুঁয়ে বল।"

কি আবার ভয়ঙ্কর চেপে-যাওয়ার কথা বলবে! বোতামে হাত দিয়েই পিলে বুঝতে পারে যে, তা'র বুক টিপ্‌টিপ্ করছে।

"পাহাড়ে ওরা আমাকে কমলালেবুর মদ খাইয়ে দিয়েছে।"

"মদ! যাঃ!"

'মদ' কথাটি সে-বয়সে 'অসভ্য' কথার লিস্টের মধ্যে পড়ে। শুনলেই ভয় আর কৌতূহল জেগে ওঠে মনে।

"মাইরি বলছি!"

"কমলালেবুর আবার মদ হয় নাকি?"

"আমি নিজে খেয়ে এলাম, তবু ব'লবি হয় না।"

"খাওয়াল কি করে? দাজুটা? জোর করে ধ'রে?"

"দিনরাত খাও, খাও, খাও! সবাই মিলে। সে দেশে সকলেই খায়। আমি যতই খাব না বলি, ততই তা'রা তিনজনে হেসে লুটোপুটি খায়। শেষকালে লজ্জায় আমি ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে নিলাম।"

"টলছিলি? চোখ লাল হয়েছিল?"

"না।"

"ভয় করল না?"

"নেশা হয়ে যাবার ভয়ে সারারাত জেগেছিলাম। কি নাক ডাকে মাইরি দাজুর মা-টার!"

"খেতে ঝাল?"

"না, টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি। মিছে বলব না; আমি অনেকদিন খেয়েছি।"

"মদ খেতে ভাল, তাই আবার বলছিস্!"

"আর বলব না, মাইরি!"

"দাজুর মা-টারা ভাল লোক না।"

"না, না, দাজুর মা খুব ভাল লোক। গাড়িতে আমাকে তুলে দেবার সময় জড়িয়ে ধ'রে কাঁদলো।"

"নেপালী তোকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো?"

একথার কোন জবাব দেয়নি তুলসী। রাত ক'রে ফিরবার জন্যে পিসিমার কাছে বকুনি খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল পিলে। মদ খেয়ে তুলসীর ঘুম হয়নি। মদ খাওয়ার সংবাদ চাপবার উত্তেজনায় পিলের ঘুম হ'ল না সারারাত।...পিসিমা বলেছিলেন—"বাড়ী ফিরবার কি দরকার ছিল? গুরুঠাকুর ফিরে এসেছেন; আর কি, সাগরেদি করগে যাও।"...পিসিমার বকুনি কেউ গায়ে মাখে না—বাবা পর্যন্ত না। বকছে তো বকছেই। কিন্তু আজ পিলের মনে হ'ল যে তাঁর বকুনির ওজন আছে; যে মদ খায় তার সঙ্গে এত রাত্রি পর্যন্ত থাকা, সত্যিই অন্যায়। সে দোষ করেছে।...কিন্তু কি সাহস! কি বুকের পাটা তুলসীর! অত বড় 'অসভ্য' কাজ করতে বাধল না একটুও। আর এই "ভয়ঙ্কর অসভ্য" কাজের খবর দেশের মধ্যে শুধু সে-ই জানে। তবু তুলসীই ফাস্ট—অনেক উঁচুতে ফাস্ট। নতুনদিদিমা তার সঙ্গে দেখা হলে চোখের জল ফেলেন; দাজুর মা তার সঙ্গে আর দেখা হ'বে না ভেবে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদে।... লোকে যাদের ভাল বলে না, তাদেরই নতুনদিদিমা দাজুর মা'রা ভালবাসে না কি?..যাকে ভাল বলে, সে হয়ে যায় 'সেকেন'—অনেক নীচে 'সেকেন্'। যত ভাল হ'বে তত কম নম্বর পাবে নতুনদিদিমার কাছে।..গানজানা লোককেই বোধ হয় সকলে বেশী ভালবাসে—এক কেবল বাবা পিসিমারা ছাড়া।...তাই বা বলা যায় কি ক'রে। তুলসীর বাবা নিজেও গান জানেন, আবার ছেলেকেও শেখান।...দিদিটা নিজেকে বড় সবজান্তা মনে করে। তার বিয়ের সময় পাওয়া, 'ধ্রুবতারা' নামের একখানি নীল মোটা বইয়ে, জামাইবাবুর বন্ধু পদ্যতে একটা 'ফাজলামি' লিখে দিয়েছিল। পিলেকে পড়তে দেখে দিদি বলেছিল—রেখেদে, তুই বুঝবি না ওর মানে।..সব বোঝে পিলে, সব বোঝে। এখন বড় একটা তুলসীর 'অসভ্য' কথা, চেপে রাখবার গুরু দায়িত্ব বুকের উপর নিয়ে শুয়ে রয়েছে! তার কাছে এসেছে লম্বা লম্বা কথা বলতে দিদিটা।..হাতের তেলো গরম হ'য়ে ওঠায় বুকের বোতামটা লাগল একেবারে ঠাণ্ডা বরফের মত। এত নীচে 'সেকেন্' হওয়ার কথা বারবার মনে হয়।...দাজুর মা ময়নাটা দিয়েছিল তুলসীকে। সে কেন নিতে যাবে অন্যকে দেওয়া জিনিস? মেয়েমানুষে যার জন্যে কাঁদে সে-ই 'ফাস্ট'!...

... ভোরে উঠেই সে ময়না পাখীটাকে তুলসীকে ফেরত দিয়ে আসবে। বলবে পিসিমা বকাবকি করছেন!...কিন্তু তখন যদি তুলসীর বাবা গাঙ্গুলিমশাই বাড়িতে থাকেন? বড় ভয় করে গাঙ্গুলিমশায়ের সম্মুখে যেতে।...

অদ্ভুত মানুষ এই তুলসীর বাবা। অন্য বাবাদের মত নয়। পিলের বাবার সঙ্গে তো মোটেই মেলে না। নাপিতে দাড়ি কামাবার সময় যেদিনই বাবা পিলের দিকে বারকয়েক তাকান, অমনি সে বুঝতে পারে যে, আজ তাকে চুল কাটতে হ'বে। বাবা দাঁড়িয়ে থেকে তার মাথার সম্মুখের ও পিছনের চুল সমান ক'রে ছাঁটিয়ে দেবেন। পিলের ইচ্ছে তুলসীর মত সম্মুখের চুল বড় রাখে; কিন্তু তা'

কি হ'বার জো আছে বাবার জ্বালায়! একবার পিলে বুদ্ধি ক'রে এক খাবলা তেল মাখিয়ে নিয়েছিল সম্মুখের চুলগুলোতে, যাতে নাপিত ছোট ক'রে ছাঁটবার সময় চুলের গোছা না ধরতে পারে। তবুও বাবা তার চেষ্টা সফল হ'তে দেননি। আর তুলসীর বাবাকে দেখ। তিনি নাপিতকে ব'লে দেন ছেলের চুল দশ-আনা ছ'-আনা ছেঁটে দিতে। তুলসী তা'র বাবার লাল গন্ধতেল মেখে টেরি কাটে। পিসিমা বলতেন, মদ খেলে গা দিয়ে রামছাগলের বোটকা গন্ধ বার হয়। সেই গন্ধ ঢাকবার জন্যই নাকি তুলসীর বাবা ঐসব গন্ধ তেল-টেল মাখেন। একদিন যদি সে তেল ফুরিয়ে যায়, ব্যস। আর কাউকে সে বাড়িতে টিকতে হ'বে না রামছাগলের গন্ধে।

খুব ছোটবেলাতে দিদি পিলেকে ভয় দেখাতো—দেবো, লালচোখো গাঙ্গুলিমশায়ের কাছে ধরিয়ে। মাতালের প্রতিশব্দ হিসাবে লালচোখো কথাটি এখানে বহুল প্রচলিত। সব ছেলেপিলেই জানত যে, গাঙ্গুলিমশাই মাতাল। আরও ছোটরা জানত যে, মাতালরা ছেলেপিলে দেখলেই মারে; সময় সময় পেটও কেটে দেয়। যদিও ছোটবেলাতে পথে-ঘাটে পিলেকে দেখলেই গাঙ্গুলিমশাই 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে খুদে চাটুজ্যে' ব'লে একটু আদর করবার চেষ্টা করতেন; কিন্তু সে তখন ভয়ে কাঁপত। পাড়ার সব ছেলেমেয়েই তাঁকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু বড় হবার পর পিলে জেনেছিল, তিনি কত ভাল মানুষ। ছেলের সঙ্গে ব'সে গান করেন। গান শেখান। আর পিলে? গান শুধু গাওয়া কেন, শোনা পর্যন্ত ছিল অসভ্যতা তাদের বাড়ীতে।

তুলসীর বাবা অনেক রাত পর্যন্ত অর্গ্যান বাজিয়ে গান করেন। কানে এলেই পিসিমা বিড়বিড় ক'রে বকেন, পাড়ার সব ছেলেপিলেদের তুলসীর বাবা গান শুনিয়ে খারাপ করে দিচ্ছেন ব'লে। পিলেরা ভাব দেখায় যে, ও গান তাদের কানে যাচ্ছে না। একদিন রাতে অন্যমনস্কভাবে দিদিকে ব'লে ফেলেছিল যে, তুলসীর বাবা সেই এক ঘণ্টা থেকে একটা গানই গাইছে। আর যাবে কোথায়! হুঙ্কার শোনা গেল পিসিমার। "পড়া হচ্ছে! এক ঘণ্টা যদি গানই শুনছিস, তবে পড়ছিস কি? যত সব অসভ্যপনা! বাপ-বেটায় মিলে গাঙ্গুলিমশায়ের গান হচ্ছে! এক গেলাসের ইয়ার যেন দু'জনে! ঐ তুলসীর সাগবেদিই ক'র গিয়ে, বড় হ'লে যাত্রার দলে!"

কি করবে পিলে? 'কে গো তুমি তরুবর আছ সুখে দাঁড়াইয়ে' গাঙ্গুলিমশায়ের এই গানটি, পড়বার সময় এক ঘণ্টা থেকে কানে এলে পিলে কান বন্ধ করবে কি করে? তোমরাই ব'লে দাও! এতো আর নিশ্বাস নয় যে, ইচ্ছামত বন্ধ ক'রে নেওয়া যায়! কে একথা পিসিমাকে বোঝাবে! অথচ নতুনদিদিমা গান কত ভালবাসেন। দাজুর মা'টা পর্যন্ত গান ভালবাসে। গানের জন্যই তুলসীর এত কদর!...

পিসিমার বকুনি একবার আরম্ভ হ'লে কি এত তাড়াতাড়ি থামে!

..."যা দেখতে পারি না তাই!...মদের নেশা আর গানের নেশা, এ নেশাতেই খেলে গাঙ্গুলিমশাইকে! ভ্রূক্ষেপও নেই সংসারের দিকে! ছেলেটা টো টো ক'রে বেড়ায় দিনরাত্তির, 'বাজারের—ছেলেদের' সঙ্গে। বাপ হয়েছিস। একবার বারণ কর। তা নয়। নির্বিকার। পরিবার ভুগে ভুগে মারা গেল। ডাক্তার ডাকতে হয় ডাকো, না ডাকতে হয় ডেকো না; ওষুধ খেতে ইচ্ছে হয় খাও, ইচ্ছে না হয় খেয়ো না; শেষদিন পর্যন্ত ধুঁকতে ধুঁকতে গিয়ে রান্নাঘরে উনুনের ধারে বসেছিল। স্বামীর পাতের ভাত খাওয়ার খোয়ার! যাক গিয়েছে, ভালই হয়েছে। হাড় জুড়িয়েছে! আপদের শান্তি! বেঁচে থাকতে সে ব্রাহ্মণী তোমাকে কোনদিন বারণ করেনি কিছু করতে; এখন তো কোন কথাই নেই! কেউ দেখতেও আসবে না, কি করছ না করছ! ছি ছি ছি! কিন্তু ছেলেটা যে এই বয়স থেকেই ইস্কুলে না গিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। আর বাপ হয়ে উনি নিজে বসে আছেন দিনরাত্তির মদ আর ঐ প্যাঁ পোঁ নিয়ে!"...

এর শেষ নেই।

তুলসীর মায়ের কথা পিলের কিছু মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, একখানা লাল গামছা প'রে

ঘর-দুয়ার ধুচ্ছেন, তা'রই একটি ছবি। তবে তুলসীর মা মারা যাবার দিনটা বেশ মনে আছে। তুলসী সেদিন পিলেদেব বাড়িতে শুয়েছিল। ঠিকেদারবাবু তা'কে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে এল পিসিমার সঙ্গে পিলেদের বাড়ি। ঠিকেদারবাবুর বাড়িতে লজ্জা লজ্জা করে—তারাদা' অনেক বড়—আর সব্বাই মেয়েমানুষ! এখানে তবু খোকা আছে। খোকা তখনও পিলে নাম পায়নি। সেই রাত্রে...একখান কম্বলের মধ্যে পিলে আর তুলসী শুয়ে। তুলসীকে নাকি কম্বল গায়ে দিতে হয়, পিসিমা বললেন। লেপের বদলে কম্বল গায়ে দেওয়া বেশ নতুন নতুন লাগে। করুগগে কুট্‌কুট্! তুলসী কাঁদেনি—ধেৎ, পুরুষমানুষে আবার কাঁদে নাকি। তা'র বাবাও তো কাঁদেনি। খুব ভাল লেগেছিল তুলসীকে সেদিন। একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে শোয়া। এত কাছে তুলসীকে কোনদিন পায়নি পিলে। অতটুকু ছেলে শ্মশানঘাটে গিয়েছে, তেল না মেখে স্নান করেছে, মড়া পোড়ানো দেখেছে। ভয়ে পিলের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, আরও জড়িয়ে ধ'রে শুতে ইচ্ছা করে তুলসীকে। আর নতুন কোরা কাপড় কিছুতেই গরম হ'তে জানে না। খুব কাছে এসে গিয়েছে দু'জন। ঘুম আর আসে না পিলের।

"জেগে নাকিরে পিলে?"

"ও, তুইও জেগে! কম্বল কুট্‌কুট্ করছে নারে?"

"না।"

"তবে?"

জবাব দিল না তুলসী তখন। অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তারপর তুলসীই প্রথম কথা বলে।

"তোরও মা নেই, আমাবও মা নেই—নারে?"

"হ্যাঁ।"

"দু'জনেই সমান নারে?"

পিলেব ইচ্ছা করছে যে বলে, সমান কেন হতে যাবে? তার মা অনেক আগে স্বর্গে গিয়েছেন, কাজেই সে বড়। মা স্বর্গে যাওয়ার ব্যাপারটাতে যে অনেক উঁচুতে তুলসীর চেয়ে—কত উঁচুতে ঠিক মনে নেই—পাঁচ ছ'-বছরের উঁচুতে তো নিশ্চয়ই—মনে থাকবার কথা নয়—বঁটি দিয়ে কেটে যাবার দাগটা পায়ে যেবার হয়, তারও এক বছর আগে—পিসিমার মুখে শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এই একটা বিষয়েই সে তুলসীর চেয়ে বড় হ'তে পেরেছিল কিন্তু আজকের মত দিনে একটু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তুলসীর গলার স্বরে কি যেন মেশানো আজ! অন্যরকম, অন্যরকম!...

"হ্যাঁ।"

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পালা। তুলসী নিজমুখে স্বীকার করেছে যে তা'র সমান সে। এর আনন্দও কম নয়। খালি কি সমান? কত কাছাকাছি। গায়ের গরম পাওয়া যাচ্ছে; নিশ্বাসে কানের কাছটাতে সুড়সুড়ি লাগছে!...জানলার ফাঁক দিয়ে সরু একটুখানি জোছনা এসে পড়েছে তাদের বালিশের ওপর।

"তোদের বাড়ির বিছানার গন্ধ আমাদের বাড়ির বিছানার গন্ধর মত না।"

"ও বোধ হয় কম্বল আর কোরা কাপড়ের গন্ধ মিলে অমন লাগছে।"

"ধেৎ! তোদেরটা খারাপ বলছি না; অন্যরকম। আমাদেরটা কেমন যেন তেলতেলে ঘাম ঘাম গন্ধ। তোদেরটা রোদ্দুরে দেওয়া বিছানার শুকনো শুকনো গন্ধ।...মোলায়েম, ভিজে নয়।"...

"স্নানের পরের চুল, আর তেল মাখবার আগের চুলের গন্ধ, যেমন দু'রকমের হয়?"

"ধেৎ! তুই বুঝবি না।"

পিলে বোকা বনবার পাত্র নয়। "দেখিস তোদের বাড়ির বিছনাতেও এমনি গন্ধ হ'য়ে যাবে।"

অতি অস্পষ্ট ইঙ্গিত; কিন্তু এই কথাই আজ তুলসীর মনে সাড়া জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। বিছানার সঙ্গে তা'র মায়ের গন্ধই জড়ানো থাকত নাকি? এদিক দিয়ে বিছানার গন্ধব কথা সে

এর আগে কখনও ভাবেনি। মায়ের সঙ্গে দেখা হ'ত কতটুকু। কতক্ষণই বা সে বাড়িতে থাকে? এখন আর সে-কথা ভেবে কি হবে, তা'র বিছানাতে মা মা গন্ধ হয়, এই মনের ভিতরের কথাটা পিলে ধ'রে ফেলল কি ক'রে? তা'র মনের কথা সে নিজে ভালভাবে বুঝবার আগেই পিলে জেনে গিয়েছে। এইজন্যই পিলেটাকে এত ভাল লাগে। মাকে কি তার সত্যিই ভাল লাগত? একথা তো সে এর আগে কখনও ভেবে দেখেনি। মা'র সঙ্গে সঙ্গে সে গন্ধও চলে গিয়েছে সেই কোথায়।

"চাঁদটা এখান থেকে অনেক দূর।"

"হ্যাঁ।"

"এক শ' মাইল হ'বে, নারে?"

পিলে জবাব দেয়, "হ্যাঁ"।

না-বলা কথাগুলোর মধ্যে একটি মন আর একটি মনকে খুঁজে পেয়েছে আজ। এই অলখডোরের বাঁধনই বুঝি বা থেকে গিয়েছিল, এর পর, চিরকাল।

তখন পিলেরা কত ছোট। কিন্তু সেই বয়সেই বড়দের মুখে শুনেছিল যে তুলসীর বাবা সেই রাত্রেই দু' বোতল মদ খেয়েছিলেন। পরের দিন যথারীতি গানও শোনা গিয়েছিল।

বহুরকমের দুর্নাম সত্ত্বেও গাঙ্গুলিমশাইকে পাড়ার লোকে সমীহ ক'রে চলত। এর প্রধান কারণ তিনি লোকটি ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের। মদ খেয়ে মাতলামি করতে কেউ তাঁকে কোনদিন দেখেনি। পাড়ার দলাদলি, ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে তিনি কোনদিন থাকেননি। পি ডবলু ডি অফিসে হেড ক্লার্ক ছিলেন তিনি। একাজে উপরি রোজগার বেশ। এসব ছাড়াও পাড়ার মধ্যে তাঁর মর্যাদার সবচেয়ে বড় কারণ ঠিকেদারবাবু তাঁকে খাতির করতেন খুব বেশী। কন্ট্রাক্টররা পি ডবলু ডি অফিসের হেড ক্লার্ককে খোশামোদ না ক'রে পারে না।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে শুদ্ধ একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা ছিল যে, তুলসী নতুনদিদিমার কাছে 'ফাস্ট' পি ডবুল ডি র হেড ক্লার্কের ছেলে বলে। যে ছেলেমেয়েরা নতুনদিদিমার বাড়িতে খেলতে যেত না এ হচ্ছে তা'দের ধারণা। এ যে কত বড় ভুল সে কথা জানত, পিলের মত, যাদের সেখানে যাতায়াত ছিল নিয়মিত, তা'রা।

পিলের মনের প্রচ্ছন্ন ধারণা ছিল যে তুলসী গান জানে, আর অনায়াসে নতুনদিদিমাকে 'তুমি' বলতে পারে ব'লেই সে 'ফাস্ট'।

সাধারণভাবে বলতে গেলে পিলে গানের সম্বন্ধে নিস্পৃহ। সুরের চেয়ে কথা অনেক বেশী সাড়া জাগায় তার মনে। নতুনদিদিমা গ্রামোফোন বাজাতে আরম্ভ ক'রলেই সে অধৈর্য হ'য়ে অপেক্ষা করে কতক্ষণে গান থেমে 'অ্যাক্টিং'-এর রেকর্ড আরম্ভ হ'বে। গাঙ্গুলিমশায়ের "কে গো তুমি তরুবর" শুনবার সময় তা'র কেবলই মনে পড়ে তুলসীদের অরগ্যানটার কথা।—কেমন চক্‌চকে পালিশ! আয়নার মত মুখ দেখা যায়, গাল লাগালে ঠাণ্ডা! নতুনদিদিমার গান সে একদিন মাত্র শুনেছিল অনেকদিন আগে, রায়বাহাদুর-গিন্নীর অনুরোধে প'ড়ে গেয়েছিলেন। প্রথম লাইন, "মহীমহিম মণিমার্ণব শ্রীমতী রাধিকা সুন্দরী।" অনেকগুলো 'ম' থাকার জন্যে কেমন যেন কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। ছোটবেলায় খুব সুপুরী খেলে অমনি হয়—পিসিমা বলেছেন।

আজকাল নতুনদিদিমা গান গাইতে বললে চটে ওঠেন। "সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন কোথায় সাধন-ভজন করব তা' নয়, গান। হ্যাঁ, শুনতে ভালবাসি, শুনব। শোনা আর গাওয়া কি এক জিনিস?" তুলসী বলে, "না না, তাই কি আমরা বলছি নাকি? তুমিই তো নিজে বলছ যে, এখন ভজন গাইবার সময়।"

"তা' আবার কখন বললাম?"

পিলে তুলসী দু'জনেই হো হো ক'রে হেসে উঠেছে। "দুষ্টুমি হচ্ছে? দাঁড়া! ভাদ্দর মাসের তাল দিতে হয় গোটাকয়েক গুম্ গুম্ ক'রে পিঠে।"

দাঁতে দাঁত চেপে আদরের সেই হি-ই ই ই শব্দটা ক'রে তিনি হাত বাড়ালেন তুলসীর কনুইয়ের উপরটা ধরবার জন্যে।

এই সময় পিলে কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর হ'য়ে ওঠে হঠাৎ। চেষ্টা করেও কথা বলতে পারে না দু'এক মিনিটের জন্যে, এত অভিভূত হয়ে পড়ে সে। নিজের অক্ষমতার জন্যে এই আত্মগ্লানি। কেন সে তুলসীর মত নতুনদিদিমাকে 'তুমি' বলতে পারে না। বলতে গেলে কিন্তু কিন্তু হয়ে যায়, বুক দুরদুর করে। একদিন বহু চেষ্টা ক'রে সে বলেছিল, কিন্তু গলার স্বর শেষ পর্যন্ত এত আস্তে হয়ে গিয়েছিল যে, নতুনদিদিমা লক্ষ্যই করেননি। কি ক'রে অধিকার নিতে হয়, তা' যে পিলে জানে না। তুলসী জানে। শুধু নতুনদিদিমা আর দাজুর মা কেন। একদিনের মিস্ত্রী-বউএর ব্যাপার পিলে নিজে চাক্ষুস দেখেছে। বেলাফাঁড নামের একরকম লাটিম-খেলা আছে। সেই খেলায় তুলসীর লাটিমটা একটু বেশী জখম হয়েছিল। তখনই লাটিমের ফাটল জুড়বার জন্যে তুলসী ফুদি মিস্ত্রীর বউএর এক গাছা গালার চুড়ি চেয়ে এনেছিল। তার আবদার রেখেছিল মিস্ত্রীবউ। বলে দিয়েছিল, মিস্ত্রী যেন দেখতে না পায়। চুড়ির গালা গলানো যে এত শক্ত তা' আগে জানা ছিল না।

"দেখেছিস কেমন গালাপোড়া গন্ধ বার হচ্ছে?"

পিলে জবাব দেয়—"বিচ্ছিরি রবাট্ পোড়া রবাট পোড়া গন্ধ।"

"দূর! রবাট্-পোড়া গন্ধর মত কেন হ'তে যাবে! এ গন্ধ একেবারে আলাদা।"

গন্ধর ব্যাপার নিয়ে তুলসীটা এত মাথা ঘামায় কেন, সে কথা পিলে কিছুতেই বুঝতে পারে না। তা'র নিজের তো খুব ভাল কিংবা খুব খারাপ না লাগলে গন্ধর কথা মনেই পড়ে না। তবে তুলসী ব'লে দেবার পর, সে সব সময় তা'র গন্ধ সম্বন্ধীয় মতে সায় দেয়। তুলসীর অনুকম্পা ও ভালবাসা থেকে সে বঞ্চিত হতে চায় না। তুলসীর কাছ থেকে গন্ধ সম্বন্ধে শোনা কথা, সে পরে অনেক সময় নিজের ব'লেও চালাতে চেষ্টা করে। একবার জেনে যাওয়ার পর সত্যিই সে গন্ধ অনেক সময় তা'র নাকে আসে। একদিন তুলসী গল্প করেছিল—"বুঝলি, কাল রাতে বাজার থেকে আসবার সময় ভারি মজা হয়েছে। তোদের ঐ মোড়ের কাছে এসেই একটা ফিকে মিষ্টি গন্ধ পেলাম। অনেক দূর থেকে হাসনাহানা ফুলের গন্ধ যেমন হয় না, সেই রকম। আশপাশে তাকিয়ে দেখি—এখানে তো কোন ফুলের গাছ নেই! তবে? পাকা সাপটাপ নয় তো? হাততালি দিতে দিতে তাকাই, ভাবি, আর চলি। এগতে এগতে দেখি, গন্ধটা যাচ্ছে বদলে। খারাপ হয়ে আসছে! আস্তাবল, আস্তাবল গন্ধ! হঠাৎ ফ-র-র-র শব্দ! ঘোড়া! দেখি ঘোড়া চড়ছে। ঘোড়ার গন্ধ ফিকে হ'লে দূর থেকে মিষ্টি ফুলের গন্ধর মত হয়ে যায়।"

পিলে তুলসীর চোখে ছোট না হবার জন্যে স্বীকার করে যে, সেও এরকম ফিকে ঘোড়ার গন্ধ অনেকবার পেয়েছে।

"আমি কিন্তু লক্ষ্য করিনি এর আগে! সার্কাসের বাঘের খাঁচার গন্ধ দেখেছিস দূর থেকে গন্ধগোকুলের গন্ধর মত লাগে। আরও দূর থেকে সেটা হয়ে যায় বাসমতী চালের সুন্দর গন্ধর মত।"

তাল রাখতে গিয়ে, এইবার পিলে বিজ্ঞের মত তুলসীরই মুখে শোনা কথা নিজের ব'লে চালায়। "ঘোড়াটা বৃষ্টিতে ভেজেনি তো? বৃষ্টির পর মাটির গন্ধ বদলে যায়, দেখিস না? স্নানের সময় প্রথম জল ঢাললেই একটা গন্ধ বেরয় না গা দিয়ে? বৃষ্টির পর কুলের ফুল আর কামিনী ফুল থেকে পায়খানার গন্ধ বেরয় দেখেছিস তো? এও বোধ হয় সেইরকম।"

"হবে।"

পিলে বোঝে যে, তা'র কথায় তুলসী খুশী হয়েছে। এতেই তা'র আনন্দ। নতুনদিদিমা আর তুলসী দু'জনকে খুশী রাখতে পারলে সে শান্তি পায়। শুধু এই দু'জনই কেন, পৃথিবীসুদ্ধ সবাই তা'র সম্বন্ধে কে কি ভাবল, কে কি বলল, এ সম্বন্ধে সে সজাগ। সবাই তা'কে ভাল বলুক, ভাল ভাবুক, এর জন্যে পিলে কেন, অনেকেই চেষ্টা করে। তুলসীর কিন্তু সে বালাই মোটেই নেই। কে কি ভাবল না ভাবল, ব'লল না ব'লল, সে কথা তার মনেও আসে না। তুলসীর মত এমন বেপরোয়া ভাব পিলের চেষ্টা করলেও কোনদিন হবে না।

নতুনদিদিমা কি ভাবলেন বয়ে গেল, তুলসী নিজের যা বলবার তা' সে বলবেই, তাঁর সম্মুখেও। তবু কোথায়, কেমন ক'রে নতুনদিদিমার চোখে তুলসীটা এত বেশী নম্বর পাচ্ছে, বোঝা যায় না। সকলে না বুঝুক পিলে বোঝে। যার, যখন তখন একটু ফাঁক পেলেই নতুন দিদিমার বাড়ি ঘুরে আসতে ইচ্ছা করে, সে-ই এ জিনিস বুঝবে। বলার সময় অবশ্য তিনি বলেন যে, সবাইকে 'তুল্যের তুল্য' ক'রে দেন তিনি। যে যায় তাকেই হেসে বলেন, "কি রে।" বসানো, খাওয়ানো, ঠাট্টা করা, গল্প করা সকলের বেলাতেই সব ঠিক আছে। কিন্তু আছে, তার মধ্যেও আছে। পিলে জানে। তা'র খুব দুঃখ হয় এতে। অথচ একথা কাউকে বলবার উপায় নেই—তুলসীকেও না। সে যে এ লাইনে ভাবতেই জানে না। শুনে হাসবে বোধ হয়। যে বিনা চেষ্টায় 'ফাস্ট' সে বুঝবে না এ ব্যথা। তবু তুলসীর মধ্যেও একটা জিনিস পিলে লক্ষ্য করেছিল একদিন।

ইস্কুলে যাবার সময় তুলসী প্রত্যহ মোড়ের তুঁতগাছটার নীচে অপেক্ষা করে পিলের জন্যে। সে জানে যখন তখন পিলেদের বাড়ি গেলে পিসিমা বিরক্ত হন। মর্নিংস্কুলের সময় একদিন পিলে এসে দেখে যে, গাছতলায় একটি ছোট কাঁসার বাটি পড়ে রয়েছে। তখন সবেমাত্র ভোরের ঘোর ঘোর ভাব কেটেছে। নতুনদিদিমার টানে ঘুরেফিরে তাঁর কাছে যেতেই হ'বে। তার মধ্যে সময় অসময় নেই। পিলে তুলসী দু'জনেরই হঠাৎ মনে হ'ল যে বাটিটি নিশ্চয়ই 'ওবাড়ির'। কুকুর-শিয়ালে হয়তো রাতে টেনে এনেছে। কিংবা হয়তো রামশরণা চাকরটা মুড়ি খেতে খেতে এসে ফেলে গিয়েছে। কি রকম 'কেয়াবলেস্' দেখেছিস্! এই ভোরবেলাতে নতুনদিদিমার সঙ্গে দেখা করবার এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ পাওয়া গেল। একে ঠিক আত্মপ্রবঞ্চনা বলা চলে না, কেন না, চেষ্টা ক'রে নিজেকে ভুল বোঝাবার প্রয়াস নেই এর মধ্যে। বাটিটি অন্য কোন বাড়িরও হ'তে পারে, একথা মনে এলে, তবে না নিজেকে ভুল বোঝাবার প্রশ্ন ওঠে? দুর্বার এক আকর্ষণের ঝোঁকে মনের গতিপথ অন্যদিকে যেতেই পারে না। যেদিকে ঢালু সেদিকে যাওয়ার জন্য কি আর জলকে ভাবতে হয়? দু'জনেই ছুটছে 'ওবাড়ির' দিকে। তুলসী বাটিটি পিলের হাত থেকে কেড়ে নিতে চায় ছুটতে ছুটতেই। পিলে কিছুতেই দেবে না। যে নিজে হাতে ক'রে নতুনদিদিমাকে বাটিটি দেবে, আর যে কেবল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, দু'জনের মর্যাদা এক নয়, একথা দু'জনই বিনা চেষ্টায় বুঝে গিয়েছে। তখনকার মত তুলসী ছেড়ে দেয়। কিন্তু "ওবাড়ির" দোরগোড়াতে গিয়ে আবার চেষ্টা করে সেটাকে কেড়ে নেওয়ার। এ কি রকম হয়ে গিয়েছে তুলসীর মুখ? ব্লাডারের নলটা ফুটবলের ভিতর ঢুকোবার সময় সে যে রকম বাঁদিককার দাঁত দিয়ে জিভটাকে দুমড়ে চেপে ধরে, ঠিক সেই রকম মুখখান এখন তুলসীর। চোখের চাউনি খর হয়ে এসেছে। মুহূর্তের মধ্যে পিলে বুঝে যায় যে, এটা আর এখন বেলে খেলা নেই। তা'রও বুকের পাটা বেড়ে গিয়েছে হঠাৎ। এত সাহসই-বা সে কোথা থেকে পে'ল। "জোর দেখানো হচ্ছে।"

'কি করছিস, মাইরি। ভাল হ'বে না বলছি তুলসী।"

তুলসীটাও তা'হলে অন্যর চোখে নিজের মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করে! সে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। পিলেকে দুর্বল জেনে নেতাসুলভ উদারতায় তুলসী সব সময় তাকে খানিকটা আশ্কারা দিত। আজ পিলে প্রথম লক্ষ্য করল এর ব্যতিক্রম। নতুনদিদিমার কাছে পৌঁছবার বেলা সে দুর্বল পিলেকেও তাচ্ছিল্য করতে পারে না।

দু'জনে বাটিটা কাড়াকাড়ি করতে করতে ঢুকল বাড়ির ভিতর। নতুনদিদিমা তখন সবে উঠনে গোবরছড়া দিচ্ছেন। বাড়ীর আর কেউ ওঠেনি।

"কিরে? দুই 'গোস্ত'তে কুকুর-কুণ্ডলী কিসের?" যে আগে বলতে পাবে কথাটা তাঁব কাছে তারই জিত। তাই চেঁচামেচির মধ্যে তাঁর বুঝতে একটু দেরী হ'ল।

"এ বাটি তারাদের বাড়ির কেন হ'তে যাবে!"

"তাহ'লে বাটিটা কি হ'বে?"

"কি আবার হ'বে! যেখান থেকে এনেছিস সেখানে ফেলে দেগে যা! না হ'লে পাড়ার সব বাড়িতে জিজ্ঞাসা কর। জাত-বেজাতের এঁটো কাঁটা ছুঁয়ে অস্থির করলি এই ভোর সকালে! একজন না হয় ছুঁয়েছিল ছুঁয়েছিল। তুই আবার সেটাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গেলি কেন, গন্ধপাতা? যা! যা এখন! নইলে সাবা বাড়ি ঐ এঁটো দিয়ে একাক্কার করবি। একটু যদি তোদের আচার-বিচার থাকে! যত সব বদবামুনের দল!"

শেষের কথা কয়টি তুলসীর দিকে তাকিয়ে বলা, চেনা হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে।

যেমন অভাবনীয় আজকেব তুলসীর ব্যবহার, তেমনি একচোখা আজকের নতুনদিদিমার আচরণ! এখন বাটিটাকে নিয়ে কি করা যায়? 'যেখান' থেকে এনেছিস, সেখানে ফেলে দেগে যা'— একথা ব'লেই তো একজন খালাস! কিন্তু সে কি একটা কাজের কথা হ'ল? তুলসীর খেয়াল হয় ফুদিমিস্ত্রীর বউএর কথা। গরীব মানুষ, তাকে দিয়ে দিলে হয় না?

ঠিকেদারবাবুদের পশ্চিম বাগানের বাঁশঝাড়ের পাশেই ফুদিমিস্ত্রীর কুঁড়ে। সেদিন ববাতটাই খারাপ! বাঁশঝাড়ের পথে তুলসীর বাবা বেরুলেন! এই ভোরে! সেরেছে! তিনি দাঁতন করবার জন্যে একটা ভাঁটের গাছ উপড়ে নিচ্ছেন। তারপর অন্যদিকে তাকাতে তাকাতেই চলে গেলেন। পিলেব হঠাৎ মনে হ'ল যেন দাঁতন ভাঙ্গবাব আগেই তিনি আড়চোখে তাদের একবার দেখে নিয়েছিলেন। মিস্ত্রী-বউ চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এল। "কি খোখাবাবু! এই সকালে?" বাটি পেয়ে সে খুব খুশী। মিস্ত্রী গিয়েছে কুর্শীপুব থানার বাড়ি মেরামতের কাজে, দিন কয়েক পর আসবে, এসে এই বাটি দেখে অবাক হয়ে যাবে। তুলসী বলল, "বাবা মিস্ত্রীকে ঠিকে পাইয়ে দেয়।" কথাটা ঠিক বুঝল না পিলে। তবে সব মিলিয়ে একটা রহস্যের ফিকে গন্ধ যেন সে পাচ্ছে। কি তা' সে জানে না। মিস্ত্রী-বউ এর হাতের গালার চুড়িগুলোর কথাই বেশি মনে হয়—লাটিম জুড়বার চুড়ি। হাত নাড়লেই এমন খট্‌খট্ ক'রে শব্দ হয় চুড়িগুলো থেকে—"লালচোখো"রা ভোরে উঠে বেড়ালে বোধ হয় তাদের মদের নেশা কেটে যায়।...

পিলেকে সেদিন ইস্কুলে তুলসী হঠাৎ গোলাপীরেউড়ি কিনে খাইয়েছিল। বাটি কাড়াকাড়ির সঙ্কীর্ণতা ঢাকবার জন্য নয়তো? অন্যদিন হ'লে পিলেব কিছুই মনে হ'ত না। কিন্তু তুলসীর সব 'ইয়ে' আজ পিলে ধ'রে ফেলেছে!...

গাঙ্গুলিমশায়ের এই দিনকার, একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে না-দেখবার ভান-করা চাউনিটি পিলের মনে দাগ কেটে ব'সে গিয়েছিল। চোখের ব্যঞ্জনা ঠিক ব'লে বুঝনো যায় না। নেপালীদের চোখের মত লাইন-টানা লাইন-টানা গোছের হয়ে গিয়েছিল তাঁর চোখ মুহূর্তের জন্যে। বছর দুয়েক পরে এক বিষম বিপদের মুখে এই চাউনির কথা হঠাৎ মনে পড়েছিল। সেদিন পিলে জীবনে প্রথম তামাকে টান মারবে। কি একটা কারণে ইস্কুল বন্ধ। আপিস-কাছারীর ছুটি নেই। গাঙ্গুলিমশাই আপিসে। তুলসীদের বাড়িতে আড্ডা বসেছে। ভয়ে পিলে কাঁপছে—যদি কেউ দেখে ফেলে। "নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করা খুব সোজা। You may can—তুইও পারবি। ইজিলি! যদি একটু চেষ্টা করিস। এত জল কমিয়ে দিয়েছি, তবু তোর মুখে জল উঠে আসবে! কি রে তুই! সব কাজেই তোর জবুথবু ভাব! দে, ভাল ক'রে ধোঁয়া ক'রে দিচ্ছি।"

চোঙা দিয়ে আগুনে ফুঁ দিতে অভ্যস্ত মড়া সেকরার চেয়েও তুলসীর বুকের জোর যে বেশি

একথা প্রমাণ হয়ে গেল এক মিনিটে। ঘর ধোঁয়ায় ভ'রে উঠেছে। তুলসীর হাতে হুঁকো। এমন সময় গাঙ্গুলিমশাই এসে ঘরে ঢুকলেন হন্তদন্ত হয়ে। আলমারি খুলে একখান আপিসের ফাইল বার ক'রে নিয়ে গেলেন। কি কাণ্ডই হয়ে গেল। এমন হাতেনাতে ধরা পড়বার কথা পিলেরা স্বপ্নেও ভাবেনি। ছি ছি ছি! পিলে সবচেয়ে অবাক হয়েছে, গাঙ্গুলিমশাই একটুও বকাবকি করলেন না দেখে।

মড়া বলল, "বোধ হয় তাড়াতাড়িতে লক্ষ্য করেননি, বুঝলি।"

এ আশ্বাসে পিলের মন প্রবোধ মানে না। সে যে দেখেছে যে, গাঙ্গুলিমশাই ছেলের দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। ঠিক সেই ভাঁটের দাঁতন ভাঙবার আগের মুহূর্তের চাহনি।—নেপালী নেপালী লাইন-টানা লাইন টানা চোখ। সেই রকম।

পিলে বলে—"এখন আপিসে চলে গেলেন তোর বাবা, বিকালে ফিরে এসে বোধ হয় তোর উপর হবে একচোট।"

"না।"

সুর লম্বা ক'রে টেনে বলা। তুলসীর কথার স্বরে দৃঢ়প্রত্যয় মেশানো। সে বাবাকে জানিয়ে তামাক খেতে চায় না, কিন্তু ধরা পড়ে গেলে ভয় পায় না। যতই তুলসী বলুক "না", এ ব্যাপার এখন গড়াবে অনেক দূর—পাড়া—পিসিমা—বাবা। নতুন করে-আসা ভয়ের তোড়ে গুছিয়ে ভাবা আর সম্ভব হয় না। এবাড়ি থেকে পালানই এখন উচিত, এই অহেতুক যুক্তিই শেষ পর্যন্ত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ক্ষীণ আশা যে, গাঙ্গুলিমশাই হয়তো তুলসী ছাড়া আর কাউকে লক্ষ্য করেননি।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখে যে, দোরগোড়ায় লিচুগাছটার তলায়, স্টেশনের সিন্ধী ঠিকেদারকে ফাইলখানা থেকে কি যেন দেখাচ্ছেন তুলসীর বাবা। চোখো-চোখি হয়ে গেল পিলের সঙ্গে, একটু যেন দুষ্টু হাসি মুখে। আর ফিরে গিয়ে তুলসীদের খবর দেওয়ারও উপায় নেই যে, গাঙ্গুলিমশাই আপিসে যাননি এখনও তামাক খাওয়া শেষ ক'রে বেরুবার সময় মড়া সেকরাও এমনি ক'রেই ধরা পড়বে ওঁর কাছে। পড়ুক। নিজের ঠেলায় অস্থির, এখন অন্যের কথা ভাবতে পারে না।

বুদ্ধি ক'রে একগোছা নলখাগড়া পথ থেকে ভেঙে নিয়ে সে বাড়িতে পিসিমার শি[illegible] ছেঁচতে বসে। এর মিষ্টি মিষ্টি রস থেকে চিনি হ'তে পারে কিনা ফোটালে তাই দেখছে। এই কথাই সে পিসিমাকে জানাতে দিতে চায়। তাঁর শিল ব্যবহার করবার জন্যে যতই চেঁচামেচি করুন, বাবা এলেই নিশ্চয় বলবেন—দেখ তোমার "বিজ্ঞান" ছেলের কাণ্ড। পিলে জানে যে, বাবা খুব খুশি হবেন এতে। অন্যায় ক'রে বিপদের আশঙ্কা দেখলে সে এই রকম কৌশলেরই আশ্রয় নেয়।

কিন্তু এত সবের দরকার ছিল না। গাঙ্গুলিমশাই সত্যিই তুলসীকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেননি।. পিলের তখনকার অপরিণত বুদ্ধির সিধে যুক্তিতে মনে হয়েছিল যে, তাঁর ছেলেকে বকবার মুখ নেই। .ভাঁটের দাঁতন ভাঙবার দিন দেখেও-না-দেখবার ভাণ করা, আর তামাক খাওয়া দেখেও না দেখা, এ দুটোর মধ্যে বোধ হয় সম্বন্ধ আছে।

কখনও বকুনি খায় না ব'লে তুলসী তার বাবাকে ভয় করে না। ভক্তিও করে না। তবে নিজের ধরণে ভালবাসে। ভালবাসার প্রধান কারণ তার বাবা আবার বিয়ে করেননি ব'লে। পিলেদের বন্ধুমহলে কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই এসে পড়ত, পাড়ার মধ্যে বউ মরে যাবার পর কে কে বিয়ে করেছে, আর কে কে করেনি। এ আলোচনায় পিলে তুলসী দু'জনেরই গর্ব ছিল। তখন মাইরির বদলে তুলসীর কথার মাত্রা হয়ে গিয়েছে 'সালা'। এটি কুটুম্বিতাবাচক শব্দ নয়, কেবল কথার মাত্রা, তাই এর বানান দন্ত্যস দিয়ে।..

.. "বিয়ে করলেই কি বউ মরে যাবে—সালা। পাড়ার অধিকাংশ লোকেরই দেখবি, একবার না একবার বউ নিশ্চয়ই মরেছে। গুণে দেখ। বেটাছেলেরা মরে কম, মেয়েদের চেয়ে। হিসাব ক'রে দেখ ক'টা বিধবা আছে আর কতগুলো বেটাছেলে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করছে। এই ঠিকেদারবাবুকেই দেখ না। এখন যদি মারা যায়, পাড়ার লোকে হা হুতাশ করবে নাবালক ছেলে রেখে মরেছে ব'লে।

কাচ্চাবাচ্চা আছে ব'লে তো আর লোকটার বয়স কম হয়নি! কত জানি না—মাথার চুলগুলো তো পেকেছে! চাবকাতে হয় এদের! আমার বাবার না হয় চুল পেকে গিয়েছে; তোর বাবার চুল তো এখনও দিব্যি কাঁচা আছে; তবু তো বিয়ে করেনি।...তোর বাবাব বয়সটা বুঝলি পিলে, দাড়িতে নেমে গিয়েছে। যাদেবই দেখবি দাড়ি আগে পাকে, তাদের মাথায় চুল অনেক দিন পর্যন্ত কাঁচা থাকে! বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা করিস মধু নাপিতকে—তারা তো অনেক চুল আর দাড়ি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে।"...

তুলসীর চিন্তা ও বাগ্‌ভঙ্গী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভরা। প্রয়োজনের চেয়েও বেশি কড়া; কিন্তু এর মধ্যে যে গর্বটুকু মেশানো পিলেও তাতে অংশীদার। সমস্ত কথাগুলোর মূলে আছে ঠিকাদারবাবুর ওপর একটা বদ্ধ আক্রোশ ও নতুনদিদিমার ওপর আন্তরিক দরদ। দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করা লোকদের গালাগালি দিয়ে গায়ের ঝাল মিটানোতেই আসল তৃপ্তি; নিজের বাবার কথা ভেবে গর্বটুকু তারই সুদ। সেইজন্যে পিলে তুলসী দু'জনেব মনই একই সুরে সাড়া দেয়। বাবার প্রশংসার মধ্যে দিয়ে, নতুনদিদিমাদের মত মেয়েদের উপর অবিচারের প্রতিবাদে, তারা যেন একটা নীবব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা জোর পেত, নতুনদিদিমার এ সম্বন্ধে বলা টিটকিরি মন্তব্যগুলো থেকে।...''তাঁরা হচ্ছেন মানুষ। ঐ দেখ না গাঙ্গুলিমশাই। ভদ্দরলোক নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবেন, তবু নতুন-মানুষ ঘরে আনলেন না। আনলেন না তো আনলেনই না! আনতে কি আর পারতেন না? কুলীন বামুন। ইচ্ছা করলেই দশ-বিশটা বউ আনতে পারেন। এখনও! কত মেয়ের-বাপের ঐ পাকা চুল দেখেও হয়তো নোলা দিয়ে জল গড়াচ্ছে! নতুন মা এলে গন্ধবামুনকে কত আদর করত, না'বে? কখনও বলত টুলু, কখনও তুলি, কখনও তুলতুল—সে কি আদরেব ঘটা! পিঠে-আটা নিত্যি লেগেই আছে! তাহ'লে আমাদেরও খাওয়াতিস তো গন্ধপাতা? কি বলিস রে পিলে? পিলে, তুই কিন্তু একটুর জন্য নতুন মা পেতে পেতে বেঁচে গিয়েছিস। তোর পিসিমা প্রায় নিমরাজী করিয়ে এনেছিল তোব বাবাকে। দেখিস, আবার মুখ হুম্-ম্ করিস না যেন, বাইরের একজন কে-না-কে বাপ তুলে কথা বলছে বলে। মনে আছে তো রে, সেই কলাচুরির দিনের বদবামুনের তম্বি? আবাব হাসা হচ্ছে! হাসা হচ্ছে খিক্-খিক্ ক'রে !...যাকগে! পিলে তুই তো তবু মায়ের বদলে পিসিমাকে পেয়েছিস!"

বেশ চলছিল এতক্ষণ; কিন্তু এই শেষের কথাটি শোনামাত্র পিলের মন খারাপ হয়ে গেল। এ আবার এক নতুন লাইন নিতে আরম্ভ করেছেন নতুনদিদিমা আজকাল! এ যে কিসের আভাস তা' পিলে দূর থেকে গন্ধে গন্ধে আবছা-ভাবে টের পাচ্ছে। যাঁর কাছে যখন তখন ছুটে যেতে ইচ্ছা করে, যাঁর কাছে বসে থাকতে ভাল লাগে, যাঁর মুখের পুরনো গল্পও সব সময় নতুন নতুন লাগে, তাঁর এই শেষের ইঙ্গিতের পরিণতি কোথায় পিলে তা' সহজ বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছে।...''তুলসীকে দেখবার-শোনবার কেউ নেই; মা চলে গিয়েছে স্বর্গে; বাবাটা ঐ রকম; নিজেও আপন-ভোলা। অমন অসহায় অবস্থা আর কোনও ছেলের নয়। কারও বা সৎমা আছে, কারও বা পিসিমা আছে। ও ছেলের কেউ বলতে কেউ নেই. ওর ওপর একটু বেশি টান থাকাই তো স্বাভাবিক। মা-মরা ছেলে-মেয়ের সংসারে এসে ঢুকেছিলাম। তাই আমার কাছে জোটেও কি যত মা-মরার দল!"...

নতুনদিদিমার শেষের দিকের ইঙ্গিতের এই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। নইলে পিসিমার কথা তোলার আর অন্য কোন অর্থ হয় না। ব্যথা গুমরে ওঠে পিলের মনে। আগে তুলসীর উপর পক্ষপাত ঢাকবার একটা প্রয়াস ছিল নতুনদিদিমার। সেটা ফুটে বেরুত অতর্কিত মুহূর্তে—চোখ-মুখের ভাবে, কথার নতুন উপছে-পড়া মধুতে, ঢলঢলে চাউনির ব্যঞ্জনায়, আদরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে, চোখ-মুখের ভাবে পিলে যে নতুনদিদিমার মন ধরতে পারে!...এই যে তিনি তাঁর ছোট ছেলে কেষ্টকে কখনও কাছে টেনে আদর করেন না; তার দিকে তাকিয়ে আছেন কিছুক্ষণ, এটা অন্য কারও চোখে ধরা প'ড়ে গেলে কুণ্ঠিত হন! কেষ্ট তো গুটলিদির কাছেই থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। অথচ নতুন নতুনদিদিমা

তারাদাকে মাথায় ক'রে রাখেন, গুটলিদিকে কোন কাজ করতে দেন না। তাই ব'লে কি তিনি কেষ্টকে কম ভালবাসেন তারাদার চেয়ে? এ সব জোর ক'রে নিজেকে অন্য রকম দেখানর চেষ্টা! ঢের জানে পিলে এসব! তুলসী যে 'ফাস্ট' একথাও তিনি খোলাখুলি বলতেন না এতদিন। এখন তুলসীর 'ফাস্ট' হবার একটা কারণ তিনি সকলকে শোনাতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর পক্ষপাতিত্বের নায্যতার খোলাখুলি স্বীকৃতি চান সকলের কাছ থেকে। মনের দুঃখ মনে রাখা উচিত; চুপ ক'রে থাকাই ভাল এসব ক্ষেত্রে। কিন্তু ভিতর থেকে কিছু যেন তাকে কথা বলাবেই বলাবে।

"আরে পিসিমা থাকাও যা, না থাকাও তাই।" বলেই পিলে বোঝে যে কথাটা বলা ঠিক হ'ল না।

"ওমা, আমি কোথায় যাব! এ যে দেখি তারার মত কথা হ'ল রে! মাও যা ঘটিও তাই। দাঁড়া আমি তোর পিসিমাকে বলে দিচ্ছি।"

খিল খিল করে হেসে ফেটে পড়েন নতুন দিদিমা। না বললেই বেশ হ'ত, হয়তো নতুনদিদিমা কিছুই ভেবে বলেন নি। এমনিই বোধ হয় বলে ফেলেছেন ওকথা! কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করলেও পিলের মন মানে না। তুলসীর পইতাতে নতুন দিদিমা আংটি দিয়েছিলেন; গত মাসে পিলের পইতে হ'ল—তাকে দিলেন দু'টাকা। কিন্তু এ পক্ষপাত নিয়ে পিলে মাথা ঘামাত না। কেন না, স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আংটিটা দেওয়া হয়েছে পি ডব্লিউ ডি হেডক্লার্কএর ছেলেকে—তুলসীকে নয়। কিন্তু 'তোর তো তবু পিসিমা আছে!'—বলা হচ্ছে আলাদা জিনিস! তার তুলসীর সঙ্গে পাল্লা দেবার ভাবটা দেখে নতুন দিদিমা হাসছেন না তো? ঢোক গিলতে গিয়ে আটকে যাবার অস্বাচ্ছন্দ্য আস্তে আস্তে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। মানসিক অস্বস্তি তো আছেই।

পিলে তুলসী দুজনেই ঠিকেদারবাবুর উপর বিরূপ। তাদের ধারণা যে, লোকটা শুধু টাকা-পয়সা বোঝে; মনের সূক্ষ্ম দিকটা নাই বললেই হয়। এ বিষয় নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে অনেক সময় আলোচনা করত। গুট্‌লিদির বিয়ের সম্বন্ধে তাঁর সে সময়ের মন্তব্য পিলেদের খুব খারাপ লেগেছিল। বেচারী গুট্‌লিদি। বিয়ের সময় দিনকয়েকের জন্যে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন; আর তাঁকে যেতে হয়নি। স্বামী নেযনি, হাঁটুর কাছে ধবল আছে ব'লে। গুট্‌লিদির সম্বন্ধে মেয়ে মহলে কানাঘুষো পিলেরা ছোটবেলা থেকে শুনত; সেইজন্য বিয়ে হচ্ছিল না; কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়াতে পারে, তা জানত না। বিয়ের পর ঠিকেদারবাবু কলকাতা থেকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন গুট্‌লিদিদেব। এসে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গল্প করেছিলেন—"শ্বশুরবাড়িতে যে গুট্‌লিকে নেবে না, একথা আমি চিরকাল জানি। ছেলের বিয়ের পর আমি যদি দেখতাম যে, আমার বৌমার গায়ে ধবল, তাহলে কি আমিই নিতাম নাকি? এতো জানা কথা! তবে বিয়েটা যে ভালয় ভালয় হয়ে গিয়েছিল, সে-ই ঢের! যাক! ভগবানের আশীর্বাদে গুট্‌লির খাওয়া-পরার অভাব কোনদিন হবে না!"

এইজন্য তুলসী ঠিকেদারবাবুর নতুন নাম দিয়েছিল 'পাষণ্ড'। নতুনদিদিমা খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। গুট্‌লি যে তাঁর বড় আদরের।...সারা জীবন যে মেয়েটার এখনও সম্মুখে পড়ে!

নতুনদিদিমা গুটলিদির বিয়ের পর কলকাতা থেকে বাপের বাড়ি ঘুরে এসেছিলেন। বাপের বাড়ি, মানে ভাইয়ের বাড়ি; বাবা তখন নেই।

বলতে গেলে সেইবারই পিলে-তুলসীর প্রথম নতুনদিদিমাকে ছেড়ে থাকা। এর আগে পিলে কলকাতায় থাকার সময় বা তুলসী নেপালে গেলে, দিনকতক তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি ঠিকই। কিন্তু সে হ'ল অন্য জিনিস। তাদের এখানকার জীবনের সঙ্গে নতুনদিদিমা এমন ভাবে জড়ানো যে, এখানে থাকতে তাঁকে না পেলে বড় খালি-খালি লাগে। তাদের দিনপঞ্জীর ধারাই যায় বদলে। সময় কাটতে চায় না। নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারা যায় না নিজেদের। ইস্কুল থেকে এসে মুড়ি কি

চিঁড়েভাজা জলখাবার দেখলেই পিলের মন খারাপ হয়ে যেত এতদিন; এগুলো খেতে বড় দেরি হয়; নতুনদিদিমার কাছে যেতে দেরি হয়ে যায়; পিসিমার সম্মুখে পকেটে পুরবারও উপায় নেই—পকেটে নিয়ে খেতে খেতে যায় 'অসভ্য বাজারের ছেলেরা'। সেই পিলে যদি দিনান্তে একবারও নতুনদিদিমার দেখা না পায়, তাহলে তার খালি-খালি লাগবারই কথা।

'মুশকিল শুধু তোর আর আমার নারে পিলে?'

'নতুনদিদিমা না থাকলে একটুও ভাল লাগে না'। রোজ দুই বন্ধুতে এই গল্প। অকারণে দুইজনে 'ও-বাড়ির' কাছাকাছি ঘুরে আসে। একই খামের মধ্যে দুজনে নতুনদিদিমাকে চিঠি দেয়। তখন মর্নিং ইস্কুল। পিয়ন আসবে সেই কখন! নতুনদিদিমার বাংলায় লেখা ঠিকানা—পড়তেই পারবে না হয়তো পিয়ন। কার হাতে না কার হাতে দেবে। সেইজন্য দুইজনে মিলে প্রত্যহ খাওয়াদাওয়ার পর রোদ্দুর ধুলোর ঝড়ের মধ্যে পোস্ট অফিসে গিয়ে হাজির হয়। নতুনদিদিমা এক খামে দুজনকেই চিঠি দিতেন—দুই 'গোস্ত'কে। একবার তুলসীর ঠিকানায়, একবার পিলের নামে—একেবারে 'তুল্যের তুল্য' করে নিক্তিতে মেপে দুজনকে সমান দেওয়া। ফিরবার দিন পিলে তুলসী দুজনেই স্টেশনে গিয়েছিল, তাঁদের আনতে। নতুন দিদিমা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, গাছ-গাছড়ার উপর তাই তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে আসবার সময় নতুনদিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কার বাগান রে? ভারি সুন্দর কলাগাছগুলো তো, দেখ দেখ! এতটুকু এতটুকু, মানুষের সমান উঁচু। বড় বড় কলার কাঁদি প্রায় মাটিতে ঠেকেছে! কার বাগান বললি?"

"রেলের সিন্ধী ঠিকেদারের।"

"তাদের দেশের কলা বুঝি? তাদের দেশ কি কাশীর কাছে?"

"না, এর নাম কাবলে কলা।"

আমি একে বলি বেঁটেবীর কলা। এত বড় বড় কাঁদি হ'লে লেজওলা বামুনঠাকুরদের বড় মজা নারে! এ-গাছ থেকে কলা চুরি করার বড় সুবিধে!"

নতুন দিদিমা হাসতে হাসতে দুই 'গোস্ত'কে সেই পুরনো কলা চুরির দিনের কথা মনে করিয়ে দিলেন।

"এখনও সে কথা মনে করে রেখেছ!"

"অমনি ফোঁস করে উঠেছেন। দেখি দেখি, বদ্‌বামুনকে রাগলে কেমন দেখায়। অনেকদিন দেখিনি!"

অনেক দিনের গল্প পাওনা নতুনদিদিমার কাছে। এখন আর এসব ছোটখাটো একচোখোমির দিকে নজর দেবার সময় নেই পিলের।

"তোদের চিঠির জন্য আমি হা-পিত্যেশে বসে থাকতাম। নকুড় ডাক-পিয়ন আসবার দিন বকশিশ চাইলে—'দিদি বকশিশ দেবেন না? চিঠি এনে দিলাম।' দিদি শুনলেই নিজের বয়সটা কম-কম মনে হয়। তাদের পাড়ার মেয়ে আমি। তারা ভাবতেই পারে না যে, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটা বুড়ি দিদিমা হয়ে গিয়েছি এখানে। বাপের বাড়ি গেলে মাথা থেকে ঘোমটা নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই ভারিক্কির ভূতও বোধ হয় মাথা থেকে নেমে যায়। সেখানকার ইস্টিশানে গরুর গাড়িতে চড়বামাত্র, দেশের গন্ধে গন্ধে আমি আবার ছোটবেলার আমি হয়ে যাই। আমার মত বয়স হোক; তোরাও বুঝবি। দেশের রাস্তার গন্ধই আলাদা। আস্‌শেওড়ার জঙ্গল দু'ধারে। এদেশে তো আস্‌শেওড়ার গাছ নেই। কত আস্‌শেওড়ার ফল খেয়েছি ছোটবেলায়। বেতের ফল, ডোঙ্গুর, গাব, এসব্ তো তোরা চোখে দেখিসইনি।...আমার দাদার আবার অভ্যাস, সকলের চিঠি পড়ে তবে বাড়ির ভিতর দেবে—সে খামই-বা কি, পোস্ট কার্ড ই-বা কি? সেখান থেকেই হাঁক দেওয়া হ'ল, 'ওরে তোর নাতিদের চিঠি এসেছে রে! তোর নাতিরা তো দেখি প্রতি চিঠিতে কবে ফিরবে, কবে ফিরবে করে তোকে পাগল করে দিলে। নিয়ে এলি না কেন তাদের আসবার সময়।'

হ'ল। বলে দেওয়া হয়ে গেল! দাদার তো কথা! ঐ বলে দিয়েই খালাস! শোয়ার ঘর তো মোটে দু'খানা বাড়িতে। তারা গিয়েছিল আমার সঙ্গে; আমার লজ্জা লজ্জা কবছিল, তাকে ঐ ঘরে শুতে দিতে। এস জন বস জন সবই তো ঐ দু'খানি ঘরের মধ্যে। তবু তোরা গেলে কেমন দেখে আসতে পারতিস বাংলা দেশের গ্রাম। দেখিসনি তো; বৈরাগীর গান শুনেছিস? যেতিস যদি শুনিয়ে দিতাম চরণদাস বৈরাগীর গান। বুড়ো হয়ে গলা ভেঙে গিয়েছে, তবু এখনও যা গায়! এতদিন পর আমাকে দেখে ভারি খুশি। রোজ গান শুনিয়ে যেত। আমি আসবার দিন সে কি কান্না। কতদূর পর্যন্ত গরুর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এল। আমি তারাকে লুকিয়ে দুটো টাকা দিলাম তার হাতে।...আমার ছোটবেলাব কথা জিজ্ঞাসা করিস পিলে। গেলে সেসব জায়গা দেখিয়ে দিতাম। ঈশানেশ্বর তলীতে তারাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে এক গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী গল্প জমালে আমাদের সঙ্গে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, তারা আমার ছেলে। 'অত বড় বড় গোঁফ, ও কি কখনও আপনার ছেলে হ'তে পারে মা।' বউঠাকরুণ দিয়েছে এক তাড়া তাকে।...এর হাত থেকে আমার কোথাও গিয়ে নিস্তার নেই। আমাদেব জামাই কি বলেছিল জানিস? ঐ যে যে লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে গুট্লির বিয়ে হ'ল—সে ছাড়া আবার আমার জামাই ক'টা? বিয়ের পর, যাওয়ার আগে, আমায় প্রণাম করবাব সময় বলে কি, 'আপনার মেয়ে মা বলতে অজ্ঞান—নিজের মা যে নেই একথা জানেই না—নিজের মায়ের কথা মনে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে থাকে—আপনি একটি দৃষ্টান্ত দেবার মত লোক!' মরি মরি! কি বুদ্ধি! আমার প্রশংসা হচ্ছে! এরই নাম নাকি প্রশংসা? 'নিজের-মা'! এই কথা লোককে বলে নাকি কেউ? এতটুকু বুদ্ধি নেই? এ-বুদ্ধির জন্য তো পাশ দেবার দরকার হয় না! মা আবার কারও 'পরের-মা' হয় নাকি? নিজের মা' শুনেই আমি বুঝেছি, কি ধরনের লোক জামাই। ঠিকই বুঝেছিলাম। একটুও ভুল হয়নি। সৎমা, সৎ-শাশুড়ী সতীনপো, কি খারাপ কথাগুলো বল তো! যে কথা আমি শুনতে চাই না, সেই কথাই কি আমার সব জায়গায় শুনতে হবে। শুনে নিজেরই উপর নিজের ঘেন্না করে। অমন প্রশংসার মুখে আগুন! আমার মত বরাত করে যারা পৃথিবীতে এসেছে, তাদের সুখ্যাতেও লজ্জা! নিন্দা হলে তো কথাই নাই। যতদিন বাঁচবো, এর হাত থেকে আমার রেহাই নেই...এই দেখ, কোন কথা থেকে কোন্ কথায় এলাম। বলতে ছিলাম আমার দেশের গল্প, বলে চলেছি আমার নিজের দুঃখের কথা।...ময়নাডালের কীর্তন শুনেছিস কখনও? কবি গান? তা শুনবি কোথা থেকে। যেমন দেশে থাকিস! এদেশে সেসব দল আসে? আসবে না কেন; সে রকম উৎসাহ করে কেউ আনায়, তাহলেই আসে। সে মন কি কারও আছে; টাকায় যক দেবে সবাই, মরবার পর। কিছু বলতে কিছু নেই এদেশে। তোদের দোষ কি! কিছু জানলিও না, দেখলিও না। দেল কাকে বলে জানিস? দোল না, দেল! দেল! দেল-দোল-দুর্গোৎসব, বারো মাসে তের পার্বণ.—শুনিসনি?

পিলে তুলসী দুজনেই হাঁ করে গেলে কথাগুলো। ফুরিয়ে যেন না যায় তাড়াতাড়ি। শেষ হতে যেন অনেক দেরি হয়, ভগবান। বড় ভাল লাগে নতুনদিদিমা যখন এই রকম একটানা দেশের গল্প করে যান। অজস্র প্রশ্ন ভিড় করে আসে পিলের মনে। তাঁর বলা বিষয়ের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—রথ দেখতে ঠিক পঞ্জিকার রথের ছবির মত, না? 'পঞ্চম-দোল' আর 'বারো-দোল'এ তফাত কি? বৈরাগীর গানের সুর কেমন? শেওড়া গাছ ছোট সাইজের হলেই তাকে আস্‌শেওড়া বলে নাকি? বেতের ফল থেকে মিষ্টি? রসকলি আর অলকা-তিলকা একই নাকি? আরও কত কথা জানবার জন্য মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু চেষ্টা করে কৌতূহল দমন করতে হয়। কেননা গল্পের স্রোতে একবার বাধা পড়লেই হয়তো এ-গল্প ভেঙে যাবে। আগেকার শোনা কথাও আবার শুনতে ইচ্ছা করে। বাংলা দেশ বলে একটা স্বপ্নরাজ্য আছে, এ হচ্ছে তার কথা; এখন তার সঙ্গে মেলানো আছে নতুনদিদিমার গ্রাম আর ছেলেবেলার কথা। তাই সেই রহস্যময় দেশটার স্বাদ আরও মিষ্টি হয়ে উঠেছে। ঘুমপাড়ানি গানের সেই আবছা-আলোর দেশটাকে, কোনদিনও

বোধ হয়, সে সম্পূর্ণ জানতে পারবে না। বড় হয়ে সে নিশ্চয়ই বাংলা দেশে গিয়ে থেকে, মনের সেই খালি জায়গাটুকু ভর্তি করে নেবে। পিলে নিজের মাকে কোনদিন দেখেছে বলে মনে নেই; তবু যখনই কেউ তাঁর কথা তোলে, তখনই মনে একটা মিষ্টি কৌতূহলের শিহর জাগে। অজানা বাংলা দেশের গল্পও সেই মরা মায়ের গল্পের মতন। সেই রকমই অচ্ছেদ্য বাঁধন; কেটেও কাটে না। মাকড়সার জালের মত মিষ্টি; শিশিরে ভিজলে কিংবা রোদের ঝলক পড়লে দেখা যায়। শুনতে শুনতে মিষ্টি রসে ভিজে ওঠে মন। নেশায় নেতিয়ে-পড়া ভাব মধ্যে মধ্যে কাটে কৌতূহলের সাড়া পেয়ে। প্রতিবারের গল্প, একবার নতুন করে পাওয়া।...সেই পুচকে নোলক-পরা নতুনদিদিমা, যিনি সাঁতার দিতে জানেন, আস্‌শেওড়ার ফল খেয়েছেন, ধূলট আর রাসের মেলা দেখেছেন, শীতেব সময় শুধুই দোলই যার পিঠের দিকে গেরো দিয়ে বাঁধা থাকত, যিনি তখন দরজাব কড়া দুটো ধরে ঝুলে ডিগবাজি খেতে পারতেন, খানিকটা নারকোল খেয়ে বাকিটা বাতায় গুঁজে রেখে দিতেন লুকিয়ে, গাজনের সন্ন্যাসীদের বেলের কাঁটার উপর নাচতে দেখে ভয়ে যাঁর প্রাণ কাঁপত—তাঁর গল্পের জিওনকাঠির পরশ লেগে, সেই ঘুমন্ত রহস্যপুরী জেগে উঠেছে।...

কিন্তু বাংলা দেশ সম্বন্ধে অভাববোধটা এক-একজনের এক-এক রকম। নতুনদিদিমার গল্প শেষ হ'লেই তুলসী জিজ্ঞাসা করে—'আচ্ছা তোমাদের গ্রামের রাস্তার সেই যে গন্ধর কথা বললে না, সে-গন্ধটা কিরকম?'

"কি রকম—কিসের মত—সে কি আমি ব'লে বুঝোতে পারি। গন্ধ কি চেখে দেখবার জিনিস যে, বলে বুঝিয়ে দেব। যেতিস যদি তবে জানতে পারতিস।"

"আচ্ছা, তোমাদের দেশে কীর্তনের সময় যে খোল বাজে, তার সঙ্গে সাঁওতালদের মাদলের কোন তফাৎ আছে?"

"অত আমি লক্ষ্য করিনি। শুনতে ভাল লেগেছে, শুনেছি। এ-কান দিয়ে শুনেছি, ও-কান দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তখন কি জানি যে, এক ভূতের দেশে গিয়ে আমার সারা জীবন কাটবে, আর সেখানকার কাদের না কাদের বাড়ির এক ছেলে আমার কাছে একথা জিজ্ঞাসা কববে?"

দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আবার বুঝি এসে গেল তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের গুমরে মরা দুঃখের কাহিনী। শুনলে কষ্ট হয়, কিন্তু একঘেয়ে লাগে না। এসব শোনা মানে তো নতুনদিদিমাকে জানা-- আরও বেশি করে জানা। পুরানো গল্পের ফাঁকে ফাঁকেই অতর্কিতে বেরিয়ে আসে তাঁর নিভৃত মনকে চিনবার নতুন আলোর ঝলক। হবু-বৈজ্ঞানিক পিলে এতে আবিষ্কারের আনন্দ পায়।

তুলসী আবার বলে, "নতুনদিদিমা, তোমাদের চরণদাস বৈরাগীর গানটি একবার গাও না। দেখি সুর কেমন।"

"বড়ো চালাক! না?"

"না-না, এক লাইন গাও। বেশি না।"

"তুমি চল ডালে ডালে তো আমি চলি পাতায় পাতায়। তুই আমার পেটে হয়েছিস, তা না আমি তোর পেটে হয়েছি!"

এইবার আরম্ভ হ'ল পিলের প্রশ্ন।

চরণদাস বাবাজীর আখড়া থেকে মালতী ফুল চুরি করতে গেলে বকত না? তাতারসি খাওয়ার জন্য যখন আপনারা রসের ভিয়েনের চারিদিকে ভিড় করতেন, তখন খেজুর রসওয়ালা বিরক্ত হ'ত না? নতুনদিদিমা আপনার ডাকনাম কি? নকুড় ডাকপিওন, ছোটবেলায় সে-নাম ধরে ডাকত না? তরণী-সেন-বধ ক'বার শুনেছেন? কচি গাব পাতার ঘন্ট মোচার ঘন্টর মত করে রাঁধতে হয়, তাই না? কথকতার সময় কথক ঠাকুরের কাছে বসা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত না? উখলি-সামাটের সামাটটাকে বাংলাতে কি বলে? আপনাদের হিমসাগর আম কি এখানকার কিষণ্‌ভোগ আমের চেয়েও ভাল?...

এত কাছে পেয়েও রহস্যের কুয়াসায় ঢাকা নতুন দিদিমাকে পুরো জানা যায় না! তাঁর বাপের বাড়ির গ্রামখানি পিলে আর তুলসীর মনে সারা বাংলা দেশের নির্যাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই গ্রামের সবকিছুকে নিঃশেষ করে মনের মধ্যে শুষে নিতে পারলে বাংলা দেশের রস অনর্গল পাবার আকাঙ্ক্ষা মিটবে। সেই গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের নাম তাদের মুখস্থ; প্রত্যেকের নিন্দা-প্রশংসা, ভাল-মন্দর খুঁটিনাটি তাদের জানা; পুকুর, বাগান, রাস্তা সব ছবির মত তাদের চোখের সম্মুখে ভাসে।...দলিল জাল করে যে মনিন্দির চৌধুরী ভাইপোদের ঠকিয়েছিল, তাকে দেখা মাত্র চিনতে পারবে পিলে আর তুলসী; তাঁর যে ডান দিকে পক্ষাঘাতে পড়ে গিয়েছে; ডান হাত দিয়ে কলম ধরেছিলেন কিনা, ভগবানের রাজ্যে অমনিই হয়।...

এসব কণ্ঠস্থ না থাকলে নতুনদিদিমার ছেলেবেলা জানবে কি করে? বড় নতুনদিদিমাকে তো তবু তারা দেখছে। বিয়ের-আগের-তাঁকে জানবার আগ্রহ তাই আরও অনেক বেশি। অন্য সব ছোট্ট মেয়েদের মত, কিন্তু অন্য সব মেয়েদের থেকে আলাদা—অন্য ধরনের একেবারে! নতুনদিদিমা কি না! যে-গ্রামের অণু-পরমাণুতে তাঁর ছেলেবেলা মেশানো, সে পরিবেশ থেকে তাঁকে আলাদা করে ভাবা যায় না। সেই পরিবেশ জানলে তাঁর নাগাল পাওয়া যায়, তাঁর ভিতর ঢুকে যাওয়া যায়, তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়। এমনি করেই স্বপ্নের বাংলার রহস্য ও বাংলা কথার মাধুর্য, নতুন দিদিমার রহস্য ও মাধুর্যের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যায় তাদের মনে। আলাদা করা যায় না।

এর আগে তারা যত বউ ঝি দেখেছিল, সব পশ্চিমের বাসিন্দা বাঙ্গালী। সেকরাদের বাড়িতে দু-একজন বাংলা দেশের মেয়ে এখানে বউ হয়ে এসেছিল। কিন্তু বাংলা দেশের গ্রামের মেয়ে হওয়া চাই, তাঁর মধ্যে রসকষ থাকা চাই, আর ছেলেপিলেদের সেখানে অবারিতদ্বার থাকা চাই; এ-যোগাযোগ নতুন দিদিমা ছাড়া আর অন্য কোথাও ঘটে ওঠেনি। নতুন বৌ বাড়িতে এলে ছেলে-পিলেরা তাঁকে ঘিরে যে মিষ্টি রহস্যের স্বাদ পায়, সেই স্বাদ পিলেরা পেয়েছে চিরকাল, নতুনদিদিমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তাঁর কথার বৈচিত্র্য পিলের মনে বিস্ময় জাগায় প্রথম দিন থেকে। শোনার সময় তাঁর কথার মধ্য দিয়ে বাংলার মধুরিমার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তারপব কথার ধ্বনি থেমে গেলে আবছাভাবে মনে হয় যে, তিনিই বাংলা দেশের সব মাধুর্যের প্রতীক।

এ-জিনিস তাদের মনে এত গভীর রেখাপাত করে গিয়েছিল যে, বাংলার গ্রামের তুলনায় কলকাতার আকর্ষণ তাদের কাছে ছিল না বললেই হয়। একদিন মাত্র তুলসীকে শোনা গিয়েছিল কলকাতার ছেলেদের হিংসা করতে। অঙ্ক তার মাথায় ঢোকে না। একদিন পিলে তাকে চৌবাচ্চার অঙ্ক বুঝোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। তুলসী শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে খাতা বন্ধ করে বলল—"ক্যালক্যাটার ছেলেদের পক্ষে চৌবাচ্চার অঙ্ক বোঝা কত সোজা। এখানে সালা চৌবাচ্চাই নেই, তার আবার নল দিয়ে ভরবে, আর খালি হবে!"

এরই মধ্যে তুলসী একদিন স্টেশনের সিন্ধী কন্ট্রাকটরের বাগান থেকে নতুনদিদিমার জন্য একটা কাবলে কলার গাছ নিয়ে এসে হাজির। কন্ট্রাক্টর সাহেব বলে দিয়েছে, এ কলাতে একেবারে ব্যানানা এসেন্সের গন্ধ? পুঁততে হবে এমন জমিতে যেখানে বৈশাখ মাসেও রস থাকে। নতুনদিদিমা বললেন, "তবে উঠনে ইঁদারার ধারে পুঁতে দেওয়াই ভাল, কি বলিস্? বাগানে পুঁতলে তোদের মত হনুমানদের কল্যাণে, আর এই ছোট গাছের কলা একটিও পাওয়া যাবে না।"

আজ আর তুলসী এ কথায় চটে ওঠে না। নতুনদিদিমাকে সে কলাগাছ এনে অবাক করে দিতে পেরেছে, তাতেই তার আনন্দ। সে নিজেই কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে, কলাগাছটা পুঁতে দেয ইঁদারা-তলায়। নতুনদিদিমা সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে কাজে অন্যরকম উৎসাহ পাওয়া যায়।

ঠিকেদারবাবু স্নান করবার সময় এই গাছ দেখে বলেছিলেন, যে তাঁদের দেশে গেরস্থরা এ কলা বাড়ীতে পোঁতে না।

নতুনদিদিমা কথাটা গায়ে মাখলেন না—"ছেলেটা শখ করে এনে পুঁতল! আমি এর নাম দিয়েছি বেঁটেবীর কলা।"

নাম শুনে ঠিকেদারবাবুও হেসেছিলেন। এর তিন চার মাস পরেই একজ্বরীতে ঠিকেদারবাবু মারা যান।

বিধবা হ'বার দিন নতুন দিদিমা ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন। পাড়ার মেয়ে-পুরুষে উঠন বারান্দা ভরা। রায় বাহাদুরের ছেলে ফটো তুলবার জন্য ক্যামেরা ঠিক করছেন। কান্নার মধ্যে নতুনদিদিমার মুখে কেবল এক কথা—"আমি কা'কে নিয়ে থাকব।"

কে এর জবাব দেবে? কা'রও সাহস নেই বলবার—"কেন, তোমার তো তারা থাকল, কেষ্ট থাকল, গুটলি থাকল, এত বড় সংসার থাকল। তোমার কিসের অভাব? নাও, আর কেঁদো না! চুপ কর!"

"কাকে নিয়ে থাকব?"—ব্যথাকাতর গোঙানির মত। অদ্ভুত প্রশ্ন। এত নৈর্ব্যক্তিক, যে কেউ জবাব দেয়নি। উদ্দেশ্য-হীন জিজ্ঞাসার সুরে সবাই বুঝেছে যে কথাটি আসছে অন্তরের গভীর থেকে। নিজেকে একেবারে একা লাগছে তাঁর আজকে। মনের কতটুকু জায়গাই বা জুড়ে ছিলেন 'বাড়ীর-মানুষ!' কিন্তু জীবনের যে প্রায় সবখানিই! একা থাকার কষ্ট নয়, আঁধারে নিসঙ্গতার ভয়। সম্পূর্ণ অসহায় বোধ হচ্ছে নিজেকে। আপদ বিপদ ঝড়ঝাপটা আড়াল করে দাঁড়াবার একটা লোক ছিল! পাওয়ার মধ্যে জীবনে এই নিরাপত্তাটুকু পেয়েছিলেন! সেই 'বাড়ীর-মানুষও' চলে গেলেন! এখনও যে জীবনের অনেক পথ বাকি। কেষ্ট যে এখনও এতটুকু ছেলে! এই দিনের ভয় তাঁর চিরকালের। তবু মনের মধ্যে আশা ছিল—সত্তর বছর, আশী বছর বাঁচেও তো কত লোক! কেষ্ট মানুষ হবার পর যদি, তাঁর এই কপাল পুড়ত!...

তাকানো আর যায় না সেদিকে? হয় না একরকম? অনেক জিনিসের দিকে তাকাতে সঙ্কোচ? লজ্জালজ্জা ভাব? ঠিক যদি নতুনদিদিমা চোখের জলের মধ্যে দিয়ে দেখে ফেলেন যে, সে তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে! তাহ'লে কি লজ্জার কথা হবে! নতুনদিদিমাকে কাঁদতে দেখলে পিলের চোখেও জল আসে। তুলসী আবার তার দিকে দেখছে না তো? পিলে তুলসীর দিকে তাকাল। সে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে নতুনদিদিমার দিকে। বিস্ময়-বিহ্বল চাউনিতে ধরা দিয়েছে গভীর বেদনাবোধের ব্যঞ্জনা।...

মড়া বার করবার জন্য লোকরা ঘরে ঢুকলে নতুনদিদিমা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন—"ওই যমদূতরা এসেছে রে!" তারপর কান্নার শব্দটা বদলে গেল একটা গোঙানির মত আওয়াজে।...গলা বেয়ে কান্না ঠেলে আসছে পিলেরও। কি মনের জোর এই লোকগুলোর! চেষ্টা করেও আর নতুনদিদিমার দিকে না তাকিয়ে পারে না সে এখন।...

সেদিন বাবা পিসিমা দুজনেই ঠিকেদারবাবু বাড়িতে। বাড়ি ফিরবার তাগিদ নেই। পিলে তুলসী দুজনে ঠিকেদারবাবুদের বাগানে গিয়ে বসেছিল, সন্ধ্যার সময়। তুলসীর অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি, তাই বাগানে এসে বসতে হয়েছিল। নতুনদিদিমার উপর সহানুভূতিতে দুটি মন আজকে মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছে। সুবিচার পাওয়া যায় না মৃত্যুর কাছ থেকে। এর আগে তারা বহু লোককে মরতে দেখেছে। নিজের মা স্বর্গে যাবার সময় তুলসীর মন খারাপ হয়েছিল। কিন্তু তখনও এ চোখে সে মৃত্যুকে দেখেনি।

"বড়ডো মরে যায় রে সকলে!" জোনাকি পোকার আলোয় ঝুপসি অন্ধকারের মধ্যে যেন তুলসী এই গভীর দার্শনিক তত্ত্বটিকে দেখতে পাচ্ছে। আজ আর সে একবারও স্বর্গগত ঠিকেদারবাবুকে 'পাষণ্ড' বলেনি।

পিলেরও অসঙ্গত মনে হ'ল না তুলসীর মন্তব্যটি।

"হ্যাঁ। বিয়ে করলেই দেখবি, হয় বউ মরে যায়, না হয় বর মরে যায়।"

আবার দুজনে চুপচাপ কিছুক্ষণের জন্য।

"আমি কিছুতেই বিয়ে করব না!"

"আমিও। দেখিস। এই বলে রাখলাম।"

পাতার খড় খড় শব্দ শোনা গেল, বাঁশঝাড়ের দিকে। শিয়াল তো না, মানুষ! ফুদি মিস্ত্রীই হবে বোধহয়—ঘটি নিয়ে বেরিয়েছে। লোকটি কাছ দিয়ে চলে গেল, কোন দিকে লক্ষ্য না করে। অন্ধকারেও দেখা গেল, কাঁধে ছাতাটা বন্দুকের মত করে তোলা—বিস্কুটের মত কি যেন একটা চিবুবার শব্দ। গাঙ্গুলিমশাই না? দুজনেই একই সঙ্গে চিনতে পেরেছে? কিন্তু-কিন্তু হয়ে তুলসী বলে—"বাবা ফুদি মিস্ত্রীর বাড়িতে মধ্যে মধ্যে তাড়ি খেতে যায়।"

পাড়ার প্রত্যেকেই গাঙ্গুলিমশায়ের মদ খাওয়ার কথা জানে। কোন নেশাই বাদ যায় না ভদ্দরলোকের একথাও বহুলোককে বলতে শুনেছে পিলে। কিন্তু এসব কথা কেউ কোন দিন তুলসীর সম্মুখে বলে না—সৌজন্যের খাতিরে। আজ তুলসী প্রথম নিজ মুখে নেশা করবার কথা স্বীকার করল! নিজেই গায়ে পড়ে একথা তুলল কেন? গাঙ্গুলিমশায়ের মিস্ত্রীবাড়ী যাবাব কারণ যাতে পিলে অন্য কিছু না ভাবে, তাই বোধহয় এই তাড়ি খাওয়ার কথা তোলা! বাবার সম্মান বাঁচানোর জন্যই হয়তো তুলসী, অপেক্ষাকৃত কম অসম্মানজনক অপবাদেব কথাটা স্বীকার কবল! কে জানে...!

তুলসী একটি আমের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে বলে—"বল! এই আম্রপল্লব ছুঁয়ে বল, কোন দিন বিয়ে করবি না!" পঞ্জিকার মত, আম্রপল্লবও ঠাকুরদেবতার জিনিস। ও নিয়ে ছেলেখেলা নয়। সেই জিনিস ছুঁয়ে দুজনে প্রতিজ্ঞা করে, কিছুতেই তা'রা বিয়ে করবে না—মরে গেলেও না।

"আমি যদি অনেক টাকা রোজগার করে নিয়ে আসি; আর তুই যদি বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করিস্ 'সায়েন্স-টায়েন্স'—তাহ'লে বেশ হয়। না? কেমন দুজনে একসঙ্গে থাকা যায়।"

অস্বাভাবিক পরিবেশে, অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় দুটি মন গতানুগতিক ধারায়, ভাবতে ভুলেছিল সব জিনিস, কিছুক্ষণের জন্য। কথাবার্তা, চিন্তা সবই আজ খাপছাড়া; একটার সঙ্গে আর একটার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া শক্ত। কিন্তু ছিল নিশ্চয়ই। মৃত্যুর আর বিয়ের কথা তারা এক নিশ্বাসে বলেছিল কি ভেবে, তা তা'রাও স্পষ্ট জানে না। তবে পিলেব মা ও তুলসীর মায়ের স্মৃতি, নতুনদিদিমার কপাল, গাঙ্গুলিমশায়ের আচরণ, ঠিকেদারবাবুর স্বার্থপরতা, সব জিনিস মেশানো এর মধ্যে। আমের শাখাটিকে অন্যমনস্কভাবে হাতে নিয়েই তুলসী ওঠে।

"মনে আছেরে পিলে, এই আমের ডাল ভাঙ্গা নিয়ে নবীন সেকরাকে ঠিকদারবাবু কি বলেছিল?—দাঁতন ভেঙ্গে ভেঙ্গেই আমার আমবাগানটাকে সাবাড় করে দিলে যে হে নবীন! নবীন সেকরা পালানোর পথ পায় না। হাসির কথা না? এত বড় আমগাছ থেকে একটা দাঁতন ভাঙ্গলে কি হয়? সঙ্গে নিয়ে গেল না কেন, আমবাগানটাকে।"

নতুনদিদিমার কপালের কথা ভাবতে গেলেই বেআক্কেলে ঠিকেদারবাবুর কথা যে আপনা থেকে মনে আসতে বাধ্য! যতই জোর করে আজকে 'পাষণ্ড' না বলো! এতক্ষণকার বলা, না-বলা সব কথাগুলোর কেন্দ্র জুড়ে রয়েছেন নতুনদিদিমা।

পরে নতুনদিদিমার নিজের মুখে বহুদিন শুনেছি তাঁর এই সময়ের মানসিক অবস্থার কথা। যে বিধবা হয় তারই নাকি বড় লজ্জা লজ্জা করে।..."বুঝবি নারে তোরা, 'বাড়ীর-মানুষ' চলে যাওয়ার সে কি লজ্জা, কি লজ্জা! ইচ্ছে করে মাটির সঙ্গে মিশে যাই, যার হয়েছে সে-ই জানে। মনে হয় পৃথিবী সুদ্ধ সবাই আমার থান কাপড়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আর নিজেদের মধ্যে কত কি বলাবলি করছে; সাদা কাপড় পরবার কপাল যেন আমি নিজের চেষ্টায় করে নিয়েছি। হে ভগবান! আমার শত্রুও যেন কখন বিধবা না হয়! কেউ আমার মুখের দিকে তাকালেই মনে হ'ত যেন সে সাদা সিঁথিটার মধ্যে চোখ বিঁধিয়ে দিল। মিস্ত্রীবউটা পর্যন্ত গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসবার

পরামর্শ দেয়। মরমে মরে যাই। মনে হয় যে, সেটা সুদ্ধ নিজের সিঁথির সিঁদুর থাকার গরবে, আমার উপর একটু করুণা দেখিয়ে নিল। বাড়ির-মানুষ চলে যাবার একমুহূর্তের মধ্যে, পৃথিবীর সবাই আমার চেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে।...বসে আছি। গয়লানী দুধ নিয়ে এল। সে দু পয়সা সুদে আমার টাকাটা আধুলিটা খাটিয়ে দেয়। এসে যেই জিজ্ঞাসা করল—টাকাগুলো জমিয়ে রেখেছেন তো মাইজী, অমনি মনে হ'ল যে আমার হাতে লোহা শাঁখা নেই, তাই দেখছে পটপট করে। হাত দু'খানাকে কাপড়ের মধ্যে গুটিয়ে টেনে নিই। হাতে কুষ্ঠ হলেও বোধহয় অমন করে হাত লুকোতাম না, বাইরের লোকের কাছে। গল্প করতে করতে কোন সধবা হাত উঁচু করলে, সন্দেহ জাগে মনে—হাতের শাঁখা দেখাচ্ছে না তো? সিঁথি পর্যন্ত ঢেকে মাথায় কাপড় দেওয়া, এ বোধ হয় বিধবা হওয়ার পর যত দিয়েছি, বিয়ের কনে এসেও তত দিইনি। ভুল! ভুল! এখন ভাবি আর মনে মনে হাসি—পরনে থানধুতি, তাই দিয়ে সিঁথি ঢাকছি, তারই মধ্যে হাত লুকচ্ছি! সত্যি করে বলতে কি, এক কেবল সুরকি-কোটো-বুড়ি ভিখুয়ার-মায়ের কাছে লজ্জা করত না। তারও যে ঐ কপাল। একরত্তি ভিখুয়াটাকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। তার দিকে তাকাই; তারও চোখের জলে বুক ভাসে, আমারও চোখের জলে বুক ভাসে। দু পয়সা সুদে ও আমার কম টাকা নিয়েছে! কখনও এক পয়সা এদিক ওদিক হয়নি। আমিও হিসাবপত্র জানি না; ও-ও জানে না; প্রত্যেকবার একটা করে টাকা দিয়েছে, আর একটা পাটের দড়িতে একটি করে গিঁট দিয়েছে। সেই প্রথম আসবার দিন থেকে ও আমাকে ভালবাসে।...কারও বাড়িতে সাধ বিয়ে বারব্রত হচ্ছে শুনলেই বুক দুরদুর করত। যেতে বলবেই। গেলেও দূরে দূরে কিন্তু কিন্তু হয়ে থাকা; না গেলেও বলবে টাকার গরমে এল না। এসব আমার মুখস্থ রে, এসব আমার মুখস্থ! আজকাল বিয়ে বাড়িতেও যাই, সবই করি। চোখে সওয়া আটপৌরে বিধবা হয়ে গিয়েছি এখন। লোকের চোখে আমার অলক্ষুনেপনার ধক কমেছে! তাই কি এখনও কোন বিয়ের মণ্ডপে গিয়ে ছোঁযাছুঁয়ি করি, সে ঐ দূরে দূরে থেকেই দণ্ডবৎ!...তোর পিসিও কম নয় পিলে, বুঝেছিস। সে-মানুষ চলে যাবার, তিনদিন পরেই আমার উপর সোহাগ দেখাতে এলেন—'রাতে দুখান লুচি পরোটা খেয়ো। তোমাদের মধ্যে তো রাতে ময়দা খাওয়া চলে।' শোন, একবার কথা! কেঁদে মরি! মুখ বুঝে সহ্য করে যাই সব। বাড়ির মানুষ চলে গেলে ব্যাঙেও লাথি মারে। বাইরের লোকে তো বলবেই—আপনার জনই ব'লে ছেড়ে কথা বলেনি। শুধু সে সময় কেন; উঠতে বসতে আজও বলছে সে সবতো তোরা জানিসই। তোর মনে আছে কি না জানি না—না, থাকবারই কথা। তোরা ভুলতে পারিস; কিন্তু আমি যে ভুক্তভোগী। আমি কি ভুলতে পারি সে কথা? বাড়ীর-মানুষ চলে যাবার পরদিনই—তখনও জলস্পর্শ করেছি কি না করেছি—তারা বলে কিনা যে আমিই নাকি তাঁকে মেরে ফেললাম, বাড়িতে কাবলেকলার গাছ পুঁতে। আচ্ছা বলো? বলারও তো একটা ইয়ে আছে। ছি ছি ছি ছি। তারার বউ গুটলি আরও কে কে যেন—ঘর ভরতি লোক—তাদের সম্মুখে। তারা যখন বলে, তখন একেবারে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে। কিছু রেখে ঢেকে তো আর বলে না। এত বড় কথা! ইচ্ছা হ'ল যে বলি—ক্ষতিটা বুঝি তোর একার? আমার বুঝি কিছু না? তোর বাবা আমার বুঝি কেউ ছিল না? শাঁখা সিঁদুর ঘুচল কার? এই নাবালক ছেলেটাকে কে পেটে ধরেছিল? এর আগে তোর যে মা মারা গিয়েছিল, সে কোন্ কলাগাছ লাগিয়ে? তবু কিচ্ছু বললাম না। বলিনি ওদেরই মুখ চেয়ে—যাতে গুটলি, বউমা একদিনের জন্যও আমাকে নীচু মনের লোক না ভাবে। তাদের মা ভাগ্যবতী সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে স্বর্গে গিয়েছেন, তাঁকে কেন টেনে নিয়ে আসি, এই সব সংসারের ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে। পাশও দিইনি, লেখাপড়াও শিখিনি; কিন্তু তাই বলে মন ছোট নয়, বুঝলি! সব মনের কথা চেপে চেপে, একেবারে যাবার জো হয়েছি! তবু কি লোকে কথা শোনাতে ছাড়ে! সময়টা বোঝ! তখন কি কেউ কাউকে কিছু বলে? না, তখন আমার জবাব দেবার সময়! পাওনাদারেও ওরকম বিপদের সময়, দু'চার দিন তাগাদা দেওয়া বন্ধ করে। তারা কিন্তু কাটা

ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে ছাড়েনি। মাও যা ঘটিও তাই! পরেও একথা তারা হাজার দিন বলেছে; যতকাল বাঁচব এ খোঁটা আমায় শুনতে হ'বে। ঘেন্নায় কোনদিন তারাকে একথার জবাব দিইনি। আমি ফেলব সে-লোককে মেবে? লাভ? বলবার আস্পর্ধা দেখ! বলতে চাই না, কিন্তু টাকাকড়ির কথাই যদি ধরিস—তা'হলে তুইই তো সর্বস্ব পেয়েছিস! আমার জন্য সে-মানুষ কি দিয়ে গিয়েছে? তোর ক্ষতির চেয়ে আমার ক্ষতি অনেক বেশী বুঝলি! সে বুঝবার ক্ষমতা থাকলে কি আর লোকে বলে!"...

মধ্যবিত্ত কেরানীর ছেলে হ'লে কি হয়, পিলেদেব দলের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে তুলসীর আর্থিক অবস্থাই ছিল সবচেয়ে ভাল। কারণ ছেলেবেলা থেকেই সে হাট-বাজার করত, জলখাবারের পয়সা পেত। আর এখন তো কথাই নেই। গাঙ্গুলিমশায়ের মাইনের টাকাটা একরকম তারই হাত দিয়ে খরচ হয়। বাড়িতে না বলে পিতলের বাঁশি কিনবার পয়সা আছে তার—বাঁশি নয়, তুলসীর ভাষায় 'বিশার্প'। শুনে শুনে দু'তিন বছর পর্যন্ত সে সময় পিলেরও ধারণা ছিল, যে ঐ বাঁশিগুলোকে 'বিশাপ'ই বলে। তা'রা অবাক হয়ে যেত তুলসীর সৌভাগ্যে—তার পকেটে পাঁচ টাকার নোট! পইতার টাকা দিযে সে হারমোনিযাম কিনেছিল; গাঙ্গুলিমশাই বারণ করেননি। তিনি মাইনের টাকাটা যে দেরাজে রাখতেন, সেটা যখন ইচ্ছা খুলবার অধিকার ছিল তুলসীর। ঠিকেদারদের কাছ থেকে পাওয়া উপরি টাকাগুলো তিনি রাখতেন দেরাজের অন্য একটা খোপে; কিন্তু তার চাবি রাখতেন নিজের কাছে। পিলের সে সময়েব বুদ্ধিতে মনে হত যে, কত টাকা নেশাটেশায় খরচ করেন, তার আঁচ যাতে ছেলে না পায়, সেই ভেবেই গাঙ্গুলিমশায়ের এই ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পিলে পেয়েছিল, পরীক্ষার ফল বার হবার পর, তুলসী আবার যখন নেপালে পালায় তখন।

ছেলে পালিয়ে যাবাব পর দিন গাঙ্গুলিমশাই পিলেদের বাড়িতে এসেছিলেন খোঁজ করতে, যে তুলসী বন্ধুর কাছে কিছু ব'লে গিয়েছে কিনা। পিলের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু নিয়েটিয়ে...?"

গাঙ্গুলিমশাই বাবাব মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেন—"না না। বুঝতে তো পারিনি সে রকম কিছু।"

"তবে আর কি। দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। এর আগেও একবার পালিয়ে ছিল না? নেপালে না কোথায় যেন?"

"ভাল লাগে না ওব, বাড়িতে!"

ছোট্টো কথাটি, কিন্তু এর সুর ভিজে। নতুন নতুন লাগল সেদিন গাঙ্গুলিমশাইকে। থাকেন অমনি চুপচাপ; কিন্তু উদাসীনতার মধ্যেও এত টান! যে নেশাখোর লোকটা ফুদিমিস্ত্রীব বাড়িতে যাতায়াত করে, তারও তুলসীর মায়ের কথা বলতে গিয়ে গলা ভিজে ওঠে! তবে গাঙ্গুলিমশায়ের এই কথার সুরের সঙ্গে, নতুনদিদিমার সেই "তোর তো তবু পিসিমা আছে," কথাটির সুরের বড় বেশী মিল। পিলে ঠিক ক'রে ফেলে যে তুলসীর বাবার এই কথাটি সে কিছুতেই বলবে না নতুনদিদিমার কাছে। বললে তার লোকসান। নতুনদিদিমা জোর পেয়ে যাবেন পিলেকে আরও নীচে 'সেকেণ্ড' করে দিতে। দেখছে তো সে! তার পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্যে নতুনদিদিমার ঔৎসুক্যই নেই। "পিলেটা তো ভালই করে পরীক্ষায়; ওর বাবা যে ওকে নিয়ে বসে পড়ায়", এই হচ্ছে পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে তাঁর একমাত্র মন্তব্য। তিনি কি বলতে চান তা' পিলে জানে। তিনি বলতে চান যে গাঙ্গুলিমশাই ছেলের পড়াশোনা সম্বন্ধে উদাসীন ব'লেই তুলসী পাশ করতে পারে না। কথাটা হয়তো ঠিক! কিন্তু নতুনদিদিমা কি পিলের উপর একটু অবিচার করছেন না?...

তুলসী পরীক্ষায় কেন যে ফেল করে তা পিলে কিছুতেই বুঝতে পারে না। গান যার মুখস্থ হয়ে যায় একবার দু'বার শুনলেই, তাকে রচনা আর জ্যামিতি কেন যে এত চেষ্টা করে

মুখস্থ করতে হয় বোঝা যায় না। ভেবে চিন্তে বিশ্লেষণ করে সে লোকচরিত্রের যেটুকু বোঝে, তুলসী সেটুকু সাধারণত বুঝে যায় অনায়াসে, সঙ্গে সঙ্গে। ওর ভাববার দরকার হয় না। নিরিবিলিতে কোন একটা জিনিস ধীরে সুস্থে বুঝে নেওয়াতেই পিলের স্বস্তি ঃ যত দেরি ততই তার সুবিধে, তত তলিয়ে বুঝতে পারে। তুলসীর ব্যবহারের মধ্যে যেমন একটা চালাক চটপটে ভাব আছে, বুঝবাব বেলাতেও সেই রকম।

অথচ পরীক্ষা দিয়ে তুলসী বলে যে, বেশ ভাল দিয়েছে। 'যে ক'দিন ফল না বেরয় সে ক'দিন অন্যরকম ভেবে মন খারাপ করতে যাই কেন?' এখন কি হচ্ছে সেইটাই সবচেয়ে বড় কথা; আগেকার বা পরের কথা নিয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না।

বাবাদের মত ছিল—'গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে বুদ্ধিমান তো খুব; কিন্তু ওর সব বুদ্ধি ছোটবেলাতেই খরচ হয়ে যাবে।' ওর বুদ্ধির ধরণটাই যে আলাদা, একথা পিলে ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

তুলসী ফিরে এসেছিল দিন দশেক পর। এবার একটা নেপালী কুকুর নিয়ে।

"এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে?"

"তেরো টাকায় আর ক'দিন চলে।"

তুলসী স্বীকার করে যে, দেরাজের মাইনের খুপীতে মোটে তিন টাকা ছিল; মাসের শেষ কিনা। বাবার খোপ থেকে সে নিয়েছিল একখানা দশটাকার নোট। বাবার বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে সে খুলেছিল দেরাজের ঐ খুপীটা—রাতে কি তাঁর সাড় থাকে? চোরে বাঁধানো-দাঁতের পাটি মুখ থেকে খুলে নিলেও ঘুম ভাঙবে না।

বাবার নেশা করবার কথা পিলের কাছে বলবার লজ্জা কেটে গিয়েছে, সেই আমবাগানে প্রতিজ্ঞা করবার দিন থেকেই। তুলসী পিলেকে বারবার জিজ্ঞাসা করে যে তার দশ টাকা নেবার কথা গাঙ্গুলিমশাই কাউকে বলেছেন কিনা...বলেননি যখন, তখন নিশ্চয়ই টের পাননি। অনেক নোট আছে কিনা!...

পিলে শুধু মনে মনে ভাবে যে নিলই যদি তুলসী, তবে মোটে একখানি নোট নিল কেন? আরও নিলে তো অনেক দিন নেপালে থেকে আসতে পারত। নতুনদিদিমার সঙ্গে অনেকদিন দেখা না হ'লে কি খারাপ যে লাগে অ' সে জানে। সেই জন্যেই বোধ হয় তুলসী বেশী নেয়নি। এ হচ্ছে 'নেওয়া'—চুরি নয়। তুলসীর টাকা নেওয়াকে 'চুরি' ব'লে ভাবতে তার বাধে।

এইবার নেপাল থেকে ফিরে আসবার পর থেকে তুলসীর হাবভাবে এমন কতকগুলো পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, যার থেকে বোঝা যায় যে, সে বড় হয়েছে। কেউ কি দিনক্ষণ ঠিক ক'রে বড় হয়? গোঁফ ওঠা, গলার স্বর মোটা হওয়া বা অন্য শারীরিক লক্ষণগুলোর কথা হচ্ছে না। এ হচ্ছে অন্য কথা; মনের একটা পরিণত ভাবের কথা। খানিকটা আত্মপ্রত্যয়বোধের উপর এর ভিত্তি। তার নিজের খেয়াল থাকে না হয়তো, কিন্তু যে তার সঙ্গে কথা বলে সেই বুঝতে পারে যে, এ আর ছোট নেই। অপরিচিত লোকে তুমি না ব'লে আপনি বলে। বাড়িতে চা তয়ের হলেই তার কাছে চায়ের পেয়ালা পৌঁছে যায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে পায়চারি ক'রে চলন্ত ট্রেনে বাহাদুরি দেখিয়ে উঠবার স্পৃহা আর থাকে না। সিগারেট ধরাবার সময় পরিবেশের কথা মনে পড়ে না। এই রকম আরও অনেক মনের ভাব যখন সহজভাবে আসে, তখনই লোকে বড় হয়। এক-একজনের এক-এক বয়সে এই পরিণত মনের ভাব আসে। তুলসীর এসেছিল তাড়াতাড়ি। কবে থেকে আসছিল কে জানে; লোকের নজরে পড়ল এতদিনে। এইজন্যই বোধ হয় নতুনদিদিমা দাজুর মা-বোনের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেননি তুলসীর কাছে। এইজন্যই বোধ হয় তিনি 'ভালবাসা'র বদলে 'টান ভালবাসা' কথাটি বেশী ক'রে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন পিলে তুলসীর ক্ষেত্রে এখন থেকে।

..."ভালবাসা অনেক রকম আছে তো। রায়বাহাদুরের সঙ্গে হচ্ছে শুধু 'খাতির-ভালবাসা'। পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে হয় 'ভাব-ভালবাসা'। বরের সঙ্গে হয় 'প্রেম-ভালবাসা'। গুটলি, কেষ্ট এদের সঙ্গে 'আপনাত্বি-ভালবাসা।' আর তোদের সঙ্গে 'টান-ভালবাসা'। আমার কাছে যে ছুটে-ছুটে আসিস...একি সোজা টান? তোদের কাছ থেকে পাওয়া এত 'টান-ভালবাসা', আমি কি করে যে শোধ দেব বুঝেও পাই না!"...

এইবার বাড়ি ফিরে আসবার পর থেকে পিলে আরও লক্ষ্য করে যে, তুলসীর আর্থিক স্বাচ্ছল্য আগে থেকে বেড়েছে। কেন না, এখানে একটা সার্কাসের দল এসেছিল। তুলসী প্রত্যহ সার্কাস দেখে দেখে তাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছিল। তাদের কাছ থেকে একটা কর্নেটও কিনেছিল। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কর্নেটেরও দাম নিশ্চয়ই কম নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য যে, গাঙ্গুলিমশাই একবার ছেলেকে জিজ্ঞাসাও করেন না যে, এ কিনবার টাকা সে পেল কোথা থেকে।

পাড়ায় সাড়া প'ড়ে গেল। এর আওয়াজটা যে বড় জোরে। পাড়ার মতামত উপেক্ষা করবার ঔদ্ধত্য এই গোরার-বাদ্যির উৎকট ধ্বনির মধ্যে। 'লক্ষ্মীছাড়াটা ঐ মাদ্রাজী-মেয়েওয়ালা সার্কাসের দলের সঙ্গেই চলে গেল না কেন?' এই হ'ল বড়দের সাধারণ মন্তব্য। এর আগে পর্যন্ত তুলসী কত কাণ্ডই করেছে—রাস্তার ডাস্টবিন রাত্রে গাছের মগডালে বেঁধে দিয়ে এসেছে; রায়বাহাদুরের চলন্ত গাড়ির পাদানে উঠে তাঁকে ঠাট্টা ক'রে কীর্তন গেয়েছে। কিন্তু সে সব ছিল দুরন্তপনা। সমাজকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে কর্নেট বাজানোকে ছেলেমানুষি ব'লে আর উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এখন যে ও বড় হয়েছে!

পাড়ার লোকের মুখে শুনে শুনে নতুনদিদিমা পর্যন্ত তাকে না ব'লে থাকতে পারলেন না।

"হ্যাঁরে, ও ছাইয়ের বিউগেল কিনতে গেলি কেন?"

"পাড়া থেকে গাধা তাড়ানর জন্যে!"

এত চটে বলা যে, নতুনদিদিমা আর কথা বাড়াতে সাহস করলেন না।..তার মন যা চাইবে তা' সে করবে! তোমরা তাকে অন্যায় বল, আর যাই বল!

নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করবার শক্তি তার এসেছে। নিজের খেয়ালের ক্ষেত্রে তার নিজের পছন্দই সব, অপরের মতামত সেখানে অবান্তর, এ বোধ অতি সহজভাবে তার মনে এসে গিয়েছে সেই সময়।...

পিলে যে তুলসীর বড়-হওয়া নিয়ে এত মাথা ঘামায় কেন তা' সে ছাড়া আর কেউ জানে না। এতদিন পর্যন্ত তুলসীর সঙ্গে যখন তখন নতুনদিদিমার সম্বন্ধে গল্প করতে পিলের কোন সঙ্কোচ ছিল না। কেন যেন এখন একটু বাধে। আগে দুই বন্ধুতে এক হলেই আপনা থেকে চলে আসত নতুনদিদিমার কথা। এখন এ জিনিস রোজ হয় না; হয় যেদিন তাঁর সঙ্গে তারাদার কোনও নতুন নটখটি লাগে। এই সময় তাঁর সাধারণ হাসিখুশি—ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য দেখা যেত। নতুনদিদিমা হয়ে যেতেন গম্ভীর, আবহাওয়া হয়ে যেত থমথমে। সেদিন দুই বন্ধু তাদের প্রাপ্য হাসি গল্প আদর মনোযোগ পায় না সেখানে। চা খাওয়ার অভ্যাসের মত এই বরাদ্দ আনন্দের ঝলকটুকু যেদিন মনে না লাগানো যায়, সেদিন একটা গভীর অতৃপ্তি ও নৈরাশ্য নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। মনের ভিতরের খালি জায়গাটুকু তবু খানিকটা ভরানো যায়, তাঁর সম্বন্ধে গল্প করলে। সেদিন বাড়ির বকুনিকে উপেক্ষা ক'রেও অনেক রাত্রি পর্যন্ত তুলসীর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করে। অন্তরঙ্গ তা অনেক বেশি বেড়ে যায়। নিঃসঙ্কোচে প্রাণ খুলে নতুনদিদিমার গল্প করা যায়। ঐ সব দিনগুলোতে বাড়ি ফিরে পড়তে বসলেও কিছুতেই বইয়ে মন বসে না। তুলসীকে কাছে পেতে এত ইচ্ছা করে যে, ভোরে উঠেই তার বাড়ি গিয়ে হাজির হতে হয়, 'মর্নিং-ওয়াক' এর অজুহাতে। দু'টি মনই নতুনদিদিমার ব্যথায় ভারী হ'য়ে উঠেছে। তুলসী নিজে থেকেই কথা পাড়ে।

..."তারাদাটা বাড়িতে নতুনদিদিমাকে 'ডিগ্রেড' করে দিচ্ছে। আর প্রোমোশন দিচ্ছে বউকে।

এত মেয়েমানুষের কথার মধ্যে থাকতে ভালবাসে তারাদাটা! ওটার নাম জয়-মা-তারাদা দিয়ে দিলে কেমন হয় রে?"...

"গুট্‌লিদি কিন্তু মায়ের 'সাইড'-এ।"...

এই হচ্ছে গল্পের ধরন। চলবে যে ক'দিন না নতুনদিদিমার স্বাভাবিক ভাব ফিরে আসে।

তুলসীর এই কর্নেট আর কুকুরের যুগ পিলে ভাল ক'রে উপভোগ করতে পারেনি। কারণ সেটা ছিল পরীক্ষার বছর; বাবা পিসিমার কড়াকড়ি একটু বেশী। দেখা অবশ্য নতুনদিদিমার বাড়িতে বিকালে রোজই হ'ত। কিন্তু যখন তখন তার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া সম্ভব ছিল না। পড়াশোনা সম্বন্ধে তুলসীর উদাসীনতা চিরকালের। পরীক্ষায় পাশ ফেলের দিকটা একেবারে দরকচা-পড়া। এবারেও যে সে ন্যায্যভাবে প্রোমোশন পাবে না, সে কথা সকলেই ধ'রে নিয়েছিল। তবে প্রোমোশন হয়তো পেয়েও যেতে পারে—এ হেডমাস্টারমশাই কাউকে দু'বারের বেশী এক ক্লাসে ফেল করান না! পেয়েও যেত ঠিকই; কিন্তু একটি ছোট্ট ঘটনায় সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। গাঙ্গুলিমশাই তাঁর পুরনো আলেস্টারটা সেবার ছেলেকে দিয়েছিলেন। বাক্সর মধ্যে পোকায় কাটছিল। 'দেখ দেখি তোর গায়ে হয় কিনা'। তুলসীর গায়ে হ'ল—ঝুলে ঠিক আছে—একটু ঢিল ঢিল গোছের—তা হ'ক, চলে যাবে। শোয়া আর স্নান করবার সময় বাদে তুলসী আলেস্টার পরতে আরম্ভ করে অষ্টপ্রহর। সেইটা পরেই পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। নরসিংহপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, বি-এ, বি-টি তখন সবে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন এ স্কুলে। কড়া লোক। তুলসীকে চেনেন না। আলেস্টার পরা দেখে সন্দেহ করলেন যে, সে চুরি করছে পরীক্ষায়। কাছে এসে তুলসীর পকেট সার্চ করতে চাইলেন।

"কেন সার্? Why?" রুখে দাঁড়িয়েছে তুলসী। নরসিংহপ্রসাদ, বি-এ, বি-টি, এরকম ছেলে বহু শায়েস্তা করেছেন। তিনি পকেটগুলো উপর থেকে টিপেটুপে একটু দেখলেন।

"লিজিয়ে সার্!" তুলসী পকেট থেকে বার ক'রে এক প্যাকেট সিগারেট তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। হল ভরা পরীক্ষার্থীর দল অবাক হয়ে গিয়েছে। তাদের চেয়েও অবাক হয়েছেন নরসিংপ্রসাদ, বি-এ, বি-টি, ছেলেটার দুঃসাহস দেখে। রাগে লাল হয়ে ওঠে তাঁর মুখচোখ। "আমাকে সিগারেট দেবার who are you?"

"আমি হু-আর ইউ, না আপনি হু-আর ইউ?" তুলসীর চীৎকারে হলঘর কেঁপে ওঠে।

নরসিংহপ্রসাদ তার খাতাটা নিয়ে বললেন, "চল হেডমাষ্টার সাহেবের ঘরে।"

তাঁর হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে তুলসী খাতাখানিকে দু'টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে। "গুড্ মর্নিং!"

কুর্নিশ ক'রে বেরিয়ে এল তুলসী হল থেকে। এমনি ক'রে নাটকীয়ভাবে তার পড়াশোনা শেষ হয়। পিলেরা তখন টেষ্ট পরীক্ষা দিচ্ছে। পাড়ার লোকদের হতাশ না ক'রে আবারও তুলসী চলে গেল নেপালে। নিয়মিত বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ানয় তুলসীর নেপাল যাওয়াকে আর কেউ 'পালানো' বলে না; বলে নেপাল 'ঘুরে আসা'। এবার নতুনদিদিমা বিচলিত হননি; কারণ এতদিনে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তুলসী যেখানেই যাক, ফিরে আসবেই; এখান ছেড়ে সে বেশীদিন বাইরে বাইরে থাকতে পারবে না।

এবার গিয়ে তুলসী ছিল অনেকদিন। ফিরে এল পিলেদের পরীক্ষা শেষ হবার মুখে—বোধহয় হিসাব করেই। কারণ এখন আড্ডাটা জমবে ভাল। পিলের হাতে অফুরন্ত অবসর; বাবা নেই; পাশের পরীক্ষা দিয়েছে ব'লে পিসিমা সাবালকত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। রাত ক'রে বাড়ি ফিরলে, এমন কি তুলসী রাতে পিলের ঘরে শুলেও পিসিমা আর কিছু বলেন না। গত এক দেড় বছরের মধ্যে দুই বন্ধুতে এত কাছে আসবার সুযোগ আর পায়নি। দেখা হ'ত ঠিকেদারবাবুর বাড়িতে। সেখানকার কথাবার্তা, মনের ভাব, সব অন্য সুরে বাঁধা; নতুনদিদিমাকে ঘিরে সেখানকার পরিবেশ; সেখানকার পিলে গন্ধপাতা, বাইরের পিলে তুলসী নয়, অন্য মানুষ। সেখানকার সমস্ত

জিনিসের মাপকাঠি নতুনদিদিমার মন। বাকি সব অবান্তর। সেখানে যাওয়া সার্থক মনে হয় যদি তাঁর মন সেদিন ভাল থাকে; একটা মজার কথা ব'লে তৃপ্তি হয়, যদি তা' শুনে তিনি হাসেন। সেখানকার পিলের বলা কোন কথা তুলসীর ভাল লাগল কি না লাগল বয়ে গেল। পিলের কাছে তুলসী সেখানে গৌণ—তার মূল্য শুধু নতুনদিদিমা সম্বন্ধীয় চিন্তার লেজুড় হিসাবে। সেখানকার পরিবেষ্টনে একমাত্র তারই কিছু নিজস্ব মূল্য থাকতে পারে যার মধ্যে বাংলাদেশের স্বপন-মাধুরীর স্বাদ খানিকটা পাওয়া যায়। এ জিনিস পিলে তুলসী, গুর্টলিদি, তারাদা, পাড়ার এত ছেলেমেয়ে, কারও মধ্যে নেই।...

কিন্তু নিজেদের বাড়িতে পাওয়া তুলসীর মূল্য অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে। এ তুলসী কতরকম গল্প করে—দাজুর মা বোনের কথা, সার্কাসের মেয়েদের কথা, মিস্ত্রী বউয়ের কথা, গাঙ্গুলিমশায়ের সবরকম কথা। তুলসীর বাবা এতদিন ছিলেন তার ব্যঙ্গরসিকতার বাইরে; এখন আর সেসব কোন বাধা নেই।...একদিন নাকি গাঙ্গুলিমশাই অন্ধকারের মধ্যে মিস্ত্রীবাড়ি থেকে আসছেন, তুলসী ঠোঁটে মুখে অনেকগুলো জোনাকিপোকা আঠা দিয়ে এঁটে গাছের উপর থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়েছিল তাঁর সম্মুখে। ভাঁটের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ভয়ে তাঁর কি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়!...

স্পষ্ট বোঝা যায়, তুলসী দিনদিনই বাবার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে—তবে বাবা গান-বাজনাটা বোঝে ভাল। পিলে তুই তবলা শিখবি বাবার কাছে? তোর পিসিমা আর এখন পাশকরা ছেলেকে বকবে না। একটা কনসার্ট পার্টি খুললে বেশ হয়। মড়া হারমোনিয়াম বাজাবে। আমারও ইচ্ছা ক্ল্যারিওনেট শিখি; কিন্তু তাহলে কর্নেটটা বেচতে হবে। বাবা আবার আজকাল দেরাজের চাবি সব সময় নিজের কাছে রাখতে আরম্ভ করেছে! একদিন আমাকে লেকচারও দেওয়া হল।... "পেনশনের আর মোটে বছর তিনেক বাকি। টাকা পয়সা এখন থেকে কিছু কিছু জমাতে না পারলে পরে খাব কি? ছেলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব বুড়ো বয়সে সে আমি চাই না। নচ্ছার পি. ডবলু. ডি. ডিপার্টমেন্টের চাকুরি! ক'টাকাই বা পেনশন পাব?"...কি ভেবে যে এত উপদেশ দেওয়া হ'ল সে কি আমি বুঝি না! নিজে যে মাসে কত টাকার শ্রাদ্ধ করেন তা যেন আমার জানা নেই!...

এতক্ষণে পিলে ধরতে পারে, কেন তুলসী আজকাল বাবার উপর এত বিরূপ। গাঙ্গুলিমশায়ের মত আপনভোলা লোকেরও ছেলের পালানোর সঙ্গে দেরাজের টাকা কমবার একটা সম্বন্ধ নজরে পড়েছে এতদিনে! ছেলেকে পরিষ্কার না ব'লে, ঘুরিয়ে বলেছেন কথাটা। তুলসী বুঝেছে ঠিকই। তবু শিষ্টাচারের খাতিরে বন্ধুর বাবার সমর্থনে পিলেকে একটা কিছু বলতে হয়।

"আমার ধারণা, যে তুই পড়াশোনা ছেড়ে দিলি ব'লেই তিনি তোর ভবিষ্যতের জন্য এত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন হঠাৎ।"

কথাটা তুলসীর মনঃপূত হ'ল না। "তুই যতই ম্যাট্রিক পাশ করিস পিলে, তোর চেয়ে বেশী রোজগার আমি করবই!"

"না না, আমি কি সে কথা বলছি।" পিলে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। পড়াশোনা ছাড়ার কথাটা তোলা ঠিক হয়নি! পড়াশোনা সম্পর্কিত দরকচা পড়া স্থানটি হঠাৎ এত স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে কেন তুলসীর? নিজে ভালভাবে জানবার আগেই কত অজানা চর নিত্য-নূতন মনের মধ্যে গড়ে ওঠে! পরীক্ষা দেবার পর পিলে যে খানিকটা নতুন অধিকার পাচ্ছে নতুনদিদিমার কাছে, সেইটাই কি তা'হলে হীনতাবোধ জাগিয়ে তুলছে, পড়াশোনার ব্যাপারে নির্বিকার তুলসীর মনে? তুলসীর মনের পরিবর্তনের সঙ্গে নতুনদিদিমার সম্পর্ক না থেকে পারে না। তারই মত তাহ'লে তুলসীও ব্যথা পায়? নতুনদিদিমার কাছে, অবিসংবাদী অধিকারে আত্মপ্রতিষ্ঠ তুলসীকে, নিজেরই মত অনিশ্চিত দাবি ও সংশয়ের দোলায় দাঁড় করিয়ে দেখতে পিলের ভাল লাগে। একথা ভাবতেও তৃপ্তি; তাই, নতুনদিদিমার চিন্তা কিভাবে তুলসীকে প্রভাবিত করছে, তার খুঁটিনাটির মনগড়া প্রমাণ

সংগ্রহে পিলের ক্লান্তি নেই।...নূতন অধিকারের মধ্যে—নতুনদিদিমা পিলেকে চুপিচুপি বলেছিলেন—"এখন তো তোর ছুটি; রোজ একটু কেষ্টটাকে নিয়ে বসিস্‌তো! গন্ধপাতা, তারার মত মুখ্যু হয়ে থাকলে কি আর ওর চলে?"

পিলের বাবা মারা গিয়েছিলেন ঠিক তার ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই। টাকা পয়সা বিশেষ রেখে যেতে পারেননি।

কলেজে পড়া হবে না, চাকরি বাকরি নিয়ে এখানেই থাকতে হবে, এই অবস্থার সঙ্গে নিজের মনকে খাপ খাইয়ে নিতে পিলেকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়নি। কিন্তু পিসিমা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।...বাপের ইচ্ছা ছিল অনেক পাশ দিইয়ে 'সায়েন্টি' পড়াতে—মা-মরা ছেলেটাকে সঁপে দিয়ে গেল তাঁর হাতে—অতটুকু ছেলে—এখনও রাতে পায়খানায় গেলে শোবার ঘর থেকে কেশে মধ্যে মধ্যে সাড়া দিতে হয়—ও এখনই চাকরি করবে কি? পিসিমা দিদিকে কি লিখেছিলেন, তিনিই জানেন। জামাইবাবুর জবাবখানা পিলেকে পড়তে দিয়ে তিনি আশ্বাসের সুরে বলেন—"তোর চিরকেলে রোগা শরীর! ডাক্তার হলে অন্তত নিজের শরীরটাওতো ভাল রাখতে পারবি। ক'বছর পড়তে হয়রে ডাক্তারি?"

ঠিক হয়ে গেল যে পিলে ডিব্রুগড়ে দিদির শ্বশুরবাড়িতে থেকে মেডিকেল স্কুলে পড়বে। সে এর আগে ডাক্তার হবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয়। পারবে তো সে রক্ত আর কাটাকুটি দেখতে? বেশ কেমন এখানে চাকরি নিয়ে থাকত! এখানকার সকলকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। বাঙলা দেশ হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। ডিব্রুগড়ে ডাক্তারি পড়তে যেতে সে উৎসাহ পায় না। কিন্তু বাছা-বাছির সুযোগ নেই, যেতেই হবে। উৎসাহ জিনিসটারই তার একান্ত অভাব—যে কোন বিষয়ে। এক শুধু নতুনদিদিমার কাছে পৌঁছনোর ব্যাপারটিতে ছাড়া। তখনই পিলে নতুনদিদিমাকে খবর দিতে গেল। তিনি শুনে খুব খুশী।

"বাঃ। বেশ হ'ল। নিজের লোকজন থাকতে একটা ভাল ছেলের পড়া না হলে বড় দুঃখের কথা হ'ত। তা' কি ভগবান হতে দেন। এখনওতো দেরী আছে যাবার? যে ক'দিন আর আছিস, একটু কেষ্টকে পড়াশোনা দেখিয়ে টেখিয়ে দিস।"

তুলসী বলল, "ডক্টর পিলে! বেশ মাদ্রাজী মাদ্রাজী হবেরে নামটা।"

নতুনদিদিমা তুলসীর কথার প্রতিবাদ করেন ঃ "না, ওকে লোকে পিলে ডাক্তার বলতে যাবে কেন। বলবে ডাক্তারবাবু। কত লোকের পিলে সারাবে ও। জানিসরে পিলে, আমাদের গ্রামে সেই হরিশ ডাক্তারের গল্প করেছি না? তাকে দেখলে ছোটবেলায় যা ভয় করত! হরিশ ডাক্তার কাউকে দেখতে বাড়িতে এলে খাটের তলায় লুকিয়ে বসে থাকতাম।...আর কি এখন থেকে পিলে ব'লে ডাকা চলবে—তুই হবি ডাক্তারসাহেব।...তুই চলে গেলে তোর পিসিমা কিন্তু একেবারে একা পড়ে যাবে। থাকবে কি করে? আমি হ'লে পারতাম না, ভয়েই মরতাম। আমাদেরও খালি খালি লাগবে।"

তুলসী আশ্বাস দেয় "নারে পিলে, তুই ভাবিস না। তোদের বাড়িতে সেরকম দরকার পড়লে আমি তো আছিই।"

নতুনদিদিমা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন ঃ "তুমি তো আমার তুমিই! নিজের বুড়ো বাপকেই বলে কত দেখ! বছরে তিনবার ক'রে নেপালে যাও। তুমি আবার অন্যর বাড়ির দেখাশোনা করবে।"

"এই রে। চটেছে। 'তুমি' বার হচ্ছে দেখছিস না পিলে।"

"দাঁড়াতোরে! দেখাই মজা!..."

হাসির শব্দে বাকি কথাগুলো শোনা যায় না।

এইসব ছেড়ে চলে যেতে হবে; মন খারাপ না হয়ে পারে?

ডিব্রুগড়ে যাবার গাড়ি ভোরবেলায়। আগের দিন রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসে না। সাড়ে বারটা বাজল। পিসিমার ঘরে দরজা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়েছে।...আবার শেষরাত্রে উঠে দুটো ভাতেভাত ফুটিয়ে দিতে হবে; যতই বারণ করুক পিলে; দুটো ভাত পেটে না দিয়ে কি রেলগাড়িতে চড়তে আছে; কলকব্জার কম্ম; কখন চলে কখন থামে, কিছু কি বলা যায়।...

শুয়ে শুয়ে কেবলই নতুনদিদিমার কথা মনে পড়ে। আবার কতদিন দেখা হবে না। কি খারাপ যে লাগে তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে। সেবার যখন গুটলিদির বিয়ের সময় তাঁরা বাড়িসুদ্ধু সবাই এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন, তখন রামশরণ চাকর ছিল বাড়ির চার্জে। সেই সময় পিলে আর তুলসী এক একদিন নতুন-দিদিমার খালি বাড়িতে গিয়ে রামশরণের সঙ্গে গল্প ক'রে আসতে। তাতেও তৃপ্তি।...বড় দেখতে ইচ্ছা করছে তাঁকে। যতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, ততবার তাঁকে নতুন ক'রে পাওয়া যায়। প্রতিবার নতুন আনন্দের স্বাদ। আজ সন্ধ্যার সময় তাঁব সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, তুলসী তখন ছিল। সেটা ছিল ভাগকরা দেখা—একার দেখা নয়। অমন ভাগের নতুনদিদিমাতে মন ভরে না, চলে যাবার দিনে।...এই রাত সাড়ে বারোটার সময় তাঁদের বাড়িতে যাওয়া কি ঠিক হবে? বাড়ির লোকে কি ভাববে? কি আবার ভাববে! ঘুম থেকে বোধ হয় আবার ডেকে তুলতে হবে। না, সে যাবেই। সে আস্তে আস্তে উঠে, নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে; পিসিমা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

নতুনদিদিমার ঘরের জানালা দিয়ে পিলে ডাকল ঃ "নতুনদিদিমা! ও নতুনদিদিমা!"

"কে? পিলে? আয়, আয়।"

মশারি থেকে বেরিয়ে তিনি দরজা খুলে দিলেন। এতরাত্রে আসায় একটুও আশ্চর্য হবার ভাব দেখা গেল না তাঁর মধ্যে—যেন এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ যেন তিনি আশাই করছিলেন। নিজের আচরণের অসামঞ্জস্য পিলে বুঝতে পারছে, তাই স্বাভাবিক ভাব দেখানোর চেষ্টা সত্ত্বেও তার মুখে অপ্রস্তুতের হাসি।

"আমিও জেগে, শুয়ে শুয়ে তোর কথাই ভাবছিলাম। এই খানিক আগে পর্যন্ত আমরা মায়ে-ঝিয়ে তোর কথাই বলাবলি করছিলাম। গুটলিতো এখনই ঘুমল।"

মশারির মধ্যে গুটলিদি ধড়মড়িয়ে উঠল ঃ "না, না, ঘুমইনি। পিলে? কিছু ফেলেটেলে গিয়েছিস?"

"না। ও থাকতে না পেরে এসেছে আমার কাছে। কতদিন দেখবে না আমাকে। আমাকে ছাড়া তো কখনও হয় নি এর আগে।"

"পাগল না পাগল।" গুটলিদির স্বরেও আদর মেশানো।

"মন খারাপ করিস না। ছুটি হলেই তো আবার দেখা হবে।"

অতি সাধারণ কথা। কিন্তু পিলের চোখের জল বাধা মানে না। লণ্ঠনের আলো পড়ে নতুনদিদিমার চোখের কোণাও চিকচিক করছে। পিলের মাথাটা তিনি কাছে টেনে নিলেন, "পাগলা কোথাকার। জোটেও কি সবকটা আমারই কাছে এমনি।"

এই "পাগলা কোথাকার", সম্বল ক'রে পিলে এসেছিল ডিব্রুগড়ে। পড়তে হয়, তাই পড়তে এসেছে। এখন চার বছর কোনরকমে কাটিয়ে দিতে পারলে হয়। বাড়ির জন্যে মন কেমন করে;

কিন্তু বাড়ি মানে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নিজেদের উঠনটুকু নয়। আরও অনেক কিছু—কত স্মৃতি, কত লোক, কত গল্প। একটা অভাববোধ অষ্টপ্রহর মনকে পীড়া দিতে থাকে। সুখ-সুবিধা আরামের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, পিসিমার কাছে যা দিদির কাছেও তাই। তবে এখানে কিসের অভাব? স্পষ্ট বোঝা যায় না কেন এই মৃদু মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য। যেদিন নতুনদিদিমার চিঠি আসে, কেবল সেইদিনই মনের এই অস্বস্তির ভাবটা থাকে না। আর নির্ধারিত দিনে চিঠি না পেলে প্রথমেই তাঁর উপর রাগে সর্বশরীর জ্বলে ওঠে। সে লিখে দিয়েছে রবিবারে রবিবারে চিঠি দিতে, তবু এই ব্যবহার! এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই? সে এখানে কষ্ট করছে আর তিনি কিনা নিজের খেয়ালে উন্মত্ত থেকে চিঠিখানা দেওয়াও দরকার মনে করলেন না? সেও আর কখনও চিঠি দেবে না নতুনদিদিমাকে! যে পিলের কথা ভাবে না, পিলেও তার কথা ভাবে না!...আজ থেকে সে দিদির শাশুড়ীর সঙ্গে বেশী করে গল্প করবে। বড় ভাল ভদ্রমহিলা। দিদিতো মা বলতে অজ্ঞান। তাঁর সঙ্গে বেশী ক'রে আলাপ করলে নতুনদিদিমার ব্যবহারের একটা পালটা জবাব দেওয়া হবে! কি ভাবেন নতুনদিদিমা!...''ও মাউইমা! এখনও কি ঠাকুরঘরে? স্বর্গে আপনার জন্য পাকা দালান তৈরি হয়ে গিয়েছে; আর অতক্ষণ পূজো না করলেও ক্ষতি নেই।''

কিন্তু এত চেষ্টা করেও তোলা যায় না। তারপর ধীরে ধীরে গভীর দুঃখ মনের উপর জমাট হয়ে চেপে বসে। তার ভারে রাগ-অভিমান কোথায় যায় তলিয়ে। মনেব আব সব কাজ বন্ধ হয়ে আসে। ঐ গভীর বেদনাবোধ মনের রাজ্য থেকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে, সারা দেহকে বিকল ক'রে দেয়; মনে হয় যেন স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে আসছে, সেইজন্য এক জায়গায় বসে থাকতে ইচ্ছা করে। একা একা চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে; আলোব চেয়ে অন্ধকার পছন্দ হয় বেশী। শুধু একটি বিষয়ে মন সচেতন থাকে—একথা বাইরের লোকে কেউ যেন জানতে না পারে। দিদির শাশুড়ী শরীর খারাপ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে, বিনা দ্বিধায় জবাব দেওয়া যায়—''হ্যাঁ, মাথাটা একটু ধরেছে।''

...বাইরের লোক মানে নিজেদের বাড়ির লোক। নতুনদিদিমাকে চিঠি লিখবার সময় মনে হয়, তিনি যদি একথা পিসিমার কাছে গল্প না কবেন তাহলে ভাল হয়। পিসিমা, দিদি, সবাই জানেন; তবু পিলে সব সময় নতুনদিদিমার প্রতি তার 'টান-ভালবাসার' গভীরতা তাঁদের কাছে একটু কমিয়ে বলতে চায়। সে চেষ্টা ক'রে দেখেছে যে, এ বিষয়ে সে বাড়ির লোকের কাছে খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না। বিশেষ ক'রে পিসিমার কাছে। পৌষসংক্রান্তির দিন বাড়ি ঢুকতেই হয়তো পিসিমা বললেন, ''দেখিতোরে তোর হাতখানা শুঁকে; নতুনদিদিমা কি আর তোকে পিঠেপুলি না খাইয়ে ছেড়েছে!'' পিলে হেসে মিছে কথা বলে : ''না। ও আলাপ-সালাপ সব কেবল মুখেই।'' আলাপ-সালাপ কথাটি পিলের ভেবে-চিন্তে বাছা। নতুন-দিদিমার সঙ্গে তার সম্পর্কের বিবরণ দিতে হলে, সে পারতপক্ষে 'আলাপ-সালাপ' ছাড়া আর অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করে না।

চিঠি না পাওয়ার ব্যথার তীব্রতা থাকে একদিন। পরদিন সকালে উঠেই মনে হয় যে, আজ চিঠি আসতে পারে। ব্যথার পরিবর্তে নূতন আশায় ভ'রে ওঠে মন। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থির বিশ্বাস জন্মে যায় যে, পোস্ট অফিসের গোলমালেই চিঠি পেতে দেরী হয়েছে। ডাক বিভাগের এই শিথিলতা সে চিরকাল লক্ষ্য ক'রে আসছে! আশা ও উদ্বেগের মধ্যেই তার দিন কাটে, চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত। চিঠি পেলেই সে প্রথমে দেখে, কোণায় রবিবার লেখা আছে কিনা। ঠিক যা ভেবেছে! রবিবারই লেখা। নতুনদিদিমা কখনও দেরী করতে পারেন? তা'ও কি কখন হয়? চিঠিতে নতুনদিদিমা কি লিখেছেন, তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব 'রবিবার' কথাটির। খানিক আগে পর্যন্ত এ ছিল তার আত্মসম্মানের প্রশ্ন। এখন মুহূর্তের ভিতরে কথাটি দু'জনের মধ্যের নিবিড় আকর্ষণের যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবিবারের জায়গায় যদি সোমবার লেখা থাকত তাহ'লে সম্বন্ধের মধুরতা কমে পানসে হয়ে যেত। এতক্ষণে চিঠিখানা পড়বার সময় হ'ল। ভুল বানানগুলোর মধ্যে দিয়ে নতুনদিদিমা একেবারে চোখের

সম্মুখে এসে দাঁড়ান। "কর্তা তো আমার কর্তাই।" "আছে তো সব জিনিসেরই একটা।" "যাও যা ঘটিও তাই"—এইরকম সব নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গিতে ভরা তাঁর চিঠি। এগুলো টেনে নিয়ে যায় পিলেকে ঠিকেদারবাবুর বাড়ির উঠানে।...দাঁতে দাঁত চেপে হি-ই-ই-ই ক'রে তাঁর সেই আদরের শব্দটি পিলে শুনতে পাচ্ছে।...একটা ফিকে হিং-হিং গন্ধ যেন তার নাকে এল।...নতুনদিদিমার অদ্ভুত স্বকীয় বাক্যরীতি যেই চিঠির মধ্যে এক একবার নজরে পড়ছে, অমনি নূতন আনন্দের ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে মন। এ চিঠি পড়ে ফুরনো যায় না। যতবার দেখা যায়, ততবার নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করা যায়। চিঠির উপরের তেলের দাগে, কালি দিয়ে কাটা লেখাটুকুতে, প্রথমবারের মোড়া ভাঁজের রেখায়, ভিজে কালির অক্ষরের উল্‌টো ছাপে, খানিক খানিক নতুনদিদিমা মেশানো।...

শান্ত ভাব ফিরে পাবার পর মনের তাগিদ আসে চিঠির উত্তর দেবার। এ পাওনাদারের প্রথম ডাকে সাড়া দিতে নেই। ঠিক করা আছে যে, সে বৃহস্পতিবারে চিঠি লিখবে। নতুনদিদিমাকে চিঠি দেওয়া ছাড়াও অনেক কাজ আছে তার এখানে! চিঠি লিখবার জন্যে এত হ্যাংলাপনা কিসের? আছে তো সব জিনিসেরই একটা!..কিন্তু রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মনে হয়—এখন লিখে রাখলে ক্ষতিটা কি? বরঞ্চ একটা কাজ সারা হয়ে থাকবে। বিষ্যুৎবারের আগে তো আর সে ডাকে দিতে যাচ্ছে না চিঠিখানাকে। সময়ের আগে চিঠি দিয়ে নতুনদিদিমার কাছে খেলো হয়ে যেতে চায় না সে।

তখনই আরম্ভ হয়ে গেল চিঠি লেখা। প্রথমেই লেখা হ'ল চিঠির কোণায় 'বৃহস্পতিবার'। কোনরকম ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সাদাকথায় ছোট চিঠি লেখার দিকে পিলের সজাগ দৃষ্টি আছে। সবচেয়ে শেষে লেখে "চিঠির উত্তর দিতে দেরি করিবেন না"। বারকয়েক কথাটিকে পড়ে দেখে। আবার বেশী বলা হয়ে গেল না তো? নতুনদিদিমা ঠিক বুঝবেন, সে যা বলতে চাচ্ছে! পিলের ভাষা ও ভাব যে তাঁর জানা! সে রাত্রের মত চিঠি লেখার পর্ব শেষ হ'ল। বিষ্যুৎবারে চিঠি ডাকবাক্সে ফেলবার আগে আবার বাধল গণ্ডগোল, ওই শেষের কথাটিকে নিয়ে। "চিঠির উত্তব দিতে দেরী করিবেন না"—সে যা বলতে চায় সবটুকু কি প্রকাশ পেয়েছে, ঐ ভাবের রসে নিটোল বাক্যটির মধ্যে দিয়ে? যত সংবেদশীল মনই হ'ক না কেন নতুনদিদিমার, আর একটু বিশদভাবে না লিখলে হয়তো ধরতে পারবেন না ওর অন্তর্নিহিত অর্থ। একটু—সামান্য আর একটু জুড়ে ওর সূক্ষ্ম অর্থের সূত্রটি ধরিয়ে দেওয়া উচিত। তা'ই সে ক'রে। "না হইলে একটুও ভাল লাগে না"—কথা কয়টি চিঠির শেষে জুড়ে দিয়ে মনের উদ্বেগ খানিকটা কমে।...একটু শালীনতাবিরুদ্ধ হয়ে গেল না তো? না না, তা' কেন হ'তে যাবে। সহজ কথা সহজভাবে নিলেই হয়! কিন্তু মন বুঝতে চায় কই! যতটুকু উচিত তার চেয়ে বেশী বলা হয়ে গেল, এই চিন্তাই মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ ক'রে বেঁধে। শোভন আর অশোভনের মধ্যে সীমারেখা পার হবার নামে পিলের আতঙ্ক আসে।...কোন একটা কাজ করি, কি না করি, এই নিয়ে যখন সন্দেহ, তখন না করাই ভাল! এরই নাম হিসেব ক'রে চলা! শেষ পর্যন্ত বাক্যটি থেকে "একটুও' শব্দটি বাদ দিয়ে দেয়। "না হইলে ভাল লাগে না" এই লিখলেই যথেষ্ট। চিঠিখানিকে ডাকবাক্সে ফেলে তার মন বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। একটি কঠিন অঙ্কের উত্তর মিলে যাওয়ার পরিতৃপ্তি মনে। নিজেকে খুব ভাল লাগছে!...তবে সে একবার খুলেই বলবে ব্যাপারটা—নিজের কাছে লুকিয়ে লাভ নেই—"একটুও" শব্দটিকে সে এমনভাবে কেটেছে যাতে কাটা সত্ত্বেও নতুনদিদিমা অনায়াসে সেটিকে পড়তে পারেন।

ডিব্রুগড় গিয়ে দু'বছরের মধ্যে পিলে বাড়ি আসেনি। অনেক দূর; আসা-যাওয়ায় অনেক খরচ। একেবারে দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষার পর যাবে। চিঠির যুগ আর ছুটির যুগের মধ্যের প্রাচীর মেডিকাল স্কুলের দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষা। এ প্রাচীর ডিঙানোর পর দেখা পাওয়া যাবে নতুনদিদিমার?

ছুটি পাওয়া যাবে তাঁকে আবার নতুন করে পুরনোভাবে পাবার; এখন শুধু চিঠির মধ্যে দিয়ে পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। চিঠি ছাড়া বাকি সব জিনিস, এখানকার জীবনে অপ্রাসঙ্গিক।

পঞ্জিকার কাগজের মত কাগজে ছাপা একখানা দাদের মলমের ক্যালেণ্ডার সে এনে ঘরে টাঙিয়েছে। তারিখ দেখবার জন্য নয়। সাদা কালো চাঁদের দাগ দেওয়া একাদশী তিথিগুলোর সঙ্গে নতুনদিদিমা জড়িয়ে আছেন বলে ঐগুলোর উপর যখনই নজর পড়ে তখনই মিষ্টি চিন্তার আমেজে মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। একাদশীর দিন তাঁর রান্না নেই, তাই পিলে তুলসীর সঙ্গে গল্প করবার অফুরন্ত অবসর। সেই আনন্দের মৃদু পরশ পাওয়া যায় চন্দ্রকলার ছবিগুলির ভিতর।

একবার সময়ে চিঠি না পেয়ে লিখেছিল ঃ "গত রবিবারে একাদশী ছিল। সেদিন চিঠি ডাকে না দেবার কোনও অজুহাতও আপনার নেই।" উত্তরে নতুনদিদিমা লিখেছিলেন ঃ "একাদশীর হিসেব ওখানেও আছে দেখছি বাবুর। এ একাদশীতে গন্ধপাতা আসেনি ব'লে ঠিকানা লেখাতে পারিনি।"

নতুনদিদিমার সন্তোষজনক উত্তরে মনের অশান্তি কমে কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে অন্য কত প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে...তুলসী একাদশীর দিন আসেনি কেন?...আর যতবার নতুনদিদিমা চিঠি লিখবেন, ততবারই কি তাঁকে তুলসীর মুখাপেক্ষী হতে হবে, ঠিকানা লেখানর জন্য? তার ঠিকানা লেখা খাম নতুনদিদিমাকে পাঠিয়ে দিলে হয় না?...ভাল দেখায় না। তুলসী আবার কি ভাববে!...তুলসী নতুনদিদিমার চিঠির উলটো পাতায় প্রতিবারই দু' এক লাইন পিলেকে লিখে দেয়। এময় দায়সারা এক লাইনের চিঠি কেন? চিঠি লিখতে হলে আলাদা চিঠি দিলেই তো পারে।...সেখানকার পোষ্ট অফিসের ছাপের তারিখটা প্রতিবারই এমন কালি ধেবরানো থাকে কেন?...এসব প্রশ্নের শেষ নেই।

সামান্য পড়াশোনার কাজ ছাড়া সমস্ত মানসিক ক্রিয়াশীলতা খরচ হয় চিঠি সম্পর্কিত এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে। নিজেই ভাঙ্গে, নিজেই গড়ে। স্বপ্নজাল বোনে; ক্ষণিকের জন্য তা'তে বাঁধা পড়ে, তা'র মাদকতার স্বাদ নেয়; আবার ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। কেবল ছেঁড়া, কেবল জোড়া। মন খারাপ হতে সময় লাগে না, মেঘ কাটতেও সময় লাগে না। খানিক আগেই যে কারণটা বেদনায় মনকে তছনছ করে দিয়েছে, সেইটাকে কিছুক্ষণ পরেই একেবারে অহেতুক মনে হয়। সব কারণ অকারণগুলির যুক্তি আছে, বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে বিচার করবার প্রয়াস আছে, শঙ্কা দ্বিধার হিসাব আছে। কিন্তু মাপকাঠি সাধারণ জীবনের থেকে আলাদা। এ রবারের মতই টেনে বড় আবার টিপে ছোট করা যায়; কিন্তু কখন যে বড় করতে হবে, আর কখন যে এটাকে ছোট করতে হবে, তার উপর কোন সজ্ঞান নিয়ন্ত্রণ চলে না। সেটা ঘটে যায়; আপনা থেকে এসে যায়।

...চিঠির হিসাব দিয়ে সপ্তাহ গুনতে হয়। রবিবারে লেখা চিঠি মঙ্গলবারে পাওয়া উচিত। কাজেই বারগুলোর সঙ্গেই পিলের সপ্তাহের সম্পর্ক, ক্যালেণ্ডারে দেওয়া তারিখগুলোর সঙ্গে নয়। চিঠির সপ্তাহগুলো ক্রমাগত জুড়ে জুড়ে পৌঁছনো যায় দুবছর পরের ছুটির রাজ্যে—যে রাজ্য আলো করে আছেন নতুনদিদিমা।

পরীক্ষার পর আসবার সময় দিদি সঙ্গে এসেছিল। দিদির শাশুড়ী বললেন, "নাই বা থাকল মা বাবা? পিসিমা তো রয়েছে। খোকাটার দু'দিন হাওয়া বদল হবে—দাঁত উঠবার পর সেই যে পটকেছে—দেখছিস না, গায়ের চামড়া একেবারে ঝুলঝুল করছে।" অর্থাৎ দিদিরা যে দু'মাস থাকবে, জামাইবাবু টাকা পাঠাবে—নইলে পিসিমা পাবেন কোথা থেকে? মাউইমা সত্যিই ভালমানুষ।

...ইষ্টিশানে সাগুগাছটা ঠিক সেইরকমই আছে। তুলসীর সঙ্গে থেকে থেকে পিলের নাকও গন্ধ সম্বন্ধে কিছু সজাগ হয়ে উঠেছে। ঘোড়ার গাড়িগুলো দাঁড়ায় যেখানে সেখানকার পরিচিত গন্ধটা নাকে এল। বেশ লাগছে। ডিব্রুগড়ে ঘোড়া দাঁড়াবার জায়গাটার গন্ধ অন্যরকম কেন? গন্ধ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তুলসীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। নতুনদিদিমার সঙ্গে দেখা হলেই বলতে হবে তাঁকে নকল

করে—"আজ আমার গাড়ির ঘোড়াটা কি তেজীয়ান যে ছিল!" বলেই সে আর তুলসী হেসে নতুনদিদিমাকে অপ্রস্তুত করে দেবে!... তেজীয়ান কথাটি যে তাঁর কাছ থেকেই শেখা।...সব সেইরকম আছে। সিন্ধী ঠিকেদারের কলাবাগান, শকুনভরা শিমুলগাছটা, নবীন সেকরার, দোকানের মরচেধরা হিন্দী সাইনবোর্ড, তুঁতগাছতলার ছেলের দল, লাঠি-হাতে সুরদাস ভিখিরী, 'টিকিমে-রাধাকিষুণ' চাপরাশী,—সব সেইরকম। কিছু বদলায়নি। এতকালকার একান্ত আপনার জায়গাতে এসে পুরনো জুতো পরবার মত আরাম লাগে বটে; কিন্তু এখানকার লোকদের উপর একটু ক্ষীণ করুণা মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে—এরা পরিবর্তনের স্বাদ পেল না, গতির স্বাদ পেল না, নূতন নূতন অভিজ্ঞতার স্বাদ পেল না ব'লে। ডিব্রুগড়ের মত একটি ছোট শহরে দু'বছর থেকে অন্য জায়গাকে ঘুমন্তপুরী ব'লে ভাবা, পিলের মত বয়সেই সম্ভব।

স্টেশান থেকে আসবার রাস্তা নতুনদিদিমাদের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে। দিদি সঙ্গে না থাকলে সে একবার গাড়ি থামিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেত। খুব একটা মজা করছে এই ভাব দেখিয়ে দিদির দিকে চোখ টিপে হাসতে হাসতে, চলন্ত গাড়ি থেকে চীৎকার করে ঃ "ও নতুনদিদিমা! নতুনদিদিমা বাড়ি আছেন!"

"রাস্তা থেকে ডাকে নাকি লোকে!" দিদি তাড়া দিয়ে ওঠে।

তারাদা'দের বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল তুলসী গাড়ির পিছনে পিছনে। দোরগোড়ায় দেখা গেল মাথায় কাপড় নতুনদিদিমাকে। মুখ চেনা যায় না এত দূর থেকে। গাড়ি এসে থামল পিলেদের বাড়িতে। তুলসী এসে পিলেকে জড়িয়ে ধরে। "মোটা হয়ে গেছিস যে রে পিলে! নতুনদিদিমা ভাবছিল তুই তাদের বাড়ি হয়ে আসবি।"

"ফোঁস করে উঠলেন পিসিমা ঃ "ভাবারও বলিহারি!" দিদিও হেসে ওঠে পিলের সঙ্গে সঙ্গে, পিসিমার কথায়। অতি পরিচিত পরিবেশের মধ্যে তারা পৌঁছে গিয়েছে।

"আপনি যে আসছেন, তা' জানতাম না।" তুলসী দিদিকে প্রণাম করল।

"বা রে! আমার কি আসতে নেই বাপের বাড়িতে?"

পিলে আশ্চর্য হ'ল, পিসিমাকে দেওয়া চিঠির খবর তুলসী একেবারে রাখে না দেখে। খোকার জন্য দুধ রাখতে লিখেছিল সে। আর ভাবছিল যে, দুধের যোগাড় তুলসীই নিশ্চয় করে দিয়েছে। ডিব্রুগড়ে যাওয়ার সময় তুলসী যে বলেছিল, পিসিমার দেখাশোনা করবে!...

"নে। তেতেপুড়ে এসেছিস; একটু জিরিয়ে স্নান করে নে!" পিসিমার হুকুমের মধ্যে একটু বকুনি বকুনি ভাব। তুলসী যেন এখানে শুধু অবান্তর নয়—একটু অবাঞ্ছিতও।

সে যাবার সময় বলে যায় ঃ "নতুনদিদিমা তোকে যেতে বলেছে খাওয়াদাওয়া সেরে; গোটা তিনেকের সময়।"

"আচ্ছা। তুইও থাকবি তো সে সময়।"

"দেখি। এখন যেতে হবে একটু কাজে।"

খাওয়া-দাওয়া সারতে পিলের প্রায় দু'টো বাজল। মোটে দু'টো! নতুন-দিদিমা যেতে বলেছেন তিনটেয়। এত ঘড়ি দেখে 'ইনটার্‌ভিউ' দেওয়া তিনি কবে থেকে আরম্ভ করলেন? ডিব্রুগড়ে যাবার আগে পর্যন্ত তো তাঁর সঙ্গে রাত একটার সময় বিনা নোটিশে দেখা করা চলত। ঠিক তো! তুলসীর বলবার সময় এর হাসির দিকটার কথা খেয়াল হয়নি। দু' বছরের অনভ্যাসের ফলে এড়িয়ে গিয়েছিল মন থেকে। নতুনদিদিমার সঙ্গে দেখা করবার আবার 'টাইম'! দাঁড়াও! আজ লাগতে হচ্ছে, এই নিয়ে, তাঁর পিছনে। একটু ফিটফাট না হয়ে সে আর আজকাল বাড়ি থেকে বেরয় না। কলকাতার পুরনো, সুতরাং ডিব্রুগড়ের নতুন ফ্যাশনের এক জোড়া স্যাণ্ডাল সে কিনেছিল। সেইটা পরে সে বেরিয়ে পড়ে।

নতুনদিদিমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে ভাবল, এক মজা করা যাক। একেবারে নিঃশব্দে

হবিষ্যিঘরে হঠাৎ ঢুকে তাঁকে অবাক করে দিতে হবে! চমকে উঠেই, হো হো করে হেসে ফেলবেন তিনি। "দেখি, দেখি, ডাক্তারসাহেবের কেমন চেহারা হ'ল।"—নিশ্চয়ই এই হবে তাঁর প্রথম কথা। এ নিয়ে বাজি রাখতে রাজী আছে সে। তিনি কখন কি বলবেন না বলবেন সব তার মুখস্থ, সে লিখে রেখে দিতে পারে আগে থেকে। পকেটে কাগজ পেন্‌সিল থাকলে সে তাই করত; নতুনদিদিমা বলবার পর কাগজখান পকেট থেকে বার করে তাঁকে পড়তে দিয়ে বলত—"কামরূপ কামাখ্যা থেকে মন্তর শিখে এসেছি; যে কথা ইচ্ছে অন্য লোকের মুখ দিয়ে বলাতে পারি।" গুটলিদি হেসে গড়িয়ে পড়ত কাগজখানা দেখে ঃ "এই সব পেস্‌কিপ্‌সন শেখায় নাকি তোদের মেডিকালে?"...কাগজ পেন্সিল যে নেই!

সদর দরজার পাঁচিলের ইঁটগুলোতে নোনা ধরেছে। এই গুঁড়োগুলো দিয়ে তা'রা কত পটকা ফুটিয়েছে ছোটবেলায়! একটা কাঠি তুলে নিয়ে নোনাধরা ইঁটের উপর লেখে—"দেখি দেখি ডাক্তারসাহেবের'...। দূর! ঝরে ঝরে পড়ে যায়! নিজের লেখা নিজেই পড়া যায় না! তবু গুটলিদিকে ব'লে দিলে ধবতে পারবে এর দু'চারটে অক্ষর!...পা টিপে টিপে সে উঠনে ঢোকে। আবার গুটলিদির সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়। তা' হলেই চেঁচিয়ে মেচিয়ে সব মাটি করে দেবে।...নিস্তব্ধ উঠনে রোদ্দুর খাঁ খাঁ করছে। তুলসীর পোঁতা কাবলে কলাগাছের পাতাগুলো পশ্চিমে 'লু'বাতাসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে একেবারে চিরুনির মত দেখতে হয়ে গিয়েছে। তারাদার ঘরের দরজা ভেজানো; খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার ঘরে চলে গিয়েছে।...অদ্ভুত এ বাড়ির রীতিনীতি। কেনরে বাপু! আর একটি প্রাণী যে হবিষ্যিঘরে...এখনও খাওয়া হয়নি—তোর শাশুড়ী—বাড়ির গিন্নী—তাঁর খাওয়ার সময় কাছে ব'স্—দরকার পড়লে নুনটা লেবুটাও তো দিতে পারিস সে সময়! তা' নয়! যে যার নিজের মত! ঠিকেদাবি করে দু'পয়সা হ'লেই কি গোরস্তবাড়ির চালচলন বদলে জমিদারবাড়ির মত হয়ে যেতে হবে? এমন কিছু লাটবেলাটের বাড়ি না এটা!...পায়ের স্যাণ্ডাল জোড়ায় একটা মশ্‌মশ্ শব্দ হচ্ছে! উঠনে খুলে রেখে সে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় হবিষ্যিঘরের দিকে। ঘরের মধ্যে নতুনদিদিমার গলা শোনা গেল।..."এই নে, টপ্ করে খেয়ে নে। এখনই আবার হয়তো গুটলি এসে পড়বে।"

...তা হ'লে গুটলিদি তো নয়। তারাদা'র বউ হলে 'খেয়ে নাও' বলতেন নতুনদিদিমা। কেষ্ট নাকি? স্কুলের ছুটি বুঝি? কেষ্টর বরাত খুলেছে দেখছি। লুকিয়ে মায়ের আদর পাচ্ছে।...

হঠাৎ হবিষ্যিঘরের ভিতর গিয়ে ঢোকে পিলে, নতুনদিদিমাকে অবাক্ করে দেবার জন্য। নিজেই অবাক্ হয়ে গেল।...কেষ্ট নয়—তুলসী। নতুনদিদিমার মুখে চোখে একটা ত্রস্ত ভাব। তিনি, তুলসী দু'জনেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। পিলে ঘরে ঢুকবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তিনি প্রথমেই নিজের অজ্ঞাতে বাঁহাত দিয়ে মাথায় কাপড় দেবার একটু চেষ্টা করলেন,—উঠন নিকানোর সময় ভাশুর হঠাৎ বাড়িতে ঢুকলে ভাদ্রবধু যেমন করে। নতুনদিদিমার খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু অল্প কয়টি ভাত ও একখানি পোরের ভাজা পাতে রয়েছে। তিনি আড়চোখে মুহূর্তের জন্য তাকালেন তুলসীর হাতের দিকে। তাঁর চাউনির অনুসরণে পিলের নজর গিয়ে পড়েছে তুলসীর হাতের দিকে।...হাতে দু'তিনখান পোরের ভাজা। তুলসী হাত মুঠো করে নিল, খুব আস্তে আস্তে—চিত করা হাতের মুঠোকে ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে উপুড় করছে—যথাসম্ভব কম নাড়িয়ে—অন্যদিকে তাকিয়ে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে। কেউ মানে পিলে। তবু হালকা মুঠোর ভিতর, বুড়ো-আঙুল আর তর্জনীর জিলিপিপেঁচের মধ্যে দিয়ে দুমড়ানো পোরের ভাজা অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে।...এঁটো। নতুনদিদিমা পাতের এঁটো খেতে দিলেন বামুনের ছেলে তুলসীকে। এটোকাঁটার বাছবিচার পিলে তুলসীর কোনকালেই নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে আচারভীরু নতুনদিদিমার। তাঁর শুচিবাই, আর দেবেদ্বিজে ভক্তি যে চিরকালের। সেকরার ছেলেদের বিদায় করে দিয়ে যিনি বামুনের ছেলেদের জলখাবার খাইয়েছিলেন কলাচুরির দিনে! এ বাড়ির নেমন্তন্নতে ছোটবেলাতেও পিলেরা যে লুচি খেয়েছে—ভাত খাওয়ানর সাহস আচারনিষ্ঠ নতুনদিদিমা কোনদিন পাননি! পিলে-তুলসী দু'জনেই ওঁর দ্বাদশীর সকালের বামুন। ওদের

ফলমূল না খাইয়ে যে উনি জলস্পর্শ করেন না।...

পিলের চেয়ে আগে, নতুনদিদিমাই কথা খুঁজে পেলেন ঃ "কি রে? সময় হ'ল এতক্ষণে আসবার? আমি ভাবলাম বুঝি পিসিমা আজ আর ছাড়বেই না।"

"বা রে? আপনি যে বলে পাঠিয়েছিলেন তিনটের সময় আসতে। আমি তো তবু এক ঘণ্টা আগে এসেছি।"

"আমি?"

তুলসীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই নতুনদিদিমা বুঝে গেলেন ব্যাপারটা। সামলে নিয়ে বললেন ঃ "খাওয়া-দাওয়া সেরে, হবিষ্যিঘর ধুয়ে নিকিয়ে ওঘরে যেতে যেতে, আমার তিনটেই বাজে।"

"তুলসী কখন এলি?"

জবাব দিলেন নতুনদিদিমা ঃ "ও এসেছে সেই কখন! এগারটা হবে বোধ হয় তখন। ওর বাপ খেয়ে অপিস গিয়েছেন; তারপরই ছোটবাবুও বেরিয়েছেন খেয়েদেয়ে। বেরিয়েছেন কোথায় জানিস তো পিলে? কাজে। গন্ধপাতা যে এখন পি ডব্‌লু ডির ঠিকেদার হয়েছে। যত ঠিকেদার কি জোটে আমারই কপালে! ওর বাপের চিন্তা যে, দু'বছর পর পেনশন নেবেন; ছেলেটা পড়াশোনা করল না; ওকে একটা লাইনে ঢুকিয়ে দিতে হয়। লাইন তো আমার লাইনই! কোথায় যেন রাস্তা তৈরীর ঠিকে পেয়েছে। সে কি ওখানে। সাইকেলে দু'ঘণ্টার পথ। বাপ জানে যে, ছেলে গিয়েছে সেইখানে। ছেলে এসে বসে আছেন আমার হবিষ্যিঘরে। তোর বাড়ি থেকে ঘুরে এলে আমি বললাম...যা, কাজে যা! ঠিকের কাজ কখনও নিজে না দেখলে হয়? মুটে-মজুর নিয়ে কারবার!— না! ওর নাকি বিশ্বাসী লোক আছে কাজ দেখবার জন্য। বিশ্বাসী তো সবাই! ঠিকেদার ঘেঁটে ঘেঁটে জীবন গেল, তুই আসিস আমাকে বুঝোতে? ভুগবি! নিজেই ঠেকে শিখবি।"...

"তুলসী হয়েছে কন্ট্রাক্টর?"

এতক্ষণে তুলসী কথা বলে ঃ "না রে পিলে। ফুদী মিস্ত্রীই আসল ঠিকেদার। বাবা ওর বেনামীতে অনেকদিন থেকেই ঠিকের কাজ নেয়। তাই ওর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছে আমাকে, কাজ শিখবার জন্য। আমি বলি যে, কুলিখাটানোর মধ্যে শিখবার কি আছে?"

"আরম্ভ হয়ে গেল দুই 'গোস্ত'তে গল্প! ডাক্তার সাহেবের কি আমার এঁদোপড়া হবিষ্যিঘরে বসতে গা ঘিন ঘিন করছে? দাঁড়িয়েই থাকবি নাকি? আচ্ছা, না হয় এইবার ওঘরে গিয়েই ব'স, দুই 'গোস্তে'। আমাব খাওয়া তো হয়েই গিয়েছে। এইবার উনন নিকিয়ে, ঘর ধুয়ে ফেলতে পারলেই, আজকের মত এ ঘরের কাজ সারা। তার পরেই ছুটি। যা, আমি আসছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"...

পিলে তুলসী গল্প করতে করতে নতুনদিদিমার ঘরে এসে বসল। পিলে লক্ষ্য করে যে তুলসী নতুনদিদিমার খাটে না ব'সে ব'সল মেঝেতে। ডানহাতখানার ভাব একটু আড়ষ্ট গোছের। যেন আলগোছে রেখেছে। নতুনদিদিমার ঘর ঠিক সেই আগেকাব মত আছে। সেই রকমই তেলচিটে হিং হিং ভাপ্‌সা গন্ধ। দেওয়ালে গঙ্গাবতরণের ছবিখানি আর নেপাল থেকে আনা শিবের মুখোশটা। সব সেইরকম আছে। তবু মনে হচ্ছে, এসব অবাস্তব। থিয়েটারের দৃশ্যের ঘরবাড়ির মত অবাস্তব। যা কিছু দেখছে সব কেবল পুরনোর ছায়া। স্টেশনে পৌঁছেই মনে হয়েছিল, এখানে কিছু বদলায় না! ভুল। এখানে সব বদলেছে। উপর উপর দেখে বোঝা যায় না। মনের ব্যাপার কিনা। পরিবেশ বদলায় ঢিমে তেতলা গতিতে; তার পরমায়ু যে মানুষের পরমায়ুর চেয়ে অনেক গুণ বেশী; পরিবেশের পরিবর্তন তাল রাখতে পারবে কেন মানুষের মনের গতির সঙ্গে? তুলসী বদলেছে। সবচেয়ে বড় কথা নতুনদিদিমা বদলেছেন। সবচেয়ে দুঃখের কথা। ঢাক-ঢাক গুড় গুড় কেন? লুকোচুরির ভাব কেন? তুলসী ঘড়ি ধরে তিনটের সময় নতুনদিদিমার হয়ে টাইম দেয়, অথচ নিজে এসে বসে থাকে তখন থেকেই; নতুনদিদিমা জানতে পেরে সামলে নেবার চেষ্টা করেন। পোরের ভাজার ব্যাপারটাতেও আগাগোড়া যোগসাজশের গন্ধ! অভাবনীয়! পিলে বুঝতে পারে না চেষ্টা করেও। অনেকদিন আগে

তুলসী একদিন তাকে বলেছিল, "তুই জানিস অনেক, কিন্তু বুঝিস কম।" কথাটা অনেক সময় মনের মধ্যে খোঁচা দিয়েছে এর আগে। এখন মনে হচ্ছে যে, তুলসী ঠিকই বলেছিল! এখানকার যে দু'জনকে সে সবচেয়ে বেশী জানে, তাদেরই সবচেয়ে কম বুঝতে পারছে। দু'বছরের মধ্যে এত বদলে যাবে? কই তার নিজের মন তো একটুও বদলায়নি। সে সেইরকমই ছুটে এসেছে নতুনদিদিমার কাছে! বাংলাদেশকে না জানবার জন্য হীনতাভাব যেমন কে তেমনই আছে।...এই তো কাল রাত্রে পার্বতীপুর স্টেশনের হোটেলে ভাত খেতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে পিলে বলেছিল যে সে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পড়ে; বাংলাদেশের বাইরে পড়ে এ কথা জানাতে লজ্জা করল।...সে ঠিক একই রকম আছে!...তার চেনা নতুনদিদিমার সঙ্গে আজকের এই লুকোচুরির ভাবটা সে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না। বিশ্রী লাগছে তাঁকে!...তাঁর বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ নয়, আক্রোশ জমে উঠেছে। তাঁর কাছ থেকে এর জবাবদিহি নিতে ইচ্ছা করছে। তাঁকে ব্যথা দিয়ে কাঁদাতে পারলে হয়তো এখন একটু তৃপ্তি হয়। কিছু না বলে চলে যেতে ইচ্ছা করছে এখান থেকে।...

নতুনদিদিমা এসে পড়লেন! হাতে পাথরবাটি দিয়ে ঢাকা একটি ছোট ঘটিতে খাওয়ার জল। তিনি ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে বাড়ির অন্য কলসীর জল খান না।

"গোনা পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি এলাম কিনা, দেখলি পিলে?"

"ঘড়ি ধরে মিনিট সেকেণ্ডের হিসাব করে চলাফেরা আরম্ভ করেছেন আপনি দেখছি আজকাল!" আর থাকতে না পেরে পিলে এই খোঁচাটুকু দিল। তার রাগের মধ্যেও সংযম আছে; তাই সেটা প্রকাশ পায় অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য কিম্বা বক্রোক্তির মধ্যে দিয়ে।

এই ঠেস মারা কথার অর্থ নতুনদিদিমা বুঝলেন, কিন্তু গায়ে মাখলেন না। তুলসী কথা পালটানোর জন্য তাঁকে বলে ঃ "জল দেখলেই জল-তেষ্টা পেয়ে যায়।"

"আহা! তোমারই জন্য আমি জল আনলাম কিনা। যার জলতেষ্টা পায় সে যেন কুয়োতলায় গিয়ে খেয়ে আসে।"

তুলসী হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। বেরুবার সময় নিজের অজ্ঞাতে ডান হাতের আঙুলগুলো কুষ্ঠরোগীর মত ফাঁক ফাঁক করে রেখেছে সে। পিলে সব লক্ষ্য করছে। তুলসী কুয়োতলা থেকে সকলকে শুনিয়ে ঠাট্টা করে ঃ "ক্ষীরখাওয়া-মুখ নিয়ে যে নতুন-নতুন-তেঁতুলবীচি ডাক্তার এসেছে তাকে কিন্তু জল খেতে, আমার মত কুয়োতলায় আসতে হবে না। তার জল ঘরেই পৌঁছবে। আমি বলে দিলাম; দেখে নিও গুটলিদি।"

"কে? পিলে এসেছে নাকি? দেখি একবার ডাক্তারবাবুকে। শুনছ তো ডাক্তারসাহেব, তোমার 'গোস্ত' তোমায় হিংসে করছে।"

গুটলিদি এসে ঢুকল। তার পায়ের পাতা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে, এ দু'বছরে। আঁচল দিয়ে পা ঢেকে সে মেঝেতে বসে।...বড় মায়া হয় তাকে দেখে।...তুলসীও এঁটো হাত ধুয়ে এসে তার স্বাভাবিক ভাব ফিরে পেয়েছে। সকড়ি হাতে সে তাঁর খাটের উপর বসেনি ব'লে নতুনদিদিমা মনে মনে খুব খুশী।...তুলসী আজকাল তাঁর মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করে নাকি?...বাইরের লোক গুটলিদি এসে বসার, ঘরের আবহাওয়ার ঝাঁজ আপনা থেকে মরে আসে। এতক্ষণ থিয়েটারের দর্শকদের মত পিলেকে চেষ্টা করে পরিবেশের কৃত্রিমতা ভুলতে হচ্ছিল, গুটলিদি আসায় সে ভাবটা কাটে। নতুনদিদিমাও এইবার নিশ্চিন্দি হয়ে গল্প করতে বসলেন।

..."পিলে যখন পাশ দিয়ে বড় ডাক্তার হবি, রাজ্যি সুদ্ধ লোকের ডাক্তার সাহেব বলতে নোলা দিয়ে জল গড়াবে। আমি সকলকে বারণ করে দেব ডাক্তার সাহেব বলতে। সেদিনকার ছোঁড়া পিলে, তাকে আবার ডাক্তারসাহেব বলবে। বেশ করেছিস তুই পিলে। এখানকার ছেলেরা পাশ করলে অফিসে কাজ করে, পাশ না করলে ঠিকেদারি করে। যা দু'চক্ষে দেখতে পারি না।...তবে হরিশ ডাক্তারের মত পুলটিস্ দিস না যেন।—ছোটবেলায় একবার দিয়ে, একমাস লেগেছিল ঘা

শুকোতে।...পিয়নে চিঠি দিয়ে গেল বুঝি? কাব চিঠি দেখতো গুটলি!"...

"তোমার দাদার।"

"কেন? মামা বলতে পারিস না? লজ্জা করে? দেখছিস পিলে! আমার কপালের ফল! আমার বউঠাকরুণ কতবার লিখেছে যে, তার একবার এখানে আসতে ইচ্ছা করে। আমি কোন জবাব দিই না। কেন দিই না বুঝলি তো? এইজন্য। এদের বাড়ি কি অন্য দশজনের সংসারের মত! আমার দাদাকে না হয় মামা বলতে মুখে আটকায়, নিজেদের মামাকে কত না চিঠি দিস তোরা বিজয়াদশমীর পর। ব'লে ব'লে আমি হাব মেনে গিয়েছি। তারার বিয়েতে পর্যন্ত তারার মামাকে আসতে লেখেনি; তখন তো এ-বাড়ির-মানুষ বেঁচে। এদের মত পোড়াকপালের যাদের সংসার তাদের সকলেরই কি মামার বাড়ির দিকটা এমনি করে নেপে পুঁছে পরিষ্কার করে দেওয়া নাকি? আমাদের যেমন শ্বশুর ভাশুরের নাম নিতে নেই, এদেরও তেমনি মামা মামী বলতে নেই। লজ্জা করে!...কেষ্টারও এইরকমই হবে!"

একেবারে চিবকেলে চেনা নতুনদিদিমা! নিজের দুরদৃষ্টের কথা, তারাদার কথা, বাংলাদেশের কথা, নিজেব ছেলেবেলাব কথা, ঝুলির ভিতর থেকে একটার পর একটা বেরিয়ে আসছে, রূপকথাপিপাসু নাতিদেব জন্য।. .এ নতুনদিদিমার পরিবর্তন হয় না। তাঁর কাছে বসে গল্প শুনলেই কথার মধ্যে দিয়ে পুরনো নতুন দিদিমাকে ফিরে পাওয়া যায়...পিলেব সবচেয়ে ভাল লেগেছে তার প্রশংসা। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে সে-ই প্রথম ডাক্তারি পড়তে গিয়েছে ব'লে!...গল্পে গল্পে বেলা পড়ে এল। তুলসী চলে গেল ঃ ফুদী মিস্ত্রীর বাড়ি গিয়ে রোজ সন্ধ্যায, তাকে ঠিকেদারির হিসাব-নিকাশ নিতে হয়।

গুটলিদি বলেছে পিলের সঙ্গে তার দিদিকে দেখতে যাবে। দিনে বার হতে গুটলিদির লজ্জা ক'রে, ধবলেব জন্য। তাই পিলেকে থাকতে হল রাত্রি পর্যন্ত। নতুনদিদিমা ব'লে গেলেন ঃ "পিলে, তুই ততক্ষণ গুটলির সঙ্গে গল্প কর। আমি টপ্ কবে সন্ধ্যাপুজোটা সেবে আসি। আমার তো শুধু সকাল সন্ধ্যা দিনে দুবার ঠাকুরঘবে হাজরি দেবার ডিউটি। গুটলির মততো নয়। ও সারাদিন ঠাকুর ঘর নিয়েই আছে!"

"তাই নাকি গুটলিদি? আমাদের হয়েও একটু ভগবানের কাছে বলে দিও।"

"পাগল! মার যেমন কথা!"

তারপর মা ঠাকুরঘরে চলে গিয়েছেন কিনা উঁকি মেরে দেখে, চাপা গলায় বলল—"আমার আর মা'র শোবার বল, বসবার বল, ঘর তো মোটে এই একটি। সারাদিন ঠাকুরঘরে যাব না তো যাব কোন চুলোয়। দিনের বেলায় একটু গড়িয়ে নিতে গেলেও তো জায়গা লাগে। দিন রাত্তির তুলসীটা এখানে! এর মধ্যে দিনের বেলায় এখানে এসে আমি শুতে পারি?"...

পিলে বোঝে যে, গুটলিদি তুলসীর উপর বেশ বিরক্ত।

নতুন-দিদিমার উপর একসঙ্গে বেশিক্ষণ চটে থাকা যায় না। রাগ করে থাকলে লোকসান নিজেরই। শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হয়, নিজের তাগিদে। বিশেষ করে তাঁর গল্প শুনবার পর কিছুতেই তাঁর উপর রাগ পুষে রাখা যায় না, একথা পিলে নিজের অনেক কালেব অভিজ্ঞতায় জানে। তার আসল ব্যথা, তুলসীর প্রতি নতুনদিদিমার পক্ষপাতিত্ব; কিন্তু সে ভাবতে চেষ্টা করে যে, তার ব্যথা অন্য কাবণে—নতুনদিদিমার মধ্যে একটা লুকোচুরির ভাব দেখে; সে নতুনদিদিমাকে পেতে চায় না, জানতে চায়; পোরের ভাজার ব্যাপারটা এক রহস্যপুরীর দুয়ার খুলে দিয়েছে তার সম্মুখে। নতুনদিদিমার পলকাটা মনের অজ্ঞাত দিক থেকে ঠিকরে-পড়া আলোর রেখা হঠাৎ তার নজরে পড়েছে; তাই এই বিস্ময়। এখন শুধু সে মজা দেখতে চায়; লুকোচুরি খেলাটা সম্পূর্ণ উপভোগ

করতে চায়।...কিন্তু নিজে সত্যিকার যা, তার থেকে অন্য রকম দেখানর চেষ্টা তো নতুনদিদিমার এর আগে কখনও দেখেনি। তুলসীরও কথায় আর কাজে কোনদিন তো ব্যবধান দেখা যায়নি! তবে? এ কিছু নয়!...পিসিমাকে একবার গরমের সময় একাদশীর রাত্রে লুকিয়ে জল খেতে দেখেছে সে।...বাবা কম রাশভারী লোক ছিলেন না। আলনায় টাঙানো পিলের জামার পকেট থেকে, তাঁকেও একদিন চকোলেট চুরি করে খেতে দেখেছিল সে। বাবা ভেবেছিলেন, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ পিসিমা এসে পড়েছিলেন বাবা চকোলেট মুখে দেবার পরই। বাবা মুখ একটুও না নাড়িয়ে চকোলেটটা খেলেন, যাতে পিসিমার কাছে ধরা না পড়ে যান। পিলে সব লক্ষ্য করেছিল আধবোঁজা চোখে।...বাবার এ দুর্বলতার কথা সে দিদি বা পিসিমা কারও কাছে বলেনি। অবাক হয়ে গিয়েছিল সে ঠিকই; কিন্তু এর জন্য বাবা তার চোখে খেলো হয়ে গিয়েছিলেন বলে তো মনে পড়ে না। তাঁর উপর রাগও হয়নি, শ্রদ্ধাও কমেনি।..তবে? নতুন দিদিমার বেলায় মন খারাপ করছে কেন? বৈজ্ঞানিক হবার জন্য তাকে বাবা তৈরি করেছিলেন ছেলেবেলা থেকে। বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ কৌতূহল নিয়ে সে জানতে চায়; নিছক জ্ঞানের জন্য, নিজেকে এর মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে সে সমস্তটা জানতে চায়। তুলসীর কতদিনের, কত অধিকারের থিতানো পলি জমে জমে, নতুনদিদিমার মনকে তৈরি করেছে বামুনের ছেলেকে পাতের এঁটো খাওয়ানর জন্য; তার মিথ্যা কথা ঢেকে নেবার জন্য. বিরক্ত সে হতে যাবে কেন? কার উপর? শুধু ডাক্তারসুলভ অনুসন্ধিৎসায় বিষয়টির উপর লক্ষ্য রাখবে ভবিষ্যতে।...দু বছরে সব লোকেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক।...এই তো নবীন সেকরা তাকে কত খাতির করে বসাল। তার স্ত্রী—পিলের মায়ের বয়সী—টিপ করে প্রণাম করল পিলেকে। নবীন সেকরা কাতব অনুবোধ জানাল মেডিক্যালে অর্শর ওযুধটি ভাল করে শিখে নেবার জন্য।... দু'বছর আগে কি তার এ খাতির ছিল?...পিলে নিজে হাতে কলসী থেকে জল গড়িয়ে নিলে, পিসিমা সুদ্ধ আজকাল অপ্রস্তুত হয়ে যান!...লোকের মধ্যে এসব ছোটখাটো পবিবর্তন দেখে অবাক হবার বা মন খারাপ করবার কিছু নেই!...

কিন্তু এসব হচ্ছে পিলের গোপন মনের ব্যাপার। এ মানসিক দ্বন্দ্বের আভাস বাইরে প্রকাশ পায় না। প্রথম দিনের হোঁচট খাওয়াব পর আবার আনাগোনা ভাবভঙ্গি পুরনো দিনের মত সহজ হয়ে আসে। পিলে এসেছে পরীক্ষা দিয়ে। হাতে অফুরন্ত অবসর। ঠিকেদার তুলসীরও তাই। এক কেবল সন্ধ্যাবেলায় ফুদী মিস্ত্রীর বাড়ি যাওয়া ছাড়া, বাকি সব সময়ই তার ছুটি। পিলে নতুনদিদিমাদের বাড়িতে যায় একবাব, গোটা তিনেকের সময়। তিনটের আগে সে নতুনদিদিমার কাছে যাবে না—মরে গেলেও না। এ হচ্ছে তার তুলসী ও নতুনদিদিমার উপর অভিমান। যাকগে, সে সব তো মিটে গিয়েছে সেই দিনই। বিকল ঘড়ির মত মনটা সেইদিনকার নাড়ানি খাওয়ার পর আবার ঠিক চলেছে। মধ্যে মধ্যে বিগড়য়। হ্যাঁ, ঠিকই সেই রকম; বন্ধ হয়, চলে; কাজ চলে যায়। যন্ত্রের মত। একটা কি জিনিসের যেন অভাব।

রাতে খাওয়া-দাওয়াব পর সব বন্ধুবা একত্র হয় প্রাইমাবী স্কুলের বারান্দায়। এইখানেই আড্ডা। রাতে খালি পাওয়া যায় স্কুলের ঘব। কর্নেট বাঁশিটা তুলসী সেকরার ছেলেদেব দিয়ে দিয়েছে। এখন ঝোঁক পড়েছে সারেঙ্গীর উপর। সেকরার ছেলেরা তুলসীর সারেঙ্গী ধরার নানা কারণ দেখায়। কিন্তু পিলে জানে, কেন সে কর্নেট বাজানো ছেড়েছে। ও ছাইয়ের বিউগেল বাজালে বুকের দোষ হয় ব'লে, নতুনদিদিমা দিব্যি দিয়ে বারণ করেছিলেন। তাছাড়া কোন একটা বাজনা তুলসীর বেশীদিন ভালও লাগে না।

মড়া সেকরা বলল—"গত বছর সবাই মিলে রেকাবিয়াপট্টির মেলা দেখতে গিয়েছি। সেখানে অশথতলায় সামিয়ানার নীচে ভমরের নাচ-গান সেরে একটা মেয়েলোক সবে তার তাবুর সম্মুখে এসে বসেছে পানের বাটা খুলে। সারেঙ্গীবালাটা তার সম্মুখেব থালায় রাখা প্যালার পয়সা গুনছে। আমরা দাঁড়িয়ে ঐ দূরে! বেশ করে কমফর্টার দিয়ে কান-মুখ ঢেকে—কে না কে আবার দেখে চিনে

ফেলবে। চার আনা বাজি রাখা হল; ঐ 'নাট্টীন' মেয়েটার কাছ থেকে পানের খিলি চেয়ে আনতে হবে। তুলসী নিয়ে এল। ওর কাছেই শুনলাম, যে, মেয়েলোকটা বাজি রাখবার কথা শুনে হেসেই বাঁচে না। বলে যে, নিয়ে এলেন না কেন আপনার সব ইয়ার-দোস্তদের। সকলকে এক এক খিলি পান সেজে খাইয়ে দিতাম—সুন্দর লক্ষ্ণৌপাত্তি জরদা দিয়ে। যেদিন যখন ইচ্ছা আমার কাছ থেকে পান খেয়ে যাবেন। আমাকে নিয়ে বাজি রাখেন, এ তো আমার ইজ্জতের কথা।...এরপর, ক'দিন তুলসী সঙ্গের পুরুষ মানুষটার কাছে সারেঙ্গী শিখতে গিয়েছিল। এ বছরেও গিয়েছিল।...বুঝলি তো? সরসৌনির নাট্টীনরা জেলার সেরা পান সাজিয়ে।" চোখের ইশারায় মড়া বুঝিয়ে দিল, এই হচ্ছে তুলসীর সারেঙ্গী ধরবার কারণ। আছে এর মধ্যে অনেক ব্যাপার।...কথার সুরে তুলসীর বাহাদুরির প্রশংসা।..এ কারণ পিলের মনে ধরল না।...বাজনা শিখবার জন্য তুলসী সব করতে পারে কিন্তু!...

তুলসী যত নতুন নতুন বাজনা শেখে ততই তো কনসার্ট ক্লাবের পক্ষে ভাল। কিন্তু তুলসী যে ক্লাবে আসেই না। এই হচ্ছে ক্লাবের সদস্য সেকরা বাড়ির ছেলেদের অভিযোগ।

"তুই আসবার পর থেকে তোর খাতিরে আবার আসছে। নইলে গত এক বছরে ক্লাব বসেছে মেরে কেটে পনর-বিশ দিন। 'হেড' যদি না আসে, তাহলে 'টেল্‌লেস' ক্লাব বাঁচে কি করে?"

বছর দুয়েক আগে এই ক্লাব খুলবার সময় তুলসী এর নামকরণ করেছিল, 'টেললেস্ ক্লাব' (Tailless club)। এর ভবিষ্যৎ তখন খুব উজ্জ্বল মনে হয়েছিল সদস্যদের। ঘর ভাড়া লাগবে না, ক্লাবে আলো জ্বালবারও দরকার নেই, বিনা পয়সায় চেয়ার-বেঞ্চিতে ভরা প্রাইমারি স্কুলের ঘর পাওয়া যাচ্ছে—এ ক্লাব গড়গড় করে চলবে।

পাড়ার লোকে প্রথমে শুনে হেসেছিল! তুলসী তখন তাদের বুঝিয়ে দেয়, এর সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত অর্থ—ক্লাবের মেম্বররা ছাড়া প্রত্যেকেরই নাকি লেজ আছে। মানে জানবার পর থেকে পাড়ার মাতব্বররা টেললেস ক্লাবের নাম দিয়েছিলেন পাঠশালার আড্ডা। টেললেসের দল তা সইতে যাবে কেন! ভোজে কাজে পুজো-বাড়িতে যেখানেই অনেক লোক একত্র হয়, তুলসীর দল 'টেললেস কী জয়' ব'লে সেকথা মনে পড়িয়ে দেয়।...একবার ওদের ফেলা সিগারেটের গোড়া কুড়িয়ে একটি ছোট ছেলে ইস্কুলের পায়খানায় বসে খেয়েছিল। পণ্ডিতমশাই নালিশ করেছিলেন সেক্রেটারী রায়বাহাদুরের কাছে। তুলসী গিয়ে সেক্রেটারী সাহেবকে বলেছিল ঃ 'আচ্ছা আপনি তো খুব 'ইন্টেলিজেন্ট'; আমাদের এমন একটা বুদ্ধি বাতলাতে পারেন, যাতে আমরা ইস্কুলের ঘরটা রাতে ব্যবহার করতে পারি, অথচ কেউ কিছু বলতে না পারে।'—গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের দুঃসাহসে ভ্যাবাচাকা খেয়ে রায়বাহাদুর বলেছিলেন সিগারেটের টুকরোগুলো রোজ ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিতে। "...তুলসীর তখনকার উৎসাহ যদি টিকতো, তাহলে কি ক্লাবের আজ এই অবস্থা হয়।...ওর তখন পর্যন্ত যে সিগারেটেই কাজ চলত!"

"মানে?"

মানেটা মড়া সেকরা বুঝিয়ে দিল চাপা গলায়—মুঠো-করা হাত থেকে মুখে ঢালবার মুদ্রা দেখিয়ে ঃ "আজকাল যে—এ সুদ্ধ চলছে! মাইরি তোর গা ছুঁয়ে বলছি। সাঁঝের বেলাতে ফুদী মিস্ত্রীর বাড়িতে!"

"দূর! সেখানে যে ওর বাবা—"

"হ্যাঁ, হাঁ, ওর বাবাও জানে। তুলসী নিজে বলেছে।"

এ খবরে পিলে যতটা অবাক হয়, তার চেয়ে দুঃখিত হয় বেশি। সেকরার ছেলেদের পিলেরা চিরকাল 'বাজারেরছেলে' বলেই জানে। তারা পর্যন্ত আজ তুলসীর বাহাদুরির প্রশংসা করবার ছেলে তাকে একরকম নির্লজ্জ বলছে ঘুরিয়ে। পিসিমার ভবিষ্যদৃষ্টি আছে!...গাঙ্গুলিমশাই আর তুলসীকে গান-বাজনা করতে শুনলেই পিসিমা আগে চটে বলতেন ঃ 'বাঃ! বাপে-ব্যাটায় চমৎকার!'...পিলের সবচেয়ে দুঃখ যে, তুলসী একথা সেকরার ছেলেদের কাছে বলেছে, কিন্তু তার কাছে একেবারে চেপে

গিয়েছে। ঠিকেদারির কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে তুলসীর পক্ষে মদ খাওয়াটা খুব আশ্চর্য নয়। নেশাভাঙ্গের ঝোঁক তার চিরকালের। কিন্তু সে তো আগে কোন কথা লুকোত না পিলের কাছে। পিলেকে আর সে আগেকার অন্তরঙ্গের মর্যাদা দেয় না দেখা যাচ্ছে!...তার আর তুলসীর মধ্যে একটা মিহি পর্দার ব্যবধান গড়ে উঠেছে গত দুই বছরে।...কেনরে বাপু? টেল্‌লেস ক্লাবে রোজ আসিস না তো, না এলেই হয়! তাকে দেখিয়ে প্রত্যহ আসবার দরকার কি? পিলের ইচ্ছা হয় যে, মড়াকে জিজ্ঞাসা করে, তুলসী কতক্ষণ পর্যন্ত ফুদী মিস্ত্রীর বাড়িতে সাধারণত থাকে? কিন্তু কি উত্তর পাবে তাও সে জানে।...ফুদী মিস্ত্রীর বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই আটটার মধ্যে ফেরে। সেখান থেকে বাড়িতে কখনই আসে না; অত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে গাঙ্গুলিমশাই নিশ্চয়ই তাকে বার্লি খেয়ে শুয়ে থাকতে বলবেন অসুখ করেছে ভেবে। কিন্তু ওখান থেকে গিয়ে তুলসী যে নতুনদিদিমার বাড়িতে রাত দশটা পর্যন্ত থাকে এ তার দৃঢ় ধারণা হলেও, পিলে কথাটা 'বাজারের—ছেলেদের' মুখ থেকে শুনতে চায় না!...এবার এখানে আসা থেকেই পোরের ভাজার ব্যাপারটা তার চিন্তার প্রতি পথ অলক্ষ্যে আগলে আছে। আপনা থেকেই পিলের মনে আসে যে, টেল্‌লেস্-ক্লাব ভালভাবে না চলবার সঙ্গে ও যেন সম্বন্ধ রয়েছে পোরের ভাজা খাওয়ার ঘটনাটির।...সে পরিষ্কার বুঝে যায়, যে তুলসী সেইদিনই ক্লাবে আসত, যে রাত্রে কোন কারণে নতুনদিদিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হ'ত না! হয়তো পাড়ার কারও অসুখে নতুনদিদিমা তাদের বাড়ি দেখতে গিয়েছেন, কিম্বা হয়তো গুটলিদি শরীর খারাপ হয়ে ঐ ঘরে শুয়ে রয়েছে, কিম্বা যেদিন মুখ দিয়ে বেশী গন্ধ-টন্ধ বার হবার সম্ভাবনা।...

"একবার বোলো টেল্‌লেস্ কী জয়!" ক্লাবের সদস্যরা জয়ধ্বনি দিয়ে তাকে এই অপ্রিয় চিন্তার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল এখনকার মত। তুলসীর প্রতি রাত্রে নতুনদিদিমার কাছে যাওয়াই তো স্বাভাবিক! পিলে এখানে থাকলে সেও যেত। সময় পেলেই নতুনদিদিমার কাছে যাবে এর মধ্যে আবাব লুকনোর কি আছে? তুলসী অন্যরকম দেখাতে চাচ্ছে কেন?...

ঘুরিয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করবার জন্য পিলে একদিন তুলসীকে বলে 'তুই এতদিন না এসে এসে টেল্‌লেস্ ক্লাব যে উঠবার যোগাড়। তোর নিজে তৈরী করা জিনিস, তুলে দিচ্ছিস কেন এমন করে?"

"তুললাম, তোর কথা ভেবেই! আমরা তো কেউ পাশ টাশ করা নই; লেজ নেই। মেডিক্যাল থেকে পাশ করে লেজ বেরুলে, তুই কি আর ও ক্লাবে আসবি? ঠিক কিনা?"

এ উত্তর যেন ওর মুখে যোগানই ছিল। একটু বিরক্ত ভাব। এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে কথাটা।

"না না। 'বাজারের-ছেলেরা' সব নানারকম বলে কিনা, তাই বলছি।"

"কি বলে?" এবার সত্যি করে চটে উঠেছে তুলসী।

"বলে, যে তুই ফুদী মিস্ত্রীর বাড়িতে মদ খাস।"

"খেলে কি হয়েছে?"

এর উপর আর কিছু বলা চলে না। পিলে চুপ করে যায়।

বাড়ি ফিরিবার সময় তুলসী পিলেকে বলে ঃ 'বলিস না যেন এসব কথা নতুনদিদিমার কাছে।"

"দূর! পাগল!"

...তবু একটু তৃপ্তি যে তাকে আর নতুনদিদিমাকে তুলসী সমীহ করে বলেই তাদের কাছে মদ খাওয়ার কথাটা চাপতে চায়।...

পিলে, নতুনদিদিমা, তুলসী তিনজনেরই মনের জটিলতা বেড়েছে এ দুই বছরে। কোনদিনই নিজের সব কথা অতি অন্তরঙ্গকেও বলা যায় না। কিন্তু দু'বছর আগে যেসব কথা বলা যেত সেগুলো এখন কি ক'রে গোপন কথা হয়ে গেল? প্রত্যেকেরই অপরের কাছে প্রকাশ করবার যোগ্য কথার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়েছে। কাজেই গল্পের মধ্যে সতর্কতা আসছে, বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা আসছে, এক এক জায়গায় আড়ষ্টতা আসছে। শরীরের এক অঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেলে, কোন না কোনরকমে তার প্রভাব

অন্য অঙ্গের উপরেও পড়ে। তাই তিনজনের আগেকার প্রাণখোলা ভাব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। তুলসীর কাছ থেকে একটু হাসিখুশী প্রাণখোলা ব্যবহার ছাড়া আর তো কিছু চায় না সে। কিন্তু নতুনদিদিমার কথা আলাদা। আগে রাগ অভিমান হ'ত তাঁর একার উপর। এবার হ'তে আরম্ভ হয়েছে দুজনের উপর এক সঙ্গে। কোন একটা জায়গায় যেন নতুনদিদিমা তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন, পর করে দিচ্ছেন।...কেন?...পিলের মনটাই এমন যে গভীর বেদনার মধ্যেও সে প্রশ্ন করতে ভোলে না 'কেন'? 'হয়তো', 'তবে কি' দিয়ে বহু মনগড়া ব্যাখ্যা খাড়া করে দেখে; কিন্তু ভুল হতে পারে ভেবে, সুনিশ্চিত উত্তরে পৌঁছতে ভয় পায়।

দিন দশেক পিলে তুলসী রাত্রে নিয়মিত ক্লাবে যাবার পর একদিন নতুনদিদিমা বললেন ঃ "সন্ধ্যার পর কি করিস রে পিলে? কেলাব? পাঠশালা কেলাব? তোর আবার গানবাজনার এত ঝোঁক উঠল কবে থেকে? দেখিনি তো কোনদিন। সন্ধ্যার পর আমার তো আর রাঁধাবাড়ার কাজ নেই। ঠাকুরঘর থেকে জপ সেরে এসে মনে হয় কি করি, কি করি। সময় কাটতেই চায় না। শুয়ে পড়ে তবে নিশ্চিন্দি।"

"তা বেশীক্ষণ ধরে পুজো করলেই পারেন।"

"সে আর পারি কই! আমার আবার জপ সন্ধ্যা! যেটুকু পুজো করি, সে সময়ও মন পড়ে থাকে গাছের মাথায়। দু'বছর পরে এলি! কেমন যেন হয়ে গিয়েছিস তুই! রাতে আমার কাছে এলেই পারিস।"

প্রস্তাব পিলের মন্দ লাগল না। তুলসী রাতে থাকে না ব'লেই সেও আসে না। মুখচোখ দেখে মনে হয় যে, কথাটা তুলসীর মনঃপূত হয়নি। সে এখানে নিশ্চয়ই রোজ রাত্রে আসত দশদিন আগে পর্যন্ত। হঠাৎ রাতে আসা বন্ধ করায় বোধ হয় নতুনদিদিমার ভাল লাগছে না। সেইজন্যেই হয়তো তিনি পিলেকে আসতে বললেন, যাতে তুলসীও আবার আসতে পারে। কিন্তু এ-কথায় তুলসীর বিরক্ত ভাব কেন?..

"ক্লাব থেকে যদি ওরা আমাকে ছাড়ে, তবে আর আমার আসতে কি!"

"কে তোকে ধরে রেখেছে! টেল্‌লেস্ ক্লাব অত কারও খোসামোদ করে না! যার ইচ্ছে যাবে, যার ইচ্ছে যাবে না।"

তুলসীর গলার স্বর বেশ রুক্ষ। বলার সুর কথাগুলোকে হাসিঠাট্টা ব'লে ভাববারও সুযোগ রাখেনি সে। বুঝেও পিলে গায়ে মাখে না।

"বুঝলেন নতুন দিদিমা, পাঁচ জনকে নিয়ে তো ক্লাব। তার মধ্যে থেকে দুজনে চলে এলে থাকবে কে?"

"তুই এখানে আর ক'দিন! কেলাব বাঁচানোই—" নতুনদিদিমা কথাটা শেষ করবার আগেই তুলসী চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে ঃ "দু'জন চলে আসতে যাবে কোন দুঃখে? যার ইচ্ছে সে যেন চলে আসে।"

একেবারে অকারণে চটে উঠেছে তুলসী। নতুনদিদিমার শঙ্কাকুল দৃষ্টিতে মিনতি ভরা। বলতে চান—ছি! অমন করতে নেই! তুই যেন একটা কি? তোকে নিয়ে তো আর পারিনে! পিলে ভাববে কি?...

আগেকার জানা তথ্যের পরিপূরক হিসাবে, পিলে সে চাউনির ভাষায় আরও অনেক কিছু পড়ে নেয়।...তুই যাতে আগেকার মত রোজ রাতে আসতে পারিস, সেইজন্যেই তো পিলেকে আসতে বলা। বড় অবুঝ তুই। আমি কি ওকে আসতে বলছি; আমি আসতে বলছি তোকে। অযথা হিংসে করছিস ওর উপর। রাতের বেলার তোর সময়, তোরই আছে! পিলে তো দু'দিন পরেই চলে যাবে। আমি কি বুঝছি না যে, তোর সময় ওকে দিয়ে দিচ্ছি ব'লে তুই চটছিস। আমার উপর চটে, সেই রাগ দেখাচ্ছিস তুই পিলের উপর। এমন কেনরে তুই, গন্ধপাতা? তুই রাগ করবি জানলে কি আর

আমি ওকে আসতে বলি?...

পিলে বোঝে যে, একটা হাসি-তামাসার কথা বলে, তুলসীর অযথা সৃষ্টি করা গুমোট আবহাওয়া হাল্‌কা করে দেবার উপযুক্ত সময় এখন। কিন্তু সেরকম কোন কথা আসছে কই। দরকারের সময় ঠিক কাজটি করা, ঠিক কথাটি যোগানো, এ আর তার দ্বারা হয়ে উঠল না কোনদিন!...সে এমন কোন অন্যায় কথা বলেনি, যার জন্য তুলসী অমন ফোঁস ক'রে উঠল।

এতক্ষণে নতুনদিদিমা কথা খুঁজে পেয়েছেন ঃ "আচ্ছারে বাবা, হয়েছে। আসতে হবে না তোদের কারুরই! দুই গোস্তে গলা জড়াজড়ি করে রোজ রাত্রে বসে থাকিস পাঠশালার বারান্দায়। এখনই একবার গলা জড়াজড়ি ক'রে ব'স না কেন দু'জনে; দেখি কেমন দেখতে লাগে! আবার হাসি হচ্ছে ডাক্তার-সাহেবের! হাসি! দেয় একবার আচ্ছা কারে...। হি-ই-ই শব্দ করে দাঁতে দাঁত চেপে সেই পরিচিত আদরের ব্যঞ্জনা।...

হাসতে হাসতে তাদের দু'জনের মাথা দু'হাত দিয়ে নেড়ে দিলেন নতুনদিদিমা। আদর পাবার তৃপ্তির মধ্যেও পিলের মনে হ'ল যেন তুলসীর মাথায় তিনি আঙুলের চাপ ইচ্ছা ক'রেই একটু বেশী জোরে দিলেন। বলতে চান ঃ 'দূর! বোকা কোথাকার'! তুলসী উঠে পড়েছে। মুখের ভাবে বোঝা যায় যে, তার রাগ একটুও পড়েনি। নতুনদিদিমা একটু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি রে, চল্‌লি নাকি?"

"হুঁ"।

পিলেও উঠল। "চল, তা'হলে আমিও যাই।"

সে রাত্রে ক্লাবে তুলসী বেশ স্বাভাবিকভাবেই পিলের সঙ্গে হাসি-গল্প করেছিল। সে ঢুকতেই ক্লাবের অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী, তুলসী তাকে "টেল্‌লেস্‌ কী জয়।" ব'লে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিল। গায়ে প'ড়ে বেশী ক'রে আলাপ করবার ভাব। সেদিনকার ব্যবহারের মধ্যে সামান্য বৈলক্ষণ্যটুকু পিলে নিজে ছাড়া অন্য কোন সদস্যের চোখে ধরা পড়বার মত নয়।...আন্দাজে পিলে বোঝে যে, রাগটা তা'হলে তার উপর নয়; নতুনদিদিমার উপর।

তারপর তিনদিন তুলসীর দেখা নেই নতুনদিদিমাদের বাড়িতে। ক্লাবে কিন্তু সে এ তিনদিন ঠিক এসেছে; অন্যদিনের চেয়ে বেশী উৎসাহ নিয়ে কনসার্ট বাজিয়েছে; অন্যদের নতুন গৎ বাজানো শিখিয়েছে। জোর ক'রে দেখাতে চায় যেন কিছুই হয়নি।

পরের দিন সকালে রান্নাঘরে পিসিমার বদলে দিদিকে দেখে পিলে অনুমান করে নেয় যে, সেদিন একাদশী। তা'হলে তো নতুনদিদিমার আজ রান্না নেই! সকাল থেকেই একরকম ছুটি! একাদশীর সকালটা আগে ছিল বরাদ্দ নতুনদিদিমার দেখা-পাওয়ার ফাউ। পনর দিনে একবার উপরি পাওনা; তাই এর স্বাদ আরও মিষ্টি। বারোটা পর্যন্ত বিরতিহীন গল্প শুনবার ছুটি। আগেকার দিনে একাদশী তিথির হিসাব রাখতে হ'ত; পঞ্জিকা দেখতে হ'ত; পনর দিন ধ'রে প্রতীক্ষা করতে হ'ত। পঞ্জিকা হাতের কাছে না পেলে চালাকি ক'রে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করতে হ'ত, তাঁর দ্বাদশীর সকালের মিষ্টান্ন ও ফলমূল কিনে আনবার অছিলায়। পিসিমা খুব খুশী হতেন।...এক একাদশীর সকালে নতুনদিদিমার সম্মুখেই তুলসী পিলেকে বলেছিল—"পইতের পর যখন একাদশী করতাম, তখন এ তিথিটা ভাল লাগত fortnight-এ লুচি sure ব'লে; আর আজকাল ভাল লাগে নতুনদিদিমা sure ব'লে। ঠিক না পিলে? বুকে হাত দিয়ে বল!" ব'লেই হো হো ক'রে হেসে ঘর কাঁপিয়ে তোলে। নতুনদিদিমা বললেন ঃ "ইংরিজী ক'রে আবার কি বলা হ'ল আমার নামে? ও ছাই জানিও না, বুঝিও না। বলবি তো আমাকে! না, দুই 'গোস্তে' শুধুই হাসবি?"...একাদশীর সকালের সঙ্গে জড়ানো এইসব মধুর ভাবানুষঙ্গগুলো কোনকালেই মন থেকে মুছে যাবার নয়। সেইজন্যে আজ সকালেও নতুনদিদিমার

বাড়ি পিলের উতলা মনকে দুর্বার আকর্ষণে টানে। কিন্তু দেশের আইনকানুন যেমন বদলায়, তাঁর দেখা পাবার বিধি-নিয়মও তেমনি বদলায়। এ হচ্ছে পিলের এবারকার অভিজ্ঞতা। স্মৃতি-নিবিড় একাদশীর সকালের বিশেষ-বৈঠকের বরাদ্দ এখনও জারি আছে কিনা আগেকার মত, সেইটাই প্রশ্ন।...নতুনদিদিমা তো রাত্রে তাকে যেতেই বলেছিলেন; সে নিজেই তো ইচ্ছা ক'রে যায়নি। ..নতুনদিদিমার উপর অভিমান কাটানোর সে একটা অছিলা খুঁজছে। তিনটের সময় ছাড়া অন্য কখনও তাঁর কাছে যাবে না ঠিক করেছিল পিলে। আজ সে তার সঙ্কল্প ভাঙ্গতে চায়। এর আসল কারণ সে নিজের কাছেও খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতে রাজী নয়।...তুলসী নতুনদিদিমার উপব রাগ ক'রে সেখানে যাওয়া বন্ধ করেছে। আজ নিশ্চয়ই যাবে না। নতুনদিদিমাকে একলা পাবার এমন একাদশীর সকালটি পিলে নিজের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখানর জন্যে নষ্ট হ'তে দিতে পাবে না। ...তাঁদের বাড়িতে যাবার সময়ের আবার বাছবিচার! কিন্তু এবার প্রথম দিন থেকে, যখন-তখন তাঁদের বাড়ি যাবার ব্যাপারে একটা সঙ্কোচ এসে গিয়েছে, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেই কুণ্ঠার কথা শেষ মুহূর্তে মনে পড়ায় খোকাকে কোলে তুলে নেয় পিলে। বাড়ি থেকে বার হবার সময় চেঁচিয়ে নোটিশ দিয়ে গেল ঃ "দিদি, তোমার ছেলেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসছি।"

গুটলিদি কয়লাব গুঁড়োর গুল দিচ্ছিল উঠনে। পিলে ঢুকতেই হেসে সম্বর্ধনা জানাল ঃ "একাদশীব গন্ধে গন্ধে আজ সবাই এসে হাজির গুটি গুটি! তুলসীবাবুও এসেছেন! রাগ পড়েছে আজ। এসেছে কি এখন! দাঁড়া হাত ধুয়েনি। এই সব কালো, কালো রসগোল্লা খাবে নাকি খোকনবাবু? তোর দিদিব ছেলেটা হয়েছে বেশ সপ্রতিভ। না না! আমার কাছে আসতে হবে না! গন্ধ! পচা! আমাব হাতে। ওকে নিয়ে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে রয়েছিস! ছেলেটার মুখ-চোখ যে লাল হ'য়ে গেল তাতে। চল ঘবে!"

গুটলিদি পাবতপক্ষে অন্য বাড়ির ছেলেপিলেদেব ছুঁতে চায় না। কেন না, তার এতদিনকার অভিজ্ঞতায় জানে যে, অধিকাংশ লোকেবই ধারণা—ধবল ছোঁযাচে। ছোট বেলা থেকে বহু জায়গায় ধাক্কা খেয়ে তার এই সঙ্কোচ এসেছে স্বাভাবিক ব্যবহাবে।

..গুটলিদি তা'হলে জানত যে, তুলসী রাগ ক'রে এ তিনদিন আসেনি! ওর বুদ্ধি খুব—বোঝে সব—ভাব দেখাতে চায় যে কিছু জানে না।...তুলসীও দেখা যাচ্ছে, থাকতে না পেরে এসেছে। ক'দিন নতুনদিদিমার উপর চটে থাকা যায়?...

পিলে ঘরে ঢুকবার আগেই ঠিক ক'রে নিয়েছে যে, মুখের ভাব ও ব্যবহার একেবারে স্বাভাবিক রাখবে; তুলসীর সেদিনকার চটাচটির কথা বা এ কয়দিন না আসবার কথা, তার মুখ দিয়ে যেন কথাচ্ছলে না বেরিয়ে পড়ে, এ বিষয়ে সাবধান থাকবে! তুলসীর রাগ রাগ ভাব দেখলে বড় অস্বস্তি লাগে। এবার আসা থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, কথায় কথায় তার মেজাজ বিগড়য় আজকাল!...

আগে থেকে এ রকম সঙ্কল্প না ক'রে রাখলে, ঘরে ঢুকে যা দেখল, তাতে অবাক হবার ভাব প্রকাশ না করে পারত না। নতুনদিদিমা পা ছড়িয়ে বসে, আর তুলসী তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। পিলের মনে হ'ল যে, যেতেই তাঁরা একটু শক্ত আড়ষ্ট মত হয়ে গেলেন। অবশ্য এটা পিলের ধারণা মাত্র। তুলসী টান-টান ক'রে পা ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে—ঠিক একখান কাঠের তক্তার মত। গুটলিদি একটুও অবাক না হওয়ায় পিলে বোঝে যে, তুলসীর নতুনদিদিমার কোলে মাথা রেখে শোয়া, নতুন জিনিস নয়।...

গুটলিদি হেসে বলে, "মায়ে-পোয়ে আজ যে দেখছি বড্ডো...!"

সহজ ভাব দেখানর জন্যে পিলেকে একটা না কিছু বলতেই হয়। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল ঃ "মায়ে-পোয়ে? তুলসী আবার ওঁর ছেলে হ'ল কবে থেকে? ও তো চিরকেলে নাতি—আমারই মত!"

তুলসী গম্ভীর। নতুনদিদিমা হাসছেন; গুটলিদি হাসছে; পিলেও হাসছে। পিলের হাসি জোর ক'রে আনা।...কি যেন ঘটে গেল পিলের মনের মধ্যে।...তাকে মিনমিনে ভাবে সবাই; কিন্তু ভুল!

সে যথেষ্ট সপ্রতিভ! যা মুখে আসে বলে দিতে পারে!...হয়তো ঠিক হবে না বলা!...অন্তর যা চায়, তা কি পাওয়া যায়? একেবারে বদলে গেছেন নতুনদিদিমা!...

নতুনদিদিমা ততক্ষণে কথার বিষয় উল্টনোর জন্যে খোকার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছেন ঃ "মামার কোলে চড়ে ওটা কে এসেছে রে? বড় মিষ্টি মামার কোল, না রে খোকা?"

খোকা খুব সপ্রতিভ। তুলসীকে দেখিয়ে বলল, "খোকা।"

সকলে হেসে ওঠায় তুলসী যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। খোকা সত্যিই গণ্ডগোল আরম্ভ করেছে। পিলে চেষ্টা ক'রে অন্য কথা পাড়ে ঃ

"আচ্ছা নতুনদিদিমা, খোকা আপনার কে হল? নাতনীর ছেলেকে কি বলে?"

"কি আবার বলবে। নাতিও নাতি; নাতির ছেলেও নাতি? নাতনীর ছেলেও নাতি।"

ঠিক তাঁর কথার সুর নকল ক'রে পিলে বলে ঃ "আবার ছেলেও নাতি!"

এত সাহস পিলে পেল কোথা থেকে? সে ইচ্ছা ক'রে বলেনি—তার মুখে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ভিতর থেকে কিসে যেন তাকে বলাচ্ছে! যে যা ভাবুক গিয়ে! অত হিসেব ক'রে, পুতু পুতু ক'রে কথা বলতে আর চায় না সে!...এই অসংযত মুহূর্তের মাত্রাধিক্যের জন্যে পরে হয়তো তার অনুশোচনা আসতে পারে, কিন্তু এখন তার সে খেয়াল নেই। এখনকার নিষ্ঠুর আক্রমণশীল মন নতুনদিদিমাকে ব্যথা দিতে চায়।

নতুনদিদিমা মৃদু বিরক্তি প্রকাশ করলেন পিলের কথায় ঃ "বাঃ, তুই দেখছি বেশ কথা বলতে শিখে এসেছিস কামিখ্যেব দেশ থেকে।"

গুটলিদি পিলের পক্ষ নিয়ে বলে ঃ "নাতনীর ছেলেটাকে নাতিই বলো আর যাই বলো, তোমার বাড়িতে এলে সেটাকে কোলে তো নেবে, না তা'ও নেবে না?"

"ওমা তাইতো! তুই কট্‌কটি থাম তো! খোঁচামারা খোঁচামারা কথা। গুষ্টির ধারা তোদের যাবে কোথায়। দে তো দেখি খোকাকে। এস দাদুন আমার কোলে। এস খোকনবাবু। তুই ওঠ্ গন্ধপাতা।"...

কাঠের তক্তা নড়েছে এতক্ষণে! তুলসী ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। এতক্ষণের মধ্যে সে একটিও কথা বলেনি। পিলে স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে, তার কথায় বিরক্তিব ঝাল নতুনদিদিমা ঝাড়লেন গুটলিদির উপর। রাগের মুখে ঠিকেদারবাবুর গুষ্টির উপর থিতিয়ে-পড়া আক্রোশ বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ পিলের খেয়াল হয় যে, এবার এসে নতুনদিদিমার মুখে 'এদের সংসারে' তাঁর উপর অবিচারের কথা একরকম শোনেনি বললেই হয়। একটু নির্লিপ্ত ভাব?...ভাগ্যের উপর অনুযোগ করবার অভ্যাস তাঁর কমে গেল কি করে? ঐসব বলেই তো উনি নিজের উপর সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন চিরকাল। তাঁর নির্দিষ্ট ভাগ্যের বাইরে কিছু খুঁজে পেয়েছেন নাকি? যাক! পরিচিত নতুনদিদিমার এক ঝলক দেখতে পাওয়া গেল 'গুষ্টির ধারার' প্রতি অপছন্দ প্রকাশে।

উঠে বসে তুলসীর আড়ষ্টতা কাটে। সে খোকার গাল টিপে আদর ক'রে বলে—"বাবারে বাবা, এক দণ্ড আরাম নেবার উপায় নেই—এই ডিমটার জ্বালায়।" এইবার তুলসী হেসেছে।

ছোট একটি কথা। 'আরাম নেওয়া।' ভারি সুন্দর লাগে কথাটি পিলের। নতুনদিদিমার কোলে শোয়ার মানে 'আরাম নেওয়া'। এতক্ষণ তুলসী 'আরাম নিচ্ছিল।' নতুনদিদিমাও অল্প অল্প হাসছেন। তুলসীকে দেখিয়ে গুটলিদিও হেসে, ঠাট্টা করল —"দেখছিস খোকন, এই বুড়ো খোকাটা তোকে হিংসে করছে।"

মিষ্টি হয়ে উঠেছে পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে। তুলসী কোল ছেড়ে ওঠায় সব বদলে গিয়েছে। তার খানিক আগের আড়ষ্ট দেহ ও মন স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেয়েছে বলেই অন্য সকলের মনও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে মুহূর্তের মধ্যে। এই ভাবটা যদি তুলসীর সব সময় থাকে, তাহলেই বোধ হয় পিলের মনের গ্লানি কেটে যায়। 'আরাম নেওয়া' কথাটি আরও ভাল লাগছে, এতে

ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব নেই ব'লে; এতে পোরের ভাজার গন্ধ নেই ব'লে। এইরকম প্রাণখোলা কথাই তো পিলে চায় তুলসীর কাছে। তবে না সেই যুগ ফিরে পাওয়া যায়, সে যুগে তাদেব কাছে একাদশীর অর্থ ছিল—'fortnight-এ নতুনদিদিমা sure'-এর দিন। পুরনো দিনের মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরপুর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু খোকা বায়না ধরেছে বাড়ি যাবার জন্যে। ইচ্ছে থাকলেও পিলের আর এখন থাকবার উপায় নেই এখানে। নতুনদিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন : "খোকাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার আসবি নাকি পিলে?"

"আজকে আবার দিদি রাঁধছে কিনা। এত বেলায় বাড়ি থেকে না খেয়ে বেরুলে পিসিমা আস্ত রাখবেন না। আচ্ছা আবার ওবেলা আসবো; অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দেওয়া যাবে।"

"গরমকালের একাদশীতে ওবেলা কি আর আমি বসে গল্প করতে পারি? সে শক্তি আর আমার নেই। বয়স হচ্ছে তো দিন দিন। গত বছরও জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশীতে আমি বিকেলে ডাল ভেঙ্গেছি জাঁতায়। এখন আর পারি না। গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে আসে।"

পিলের হঠাৎ-আসা উৎফুল্লতার দীপ্তি দপ করে নিভে যায়। এই ভয়েই সে সব বিষয়ে ভালর চেয়ে খারাপ দিকটা আগে ভাবতে চায়, সাবধান হয়ে বুঝেসুঝে কথা বলবার চেষ্টা করে। নতুনদিদিমার কথায় রূঢ়তা নেই। কিন্তু তার প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান স্পষ্ট। নিজে কষ্ট স্বীকার ক'রে পাড়ার ছেলেমেয়েদের আদরের অত্যাচার সহ্য করাতেই ছিল তাঁর আনন্দ চিরকাল। শুধু কি কষ্ট স্বীকার? কত সময় ক্ষতি স্বীকার, কত সময় বাড়ির লোকদের মুখঝামটা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে এর জন্যে। লণ্ঠনের চিমনি ভাঙ্গা, পেয়ারাতলার ঘুঁটেঘরের খাপরা ভাঙ্গা, গোবরমাটি দিয়ে নিকানো তক্‌তকে উঠনে গর্ত খোঁড়া, ঘরের দেওয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে পাখী আঁকা, দেওয়ালে ঝোলানো মশারির, দড়িতে গেরো দেওয়া, পাশবালিশ দিয়ে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ খেলা, কাচাকাপড়ের আলনা ছোঁয়া, ঠাকুবঘরের বারান্দায় পা না ধুয়ে ওঠা—ঠিক যে জিনিসগুলো তিনি অপছন্দ করতেন, সেইগুলোই তাঁকে সইতে হ'ত প্রতিদিন। 'বাড়ির-মানুষের' কাছে সে-সব লুকানোর চেষ্টা করতে হ'ত। সেই নতুনদিদিমা নিজের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে ব'লে পিলের সামান্য একটা আবদার রাখতে অস্বীকার করলেন।

আবদার নয়, সামান্য একটা কথা। না, কথা রাখার প্রশ্নও ওঠে না। কেন না নিজেই তিনদিন আগে পিলেকে রোজ রাত্রে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। মনের ভিতর থেকে ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু নতুনদিদিমাকে এত কঠোর সে কোনদিন ভাবতে পারবে না। তাঁর এখনকার অযথা কাঠিন্যের কারণ হচ্ছে অন্য। নতুনদিদিমা নিজে থেকে এমন কখনই হতে পারেন না—যতই বদলান না কেন তিনি। স্পষ্ট বলতে ভয় পাচ্ছে পিলে।...

...তুলসীর মন রাখবার জন্যে নতুনদিদিমা পিলেকে রাত্রে আসতে বারণ করলেন। তিনি তুলসীর রাগারাগি দেখে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে, ঐ সময়টুকু তার একার—আর কারও নয়—রাত্রে সে তাঁর কাছে না গেলেও। এত ভয় করেন তিনি তুলসীর রাগকে? তুলসী যে একাদশীর রাত্রে কোনদিন তাঁর কাছে বসে গল্প করতে চাইত না, উপোস-করা মুখের দুর্গন্ধের ভয়ে।

পিলের এ দুঃখ রাখবার জায়গা নেই।

নতুনদিদিমার ব্যবহারে মাঝে মাঝে ব্যথা পাওয়া ছোটবেলা থেকে অভ্যাসের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছে পিলের। এ বেদনাগুলো আসবার মুহূর্তে খুব তীব্র থাকে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঐ সম্পর্কিত বহু চিন্তার মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ে ফিকে হয়ে আসে। তারপর টেঁকে বেশ কিছুদিন। তার এক এক সময় সন্দেহ হয় যে, এইসব মৃদু দুঃখগুলিকে আরও ফিকে করে নিয়ে মনের

মধ্যে জীইয়ে রাখাটা সে উপভোগ করে। অবসর সময়ে এগুলোর রোমন্থনে বহুকাল পরেও ব্যথার মধ্যে দিয়ে একরকম আনন্দ পাওয়া যায়—ঠিক যেমন একটি পালক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কানের পর্দায় মৃদু ব্যথা লাগাতে আরাম লাগে। আনন্দ লোককে ভোলায়, কিন্তু মৃদু ব্যথার আমেজ লোককে মনে পড়ায়।

এই রকম ছোট ছোট ব্যথা, আর সেই ব্যথা-ভোলানো ছোট ছোট আনন্দের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, পিলের এবারকার এখানে থাকবার দিনগুলি। প্রথমে দুঃখগুলোকেই বড় বলে মনে হয়, পরে বোঝা যায় যে সব মিলিয়ে আনন্দের ভাগটাই বেশি। বেদনার অংশটা এসেছে তুলসী ও নতুনদিদিমা দু'জনের দিক থেকেই; আনন্দের ঝলকগুলো শুধু নতুনদিদিমার কাছ থেকেই পাওয়া। যেখানেই যাক, কথায় ও ব্যবহারে বিনা আয়াসে আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করবার তুলসীর একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল; এখন সেটা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। টেল্‌লেস্ ক্লাবে পর্যন্ত। তার নির্দোষ ঠাট্টাগুলো স্বকীয় ধারা ও ধার অনেক পরিমাণে হারিয়েছে। কথার টিপ্পনিগুলোর মধ্যে আগেকার স্বতঃস্ফূর্ততা খুঁজে পাওয়া শক্ত। ছোটবেলা থেকে তার মনে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। সেই তুলসীর মধ্যে সঙ্কীর্ণতার আভাস পেয়ে পিলে প্রথমে বিস্মিত ও পরে মর্মান্তিক দুঃখিত হয়েছে। ...আসলে লেখাপড়া শেখেনি ব'লে তার মনে একটা হীনতার ভাব জাগতে আরম্ভ করেছে। কয়েকদিন তার হাবভাবে এ জিনিস ফুটে বেরিয়েছে; যেমন একদিন টেল্‌লেস্ ক্লাব তুলে দেবার কথায়, পিলের ডাক্তারি খেতাবের উপর কটাক্ষ করেছিল তাকে লেজওয়ালা ব'লে। কথাটিকে সাধারণ ঠাট্টা ব'লে নেওয়া যেতে পারত, যদি না এর সমর্থনে আরও অনেক ছোট ছোট বিষয় তার নজরে পড়ত। গাঙ্গুলিমশাই পাড়ার লোকের কাছে বলেন, "ছেলেটার পড়াশোনা তো কিছু হ'ল না; তাই দিলাম ঠিকাদারিতে ঢুকিয়ে—নিজের হাতের মধ্যে যেটুকু আছে। এখন দেখা যাক কদ্দুর কি হয়!" ...নতুনদিদিমার কেষ্টকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য ব্যগ্রতা যাতে তাকে ঠিকাদার না হ'তে হয়।...এ সবই তুলসী জানে তো! নতুন দিদিমার ঠিকেদারদের সম্বন্ধে। কি রকম ধারণা, সে কথা শুনছে অষ্টপ্রহর।...মনের এ দিকটা, বড় হ'লে স্পর্শকাতর হ'তে বাধ্য।...অন্য কে কি বলে, সে কথায় কান না দিক, নতুনদিদিমার মতামতের মূল্য আছে তুলসীর কাছে।...তা ছাড়া নতুনদিদিমার পিলেকে 'ডাক্তার সাহেব' বলা হাসিচ্ছলে আদরের মধ্যেও খানিকটা মর্যাদা মেশানো। গুটলিদি, বন্ধুবান্ধবরা, পাড়ার লোকে, সকলেই আজকাল পিলেকে হবুডাক্তার হিসাবে খানিকটা অতিরিক্ত খাতির দেখায়;... পাড়ার ছেলেদের মধ্যে প্রথম ডাক্তারি পড়তে গিয়েছে..মড়া কাটবার জন্যে সিগারেট খেতে হয় ওকে—কাটাকুটি করবার শক্তির জন্যে রোজ মাংস খেতে হয়—মানুষের হাড় ঘাঁটাঘাঁটি করে—মড়ার খুলি দিয়ে টেবিল সাজায়—মেমসাহেবদের সঙ্গে যখন-তখন কথা বলে—অন্য ছেলেদের উপর এর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব ইন্দ্রজালের মত রহস্যে জড়ানো। ...এ সব ছোট ছোট জিনিস আজকাল তুলসীর নজরে পড়ছে। ...এততাল সে খানিকটা উঁচু থেকে নীচের লোকজনভরা সংসারটাকে দেখত। কে তার চেয়ে পড়াশোনায় ভাল একথা ভাববার দরকার হয়নি, সময়ও ছিল না। কিন্তু এখন আর তা নেই।...

তার বর্তমান মনের একটা চরম দৃষ্টান্ত দেখেছিল পিলে, এবার যেদিন মেডিক্যালের দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষার পাশের খবর বেরুল। পিসিমার চোখে জল এসে গেল; নতুনদিদিমা হি-ই-ই শব্দ ক'রে মাথাটা কাছে টেনে নিলেন; নবীন সেকরা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে অর্শ রোগের চিকিৎসা শিখবার কথাটি আবার একবার মনে করিয়ে দিল; টেললেসের একজন সদস্য সদস্যতার যোগ্যতা হারানোর পথে অর্ধেক অগ্রসর হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও, তাকে নিয়ে হুর্‌রে হুর্‌রে পড়ে গেল সেখানে।...তুলসী কিন্তু খবর শোনামাত্র প্রথমেই প্রশংসা করল পিলের জামাইবাবুদের; শ্বশুরবাড়ির লোকেরা একটু অন্যরম হ'লে বোনের সাধ্যি কি ভাইকে সেখানে রেখে পড়ায়।...ক্লাবে সেদিন পিলেকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ।... "আজকের মত দিনে একটা কিছু করতে হয় মনে রাখবার মত। কি করা যায়? কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটু সিদ্ধি খেলে হয় না? না করিস্ না, তুই পিলে! গাঁজা নয়, মদ

নয়, পাতলা সিদ্ধির শরবত; বিজয়া দশমীর দিন আমাদের তার চেয়েও পাতলা। একেবারে ফাস ক্লাস্‌ ক'রে মাইরি! ভাঙের শরবত তয়ের করতে 'এক্সপার্ট' পি. ডবলু. ডি.'র জগদীপ আরদালী; তাকে দিয়ে আমি করিয়ে নিয়ে আসছি এখনই; আধ ঘণ্টার ভিতরে। Don't anxious—কিছু ভাবতে হবে না।"...

সকলেরই সমান উৎসাহ। পিলেও নিমরাজী। না বলতে পারল না। সাইকেলে তুলসী চলে গেল শরবত তয়ের করিয়ে আনতে।...

সে রাত্রে কেলেঙ্কারির একশেষ!...পিলে খেয়েছিল অল্পই—ছোট গেলাসের এক গেলাস। তাইতেই যা কাণ্ড; তুলসী ছাড়া আর বাকি সব ক'জনের নেশা হয়েছিল। আর সে একটু-আধটু নেশা! তুলসী পিলেকে পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়িতে। পিসিমাকে দেখেই পিলের হাউমাউ করে কান্না। মাঝে মাঝে চিনতে পারছে, মাঝে মাঝে ভুলে যাচ্ছে।—"আর আমি বাঁচব না পিসিমা, এই দেখ আমার নাড়ী নেই। আমার জিভের সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাতালে ঢুকে যাচ্ছি।" পিসিমা কান্নাকাটি আরম্ভ করেন। দিদি তুলসীকে বলে নুটু ডাক্তারকে খবর দিতে। তুলসী আশ্বাস দিল—"ডাক্তারবদ্যির কোন দরকার নেই; আনলেই এর উপরও বোধ হয় খানিক ব্র্যাণ্ডি গিলোবে। কাঁঠাল পাতা চিবুলেই ঠিক হ'য়ে যাবে। দাঁড়ান, আমি ওর মাথায় বালতি কয়েক জল ঢেলে দিই আগে। আমার আবার বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সময় নেই। আরও ক'টা রয়েছে! এতক্ষণ কি করছে কে জানে! সেগুলোকেও বাড়ি পৌঁছতে হবে এক এক করে। সেগুলো সব বাজারের-ছেলে।"

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়; কিন্তু জানাজানি হয়ে গিয়েছিল পাড়ায়। বাজারের-ছেলেদের আর কি—হয়েছিল পিলেরই মুশকিল। বড়দের সম্মুখে বেরুতে লজ্জা লজ্জা করছিল, এর পর দিন কয়েক। সেকরাবাড়ির ছেলেরা বলল, "তুলসী নিজে খেয়েছিল অন্য ঘটি থেকে, আর পিলেদের ঘটির মধ্যে একটা পয়সা ফেলে দিয়েছিল, নেশা বেশি করানোর জন্যে; খানিকটা সিগারেটের ছাইও মিলিয়ে দিয়েছিল শরবতের সঙ্গে নিশ্চয়ই, নইলে অতটুকু খেয়ে কি অমন কেলেঙ্কারি হয়?" নতুনদিদিমা বকলেন, "ও ছাই তুই খেতে গেলি কেন? যে খায় সে খায়!" লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করে পিলের। সেখান থেকে বাড়ি ফিরবার সময় তুলসীর কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল তার বর্তমান মনের এক অপ্রত্যাশিত দিক। সে শুনিয়ে দিল—"আমাকে যে মদ খাওয়ার কথা বলিস, দ্যাখ, লোকে বললে কেমন লাগে।" এ কথা শুনবার পর সেকরাবাড়ির ছেলেদের কথা পিলে আর অমূলক সন্দেহ ব'লে উড়িয়ে দিতে পারে না।...ভেবে ভেবে তারও আবছাভাবে মনে পড়ে যে, প্রথম যখনই নেশা হয়েছে ব'লে বুঝতে পেরেছিল, তখনই সে বাড়ি চলে আসতে চেয়েছিল। তুলসী আসতে দেয়নি। তুলসী তখন তাকে দিয়ে অজস্র বাজে কথা বলিয়ে তার নেশা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে! মিষ্টি খেলে নেশা বাড়ে বলেই সে সিদ্ধি বাঁটিয়ে আনবার সময় অনেক মিষ্টিও কিনে এনেছিল। বলেছিল—"পিলেটা তো খাওয়াবে না; পাশ করেছে ব'লে আমিও খাইয়ে দিচ্ছি ওকে।"...

মোটের উপর সব মিলিয়ে পিলের ধারণা যে, মনে একটা হীনতার ভাব জাগার জন্যে তুলসীর মন স্বাভাবিক উদারতা ভুলেছে। কই, পিলে তো কোনদিন তুলসীকে ছোট করতে চায় না কারও কাছে! তার মদ খাওয়ার কথা সে কি কারও কাছে বলেছে? কারও কাছে তুলসীর নিন্দা করেছে? তবে আর বন্ধু কি হ'ল? আছে তো সব জিনিসেরই একটা...!

আবার ডিব্রুগড়ে এসে হিসাব-নিকাশ খতিয়ে বোঝা যায় যে, যা কিছু ঘটে যাক, নতুনদিদিমা, সেই নতুনদিদিমা। এবার কাছে গিয়ে যা নিয়ে দুঃখ পেয়েছিল, সেগুলো দূরে আসবার পর মনের নাগালের বাইরে চলে যায়। তাঁর হাসিখুশি জ্বলজ্বলে মুখখানিই কুয়াশার ঘোমটা সরিয়ে ফুটে বের হয়।

..."তুই আবার ও ছাই খেতে গেলি কেন?"...বকুনির মধ্যে এতখানি দরদ তিনি ছাড়া আর

অন্য কেউ কি ভরে দিতে পারত?...নতুনদিদিমার ক্রটিগুলো যত তাড়াতাড়ি ভোলা যায়, তুলসীর গুলো সে রকম যায় না। মনে-পড়াগুলোর অদ্ভুত স্বভাব; কোন নিয়মকানুন মেনে চলে না। তুলসীর কথা ভাবতে গেলেই মনে আসে এবারকার তুলসীর কথা—ঝগড়াটে তুলসী, ভুঁদভুঁদে তুলসী, অনুদার তুলসী! কিন্তু নতুনদিদিমার বেলা এবারকার সময়টাই বাদ। আগের ছবিগুলোই তিনি; এবারকারটা আসল তিনি নন! 'মিষ্টি' ছাড়া আর কোনও বিশেষণ তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। 'নতুন' শব্দটি ভাল না; নতুনদিদিমা শুনলেই মনে হয় যে, পুরনো আর একজনকে ইনি গায়ের জোরে ঠেলে সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। যদি মাসি-পিসি খুড়ি-জেঠীদের ইচ্ছামত নাম দেবার চলন থাকত, তাহলে পিলে নিশ্চয়ই নতুনদিদিমার নাম দিত মিষ্টিদিদিমা।...ঐ যে ঘুঘুর ডাক কানে আসছে ভেসে; যে শুনবে সে-ই বলবে, ঘু-ঘু-ঘু ক'রে ঘুঘু ডাকছে। বড় জোর 'ঘু ঘু ঘু—মতি সু।' কিন্তু নতুনদিদিমা শুনলেই বলবেন ঃ "ঐ শোন, ঘুঘু পাখী কি বলছে! ঘুঘু বলছে—ও গোপাল ওঠো ওঠো ওঠো—ও গোপাল জাগো জাগো জাগো!" এত মিষ্টি ক'রে কি বলতে পারে অন্য কেউ? একথা কি মনে না পড়ে পারে? এই মিষ্টি কথাগুলোই নতুনদিদিমা!...যত দিন যায় ততই বোঝা যায় যে, তার মনের ভিতরে নতুনদিদিমা ভরা আছেন কতকগুলি কথার মধ্যে।...কখনও ঠাসা ভরা, কখনও আলগোছে জড়ানো কথাগুলোর সঙ্গে।...তার নিবিড় সম্বন্ধ আসলে নতুনদিদিমা মানুষটির সঙ্গে নয়, তাঁর বলা কথার সঙ্গে।...গানের কান নেই তা'র। গলাও নেই। অথচ কথার ধ্বনি কি করে তা'র মনে দাগ কাটে, অন্তরের সুপ্ত তন্ত্রীতে সাড়া জাগায়?...নতুনদিদিমা যদি বোবা হতেন, তাহলে বোধ হয় তাঁর কোন আকর্ষণ থাকত না পিলের কাছে!...সেই জন্যেই বোধ হয় তাঁর কথা শুনলেই আর তাঁর উপর রেগে থাকা যায় না!...

পিলে ভাবছে যে সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে আত্মবিশ্লেষণ ক'রে চলেছে। কিন্তু আসলে তার মনের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে নতুনদিদিমার সমালোচনা, এবার আসা থেকে। সমালোচনা এখনও খুব নরম, খুব মৃদু। নতুনদিদিমাকে খোলাখুলি ভাষায় কথা-সর্বস্ব বলতে বাধছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপরও বিরক্তি আছে, এবারকার ঐ ব্যবহার পাবার পরও তাঁর কথার সম্মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছে না ব'লে।

আর এক দিকেও পিলের মনে একটু পরিবর্তন এসেছে এবার। যেখানেই থাকুন, আগে নতুনদিদিমা আছেন ব'লে, তার মনে একটা পরিপূর্ণতার ও সন্তোষের ভাব ছিল। না-পড়া খবরের কাগজখানা হাতের মধ্যে থাকলে এরকম হয় না! হয়তো হাতে কাজ আছে, কিছুক্ষণের মধ্যে কাগজখানা পড়বার সময় হবে না, তবু সেখানা নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকলে খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। সেই রকমের আনন্দ ছিল আগে। ওই পরিতৃপ্তির ভাবটা পিলে চেষ্টা ক'রেও ফিরিয়ে আনতে পারে না, এবার দূরে চলে এসে।

এবার আসবার পর থেকে নতুনদিদিমা একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে চিঠি দেন। অথচ সে ঠিক ক'রে নিয়েছিল যে, তিনি ঠিক সময়ে চিঠি না দিলে আর সে আগেকার মত রাগারাগি ফাটাফাটি করবে না। রাগ করবে কার উপর? অভিমানের স্থান নেই বোধ হয় আর এখন, শুধু দুঃখ পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু আজকাল ঠিক সময়ে চিঠি দিয়ে, নতুনদিদিমা আর পিলেকে দুঃখ পাবার সুযোগ দেন না।

পিলের নাকে পোরের ভাজার গন্ধ লেগে আছে জেনেই বোধ হয় তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছেন!...তার পরই সে নিজেকে তাড়া দেয়—তোমার কাছেও যদি নতুনদিদিমা সুবিচার না পান, তবে পাবেন কোথায়? তিনি যদি একথা ঘুণাক্ষরে টের পান, তাহলে কি ভাববেন? ঠিক সময়ে চিঠি দাও, অথচ পেলে সন্দেহ কর! ছি!...এইতো গত সপ্তাহের চিঠিখান। কি সুন্দর কথাগুলো!..."ডাক্তার সাহেবের পা মাচায় উঠল নাকি পরীক্ষায় জলপানি পেয়ে? দেখিস! সরকার বাহাদুর কি তোকে জলপানি দেওয়ার সময় হুকুম দিয়ে দিয়েছে যে, ও টাকা থেকে নতুনদিদিমাকে খাওয়াতে পারবে

না? তোর একার পিলে-ভরা পেটে কতই বা আঁটবে! এত কিপটে তুই! আচ্ছা, বোঝা গেল! এদিকে আমি সেই কবে থেকে জোলাপ নিয়ে বসে রয়েছি খাওয়ার লোভে লোভে!..." নতুনদিদিমার গলার স্বর যেন কানে আসছে চিঠির কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে। জোলাপ নেওয়ার মত সুরুচি বহির্ভূত বাক্যরীতিও কি মিষ্টি লাগছে। হোক কথাটা শ্রুতিকটু। কিন্তু ঐগুলোই নতুনদিদিমা। কিছু না ভেবে অবহেলায় নিজেকে ছড়িয়ে দেন তিনি ঐসব বাকভঙ্গিগুলোর মধ্যে।...লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁর কথার ধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। পোরের ভাজার গন্ধ ছাপিয়ে একটি অতি পরিচিত হিং হিং গন্ধে ঘর ভরপুর হয়ে উঠেছে। দেহে-মনে একটা মিষ্টি রসের আমেজ।...হঠাৎ দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে নজর পড়ল পিলের। একাদশীর সাদা-কালো চাঁদের ফালি দেওয়া ক্যালেণ্ডার।...মাস কয়েক পাতা ছেঁড়া হয়নি। ভুল হয়ে গিয়েছে! সে তাড়াতাড়ি উঠে পাতা ক'খান ছিঁড়ে দেয়।...

ভুল হঠাৎ মনে পড়বার মত একটা হেঁচকা টানের ভাব এসেছে আজকাল, নতুনদিদিমা-সম্বন্ধী এলোমেলো ভাবনাচিন্তাগুলোর মধ্যে। তাঁর কথা মনে এলেই ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে নতুনদিদিমা কি করছেন ভাবলে একটা অতিরিক্ত যোগাযোগ স্থাপনা করে যায় তাঁর সঙ্গে। আনন্দের ফাউ পাবার লোভে, এ চিন্তা সে চেষ্টা ক'রে মনে আনবার চেষ্টা করত প্রথম দুবছর। সেইটা এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। না চাইলেও সেই নাছোড়বান্দা চিন্তার হাত থেকে আজকাল নিস্তার নেই। নতুনদিদিমার দিনের প্রতি ঘণ্টার কাজ বাঁধা; পিলের সে সব নখদর্পণে। ঘড়ির মত তাঁর কাজ দেখেও সে ঠিক বলতে পারে ক'টা বাজল।...তার বৈজ্ঞানিক মন নির্ভুলতা পছন্দ করে। তাই দ্রাঘিমা দেখে অঙ্ক কষে সে ঠিক করে নিয়েছে, এখানকার ঘড়ির সময় থেকে কতটা বাদ দিতে হয়, সেখানকার সময় পেতে হলে। এ আর আজকাল ভেবে বার করতে হয় না; আপনা থেকে এসে যায় নতুনদিদিমা এখন কি করছেন ভাবতে গেলেই।...সন্ধ্যার আসরে গল্প করতে করতে নতুনদিদিমার প্রথম হাই উঠত রাত ন'টার সময়।...এসব তার মুখস্ত। ন'টা মানে এখানকার টাইমে ন'টা পঞ্চাশ।...তাঁর হাই উঠলেই তুলসী হেসে বলত 'চলরে পিলে, এবার যাওয়া যাক্। ন'টার ঘণ্টা পড়েছে!"...তাই রাতে হাই এলে নতুনদিদিমা চাপতে চেষ্টা করতেন।—নইলে এখনই এরা হেসে উঠে পড়বে—কে এদের বোঝাবে যে, ঘুম না এলেও, গল্প ভাল লাগলেও হাই উঠতে পারে—পণ্ডিত কিনা, সব বুঝে বসে আছিস তোরা!.....

পিলে হঠাৎ সতর্ক হয়ে থেমে গেল। সন্ধ্যার সময়ের সেখানকার কথা সে আর ভাবতে চায় না আজকাল!...

...যাক্‌গে! যে যা ইচ্ছা করুক গিয়ে যাক্! সে এসেছে পড়তে এখানে। গরীবের ছেলে সে। তাকে ভাল ফল করতে হ'বে পরীক্ষায়! ডাক্তার হয়ে বাংলা দেশে গিয়ে পয়সা রোজগার করতে হবে!...অনেক সময় অযথা নষ্ট করা হয়েছে!...পিলে পড়ার বইয়ে মন বসাতে চেষ্টা করে।

তার মনের এই দিকটা সাংসারিক অভিজ্ঞতার দিক, বুঝেসুঝে চলার দিক; আর নতুনদিদিমার দিকটা ভাবপ্রবণতার দিক, বেহিসাবী দিক। এই দুটো দিকের মধ্যে বিরোধ লেগে আছে অষ্টপ্রহর। বুঝেসুঝে চলার দিকটা আগে ছিল নিজের সুনাম অর্জনের চেষ্টার অঙ্গ; বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই দিকটা ক্রমেই জড়িত হয়ে পড়ছে নিজের ভবিষ্যৎ ও সুবিধা-অসুবিধার সঙ্গে। আর্থিক অসাচ্ছল্যেরই ফল বোধ হয় এটা। ভেবে চিন্তে চলে বলেই প্রথম জলপানি পেয়ে দু'টাকা দিয়ে দিদির শাশুড়ীকে প্রণাম করেছিল। তিনি খুব খুশী। অপরের বিশ্বাস সৃষ্টি করানোর ক্ষমতা পিলের আছে চিরকাল। গুটলিদি তার কাছে পেটের কথা বলে; তারাদা'র বউ পর্যন্ত লুকিয়ে তাকে দিয়ে টুকিটাকি জিনিস কেনায়।...

ঠিক ছিল যে, ডাক্তারি পাশ করবার আগে সে আর বাড়ি যাবে না। কিন্তু পিসিমার অসুখের উপলক্ষ ক'রে দিদির শাশুড়ী একরকম জোর ক'রে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, তৃতীয় বছর শেষ হ'বার পর। অসুখ বিশেষ কিছু না। সে কথা পিলে জানত, কিন্তু দিদিদের বলেনি। নতুনদিদিমা

একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, "তোর পিসি মাঝে মাঝে জ্বরে ভুগছে। এই সেদিন জ্বর থেকে উঠল। দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি বললাম যে, লেবুজারা খেলে জ্বরের পরে মুখ পরিষ্কার হয়ে যাবে— ঠাকুর ঘরে আলাদা করে রাখা আছে, পাঠিয়ে দেবখুনি। শুনেই তোর পিসি উঠেছে ফোঁস ক'রে— না না লেবুজারা ফারার দরকার নেই। কি যে মানুষ! আচ্ছা বাপু ঘাট হয়েছে। মাপ চাচ্ছি। তুমি সাত জন্মেও লেবুজারা খেয়ো না!...কি দোষই যে করেছি সকলের কাছে ভগবান জানেন। তোর পিসি ব'লেই দেখতে যাই, বুঝলি। ভাবি যে বুড়ী একা থাকে।...যাকগে। তোর পিসি ভাল আছে, তুই ভাবিস না।"...

পিসিমাটা কিরকম যেন! তাঁর ব্যবহারের জন্যে চিরকাল নতুনদিদিমার কাছে লজ্জা করে। কোনদিন পিসিমা নতুনদিদিমাকে দেখতে পারেন না।...অন্য কেউ চিঠি লিখলে নিশ্চয়ই, 'তোর পিসি ভুগছে' না লিখে 'তোর পিসিমা ভুগছেন লিখত!...

নতুনদিদিমার চিঠির কথা সে সাধারণত কারও কাছে বলে না; তাই দিদিকে বলেনি পিসিমার শরীর খারাপের কথা। ভেবেছিল সেরেইতো গিয়েছে, কি আর বলবে। কিন্তু দিদি ধরেছিল পিসিমার নিজের চিঠি থেকেই। তাঁর পরপর দু'খানা চিঠিতে নিজের কথা কিছু লিখতে না দেখে দিদি ব্যস্ত হয়ে চিঠি লিখেছিল। তার জবাবে পিসিমা লিখেছিলেন, "আমি কি আর টপ ক'রে মরব? তুই মিছামিছি ব্যস্ত হ'স। আমি অবাক হয়ে ভাবি, মেয়েরা মায়ের জন্য যত ব্যস্ত হয়, কই ছেলেদের তো তেমন হতে দেখি না।"...

এ অভিযোগ পিলে অস্বীকার করতে পারে না।

চিকিৎসা, যাওয়া-আসা, টাকা পয়সা খরচের ব্যাপার। দিদি লজ্জা পায়। দিদির শাশুড়ী নিজেই সেকথা বুঝে, একরকম জোর ক'রে পিলেকে পাঠিয়ে দিলেন পিসিমাকে দেখে আসার জন্য। মাউইমা সত্যিই খুব ভাল লোক।

পরীক্ষা শেষ হবার দিন ছাত্ররা যেমন হঠাৎ কি করবে ভেবে পায় না, পিলেরও সেইরকমই অভিভূত গোছের অবস্থা। আগে থেকে ঠিক ছিল না ব'লেই সে বিহ্বল হয়ে পড়েছে আরও বেশী।...পিসিমার ম্যালেরিয়া জ্বর সেরে গিয়েছে তা সে জানে, তবে সেকথা সে কারও কাছে এখনও প্রকাশ করতে চায় না যাওয়া বন্ধ হ'বার ভয়ে। জলপানির টাকা দিয়ে সে পিসিমার জন্যে একজোড়া থান ধুতি কিনে নিয়ে যাবে।...তিনি নিশ্চয়ই পাড়ায় সকলকে দেখিয়ে বেড়াবেন। ...'ছোঁড়া, পিসিমা বলতে অজ্ঞান।'

...নতুনদিদিমাও জলপানি পাবার পর খাওয়াতে লিখেছিলেন। খাওয়ানোটা অবশ্য ঠাট্টার কথা। কিন্তু পিলের ইচ্ছা করে ভাল ক'রে স্নান-টান করে, একদিন তাঁকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ায়। বামুনের ছেলের রান্না খেলে কি হয়েছে? যা আচার-বিচার তাঁর। তাছাড়া পিসিমাকে না জানিয়ে তো আর এ হতে পারে না! সে সম্ভব নয়। তার জলপানি পাওয়াতে নতুনদিদিমার অত আনন্দ; তাঁকে কি কিছু না দিলে চলে! দেখা হ'লেই আবার নিশ্চয়ই খাওয়ানর কথা নিয়ে হাসিঠাট্টা করবেন। সে সুযোগ পিলে দিতে চায় না।...কি দেওয়া যায়? একখানা বই দিলে হয় না? রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া আর অন্য কোন বই তাঁকে পড়তে দেখেনি সে। তারাদাদের বাড়ির সকলেরই ছাপার অক্ষরের উপর বিতৃষ্ণা। সে বাড়িতে বই দেওয়া কি ঠিক হবে? ছোটবেলায় নতুনদিদিমার মুখে কালকেতু, শ্রীমন্ত সদাগরের গল্প শুনেছে কত দিন।...তাঁদের গ্রামে তাঁর সইয়ের বাড়িতে আছে একখান ভারী সুন্দর কবিকঙ্কন চণ্ডীর বই। সুন্দর সুন্দর পট দেওয়া; ইচ্ছে করে পিলে গন্ধপাতা তোদের দেখাই। একখান পটের নীচে লেখা ছিল—"যদি না দেখাতে পার কমলে কামিনী, দক্ষিণ মশানে তবে যাইবে তখনি।"...সে ছবি দেখলে ভয় করে; এই এমনি করে চোখ পাকিয়ে হাত তুলে ভয় দেখাচ্ছে!...প্রথমবার শুনবার সময় পিলে জিজ্ঞাসা করেছিল 'মশান কি নতুনদিদিমা?' পণ্ডিত তুলসী বলেছিল—মশাল জানিস না? মশাল রে মশাল—জ্বলে! নতুনদিদিমার হাসিতে একটুও অপ্রস্তুত হয়নি সে।...নতুনদিদিমা

বলে দিলেন মশানের মানে।...আশ্চর্য। লেখাপড়া না শিখেও মশানের মানে জানলেন কি করে? এত ছড়া পাঁচালিই বা শিখলেন কি করে? সে একখান কবিকঙ্কণ চণ্ডীই দেবে নতুন দিদিমাকে। ডিব্রুগড়ে বই পাওয়া যায় না। কলকাতায় বইয়ের দোকানে লিখে দিল, পিলের বাড়ির ঠিকানায় পাঠাতে। ছবিওলা হওয়া চাই।

বইয়ের দোকানে লিখবার পরও আর দু'এক দিন পিলে ছুতোয় নাতায় ডিব্রুগড়ে দেরি করে, যাতে সেখানে পৌঁছুবার পরই বইখানি হাতে পায়।

কাউকে কোন খবর না দিয়ে এবার পিলে গিয়েছিল। পিসিমাতো অবাক। কলেজ কামাই ক'রে এক কুড়ি টাকা খরচ ক'রে তাঁর শরীর খারাপের খবর শুনে ছেলে এসেছে; এ আনন্দ তাঁর রাখবার জায়গা নেই!—"এত চিন্তিত হ'স কেন তোরা? আমার হচ্ছে ভাল্লুকের জ্বর—এই এল, এই গেল। আমাকে রোগা দেখছিস নাকি? না রে না। ও তোর চোখের ভুল। চিরতা ভিজিয়ে আমি রোজ খাই; আমাকে কি জ্বরে কাবু করতে পারে? আমি কি তোকে কোনদিন লিখেছি যে, আমার অসুখ? শরীর সে-রকম খারাপ হলে কি আর তোকে লিখতাম না?...হ্যাঁরে, বেয়ান রাঁধেন কেমন? তোর যে পিসিমার হবিষ্যি ঘরের রান্না না হ'লে রোচে না, তা কি আর আমি জানি না।"...

'তোমার জ্বরের সময় তুলসী টুলসী কেউ আসেনি দেখতে?'

'না, না, আসতে হবে না কারও। দেখতে পারি না দু'চক্ষে! যত সব বদ! ও লক্ষ্মীছাড়া এবার মেয়ে সেজে মিস্ত্রীপাড়ার 'যুগীরা'র দলে নেচেছে। ছোটলোকদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি নেচে বেড়ানো এই কি ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ? যেমন বাপ, তার তেমন ছেলে!'

পিসিমা তুলসীর উপর চিরদিন বিরক্ত; কিন্তু আজকের উষ্মা দরকারের চেয়েও বেশী! সে নিশ্চয়ই ফুদীমিস্ত্রীর পাল্লায় প'ড়ে চৈত্র মাসের যুগীরার নাচে নেমেছে। খোলাখুলিভাবে 'বাজারের ছোটলোকদের' সঙ্গে মিশে নাচ-গান রঙ্গ-তামাসা করা স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজে যে গুরুতর অপরাধ ব'লে গণ্য!...এসব করতে ঐ একমাত্র তুলসীই পারে!...

ডাকঘর থেকে বইয়ের পার্সেল ছাড়িয়ে তবে পিলে নিশ্চিন্ত হয়!...বহুকাল আগে নতুনদিদিমা যখন বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন, তখন সে আর তুলসী রোজ ডাকঘরে আসত তাঁর চিঠির লোভে। সেই যুগের চিঠি খোলার সময়ের কৌতূহল ও উদ্দীপনার স্বাদ পেল পিলে পার্সেল খুলবার সময়। সবচেয়ে বেশী ভয় যদি বইখানিতে ছবি দেওয়া না থাকে।...আর যদি সত্যিই সে ছবিখানি থাকে। সেই "যদি না দেখাতে পার কমলে কামিনী" লেখা ছবিখানি। তা'হলে ছোটবেলার নোলক-পরা নতুনদিদিমার সঙ্গে একটা নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হবে পিলের, যতবার ছবিটিকে দেখে তাঁর আনন্দ উপছে পড়বে, ততবার। যখনই ছেলেবেলার কোন কথা তাঁর মনে পড়ে, তখনই উছল আনন্দের দীপ্তি লাগে তাঁর মুখে চোখে। সেই সময়ের নতুনদিদিমার মনের পরশ সে পেতে চায়; তাঁর উচ্ছ্বাসের তীব্রতম মুহূর্তের স্বাদ নেবার তার আকাঙ্ক্ষা; তাঁর ছোটবেলার সঙ্গে মিশে যেতে চায়। যখন এই বিদেশ বিভুঁইএর মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করেনি, যখন উনি গোকুল ব্রত করবার সময় গরুর কাছে যেতে ভয় পেতেন, শীতকালে দোলাই গায়ে দিয়ে খেজুর রসের ভিয়েনের চারি দিকে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াতেন, যখন ওঁর দাদা একদিন ওঁকে পুকুরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন; সেই রহস্যময় আবেষ্টনীর নতুনদিদিমার সে পরশ পাবে যতবার তার দেওয়া বইয়ের ছবি, ছেলেবেলার ঝলকানি লাগাবে তাঁর মনে!.. ..

...না। সে জিনিস থেকে বঞ্চিত হ'ল পিলে। সে ছবি বইখানিতে নাই! তবে অন্য অনেক ছবি আছে। না থাকুক সে ছবি—বইয়ের গল্পগুলির সঙ্গেও তো নতুনদিদিমার শৈশবের ভাবানুষঙ্গ আছে! একটু ভগ্নোৎসাহ হয়েই সে ঢুকল তারাদাদের বাড়িতে।...নতুনদিদিমাকে কি আর একলা পাওয়া

যাবে!...যাক্! তাঁর ঘরে তুলসী নাই...তিনি কাঁথা সেলাই করছেন—বোধ হয় তারাদার ছেলের জন্যে। গুটলিদি সুপুরি কাটছে।

"কে রে? তুই!"

"পিসিমার শরীর খারাপ শুনে চলে এলাম দু'দিনের জন্যে।"

"কখন এলি?"

"কাল বিকেলে।"

কাল? তা কাল এলি না যে আমার কাছে? পিসির সেবা করলি?"

পিলে একথার জবাব দিল না। কেন যে কাল সন্ধ্যাতে দেখা করতে আসেনি একথা সে বলতে পারবে না তাঁর কাছে। বেশী আনন্দের সময় অনেকের মুখে একটা অপ্রতিভ ভাব আসে। তাই বোকার মত হাসে, কি বলতে কি বলে ফেলে। এই ভাবটা কাটানোর জন্য পিলেকে একটা কিছু বলতে হয়।

"তুলসিকে দেখছি না! আসে না?"

জবাব দিল গুটলিদি, "আসে আবার না! এই খানিক আগেইতো গেল। মিস্ত্রীপাড়ায় নাচতে গিয়েছে হয়তো। এবার ওদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি 'যুগীরা' নাচ নেচেছে যে, পয়সা নিয়ে নিয়ে!"

তুলসীর কথাটা প্রথমেই তোলা ঠিক হয়নি। পাড়ায় এ নিয়ে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল বোঝা যাচ্ছে। নতুনদিদিমার সম্মুখেও তুলসীর সম্বন্ধে যা'তা বলতে গুটলিদি আর এখন ভয় পায় না।...

নতুনদিদিমা বললেন, "না না। তোর গোস্ত গিয়েছে আপিসে, বিলের টাকা আনতে। এখন কি আর ছুটোছুটি না করে উপায় আছে। বাপে পেনশন নিয়েছে এই মাস থেকে। সে বুড়ো বামুনের নিশ্চিন্দি আর নেই। তিনিই ধ'রে নিয়ে গিয়েছেন আপিসে।—বাপ সঙ্গে থাকলে আপিসের লোক তাড়াতাড়ি টাকা দেয় কিনা। ছেলেপিলে হওয়াই মাবাপের শাস্তি। বৃদ্ধ আজকাল বারবাড়িতে মধ্যে মধ্যে এসে গুটলিকে ডেকে বলেন—তোর মাকে বল গন্ধপাতার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। আমার কথাতো কানেও তোলে না। ওর মাতো নেই, সেই জন্যেই আমার আরও চিন্তা। তোর মা ধরলে সে না করতে পারবে না।—আমার কথা শুনেতো ছেলে চলে কত! মা ও যা ঘটিও তাই, আজকালকার ছেলেদের কাছে। কতদিন বলেছি গন্ধপাতাকে বিয়ে করতে। ওর বাপ বোধ হয় ভাবে যে, আমি বলি না। নইলে বারবার একই কথা বলবে কেন? কে জানে! কি ভাবেন তা তিনিই জানেন।...তুই চলে এলি, তো আমার এবারকার চিঠিখানার কি হবে?...

কথার জাল বুনে চলেছেন নতুনদিদিমা। সেই জালে ফাঁসবার মিষ্টি নেশা লাগতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে পিলের।

সেই সব উত্তর না-আশা-করা প্রশ্ন, আগের কথার সঙ্গে সম্পর্কহীন পরের কথা—সব নতুনদিদিমার নিজস্ব। অতি পরিচিত। কথাগুলোর সূক্ষ্ম মাধুর্য কেন, অন্তর্নিহিত অর্থ পর্যন্ত বাইরের লোকে ধরতে পারবে না। রহস্যের কুহেলীতে ঢাকা ছোট্টো একটি গুপ্ত দলের সাঙ্কেতিক ভাষা। শুনে সবাই ভাবে, বেশ বুঝছে, কিন্তু আসলে কিছুই বুঝছে না। দুরকম মানে হয় কথাগুলোর। যে বলছে তার মন যদি তুমি না জান, তাহলে তার কথা বুঝবে কি করে?

এতক্ষণে তাঁর নজর পড়ল, পিলের মুখের বোকাবোকা হাসির দিকে। কি বলেছিলেন নিজেরই ভাল খেয়াল নেই।

"তা তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ব'স। ডাক্তার সাহেবের জন্য কি আবার চেয়ার আনতে হবে নাকি বৈঠকখানা থেকে! তোর হাতে ওখান কিসের বইরে?"

অর্থহীন ভঙ্গি গিয়ে পিলের মুখ ভরে উঠেছে সলজ্জ হাসিতে।—"এ একখান কবিকঙ্কণ চণ্ডী। আপনার জন্য আনলাম।"

"আমার জন্যে!"

লজ্জবিহ্বল পিলের মুখ দিয়ে কথা বেরয় না।...কত কি বলতে ইচ্ছা করছে।

তিনিও আনন্দের আবেশে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।...ঐ তো বাড়ির অবস্থা! তারই মধ্যে জলপানির টাকা জমিয়ে জমিয়ে তাঁর জন্য বই কিনে এনেছে! কি ভালই বাসে এই সব ছেলেপিলেরা তাঁকে! আগের জন্মের পুণ্যের ফল।...আপন থেকে পর ভাল, পর থেকে জঙ্গল ভাল!...এইসব ছেলেপিলেদের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। এদের কাছ থেকে পাওয়ার যে শেষ নাই। এত টান-ভালবাসার বদলে তিনি কতটুকু এদের দিতে পেরেছেন! কেবলই নিতে এসেছেন পৃথিবীতে!...

পিলেকে কাছে টেনে নিয়ে হি-ই-ই-ই করে আদর করবার কথা তিনি ভুলে গিয়েছেন। তার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খাওয়ার কথাও তাঁর মনে নেই। তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছে।.. পিলের হাত থেকে বইখানি নিতেও তিনি ভুলে গেলেন।

"আয়! এখানে বস!"

এই মৌন আদরের গভীরতা আগেকার চেনা আদরের চেয়ে অনেক বেশী। এখন একটি নিবিড় সম্পর্কের মুহূর্ত! দুজন দুজনের হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরা এক জিনিস, আর একজন অপরজনকে ছোঁয়া হচ্ছে অন্য জিনিস। পিলে লাভেই আছে; না থাকুক "যদি না দেখাতে পার কমলে-কামিনী—" ছবিখানি বইয়ে! সংশয়, প্রশ্ন, যুক্তি, তর্ক, সব নেশায় ঝিমিয়ে পড়েছে। ভাগ্যে এইরকম পরিপূর্ণ মুহূর্তে কথা বলতে ইচ্ছে করে না; না হলে সময়ের বাজে খরচ হ'ত!...এখনকার মত সে 'ফাস্ট'।...এই প্রথম বোধ হয় সে তুলসীর সমান হতে পারল নতুনদিদিমার চোখে, অর্থাৎ নিজের চোখে। অন্তত, দুজনেই ব্র্যাকেটে 'ফাস্ট' এখন।...

"গর্বে এখন মাটিতে পা পড়লে হয় মা'র। আমরা তো বাপু বানের জলে ভেসে এসেছি। কেউ দেবারও নেই, থোবারও নেই।"

গুটলিদির ঠাট্টায় এতক্ষণে পিলের মনে পড়ে যে, তার জন্যও একটা কিছু আনলে বেশ হ'ত। এর উত্তরে নতুনদিদিমা বললেন—"জলপানির টাকা দিয়ে বই কিনে দিয়েছে। গর্বের তো কথাই! কত দাম রে পিলে বইখানার?"

এ প্রশ্নের পর আর সেই পূর্ণ মুহূর্তটুকুকে ধরে রাখা যায় না। পলকের মধ্যে নতুনদিদিমা কি যে গড়ে তুলতে পারেন, আর কি যে ভেঙ্গে ফেলতে পারেন, তা তিনি নিজেই জানেন না। দামের প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জন্য পিলে বলে, "এইরে! গুটলিদি চটেছে রে! এখন যদি এক গেলাস খাওয়ার জলও চাই, তা'ও এনে দেবে না।"

"ও বাবা! ডাক্তার সাহেবকে কি চটাতে পারি!"

হাসতে হাসতে গুটলিদি জল আনতে গেল।

"ঐ এলেন!"

"কে?"

"কে আবার! তোমার গোসতো।"

বাড়ির বাইরের দেওয়ালে ঠেকিয়ে সাইকেল রাখবার শব্দ নতুনদিদিমার জান' অনভ্যস্ত কানে পিলে ধরতে পারেনি। তুলসী এসে ঢুকল বাড়িতে।

"দেখলি পিলে, হাত গুনে বলেছি কিনা যে তোর গোস্ত আসছে?"

"আরে! পিলে যে? হঠাৎ!"

"হ্যাঁ। ওর পিসিকে দেখতে এসেছে। অসুখ।"

"অসুখ? ও জটেবুড়ী পটল তুলবে নাকি এবার? আমার উপর ভারি চটা, পিলেকে খারাপ করে দিচ্ছি বলে। ভয়ে আমি ওদিক মাড়াই না।"

তার সম্মুখেও পিসিমাকে জটেবুড়ী বলতে ইতস্তত করল না তুলসী ‌ বলে আশ্বস্ত হয়।

কেননা এই হচ্ছে আসল তুলসী। তার ব্যবহার পিলের সম্মুখে আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, এত দিনের পর। এই জিনিসইতো পিলে চায়।

"হ্যারে তুলসী, তুই নাকি এবার নাটুয়ার দলে নেচেছিলি?"

তুলসী ফাজলামি করে কোমরে হাত দিয়ে 'যুগীরা' গানের এক কলি গেয়ে দিল, "তুঁত গাছ পর তুঁতী বৈঠে, তুঁত ঝরাঝর খায়"—(তুঁত গাছে টিয়াপাখি বসে টপাটপ তুঁত খাচ্ছে)।...

"আঃ! চুপ করনা! তারা এখনি এসে পড়বে! মহা মুশকিলতো এ-ছেলেকে নিয়ে!"

নতুনদিদিমা চাপা গলায় তাকে থামতে অনুরোধ করেন। মুখ দেখে বোঝা যায় যে, তুলসীর এই রসিকতা তাঁর নিজের খারাপ লাগছে না। কিন্তু তারা যদি কিছু ভাবে! কত ভেবে চিন্তে যে তাঁকে চলতে হয়, তা অন্য লোকে জানবে কি করে!

গুটলিদি পিলেকে জল এনে দিল।

"এইরে! আদেখলের ঘটি হল; জল খেতে খেতে বাছা ম'ল! মা যে দেখি একেবারে বইখানাকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসেছ! তোমারতো এখন বই পড়বার সময় কত! দাও, আমি এখন ওখানাকে নিয়ে যাই।"

"তা নেনা কেন।"

গুটলিদি বই নিয়ে চলে গেল ঠাকুরঘরের দিকে। তুলসী এঘরে থাকলে, সে চলে যায় ঠাকুরঘরে।

তুলসী জিজ্ঞাসা করে—'বই কিসের?'

'লাভের পাওনা!'

নতুনদিদিমাকে হাসতে দেখে সে ধরে নেয় যে, বইখানি দিয়েছে তারাদা।

"তাই নাকি! ব্যাপার কি? too much ভক্তি মনে হচ্ছে নারে পিলে?"

নতুনদিদিমা আন্দাজে বুঝলেন যে, কোথাও বুঝতে ভুল হচ্ছে তুলসীর। তাই বললেন ঃ 'জলপানির টাকা থেকে কিনে দিয়েছে পিলে।'

পিলে সলজ্জ কুণ্ঠায় তুলসীর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না; আর কেন যেন অন্তর থেকে অনুভব করছে যে, একথা তাকে না জানালেই ভাল করতেন নতুনদিদিমা।...একটা কিছু ঘটেছে বোঝা গেল তুলসীর গলার অস্বাভাবিক স্বর থেকে।...

"এ বেলায় নিতে আপত্তি হ'ল না?"

শুনেই পিলে তাকিয়ে দেখে, রাগে তুলসীর চোখ মুখের কাঠিন্যের রেখাগুলি উচ্চারিত হয়ে উঠছে ক্রমেই। নতুনদিদিমার ত্রস্ত চাহনিতে স্পষ্ট লেখা—এই দেখ, পাগল আবার কি কাণ্ড করে!

ব্যাপারটা কিছু বোঝা না গেলেও পিলে আঁচ করে নেয় যে, সেও এর সঙ্গে জড়িত। নতুনদিদিমা তার সম্মুখে এবিষয়ের আলোচনা অপছন্দ করেন; তাই হালকা কথা বলে গন্ধপাতাকে থামিয়ে দিতে চাইলেন, 'বস বস! রোদ্দুর থেকে এলি।'

"হয়েছে, ঢের হয়েছে! আমার বই ফেরত দেওয়া হয়েছিল কি পুরনো ব'লে?"

"কি রকম যেন তুই! সে ছিল তোর মায়ের বই—এক সময় তোর বাবা কিনে দিয়েছিলেন; নিজে হাতে নাম লিখে দিয়েছিলেন। কোথায় সে বই তুলে রেখে দিবি! সে বই আমাকে দিলেই কি আমি নিতে পারি? আছে তো সব জিনিসেরই একটা...। তা ছাড়া মহাভারত আমার নিজেরও রয়েছে। সোজা কথার বাঁকা মানে করবি কেন? কি যে ছেলেমানুষী করিস!"

"আচ্ছা আচ্ছা! আর নেকামি করতে হবে না!"

"কি বললে? নেকামি! নিজের পেটের ছেলে যদি এই কথা বলত তাহলে আমি চাবকে আজ তার গায়ের ছাল ছিঁড়ে নিতাম! এত বড় কথা! যে মানুষ বিয়ে করে এনেছিল, সে পর্যন্ত কোনদিন অত বড় কথা আমাকে বলতে সাহস করেনি! নেকামি! কার সঙ্গে কি বলতে হয় জান

না? ভেবেছ কি তুমি? আমি কি কারও দাসী-বাঁদী, যে সে যা চাইবে তাই করব?...এবাড়ির লোকেও মনে করে দাসী-বাঁদী, সকলেই মনে করে দাসী-বাঁদী—অদ্ভুত কপাল নিয়ে আমি জন্মেছিলাম।”...

নতুনদিদিমার এ মূর্তি পিলে খুব কম দেখেছে। রাগ হলেই তিনি 'তুই' না বলে 'তুমি' বলেন। তাঁর কথা বোধ হয় তুলসীর কানেও গেল না।

“অমন বই আমিও অনেক কিনে দিতে পারি।”—সে গটগট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণে পিলে নিজেকে এত বড় কাণ্ডটির জন্য অপরাধী ভাবতে আরম্ভ করে।...বড় বিশ্রী লাগছে তার। এতদিন পর দেখা হল! এব্যাপার এখন কতদূর গড়াবে কে জানে। মাঝে থেকে সে-ই হল নিমিত্তের ভাগী।...তুলসীটা যে ওজন করে কথা বলতে জানে না মোটে!...নতুনদিদিমা পা ছড়িয়ে বসে। নির্বাক, নিস্পন্দ। দুগাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে।...এখন উঠে চলে গেলেও দেখায় খারাপ। অথচ এমন করে কি দুজনে চুপচাপ বসে থাকা যায়।...চোখে জল যখন, তখন রাগ নিশ্চয়ই পড়ে এসেছে! হঠাৎ উনি এত চটে উঠলেন কেন? শুধু কি ঐ নেকামি কথাটিতে? এ বিশ্বাস করতে মন চায় না। তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, তুলসী পিলের সম্মুখেই ঐসব কথা তোলায়।...বুঝতে দেওয়া এক জিনিস, কিন্তু চোখে আঙ্গুল দিয়ে আলো ফেলে দেখিয়ে দেওয়া অন্য জিনিস।...পিলেকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজের অধিকাব ফলানো, অন্যায় না?...তুলসীর মত স্বভাবের লোকদের অভিমান ব্যক্ত হয় রাগের মধ্যে দিয়ে; চোখের জল কিম্বা ঘ্যানঘ্যানানির মধ্যে দিয়ে নয়। আবার আসবে নিশ্চয়ই রাত্রে। আসতেই যে হবে, তা কি পিলে নিজের অভিজ্ঞতায় জানে না?...

এই অবস্থায় চুপচাপ বসে পিলে কতক্ষণ যে অস্বস্তি ভোগ করেছিল তা জানে না।...হঠাৎ চমক ভাঙ্গল।...“হরে কৃষ্ণ! চারটি ভিক্ষা পাই মা-ঠাকরেন!”

কে? এ কি! কান খাড়া হয়ে উঠেছে। নতুনদিদিমারও। তিনিও তাকালেন পিলের দিকে। বিস্ময়, কৌতূহল ও প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি। এ-ধ্বনি এখানে কোথা থেকে এল?...স্মৃতি ছুটে পলকের মধ্যে তাঁর দেশ থেকে ঘুরে এল। এতে যে তাঁর দেশের হাওয়া বাতাসের গন্ধ! এখানকার থেকে আলাদা। ধ্বনির তরঙ্গে ভেসে আসছে তার ছোটবেলা, তাঁর ফেলে আসা স্বর্গের সুবাস!...

যাদের জন্ম এখানে তারাও জাতিস্মরের হঠাৎ-আসা আবেশের মধ্যে দিয়ে সন্ধান পায় সেই বিস্মৃত স্বর্গের। পিলেও স্বপ্নের পরিচয়ের মত আবছাভাবে চিনেছে এ ধ্বনিকে!...

এসব এক মুহূর্তের কথা।

বেজেছে! বেজেছে একতারা! “ওরে বৈরাগীর গান!”

নতুনদিদিমা ধড়মড় করে ওঠেন।

পিলেও সম্মোহিতের মত ছুটেছে তাঁর পিছনে পিছনে বারদরজার দিকে।... না শুনলেও মনে হয় এ গান আগে যেন কোথায় শুনেছে।...এ যে সত্যিকার বোষ্টমবোষ্টুমির গান—বাংলা দেশের গ্রামের! এর সঙ্গে যে কতকালের পরিচয়! কত বইয়ে পড়া—কত নতুনদিদিমার মুখে শোনা—কতরকম ভাবে জানা! কখনও দেখেনি বলে কি মনে পড়তে নেই? এরা কি পর? এরা হ'ল নিজের জন—বাংলাদেশের! এখানকার লোকে যখন একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়, তখন এমন' রোমাঞ্চ জাগে কই! সে গানে ফেলে আসা জিনিস মনে পড়ায় কই? মন ভিজে ওঠে কই সে রুক্ষ সুরে? রাই, সখী, কুঞ্জ এসব মিষ্টি কথা কি আছে তাদের গানে?...বোষ্টম বোষ্টমীর বয়স হয়েছে। মনের মধ্যে আঁকা ছবির সঙ্গে মিলল না!...কত প্রশ্ন ঠেলে আসছে পিলের মনে।... ওগুলোকে অলকাতিলকা বলে, না রসকলি বলে? বোষ্টম আর বৈরাগীর মধ্যে তফাৎ কি? ভিক্ষার সময় কেউ মৃদঙ্গ বাজিয়ে গান করে সেখানে? একতারা, খঞ্জনি, করতাল, মন্দিরা,—ভিক্ষার সময়ের গানে কোনটা বেশী ব্যবহার হয়? ভিক্ষাকে মাধুকরী না বললে চাঁপা বোষ্টমী খুব ঝগড়া করত না?...সব জিজ্ঞাসা করতে হবে নতুনদিদিমাকে পরে।

তাঁর দিকে নজর পড়ল।...তন্ময় হয়ে শুনছেন। জিয়নকাটির পরশ লেগে মনের ঘুমন্তপুরী জেগে উঠেছে।...ছেলেবেলার নতুনদিদিমাকে ঘিরে যে রহস্যের ঘোমটা আছে, সেটি যেন অল্প ফাঁক হয়েছে।...পিলেও সেই রূপকথার জগতে পৌঁছে গিয়েছে।...হঠাৎ গান থামল।

বৈরাগীর মুখের কোণে হাসির রেখা। এমন দরদী শ্রোতার দল পেয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে গেয়েছে। গুটলিদি বলল, "কি সুন্দর! না মা?"

এতক্ষণে পিলের নজরে পড়ে যে বাড়িসুদ্ধ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে—গুটলিদি, একগলা ঘোমটা দেওয়া তারাদার বউ, এমনকি তারাদা পর্যন্ত।

"গন্ধপাতা ঠিক এই সময়েই চলে গেল! থাকলে শুনত! তোরা তো শুনিসনি এসব কোনদিন। ওরে গুটলি এদের একটু ভাল করে চাল ডাল দিয়ে দে। থাকেতো, আলু পটলও দিস।...বড়ি খাও তোমরা? বড়ি ভাতে? খেয়ে দেখো আমার বৌমা কেমন সুন্দর বড়ি দেয়। দুটো বড়ি নিয়ে এসে দাওতো বৌমা এদের!...তোমরা একটু জিরোবে নাকি? তারা তোর পকেটে পয়সা থাকে তো দিয়ে দে না গোটাকয়েক!"

'দাঁড়াও এনে দিচ্ছি"—তারাদা তাড়াতাড়ি ছুটল ঘরে পয়সা আনতে।

ভিক্ষা নয়। এ হচ্ছে আপন জনকে ভালবেসে দেওয়া; কতকাল পবে দেখা-দেওয়ার কৃতজ্ঞতায় দেওয়া। 'মাধুকরী' কথাটির সঠিক ব্যবহার পিলে জানে না; তবে শব্দটির অর্থ যে সে জানে, একথা সকলকে জানিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারে না। পকেট থেকে একটি দোযানি বের করে বৈরাগীকে বলে, 'এই নিন, আমার মাধুকরী'।

এতো আর হিন্দুস্থানী ভিখিরী নয়, তাই চেষ্টা করেও 'নিন' না বলে, 'নাও' বলতে পারল না।

বোষ্টম বোষ্টমী চলে গেল বাংলাদেশের খানিকটা এখানে ছড়িয়ে দিয়ে। সকলে মিলে বারান্দায় বসে এদেরই সম্বন্ধে কথা হতে লাগল। তারাদা পর্যন্ত এসে বসেছে। ঘোমটা দেওয়া তারাদার বউ ছেলেকে শাশুড়ীর কোলে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে। খানিক আগের আবেশ এখনও কাটেনি। এর রেশ যতক্ষণ মনে থাকবে ততক্ষণ আগেকার জমানো গ্লানির কোন স্থান নেই সেখানে। ...এবাড়ির সকলের মধ্যে এমন প্রাণখোলা মেলামেশার নিবিড় পরিবেশ, এর আগে হয়েছিল এক শুধু তারাদা'র বিয়ের সময় দিনকয়েক।....তারাদা সুদ্ধ হয়ে উঠেছে উদার,—"গুটলি দেখছিস, পিলে আছে ব'লে ঘোমটা দেওয়া একজন কেমন লজ্জায় মরছেন।"

সে হেসেই বাঁচেই না। মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছে যে, বউয়ের লজ্জাটা শুধু পিলের জন্য নয়, শাশুড়ীর জন্যও বটে। অন্য সময় তাঁর সম্মুখে ছেলে যদি বউয়ের সঙ্গে কথা বলে, তাহলে নতুনদিদিমাও বোধ হয় খুশী হবেন না; বরঞ্চ মানে করে নেবেন তারা তাঁকে মানুষ বলেই মনে করে না, নিজের মা নয় ব'লে। কিন্তু এখন সেকথা তাঁর খেয়ালই হ'ল না; শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।...পিলে গন্ধপাতাকে তিনি একেবারে নিজের বাড়ির লোকের মত ক'রে নিতে চান—তাঁর হাতে যতটুকু ততটুকু তো তিনি করেইছেন। তারা হ'ল বাড়ির কর্তা; সে নিজে যদি সবরকমে এদের আপন জনের স্বীকৃতি দেয়, তবেই তিনি একটু বেশী জোর পান মনে।...নইলে যতই মনের জোর দেখাও এক জায়গায় গিয়ে, যেন পায়ের নীচে শক্ত মাটি পাওয়া যায় না!...

তাই নতুনদিদিমা বলেন : "কোন দিন তো এর আগে পিলের সঙ্গে গল্প করেনি বউমা। হবে—আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে'খন।"...

...আহা! এখন যদি গন্ধপাতাটাও এখানে থাকতো রে! তা'হলে সেও বোধ হয় তারার কাছ থেকে এই একই সঙ্গে 'আপনাত্বির' ভাব পেত! তারার কাছ থেকে বাড়ির লোকের স্বীকৃতি পেলে, কত সহজ হ'য়ে উঠতে পারত গন্ধপাতার সম্বন্ধ, বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে!...এখনই থাকল না সে ছোঁড়া!...বৈরাগীর গান তারই যে সবচেয়ে ভাল লাগত!...বুকের মধ্যে টন টন করে।...

বৈরাগীর গান শোনবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আজ হ'ল ব'লে তারাদা', গুটলিদি, পিলে সকলেই গর্বিত। কিন্তু প্রত্যেকেই হাবভাবে বুঝোতে চাইছে যে, এর আগেও আর একবার শুনেছে এ গান, সেই যখন বাঙ্গলা দেশে গিয়েছিল। প্রত্যেকে সমর্থনের আশায়, নতুনদিদিমাকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে সালিস মানছে।...পিলে নাকি শুনেছিল কলকাতার রাস্তায়, দিদির বিয়েরবার। তারাদা' শুনেছিল নতুনদিদিমার দেশে—"তাই না মা?".....শ্বশুরবাড়ির কথা উঠলেই যে গুটলিদির মুখ কাঁচুমাচু হয়ে যায়, সে সুদ্ধ বলে যে, বিয়েব পর সেখানে, থাকবার সময় শুনেছে একদিন। সেখানে গুটলিদি ছিল তো মাত্র সাতদিন—জীবনে ঐ একবারই।...

কেষ্ট স্কুল থেকে এল। বাড়ির আবহাওয়া তারও একটু নতুন নতুন লাগছে। এমন তো কোনদিন দেখেনি।

গুটলিদি বুঝিয়ে দিল—"বোষ্টম-বোষ্টুমীর গান।...আর একটু আগে এলি না কেন?...খাবার খাস পরে।...জুতো খুলিস না! যা দৌড়ে যা! পশ্চিম বাগানের রাস্তায়। এখনও যায়নি বোধ হয় বেশীদূর।"

কেষ্ট কথাগুলো সম্ভবত ঠিক বুঝল না। রূপকথার বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর মতই এই বোষ্টম-বোষ্টুমী। এর দেখা পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা!...সে ছুটে বার হয়ে গেল, যাতে অন্তত পবে লোকের কাছে গর্ব করে বলতে পারে যে, সেও দেখেছে। না হলে সে নেহাত ছোট হয়ে যাবে সকলেব চোখে!

তারাদা কাজের মানুষ। বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না। তাই এমন মিষ্টি আসরকেও ভাঙতে হ'ল ঘণ্টাখানেক পর।

আবার যে কে সেই!

পিলে যখন বাড়ি পৌঁছল, তখন আর মনের সে স্নিগ্ধতা আর নাই।...এতক্ষণে নিরিবিলিতে আসতে পেয়ে তুলসীর আজকের ব্যবহার মনের মধ্যে কিরকির করে বিঁধতে আরম্ভ করে। কেন তার মন পিলে আর নতুনদিদিমার সম্বন্ধে এত স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে? পিলের মনের গড়নটাই এমন যে, বন্ধুর বিরুদ্ধে মানসিক তিক্ততাকেও সে মেপে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। অভিযোগ তার অনেক জড় হয়েছে, কিন্তু তুলসীর বিরুদ্ধে চিন্তার মধ্যেও সে একটা শালীনতার মাত্রা মানে।...এ সংযম বুঝি আর রাখা গেল না। এবার থেকে তুলসীকে একটু এড়িয়ে চলবার চেষ্টা কি অনুচিত হবে? তুলসী যে সময় নতুনদিদিমার বাড়িতে থাকে, তখন সেখানে না যাওয়াই উচিত। দিয়েছেন আজকে তাকে বেশ করে শুনিয়ে নতুনদিদিমা! আজকে পিলে ও বাড়িতে যা পেয়েছে, তার তুলনা হয় না; কিন্তু তাঁর একার সঙ্গে সত্যিকার কথা হ'ল কই? যা হ'ল সে তো দশজনের মধ্যে। অন্য গোলমালেই তো কেটে গেল। মোটে দুদিনের জন্য তো সে এসেছে। এত বড় কাণ্ডের পর তুলসী নিশ্চয়ই আজ রাতে আসবে না তাঁর কাছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সে আবার বেরিয়ে পড়ে নতুনদিদিমাদের বাড়ির দিকে।

দিনে দশবার হলেও প্রতিবার তাদের বাড়ি যাবার সময় মনে খানিক আনন্দেরই শিহব লাগে। বেশ ফুটফুটে জোছনা। কি তিথি কে জানে,...একাদশী হলে জানাই যেত; ত্রয়োদশী চতুর্দশী হবে বোধ হয়।...নতুন-দিদিমা কিন্তু একবারও বইখানিকে খুলে পাতা উল্টে দেখেন নি। কোনদিন ও বই পড়বেন কিনা সন্দেহ!...তাঁদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই নজরে পড়ল যে, পাঁচিলের গায়ে সাইকেল দাঁড় করানো আছে। চাঁদের আলো পড়ে এক আধ জায়গা চক চক করছে। কার সাইকেল? তারাদা'রও হতে পারে? না। যা ভয় করেছে ঠিক তাই! মাড্‌গার্ড নেই, তোবড়ানো সিট...ও সাইকেল কি ভুল হবার জো আছে! এতেই যে সেও সাইকেল চড়া শিখেছিল। এই মার্কামারা সাইকেল যে চোরেও চুরি করে না; একবার ফুটবল ম্যাচের সময় চুরি গিয়েছিল; কিন্তু পরের দিন মাইল তিনেক দূরে রাস্তার ধারে পাওয়া যায়।...তুলসীটার একটুও লজ্জাও করল না। এত ঝগড়াঝাঁটির পর আবার

এখনই এসেছে? তুলসী কেমন ভাবে তাঁর ঘরে ঢুকল আজ, নতুন-দিদিমা কি ব'লে তাঁর সঙ্গে প্রথম কথা আরম্ভ করলেন, সে ক্ষমা চাইল কিনা, তিনি আদর করলেন কিনা, তারপর সে কি করল, তিনি কি করলেন, এখন কি কথা হচ্ছে, সব জিনিস খুঁটিয়ে জানতে ইচ্ছা করে। শুধু জানা। নিছক তথ্য সংগ্রহ ছাড়া তার নিজের কোন স্বার্থ নেই এ বিষয়ে। কারও সম্বন্ধে বিরূপতার প্রশ্ন ওঠে না এর মধ্যে। জানবার চেষ্টার মধ্যে অন্যায়টা কোথায় থাকতে পারে? পিলে পা টিপে টিপে গিয়ে নতুন-দিদিমার ঘরের পিছনে দাঁড়ায় চোরের মত। জানলা দিয়ে আলো আসছে না। ঘর অন্ধকার। গাছ থেকে পড়া নিমের ফুলগুলো মাড়ালে বড় ফট ফট করে শব্দ হয়। তাই জানলার আরও কাছে যেতে সাহস হয় না। কোন কথা শোনা যাচ্ছে না। কেউ জানতে পারে যদি! ভয়ে সে পা টিপে টিপে আবার ফিরে আসে। কেন যেন সারা গা কাঁপছে। স্বাভাবিকভাবে চিরকালের অভ্যাসমত এখনই নতুন-দিদিমার ঘরের মধ্যে গট গট করে ঢুকে গেলে কেমন হয়?...না, দরকার কি...তুলসী থাকল তো কি হ'ল? ঘর কি তার নাকি।. .দুপুরের ঐ কাণ্ডর পর আজ তুলসীব সম্মুখে নতুন-দিদিমাব সঙ্গে বোধ হয় সে সহজভাবে কথা বলতে পারবে না। তুলসীর ব্যবহারও বোধ হয় আড়ষ্ট হয়ে আসবে।...

ভেবে চিন্তে পিলে পেছিয়ে যায়।...তুলসী নিশ্চয়ই এখনই বাড়ি ফিরবে, কত রাত পর্যন্ত আর থাকবে। সে নিজে তো খেয়েই বেরিয়েছে বাড়ি থেকে— বেশী রাত হলেও ক্ষতি নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই হবে। কিন্তু এখানে নয়। পাঁচিলের পাশে কি দাঁড়িয়ে থাকা যায়—কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে? ঐ দূরে, রাস্তার ওদিকে, কাঁঠালগাছের নীচে ভাঁটের জঙ্গল। সাপখোপ নেই তো? ওর চেয়ে দূরে গেলে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের উপরেব চকচকে জোছনাটুকু দেখা যাবে না।. পিলে সেই ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসে; ওখানে কারও নজরে পড়বার সম্ভাবনা নেই।

বাড়ি থেকে বার হবার নামও নেই তুলসীব। ঢুকেছে তো ঢুকেইছে! সাইকেলেব দিকে তাকিয়ে পিলের চোখ ফেটে গেল। নতুন-দিদিমার উপবও এরই মধ্যে কখন থেকে যেন বাগ হতে আরম্ভ হয়েছে; আছে তো সব জিনিসের একটা...! বাড়ি চলে গেলেই হ'ত। মিছামিছি এত সময় নষ্ট করল সে। ভাঁটগাছের পিঁপড়েগুলো কি রাত্রেও ঘুমোয় না? মশার কামড় মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যকে আরও দুঃসহ করে তুলেছে। অথচ মশা তাড়াবার জন্যে হাত-পা নাড়াতে ভয় হয়—পাছে আবার কেউ কোথাও থেকে দেখে ফেলে, সেই ভয়ে। সরকারী ঘড়িতে এগারোটা বাজতে শোনা গেল। ঠিকেদারবাবুদের বাড়িতে ঝি-চাকরদের কাজকর্ম সারতে সারতে চিরকাল প্রায় রাত বারোটা হয়। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর তার মনে পড়ে যে, রাত বারোটা থেকে পাহারাওলা টহল দিতে আরম্ভ করে পাড়ায়। যদি তাকে দেখে ফেলে, তাহলে নিশ্চয়ই চোর বলে ভাববে।.....কাল সকালে নতুন-দিদিমার কাছে আসা হবে না; কেননা তখন নিশ্চয়ই তুলসী থাকবে। আর কাল বিকালের ট্রেনে তো সে ডিব্রুগড় চলেই যাবে। এবার এসে নতুন-দিদিমার সঙ্গে কথাই হ'ল না। গুটলিদি বেচারীর কি অসুবিধা বল তো! এত রাত পর্যন্ত নিশ্চয়ই শুতে পারছে না, তুলসী ঘরে থাকার জন্য। সাধে কি সে চটা তুলসীর উপর! এ আক্কেলটুকু লোকের থাকা উচিত। নতুন-দিদিমাও তো মেয়ের অসুবিধার কথা বুঝে তুলসীকে মনে করিয়ে দিতে পারেন যে, বাড়ি যাবার সময় উতরে গিয়েছে অনেকক্ষণ!...হাতাশ ও বিরক্তিভরা মন নিয়ে পিলে ভাঁটগাছের জঙ্গল থেকে বার হয়ে বাড়ির পথে এগুলো। তখনও সাইকেল থেকে চাঁদের আলো ঠিকরে এসে চোখে লাগছে।

পরের দিন পোস্টাফিস থেকে একতাড়া খাম কিনে, তাতে ডিব্রুগড়ের ঠিকানা লিখে নিয়ে পিলে গেল নতুন-দিদিমাদের বাড়ি বেলা বারোটার সময়। তার হিসাব মত এই সময়টাই সবচেয়ে নির্বিঘ্ন—নতুন-দিদিমা থাকেন রান্নাঘরে—তুলসীর আসবার এখনও দেরি আছে। তার আন্দাজে ভুল হয়নি।

"এই পিঁড়ির উপর থাকল আমার ঠিকানা-লেখা খাম। আজই সন্ধ্যার গাড়িতে আমাকে যেতে হবে কিনা!"

"খাম!"—নতুন-দিদিমা তাকালেন তার মুখের দিকে। নিমেষের মধ্যে বুঝে গেলেন তিনি যে, গন্ধপাতার কালকের পাগলামির পর দুই 'গোস্তের' মনের ব্যবধান খুব বেড়ে গিয়েছে। পিলে আর চায় না যে, তার চিঠির ঠিকানা তিনি গন্ধপাতাকে দিয়ে লেখান; আত্মসম্মানে বাধে। এখন এ সম্বন্ধে পিলেকে কিছু বলা ঠিক হবে না। সেইজন্য তিনি পাড়লেন একেবারে অন্য কথা।

"আজই যাবি? বলিস্ কি! সন্ধ্যার গাড়িতে?"

"না, পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। এ বছর হাসপাতালের কাজ থাকে কিনা।"

"আজকের দিনটা থেকে যা না কেন।"

"না না, সে হয় না। সে উপায় থাকলে কি আর আমি থাকতাম না।"

"এমন আসা না এলেই হয়। ঐ দূরদেশ থেকে একেবারে গুনে দুদিনের জন্য, কেউ আসে নাকি? না হয় বুঝলাম যে, পিসিমাকে দেখতে এসেছিলি! কিন্তু আছে তো সব জিনিসেরই একটা!...হ্যাঁ রে ডাক্তারসাহেব! শোন! আমার দিকে তাকা! তুই আজকাল অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিস, না? নতুন-দিদিমা পুরনো হয়ে পচে গিয়েছে না রে? নতুন নতুন তেঁতুল-বীচি, পুরনো হলে বাতায় গুঁজি। ঠিকই তাই। দুদিনের জন্য এলি; কাল রাতে এলি না, আজ সকালে এলি না। আমি বসে বসে ভাবছি, এই বুঝি আসছে এই বুঝি এল! আজও আসছে, কালও আসছে! আজকাল দেখছি দেখা পাওয়াই ভার ডাক্তারসাহেবের। আমি ভাবছি পিলে নিশ্চয়ই আসবে, তার দেওয়া বই পড়ে আমাকে শোনাতে। কি করলি কাল রাতে, আজ সকালে, শুনি? পিসির সঙ্গে গল্প হচ্ছিল? তাও ভাল। চিরকাল বলেছি, হ্যাঁ রে পিলে আমার কাছে যে ছুটে ছুটে আসিস, আমার গল্প শুনতে যে এত ভালবাসিস, তা তোর পিসির কাছে সুস্থির হয়ে বসে দু'দণ্ড গপ্পো করিস কখনও? মাথা কাত করে জোর গলায় বলা হ'ত—'হুঁ উ-উ করি তো।' ওসব হুঁ উ-উ আমি ঢের শুনেছি! তোব হুঁ-উ-উ আমি চিনি না? আমার পেটে তুই হয়েছিস্, না তোর পেটে আমি হয়েছি? পিসির কাছে কত যে বসিস, আর কত যে গপ্পো কবিস, যে আর আমি জানি না! তবু ভাল! যদি এতকাল পর পিসির কপাল ফিরে থাকে তবু ভাল। সে হ'ল আপন জন। আমরা তো কোন্ পর। ছোট্টো ছেলের মত পিসির কোলে কাল শুয়েছিলি তো? বল! চুপ করে রইলি কেন? আমরা কি তোর পিসির ভাগ নিতে যাচ্ছি? আবার হাসি হচ্ছে!—হাসি। দেখি তো রে! দাঁড়া। এখনও আমার রান্না শেষ হয়নি—এখন যে তোকে ছুঁতে পারছি না—তাই! নইলে দিতাম একেবারে আচ্ছা করে,...মাথাটাকে ধরে নেড়ে। পিঠের উপর গোটাকয়েক গুম্ গুম্ করে!...আমি একা একা বসে থাকি ওঁর জন্য,—আর ওঁর টিকি দেখবার জো নেই!"...

রাত্রের মানসিক গ্লানি ও অশান্তির যেটুকু এত কথার পরও মনের কোণায় উঁকিঝুঁকি মারে, সেইটা পিলেকে বাধ্য করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে ঃ "একা কেন? তুলসী আসেনি কাল রাত্রে?"

যাদুকর যেন নিজের বাছা একখানি তাস টেনে নিতে বাধ্য করালো, একজন অতি-সতর্ক দর্শককে। এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিলেন নতুন-দিদিমা।

"না। সন্ধ্যায় কেষ্ট পড়তে বসবার সময় বলল—গন্ধপাতাদা'কে দেখছি না—ওর সাইকেল দাঁড় করানো রয়েছে পাঁচিলের গায়ে। তবে কি আমার ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে রয়েছে? না তো। গিয়ে দেখি কেউ নেই। তা থাকবে কি করে। আমি না হয় ঠাকুরঘরে গিয়েছিলাম, উঠোনভরা অন্য লোক তো সবাই ছিল। এলে পরে কেউ কি দেখতে পেত না? গুটলি খানিক আগেই সন্ধ্যা-পিদিপ দেখিয়ে এসেছে—সে কি জানতো না? তখন বুঝি যে বাবু যখন গটগটিয়ে চলে গেলেন এখান থেকে, তখন রাগের মাথায় সাইকেলের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। রাগলে তো ওর কোনদিন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। সে তো তুই জানিসই। কিসে যে লোকের রাগ হয়, আর কিসে যে ।

যায়, তা বোধ হয় স্বয়ং ভগবানও জানেন না। এর আগের বছর তুই যখন এসেছিলি, তখন একদিন তোর সম্মুখেই চটেছিল, আমার উপর মনে আছে? কেন চটেছিল জানিস? ও বলে যে-যার যখন ইচ্ছা তোমার কাছে আসুক; কাউকে আসতে বারণ করতে বলছি না; কিন্তু যে সময় জান আমি আসি, সে সময় তুমি নিজে থেকে কাউকে আসতে বলবে কেন? কেউ নিজের ইচ্ছায় সে সময়টায় যদি আসে তো আসুক না কেন।—খেয়ালী! পাগল! কি ভাবে, কি বলে, কি করে! এত সূক্ষ্ম কি আমরা বুঝতে পারি? হাসিও আসে, দুঃখও হয়! তোরা সেদিনকার ছেলে ঠিকই,—কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু এ ছেলেমানুষী করবে পাঁচ বছরের ছেলেতে; তোদের কি এখন সে বয়স আছে? ছেলেমানুষী না ছেলেমানুষী। সাইকেল যখন ফেলে গিয়েছে, তখন নিতে আসবেই; আর আমার দোরগোড়া পর্যন্ত এলে কি আর আমার কাছে না এসে থাকতে পারবে? সে যত রাগই হোক। জানি তো তোদের আমি! ঐ টুকুনই তো আমার গর্ব। সন্ধ্যার পর দুবার বাইরে গিয়ে দেখে এলাম, সাইকেলখানা আছে, না সে এসে নিয়ে গেল। তা' তুইও যেমন এলি, সেও তেমনি এল। সে বাবুর আসবার সময় হল, আজকে সকালে। মুখখানা তখনও হুম্ ম্-হাঁড়ি হয়ে রয়েছে। এসে জিজ্ঞাসা করা হ'ল আকাশকে—সাইকেলখানা যে ছিল এখানে? আমি বলি— "ও সাইকেল নিতে এসেছ? তাই বল! আমার অপরাধ হয়ে গিয়েছে যে, পাছে আবাব চোরেটোরে নিয়ে যায় ভেবে রাত বারোটাব সময় রামশরণকে দিয়ে ভিতরে এনে রাখিয়েছিলাম। ঐ বারান্দায় আছে, নিয়ে যাও। সাইকেল নিতে এসেছ? বাড়ির কোন লোকের সঙ্গে দরকার নেই, শুধু সাইকেলখানার সঙ্গে সম্বন্ধ, তো বাইরে থেকে রামশন্নাকে ডাকলেই হ'ত। সে-ই সাইকেলখানা বার করে দিয়ে আসত। তাহলে আর এতটা কষ্ট করে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হ'ত না। দিলাম খুব করে তুড়ে। ওরে আমার সাইকেল-লেনেওলা রে! কত না কিছু দেখলাম। সাতকাল গেল ছেলে খেয়ে, এখন বলে ডান।"

পিলেটাকে এমন বোকামিতে পেয়ে বসেছে যে, নতুন-দিদিমাকে কথার মাঝে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"আপনি সত্যিকার রাগ করে বকলেন, না ঠাট্টা করে?"

আক্ষেপের চিক্ কেটে তিনি বলেন—"অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। আমার হয়েছে তাই। রাগও বুঝি না, ঠাট্টাও বুঝি না। যে রকম কথা বেরয়, সেই রকম বলি। গন্ধপাতাকে বললাম—নিস এখন সাইকেল?—ওখানা তো আর কেউ খেয়ে ফেলছে না। চল্ দেখি ছোঁড়া, এখন আমার ঘরে। দ্যাখ্ না তোকে আজ আমি কি করি। টেনে নিয়ে গিয়ে তো ঘরে বসালাম। ব'স! এবার শুনি—কেন তোর এই ভূতের মত আচরণ? যেদিন তোর মায়ের মহাভারত ফেবৎ দিয়েছিলাম, সেদিন তো তুই কিছু বলিস নি? কাল পিলেব বই নিলাম দেখে মনে পড়ল, না? তুই তুলনা করে করে দেখিস বুঝি? দ্যাখ্ তোর উপর তো তারা-টারা সবাই বিরক্ত। বাড়িসুদ্ধ কেন, পাড়াসুদ্ধ সবাই। কত বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে, সামাল দিয়ে দিয়ে চলতে হয় যে আমাকে তা তো বুঝিস না! আর তুই সামান্য কথা নিয়ে হইচই কাণ্ড বাধিয়ে দিলি! কারও মা-মাসি কি সন্দেশ না রসগোল্লা যে, আর একজনকে দিলে ফুরিয়ে যাবে? কে আমার কথার জবাব দিচ্ছে! দেখি ছেলের চোখে জল। এই দ্যাখো। হ্যাঁ রে, তা কাঁদিস কেন? কি হয়েছে বলবি তো! আমি বকলাম বলে? একটুতেই আমার চোখে জল আসে জানিসই তো। সেও যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। কথা বলব কি, কেঁদেই মরি। কিসের জন্য, ভগবান জানেন। কেন যে তোরা এমন করে জ্বালাস আমাকে!..."

কি ভেবে বললেন তিনিই জানেন। কে যে তাঁকে জ্বালায়। মনে আর মুখে নতুন-দিদিমার তফাৎ ছিল না কোনদিন। তারই মধ্যে গত বছর তুলসী সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পেয়ে পিলে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। নতুন-দিদিমার আজকের কথায় গতবারের দ্বিধা বা সতকর্তা নেই। তুলসীর কালকের ঐ কাণ্ডের পর আর কি পিলের সম্মুখে কথায় দ্বিধা-সঙ্কোচ করা পোষায়? কারও দেওয়া জিনিস নিলে তুলসীর রাগারাগি করবার অধিকার আছে তাঁর উপর—এ খবর যে জেনে গিয়েছে, তার কাছে আর সাবধান হয়ে কথা বলে লাভ কি? তবু ভাল যে, এ পিলে।

পিলে না হয়ে অন্য কারও সম্মুখে যদি গন্ধপাতা অমন করে কাল কোঁদল করত, তাহলে কি অপ্রস্তুতই না হতে হ'ত।

পিলের বেশীক্ষণ বসবার সময় নেই। আজকে সন্ধ্যার ট্রেনে যাবার জন্য বাড়ি গিয়ে তয়ের হতে হবে। তয়ের মানে, পিসিমার ওষুধ-পথ্য কিনে দিয়ে যেতে হবে। আরও কয়েকটা বাড়ির কাজ আছে। নতুন-দিদিমা বারদরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

"তুই যখন পারবিই না, আর থাকতে তখন তোকে বলা মিছামিছি। পড়া-শোনার ক্ষতি হবে, তার উপর তো কথা বলা চলে না। এমন আসার থেকে না আসা ভাল। আমার এখন দুদিন একা একা লাগবে। তুইও চলে যাবি। গন্ধপাতাও সাইকেল নিয়ে গেল বাইরে। দুদিন থাকতে হবে সেখানে। হরকতিয়া না কি যেন একটা জায়গা আছে না,—সেখানকার ডাকবাঙলা মেরামতের কাজ পেয়েছে।"

শুনেই পিলের মন খারাপ হয়ে যায়।...একথা আগে বলেননি কেন?...বাড়ি ফিরতেই পিসিমা যখন অতি ভয়ে ভয়ে তাকে আর একদিন থেকে যেতে বললেন, তখন সে এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। বুকের বোঝা নেমে গিয়েছে। আবার আজ সন্ধ্যার সময় নতুন-দিদিমা'র সঙ্গে দেখা হবে—কত হাসি কত গল্প—অফুরন্ত আনন্দস্রোতের সম্ভাবনা এখন তার হাতের মুঠোয়। নতুন-দিদিমা একটুও আশ্চর্য হবেন না, সন্ধ্যার সময় আবার তাকে দেখে একথা সে জানে। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছিলেন শেষ মুহূর্তে। তাঁকে দেখে মনে হয় কিছু বোঝেন না; কিন্তু তিনি সব জানেন, সব বোঝেন। পিলের মনে হচ্ছে যে, তিনি যখন বললেন আজ তুলসী থাকবে না, তখন যেন তাঁর চোখে একটা কৌতুকের বিজুলী খেলে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য।

ডিব্রুগড়ে আসবার পর মাস তিনেক নতুনদিদিমার চিঠি নিয়মিত পেয়েছিল। প্রায় প্রতি চিঠিতেই লেখা,—"গন্ধ-বামুনটাকে তো আমি বলে বলে হার মেনে গেলাম; তুইও কি তাকে একখানা চিঠি দিতে পারিস না? আমি তাকে একথা নিয়ে বকলে কোন উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে; কিন্তু রাগ করে না। আমার বোধ হয় লজ্জায় চিঠি দিতে পারছে না তোকে। তোকেও বলি—তুইই যদি প্রথমে চিঠি দিস ওকে, তাতে কি তোর মাথা হেঁট হবে? দুই বামুনই সমান!" তাঁকে পিলে এ সম্বন্ধে কিছু লেখেওনি, আর বন্ধুকেও চিঠি দেয়নি।

মাস তিনেক পর নতুন-দিদিমার চিঠি বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। অনেকদিন কেটে গেল। রাগ অভিমান করে দুখানা চিঠি দিয়েও উত্তর পাওয়া গেল না। তবে কি অসুখ? ছাঁত করে কথাটা মনে লাগে। তারাদার কাছে টেলিগ্রাম করলে কি হয়? যদিও তিনি পিলেকে বাড়ির লোক বলে মনে করেন, তবুও তাঁকে এ খবরের জন্য টেলিগ্রাম করতে লজ্জা করে। গুটলিদিকে এর আগে কখনও চিঠি লেখেনি; তাকে লেখাও অসম্ভব। পিসিমার কথা তো বাদই দাও। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষকালে তুলসীকে চিঠি দেওয়া ঠিক করল। হাজার হোক, সে-ই একমাত্র বন্ধু, যার কাছে নতুন-দিদিমার কথা লেখা যায়। সে বুঝবে। জবাব দেবে নিশ্চয়ই। নতুন-দিদিমার কথাও রাখা হবে। তুলসীর কাছে নীচু হতে সে চিরদিনই রাজী। শুধু একটা বিশেষ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল মাত্র।

এ চিঠিরও জবাব এল না।

কিছুদিন পর সামান্য খবর পাওয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। পিসিমা দিদিকে লিখেছেন ঃ

গাঙ্গুলীমশায়ের ছেলে অনেকদিন থেকে নিখোঁজ। তাই নিয়ে পাড়ায় মহা-সোরগোল। সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না, তবু কানে আসে। ও ছেলে চিরকাল লক্ষ্মীছাড়া। যাক্‌গে, এসব কথা পিলেকে জানিয়ে দরকার নেই; মন খারাপ হবে। তার পরীক্ষার বছর এটা।"

এমন জবর খবর কি দিদি পিলেকে না দিয়ে থাকতে পারে? আর পিসিমার অনুরোধের মধ্যেও যেন তেমন আন্তরিকতা ছিল না। তুলসী হারিয়ে যাবার ছেলে নয়। কাজেই পিলে তার

নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত নয়। এর আগেও বহুবার তুলসী চলে গিয়েছে; আবার ফিরে এসেছে। তবে এর আগে তার যাওয়া নিয়ে পাড়ার লোকে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু পিসিমার লেখা 'সোরগোল' কথাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, বোঝা যায়। হয়তো কি খেয়াল হয়েছে—আবার নেপালে দাজুর বাড়িতে চলে গিয়েছে। নেপালে নয়, পাহাড়ে। কিছুদিন পরই ফিরে আসবে।

যতই এইসব ব'লে পিলে ব্যাপারটিকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করুক, সে অন্তর থেকে অনুভব করছে যে, তুলসীর চলে যাওয়ার সঙ্গে নতুন-দিদিমার চিঠি না দেবার একটা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে। কি ধরনের সম্বন্ধ, সেটা গুছিয়ে স্পষ্ট করে ধারণা করতে পারছে না। তবে একটা কিছু যে ঘটেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অত সোজা নয় এবারকার ব্যাপার। নইলে একটানা এতদিন কখনও তুলসী বাইরে থেকে যেতে পারে? জানে তো পিলে। আর জীবনে যাব না, এই সঙ্কল্প করবার পরমুহূর্তে আবার যেতে হয় সেখানে, কিছু বলবার না থাকলেও শুধু অকারণে চোখের জল ফেলবার জন্য। যাক্‌গে, সকলে বুঝবে না একথা!.....এই তো পর পর চারখানি চিঠির উত্তর না পেয়ে সেও ঠিক করেছিল, আর চিঠি দেবে না। তারপর আবার কেঁদেকেটে চিঠি দিয়েছিল—"শুধু কেমন আছেন জানাতে।" সত্যিসত্যিই সে শুধু ঐটুকুই চায় না। চায় আরও অনেক খবর। কিন্তু লিখেছিল ঐটুকু।

অনেকদিনের পর এ চিঠির জবাব এসেছিল ঃ "ভেবেছিলাম জীবনে আর কোনদিন কাউকে চিঠি লিখব না; কিন্তু তোর চিঠির উত্তর দিতেই হ'ল। থাকব আবার কেমন? তেমন বরাত নিয়ে কি আর এসেছিলাম যে, অত তাড়াতাড়ি চলে যাব! কুকুর-বিড়ালের মত চারটি চারটি ভাত খেয়ে বেঁচে থাকা, এদেব-সংসারে। দেখা হলে সব কথা হবে। আর আমাকে চিঠি দিস না।"

দেখা হয়েছিল এর কয়েকমাস পর, পাশ করে ডাক্তার পিলে বাড়ি ফিরলে।

প্রথম দেখা হতেই বললেন ঃ— শুনেছিস বোধ হয় সব? শুনিস আবার নি! বললেই আমি বিশ্বাস করি! এ নিয়ে টিটিক্কার! জানিসই তো গন্ধপাতাটার উপর এ বাড়িব কর্তা কি বকম হাড়ে-চটা চিরকাল। কর্তা আবার কে—তারা—তারা—তোর আপনার লোক তারাদা'! শুধু তারা কেন, ওদের গুষ্টির সবাই ওর উপর বিরক্ত; গুট্‌লিটা পর্যন্ত। কি যে এদের পাকাধানে মই দিয়েছিল! ছেলেপিলেরা আসে আমার কাছে, এ তারা কোনদিন পছন্দ করে না। বলতে তো পারে না; তার বাপের আমল থেকে যা দেখে আসছে, তা' খারাপ লাগলেই বা দড়াম করে বলে কি করে? একশ'টা ছেলেমেয়ে নিত্যি এসেছে আমার কাছে; এ-বাড়ির-মানুষ তো একদিনের জন্যও বিরক্ত হননি। বাপের ভাল দিকটা তো পেল না, পেয়েছে তাঁর মেজাজের দিকটা? ছেলেপিলেরা আসে কেন তোমার কাছে? একথার কোন জবাব আছে! তোরাই জানিস কেন আসিস। কেন তোদের আমাকে এত ভাল লাগে। পাড়ার ছেলেমেয়ে-বউ-জামাই সবাই আসে আমার কাছে। আমি কি তাদের ডেকে নিয়ে আসি? না নেমন্তন্ন করে খাওয়াই? গন্ধপাতা সম্বন্ধে কতদিন কত কথা কানে গিয়েছে, ও নাকি মদ খায়, কি করে কি করে...কত কথা কত দিনের! আমি সে সব শুনেও শুনি না। এ কান দিয়ে শুনি ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারা হয়তো একদিন সাইকেলখানা দেখে বাড়ি ঢুকবার সময় গুটলিকে বলল ঃ ও কতটুকু সময় নিজের বাড়িতে থাকে?"

....কিম্বা হয়তো কোনদিন আমাকে শুনিয়েই বলা হ'ল ঃ "ও কি কাজকর্ম সব ছেড়ে দিল নাকি?" এসব শুনতে শুনতে তো কানে পোকা পড়ে গিয়েছে। সে সব কথা কি কোনদিন তোদের কাছে বলেছি? বলব আবার কি; সেসব কি বলার কথা?...সেদিন দ্বাদশী। সবে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়েছি। গন্ধপাতা তখনও আসেনি। এলে, বামুনকে ফলমূল খাইয়ে তবে একটু মিছরি-ভিজানো জল খাব। তারাচাঁদ এই মারমূর্তি হয়ে বাড়ি ঢুকলেন—একেবারে চোখমুখ পাকিয়ে! সে কি চীৎকার।

"হতভাগাটা মদ খেয়ে মাতলামো করে। তোমায় বলে রাখছি, আজ থেকে যেন ও আর এ বাড়িতে ঢুকতে না পারে। পাড়ার লোকের কাছে মুখ-দেখানো দায় হয়ে উঠেছে!"

"কি। কি-বললি? এত বড় কথা!"

পা থেকে মাথা পর্যন্ত রি রি করে উঠেছে আমার। সারা গা কাঁপছে ঠকঠক করে। ভাবলাম বলি যে, নিজের মা হলে আজ তুই একথা মায়ের মুখের উপব বলতে পারতিস? মুখে এসে গিয়েছিল। খুব সামলে নিয়েছি। আমার রাগ দেখেই বুঝি তারা আগের চেয়ে একটু নরম হ'ল।

"একি আমি বলছি নাকি? গিয়েছিলাম বুড়ো রায়বাহাদুরের কাছে একটু কাজে। তিনি বললেন—গাঙ্গুলী মশায়ের ছেলেটা তোমাদের বাড়িতে দিন-রাত্তির বসে বসে করে কি? ছেলেটা শুনেছি মদ ধরেছে?"

"আমি কি সে ছেলেকে আসতে বলি? তোমার বাড়ি, তোমার ঘর, তুমি তাকে আসতে বারণ করলেই পার!"

...রায়বাহাদুর না ফায়বাহাদুর! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে; আজ বাদে কাল চোখ বুজবে; এখনও পরের কুষ্টিকাটা গেল না। খুরে খুরে দণ্ডবৎ। তাবার কাছে আরও কিছু কি আর না বলেছে। নইলে কি আর সে অমন চোখমুখ পাকিয়ে বাড়ি ঢুকেছে? তারার নিজের মা হলে বোধ হয় রায়বাহাদুরও তার কাছে এ ধরনের কথা বলতে সাহস কবত না। ...তারার ইচ্ছেই বোধ হয় আমাকে অপমান করা। নইলে বাড়ির ঝি-চাকর সকলের সম্মুখে চীৎকার করে একথা বলে কেন? সব বুঝি রে; আমিও ঘাস খেয়ে থাকি না। হ্যাঁ, বলতেই যদি হয়, একথা কি আলাদা করে ডেকে আস্তে আস্তে বলা যেত না? সেখানেই বসে বসে ভাবলাম কথাগুলোকে। ভাবি, আর মাথা গরম হয়ে ওঠে। আমারই জন্য তাহলে পাড়ার লোকের কাছে ওদের মুখ দেখানো দায়।

ছি ছি ছি! কোথাও চলে যাবার জায়গা যে নেই! নেই বলতে একেবারে নেই। নইলে এর পরও আবাব এদের বাড়ির অন্ন মুখে দিই? এত বড় অপমান! মায়ের নামে কোন কথা কাউকে বলতে যদি ছেলে শোনে, তাহলে তার উচিত না, যে বলছে তাকে বেশ করে দু-ঘা দিয়ে দেওয়া? মা না ছাই। মাও যা, ঘটিও তাই।

...এরই মধ্যে কখন বাইরে সাইকেল রাখবার শব্দ হয়েছে জানতে পারিনি; চোখে জল এলে বোধ হয় কানে শোনা যায় কম। দেখি এক মুখ হাসি নিয়ে ঢুকল উঠনে গন্ধপাতা। আমার কি এখন নরম হলে চলে? আমারই জন্যে তারাদের নাকি মুখ দেখানো দায়। আমার কাছেই গন্ধপাতা এখন এসেছে। তারা কেন বলতে যাবে—আমারই বারণ করা উচিত গন্ধপাতাকে।...সেই এতটুকু বেলা' থেকে আসে।...তাতে কি?...আমার কাছেই ছুটে ছুটে আসে।...তাতে কি? এ সংসার আমার নয়, তারাদের। আমাকে শক্ত হতে হবে। বলতেই হবে।...বলতে কি পারি। তবু বললাম। তুই আর কখনও আসিস না এ বাড়িতে।—

বোধ হয় অমনভাবে বলা ঠিক হয়নি।...বোধ হয় আরও বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল! কিন্তু তখন যে গলা বেয়ে ঠেলে উঠে আসছে কান্না। গন্ধপাতা প্রথমটায় যেন বিশ্বাস করতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপরকার ফ্যাকাশে মুখ, ফ্যালফেলে চাউনি এখনও আমার চোখের সম্মুখে ভাসছে রে!....আস্তে আস্তে মাথাটি, নীচু করে বেরিয়ে গেল সদরদরজা দিয়ে। কান্নার সময় কানে কম শোনা যায় না ছাই। বাজে কথা। স্পষ্ট শুনলাম সাইকেল নেবার সময় দেওয়ালে ঘষটানি লেগে ঘণ্টাটা একটু বেজে উঠল টুং করে।...ও চলে যাবে কি। এ ঘর, বাড়ি, উঠন, সব জায়গায় যে গন্ধপাতা ছড়ানো। যে দিকে তাকাও গন্ধপাতা—ওই দেওয়ালের শিবঠাকুরের মুখোশ, ওই ইঁদারাতলায় কাবলেকলার ঝাড়—সব জায়গায়। একি গায়ের ময়লা যে, রগড়ে ফেলে দেবে,—চলে গেল আর হয়ে গেল। সে কি হয়। হয় না।...

নতুন-দিদিমার দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে টপ টপ করে। তাকানো আর যায় না

সে মুখের দিকে। তাঁর দুঃখ যে কত গভীর, সে কথা পিলে ছাড়া আর অন্য কেউ কি বুঝবে? এত ভাল করে, এত জুতসই কথা বলতে পারেন নতুন-দিদিমা; তবে তিনি কেন তারাদাকে বলতে পারলেন না, "হ্যারে তারা, ছেলেটা আমার কাছে ছুটে ছুটে আসে; আমার জানতে ও তো কোন দোষ করেনি; আর দোষ যদি করেই থাকে, তাকে বুঝিয়ে বল। কেষ্ট যদি কোন দোষ করে, তাহলে কি তাকে বাড়ি ঢুকতে দেব না? তা কি হয়?"...এর উপর কি তারাদা কোন কথা বলতে পারত? তুলসীও তো চিরকাল একটুও না ভেবে কথার পৃষ্ঠে কথা বলতে পারে তার নিজস্ব ধরনে। সে কেন শোনামাত্র হেসে বাড়ি মাথায় করে ভুল ইংরাজিতে বলল না—"তারাদাটার টেম্পোরারি ইনসমনিয়া হয়েছে। ওর মাথায় মধ্যমনারায়ণ লাগাতে হবে দেখছি। ওটাকে আজকে থেকে জয়-মা-তারাদা বলে ডাকব। কেষ্ট যতদিন এ বাড়িতে ঢুকবে, আমিও ঢুকব। বারণ করুক তো দেখি জয়-মা-তারাদা!"...কিন্তু বলতে পারল কই? তাহলে কি আর এ ঘটতে পারত? পিলে নিজেই তো ছোটবেলা থেকে কতদিন নতুনদিদিমাকে বলতে চেয়েছে—"বা রে বা! কারও পিসিমা আছেন বলেই সে সেকেন হয়ে যাবে বুঝি?" কিন্তু পেরেছে কি? সব কথা বলা যায় না সঙ্কোচ-ভীরু 'টান-ভালবাসা'র ক্ষেত্রে। আলোকচোরা 'টান-ভালবাসা'র প্রান্তপথে যারা চলাফেরা করে তাদের ধারাই এই। এখানে যে কেউ, নিজের অধিকারের সীমা কতদূর, তা ঠিক্ জানে না। এরা পাবে কোথা থেকে 'প্রেম-ভালবাসা' কিংবা 'আপনাত্বি-ভালবাসা'র সে অসঙ্কোচ? ন্যায্য অধিকার দাবী করবার সে দ্বিধাহীনতা? এ ভেবে লাভ নেই। তাই পিলে বলল ঃ "আর বলতে হবে না নতুনদিদিমা; এখন থাক।"

"না রে পিলে না। তুই ছাড়া আর কি আমার বলার লোক আছে? কার কাছেই বা বলি এসব কথা, কেই বা শুনছে! আট মাস ধরে ভেবেই চলেছি, ভেবেই চলেছি; কত কথা, কত কথা, কত কথা। এ ভাবা বোধ হয় কোনও দিন শেষ হবে না—যতকাল বাঁচবো।...পরের দিনই শুনলাম গন্ধপাতার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। শুনেই বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে। যা গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে! কি না কি করে বসেছে! এমনিই একটা কিছু যে হবে তা আমি আগে থেকে জানতাম। ঠাকুরকে বলি—হে ভগবান, এ আবার তুমি আমার কি করলে। কেঁদে মরি। এদিকে দেখি পাড়াসুদ্ধ সবাই জেনে গিয়েছে যে, আমি গন্ধপাতাকে 'এদের বাড়ি' ঢুকতে বারণ করে দিয়েছি। কি করে যে মুহূর্তের মধ্যে পাড়ার লোকে এ খবর জেনে গেল ভগবান জানেন। কান্না হ'ল এদের বাড়ির উঠনে। আমিও বলতে যাইনি, তারাও বলতে যায়নি, সেও বলতে যায়নি। এসব কি লোক ডেকে বলবার কথা? খবর হাওয়ায় ওড়ে। বাড়ির ঝি-চাকরেরই কাজ হবে নিশ্চয়। হ'তাম আমি এ বাড়ির কর্তা, তো দিতাম এইসব ঝি-চাকরদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। গাঙ্গুলীমশাই এলেন তারার কাছে জিজ্ঞাসা করতে যে, তাঁর ছেলে কিছু বলে গিয়েছে কিনা—নিশ্চয়ই বলে গিয়েছে তোর মায়ের কাছে—তুই ভাল করে জিজ্ঞাসা কর—না বলে যেতেই পারে না—তোর মাকে কত ভালবাসে?...কে বুঝোবে ভদ্দরলোককে যে ছেলে একটি কথাও বলে যায়নি। যতই উড়নচড়ে হ'ন ভদ্দরলোক, তাঁর তো ওই একই ছেলে! পেন্সন নিয়েছেন। কত সাধ. ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনবেন ঘরে। সে ছেলে এক কাপড়ে চলে গিয়েছে। নেবার মধ্যে শুধু নিয়েছে সাইকেলখানা। অবুঝ ভদ্রলোক ঠায় বসে বারান্দায়। মায়াও হয়, দুঃখও হয়, আবার বিরক্তিও আসে। ছেলে কিছু বলে গেলে কি আর আমি বলতাম না সে কথা? শেষকালে তারা একরকম জোর করে তাঁকে উঠিয়ে বিদায় করে দিল।...তারপর কত সময় ভেবেছি যে, আমি যদি নিজে অমন কথা গন্ধপাতাকে না বলতাম, তাহলে বোধ হয় সে এখান ছেড়ে চলে যেত না। তারার ইচ্ছা হ'ত বলত, না ইচ্ছা হ'ত বলত না। তার বাড়ি, তার ঘর—যা ভাল বুঝত ক'রত। তারা বারণ করলে গন্ধপাতা আর এ বাড়িতে আসত না ঠিকই, কিন্তু হয়তো এখানেই থাকত। গুটলি উঠতে বসতে বলে—মা তুমি চিরদিন নিজের তেজেই মরলে।—কথাটা ঠিকই। রাগে, অভিমানেই আমি বলেছিলাম, অত বড় কথাটা গন্ধপাতাকে। তুই বলবি—কার উপর অভিমান?—কার উপর

আবার। আমার এই বরাতের উপর। ...যেতে দে সেকথা। নবীন সেকরার মা সেই সময় আমাকে এসে কি বলেছিল জানিস? বলে কিনা—"হ্যাঁ তারার মা, শুনছি লোকের মুখে যে, তুমিই নাকি গাঙ্গুলীমশায়ের ছেলেকে পালিয়ে দিয়েছ?" শোন একবার কথা! কেউ আবার কাউকে পালিয়ে দেয় নাকি? এত তো পাশ দিয়ে ডাক্তার হলি, 'পালিয়ে দেওয়া' কথাটা এর আগে শুনেছিস কখনও? বদ যত সব! ইচ্ছা হল দিই সেকরার মাকে বেশ করে দুকথা শুনিয়ে; কিন্তু ঘেন্না করল। এসব নিয়ে অন্যের কাছে কথা বলতে ঘেন্না করে। বাজারে থাকে, তাই 'বাজারের লোকের' মত কথা সেকরা বাড়ির! আরও কত লোক কত কথা বলে থাকবে সে সময় আড়ালে, তার কি ঠিক আছে। সে সময় এমন একটা লোক পাই না, যার কাছে কেঁদে দুটো মনের কথা ব'লে বুকের বোঝা হাল্কা করি। বুঝলি, খুব মনে হ'ত তোর কথা তখন। আরও কত কথা, কত কথা। সব মনেও কি থাকে ছাই!......তুই এসে তার কথা কিছু শুনলি নাকি? কার কথা আবার, গন্ধপাতার। কিছু শুনিসনি এখন? সত্যি? না তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস।

বাজারের মুরলী পানওয়ালা রটিয়েছে কথাটা। সে গিয়েছিল চক-সিকন্দরের মেলায় দোকান নিয়ে। ফি বছরই যায়। সেখানে সে নাকি দেখেছে গন্ধপাতাকে। যে সব মেয়ে নাচে গায়—নাট না কি বলে যেন—তাদের দলে। ছি ছি ছি! কি জাত না কি জাত। ওদের কি কিছুর ঠিক আছে! বদ সব! আমাকে বলল মিস্ত্রী-বৌ। বিশ্বাস হয় না। সত্যি হলে বেঁচে আছে তবু ছেলেটা। এখন তো তুই এসে গিয়েছিস এখানে। কত লোকজনের সঙ্গে দেখা হবে; কত খবর শুনবি। আমার আর সে সবের স্পৃহাও নেই; কারও সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের দবকারও নেই। ইচ্ছেও করে না আর। গাঙ্গুলীমশাই ছেলে ফিরবে বলে বসে আছেন; নইলে উনি কবে দেশে চলে যেতেন। পেন্‌সনের ঐ কটা টাকা দিয়ে কি আর এখানে বাড়িভাড়া দিয়ে থাকা পোষায়? দেখ কি ছিল বৃদ্ধের বরাতে। কোথায় ছেলে রোজগার করবে, ছেলের বউ রেঁধে খাওয়াবে, নাতিপুতি কোলেকাঁধে করে বেড়াবেন তা নয়, মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুও পাচ্ছেন না। সে ছেলের কথাও বলি—বুড়ো বাপের কথাটাও একবার ভাবল না। হাজার হোক বাপ তো। কি রকম যেন! আমি রোজ ঠাকুরের কাছে বলি—হে ভগবান, গন্ধপাতা যেন এখানে আবার ফিবে আসে। আমার সঙ্গে না হয় দেখা না-ই হ'ল—তার বাপের কাছেও তো থাকবে।...আমার কথা কি সেখানে পৌঁছয়!...শোন্ পিলে, আর এক কথা বলি, কাউকে বলিস না। আমার ধারণা কি জানিস। তারা পারলে পরে গন্ধপাতাকে এ বাড়ি থেকে বার করে দিত অনেকদিন আগেই। শুধু পারেনি ওর বাবা পি-ডবলু-ডি অফিসের বড়বাবু বলে। ঠিকেদাররা কি কখনও বড়বাবুকে চটাতে পারে। দেখেছি তো এ বাড়ির-মানুষকে—পারলে পরে গাঙ্গুলীমশাইকে মাথায় নিয়েই বুঝি নাচে। তিনি পেন্সন নিয়েছেন; আর এখন কিসের খাতির। কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি। তাই এতদিনে সাহস পেল গন্ধপাতার বিরুদ্ধে যাবার। এরা কি মানুষ? চিনেছে শুধু পয়সা। রায়বাহাদুর কিছু বলেছে না হাতী। তুইও বিশ্বাস করিস? ওসব বানানো কথা। যাক্‌গে, এসব আমার নিজের ভাবা কথা। সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন। বললাম, তুই বলেই।"...

এই হচ্ছে নতুনদিদিমার কাছ থেকে শোনা তুলসীর চলে যাবার খবর।

এর পর পিলে এখানকার অনেকের কাছ থেকে তুলসীর পালানোর এবং তার বর্তমান গতিবিধি সম্বন্ধে নানারকম মতামত শুনেছে। সবগুলি না মিললেও মোটামুটিভাবে নতুন-দিদিমার দেওয়া খবর ভুল নয়। গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কেননা মুরলী পানওলা নিজে কথা বলেছে তুলসীর সঙ্গে সেখানে, পান খাইয়েছে।...এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা এর আগে এখানকার বাঙালী সমাজে কখনও ঘটেনি। এর পর নাকি আত্মসম্মান বজায় রেখে বাঙালীরা এদেশে থাকতে পারবে না। গাঙ্গুলী মশায়ের লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটার কাণ্ডে পাড়ার লোকের মাথা কাটা যায়। হিন্দুস্থানীদের কাছে মুখ দেখানো ভার।...

পিলে আরও লক্ষ্য করে যে, নতুন-দিদিমার মন তারাদা এবং 'এদের' সংসারের উপর আবার আগেকার মত তেতো হয়ে উঠেছে। মধ্যে বছর দু-তিন যেন এই ভাবটা একটু চাপা ছিল। নিজের ব্যর্থ জীবনের গ্লানির কথা মনের নীচে থিতিয়ে পড়েছিল; সেগুলো আবার ঘেঁটে উঠেছে।

তুলসী চলে যাওয়ায় পিলের যতটা দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি। দুঃখের চেয়ে কৌতূহল ছিল বেশী। এজন্য সে নিজের কাছে লজ্জিত। পাড়ার অন্য দশজনের মত এমন চটকদার খবর নিংড়ে নিংড়ে রস উপভোগ করবার স্পৃহা অবশ্য তার থাকতেই পারে না—অত নীচ সে নয়। তবে তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু হিসাবে এর চেয়ে একটু বেশী অভিভূত হয়ে পড়ে স্বাভাবিক ছিল বইকি। একবার ইচ্ছা হয়েছিল, পাওয়া সংবাদের সূত্র ধরে বন্ধুর খোঁজ করবার, দেখা করে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা সে যদি না করে, তবে করবে কে? কিন্তু হয়ে উঠেনি। বরঞ্চ তার একটু ভয় ভয়ই করে—এই বুঝি নতুন-দিদিমা অনুরোধ করেন গন্ধপাতার খোঁজে বেরুতে, বুড়ো গাঙ্গুলীমশাইকে সঙ্গে করে।...তার ব'লে এখন কত ভাবনা-চিন্তা মাথায়। রোজগার করে খেতে হবে, চাকরিবাকরির খোঁজখবর নিতে হবে। সবদিক ভেবে চিন্তে সে কাজ করে চিরকাল।

এর পরে বছর কয়েক সাংসারিক জীবনের মাপকাঠিতে পিলের জীবনে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। তারাদার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সে যখন এখানে প্র্যাক্‌টিস করতে বসে, তখন নতুনদিদিমা ছেলের নিন্দা করে বলেছিলেন—"ও কি বিনা মতলবে টাকা ধার দিয়েছে না কি? বিনা পয়সায় বাড়ির ডাক্তার পাবে বলেই দিয়েছে। ওকে আমি জানি না! আমার টাকা নিয়ে আজও দিচ্ছে কালও দিচ্ছে! টাকা নেবার সময় আমার কি খোশামোদ! সে টাকা এখন চাইতে গেলে তম্বি কি। গো-বধের সময় খুড়োকর্তা—এস খুড়ো তোমার মাথা মুড়ি। এদের হচ্ছে তাই। দেখলাম তো! গন্ধপাতার বেলায়ও। যাক, তোর ভাল হলেই ভাল। তুই পড়েছিস তারার শুক্লপক্ষে; সেটা পড়েছিল ওর কেষ্টপক্ষে। এখন সেটা কি করছে, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই জানে। আমি বসে বসে ভাবি, বুঝলি। কত কথা, কত কথা।"...

স্ত্রীসুলভ সাংসারিক বুদ্ধিতে তিনি হয়তো পিলেকে টাকা দেবার উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝেছিলেন; কিন্তু তাহলেও সে তারাদার কাছে কৃতজ্ঞ। নইলে পিলেকে বোধ হয় ডিব্রুগড়ের চা-বাগানে জামাইবাবুর যোগাড় করা এক চাকরি নিতে হ'ত। সেখানে কাজ করলে নতুনদিদিমার কাছাকাছি থাকতে পেত কি করে? এর জন্য জামাইবাবু বোধ হয় একটু দুঃখিতও হয়েছিলেন। তারাদার টাকা তো সে আস্তে আস্তে শোধ করে দিচ্ছেই; কিন্তু জামাইবাবুর ঋণ কোনদিনই শোধ করবার নয়। তাই মাউইমার ঠিক করা তাঁদেরই এক নিকট-আত্মীয়াকে সে বিয়ে করতেও রাজী হয়। বেশ কেমন এদিকও রাখা হ'ল, ওদিকও রাখা হল। নিজের স্বার্থ ও পরের মন দুইই এক সঙ্গে রাখতে পারবার নামই সামঞ্জস্যজ্ঞান। খানিক ছেড়ে খানিক পেয়ে, জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ চালাতে হয় এ সংসারে। তার আন্তরিক বাসনা ছিল বাঙলাদেশের গ্রামের মেয়ে বিয়ে করে। তাহলে সে হয়তো বাঙলাদেশের অন্তরের তবু একটু কাছাকাছি যেতে পারত; যে অভাববোধে সে নিজে ভুগেছে, তার ছেলেপিলেদের তাহলে সে অভাববোধে ভুগতে হ'ত না; একজনের সান্নিধ্যে সব সময় কাছ থেকে পরশ পেত মুদীর পিদিমের-আলোয় পড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের সুরের, হিজল গাছের রঙের, তাতারসির গন্ধের, গাঙের বাঁকের বালুচরের ভিজে বাতাসের, ঢেঁকির পাটের শব্দের। নতুনদিদিমার ভাষায়—আরও কত কি, কত কি!...চিরকাল ভেবে এসেছিল যে, এইগুলো পাওয়াই তার মনের সবচেয়ে বড়

আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বিয়ে করবার সময় করল আসামে। পিলের যে মাধুর্যের স্বাদ নেবার স্বপ্নসাধ তা পাবে কি করে এ মেয়ের মধ্যে? মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিতে হয় যে, ভালই হল এ একরকম; নইলে সত্যিকারের বাঙলাদেশের মেয়ে হলে তার কাছেও একটা হীনতাভাব থেকে যেত চিরকাল।...এই যেমন খানিক আগেই সে আসামের মেয়েকে বলে ফেলেছিল, "আজ যে বড় সকাল সকাল মসলা পিষতে বসে গিয়েছ।" ব'লেই মনে হ'ল নতুনদিদিমা বলেন 'বাটনা বাটা', 'মসলা পেষা' কথাটা বোধ হয় ঠিক বাঙলাদেশের কথা নয়। 'বাটনা বাঁটা'ই বলা উচিত ছিল। আসামের মেয়ের বেলাতেই এই পুতুপুতু ভাব; বাঙলাদেশের মেয়ে হ'লে তো অনেক কথা ভয়ে ভয়ে বলাই হ'ত না। শুনলে সে মেয়ে নিশ্চয়ই হেসে ফেলত। বাইরে থাকাজনিত হীনতা ভাবটা এখনও আছে পুরোমাত্রায়। তাই সে আজকাল 'দাই'কে ঝি বলে ডাকা আরম্ভ করেছে; গল্পের মধ্যে বাঙলাদেশের কোন জিনিস বা আচার-ব্যবহারের কথা এলে সে প্রয়োজনের চেয়েও জোরগলায় জানিয়ে দেয় যে, এসব তার ভালভাবেই জানা।...পাকা গাব কি টক! ময়নাডালের কীর্তন কি সুন্দর! বাউলগুলো কেমন যেন আধপাগলা গোছের। তাতারসির গন্ধটি ভারি মিষ্টি! ইটেকুমোর পুজোতে সেখানে মেয়েদের ভারি ফূর্তি! এইবকম সব কথা সে না ব'লে থাকতে পারে না। অথচ এগুলো এই বইয়ে পড়া, না হয় নতুনদিদিমাব মুখে শোনা। অকারণে সে বাড়িতে ঢেঁকিঘর করেছে! এত আকাঙ্ক্ষা! তবু পিলে বাঙলাদেশের কোথাও চাকরি নেওয়ার চেষ্টা করেনি। বহুকাল থেকে মনে মনে ঠিক করা ছিল—তবুও। নতুনদিদিমার গ্রামে গিয়ে যদি প্র্যাকটিস করতে বসত, তা'হলে তো সে সেখানকার অণু-পরমাণুর মধ্যে ঢুকে যেতে পারত। কিন্তু তা সে করল কই? পিলে যেতে পারেনি। তাঁর কাছাকাছি থাকাই পছন্দ করেছে। বাঙলার গ্রামের মধুরতার নির্যাস ধরা দিয়েছে মূর্ত হয়ে নতুন-দিদিমার মধ্যে—পিলের মনোজগতে।

সাদা কথায় পিলে ডাক্তার আরম্ভ করেছে গুছিয়ে রোজগার আব ঘরসংসার করতে। গাঙ্গুলীমশাই বহুদিন ছেলের জন্য অপেক্ষা করে করে এখানকার বসবাস উঠিয়ে দেশে চলে গিয়েছেন। যাবার সময় বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি করে গিয়েছিলেন। পিলে ডিস্‌পেনসারির জন্য তাঁর দুটো আলমারি কিনেছিল—পুরনো সেকেলে বইটই শুদ্ধ। তার মধ্যে ছিল সেই ছেঁড়া ছেঁড়া মহাভারতখানি, যা নিয়ে তুলসী রাগারাগি করেছিল নতুনদিদিমার সঙ্গে। তিনি খুশী হবেন জেনেই পিলে সেখান নতুনদিদিমাকে দিয়ে দেয়।

পিলের পশার কিছু কিছু জমতে আরম্ভ হয়েছে। সে আর নতুনদিদিমা ছাড়া পাড়ার লোকে তুলসীর কথা প্রায় ভুলে এসেছে। এক শুধু বাপ মা'রা অবাধ্য ছেলেদের শাসন করবার সময় বলেন—"ঐ সেই গাঙ্গুলীমশায়ের লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটার মত হবে আর কি!"...এইরকম সময়ে তুলসীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেল একেবারে হঠাৎ।

এক সন্ধ্যায় পিলে বসে বসে ডিস্‌পেনসারী আগলাচ্ছে। একটি হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ এসে ঢুকল। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, চোখে কাজল, কপালে প্রকাণ্ড উল্কির টিপ! বেশভূষা ময়লা হলেও, পারিপাট্যের ব্যর্থ চেষ্টা আছে। দেখলেই বোঝা যায়, গেরস্ত বাড়ির মেয়ে নয়। ময়লা কাপড়চোপড় থেকে একটা তেলচিটে হিং হিং গন্ধ বার হচ্ছে।

"আদাব ডাক্তার সাহেব! পিলেবাবু ডাক্তার?"

সে পিলের হাতে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ দিল।...বোধ হয় ওষুধের নাম টাম হবে।...না তো! বাংলাতে লেখা! হাতের লেখা পড়া শক্ত। চিঠি! তুলসীর!..."ভীষণ দরকার। চট ক'রে চলে আসবি পাওয়া-মাত্র। Don't anxious ডাক্তারি করবার জন্য ডাকছি না। তুলসী।

পুঃ এটাকে আরজেন্ট টেলিগ্রামের মত মনে করবি।

চিঠির কোণায় ভুল বানানে 'আর্জেন্ট্' শব্দটি বড় বড় করে লেখা।...নিজের বুকের দ্রুততর স্পন্দন পিলে স্পষ্ট বুঝতে পারছে।...

"তুলসি কোথায়?"

"ধোকরধারা পুলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।"

"তোমার সঙ্গে বাবুর জানাশোনা হ'ল কোথায়?"

এইবার স্ত্রীলোকটি হেসে ফেলেছে। "বাবুজী যে এই গরীবের কুঁড়েতেই থাকে।"

পিলে এইরকমই একটা কিছু আন্দাজ করছিল। কত কথা জানতে ইচ্ছা করে এর কাছ থেকে।...আচ্ছা তুলসীর সঙ্গে তো দেখাই হবে।...নতুন-দিদিমাকে এখনই ছুটে গিয়ে খবর দিতে ইচ্ছা করছে!...

"আচ্ছা তুমি এগোও; আমি আসছি সাইকেলে।"—পিলে মেয়েলোকটিকে আগেই বিদায় করে দিতে চায়। এর সঙ্গে এক গরুরগাড়িতে গেলে পাড়ায় লোকে কে আবার কি ভাববে, না ভাববে!

"আদাব ডাক্তার সাহেব। আবার দেখা হবে।"

মেয়েটি চলে গেলে পিলেও বাড়িতে খবর দিতে যায়, যে তার ফিরতে রাত হবে রুগী দেখে। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় লোক দেখানর জন্য সাবধানী পিলে ডাক্তারী ব্যাগটি সঙ্গে নিতে ভোলে না।

ধোকরধারা পুল মাইল চারেক দূরে। পথে প্রায় মাইলখানেক গিয়ে সেই মেয়েলোকটির সঙ্গে দেখা। সাপের ভয়ে হাততালি দিতে দিতে চলেছে। পিলে ভেবেছিল মেয়েটি গরুরগাড়িতে এসেছে, গরুরগাড়িতেই যাবে।...তা' তো নয়।...এই অন্ধকার রাত্রে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে অতদূর!...একে যতটা গরীব ভেবেছিল, তার চেয়েও বেশী গরীব! নইলে কি আর একখান গরুরগাড়ি ভাড়া করতে পারে না!...মেয়েলোকটি হেঁটে হেঁটে যাবে, আর সে যাবে সাইকেলে—এ ভাল দেখায় না! .বিশেষ করে যখন দুজনেই যাচ্ছে একই জায়গায়।...জায়গাটা লোকালয়ের বাইরে; কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয় নেই।...

সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে।

"অনেক দূর চলে এসেছ তো এরই মধ্যে।"

"কে? ডাক্তার সাহেব? আমি অন্ধকারে চিনতেই পারিনি। আপনি নামলেন কেন? আপনারা কখনও এতদূর হাঁটতে পারেন। আপনি সাইকেলেই চলে যান আপনার দোস্তের কাছে। আমি আসছি পিছনে।"

পরিচিত পুরনো জায়গা অনেকদিন পর হঠাৎ দেখবার সময়ের মত একটা আনন্দে মন ভরে ওঠে। 'আপনার দোস্ত' কথাটি ঠিক লাগল নতুনদিদিমার বলা 'তোর গোস্ত'-এর মত। ইদানীং অনেকদিন তাঁর মুখে এ ঠাট্টা শোনেনি।...

"না না। হাঁটা আমার খুব অভ্যাস আছে।"

"কিন্তু আমার জন্য আপনি হাঁটবেন। আমার লজ্জা লজ্জা করে।"

নিজের পরিচিত গোষ্ঠীর বাইরে পিলের কথাবার্তা চিরকাল একটু আড়ষ্ট গোছের। কিন্তু এই মেয়েমানুষটির কথা ও ব্যবহারের অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্য, তাকে একটুও কুণ্ঠার অবকাশ দেয় না।

"তিন মাইল তো দূর এখান থেকে। বেশ গল্প করতে করতে চলে যাওয়া যাবে। যে রকম রাস্তা। এ রাস্তায় রাত্রে সাইকেলে যাওয়ার চেয়ে হেঁটে চলাতেই আরাম।"

"সবই নির্ভর করে অভ্যাসের উপর। আমার মা মরবার দিন পর্যন্ত কোনদিন গাঁয়ের বাইরে হেঁটে এক পা যায়নি। তবে সে যুগ আর এ যুগ। তাদের সময়ের কথাই ছিল আলাদা। তাকে তো আর আমার মত মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াতে হ'ত না।

"কেন?"

"কেন আবার! তখন লোকের হাতে পয়সা ছিল, নাচগানের কদর ছিল, রইসদের দিল ছিল। আর গায়ের রঙও যে আমার চেয়ে অনেক ফরসা ছিল। আমার মত এতদিন বাঁচেওনি। আমাদেব জাতের লোক বেশীর ভাগই বাঁচে না বুড়ো বয়স পর্যন্ত, তাই ভাগ্যি! নইলে আমাদের আসল রোজগার ক' বছর? ত্রিশ বছর বয়সের পর ক'জন মেয়ে নাচতে পারে? যে ক'দিন রোজগার করে সে ক'দিন ঘি মিছরি খুব খায়। তারপরই হাত পাততে হয় মালিকের কাছে! বিজুনিয়ার বৈদজী বলে যে, যেখান সেখান থেকে ওষুধ কিনে খেয়ে তোদের রক্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে; তাই এত টপ্ করে মরিস তোরা।...খাবে না তো কি করবে? তুমি হলে জমিদারের বদ্যি। তোমার ওষুধ অত দাম দিয়ে গরীব মানুষে কিনতে পারে? গান বাজনা শুনিয়ে খুশী করব, ওষুধের দাম নিও না।—তবে না বুঝি তুমি দিলদার বৈদজী! সে সব শখ নেই! গোমড়ামুখো একেবারে! বিজুনিয়ার নাম জানে এমন লোকও এ জেলায় আছে নাকি? অত বড় রইস হরখ্‌চন্দ্‌ সিঙের দেউড়ি সেখানে। ওপারে বিজুনিয়া, এপারে সরসৌনি—আমাদেব গাঁ। মাঝখান দিয়ে গিয়েছে হীরাধার নদী। নদী ছোট হ'লে কি হবে, চৈতবোশেখেও এক হাঁটু জল থাকে। আর সে নদীর মজা জানেন তো? জলের নীচের দামগুলোর তামার মত রং; আর শীতের শেষে হয়ে ওঠে আলতা গুলালের মত লাল। জলে হালকা ঢেউ লাগলেই সেগুলো দুলে দুলে ওঠে; বললে বিশ্বাস করবেন না—একেবারে ঠিক নাচের সময়ের ঘাঘরাব পাড়টির মত দেখতে লাগে। সে এক দেখবার জিনিস। কখনও ওদিকে যান তো দেখে আসবেন। আমাদেব গাঁ থেকে দুকোশ দূরে ঐ নদীর উপরেই কমলপুর—যেখানে থানা সবরেজিষ্ট্রি অপিস আছে। সেখানে কিন্তু দেখবেন নদীর দামগুলো কালো আর সেখানকার নদীর জল খেলেই গলগণ্ড। সরসৌনিব প্রত্যেকে হীরাধারের জল খায়, কারও গলগণ্ড নেই।...এই দেখুন আমার গলা—সাইকেলের আলো ফেলুন! আছে গলগণ্ড?"

"না তো।"

"কোন নাট্রীনের (নাট স্ত্রীলোক) নেই। সরসৌনির সবাই জাতে নাট। জাতবেরাদার। হরখ্‌চাঁদ সিঙের ঠাকুরদাদাই বসিয়েছিল নাটদের ও গাঁয়ে। ও খানদান গুণীর কদর জানে চিরকাল। সকলকে বিনা খাজনায় জমি দিয়েছিল, পাঁচ পাঁচ বিঘা করে। জমি অবশ্য একেবারে বালি। মেহেদি গাছের ডাল পুঁতে পর্যন্ত জল দিতে হয় রোজ, এত বালি। আর জমি ভাল হলেও নাটরা কত না চায করত! কুড়ের হদ্দ! হরখ্‌চন্দ্‌বাবু লোক ছিল বড় ভাল। কড়ার কাছে কড়া, নবমের কাছে নরম। থরথর করে কাঁপত তার নামে চক্‌সিকন্দরের নবাবরা। যেমন চড়তে পারত ঘোড়ায় তেমনি ছিল তার বন্দুকের নিশানা। ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তার উপর থেকেই বুনোহাঁস মারত। হেন বছর নেই, যে বছর সে বল্লম দিয়ে বুনোশুয়োর মারেনি। ও তল্লাটের সব লোকে জানে যে, হরখ্‌চন্দ্‌ সিং এক একটা দারোগার দাম ফেলে তিন ভুড়ভুড়ি করে। কেন জানেন তো? যখন ওর জোয়ান বয়স, তখন নাকি থানার দারোগা সাহেব ওকে বলে যে, সরকার বাহাদুর সব জেনে গিয়েছে; তোমার ডাকাতের দল আছে, তোমার বন্দুক পাওয়া গিয়েছে ডাকাতেব কাছে; তাই অন্দরমহল খানাতল্লাস করতে হবে।...আর যাবে কোথায়! অত বড় বেআদবী সইবার পাত্র হরখ্‌চন্দ্‌ সিং নয়! হীরাধারের লাল দামগুলো গুটিতিনেক ভুড়ভুড়ি কেটে ঢেকে নিয়েছিল দারোগা সাহেবের লাসটাকে। তারপর কলেক্টর সাহেব কত চেষ্টা করল; দশ মাইলের মধ্যের একটি লোকের সাহস হয়নি ঐ বাঘের বাচ্চার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার।...বেইজ্জত বরদাস্ত করবার লোক নয় সে। এত কড়া! অথচ এত ভাল। নাচ গানের এত বড় সমঝদার এ মুল্লুকে আর আছে?...ভোজে কাজে বিয়ে পরবে আমরা তো সব বড়লোকের বাড়িতেই যাই।...মেলায় মেলায় নাট্রীনদের তাঁবু পড়ে।...দেখি তো!...ঘুঙুরের শব্দ শুনলেই ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ তাঁবুগুলোর উপর ভেঙে পড়ে, নাট্রীন নাচে, নাট বাজায়, নাটনাট্রীন দুজনে মিলে গান গায়। কত ছকরবাজি, ভমর, বলবাহি, যোগিরা, বিদেশিয়ার নাচ! গানের

কলি শেষ হবার পর নাট্রীন যখন সকলের কাছে থালা হাতে করে ঘোরে, তখন দু'চার পয়সা রসিকতা করে ফেলে দেয় থালার উপর। এই তো সব গান বাজনার সমঝদার! এদের আবার কথা! চকইসমাইলের নবাবদের বড়মানুষী চাল হচ্ছে যে, অন্য সবাই মিলে যা দেবে, তারা তার চেয়েও বেশী দেবে। কিন্তু নাচগান কি তেমন বোঝে? কালাবালুয়ার মনোহর মিসর পত্তনীদারের নাম শুনেছেন তো? সে কি রকম নাচ গান বোঝে জানেন তো। এক ঢোক পেটে পড়লেই, সে মাইফেলের মধ্যে কাঁদতে আরম্ভ করে যে, নাট্রীন যতক্ষণ না তার এঁটো করা পানের খিলি তাঁকে খাইয়ে দেয় ততক্ষণ সে পান খাবে না।...দিয়ে তবে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।...ওদের, সব কথা লোকের কাছে বলবারও না। গান বোঝে, না ছাই।...কিন্তু হরখ্‌চন্দ্‌ সিং ছিল অন্য রকমের লোক। নিংড়ে নিংড়ে রস নিতে পারত নাচগান থেকে। মাইফেলের মধ্যে হাঁটু দুমড়ে বীরাসন হয়ে বসে সে রস নিত নাচগানের।...একটু বেতালা পা ফেলুক তো নাট্রীন নাচের সময়। অমনি তবক মোড়া পানের রেকাবী আসবে নাট্রীনের সম্মুখে। থামো, তোমার পালা শেষ হয়েছে। তারপর আর এক মুজরার দলের ডাক পড়বে।...

"আর মন ছিল কি উঁচুদরের!...শীতের শেষে যখন পশ্চিমে ধুলোর ঝড় আরম্ভ হত, তখন নাট্রীনরা সব মেলা সেরে ফিরে আসত গাঁয়ে। হরখ্‌চন্দ্‌ সিং নিজে আসত সরসৌনিতে রাঘো সর্দারের বাড়ি, দেখাশোনা করতে। রাঘো সর্দারের নাম শোনেননি বোধহয়? তা' শুনবেন কি করে। সে হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের মাথা—নাটদের সর্দার।...মাথা ভরা ঝাঁকড়া বাবরি চুল, বটের ঝুরির মত নেমেছে কাঁধের উপর, পাক খেয়ে খেয়ে। তাই না আমরা তাকে বলি বুড়োবট। এমনি কিছু বলে না সর্দার। কিন্তু করতে যাক তো দেখি কোন নাট জাতের বাইরে বিয়ে; জাতব্যবসা ছেড়ে খুলতে যাক তো সহরে পানের দোকান? কিম্বা বেচুক তো গান গেয়ে গেয়ে ইস্টিশানে বই, আর চানাচুর গরম। চাবকে ফিরিয়ে আনবে গাঁয়ে।...কত বড় দায়িত্ব তার মাথায়? ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে বুড়োবট; তেতেপুড়ে তার কাছে যাও, মন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, আপদে বিপদে পড়ে যাও তাব কাছে, সে সর্বক্ষণ তৈরী, নিজের আওতায় সমাজের যে কোন লোককে জায়গা দেবার জন্য। অমন সর্দার সাত জন্ম মাথা খুঁড়লেও হয় না। আর হরখ্‌চন্দ্‌ সিং-এর মত মালিকও তপস্যা কবলেও পাওয়া যায় না।...এবছরেও যখন মালিক সর্দারের বাড়ি আসে, তখন আমাদের সকলকে ডেকে নিয়ে হাসিগল্প করেছিল। অন্য জমিদার প্রজার বাড়ি গেলে নজরানা নেয়; কিন্তু আমাদের মালিক দিত নাট্রীনদের বকশিশ। কি মিষ্টি রসিকতা করে হেসে কথা বলত!...এবারেও আমাকে বলেছিল—হোলির জলসার মধ্যে, নাচতে নাচতে, বিজুনিয়াব বৈদজীর দাড়ি ধরে যদি মুখে পানের খিলি ঢুকিয়ে দিতে পারিস, তবে দশ টাকা বকশিশ দেব। তুই পারবি না পাতরঙ্গী।"—

গল্পে পিলে রস পাচ্ছে, কিন্তু যা জানতে চায় সেদিকেও মাড়াচ্ছে না পাতরঙ্গী। সে জানতে চায় তুলসীর কথা; তুলসীর সঙ্গে এর সম্বন্ধের কথা। অথচ একথা জিজ্ঞাসা করতে বাধে। একটা কিছু বলতে হয় তবু। তাই কিছু না ভেবেই প্রশ্ন করে—"তোমার নাম পাতরঙ্গী?"

খিল খিল করে হেসে ওঠে পাতরঙ্গী (শব্দার্থ পাতলা, রোগা)। "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ডাক্তার-সাহেবের? আমার এত সাধের শরীরটির উপর নজর দিচ্ছেন? সত্যিই আমি ছোটবেলায় রোগা ছিলাম খুব। তাই মায়ে নাম রেখেছিল পাতরঙ্গী। আমার মেয়ের নাম সাতরঙ্গী। এবার বারো পূর্ণ হয়ে তেরয় পড়ল। দিদিমার রূপ পেয়েছে। রামধনুর মত সুন্দর ব'লে সর্দার তার নাম রেখেছিল সাতরঙ্গী। কি ভালই বাসে তাকে সর্দার। প্রথম দিন থেকেই সর্দার সাতরঙ্গী বলতে লাগল। যখন তখন ঠাট্টা করে বলে,—আমি যদি আমার নাতি হতাম, তাহলে নিশ্চয়ই সাতরঙ্গীকে বিয়ে করতাম। নিজেই সব রকম নাচ গান শিখিয়েছে সাতরঙ্গীকে শেখায় অবশ্য সব মেয়েকেই, কিন্তু ওর উপর বেশী নজর, সবচেয়ে সুন্দর কিনা। সর্দার বলে,—সাতরঙ্গীকে। একেবারে খাঁটি পচ্ছিমা বাই তয়ের করাব; তবে না সরসৌনির নাম সারা মুলুকের গন্ধর্বজাতের মধ্যে ছড়িয়ে

পড়বে! এইজন্যই আপনার দোস্তকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে দিয়ে মেয়েটাকে হারমুনিয়া বাজানো শিখিয়েছে।"...

এতক্ষণে পাতরঙ্গী তুলসীর কথা বলেছে!

"তুলসী আজকাল সারেঙ্গী বাজায় না?"

"সারেঙ্গী না বাজালে কখনও আমাদের চলে! কিন্তু কিছুদিন থেকে তো আমাদের সবারই গানবাজনা মাথায় চড়েছে।"

"কেন? কেন?"

"সেই কথা তো বলছি। সেই কথাই তো ব'লব। টাকা! আর আমার কপাল! আজকে আমি গরীব বটে, কিন্তু আমিও যে-সে বাড়ির মেয়ে নই। আমাদের পরিবারের মেয়েরাই বিজুনিয়া দেউড়ির বাঁধা নাট্রীন, হোলির মাইফেলে, আর বিয়ের জলসায়। আমার দিদিমা ছিল, আমার মা ছিল, আবার আমিও আছি।...হোলির আগে বিজুনিয়ার বিষ্যুতের হাট সেরে আসছি। রাস্তায় তশীলদার সাহেবের সঙ্গে দেখা।...

"ওরে পাতরঙ্গী শোন। আমার বাটুয়ার মাঘী পান আছে গয়ায়। এক খিলি সেজে দে তো, তোদেব সেই লক্ষ্ণৌ পাত্তি জরদা দিয়ে। তোদের মত পান সাজতে বিজুনিয়ার গিন্নীরা কেউ পারে না—একথা আমি একশবার স্বীকার করব।"

আমি বললাম—"চল, তোমার গিন্নীর সম্মুখে একথা স্বীকার কর।" তখন হাসতে হাসতে তশীলদার সাহেব কাজের কথা পাড়ে। তাকে নান্নুবাবু পাঠিয়েছে আমার কাছে। নান্নুসিং হচ্ছে হরখ্‌চন্দবাবুর ছেলে। সবে মোচ উঠেছে। ইয়ার বন্ধু জুটতে আরম্ভ করেছে। কালাবালুয়ার মনোহর মিসিরের ছেলে হচ্ছে তার এক গেলাসের ইয়ার। সে চেয়ে পাঠিয়েছে—নান্নুবাবুর কাছে সাতরঙ্গীকে তাদের বাড়ির হোলির মুজরায়। যত টাকা লাগে দেবে। তাদের বাড়ির হোলির মাইফেলে খুব ঘটা—লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজী আসে। তুই না কবিস না পাতরঙ্গী। এতটুকু কাজ না করে দিলে বন্ধুর কাছে ছোট-মালিকের মাথা হেঁট হবে। এই নে বায়না একশ' টাকা। রাখ। পরে আরও দেবে। সেখানে নাট্রীনদের আসবার সময় আতরদান ওগলদান বকশিশ দেয়।...

"আমি বিজুনিয়া দেউড়ি থেকে পাব মোটে পঁচিশ টাকা, আর আমার মেয়ে পাবে কালাবালুয়ার মাইফেল থেকে দু'শ চারশ' টাকা!.....লোভে পড়ে রাজী হয়ে গেলাম।......তখন যদি 'না' বলে দিতে পারতাম তবে আর আজ এ হালত হ'ত না। তকদির! কপাল!"

এতক্ষণে পিলের কৌতূহল জেগে উঠেছে। বেশ কথা বলে পাতরঙ্গী। 'কপাল!' বলবার ধরনটা ঠিক নতুনদিদিমার মত!...

"...হোলির দিন ভোরে সূর্য মহারাজ সবে ফাগের খেলা আরম্ভ করেছেন হীরাধারের পাড়ের তালগাছের ডগাগুলোর সঙ্গে এমন সময় নান্নুবাবুর গাড়ি এসে হাজির, সাতরঙ্গীকে নিতে; কালাবালুয়া যে ছ'কোশ দূর।...সর্দার যাচ্ছিল মুখ ধুতে। গাড়ি দেখে এল আমার বাড়িতে।—ব্যাপাব কি?...আপনার দোস্ত তখনও ঘুমুচ্ছে বাহিরের বারান্দায় খাটিয়ার। "এই বাঙ্গালিয়া! ওঠ্—"। সর্দার আপনাব দোস্তকে বাঙ্গালিয়া ব'লে আদরের ঠাট্টা করে।...

সাতবঙ্গীকে কালাবালুয়া নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি এসেছে শুনেই সর্দার রেগে আগুন। আমার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে বার করে বাড়ি থেকে।...তোরা মানুষ না কি! ফিরিয়ে দে নান্নুবাবুর টাকা! মা হ'তে গিয়েছিলি! অতটুকু মেয়ে কখনও হোলির জলসার ধকল সইতে পারে? হাজারটা বেহেড় মাতালের মাইফেলে? আর দুবছর পর তো যাবেই। দেউড়িয়া বাঁধা নাট্রীন হয়ে থাকবে। এই নাও গাড়োয়ান সাহেব—দশখান নোট! ছোটমালিককে দিয়ে দিও। বলে দিও যে, রাঘো সর্দাব সাতরঙ্গীকে পাঠাতে দিল না।

"আমি ভয়ে জুজু। সর্দার আব আজ আমায় আস্ত রাখবে না। টাকার লোভে তাকে না

জানিয়েই ঐ একরত্তি মেয়েকে পাঠাচ্ছিলুম কালাবালুয়ায়—অন্যায় তো করেইছি! সাতরঙ্গী এসে আমায় বাঁচিয়ে দিল। সে এসেছে আবীর নিয়ে।—"মুখ ধুয়ে নাও সর্দারদাদু; হোলির প্রণাম করব।"

রাগতেও দেরী লাগে না, আবার রাগ পড়তেও দেরী লাগে না! রাঘো সর্দারের মুখে হাসি ফুটে ওঠে—"সাতরঙ্গী ডুগিতবলায় আবীর লাগিয়েছিস তো আগে?"

সে সব আর সাতরঙ্গীকে বলে দিতে হবে না!...নাছোড়বান্দা নাতনীর পাল্লায় পড়ে সর্দারকে চারটি জলপানও করতে হয় সেখানে। গাঁয়ে এখন আছে শুধু বুড়োবুড়ীরা; যাদের বয়স আছে তারা সবাই কালই চলে গিয়েছে নানা জায়গায় হোলির মুজরায়। সেই সব বুড়োবুড়ীরাও গুটি গুটি এসে জোটে সর্দারের সংগে গল্প করতে আর আমার লাখ্‌নৌ-পাত্তি জরদার লোভে। আজ আর কারও রান্নারও তাগিদ নেই—দুচার গাল চিড়ে মুড়ি যাহোক কিছু খেয়ে নিলেই চলবে। কালকে তো মুজরা ফেরত নাটনাট্টীনদের আনা ঘিয়োর, ঠিকরি, খাজা, লাড্ডুর ছড়াছড়ি পড়ে যাবে গ্রামে!...সকলের মনেই আতঙ্কের ছায়া। হোলির দিনের ফষ্টিনষ্টি-আবীর-ফাগ সব চলছে মনের উদ্বেগ চাপবার জন্য। একটা কিছু যে এখনই ঘটবে তা সবাই জানে। বুড়োবুড়ীরা নিজেদের বয়স-কালের হোলির জলসার গল্প করছে ঠিকই; কিন্তু ভিতর থেকে জানে যে, বিজুনিয়া দেউড়ির বাবুরা একজন নাটের হাতে বেইজ্জতি বরদাস্ত করবার পাত্র নয়।...এই এল বলে। গাড়োয়ানটার দেউড়িতে পৌঁছতে যতটুকু দেরী! সে এখানে গাড়ি রেখে গিয়েছে; জানে যে, পাতরঙ্গীকে নিশ্চয়ই যেতে হবে আজ কালাবালুয়ায়; যেমন ক'রে হক; নইলে সরসৌনির সিংদের কথার খেলাপ হয়ে যাবে; বন্ধুর কাছে মিথ্যাবাদী হতে হবে; হরখ্‌চন্দ্‌ সিঙের খানদানকে একটা নাটের কাছে মাথা নোয়াতে হবে।...বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না! তখন প্রাত্যহিক পশ্চিমে ধূলোর ঝড় সবে আরম্ভ হয়েছে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। ঘোড়ার খুরের শব্দ! ফুটন্ত লোহার টগবগানি! আসছে হরখ্‌চন্দ সিং। সরসৌনি গাঁখানাকে জ্বালিয়েই বুঝি আজ হোলি খেলবে! আমাদের মুণ্ডুগুলোকে নিয়েই বুঝি ভাঁটা খেলা হবে আজ। আমরা মেয়েমানুষরা ঢুকে গেলাম দরজার আড়ালে। কাঁপতে কাঁপতে দেখছি বেড়ার ফাঁক দিয়ে।...সাদা ঘোড়ার থেকে নামল লাফিয়ে, হরখ্‌চন্দ সিং। হাতে চামড়ার বিনুনীপাকানো চাবুক। সর্দার বাইরের বারান্দার উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। "আদাব হুজুর" বলে ঝুকে সেলাম করল মালিককে।...ঘোড়াটার মুখ দিয়ে গেঁজলা বার হচ্ছে!....কোনদিকে না তাকিয়ে গটগট করে এগিয়ে যায় মালিক রাঘো সর্দারের দিকে।..."আবার আদাব হুজুর করা হচ্ছে। হারামজাদা! নেমকহারাম! খানদানের বেইজ্জত করে আবার আদাব হুজুর। এই নে আদাব-হুজুর।...এই নে।...এই নে।...এই নে।"

হোলির দিনে লাল বিনুনীর ছাপ কেটে কেটে বসছে সর্দারের বুকে পিঠে! সাঁই সাঁই করে শব্দ হচ্ছে চাবুকটার! মাথা নীচু করে সর্দার দাঁড়িয়ে আছে। সাজা নিচ্ছে।....মালিকের রাগ তো হওয়ারই কথা। বড়লোকের কথার দামই তো আসল! ইয়ার দোস্তরা খোঁটা দেবে পরে! মারবার পর রাগ পড়ে যাবে। আবার ওবেলায় দেউড়ির জলসায় হেসে সর্দারকে পানের খিলি দেবে!...

হাত ব্যথা হয়ে গেলে হরখ্‌চন্দ্‌ সিং থামে। বারান্দা থেকে নেমে সে আমাদের দরজার দিকে আসে।..."সাতরঙ্গী! শীগ্‌গির বেরিয়ে আয়, সাজ পোষাক নিয়ে। এই গাড়োয়ান, বলদ জোত গাড়িতে।"

"খবরদার।"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে বুড়োবট, চোখে আগুনের হল্‌কা নিয়ে। সমাজের এতকালকার নিয়মগুলো হোলির ফাগ নয় যে, যার ইচ্ছা গুঁড়ো গুঁড়ো করে উড়িয়ে দেবে! বাপদাদারা তাকে সরসৌনির নাটদের ভালমন্দর অছি করে গিয়েছে। এক মুহূর্ত সময় লাগল তার মন স্থির করে নিতে। মাথার নাড়ানিতে বটের-ঝুরি বাবরি চুলের থোকাগুলো নড়ে চড়ে ছড়িয়ে বসল কাঁধের উপর। মালিকের ইজ্জত আর নাটসমাজের ইজ্জত, দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিয়েছে সে। আপনার দোস্তের খাটিয়ার মাথার বাতায় গোঁজা বল্লমখান সে হেঁচকা টান মেরে বার করে নেয়।

আমরা ভাল করে ব্যাপারটা বুঝবার আগেই অব্যর্থ নিশানায় ছুটে এল বল্লমখান, রোদের ঝলক ডগায় নিয়ে। বাপরে ব'লে ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেল হরখ্‌চন্দ্‌ সিং।...ভয়ে আমরা সবাই চোখ বুজে ফেলেছি তখন।...সে কি রক্ত, কি রক্ত। অত যে বালি, তাও যেন শুষে শেষ করতে পারে না। হোলির দিনই বটে।"

"তোমাদের মালিক বেঁচে গিয়েছে তো?"

"বাঁচল আর কই? সেইতো গোলমাল।"

"মারা গেল?"

"সর্দারও ভাল, মালিকও ছিল ভাল। তবু কেন যে এমন হয়!"

"সর্দারের কি হল? পুলিশে ধরেছে?"

"সেই বিপদের জন্যইতো আপনার দোস্ত আপনাকে ডেকেছে।"...

তুলসীর কি এর মধ্যে? সে পাতরঙ্গীর বাড়িতে কি বাজনদার হিসাবে থাকে?....আরও কত প্রশ্ন পিলের মনে উঁকিঝুঁকি মারছে তখন। ভারি সুন্দর কথা বলে পাতরঙ্গী নাট্নীন।...নাচগানের সঙ্গে কথা বেচাও যে এদের পেশা!..

ধোকরধারা পুল এসে গিয়েছে।

"কে? ডাক্তার?"...তুলসী এসে পিলেকে জড়িয়ে ধরেছে। কতদিন পর দেখা।...পিলে বলে ডাকতে পারেনি, বলেছে ডাক্তার।

"আমি তো অবাক চিঠি পেয়ে! কি করছিস আজকাল?"...কথাটা বোধ হয় জিজ্ঞাসা করা উচিত হয়নি।

তুলসী হো হো করে হেসে বলে ঃ "ঐ যা চিরকাল করি। ভাজার ইংরাজী কি রে? ঐ দেখ, ভুলে গিয়েছি ইংরাজীটি।—গীত গাবত, ভ্যারেণ্ডা ভাজত, তবলা বাজাওত বঁধুয়া— বুঝলি?"...সেই পুরনো তুলসী!

"সবসৌনিতেই তো আছিস?"

"তুই জানলি কি করে? ও পাতরঙ্গীর সব বলা হয়ে গিয়েছে? কথা বলতে পেলে একবার, আব ওকে দেখতে হচ্ছে না! হ্যাঁ সরসৌনিই Summer capital, আর শীতকালে মেলায় মেলায়। চলে যাচ্ছে একরকম জোড়াতাড়া দিয়ে।"

"দেখি তোর চেহারাটা কেমন হয়েছে!" পিলে সাইকেলের আলো ফেলে দেখে। বড় রোগা রোগা গোছের হয়ে গিয়েছে তুলসী! মাথায় বাবরি চুল। পোশাক হিন্দুস্থানী নাটদের মত।

"তোরটাও একবার দেখেনি। যাক! তোর গোঁফ দেখছি বেশ কড়া হয়েছে। কি সাইকেল রে? এ কিনতে গেলি কেন?—হচ্ছে best; ভাঙ্গতে জানে না।...আমার সাইকেলের ফ্রেমখানা এতদিনে বেচে দিতে হল। টাকার দরকার পড়েছিল কেন, সেই কথা বলবার জন্যই তোকে ডাকা।...কিগো পাতরঙ্গী সব বলে ফেলেছ, না আমার জন্যও কিছু বাকি রেখেছ?...আবার হাসি হচ্ছে! হাসি! সত্যিই রাঘো সর্দারকে ভগবানের চাইতেও fine লোক বলা চলে! এত বিশ্বাস করে আমাকে!...আজকাল তারই চেলা কিনা আমি।...তার জনই সরসৌনিতে থাকা।...বেচারাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছে।...পুলিস খুব জ্বালাতন করছে গাঁয়ে। তাই সরসৌনির কেউ জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে সাহস পায় না।...আমাকেও পুলিস কম ভয় দেখাচ্ছে না সাক্ষী দেবার জন্য।...তবু আমি যেতাম তার সঙ্গে দেখা করতে জেলে। কিন্তু বুঝিসইতো তুই। ও শহরে আর আমি যাব না।...একবার জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করে উকিলটুকিল ঠিক করে দিতে পারবি না?...ওটাকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে। অত ভাল লোক আমি দেখিনি। সরসৌনির প্রত্যেকের চোখের জল পড়ছে ওর জন্য।..."

পিলের হাত চেপে ধরেছে তুলসী।

"তুই বলছিস। আর এটুকুও করব না আমি তোর জন্য?

"এইনে, ক'টা টাকা রাখ। মকদ্দমার খরচের জন্য।"

"ঠিক আছে। টাকা দেবার দরকার নেই।"

"কি যে বলিস! আছেতো সব জিনিসেরই একটা!...আজকাল খুব পশার জমিয়েছিস বুঝি? good! তোকে যে সবাই বিশ্বাস করে! রুগীর বিশ্বাসেই ডাক্তারের পয়সা। তোর উপর বিশ্বাস করতে পারা যায় বলেইতো আজ তোর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম।...সিগারেট খাস? তবে মরাকাটা শিখলি কি করে?"

তুলসী সিগারেট ধরাল। দেশলায়ের আলোয় দেখা গেল যে, তার নাকটা আগের চেয়ে অনেক ছুঁচলো হয়ে উঠেছে রোগা হয়ে। তাই গাঙ্গুলীমশায়ের সঙ্গে তার মুখের মিল স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।...

"বুঝলি, তোর বাবা অনেকদিন অপেক্ষা করে দেশে চলে গেলেন।"

"যেতে দে ওসব কথা!" তুলসীর গলার স্বর গম্ভীর হয়ে উঠেছে।... পাড়ার কথা, আত্মীস্বজনের কথা সে বলতে চায় না পিলের সঙ্গে।...সে জানে যে এরপরই উঠবে নতুনদিদিমার কথা, আর তার চলে আসবার কথা।...

বুঝতে পেরে পিলে থেমে গেল। দুটো টান মেরে তুলসী সিগারেটটা দেয় পাতরঙ্গীর হাতে। কিন্তু গল্প আর জমল না।...পিলে যে নতুনদিদিমার কথা তুলবে না, এসম্বন্ধে তুলসী নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

ফিরবার আগে পিলে জিজ্ঞাসা করে "আবার কবে দেখা হবে তোর সঙ্গে?"

"তার কি ঠিক আছে? অসুখে পড়ে মরমর হলে তখন ডাক্তার পিলেকে 'কল' দিয়ে নিয়ে যাব। যাবিতো?"

পাতরঙ্গী বাধা দিল ঃ 'ডাক্তারসাহেব, যখনই দোস্তের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হবে, তখনই যাবেন আমাদের গাঁয়ে। এক শীতকাল ছাড়া!"

"থামো! হয়েছে। নারে ডাক্তার আসিস না; সরসৌনি তোদের যাবার মত গ্রাম না। এক যেতে পারিস রুগী মারতে। সেরকম অসুখে পড়লে-তোকে 'কল' দেব মাইরি বলছি। পাতরঙ্গী তোর সঙ্গে দেখা করতে যাবে তরশু। এর মধ্যে সব ঠিক করে রাখিস সর্দারের!"

আসবার সময় হঠাৎ সাইকেলের আলো পড়ায়, তুলসীর শততালি মারা জুতোর দিকে নজর পড়ল। সেদিকে তাকাতেই সে বুঝে গিয়েছে পিলের মনের কথা! হেসে উড়িয়ে দেবার কথা বলে ঃ "সবই জোড়াতালি, তার আবার জুতো। যেই দেখবি খুব আরাম লাগছে, অমনি বুঝবি যে tear, tore, torn-এর আর দেরী নেই। আমার জুতোজোড়ায় আজকাল খুব আরাম লাগছে মাইরি।"...

হাসলে কি হবে, তার এখনকার হাসিতে প্রাণ নেই। জোনাকপোকার মিটমিটুনি পুলের নীচের অন্ধকার আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

সাইকেলে ফিরবার সময় পিলের কেবলই মনে পড়তে লাগল, যে বাংলা বলতে গিয়ে তুলসীর আটকে আটকে যাচ্ছিল। চার বছর বাংলা কথা না বললেই এই রকম হয়ে যায় নাকি? তবে একটা জিনিস সে লক্ষ্য করেছে; পিলের মতই তুলসীরও নতুনদিদিমার বাকভঙ্গী অজ্ঞাতে কথার মধ্যে এসে যায়। 'জীবনটাই জোড়াতালি', 'আছে তো সব জিনিসের একটা', 'হাসি' হচ্ছে হাসি'—এসব তার কাছ থেকে পাওয়া কথা।...নতুন দিদিমার প্রভাব যে কত দিক দিয়ে পড়েছে, তাদের দুজনের জীবনের উপর। গ্রামোফোন রেকর্ডের উপরের দাগের মত, ছোটবেলার ভাললাগাগুলো মনের উপর দাগ কেটে যায়। চেষ্টা করে নতুন ভাললাগাগুলোকে সেইসব লাইনেই টেনে আনতে হয়।...নতুন জায়গার আড্ডাকে ভাল লাগাতে হলে টেনে আনতে হয় পুরানোকালের

মনে দাগ-কাটা আড্ডার ছায়া। কাউকে ভাল লাগলেই খোঁজ করতে হয় মনের মধ্যে, যে তার কথাবার্তাও নতুনদিদিমার মত কিনা।...

সে এখান থেকে সোজা নতুনদিদিমার কাছে যাবে, যত রাত্রিই হ'ক না কেন।...কত কথা, কত কথা!...

পিলে সে রাত্রে তুলসীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা নতুন-দিদিমাকে বলেনি। বাড়ির কাছাকাছি এসে মত বদলে গিয়েছিল। বলেছিল বহুদিন পর; থাকতে না পেরে। তারপর তাঁর প্রশ্ন আর থামে না।

"বিয়ে করেছে না কি রে সেই মেয়েটাকে? জিজ্ঞাসা করিসনি? কেন তা জিজ্ঞাসা করতে আবার কি হয়েছে? আমি তো তোদের ভাববার ধারাই বুঝতে পারি না! বিয়ে করলেও করেছে, না করলেও করেছে। বদ-মেয়েমানুষগুলো! কি জাতের ওরা? নাটরা হিন্দুও হয়, মুসলমানও হয়? সে আবার কি! দু' জাত হয় কি ক'রে? আচ্ছা কেমন দেখলি গন্ধপাতাকে তাই বল্। হ্যাঁ হ্যাঁ, শরীরের কথা বলছি। তোকে দেখেই জড়িয়ে ধরল, না? কি ভাল যে বাসত তোকে। তুই যখন প্রথম প্রথম ডিব্রুগড়ে গেলি না, সেই যে যখন তোকে রবিবারে রবিবারে চিঠি লিখবার কথা—তখন কতদিন হয়েছে, আমি হয়তো ভুলে গিয়েছি, কিংবা কাজের ভিড়ে রবি সোমবারে হয়তো চিঠি লিখে উঠতে পারিনি—অত ঘড়ি ধ'রে চিঠি লিখতে কি আমরা পারি—সেই সময় গন্ধপাতা বলেছে আমাকে, আজ মঙ্গলবার হ'ল তো কি হ'ল; তুমি চিঠির কোণে রবিবার লিখে দাও; না হ'লে পিলেটার মন খারাপ হবে। আমি বলি—মিথ্যা লিখব? কিছুতেই ছাড়বে না। বলে—তা হোক্, কত দূরদেশে পড়তে গিয়েছে একা।...অত ভাল বোধহয় ও আর কাউকে বাসত না। নিজের বাপের কথা ভাবল না, অথচ কে না কে এক সর্দারের জন্য মাথা কুটে মরছে। এদের ভাবও তো আমি বুঝে পাই না। না না, সর্দারকে কি আমি খারাপ লোক বলছি? ভাল-মন্দ সব জাতের মধ্যেই আছে। সর্দার উঁচু-মনের লোক। নইলে মেয়েমানুষের দুঃখ দরদ কি বেটাছেলেতে বোঝে? নিজের মা-বাপেই ব'লে বোঝে না, তার আবার অন্য লোক। ঐ দেখ না—পেটে তো ধরেছিল। তবু পয়সার লোভে পাঠাচ্ছিল তো মেয়েকে! আরে ওদের কথা বাদ দে; ভদ্দরলোকের বাড়িতেই কন্যাদায় উদ্ধার হবার সময় একবার ভাবে না যে, নিজের মেয়েটাকে গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গায় ডুবিয়ে দিচ্ছে কি না। মা-বাপ তো আমার মা-বাপই! চোর-ডাকাতগুলোরও তো ছেলেপিলে হয়! কিন্তু তুই এত খোশামোদ করলি, তবু সে বুড়ো-সর্দার, উকিল—মোক্তার রাখল না কেন? তাহলে বোধ হয় তাকে দশ বছর জেলে পচতে হ'ত না! দোষ স্বীকার করলে কি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়ে? তবু কি ভাগি যে, ফাঁসির সাজা দেয়নি। দেখ দিকি কিসে থেকে কি কাণ্ড হয়ে গেল? হ্যাঁ রে, ওই মেয়েমানুষগুলোর গায়ে খুব দুর্গন্ধ, না রে? যা পিঁয়াজ-রশুন খায়। ঢুকতে দিস কেন ওগুলোকে ডিস্পেন্সারিতে? যত সব বদ! হয়েছে, হয়েছে। বাজে বকিস কেন? কে তোর বক্তিমে শুনতে চাইছে। আমি যে তাকে 'এদের বাড়ি'তে আসতে বারণ করেছিলাম, সে কথা কিছু বলল না কিরে গন্ধপাতা? না না, তুই চাপিস না আমার কাছে। আমি কিছু মনে করব না। আর কারও কাছে না বলুক, তোর কাছে সে বলবেই বলবে। খুব দুঃখ করছিল, না রে? রেগে একেবারে মুখ হুম্-ম্ করে না? আচ্ছা না বললি না বললি! সাধে কি আর আমি বলি, তুই চিরকাল সেই একই রকম চাপা থেকে গেলি! আমি যখন তখন বসে বসে ভাবি, সে ছেলের একেবারে নিরুদ্দেশ হবার মানে কি? আমার কাছে না হয় না-ই আসতিস। কোন্ চালে যে চলে এরা! কি ভাবে, কি করে—ভগবান জানেন। এই তো তুই কেমন দিব্যি ঘর-সংসার করছিস; সেও তো করতে পারত? সবই এদের অন্য রকম! হ্যাঁ রে পিলে, সে মেয়েটার কথাবার্তা ছোটলোকদের মত, না রে? ছোটলোক—তার আবার হবে কি রকম! যত রাজ্যের

বদ! গন্ধপাতাও আর জায়গা পেল না। ওদের মধ্যে থাকতে গেল কেন? একথা বিশ্বাস না করতে পারলেই ছিল ভাল। এতদিন তবু কথাটাকে মিথ্যে ভেবে মনকে বুঝ দেবার একটা উপায় ছিল। তুই সে রাস্তাও বন্ধ করলি। ও ওখানে থাকে, এ আমার একটু ভাল লাগে না। কিন্তু ভাল না লাগলেই বা করছি কি! হ্যাঁ রে, তোর গোস্‌তো, আমার কথা কিছু বলল না?''

এইটিই আসল প্রশ্ন। এতক্ষণকাব বাকি সব প্রশ্নগুলো অবান্তর, ইচ্ছা হয় উত্তর দাও, না হয় দিও না। কিন্তু এ প্রশ্নটির জাত আলাদা। এই কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যই তিনি এত অন্য কথা বলছিলেন। পুরনোকালের 'গোস্ত' শব্দটি ব্যবহার ক'রে পিলের মন ভিজিয়ে নেবারও বোধ হয় চেষ্টা আছে এর মধ্যে। উদ্‌গ্রীব হয়ে তিনি প্রতীক্ষা করছেন দেখে পিলেকে মিছে কথা বলতেই হ'ল।

''হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কেমন আছেন।''

''তুই কি বললি?''

''বললাম, বেশ ভাল আছেন।''

কেন যেন নতুন-দিদিমা চটে উঠলেন—ভালো তো আমার ভালই! কেমন ক'রে তুই একথা বললি, আমি ভেবে পাই না। কি ভালো তুই দেখলি? 'মাইজী' কথাটার মানে পর্যন্ত বদলে গেল এদের সংসারে আমি বেঁচে থাকতেই। ঝি-চাকরে মাইজী বলতে বোঝে বউমাকে। কেন? বউমাকে বহুমাইজীই তো আগে ব'লত। তোদের সংসার, তোরাই গিন্নী; আমি কি তোদের গিন্নীপনা কেড়ে নিতে যাচ্ছি না কি? তর সইছে না এদের। ঐ মাইজী নামটুকুই তো ছিল। হবিষ্যি ঘরে রাঁধবার জন্য যা হাত তুলে দাও, সেইটুকুকে রাঁধি। এইটুকুনই তো তোদের সংসাবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। দিলে বেশ, না দিলেও আমি কোনদিন চাইতে যাব না তোমাদের কাছে। এসব হচ্ছে বুঝবার কথা। দেখে দেখে একেবারে নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেল। সব নির্ভর করে বাড়ির কর্তার উপর। বাকি সকলে তো টিয়াপাখী—যেমন পড়াবে তেমনি পড়বে।

এই 'মাইজী' বলা আরম্ভ হ'ল কবে থেকে জানিস তো? আর কেউ খেয়াল করেনি, কিন্তু আমার মনে আছে। এ জিনিস তারার মাথায় ঢোকে, গুট্‌লির একদিনের কথা থেকে। গুটলি অবশ্য ভাল ভেবেই বলেছিল; তাকে দোষ দিই না। আমসত্ত্ব দেবার জায়গার অভাব। রামশন্নাকে বললাম দে তো দেখি একটা কেরোসিনের টিন কেটে, নীচে-উপরটা বাদ দিয়ে। সবে কাটতে বসেছে, এমন সময় তারা এসে ঢুকল বাড়িতে। এসেই এই তেরিয়া। —টিন কাট্‌তা হ্যায় কাহে? মাইজী বলেছে? টিন বড় সস্তা? আমি তোকে বলেছিলাম না পশ্চিম বাগান থেকে বোম্বাই আমগুলো পেড়ে আনতে আজ সকালে? কানে গিয়েছিল? বদমাস কাঁহাকা? মাইজী বলেছে, ওসব কর অন্য বাড়ীতে গিয়ে।

রামশরণ গজ গজ করে—এ বাড়িতে মাইজী একরকম বলে, বাবু আর এক রকম বলে, কার কথা রাখে সে। গুটলী আর বউমা রান্নাঘরের বারান্দায়। চিরকাল গুটলিটার তো মাথায় বুদ্ধি খেলে খুব। সে বলে যে ভাঁড়ার ঘরে আমের আগুিল পচছে। তাই আমসত্ব দেবার জন্য বউদি রামশরণকে টিন কেটে দিতে বলল। মাইজী হচ্ছে গুটলির বউদি। অমনি জোঁকের গায়ে নুন পড়ল। আর একটি কথা নয়। গুটি গুটি তারা বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে গুটলি হেসে গড়িয়ে পড়ে। এতে রামশন্নার চাকরি না হয় বাঁচল, কিন্তু আমার মান থাকল কই? এইদিন থেকে তারার মাথায় ঢোকে বউমাকে মাইজী টাইটেল দেবার। কেননা পরেব দিনই আমি লক্ষ্য করলাম, বাড়ি ঢুকেই বলল—এই রামশরণ, মাইজীকে চা করতে বল শীগ্‌গির।—আমি সম্মুখে বসে তখন। রামশরণ তো জানে যে, আমি চা করি না; চা করে বউমা...'বাড়ির-মানুষ' চলে যাবার পর আমি দাসী-বাঁদিরও অধম হয়ে গিয়েছি এদের সংসারে, বুঝলি? ঘেন্নায় মরে যাই। বাড়ির চাকরটা পর্যন্ত গেরাহ্যির মধ্যে আনে না। আনবেই বা কেন? বাড়ির কর্তাকে যেমন ব্যবহার করতে দেখবে; তেমনিই তো শিখবে। ঝি-চাকর দেখছে তো তারার ব্যবহারে, যে আমার হুকুম এ বাড়িতে অচল। বলো। এই রকম সংসারে

কি থাকতে ইচ্ছা করে? ইচ্ছা হয় কাশীটাশী কোথাও গিয়ে থাকি। কিন্তু তাতেও যে টাকা লাগে। সে টাকা আমি কোথায় পাব? তারা দিলে তো! দিলেও তার কাছে আমি হাত পাততে যাব না। যে দিকে দুচোখ যায়, সেদিকে যদি চলে যেতে পারতাম। ইচ্ছে করে, কেষ্টকে টেনে বড় ক'রে দিই একদিনে। ভিখুয়ার মা আর তেলী-বউকে আমি যে টাকা ধার দিই সুদে, তা কি একদিনের মধ্যেই টেনে বাড়িয়ে অনেক ক'রে দেওয়া যায়? তা কি হয়? বুঝি তো সব! কিন্তু মন মানে কই।...আরে কেষ্টর উপরও কি তারা খুশী নাকি? ছাই। দেখলি না সেদিন? ঐ যেদিন ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বার হ'ল? বলে কি আর পড়াব না। আমার সঙ্গে ঠিকেদারির কাজে ঢুকিয়ে দেবো।...তোমাদের সব কথা আমি সহ্য করতে পারি, সব অপমান মাথা পেতে নিতে পারি, কিন্তু কেষ্টর বেলায় আমি মুখ বুজে থাকব না। আমি সেদিন স্পষ্ট ব'লে দিলাম—তোমরা তো চিনেছ পয়সা। অমন পয়সা রোজগারে কেষ্টর দরকার নেই। ওকে আমি মুখ্যু থাকতে দেব না, তোমাদের গুষ্টির সকলের মত। ঠিকেদার দেখতে দেখতে আমার চোখ পচে গিয়েছে।"

"তারাদা তো শেষ পর্যন্ত বলল যে, পড়তেই যদি হয় তাহলে ওভারসিয়ারী পড়াবে। ওভারসিয়ারী পাশ করা ঠিকেদারের রোজগার খুব।"

"পিলে তুইও যে দেখি আজকাল তারার দিকে টেনে কথা বলতে আরম্ভ করেছিস! ওভারসিয়ারী আবার একটা পড়া নাকি? যাক্ টাকা দেবে পড়বার, ওর দাদা। আমি বললেই বা কি হচ্ছে। কিন্তু ঠিকেদারি আমি কিছুতেই করতে দেব না কেষ্টকে। মরে গেলেও না।

এই তো আমার মনের ইচ্ছা। এখন দেখা যাক্, কপালে কি আছে! যে যা চায়, তা পায় না; যা পায় তা চায় না। আবার কেষ্ট বড় হয়ে কি মূর্তি ধরবেন কে জানে! ওর উপরও কি তারা খুশী নাকি? কেষ্টর যখন দু'বছর বয়স, তখন একদিন তারার ঘর নোংরা করে ফেলেছিল। তাই নিয়ে কি ফাটাফাটি। কই আজকাল যে নিজের ছেলে নিত্যি ঘর নোংরা করছে, কোন দিন তো কিছু বলতে শুনি না। ক্ষীরের চাঁচি, দুধের সর, তাতেই বুঝি আপন-পর। শুধু কি কেষ্ট? আমার কাছে যে ছেলেমেয়েরা আসে, তাদের কেউ ঢুকুক তো তারার ঘরে। অমনি মুখ একেবারে বিষ। তাদের ওঘরে যাওয়ার জন্য যেন আমি আমিই দায়ী। বুঝি তো সব। ও দাঁত-মুখ খিঁচুনি যে আমারই উপর। কিন্তু বউমার কোন বন্ধুর ছেলেপিলে ও ঘরে ঢুকলে তার সাত-খুন মাপ। তারা যে আমার কাছে আসেনি। দেখে দেখে দেখে একেবারে চোখ পচে গেল। কত দেখলাম; বেঁচে থাকলে আরও কত দেখব। যে গুটলির আমার কোল ঘেঁষে না শুলে এখনও ঘুম আসে না—এই বয়সেও সেটাসুদ্ধ যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। সেদিন আমি 'বাড়ির মানুষের' কথা কি যেন বলছিলাম,—মনে পড়ছে না। কি কথাটা—অমনি মেয়ে ফোঁস ক'রে উঠেছে; "না মা, তুমি অমন ক'রে বাবার নামে ব'ল না।"

আরে তোরই বাবা, আমার বুঝি কেউ না? লোকে ঠিকই বলে। এক গাছের বাকল কি আর এক গাছে জোড়া লাগে? একেবারে তুলোর তুল্য ক'রে দিয়েছি এদের। কেউ বলুক তো একটুও ত্রুটির কথা। তবু কি এক হয়ে যেতে পেরেছে এরা মনের থেকে। হ্যাঁ, একটা কথা বলি—আমার নিজের ভাবা কথা অবিশ্যি। আমি গুটলি সবাই সেবার বাসুকিনাথের স্নানে গিয়েছিলাম না? সব সময় যেন তারাটারারা আমার চেয়ে একটু দূরে দূরে থেকে লোককে বুঝোতে চায়, আমি তাদের মা নই। আমার আর তারার মধ্যের বয়সের তফাৎ খুব একটা বেশি নয় ব'লে তার বোধ হয় বাইরের লোকের কাছে মা ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা করে। আমার সন্দেহ হয় যে, এই ভাবটা গুটলি, বউমা সকলের মধ্যেই আছে। আমি পড়ে থাকলাম কোথায় পিছনে, আর ওরা অনেক আগে চলেছে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে। আমার ভাবা ভুল হতে পারে—তবে আমার মনে হয়েছিল গাড়িতে আমার পরিচয় দেবার সময় নতুন লোকের কাছে একটু যেন কিন্তু কিন্তু ভাব ওদের।...কপাল। জোড়াতালি দিতে দিতেই জীবন গেল। কেবল জোড়াতালি! কেবল জোড়াতালি!

তারার চিরকাল আক্রোশ আমার উপর। তাই সে চায় কেষ্টকে নিজের মুঠোর মধ্যে রাখতে। সেইজন্যই না ওটাকে ঠিকেদার করবার জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছে।...আচ্ছা, ভগবান আছেন; সে দিন যদি তিনি দেন তো দেখিয়ে দেব!"

এসব কথা পিলের কাছে নতুন নয়। কতদিন শোনে এসব। কিন্তু দিন পেলে কি দেখাবেন নতুন-দিদিমা? কি চান তিনি? তিনি নিশ্চয়ই সব ভেবে ঠিক করে রেখেছেন। নইলে কথার মধ্যে এত দৃঢ়তা আসবে কোথা থেকে? পিলে ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। তবে সে ভালভাবেই জানে যে, এত কোমলতার মধ্যেও তাঁর এক জায়গায় দৃঢ়তা অসীম। জোর ক'রে কেউ তাঁর মাথা নোয়াতে পারবে না। এই দৃঢ়তাকেই তারাদা বলে 'জিদ', গুটলিদি বলে 'তেজ', ঠিকেদারবাবু ভাবতেন অভিমান। নিজেব কপালের উপর অভিমান এর মধ্যে মেশানো আছে ঠিকই। বর্তমান তাঁর বিরুদ্ধে; তাই কি তিনি তাঁর মিষ্টি ছেলেবেলা খুঁজে পেতে চান, পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে? না, তিনি ভাবছেন এখানকার বিসঙ্গতির হাত থেকে কোনরকমে ছিঁড়ে নিজেকে বার ক'রে নিয়ে যেতে পারলে অন্য কোন হারিয়ে-যাওয়া সুর খুঁজে পাবেন?...কেবল জোড়াতালি! কেবল জোড়াতালি! কেউ বলে; কেউ বলে না। কেউ বোঝে, কেউ-বা হাতড়ে বেড়ায়,—বাড়িতে কি যেন একটা মনে-না-পড়া জিনিস ফেলে গেলাম—ভাববার সময়ের মত। কেউ হা-হুতাশ করে, কেউ-বা প্রতিবাদ করে। পিলের বাবার মত লোক চকোলেট চুরি ক'রে খান, পিলে মনোজগতে কল্পলোকের সৃষ্টি করে, পিসিমার মত লোকরা একাদশীর রাত্রে লুকিয়ে জল খান, নতুন-দিদিমা দিন পেলে দেখিয়ে দেবার মঙ্গল ব্যক্ত করেন।...অত সোজা নয় জোড়াতালির হাত থেকে পালানো। তুলসীও পারেনি।...নতুন-দিদিমা বলছেন তখনও।

"হ্যাঁরে পিলে, তুই হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলি কেন? তোর 'আপনার লোক' তাবাদার সম্বন্ধে এত কথা বললাম বলে? না বললে কি আমি শুনি! ঠিক তাই। আচ্ছা, আর বলব না। ভাবতে গেলেই মাথা গরম হয়ে উঠে, তাই এত কথা বলে ফেলি। আর তোব কাছে ব'লেই বলি। অন্যর কাছে কি বলতে যাই?...

শোন, আমার আর একটা মনের কথা। চুপ চুপি! গন্ধপাতার নাটনাট্রীনদের সঙ্গে থাকাটা আমার আরও খারাপ লাগে কেন জানিস্? সে ছিল পাড়ার লোকদের চক্ষুশূল। নাট্রীনদের সঙ্গে থাকবার খবরে তাদের জোর বাড়ে, আর আমার জোর কমে। তোর তারাদা একদিন যদি আমায় শুনিয়ে দেয় যে, দেখলে, ও লক্ষ্মীছাড়াটাকে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দিতে বারণ করেছিলাম কেন—তখন আমার কিছু উত্তর দেবার মুখ রাখল না গন্ধপাতা। ছি ছি ছি! জবাব আমি দিতামও ঢের। তবে মনের দিক থেকে ও কথার জবাব দেবার আমি জোর পাব না আর।...

আমি কি বলতে চাইছি, তুই বুঝলি না বোধ হয়? তোর কাছে এর চেয়ে পরিষ্কার ক'রে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। সব কথা কি সকলের কাছে পরিষ্কার ক'রে বলা যায়? আছে তো সব জিনিসেরই একটা।

সংসার চিরকাল তাঁর উপর অবিচার করেছে; কিন্তু সংসার কথাটি বড় অস্পষ্ট। চব্বিশ ঘণ্টা মনের আয়নায় ধরবার জন্য এর চেয়ে একটা স্পষ্টতর অবয়বের দরকার। যতদিন ঠিকাদারবাবু বেঁচে ছিলেন, ততদিন তিনিই ছিলেন এই প্রতিকূল সংসারের মূর্ত রূপ। তিনি চলে যাবার পর সংসারের অবিচারের সূচিমুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারাদা, নতুন-দিদিমার চোখে।

পাতরঙ্গীর সঙ্গে মাঝে আর একবার দেখা হয়েছিল। একবার মেলার মরসুমের পর এসেছিল ইনজেকসন নিতে। পিলের আনন্দ যে, এর কাছ থেকে তুলসীর সব খবর পাওয়া যাবে, আর এর চিকিৎসা করলে তুলসী খুশীও হবে। পাতরঙ্গীর কাছেই শোনে যে, সর্দার পুলিসের সঙ্গে চলে যাবার সময় তুলসীকে বলে গিয়েছিল সরসৌনির নাটদের দেখাশোনা করতে—নইলে তারা সব গাঁ ছেড়ে

পালাবে। আপনার দোস্ত আছে বলেই নাটরা টিকে আছে এখনও। নান্নু সিং বড় জুলুম আরম্ভ করেছে। খাজনা চায়, বর্ষায় খেয়া পার হতে গেলে পয়সা চায়। সরসৌনির নাটদের সময়টা পড়েছে খারাপ। হবারই কথা। জমিদার বিরুদ্ধে। ঘর ছাইবার ঘাস, বাঁশ কখনও পয়সা দিয়ে কিনতে হয়নি এর আগে। সবই তাদের দুঃখের কাহিনী, তুলসীর কথা কম। যাক্, এখন অনেকদিন থাকতে হবে তাকে এখানে চিকিৎসার জন্য। তারই মধ্যে আস্তে আস্তে তুলসীর কথা বার ক'রে নিতে হবে পাতরঙ্গীর কাছ থেকে। এর আগে সর্দারের মোকদ্দমার সময় তুলসীর তখনকার জীবনের সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়েছিল, তারই ভিত্তিতে তাকে নিয়ে গল্প হ'ত প্রত্যহ নতুন-দিদিমার সঙ্গে। এতদিনে সঠিক খবর জানবার তবু একটা উপায় পাওয়া গেল। পিলে তখনই ছোটে নতুন-দিদিমাকে পাতরঙ্গী নাট্টীনের খবর দেবার জন্য। শুনেই তিনি চটে উঠলেন।

"ঢুকতে দিস্ কেন ওদের? যত সব বদ।"

'ডিস্‌পেন্সারীতে রুগী ঢুকবে না?"

"ওদের গায়ে খুব দুর্গন্ধ না রে? যা সব রশুন-পিঁয়াজ, অখাদ্য-কুখাদ্য খায়। ভাবলেও গা ঘিন্ ঘিন করে।'

এর আগেরবার পাতরঙ্গীর কথা শুনবার পরও ঠিক এই কথাই নতুন দিদিমার মনে পড়েছিল—পিলের মনে আছে। এ ধারণা উনি কেন ক'রে নিয়েছেন?

বোধ হয় ওঁর ধারণা যে, অখাদ্য খেলে গায়ে খুব দুর্গন্ধ হয়। সত্যিই ইন্‌জেকসন দেবার সময় পাতরঙ্গীর কাপড়চোপড়ের কিংবা গায়ের হিঙ্ হিঙ্ গন্ধ সে পেয়েছে। এরকম গোছের ঘামপচা গন্ধ তো নতুনদিদিমার গায়েও হয়—যতই হবিষ্য খান না কেন তিনি।

"এখানে এতদিন থাকবে কোথায় রে।"

"ডিস্‌পেন্সারীর বারান্দায় শোবে, আর ওই পাশেই বটগাছতলায় রাঁধবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের ওতেই যথেষ্ট। যে না রান্নার ছিরি এদেশের। না আছে ফোড়ন, না আছে কিছু। এরা কি খেতে জানে? থোড়, মোচা, কাঁঠালের বীচি, কুমড়োর ডাঁটা এসব খেতে দেখলে অবাক হয়ে যায়। তোর কোন্ তরকারী সবচেয়ে ভাল লাগে রে? ডাল ছড়ানো তরকারী? দ্যাখ্ কেমন হাত গুনে বললাম। আমার ইচ্ছা করে যে, এদেশের সবাইকে বাঙালী গেরস্তবাড়ির রান্না শিখিয়ে দিই। তোর ঐ রুগীটাকে আজকে বলে দিস্, কি ক'রে ডাল-ছড়ানো তরকারী রাঁধতে হয়। ও তো এখন থাকবে এখানে কিছুদিন। তোকে বরঞ্চ আমি রোজ, এক একটা তরকারী কি ক'রে রাঁধতে হয় মুখস্থ করিয়ে দেব।"

এতক্ষণ পিলে থই পেল নতুন-দিদিমার অন্তরের। তিনিও বুঝলেন যে, পিলে ধরতে পেরেছে কেন পাতরঙ্গীকে গেরস্তবাড়ির রান্না শেখাতে তাঁর এত আগ্রহ। কিন্তু পরের দিন সকালবেলায় আর পাতরঙ্গীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সে ভেবেছিল একটা ইন্‌জেকসন নিলেই রোগ সেরে যায়। অতগুলো সূচ ফোটাতে হবে শুনে রাতারাতি পালিয়েছিল ভয়ে। সেইদিন থেকেই পাতরঙ্গীর নাম দিয়েছিলেন নতুন-দিদিমা 'সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগী'। কতদিন যে এ গল্প হয়েছে। 'সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগী' কথাটি উচ্চারণ করবার সময় দু'জনের চোখে-মুখেই হাসির ঝলক খেলে যায়। হাসির খোরাক নিশ্চয়ই, কিন্তু যে ডাক্তারের রুগী পালিয়েছিল, হাসির সঙ্গে তার মনের মধ্যে জড়িয়ে আছে আর একটি করুণ সুর।

যেদিন ডাল-ছড়ানো তরকারী রাঁধা শেখানর কথা হ'ল, সেই রাত্রে পিলে এক জায়গা থেকে রুগী দেখে ফিরছে ডিস্‌পেন্সারিতে। হঠাৎ নজরে পড়ল,—বাঙালী ভদ্রমহিলা না? ঘোমটা মাথায়। অল্প আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। চলন নতুন-দিদিমার মত লাগছে। বাজারের এই রাস্তার উপর দিয়ে তখনকার দিনে বাঙালী-বাড়ির মেয়েছেলেদের হেঁটে যাওয়ার ঠিক চলন ছিল না, স্থানীয় বাঙালী সমাজে, হয় গাড়িতে, না হয় রাস্তাটি ছাড়া অন্য কোন পথ দিয়ে যেতে হ'ত। সেইজন্যই

বাঙালী ভদ্রমহিলাটি পিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তার ডিস্‌পেন্সারির একটু আগে তিনি দু-তিন মিনিট দাঁড়ালেন পথের উপর।...দূরে গাছতলায় পাতরঙ্গী রাঁধছে।...রান্নার আগুনের আলো পড়লে কি হবে, তবু তার মুখের ধাঁচ-ধরন স্পষ্ট বোঝা যায় না এত দূর থেকে।...তারপর তিনি পথ দিয়ে এগিয়ে চলে গেলেন। পিলে ডিস্‌পেন্সারি হয়ে বাড়ি ফিরল। ঠিকই নতুন-দিদিমা এসেছেন তাদের বাড়িতে।—"গোকুল-পিঠে করেছিলাম। ভাবলাম দিয়ে আসি গিয়ে, খানকয়েক পিলের বউকে।"...

তিনি পিলের বাড়িতে আসেন মধ্যে মধ্যে ঠিকই; কিন্তু ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসা, এই প্রথম, আর বোধ হয় এই শেষ। অপ্রস্তুত হয়ে যাবেন ভেবে একথা পিলে কোনদিন জিজ্ঞাসা করেনি তাঁকে।...

'সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগী' কথাটির আরম্ভই শুধু ঐ হাসি দিয়ে। হাসিটুকু উভয় পক্ষের স্বীকৃত ইঙ্গিত তুলসীর কথা পাড়বার। সেখানকার কল্পিত জীবনযাত্রা গল্পের বিষয়বস্তু।...এ একেবারে তাঁদের গল্পের প্রাত্যহিক রুটিন।...এরপরই নতুনদিদিমা কথাচ্ছলে আনেন কেষ্টর কথা।.. আগে তিনি কেষ্টর কথা বলতেন না পারতপক্ষে; কিন্তু আজকাল তিনি বদলেছেন। আর কেষ্টর কথা উঠলেই সেই অনুষঙ্গে উঠতে বাধ্য তারাদার কথা—'এদের সংসারের' কথা। তারাদার বিরুদ্ধে বলা কথাগুলোর ঝাঁজ আগেকার থেকে বেড়েছে। খোলাখুলি ঝাঁজালো হককথা শোনাবার সাহস বাড়তে দেখে তারাদার বিরোধ আজকাল অন্য পথ নিয়েছে। সে আর আগেকার মত রূঢ়ভাবে চেঁচামেচি গালাগালি ক'রে সংসারের উপর নিজের প্রভুত্ব ফলায় না। বাড়ীতে সে কর্তৃত্ব জাহির করে মায়েব সম্বন্ধে একটা নির্বাক উদাসীনতা দেখিয়ে। নতুন-দিদিমার ভাষায়—"আছ, বেশ; না থাকলেও ক্ষতি ছিল না! বড়ি দিচ্ছ, বড়ি দাও; নীলের উপোস করছ, করো! কিন্তু একটা মানুষ যে আছে এ বাড়ীতে, তার অস্তিত্বটা পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় না। আচ্ছা বলো। একটা কুকুর-বিড়াল থাকলেও তো চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে লোকে!...সব জিনিসের একটা সীমা আছে বুঝেছিস! দেখে দেখে দেখে—আর পারি না! কখন যে কোন্ মতলবে চলে ও!...কপাল! নইলে একদিনের জন্যও কি ওরা আমার কাছে কেষ্টর থেকে অন্যরকম ব্যবহার পেয়েছে! ওদের জন্য কি আমি কিছু করিনি? কেষ্ট নামটা পর্য্যন্ত আমার রাখা নয়! আমার ইচ্ছা নয় যে ও নাম রাখি; কিন্তু গুটলি ঐ নামে ডাকে; সে আবার কি মনে করবে। সে যদি মনে করে যে নিজের মায়ের পেটের ভাই নয় ব'লে মা তাকে এই সামান্য অধিকারটুকুও দিল না! তটস্থ! আমার মত মায়ে কি যা মন চায় করতে পারে? কেউ যদি ভাবে যে মা নিজের অধিকার ফলাচ্ছে! পেটের ছেলেটাকে আপন ব'লে ভাবতে পর্যন্ত ভয় হয়, পাছে আবার কেউ আমার মনের কথা জেনে ফেলে ব'লে! কে কি ভাবল, কোন্ কাজটা কেমন দেখাল চব্বিশঘণ্টা যার এই ভয়, তার মধ্যের মানুষটা যে যায় পিষে।...আরে তোরা তো খেতে দাও, ব'লেই খালাস! যার ব্যথা সেই বোঝে। ওই যে সেই বলে না,—যাবে নিয়ে ঘর করনি সে বড় ঘরণী—তোদের হয়েছে তাই!...ছোটবেলা কেষ্ট, গুটলির কোলে-কাঁখেই থাকত। তোর পিসি-টিসি, পাড়ার আরও কত লোক আমাকে বলেছে যে, একাজ ঠিক হচ্ছে না—গুটলির একটু আলাদা-আলাদা থাকা ভাল।...কারও কথায় আমি কান দিইনি। কেবল ছোঁয়াচে কিনা জানি না! কিন্তু ভেবেছি, যা হয়েছে গুটলির তা যদি ভগবান কেষ্টকেও দেন, তাই হবে! বিধিলিপি কে খণ্ডাবে বল! কেষ্টতো তবু ছেলে—একটা কিছু ক'রেই নেবে; কিন্তু গুটলি যে মেয়ে। সারাজীবন যে ওর সমুখে পড়ে!...ওর কথা ভাবতে গেলেই বুকের ভিতর হিম হয়ে আসে।...আমার এসব কি তারার একদিনও নজরে পড়েনি? চোখ বুজে থাকত না কি সে সময়? ও আমার দিকের সম্বন্ধটুকু মুছে ফেলে দিতে চায় বুঝলি?...কেষ্টর চোখ খারাপ হয়েছে, চশমা নিতে হবে শুনে

সেবার তোর তারাদার প্রথম কথা কি জানিস্? বলে কি—আমার কিংবা বাবার তো কোনদিন চোখের দোষ হয়নি, কেষ্ট নিশ্চয়ই এ জিনিস পেয়েছে মামার বাড়ির দিক থেকে। শোন একবার কথা। আবার আমার সাতগুষ্টিকে টেনে নিয়ে আসিস্ কেন? তারার স্বভাবটাই ঐ রকম। চিরকাল। যার উপর ওর আক্রোশ, তার সব খারাপ। কোনদিন তার মধ্যে ভাল দেখতে পায় না কিছু। আমারই মত ওর বিষনজরে পড়েছিল সে ছেলেটা। গন্ধপাতার কথা বলছি। ও তোকে সেবার বলেছিল না যে দুনিয়াতে কেউ ওকে বিশ্বাস করেনি? এক ঐ সর্দার ছাড়া। কত বড় কথা। কম দুঃখে সে একথা বলেছে। শুনলেই বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। কি বলব। কথা তো মিছে নয়। এখানে কেউ ওকে বিশ্বাস করেনি। কত বড় অভিমান নিয়ে সে গিয়েছে, আমাদের সকলের উপর। তাই না ও আজকে বুড়ো সর্দারের কথা রাখছে। ছি ছি ছি। নাট-নাট্রীন সামলানো কি তোর কাজ? তুই হলি বামুনের ছেলে। পইতে-টইতে করে বোধ হয় টান মেরে ফেলে দিয়েছ না রে? হ্যাঁরে, নাটরা বলেছিলি হিঁদুও হয়, মোছলমানও হয়—ওরা মুর্গি টুর্গি নিশ্চয়ই পোষে বাড়িতে? নাটের গুরু নিত্যানন্দ। তুই বামুন হয়ে নাটদের জাতব্যবসা আগলাচ্ছিস। কপাল। কপালের লেখা ওর গান বাজনা। সেই ছোটবেলা থেকে। মনে আছেরে পিলে সেই 'দিয়ে করতালি নাচ হবি বলি'—গেয়েছিল গন্ধপাতা রায়বাহাদুরের মেয়ে শুভঙ্করীর বিয়ের দিন আজও স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসছে। মা সরস্বতী তোকে দিলেন লেখাপড়া, ওকে দিলেন গানবাজনা যাক্, তোর বেলাতো সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর কোঁদল নেই। বেশ রোজগার করছিস্, ঘরসংসার করছিস্, দিন দিন পশার বাড়ছে, কিন্তু গন্ধপাতাটা কি করল? তোদের ভাল দেখলেই আমাদের আনন্দ। হ্যাঁরে, তুই যে বলছিলি রায়বাহাদুরদের পুরনো গাড়িখানা কিনবি তা কি হ'ল?

"ওঁদের নতুনগাড়ি এলে তবে আমাকে দেবেন পুরনো গাড়িটা।"

"তোর মোটরে আমাকে চড়াতে হবে কিন্তু।"

"কিনে আগে নিজে চালাতে শিখব, তারপর আপনাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে নিয়ে আসব একদিন। এই রে! আর এখানে থাকা নয়। এরা সব এসে গেল দেখছি।"

এরা মানে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়ের দল। তুলসী চলে যাবার পর, তারাদার উপর রাগ ক'রে পাড়ার ছেলেমেয়েদের বছরখানেক বাড়িতে ঢুকতে দেননি তিনি। আবার করে থেকে যেন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এদের আসা-যাওয়া, নতুনদিদিমাকে ঘিরে খেলাধূলো গল্প করা। ঠিক সেই পিলেদের ছোটবেলাকার মত। গত কয়েক বছরে পিলের মনেও একটু পরিবর্তন হয়তো এসেছে। আজকাল পিসিমার বা অন্য কারও কাছে নতুন-দিদিমার গল্প করতে আর বাধো-বাধো লাগে না। আগে পাড়ার কোন ভোজে-কাজে অন্যান্য পরিচিতাদের মধ্যে তাঁকে দেখলে সে ভাব দেখাতে চেষ্টা করত যে, তাঁদের থেকে নতুন-দিদিমার সঙ্গে তার বেশী আলাপ নেই। এ ভাবটাও আজকাল কেটে-গিয়েছে। অপরের ভাল লাগানোটাকে বাড়াবার প্রয়াস আর নেই। তৃপ্তি ও ব্যথার, আনন্দ ও আশঙ্কার আলোড়ন বিক্ষোভ আর মনে জাগে না। তবু নতুন-দিদিমার কাছে পৌঁছরামাত্র মন অনাবিল আনন্দে ভরে ওঠে। তাঁর কথা শোনরামাত্র ছেলেমানুষদের প্রাণপ্রাচুর্য্য, তুচ্ছ জিনিসে আনন্দবিহ্বল হবার ক্ষমতা, বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া আরও অনেক মনের ভাব ফিরে পায়। সব সময় এই ভেবে তৃপ্তি পাওয়া যাওয়া যায় যে, তার এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবার নির্বিঘ্ন স্থান আছে। বাংলাদেশকে কোনদিনই সম্পূর্ণ জানতে পারবে না, তাই নতুন-দিদিমার আকর্ষণও কোনদিন যাওয়ার নয়। রহস্যভরা, নতুন-দিদিমাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা তার আজও ফুরল না। এখনও এইসব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হৈ চৈ করতে দেখে মনে হচ্ছে—তাঁকে চেষ্টা ক'রে বয়সের চেয়ে বড় দেখাতে হয়েছে চিরকাল ব'লেই কি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছেলেবেলায় ফিরে যাওয়ার—এদের সঙ্গে মিশে? সব চেয়ে আশ্চর্য যে আজও ছেলেপিলের দলকে নিয়ে নতুন-দিদিমাকে সেকালের মত মাতামাতি করতে দেখলে, অন্তরের গভীরে ঐ ছোটদের সঙ্গেও একটু রেষারেষি গোছের ভাব জেগে ওঠে। ওরে অর্বাচীনের

দল তোরা প্রত্যেকে গর্বে অস্থির যে নতুন-দিদিমা তোকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে! কতটুকু তোরা জানিস্? কে 'ফাস্ট', কে 'সেকেন' তার খবর রাখিস?...

নতুন-দিদিমা বললেন ঃ "উঠলি কেন পিলে?"

"আরে, আমরা এখন পচে গিয়েছি!"

পিলের কথার সুর নতুন-দিদিমা ধরতে পারেন। "পচলি আবার কিসে? আয় তুইও ব'স না কেন এখানে! ওরে তোরা—তোদের পিলেদা যখন ছোট ছিল, তখন এখানে একদিন কি করেছিল জানিস্? একদিন রেগে হুম্-ম্, এমনি মুখ ক'রে বসেছিল। আমি আদর ক'রে যত রাগ ভাঙ্গাতে যাই, তত আরোও চটে ওঠে। বলে, আমি হলাম পিঁপড়ে, আপনারা আমায় দেখবেন কি করে? আমি বুঝোই—তুই হলি প্রকাণ্ড হাতী, তোকে দেখতে পাইনি তা কি হয়? তবে পিলেবাবুর রাগ পড়ে।...কম জ্বালিয়েছে ও আমাকে!"...ছেলেপিলেরা হেসে আকুল। "ধেৎ! পিলেদা যে বড়! নতুন-দিদিমা চালাকি ক'রে বলছে রে।"

ছেলেপিলেদের মধ্যে যারা বড়, তারা পিলেদা সম্মুখে থাকার জন্য হাসিখুশীর স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়েছে।...

পিলে বেরুবার সময় সেই কজনের মুখ-চোখের দিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখল—। সলজ্জ পুলক-নিবিড় চাউনি তাদের। এদের মনেও সেই আলোকচোরা রাগিণীর মূর্ছনা লেগেছে!—এ রসের অতি সূক্ষ্ম ধারাও ভুক্তভোগী পিলের নজর এড়ায় না।...

পিলে দরজার বাইরে গিয়েও থমকে দাঁড়াল নতুন-দিদিমার কথা শুনতে পেয়ে।—"ওরে তোরা সাঁঝ-সেঁজুতি-সাঁঝের-বাতি জানিস? আমি একবার সেঁজুতিবেরতো করবার সময়, করেছিলাম কি..."

কেষ্ট পাশ ক'রে এসেই ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের ওভারসিয়ারের চাকরি নিল। এই নিয়ে তারাদার সঙ্গে খুব গণ্ডগোল। দাদা চটে আগুন; কিন্তু কেষ্ট কন্ট্রাক্টরের কাজ করবে না কিছুতেই; চাকরিই তার পছন্দ। কমলপুরে থাকতে হবে; এখান থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে। চাকরি-বাকরির সম্বন্ধে নতুন-দিদিমা ছেলেকে একটিও কথা বলেননি; তবু সে ঠিকেদারি করেনি। এইজন্য তাঁর আনন্দ রাখবার জায়গা নেই।..."ও কাজ ভদ্দরলোকে করে? যত সব বদ ছোটলোকদের নিয়ে কারবার। দেখেছি তো! কেষ্টটা মায়ের মন বোঝে। ওই চুপচাপ থাকলে কি হয়, বোঝে সব। চোখকান বুঁজে তো আর কেউ থাকে না। ঠিকেদারির কাজ না ক'রে, ও আমার মান রেখেছে। ও কি বোঝে না, কেন ওর মা নিজে হাতে তুলে ওকে খেতে দেয়নি কোনদিন। বড় ভাই পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ করে দিয়েছে সেই ঢের! এত নীচু মন যেন কখনও না হয়, যে জীবনে একটি পয়সাও সে আর এদের-সংসার থেকে নেয়। আমি শুধু এইটুকুই চাই! তোমরা শুধু বলো, যে সে বেঁচে বর্তে থাকুক!...তোর তারাদা খুব পয়সা রোজগার করুক! ভগবান করুন তারা যেন তার বাপের রাখা সম্পত্তি চারগুণ বাড়িয়ে ধনে-পুত্রে সুখী হয়ে ভোগ করুক! ঠাকুর জানেন, এ কথা আমি অন্তর থেকে বলছি কিনা।...এখন কেষ্টটা কমলপুরে কি যে করছে, কি যে খাচ্ছে তাই ভাবি। মেসে হোস্টেলে ছিল কি ক'রে জানি না। এখনও যে ও ছেলে পাটির উলটো সোজা চেনে না!...হ্যাঁরে, তোর আপনার-লোক-তারাদা কেষ্টর কমলপুর যাওয়া নিয়ে কিছু বলছিল না কি রে তোকে? নিশ্চয়ই বলেছে,—তুই হলি ওর বিশ্বাসের লোক আজকাল।...আচ্ছা বলিস না!...আর আমি তারার রাগকে ভয় করি না। সেদিন আমার চলে গিয়েছে! অনেক সহ্য করেছি! তিল তিল করে!...কেষ্টটাকে যাওয়ার সময় বলে তো দিয়েছি যে নদীর জল যেন না খায়। তোর সেই সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগী বলেছিল না যে কমলপুরের জল খেলে গলগণ্ড হয়? মাইল চারেক দূরে হবে সরসৌনি থেকে কমলপুর না রে?...থানা সবরেজিষ্ট্রি

অফিস যখন আছে তখন কমলপুরের হাট-বাজার ভালই হবে কি বলিস?...তবে সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগীর তো কথা! ও পদের মেয়েরা যদি বলে পুবে যাচ্ছি, তবে যায় পশ্চিমে! বদ সব!...তবু ভাল যে কমলপুর নামটা খারাপ না। নইলে কি যে সব নামের ছিরি এদেশে! দ্যাখতো! সরসৌনি-বিজুনিয়া! প্রকাণ্ড বড় মন্তরের মত নাম! এ নামের কোন মানে হয়? বড় নাম থাকবে না কেন, আমাদের দেশেও আছে। চড়াইকোল—পাঁচুখালি— সে নামের একটা তবু মানে বোঝা যায়! যেমন সব গাঁ, তেমনি তার নাম!...পিলে! তোর সেই সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগীর অনেকদিন কোন খোঁজ খবর নেই না রে?"...

সত্যিই পাতরঙ্গী সেই যে ইন্‌জেকশনের ভয়ে পালিয়েছিল, আর তার কোন খবর পাওয়া যায়নি।

পাওয়া গেল এ-কথার অনেক দিন পর। হঠাৎ। সরসৌনিতে ডেকে পাঠিয়েছে পাতরঙ্গী ডাক্তার সাহেবকে। সরসৌনির একটি ছেলেকে পাঠিয়েছে। পাতরঙ্গী নিজেই আসত, কিন্তু ডাক্তার সাহেবের দোস্তের অসুখ যে খুব বেশী। তাকে ফেলে আসে কেমন করে? বহু চিকিৎসা করিয়েছে। বিজুনিয়ার বৈদজীকে দিয়ে পর্যন্ত দেখানো হয়েছিল। তাঁর দেওয়া অত ধকওয়ালা ওষুধ—তাতে পর্যন্ত কোন কাজ হয়নি। তার চেয়েও জোরালো ওষুধ যেন ডাক্তার-সাহেব নিয়ে আসেন আসবার সময়। খবর পাওয়া মাত্র চলে আসতে বলেছে।...

তুলসীর অসুখ!

"কি অসুখ?"

ছেলেটা বলে "বায়ু উপড়ে গিয়েছে।"

যে কোন কঠিন রোগকে এদেশের লোকে বলে বায়ু উপড়ে যাবার রোগ।

"কতদিন থেকে জ্বর হচ্ছে বাবুর? তিন চার মাস?"

"হ্যাঁ"

"সাত আট মাস "

"হ্যাঁ তা হবে বইকি! কবে থেকে দেখছি বৈদজী আনাগোনা করছে। শীতকালে মেলার সময়ও বাবুজী যেতে পারেনি।"

এ লোকের কাছে রুগীর সম্বন্ধে কোন খবর জিজ্ঞাসা করা বৃথা! অসুখ নিশ্চয়ই খুব কঠিন! নইলে কি আর তাকে ডেকে পাঠিয়েছে? তুলসীকে হয়তো পাতরঙ্গী জানায়নি তাকে ডাকবার কথা। জানতে পারলে তুলসী কখনই রাজী হ'ত না—চেনা আছে তো তাকে!...সরসৌনিতে যাওয়ার আগে একবার নতুন-দিদিমাকে একথা না ব'লে যেতে পিলের মন সরে না।...হয়তো তিনি একটু বেশী উতলা হয়ে পড়বেন। কিন্তু উপায় কি! তুলসীর অসুখের খবর কখনও তাঁকে না দিলে চলে?...

তারাদাদের বাড়ি, অষ্টপ্রহর হট্টগোলের বাড়ি। সেখানে একটু থমথমে ভাব দেখলেই বুঝতে হবে যে বাড়ির আবহাওয়া স্বাভাবিক নেই।...ঠিক যা ভেবেছে!...

গুটলিদি ঠাকুর ঘরের বারান্দায় চুপ করে বসে; তারাদার বউ ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায়; তারাদা আর নতুন-দিদিমা নিজের নিজের ঘরে।...সব চুপচাপ। পিলে যাওয়াতে কেউ কোন কথা বলল না। কেবল তারাদার বউ মাথার কাপড় একটু টেনে দিল মাত্র।...ব্যাপার তাহ'লে সাধারণের চেয়ে গুরুতর।...নতুন-দিদিমা ঘরের মেঝেতে শুয়েছিলেন, পিলে ঢোকায় উঠে বসলেন।...মেঝে ভরা কাপড়-চোপড় ছিটানো। বাক্স পেঁট্‌রার ডালা খোলা।...তুলসীর অসুখের কথাটা পাড়তে হবে একটু গুছিয়ে ভেবে চিন্তে!...কিন্তু সে সুবিধা পাওয়া গেল না।

"কে? পিলে? ব'স!"

তারপরই আরম্ভ হয়ে গেল পুরনো কাহিনীর সবচেয়ে নতুন অধ্যায়।

"তারার বউয়ের ঐ একটিইতো ছেলে। তারপর পর পর দুটো নষ্ট হয়ে গেল,—সেতো তুই জানিসই। আমরা পোয়াতির ভাল ক'রে দেখাশোনা করতে পারি না, না কি ভাবল তারা, তা' সে-ই জানে। এবার বউকে পাঠিয়েছিল বাপের বাড়িতে তার মায়ের কাছে। আমাদের কারও কাছে জিজ্ঞাসাও করে না, বলেও না। বলবেই না কেন? মাও যা ঘটিও তাই। তা' এবারকারটিও তো গেল। তারার শাশুড়ী ব'লে দিয়েছেন মেয়েকে এবার একটা জগৎ ঠাকরুণের কবচ ধারণ করতে— খুব না কি জাগ্রত। জগৎঠাকরুণ আমার মাথায় থাকুন—তাঁকে প্রণাম করছি, তিনি যেন আমার দোষ না নেন। কিন্তু সেই কবচের ব্যাপার দিয়ে তোর তারাদা' আজ আমায় কি বলল শুনেছিস? সক্কাল বেলা দেখি আমার ঘরে ঢুকেছে। একটু যেন ভক্তিতে গল গল ভাব। পূবের সূর্য পশ্চিমে উঠেছে দেখছি আজ। কি ব্যাপার? বলল—একটা কথা বলতে এসেছি, শাশুড়ী খবর পাঠিয়েছেন ওর একটা কবচ ধারণের কথা। আমি বলি—সে তো ভাল কথা, তা তুই শাশুড়ী বলছিস কেন? মা বল। আমাকে না হয় মা না বললি তাঁকে তো বলতে পারিস। আমার সমুখে লজ্জা করছে বুঝি বলতে? অন্ধের কিবা রাত্রি, কিবা দিন। আর আমি তারার সঙ্গে পুতুপুতু ক'রে কথা বলি না, সেদিন আমার গিয়েছে। তারা সে কথার জবাব না দিয়ে বলে –জগৎঠাকরুণের কবচ মায়ের গায়ের সোনা দিয়ে তয়ের করাতে হয়। শুনেই আহ্লাদে নেচে উঠল বুক আমার। প্রাণভরা মা ডাক না দিক, তবু তো তারা ঘুরিয়ে আমায় মা বলেছে, আমার সম্মুখে। মা ব'লেতো কোনদিন ডাকে না, ওই ঠেলামারা ঠেলামারা অন্য কথাটথা দিয়ে কোনরকমে কাজ সারত আগে। তারপর আজকাল তো কথাটথা সব ঘুচেই গিয়েছে। বললাম—সেকথা তো কাল গুটলির মুখে শুনেছি। গুটলিকে দিয়ে তো কাল বলিয়েছিলি একটু সোনা দেবার জন্য। আমার গায়ের সোনা ছিলও তো ভারি। কত না তোর বাবা আমায় গহনাগাটি কিনে দিয়েছিল? যাও ছিল, তার থেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গেইতো দেওয়াথোওয়া, সাধ আহ্লাদ, লোক লৌকিকতা সব করতে হয়েছে এতকাল। আমার তো অন্য তালুক মুলুক নেই। এইতো তোর ছেলেকেই তো ভাতের সময় চেনহার গড়িয়ে দিয়েছিলাম। তার তো আর এখনও হার গলায় দেবার বয়স নেই। সেইটা থেকেও খানিকটা সোনা তো নিতে পারতিস। কতটুকুই বা সোনা লাগে একটা কবচ করতে। কালকে তো আমি ব'লেই দিয়েছিলাম গুটলিকে যে আজ বার ক'রে দেব খুঁজে পেতে একটু সোনা, ঐ কবচের জন্য। গুটলি বলেনি? থাকবার মধ্যে আছে তো চুড়ি ক'গাছ। তারই একগাছা নে না হয়। দাঁড়া, আলমারিটা খুলি। তুই মুখ ফুটে চাইলি, আর তোকে দেব না? বউমার মঙ্গল হবে, ঠাকুরদেবতার ব্যাপার, এর জন্যও দেব না তো, কেন রেখেছিলাম সোনাটুকুকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে?

তারা গম্ভীর হয়ে বলে ঃ না, ওতে হবে না।

—কেন হবে না শুনি? একটা কবচ করতে আবার কত সোনা লাগে যে একগাছা চুড়িতে হবে না? তারা জবাব দিলে কি জানিস?—মা, তা নয়, সেখান থেকে বলে দিয়েছে যে, নিজের মায়ের গায়ের সোনা দিয়ে কবচ করতে হবে।

ছেঁকা লাগবার মত ছ্যাঁৎ ক'রে লাগল কথাটা বুকে।—ও আমার কপাল। নিজের মা? আমি যে হ'লাম পরের-মা? আমার গায়ের সোনার দরকার নেই, দরকার ওর নিজের-মায়ের গায়ের সোনার। ঘেন্নায় মরে গেলাম—নিজের উপর। ছি। ছি। ছি। কি নিয়ে আছি এদের বাড়িতে। নিজের মা। কি খারাপ কথাটা। গুটলিকে বোধ হয় বলেছিল তারা পরিষ্কার করে কথাটা আমায় বুঝিয়ে বলতে, গুটলি পারেনি লজ্জায়, তাই তারা নিজেই বলতে এসেছে। বুক একেবারে ভেঙ্গে গেল। বেশ। পরের-মা তো আছিই। কিন্তু তাই ব'লে কি উঠতে বসতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, যে এই হচ্ছে পরের-মা, এই হচ্ছে পরের-মা? জগৎঠাকরুণ নিজের-মা, পরের মা শেখান না কি? তারা আমাকে পরের মা বলেছে। কথাটা তো মিথ্যে নয়। কিন্তু মনের দুঃখে তারার কথার আসল

মানে এতক্ষণ ধরতে পারেনি। হঠাৎ খেয়াল হ'ল।...তাই তো! তারা নিজের-মায়ের গায়ের সোনা আমার কাছে চাইল কেন? ওর নিজের-মায়ের গয়নাতো আমি একদিনও ব্যবহার করিনি। সে সব তো 'বাড়ির-মানুষের' সিন্দুকে ছিল। তাই দিয়েই তারার বউকে দেওয়া হয়েছিল গহনা গড়িয়ে, বিয়ের সময়।...কি করেছে কে জানে...তারাকে বললাম সে কথা। তারা বলে কি—হ্যাঁ সেগুলোর সঙ্গে আরও সাতরকম বাইরের সোনাটোনা মেলানো হয়েছিল কি না, তাই তোমার কাছে চাইছি—যদি কিছু থাকে আলাদা করা। চাও তো আমি তার দাম দিয়ে দেব।...শোন একবার কথা! আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল।...এত বড় কথা! কি, বলতে চাস কি? তোর নিজের-মায়ের গহনা আমি চুরি করেছি? দেখিস্ না আমার সর্বাঙ্গ গহনায় ভরা? ভগবান শাঁখা রাখবার বরাতটুকু দিয়েও যদি পাঠাতেন পৃথিবীতে তবু না-হয় বলতিস! আমাকে দাম দেখাতে এসেছিস তুই? আমি করব গহনা চুরি? বলছিস না? আবার কি ক'রে ব'লে লোকে? তোর নিজের-মায়ের গহনা আমি একদিনও ছুঁইনি—শুধু এইসব কথা ভেবে, বুঝলি? পাছে যদি তুই কিছু মনে করিস কোনদিন। সেই অপবাদই তুই দিলি শেষ পর্যন্ত! সে গহনা কিসের জন্য রাখব? কেষ্টর বউকে দেবার জন্য? তেমন ছেলে কেষ্ট নয়, বুঝেছিস! সে এক পয়সাও তোদের সংসার থেকে নিতে আসবে না কোনদিন, এ জেনে রেখে দিস্! আর সে মন থাকলে, আমি অনেক কিছু করতে পারতাম, বুঝলি। আবার বলছিস্ আমি সামান্য কথাকে বড় করছি? সামান্য কি? তোর নিজের-মায়ের গহনা নেবার অপবাদটা হ'ল সামান্য কথা? আবার চোখ রাঙাচ্ছিস্ কি! তোর চোখ-রাঙানিকে ভয় করবার দিন আমার চ'লে গিয়েছে! কি? ধ'রে মারবি না কি? তা হলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়! এই নে ফেলে দিলাম আমার চাবি! প্রত্যেকটা বাক্স, পেঁটরা, আলমারী খুলে হাঁটকে দেখে নে—তোর নিজের-মায়ের কিছু আছে কিনা! দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ কেন? খোল্। দ্যাখ্! আচ্ছা তুই না খুলিস্ আমি খুলে দিচ্ছি!—এই দ্যাখ্!—এই দ্যাখ্!—এই নে! নিজের কি পরের-মায়ের জিনিস দেখে নে...ঘেন্না ধ'রে গেল নিজের উপর! আছি শুধু গিলতে! আগে তারার বাবার খেতাম, এখন খাই তারার! কি লজ্জার কথা! আমি নিয়েছি তোর নিজের-মায়ের গায়ের সোনা! যে ক'টা দিন ভগবান গায়ে সোনা রাখবার কপাল দিয়েছিলেন, সে ক'দিনই কত সোনাদানা গায়ে দিতাম, দেখিস্ নি? জ্বলে পুড়ে মলাম, সেই এ বাড়িতে ঢুকবার দিন থেকে! কেন যে ঠাকুরদেবতারা এ নিয়ম ক'রে গিয়েছিলেন!..."

এরকম ঝগড়াঝাঁটি পিলে এ বাড়িতে আগেও বহুদিন দেখেছে। এত কথা তার এখন ভাল লাগছে না। যে খবরটি দেবার জন্য সে এসেছে, নতুনদিদিমার কথার স্রোতে বাধা দিয়ে, সে কথাটি বলতেই হ'ল। তিনি চমকে উঠলেন।

—"তাই বলো! আমি ভাবছি পিলে হঠাৎ অসময়ে কেন? একটা কি যেন হবে, কি যেন হবে ভেবে কাল থেকেই আমার মনটা চঞ্চল হ'য়েছে! হ্যাঁরে অসুখ কি বেশী?"

"যা খবর পেয়েছি তা' তো বললাম।"

"কিছু খারাপ টারাপ নয়তো।"

"না দেখে কি ক'রে বলি!"

"তুই চেপে যাচ্ছিস্ আমার কাছে?"—তিনি পিলের হাত চেপে ধরেছেন।

"চেপেই যদি যাব, তবে খবর দিতে এলাম কেন? না এলেও তো পারতাম।"

"অতশত তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারব না। ডাক্তারের মন কি বলছে? ভাল না খারাপ?—আছে তো সব জিনিসেরই একটা...।"

"ওদের কথা থেকে কি রোগের কিছু বোঝা যায়?"

"তা' হ'লে?"

কে জবাব দেবে এ কথার! জবাব নতুন-দিদিমা চানওনি। উদ্বেগবিহ্বল মন নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করছে; দিশেহারা হ'য়ে পথ খুঁজছে।...দু'জনেই নির্বাক—অনেকক্ষণ ধ'রে।...

"আচ্ছা আমি আগে দেখে তো আসি সরসৌনি থেকে।" আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ দু'জনেই।...তারপর নতুনদিদিমা বললেন ঃ

"তুই নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছিস্ তো? আমাকেও ঐ সঙ্গে পৌঁছে দে না কেন কমলপুরে?"

"যেতে হ'লে তারাদাকে একবার বলতে তো হয় আপনার?"

"কিছু দরকার নেই! তোর ইচ্ছা হয়, বল গিয়ে! আমি আর কোনদিন কারও হুকুম নিয়ে চলব না এদের-সংসারে!"...

নতুন-দিদিমা মনস্থির ক'রে ফেলেছেন।...জীবনে ন্যায্য স্বীকৃতি পান নি তিনি। অবিচারের সঙ্গে আপসে মিটমাট ক'রে নেবার চেষ্টা করেছেন সারা জীবন। কিন্তু আর গোঁজামিল চলে না। এতদিনে প্রতিবাদের চরম মুহূর্ত এসেছে!. এখানকার দুঃসহ আবহাওয়া থেকে তিনি মুক্তি চাইছেন।...কার কি মনে হবে, না হবে সে জানে না; তবে পিলের নিজের ভাল লাগবে না--খালি খালি লাগবে। তাঁর কাছাকাছি থাকবার জন্যই সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা, বাংলা দেশের গ্রামে গিয়ে ডাক্তারি করবার বাসনা ছেড়েছিল।...কিন্তু তিনি তো পিলের কথা একটুও ভাবলেন না এখন!...

নতুন-দিদিমা বোধ হয় পিলের মনের ভাব বুঝলেন।—"এ সবের পরও কি তুই আমাকে এখানে থাকতে বলিস্? ভাবছিস কেন? যখন ইচ্ছা হবে আমার কাছে চলে যাবি। দেখা ক'রে আসবি। তোরা তো আর মেয়েমানুষ না। বেটাছেলের আবার ভাবনা যাওয়া-আসা নিয়ে! নিজের গাড়ি। হুট্ ক'রে চলে যাবি, যখন মন চায়।...চোখ ছলছল করবে কেন—বেটাছেলে তুই!"...

পিলে বলতেই তারাদা রুখে জবাব দিল—"কেউ যদি কলমপুর যেতে চায় তো আমি কি তাকে আটকে রেখে দেব?"

হ'ক রাগের কথা। তারাদাকে না ব'লে নিয়ে যাওয়ার কুণ্ঠা পিলের কেটে গেল।

বাড়িশুদ্ধ কেউই তৈরি ছিল না এর জন্য। সকলেরই যেন আর একটু ভাববার সময় পেলে সুবিধা হত। স্নানাহ্নিক পর্যন্ত নতুন-দিদিমার তখনও হয়নি যে গুটলিদি তাঁকে কিছু খাইয়ে দেবে বেরুবার আগে।

নতুন-দিদিমা কাঁদছেন; গুটলিদি কাঁদছে; তারাদার বউ কাঁদছে। চাকর, ঠাকুর, দাই, নির্বাক বিস্ময়ে দেখছে এইসব, রান্নাঘরের বারান্দা থেকে।...এত বড় কাণ্ড বাড়িতে। মা স্বেচ্ছায় তাদেব ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কেষ্টর কাছে—সঙ্কোচকাতরতায় গুটলিদি, তারাদার বউ কেউ বারণ করতে পারে না। গুটলি এঁকে নিজের-মা বলেই জানে; তারাদার বউ এঁর কাছ থেকে নিজের শাশুড়ীর মতই ব্যবহার পেয়েছে; তবু তাদের নতুন-দিদিমাকে কিছু বলতে বাধে। বাইরের ছেলেমেয়েদের যেটুকু অধিকার আছে, অন্য মায়ের ছেলেমেয়েদের সেটুকুও বুঝি নেই!—উনি যে কেষ্টর দাবীকেই উঁচুতে মনে করছেন—তাই গুটলিদির পর্যন্ত কুণ্ঠা এসে যাচ্ছে।...নতুন-দিদিমা কি তাদের দিক থেকে জিনিসটাকে কখনও ভেবে দেখেছেন?...পিলে এখনও তাঁর 'সাইড'এ। তবু একথা না ভেবে পারে না।..

নতুন-দিদিমা ডাকলেন ঃ "রামশরণ, কোদালখানা নিয়ে আয়তো। ইঁদারার ধারের ক্কাবলে কলার ঝাড়টা কেটে ও জায়গাটা পরিষ্কার ক'রে দে! শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিস্, নইলে ও গাছ আবার হবে!"

...নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক, গন্ধপাতার চিহ্ন 'এদের-বাড়ি' থেকে!...

এত মনের জোর তিনি হঠাৎ পেলেন কি ক'রে?...

দুখান থান ধুতি, দুখান মটকার কাপড়, পিলের দেওয়া কবিকঙ্কণ চণ্ডী, তুলসীর মায়ের মহাভারতখানি, তিনি গামছায় বেঁধে নিলেন।...পিলে দেওয়ালের ঐ শিবের মুখোশটা পেড়ে দিস্ তো! গুটলি এক ঘটি গঙ্গাজল দিবি গাড়িতে, মনে করে!...কি হবে বেশী জিনিসপত্র নিয়ে!...

বোঝা গেল, তিনি 'এদের-সংসারের' আর একটিও জিনিস নিতে চান না। তারাদার বউ কিছু ফলমূল এনে দিল গুটলিদির হাতে গাড়িতে দিয়ে দেবার জন্য—কি জানি ঠাকুরপোর ওখানে একেবারে খবর না দিয়ে যাওয়া!...

যত মনের জোরই থাক, নতুন-দিদিমার চোখের জল বাধা মানছে না। 'এদের-সংসার' হলে কি হয়; এরওতো অজস্র মিষ্টি বাঁধন আছে! সবটুকুই কেবল কর্তব্য আর শোভন-অশোভনের বাঁধন নয়। কোন সুখের স্মৃতিই কি তার জড়ান নেই এখানকার সঙ্গে?...কেষ্ট হয়েছে এই বাড়িতেই।...এই তুলসীতলাতেই 'বাড়ির মানুষকে' নামানো হয়েছিল...এই কামিনী গাছ নিজে হাতে লাগানো।...ঠাকুরঘরে ঠাকুর থাকলেন। আরও কত কি, কত কি!...এসব ছেড়ে যাওয়া কি সোজা কথা!...এই উঠনটুকুর মধ্যেই তাঁর এত বড় জীবনটা কেটেছে।...

শেষ মুহূর্তে বোধ হয় তাঁর মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠেছে। ঠাকুরঘরের প্রণাম সেরে তিনি এলেন বউমার কাছে। তারাদার বউ প্রণাম করল। সে আজকের কাণ্ডের জন্য নিজেকে দোষী মনে করছে; তার বাপের বাড়ির বলা কবচের জন্যই তো এত গণ্ডগোল!...''কেঁদো না বউমা! দরকার পড়লেই আবাব আমি আসবো।''...গুটলিকে নিয়েই তাঁর যত ভাবনা!—একদিনও সে মাকে ছেড়ে থাকেনি।..এই উঠনে প্রথম দিন ঢুকে সেই এতটুকুনি গুটলিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন!...''গুটলি, তোকে নিয়েই আমার যত ভাবনা। তোকে কি কখনও আমি ফেলে যাই। এখানে ঠাকুর থাকলেন—একজন কারও না থাকলে কি চলে? সেখানে গিয়ে, ঠাকুর থাকবার মত একটা ঘর টর ক'রে নিই আগে। তারপর তোকে নিয়ে যাব। নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। কাঁদিস্ না।''.....

পিলে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

সুরকিকোটা বুড়ী দুখিয়ার-মা লাঠিতে ভর দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আসছে। হাতে একটা মাটির হাঁড়ি। বামশরণের কাছে শুনেছে মাইজীব চলে যাবার কথা। নতুন-দিদিমার কাছ থেকে বহুকাল আগে গোটাকয়েক টাকা ধার নিয়েছিল। কিছু কিছু শোধ দিয়েছে মধ্যে মধ্যে। যতবার একটা ক'রে টাকা দিয়েছে ততবার একটি পাটের দড়িতে একটি ক'রে গিঁঠ দিয়ে রাখত। দড়িটা অনেক দিন থেকে এই হাঁড়ির মধ্যে রাখা ছিল। মাইজী চলে যাবেন শুনে সেইটার কথা মনে পড়ে। নামিয়ে দেখে যে পুরনো দড়িটি পচে না পোকা লেগে একেবারে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। মাইজীর বীরতো শোধ দেওয়াই হ'ল না—হিসাবটা পর্যন্ত থাকল না!...এ কি করলেন ভগবান!...এখন জন্ম জন্ম তাকে নরকে পচতে হবে!...সে তো মাইজীকে ফাঁকি দিতে চাযনি, তবু কেন এমন হ'ল!...বিশ্বাস করুন মাইজী!...

নতুন-দিদিমা ইশারা ক'রে কালা বুড়ীকে বুঝোতে চেষ্টা করলেন—সে যেন ও টাকার কথা না ভাবে। সব তিনি পেয়ে গিয়েছেন।

কি বুঝল না বুঝল সে-ই জানে। অবুঝ বুড়ীর অবিরাম কান্না ও চেঁচামেচি পিছনে ফেলে গাড়ী চলল।...

...দুখিয়ার মাও খাপ-খাওয়াতে পারছে না নিজেকে, পুরনো-গ্রন্থি হারানোর সঙ্গে।...এত সাহস নতুন-দিদিমা পেলেন কি করে? পিলের সাহস তো দিন দিন কমছে। এখন কি সে গ্রীষ্মের রাত্রে ঐ কাঁঠালগাছতলার ভাঁটবনে বসে থাকতে পারে? সাহস নেই ব'লেই জীবনে যা কিছু তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করে সে।...আগে কতবার শুনেছে নতুন-দিদিমার মুখে যে কাশীতে গিয়ে থাকবার বাসনা তাঁর।...সে সব বাজে কথা। কমলপুরই কি তাঁর কাশী? কেষ্টকে নিয়ে থাকাই তাহ'লে তার জীবনের একমাত্র কাম্য! সঙ্কোচে বলতে পারেননি সে কথা কারও কাছে।...নিজের সংসারে নিজের মত ক'রে থাকতে চান;—যেখানে তাঁর উপর কথা বলবার কেউ নেই; কে কি মনে করল এ কথা ভাববার দরকার নেই কোন বিষয়ে; যেখানে বউ এসে জিজ্ঞাসা করবে মা আজ কোন তরকারি কুটবো; যেখানে কাশী যাবার কথা তুললে ছেলে অভিমান করবে; দ্বাদশী সকালের ফলমূল নিজে

মনে ক'রে কিনে এনে রাখবে আগের দিন; সেই অনাস্বাদিত স্বর্গ তিনি গড়ে তুলতে চান কেষ্টকে নিয়ে।...

হিংসা হয় কেষ্টর উপর।...সে তো কোনদিন ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না!...আজ হঠাৎ কেষ্ট কি ক'রে 'ফাস্ট' হয়ে যাচ্ছে? অন্যায় কথা না? বিনা নোটিসে তুলসী পিলেকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে!...এ নীচে নামায় মান অপমানের প্রশ্ন নেই; কিন্তু ব্যথা আছে; অভিমানের বেদনা আছে; স্মৃতি রোমন্থন ক'রে পক্ষপাতহীন বিচারের প্রয়াস আছে!...চিরকাল সে 'সেকেন!...এখন বোধ হয় কেষ্ট 'ফাস্ট', পিলে 'সেকেন'।

তুলসীর অসুখের কথা পিলের কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুহূর্তের মধ্যে।

নতুনদিদিমাও নিশ্চয়ই কত কি ভাবছিলেন। ডাকলেন ঃ 'পিলে! কেষ্ট আমাকে লেখেনি তার কাছে যেতে। তবু যাচ্ছি!...ওমা! গঙ্গাজল যে উছলে উছলে পড়ছে ঘটি থেকে!"

কি যেন বলতে গিয়ে বললেন না নতুন-দিদিমা। পিলে সম্মুখে বসে গাড়ী চালাচ্ছে! পিছনের সিটে নতুন-দিদিমা। আবার অনেকক্ষণ পর বললেন ঃ "মনের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে কেষ্ট কোনদিন আমার উপর কোন কথা বলবে না। এ বিশ্বাস কোনদিন পাইনি 'এদের-সংসারে'।"...

আবার কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করেন... "কমলপুর কতদূর রে আর?"

"মাইল পাঁচ ছয় হবে।"

জোর ক'রে আনা স্থৈর্য আর টিকলো না—"ওমা! সরসৌনি তাহ'লে এসে গেল যে! তাই না? চার মাইল দূরে বলেছিল না 'সরসৌনি-বিজুনীয়ার রুগী'? গ্রামের বাইরেই গাড়ী থামাস!"

অবাক হয়ে গেল পিলে।

"আমি ভাবছিলাম, আপনাকে আগে কমলপুরে পৌঁছে দিয়ে, তারপর আবার সরসৌনিতে ফিরে আসব!"

"কি যে তুই বলিস!"

পিলে অপ্রতিভ হয়ে গেল।—"না না, আমি ভেবেছিলাম কি না যে আপনি নাটনাট্টীনদের বাড়ি যাবেন না, তাই..."

"যাব তো না-ই! কে বলল আমি যাব? ঐ সব ছত্রিশ জাতের অনাচার মনাচারের মধ্যে আমি গেলাম আর কি! বদ সব! ওর মধ্যে যাব আমি? কি যে বলিস! কি যে ভাবিস!"

সত্যিই পিলে এখনও ঠিক ধরতে পারেনি তিনি কি করতে চান। সে গাড়ী থামাল। গঙ্গাজলের ঘটি আর মটকার থান নিয়ে নতুন-দিদিমা গাড়ী থেকে নামলেন। প্রশান্ত আত্মবিশ্বাসের দ্যুতি তাঁর মুখে চোখে।

"আমি ততক্ষণ দেখি যদি আহ্নিকটা সেরে নিতে পারি এই গাছতলায়। তুই গ্রামের মধ্যে গিয়ে গাড়ীতে ক'রে গন্ধপাতাকে নিয়ে আয়। সেখানকার কাপড়চোপড় পরিয়েই আনিস না যেন! গাড়ীর মধ্যে থানধুতি আছে আমার। তারই একখানা পরিয়ে আনিস! দেখিস, ছিষ্টি ছুঁয়ে একাকার করিস না। এখানে এলে আমি গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেব। বলিস আমার কথা!...দুর্গা! দুর্গা!...বলবি যে তাকে যেতে হবে কমলপুরে। খুব সাবধানে আনবি—যা রাস্তা! ওদের কাউকে আবার সঙ্গে টঙ্গে নিয়ে আসিস না যেন! বদ সব। গন্ধপাতাকে বলিস্, আমি নিতে এসেছি।"...

পিলেকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। মুহূর্তের মধ্যে চিরকেলে 'সেকেন' পিলে, 'সেকেন' থেকে 'থাড়'এ নেমে গেল!...তুলসী ফাস্ট, কেষ্ট সেকেন, পিলে থাড়!...

পাতরঙ্গীর বাড়ির কাছাকাছি গাড়ী থামতেই হেসে এগিয়ে এল সে ডাক্তার-সাহেবকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য! হীরাধারের উপরেই বাড়ি। পাতরঙ্গীরা গরীব তা পিলে জানত, কিন্তু এত গরীব

তা' বুঝতে পারেনি আগে। আর ঘর দুয়োর কি নোংরা! নাচগান যাদের জীবিকা, তাদের বাড়িঘর এর চাইতে পরিষ্কার হবে আশা করেছিল পিলে।...বারান্দার উপর থেকে মুর্গিটাকে তাড়িয়ে দিল পাতরঙ্গী ডাক্তারসাহেবের খাতিরে।...ভাগ্যে নতুন-দিদিমা আসেননি!...দড়ির খাটিয়ায় তুলসী শুয়ে। খাটিয়ার পায়ার সঙ্গে একটা রামছাগল বাঁধা।...তুলসী অসম্ভব রোগা হয়ে গিয়েছে! কোটরের মধ্যে থেকে চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।...জ্বর আছে।...

"আয় পিলে! পাতরঙ্গী ডাক্তারসাহেবকে একটা কিছু দে বসবার জন্য।"

"না না ঠিক আছে।"

পিলে তুলসীর খাটিয়াতে ব'সে তার জ্বর কত দেখল।

"রামছাগলের বোটকা গন্ধটা হিঙের মত, না রে তুলসী?"

তুলসী হাসল।—"ঠিক বলেছিস।"

পাতরঙ্গী শুধু বুঝল যে, রামছাগলটার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

"রামছাগল বেঁধে রাখতে বলেছে বিজুনিয়ার বৈদজী। এর গন্ধে অসুখ সারে।"

একথারও জবাব পিলে দেয়, তাদের গুপ্তদলের সাঙ্কেতিক ভাষায় ঃ "বৈদজী তো আমার বৈদজীই! এ সব রোগা ছাগলে হবে না। আরও তেজীয়ান তেজীয়ান ছাগল এনে বাঁধতে, তবে না রোগ সারত!"

পিলে হাসছে; তুলসীও হাসছে। আনন্দ কৌতুকের দীপ্তি লেগেছে তার রুগ্ন মুখচোখে। সে বুঝতে পারছে যে পিলে সেই আগেকার মত নতুন-দিদিমাকে নকল ক'রে কথা বলছে।

"রোগ আর সারছে কই! কি চেহারা ছিল আর কি হয়েছে দেখছেন তো। কত ওষুধ, কত চিৎসা হ'ল। দিনদিনই খারাপ হচ্ছে! দিনদিনই খারাপ হচ্ছে! আমার দোস্ত মরদ। ও ভয় পায় না আমার মত সূচ ফোটাতে। আমি আর থাকতে না পেরে আপনাকে খবর দিলাম। খুব ধকওলা ইনজেক্‌শন দিন আপনার দোস্তকে ডাক্তারসাহেব।"

রুগীকে কেমন দেখলেন একথা ডাক্তারসাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে পারছে না পাতরঙ্গী ভয়ে। হাওয়াগাড়ীওলা এত বড় ডাক্তারসাহেব রুগীকে ছুঁয়েই রোগ অর্ধেক সেরে যাবে। তবু ভয়ে কাঁপে মন—যদি...

তুলসীই কথা বলল। "শিগ্‌গিরই সেরে ওঠা, কিংবা একটা কিছু এসপার ওসপার হয়ে যাওয়া আমার দরকার বুঝলি। আমার নিজের জন্য না, ওর জন্যই! এবার শীতে ও মেলায় যেতে পারেনি। রোজগার বন্ধ। আমারই জন্য।"...

"আচ্ছা আপনিই বলুন ডাক্তারসাহেব, এই রুগী ফেলে বাড়ীর বার হওয়া যায়? ও কেবলই আমাদের বলবে মেলায় যাও, মেলায় যাও, নইলে খাবে কি?...তার আর করছি কি। ভগবানই খারাপ দিন দিয়েছেন, আবার তিনিই ভাল দিন দেবেন। ওর মুখের দিকে তাকালেই আমার বুক শুকিয়ে আসে ডাক্তারসাহেব।"...

"বিশ্বাস করিসনারে ওর সব কথা পিলে! এত রঙিয়ে কথা ব'লে আমি ওর নাম দিয়েছি বাতরঙ্গী।"...

যত দেরী হচ্ছে ততই আসল কথাটি বলা শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে পিলের পক্ষে।...না আর দেরী না ক'রে সে এইবার কাজের কথা পাড়বে তুলসীর কাছে। রুগীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে পিলে বলে ঃ

"কেষ্ট এসেছে কমলপুরে, চাকরি নিয়ে।"

"কোন্ কেষ্ট?"

"ঐ যে তারাদার ভাই।"

"সে এত বড় হয়ে গিয়েছে? তাতো হবেই।"

"আমার সঙ্গে নতুন-দিদিমা এসেছেন, তোকে কমলপুরে নিয়ে যাবার জন্য।"

"নতুন-দিদিমা।"

গভীর মানসিক উত্তেজনা প্রকাশ পেল শুধু তার উজ্জ্বল চোখদুটির মধ্যে দিয়ে।

"হ্যাঁ। তিনি অপেক্ষা করছেন বড় রাস্তার ওপর, একেবারে গঙ্গাজল টঙ্গাজল নিয়ে।"

হাসতে গিয়েও পিলে ভাল ক'রে হাসতে পারল না। পাতরঙ্গী এখনও ব্যাপারটা বোঝেনি। একবার ভাবল যে, ডাক্তারসাহেবের সঙ্গে হাসাই উচিত। কিন্তু তুলনায় মুখের ভাব দেখে বোঝে যে, কথাটা ঠিক হাসিঠাট্টার নয়। নিশ্চয়ই রোগের কথা। রোগ যে খুব কঠিন তা' তার জানতে বাকি নেই।

"সে আর হয় না-রে পিলে।"

এই ভয়ই করছিল পিলে। দুর্বল তুলসীর চোখের কোণে জল এসে গিয়েছে। পারতঙ্গী কি বুঝেছে না বুঝেছে তা সেই জানে। সে পা জড়িয়ে ধরেছে পিলের। মাথা কুটছে পায়ের উপর। "এত কঠিন রোগ তা' আমি আগে বুঝিনি ডাক্তারসাহেব। খুব জোরালো ওষুধ দিন বড় সূচে ক'রে। দামী দামী ওষুধ দিন। কত রকওলা ওষুধ তো আপনাদের জানা। রাজারাজড়াদের যে ওষুধ দেন আপনারা, সেই ওষুধ দিন।"

অর্থহীন কতকগুলো কথার ধ্বনি পিলের কানে ঢুকছে কিন্তু সে শুনছে না কিছুই। পায়ের উপর কিসের ভাব তারও খেয়াল নেই। এখানে থেকেও সে এ পরিবেশের বাইরে। তাকিয়ে আছে বারান্দার নীচের হীরাধারের দিকে, কিন্তু দেখছে না। ফাস্ট, সেকেন, থার্ড হবার চিরকেলে হিসাব তার মনের মধ্যে ভিড় ক'রে আসছে না এখন। তুলসীর চিকিৎসা বা রোগের কথা পর্যন্ত সে ভুলে গিয়েছে ক্ষণিকের জন্য। বন্ধ্যা অস্পষ্টতার মধ্যে শুধু জ্বল জ্বল করছে একখানি মুখ—গভীর আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত—মুক্তির আনন্দে উদ্দীপিত—শান্ত সাহসে ভরা—অল্প, টাকপড়া সিঁথির দুইদিককার কাঁচাপাকা মেশানো চুলগুলি কপালে এসে পড়েছে। মটকার থান পরে তিনি তৈরী হয়ে রয়েছেন তাঁর এতদিন-পর ফিরেপাওয়া গন্ধপাতাকে কোলে টেনে নেবার জন্য। গাড়ী যেতেই যে তিনি ছুটে আসবেন। কি ক'রে তাঁর সম্মুখে যাবে? কি ক'রে বলবে এ কথা তাঁর কাছে? কি জবাব দেবে তাঁর প্রশ্নের? এরই জন্য তিনি এতদিন ধ'রে নিজের মনকে তৈরী করেছেন। এত মনের জোর—এত সাহস—কোন কাজে এল না। আজ তাঁকে না ব'লে চ'লে এলেই হ'ত। তুলসীর মাথার চুল ভিজে উঠেছে ঘামে। লাল শ্যাওলার তল থেকে ভুড়ভুড়ি কাটছে হীরাধারের জলে।—বুদ্-বুদ্-বুদ্—একটা, দুটো, তিনটে।

গন্ধবামুন। গন্ধপাতা। ও আমার গন্ধপাতা।

প্রিয় বান্ধবী

প্রবোধকুমার সান্যাল

কলিকাতা নগরীব প্রান্তে শীতের সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। চারিদিকে হিমের সহিত ধোঁয়া মিশিয়া ইহারই মধ্যে ঘোরালো অন্ধকার হইয়া আসিযাছে। কোথাও আলো জ্বলিয়াছে, কোথাও জ্বলে নাই। দূর হইতে শহরের অস্পষ্ট কলরোল ভাসিয়া-ভাসিযা আসিতেছিল।

ঘরের মধ্যে একটু-একটু করিয়া অন্ধকার দল পাকাইতেছে। একটি দরজা ও একটি মাত্র জানালা—জানালাটি খোলা। তাহারই বাহিরে মুখ করিয়া জহর চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। হাওয়ার চলাচল নাই, অন্ধকাবে মশার উৎপাত, ইতিমধ্যে অনেকবার এপাশ-ওপাশ করিয়াছে, এইবার চোখ ছাড়াইয়া উঠিয়া বসিল। বসিল বটে কিন্তু ঘুমের নেশা না কাটাইতে পারিয়া আর একবার সে ঠাণ্ডা দেওয়ালের গায়ে কাৎ হইয়া শুইল। শীতের ঠাণ্ডায় হাত-পা গুলা তাহার তখনও কন্-কন্ করিতেছে, ঘুমাইয়াও সেগুলি গরম হয় নাই। ঠিক অম্নি করিয়া বসিয়া কতক্ষণ নাক ডাকাইয়া এক সময় সে চোখ খুলিয়া চাহিল। চাহিয়া প্রথমেই মনে হইল, আজ সে সমস্ত দিন উপবাস করিযা আছে।

ছেঁড়া জামার সেলাই করা পকেটে হাত ঢুকাইয়া অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া সে আধখানা পোড়া সিগারেট বাহির করিল। জীবনে সে পূরা একটি সিগারেট কখনও এক সঙ্গে খায় নাই। অন্য পকেটে হাত দিয়া সে একটা দেশালাই বাহির করিল, কিন্তু হাত নাড়া দিয়া দেখিল তাহার মধ্যে একটি মাত্র কাঠি খড়্-খড়্ কবিতেছে। এই কাঠিটি খরচ করিয়া ফেলিয়া সিগারেট ধরাইতে তাহার ভবসা হইল না। এখনও সমস্ত রাত্রি বাকি।

সে উঠিযা দাঁড়াইল। পায়ের শব্দ পাইয়া একটা বড় ইঁদুর ঘরের ভিতর হইতে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করিতে-করিতে নর্দ্দমা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইঁদুরটা তাহাকে এতটুকুও গ্রাহ্য করে না, অত্যন্ত স্বাধীন—দরজা ঠেলিযা যখন খুসী আসে, আবার নর্দ্দমা দিয়া বাহিরে যায়। তাহার অবাধ গতিবিধি। বাড়ীওয়ালার বাচ্ছা বিড়ালটা ইঁদুবটাকে যথেষ্ট সমীহ করিযা চলে। অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে তাহার হাত হইতে আত্মরক্ষা কবিয়া জহবকে দিন কাটাইতে হয়।

ঘরটি আর একটু বড় হইলে সে পায়চারি করিতে পারিত, বড়-বড় রাস্তায় দিনের পর দিন ধরিয়া সে পায়চারি করিয়া সময় কাটাইয়াছে। মানুষকে তাহার ব্যস্ততা দেখাইতে হইয়াছে; সে যে কাজের লোক, এ-কথা অকাবণ ছুটাছুটি করিয়া তাহাকে প্রমাণ করিতে হইয়াছে। পায়চারি সে করিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইযা বহিল। দরজা খুলিয়া সে রাস্তায় বাহিব হইতে পাবে কিন্তু গন্তব্য তাহাব নাই।

এক টুক্‌বা মোমবাতি কোথায় ছিল, হাত বাড়াইয়া সে একবার অনুসন্ধান করিল। আলো না জ্বালিলে সেটি আর পাওয়া যাইবে না, কিন্তু দেশালাই জ্বালিয়াও যদি সেটি খুঁজিয়া না পাওয়া যায় তাহা হইলে কাঠিটি অকারণে নষ্ট হইবে। থাক্ মোমবাতি। ছেঁড়া জুতাটা কোনোমতে সে পায়ে লাগাইয়া লইল। কিন্তু পা বাড়াইতেই অন্ধকাবে যাহার উপর তাহার পা পড়িল, সে বস্তুটির কথা তাহার ইতিমধ্যে মনেই হয় নাই। হেঁট হইযা সে হাত দিয়া অনুভব করিল, পায়ের চাপে সেই পরশু দিনকার কেনা মুড়িব ঠোঙাটা ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহার কথা তাহার মনেই ছিল না—যাক্, আজ তবে তাহার কোনমতে চলিতে পারে!

ঠোঙাশুদ্ধ মুড়ি পকেটে পুরিযা সে বাহির হইয়া আসিল। অত্যন্ত ক্লান্ত, অকারণেই ক্লান্ত, চলিবার স্পৃহা নাই, পথের মুখ দেখিতে তাহাব রুচিও নাই। অদূরে গ্যাসের আলোটা নিশ্বাসরুদ্ধ হইয়া দপ্-দপ্ করিতেছিল। দূরে আলোকসজ্জিত রাত্রির কলিকাতা নগরী দেখিয়া সমস্ত মন তাহার বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। উৎপীড়িত নগরী ক্ষুধার্ত্ত, লেলিহজিহ্ব, অজগর সরীসৃপের মতো ক্ষণে-ক্ষণে কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে। জহর কয়েকটা মুড়ি মুখের মধ্যে পুরিয়া চিবাইতে-চিবাইতে দাঁড়াইয়া রহিল।

'এই যে জহরবাবু, এখানে দাঁড়িয়ে?' বলিতে-বলিতে বাড়ীর কর্ত্তা দরজার উপর উঠিয়া আসিলেন।—'আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম, আর ত দেখা হয়ে ওঠে না, আমি যখন থাকি আপনি

তখন নেই, আপনার ত কোনো হদিস পাবার উপায় নেই মশায়! কাজকর্ম্মের কিছু সুবিধে হয়ে উঠলো?'

জহর হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'চেষ্টা আমি করি নি।'

'করেন নি?' তা হ'লে কি ভাব্চেন? দাঁড়ান একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে, আমি আসছি। চলে যাবেন না যেন।' বলিয়া তিনি অন্দরের দিকে চালিয়া গেলেন।

জহর তাঁহার পথের দিকে কিয়ৎক্ষণ লক্ষ্য করিল, তারপর তাড়াতাড়ি তাহার দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া হন্-হন্ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। লোকটার হাত এড়াইতে হইবে।

গলিটা পার হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া তবে সে নিশ্বাস লইল। এমনি করিয়াই তাহার বহুদিন কাটিয়াছে, ঘরের ভাড়া শোধ করিতে পারে নাই বলিয়া মাসের পর মাস তাহাকে লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছে। একটা ছাপাখানায় কিছুদিন হরফ সাজাইয়া সে মাস চারেক আগে একত্রে অবশ্য কয়েকটি টাকা কর্ত্তার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল; কর্ত্তা দিন-কয়েক তাহাকে সম্মান করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহিণীর বয়স অল্পই, সন্তানাদি নাই—নাই বলিয়াই হয় ত তাঁহার অর্থের টান একটু বেশি। যে নাবী ভালবাসিতে শিখে নাই, সে সাধারণত অর্থলোভী ও সঞ্চয়প্রয়াসী। কিন্তু যাক্ নারীর কথা!

মুড়িগুলা ভাল নয়, নরম হইয়া গেছে, মাটির দুর্গন্ধ মাখা, চিবাইতে গেলে দাঁতে জড়াইয়া যায়, বমি উঠিয়া আসে। রাস্তার উপর জহর সেগুলি ছড়াইয়া দিল। সুস্বাদু খাদ্য যখন আহারের অযোগ্য হয় তখন সে নরক। কিন্তু উপবাস করিয়া তাঁহার চলিবে আর কেমন করিয়া? আর কতদিন? জহরের রাগ হইল না, জগতটা যে অত্যন্ত কৌতুকময় এ ধারণা তাহার হইয়াছে। বাস্তবিক পৃথিবীতে বাস করা আজকাল অতি সহজ, কারণ মানুষ সহজ হইয়া বাঁচিতে ভুলিয়া গেছে।

একটা পানের দোকানের সুমুখ দিয়া পার হইয়া যাইবার সময় সে একবার আয়নাটা দেখিয়া লইল। কিছুদূর গিয়া মুখের উপর হাত বুলাইয়া দেখিল, মুখ তাহার দাড়িতে ভবিয়া গেছে। মনে হইল, মুখখানিতে তাহাব আব স্বাস্থ্য নাই, চোখের কোল বসিয়াছে, শুষ্ক শীর্ণ মুখের জৌলুস চলিয়া গিয়াছে। নিজেব মুখখানার উপর তাহার মমতা হইল। নিজেকে একদা সে সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসিত।

কে যেন তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল। মুখ ফিরিয়া তাকাইয়া জহর হাসিয়া ফেলিল। বন্ধুটি কহিল, 'অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলে হে?'

জহর বলিল, 'ভাবছিলাম, পূর্ব্বস্মৃতি আলোচনা ক'রে মানুষ সান্ত্বনা পায় কি না।'

'সাবাস্। কোথায চলেছো?'

'এই তোমাদেব এখানেই। আজ খেলা হবে না?'

বন্ধুটি সভয়ে বলিল, 'চুপ, পুলিশের নজর আছে। খেলা অনেকক্ষণ সুরু হযেছে। তোমার বুঝি—'

'হ্যাঁ, নেশা লেগে গেছে। মন কেবল মন্দ কাজ খুঁজে বেড়ায়।' জহর পুনরায় কহিল, 'চল।'

ফুটপাথ কাটিয়া দুইজনে একটা অন্ধকার সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া প্রবেশ করিল। কিছু দূর গিয়া আর একটা সুড়ঙ্গের মতো পথ। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে কলিকাতা শহর যেন ভোজবাজীর মতো মিলাইয়া গেল। মাথা নীচু করিয়া একটা চালার মধ্যে ঢুকিলে প্রথমেই সেই ভিখারী-বুড়ীকে দেখা যায়, বুড়ির সঙ্গে ইহাদের চুক্তি আছে, মাসে এক টাকা করিয়া বক্‌শিস পায়।

একটা কেরোসিনের ডিবে মাঝখানে রাখিয়া তাহার চারিদিকে কয়েকজন লোক বসিয়া বসিয়া ময়লা তাসগুলি নাড়া-চাড়া করিতেছিল। পায়ের শব্দ পাইয়া হঠাৎ তাহারা কয়েক মুহূর্ত্ত থামিয়া গেল। পরে সুমুখে ইহাদের দুইজনকে দেখিয়া তাহারা আশ্বস্ত হইয়া আবার গোলমাল সুরু করিল। ঘরের ও-কোণে আর একটি কেরোসিনের ডিবে রাখিয়া জন-চারেক লোক একটা ফুটো হাঁড়ি ও গোটা-কয়েক কড়ি লইয়া খেলিতে বসিয়াছিল। হাঁড়ি-খেলাটা জহর ভাল করিয়া শিখিতে পারে নাই।

বিড়ি ও গাঁজার ধোঁয়ায়, কেরোসিনের ভুষোয়, ময়লা কাপড় ও গায়ের দুর্গন্ধে ঘরখানা ভরিয়া উঠিয়াছে। তাস খেলার কাছে আস্তে আস্তে জহর বসিয়া গেল। নিঃসঙ্কোচে দুষ্প্রবৃত্তির কাছে আত্মদান করিতে তাহার কোনদিন আটকায় নাই।

রোসেদ মিঞা কহিল, 'কি জোহরবাবু, প'সা কড়ি এনেছ? বসে' যাও চেপে। ক'টাকা আছে?

জহর কহিল, 'টাকা নেই, দুর্ভাগ্য আছে।' বলিয়া হাসিল।

রোসেদ মিঞা অত বুঝিল না, কিন্তু বুঝিবার ভাণ করিয়া বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িল।

কানাই মিস্ত্রি কহিল, 'জহর, বসে যা।'

জহর বলিল, 'আজ স্রেফ্ পকেট খালি।'

'ধারে খেলে যা এক হাত।'

জহর হাসিয়া বলিল, 'ধারে খেলা আর ধারে খাওয়া—এর পয়সা কিন্তু শোধ দিতে ইচ্ছে হয় না।'

বাঁ-দিকে গায়ে গা ঘেঁষিয়া, পানওয়ালা বিরিজ্‌লাল বসিয়াছিল, সে একটা অশ্লীল মন্তব্য করিয়া জহরকে টানিয়া খেলিতে বসাইল।

খানিকক্ষণ খেলার পর ক্ষুধায় জহরের আর ধৈর্য্য রহিল না। দুইবার হারিয়া একবার সে জিতিয়াছে; এইবার একেবারে মোটারকম দুই আনা সে জিতিল। দু' আনিটি কানাই মিস্ত্রির নিকট হইতে লইয়া সে উঠিয়া পড়িল। সবাই জুয়াখেলায় মত্ত, জহর আর ফিরিয়া চাহিল না—সকল খেলাতেই তাহার মোহ আছে কিন্তু মমতা নাই—সকলের অলক্ষ্যেই সে দরজা পার হইয়া আসিল। পাশেই বুড়ি ঘুমাইতেছিল, হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখের উপরকাব কাঁথা সরাইয়া কহিল, 'কে যাচ্ছ।?'

জহর কহিল, 'আমি গো বুড়িমা।'

'হার না জিৎ?' পয়সা দাও—চার আনায় দু পযসা।'

'হার হয়েচে যে?'

'রোজ-রোজ তোমার হার হয় গা?'

'রোজ নয়, চিরদিন।' বলিয়া হাসিয়া জহর অন্যপথে অন্ধকারে আঁকিয়া বাঁকিয়া বাহির হইয়া আসিল।

রাত বোধ করি বেশি হয় নাই। পকেটেব মধ্যে ফেলিযা চৌকা দু' আনিটি জহর বার-বার অনুভব করিয়া দেখিতেছিল। আজিকার রাত্রি তাহার চোখে সুন্দর ও সুখদায়ক মনে হইতে লাগিল। দুইদিন তাহার পরমানন্দে চলিয়া যাইবে। গোপাল সরকারের হোটেলের কথা মনে করিয়া তাহার মুখের মধ্যে জল আসিয়া পড়িল। কি কি খাইবে হিসাব করিতে করিতে সে অগ্রসর হইয়া চলিল। বড় রাস্তায় গাড়ীঘোড়া, লোকজন যেন তাহাকে ঘিরিয়া নাচিতে-নাচিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, আনন্দে জহরের গা রোমাঞ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিল। ভাত কিম্বা পুরি—কোনটি খাওয়া সমীচীন তাহাই এখন চিন্তার বিষয়। ভাত এবং তরকারী সুস্বাদু সন্দেহ নেই, কিন্তু পুরি গুরুপাক, জীর্ণ হইতে দেরী লাগে। সুস্বাদের চেয়ে গুরুপাকেই তাহার বেশি প্রয়োজন। জহর একটা খাবারের দোকানে আসিয়া উঠিল।

এক আনার উপর আর একটি পয়সা হিসাব করিয়া সে আহার সমাপ্ত করিল। হাত ধুইয়া দোকানের ছোট রেকাব হইতে কাটা সুপারি তুলিয়া লইতেই কে একজন কহিল, 'ঠাকুরমশাই, চিনতে পারেন?'

জহর মুখ তুলিল। লোকটার দিকে তাকাইয়া কহিল, কে বল ত?'

লোকটা কহিল, 'বোম্বে গিয়েছিলেন না আপনি? সেই ধর্ম্মশালায় দেখা হয়েছিল? আপনি ত জাহাজে কাজ করতেন।'

জহর শুধু বলিল, 'তোমার খবর ভাল?' বলিয়া পকেট হইতে দু' আনিটি বাহির করিয়া ম্যানেজারের টেব্‌লের উপর রাখিল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল। আমি এই দোকানে চাকরি করি বলিযা সে জহরের আপাদমস্তকের দিকে একবার চোখ বুলাইয়া আবার নিজেব কাজে বসিয়া গেল।

'দোয়ানিটা চলবে না মশাই, বদ্‌লে দিন।'

জহর চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইল। তারপর দু' আনিটি হাতে করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'চল্‌বে না? এই যে নিয়ে এলাম!' ভয়ে তাহর পা দুইটা যেন ভারী হইয়া উঠিল। পেটের মধ্যে খাবারগুলি হঠাৎ যেন জীবন্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।'

'নকল দোয়ানি মশাই, বদ্‌লে দিন না?'

'নকল? নকলই ত চলে বেশি!'

ম্যানেজার কহিল, 'পয়সাকড়ির বেলায় নয়। ওটা সবাই বাজিয়ে দেখে।'

জহর একটু কৌতুক অনুভব করিল। বলিল, 'যারা বাজায় তাবা কিন্তু প্রায়ই বাজে না।'

ম্যানেজারের অত কথা বলিবার সময় নাই, দোকানে ভিড় হইয়াছিল। বলিল, 'কত হয়েছে আপনার?'

'পাঁচ পয়সা। কিন্তু দোযানিটি ছাড়া আর আমার কাছে কিছু নেই মশাই।'

'তাব মানে? আপনি অচল দোয়ানি নিয়ে দোকানে বসে খেতে এলেন?'

জহর হাসিযা কহিল, 'তাই ত এসেছিলাম দেখ্‌চি! হায রে লটারির পয়সা!'

'তা হ'লে কি করবেন এখন? ও দোয়ানি আমি নেবো না?'

'বেশ ত, আমিও দিতে চাচ্ছি নে।'

আগেকার পরিচিত লোকটি সেখান হইতে তখন ভিতবে চলিয়া গিয়াছিল। ম্যানেজার কহিল, 'ধার আমরা রাখি নে, কাল মনে ক'রে দিয়ে যাবেন। আপনি ত প্রায়ই এখান দিয়ে যাতায়াত করেন।'

জহব দোকান হইতে বাহির হইযা পড়িল। পথে নামিয়া না হাসিয়া সে থাকিতে পারিল না। দু' আনিটি বাহির করিয়া আর একবার সে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিল; এই মুদ্রাটি যে আত্মবিক্রয় করিয়া তাহার উদরপূর্ত্তি করে নাই, এজন্য সে খুসী হইল। আত্মবিক্রয় করিয়া উদরপূর্ত্তি করা এখানকার রীতি।

ঘুরিতে-ঘুরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। তুহিন শীতল রাত্রি, কুহেলিকাচ্ছন্ন যন্ত্রণাদায়ক কঠিন রাত্রি। ছেঁড়া-জামা কাপড়ের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকিয়া হাড়ের মধ্যে কন-কন্ করিতেছিল। এমনি করিয়া পথ চলার মধ্যে জহর আগে একটি নিবিড় দুঃখের সুর অনুভব করিত। কোনো অবলম্বন এবং বন্ধন নাই—এই কথাটি আগে তাহার তরুণ মনে একটি ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিত। আজকাল দুরবস্থায় পড়িয়া তাহার হৃদয়ের কোমলতার আবেগের তন্ত্রীগুলি আর তেমন ঝন্-ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠে না।

বাসার কাছাকাছি আসিয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। সদর দরজার বাঁ-দিকের ঘরে কিসের যেন. গোলমাল চলিতেছিল। আলো জ্বালিয়া কর্ত্তা একখানা তক্তার উপর বসিয়া আছেন, সুমুখে আর দু'টি লোক, একজন বসিয়া-বসিয়া তামাক টানিতেছে।

'মিথ্যেবাদী, বুঝলে সাধন, জোচ্চোর!'

'তুমি এতদিন রাখলে কেমন ক'রে যজ্ঞেশ্বর? চার মাসের ভাড়া বাকি, এই কলকেতা শহরে....এত খরচ তোমার—'

'ওসব লোককে বাড়ী ঢুকতে না দেওয়াই ভাল। ঘরের জিনিসপত্তর টান মেরে ফেলে দিয়ে আবার ভাড়া বসাও! রান্নার জায়গা আলাদা আছে তো? ব্যস্, কল-পায়খানা এক, ভাড়া পনেরো

টাকা। দেখি কোন্ শালা—'

কর্ত্তা কহিলেন, 'আরে ভাই, বলে গেলাম দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা কর, এই আসি, ফিরে এসেই দেখি ভোঁ ভোঁ? লবাবপুত্তুর, একটু দাঁড়াতে পারো না? ওকে তাড়াতেই হবে, এই আমি এখানে বসে রইলাম, আসুক, আসুক একবার!'

জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়া জহর তাহাদের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল।

'আজ একটা যা হোক হেস্তনেস্ত ক'রে ফেল যজ্ঞেশ্বর। চাল নেই, চুলো নেই, ওর কাছে ভাড়া আদায় হবে কেমন ক'রে? ছেলেমেয়ে নিয়ে যে-লোক ঘর করে না, তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।'

যজ্ঞেশ্বর কহিল, 'তাড়াবো বলেই ত ব'সে আছি।'

জহর আর সেখানে দাঁড়াইল না, জানালার কাছ হইতে সরিয়া সে আবার হাঁটিতে সুরু করিল। কিন্তু রাত্রিবাস করিবার জায়গা আর কোথাও তাহার ছিল না। কয়েক দিন আগে এক পার্কের বেঞ্চে শুইতে গেলে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ—জীবন ধারণ করিবার উপযোগী তাহার নাকি কোনো সদুপায় নাই! ইহার পর অসদুপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই বলিয়া পুলিশ হয় ত পুনরায় গ্রেপ্তার করিবে!

উত্তর কলিকাতায় কোথায় নাকি একটা বড় মন্দির তৈয়ারী হইতেছিল। এ সংবাদ জহরের জানা ছিল। রাত্রে তাহার নাটমন্দিরে পড়িয়া ঘুমাইলে কেহ কিছু বলে না। যারা নিশাচর তাহাদের গতিবিধি সন্দেহজনক, কিন্তু একবার কোথাও শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে তাহাদের অর্দ্ধেক অপরাধ কমিয়া যায়। একটা গল্প জহরের মনে পড়িয়া গেল। একবার সমুদ্র পথে সে জাহাজে করিয়া আসিতেছিল। জাহাজের মধ্যেই একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিয়া সে পলাইবার পথ পায় নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্ব্বিবাদে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া সে প্রমাণ করিয়াছিল, সে নিরপরাধ। সেই জাহাজেই একজন জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীর নিকট সে নানা রকমের যাদুবিদ্যা শিখিয়াছিল।

সাধারণত শহরের বড় বড় রাস্তা ধরিয়া জহর হাঁটিতে চায় না, গলি-ঘুঁজি দিয়া সুবিধাজনক পথ আবিষ্কার করিয়া সে চলিতে ভালবাসে। এ-যুগে অধ্যবসায়ের চেয়ে সুবিধাবাদ অনেক বড়। জহরও জীবনে অনেক সুবিধা আবিষ্কার করিয়াছে। সুবিধার সঙ্গে বুদ্ধির যোগাযোগ ঘটিলে রাজ্য পর্যন্ত জয় করা চলে। যাক্ সেকথা। গলি পথ দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া জহর চলিতেছিল। অত রাত্রে আশেপাশে বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নিদ্রিত, নিশুতি রাত। মাঝে মাঝে হু-হু করিয়া উত্তরের বাতাস ধূলি-জঞ্জাল উড়াইয়া বহিয়া চলিয়াছিল। সকলেই বোধ করি লেপ গায়ে দিয়া ঘুমাইতেছে। লেপ গায়ে দিলে ধীরে ধীরে হাত-পা গরম হইয়া উঠে। অতিরিক্ত আনন্দ এবং অতিরিক্ত তৃপ্তি হইতেছে অতিরিক্ত যন্ত্রণাদায়ক। অনাবিল আরামের মতো অভিশাপ জীবনে কি আর কিছু আছে? তরুণ বয়সে জহর দুঃখ পাইয়া হাসিত, সুখের আনন্দে তাহার চোখে জল আসিত। অবারিত স্রোতের চেয়ে উপলাহত স্রোতের সৌন্দর্য অনেক বেশি।

দূরে কোথায় একটা পাহারাওয়ালা গৃহস্থকে সাবধান হইতে বলিয়া নিজে অতি সাবধানে চলিয়া যাইতেছিল। তাহার নাল্ দেওয়া বুট্-এর খট্-খট্ শব্দ এত দূর হইতেও কানে আসিতেছিল। শীতের প্রথমরাত্রে গৃহস্থঘরে চুরি করিবার সুবিধা, গ্রীষ্মকালে শেষরাত্রে। পাহারাওয়ালার বুট্-এর শব্দ যে দিক হইতে আসিতেছিল জহর তাহার অপর দিকে চলিতে সুরু করিল। 'একশ দশ ধারায়' অভিযুক্ত হইয়া সে আর 'বিপজ্জনক ও মরিয়া ব্যক্তি' বলিয়া আদালতের জনতার সম্মুখে অভিহিত হইতে চাহে না। বহুলোকের নিন্দা শুনিয়া যাহারা বিখ্যাত বলিয়া নিজেদের গৌরব করিয়া বেড়ায়, জহর সে আধুনিক মনকে ঘৃণা করে। পথের প্রদীপের সারি ও উপরের অন্ধকার আকাশের অগণ্য তারকা একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার পথের দিকে তাকাইয়াছিল। সে একবার উপরের দিকে চাহিল। এই নিঃশব্দ নির্ব্বাক আকাশকেই মানুষ সকলের চেয়ে সমীহ করে। পৃথিবীর সকল পাপ ও অন্যায় ঘরের মধ্যে

বসিয়া সৃষ্টি, যত কলুষ-কালিমা মানুষ আকাশের দৃষ্টি হইতে লুকাইতে চায়। অবারিত প্রান্তরের মাঝখানে মানুষ হত্যা করে, হানাহানি করে, কিন্তু বিষাক্ত মস্তিষ্ক খেলাইয়া অন্যায় ও নীচতার কুৎসিত কৌশল আবিষ্কার করে না। মণি, রত্ন, অর্থ, অলঙ্কার মানুষের গোপন প্রলোভনের প্রতীক, তাই তাহাদের স্থান খোলা আকাশের আলো-বাতাসের নীচে নয়, লৌহ আধারের নিশ্বাসরোধী অন্ধকূপের মধ্যে।

পাহারাওয়ালার পায়ের শব্দ কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। জহর সেই দিকে একবার তাকাইয়া চট্ করিয়া একটা চালার বেড়ার পাশে উঠিয়া লুকাইল। জীবনে তাহাকে অনেকবার অনেক অবস্থায় লুকাইতে হইয়াছে। একবার সে ট্রেনে লুকাইয়া থাকিয়া মধুপুর হইতে কানপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। আর একবারের আত্মগোপনের কথা মনে করিয়া সে মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

পাহারাওয়ালাটা ঘুমাইতে-ঘুমাইতে চলিয়া গেলে সে আবার বাহির হইয়া আসিল। হাঁটিয়া-হাঁটিয়া তাহার শরীর একটু গরম হইয়াছিল। পরিশ্রম করিয়া শরীর যাহাদের গরম করিতে হয়, পৃথিবীর ভরণপোষণের ভার তাহাদেরই উপর। জহর বাঁ-দিকে মোড় ফিরিল। কিন্তু মোড় ফিরিয়া দেখিল, যেখান হইতে সে পথ হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল আবার সেইখানেই সে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে? বুঝিল পথ সে ভুল করিয়াছে, আবার ওই মাঠকোঠার পাশ দিয়া না গেলে সে মন্দিরে গিয়া পৌঁছিতেই পারিবে না। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে চলিতে লাগিল। শীতের রাত, বারোটা না বাজিতেই পথঘাট নিস্তব্ধ এবং জনবিরল। পথে চলিতে-চলিতে কোথাও কিছু তাহার দৃষ্টি এড়ায় না, এদিকে ওদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টি সজাগ থাকে। কাছাকাছি আসিতেই সে লক্ষ্য করিল, একখানা চওড়া-পাড় কাপড়ের একটা ধার হাওয়ায় নড়িতেছে, কাপড়খানি আলোয় এক-একবার চক্-চক্ কবিয়া উঠিতেছে। জহর আর একবার পর্য্যবেক্ষণ করিল। দেখিল শুধু কাপড় নয়, কাপড় পরিয়া গ্যাসের আলো হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া যে দরজায় দাঁড়াইয়া আছে সে মানুষ। এবং সে মানুষও নয়—সে নারী।

নারী দেখিয়া বিপন্ন হইয়া সে পা বাড়াইল। পা বাড়াইল বটে কিন্তু বেশি দূর তাহাকে যাইতে হইল না। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার যে ফিরে এলে?'

জহর ফিবিয়া তাকাইল। বলিল, 'ও, তুমি? ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় এলে কেন? ফিরে আমি আসি নি, পথটা ভুল হয়েছিল, যাচ্ছিলাম এই দিক দিয়ে।' বলিয়া সে আবার পা বাড়াইল।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি কহিল, 'তখন দেখলাম মাথা হেঁট করে চলে যাচ্চ। শোনো দাঁড়াও, কোথায় যাবে তুমি?'

'মন্দিরে।'

'মন্দিরে?' বড়-বড় চোখে মেয়েটি তাহার দিকে তাকাইল। তারপর কহিল, 'তোমাকে নিতান্ত জুয়াড়ি বলে আমার একদিনো মনে হয় না। সেদিন তোমাকে 'তুমি' বলে ডেকেচি, ক্ষমা করো। দয়া করে আমার একটি উপকার করবে?'

জহর একটু হাসিয়া কহিল, 'মেয়েদের উপকার অল্পবয়সে করে বেড়াতাম, এখন সে রুচি গেছে। যাক্ গে, শুনেই যাই তুমি কি বলতে চাও; তাড়াতাড়ি বল।'

'বলি' বলিয়া মেয়েটি একবারে পথে নামিয়া আসিল, বলিল, 'আর একটু এগিয়ে চল বল্‌চি। ওরা হয় ত এখুনি এসে পড়বে।'

তাহার চকিত ও ত্রস্ত অবস্থা দেখিয়া জহর বিস্ময় বোধ করিল, কহিল 'ওরা কারা?'

'আমার শ্বশুরবাড়ীর ঝি। তার মতলব ভাল নয়।'

'কি রকম?'

মেয়েটি কহিল, 'সে অনেক কথা, আগে এগিয়ে চল। তুমি না এলে, এখনই আমাকে চলে যেতে হতো।'

জহর চিন্তিত হইয়া কহিল, 'কোথায় যেতে?'

'যেতাম যেখানে হোক্! আচ্ছা, তুমি রায়বাগানের রাস্তাটা চেনো।'

'চিনি, কেন বলত?'

'মেয়েদের নতুন বোর্ডিংটা?'

জহর কহিল, 'আগে ওসব চিনতাম, যখন গোঁফ উঠছিল, এখন সব ভুলে যাচ্ছি একটু-একটু করে।'

'চালাকি করো না। বল। মেয়েমানুষের বিপদকে নিয়ে যারা খেলা করে তারা পশুর মতো অসচ্চরিত্র।'

কিছুদূর দ্রুতপদে দুইজনে আসিয়া একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। চলিতে-চলিতে জহর কহিল, 'মেয়েরা মরে ত মর্য্যাদা ছাড়ে না। কিন্তু শোনো, এসব আমি পারি নে। জগতে একটা কাজ এড়িয়ে চলা উচিত, সে হচ্ছে মেয়েমানুষের উপকার করা। তুমি যে এত লোক থাকতে আমাকেই কেন বেছে নিলে এ আমি বুঝলাম না। আমি যে লোক ভাল নয় তা নিশ্চয় তুমি এ-ক'দিনে—'

'সে আমি জানি।' মেয়েটি কহিল।

'জানো? কী জানো?'

'জানি যে, গরম চাটু থেকে আগুনে পড়চি। অপমান থেকে হয় ত নেমে যাচ্ছি অধঃপতনে।'

জহর বলিল, 'তা হ'লে জানতে পারো নি। চাটু থেকে পড়েছ বটে, কিন্তু আগুনে নয়, ছাইয়ের গাদায়!'

অত দুঃখেও মেয়েটি কৌতুকের হাসি হাসিল। বলিল, 'আমি কি জন্যে পালিয়ে এসেচি শুন্‌বে?'

'না।' জহর কহিল, 'আমি তরুণ মাসিকপত্র নই যে, তোমার কেচ্ছা আমি বইতে পারবো। সাবধানে এসো, পাহারাওয়ালাটা হাঁক দিচ্ছে!'

মেয়েটি কহিল, 'দিলেই বা, ধরবে আমাদের?'

'নিশ্চয়ই ধরবে, একেবারে হাতে-হাতে, ধরলে আর ছাড়বে না!'

'অপরাধ?'

'বল্‌বে আমি তোমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

মেয়েটা হাসিয়া কহিল, 'বোধ হয় অন্যায় বল্‌বে না।'

জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইল। বলিল, 'ওই বাঁ-হাতি বেঁক্‌লেই রায়বাগানের বোর্ডিং পাবে, যাও। ভাল লাগচে না তোমার সঙ্গে পথ হাঁটতে। এসব আমি অপছন্দ করি।'

পাহারাওয়ালার পায়ের শব্দ অন্যদিকে চলিয়া গেল। মেয়েটি কহিল, 'অপছন্দ? আজকালকার ছেলেদের নতুন ফ্যাসন, মেয়েদের করে ঘৃণা! দায়িত্ব নেবার অক্ষমতা, ভীরুতা আর বেকারবৃত্তি, এই তিনে মিলে নারীবিদ্বেষ! আমি যাবো না!'

জহর প্রমাদ গণিল। বলিল, 'এত রাতে কেলেঙ্কারী করো না। যাবে না ত এলে কেন ছলনা ক'রে? আমাকে ছেড়ে দাও, দোহাই তোমার!'

সে কহিল, 'না। ভেবে দেখচি এত রাতে মেয়েদের বোর্ডিংয়ে গিয়ে ওঠা উচিত হবে না!'

'তবে কোথা যেতে চাও এখন?'

'এখানে যদি ধর্ম্মশালা কোথাও থাকে ত দেখিয়ে দাও, আজকের রাতটা সেখানে পড়ে থাকবো!'

ধর্ম্মশালা এত রাতে কোথায় খুঁজবো? কলকাতায় ধর্ম্ম আর ধর্ম্মশালা দুটোরই বড় অভাব।'

মেয়েটি এবার একটু আর্দ্র কণ্ঠে কহিল, 'ক'দিন তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েচে কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারচো না।' চলিতে-চলিতে সে পুনরায় কহিল, 'এক্‌লাই আমি চলে আসতে

পারিতাম। কিন্তু অবলম্বন দেখলেই মেয়েমানুষ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ওরা এতক্ষণ হয় ত খোঁজাখুঁজি করচে।'

'কেন? মেয়েমানুষ হারালে ত খোঁজবার কথা নয়!'

'হ্যাঁ, খুঁজচে। স্ত্রীলোক যখন স্বার্থের গন্ধ পায় তখন সে সাপের মতো কুটিল। ঝি-এর বাড়ীতে এসে ওঠাই আমার অন্যায় হয়েচে।'

'এলে কেন?'

'সহজেই বুঝতে পারো, অত্যাচারী স্বামী, মাতাল—'

জহর তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, 'এই জন্যেই এদেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে নেই! মেয়েদের রুচিজ্ঞান আর সম্মানবোধ যদি জন্মায় তা হ'লে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যে হাহাকার উঠবে তা কি ভেবে দেখেচ? কিন্তু ঘর ছেড়ে এসে এখন তুমি কি করবে?'

মেয়েটি কহিল, 'স্বাধীন জীবিকা!'

জহর কহিল, 'সেই পুরানো কথা। অর্থাৎ হাসপাতালের নার্স, কিম্বা মেয়ে-ইস্কুলের মাষ্টারী, তারপর?'

'তারপর আবার কি?'

'তারপরেও আর একটা প্রশ্ন থেকে যায়। নার্স এবং মাষ্টারণিদের সম্বন্ধে কিছু-কিছু ত আমি জানি?'

মেয়েটি কহিল, 'ছি, চুপ কর। ঝি-এর সঙ্গে চলে এলাম, সে বললে, দর্জ্জিপাড়ায় সুতো কাটার কলে আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবে, পরিশ্রম করলে রোজ আটআনা দশআনা রোজগার করতে পারবো—তার ওখানেই থাকবো কিছুকাল। এ অবস্থায় যা হোক একটা কিছু জীবনধারণের মতো—কিন্তু কাল থেকেই লক্ষ্য করেচি ঝি-এর আছে অন্য মতলব, আমাকে সে বিপদে ফেলতে চায়। তোমার এখানে বাসা কোথায়?'

জহর কহিল, 'এতক্ষণে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে? কি ভাগ্যি যে কুলশীল জান্‌তে চাও নি? আমি স্রোতের ফুল নই, সমুদ্রের আগাছা!'

'খুব বাহাদুর! এখন বাসাটা কোথায় শুনি?'

'বাসা আছে কিন্তু বাস নেই, সে বাসায় প্রবেশ নিষেধ।'

'কেন?'

'বাড়িওলার দেনাটা শোধ করতে পারি নি।'

'তা হ'লে কি হবে?'

জহর বলিল, 'ভাববার কথা!'

বাঁ দিকের গলির মধ্যে তাহারা আসিয়া ঢুকিল। একটা কুকুর শুইয়া ছিল, তাহাদের দেখিয়া চীৎকার করিতে-করিতে চলিয়া গেল। দুইজন নিঃশব্দে বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল। পথের আলো বাঁচাইয়া মেয়েটিকে একজায়গায় দাঁড় করাইয়া জহর আসিয়া দরজায় উঠিল। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল। দরজা ঠেলিয়া দেখিল ভিতর হইতে বন্ধ। কিন্তু খুলিবার কৌশল তাহার অজানা ছিল না। ইঙ্গিতে মেয়েটিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে রোয়াকের উপর হইতে পা বাড়াইয়া পাঁচিল বাহিয়া উপরে উঠিল। সেখান হইতে অতি সাবধানে ভিতর দিকে নামিয়া পড়িল।

দুই মিনিটের মধ্যেই দরজা খুলিয়া গেল। চুপি-চুপি মেয়েটি উঠিয়া আসিল। তারপর নিম্নস্বরে কহিল, 'এতক্ষণ অবধি বল্‌তে মনেই ছিল না—আমার নাম সুখলতা।'

জহর বলিল, 'মেয়েমানুষের কোন নাম নেই।'

অতি সাবধানে শিকল খুলিয়া দুইজনে অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরে ঢুকিয়া আলোর অভাবে কিছুই ঠাহর করিবার উপায় নাই। নীচেকার পুরানো ঘর, প্রায়

দিবারাত্রি বন্ধ থাকিয়া ভিতরটায় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর খানিকটা ধোঁয়ার মতো ঠাণ্ডা জমিয়া উঠিয়াছে। ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়া শীতে সুখলতার পা দুইটা কন্-কন্ করিয়া উঠিল।

'আলোটা আগে জ্বালো বাপু!'

জহর বোধ হয় জামার পকেট হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিতেছিল, হঠাৎ সুখলতা আঁক্ করিয়া ভয়ে হাত পা ছুড়িয়া সরিয়া গেল। 'মাগো, পায়ের উপর দিয়ে কি যেন—শীগগি্র জ্বালো বাপু আলোটা!

জহর হাসিল। বলিল, 'ভয় কি, ও আমার পোষা ইঁদুর, নতুন মানুষ তুমি তাই পায়ের ধুলো নিয়ে গেল। দাঁড়াও একটু, দেশলাইয়ে আমার একটিমাত্র কাঠি, আগে বাতির টুক্‌রোটুকু খুঁজে বার কর দেখি?'

'অন্ধকারে খুঁজ্‌বো কোথায়?'

'ধরো তবে দেশলাইটা, আমিই দেখি।' বলিয়া জহর আন্দাজে দেশলাইটা তাহার হাতে দিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া হাত বুলাইতে লাগিল।

'পেয়েছ?'

'না।'

'পেয়েছ?'

'না, কিন্তু ছিল যে এখানেই, এই বিকেল-বেলাও যাবার সময়—হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছি, এই যে! সব জিনিসই থাকে, শুধু খুঁজে পাওয়ার অভাব।' বলিয়া জহর উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় বলিল, 'নাও জ্বালো একবার দেশলাইটা, খুব সাবধান, আর কাঠি নেই!'

অতি সন্তর্পণে আলো জ্বালা হইল। কিন্তু সে-আলোয় ঘরের লজ্জাই ফুটিয়া উঠিল, আলো হইল না। ঘরের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহাতে মানুষের আবাস বলিয়া মনে হইতে পারে। দেওয়ালের চারিদিকে দড়ির মতো অসংখ্য উইপোকার বাসা নামিয়া আসিয়াছে। একপাশে কয়েকখানা খবরের কাগজ, মাঝখানে একটি বিছানা—মনে হয় কোনো শ্মশান হইতে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেটা তুলিয়া আনা হইয়াছে।

সুখলতা ভীত দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, এ ঘরে যে থাকে সে ত যে-কোনো পাপ করতে পারে।'

জহর কহিল, 'এ ত ঘর নয়, আশ্রয়!'

'তুমি থাকো এইখানে? দিনের পর দিন?'

'থাকি নে, এসে লুকোই যেমন তুমি এসে আজ লুকিয়েছ।'

'লুকিয়েছি, তা বলে ভয়ে নয়, রাত হয়েছে বলে।'

'রাত না হ'লে কি করতে?'

'রাস্তা ধরে হাঁটতাম।'

'কোন দিকে?'

'যে-কোনো দিকে।' সুখলতা কহিল, 'তা বলে কি আর মরিয়া হতাম? তা হতাম না; যে মেয়ে সাধারণ বুদ্ধি হারায় সে আমায় দু'চোখের বিষ।'

জহর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'কাল সকালে উঠেই চলে যাবে ত?'

'হ্যাঁ, খুব ভোর বেলা। তুমি যদি ঘুমিয়ে থাক তা'হলে আর জাগাব না। বাড়ীর লোক উঠবার আগেই—'

জহর হাসিয়া বলিল, 'ঐ সময়েই গৃহত্যাগ করে বটে।'

মুখে কাপড় চাপা দিয়া সুখলতাও হাসিল। তারপর বলিল, 'সত্যি আমি শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে এসেছিলাম ঠিক অমনি সময়।' বলিতে বলিতে সে সহসা সচেতন হইয়া উঠিল, কহিল, 'আমার

একটুও লজ্জা নেই, না? দু' মাসে যতটা আলাপ হওয়া উচিত ছিল, দু' ঘণ্টায় তোমার সঙ্গে তার চেয়েও বেশি হলো।'

জহর কহিল, 'মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হওয়া ভাল, ঘনিষ্ঠতা হওয়া ভাল নয়। তারা ভুলতে পারে না যে তারা মেয়ে।'

'পুরুষরাও তাই, এই ত নিয়ম।'

জহর কিছু না বলিয়া বিছানা ছড়াইতে লাগিল। কে কোন্‌খানে কেমন করিয়া শুইবে এই লইয়া দুইজনে সমস্যায় পড়িল। স্থির হইল, ইঁদুরের যাতায়াতের পথ ছাড়িয়া দিয়া সুখলতা দেওয়ালের দিকে শুইবে। জহর বলিল, 'তুমি অতিথি বলে একটু বেশি যত্ন পাবে কিন্তু মেয়েছেলে বলে নয়। মেয়েদের প্রতি যাদের অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব তাদের আত্মসম্মানবোধ কম।'

'কিন্তু আদালতের বিচারে পর্য্যন্ত মেয়েদের বিশেষ সম্মান। এই সেদিন—'

'ওটা সম্মান নয়, তোষামোদ; কিম্বা বিচারক হচ্ছেন বিপত্নীক। আধাআধি পাওনা ছাড়া এক চুলও মেয়েদের বেশি দিতে আমি রাজি নই।'

একজনের যে-বিছানায় শীত কাটে না, দুইজনে তাহা ভাগাভাগি করিয়া লইল। ওদিকে রাত কত হইয়াছিল তাহা কাহারও জানা নাই। বাতির টুকরাটি আর কয়েক মিনিট মাত্র জ্বলিতে পারে। জহর উঠিয়া গিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিল। তারপর কহিল, 'কাল যাবার সময় আমার চাদরটা যেন নিয়ে যেয়ো না।'

সুখলতা এই নীচতায় অত্যন্ত চটিয়া গেল। বলিল, 'আমাকে কি এমনি ছোটলোক পেয়েচ।'

'না না, তা বলি নি; যদি ভুলক্রমে—হাতছাড়া হয়ে গেলে ত আর ফিরে পাবো না! তুমি ত পালিয়ে-পালিয়েই বেড়াবে।'

সুখলতা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, 'আমার কোনো উপায় নেই বলেই তোমার এই অপমান সয়ে রইলাম। আমি যদি দরজা খুলে আবার চলে যাই তুমি আটকাতে পারো?'

'গেলে আট্‌কাতে পারতাম। কিন্তু তোমাকে ছুঁতে হবে তাই আট্‌কাবো না।'

'তার মানে?'

'স্বামীকে যে মাতাল বলে ত্যাগ করে তাকে আমি ছুঁই নে।'

সুখলতা হাসিয়া ফেলিল। কহিল, 'মাতাল বলে ত্যাগ না করলে তুমি ছুঁতে? তোমাব চরিত্র তা হ'লে আমার স্বামীর চেয়েও খারাপ। তুমি বুঝি আজো বিয়ে কর নি?'

'করলে ভালই করতাম। পরস্ত্রীর কাছে বিয়ে না করার জবাবদিহি করতে হ'তো না।'

নিজের মনেই সুখলতা কহিল, 'মাতাল বলে ত্যাগ করি নি, করেচি দুশ্চরিত্র বলে।'

বিছানার উপর বসিয়া জহর কহিল, 'তুমি এই যে পালিয়ে এসেচ, এও সচ্চরিত্রের লক্ষণ?'

সুখলতা কহিল, 'পালিয়ে এসেচি মুক্তি পাবার জন্যে। আমার স্বামী শুধু অসচ্চরিত্র হ'লে না-হয় আত্মহত্যা ক'রে বাচতাম, কিন্তু আমার শাশুড়ী ননদ?—ওরে বাপ্ রে, বাংলা দেশে মেয়েদেব ওপর মেয়েদের অত্যাচারের সীমা নেই। যাক্ সে সব কথা, তোমার কাছে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই।'

জহর কহিল, 'তোমার পরমায়ু থেকে ক'বছর খসেচে?'

'সে আবার কি?'

'তোমার বয়স কত?'

সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'মেয়েমানুষ নিজের বয়েস সম্বন্ধে কখনো সত্যি কথা বলে না। কত দেখায় আমাকে তাই বল!'

দরজার দিকে চাহিয়া দুজনেই চুপ করিয়া গেল। এতক্ষণ তাহাদের মনেই ছিল না যে তাহারা

চুরি করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছে। কর্তার আওয়াজ পাইয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল।

সাড়াশব্দ মিলাইয়া যাবার পর, সুখলতা চুপি চুপি কহিল, 'যদি আমাদের এ অবস্থায় উনি দেখতে পান, তুমি কি বল্‌বে?'

'বলবার আর কিছু দরকার হবে না।'

'আমাকে যদি অপমান করে?'

'তোমাকে যদি অপমান করে তা হ'লে কি মনে কর, কোমর বেঁধে আমি ওর সঙ্গে লড়াই করতে যাবো?'

'যাবে না? চোখের সুমুখে মেয়েছেলের অপমান—'

জহর বলিল, 'ইস্কুলের ছেলেদের কাছে তুমি বক্তৃতা দিতে নাকি? মেয়েদের অপমানে যারা চঞ্চল হয়, তারা অজ্ঞানে মেয়েদের অসম্মানই করে। মেয়েদের শক্তির ওপর তাদের বিশ্বাসও নেই, শ্রদ্ধাও নেই।'

পা গুটাইয়া সুখলতা ঘেঁসিয়া শুইয়া পড়িল। শীতে যে তাহার কাঁপুনি ধরিয়াছিল তাহা তাহাব গলার আওয়াজ হইতেই বুঝা যায়। বলিল, 'তোমার ত গায়ে মোটা জামা আছে, চাদরটা রেখে তোমার কম্বলটা আমায় দাও।'

জহর রাগিয়া কহিল, 'এ তোমার জবরদস্তি।'

'বা রে, আমার যদি অসুখ করে?'

'তোমার অসুখ করলে দেখবার লোক পাবে, কারণ তুমি স্ত্রীলোক, আমার অসুখ করলে হাসপাতালে দিয়ে আসবার লোকও জুটবে না! জঞ্জালের মতো লোকে আমাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবে।' বলিয়া সে কম্বলটা সুখলতার কাছে সরাইয়া দিল।

কম্বল ঢাকা দিয়া সুখলতা শুইল। আলোটা এইবার নিবিয়া আসিতেছে, সেই দিকে একবার তাকাইয়া সে কহিল, 'সমস্তটাই মনে হচ্ছে আজগুবী। তুমি ঘুরছিলে কোথায় বাউণ্ডুলে হয়ে, আমি বেড়াচ্ছিলাম, পালিয়ে-পালিয়ে। গ্রহে-গ্রহে লাগ্‌লো ঠোকাঠুকি! অতি অল্প পরিচয়, কোনো জানাশুনো নেই, তবুও দু'জনে দু'জনকে চিন্‌লাম। কাল এমন সময় একজন আর একজনের কাছে হবে নিরুদ্দেশ—কোন তল্লাস নেই, কোনো চিহ্ন নেই—'

জহর বলিল, 'এ যে দেখচি বৈষ্ণব কবিতার রসতত্ত্ব, কাছাকাছি থেকে ছাড়াছাড়ির কথা ভাবা।'

সুখলতা কহিল, 'আচ্ছা, এতক্ষণের মধ্যে একবার জিজ্ঞেস করলে না আমি কিছু খেয়েছি কিনা?'

'ভাবছিলাম সে কথা! তুমি যদি বল কিছু খাই নি তা হ'লে বিপদে পড়বো। এত রাতে—'

'আজ সারাদিন আমার উপবাস গেল।'

'গেল-কাল খেয়েছিলে?'

'তা কেন খাবো না?'

জহর বলিল, 'তবে ত তুমি নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারবে।'

সুখলতা তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই জহর পুনরায় কহিল, 'এমন লোক আছে জানো, যারা রোজ একবার ক'রে খাবার কথা ভাবতেই পারে না? এমন লোক আছে জানো, যারা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, দু' হাত দিয়ে তারা খাবার গিল্‌চে?'

'খাওয়ার স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ, সে স্বপ্ন ভেঙে গেলে তাদের চোখে জল আসে।'

'উপবাস করলে যে কঠিন রোগ হয়।'

জহর বলিল, 'ভুল। সত্যিকারের দুঃখ যাকে পেতে হবে তার রোগ হয় না। দুঃখ হচ্ছে নির্ম্মল।'

দুইজনেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর এক সময়ে সুখলতা বলিল, 'তুমি কী নিয়ে থাকো? কী কর?...কেমন ক'রে চলে?'

'তোমার কি মনে হয়?' জহর ভ্রূ কুঞ্চন করিয়া তাকাইল।

'আমার মনে হয় তুমি কিছুই নিয়ে থাকো না, কিছুই কর না, এবং কোনো রকমেই তোমার চলে না।'

'বেশ, এর ওপর তোমার একটা মন্তব্য বসিয়ে দাও।'

সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'মন্তব্য বসালে তুমি রাগ ক'রে আমার কাছ থেকে কম্বলটা কেড়ে নেবে।'

'না, তার কারণ সবার মন্তব্যই আমার কাছে সমান। কেউ আমাকে বল্‌লে লক্ষ্মীছাড়া, কেউ বল্‌লে সর্ব্বত্যাগী; কাবো কাছে আমি জোচ্চোর, কারো কাছে পরোপকারী; কেউ বলে মিথ্যেবাদী, কেউ বলে ধার্ম্মিক।

'যাক্ বাঁচলাম, এবার তোমাকে বুঝতে পেরেচি। তুমি অসাধারণ নয়, অতি সাধারণ।'

আলোটা ধীরে-ধীবে ম্লান হইয়া নিবিয়া গেল। ঘর হইল ঘুটঘুটি অন্ধকার। অন্ধকার হইতে দুইজনে দুইজনকে মনে-মনে অনুভব করিতে লাগিল। দুইটি সমুদ্র যেন পাশাপাশি আসিয়া পরস্পরকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে। যত কথা এতক্ষণ পর্য্যন্ত হইল, এ যেন নিতান্তই মৌখিক, এ-আলাপের মধ্যে কোথাও আত্মীয়তার উত্তাপও যেমন নাই, তেমনি স্নেহ দাক্ষিণ্য অথবা সহানুভূতির স্পর্শও কোথাও ছিল না। দুইটি প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণে যেমন অগ্নি জ্বলে অথচ তাহাদের মধ্যে আগুন নাই, তেমনি ইহাদের ভিতরেও কোনোরূপ আন্তরিকতা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন!

সুখলতা পুনরায় কহিল, 'আজ পর্য্যন্ত কত রকম লোকই আমি দেখলাম। কত জায়গায় কত রকম—'

জহর বলিল, 'মেয়েদের অভিজ্ঞতার হিসাব শুনলেই আমার হাসি পায়। আত্মরক্ষা করতে-করতেই যাদের দিন কাটে তারা আবার দেখ্‌লো কী?'

রাত্রি আর হয়ত ঘণ্টা-তিনেক বাকি আছে। তর্ক এবং কথালাপ দুইটি নরনারীর মধ্যে আপন অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণে টানিয়া-টানিয়া চলিতেছিল। ইহা হইতে বিরতির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কথার নেশা যেন দুইজনকেই পাইয়া বসিয়াছে।

জহর বলিল, 'দু'জনেই ঘুমোলে সকাল-বেলা বিপদে পড়্‌বো। তুমি ঘুমোও, আমি রইলাম বসে। তুমি চলে গেলে দরজা দিয়ে ভোর রাতে আমি শোব।'

'ধন্যবাদ।' বলিয়া সুখলতা চোখ বুজিয়া পাশ ফিরিল। মিনিট-দুই পরে আবার মুখের উপর হইতে আবরণ সরাইয়া পুনরায় বলিল, 'কেমন লোক তুমি বল ত।'

জহর কহিল, 'কেন?'

সুখলতা চুপ করিয়া রহিল। পুরুষমানুষকে কোন বয়সেই বিশ্বাস করিতে নাই একথা তাহার মনে ছিল।

কিছুক্ষণ পরে জহর কহিল, 'রাত্রে কোন মেয়ের সঙ্গে এক ঘরে বাস করা আমার বিসদৃশ লাগে, দম বন্ধ হয়ে আসে।'

সুখলতা এবারেও কোন উত্তর দিল না, বোধ করি ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, হাত পা হয় ত এবার একটু গরম হইয়াছে। জহর আড়ষ্ট হইয়া পা গুটাইয়া কাৎ হইয়া শুইল।

আবার কিয়ৎক্ষণ পরে সুখলতা জাগিয়া উঠিল। কম্বলখানা নিজের গায়ের উপর হইতে তুলিয়া অন্ধকারে আন্দাজে জহরের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'এই নাও, আমি চলে গেলে তুমি যে বলবে মেয়েমানুষ অত্যন্ত স্বার্থপর, তা হবে না।'

জহর বলিল, 'তুমি শীতে কষ্ট পেয়ে গেলে এই বা ভাববো কেন? কম্বল তোমাকে গায়ে দিতেই হবে।' বলিয়া সে কম্বলখানি আবার সরাইয়া দিল।

'তবে আমার এই চাদরটা তুমি নাও।' বলিয়া চাদরখানা খুলিয়া সে জহরের দিকে ফেলিয়া দিল।

দুইজনেই শুইয়া আবার চোখ বুজিল। জহরকে জাগিয়া থাকিতে হইবে। বহু অবস্থায় বহু রাত্রে তাহাকে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছে। একবার দক্ষিণ দেশে সমুদ্রতীরে গিয়া রাত্রির দৃশ্য দেখিবার তাহার সাধ হয়। একাদিক্রমে আঠারো রাত্রি সে সমুদ্রতীরে বসিয়া কাটাইয়াছিল।

কতক্ষণ এমনি করিয়া কাটিয়াছিল কে জানে। কতখানি রাত্রি আর বাকি ছিল তাহাও জানিবার কোন উপায় ছিল না। সুখলতার তন্দ্রা আবার ভাঙিয়া গেল। আরামে এবং আনন্দে তাহার সর্ব্বশরীর তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনে হইল, তাহার গায়ের উপর কি যেন চাপিয়া ধরিয়াছে। আস্তে আস্তে সে হাত বুলাইয়া নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। দেখিল, একটা গরম মোটা জামা। জামাটা জহরের তাহা তাহার বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না।

অন্ধকারেই সুখলতা তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল। কিছুই দেখা গেল না, শুধু সেই পরিচিত ও অপরিজ্ঞাত লোকটার নিশ্বাস টানা এবং নিশ্বাস লইবার সোঁ সোঁ শব্দ সে চাহিয়া-চাহিয়া শুনিতে লাগিল। জানালা দিয়া যদি একবিন্দুও বাহিরের আলো আসিয়া পড়িত তাহা হইলে সে হয় ত দেখিত লোকটা কুঁকড়াইয়া ছোট হইয়া ঘুমাইয়া আছে। শীতে সে জর্জ্জর, ঘুমের ঘোরেও হয় ত কাঁপিতেছে, তবু তাহার নির্ব্বিকার মুখ পৃথিবীর প্রতি অসীম ঔদাসীন্যে ভরিয়া রহিয়াছে। সুখলতা তাহার নিদ্রাজড়িত চোখ টানিয়া একটু হাসিল। তাহার মনে হইল লোকটা শুধু অতিথিবৎসল নয়, শীত-গ্রীষ্মও সে জয় করিয়াছে।

দরজা ঠেলাঠেলির শব্দে আচমকা তাহাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দুইজনেই জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ইতিমধ্যে কখন না-জানি সকাল হইয়া গিয়াছে। বিস্ময়ে ও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দুইজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল।

অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় চীৎকার ও কটূক্তি করিয়া বাহিরে কাহারা দরজায় ধাক্কা মারিতেছে। সমস্ত এখনই জানাজানি হইয়া পড়িলে অপমান ও লাঞ্ছনার আর সীমা থাকিবে না; লুকাইবার স্থান নাই, পলাইবার পথ নাই। জহর পাথরের মতো বসিয়া রহিল।

রুদ্ধকণ্ঠে সুখলতা কহিল, 'আর ত উপায় নেই ধরা দেওয়া ছাড়া। কি হবে? কেন মরতে এলাম তোমার সঙ্গে?'

জহর ইঙ্গিতে তাহাকে চুপ করিতে বলিল।

দরজায় আবার ভীষণ জোরে ধাক্কা দিয়া একজন কহিল, 'কালা নাকি, শুন্‌তে পাচ্ছ না? বলি ওহে লবাবপুত্তুর?'

ভয়ে বিবর্ণ মুখে চুপি-চুপি সুখলতা কহিল, 'জিজ্ঞেস করলে কি বল্‌বো? আমার ত মাথা হেঁট হয়ে যাবে।'

আবার দরজায় শব্দ হইল। জহর করুণকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, 'কে মশাই?'

'দরজা খুলুন আগে—শীগ্‌গির খুলুন।'

জহর চুপি-চুপি বলিল, 'উঠে ওই কোণে গিয়ে লুকিয়ে ব'সো, কেউ যেন দেখতে পায় না জান্‌লা দিয়ে।'

বলিবামাত্র, উঠিয়া সুখলতা ঘরের কোণে গিয়া নিঃশব্দে লুকাইল। গলা উঁচু করিয়া জহর তারপর কহিল, 'জ্বর হয়েচে মশাই, উঠতে পাচ্ছি না, দয়া করে জান্‌লার ধারে আসুন।'

কম্বলটা মুড়ি দিয়ে সে জানালার ধারে কাৎ হইয়া রহিল।

চার-পাঁচ জন লোক জানালার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীওয়ালা কহিলেন, 'জ্বর হোক্ আর যাই হোক্ আপনি জাল্-জোচ্চুরি আর কতদিন করবেন শুনতে চাই।'

একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি কহিলেন, 'তোমার রোজগার যদি না থাকবে তবে ঘরভাড়া করেছিলে কেন? এটাত তোমার পিতৃপুরুষের জমিদারী নয়!'

বাড়ীওয়ালা কহিলেন, 'কে তোমাকে রাত্রে দরজা খুলে দিয়েছিল?'

'দবজা খোলাই ছিল।'

'খোলা ছিল? কক্ষণো না, আমি নিজে শোবার সময়—'

জহব সে-কথার উত্তর দিল না, শুধু ডান হাতটা বাড়াইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, 'আপনারা কেউ নাড়ী দেখতে জানেন?' বলিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল।

তাহার হাত কেহ ধরিল না ববং মাঝখানের লোকটা মুখ বিকৃত করিয়া বলিতে লাগিল, 'হাতী-হুটকো চেহাবা, রোজগার করতে পারো না? ঘরে যদি গরু পুষতাম তা হ'লে তারাও দুধ দিতো, গাধা রাখলে মোট বইতো, ঘোড়া হ'লে গাড়ী টান্‌তো। তুমি না-ঘোড়া, গা-গাধা।'

আর একটা লোক কহিল, 'মেয়েমানুষেরও অধম!'

জহর খক্-খক্ কবিযা বুকে হাত চাপিয়া কাশিল। এ-অপমানের মৌখিক জবাব দিতে পারে এমন শক্তিই তাহাব নাই। কুঁজো হইয়া পড়িয়া সে হাঁপাইতেছিল।

'জ্বব ছেড়ে আর কাজ নেই, কোনো ওষুধ-পত্র নয়, দু' ঘণ্টা সময় দিলাম, আপিস যাবার সময যেন দেখি, ঘর আমাব খালি। বিক্রি ক'রে ভাড়া আদায় করবার মতন কিছু আছে?'

জহব ধুঁকিতে-ধুঁকিতে হাত বাড়াইয়া তাহার জামাটা লইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'এই জামাটা— যদি চোরা বাজারে—দশ বারো আনা হয় ত হতে পারে!'

লোকগুলা নাসাকুঞ্চিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'ওকি ভদ্রলোকের জামা! মুচি-মুদ্দোফরাসেব গায়েও অমন জামা—থুঃ, বোকাপাঁঠার গন্ধ!'

বাড়ীওয়ালা কহিলেন, 'হোক্ আমার লোকসান, তুমি এখন বিদেয় হও তোমার জামা আর ছেঁড়া কম্বল নিয়ে, দু' ঘণ্টা সময় রইলো, তারপর না গেলে ধাক্কা দিয়ে—'

বলিতে বলিতে তাহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের পায়ের শব্দ এবং গলার আওয়াজ ক্রমে মিলাইয়া যাইবার পর জহর পিছন ফিরিয়া চাহিল। সুখলতা তখন কোণে বসিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসি চাপিবার মিথ্যা চেষ্টা করিতেছে। জহর তাহাকে ইঙ্গিতে কহিল, 'চুপ, শুনতে পাবে!'

অনেকক্ষণ তাহারা নির্ব্বাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রির আলোয় জহর যে-সুখলতাকে দেখিয়াছে, দিনের আলোয় তাহাকে দেখিয়া সে খুসী হইল। শিক্ষিত নারীর সম্বন্ধে তাহার ধারণা ভাল নয়। তাহারা কেতাদুরস্ত, অতিরিক্ত তাহাদের পালিশ, সর্ব্বাঙ্গে তাহাদের ছলনা, সহজ কথাকে ঘুরাইয়া অস্বাভাবিক চাতুর্য্য মিশ্রিত করিয়া তাহারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। এ-মেয়েটির কটাক্ষ নাই, আছে সহজ চাহনি, ইঙ্গিত নাই, আছে স্পষ্ট নির্দ্দেশ। ইহার বলিষ্ঠ দেহ, নিরলঙ্কার মুখশ্রী, অপরিমিত প্রাণপ্রাচুর্য্য। এ মেয়ে আকর্ষণ করে, কিন্তু প্রলুব্ধ করে না। নারীর সারল্য ইহাতে আছে, নারীর প্রতারণা ইহাতে নাই। তাহার মতো একজন স্বল্প-পরিচিত পুরুষের সহিত অনাহূতভাবে কেমন করিয়া এ নারীটি গত রাত্রে পথে নামিয়া আসিয়াছিল তাহা

জহর এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইল। সুখলতা কহিল, 'বোকার মত চেয়ে রইলে যে মুখের দিকে? হুঁস নেই?'

মুখ ফিরাইয়া লইয়া জহর বলিল, 'ভাবচি তোমার প্রশংসা করবো কি না।'

সুখলতা ব্যস্ত ও উত্যক্ত হইয়া কহিল, 'এই তার সময় বটে! বাল্মীকি মুনিরই কেবল একটি জিনিস ছিল যা আর কোনো পুরুষের মধ্যে নেই। সে হচ্ছে কাণ্ডজ্ঞান।'

জহর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'মেয়েরা কিন্তু একটিমাত্র বস্তুর অধিকারিণী, তার নাম উপস্থিতবুদ্ধি!' বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দরজার কাছে আসিয়া কান পাতিয়া সে শুনিল, বাহিরে কাহারও সাড়াশব্দ কিম্বা গলার আওয়াজ হইতেছে কিনা। তারপর সে নিশ্চিন্ত হইয়া অতি সন্তর্পণে খিল খুলিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একবার মুখ বাড়াইয়া চারিদিক দেখিয়া সে সুখলতাকে বাহির হইয়া আসিতে বলিল। গায়ে চাদর মুড়ি দিয়া সুখলতা বাহির হইতেই সে কহিল, 'গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও গে, আমি আসচি।'

সুখলতা দ্রুতপদে রাস্তায় নামিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া জহর একবার দাঁড়াইল। সঙ্গে লইয়া যাইবার মতো তাহার কিছু নাই। ছেঁড়া ও রুগ্ন কম্বল প্রমুখ যে বিছানাগুলি তাহার আছে সেগুলি সঙ্গে লইলে পথের লোক তাহাকে উন্মাদ বলিয়া পিছন দিক হইতে হাততালি দিতে পারে। নিজেকে ছাড়া আর কোন দরিদ্রকে সেগুলি দান করাও চলে না। সেগুলি ব্যবহারযোগ্য নয়, বোঝা মাত্র।

অতএব কেবল জামাটা গায়ে চড়াইয়া ও চামড়ার তালিমারা ক্যাম্বিশেব জুতাটা পায়ে লাগাইয়া সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল।

পথের মোড়ে সুখলতা দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া কহিল, 'দাঁড়াতে বললে কেন? তুমি কোনদিকে যাবে এখন?'

'যে দিকে বাড়ীওলা নেই। তুমি যাবে কোন্ দিকে?'

'দক্ষিণ দিকে। কারণ আমার শ্বশুরবাড়ী আর বাপের বাড়ী উত্তর দিকে।'

'দক্ষিণে কোথায় যাবে?'

'যমালয়ে নয়, ভবানীপুরে আমার মা'র খুড়তুতো বোনের শ্বশুরবাড়ী।'

'আচ্ছা, এক রাত্রের আলাপ, মনে রইলো, আর হয় ত দেখা হবে না। যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি—' বলিয়া জহর পা বাড়াইল।

সুখলতা স্নিগ্ধ হাসিয়া বলিল, 'তুমি যে নাটুকে কায়দায় বিদায় নিচ্ছ! কি করবে এখন শুনি?'

'কিছুই না, কোনো একটা বাগানে গিয়ে হয় ত ঘুমুবো, কিম্বা—'

'এখন গিয়ে ঘুমুবে?'

'যদি না ঘুমুই, কোনো খবরের কাগজের আপিসের ধাপে দাঁড়িয়ে চাকরীর বিজ্ঞাপনও পড়তে পারি।'

'নাওয়া-খাওয়া এ সব?'

জহর হাসিল। কহিল, 'কাল রাতে কচুরি খেয়েচি, আজকের দিনটা বেশ চলে যাবে।'

'খবরের কাগজ কি সারাদিনই পড়বে নাকি?'

'তার কি ঠিক আছে? কাগজ পড়ে হয় ত দেখবো চাকুরীর বিজ্ঞাপন আছে, চাকরীর বিজ্ঞাপন নেই। তখন হয় ত বা শিয়ালদায় গিয়ে রেললাইন ধরে হাঁটতেও পারি। তুমি যাও, তোমাকে আবার অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।' বলিয়া জহর আবার পা বাড়াইল।

দু'পা অগ্রসর হইয়া সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'তোমার এ-বিদায় নেওয়াটাও ভাল জমলো না। একটু হা হুতোশও ক'রে গেলে পারতে।' বলিয়া সে পিছন ফিরিয়া চলিতে চাহিল।

জহর বলিল, 'সেটা গল্পও হ'তো না, নাটকও হ'তো না, হ'তো ন্যাকামি। শোনো বলি,

ভবানীপুর জায়গাটা ছোট নয়, কোন্ রাস্তা আর কত নম্বর এটা জানা দরকার।'

'ঠিকানা আমার মনে আছে।'

কলিকাতার রাজপথে তখন জলস্রোতের মতো জনস্রোত নামিয়াছে। গাড়ী-ঘোড়ায়, ট্রামে মোটরে, মানুষে, গরুর গাড়ীতে সমস্তটা জট পাকাইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে। আশপাশের পথচারী এই দুইটি আশ্রয়চ্যুত নরনারীর প্রতি ভ্রূ কুঞ্চিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া চলিয়া যাইতেছিল। রাস্তায় এমন করিয়া কেহ আলাপ করে না।

জহর উদাসীন হইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই সুখলতা বাঁ হাতখানি বাড়াইয়া কহিল, 'আমার এই সোনার বালাগাছটা বিক্রি ক'রে দিতে পারবে?'

জহর কহিল, 'না, আমি নিঃসম্বল অবস্থায় বেশ নিরাপদ, কিন্তু সোনার গহনা কাছে থাকলে আমার রেহাই নেই।'

'কেন?'

'আমার আপাদমস্তক ছিন্নভিন্ন অবস্থায় অঙ্গে সোনা মানায় না। তোমার হাতের বালা বিক্রি করতে গিয়ে হয় ত পুলিশের বালা আমায় হাতে পরতে হবে।'

'তুমি কি চোর যে পুলিশকে ভয়?'

জহর হাসিয়া কহিল, 'চোর হ'লে ত ভয় ছিল না, পুলিশকে এখন ভয় করে ভদ্রলোকেরা, শিক্ষিতেরা।'

সুখলতা কহিল, 'চুপ কর, বাজনীতিব প্রতি কটাক্ষ ক'রো না, ওর নাম আইন ও শৃঙ্খলা।'

জহর হাসিয়া কহিল, 'শৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খল!'

দুইজনে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর অগ্রসব হইল। জহর একসময়ে বলিল, 'মেয়েদের নিরাপদে থাকবাব কোনো আশ্রয় এদেশে নেই।'

সুখলতা কহিল, 'এতগুলো আশ্রম আর নারী-মন্দির তবে কি জন্য?'

'সব জায়গাতেই পয়সা লাগে। যেখানে পয়সা লাগে না সেখানে রূপ আর যৌবনের দরকার।'

'তার মানে?'

মানে, দুনিয়ায় যুধিষ্ঠিরের সংখ্যা বেশি নেই। সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মূলে যেটা থাকে সেটা দান, শোষণ।'

কি যেন ভাবিয়া সুখলতা কহিল, 'মেয়েরা কিন্তু আসলে সচ্চরিত্র। আজ পর্য্যন্ত বহু পুরুষ নারী-প্রতিষ্ঠান খাড়া করেচে, কিন্তু কোন নারীর দল আজ পর্য্যন্ত পুরুষদের জন্য প্রতিষ্ঠান দাঁড় করায় নি।'

জহর খুব খানিকটা হাসিল। তারপর বলিল, 'উল্টোটাও হতে পারে। নিজেদের চরিত্রে তাদের বিশ্বাস নেই, তাই জন্যই হয় ত, কিন্তু মেয়েরা এমনি একটা কিছু করলে আমরা যে বেঁচে যাই। আমাদের মতো বেকার, আশ্রয়হীন আর ভবঘুরে যুবকদের দল তা হ'লে—'

সুখলতা কহিল, 'এই ত একটা বগজ তোমার মিলে গেল। এই নিয়ে কোনো সাপ্তাহিক কাগজে মেয়েদের নাম দিয়ে গরম-গরম প্রবন্ধ লেখ। মেয়েদের নামে মেয়ে-বিদ্রোহ ছাপলে কাগজও কাটে।'

জহর কহিল, 'হাঁ, কলেজের ছাত্র-মহলে প্রথমেই তা হ'লে সাড়া পড়ে যায়। মেয়েদের লেখা পড়েও তাদের আনন্দ।'

বেলা হইয়া গিয়াছিল। চারিদিকে শীতের আরামদায়ক রৌদ্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। চলিতে-চলিতে কাছেই গোলদীঘির মধ্যে তাহারা ঢুকিল। সুমুখেই শান-বাঁধানো সিঁড়ির নিচে পরিষ্কার জল চক্-চক্ করিতেছে। দুইজনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া মুখে চোখে জল দিতে বসিল।

'আমি বাপু উপোস ক'রে আর থাকতে পারি নে। বালা একগাছা যা হোক ক'রে বেচতেই হবে। তোমার কাছে কিছু নেই ত?'

জামার পকেট হইতে অচল দু' আনিটি বাহির করিয়া জহর কহিল, 'ইনি সব জায়গাতেই অচল—একেবারে সতী-সাবিত্রী, আমাকে ছেড়ে কোথাও ইনি যাবেন না।'

সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'চল একটা স্যাকরার দোকানে দেখি গে, আমিও না হয় থাক্‌বো তোমার সঙ্গে।'

স্যাক্‌রার দোকান অনুসন্ধান করিতে করিতে দুইজনে চলিল। কিছুদূর গিয়া বাঁ-হাতি একটা ময়রার দোকান দেখিতে পাইয়া সুখলতা দাঁড়াইল। বলিল, 'দাও দেখি দোয়ানিটা চলে কি না দেখি, তুমি গিয়ে ওই গ্যাসের খুঁটিটার কাছে দাঁড়াও গে, আমি আসচি।'

ক্ষুধা পাইলে ক্ষুধা চাপিয়া থাকিবার মেয়ে সুখলতা নয়। মুখখানি তাহার শুকাইয়া গিয়াছিল। এত কষ্টেও তাহার সে সুন্দর মুখে কোথাও রেখা পড়ে নাই, বরং রৌদ্র লাগিয়া ইতিমধ্যেই রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। দোকানে উঠিয়া সে কহিল, আপনাদের এখানে বসে খাবার বন্দোবস্ত আছে।'

মেয়েরা সাধারণত দোকানে বসিয়া খায় না। দোকানি কহিল, 'হ্যাঁ, আসুন না, জায়গা ক'রে দিচ্ছি। কি খাবেন?'

গরম-গরম খাবার ভাজা হইতেছিল। সুখলতা মনে মনে হিসাব করিয়া দুই আনার মতো দিতে বলিল। তারপর দোকানির নির্দ্দেশমতো এক কোণে নির্জ্জনে পরিষ্কার একখানা বেঞ্চের উপর গিয়া বসিল।

একটি ছোকরা বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে এক ঠোঙা খাবার ও এক ঘটি ঠাণ্ডা জল তাহার কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে ঘটির জলে হাত মুখ ধুইয়া ও জল খাইয়া সুখলতা বাহিরে আসিয়া দু' আনিটি বাহির করিয়া দিল। সেটি হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া দোকানি কহিল, 'এটা ত আপনার চল্‌বে না?'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুখলতা কহিল, 'সে কি, চল্‌বে না? এই যে নিয়ে এলাম কালীবাড়ীর ঠাকুরমশায়ের কাছ থেকে।'

দোকানি কহিল, 'ও, তা ত হবেই। যত অচল টাকাপয়সা লোকে আজকাল ঠাকুরের দোরে দিয়ে যায়। ঠাকুরমশাইরাও সর্ব্বত্যাগী, কাছে কিছু রাখেন না।'

সুখলতা করুণ ও মধুর হাসি হাসিয়া কহিল, 'তা হ'লে কি হবে? আমার কাছে আর ত কিছু নেই।'

দোকানি তাহার হাসিতে মুগ্ধ হইয়া কহিল, 'বউনির সময় কি না, নৈলে আট আনারই খেয়ে যান না—' বলিয়া অচল দু' আনিটি সে সুখলতার নরম হাতের তালুটি ছুঁইয়া ফিরাইয়া দিল। তারপর পুনরায় কহিল, 'এক সময় দিয়ে যাবেন, কি আর বল্‌বো বলুন, আপনি ভদ্রঘরের মেয়ে—'

'আচ্ছা বাবা, দিয়ে যাবো এক সময়।' বলিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া সুখলতা এক-পা এক-পা করিয়া চলিতে সুরু করিল। কিছুদূরে জহর দাঁড়াইয়া ছিল, কাছাকাছি আসিয়া তাহাকে ইঙ্গিতে অনুসরণ করিতে বলিয়া সে চলিতেই লাগিল। দোকানির দৃষ্টি আগে ছাড়াইয়া যাইতে হইবে।

অনেক দূর পথ আসিয়া তাহারা আবার একত্র হইল। সুখলতা হাসিতে হাসিতে গায়ের চাদরের তলা হইতে আঁচলে বাঁধা খাবারের পুঁটুলি বাহির করিয়া কহিল, 'চল, আগে কিছু খেয়ে নেবে।'

জহর বিস্মিত হইয়া তাকাইতেই সুখলতা অচল দু' আনিটি তাহার পকেটের মধ্যে পুরিয়া দিল। তারপর কহিল, 'কিছুই খাই নি, তবে বসে-বসে শুধু আত্মসাৎ করেছি। চল।' বলিয়া সে জহরের হাত ধরিয়া টানিল।

ভবানীপুরের বাসা খুঁজিয়া তাহারা দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল. দুইজনের মধ্যে তখন ইত্যবসরে

একটা চুক্তি হইয়া গেছে। সুখলতা ঠিক করিয়াছে মাসিমার বাড়ী সে বেশীদিন থাকিবে না; হাওড়া ষ্টেশনে সে 'লেডি বুকিং ক্লার্কে'র চাকরী লইবে। যদি সে চাকরী না মিলে তবে সে জহরের সহিত একত্রে একটা চায়ের দোকান খুলিয়া লোককে চমকাইয়া দিবে। ছাত্র-মহলে সাড়া আনিবে।

জহর ইতিমধ্যে দাড়ি কামাইয়া লইয়াছে। নাপিত ডাকিয়া কোনো এক গৃহস্থ-বাড়ীর দরজায় বসিয়া দাড়ি চাঁচিয়াছে! নাপিত পয়সা চাহিলে সে দু' আনিটি বাহির করিয়াছে। কিন্তু সে দু' আনি চলে নাই। অগত্যা নাপিত বাড়ীটা দেখিয়া চলিয়া গেছে, আগামীকাল সেই বাড়ীতে গিয়া ডাকাডাকি করিয়া পয়সা চাহিবে। দাড়ি কামাইয়া তাহার মুখ হইয়াছে পরিষ্কার, সুখলতা তাহার চেহারার একটু প্রশংসাও করিয়াছে। সে নাকি সুপুরুষ।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া সুখলতা দরজার কড়া নাড়িল। কড়া নাড়িয়া যখন কেহ সাড়া দিল না, তখন সে দরজা ঠেলিল। দরজা খোলাই ছিল। জহরকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে এদিক-ওদিক চাহিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। বহুদিন পরে আজ মাসিমার সহিত তাহাব সাক্ষাৎ হইবে।

জহর তাহার পথের দিকে তাকাইয়া কয়েক মিনিট দাঁড়াইল। আশ্রয় একটা সুখলতার মিলিয়া গেল, আর কিছু চিন্তা করিবার নাই! সুখলতা অবলা নয়, নাবী। এদেশে নাবীর চেয়ে অবলার সংখ্যাই বেশী। তবু নারীর সম্বন্ধে চিন্তা করা জহরেব স্বভাব-বিরুদ্ধ। নিজের প্রতি যাহার ঔদাসীন্য, অন্যেব প্রতি তাহার আকর্ষণ নাই। সুখলতার জন্য এমনি করিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে সে অপরিসীম দৈন্য অনুভব করিতেছিল। সুখলতাব পিছু-পিছু অনুসরণ কবিয়া বেড়াইতে তাহার অপমান বোধ হইল। তাহার সাহায্য শেষ হইয়া গেছে, আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। এই মেয়েটির কথা তাহার মনে বহিয়া গেল।

জহর একটু আগেকাব চুক্তি ভাঙ্গিযা দিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিতে সুরু করিল। কোনরূপ চুক্তি ভাঙ্গিতে তাহার একটুকু বিলম্ব হয না। বাস্তবিক কাল রাত্রি এবং আজকেব সকালটা যেন স্বপ্নের মতো কাটিয়া গেল। জীবনের আকস্মিক ঘটনাগুলির সঙ্গে সচরাচর জীবনের যোগ নাই, তাই সেগুলি সত্য হইয়াও স্বপ্ন। সেগুলির সহিত আত্মার যোগাযোগ আছে, কিন্তু আত্মীয়তা নাই। আত্মীয়তা যে নাই তাহা সুখলতা মনে কবাইয়া দিয়া গেল। সুখলতার সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, বন্ধন হয় নাই। জহর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, একটা আবর্ত্ত সে পার হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে বিশেষ ঘুরপাক খাইতে হয় নাই।

নারীর সহিত আলাপ করিয়া যাহারা শেষকালে তাহার জন্য বিলাপ করে জহর সে দলের লোক নয়। ভালবাসিবাব জন্য মানুষ আজ পর্য্যন্ত যত অশ্রুপাত করিয়াছে, ভালবাসার জন্য অত করে নাই। সে বস্তুর ধরা-ছোঁওয়া পাওয়া যায় না, মানবজাতিব আকর্ষণ তাহার প্রতিই অধিক। প্রেমের জন্য এত চোখের জল জমা হইয়াছে। অথচ মনুষ্যত্বের অপমানে চারিদিক ভাসিয়া গেল; পৃথিবীতে এত ধর্ম্মপ্রচার করা হইয়াছে, অথচ আজ পাপ ছাড়াইয়া গেল পুণ্যেব পরিমাণকে। সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ বর্ব্বরতার মধ্যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি!

বড় রাস্তাটা পার হইয়া জহর সুমুখেব পথটা ধরিয়া চলিল। এই পথটা বরাবর গিয়া মিশিয়াছে কালী-মন্দির পর্য্যন্ত। সম্ভবতঃ আজ কোন একটা পর্ব্বদিন। স্ত্রীপুরুষ-পুণ্যার্থীর দল ভিড় করিয়া চলিয়াছে। পুণ্যের প্রতি তাহাদেরই লোভ বেশী যাহারা পাপকে আশ্রয় দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। জীবনে যাহারা মনুষ্যত্ব আহরণ করে নাই, ধর্ম্মকে অপহরণ করিবার লোভ তাহাদেরই অধিক। যাহারা ধার্ম্মিক নয় তাহারা ধর্ম্মভীরু। ধর্মভীরু পুরুষের চেয়ে ধর্ম্মভীরু নারীর সংখ্যাই সংসারে প্রচুর। আজ পর্য্যন্ত যত লোক তীর্থ করিতে যাত্রা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ নারী।

জনস্রোতের মধ্যে ভাসিয়া-ভাসিয়া জহর চলিতেছিল। দুইধারে দোকান, বাজার, মেলা, ফেরি, গাড়ীঘোড়া, ভিখারীর চীৎকার, খঞ্জনীর গান, পাণ্ডাদের গণ্ডগোল, অশ্লীল গালী-গালাজ, রামকৃষ্ণ মিশনের গেরুয়া-পরার দল, নারীর কলকণ্ঠের হাসাহাসি—সমস্তটা মিলিয়া একটা ভয়ানক রোল

উঠিয়াছে। তীর্থের পরিচয় ইহার বেশী আর কিছু নাই। এদেশে তীর্থকে কেন্দ্র করিয়া যত পাপের চক্রান্ত। একদিকে প্রচণ্ড ক্ষুধা অন্যদিকে প্রবল আত্ম-অপমান। আত্ম-অপমানই এখনকার গৌরব। পৃথিবীতে আসিয়া আত্ম-অপমান যাহারা করিতে পারিল না, দুরবস্থার চাপে তাহাদের মাথা চিরদিন হেঁট হইয়া রহিল। আত্ম-অপমান করিয়া যাহারা অর্থোপার্জ্জন করে তাহাদের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যই মানুষের একমাত্র স্বপ্ন। ঐশ্বর্যের পদপ্রান্তে পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অনাচার, সভ্যতা ও বর্ব্বরতা, প্রেম ও প্রবঞ্চনা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐশ্বর্য্য এমন একটি বস্তু যাহার জাতবিচার নাই। শাঠ্য ও সভ্যতা, নীচতা এবং ন্যায়, মাৎসর্য্য ও মানবতা—সব কিছুকেই সে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিয়াছে। ঐশ্বর্য্যই কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্যই ধ্বংসের প্রতীক।

কোথায় সে এমনি করিয়া চলিয়াছে তাহাই জহর একবার চিন্তা করিয়া দেখিল। গন্তব্য কোথাও তাহার নাই। গন্তব্য শেষ অবধি কাহারই বা আছে! গন্তব্য সন্ধান করিতে-করিতেই যত শিক্ষা সাধনা, জ্ঞান-সভ্যতা; গন্তব্যের জন্যই যত স্বার্থত্যাগ, শুভবুদ্ধি ও কল্যাণকামনা। জহরের কোনো গন্তব্য নাই।

নিজের মনে সে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কিছুদিন হইতে রঙীন বুদ্‌বুদের মতো কতকগুলি বড়-বড় কথা তাহার মাথার মধ্যে ভিড় করিতেছে। বাস্তবিক, এখনকার শিক্ষিত লোকেরা আপনাদের দৈন্য, লজ্জা ও দারিদ্র্যকে ঢাকিবার জন্য কতকগুলি ফাঁকা দার্শনিক তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত সমাজে যে বস্তুটি সকলের চেয়ে বেশী প্রসারলাভ করিয়াছে, সেটি আত্ম-প্রবঞ্চনা। আত্ম-প্রবঞ্চনা ও আত্ম-অবিশ্বাস। বড়-বড় কথা বলিয়া যাহারা মানুষের মন ভুলাইতে চায় বুঝিতে হইবে আপনাকে ভুলাইতেই তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইযাছে। ভিতরে যাহাদের কিছু নাই, বাক্‌পটুত্বই তাহাদের একমাত্র সম্বল। জগতে কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির নাম করিয়া যাহারা অনাবশ্যক বাক্য ও শব্দ সৃষ্টি করিয়াছে তাহারা নিতান্ত দরিদ্র এবং অসহায়। নিজের ভিতর ও বাহিরের নির্জ্জনতাকে মুখর করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের এই কাঙালপনা। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, তিনি সর্ব্বস্বহারা।

অনেক বেলা অবধি জহর ঘোরাফেরা করিল। আজ সকলের চেয়ে তাহার বড় সান্ত্বনা, আহারাদির উপদ্রব নাই। একটুখানি কোথাও বিশ্রাম করিয়া লইয়া অনায়াসেই সে আবার হাঁটিতে সুরু করিতে পারিবে। পাশেই একটা ধর্ম্মশালা দেখিয়া সে দাঁড়াইল। ধর্ম্মশালায় বিনামূল্যে আশ্রয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু দরোয়ান প্রমুখ সকলকে বক্‌শিস দিতে-দিতে শেষ অবধি ঘর ভাড়ার পরিমাণকেও ছাড়াইয়া যাইতে থাকে। মূল্যদান করিয়া আজকাল দানের মূল্য দিতে হয়।

অগত্যা সে মন্দিরের দরজায় আসিয়াই উঠিল। ভিতরে এত গোলমাল এবং ভিড় যে দাঁড়াইবার উপায় নাই। দেবমূর্ত্তি সাধারণতঃ মাটি এবং পাথরের তৈরি কেন হয় তাহার কারণ, মাটি ও পাথরের সহিষ্ণুতা। মূর্ত্তি জীবন্ত হইলে পুণ্যার্থীর অত্যাচারে পাগল হইয়া তাহাকে দেশত্যাগ করিতে হইত। মাটি, পাথর ও চিত্রপটই মানুষের অসংখ্য নির্ব্বোধ কামনার সাক্ষ্য। জহর একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজিবার জন্য পা বাড়াইল।

কিন্তু পা বাড়াইতেই হঠাৎ পিছন দিক হইতে কে একজন প্রাণপণ মুঠিতে তাহার ডান হাতখানা আঁকড়াইয়া ধরিল। মুখ ফিরাইতেই সে অবাক হইয়া গেল। কহিল, 'তুমি? তুমি ফিরে এলে যে?'

দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট সজোরে চাপিয়া সুখলতা হাঁপাইতেছিল। হাতখানা সে তেমনি করিয়া চাপিয়া ধরিয়াই হাসিমুখে কহিল, 'অনেক কষ্টে তোমাকে পেয়েছি—অনেক খুঁজে—' বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখে জলের রেখা ফুটিয়া উঠিল। পুনরায় বলিল, 'পথের দু'ধারে দেখতে-দেখতে এসেচি—অলি-গলি, দোকান-বাজার—এবার আসছিলাম তোমার জন্য ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়তে।'

'ঠাকুরের কাছে? তুমি ঠাকুর মানো?'

'হিঁদুর রক্ত আছে যে গায়ে! দুঃসময়ে ঠিক মানতেই হয়! চল; এখান থেকে বেরিয়ে এসো।'

দুইজনে পথে বাহির হইয়া আসিল। সুখলতা তাহার হাত ছাড়িল না, তেমনি করিয়া চাপিয়া ধরিয়া রহিল। জহর কহিল, 'মাসিমা কি বললেন?'

'তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন আমি শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়েচি। আমাকে তিনি জায়গা দেবেন না।'

সুখলতা করুণ হাসি হাসিল। পরে কহিল, 'আমি অনেক অনুনয় করলাম, শেষ পর্য্যন্ত পায়েও ধরলাম; তিনি বললেন, পালানো মেয়েকে জায়গা দিলে বদ্‌নাম হবে।'

জহর কহিল, 'তোমাকে জায়গা দিলেন না, তাব মানে নিজের ওপর তাঁর শ্রদ্ধাও নেই, বিশ্বাসও নেই।'

সুখলতা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চলিতে লাগিল, তারপর এক সময় বলিল, 'যাক্ গে—চল।'

রাস্তায় ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহারা একান্তে পাশ কাটিয়া চলিতে লাগিল। সুখলতা কহিল, 'উঃ, একটু আগে আমি একেবারে অন্ধকার দেখেছিলাম! মেয়েমানুষ যত বেপরোয়াই হোক, অবলম্বন একটা খোঁজেই।'

জহর বলিল, 'কাল রাত্রে তুমি ত একথা বল নি? তোমার মতো মরিয়া আর স্বার্থপর মেয়ে—ছাড়ো, হাত ছাড়ো—'

হাত সুখলতা ছাড়িল না, কহিল, 'না, হাত ছাড়লে তোমাকে আব খুঁজে পাবো না!'

জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই সুখলতা স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, 'তুমি ছাড়া এখন আর আমার কোনো আশ্রয় নেই।'

জহর বাগ কবিযা কহিল, 'তুমি যে বীতিমত একটা উপন্যাসের নাযিকা হয়ে উঠলে!'

সুখলতা উত্তর দিল, 'নায়িকা হতে পাবি কিন্তু কাঁচা উপন্যাসের নয।'

জহর কহিল, 'পথের লোক কি মনে কববে বল ত?'

'মনে আগেই করেচে।' সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'একটু আগে দু'টি ছেলে আমাকে দেখে কি ভাবলো কে জানে—পিছু নিয়েছিল, আমি ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে তাদের মন্দিরের পথটা কোন্ দিকে জিজ্ঞাসা করলাম। ব্যাস্, আর কি, এখনকার ছেলেদের দিকে হাসিমুখে তাকাবার যো নেই, তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারও করবার উপায় নেই।'

'কি করলে? খেলা করলে বুঝি তাদের নিয়ে?'

সুখলতা হাসিযা কহিল, 'রাম বল! নিতান্তই অযোগ্য খেলনা!'

বেশী দূর তাহারা গেল না, পথের পাশেই একটা চালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। গত রাত্রে একটা আশ্রয় যা হোক মিলিযাছিল কিন্তু আজ তাহাও পাইবার উপায় নাই। অথচ শীতের বেলা, ইহার মধ্যে রৌদ্র পাতলা হইয়া আসিতেছে, আর কয়েক ঘণ্টা পরে অগাধ সমুদ্রে তাহাদের হাবুডুবু খাইতে হইবে। চালার ঘরের দরজায় তালা লাগানো দেখিয়া তাগারা সেইখানেই বসিয়া পড়িল। দুইজনেই সকাল হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িযাছে।

সুখলতা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, 'তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারো না?'

পথের গোলমালের দিকে চাহিয়া জহর বলিল, 'যেটা করচি এটা তবে কি?'

'তা তুমিও জানো না, আমিও না।'

জহর কহিল, 'আমি কিন্তু জানি।'

'জানো? কী বল ত?'

'আসলে এটা কিছুই না।'

সুখলতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। বলিল, 'আমি ভাবছিলাম তোমার মুখ যা আল্‌গা, হয় ত একটা বেমক্কা কথা বলে বসবে।'

জহর কহিল, 'এই কথাই বলতাম, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা কঠিন কাজ, যারা দুর্ব্বল তারা আসক্তির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।'

একটু থামিয়া সুখলতা কহিল, 'আমি যদি তোমার সঙ্গে একটা কিছু সম্বন্ধ পাতাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠি তা হ'লে মেয়েমানুষ বলে ক্ষমা ক'রো, কেমন?'

জহর হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, 'তোমার ভূমিকাগুলো মন্দ লাগে না। কিন্তু তুমি আর যাই কর সম্বন্ধ পাতিয়ো না। সম্পর্কও নেই, সংস্পর্শও নেই—এমন স্থলে কোনো সম্বন্ধ হতেই পারে না। ওটা এখন মুলতুবি থাক।'

সুখলতা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'মেয়েদের মন, জানো ত? ভারি অস্বস্তি ঠেক্‌চে।'

'ওটা দুর্ব্বলতা। আমাদের পরস্পরকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকতে দাও। তাড়াতাড়ি ভাই-বোন একটা কিছু পাতিয়ে গোঁজামিল দিতে চেয়ো না। ছাড়াছাড়ি যখন হবে, তখন যেন অতি সহজে দু'জনে দু'দিকে চলে যেতে পারি।'

মুহূর্ত্তের জন্য দুইজনে যেন একটি অপ্রত্যাশিত নীরবতার মধ্যে ডুবিয়া গেল। তারপরই জহর ধীরে-ধীরে কহিল 'শেষের কথাটায় আমার গলাটা একটু ভারি হয়ে আসছিল, না?'

সুখলতা বলিল, 'হ্যাঁ, একটু। বোধ হয় তোমার ভেতরটা একেবারে শুকিয়ে যায় নি। একেবারে শুকিয়ে যাওয়াই মৃত্যু।'

জহর হাসিয়া কহিল, 'মনে হচ্ছে তুমি আমার মনে রসসঞ্চার করবার চেষ্টায় আছো।'

সুখলতা কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় একটি লোক আসিয়া দাওয়ার উপর উঠিল। লোকটির গায়ে নামাবলী, পরণে তসরের থান, মাথায় শিখা, হাতে সাজি। বোধকরি পূজা সারিয়া ফিরিয়াছে। জহরের দিকে ফিরিয়া সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথা থেকে আসচো বাবা?'

জহর কহিল, 'অনেক দূর থেকে। এই ইনি এসেচেন সঙ্গে, গোপালপুরের 'মাতৃ আশ্রমে'র ইনি বড় মেয়ে—আমি সেখানকার ইস্কুল-মাস্টার।'

লোকটি বলিল, 'বেশ, বেশ, কি উদ্দেশ্যে আসা?'

'মন্দিরে এঁকে বসাতে এসেচি, আশ্রমের জন্য কিছু চাঁদা তুলবেন। সতী-ব্রহ্মচারিণী নামে এঁর পরিচয়।'

সুখলতা তাহার আকস্মিক অভিনয়ে হতচকিত হইয়া মাথা হেঁট করিয়া ছিল।

লোকটি প্রৌঢ়, সুখলতাকে দেখিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ও স্নেহের উদয় হইল। বোঝা গেল, জহরের আলাপে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

জহর কহিল, 'আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

'খুব। আমার নাম শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। যাত্রীদের পুজো করি মন্দিরে গিয়ে। এরই পিছন দিকে আমার বাসা। এই ঘরগুলোয় যাত্রীরা ভাড়া থাকে। দাঁড়াও বাবা, আমি সতী-মায়ের সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। এই ঘরখানায় ওঁর থাকা চল্‌বে ত? অবশ্য উনি মন্দিরেও থাকতে পারেন। এসো মা, এসো।'

নিতান্ত বিনীতভাবে জহর ও সুখলতা উঠিয়া দাঁড়াইল। লোকটি সুমুখের ঘরের দরজাটা খুলিয়া দিল। জহর মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ভিতরে একখানা তক্তা ও দেয়ালে একখানা ঝুলপড়া কালীর ছবি ছাড়া আর কিছুই নাই। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'সঙ্গে কিছু নেই ত? আচ্ছা বাবা, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমরা ততক্ষণ—এই যাবো আর আসবো। আহা, মায়ের আমার লক্ষ্মীর মতো শ্রী!' বলিতে-বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সুখলতা জহরের মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া এতখানি জিব বাহির করিল। বলিল, 'সর্ব্বনাশ, কি করলে তুমি?'

জহর চুপি-চুপি বলিল, বাঁচ্‌তে হবে ত!'

'এমন করে বাঁচ্‌তে হবে?'

'এমনি ক'রে বাঁচাই এদেশে সহজ।'

কয়েক-মিনিটের মধ্যেই ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া আসিলেন। জহর তখন বিনীতভাবে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কহিলেন, 'মন্দিরে বসবেন, শাদা কাপড় ত ওঁর পরা চল্‌বে না। এই লালপেড়ে গেরুয়াই—এই নাও মা, কাপড়খানি তুমি পর।'

কাপড়খানি হাতে লইয়া সুখলতা কহিল, 'সিঁদুর আছে বাবা?'

ভট্টাচার্য্য মুখ বিস্তীর্ণ করিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, 'ছেলে কি তোমার অজ্ঞান মা? সিঁদুর যে আগেই সঙ্গে এনেচি।' বলিয়া তিনি একটি কাগজের মোড়ক তাহার হাতে দিলেন।

সুখলতা কহিল, 'এতই যদি করলেন তবে একখানি চাদরও দিন বাবা!'

'এক্ষুনি আন্‌চি।' বলিয়া ভট্টাচার্য্য আবার ছুটিতে-ছুটিতে চলিয়া গেলেন এবং তিন মিনিটের মধ্যে একখানা গেরুয়া রঙের চাদর আনিয়া হাজির করিলেন।

দুইজনে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুখলতা গেরুয়া শাড়ী ও চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। সিঁদুর মাখিয়া সে তখন মাথার সুমুখের চুলগুলি বাঙা করিয়া তুলিয়াছে। হেঁট হইয়া সে ভট্টাচার্য্যের পায়ের কাছে প্রণাম করিতেই তিনি কহিলেন, 'এসো মা, এসো, উদ্দেশ্য তোমার সিদ্ধ হোক।'

ধীরে-ধীরে সুখলতা পথে আসিয়া নামিল। জহরকে ডাকিয়া একটু হাসিয়া অতি কুণ্ঠিত কণ্ঠে চুপি-চুপি ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'কিছু মনে ক'রো না বাবা, এই আমাদের কাজ। শাড়ী আর চাদরের দরুণ পাঁচটি টাকা আর ঘরভাড়া রোজ আট আনা হিসাবে—'

জহর কহিল, 'নিশ্চয়, সে আপনি পাবেন বৈ কি।'

'এখনই কি দেবে বাবা?'

'কাল সকালে নিলে হয় না?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাড়া নেই, তোমার সুবিধে মতন—আর আমার হাতের কাছে ত রইলে!'

বেলা পড়িয়া আসিল। মন্দিরে আজ সন্ধ্যায় বিশেষ আড়ম্বরের সহিত আরতী হইবে। লোক-জন, স্ত্রী-পুরুষ, জড়ো হইয়া এখন হইতেই হৈ-চৈ করিতে সুরু করিয়াছে। এক জায়গায় কালী-কীর্ত্তন বসিয়াছে।

সম্রাজ্ঞীর মতো মাথা উঁচু করিয়া ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টিতে সুখলতা আসিয়া দাঁড়াইল। মুখখানির চারিদিকে তাহার জোতির্ম্মণ্ডল, চোখে তাহার স্বর্গীয় দ্যুতি, অধরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিতে আঁকা বিচিত্র হাস্যরেখা—সমস্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গের অপরিমিত যৌবন-শ্রীর সহিত মিলিয়া তাহাকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

ভট্টচার্য্য কোথা হইতে কুলকাঠ আনিয়া আগুন জ্বালিতে বসিলেন। আগুন জ্বালা হইলে কোন পাণ্ডার নিকট হইতে একখানি আসন আনিয়া সতীমায়ের জন্য পাতিয়া দিলেন। পাশেই জহর দাঁড়াইয়াছিল, তিনি বলিলেন, 'আমি এখুনি প্রচার ক'রে দিচ্ছি চারিদিকে, তুমি বাবা এখানেই থাকো। আর আমার টাকাটার কথা যেন—হেঁ—হেঁ—' বলিতে-বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখিতে-দেখিতে স্ত্রী-পুরুষ জমিয়া গেল। সকলে মিলিয়া এই পরমাসুন্দরী যুবতী ব্রহ্মচারিণীটিকে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। ব্রহ্মচারিণী নাকি সধবা ও কুমারীর হস্তরেখা নির্ভুল বিচার করিতে পারেন। সমগ্র ভারতের সকল তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া হিমালয়ের কোন্ দুর্গম গিরিগুহায় এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়া দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় তিনি আবার মানব-সমাজে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

ভিড় ক্রমশ বাড়িয়া উঠিয়া হৈ-চৈ করিতে লাগিল। সেই ভিড়ের ভিতরে কাহাকে উদ্দেশ

করিয়া সতীদেবী অভয় হস্ত বাড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ একটি লোক গললগ্নীকৃতবাসে সাশ্রুনেত্রে লোকজন ঠেলিয়া সরিয়া আসিল এবং আসিয়াই সে আর দেরি করিল না, জামার পকেট হইতে একটি দু' আনি বাহির করিয়া দেবীর চরণে নিবেদন করিয়া সটান্ তাঁহার পদতলে উপুড় হইয়া পড়িল। সুখলতা জহরের কীর্ত্তি দেখিয়া মনে-মনে কৌতুক বোধ করিল।

একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। সমবেত জনমণ্ডলী ভক্তিভরে অবনত হইয়া শুধু প্রণামই করিল না, সঙ্গে-সঙ্গে আধ্‌লা, পয়সা, আনি, দু' আনি, সিকি প্রভৃতি দেবীর চরণারবিন্দে অজস্রধারে পড়িতে সুরু করিল। যে-লোকটি দু' আনি দিয়া উপুড় হইয়া দেবীর চরণে পড়িয়াছিল, সে কি জানি কেন ছেলেমানুষের মতো ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্নার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ বুঝা যাইতেছিল না বলিয়াই হয় ত অসংখ্য নরনারী মুগ্ধ দৃষ্টিতে সতীদেবীর দিকে তাকাইয়া পয়সা ফেলিয়া প্রণাম করিতেছিল। দেবীর মহিমা মানুষে কতটুকু জানে?

দেবী এতক্ষণে প্রসন্ন হইলেন। স্নিগ্ধ হাসিয়া লোকটির মাথায় সুকোমল হস্ত স্পর্শ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, 'কল্যাণ হোক।'

ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য্য একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া চলিয়া গেলেন।

২

লোক-জন এবং স্ত্রী-পুরুষের ভিড় একটু-একটু করিয়া কমিয়া যখন একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল তখন বেশ রাত হইয়াছে। আরতির ঘণ্টা কখন থামিয়া গেছে, ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পাণ্ডারাও প্রস্থান করিয়াছে।

কেহ কোথাও আর নাই দেখিয়া সুখলতা ধ্যান ভঙ্গ করিয়া এবার চুপি-চুপি হাসিল। অদূরে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়া বসিয়া জহরের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, সুখলতা ইঙ্গিত করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, 'শুনচেন মশাই?'

জহর হঠাৎ সজাগ হইয়া এদিক-ওদিক তাকাইল। সুখলতা হাসিমুখে কহিল, 'কেউ নেই, এবার ওঠো।'

জহর উঠিয়া একটু কাছে সরিয়া আসিল। সুখলতা কহিল, 'ঘুমোচ্ছিলে না কিছু ভাবছিলে?'

'ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ভাবছিলাম।'

'যে ভাবে, সে ঘুমোয় না। নাও, এসব সরাও বাপু উঠি, বসে-বসে পা ধরে গেচে। এত সন্দেশ মেঠাই ফুল জল নিয়ে কোথায় যাবো? ওই দেখ রাঙা পেড়ে কাপড়ের গোছা—কত টাকা জম্‌লো গুণে দেখবে নাকি? পয়সা-কড়ি সব তুলে তোমার কাছে নাও।'

জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিল। বলিল, 'আমাকে এত বিশ্বাস না করলেও পারো।'

'বিশ্বাস নয়, আমার পরিশ্রমটা বাঁচে। একজন একখানা গিনি দিয়ে গেছে, ও গুলোর মধ্যে খুঁজলেই পাওয়া যাবে।'

গিনি? সতীব্রহ্মচারিণীর প্রতি এত—'

'সতীর প্রতি নয়, সতী যিনি সেজে বসেছিলেন তাঁর প্রতি। লক্ষ্য ক'রে দেখছিলাম, যে লোকটা গিনি দিল, সে অন্ততঃ বার-দশেক ঘুরে-ঘুরে এসে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছিল; ভাবলে, আমি বুঝি চোখ বুজেই আছি। পা ছুঁয়েই তার তৃপ্তি।'

জহর কহিল, 'অল্প বয়স নাকি লোকটার?'

সুখলতা কহিল, 'চুল পেকেছে মনে হ'লো, অল্প বয়েস হ'লে লোকে যে সন্দেহ করতো। সন্দেহজনক বয়েস যার কেটে গেচে সেই বেশী সন্দেহজনক। চল যাই।'

'কোথায় যাবো? থাকবার জায়গা?'

'ওই ত, যে ঘরটা ভট্‌চায্যিমশাই দিয়েছেন, ওটাতে থাকা চল্‌বে না?'

কি ভাবিয়া জহর বলিল, 'তোমার থাকা চল্‌বে, তুমি এখন ভট্‌চায্যিমশায়ের উপার্জ্জনশীল মক্কেল, কিন্তু আমার—'

সুখলতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কি আশ্চর্য্য, তুমিই থেকো ঘরটায়, আমি কম্বলমুড়ি দিয়ে দালানে পড়ে থাকবো'খন।'

'কম্বল মুড়ি দিয়ে? আজ কিন্তু একটু গরম বোধ হবে কারণ অনেক টাকা রোজগার ক'রেচ। কম্বল যদি রাত্রে গায়ে না সয়? ঘুমের ঘোরে যদি গা থেকে—'

'গেলেই বা!' বলিয়া সুখলতা গায়ের চাদরটা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইল।

জহর বলিল, 'তা হ'লে সকাল-বেলা ভট্‌চায্যিমশাই উঠে এসে দেখবেন, পরমাসুন্দরী সতীদেবী আপন দেহকে বিপন্ন করে' পথের ধারে ঘুমুচ্ছেন, আর ষণ্ডামার্কা মাষ্টার মশাইটি স্বার্থপরের মতো ঘরের ভেতর চৌকিখানি দখল ক'রে রয়েছেন। সে হবে না।'

অনেক রাত্রি হইয়াছিল, সুখলতা আব কথা বাড়াইল না, টাকা পয়সাগুলি পুঁটুলি বাঁধিযা লইয়া জহরের সঙ্গে মন্দির হইতে বাহির হইযা আসিল। পথে নামিতেই ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে দেখা; তিনি হন্‌-হন্‌ করিয়া ভিতরে ঢুকিতেছিলেন। বলিলেন, 'এই যে বাবা, বলি এত রাত হ'লো, যাই একবার দেখে আসি—ভাগ্যবতী মা আমার, সব ব্যবস্থা ক'রে রেখে এসেছি, খাবার দাবার, শোবার জায়গা—'

সুখলতা কহিল, 'আসুন আপনাকে দেখিয়ে দিই—ওই সব পড়ে রয়েচে, আপনি সব তুলে আপনার ঘবে নিয়ে যাবেন।'

জহব কহিল, 'এ আপনাকে দান নয়, আপনার ঋণ পরিশোধ।'

ভট্টাচার্য্য মৃদু হাসিয়া রোয়াকের উপর উঠিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি বিস্ময় ও আনন্দে একেবাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

'এত কাপড় চোপড় পেয়েচ মা? এত খাবার দাবার? এসব তুমি নেবে না?

সুখলতা কহিল, 'না, ওতে আমার কাজ নেই, আমাদের জন্য ধোয়া কাপড় যদি থাকে দু'খানা দেবেন। ওসব আপনি নিন্‌।'

ভট্টাচার্য্য অবাক হইয়া একবার এই দুইটি বিচিত্র নরনারীব মুখেব দিকে তাকাইলেন। ইহাদের মনে মমতা, বন্ধন ও গৃহস্থালী বলিয়া কি কিছুই নাই?

জহর কহিল, 'আপনি আসুন পরে, আমরা এগোই! সংগ্রহ করা যাদের কাজ তারা পিছু-পিছু আসে।' বলিয়া দুইজনে আবার অন্ধকার পথে নামিয়া আসিল।

ভট্টাচার্য্য যখন ফিরিলেন তখন ইহারা বাসায় ফিরিয়া আহারাদি শেষ করিয়া লইয়াছে। মোটঘাট ভিতরে নামাইয়া রাখিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে মা?'

জহর গম্ভীর হইয়া কহিল, 'ওঁর সেবা হ'লো, আমিও পেসাদ পেয়ে এইমাত্র উঠলাম।'

'বেশ, বেশ, সারাদিন কত পরিশ্রম গেচে—' বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর কহিলেন, 'কালই কি তোমরা চলে যাবে বাবা?'

জহরের হইয়া সুখলতাই উত্তর দিল। বলিল, 'কালকেই ত যেতে হবে ঠাকুরমশাই, মন্দিরে আর ত বসতে দেবে না, কিছু চাঁদাও উঠলো।'

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'হ্যাঁ, এখানকার নিয়ম আজকাল ভারি কড়াকড়ি হয়েচে, আগে হলে আরো দু'একদিন বসতে দিত, কিন্তু এখানকার পাণ্ডারা—তোমাকে আর একটি কথা বলি মা।'

'কি বলুন।'

তুমি যা দিয়ে গেলে, আমি গরীব এতেই আমার পেট ভরে গেচে মা, যেমন-তেমন ক'রে পাঁচিশ টাকার কাপড়-চোপড়—'

জহর কহিল, 'বেশ ত, ওতেই যদি আপনি খুসী হয়ে থাকেন—আমাদের কিন্তু দু'খানা কাপড় দিতে ভুলবেন না ঠাকুরমশাই।'

'সে ত দেবোই বাবা, সে তোমাদের প্রণামী।'

জহর হাসিয়া বলিল, 'প্রণামী দিতে আজকালকার সভ্যতা লজ্জা বোধ করে। প্রণামীগুলি আজকাল দান এবং বক্‌শিস্ বলে চলে যায়।'

ভট্টাচার্য্য বিনীত হাসি হাসিলেন।

পথে লোক-চলাচল ইতিমধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শীতের রাত্রি সাঁ সাঁ করিতেছে। ভট্টাচার্য্য গুটিসুটি হইয়া দাঁড়াইয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। এবার একটু গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, 'তোমার বিছানা ভিতরে হয়েছে মা, অনেক রাত হ'লো, এবার—'

জহর একবার অলক্ষ্যে দুইজনের মুখের দিকে তাকাইল, তারপর তাড়াতাড়ি সুখলতার দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, 'যান্ ভিতরেই শু'ন্ গিয়ে, ঠাকুরমশায়ের মেয়েরা আছেন।'

সুখলতা প্রথমে একটু হাসিল, তারপর বলিল, 'আপনাকে আর কষ্ট দেবো না বাবা, আপনি যান, উনি আমার পরম শ্রদ্ধেয়।'

এরকম গলার আওয়াজ ও বলিবার ভঙ্গী ভট্টাচার্য্য অনেকদিন শুনেন নাই, ইহাকে আর কিছু ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন রহিল না।—'আচ্ছা আচ্ছা' বলিতে-বলিতে তিনি একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া চলিয়া গেলেন। সুখলতা আস্তে-আস্তে উঠিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। বড় তক্তাটার একধারে জহর পা গুটাইয়া উঠিয়া বসিল। হারিকেনের আলোটা সামান্য একটুখানি কমাইয়া দিয়া সুখলতা মোটা গেরুয়া শাড়ীখানা ছাড়িয়া ওবেলাকার কাপড়খানি পরিয়া লইল; তারপর আবার আলোটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'মাথায় একেবারে সিঁদুরের বিষ্টি হয়ে গেচে। এত সিঁদুর মাথা থেকে তুলে না ফেললে কাল রাস্তায় পা বাড়াবার উপায় থাকবে না, কি করি বল ত?

জহর বলিল, 'একেবারে তুলে ফেলবে নাকি?'

সুখলতা হাসিয়া বলিল, 'তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

'তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে। তুমি তুল্‌বে মাথার সিঁদুর, আমি পড়বো অগাধ জলে।'

সুখলতা কহিল, সিঁদুরও থাকবে, তুমিও থাকবে এই বা কি ক'রে হতে পারে? আমি গরমিল সইতে পারি, গোঁজামিল সইতে পারি নে।'

জহর কহিল, 'তা হ'লে সিঁদুর থাক, আমি যাই।'

সুখলতা মৃদু-মৃদু হাসিয়া বলিল, 'না, তুমি থাকো, সিঁদুর যাক, সিঁদুরের চেয়ে তোমাকেই আমার বেশী দরকার। ওঠো, বিছানাটা ভাল ক'রে ছড়িয়ে নিই।'

জহর উঠিয়া দাঁড়াইল। বড় তক্তাটার উপর বিছানাটা ছড়াইতে-ছড়াইতে সুখলতা কহিল, 'ভট্টাচায্যির বিবেচনা আছে, একটা বিছানা অনায়াসেই দু'ভাগ ক'রে নেওয়া চলবে। আজকে শীতও তেমন বিশেষ—'

জহর হাসিল, হাসিয়া বলিল, 'আমরা সত্যই দরিদ্র, আমাদের ভাগ্যে আরাম লেখা নেই।'

সুখলতা তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই সে পুনরায় কহিল, 'যেদিন শীত থাকে সেদিন বিছানা জোটে না, যেদিন বিছানা থাকে সেদিন—'

সুখলতা কহিল, 'সেদিন টাকার গরম।' বলিয়া সে গেরুয়া শাড়ীর একটা কোণ দিয়া ঘষিয়া-ঘষিয়া মাথার সিঁদুর মুছিতে লাগিল।

তক্তার উপরে জহরের বিছানা হইল, তারপর মেঝের উপর নিজের বিছানাটা কোনোমতে ছড়াইয়া সুখলতা কহিল, 'আর কেন, শোও!'

শুইয়া পড়িয়া জহর বলিল, 'শুলাম বটে কিন্তু ঘুম হবে না। আমি যদি একা থাকতাম কিম্বা তুমি যদি পুরুষ হতে তা হ'লে এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়তাম।' পুনরায় কহিল, 'সমাজের ভয়, মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরই বেশী।'

সুখলতা কহিল, 'আমাকে দেখে বুঝি তোমার তাই মনে হয়?'

'তাই-ই মনে হয়! সমাজ মেয়েদের কাছে প্রবলতর প্রতিপক্ষ, লড়াই করলে হারবে জেনে মেয়েরা তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। পুরুষের কাছে সমাজ শ্রদ্ধার এবং সম্মানের। তাই মেয়েদের চেয়ে পুরুষের কাছে লোকলজ্জার মূল্য বেশী।'

সুখলতা কহিল, 'আমি বেপরোয়াও নই, সঙ্কোচও কাটাই নি, সমাজও ভাঙি নি!'

'কিছুই কর নি, তবু তুমি আঘাত করেচ সমাজের মন।'

'থামো!' বলিয়া সুখলতা তাহাকে একটা ধমক দিল। বলিল, 'সমাজকে যারা সামলাবার চেষ্টা করে, নিজেরাই তারা বেসামাল। সমাজের মন বলে কোন বস্তুই নেই, মন তোমার; পুরুষমানুষ যতই উদারনীতিক হোক, তার রক্তের মধ্যে সংরক্ষণশীলতা। অর্দ্ধেক রাতে সমাজতত্ত্ব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি ক'রো না গা জ্বলে যায়।' বলিয়া সে রাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

জহর হাসিয়া বলিল, 'আমার কিন্তু এ দোষ ছিল না।'

তাহার করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুখলতা পাশ না ফিরিয়া থাকিতে পারিল না। মুখ তুলিয়া বলিল, 'কি দোষ?'

'এই জ্ঞানানুশীলনটা। এটা বোধ হয় দুর্ব্বলের পেশা। আমি যখন নিতান্ত অসহায় বোধ করি তখন মনে আসে তত্ত্বজ্ঞান।'

সুখলতা বলিল, 'আর কিছুদিন পরে এ-দোষটা তোমার মুদ্রাদোষ হতে পারে। পুরুষের মুদ্রাদোষ মেয়েদের ভারি পছন্দ!

জহর বলিল, 'পুরুষের সকল দোষই মেয়েদের পছন্দ! দুষ্টেরা তাই মেয়েদের ভালবাসার পাত্র।'

চোখ পাকাইয়া সুখলতা বলিল, 'এ বদ্‌নাম কেন দিচ্ছ মেয়েদের নামে? তুমি কি ভাবো ভাল লোকদের মেয়েরা শ্রদ্ধা করতে জানে না?

নিশ্চয়ই জানে! শ্রদ্ধা শুধু? সম্মান করে এবং ভক্তি করে। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় মেয়েরা ভালবাসে তাদের, যারা মেয়েদের পীড়ন করে, যারা দুঃখ দেয়, যারা কাঁদায়, যারা তাদের হতমান করে। মেয়েরা তাদের ভালবাসে যারা বর্ব্বর, যারা পশু, যারা জীবনের মূল্য বোঝে না, দুঃসাহসী ও দুর্দ্দমনীয় যারা, যারা নিতান্তই অসামাজিক ও উচ্ছৃঙ্খল।'

সুখলতা হাসিতে-হাসিতে বলিল, 'যত খুসী বলে যাও, কোনো আপত্তি নেই। মেয়েদের ভালবাসার সম্বন্ধে কিছু একটা ফতোয়া দেওয়া আজকালকার ফ্যাসান্।'

'নয় ত কি, আমি বৃন্দাবনে গিয়ে একবার একটি মেয়েকে দেখেছিলাম। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম স্বামীটির প্রতি মেয়েটির আর যাই থাক্ ভালবাসা নেই। অথচ স্বামীটি ভদ্র, রূপবান এবং অবস্থাপন্ন। সংসারে নিত্যদিন খিটিমিটি লেগেই আছে। বেচারী স্বামী, তার সহিষ্ণুতার আর অন্ত নেই। একদিন সে কিন্তু আর সইল না, স্ত্রীকে দিল বেদম প্রহার। সে প্রহার শুধু বাঙালী-মেয়েরাই সইতে পারে। আমি ত অবাক হয়ে দেশত্যাগ করলাম। তারপর এই সেদিন কল্‌কাতায় দেখা। লোকটি আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে বাড়ীতে নিয়ে গেল। ও হরি, কোথায় সে অশান্তি? ছেলেপুলে নিয়ে পরমানন্দে তারা—'

সুখলতা কহিল, 'অর্থাৎ জোর ক'রে তারা ভালবাসা আদায় করলো?'

'ঠিক তাই, জোর ক'রে। শারীরিক ও মানসিক পীড়ন যারা মেয়েদের করতে পারলো না, বুঝতে হবে মেয়েদের তারা চিন্‌তে পারে নি।'

সুখলতা হাসিতে লাগিল। হাসিতে-হাসিতে বলিল, 'তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কি এই কথা বলে?'

'অভিজ্ঞতার কথা ব'লো না, অভিজ্ঞতাগুলো হচ্ছে বোকামির ইতিহাস। আমার প্রথম প্রেম আমার লজ্জা। সে-প্রেমে ছিল হৃদয়াবেগ, মানসিক দৌর্ব্বল্য, অলস দিবাস্বপ্ন, রাত্রে অনিদ্রা, কাব্যের উচ্ছ্বাস আর চোখের জল। প্রথম প্রেম আমার জীবনের গভীর কলঙ্ক।'

সুখলতা কৌতুক বোধ করিয়া বলিল, 'কি রকম?'

জহর কহিল, 'ছেলেমানুষ কি না তাই নারীর প্রতি ছিল অগাধ শ্রদ্ধা, অপরিমিত সম্মান আর অজস্র অভিমান। তাকে আমি নিরালায় পুজো করতাম! প্রথম প্রেমের মতো এমন রোমান্স জীবনে আর কিছু নেই? সে ছিল আমার মনের আকাশে একটিমাত্র তারা, সে আমার ইহকালের অভিশাপ, পরকালের অদৃষ্ট; তার স্পর্শ মনে করলে আজো আমার বুকের ভেতর ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ করে।'

'তারপর?'

'তারপর যা হয়। অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত সচরাচর। সে প্রেম হলো ব্যর্থ। আমিও কাগজ-কলম নিয়ে পদ্য লিখতে বসলাম। কি ভাগ্যি সে-সব পদ্য মাসিকপত্রের সম্পাদকরা ছিঁড়ে ফেলেছিল, তাই রক্ষে।'

সুখলতা আর একবার উঠিল, উঠিয়া গিয়া দরজাটা খুলিল। তারপর আলোটা আনিয়া নামাইয়া খোলা দরজার কাছে রাখিয়া আবার আসিয়া শুইল। জহর বলিল, 'দরজা খোলা রাখলে?'

'থাক, বন্ধ করবার দরকার নেই।'

'একটু ছিল বৈ কি, একেবারে বিসদৃশ লাগে যে। সকালবেলা রাস্তার লোক পর্য্যন্ত—'

'জ্বালাতন!' বলিয়া সুখলতা আবার উঠিল—'খুলে রাখলে লোক-লজ্জা, বন্ধ করলে সন্দেহ; যাই কোথায়?' বলিয়া সে দরজার একটিমাত্র কপাট ভেজাইয়া দিয়া আবার আসিযা শুইল। টাকাপয়সার পুঁটুলিটার কথা সে ভুলে নাই, সেটি তাহার কাছেই ছিল, হাত বাড়াইয়া পুঁটুলিটা সে জহরের কাছে সরাইয়া দিল।

'আমার কাছে দিল কেন?'

রাগ করিয়া সুখলতা কহিল, 'চোরে এসে যদি আমার গলা টিপে ধরে? আজকাল যে রকম ডাকাতির দিন! আমি বাপু অপঘাতে মরতে পারবো না। তুমি যা হয় কর।'

অর্থের পরিমাণ সামান্য নয়। জহর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া উঠিল। উঠিয়া পুঁটুলিটা লইয়া খোলা দরজার ভিতরের দিকের একটি কোণে আড়াল করিয়া রাখিয়া আসিল। সুখলতা তাহার কূটবুদ্ধির প্রতি হাসিয়া বলিল, 'একেবারে পা বাড়িয়ে রইলে যে!'

'সেই জন্যই যাবে না। অর্থের প্রতি অতি-সতর্কতাই অর্থনাশের কারণ।' বলিয়া জহর গায়ে ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িল।

দুইজনেই কিয়ৎক্ষণ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বাহিরে এবং আশেপাশে কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। দূরে কোথায় এইমাত্র একখানা ষ্টিমারের বাঁশী বাজিয়া থামিয়া গেছে। সুখলতা আস্তে-আস্তে কহিল, 'তোমার সঙ্গে আলাপটা আমার অদ্ভুত, একেবারে বিচিত্র! নয়?'

জহর শুধু বলিল, 'হ্যাঁ।'

সুখলতা বলিল, 'অত্যন্ত আকস্মিক আলাপ, আলাপ হবার আগে আমাদের কোন আয়োজন ছিল না, কোনো ভূমিকার দরকার হয় নি, কেমন?'

জহর কহিল, 'জীবনে এমন ঘটনা ঘটে, যাদের জীবনে ঘটে না তাদের চোখে আমাদের হঠাৎ আলাপটা অত্যন্ত আজগুবী, তারা এ বুঝবে না।'

সুখলতা উত্তর দিল, 'স্ত্রী-পুরুষে একটু-একটু ক'রে যখন আলাপ হয় তখন বুঝতে হবে তাদের ভেতরে কোন উদ্দেশ্য আছে।'

জহর হাসিয়া বলিল, 'হাঁ, সুবিধাবাদী, বিধাতা অমনি তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণের আনন্দ সংযোগ করেন। ছেলেটি এগিয়ে যায় নানা ভঙ্গীতে মেয়েটি আসে নানা ইঙ্গিতে।'

'কিন্তু আমাদের আলাপ এত সহজে হ'লো কেন?'

'তার কারণ আমাদের প্রয়োজন প্রেমের নয়, মিলনেরও নয়, আমাদের প্রয়োজন পরিচয়ের। ঝড়ের পাখী যখন উড়ে এসে ডুবো জাহাজের মাস্তুলের খোঁচায় বসলো, তখন তাদের কথা ভাবো। পরিচযেব আনন্দ বোঝ ত?'

সুখলতা কহিল, 'তুমি আবার তত্ত্বকথা দিয়ে সহজ কথাটা ঢাক্‌চ।'

জহরও হাসিল। হাসিয়া বলিল, তার কারণ ঘুম পেয়েছে। চোখে যখন ঘুমের ঘোর লাগে তখন মানুষ সহজ কথা বলতে ভুলে যায়।'

সুখলতা এবার সানন্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'আমারো ঠিক তাই মনে হয়। যাদের কাছে কাজের কথা শোনবার আগ্রহ, ধরো দেশের বড়-বড় গুণী-জ্ঞানীরা, তারা শোনায তত্ত্বকথা। মনে হয তারা জেগে নেই।'

জহর বলিল, 'আমাদের দেশে জেগে থাকে না একশ্রেণীর লোক, যারা কবি। ঘুমানো তাদের নেশা আব ঘুম পাড়ানো তাদের পেশা।'

আবার দুইজনে চুপ করিয়া রহিল। কিযৎক্ষণ পরে সুখলতা বলিল, 'কাল ত আর মন্দিরে বসতে দেবে না, কোথায় যাবে?'

জহর ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, 'আমার যাবার জায়গা আছে, একটা জুয়োখেলার আড্ডায়। গাবাব সময় গোটা-দুই টাকা বক্‌শিস্ দিয়ো, আমার দিন-পনেরো বেশ চলে যাবে!'

'পনেবো দিন পবে?'

'আবাব নেই কাজ ত খই ভাজ।'

'পুরুষমানুষ তুমি, কাজ খুঁজে পাও না কেন?'

'এখানকার বাঙালী ছেলেরা পুরুষ কিনা সন্দেহ।' জহর কহিল, 'কিন্তু কাজ খুঁজে কেন পাবো না। যার কোন কাজ নেই তার আছে দেশের কাজ। এবার ভাবচি পিকেটিং করে জেল-এ যাবো।'

'আমাকেও তবে সঙ্গে নিও।'

'নিতাম, যদি সেখানে তোমার সঙ্গে আমায় থাকতে দিত। আধুনিক সভ্যতাটা নিতান্তই বর্ব্বর, জেল-এব মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোককে একত্র থাকতে দেয় না। সে-নিয়ম থাকলে স্বরাজ পাওয়া সহজ হ'তো।'

সুখলতা কহিল, 'সে-নিয়ম থাকলে জেলগুলো হ'তো 'প্রজাপতি সঙ্ঘ'। বাজে কথা এখন ছাড় বাপু। তুমি নিজেব কথাই ভাবলে, আমি কাল কোথায় যাবো বল ত?'

জহর কহিল, 'যেখান থেকে বেরিয়েচ সেখানেই—'

চোখ পাকাইয়া সুখলতা কহিল, 'তুমি কি মনে কর সুবিধে পেলেই স্বামীর কাছে ফিরে যাবো, অন্তর থেকে যাকে ত্যাগ করেচি তাকে আবার গ্রহণ করবো কোন্ দৈন্যে? স্ত্রীলোকের যেখানে সব চেয়ে বড় আশা সেখানেই আমার বুক ভেঙেচে; যেখানে সব চেয়ে বড় আনন্দ, সে জায়গা হয়েচে বিষাক্ত।'

'কিন্তু এই অছিলায় মেয়েরা যদি আজ ঘর ছেড়ে বেরুতে থাকে।'

'অছিলায় নয়, উৎপীড়নে। যদি তারা সাহস আর শক্তি নিয়ে বোরোয় বুঝবো আজকের নারী-আন্দোলনের প্রাণ আছে!'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া জহর বলিল, 'যাক্ এত সহজে তোমাকে বোঝা যাবে আশা করি

নি।'

'এই সামান্য কথাটা বুঝতে তোমার এত দেরি হ'লো?'

'সামান্যর পরে এত আবরণ যে, বেচারা দুঃশাসন একেবারে হয়রাণ! তুমি এখন তবে কি করবে? চাক্‌রি?'

'হ্যাঁ, চাক্‌রিই একটা খুঁজবো।'

জহর কহিল, 'তোমরা কিন্তু চাক্‌রি খুঁজতে নামলে আমাদের সমূহ বিপদ। একেই ত দেশে বেকার সমস্যা, তার ওপর তোমাদের প্রতিযোগিতায় সকল জায়গায় পরাজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।'

'কেন তোমাদের যদি গুণ থাকে—'

'গুণ আমাদের অনেক, কিন্তু তোমরা যে মেয়ে। মেয়ে যদি খুনেও হয় তা হ'লেও বিচারালয়ে তার বিশেষ সম্মান। মেয়েদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মানুষের সহজাত। একটা মেয়ের জন্য একটা জাতি তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু একটা পুরুষের জন্য নয়। তুমি জানো সামান্য নারীর দেহ আজো এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতকে শাসন করচে?'

'তুমি বোধ হয় সে শাসনের বাইরে?' সুখলতা কহিল।

'না, আমিও তা মাথা পেতে নিয়েচি। তুমি স্ত্রীলোক বলেই রাত জেগে-জেগে প্রলাপ বক্‌চি, পুরুষ হলে ঘুমিয়ে এতক্ষণ ভোর হয়ে যেত। তুমি স্ত্রীলোক বলে, এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই।'

'আর একটা কারণ আছে।' সুখলতা কহিল, 'তুমি তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিক বক্তারো অধম। তোমার ছ্যাক্‌রা গাড়ী একবার চল্‌লে আর থাম্‌তে চায় না। তুমি যখন কথা বলো তখন আমি শুনিনে, শোন তুমি নিজে; তুমি যখন চুপ ক'রে থাক তখনই কথা বলে তোমার মন। তুমি কেবল কথার পুঁটলি, চিন্তার স্তূপ, আর কিছু নও।'

জহর হাসিতে-হাসিতে পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

রাত শেষ হইয়া আসিযাছে। দূর মন্দিরে প্রভাতী সংকীর্ত্তনের অস্পষ্ট আওয়াজ ভাসিয়া-ভাসিয়া আসিতেছে। নিষ্প্রয়োজনের কথা কহিতে-কহিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল কিন্তু তাহাদের কাজের কথা এতটুকু হইল না, হইল না বলিয়া তাহাদের অস্বস্তিও কিন্তু নাই, অদূর ভবিষ্যতের চিন্তা করিয়া তাহারা যে ভাবিত হইয়া পড়িযাছে, এ আভাসটুকুও এই দুইটি নরনারীর মুখাকৃতি দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। ঘরের একদিকে টিপ্‌-টিপ্‌ করিয়া আলো জ্বলিতে লাগিল, অন্যদিকে জানালার ফাঁকটুকু দিয়া ভোরের আকাশ অল্প-অল্প শাদা হইয়া আসিতেছিল। শেষকালে আলো জ্বালিয়া রাখিবার আর প্রয়োজন রহিল না, দরজা দিয়া সকাল আসিয়া পড়িয়াছে। সুখলতা উঠিয়া গিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল।

আলোটা নিবাইয়া আসিয়া সে জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিল। জহর সাড়া দিল না, তখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। জানালার কাছে মুখ রাখিয়া সুখলতার মুখের ক্লান্তি ও ক্লেশ মুছিয়া গেল। শীতের ভোরের বাতাস ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে। অল্প-অল্প কুয়াসার ভিতর দিয়াও বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টি চলিতেছিল। নগরে কোলাহল তখনও জাগিয়া উঠে নাই, নির্বিষ্ট নয়নে সেই দিকে তাকাইয়া সুখলতার একটিবার মাত্র মনে হইল, রৌদ্রদগ্ধ ও জীবন-সংগ্রামক্লিষ্ট শহর ও নিষ্কলুষ প্রাতের শহরের মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ। গত রজনীর ক্লান্তি হইতে উঠিয়া একটি সুন্দরী নাগরী যেন সদ্যস্নান করিয়া পূজার্চ্চনার আসনে বসিয়াছে। মুখে তাহার উজ্জ্বল আভা, চোখে অপূর্ব্ব জ্যোতি। সুখলতা মুগ্ধ হইয়া এমন করিয়াই সেইদিকে তাকাইয়া রহিল যে, চোখদুটি তাহার তন্দ্রায় জড়াইয়া আসিতে বিলম্ব হইল না।

জহরের যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেশ রোদ উঠিয়াছে। চোখ রগড়াইয়া সে উঠিয়া বসিল। সুখলতা মেঝের উপর লেপটা পাতিয়া আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। চুলগুলি তাহার

ধূলা-বালি মাখা। দরজার দিকে সে ফিরিয়া দেখিল, আলোটা ইতিমধ্যে ঘর হইতে কখন অদৃশ্য হইয়া গেছে, খুব সম্ভবত ভট্টাচার্য্য একবার আসিয়াছিলেন, তাহাদের না ডাকিয়া আলোটা লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। জহর হাসিল। যাক্, সুখলতা মেঝেতে শুইয়া ভট্টাচার্য্যের সন্দেহ হইতে নিজেকে খুব বাঁচাইয়া লইয়াছে। সন্দেহের পথ বাঁচাইয়া চলিতে মেয়েরা অভ্যস্ত।

আর ঘুমাইলে চলিবে না, একটা যা হোক কিছু বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ওই যা, জহর তাহাকে ডাকিবে কি বলিয়া? তাহার ভারি বদ্স্বভাব মেয়েদের নাম মনে রাখা তাহার কিছুতেই হইয়া উঠে না। ফুল, ফল, নদী, গাছ, স্ত্রী-দেবতা মানুষের কতগুলি কোমল বৃত্তি, প্রকৃতির কতকগুলি ধাতু ও রূপ প্রভৃতি হইতেই ত মেয়েদের নাম সাধারণতঃ নির্ব্বাচিত হয়। এ মেয়ের কী নাম? জহর চিন্তিত হইয়া চারিদিকে তাকাইল, কিছুতেই তাহার মনে পড়িল না। শুনচ—ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতেও তাহার বিসদৃশ লাগে। সে জোরে-জোরে গলার সাড়া দিল, কিন্তু সাড়া নাই। জানালার কপাটে হাত চাপড়াইল, তবুও না, আগের মতোই খুর্-খুর্ করিয়া মেয়েটির নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া অবশেষে জহর নির্ব্বাক হইয়া রহিল, তবু নামটি কিছুতেই তাহার মনে আসিল না।

হঠাৎ তাহার নজর পড়িল বাহিরে রোয়াকের ওধারে দর্মার বেড়াটার দিকে। বেড়ার গায়ের গেবো খুলিয়া ছোট একখানা বাঁকারি ঝুলিতেছে, তাড়াতাড়ি গিয়া সেখানা সে খুলিয়া আনিল, তারপর দূরে বসিয়া অতি সন্তর্পণে সে সুখলতার গায়ে দুই-এক বার খোঁচা দিল।'

খোঁচা খাইয়া সুখলতা জাগিয়া উঠিল। মুখের কাপড় সরাইয়া সে উঠিয়া বসিল। বলিল, 'ও কি হচ্ছিল? কি বুদ্ধি তোমার? খোঁচা দিচ্ছিলে, যদি লেগে যেত?'

বাঁকারিখানা ফেলিয়া জহর বলিল, 'মেয়েদের গায়ে আমি সহজে হাত দিই নে।'

'সহজে কেউই দেয় না।' বলিয়া সুখলতা রাগে গর-গব করিতে লাগিল।

বেলা ধীবে-ধীরে বাড়িয়া চলিয়াছিল, রোদে চারিদিক ভাসিতেছে, ইহার পর পরের বাড়িতে অকারণ দাবি লইয়া আর বেশিক্ষণ থাকা চলে না। সুখলতা কহিল, 'খুঁচিয়ে-খুঁচিযে ত জাগালে, এবার কি করবে কর?'

জহর বলিল, 'তৈরী হয়ে নাও।'

'আমি তৈরী হয়েই আছি।'

এমনি সময় ভট্টাচার্য্য আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'ও কি, সে হবে না বাবা, ব্রাহ্মণেব বাড়ী থেকে বাসিমুখে চলে যেতে দেবো না। সকাল-বেলা উঠেই রান্না চাপাতে বলেচি—'

সুখলতা কহিল, 'ওসব আর কেন ঠাকুরমশাই, আপনাকে ঝঞ্ঝাট দেওয়া—'

'ঝঞ্ঝাট ত নয় মা, এ আমার কর্ত্তব্য। তোমাদের ট্রেনের সময় কখন বাবা?'

জহর কহিল, 'সাড়ে এগারোটার সময়।'

'ওঃ ঢের হয়ে যাবে তার আগে। তোমাদের স্নানের ব্যবস্থা ক'রে দিই গে ততক্ষণ।' বলিয়া ছুটিতে-ছুটিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার পথের দিকে উঁকি মারিয়া সুখলতা বলিল, 'আঃ বাঁচলাম্।' বলিয়া সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

জহর হাসিয়া কহিল, 'যা বলেচ, একবেলাকার মতো নিশ্চিন্ত!'

সুখলতা বলিল, 'একবেলাকার মতো? তোমার মনে বুঝি ওবেলাকার আশাও আছে?'

করুণ কণ্ঠে জহর বলিল, 'দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাওয়া ত খুব বড় আশা নয়!'

মুখের একটা শব্দ করিয়া সুখলতা চুপ করিয়া রহিল।

যথাসময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আতিথেয়তায় তাহারা স্নান এবং আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিল। জহর স্মরণ করিয়া দেখিল, গত ছয় মাসের মধ্যে এমন সুখভোজন সে করিতে পায়

নাই। গৃহস্থের অন্দরে গিয়া তাহারা পরস্পর সংযত হইয়া একটি আধটি মাত্র কথা বলিল। একজন পরম শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই, আর একজন গোপালপুরের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী! ঘরের ভিতর হইতে যখন সুখলতা নূতন ও ধোয়া শাড়ী, সেমিজ ও গায়ের চাদর লইয়া স্মিত ও প্রসন্ন মুখে বাহির হইয়া আসিল তখন সকলে মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তির মতো তাহার আবির্ভাব। জহর এ সুযোগ ত্যাগ করিল না, কাছে গিয়া হেঁট হইয়া ভক্তিভরে তাহার পায়ের ধূলা তুলিয়া লইল।

সুখলতার মুখের উপর একটা রাঙা আভাস খেলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে জহরের মাথায় হাত রাখিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করিয়া কোমল ও মধুর কণ্ঠে কহিল, 'আপনি আমাকে বার-বার অপরাধী করছেন মাষ্টারমশাই—বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে এমন ক'রে পায়ের ধুলো নেওয়া—'

জহর বলিল, 'তা হোক, আমি অধম—'

মেয়েরা একে-একে প্রণাম করিয়া লইল। এই বাড়ীর ও আশপাশের দু'চার জন মহিলা সুখলতার পায়ের কাছে টাকা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। বিনীত কণ্ঠে সুখলতা কহিল, 'অনেক পেলাম, অনেক দিলেন আপনারা, আমি এর যোগ্য নই—মাষ্টারমশাই, এ প্রণামী তুলে নিয়ে রাখুন আপনার কাছে।'

জহর নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে টাকাগুলি তুলিয়া লইল।

ঠাকুরমশাই অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সুখলতা কহিল, 'এবার আমায় পায়ের ধুলো দিন বাবা।'

সর্ব্বনাশ, ও কথা বলিস নে মা, আমার অপরাধের সীমা থাকবে না। ও-মাথা তোর হেঁট হবার মাথা নয় মা? তোর মতো সতী-সাধ্বীর পায়ের ধূলোয় আমার সংসার, আমার যে যেখানে আছে সবাই যেন উদ্ধার হয়ে যায়।' ভট্টাচার্য্যের চোখে জল আসিয়া পড়িল।

তাঁহার কণ্ঠের ও মনের আন্তরিকতা দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সুখলতার সর্ব্বাঙ্গ অপূর্ব্ব আবেগে রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। তাহার মুখভাব উপলব্ধি করিয়া জহর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'এবার আপনার যাত্রার সময় হয়েছে কিন্তু।'

'চলুন মাষ্টারমশাই।' বলিয়া ধীরে-ধীরে স্ত্রী-পুরুষের ভিতর হইতে সুখলতা পা বাড়াইল। সকলে ভক্তিভরে তাহাকে বিদায় দিতে দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিল।

রাস্তায় নামিয়া কয়েক পা গিয়া সুখলতা একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কিছু ফেলে আসো নি ত?'

দুই পা অগ্রসর হইয়া জহর বলিল, 'বরং কিছু বেশী নিয়ে চলেচ সঙ্গে।'

'টাকাকড়ি তোমারই কাছে রেখো।'

হঠাৎ জহর স্তম্ভিত হইয়া বলিল, 'টাকার সেই পুঁটলিটা?'

সুখলতা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিল, বলিল, 'ফেলে এসেচ, যাও শীগগির—'

জহর ছুটিতে-ছুটিতে আবার ফিরিয়া আসিল। ভট্টাচার্য্য তখনও দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদের পথের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। বলিলেন, 'ফিরলে যে বাবা?'

'ওঁর জপের মালার পুঁটলিটা ফেলে গেছেন।' বলিয়া সে ঘরে উঠিয়া আসিয়া দরজার পাশ হইতে লুকানো টাকার পুঁটলিটা তুলিয়া লইল।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, 'গাড়ী ঠিক পাবে ত বাবা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা না গেলে গাড়ী ছাড়বেই না।'

'আহা, তা বটে, সতীকন্যে যাবেন কি না!'

জহর ততক্ষণে পথে নামিয়া চলিয়া গেছে।

আবার দুইজনে একত্র হইয়া চলিতে লাগিল। পোষাক-পরিচ্ছদ বদ্‌লাইয়া দু'জনেই ইতিমধ্যে বেশ সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে কোথায় এবং কোন্ দিকে যাইতে হইবে তাহারা গ্রাহ্য করিল

না। সুখলতা উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল, 'ভালো ভালো দোকান যেদিকে আছে, চল, দু'জনে দু'জোড়া জুতো কিন্‌বো। আমাব চটি হ'লেই চল্‌বে। তাবপব কিন্‌বো আমাব পেটিকোট্ আব তোমাব জামা। শীত ত ফুবিয়ে এল, তুমি পাঞ্জাবী পববে?'

জহব বলিল, 'ভিক্ষেব চাল, তাব আবাব কাঁড়া-আকাঁড়া।'

'ভিক্ষে নয় গো ভিক্ষে নয়, প্রণামী। একটু দাঁড়াও দেখি?'

জহব দাঁড়াইয়া পডিতেই সুখলতা সেই পথেব উপবেই হেঁট হইয়া তাহাব পাযেব ধুলো তুলিয়া লইল।

'এটা ত ঠিক বুঝতে পাবলাম না?' ভ্রূ কুঞ্চন কবিযা জহব তাহাব মুখেব দিকে তাকাইল।

সুখলতা হাসিযা বলিল, 'কাল থেকে কতবাব আমাব পাযেব ধুলো নিলে বল ত? আমি যে তোমাব চেযে অনেক ছোট।'

জহব বলিল, 'তাব চেযে জেনে বাখা ভাল আমবা কেউ কাবো চেযে ছোট নই, দু' জনেই আমবা সমান। আমাদেব মধ্যে যেটা থাকবে সেটা শ্রদ্ধাও নয, স্নেহও নয। তোমাব চেযে বড হযে আমি তোমাব নাগালেব বাইবে যেতে চাই নে।'

'কিন্তু বযসেব সম্মান—'

'বযসেব সম্মান নয, মানুষেব প্রতি মানুষেব সম্মান। অনেক বযোজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি দুষ্ট প্রকৃতিব, অনেক বালক মহৎ এবং উদাব। তুমি যাকে সম্মান দেবে সে তোমাব সম্মানেব উপযুক্ত কি না এইটি দেখা দবকাব। আমি যে-কোনো সঙ্কীর্ণচেতা বৃদ্ধকে অনাযাসে অপমান কবতে পাবি।'

'পাবো, আমি কিন্তু পাবি নে। এখানেই মেযেদেব সঙ্গে তোমাদেব তফাৎ।' সুখলতা বলিতে লাগিল 'যাদেব সত্যিই অসম্মান কবা উচিত তাদেব দেখে আমবা পালিযে যাই, কিন্তু অপমান কবতে পাবি নে। তাদেব আমবা প্রতাবিত কবি, কিন্তু অপমান কবি নে। আমি যেদিন শ্বশুববাডী থেকে চলে আসি তাব আগেব দিন আমি স্বামী আব শাশুডীব পবিচর্য্যা কবেচি। তাদেব আমি মনে মনে ঘৃণা কবেচি কিন্তু অপমান কবি নি। অপমান কবা সহজে মেযেদেব আসে না।

একটা গলিব ভিতব হইতে বাহিব হইযা তাহাবা বড বাস্তায আসিযা পডিল। মাথাব উপবে দুপুবেব বৌদ্র বেশ প্রখব হইযা উঠিযাছে। পথে লোকচলাচল একটু স্তিমিত হইযা আসিযাছিল। একটা দোকান হইতে পান কিনিযা চিবাইতে চিবাইতে তাহাবা চলিল। কিছুদুব গিযা সুখলতা বলিল, 'চল, ট্যাক্সিতে চডি, বেশ ছুটে যাওযা যাবে।'

'কোথায যাবে?' ইডেন গার্ডেন?'

'না, শুধু ঘুব্‌বো। ঘুবে-ঘুবে বেডাবো।'

পথেব উপব হইতে একখানা মোটব ডাকিযা তাহাবা চডিযা বসিল। ড্রাইভাবকে বলিল, উত্তব দিকে গাডী চালাইতে। কোথায, তাহা কিছু বলিল না। গাডী যখন ছুটিতে লাগিল তখন পিছন দিকে হেলান দিযা আবাম কবিযা দুইজনে বসিযা বহিল।

একবাবটি কেবল সুখলতা বলিল, 'ঘুমুই এসো আমবা দু'জনে। ঘুম ভাঙ্‌লে গাডী থেকে নাম্‌বো। মোটবে চডতে কি আবাম বল ত?'

জহব বলিল, 'যন্ত্র সভ্যতাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।'

বহুক্ষণ ধবিযা তাহাবা মোটবে ছুটাছুটি কবিতে লাগিল, মাঝে মাঝে জহব ড্রাইভাবকে পথ নির্দেশ কবিযা দিতেছিল। সুখলতা শুধু কাৎ হইযা চোখ বুজিযা আছে, এক-একবাব আবামে তাহাব মুখে হাসি ফুটিযা উঠিতেছিল।

ঘণ্টা-খানেক পবে এক জাযগায আসিযা জহব গ্যাড়ী দাঁড় কবাইল। বলিল, 'এবাব নামো।'

সুখলতা বিবক্ত হইয়া বলিল, 'এই তোমাদেব দোষ। একেবাবে ভেসে যেতে পাবো না।'

দুইজনে নামিল। জহব পকেট হইতে টাকা বাহিব কবিযা ভাডা চুকাইয়া দিল। অর্থব্যয নিতান্ত

অল্প হইল না। শিখ ড্রাইভারটা যাইবার সময় তাহাদের সেলাম করিয়া গেল। ফুটপাথে উঠিয়া সুমুখেই দোকান।

জহর বলিল, 'এ বাজারটায় গরু হারালেও খুঁজে পাওয়া যায়। কি কিন্‌বে বল?'

একে-একে ফর্দ্দ করিয়া দুইজনে এক-একটা দোকানে উঠিয়া জিনিসপত্র কিনিতে লাগিল। জহরের বিশ্বাস, কলিকাতার দোকানদাররা ঠকায় না, সুতরাং দর-দস্তুর করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। যাহারা মফঃস্বল হইতে আসিয়া কলিকাতার লোক বলিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়ায় তাহারাই দর-দস্তুর করিয়া কলিকাতার ভদ্র দোকানদারগুলিকে অসম্মান করে। জহর মনে করে, জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি এ দেশের মাড়োয়ারি ব্যবসায়িগণ। লোটা, কম্বল এবং ছাতুকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা আজিও এই দরিদ্র ভারতবর্ষের মান রক্ষা করিতেছে। কোনো কাজ না থাকিলে সে বড়বাজারে বেড়াইতে যায়, মনে-মনে মাড়োয়ারীদের তারিফ করিবার জন্য। একবার পকেটকাটা সন্দেহ করিয়া একটা গোয়েন্দা তাহাকে বড়বাজার হইতে বরাহনগর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল। শেষকালে একটা ভাঙা বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া পিছনের দরজা দিয়া জহরকে অতি কষ্টে অদৃশ্য হইতে হইয়াছিল।

জামা-কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে খরিদ করিয়া তাহারা আবার পথে নামিয়া আসিল। কিছুদূর গিয়া একটা জুতার দোকানে সুখলতা ঢুকিবার চেষ্টা করিতেই জহর বাধা দিয়া বলিল, 'ও-দোকানে নয়, অন্য জায়গায় চল।'

'কেন? এ ত বেশ বড় দোকান।'

'ওখানে আমি চাকরি করতাম!'

'চাক্‌রি করতে? জুতোর দোকানে?'

'চাক্‌রি, তা সে যেখানেই হোক।'

'তা ত বটেই। অমন সুখের চাক্‌রি ছাড়লে কেন? মেয়েরা বুঝি জুতো কিন্‌তে আসতো না?'

'সেই জন্যেই ছাড়তে হয়েছিল।' জহর বলিল, 'বিশেষ কারণে সত্ত্বাধিকারীকে জুতো মেরেছিলাম।'

'জুতো মেরেছিলে, এই অহিংস যুগে?' সুখলতা হাসিয়া বলিল।

জহর বলিল, 'তখন অহিংস ছিলাম না, অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া অভ্যেস ছিল।'

অন্য একটা দোকানে তাহারা আসিয়া উঠিল।

কাঁসারিপাড়ায় একটা বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া জহর কড়া নাড়িল। কিয়ৎক্ষণ ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের সাড়া আসিল, 'কে গা?'

জহরের হইয়া সুখলতা উত্তর দিল, 'দরজাটা একবার খুলুন ত?'

মিনিট-দুই পরে দরজা খুলিল। ভিতর হইতে একটি মহিলা গলা বাড়াইয়া হঠাৎ জহরকে দেখিয়া ভিতরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সুখলতা তাঁহার কাছে অগ্রসর হইয়া গেল। নমস্কার করিয়া বলিল, আপনাদের বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে বলে লেখা রয়েচে। ক'খানা ঘর আছে সবসুদ্ধ?'

মহিলাটি কহিলেন, 'দু'খানি ঘর আর রান্নাঘর। আপনাদের ক'খানা দরকার?'

সুখলতা কহিল, 'দু'-তিন খানা হ'লেই চলবে। রাস্তার দিকটা বুঝি ভাড়া দেবেন?'

মহিলাটি অলক্ষ্যে একবার সুখলতার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিলেন, 'এসে দেখুন না ভেতরে? পছন্দ হ'তেও পারে, অবশ্য আপনাদের উপযুক্ত কি না—'

জহরকে ইঙ্গিতে দাঁড় করাইয়া সুখলতা ভিতরে প্রবেশ করিল। মহিলাটিকে কুণ্ঠিতভাবে

অনুসরণ করিতে দেখিয়া বলিল, 'বড়লোক বলে আমাদের সন্দেহ করবেন না, আমরাও মধ্যবিত্ত।'

আলো-হাওয়া যুক্ত দুইখানি ঘর দেখিয়া অতি সহজেই পছন্দ হইয়া গেল। পছন্দ করিয়া সুখলতা কহিল, 'ভাড়া কত বলুন ত?'

মহিলাটি এমন ভাড়াটে পাইবার জন্য মনে-মনে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়া ছিলেন। নারীর রূপের প্রতি নারীর একটি ঈর্ষা মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে। তিনি কহিলেন, 'এঁরা সবাই অফিসে গেছেন, ফিরবেন সন্ধ্যের পর। তাঁরা থাকলে বলতেন, কুড়ি টাকা। আপনাদের কিছু কমেও হতে পারে। বরাবর থাকবেন ত?'

সুখলতা হাসিল। বলিল, 'সে কি বলা যায়? যারা এই চুক্তিতে ঘরভাড়া নেয় তারা মানুষ নয়, মরা মানুষ।' বলিয়া সে আবার হাসিল।

মহিলাটি এই সুযোগে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, 'আপনার সঙ্গে উনি বুঝি স্বামী?'

সুখলতা হাসি বন্ধ করিল না, বলিল, 'বুঝতেই পারছেন!'

'সে তো বটেই; না বললেও বোঝা যায়! আসুন আপনারা, এই ঘরেই থাকুন। ওঁরা এলে বল্‌বো কুড়ি টাকার কিছু কম করতে।'

'কুড়ি টাকাও দেওয়া যেতে পারে, ঘর আপনাদের ভালই।' বলিয়া সে জহরকে ডাকিবার জন্য বাহিরে আসিল। মুটের মাথায় জিনিসপত্র লইয়া জহর তখন পথের উপর উদাসীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মুটে মোটসুদ্ধ ইতিমধ্যে পালাইলেও হয় ত তাহার হুঁস হইত না।

মোট লইয়া জহর ভিতরে জিনিসপত্র নামাইল। পয়সা লইয়া মুটে যখন চলিয়া গেল, আড়ালে মহিলাটি তখন সুখলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাদের আর জিনিসপত্র কোথা?'

সুখলতা বলিল, 'আনতে হবে, এই কাছেই আমার বাপের বাড়ীতে সব আছে! আমরা আজ সকালে এলাহাবাদ থেকে ফিরলাম কি না?'

'বাপের বাড়ীতে ঝগড়া করে এসেচেন বুঝি?'

'ঝগড়া নয়, মতান্তর।' সুখলতা কহিল, 'তা ছাড়া বাপের বাড়ীতে মেয়েদের বেশীদিন থাকা উচিত নয়। ভায়েদের মন ভারী হয়ে উঠে।'

'তা সত্যি, ঠিক বলেচেন। আপনার স্বামী কি করেন? চাকরী করেন না?'

সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'চাকরী ছাড়াও মানুষের বাঁচবার উপায় আছে। উনি অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করেন।

মহিলাটি বোধ করি এবার খুসি হইতে পারিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, যে-লোক চাকরী করে না, তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি এবং যোগ্যতা একটু অল্প। যাহা হউক, ভিতরে খবর দিবার জন্য তিনি চলিয়া গেলেন।

দুইটি ঘর পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সুখলতা খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইল। দেওয়ালগুলি সে ভাল-ভাল ছবি টাঙাইয়া ভরিয়া তুলিবে। ঘর সাজাইবার ইচ্ছা তাহার প্রচণ্ড নয়, কিন্তু সাজানো ঘর দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রচুর। তাহার মতে কিছুই স্থায়ী নয়, স্থায়ী নয় বলিয়াই সব জিনিসের সৌন্দর্য্য এত আনন্দদায়ক। স্থায়ী অনড় আরামের মূল্য তাহার কাছে নাই, ক্ষণকালের আনন্দ তাহার কাছে অনেক বড়। সে ক্ষণিকবাদিনী।

এ ঘরে আসিয়া সে কহিল, 'এবার তোমার বিশ্রাম, বসো তুমি। আমি একবার বাজারে যাবো কিনতে কাট্‌তে। কিছু পয়সা কড়ি বরং দাও। মেঝেতে বসলে কেন, বিছানাগুলো কেনা হ'লো কি জন্য? ওগুলো গুছিয়ে পাতো, আমি আসচি।'

পয়সা কড়ি লইয়া সুখলতা বাজার করিতে বাহির হইয়া গেল। বাজার খুব কাছেই, ছোট বাজার। কলিকাতায় প্রত্যেক তিন শত গজের মধ্যে একটি করিয়া বাজার। বাজারে গিয়া সুখলতা চাল-ডাল কিনিল, তরী-তরকারী কিনিল, মশলা-পাতি কিনিল। নূতন সংসারের অন্যান্য সরঞ্জাম

কিনিতে ভুলিল না। বাজার করিতে-করিতে তাহার নেশা ধরিয়া গিয়াছিল। ফিরিবার সময় জিনিসপত্র লইয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া সে দরজায় আসিয়া পৌঁছিল।

গাড়ী ভাড়া চুকাইয়া দিল। জহর জিনিসপত্র নামাইয়া লইল। উপযুক্ত ঘরে সুখলতা যে কত বড় ঘরণী হইতে পারিত তাহা এই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া জহর বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল। সুখলতা ভিতরে আসিয়া দেখিল, জহর ইতিমধ্যে সমস্ত গুছাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

যে-কথাটা এতক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মনে হয় নাই, তাহাই এবার ভয়ানক চেহারা লইয়া দুইজনের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

জহর বলিল, 'সব ত হ'লো, তারপর?'

সুখলতা বলিল, 'তারপর কি?'

'এসব কি জন্য? কেন?'

সুখলতা কিয়ৎক্ষণ জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল। সুমুখে কয়েকখানা বাড়ীর মাঝখান দিয়া একটা আমগাছের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে, রৌদ্রটুকু পড়িয়া গেলেই শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবে। সেইদিকে চাহিয়া নিতান্ত শিশুর মতো সে বলিল, 'তাই ত, কেন বল ত? দু'জনের যে দু'দিকে চলে যাবার কথা! আমার এতক্ষণ মনেই ছিল না।'

সমস্ত আয়োজন একটি মুহূর্তেই যেন দুইজনের চোখে নিতান্ত মিথ্যা হইয়া গেল। কী প্রয়োজনে এতক্ষণ তাহারা অকারণে পরিশ্রম করিতে ছিল! স্পষ্ট সুখলতার মুখের দিকে তাকাইয়া জহর বলিল, 'একসঙ্গে থাকার কৈফিয়ত কি বলতে পারো? কিসের বাঁধাবাঁধি?'

সুখলতা তাহার মুখেব চেহারা দেখিয়া কহিল, 'তোমার মন অত্যন্ত সচেতন। মেয়েদের চেয়েও সচেতন।'

'সে আমি জানি।' কথাটা ঘুরাইয়া জহর বলিল, 'যাদের মন অতিরিক্ত সচেতন তাবা কোনদিন আত্মহারা হয়ে কিছু করতে পারে না। তারা বুঝ্‌লে না উচ্ছ্বসিত প্রেম কাকে বলে, কাকে বলে নিঃস্বার্থ ত্যাগ। তাদের খানিকটা স্বার্থপরও বলা চলে। রাশ তাদের সহজে আল্গা হয় না, অত্যন্ত করুণার পাত্র তারা। সে আমি বুঝি।'

'নিজের সম্বন্ধে তোমার তা হ'লে ধারণা নেই।'

'কোনো ধারণাই নেই! তবু বল্‌বো নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আমার একটু কম। আমি পরনিন্দা ভালবাসি নে, ভালবাসি আত্মনিন্দা। আত্মনিন্দার দ্বারা আত্মশুদ্ধি শাস্ত্রে লেখা নেই বটে, কিন্তু আমার মনে লেখা আছে।'

সুখলতা কথা কহিতে গিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, গৃহস্বামিনী আবার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জহরের নিকট হইতে কুড়িটি টাকা লইয়া সে উঠিয়া গিয়া তাঁহার হাতে দিল। বলিল, 'ভাড়াটা অগ্রিম দিয়ে রাখাই ভাল, আপনাদেরই সুবিধে।'

গৃহস্বামিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'টাকা ত নিতে আসি নি ভাই, বলতে এসেছিলাম আপনাদের এ-বেলাকার খাবার আমাদের এখানেই হোক্ না! রান্না চড়িয়ে দেবো কি?'

সুখলতা একবার জহরের দিকে তাকাইল। তারপর বলিল, একদিন বরং নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াবেন, আজকের মতো আমিই ক'রে নিতে পারবো। রান্নাঘরে উনুন পাতা আছে ত?'

'হ্যাঁ নতুন উনুন, এই সেদিন মাত্র—'

'তা হ'লেই হবে।'

মহিলাটি চলিয়া যাইবার সময় বলিলেন, 'ওরা এলে ভাই রসিদ দেবো।'

সুখলতা একগাল হাসিয়া কহিল, 'মনে ক'রে নিশ্চয়ই দেবেন, নৈলে রাত্রে আমাদের ঘুম হবে না।'

মুখখানি নির্ম্মল হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া মহিলাটি ভিতরে চলিয়া গেলেন। তিনি অদৃশ্য হইবার পর জহর তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'এদিকে যে কুবেরের ভাণ্ডার নয়, তা মনে আছে ত?'

সুখলতা তাহার মুখের দিকে তাকাইল। বলিল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ কলসীর জল গড়িয়ে গড়িয়ে যে ফুরিয়ে এল। বাড়ীভাড়া ত ক'রে বসলে, তারপর?'

সুখলতা বলিল, 'তারপর, তুমি পুরুষমানুষ, একটা উপায় করতে পারবে না? আর কত আছে তোমার থলিতে?'

'দু'টাকা ক' আনা মাত্র। চল বেরিয়ে পড়ি, ঘরে আমার ভাল লাগে না।'

'চল ঘুরে আসা যাক। ঘরে বসে থাকলেই পুরুষমানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

নূতন জুতা ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিয়া তাহারা বাহির হইল। যাইবার সময় দুইটা ঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া গেল।

বিকাল-বেলাটা কলিকাতার নাড়ী এই সময় চঞ্চল হইয়া উঠে। নগর মাত্রই চঞ্চল ও অস্থির। অস্থিরতাই আধুনিকতার বর্ত্তমান রূপ। যাহারা অস্থির নয়, তাহাবা পিছনে পড়িয়া থাকে। শহরে কেহ কাহারও দিকে ফিবিয়া তাকায় না—আত্মীয়হীন, বন্ধুহীন কলিকাতা শহরে যাহারা বাস করে, তাহারা মাত্র জীবন ধারণ করে, কিন্তু বাঁচিয়া থাকে না। এখানে দুইটি বস্তু নাই, মাটি ও ক্ষমতা। মাটি এখানে কিনিয়া ব্যবহার করিতে হয়। মাটিব সহিত যাহাদের সংস্পর্শ নাই তাহারা শহরবাসী, কিন্তু মানুষ নয়। যাহারা মাটি পবিত্যাগ করিয়াছে তাহারা মমতাহীন।

পথে গল্প করিতে-কবিতে দুইজনে চলিতেছিল। আজকাল নারী-আন্দোলন হইয়া একটিমাত্র সুবিধা হইয়াছে যে, পথে নারী দেখিলে এখন আর কেহ কাঙালেব মতো হাঁ কবিয়া তাকাইয়া থাকে না। যে-দেশেব পথে-ঘাটে ইতস্তত নাবী দেখা যায না, সে-দেশেব যুবকগণের মনে অস্বাস্থ্যকর দেহলালসা জমিয়া উঠে। চোখ এবং মন তাহাদেব উপবাস কবিযা-করিয়া জীর্ণ হইতে থাকে। জহবের ধারণা, নারীর সঙ্গলাভ করিলে এবং তাহাদের উৎসাহ পাইলে দেশে আরও অনেক বীর যুবক জন্মাইতে পারিত। নারীব সঙ্গলাভের ইচ্ছা চাপিয়া থাকিলে মনের মধ্যে ভীরুতা ও কাপুরুষতা আশ্রয় পায়। মেয়েদের স্বাধীনতাই জাতির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিমাপ!'

সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'পরাধীন দেশের একটা ভয়ানক অভিশাপ যে তাদের মেয়েরা গৃহবন্দিনী।'

'তাব ফল কি জানো ত?'

'জানি!' সুখলতা কহিল, 'তার ফল নারী-হরণ! যে-দেশে আজো নারী-হরণ হয় সে-দেশে সতীত্বের বড়াই করে কোন্ লজ্জায় আমি বুঝতে পারি নে।'

জহর কি-একটা মন্তব্য করিতে যাইতেছিল, সুখলতা হাত বাড়াইয়া একখানা রিক্সা গাড়ী ডাকিল। ফুটপাথের ধারে রিক্সা থামিতেই তাহারা দুইজনে উঠিয়া পাশাপাশি বসিল। রিক্সাওয়ালা ঘুঙুর বাজাইয়া তাহাদের টানিয়া লইয়া চলিল। চলিল সোজা উত্তর দিকে। জহর একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'যদি কোনো চেনা লোক দেখে?'

'কার চেনা?' তোমার, না আমার?'

জহর বলিল, 'আমার চেনা লোক দেখলে খুসি হয়, কিন্তু তোমার চেনা লোক?'

'আমার চেনা লোক যদি দেখে তা হ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে।'

অনেক দূরে গিয়া সে গাড়ী থামাইল। বলিল, 'এসো, একটা দরকারি কাজ সেরে যাই।'

দুইজনে গাড়ী হইতে নামিল। বাঁ-হাতি একটা রাস্তার মধ্যে বাঁকিয়া প্রকাণ্ড এক ধনীর বাড়ীর কাছে আসিয়া তাহারা মুহূর্ত্ত মাত্র এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর রিক্সাওয়ালাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে সটান প্রবেশ করিয়া গেল।

দারোয়ান তাহাদের সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সুখলতা জহরের পাশাপাশি আসিয়া

সুমুখের বড় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। বৈঠকখানায় ঢুকিতে গা ছম্‌-ছম্‌ করে। সুমুখে ইজিচেয়ারে যিনি বসিয়াছিলেন, মনে হইল তিনিই এ বাটীর মালিক। আশেপাশে জনকয়েক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক বসিয়া গৃহস্বামীর দিকে গভীর উৎকণ্ঠায় তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুই-একজন চেয়ার ছাড়িয়া সরিয়া গেল।

গৃহস্বামী বলিলেন, 'বসুন আপনারা, কি চান্‌?'

দুইজনে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চেয়ার টানিয়া বসিল। বসিয়া প্রথমেই জহর কথা কহিল, 'আপনার কাছে দু'বার আমরা এসেচি কিন্তু দেখা পাবার সুযোগ ঘটে নি।'

'ও। বলুন কি চাই?'

বিনীত কণ্ঠে জহর বলিল, 'আপনি 'মহিলা-সংসদে'র নাম শুনেছেন? কাগজে সম্ভবতঃ দেখে থাকবেন!'

ভদ্রলোক বলিলেন, 'মহিলা-সংসদ, না সমিতি?'

'অনেকে সমিতিও বলে। ইনিই সেখানকার সেক্রেটারী।' বলিয়া সে সুখলতাকে দেখাইয়া দিল। তারপর পুনরায় কহিল, 'নতুন সমিতি, ইনি আর ক'জন মহিলাকে নিয়ে অতি কষ্টে আরম্ভ করেছেন—অবস্থা ত তেমন ভাল নয়, সবারই সমান—'

'কি হয় সেখানে?'

গলা পরিষ্কার করিয়া বীণানিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে সুলখতা সুন্দর হাসি হাসিযা কহিল, 'এই ধরুন মেয়েদের শরীর চর্চা, লাইব্রেরী, বিনাবেতনে ইস্কুল, সঙ্গীত-শিক্ষা।'

'ও, বেশ বেশ—'

জহর বলিল,'আপনি অবস্থাপন্ন, আপনার কাছে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যের জন্য উনি—'

ভদ্রলোক একটু হাসিলেন। সুলখতা কহিল, 'আপনাদের ভরসা ক'রেই এই দুরূহ কাজে নামা, যদি উৎসাহ দেন তা হ'লে—' বলিয়া এমন করিয়া সে তাঁহার দিকে তাকাইল যে ভদ্রলোকটি বিন্দুমাত্রও অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আর্থিক সাহায্য পেলেও কি এ-সমিতি তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পারবে মা?'

সুখলতা কহিল, 'বাঁচানোটা দেশের মেয়েদের হাত, আমার শুধু পরিশ্রম।'

'সমিতির চাঁদা ওঠে না?'

'ওঠে কিছু-কিছু, কিন্তু সে অতি সামান্যই।'

ভদ্রলোক ড্রয়ার খুলিয়া পঁচিশটি টাকা বাহির করিয়া সুখলতাব হাতে দিলেন। বলিলেন, 'আমার সাহায্যও সামান্য, তোমার আশানুরূপ নয় মা। তবু কিছুদিন পরে যদি মনে হয, আর একবার এসো।'

সুখলতা সকৃতজ্ঞ নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, 'সামান্য হোক, আপনার কাছে যে উৎসাহ পেলাম এই আমাদের অনেক।'

দুইজনে উঠিয়া অগ্রসর হইল। ভদ্রলোক জহরের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন, স্বামী-স্ত্রীতে বেরিয়েচেন সমিতিকে বাঁচাতে।'

জহর বিনীত হাসি হাসিল, তারপর দুইজনে তাঁহাকে পুনরায় একবার সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়া উপস্থিত সকলের মুখের উপর দিয়া বাহির হইয়া গেল।

রিক্সা দাঁড়াইয়াছিল, দুইজনে ঘেঁষাঘেঁসি করিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া বলিল, 'যাঁহা খুসি লে চলো।'

সুখলতা বলিল, 'ভাবছিলাম শ'খানেক টাকা দেবে।'

ক্ষুব্ধকণ্ঠে জহর কহিল, 'নিজের রূপ সম্বন্ধে তোমার দেখছি ভয়ানক ভাল ধারণা।

'সে ধারণা কি অন্যায়? তুমি যে বিশ্বনিন্দুক, তুমিই সত্যি ক'রে বল ত?' বলিয়া সুখলতা

এমন করিয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইল যে, তাহার গরম নিশ্বাসটা জহর নিজের মুখের উপর অনুভব করিতে লাগিল। সুমুখের একটা গ্যাসের আলোয় দেখা গেল, এই শীতকালেও সাগুর দানার মতো সুখলতার মুখে, কপালে ও গলায় ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে।

জনকোলাহল ও যান-বাহনপূর্ণ কলিকাতার রাজপথের দিকে জহর একবার ফিরিয়া তাকাইল এবং সেইদিকে তাকাইয়াই সে কহিল, 'অত ক'রে হাঁপাচ্ছ কেন?'

সুখলতা কহিল, 'তোমার মতো জোচ্চুরিতে এখনো হাত পাকেনি, বোধ হয় তাই জন্য।'

'এ ত জোচ্চুরি নয়, এ উপার্জ্জন।'

'উপার্জ্জনের কি ধর্ম্মপথ নেই? তুমি বল কি?'

'উপার্জ্জন একদিকের কথা, ধর্ম্মপথ আর একদিকের। কেউ রোজগার করে জুয়া খেলে, কেউ কেরাণীগিরি ক'রে, কেউ বা মহিলা-সমিতির নাম ক'রে!'

সুখলতা তাহার অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া হাসিতে লাগিল। জহরের সমস্ত যুক্ত লইয়াই তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু তর্ক করিলে তাহাব কথার কৌতুকটুকু একেবারে চলিয়া যায়। সুখলতার মন রসসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাসায় ফিরিল তাহারা অনেক রাত্রে। ফিরিবার আগে তাহারা টিকিট কিনিয়া থিয়েটার দেখিয়া আসিয়াছে। থিয়েটার হইতে তাহারা গিয়াছিল এক হোটেলে। হোটেল হইতে পুনরায় ট্যাক্সি করিয়া ফিরিল।

সুখলতা বলিল, 'উপবাসের পব মানুষ যা পায় তাই খায়।'

জহর কহিল, 'হ্যাঁ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে।'

অন্ধকারে ঘরে ঢুকিয়া তাহারা আলো জ্বালিল। আলো জ্বালিয়া তাহাদের মনে পড়িল, আহার্য্যবস্তু এত পরিমাণে থাকিতে হোটেলে খাইয়া আসা তাহাদেব উচিত হয় নাই। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ফিরিয়া রান্না চড়াইলেই ভাল হইত। জিনিসপত্র আজিকার মতো সমস্তই শুকাইতে লাগিল। সুখলতাকে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িতে দেখিয়া জহর বিছানাগুলি ছড়াইতে লাগিল।

এ-ঘরে বিছানা পাতিয়া সে পাশের ঘরে ঢুকিল। এ-ঘরটি ও-ঘরটির চেয়ে ভাল—ভাল এবং সুন্দব। জহর পাতিল নূতন সররঞ্চি, নূতন তোষক ও ধোয়া চাদর। চাদর পাতিয়া গায়ে দিবার কম্বল গুছাইয়া রাখিল। জিনিসপত্রগুলি একপাশে সুবিন্যস্ত করিল।

অত্যন্ত মনোনীত বিছানা পাতিয়া জহর হাসিয়া ডাকিল, 'শোনো বলি?'

সুখলতা উঠিয়া আসিয়া এ-ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। বলিল, 'নাম ধরে ঢাকতে কি হয়েচে? নাম বুঝি শোনো নি?'

'তোমার নামটা কিছুতেই আমার মনে থাকে না।' জহর বলিল।

সুখলতা তাহার সদ্য প্রস্তুত বিছানার দিকে চাহিয়া কহিল, 'মনে থাকবার কথাও নয়, কারণ সে আমার মিথ্যে নাম। আমার নাম সুখলতা নয়।''

জহর নির্ব্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইল, তারপর কহিল, 'তবে?'

সুখলতা বলিল, 'মিথ্যে কথা বলা আমার ভয়ানক অভ্যাস। আমার সত্যি নাম হচ্ছে, শ্রীমতী।'

'শ্রীমতী? ও! নামটা মন্দ নয়। তোমাকে বেশ মানায়।' বলিয়া সে একবার এই পরমাসুন্দরী যুবতীটির মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত চোখ বুলাইয়া লইল। মনে হইতে লাগিল, একটা মানুষ যেন অকস্মাৎ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। জহর পুনরায় বলিল, 'সকল নামের মধ্যে তোমরা একই মেয়ে।'

শ্রীমতী কহিল, 'এ তোমার তত্ত্ব।'

'তত্ত্ব নয় বন্ধু, এ সত্য।'

শ্রীমতী পুনরায় কহিল, 'তোমার নাম কি শুনি?'

'জহর।'

'জহর? জহর? আগে জানলে আমার নাম বলতাম, হীরে!' বলিয়া আলোর দিকে চাহিয়া উচ্চ কণ্ঠে শ্রীমতী হাসিয়া উঠিল।

জহর বলিল, 'তোমার হাসির শব্দে পাথরের চিড় ধরে শ্রীমতী!' বলিয়া সে নিজেও হাসিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

৩

সকাল-বেলা দুইজনে দুই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। উঠিতে তাহাদের বেলা হইয়া গিয়াছে এবং এতই বেলা হইয়াছে যে ও-পাশের গৃহস্থেরা পুরুষদের আফিস-ইস্কুল পাঠাইয়া ধীরে-সুস্থে আলাপ-আলোচনা করিতে বসিয়াছিল। এ রকম নিদ্রা যাহাদের, মনে হয় এ-জগতে কোনো দায়িত্বের বোঝা বহন করিতে তাহারা আসে নাই।

শ্রীমতী কহিল, 'বাপ রে, কী ঘুম তোমার? আমাকেও হার মানালে যে!'

জহর কহিল, 'সারা রাত জেগে, ঘুম এল ভোর রাত্রে। একেই ত ঘরের মধ্যে শুয়েচি তাতে আবার নরম বিছানা—সমস্ত রাত গায়ের রক্ত কিলবিল করছিল, কী অস্বস্তি।

'তবে রাস্তায় গিয়ে শুলেই পারতে?'

জহর একবার হাসিল, তারপর কহিল, 'শক্ত কাঠের তক্তা, ছেঁড়া আর দুর্গন্ধ বিলিতি কম্বল, শীতের ঠাণ্ডা ফুটচে সর্ব্বাঙ্গে, একবেলা উপবাস—এম্‌নি অবস্থায় আমার হয় গভীর নিদ্রা। নরম আর গরম বিছানায় শুয়ে পিঠে কাঁকর ফোটে কেমন, এ কথা বোঝবার সাধ্য মেয়েদের নেই শ্রীমতী।'

'তা নেই হয় ত।' বলিয়া শ্রীমতী একটু হাসিল, তারপর পুনরায় বলিল, 'ওটা অভ্যেস! তোমাকে বল্‌চি নে, কিন্তু যারা কুকুর তাদের পেটে ঘি হজম হবার কথা নয়। যাদেব চবিত্র দুর্ভাগ্যেব মধ্যে গড়ে উঠে তারা—'

জহর বলিল, 'তোমার ঘুম হয়েছিল তা?'

'নিশ্চয়! নরম বিছানায় শুলে আমার গায়ে অমন সুড়সুড়ি লাগে না! কতবার ঘুমিয়েচি, কতবার জেগে উঠেচি তার সংখ্যা নেই। আহ্লাদে সমস্ত বিছানাটাকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনটা কাদামাটির মতো, এক ছাঁচ ভেঙে আর এক ছাঁচে বেশ তুলতে পারি।'

মুখ টিপিয়া জহর বলিল, 'তা ত দেখতেই পাচ্ছি।'

অসাবধানে শ্রীমতী বোধ করি কথাটা হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিল, এবার অপ্রস্তুত হইয়া তিক্ত কণ্ঠে বলিল, 'পাচ্ছ নাকি? খুব বুদ্ধিমান ত?' বলিয়া সে গামছাখানা হাত বাড়াইয়া লইয়া কাপড় কাচিতে যাইবার আগে বলিয়া গেল, 'তা বলে একটা কথা ভুলো না যেন, মেয়েরা মুখে যা বলে, মনে-মনে তার বিরুদ্ধ কথাই ভাবে।'

তাহার পথের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপ করিয়া জহর বলিল, 'তোমার লীলা ও লাস্যটুকু মন্দ নয় শ্রীমতী।'

কলের ঘর হইতে শুধু নারীকণ্ঠের উচ্ছৃঙ্খল হাসির শব্দ শোনা গেল।

স্নান করিয়া শ্রীমতী যখন পরিষ্কার রাঙাপাড়ে শাড়ী পরিয়া বাহির হইয়া আসিল তখন তার স্নিগ্ধ ও শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া জহর বলিল, 'এবার বোধ হয় রান্নাবান্না চড়াবে? বিলিতি বেগুনের অম্বল ক'রো কিন্তু।'

শ্রীমতী গম্ভীর হইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। তাহার এই অনাবশ্যক গাম্ভীর্যটুকুতে আনন্দ বোধ করিয়া জহর পাশের ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমতী তখন পিছন ফিরিয়া দেয়ালে একটা হাতের

ভর দিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিয়াছে। জহর গলা পরিষ্কার করিয়া কহিল, 'ভারি ধোঁকা লাগলো তাই ছুটে এলাম। বিলিতি বেগুন শুনে তোমার কি কোনো অতীত স্মৃতি মনে পড়লো?'

শ্রীমতী তাহার দিকে একবার ঘাড় বাঁকাইয়া আবার গাম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, কথা কহিল না। মন তাহার তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

জহর বলিল, 'আচ্ছা বেশ, রান্না করতে বলায় চটে গেছ, আমি না হয় উনুনটা ধরিয়ে...একবার তীর্থের পথে বেরিয়ে সমস্ত রাস্তাটা আমি দলবলকে বেঁধে খাইয়েছিলাম। তা ছাড়া এই সাম্যবাদের যুগ, মেয়েরা আজকাল পুরুষের সমান...আমি রান্না কচ্ছি।' বলিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

উনুন ধরাইতে বসিতেই শ্রীমতী পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিয়া 'রান্নাবান্না তুমি নিজের জন্যই ক'রো। আমি আজ আর খাবো না।'

'সে-কি?' জহর ঘাড় ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, 'স্বামী থাকতেই তুমি একাদশী করবে?'

শ্রীমতী স্পষ্ট করিয়া এতক্ষণে আসল কথাটাই বলিয়া ফেলিল, 'তোমার সঙ্গে আমার বনিবনা হবে না।'

'ও এই কথা!' একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া জহর পুনরায় কহিল, 'তুমি বনিবনা হবার জন্যে অপেক্ষা করছিলে? তা ছাড়া এমন বে-আইনী বনিবনা কেনই বা হবে? আঃ—আমি বাঁচলাম।'

'আমি চলে যাবো এখুনি।' শ্রীমতী উদাসীন হইযা কহিল।

'বেশ ত, আমি ত তোমায বেঁধে রাখি নি? তুমি ত যাবেই! তুমি এখুনি যাবে, পরেও যাবে, তোমার থাকাটাই হবে অস্বাভাবিক। সেইজন্যেই ত বল্‌চি, আমার হাতের রান্নাটা পরমানন্দে খেয়ে যাও যাবার সময়। বাঁধাকপির তরকারী কেমন রাঁধি দেখবে?'

'তুমি আমাকে অপমান করেচ বলেই যাচ্ছি।'

'ও!' বলিয়া জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া পুনরায় বলিল, 'তাই নাকি? কি কথায় লোকে অপমানিত হয় আমার জানা নেই। লেগেচে বুঝি খুব?'

শ্রীমতী কহিল, 'অপমান এখনো আমার লাগে।'

জহব হাসিতে লাগিল, খানিকটা হাসিয়া বলিল, 'মানে শুধু তোমারই লাগে, আমার লাগে না! বেশ ত, তা যাবার সময় একবার আমার হাতের রান্নাটা খেয়ে যাবে না? শুধু নিজের জন্যই রাঁধবো? তরকারীগুলো যে আলুনি লাগ্‌বে!'

'লাগুক।' বলিয়া শ্রীমতী আবার চলিয়া গেল।

জহর চুপ করিয়া সেখানে বসিয়া রহিল। উনন সে ধরাইবেই, রান্না সে করিবেই, আহার এবং বিশ্রাম করিবার এমন সুবর্ণ-সুযোগ সে কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। শ্রীমতীর অভাবে তাহার সমস্ত বিস্বাদ লাগিবে এমন আশঙ্কাও নাই। কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো তাহাদের পরস্পরের আকস্মিক ঠোকাঠুকি লাগিয়াছিল, দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেলে আবার তাহার তিন দিন আগেকাব পরিচিত জীবনের স্রোত দিনের পর দিন ধরিয়া তেমনি করিয়াই বহিতে থাকিবে। দিনমানের খররৌদ্রে কলিকাতার পথে-পথে টহল্‌ দিয়া বেড়াইবে, বিদেশে বিভুঁয়ে জলপথে, যেখানে হউক, যাত্রা করিবার জন্য সে সুযোগ খুঁজিতে থাকিবে, রাত্রি হইলে অন্ধকারে কোথাও ঘুমাইবার স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে, জুয়ার আড্ডায় গিয়া ধার করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবে এবং ফিবিবার সময় সেই বৃদ্ধা ভিখারিণীকে বক্‌শিস্‌ দিয়া আসিবে, যাহাতে সে পুলিশে ধরাইয়া না দেয়—সে-জীবনের সহিত এক রকম তাহার বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতীকে আবিষ্কার করিবার পর হইতে এমন আশা সে মনে-মনে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও পোষণ করে নাই রে, শ্রীমতীর নিকট হইতে সে ভালবাসা পাইবে, আনন্দ পাইবে; অথবা এই নারীটির সহিত সে ঘর করিবে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এত বড় ফাঁকি, এত বড় বাতুলতা তাহার নাই। এ কয়টি দিনের ইতিহাস জহর মনে-মনে স্মরণ করিয়া দেখিল, তাহাদের হাসিতে, গল্পে, আলাপে, আলোচনায়, পথে-বিপথে আগাগোড়া বিচ্ছেদের

সুরই থাকিয়া-থাকিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড় সত্য যে তাহাদের মধ্যে কোনো সেতু নাই, সেতু নাই বলিয়া বন্ধনও কিছু নাই; থাকা এবং চলিয়া যাওয়া তাই ছিল পরস্পরের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, যে-কোনো মুহূর্তেই এক জন আর একজনের নিকট হইতে চিরদিনের মতো অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারিত।

জহর আস্তে-আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর এ-ধারে আসিয়া দেখিল, গায়ে একখানা চাদর জড়াইয়া শ্রীমতী চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, পিছন দিক হইতে সে কহিল, 'আচ্ছা তুমি কি সকাল থেকে চলে যাবারই সুযোগ খুঁজছিলে? সুয়োগ না খুঁজে সহজেই ত যেতে পারতে শ্রীমতী?'

শ্রীমতী ঘাড় না ফিরাইয়াই বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তোমার সকল কথার আমি উত্তর দিতে পারি নে।'

জহর বলিল, 'বেশ, তা না হয় নাই দিলে, কিন্তু এই যে একঘর জিনিসপত্র কিন্‌লে, তুমি চলে গেলে এর বোঝা বইবে কে? এসব ত তোমারই। তোমারই পয়সায়—'

শ্রীমতী উত্তপ্ত কণ্ঠে বলিল, 'আমি কিছুই সঙ্গে ক'রে আনি নি মনে রেখো। ঘরকন্নার অত সখ আমার নেই!'

'আমারো নেই শ্রীমতী। চলে আমারই যাবার কথা। তুমি থাকো, যতই হোক এসব তোমার। তোমার সঙ্গে এই কটা দিন আমার আনন্দে কাট্‌লো এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আর কিছুক্ষণ আমায় ক্ষমা করো তা হ'লে একমুঠো ভাত খেয়ে যেতে পারি, আবার হয় ত কতদিন আহার জুটবে না।'

শ্রীমতী একবার ঘাড় ফিরাইল। বলিল, 'গলার আওয়াজ নরম ক'রে আবার সহানুভূতি টান্‌বার চেষ্টা কেন? এসব তোমার ফন্দি!'

জহর হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আমার বনিবনা হয়েছিল। মেয়েদের মন সাধারণত উচ্ছ্বাসে অভিভূত থাকে, তোমার ত নেই। তোমার মধ্যে ধোঁয়ার চেয়ে আলো বেশি।'

'থাক আর খোসামোদে কাজ নেই। আমি কী তা আমি জানি।'

জহর হাসিয়া চলিয়া আসিল।

ও-বাড়ীর সেই বউটি এতক্ষণ সিঁড়ির ধারে আসিয়াছিল, জহর চলিয়া যাইতেই সে ভিতরে ঢুকিল। মৃদু হাসিয়া বন্ধুর মতো জিজ্ঞাসা করিল, 'একবার এসে উঁকি মেরে দেখে গেছি, আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন। বাবা রে, অত বেলা অবধি আপনি ঘুমোন্?'

শ্রীমতীও তাহার উত্তরে হাসিয়া বলিল, 'আপনি নয়, আপনারা। সত্যি, এক এক দিন এমন ঘুমোই যে, জেগে দেখি দিন পুইয়ে রাত হয়েচে। ঘুমের টানে ঘুম আসে।'

বউটি কহিল,'এখনো রান্না চড়ান নি? বেলা অনেক হয়ে গেল!'

শ্রীমতী কহিল, 'আর বলবেন না, এইমাত্র ষ্টোভে খাবার হয়ে গেল। রাঁধতে আমাদের বেলাই হয়। এইবার গিয়ে উনুন ধরাবো।' মনে-মনে কিন্তু সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বউটি একবার এদিক-ওদিক তাকাইল, তারপর গলা নামাইয়া চুপি-চুপি কহিল, 'আপনি কাল আলাদা ঘরে শুয়েছিলেন কেন?'

শ্রীমতী কহিল, 'দুটো শোবার ঘরই ব্যবহার করা উচিত, তাই জন্যে।'

'তাই জন্যে আলাদা শোবেন? ঘুম হয়?'

'ঘুম আরো বেশি হয়। পুরুষমানুষকে ঘরে রাখার মতো ঝক্‌মারি আর কিছু নেই। রোজ ত আর নয়, মাঝে-মাঝে আলাদা শুই।'

বউটি একটু-একটু করিয়া গল্প করিতে দাঁড়াইয়া গেল। বলিল, 'আপনি বেশ আছেন, ছেলেপুলে হওয়া ভারি ঝঞ্ঝাট!'

শ্রীমতী কহিল, 'ছেলের মা হবার মতো মন আমার নয়। না হওয়াই ভাল।' বলিয়া সে একটু হাসিল।

বউটি বলিল, 'আপনার স্বামী যে আজ কাজে বেরোলেন না?'

'মাঝে-মাঝে বেরোলেই ওঁর চলে।'

ঘরের ভিতর তাকাইয়া বউটি পুনরায় কহিল, 'ভারি অগোছালো হয়ে রয়েচে। আপনি একা মানুষ, এক হাতে কতই বা পারবেন!'

শ্রীমতী কহিল, 'গোছানো আমার হয়ে ওঠে না। আমি বাস করতে পারি, ঘর করতে পারি নে। শৃঙ্খলা আমার পায়ে শৃঙ্খলের মতো বাজে।'

বউটি মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, 'কী মেয়ে আপনি?'

'সত্যি বল্‌চি।' শ্রীমতী বলিল, 'সংসারে আমার একটিমাত্র কাজ, দিন কাটানো। একটি দিন পার হয়ে যখন আরেকটি দিনে এসে পড়ি তখন আমার পক্ষে কী শাস্তি বলুন ত?'

বউটি মনে-মনে বিস্মিত হইল। স্ত্রীলোকের এরকম আজগুবী চিন্তার সহিত তাহার কোনকালে পরিচয় নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে ইহাদের কোনো অভাব চোখে পড়ে না, অশান্তি কিছু সত্যকারের আছে বলিয়াও মনে হয় না, গত কাল হইতে যেটুকু ইহাদের পরস্পরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উভয়কে কলহ-প্রকৃতির বলিয়াও মনে হইবার কথা নয়। বউটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, 'আপনি কি মনে কচ্ছেন আমাদের মধ্যে তেমন বনিবনা নেই? আমার কথা শুনে তাই ভাবচেন বোধ হয়?'

বউটি ঘাড় নাড়িল, তারপর বলিল, 'জিজ্ঞেসা করতে আমাব সাহস হচ্ছিল না ভাই।'

'আমিই বলছি।' বলিয়া শ্রীমতী একটু থামিল, তারপর কহিল, 'আমাদের মধ্যে যে রকম বনিবনা এরকম বাংলা দেশে ক্বচিৎ কোনো মেয়ে-পুরুষের ভাগ্যে ঘটে! তা ছাড়া বিয়ের অনেকদিন আগে থেকেই আমরা দু'জনে দু'জনকে জানি কিনা, সেই ছোটবেলা থেকে—'

'সত্যি? এ ত বেশ!' বউটির চোখদুটি বড়-বড় হইয়া উঠিল।

শ্রীমতী বলিতে লাগিল, 'একই গ্রামে ছিল আমাদের বাড়ী, গ্রামের কোলে ছিল চম্পানদীর তীর, উত্তর দিকে ছিল তার কুল-খেজুরের ঘন বন, আমরা সেই নদীর তীরে আর বনের ধারে মানুষ হয়েচি। এক পাঠশালায় পড়েচি, এক জায়গায় খেলা করেচি, একসঙ্গে সাঁতার কেটেচি।' শ্রীমতী কোমলকণ্ঠে স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, 'গ্রীষ্মকালের দুপুরে সেই ঘন বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় আমরা ধীরে-ধীরে এগিয়ে যেতাম। এই ছিল আমাদের নেশা। এমন নয় যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আমাদের মুগ্ধ করতো। আমাদের স্বভাবই ছিল বনে-জঙ্গলে নদীর ধারে মাঠের পথে ঘুরে বেড়ানো। অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা বনে-বনে ঘুরে বেড়াতাম, গলা ধরাধরি ক'রে ছুটোছুটি করা ছিল আমাদের একটা ভয়ানক আনন্দ। এমনি করেই দিন যেত। সেই থেকে প্রকৃতির পট- ভূমিকায় আমরা দু'জনে দুজনকে ভালবেসেছিলাম।'

বউটি বলিল, 'সেই থেকে ছাড়াছাড়ি হয় নি?'

শ্রীমতী কহিল, 'সাধারণ জীবনে ছাড়াছাড়ি হওয়াই স্বাভাবিক, আমাদের তা হয় নি, আমাদের পেছনে আছে আমাদের স্বাধীন মন। আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার উপায় নেই!'

বউটি বলিল, 'চমৎকার! চমৎকার আপনার গল্প।'

শ্রীমতী যখন হাসিয়া বাহির হইয়া আসিল, বউটি তখন আর দাঁড়াইল না, ধীরে-ধীরে উপরে উঠিয়া গেল।

জহর উনুন ধরাইয়া রান্না চড়াইতেছিল, শ্রীমতী দেখিল, সে একেবারে নিখুঁৎ আয়োজন করিয়া বসিয়াছে। পিছন দিক হইতে কহিল, 'হয়েচে, ঢের হয়েচে, এবার উঠে দাঁড়াও।'

হুকুম শুনিয়া জহর টপ্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমতী গিয়া উনুনের সুমুখে বসিয়া পুনরায়

বলিল, 'দস্যির মতো গায়ে জোর আমার নেই, বাটনা বাটতে পারবো না, বরং রেঁধে দিয়ে যেতে পারি।'

জহর বিনীত কণ্ঠে কহিল, 'আচ্ছা আমি বাটনা বেটে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি নিতান্তই খেয়ে যাবে না?'

'চুপ একেবারে।' বলিয়া শ্রীমতী নিজের কাজ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ চুপ কবিয়া কাটিয়া গেল, তারপরই জহর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'চোখ রাঙানো শাসন সহ্য করা আমাদের অভ্যেস। ও আমাদেব আর গায়ে লাগে না।'

'গণ্ডারের চামড়া যে!' শ্রীমতী ক্ষুব্ধকণ্ঠে পুনরায় কহিল, 'বন্দুকের গুলি ছাড়া লাগে না! মার না খেলে তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়।'

'ঠিক বলেছে শ্রীমতী।'

'আবার?' বলিয়া শ্রীমতী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, 'আবার তোমার ওই খোসামোদের সুর? যাও আমার বাটনা বেটে দিতে হবে না। ছোঁওয়া যেন আমার পেটে না যায়!'

'আমি ত বামুনের ছেলে।'

'থাক্, বামুনের ছেলে হলেই বামুন হয় না। যাও এখন সুমুখ থেকে।'

'বাঁচলাম। বলিয়া উঠিয়া জহর তাড়াতাড়ি ঘবে চলিয়া গেল। ধোঁয়ায় তাহার চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, কাপড় দিয়া রগড়াইয়া মুছিতে লাগিল।

শ্রীমতী গর গর করিতে-করিতে রান্না চড়াইল। আয়োজন যাহা প্রস্তুত ছিল তাহা সে কাটছাঁট করিয়া সঙ্কুচিত করিল। তাহার মনে এমন এক জায়গায় চিড় ধরিয়াছে যাহার সংস্কার করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। সত্যই ত, এমন করিয়া থাকিবার তাহার প্রয়োজন কি? সে কি স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এই জন্য? পথে নামিয়া সে নূতন করিয়া সংসার রচনার স্বপ্ন দেখিতে আসে নাই! এ-লোকটির সহিত এমন করিয়া দিন এবং রাত্রি কাটাইবাব তাৎপর্য্য কী থাকিতে পারে? পথ ভুল করিবার সম্ভাবনাও তাহার নাই, ভুল সে করেও নাই কোনোদিন, এ-লোকটিকে জড়াইয়া ধীরে-ধীরে সে কোথায় চলিয়াছে?

জহর স্নান করিয়া রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমতীর রাগ ততক্ষণে একটু পড়িয়া গিয়াছে। বলিল, 'কিছু মনে ক'রো না, তোমাকে অনেক বক্‌লাম। তুমি আমার জন্যে অনেক করেচ, তোমার উপকার আমি ভুলবো না।'

জহর বলিল, 'এই শুকনো কথাগুলো তোমাকেও আমার বলা উচিত।'

'এই শুকনো কথাগুলোতেই জগতের বাজার চলে মনে রেখো!'

'তা চলুক।' জহর বলিল, 'কিন্তু একটা কথা আমার কেবলই মনে হচ্ছে তুমি চলে যাবার এমনি একটা ফিকির খুঁজছিলে শ্রীমতী। তুমি যাবার সময় হাসি মুখেই চলে যেতে পারতে, আমার বাধা দেবার কিছু ছিল না।'

'হাসি মুখেই ত যাবো!'

'না, এর পরে তোমার মুখে হাসি আর মানাবে না।'

তরকারি নামাইয়া শ্রীমতী বলিল, 'তা বলে ফিকির আমি খুঁজি নি। যারা ফিকির খোঁজে তারা দুর্ব্বল। আমি যে এখানে বসবাস করতে আসি নি, এটা তোমার জানা উচিত।'

জহর হাসিল, হাসিয়া বলিল, 'একথা বলে আমাকে লজ্জা দেবার চেষ্টা নাই বা করলে। তুমি কতক্ষণে চলে যাবে আমিও তারই অপেক্ষায় আছি এবং চলে যখন যাবে তখনও ভুলেও একবার জিজ্ঞাসা করবো না, কোন্ পথে তুমি যাবে, কেন যাবে, অথবা গিয়ে আবার ফিরবে কি না।'

শ্রীমতী নীরবে রান্না করিতে লাগিল, কোনো জবাব দিল না। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে প্রশ্ন না করিয়া সে থাকিতে পারিল না। বলিল, 'কোথায় যাবো তাও জিজ্ঞাসা করবে না?'

'না। সে নীতিই আমার নয় শ্রীমতী। কোথায় আমার কতটুকু অধিকার সে সম্বন্ধে আমি বিশেষ সচেতন।'

'আমি যখন আর ফিরবো না, এ বাড়ীর লোকদের তুমি তখন কি বল্‌বে?'

জহর আবার হাসিয়া বলিল, 'তুমি কি ভাবচ, তুমি চ'লে যাবার পরেও আমি এখানে বসে ঘরকন্না করবো। আমি যখন নিরুদ্দেশ হই তখন আমি নিজেকেও আর খুঁজে পাই নে।'

শ্রীমতী বলিল, 'তবে যে এত জিনিসপত্র কেনাকাটা হ'লো—'

'তোমাকে আগেই বলেছি এসব আমার নয়, তোমার।'

'আমি ত আব সঙ্গে নিয়ে যাবো না।'

'আমিও নেবো না এটা তোমাব জানা উচিত।' জহর বলিল।

শ্রীমতী কহিল, 'তা বলে তুমি মনে করো না, এসবের ওপর আমার এতটুকু মায়া-মমতা আছে! যাবার সময় পিছন ফিরে চাওয়া আমার চরিত্রে লেখা নেই!'

জহর হাসিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে আমার চরিত্রের বিশেষ তফাৎ নেই, তবে আমি যখন তাই তখন সুমুখের দিকেও তাকাই নে। আমাব অতীতের দিকে কুহেলিকা, ভবিষ্যতের দিকে কুয়াসা।'

রান্না হইয়া গিয়াছিল, থালায় তরকাবি সাজাইয়া শ্রীমতী ভাত বাড়িয়া দিল। জহর আসিয়া খাইতে বসিবার আগে বলিল, 'তোমার ভাত বুঝি আগেই বেড়ে নিয়েচ?'

'হ্যাঁ।' বলিয়া শ্রীমতী তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, 'তুমি ভাবছিলে তোমার খাওয়ার পর তোমার পাতে আমি বস্‌বো?'

'রাম বলো। বে-আইন কথা আমি ভাবি নে।' বলিয়া জহর খাইতে বসিয়া গেল।

একটা অহেতুক তাচ্ছিল্যভরে শ্রীমতী পরিবেশন করিতে লাগিল। মনে হইল, পাছে কোথাও যত্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে এজন্য ইচ্ছা করিয়াই সে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। ইহার কোন যুক্তি ছিল না। পাতে নুন দিল, কিন্তু তাহাব পরিমাণ এত যে সমস্তটা খাইলে মানুষের মৃত্যু হয়। গেলাসে এমন করিয়া জল ঢালিয়া দিল যে, গেলাসের মাথা ছাপাইযা জল গড়াইয়া জহরের বসিবার জায়গা পর্য্যন্ত ভিজিয়া একাকার হইল। সমস্ত ভাতের মাথায় এমন করিয়া ঘি ছড়াইয়া দিল যে সবটা পেটে গেলে কলেবা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ঘিয়ের বাটি ফুরাইয়া যাইতেই জহর বলিল, 'আরেকটুকু দিলে পারতে, ঘি আমার একটু বেশি খাওয়া অভ্যেস।'

শ্রীমতী বলিল, 'কিনে আনো গে তবে দোকান থেকে।'

জহর কহিল, 'যে পরিবেশন করে তারই যাওয়া উচিত, শাস্ত্রে লেখা আছে।'

'আমার গুরুঠাকুব এসেছেন।' বলিয়া শ্রীমতী গর-গর করিযা খাইতে বসিল। পবমানন্দে আহার করিতে করিতে একসময়ে জহর শ্রীমতীর পাতের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'তুমি বোধহয তরকারি একটু বেশিই খাও, না শ্রীমতী?'

শ্রীমতী নিজের পাতে তরকারির পরিমাণ দেখিয়া এতটুকু লজ্জিত হইল না। বরং বলিল, 'আমার পাতের দিকে অমন নজর দিয়ো না।'

জহর বলিল, 'শাকসজি বেশি খেলে বোধ হয় চেহারা দেখতে ভালই হয়।'

শ্রীমতী কহিল, 'কেবল বাজে কথা। খেতে বসলে যে বিরক্ত করে সে ইতরের মুখ দেখতে নেই।'

'তাই বটে।' জহর বলিল, 'আমি একবার একজনদের বাড়ীর গোয়ালে রাত কাটাবার জন্যে ঢুকেছিলাম। শান্ত গরু, গরুরা চিরকাল শান্তই হয়; কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে পড়তেই তেড়ে এল শিং বেঁকিয়ে, ফিরে দেখি জাব খাচ্ছিল।' বলিয়া সে হাসিল।

শ্রীমতীও এবার না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, 'যার যেখানে জায়গা সে নিজেই তা বেছে নেয়।'

কি বলিতে গিয়া কি হইয়া গেল। জহর একটু আহত হইয়া বলিল, 'আমাকে আঘাত ক'রে তুমি যদি হাসিমুখে যেতে পারো ত আমার আপত্তি নেই।'

তরকারিগুলো আগেই খাইয়া ফেলিয়া জহর শুধু ভাত বসিয়া-বসিয়া খাইতেছিল। শ্রীমতী অন্য কথায় ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, 'খাওয়ার ওই কি ছিরি? ভাত খাচ্ছ না জাবর কাট্‌চ?'

জহর বলিল, 'অনাদরের ভাত জাবর কাটারই মতো। পূর্ব্বজন্মে জীবন-জোড়া দুঃখের প্রতিবাদ যারা করতে পারে নি, পরজন্মে তারা গরু হয়েই জন্মায়, তারা জাবরই কাটে।'

পিতলের একটা হাতা দিয়া শ্রীমতী নিজের থালা হইতে তরকারি তুলিয়া তাহার পাতে দিল। বলিল, 'এইতে যেন সব ভাত খাওয়া হয়। ও-বেলা ত কোথায় থাকবে তার ঠিক নেই, খাবার আরো বেঠিক, ভাত যেন ফেলে উঠো না।'

জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'এই কি তোমার আসল চেহারা? এই স্নেহের স্পর্শটুকু?'

শ্রীমতীও তাকাইল তাহার মুখের দিকে। বলিল, 'ছুঁতেই তুমি নুয়ে পড়লে বুঝি। এটুকু যে অতি সাধারণ ভদ্রতা?'

'হঠাৎ এই ভদ্রতা কেন?'

শ্রীমতী কহিল, 'এবার যে বিদায় নেবার পালা, তাই জন্যই—'

'তাই জন্যই এই ভদ্রতার আয়োজন?'

জহর হাত ধুইতে উঠিয়া পড়িল। শ্রীমতীও উঠিল, বেলা থাকিতে-থাকিতেই তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। কোথায় যাইয়া কি করিবে সে সম্বন্ধে তাহার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। আজই বাহির হইয়া সে কোথাও একটা চাকুরি খুঁজিয়া লইবে। মেয়েদের জন্য আজকাল কলিকাতার পথেঘাটে যেখানে-সেখানে চাক্‌রি পড়িয়া আছে—এই তাহার ধারণা; অর্থোপার্জ্জনের মতো সোজা কাজ জগতে আর কিছু নাই। পথে-পথে টাকা পয়সা ছড়ানো, কেবল কুড়াইয়া লইবার কৌশলটুকু জানা দরকার। কোটি-কোটি লোকের মতো শ্রীমতীও অতি সহজে সে কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইবে। অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে জহরের অক্ষমতা স্মরণ করিয়া অনুকম্পায় তাহার মন ভরিয়া আসিল।

গায়ে চাদর ও পায়ে চটি জুতা পরিয়া সে প্রস্তুত হইয়া লইল। জহর তাহার আগেই জুতা পরিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, 'তুমি কোন্ দিকে যাবে?'

জহর বলিল, 'এই দিকেই যাবো ভাবচি। তুমি?'

'আমি যাবো ও-দিকে।'

'ও।' বলিয়া তাহার পথের দিকে একবার তাকাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া জহর বলিল, 'আচ্ছা—নমস্কার।'

'নমস্কার।' বলিয়া শ্রীমতী ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, জহর তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হাত তুলিয়া সে আর একবার নমস্কার করিল, কিন্তু জহর তাহার প্রত্যুত্তর দিল না। শ্রীমতী গলা বাড়াইয়া কহিল, 'সমস্ত কলকাতা শহরে আজ ঘুরে-ঘুরে বেড়াবো। চাক্‌রি আমি খুঁজে বার করবোই।'

জহর কি যেন একবার ভাবিল, তারপর তাড়াতাড়ি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। কাছে গিয়া পকেট হইতে হাত বাহির করিয়া বলিল, 'এ টাকাকড়ি তোমার, তুমি নিয়ে যাও।'

'না না, সে কি, তোমার চল্‌বে কি করে? ব্যস্ত হইয়া শ্রীমতী হাত সরাইয়া লইল।

'আমার চল্‌বে, আমি জুয়া খেল্‌তে জানি। তুমি ত আর সে ইত্‌রোমো কর্‌তে পারবে না। এ টাকা তুমি সঙ্গে রাখো।'

শ্রীমতী কহিল, 'তা হলে তোমার সঙ্গেও কিছু থাক্?'

'কিছুই থাক্‌বে না।' বলিয়া শ্রীমতীর একটা হাত টানিয়া ধরিয়া জহর টাকাগুলি তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। বলিল, 'টাকার অভাবে অসম্মানের আঁচ্ যেন গায়ে না লাগে।'

শ্রীমতী কম্পিতকণ্ঠে কহিল, 'সব দিলে, কিছুই রইলো না যে তোমার!'

'কিছুই রইলো না বটে!' বলিয়া জহর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একপ্রকার মলিন হাসি হাসিল এবং তারপর আর কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া চলিতে লাগিল।

শ্রীমতী পথের উপরেই একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। জহরকে আর একবার ডাকিবার চেষ্টা করিল কিন্তু মনে হইল, গলার আওয়াজ তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে। মাথার উপরে সূর্য্য খররৌদ্র বর্ষণ করিতেছিল। অদূরে মালবোঝাই করিয়া কয়েকখানি গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে চাকার আওয়াজ করিতে-করিতে চলিয়াছে; মাঝে-মাঝে আসন্ন বসন্তকালের এলোমেলো বাতাস থাকিয়া-থাকিয়া ধূলি জঞ্জাল উড়াইয়া বহিয়া চলিয়াছিল। বহুদূর পথ; গন্তব্য যেখানেই হউক, পথ অসীম এবং অপরিমিত, ইহারই মধ্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহার চলিবে না। পা বাড়াইয়া শ্রীমতী আবার আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। একথা আর অস্বীকার করিলে চলিবে না, জহরের সহিত সে সদ্ব্যবহ.. করিয়া আসে নাই! এই বিনষ্ট-জীবন যুবকটির প্রতি ইচ্ছা করিলে সে আরও একটু কোমল হইতে পারিত।

রৌদ্রক্লিষ্ট জনবিরল পথে চলিতে-চলিতে তাহার মনে হইল, যে-পরিচয় সে জহরের কাছে দিয়া আসিল তাহ্াই তাহার চরম আত্মপরিচয় নয়। উপকার পাইলে সে কৃতজ্ঞ হইতে জানে, ভদ্রতা দেখিলে সে মনে-মনে প্রশংসা না করিয়া পারে না। সংসার যদিচ তাহাকে আজ পর্যন্ত শিখাইয়াছে মানুষের সহজ স্নেহ ও মমতাকে পদদলিত কবিতে, তবুও অন্তরে-অন্তরে এই দুর্দ্দিনের বন্ধুটির প্রতি নম্রচিত্তে সে আর একবার নমস্কার না জানাইয়া থাকিতে পারিল না।

ধূলা ও রৌদ্রেব ভিতর দিযা যতদূর পর্য্যন্ত শ্রীমতীর সুন্দর তনুলতাটি দেখা যাইতে লাগিল, জহর একটা বাড়ীর বাবান্দার নীচে দাঁড়াইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। মনে হইল, তাহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া একটি অনাস্বাদিত পূর্ব্ব মর্ম্মকামনা শ্রীমতীর পিছু-পিছু অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। শ্রীমতী আসিয়াছিল ঠিক প্রদীপের আলোকের মত, সেই আলোয় জহর আপন অন্তঃস্থলের চারিদিক দেখিতে পাইযাছিল, শ্রীমতী চলিয়া যাইবার পর আবার যেন তাহার ভিতরটা ধীরে-ধীরে অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। অন্ধকার হইয়া থাকিয়াই সে চিরদিন জীবনের বহুবিচিত্র রূপ দেখিয়াছে, অন্ধকারে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সে পথ আবিষ্কার করিয়াছে, অন্ধকারেই নিজেকে সে চিনিতে শিখিয়াছে। নিরন্ধ্র নিশীথিনীব বিজনপ্রান্তে বসিয়া সে আপন অন্তর্দেবতার অশ্রুকাতর দীর্ঘনিশ্বাস শুনিয়াছে। জীবনে যাহাবা আলোকের মুখ দেখিতে পায় নাই তাহারাই তাহার বন্ধু ও সহচর। অন্ধকার তাহাব শয্যা, অন্ধকারেই তাহার বিশ্রাম।

বড় রাস্তার ফুটপাথ ধরিয়া সে আবার চলিতে লাগিল। শ্রীমতী তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল একথা ভাবিবার প্রয়োজন তাহার ছিল না। এমন নয় যে এই নারীটির প্রতি তাহার কোনরূপ আসক্তি ছিল। আসক্তি হইতে বেদনা, বেদনা হইতে বিলাপ। শ্রীমতীর জন্য বিলাপ করিবে— সে স্তর হইতে বহুদিন সে নামিয়া স্সিয়াছে। নারীর জন্য বিলাপ করিবার মতো বিশুদ্ধ আবেগগুলি তাহার শুকাইয়া গিয়াছে। তবু এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না শ্রীমতীকে ঘিরিয়া তাহার নিশ্বাস পর্য্যন্ত গন্ধমধুর হইয়া উঠিয়াছিল, সে নিশ্বাস আবার তাহার দিন-দিন মলিন হইয়া আসিবে। শ্রীমতীর সহিত একত্রে বসবাস করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুঞ্জ-পুঞ্জ চঞ্চল জীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, আবার তাহা পথের ধূলায় এবং রৌদ্রে প্রতিনিয়ত নিস্তেজ হইতে থাকিবে। শ্রীমতীর প্রতি তাহার আসক্তি নাই, কারণ যে-সূর্য্য আলোক এবং উত্তাপের দ্বারা মানুষের প্রাণসঞ্চার করে তাহার প্রতি আসক্তি থাকিতে পারে না; যে-নদী আপন মমতার প্রাচুর্য্যে লোকালয়কে কোলে করিয়া রাখে তাহার প্রতি আসক্তি অস্বাভাবিক; যে-লক্ষ্মী ধান্যে ও শস্যের দ্বারা মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে তাহার প্রতি কাহারও আসক্তি থাকিবার কথা নয়। শ্রীমতীর প্রতি আসক্তি জহর ভাবিতেও পারে না। চলিতে-

চলিতে সে একবার উপর দিকে তাকাইল। মনে হইল, পৃথিবীতে বসন্ত-ঋতু সবেমাত্র প্রবেশ করিয়াছে। শীতের জড়তা আকাশে আর নাই; আকাশ নীল হইয়া উঠিয়াছে। শহরে যাহারা বাস করে বসন্তকালের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। রাজপথের গাছগুলি অতি কষ্টে দেহ রক্ষা করিয়া চলে, তাহাদের নির্জীব জীবনের উপর দিয়া ঋতু-পরিবর্তন হয় না। ফিরিওয়ালারা পথে-ঘাটে ফুল বিক্রয় করিয়া শহরবাসীদের কাছে বসন্ত-ঋতুর আগমনের কথা জানাইয়া যায় মাত্র। এক শ্রেণীর শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারী আছে যাহারা বসন্তকালকে লইয়া বিলাস করিয়া বেড়ায়। আকাশ তাহাদের ব্যর্থ কল্পনার ক্ষেত্র, দক্ষিণ বাতাসকে লইয়া তাহারা হা-হুতাস করে, ফুলের গন্ধে তাহারা প্রিয়জনের বিরহ ও মিলন আস্বাদন করে। বাস্তব জীবনে যাহারা বিচিত্র ও অসম্ভব কামনা মিটাইতে পারে নাই তাহারাই সাধারণতঃ মনোবিলাসী। যাহাদের উচ্চ আশা পদে-পদে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, দিবাস্বপ্ন তাহাদের নিত্য সহচর। মানব-চরিত্র যাহাদের কোনদিন বোধগম্য হয় নাই, তাহারাই মানবচরিত্রকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া অনুভব করিতে থাকে। পৃথিবীতে যাহারা নিতান্তই অকর্ম্মণ্য বলিয়া গণ্য, বসন্তকালকে কেন্দ্র করিয়া তাহারাই চোখের জল ফেলিয়া চারিদিক ভাসাইয়া দেয়। প্রেম লইয়াও আজকাল এমনি সৌখিন কল্পনা বিলাস! প্রেম যে আনন্দের, দুঃখের নয়, তাহা এ যুগের লোক ভুলিয়া গেছে। প্রিয়জনের চিরবিচ্ছেদের মধ্যেও যে দুঃখবোধ করে না বরং নিত্য আনন্দে অবগাহন করে, বুঝিতে হইবে সে-ই প্রেমের অধিকারী। প্রেমের পরীক্ষা তাই বিচ্ছেদের মধ্যে, প্রেমের পরিচয় সুখস্মৃতিতে। তারেব যন্ত্র বাজাইলে যেমন সুরের ঝঙ্কাব উঠিতে থাকে, তেমনি প্রিয়জনের সুখস্মৃতির আঘাতে যে-হৃদয় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, বুঝিতে হইবে প্রেমের রসলোক সে সৃজন করিতে পারিয়াছে। প্রেম এত দুর্লভ বলিয়াই প্রেমের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ সংসারে এত বেশি চলে। শ্রীরাধা প্রেমের জন্য শত বৎসর ধরিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে অশ্রুর মধ্যে ছিল মান-অভিমান, দেহ-কামনা, মোহ, রূপতৃষ্ণা, মানসিক দ্বন্দ্ব; শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে পড়িয়া বৃহত্তর জীবন লাভ কবিয়াছিলেন, প্রেম তাঁহার চরিত্রকে কবিযাছে মহীয়ান্। তিনি ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, সাম্রাজ্যস্রষ্টা, ঐশ্বর্য্যশালী; তিনি ছিলেন ভোগী, ত্যাগী, যোদ্ধা, শান্তিকামী, আদর্শচরিত্র; সমস্তের মর্ম্মমূলে ছিল শ্রীরাধার প্রতি প্রেমের রসপ্রেরণা। পুরুষের প্রেম নারীকে কাঁদায়, নারীর প্রেম পুরুষকে উন্নত করে। যে পুরুষ জীবনে উন্নতি করিতে পারে নাই, তাহার জীবনে নারীর প্রেমের প্রেরণার অভাব। নারী তাহার আসক্তিকে তৃপ্ত করিয়াছে, হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে নাই। নারী পুরুষের জীবনে সর্ব্বক্ষেত্রে শক্তিসঞ্চার করে, তাই নারীর নাম শক্তি। সকল ঐশ্বর্য্য-আহরণের মূলে নারীর প্রেরণা। নারীর উৎসাহ লইয়া যাহারা যুদ্ধযাত্রা করে, তাহারা হয় যুদ্ধে প্রাণ দেয়, নয়ত যুদ্ধ জয় করিয়া আসে। যে-জাতির নারীশক্তি জাগ্রত হয় নাই, সে জাতির পুরুষগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সুদূরপরাহত। নারীর কার্য্যকলাপ জাতির স্বাস্থ্য ও শক্তির পরিচায়ক।

এমনি অসংলগ্ন তত্ত্বকথা লইয়া বিকাল গড়াইয়া গেল সন্ধ্যার দিকে। রাজপথে দেখিতে-দেখিতে একটি-একটি করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, কাল এমনি সময় শ্রীমতীকে লইয়া সে পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। শ্রীমতী আসিয়াছিল মরা নদীর জোয়ারের মতো। কাল তাহার মনের ঐশ্বর্য্য ছিল, অর্থের আনুকূল্য ছিল, উৎসাহের বেগ ছিল। শ্রীমতীর সঙ্গলাভ করিয়া একটা সুবিধা হইয়াছে, সে নূতন জামা-কাপড় এবং চক্‌চকে জুতা পাইল। কলিকাতা সহরে জুতা বেশিদিন টিকে না, ভাঙা খোয়া-ফেলা রাস্তায় চলিবার সময়, জহর ঠিক করিল, জুতা জোড়াটি হাতে করিয়া লইয়া যাইবে। এই জুতা তাহার পায়ে যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহার মনে থাকিবে শ্রীমতীর সুখস্মৃতি। একবার—বহুদিন পূর্ব্বে, নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া তাহার নূতন জুতা কে একজন পরিয়া চলিয়া গিয়াছিল। জুতা পরিতে-পরিতে পায়ে ফোস্কা পড়িতে থাকিলে সমগ্র জগতের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া, আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা যায়। সংসারে সকলের চেয়ে কঠিন কাজ আত্মহত্যা। দুঃখ সহিয়া সহিয়া বাঁচিবার যাহার সাধ নাই, আত্মহত্যা করিবার সময় নিজের প্রতি মমতা তাহার উদ্বেলিত হইয়া উঠে। জহর একবার দীর্ঘ একমাস ধরিয়া আত্মহত্যার সুযোগ খুঁজিয়াছিল।

চলিতে-চলিতে পথের একটা মোড় ঘুরিতে গিয়া পিছন হইতে কাহার ডাক শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। একটা লোক হন্-হন্ করিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া হেঁড়ে গলায় কহিল, 'কোথায় চলেছ বাবজীবন।'

লোকটা যেমন কুৎসিত তেমনি বিরাটাকৃতি। ঝাঁকুনি খাইয়া জহর সজাগ হইয়া দাঁড়াইল বটে কিন্তু হাতটা তাহার টন্-টন্ করিয়া উঠিল। ঈষৎ হাসিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল, 'দুলালচাঁদ যে, তুমি এদিকে?'

'আমি? আমি কোনদিকে নয়? শোন বলি, আজ আর আখড়ায় যেয়ো না বাবাজি—'

'সে কি, আজ একটু খেলবো না? অনেকদিন বাদে—'

'দুত্তোর আজ চাঁদ উঠেছে, আজ আবার জুয়া খেলা কি?' বলিয়া দুলালচাঁদ ঠেলিতে-ঠেলিতে কিছুদূর তাহাকে লইয়া গিয়া বলিল, 'কদ্দিন বাদে দেখা, চল আজ একটু মাসীর ওখানে ঘুরে আসি।'

'মাসীর ওখানে? না-না—'

'দুত্তোর।' বলিয়া দুলালচাঁদ আবার তাহাকে হিঁচ্ড়াইতে-হিঁচ্ড়াইতে লইয়া চলিল।

দুলালচাঁদের সহিত দেখা হইয়া যাইবার অর্থ যে কি তাহা বহুদিনের মতো আজও ঘণ্টা-দুই ধরিয়া জহর মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল। তবু ইহা তাহার পক্ষে নূতন নয়। মানুষের খেয়াল-খুসীর সঙ্গী হওয়া তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কত ধনী বন্ধুর পাশে থাকিয়া সে প্রতারণা দেখিয়াছে, অন্যায় দেখিয়াছে, পাপ ও দুর্নীতি দেখিয়াছে। দেখিয়াছে সে অনেক। অকারণ পীড়ন দেখিয়াছে, নিরপরাধের শাস্তি দেখিয়াছে, অহেতুক অপমান দেখিয়াছে, অযথা নির্য্যাতন দেখিয়াছে, কিন্তু কোনদিন কাহাকেও সে নিষেধ করে নাই। নিষেধ করা, উপদেশ দেওয়া, বাধার সৃষ্টি করা তাহার নীতিবিরুদ্ধ। দুলালচাঁদকেও সে আর বাধা দিতে পারিল না। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে পাশে রহিল।

মাতামাতি করিতে-করিতে দুলালচাঁদ প্রায় জ্ঞান হারাইল, জ্ঞান হারাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে আবার বসিল এবং বসিয়া হঠাৎ জহরের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, 'তোমাকে আজ একটু সিঁদুর কপালে ঠেকাতে হবে বাবাজি!'

জহর রাজি হইল না। দুলালচাঁদ অচেতন অবস্থায় অনেক অনুরোধ করিল, তারপর নানারূপ সাধ্য-সাধনা, অনুনয়-বিনয়, কিছুতে না পারিয়া শেষকালে গলা জড়াইয়া একসঙ্গে গোটা-তিনেক চুম্বনই করিয়া দিল। বলিল, 'লোকে এরপর যে তোমায় ভাল লোক বলে সন্দেহ করবে বাবাজি! তুমি ত এমন ছিলে না? মাইরি বলছি—আমি তোমাকে যতদূর জানি—তোমার দিব্যি ক'রে বলছি—'

জহর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আজ চললাম দুলাল।'

'না না, তা হ'লে আমি আর বাঁচবো না—অগাধ জলে পড়েছি, আমাকে ছেড়ো না বাবাজি!'

শেষকালে জহর তাহাকে ধরিয়া-ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিল। বলিল, 'বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি, কেমন?'

'বাড়ী? আমার বাড়ী আছে নাকি? আজ মারামারি হয়ে গেল ছোটভাইটার সঙ্গে—আমি আর ঢুকবো ও-শালাদের বাড়ী? আমিও শোধ নেব বলে রাখলাম—চার আনা পয়সা ধার চাইতে গেলাম—আমি আর কিছু বলি নি ভাই—'

জহর কহিল, 'বাড়ীতে ঝগড়া করেছ? মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?'

'মেরে? হে হে হে। এই দ্যাখ্।' বলিয়া দুলালচাঁদ ফস করিয়া গায়ের পিরাণটা ছিঁড়িয়া বুকের ছাতি বাহির করিয়া দেখাইল। তারপর বলিল, 'আমাকে মারবে? কেউ জম্মেছে নাকি? সেবার হোগলকুঁড়ের বারোয়ারী তলায় ছ'খানা লাঠি একদিকে আর আমি একদিকে—মেরে বেটাদের শুইয়ে দিলাম। আমাকে মারবে—হে হে হে!'

টলিয়া পড়িতেছিল বলিয়া জহর তাহাকে সামলাইয়া লইয়া চলিতে লাগিল। বলিল, 'তা

হ'লে কোথায় যাবে এই অন্ধকার রাতে?'

দুলাল কহিল, 'তুই কি বে' করেছিস?'

'কেন বল ত?'

'চল্ না তোর বাসায়? দিবি গাছতলায় একটু জায়গা—মাইরি বল্‌ছি, পড়বো আর মরে ঘুমোবো।'

'আমার ত বাসা নেই দুলাল।'

'বাসা নেই, খোঁয়াড় ত আছে!'

'তাও নেই।'

জড়াইয়া-জড়াইয়া দুলাল বলিল, 'তবে চল্ আমাকে থানায় জমা দিয়ে আসবি।'

থানার নামেই জহর ভয় পাইয়া গেল। এদেশের থানা-পুলিশের নাম শুনিলেই তাহার গা ঘিন্-ঘিন্ করিয়া ওঠে। থানা-পুলিশের সংস্পর্শে আসিলে, তাহার বিশ্বাস, ভদ্রসন্তানের আত্মসম্মান নষ্ট হয়। সে কহিল, 'চল তবে দেখি যদি কোথাও—'

কিন্তু কোথায় লইয়া গিয়া এই চিরপরিচিত দুঃশীল লোকটাকে শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। এমনি করিয়া বহু বন্ধুর দুরন্ত অতিথিপনা তাহাকে বহুদিন সহ্য করিতে হইয়াছে। আশ্রয় তাহার কোথাও নাই বলিয়াই হয় ত আশ্রয় পাইবার আশায় বন্ধুবান্ধব তাহার কাছে অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। সংসারে ইহাই বোধকরি একটি বিচিত্র নিয়ম। যাহারা দরিদ্র, বিধাতা তাহাদের হৃদয় দিয়াছেন কিন্তু সঙ্গতি দেন নাই। যাহারা উপবাস করিয়া শুকাইয়া মরে তাহাদের ঘরেই আসে উপবাসী অতিথি। যে-ধর্ম্মশালার মাথার চালা ফুটা হইয়া গিযাছে তাহারই ভিতব সমাগত হয় পথশ্রান্ত তীর্থযাত্রীর মেলা।

জহর নীরবে দুলালকে সামলাইয়া লইয়া চলিতেছিল। দুলাল চলিয়াছে চোখ বুজিয়া। বিগলিত স্নেহে ও বন্ধুত্বের আতিশয্যে একটা হাত দিয়া জহরের গলা জড়াইয়া ক্ষণে-ক্ষণে সে প্রলাপ বকিয়া উঠিতেছিল। সে কেবলই প্রমাণ করিতে চায়, বুকের ছাতি তাহার একচল্লিশ ইঞ্চির উপরে, ইচ্ছা করিলে পথের উপর এখনই জহরকে পিষিয়া মারিতে পারে।

অবশেষে আন্দাজ রাত্রি এগারোটা নাগাত জহর তাহাকে লইয়া কাঁসারিপাড়ার বাড়ীর কাছে আসিল। শ্রীমতী একমাসের দরুণ ভাড়া অগ্রিম দিয়া গেছে সুতরাং এখনও বহুদিন এখানে তাহারি থাকিবার অধিকার আছে। কাল এমনি সময়ে পথের ধারে এই দুইখানি ঘর শ্রীমতীর কলকণ্ঠে থাকিয়া-থাকিয়া মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ শ্মশানের মতো সমস্তই অনড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

রাস্তার দিকে জানালাগুলি বন্ধ। জহর একবার ভিতরের নিস্তব্ধ অন্ধকারে উঁকি মারিয়া চুপি-চুপি কহিল, 'গোলমাল ক'রো না হে, ভেতরে ভদ্রলোকেরা আছে, ঘরে ঢুকেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, বুঝলে?'

দুলাল জড়িতকণ্ঠে কহিল, 'এই তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি—'

গা ছুঁইতে গিয়া সে সেখানেই একবার জহরকে কোলে তুলিয়া আবার নামাইয়া দিল।

ভিতরে লইয়া গিয়া জহর নিজের ঘরের শিকল খুলিয়া তাহাকে ভিতরে ঢুকাইল। ঘর অন্ধকার। খুঁজিয়া-খুঁজিয়া দেশলাই বাহির করিয়া সে আলোটা আগে জ্বালিল। দুলাল ঘাড় গুঁজিয়া ততক্ষণে দেয়ালের একধারে বসিয়া পড়িয়াছে। জহর নিজের বিছানাটা তাড়াতাড়ি জড়াইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল। দুলাল বলিতে লাগিল, মাইরি, তোকে ধন্যবাদ। তা বলে বাবাজি, মনে করচ্ আমি শান্ত? আমি ভাল লোকের কাছে ভাল লোক, মন্দ লোকের কাছে।'

'আঃ কথা ব'লো না, চুপ কর।'

'চুপ করেই আছি, বুঝলে বাবাজি, চুপ ক'রে না থাকলে ফুঁ দিয়ে তোমাদের উড়িয়ে দিতাম। তোমরা কত অন্যায় করচ বল ত? কত অপমান করচ, মুখটি বুজে আমরা— তা বলে মেরো

না বাবা, মারের চোটে মরা মানুষ জাগে, বুঝলে, তার চেয়ে চিরকাল ধরে অপমান করো—অপমান আমাদের গায়ে লাগে না—'

জহর তাহার কথার শব্দে ভীত হইয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিল। তারপর বলিল, 'যদি কেউ টের পায় তা হ'লে কী কেলেঙ্কারী হবে তা তুমি ভাবচ না দুলাল?'

দুলালচাঁদ কাৎ হইয়া উঠিয়া বসিল। তারপর আবার শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'গেরুয়া কাপড় পরেছ নাকি বাবাজি, তুমি ত এত বাজে লোক ছিলে না! ভুলে যাচ্ছ কেন বাবা, সেবার বারুইপুরের গাঁয়ের পথে তোমার কীর্ত্তি—হে হে হে—' বলিয়া সে এমনই উচ্চকণ্ঠে হাসিল যে জহর তাঁহার মুখে হাত চাপা দিয়া থামাইতে বাধ্য হইল।

এক মিনিট শান্ত থাকিয়া দুলাল আবার বলিল, 'তোর এ সময় ভারি সুযোগ মিলেছে রে। মাতাল যখন নর্দ্দমায় পড়ে বাবাজি, রাস্তার লোক তখন কেমন সাধু সাজে দেখেছ?'

জহর এবার একটু হাসিল। কিন্তু হাসিয়াও সে রাগ করিয়া কহিল, 'দেখেছি দেখেছি, তুমি এখন থামো।'

ঠিক এমনি সময় বাহির হইতে বন্ধ দরজায় কে করাঘাত করিল। দুইজনে মুহূর্ত্তে নির্ব্বাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল। আলোটা এতই টিম-টিম্ করিয়া জ্বলিতেছিল যে কেহ কাহারও মুখ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইল না। তাহা হইলে দেখা যাইত, ভয়ে জহরের মুখখানা পাথরের মত শাদা ও অচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

আবার দরজায় শব্দ হইল। চুপি-চুপি দুলালচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, 'দরজা খুল্‌তে বল্‌চে নাকি?'

জহর ভীতকণ্ঠে কহিল, 'তোমাকে বললাম চেঁচামেচি ক'রো না, ভদ্রলোকের বাড়ী, কর্ত্তা টের পেয়েছেন!'

এবার দরজায় জোরে জোরে হাত চাপড়াইবার শব্দ হইল। জহর উঠিতে যাইতেছিল, দুলাল তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি।'

'না না, সর্ব্বনাশ, তুমি এ অবস্থায়—অপমান করবে কিন্তু।'

দুলাল হাসিয়া আর একবার তাহার বুকের ছাতিটা বিস্তৃত করিয়া দেখাইয়া উঠিয়া গেল। জহরের গা কাঁপিতেছিল। দুলাল গিয়া সটান দরজাটা খুলিয়া দিল।

কিন্তু দরজা খুলিয়া ঈষৎ আলোয় সে যাহা দেখিল তাহাতে সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে এক পরমাসুন্দরী রমণী? দেখিতে-দেখিতে তাহার চোখের নেশা ছুটিয়া গেল।

জহরও মুখ তুলিল, কিন্তু সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে আলোটা লইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল এবং আলোটা একটু বাড়াইয়া নারীটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হইল। হাঁ, স্বপ্নও নয়, মায়াও নয়, চোখের ভুল নয়!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ধীরে-ধীরে তাহার পড়িয়া গেল। দুলালের দিকে তাকাইয়া সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, 'তুমি যাওনি শ্রীমতী?'

'কি মনে হচ্ছে?' বলিয়া শ্রীমতী সোজা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আসিল, তারপর কহিল, 'গেলেই বোধ হয় ভাল হ'তো, না? এসে ও-ঘরে শুয়েছিলাম, শুনছিলাম তোমাদের রঙ্গরস।' বলিয়া সে আগুনের ফিন্‌কির মতো একটুখানি হাসিল।

জহরের গলা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। চীৎকার করিয়া সে একবার শ্রীমতীকে এ-ঘর হইতে চলিয়া যাইতে বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার আওয়াজ ফুটিল না। ওই কদাকার মদমত্ত লোকটার কুৎসিত দৃষ্টি হইতে শ্রীমতীকে সেই মুহূর্ত্তেই না সরাইতে পারিয়া অপমানে তাহার মাথা হেঁট হইয়া আসিল।

ভয়ানক রাগ চাপিয়া দুলালের কাছে গিয়া উত্তপ্ত কণ্ঠে শ্রীমতী কহিল, 'কে আপনি?'

'আমি?' বলিয়া দুলাল একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, 'আমি কেউ নয় ঠাকরুণ!'

'এখানে তবে কি দরকার?'

'কিছুই নয়—এই, বাবাজির সঙ্গে দেখা হ'লো, অনেক দিনের বন্ধু—'

'মিথ্যে কথা, উনি কারো বন্ধু নন্।'

'বেশ, নন্—আপনি যখন বল্‌চেন তখন—'

শ্রীমতী হাত বাড়াইয়া পথের দিকে ইঙ্গিত করিয়া কহিল, 'এক্ষুনি চলে যান্—যান্, আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

এরকম আদেশ দুলাল জীবনে এই প্রথম শুনিল। বুকের ছাতি হঠাৎ তাহার শীর্ণ হইয়া আসিল। মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইতে আর তাহার সাহস হইল না। দরজার বাহিরে গিয়া বলিল, 'বাবাজী, বলি ও বাবাজীবন?'

বাবাজীবনের হইয়া শ্রীমতীই অগ্রসর হইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'যা বল্‌তে হয় আমাকে বলুন।'

দুলালচাঁদ কিন্তু আর সে-কথা শুনিল না। ঘরের ভিতর তাকাইয়া মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল, 'বিয়ে করেছ তা হ'লে? ঘরে যে বাঘিনী পুষে রেখেছ সে কথা কই আগে আমাকে—?'

শ্রীমতী জোরে একটা ধমক দিয়া বলিল, 'চুপ বল্‌চি—যান, বেরিয়ে চলে যান্।'

পথে নামিয়া চলিয়া যাইবার আগে দুলালচাঁদ শুধু একটি দুর্ব্বল আস্ফালন করিয়া গেল, 'আচ্ছা দেখে নেবো এ অপমানের শোধ আমি একদিন—' বোধ করি চোখের জল চাপিতে-চাপিতেই সে চলিতে লাগিল।

সদর দরজা বন্ধ করিয়া শ্রীমতী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া জহর তখন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মিনিট দুই নীরব থাকিয়া শ্রীমতী নিজের মনে হাসিয়া কহিল, 'লোকটার গুণ আছে, মেয়ের সম্মান রাখতে জানে।'

খানিকক্ষণ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ঘরের মধ্যে সে অস্থির হইয়া পায়চারি করিল। তারপর অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর বিস্ময়কর ভাবে বদ্‌লাইয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, 'এসব কী তোমার?'

জহর মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইল। শ্রীমতী কহিল, 'এই তোমার পরিচয়? এরা তোমার বন্ধু?'

হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গ জহরের জ্বালা করিয়া উঠিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, ওরাই আমার বন্ধু। ওরা বন্ধু ব'লে আমার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।'

'তা হ'লে বুঝবো, তুমিও এই?'

জহর আবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'তুমি কি ভেবেছিলে আমি একটা ভয়ানক ধার্ম্মিক, যুধিষ্ঠির?'

শ্রীমতী তিক্তকণ্ঠে কহিল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি ভদ্র।'

'যাক্, এত রাতে আর ভদ্রতা শেখাতে এসো না।' জহর এবার ফাটিয়া উঠিল—'ভদ্র যেন তুমিই। তুমি কী? তুমি কোন্ জাতের?'

পাছে বাহিরের কেহ শুনিতে পায়, শ্রীমতী গিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, পরে আরো কাছে আসিয়া কহিল, 'তারপর? অপমানের ভাষা এর আগে তোমার মুখ থেকে শোনা হয় নি—তারপর?'

জহর কহিল, 'বলই না তোমারই বা কী পরিচয়। চলে ত গিয়েছিলে, ফিরলে কেন আবার? কি মতলব নিয়ে? আমি না হয় অভদ্র, ইতর, চরিত্রহীন—তুমি ত ভাল হতে পারতে?'

মৃদু হাসিয়া সমস্ত তিরস্কারগুলি উড়াইয়া দিতেই এক মুহূর্ত্তে জহর দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। শ্রীমতী পুনরায় কহিল, পিঠে আমার কুলো আর কানে তুলো। আচ্ছা, আমার ওপর তোমার একটা

বিজাতীয় বিতৃষ্ণা, সত্যি নয়?'

জহর ভিজিয়া একেবারে স্যাঁতসেঁতে হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তরে শুধু বলিল, 'সত্যিই ত।'

'বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে। কী সরল তোমার স্বভাব! কী সুন্দর! যা বল তা আবার স্বীকারও কর! তুমি যুধিষ্ঠির নও কে বলে? আমি ত শাদা চোখে দেখছি তোমার দেবচরিত্রে লেশমাত্র খুঁৎ নেই। তুমি প্রশান্ত, সচ্চরিত্র, তোমার ললাটে প্রতিভা, চোখে আলো—' শ্রীমতী হাসিয়া-হাসিয়া বলিল, 'তোমার সৌজন্য, দয়া, তোমার মহৎ হৃদয়, তোমার কন্দর্পের মতো অতুলনীয় রূপ, তোমার সুকোমল ব্যবহার—'

জহর অধীর হইয়া বলিল, 'চলে যাবো ঘর ছেড়ে, তাই চাও?'

শ্রীমতী তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষ আমি, না-হয় গায়ের চামড়াখানা আমার একটু চক্‌চকে, কিন্তু তুমি? তুমি উদার, আদর্শচরিত্র, সর্ব্বত্যাগী, সত্যাশ্রয়ী; হে দেবতা, বিছানা পাতা রয়েছে, তুমি নিদ্রা যাও, আমি সারা নিশি জেগে-জেগে তব পদসেবা করি! সামান্যা নারী আমি—হে অসামান্য, তোমার অনন্ত মহিমা—' বলিতে-বলিতে শ্রীমতীর দম্‌ ফুরাইয়া যাইতেই সে হাসিয়া চুপ করিল।

জহর বলিল, 'তোমার এই অসৎ আচরণ আমার মনে থাকবে।'

'অসৎ আচরণ?' বলিয়া শ্রীমতী একটু থামিল, তারপর দরজার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া নির্ভয়কণ্ঠে বলিল, 'এমন প্রাণখোলা প্রশংসা তুমি শুনেছ কোনোদিন? একে তুমি বলচ্‌ অসৎ আচরণ? ওই লোকটার সঙ্গে তুমি বুঝি এতক্ষণ খুব সৎ আচরণে ব্যস্ত ছিলে?'

কথা কহিতে জহরের আর প্রবৃত্তি হইতেছিল না, তবু কহিল, 'আমি কি তোমার কাছে প্রশংসা চেয়েছিলাম? তুমি শুদ্ধ ভাষায় মৌখিক প্রশংসা ক'রে আমাকে অপমান করেচ। আমি যা কোনদিনই নই তাই আমাকে বল্‌চ। আমি যদি তোমাকে এই সব বল্‌তে থাকি?'

'কি?' বলিয়া শ্রীমতী তাহার দিকে তাকাইল।

জহর বলিল, 'আমি যদি বলি, তুমি নারীজাতির শিরোমণি, বহ্নিশিখার মতো তোমার তেজ, উর্ব্বশীর মতো তুমি সুন্দরী, সাবিত্রীর মতো তুমি সতী, সীতার মত পবিত্র, তুমি দিক্‌বিজয়িনী, তুমি কল্যাণময়ী—তোমার এসব ভাল লাগবে?'

শ্রীমতী কহিল, 'চমৎকার লাগবে।'

'তা হ'লে বলবো তুমি যশের কাঙাল!'

হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, 'যশের কাঙাল যারা নয় তারা মরা মানুষ!'

ক্ষুব্ধকণ্ঠের একটা আওয়াজ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জহর এবার চুপ করিয়া গেল। মুখ ফিরাইলে দেখিতে পাইত একজনের মুখ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ইতিমধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কৌতুক করিয়া সে কহিল, 'যাক, ঘণ্টাখানেক ধরে, বেশ একখানা নাটকের অভিনয় হয়ে গেল।'

কণ্ঠের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া জহর কহিল, অভিনয় তোমার ভালই হয়েছে! নায়িকার চরিত্র-অভিনয়ে মিস্‌ মলিনাবালাকেও তুমি হারিয়ে দিয়েছ। কী তোমার নিখুঁত অঙ্গভঙ্গী, কি আবৃত্তি, দর্শকরা নির্ব্বাক, মন্ত্রমুগ্ধ—'

শ্রীমতী হাসিয়া বলিল, 'তুমি ত বলবেই, ফ্রি-পাশে থিয়েটার দেখতে এসেচ—তা ছাড়া অভিনেত্রীটির সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। দেখো, যেন সাপ্তাহিক কাগজে এ-প্রশংসা ছাপিয়ো না—জনসাধারণের চোখে ধুলো দেওয়া আজকাল বড় কঠিন।'

'নির্লজ্জ!' বলিয়া উঠিয়া জহর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া গেল বটে কিন্তু কোথাও সে গেল না। কয়েক মুহূর্ত্ত অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সে সোজা কলের দিকে চলিয়া গেল এবং মুখে-মাথায় খানিকটা জল দিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই শ্রীমতী কহিল, 'লজ্জা আমার অত্যন্ত অল্প, তুমি ঠিকই বলেছ,

কিন্তু এখনো যেটুকু আছে তাও বুঝি আর থাকে না। এবারের সমস্যাটা সমাধান করবে কি ক'রে?'

জহর বলিল, 'কেন?'

শ্রীমতী বলিল, 'আমাদের সম্বন্ধে একটা কথা বাড়ীর লোকেও জান্‌লো, বাইরের লোকও জেনে গেল। জানলাম না শুধু আমরাই। গোঁজামিল দিয়ে ক'দিন চল্‌বে?'

এবার জহর আর অস্পষ্ট কথা কহিল না। বলিল, 'দিন চলবার কথাই বা ভাবচ কেন শুনি? ছাড়াছাড়ি হলেই ত সব গোলমাল চুকে গেল। তুমি চলে গিয়েছিলে, আবার ফিরলে কেন?'

শ্রীমতী কহিল, 'এই নিয়ে তিন বার তুমি এই কথা শুনতে চাইলে। তোমার কি মনে হয়। কেন ফিরলাম?'

'কেন?' জহর একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, 'এ অবস্থায় সবাই যা ভাববে, আমাকেও তাই ভাবতে হবে!'

'সবাই কি ভাববে আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা পাকাপাকি করবার জন্যে ফিরেছি?'

'তাদের ধারণাটা আরো কিছুদূর অগ্রসর হতে পারে!'

'অর্থাৎ তোমার বন্ধুটি যা বলে গেল? বেশ, তা হ'লে এ অবস্থায় কি করবে ভাব্‌চ?'

'তুমি থাকো আমি যাই।'

'গেলেই কি এর প্রতিকার হবে? তখন হয় ত লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতেই হায়রাণ হতে হবে, তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে গেছ কি না। তখন কি তারা এ কথাটা বুঝবে আমার মতন মেয়েকে কেউ ত্যাগ করতে পারে না, আমিই বরং সবাইকে—' বলিয়া শ্রীমতী হাসিল।

তাহার এই অসঙ্কোচ বাহাদুরি দেখিয়া জহরের শরীর জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, 'সত্যি কথাটাই তারা বুঝবে!'

'তার মানে, তুমি অনায়াসেই আমায় ত্যাগ ক'রে যেতে পারো?'

'নিশ্চয়ই পারি।'

'পারো।' শ্রীমতীর গলার আওয়াজ হঠাৎ কোমল হইয়া আসিল—'কিন্তু অনায়াসে নয়! বিয়ের আগে রংপুরে একটি ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তার সঙ্গে প্রেমেও পড়ি নি, ছেড়েও এসেছিলাম, কিন্তু অনায়াসে নয়! বহুদিন পর্য্যন্ত মন ছুট্‌তো তার কাছে, নিতান্ত অকারণে। এমনিই হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের কোথায় যে বাঁধাবাঁধি তার খোঁজ কি কেউ জানে? ছোটবেলায় মনে আছে, পাড়ার একটি মেয়ে একদিন হাসতে-হাসতে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিল, আমি কিন্তু সেদিন কেঁদে ভাসিয়েছিলাম। অথচ মেয়েটার সঙ্গে আমার আলাপও ছিল না। এমনিই হয় বোধ হয়। রেলগাড়ী যখন যাত্রীর দল নিয়ে চলে যায়, আমার বুকের ভেতরটা তখন হু-হু ক'রে ওঠে। অনায়াসে কাউকেই ছাড়া যায় না, বুঝলে?'

জহর অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। জানালার বাহিরে মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকার থম্‌-থম্‌ করিতেছে। বড় রাস্তার কোথায় পথের একটা কুকুর থাকিয়া-থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। আশপাশের সাড়াশব্দ বহুক্ষণ হইতেই থামিয়া গেছে। মৃদুকণ্ঠে সে কহিল, 'তুমি আবার ফিরে এলে কেন?'

শ্রীমতী কহিল, 'কেন এলাম? জানি নে? বোধ হয় যে বাড়ীতে রাত্রিবাস করা যায়, তার ওপর একটা মায়া জন্মায়। সারাদিন ত ঘুরলাম পথে; কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। মনে-মনে কেবল একটা দুরাশা, মেয়ের মতো মেয়ে হয়ে বাঁচবো। যেদিকে চোখ ফেরাই, দেখি অবারিত মুক্তি, অবাধ অবকাশ, কিন্তু তার শেষ কোথায়? সুমুখে-পেছনে যেদিকেই ফিরলাম, লক্ষ্যহীন দিশেহারা পথ। সে-পথ যেমন নিষ্ঠুর তেমনি নিরাশ্রয়। বল ত মেয়েমানুষের মন তখন কিসের কথা ভাবে?'

'আমি কেমন ক'রে জান্‌বো বল?'

'হ্যাঁ, আমিও জানি নে। শুধু ভাবলাম, এ কেন? এর কি দরকার? স্বাধীন হলাম, উপার্জ্জন করলাম, অগাধ অর্থ হয় ত হাতে এল, আয়-ব্যয় করলাম অজস্র, অপরিমিত। তারপর দেশ জয়

করলাম, করলাম না-হয় সমাজ-সংস্কার, লোককে হিতশিক্ষা বিলিয়ে বেড়ালাম, কিন্তু তার কি দরকার ছিল? জীবনে উন্নতি করাটাই কি একমাত্র মানুষের লক্ষ্য?'

জহর বলিল, 'এবার তুমি অন্য কথায় যাচ্ছ। যা বল্‌চ তা হয় ত এই রাতের বেলা তোমার ভাবতেই ভাল লাগ্‌চে।'

'বোধহয় তাই হবে। ফিরে এলাম কেন, এ কথা দরজা পর্য্যন্ত এসে নিজেই আমি ভেবেচি। কেন ফিরলাম? অথচ জানতাম তুমিও আর কোনোদিন ফিরবে না। তবে কি ফিরেছিলাম তোমার খালি ঘরটা দেখবার জন্য? তুমি নেই, এই ভাবনাটাই কি আমাকে আবার টেনে আন্‌লো? অন্য কেউ হলে ভাবতো, আমি তোমার ভালবাসায় পড়েচি, তোমার মনও হয় ত এই কথা শুনে তোমার অজ্ঞাতে খুসি হয়ে উঠ্‌চে, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি এম্‌নিই। স্বামীকে ছেড়ে এসেচি, তার কথা মনে হলে ঘৃণায়-লজ্জায় আমার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, কোনদিন তার কাছে ফিরে যাবার দুর্বুদ্ধি আমার যেন না আসে; তবু ভাবি, তার জান্‌লায় গিয়ে একবার উঁকি মেরে তাকে দেখে এলে কেমন হয়! আমার মনের দৃষ্টি কতবার ছুটে গেচে তার কাছে, কিছুতেই ধরে রাখতে পারি নি। একে তোমরা কী বলবে? প্রেম? মোহ? না আর কিছু?'

'আর কিছুই নয়, এটা মেয়েমানুষের মন।'

'মেযেমানুষের নয়, মানুষের মন। মনের কাছে মানুষ হার মেনেচে। দুঃখের স্মৃতি আর সুখের স্মৃতি—মনের কাছে তাদের সমানই মাধুর্য্য।'

জহর এবার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'আসল কথা তুমি ফিরে এসেচ তোমার আর কোথাও আশ্রয় ছিল না বলে।'

উদাসীন হইয়া শ্রীমতী বলিল, 'বোধ হয় তাই হবে।'

বহুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। যে-কথাটা এইমাত্র শেষ হইয়া গেল তাহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার কাহারও প্রয়োজন ছিল না। সমস্ত আলোচনার শেষ হয় ত এমনি করিয়াই হয়। যেখানে তাহার মৌখিক পরিসমাপ্তি, সেইখানেই তাহার সত্যকারের আরম্ভ।

অনেকক্ষণ পরে জহর ডাকিল, 'শ্রীমতী?'

শ্রীমতী হাসিল, হাসিয়া বলিল, 'আমার নামটা তোমার মুখে বেশ সুস্বাদু লাগে, নয়?'

'হতেও পাবে!' হঠাৎ জহর বলিয়া ফেলিল, 'ভাল লাগে বলেই হয় ত লোকের বাড়ীর দেয়ালে-দেয়ালে তোমার নাম লিখে বেড়াই। এমনো হতে পারে শ্রীমতী, আমার অভাবকে আমার চোখে ধরিয়ে দেবার জন্যই তুমি এসেচ।'

শ্রীমতী করুণ হাসিয়া কহিল, 'সেই জন্যেই বলছিলাম অনায়াসে কাউকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।'

জহর একবার থামিয়া কহিল, 'আচ্ছা শ্রীমতী?'

শ্রীমতী মুখ তুলিল। জহর বলিল, তুমি অম্‌নি করে আমার বন্ধুটিকে তাড়িয়ে দিলে কেন বল ত?'

'তার জন্য কি তোমার মন খারাপ হচ্ছে?'

'ভাবছিলাম এত সহজেই তুমি তাকে অপমান করতে পাবলে? সে ত তোমার কাছে কোনো অন্যায় করে নি।'

শ্রীমতী কহিল, 'ভদ্রলোকের বাড়ীতে মাত্‌লামি করাটাই কি ভাল হ'তো, তুমি বল্‌তে চাও?'

জহর বলিল, 'দরজাটা বন্ধ ছিল, রাতটা সে এখানে কাটিয়েই যেতে পারতো। বন্ধুর আশ্রয় পেয়ে আনন্দে সে একটু-আধটু প্রলাপ বক্‌ছিল মাত্র।'

শ্রীমতী কহিল, 'সেই জন্যেই তাড়ালাম। এক-এক জন থাকে, আরাম তাদের সহ্য হয় না। নিজের হাতেই তারা নিজের দুঃখের সৃষ্টি করে। সে-দুঃখে তারা কাঁদে, নিজেকে অভিশাপ দেয়,

সংসারকে দুঃখের রঙে রাঙিয়ে হা-হুতাশ করে—ওপরে বিধাতা বসে হাসেন। তাদের ওপর আমার দয়া-মায়া নেই। যারা মাতাল হয়ে ঘরে ঢুকে নরম বিছানা চায়, তাদের অপমান ক'রে তাড়ানোই উচিত।'

'তুমি তা হ'লে তার জন্য দুঃখিত নও?'

'এতটুকু না। অপমান ক'রে তাড়ালেই তবে এ সব লোকের একদিন চোখ ফুটতে পারে।'

'সে ত কারো অসম্মান করে নি?'

অসম্মান করেচে সে নিজেকে। নেশা ক'রে সত্যি মাতাল যে হতে পারলো না, আরামের লোভ যার মনে সচেতন হয়ে রইলো, তার ত আত্মসম্মান বলে কোনো পদার্থ-ই নেই! যে-লোক সত্যিকারের মাতাল, সে সন্ন্যাসী। সে নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত।'

'কিন্তু আমি ভুলতে পারবো না শ্রীমতী, আজ সারারাত সে পথে পথে বেড়াবে। তার আত্মসম্মান জ্ঞান না থাকতে পারে, কিন্তু তার আশ্রয় যে নাই! যে সর্ব্বস্বান্ত তাকে লক্ষ্মীছাড়া বলে গাল দিতে পারো, কিন্তু তাকে উপবাসে রাখলে চল্‌বে কেন। মানুষের ওপর এই কি মানুষের বিচার?'

শ্রীমতী ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, 'যারা নেশা ক'রে বেড়ায় তাদের ওপর তোমাদের এমন অকারণ মমতা কেন? একি আজকালকার ফ্যাসান্ নাকি?'

'যারা নেশা করে তারা জীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে—'

'থামো, বড়-বড় কথা বলে নেশার বিজ্ঞাপন ক'রো না। নেশা ক'রে যারা জীবনের ব্যর্থতা ঢাকতে চায় তারা নিতান্তই অকর্ম্মণ্য। জীবন কখনো কারো ব্যর্থ হতে পারে না। যাদের হয় তারা স্থবির পঙ্গু।'

জহর চুপ করিয়া রহিল। বোধকরি নিজের মনের সঙ্গে সে কথাটাকে মিলাইতে পারিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, কহিল, 'আচ্ছা, তুমি যখন আমাকে এই নোংরামির মধ্যে দেখলে তোমার কি মনে হ'লো?'

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীমতী নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে তাকাইল। এমনি করিয়া বহুবার দুইজনে চোখাচোখি হইয়াছে। শ্রীমতীর চোখের দীপ্তি এমনি সহজ এবং প্রখর যে, সে-দৃষ্টির সুমুখে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারা যায় না। যায় না বলিয়াই জহর বহুবার মাথা হেঁট করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এবার সে সঙ্কোচ বোধ করিল না। বলিল, 'মানে, তুমি যা আমায় জেনে রেখেছিলে তা হয় ত আমি নই, আমার একটা দিক তোমার চোখে আজ স্পষ্ট উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল!'

শ্রীমতী হাত দিয়া বিছানাটা ঝাড়িতে-ঝাড়িতে বলিল, 'কি রকম?'

জহর বলিল, 'তোমার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেচ। ধর, তুমি হয় ত শ্রদ্ধাসহকারে একটা প্রাসাদ মনে-মনে গড়ে তুলেছিলে, কিন্তু সামান্য ভূমিকম্প সইতে না পেরে সেটা যখন চুরমার হয়ে ভেঙে পড়লো, তুমি দেখলে সে প্রাসাদের নিচে ছিল চোরাবালির স্তূপ!'

শ্রীমতী মনে-মনে চিত্রটি কল্পনা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

জহর বলিল, 'তোমার কি এখন মনে হচ্ছে শ্রীমতী, আমি আজ তোমার কাছে ধরা পড়ে গেছি?'

শ্রীমতী কহিল, 'আমার কি মনে হচে সে কথা শুনে তোমার লাভ কি? মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি চলচে বলেই আজ মানুষের এত অশান্তি!'

'তবু ত এই সাধারণ কথাটাও তোমার মনে হতে পারে, আমি ইতর, অসচ্চরিত্র, নোংরা—'

'যদি তাই মনে হয় কি করবে?'

'কিছুই করবার নেই। শুধু ভাব্‌বো অতি সহজেই তুমি আমার পরিচয় পেয়ে গেলে!'

শ্রীমতী কাৎ হইয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'মেয়েদের কাছে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা এখনকার ছেলেদের একটা বদ্ অভ্যাস। তুমি কি নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে?'

'শ্রদ্ধেয় আমার মধ্যে কিছু নেই শ্রীমতী!'

'সে বিচার আমার, তোমার নয়। আমার সব চেয়ে হাসি পায় তখন, মানুষ যখন নিজের চরিত্র-পরিচয় নিজের মুখে দেবার চেষ্টা করে।'

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল। পরম নিশ্চিন্ত মনে গা এলাইয়া শ্রীমতীকে শুইয়া পড়িতে দেখিয়া বলিল, 'ওঠো, ও-বিছানাটায় তুমি শুয়ো না!'

'কেন? দোষ কি?'

কি একটা কথা স্মরণ করিয়া বলিল, 'না শোয়াই ভাল। নিজের ঘরে গিয়ে তুমি শোও না?'

শ্রীমতী হাসিয়া বলিল, 'কোনটা আমার ঘর আর কোন্‌টা তোমার, ভুলেই গেচি।'

জহর বলিল, 'কিছু খেলে না?'

খাওয়ার কথা শুনিলেই শ্রীমতীর রাগ হয়। বলিল, 'মেঠাই-মণ্ডা তোমার ঘরে যেন থৈ-থৈ করছে। যদি ক্ষিদে পেয়েচে বলি তুমি এখন খাবার এনে খাওয়াতে পারবে?'

'তা ধর সুন্দরী মেয়ের ফরমাস—সুন্দরী মেয়ের অনুরোধে কত লোকে কত দুঃসাহসিক কাজ—'

শ্রীমতী অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, 'তোমার কাছে থাকার এটা সুবিধে এই যে, আমি নিরাপদ।'

'তার মানে?'

'মানে, বিপদ আপদের ভয় বিশেষ নেই!'

ক্ষুব্ধকণ্ঠে জহর বলিল, 'তুমি এমন জায়গায় ঘা দাও যেখানে যে-কোনো পুরুষ আঘাত পায়! ভয় নেই কেমন ক'রে জান্‌লে?'

চোখ বুজিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, 'ও আমরা জান্‌তে পারি, অনুভব করতে পারি। তুমি পুরুষ, কিন্তু বর্ব্বর পুরুষ নয়।'

'তোমরা অনুভব করতে পারো পুরুষের চরিত্র?'

'অনুভব করতে পারি শুধু চরিত্রটা নয়, গোটা পুরুষটাকে। চোখ বুলিয়ে পুরুষকে চেনা মেয়েদের প্রকৃতি।'

জহর আর কথা কহিল না। শ্রীমতী ও-পাশ ফিরিয়া কথা কহিতেছিল, এ-পাশে তাহার মাথার বড় খোঁপাটা বালিশের উপরে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তাহার চুলের বিচিত্র গন্ধকে হঠাৎ ফুলের গন্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। সুন্দরী নারী অসম্বৃত কেশপাশের সুখসৌরভ কেমন করিয়া রাত্রির অন্ধকারে একটি মায়াজাল বিস্তার করিতে থাকে তাহাই ভাবিতে-ভাবিতে হঠাৎ জহরের মনে পড়িয়া গেল, একবার বহুকাল আগে কোথাকার একটা ধর্ম্মশালায় এক মাড়োয়ারী তীর্থযাত্রীর দলে সে ভিড়িয়া গিয়াছিল। দুইটী যুবতী ছিল সেই দলে। ধর্ম্মশালায় একটিমাত্র ঘর। ঘরটা বড়। কিন্তু গভীর রাত্রে শুইয়া-শুইয়া জহর সেই মেয়ে দুইটির চুলের গন্ধে কেমন একটি অপরিচিত সূক্ষ্ম সহানুভূতির স্পর্শ পাইয়াছিল তাহা চিরদিন তাহার স্মরণে থাকিবে। স্মরণে থাকিবে তাহার কারণ, মানুষের বোধ করি এমনিই হয়। এ রহস্য সম্ভবতঃ আজিও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, কোন একটি বিশেষ গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও ইঙ্গিত মানুষের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া নিরুদ্দেশ করিয়া দেয়। মানব-মনের এ চিরন্তন রহস্য।

শ্রীমতীর চুলের মৃদু-মধুর গন্ধকে অনুসরণ করিয়া জহরের কল্পনা এই নিরন্ধ্র রাত্রির অন্ধকারের জাল উত্তীর্ণ হইয়া কোথায় যেন দিশাহারা হইয়া ছুটিতে লাগিল। ঘুমাইয়া পড়িয়াও তাহার কল্পনার সে-গতি থামিল না।

একটা অস্ফুট আলোচনার শব্দে তাহাদের দুজনেরই ঘুম ভাঙিয়া গেল। জহর আগেই জাগিয়া-উঠিয়া বসিল। চোখ রগ্‌ড়াইয়া বলিল, 'কিসের গোলমাল?'

শ্রীমতী বিরক্ত হইয়া এ-পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিয়াই কহিল, 'বোধ হয় আমাদের চরিত্র নিয়ে আলোচনা চল্‌চে। বলিয়া সে আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, উঠিল না।

জহর কান পাতিয়া খানিকক্ষণ বাহিরের কথাবার্ত্তা শুনিল, তারপর বলিল, 'এইবার ওঠো।' বলিয়া সে নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে তখন বেলা বাড়িয়া গিয়াছে।

কাপড় গুছাইয়া মাথার চুলের রাশি ফিরাইয়া শ্রীমতী এইবার উঠিয়া বসিল। বলিল, 'চা তৈরী করি, আগে খেয়ে নাও, নৈলে কথাবার্ত্তা শুনে হয় ত তোমার মেজাজ গরম হয়ে যাবে। এখন ত আর বাড়ীভাড়া পাওনা নেই যে, মারলেও কথা কইবে না।'

জহর হাসিয়া বলিল, 'তা সত্যি। তবে মেজাজ আর আমার গরম হয় না, আমি ভুলে গেচি।'

ষ্টোভ জ্বালিয়া আগে চা তৈরী হইতে লাগিল। যথাসময়ে চা পান করিয়া জহর দরজা খুলিল। বাড়ীর যিনি বড় ছেলে, তিনি সদর দরজায় দাঁড়াইয়া একটি লোকের সহিত কথা বলিতেছিলেন। জহরকে দেখিয়া বলিলেন, 'নমস্কার।'

তিনি কহিলেন, 'আপনাকে দেখতেই পাই না যে একটু আলাপ-সালাপ করবো। কাজ-কর্ম্মে খুব ব্যস্ত থাকেন বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এইটে আমাদের মরশুমের সময় কি না। ধান পাট বিক্রী হয়ে গেছে, টাকা কড়ি আদায় করবার সময়—'

লোকটি বলিল, 'কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত আপনাদের এখানে কি গোলমাল হচ্ছিল বলুন ত?'

'কালকে? ওঃ মনে পড়েছে, আমাদের একটি প্রজা এসে—টাকাকড়ি নিয়ে গোলমাল কিনা—'

এমন সময় একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, 'প্রজা কিন্তু জমীদারকে সমীহ করে না দেখলাম। যে ভাষায় তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করে গেলেন বাবা, সে আলাপ একটি বোতলে হয় না। কি ব্যাপার বল ত?'

জহর একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'কি বলচেন আপনি?'

'বলছি যে—' বলিয়া ভদ্রলোকটি একটু হাসিলেন, তারপর কহিলেন, 'এটা গেরস্থ বাড়ী কিনা, মেয়েছেলেরা রয়েছেন, মাতলামি করার এখানে একটু অসুবিধা আছে। তুমিই বল না বাবা—'

'আপনার কি ধারণা কাল রাতে আপনার বাড়ীতে মাতলামী হয়ে গেছে?'

'ধারণা ত নয় বাবা, সত্যি ঘটনা। সুতরাং এমন ঘটনা আর না ঘটে তার ব্যবস্থা তোমরা আজই একটা কর বাবা।'

'অর্থাৎ?'

বড় ছেলেটি কহিল, 'অর্থাৎ ঘর দু'খানা যদি খালি হয় তা হ'লে আমরা অন্য ভাড়াটে বসাতে পারি।'

শ্রীমতী আর ভিতরে থাকিতে পারিল না, মাথার ঘোমটা তুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, 'বেশি দূর বোধ হয় আপনাদের পড়াশুনো নেই, তা হ'লে বুঝতেন আইনের চোখে আপনাদের এই অভদ্র দাবি একটুও টেকে না। আপনারা কি বল্‌তে চান্‌ আমাকে বলুন।'

পিতা আর একটু উষ্ণ হইয়া কহিলেন, কথাবার্ত্তা হচ্ছে পুরুষের মধ্যে, তুমি মা ঘরে যাও।'

অধিকতর উষ্ণ হইয়া শ্রীমতী কহিল, 'আমি আপনার মা-ও নই, আমাকে তুমি বল ডাকবার অধিকারো আপনাকে দিই নি, একটু ভেবে-চিন্তে কথা বলবেন।' বলিয়া সে একটু থামিয়া পুনরায়

কহিল, 'আপনাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবার রুচি আমার হ'তো না কিন্তু মাতলামি করা হয়েছে এই কথা বলে কত বড় অসম্মান যে আপনারা আমাকে করলেন, সে কথা বোঝবার মতো সামান্য শিক্ষাও আপনাদের নেই। আপনারা আবার গিয়ে পাঠশালায় ভর্ত্তি হোন্।'

পুত্র কহিল, 'মুখ সামলে কথা বলবেন। মেয়েমানুষ বলে আপনাকে—'

শ্রীমতী হাসিল, কহিল, 'আবার ভুল হ'লো। মেয়েমানুষের ভদ্রভাষা হচ্ছে মহিলা, এটা মুখস্থ করে রাখুন।'

পুত্রটি আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল, পিতা তাহার পিঠ ঠুকিয়া পথে নামাইয়া দিলেন। ছোক্‌রা পথের উপর গোঁজ-গোঁজ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শ্রীমতী জহরের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'এ-বাড়ির মালিককে বলে দাও যে আমবা তাঁদের ইচ্ছায় আজ উঠে যেতে রাজি নই, কাল এক মাসের ভাড়া আমরা আগাম দিয়ে এ-বাড়ীতে এসেছি।'

'ভাড়া যে দিয়েছেন তার প্রমাণ নেই।'

'নেই? ও, হ্যাঁ রসিদখানা আমরা ভদ্রতা ক'রে নিই নি বটে। তবুও এটা আমরা জানিয়েই দিচ্ছি, আপাতত আমরা উঠতে রাজি নই।'

কর্ত্তা কহিলেন, 'তিন দিনের ভাড়া কেটে নিয়ে বাকিটা ফেরৎ দিলেও না?'

জহর বেয়াকুবের মত দাঁড়াইয়া ইহাদের দিকে তাকাইয়াছিল শ্রীমতী তাহার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া হাসি চাপিয়া কহিল, 'তা হ'লেও না। আমরা নিজের সুবিধে মতন উঠে যাবো কারো কথায় নয়। যদি দবকার হয় আপনারা পুলিশে খবর দিতে পারেন।'

বাহির হইতে পুত্রটি এইবার গর্জ্জন করিয়া কহিল, 'পুলিশ নয়, গায়ের জোরে আমরা তুলে দেবো।'

জহর ফিরিয়া দাঁড়াইতেছিল, শ্রীমতী তাহাকে টানিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিল, তারপর হাসিতে-হাসিতে কহিল, 'বেশ ত, তাতেও আপত্তি নেই, তবে আমরা দু'জন একত্র হ'লে আপনাদের একটু অসুবিধে হবে, আপনাদের যে রকম চেহারা তাতে মনে হচ্ছে আমি একলাই আপনাদের সামলাতে পারবো।' বলিয়া সে এক লীলায়িত ভঙ্গীতে আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

ভিতরে জহর পায়চারি করিতেছিল, শ্রীমতী একবার তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিল। যে কোন নারীই জহরকে দেখিযা খুসী হইবে। শুধু তাহার ভস্মাচ্ছাদিত রূপ দেখিয়া নয়, তাহার বলিষ্ঠ বাহু, সুবিস্তৃত বক্ষপট, সুন্দর মাংসপেশী—দেহের কোথাও তাহার বিন্দুমাত্র ফাঁকি নাই। সে কহিল, 'এক্‌টা কেলেঙ্কারী না ঘটে। তোমাকে আমার ভয় করে বাপু।'

জহর কহিল, 'ভয় নেই, দু-চার ঘা মার খাওয়া পর্য্যন্ত আমি চুপ করেই থাকবো।'

'তারপর?'

'তারপর বলতে পারি নে। তারপর হয় ত গুহা থেকে বাঘ বেরিয়েও পড়তে পারে। মেয়েদের অসম্ভ্রম আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু তোমার অসম্মান আমার সহ্য হবে না শ্রীমতী।'

সেদিন আর রান্নাবান্না চড়িল না, দুইজনে স্নান করিয়া ঘরে তালাচাবি দিয়া এক সময় বাহির হইয়া পড়িল।

৪

পথে বাহির হইয়া তাহারা দুই ঘণ্টা ধরিয়া লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কলিকাতা নগরীর সুপ্রশস্ত রাজপথ-গুলিতে তখন এক প্রকার বিচিত্র কলরব ও আন্দোলন উঠিয়াছে। অসংখ্য মানুষ, অগণন গাড়ি-ঘোড়া, মোটর, ট্রাম, বাস্—কোথাও চীৎকার, কোথাও সোরগোল, ভিড়,

মারামারি, বক্তৃতা, তামাসা, শোভাযাত্রা সমস্তটা মিলিয়া-মিশিয়া তালগোল পাকাইয়া এক অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি হইতেছে। ইহাদেরই ভিতর শ্রীমতীকে লইয়া এতক্ষণ ধরিয়া জহর ঘুরপাক খাইল। ট্রামে উঠিল, বাসে চড়িল, তারপর হাঁটিল, হাঁটিতে হাঁটিতে ট্যাক্সি করিল এবং ট্যাক্সি হইতে এক হোটেলের দরজায় আসিয়া নামিল।

ভাত-তরকারীর হোটেল। সুন্দরী যুবতী সঙ্গে আসিয়াছে দেখিয়া হোটেলওয়ালা তাহাদের আলাদা ঘরে জায়গা কবিয়া দিল। সেখানে গিয়া দুইজনে দুইখানি আসনে বসিলে থালায় করিয়া ভাত এবং আনুষঙ্গিক তরকারি প্রভৃতি আসিল।

পেট ভরিয়া পরম তৃপ্তিতে দুইজনে আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া দেখিল, ব্যয় আহারের অনুপাতে সামান্যই হইয়াছে। যাহা হউক, হিসাব চুকাইয়া বাহিরে আসিয়া জহর বলিল, 'এবারে কি করা যায় বল ত?'

শ্রীমতী কহিল, 'ভাতেব একটা নেশা আছে, এবার ঘুম পাবে।'

জহর কহিল, 'চল তবে গঙ্গায় গিয়ে ষ্টিমারে চড়ি গে। তার নিচের তলায় গিয়ে ঘুমানো যাবে।'

'ঘণ্টা তিনেক ত পারাপার করা চলবে, তারপর নামবার সময় টিকিট দিলেই হবে।'

শ্রীমতী বলিল, 'তার চেয়ে চল ট্রেণে ক'রে কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক্। ট্রেণের দোলায় ঘুমোতে আমার ভারি ভাল লাগে।' বলিয়া সে একখানা গাড়ী ডাকিতে গেল, জহর বাধা দিল। বলিল, 'চল হেঁটে যাই।'

হাঁটিতে-হাঁটিতে তাহারা হাওড়ার পথের দিকে চলিল। পথ ঘুরিয়া কিছুদূব যাইতে যাইতে পিছনে কাহাব ডাক শুনিযা দুইজনেই একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। একটি যুবক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া একেবারে শ্রীমতীর হাত ধরিয়া বলিল, 'দিদি, আপনি এদিকে?'

শ্রীমতী আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিল, 'বিমল যে, ভাল ত?'

বিমল বলিল, বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, দেখি আপনারা চলেছেন, ওই দেখুন আপনার ছোট বোন এখনো দাঁড়িয়ে। চলুন, বাসায় চলুন।'

শ্রীমতী কহিল, 'এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই বিমল, ইনি হচ্ছেন প্রফেসর, যে-কলেজে আমি পড়তাম সেই কলেজের। আর ইনি হচ্ছেন আমার ছোট ভগ্নিপতি, বুঝলেন, মাষ্টারমশাই?'

জহরের সহিত নমস্কার বিনিময় করিয়া বিমল তাহার হাত ছুঁইয়া কহিল, 'আসুন মাষ্টারমশাই।'

অবস্থা বিমলদের যথেষ্ট ভাল, ঐশ্বর্য্যের প্রচুর চিহ্ন তাহাদের বড় বাড়ীখানার সর্ব্বত্র বিদ্যমান। নিচে চাকর বামুন বসিয়া জটলা করিতেছিল, তাহাদের দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের বৈঠকখানায় জনকয়েক ছেলে-ছোকরা ইলেকট্রিকের পাখার তলায় বসিয়া তাস-পাশা খেলিতেছে। সিঁড়ির কাছে আসিয়া শ্রীমতীর ছোট বোন রমা হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল। দিদির হাত ধরিয়া সে উপরে লইয়া গেল। বিমল কহিল, 'মাষ্টারমশাই, আপনিও আসুন ওপরে।'

উপরে উঠিয়া একখানা ঘরে লইয়া গিয়া বিমল কহিল, 'বসুন এই ইজিচেয়ারটায়, বিশ্রাম করুন। এটা আমার লাইব্রেরী, যদি কোনো বই পড়তে ইচ্ছা হয়—দাঁড়ান্ আমি আসচি।'

একটু পরে রমাকে লইয়া সে আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল। নমস্কার করিয়া রমা কহিল, 'দিদি আপনার কাছে পড়েচেন, আমার কিন্তু সে ভাগ্য হয় নি।'

জহর কহিল, 'কোন্ কলেজে আপনি পড়তেন?'

রমা বিমলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল,'কলেজেও নয় ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত, তাও পাশ করি নি; এমন সময়—' বলিয়া সে লজ্জায় চুপ করিয়া গেল।

জহর কহিল, 'এমন সময় বুঝি একদিন শাঁখ বেজে উঠ্‌লো?'

হাসিতে-হাসিতে চলিয়া যাইবার সময় রমা বলিল, 'আপনার জন্যে চা ক'রে আনি।'

বিমল তাহার সহিত গল্প করিতে বসিয়া গেল।

শুইবার ঘরে ঢুকিয়া রমা দরজাটা একটু ভেজাইয়া দিল। শ্রীমতী তখন তাহার পুত্রটিকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে। রমা কহিল, 'একটা ছেলে কি মেয়েও ত তোমার হ'লো না যে শান্ত হয়ে এক জায়গায় থাকবে। হ্যাঁ, তারপর?'

'তারপর আর কি।' শ্রীমতী বলিয়া চলিল, 'ঝগড়া বাধ্‌লো। পুরুষ যখন কাপুরুষ হয়ে ওঠে তখন আমি সইতে পারি নে রমা।'

রমা কহিল, 'বাধ্‌লো রমণীবাবুর সঙ্গে?'

'না বেধে উপায় ছিল না। বিষয় গেল, টাকাকড়ি গেল, গয়না গেল, এমন কি ঘরের জিনিসপত্র পর্য্যন্ত—তাও সয়, মদ খেয়ে বাইরের মেয়েমানুষ এনে মাত্‌লামি তাও নাহয় ক্ষমা করা যায়; কিন্তু যেদিন শুনলাম আশেপাশের বাড়ীর বৌ-ঝিরা পর্য্যন্ত উত্যক্ত হয়ে উঠ্‌লো, তারা কল্‌তলায় যেতে পায় না, ছাতে উঠ্‌তে পায় না—সেদিন আমার এল বিজাতীয় ঘৃণা, সেদিন আর সহ্য হ'লো না রমা, ঝিয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লাম। উঃ সমস্ত পৃথিবী তখন আমার চোখে অন্ধকার!'

'বাবার ওখানে গিয়ে উঠলে না কেন? তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তিই ত তোমার। তিনি ত আর তোমাকে—'

শ্রীমতী কহিল, 'বাবার ওখানেই যাবার কথা, তা জানি, কিন্তু কেমন করে যাই বল ত? কি কৈফিয়ৎ দেবো তাঁকে গিয়ে? স্বামীর চরিত্র নিয়ে বাবার কাছে আলোচনা করবো তার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা ভাল।' বলিতে-বলিতে তাহার গলা ধরিয়া আসিল।

রমা বলিল, 'একে তুমি চিরদিন অশান্ত, তার ওপর এই হ'লো। ওখান থেকে বেরিয়ে তুমি আমার কাছে এলে না কেন?'

'কেন আসি নি সে কথা আমার মন নিয়ে না বুঝলে বোঝানো যাবে না ভাই। মানুষ যখন সকলের চেয়ে বড় আশ্রয় ত্যাগ করে, সে হয় মরিয়া।'

রমা কহিল, 'আমার কাছে খবর যখন এল, আমি একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। কোথায় খবর নিই, কাকে জিজ্ঞাসা করি—ঘরের মধ্যে বসে ছটফট করতে লাগলাম। এ-ক'দিন তুমি কোথায় ছিলে দিদি?'

'প্রথমে ঝিয়ের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম, দেখি তার মতলবো ভাল নয়, সে এক ভয়ানক বিপদ রমা, এমন দিনে দেখা হ'লো মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে; উনি আমার বিপদের বন্ধু, দুঃখের বন্ধু!'

'এবার বাবার কাছে যাবে ত?'

'যাবো কিন্তু থাকবো না।'

'থাক্‌বে না? তবে—'

শ্রীমতী একটু হাসিয়া বলিল, 'কোথাও থাকবো না ভাই, থাকবো নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে। যে-মেয়ে আমার মতন অবস্থায় পড়ে, যার বাপের বিষয়-সম্পত্তি, নেই, সে কেমন ক'রে দাঁড়ায় আমি তাই দেখাবো।'

'কিন্তু তোমার আশাই ত বাবা করেন দিদি। একে মা নেই।'

'তা আমি জানি রমা। তারপর, তুই কেমন আছিস্ বল্? ছেলের কি নাম রাখলি?'

'নাম এখনো রাখা হয় নি। পঞ্চানন কি ভজহরি যা হোক একটা রাখ্‌তে হবে।'

দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। রমা কহিল, 'কিন্তু একটা জিনিস দেখলাম দিদি, কোন অবস্থাই কোনদিন তোমাকে কাবু করতে পারলো না। কাবু হ'ত যদি কোলে একটা ছেলেপুলে থাক্‌তো।'

'হাঁ তা হ'লে কাবু হতাম।' বলিয়া কোলের ঘুমন্ত সুন্দর ছেলেটির মুখে হেঁট হইয়া শ্রীমতী একটি পরিপূর্ণ চুম্বন বসাইয়া দিল। তারপর মুখ তুলিয়া পুনরায় কহিল, 'দিবি, তোর ছেলেটাকে

আমার কাছে?'

রমা বলিল, 'দিতেই আমার ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে তোমার মতনই আমার ছেলে বেপরোয়া, জালছেঁড়া, পোলোভাঙা হোক। দুরন্ত ছেলে আমার খুব ভালো লাগে।' বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া চায়ের জল চড়াইতে বসিল।

চা হইয়া গেলে সে ডাকিল, 'কানাই?'

কানাই সাড়া দিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমা কহিল, 'লাইব্রেরী ঘরে সাড়াশব্দ শুন্ছি, দেখে আয় ত বাবা, ক' পেয়ালা চা লাগবে?'

কানাই গিয়া দেখিয়া আসিয়া কহিল, 'বাবুকে নিয়ে ছ পেয়ালা বৌমা।'

চা এবং খাবার সাজাইয়া কানাইকে দিয়া সে পাঠাইয়া দিল। তারপর নিজের হাতে সে এক পেয়ালা চা ও জলখাবারের একটি ডিস্ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'এসো দিদি, ও-ঘরে যাই।'

দুই বোনে লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে একটি রীতিমত মজলিস বসিয়াছে। কাছে গিয়া রমা ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর চা ও খাবাব রাখিয়া কহিল, 'আপনার ছাত্রীর জন্য চা দিতে দেরী হ'লো মাষ্টারমশাই।'

সকলেই আজিকার এই নবাগতা তন্বী সুন্দরীটির দিকে চাহিলেন। এমনি করিয়া অপরিচয়ের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া এত সহজে যে কথা বলিতে পারে তাহার সম্বন্ধে একটা অদম্য কৌতূহল সকলের মনে আনাগোনা করিতে লাগিল। অথচ ইহাকে প্রগল্ভা নারী বলিয়া কোনো একটা বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করিবার উপায় নাই। মনে হইল, ধারালো কৌতুক ইহার দুই আয়ত চক্ষু হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

বিমল বলিল, 'এঁর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই, ইনি আমাদের অতিথি।'

শ্রীমতী কহিল, 'আমি নিজেই পরিচয় দিচ্ছি। হ্যাঁ, তার আগে বিমলের ভুলটা শুধরে দিই। আমি এঁদের অতিথি নই, অভ্যাগত মাত্র। আমার পরিচয়টা আমার দিকে তাকালেই খানিকটা ভেবে নেওয়া যায়, বাকি সামাজিক পরিচয়টুকু হচ্ছে আমি এ-বাড়ীর কর্ত্তা এবং গিন্নীর দিদি, আর ওই যে উনি বসে আছেন, ওঁর আমি ছাত্রী।'

মিষ্টার রায় কহিলেন, 'এর আগে আপনার দর্শন মেলে নি ত?'

'মেলা কঠিন, দর্শনেব ব্যাপার কি না। মাষ্টারমশাই চুপ ক'রে রইলেন যে? আপনার কি ঠাণ্ডা চা খাওয়া অভ্যাস?'

জহর কহিল, 'হ্যাঁ, কথায়-কথায় গরম হয়ে উঠলাম কি না, সুতরাং চা-টা ঠাণ্ডা হওয়াই দরকার।' বলিয়া সে পেয়ালাটা তুলিয়া লইল।

শ্রীমতী স্বচ্ছ হাসি হাসিয়া কহিল, 'তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই বিমল, মাষ্টারমশাই এমনিই, ঠিক হারমোনিয়ামের মতো রীডের ওপর আঙুল না টিপ্‌লে ওঁর কথা বেরোয় না।'

ছোক্‌রা উকীল অমলেন্দু বলিল, 'বেশ ত, ভাল করেই আপনি বাজান না, আমরা ওঁর গান শুনি?'

'কি মাষ্টারমশাই, বাজাবো নাকি, কল আপনার বেগ্‌ড়ায় নি ত?'

রমা তাহার কথা শুনিয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল। জহর কহিল, 'কল যদি না বিগ্‌ড়ে থাকে, মর্‌চে ধরেচে, তোমারো ত বাজানো প্র্যাকটিস্ নেই।'

বিমল বলিল, 'রূপক ছেড়ে দিয়ে যদি সত্যি গানই এঁদের একটা শুনিয়ে দেন তা হ'লে কেমন হয় দিদি?'

'অত্যন্ত একঘেয়ে হয়। পৃথিবীতে এসে গান গেয়ে খুসি করা ছাড়াও মেয়েদের অন্য কাজ আছে বিমল।'

হঠাৎ সকলে যেন একটা কঠিন ধাক্কায় চকিত হইয়া শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকাইল। জহর

মুখ তুলিল না বটে কিন্তু হাসিয়া চায়ের পেয়ালাটা আর একবার মুখের কাছে ধরিল।

'এটা কিন্তু খুব সত্যি বিমলবাবু।' অমলেন্দু বলিল।

এবার জহর কথা কহিল, বলিল, 'জীবনের বড়-বড় সত্যগুলো কিন্তু প্রকাশ করা সঙ্গত নয়।'

বিমল কহিল, 'ঠিক বলেচেন মাষ্টারমশাই, সংসার মনোহর হয়ে উঠেছে মিথ্যা নিয়ে, সত্য নিয়ে নয়।'

'এবার তোমার সঙ্গে আমার মিল্‌বে। জগতটা আমার চোখে অতি প্রিয়, তার কারণ এখানে নরঘাতক আর ধার্ম্মিকের মূল্য প্রায় একই। একজন পায় ঘৃণা, আব একজন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।'

মিঃ লাহিড়ী কহিলেন, 'আপনি কি বল্‌তে চান মুড়ি মিছরি এক দর।

ধার্ম্মিকেরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পাত্র হলেও পরলোকে—'

শ্রীমতী খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং সে হাসির বেগ মিনিট দুই ধরিয়া থামিতেই চাহিল না। হাসি থামিলে কহিল, 'পরকালে তাঁদের নরক ভোগ হওয়াও ত সম্ভব।'

'নরক ভোগ, আপনি বলেন কি?'

শ্রীমতী কহিল, 'পৃথিবীতে একদল সমাজচ্যুত বেকার আছে, তাদের দলের কতকগুলি লোক সভ্যতার নামে মানুষের বন্ধনই সৃষ্টি করে, আব বাকি লোকগুলি করে ধর্ম্মপ্রচার অর্থাৎ মানুষকে পঙ্গু করবার ফন্দী। মনুষ্য-সমাজের হিত করবার মতো অন্যায় স্পর্দ্ধা সংসারের আর কিছু নেই, যারা করে তাদেব ক্রুশে বিদ্ধ ক'রে মারাই উচিত।'

মনে হইল, জহর ভিন্ন তাহার কথাগুলিকে একটুখানি মানিয়া লইবার মতো মুখও ইহাদের ভিতর কাহারও দেখা যাইতেছে না। দেখা না গেলেও তাহার কিছু যায় আসে না। সে অবলীলাক্রমে হাসিয়া বলিল, 'আপনিই বলুন ত মাষ্টারমশাই, যারা মানুষকে বিষ খাইয়ে মারে তাদের বুঝতে পারি, কিন্তু যাবা ধর্ম্মবাণী শুনিয়ে মানুষের মনকে অভিভূত করে, অকর্ম্মণ্য করে, তারা মানবজাতির সব চেয়ে বড় শত্রু নয় কি?' বলিয়া শ্রীমতী আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পিছন ফিরিয়া বাহির হইয়া গেল।

জহর মুখের হাসি সংযত করিয়া একখানি বই খুলিয়া লইয়া বসিয়াছিল। আজ সে মন খুলিয়া শ্রীমতীর একবার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। একটু আগে এই ঘরে এতগুলি লোকের সম্মুখে শ্রীমতীর আবির্ভাবও যেমন হইয়াছিল অকস্মাৎ, তিরোভাবও হইল তেমনি একটি সুন্দর নাটকীয় রসসৃষ্টিব ভিতর দিয়া। এতগুলি কথা সে বলিয়া গেল, কিন্তু ইহার মধ্যে তার জ্বালাও নাই, উষ্মাও নাই—কথাগুলি লইয়া সে খেলা করিয়া গেল মাত্র। কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না, তাহা তাহার গ্রাহ্যই নাই; মুখে আসিল, মুখের কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। কথা বলার দায়িত্ব সে নিজেও কিছু লয় না, সংসারে বিশ্বাসও তাহার কিছুর প্রতিই নাই। বড় বড় তত্ত্ব লইয়া যাহারা বক্তৃতা করিয়া যায়, নিজ জীবনে তাহারা কিছুই বিশ্বাস করে না।

বেলা পড়িয়া আসিল, বন্ধুবান্ধব একে-একে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন, নিচে, অনেকের মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। বিমল যখন তাহাদের পৌঁছাইতে নিচে নামিয়া গেল তখন শ্রীমতী আসিয়া একবার লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া কাছে আসিয়া ইজি-চেয়ারের একটা হাতলের উপর বসিয়া জহরের একটা হাত ধরিল। বলিল, 'ভারি বিপদে পড়লাম যে! এরা ত আমাকে এখন ছাড়বে না?'

জহর বলিল, 'সেই প্রার্থনাই ত শ্রীভগবানের চরণে নিবেদন কচ্ছি, যেন না ছাড়ে।'

'কেন? তুমি বুঝি আর আমাকে সহ্য করতে পাচ্ছ না?'

মুখের হাসি চাপিয়া জহর বলিল, 'ভগবান জানেন আমার মনের কথা, আমার হ'লো শাঁখের করাত!'

অত্যন্ত ছেলেমানুষের মতো শ্রীমতী তাহার হাতখানা একবার মুচড়াইয়া দিল। বলিল, 'শোনো, আমাকে এখন এখানে থাকতেই হবে—'

জহর বলিল, 'যদি না থাকো তা হ'লে বুঝবো তোমার চরিত্র রীতিমত সন্দেহজনক।'
শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, 'তুমি এখন তবে কী করবে?'
'খাবো দাবো, ডুগ্‌ডুগি বাজাবো!'
'ঠাট্টা নয, বল।'
জহর তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি আশ্চর্য্য, কি করবো, সে ফর্দ্দ তোমার নিয়ে কি হবে? ছাড়ো, ওঠো এখান থেকে, কেউ এসে পড়বে।'
'আসুক, বল তুমি।'
জহর চুপ করিয়া রহিল।
শ্রীমতী কহিল, 'দিন-কয়েক আমি এখানে থাক্‌বো। তারপর যাবো বাবার ওখানে। তুমি আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখা করবে ত?'
'কেন?' জহর মুখ তুলিল।
শ্রীমতী একটু অপ্রস্তুত হইযা কহিল, 'তাই বল্‌ছি, রাগ করছ কেন? যদি না যাও তা হ'লে ত আমার নালিশ করবার কিছু নেই!'
বাহিরে পায়ের শব্দ হইতেই সে উঠিয়া সরিয়া গেল। বিমল আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, 'দিদি, আপনার প্রশংসায় সকলে মুখব হযে গেলেন।'
শ্রীমতী কহিল, 'আমার মতামতের প্রশংসা, না আর কিছুর বিমল?'
বিমল হো হো কবিযা হাসিযা উঠিল। তারপর বলিল, 'শিক্ষিত লোকের প্রশংসা কি না তাই ঠিক বোঝা গেল না!' বলিয়া সে বাহির হইয়া আবার চলিয়া গেল।
শ্রীমতী আবার কাছে আসিযা দাঁড়াইল। তারপর একখানি হাত বাড়াইয়া আজ প্রথম জহরের মাথার চুলগুলি নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, 'ঠাট্টা কববে না একটা সত্যি কথা বলবে?'
জহর বলিল, 'ছাত্রীর সঙ্গে কি ঠাট্টার সম্পর্ক?'
'আচ্ছা, ছাত্রীই না হয় হলাম। বল ত তোমার শেষ লক্ষ্যটা কি?'
'শেষ লক্ষ্য? কেন, মানুষের শেষ লক্ষ্য—মৃত্যু?'
'সে একশোবার, তার আগে পর্য্যন্ত?'
জহর বলিল, 'এটা তোমার মেয়েলি মনের পরিচয়, বিষয়বুদ্ধি! কেউ জানে তার ভবিষ্যৎ? তুমি জানো তোমার নিয়তি কোথায় টেনে নিয়ে যাবে?'
শ্রীমতী হাসিযা বলিল, 'আচ্ছা, বল ত তুমি সংসার করবে কি না?'
'তোমার মাথা ব্যথার হেতু?'
'শুধু কৌতূহল। জানো ত মেয়েমানুষের মন?'
জহর বলিল, 'সংসারের ওপর মমতা আমার ভয়ানক শ্রীমতী। বড় ভালবাসি আমি সংসারী হতে।'
'হও না কেন?'
জহর চুপ করিয়া বইখানার দিকে তাকাইয়া রহিল। শ্রীমতী তাহার মাথাটা নাড়িয়া কহিল, 'উত্তর দিচ্ছ না যে?'
.একটু উদাস হাসিয়া মুখ তুলিয়া জহর বলিল, 'কী উত্তর দেবো?'
'বল যে, ওগো, এই কারণে আমি সংসারী হতে পারলাম না? সে কারণটা কি বল। ব্যর্থপ্রেম?'
'আরে রামোঃ!' বলিয়া জহর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল।
'তবে অর্থাভাব?'
'অর্থাভাব হলেও কি মানুষের সংসারী হতে বাধে?'
'তবে? তবে? তবে কী, বলতেই হবে।'

জহর উত্যক্ত হইয়া কহিল, 'তুমি পরস্ত্রী, তোমার এ-কৌতূহল কেন শ্রীমতী?'

শ্রীমতী এবার চুপ করিয়া সরিয়া আসিল। জহর বলিল, 'আজ তোমার কথাবার্ত্তায়, ধরণধারণে তুমি যেমন চঞ্চল, তেমনি কেমন যেন একটা বিরক্তিকর আত্মীয়তার ছুঁচ ফুট্‌চে। এ ত তোমার অভ্যেস নয়?'

এ একেবারে জহরের নিজস্ব চেহারা। শ্রীমতী হাসিমুখেই কহিল, 'কি তোমার মনে হচ্ছে?'

'এ ঠিক প্রেম নয়, এর মধ্যে খানিকটা সহানুভূতি আর অনুকম্পা মেশানো রয়েছে।'

'আর ওই যে ছুঁলাম তোমাকে তার কী?'

'কিছুই না, সামান্য একটু পরকীয়া রসের ইঙ্গিত। এসব কেন বল ত?'

'বোধ হয় তোমাকে আজ ছাড়তে হবে তাই জন্যে। তোমার পথটা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কোথাও ছায়া নেই।' বলিয়া শ্রীমতী কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে বাহিরের দিকে তাকাইল, তারপর 'আসছি, বসো।' বলিয়া একটি ছোট নিশ্বাস চাপিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন আর একা নয়, পিছনে রমা। আসিয়া বলিল, 'মাষ্টারমশাই যাচ্ছেন যে।'

রমা হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, 'আপনার চেয়ে বড় বন্ধু দিদির আর কেউ নেই। কত বড় দুর্দ্দিনে যে আপনি তাকে—আবার আপনি কবে আসবেন বলে যান্ মাষ্টারমশাই।'

'একদিন এর মধ্যে এলেই হবে।'

শ্রীমতী কহিল, 'এখন ক'দিন ওই বাড়ীতেই আপনি থাকবেন; চট ক'রে যেন বাড়ী বদল করবেন না। বুঝলেন?'

শান্ত ছেলেটির মতো জহব মাথা নাড়িল। শ্রীমতী মেঝের উপর হাঁটু পাতিয়া গলায় আঁচল দিয়া পায়ের ধূলা তুলিয়া লইল।

'ওঁকে ডেকে দিই।' বলিয়া রমা বাহির হইয়া যাইতেই সে দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তারপর একবারটি এ-দিক ও-দিক তাকাইয়া জহরের পায়ের ধূলামাখা হাতখানি জহরেরই মাথায় মাখাইয়া দিল। বলিল, 'বয়ে গেছে পায়ের ধূলা নিতে।'

জহর রাগ করিয়া বলিল, 'কাল ক্লাশে গিয়ে তোমাকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দেবো। যদি না দিই তা হ'লে আমার নাম—'

শ্রীমতী হাসিয়া বলিল, 'আর আমি তার ওপর দাঁড়িয়ে একালের মাষ্টারমশাইদের চারিত্রিক অধোগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবো।'

উচ্চকণ্ঠে দুইজনে হাসিয়া উঠিবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিমল আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

বিদায় লইয়া জহর যখন পথে নামিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পথে লোকজনের সমারোহ কমে নাই বরং সন্ধ্যার মুখে বাড়িয়াই গিয়াছে। বড় রাস্তাটার মোড়ে আসিয়া প্রথমেই তাহার মনে হইল, কোন্ দিকে যাওয়া যায়। যেদিকেই যাওয়া যায় সেই দিকই তাহার পক্ষে অবারিত। আঃ, এবার সে বাঁচিয়া গেল। শ্রীমতীর জন্য সম্ভবতঃ মনে মনে তাহার একটা দুশ্চিন্তা ছিল, আজ বিমলচন্দ্র মূর্ত্তিমান মুক্তর মতো আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিল। বিমলের কাছে সে চিরকৃতজ্ঞ। অনাত্মীয় স্ত্রীলোককে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার মতো বিড়ম্বনা সংসারে আর কিছু নাই, সুন্দরী স্ত্রীলোক হইলে আরও অসুবিধা। যাক শ্রীমতী এবার বাঁচিয়া গেল। হাতের কাছে এত বড় আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বেওয়ারিশের মতো তাহার সহিত এ কয়দিন পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়ানো শ্রীমতীর উচিত হয় নাই। পথে-পথে কেনই বা এমন করিয়া সে বেড়াইয়া গেল? স্বাবলম্বী হওয়া সকলেরই প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জন্য এমন অযৌক্তিক ব্যাকুলতা কেন? শ্রীমতীর বড় হইয়া উঠিবার একটা উচ্চাশা

আছে বটে, কিন্তু তাহার স্পষ্ট অভাব ত কিছুই নাই!

যাক্ শ্রীমতী! তাহার দুরন্তপনায় এই কয়দিন ধরিয়া জহরের দৈনন্দিন জীবনের নিয়মানুবর্ত্তিতা ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহার প্রত্যহের বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি পরম তৃপ্তিকর স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, শ্রীমতী তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছে অথচ তাহার দৌড় এই পর্য্যন্তই। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া এক বৃহৎ আদর্শবাদ মাথায় লইয়া যে-মেয়ে সমাজদ্রোহিণী সাজিয়া পথে নামিয়া আসিয়াছিল, আপন সহোদরার একটি সামান্য আশ্রয় পাইয়া তাহার দ্রুতগতি আজ থামিয়া গেছে। এদেশের মেয়েরা এতই বিষয়বুদ্ধি লইয়া থাকে যে, শেষরক্ষা করিতে পারে না! খুব সম্ভবতঃ শ্রীমতীর স্বপ্ন ছিল, আদর্শ উদার সমাজ, সুশৃঙ্খল স্বাস্থ্যময় জীবন, স্বচ্ছন্দ সংসার, অকলঙ্ক ভালবাসা! এমন আজগুবী স্বপ্ন লইয়া এক শ্রীমতীই চীৎকার করিয়া বেড়াইতে পারে। শ্রীমতীর গর্জ্জন আছে, বর্ষণ নাই।

চুলোয় যাক শ্রীমতী! পথের উপর একটা চায়ের দোকান পাইয়া জহর আসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ বসিয়া-বসিয়া একে-একে তিন পেয়ালা চা সে নিঃশেষ করিল। দাম চুকাইয়া দিয়া সে যখন আবার পথে নামিল, দেখিল একটা লোক নানা রঙের ফুল বিক্রয় করিতেছিল। সে একটা জুঁই ফুলের মালা কিনিয়া হাতে জড়াইয়া চলিতে লাগিল।

চলিতে-চলিতে কিছুদূর গিয়া দেখিতে পাইল, বাজনা-বাদ্য করিয়া চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া এক ধনীর পুত্র বিবাহ করিতে চলিয়াছে। সে এক বিরাট শোভাযাত্রা। ইংরেজি ব্যাণ্ড্, মাদ্রাজী ফ্লুট, ঘোড়-সওয়ার, কাগজের হাতী ও রাক্ষসী, মাটির পুতুল নাচ, ছেঁড়া তাজমহল, সমস্ত পথ জুড়িয়া বরযাত্রীদলের এক বিপুল উৎসাহ। যে-লোকটা সানাই-বাঁশী বাজাইতে-বাজাইতে চলিয়াছিল, জহর তাহার সঙ্গ ধরিল। লোকটা জাতিতে সম্ভবতঃ হিন্দু নয়, মাথার পিছন দিকটা অতি কর্দয্যভাবে ক্ষুর বুলানো। চোখ দুইটা নেশায় রাঙা, আপন মনে বাঁশী বাজাইতে-বাজাইতে হুঁস নাই যে, তাহার দুই ঠোঁটের কস বাহিয়া ফেনা গড়াইতেছে। কিন্তু এমন করিয়াই সে বাঁশী বাজাইতেছিল যে, জহর তাহাকে ছাড়িতে পারিল না।

কতদূর পর্য্যন্ত তাহারা গেল, কোন্ পথে ঘুরিল, পথের গাড়ী ঘোড়া লোক-লস্কর, আলো-বাজনা সমস্তটাই জহরের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে ছায়াবাজির মতো মিলাইয়া গিয়াছিল। বহুদূর পর্য্যন্ত বাঁশী শুনিতে-শুনিতে গিয়া একসময় তাহার চমক ভাঙ্গিল। দেখিল, লোকটা বাঁশী থামাইয়া পকেটের ভিতর হইতে একটা পাঁইট বোতল বাহির করিয়া ছিপি খুলিয়া মুখের কাছে ধরিল। ঢক্-ঢক্ করিয়া খানিকটা কি যেন গিলিয়া সে আবার বোতলটা পকেটে রাখিয়া দিল। দুর্গন্ধে তখন আর তাহার নিকট থাকা যায় না। জহর চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বাঁশীর আওয়াজ আবার উঠিতেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুরের মাধুর্য্যে আবার তাহার দুই কান ভরিয়া গেল, তখন প্রথমেই মনে হইল, শিল্পীরা হয় ত এমনই হয়! মানব-সমাজকে যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ দিয়াছে, ব্যক্তিগত জীবনে তাহারা হয় ত নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল, তাহাদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি সাধারণ মানুষের রুচিকর নয়।

বাঁশী যখন থামিল, দেখিল, তখন চারিদিক হইতে শাঁখ ও উলুধ্বনি উঠিয়াছে। বরকে দেখিবার জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি। জহর লজ্জিত হইয়া পাশ কাটাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বড় একটা বাগানবাড়ীর মধ্যে সে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

'আরে মশাই, যান্ কোথায় অত *ঠেলেঠুলে?*'

'ও-দিকে এগুচ্ছেন কেন, পথ নেই যে।'

'দয়া করে ও-দিক দিয়ে যান্, এ-দিকে অন্দরের পথ।'

চারিদিকের তীব্র আলোয় জহরের চোখে তখন ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে। লোকের ভিড়ের মধ্যে হাঁকপাক করিয়া সে একবার প্রাণপণে বাহির হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পাঁচিল-ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান আর অন্দরমহলটাই শুধু তাহার নজরে পড়িল, লোকের ভিড়ে বাহিরের পথটা আর দেখা গেল না।

'মালা পেয়েছেন? আসুন মালা পরিয়ে দিই।' বলিয়া একটি লোক তাহার গলায় একছড়া বেলফুলের মালা পরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। এমন বিপদে জহর জীবনে পড়ে নাই, অতি কষ্টে ভিড়ের ভিতর দিয়া হাতড়াইতে-হাতড়াইতে সে পলাইবার পথটা এতক্ষণে আবিষ্কার করিল। তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিতেই হঠাৎ এক জায়গায় দুইদিক হইতে জলের ছাট্ তাহার মুখ-চোখে, জামা-কাপড়ে, সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া লাগিল। এ আবার কী রসিকতা? দেখিল, গোলাপের গন্ধে তাহার সর্ব্বশরীর ছাইয়া গিয়াছে। এবার একেবারে মরিয়া হইয়া সে গেটের কাছে আসিয়া পড়িল।

'আরে জহর যে! সোনার চাঁদ, এতক্ষণ ছিলে কোথায়? ওহে সৌরীন, এই দ্যাখো তোমার বাল্যবন্ধু হাজির, এবার আমাদের দল জম জমাট!'

একটি যুবক আবার তাহাকে পাঁজকোলা করিয়া ভিড়ের মধ্যে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সৌরীন আসিয়া তাহাকে ধরিল। তাহার কান ধরিয়া বলিল, 'গাধা, তিন দিন ধরে খুঁজেছি তোকে, ছিলি কোথায়? রাধারাণীর যে বিয়ে আজ! তোকে নেমন্তন্ন করবো বলে—'

রাধারাণী সৌরীনের ছোটবোন।

জহর বলিল, 'আমি বুঝি জানি নে যে রাধারাণীর বিয়ে? সব জানি। তার বিয়েতে তুই আমায় নেমন্তন্ন করবি সেই অপেক্ষায় থাক্‌বো? এই দেখ্ রাস্তা থেকে নিজে মালা কিনে এনেছি; এই হাতে জড়ানো। তারপর? সেই পাত্রের সঙ্গেই বিয়ে হ'লো ত?'

'হ্যাঁ, সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্। তুই জান্‌লি কেমন করে?'

'জানি না? সমস্ত জানি। ডেপুটি ত দূরের কথা, পঞ্চম জর্জ্জের বড়ছেলেও রাধারাণীকে পছন্দ করতো।'

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সৌরীন কহিল, 'ওঃ তোকে দেখলে বাড়ীতে সবাই খুসি হবে। সেদিন রাধারাণী কত দুঃখ করছিল তোর দেখা পাওয়া গেল না বলে। চল্ তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবি।'

জহর বাধা দিয়া বলিল, 'আচ্ছা যাবো একটু পরে। যাবোই ত!'

ভিতর বাড়ীতে ষ্টেজ্ বাঁধা হইয়াছিল। ছোট-ছোট মেয়েদের নাচ, গান, লাঠিখেলা এবং যাদুবিদ্যা দেখানো হইবে। অমরেশ কহিল, 'এই ত জহরকে পাওয়া গেল, তবে আর কি, এ ত একেবারে জাগ্‌লারিতে ওস্তাদ; ভাই তোর সেই তাসের বাজীটা—'

সৌরীন বলিল, 'ব্যস্, কেল্লা মার দিয়া, সে-লোকটার চেয়ে জহর ঢের ভাল করবে। তোর সেই ভেন্‌ট্রিলোক্যুইজম্‌টা—উঃ সেটা অদ্ভুত! চল্ ভেতরে আয়, মেয়েদের গান শেষ হয়ে এল!'

পাঁচ-সাত জন বন্ধুবান্ধব মিলিয়া তাহাকে অন্দর-মহলের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

বিবাহ-লগ্নের একটু বিলম্বই ছিল। ভিতর বাটীর প্রকাণ্ড উঠানে পাল্ টাঙাইয়া আসর করা হইয়াছে। একদিকে ষ্টেজ্ বাঁধা। তাহারই উপর অত্যুগ্র আলোকের সম্মুখে জরির সাজ-সজ্জা করিয়া কয়েকটি মেয়ে নাচিয়া-নাচিয়া গান গাহিতেছিল। গানের বিষয়-বস্তু হইল, দীর্ঘ বিরহের পর নববসন্তে প্রিয়-মিলন। চারিদিকে সম্ভ্রান্ত শ্রোতা ও শ্রোত্রীর দল অসংখ্য চক্ষু মেলিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া আছে। একটি বিবাহকে উপলক্ষ্য করিয়া এমন শত-সহস্র নরনারীর ভিড় জহর ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় আর কোথাও দেখে নাই। সে যেন দিশাহারা হইয়া গেল।

গান থামিতেই সহস্র-সহস্র করতালির অভিনন্দনে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। তাহার পর হইল সঙের নাচ—হাসির সমুদ্র রোল উঠিল। হাসিয়া-হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়া সকলে আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

এইবার জহরের পালা। সকলে তাহাকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া ষ্টেজের উপর উঠাইয়া দিল। বহুদিনের অনভ্যাসে প্রথমটা সে কথা বলিতে গিয়া থতমত খাইয়া গেল, এই বিপুল জনতার মাঝখানে তাহার হাত-পা আসিল না। অসংখ্য কৌতুহলী দৃষ্টি তাহার দিকে নিস্পন্দ হইয়া তাকাইয়া আছে। মুহূর্ত্ত

তাহার গায়ের রক্ত ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল।

কী যে করিবে, কী যে বলিবে—সব তাহার গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ আর বিলম্ব নয়, এইবার লোকে তীব্রকণ্ঠে বিদ্রূপ করিয়া উঠিবে। মঞ্চের উপর দুই-একবার পায়চারি করিয়া নিস্তব্ধ দর্শকগণের মুখের উপর জহর হঠাৎ মরিয়া হইয়া চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'আপনাদের সবাই দেখচেন আমি আজ দাড়ি কামাই নি। কামাই নি ত? দেখুন, ভাল ক'রে দেখুন আমার দাড়ি।'

দুই-এক জন বলিয়া উঠিল, 'তা ত দেখছি, কামান নি।'

'কে বলে কামাই নি?' বলিয়া সে একখানা রুমাল বাহির করিয়া মুখ ঢাকিল। মুখ যখন খুলিল, তখন দেখা গেল তাহার দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করিয়া কামানো। সকলে হাততালি দিয়া উঠিল। এ ত আশ্চর্য্য যাদুকর!

'এবার শুনুন আপনারা, একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বল্‌বো। তাঁকে আপনারা দেখতে পাবেন না, অথচ তিনি আমার পাশে আছেন।'

বলিয়া গলা ঝাড়িয়া জহর আরম্ভ করিল। প্রথমে ডাকিল, 'শ্রীমতী?'

সুন্দর নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল, 'কি বলচ?'

'দাঁড়াও, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'বিমলদের বাড়ী।'

'সেখানে কে আছে।'

'আমার ছোটবোন।'

'শোনো, কবে আসবে?'

'আর আসবো না, চল্‌লাম।'

'শুনে যাও, আমি থাকবো কেমন ক'রে?'

'তা আমি জানি নে, চল্‌লাম।'

'আচ্ছা শোনো, আমি তোমায় ভালবাসি।'

'মিথ্যে কথা, তুমি আমায় ভালবাস না। চল্‌লাম।'

জহর বলিল, 'তোমার বিরহ আমার সইবে না শ্রীমতী।'

দূর হইতে নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল, 'এ তোমার বাড়াবাড়ি।'

'তোমার দিব্যি ক'রে বলচি শ্রীমতী, দিন আমার কাট্‌বে না।'

শ্রীমতী কহিল, 'মিছে কথা, সকলেরই দিন কাটে, তোমারো—'

'শ্রীমতী, শুনে যাও।'

নারীর কণ্ঠস্বর নিকটে আসিয়া কহিল, 'কি বল?'

'তুমি যেয়ো না, এমন ক'রে আমায় কাঙাল ক'রে যেয়ো না।'

খিল্-খিল্ করিয়া স্ত্রীলোকের হাসির শব্দ হইল। জহর বলিল, 'বিশ্বাস কর, তুমি গেলে আমি সব হারাবো।'

'কী-ই বা তোমার আছে যে হারাবে? ভিখারী ছিলে, এবার না হয় কাঙালই হবে!'

'আমার কিছু নেই, তোমার ভালবাসা পেলে আমি ঐশ্বর্য্যবান হতে পারি শ্রীমতী। আমি বড় হতে পারি, মানুষ হতে পারি।'

নারীর কণ্ঠ কহিল, 'আমি তোমায় ভালবাসি কিন্তু তুমি তার দাম দিতে পারবে না।'

'শুনে যাও শ্রীমতী, চলে যেয়ো না।'

'না, আমি চল্‌লাম।'

'শুনে যাও, ফিরে চাও?'

দূর হইতে উত্তর আসিল, না।'

চীৎকার করিয়া জহর ডাকিল, 'শ্রীমতী?'

বহুদূর হইতে শেষবার জবাব আসিল, 'আমার আশা ছেড়ে দাও।'

বিস্ময়-বিমুগ্ধ নিস্তব্ধ দর্শকমণ্ডলী অবাক হইয়া দেখিল, ষ্টেজের উপরকার উজ্জ্বল আলোয় ব্যর্থ প্রেমিকটির দুইটি চোখ সজল হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিক হইতে অজস্র ও অসংযত হাততালি উঠিয়া সমস্ত আসরটাকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। এমন ভৌতিক প্রেমালাপ তাহারা জীবনে শুনে নাই। আশ্চর্য্য এই শিল্পী, অভূতপূর্ব্ব ইহার যাদুবিদ্যা!

তারপর তাসের নানারকম বাজী সুরু হইল, সকলে চীৎকার করিয়া হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। তাহার পর টাকার খেলা। সে খেলা শেষ হইলে জহর অমরেশের নিকটে একটি ট্যাঁক ঘড়ি চাহিয়া লইল। ট্যাঁক ঘড়িটি সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে সে যখন টুকরো টুকরো করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল, একটি বর্ষীয়সী মহিলা নিকটবর্ত্তী বারান্দা হইতে উত্যক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এসব ঢের দেখেছি, এ আর নূতন কি?' বলিযা তিনি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন!

'দাঁড়ান্, নতুন কিছু দেখতে চেয়ে চলে যাবেন না।' বলিয়া জহর মঞ্চের উপর হইতে নিচে নামিয়া উক্ত মহিলাটির নিকটে আসিল। দর্শকগণ পরম ঔৎসুক্যে তাহার গতিবিধি নিরীক্ষণ কবিতেছিল।

জহর বলিল, 'আমাদের ঘড়িটা নিয়ে চলে যাচ্ছেন, বেশ লোক ত আপনি?'

'ঘড়ি? ঘড়ি আমি কি জানি?' মহিলাটি ফিরিযা দাঁড়াইলেন।

'নিশ্চয়, জানেন, ঘড়িটা আছে আপনার কাছে। পরের জিনিস আপনি না বলে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? নিজেব ট্যাঁক দেখুন দেখি।'

মহিলাটি হতভম্ব হইযা হাত বুলাইযা নিজের ট্যাঁক পবীক্ষা করিলেন। কিছুই পাওয়া গেল না। তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া কহিলেন, 'ভারি নচ্ছার লোক ত তুমি? ভদ্রলোকের মেয়েছেলেকে—'

জহর বলিল, 'ট্যাঁকে নেই, তবে নিশ্চয়ই আঁচলে বেঁধেছেন।'

আঁচল ঝাড়িতে গিয়া তিনি দেখেন, আঁচলটা ভারী, তাহার খুঁটে অমরেশের ঘড়িটি বাঁধা। ঘড়ি বাহির হইয়া পড়িতেই মহিলাটির মুখখানি অপমানে বিবর্ণ হইয়া গেল। চারিদিকে ততক্ষণে হাসি, হাততালি, চীৎকার, প্রশংসা ও আনন্দধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। মাথা হেঁট করিয়া মহিলাটি সেখান হইতে ভিড়ের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন।

খেলা শেষ হইলে বিপুল অভিনন্দন ও প্রশংসায় জহরকে সকলে প্লাবিত করিয়া দিল। এই বলিষ্ঠকায় সুশ্রী যুবকটির অলৌকিক শক্তিমত্তায় মুগ্ধ হইয়া মেয়েরা ধন্য-ধন্য করিতেছিল। এ যেন কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া আজিকার সম্মিলিত শত-শত নরনারীর হৃদয় লইয়া অতি স্বচ্ছন্দে খেলা করিয়া চলিয়া গেল। অদ্ভুত ইহার শক্তি!

বিবাহ লগ্নের আর বেশি বিলম্ব ছিল না। উঠানের একদিকে আট চালার নিচে বরযাত্রীর প্রথম দল তখন সমারোহের সহিত আহার করিতে বসিয়াছে। অনেকে সেইদিকে গিয়া তদ্বির করিতেছিল। এমন সময় সৌরীনের পিছনে-পিছনে অন্দরমহলের বারান্দা হইতে রাধাবাণী উঠানের ছোট দরজায় নামিয়া আসিল। বলিল, 'কই দাদা, তোমার বন্ধু?'

'দাঁড়া তুই এখানে, আমি ডেকে আনি।' বলিয়া সৌরীন বাহির হইয়া গেল।

আলো বাঁচাইয়া অতি উদ্বেগে, অতি সন্তর্পণে রাধারাণী সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকক্ষণ বাদে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সৌরীন আসিয়া বলিল, 'ষ্টুপিড্‌কে দেখতে পাচ্ছি নে, হতভাগা গেল কোথায় বল ত?'

'দেখতে পেলে না?' বলিয়া রাধারাণী গলা বাড়াইয়া বাহিরে একবার চোখ বুলাইয়া চারিদিকে তাকাইল, তারপর চিন্তিত হইয়া বলিল, 'সে হয় সুমুখেই থাকে, নৈলে কোথাও থাকে না দাদা।'

'দেখি, দীনেশটা গেছে তাকে খুঁজতে। হতভাগা খেয়েও গেল না!'

ভাই-বোনে প্রতীক্ষা করিতে-করিতে দীনেশ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'কোথাও তাকে পাওয়া গেল না ভাই। ভেতরে, বাইরে, রাস্তায়—কোথাও না। অদ্ভুত ছেলে যা হোক।'

'অদ্ভুত সে চিরকাল। তুই আর একটু দাঁড়া রাধারাণী, আমি আর একবার তাকে—'

কিন্তু রাধারাণী আর দাঁড়াইল না। অন্ধকারে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'তুমি কি তাকে চেনো না দাদা, সারা রাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও তোমরা তাকে আন্‌তে পারবে না!'

এদিকে বিবাহের উৎসব লইয়া সকলেই যখন নানাদিকে ব্যস্ত, জহর তখন পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে চলিয়াছে। পথের ঠিক নাই, তবু মনে হইল এ পথ অনেকদূর। নূতন বাড়ী তৈরি করিয়া রাধারাণীরা যে এ-দিকে আসিয়া বাস করিতেছিল তাহা সে জানিত না। এতক্ষণে গলার ফুলের মালাটি খুলিয়া সে হাতে লইল। চলিতে-চলিতে মনে হইল, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। যে-সম্মান ও গৌরব এইমাত্র সে অর্জ্জন করিয়া আসিল তাহাতে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই। জনসাধারণ প্রশংসা অথবা নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত থাকে—তাহারা এটুকু বুঝে না, যে-হতভাগ্য তাহাদের আনন্দ বিলায়, যে-দরিদ্র তাহাদের চিত্ত-বিনোদন করে, তাহার দিন চলে কেমন করিয়া! সংসারে এ-দৃশ্য নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যে-রসিক সকলের হাস্যোদ্রেক করে, তাহার ব্যক্তিগত জীবন অতি করুণ, পৃথিবীতে তাহার জন্য কাঁদিবার লোক নাই। যাহাকে সকলে পাইলে আনন্দিত হয়, আপন জীবনের দুঃখে সে হয় ত নিজেই অশ্রুকাতর। এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে একটি অতি অকরুণ বিদ্রূপ নিহিত রহিয়াছে।

এদিকে ময়রার দোকান একটিও নাই, দুই-এক খানি যাহা ছিল এত রাত্রে তাহা বন্ধ হইয়া গেছে। আজ রাত্রে আর আহারাদি করিবার কোনও উপায় নাই। পথের উপরে একটা বিরাটকায় গরু শুইয়া-শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল, জহর তাহার পাশ দিয়া আসিতে-আসিতে একবার দাঁড়াইল। তারপর হাতের দুই ছড়া মালা লইয়া শিংয়ে জড়াইয়া দিয়া আবার চলিতে লাগিল।

এমনি করিয়া বহু পথ অতিক্রম করিয়া গভীর রাত্রে সে কাঁসারীপাড়ার বাসার দরজায় আসিয়া হাজির হইল। অন্ধকারেও উপর দিকে চাহিয়া সে বেশ বুঝিতে পারিল আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, আজ অসময়ে একবার বৃষ্টি নামিবে। তাহার খাওয়া হইল না বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা পড়িলে অতি আরামেই তাহার সুখনিদ্রা হইবে, শ্রীমতীর জ্বালায় গতরাত্রে তাহার তেমন ভাল ঘুম হয় নাই।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। দরজায় উঠিয়া তাহার মনে পড়িল, ঘরের তালার চাবি শ্রীমতীর কাছে। দরজা খুলিবার অন্য কোনও উপায় নাই। মুখের ভিতর হইতে তাহার কে যেন হাসিয়া উঠিল। এ-হাসির সহিত কাহারও হাসি মিলে না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া পথে নামিয়া সে আবার একদিকে চলিতে লাগিল। পা দুইটা এবার তাহার ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে।

আকাশের আয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছিল, এবার গুরু-গুরু মেঘগর্জ্জন সুরু হইল। দুর্য্যোগ এবং দুর্দ্দিনে জহরের দুইটি বস্তুর একান্ত অভাব ঘটে, সঙ্গী এবং আশ্রয়। যেখানে সে দুঃখ পায় সেখানে সে একা। অথচ আজিকার রাত্রে বর্ষণের কোনো হেতু ছিল না—গ্রীষ্মকালের উত্তাপও নাই; বর্ষা-বাদলের সময়ও নয়। বৃষ্টি যখন সত্যই তাহার মাথার উপর সপ্-সপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল, মনে হইল আকাশের এই বিশ্বাসঘাতকতা শুধু তাহারই জন্য। সে শপথ করিয়া বলিতে পারে, দিকে-দিকে আজিকার রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, দক্ষিণ বাতাসের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের মধ্যে সংসারের শ্রান্ত ক্লান্ত নরনারী গা এলাইয়া দিয়া নৈশ বিলাস করিতেছে, ফুলদল দিয়া তাঁহাদের হইয়াছে ফুলশয্যা, আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রমালা সভা করিয়া তাহাদের অভিনন্দিত করিতেছে, বিরহ মিলনের করুণ ও মধুর রসলোক সৃজন করিয়া শিয়রে প্রদীপ জ্বালিয়া সুখরজনীর কোলে সবাই

শায়িত। কোথাও দেখা যাইবে ঐশ্বর্য্যের আনন্দ সৌভাগ্যের অপরিমেয় সমারোহ, যশ ও খ্যাতির প্রাচুর্য্য, দানে-দয়ায়-দাক্ষিণ্যে আজিকার রাত্রি হয় ত কাহারও কাছে চিরস্মরণীয় বোধ হইতেছে। কোথাও দেখা যাইবে ফেনিল মত্ততা, বিষাক্ত আনন্দ, প্রগলভ্ রসের ইঙ্গিত, ভ্রূ-বিলাসের গোপন ইসারা, প্রসাধন চাতুর্য্যের উন্মত্ত আকর্ষণ, অসংযত ও অন্ধ উল্লাসের বিক্ষুব্ধ বিশৃঙ্খল!

কিন্তু আর একটা দিক? যেখানে নির্জ্জন নদীতীরের নিভৃত অন্ধকারে একাকী পক্ষী থাকিয়া-থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, এ বসন্ত-ঋতু কি তাহার জন্য নয়? যাহারা পীড়ন সহিল কিন্তু অভিমান করিল না, যাহাদের জীবনের সকল সম্ভাবনা পদদলিত হইয়া গেল, শত চেষ্টা করিয়াও এ-সংসারের সুকঠিন বিরুদ্ধতার মধ্যে যাহার মাথা তুলিতে পারিল না, এ বসন্ত-ঋতু কি তাহাদের জন্য নয়? মানুষের হিতসাধন করিতে আসিয়া মানুষের দেওয়া অপমানে যাহাদের মাথা হেঁট হইয়া গেল, ভালবাসিতে গিয়া যাহাদের সমগ্র জীবন কলঙ্কিত হইল, নির্ব্বিচার লাঞ্ছনা ছাড়া এ পৃথিবীর নিকট যাহাদের আর কোনো পাওনা নাই—এ বসন্ত-ঋতু কি তাহাদের জন্য নয়? আজিকার এই চন্দ্রকরোজ্জ্বল বসন্ত রাত্রে তাঁহারা কোথায়, যাহারা অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, যাহাদের ঘরে আলো জ্বলে না, যাহাদের ক্ষুধার অন্ন নাই, ভাষার অভাবে যাহারা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, যাহারা শ্রমিক, রেলের কুলী, জাহাজের খালাসী, সমুদ্রের তীরে মাছ ধরিয়া যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করে, ঐশ্বর্য্যশালীর পদলেহন না করিলে যাহারা লাঞ্ছিত হয়—তাহারা কোথায়? দিনযাপনের দুর্ব্বিসহ যাতনা যাহাদেব, যাহাদের মাথায় লজ্জায় বোঝা, পরিবাবের গ্লানি, জীবনকে লইয়া যাহাদের গণিকাবৃত্তি, যাহাদের স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন, আশা সুদূরলুপ্ত, ভগ্ন-স্বাস্থ্য, ক্ষয়হীন প্রাণ—তাহারা কোথায়? যাহারা বঞ্চিত, প্রতারিত, অবৈধ দেহ-লালসায় যাহাদের জন্ম, যাহারা ঘৃণ্য, পরিত্যক্ত, উপেক্ষা ও অনাদর যাহাদের পাথেয়, বাঁচিয়া থাকাই যাহাদের কঠিনতম শাস্তি—আজিকার এই রাত্রে সে হতভাগারা কোথায়? এই বৃষ্টি, এই দুর্যোগ, আকাশের এই গুরুগর্জ্জন, এই প্রলয়ান্ধকার—এ যে শুধু তাহাদেরই জন্য!

জলে ভিজিতে-ভিজিতে একটা বাগানের গেট-এর কাছে আসিয়া জহর দাঁড়াইল, দেখিল লোহার শিকল জড়াইয়া তালাচাবি বন্ধ। এ-দিক ও-দিক একবার তাকাইয়া রেলিঙ টপ্‌কাইয়া সে ভিতরে ঢুকিল। কিয়দ্দুর গিয়া একটা শেড্-এর নিচে একখানা বেঞ্চের উপর সটান লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। জামা, কাপড় জলে ভিজিয়া তখন সপ্-সপ্ করিতেছিল।

শুইয়া পড়িল, কিন্তু আজ রাত্রে তাহার ঘুম হইবে না। তা না হোক্, বহুরাত্রি এমনি করিয়া তাহার জাগরণে কাটিয়া যায় সে জন্য তাহার কষ্ট কিছু নাই। অন্ধকার আকাশের দিকে সে মুখ ফিরাইয়া ভাবিল, ঘুমাইবে না, একি তাহার অভিমান? অভিমান কাহার উপর? দুইটি উজ্জ্বল দৃষ্টি বাহিরের দিকে নিবদ্ধ করিয়া মনে মনে জহর বলিল, অভিমান তাহার কাহারো উপর নাই। এই দরিদ্র পৃথিবী, তাহার চেয়ে দরিদ্র মানুষ, এখানে সে অভিমান করিবে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া? মানুষে তাহাকে কী দিতে পারে? কতটুকু তাহাদের সাধ্য? সে ত আরামের লোভ করে না, আনন্দ পাইবার আশা ত তাহার নাই, তবে কেন সে দুঃখকে লইয়া আজ বিলাস করিবে।

কিন্তু সাধারণের মনের সহিত জহরের মন মিলে না। একটু আগে যে-অসংলগ্ন কথাগুলা তাহার মাথার মধ্যে জট পাকাইতেছিল, তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তাহার বিবাগী মন আবার কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিল।

মনে হইল, দুঃখ পাইবার মতো করিয়া বিধাতা শ্রীমতীকে সৃষ্টি করেন নাই। যে-আশা ও ইচ্ছা লইয়া সে সংসার ত্যাগ করিয়া পথে নামিয়া আসিয়াছে, সে তাহার উপযুক্ত নয়। ভিতরের বিদ্রোহ ও তিক্ততা তাহাকে দিকে-দিকে ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইবে, অথচ তাহার সার্থকতা কোথায়? যে-আদর্শ ও স্বপ্ন লইয়া পুরুষ যুগে-যুগে ঘরছাড়া হইয়া গিয়াছে, নারীর বিদ্রোহী মন সেগুলিকে আশ্রয় করিলে এই গ্লানি-পঙ্কিল পৃথিবীর ধূলা ও রৌদ্রের আঁচ তাহাকে শুধু বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্তই

করিবে, আর কিছু নয়। শ্রীমতীর মধ্যে বিদ্রোহ আছে, প্রেরণা আছে কিন্তু সংগ্রাম নাই। উৎসাহ আছে কিন্তু শক্তি নাই।

কিন্তু যাক্ শ্রীমতী। শ্রীমতী তাহার কাছে শেষ হইয়া গিয়াছে। এমন বন্ধন সে কোথাও সৃষ্টি করে নাই যাহাতে শ্রীমতীর সহিত তাহার বার-বার দেখা হইতে পারে। আজ মাঠের মাঝখানে বসিয়া এই সেদিনকার শ্রীমতীর জন্য সে ব্যর্থপ্রেমের বিলাপ করিতে পাইতেছে না, ইহা বিধাতার অসীম অনুগ্রহ বলিতে হইবে। সামান্য কয়েকদিনের জন্য তাহার জীবনের রঙ্গমঞ্চের উপর আসিয়া খেলা করিয়া শ্রীমতী ছায়াচিত্রের মতো আবার সরিয়া গেল। শ্রীমতী তাহার কাছে মাত্র ক্ষণিকা, ক্ষণপ্রভা। অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন শ্রীমতীর জন্য বিলাপ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইত। সেদিন তাহার চক্ষে ছিল জীবনের অনন্ত আশা, অপরিমিত পরমায়ুর ক্ষুধা, উজ্জ্বল কামনা, অফুরন্ত প্রেম, জ্বলন্ত উদ্দীপনা। সে দিনগুলিও সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

রাত্রির শেষ প্রহরটিও তাহার অর্দ্ধনিমীলিত চোখ দুইটার উপর দিয়া ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল, দেখিতে-দেখিতে ভোরের বাতাস বহিতে সুরু করিল, বাগানের গাছগুলিতে নানাকণ্ঠে পাখী ডাকিতে লাগিল, রেলিঙয়ের পাশে রাস্তাটায় ঝাড়ুদারের ঝাড়ুব শব্দ সুরু হইল। জহরের বিনিদ্র চক্ষে ক্লান্তি ছিল না, পূর্ব্বদিগন্তের ঝাপ্সা আলোয় সে একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। এই দিকটায় তাহার বাল্যকালের স্মৃতি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ওই তাহাদের পাঁচিলঘেরা স্কুল; তাহার পাশে খেলিবার মাঠ, মাঠের গায়ে সেই দেবেন বসুদের শিবমন্দির, শিবমন্দির ছাড়াইয়া ওই দেখা যাইতেছে সেই পুরাতন বারোয়ারীতলা—সমস্ত আছে, শুধু সে নাই। উহাদের দিকে তাকাইবার অধিকারটুকু সে বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহার সঙ্গীরা কে কোথায় গিয়াছে তাহার সন্ধান নাই, কেহ বাঁচিয়া আছে, কেহ হয় ত বা নাই। শুধু যে তাহার জীবনের উপর দিয়া একটা যুগ চলিয়া গিয়াছে তাহা নয়, একটা জন্ম পার হইয়া গিয়াছে। পুরাতন কাহারও সহিত পথে-ঘাটে কোথাও দেখা হইয়া গেলে এখন আর কাহাকেও চিনিতে পারিবে না। মহাকালের ফুৎকারে সে আজ নিশ্চিহ্ন হারাইয়া গিয়াছে। নিয়তির সে ক্রীড়নক!

রাঙা সূর্য্যের আভায় সারা আকাশ যখন ছাইয়া গেল, সে তখন ধীরে-ধীরে বাগানের খোলা গেট দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

দিন দুই পরে আবার জহরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। দেখিলে মনে হইবে দুই দিনের সম্পূর্ণ ইতিহাসটা তাহার সর্বাঙ্গে বড়-বড় আঁচড় টানিয়া লেখা। সে যেন ফুরাইয়া ফতুর হইয়া গিয়াছে। কালবৈশাখীর মুখে পড়া সে যেন একখানা জাহাজ—বিশৃঙ্খল, চূর্ণ-বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত। একটা হিংস্র বন্য শ্বাপদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সে যেন এইমাত্র পলাইয়া আসিল।

কাঁসারীপাড়ার বাড়ীর দরজায় উঠিয়া স্বভাবতই সে কর্ত্তার বড়ছেলের চোখে পড়িয়া গেল। শনিবার বলিয়া লোকটা বোধ করি একটু সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া কহিল, 'আসুন, দুদিন যে আপনার দেখা নেই? কোথায় ছিলেন?' বলিয়া জহরের আপাদমস্তক সে একবার লক্ষ্য করিল।

এই অভাবনীয় এবং অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা পাইয়া জহর বিস্মিত হইল। কহিল, 'তালুকে গিছলাম নতুন প্রজা বসাতে, পথে ভারি কষ্ট গেছে। আচ্ছা, আমাদের ঝগড়াটা কি এর আগে মিট্মাট্ হয়ে গিয়েছিল?'

লোকটা হাসিয়া কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের আর কোনো নালিশ নেই, ঝগড়া রেখে কি লাভ বলুন না? আপনার স্ত্রী এসে সব মিট্মাট্ ক'রে গেছেন। তিনি বাস্তবিকই ভাল লোক।'

একটু থতমত খাইয়া জহর বলিল, 'হ্যাঁ, তাঁকে এক আত্মীয়ের বাড়ী রেখে বিশেষ দরকারে

আমি—কখন্ এসেছিলেন?'

'কাল সকালে। আপনার জন্য ঘরের চাবি আর একখানা চিঠি—দাঁড়ান সেগুলো এনে দিচ্ছি।'

'আর কিছু বলে গেছেন?'

'আজ্ঞে না। এসেছিলেন মোটরে, বিশেষ তাড়াতাড়ি ছিল কিনা তাঁর।'

চাবি লইয়া ঘর খুলিয়া জহর চিঠি পড়িল—খামে মোড়া চিঠি—

'প্রিয়,

তোমার দেখা পেলাম না, সম্ভবত ব্যস্ত আছো। চাবিটা আমার কাছে থেকে গিয়েছিলো, ক্ষমা করো। বিশেষ বিপদের সংবাদ পেয়ে আজই আমি বিমলদের ওখান থেকে চলে যাচ্ছি। তুমি চিঠি পেয়েই নিচের ঠিকানায় চলে আসবে, অন্যথা না হয়।

—শ্রীমতী'

অন্যথা হইল না, একটুমাত্র বিশ্রাম না করিয়াই ঘরে পুনরায় তালা বন্ধ করিয়া জহর ঠিকানা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। পুরা একদিন যখন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তখন কাছে পয়সা থাকিলে সে অন্তত এক পেয়ালা চা খাইয়াও লইতে পারিত। তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি করিয়া এখন আর যাইবারও বা এত কি প্রয়োজন? শ্রীমতীর বিপদ-আপদ নিশ্চয় কাটিয়া গিয়াছে, বিপদ কখনও সাহায্যের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে না। দুর্ভাগ্য আসে যুদ্ধ করিতে, বিপদ আসে লুণ্ঠন করিতে। অসতর্ক মুহূর্তে ডাকাতের মতো সে মানুষকে গুপ্তহত্যা করিয়া উধাও হইয়া যায়। শ্রীমতীর কাছে একেবারে না গেলেও আর বোধ হয় ক্ষতি ছিল না।

কিন্তু যাইবে না ভাবিয়াও সে খুঁজিতে-খুঁজিতে সারকুলার রোডের উপর একটা বড় বাগান-বাড়ীর ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিকানাটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বাড়ী ভুল করে নাই। তখন বেলা ছয়টা বাজে, পশ্চিমের আকাশটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। অতি সন্তর্পণে গেট পার হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে দারোয়ানকে দিয়া খবর পাঠাইল। দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া সে উদাসীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চোখ বুলাইতে লাগিল। ফটকওয়ালা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সে পছন্দ করে না। বাল্যকাল হইতে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের প্রতি তাহার একটি ভয়মিশ্রিত স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল, সে-বিতৃষ্ণা এখন ঔদাসীন্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই অবসরে সে একবার এই প্রাসাদখানির ঐশ্বর্যের পরিমাণটা দেখিয়া লইল। হ্যাঁ, বড়লোক বটে। ধনী ব্যক্তির ঐশ্বর্যই সে এতকাল দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখানে আসিয়া একটি দুর্লভ বস্তু প্রথমেই তাহার নজরে পড়িল, ইহাদের সুসঙ্গত এবং সুকুমার রুচিজ্ঞান। চারিদিকে তাকাইয়া জহর মনে-মনে প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

পর্দা তুলিয়া শ্রীমতী বাহিরে আসিল এবং আসিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, 'কাল যে এলে না?'

যেন একটি দীর্ঘ যুগ পরে চির-আরাধ্যা দেবীর দুর্লভ দর্শনলাভ ঘটিল। আবেগে অভিভূত হইয়া জহর বলিল, 'এইমাত্র গিয়েই তোমার চিঠি পেলাম। বিপদ-আপদ কেটে গেছে ত?'

'হ্যাঁ, ভেতরে এসো।'

শ্রীমতী যেন নূতন মানুষ বনিয়া গিয়াছে। গম্ভীর ও সংযতবাক।

কোথা হইতে যেন একটা ভয়ানক বাধা আসিয়া জহরের দুই পায়ে জড়ো হইল। সে কহিল, 'যাবো, কেউ নেই ভেতরে?'

'কথা কাটাকাটি ক'রো না।' বলিয়া সে আগে-আগে চলিল।

দোতলায় বড় একটা হল ঘরে ঢুকিয়া জহর নিজেই একটা গদি আঁটা চেয়ার আশ্রয় করিয়া

বসিল। বলিল, 'কি বিপদ তোমার গেল বল্‌বে?'

শ্রীমতী কোনও ভূমিকা না করিয়া কহিল, 'কাল বাবা মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন? কাল? তোমার বাবা জীবিত ছিলেন না কি?'

শ্রীমতী তাহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইল, তারপর কহিল, 'কাল, এর একটু আগে। মা গিয়েছেন ছোটবেলা জান্‌তে পারি নি, কাল জানলাম। বাবার সঙ্গে কাল মায়েরো মৃত্যু হয়েছে।' বলিয়া শ্রীমতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার কণ্ঠস্বরে সুদূর কারুণ্যে অকস্মাৎ এ-বাড়ীটার সমস্ত চেহারাটা যেন একটি মুহূর্ত্তেই জহরের চোখে বদ্‌লাইয়া গেল। শুধু এবাড়ীটাই নয়, মনে হইল এই নারীটির মতো একাকী অসহায় এবং ভাগ্যহত সংসারে বুঝি আর নাই। সে কহিল, 'মা-বাপ ত চিরদিন থাকে না শ্রীমতী! এ সংসারে নিত্যদিন—'

শ্রীমতী তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, 'কাল থেকে যে পরিমাণ সান্ত্বনা এবং সহানুভূতির উচ্ছ্বাস শুনলাম, তাতে একখানা মহাকাব্য তৈরী হয়ে যায়। তুমি অন্তত আর সান্ত্বনার কথা ব'লো না।'

জহর একটু আহত হইয়া নীরবে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ সজাগ হইয়া কহিল, 'আচ্ছা, এ বাড়ীতে কি মানুষ নেই?'

শ্রীমতী কহিল, 'না, বাবাই ছিলেন একা। চিরদিনই একা। মায়ের মৃত্যুর পর আর তিনি মানুষের জটলা সইতে পারতেন না। দুই বোন ছিলাম তাঁর দুই চক্ষু, পুত্র সন্তান ছিল না। আমরা বড় হলাম, বিয়ে হ'লো, কিন্তু বড় জামাইয়ের অমানুষিক জীবনযাত্রা দেখে তাঁর বুক ভেঙে গেল, আমাকে পর্য্যন্ত আর তিনি সইতে পারতেন না, আমারো ছিল প্রচণ্ড অভিমান। তিন বছর পরে কাল সে অভিমান আমার ভাঙলো।'

জহর কহিল, 'তুমি ত পিতৃ-পরিচয় কিছুই আমাকে আগে দাও নি? আজ আমি অবাক হচ্ছি যে—'

শ্রীমতী কহিল, 'পিতৃ-পরিচয় দেবার মতো বলেই তোমার কাছে চেপে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া সকলের চেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে আত্ম-পরিচয়, এই আমার ধারণা। যাক্, যেদিন আমি স্বামীকে ছেড়ে চলে গেলাম, সেইদিনই বাবার কানে খবর এসে পৌঁছলো এবং আজ আমার এই আনন্দ যে, তিনি আমাকে খোঁজাখুঁজি করবার জন্য লোকজন মোতায়েন করেন নি। তিনি জানতেন আমার কোন বিপদ নেই, তীরে একদিন আমার জাহাজ ভিড়বেই।'

'মৃত্যুর আগে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো, কতক্ষণ আগে?'

'দেখা হ'লো কিন্তু কথা হ'লো না। মস্তিষ্কে তাঁর পক্ষাঘাত হয়েছিল, দুদিন জ্ঞান হয় নি আর হ'লোও না। কিন্তু সেই মৃত্যুর কাছে বসে যে সংবাদ শুনলাম তাতে আমি একেবারে পাথর হয়ে গেলাম।' বলিয়া সে হলের বারান্দার বাহিরে সূর্য্যাস্ত-কালের আরক্তিম আকাশের দিকে তাহার ভাবাক্রান্ত কমল চক্ষু দুইটিকে একবার প্রসারিত করিয়া দিল, তারপর পুনরায় কহিল, 'অত্যন্ত স্থূল স্পষ্ট সংবাদটা আমার কানে এল, তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে তিনি উইল ক'রে গেছেন।'

জহর কহিল, 'সে ত তাঁর করবারই কথা। রমা অর্দ্ধেক পাবেন ত?'

'করবার কথা তাঁর একেবারেই নয়, রমাকেও তিনি একটি কপর্দ্দক দেন নি, কারণ তার স্বামীর আছে অজস্র অপরিমিত; অত বড় জমিদারী নদীয়া জেলায় তার মতো আর কারো নেই, কিন্তু সে কথা ত নয়—বাবার চিরদিনই আশা এই সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে তিনি জনসাধারণের কল্যাণে নামবেন—ইস্কুল হবে, হাসপাতাল, হবে, দরিদ্রের সেবার সুবিধা থাকবে, মেয়েদের অর্থকরী বিদ্যা শেখানো চল্‌বে—'

'এ-ইচ্ছা তাঁর গেল কেন?'

'যাবার কারণটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগচে। আমার নামে সমস্ত লিখে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে যে-চিঠি তিনি আমাকে লিখে রেখে গেছেন, সেখানা আজ সকালে রমা চলে যাবার পর তাঁর বাক্স থেকে পেলাম, সে-চিঠির বক্তব্য শুন্‌লে সমস্ত সমাজ সচকিত হয়ে উঠ্‌বে।'

জহর মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইল। সে কহিল, 'শুধু তোমাকেই বলি, মেয়ে যে তাঁর চরিত্রহীন স্বামীকে ত্যাগ ক'রে চলে গেছে এতে অপার আনন্দ, এই আনন্দই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল আমার নামে যথাসর্ব্বস্ব লিখে দেবার। তিনি বলে গেছেন, আমাকে শিক্ষা দেওয়া তাঁর ব্যর্থ হয় নি। বাবা ছিলেন গতির উপাসক, প্রগতির পূজারী। তাঁর কতকগুলা ধারণা ছিল, শুন্‌লে তোমরা হাসবে। তিনি বলতেন, যারা সত্যিকার শিক্ষিত মেয়ে, বাঙালীর ছেলেকে যেন তারা বিবাহ না করে। যারা শিক্ষিত ছেলে তারা যেন বাঙালীর মেয়েকে ঘরে না আনে। তিনি অধার্ম্মিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সকল ধর্ম্মত্যাগী। তাঁর সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, একদিন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হবে।'

জহর বলিল, 'কিন্তু সে ত আর হ'লো না।'

শ্রীমতী একটু ম্লান হাসি হাসিল। বলিল, 'সে জন্য মৃত্যুর সময় তিনি দুঃখ ক'রে যান নি। সমস্ত ভারই তিনি আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে গেছেন। চিঠিতে বলেছেন, আমি যে-পন্থায় চল্‌বো, তার উপরেই থাকবে তাঁর অকৃপণ আশীর্ব্বাদ। তিনি কোথাও আমাকে উপদেশ দিয়ে যান নি। পরলোকের পথে দাঁড়িয়ে আমার বিচার এবং বিবেচনা তিনি হাসিমুখে বিনা দ্বিধায় স্বীকার ক'রে নেবেন।' বলিতে-বলিতে তাহার দুইটি চক্ষে অশ্রুর রেখা ঘন হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া সে সুইচ্‌ টিপিয়া পাখাটা খুলিয়া দিয়া আসিল।

জহর বলিল, 'তোমার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কথা বললে না ত?'

শ্রীমতী খানিকক্ষণ কি-যেন চিন্তা করিল, তারপর কহিল, 'কেউ নেই, থাকলে তবু কিছু আশা করতে পারতাম। তাই ত ভাবচি, এর ভার বইবো কেমন ক'রে! এদের মাঝখানে আজ আমি বন্দী হলাম।'

'আচ্ছা ধর, এমন যদি হয়, তোমার স্বামী অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে এসে মার্জ্জনা চাইলেন— সংসারে এমন ত নিত্যই ঘটে—'

শ্রীমতী কহিল, 'তোমার কথার আওয়াজে মন হচ্ছে তুমি আমাকে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করছ, সে চেষ্টা ক'রো না। সে লোকটাকে তোমার চেয়ে আমি বেশি চিনি! আমি তোমাকে স্পষ্ট কথা হয় ত বলতে পারবো না, কিন্তু নিজের কাছে আমি অত্যন্ত স্পষ্ট।' বলিয়া সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পুনরায় কহিল, 'বলি খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, না তিন দিন থেকে হরিমটরই চল্‌চে? কি চেহারাই হয়েছে তোমার?'

জহর নিরুত্তরে শুধু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে হইল, এ মেয়ে যতই স্পষ্ট হউক, তার পক্ষে চেনা অত্যন্ত কঠিন। সে আর বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

একবার ভিতরে গিয়া মিনিট তিনেক পরে শ্রীমতী আবার ফিরিয়া আসিল। হলের মধ্যে ইতিমধ্যে একটু-একটু করিয়া অন্ধকার ঘন হইতেছিল, প্রথমেই সে ঘষা কাচের ডুম পরানো বড় আলোটা জ্বালিয়া দিল, তাহার উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন আলোটা ঘরের ছাদে প্রতিফলিত হইয়া সুস্নিগ্ধ দীপ্তিতে নিচে আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই অল্পক্ষণের জন্য যে নীরবতাটুকু এখানে বিরাজ করিতেছিল তাহা অকস্মাৎ বিদীর্ণ করিয়া দিয়া সে মুখের একটা শব্দ করিল, তারপর ঠোঁট উলটাইয়া জহরের কথার বিদ্রূপাত্মক নকল করিয়া কহিল, 'স্বামী অনুতপ্ত হয়ে এসে ক্ষমা চাইবেন!' উত্তেজিত হইয়া সে পুনরায় কহিল, 'তুমি জানো তার চরিত্রের মধ্যে কোথাও একবিন্দু ঐশ্বর্য্য নেই? অসৎকর্ম্ম করাই তার জন্মগত প্রবৃত্তি! মনের ভেতরটা তার অন্ধকূপ-বিষাক্ত পোকামাকড়ের বাসা! সে করে নি এমন পাপ নেই,

ভাবে নি এমন কুচিন্তা নেই, তার সান্নিধ্যে এলে তার সমস্ত চরিত্রটা থেকে একটা অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ বেরোয়। যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের সর্ব্বনাশ করাই তার রীতি, অন্যের কলঙ্ক প্রচার করাই তার পেশা, মেয়েদের অপমান করাই তাঁর ধর্ম্ম। অথচ সে দুর্দ্দান্ত নয়, জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তার বলিষ্ঠতা বা দৃঢ়তা নেই, সে অত্যন্ত কাপুরুষ। হ্যাঁ, কাপুরুষ, হীনচেতা, কুৎসিত। আমি সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য হতাম তখন, যখন দেখতাম এক পেট মদ খেয়েও সে মাতাল হ'তো না। নেশা করলেই যেন তার ভিতরের চরিত্রটা বাইরে ফুটে উঠ্‌তো; মনে হ'তো, লিকেলিকে কতগুলো বিষধর সাপ তার সর্বাঙ্গ থেকে বেরিয়ে আস্‌চে, চোখে তার ক্রূর দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল! মানুষকে মুখোমুখি খুন করবার সাহস তার হয় নি, কিন্তু বহুবার সে গুপ্তহত্যার সাহায্য করেছে।'

জহর বলিল, 'কিন্তু তাকেই ত তুমি বিয়ে করেছিলে?'

শ্রীমতী অকপটে কহিল, 'শুধু বিয়ে নয়, বিয়ের আগে তাকে ভালবেসেছিলাম! তোমাদের ভাষায় যাকে বলে প্রেম!'

'ভালবেসেছিলে? অথচ —'

'হ্যাঁ, ভালবেসেছিলাম। বাবা তাকে অপছন্দ করতেন, তাব সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠছে দেখে বিরক্ত হতেন, আভাস-ইঙ্গিতে বারণ করতেন, তবু তাকে আমি ভালবেসেছিলাম। এমন কিছু রূপবান্ সে নয়, কিন্তু কোথায় যেন তার একটা মোহ, চুম্বক শক্তি, আকর্ষণ। বড়-বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে যখন হেসে আলাপ করতো, আমি সংসার ভুলে যেতাম। তার চোখে, ইসারায় অদ্ভুত একটা মোহ। একবার কেউ তার সঙ্গে আলাপ করলে আর একবার তাকে ফিরে আসতেই হবে! সর্ব্বনাশা আকর্ষণে অন্ধ হয়ে আমি একটু-একটু ক'রে এগিয়ে গিয়েছিলাম।'

'একটুও সজাগ হও নি?'

বরাবরই সজাগ ছিলাম, আমার মোহও ছিল সজাগ। কিন্তু তার আলাপে এমন একটা ক্ষণস্থায়ী আন্তরিকতা থাকতো যে, আমি কোনোদিনই এড়াতে পারি নি। তাকে এড়ানো বড় কঠিন। বড় কঠিন।'

জহর চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতী পুনরায় কহিল, 'একদিন সে হঠাৎ বল্‌লে, আমাকে সে বিয়ে করবে। পাত্র হিসেবে সে মন্দ কি? যথেষ্ট অর্থ, সামাজিক প্রতিপত্তি, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, চেহারার দিক থেকেও নিতান্ত খেলো না। বাবার অসম্মতি লক্ষ্য করে, সে আমাকে অনুরোধ করলো, আমি যেন সব ব্যবস্থা করি। তাই-ই করলাম, বিয়ে হয়ে গেলো। মাথায় সিঁদুর পরে স্বামীর ঘর করতে গেলাম। কিন্তু একটি সপ্তাহ পার হ'লো না। সে মনে করলো, আমি তার করতলগত, সে হ'লো স্বেচ্ছাচারী। আমাব ঘুম ভাঙ্‌লো, চেয়ে দেখি, এ কোথায়? কার হাতে পড়লাম? এ যে জন্ম-চরিত্রহীন! এ শুধু মাতাল শুধু উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট নয়, এর রুচি প্রবৃত্তি জীবনযাত্রা সমস্তই যেমন কুৎসিত তেমনি জঘন্য। আশ্চর্য্য, সেদিন আমার ধারণা হ'লো, পুরুষের ঘরে না ঢুকলে পুরুষমানুষকে চেনা যায় না। সেদিন থেকে দীর্ঘ তিন বছর ধরে লোকটা আমার ঘৃণাই পেয়ে এল।'

জহর বলিল, 'কিন্তু এর মধ্যে আর-একটা কথা থেকে যায় শ্রীমতী।'

'তা জানি।' শ্রীমতী একটুখানি উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'বাইরের লোক চট্ করে সে কথাটা বিশ্বাস করবে না, এই বল্‌তে চাও ত? সে আমি জানি। যাই হোক, সে গল্প আজ তোমার না শুনলেও চল্‌বে। এসো, ও-ঘরে যাই!' বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। বাহিরে তখন রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে।

দুই-তিনটা দালান এবং ঘর পার হইয়া তাহারা আর একটা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। এটা বোধ করি খাবার ঘর। মাঝখানে অয়েলক্লথ মোড়া বড় একখানা বেঞ্চ পাতা। নিচে মেঝের উপর পাশাপাশি দুইখানি আসন। একখানি আসনের সম্মুখে শ্বেত-পাথরের থালায় নানাজাতীয় ফলমূল মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাজানো। জহরকে সেইখানে খাইতে বসাইয়া শ্রীমতী দরজার বাহিরে একবার তাকাইয়া ডাকিল, 'লখিয়া?'

ডাক শুনিয়াই একটি যুবতী মেয়ে ধীরে-ধীরে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি সুশ্রী, হিন্দুস্থানী ধরনের কাপড় পরা, হাতে দুগাছি সোনার বালা, ছোট কপালখানি জুড়িয়া তাহার বড় একটা উল্কি আঁকা। নতমুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই শ্রীমতী কহিল, 'আমার ত এসব কিছু খেতে নেই, অশৌচ— একটুখানি সরবৎ শুধু দে; আর এর জন্যে এক পেয়ালা চা।'

লখিয়া ঘাড় নাড়িয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল।

'কী, তোমার যে আর মাথা তোলবার সময় নেই; মাথা হেঁট ক'রে খেয়ে চলেচ্। বলি, মন ছুট্‌লো কোন্‌দিকে?'

জহর কহিল, 'ওই তোমার দোষ শ্রীমতী, এমন বেয়াড়া প্রশ্ন করো যে আমি দমে যাই। এত বড় বিপদ গেল, তোমার একটু পরিবর্ত্তন হ'লো না!'

'তাই নাকি? তোমার যে মাসির দরদ! মেয়েদের পরিবর্ত্তন বাইরে যে হয় না, হয় ভেতরে এটুকু বুঝি জেনে রাখো নি? দু-পাঁচদিন কান্নাকাটি ক'রে যারা শোক সাম্‌লে উঠে বসে, তাদের দলে আমি নাম লেখাই নে। চোখের কান্নাটাই তোমাদের চোখে বড়, তাই মৃত্যুর আসল চেহারাটা তোমরা বোঝ না। বাবার মৃত্যু কাল হয়েছে বটে কিন্তু আমার চোখে সে-মৃত্যু প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্ত্তের, যতদিন বাঁচ্‌বো সে মৃত্যু আমার পাশে-পাশে থাকবে, সে অভাব তোমরা বুঝবে না। আমার হাসিতে কান্নায় দুঃখে আনন্দে, এমন কি আমার ঠাট্টা-বিদ্রূপে পর্য্যন্ত সে মৃত্যু মিশিয়ে থাকবে। যাক্‌ সে কথা, সে হয় ত তোমার বোধের বাইরে।' বলিয়া শ্রীমতী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর একটি মুহূর্ত্তেই মুখের চেহারা বদ্‌লাইয়া হাসিয়া কহিল, 'একটি সুন্দরী মেয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো এবং ফরমাস শুনে চলে গেল, তার সম্বন্ধে তোমার কোনো কৌতূহল হ'লো না? তোমার মন ত পুরুষের মন!'

জহর বলিল, 'যদি হয়েই থাকে তবে সে অন্যায় কৌতূহল। পুরুষের মন বলে নিজের জাতকে বাঁচিয়ো না, তোমাদের কৌতূহল আরও তীব্র। আমরা সুন্দরী মেয়ে দেখলে নানা উদ্ভট কল্পনা করি, তোমরা সুন্দর পুরুষ দেখলে সে বিবাহিত কিনা জানবার চেষ্টা করো। আমাদের এটা স্বভাব, আর তোমাদের ওটা প্রকৃতি।'

একজন বুড়া চাকর একথালা খাবার লইয়া ঢুকিল এবং তাহারই পিছনে আবার আসিল সেই মেয়েটি, হাতে তাহার এক পেয়ালা গরম চা। মাথার ঘোমটা এবার সে আর-একটু টানিয়া দিয়াছে বটে কিন্তু জহর আর মুখ তুলিয়া তাকাইল না।

চা ও খাবার রাখিয়া দুইজনেই যখন বাহির হইয়া চলিয়া গেল শ্রীমতী তখন একটু হাসিয়া বলিল, 'ওর নাম লখিয়া।'

জহর বলিল, 'তা ত শুনলাম।'

'মেয়েটি বাল্য-বিধবা।'

'তাও ত দেখলাম।'

'ভারি শান্ত মেয়ে।'

'তাই মনে হ'লো বটে।'

শ্রীমতী কহিল, 'বাবা যখন লক্ষ্ণৌতে ছিলেন, ওর মা আমার মায়ের কাছে চাক্‌রি করতো, ওর বাপ ছিল না। মা-ও যখন ওর মারা গেল তখনো ও বড় হয় নি। বাবা ওকে নিয়ে মানুষ করতে লাগলেন। ঠিক সময় বিয়ে দেওয়া হ'লো, কিন্তু ভাগ্য মন্দ, অল্পদিনের মধ্যেই মাথার সিঁদুর মুছে লখিয়া ফিরে এল। সেই থেকেই এখানে রয়েছে। শুনলাম বাবা ওর আর-একবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। আহা, মেয়েটি ভারি চমৎকার। জাতে হিন্দুস্থানী, কিন্তু আচার-ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় সম্পূর্ণ বাঙালী। বাঙালী মেয়ের মতন কাপড় পরা সুরু করেছিল কিন্তু আমি মানা করেছি, ও বৈশিষ্ট্যটুকু থাকুক। রাতে ও আমার কাছে শোয়।' বলিয়া সে খাইতে বসিয়া গেল। খাওয়া শেষ

করিয়া চায়ের পেয়ালাটা কাছে লইয়া জহর বলিল, 'ওর চেয়েও আমার দুর্ভাগ্য, তার কারণ, মেয়েমানুষের ইতিহাস শুনতে-শুনতে আমার জীবনটা কাট্‌লো।'

শ্রীমতী কহিল, 'শুধু শুনেই এসেছ, ইতিহাস রচনা করবার শক্তি হয় নি।'

'না, সে-প্রবৃত্তি আমার কোনদিনই নেই।'

'নেই? দুলালচাঁদের সেদিনকার ইঙ্গিতটা আমি এখনো ভুলি নি মনে রেখো। অবশ্য ও-দিকটা দিয়ে তোমাকে বিচার করা চলে না, তোমার আর একটা পরিচয়ও রয়েচে।'

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং রাত যে ঠিক কত তাহাও জানা গেল না। খুব সম্ভবতঃ নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। এ-বাড়ীর সীমানা চারিদিকে এতই বিস্তৃত যে, পথের কলরবও আর শুনিবার উপায় নাই। ঝি চাকর বামুন দারোয়ান এবং বাহিরের অন্যান্য লোক—তাহারা যে কোথায় একান্তে আছে তাহা এখান হইতে বুঝিবার উপায় ছিল না। বিশাল পুরী যেমনি নিঃসঙ্গ তেমনি স্তব্ধ এবং জীবনচিহ্নহীন। মানুষের অভাবে ইহার সকল দিক নিরন্তর যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে।

বাহিরের অটল নীরবতার দিকে জহর একবার মাত্র তাকাইয়া কহিল, 'সে-পরিচয় আমার লজ্জা শ্রীমতী, সে আমার দৈন্য।'

'তা হোক, সেখানে ফাঁকি ত আর নেই! চল, এ-ঘর থেকে।'

'চল, অনেক রাত হ'লো।' একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জহর উঠিয়া দাঁড়াইল।

দালান পার হইয়া শুইবার ঘরের দরজার কাছে আসিয়া শ্রীমতী কহিল, 'ভেতরে এসো।'

জহর ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'আজ আর নয়, এর পর কথা কইতে বসলে ও-দিকে রাত পুইয়ে যাবে। আজ আমি যাই শ্রীমতী।'

শ্রীমতী বিস্মিত হইয়া কহিল, কোথায় যাবে এত রাতে?'

'কেন, বাসায়? কাঁসারীপাড়ায়?'

শ্রীমতী চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া হাসিয়া উঠিল—'সে বাসার বড়াই আর ক'দিন থাক্‌বে?'

'য'দিন থাকে।'

'ভারি ছেলেমানুষী তোমার! মরিয়া হয়ে ভবঘুরে হয়ে জীবন কাটাবারো একটা ধরণ আছে, তোমার তাও নেই!'

'তা নেই, তবু যেতে ত হবে।'

'যাবার জন্যে কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে শুনি?'

রাগ করিয়া জহর কহিল, 'তবে কি এখানে শেকড় নামাবো তুমি বল্‌তে চাও?'

'তাই ত বলতে চাই।' বলিয়া শ্রীমতী হাসিল। দালানের উজ্জ্বল আলোয় তাহার সুন্দর দাঁতগুলি পর্য্যন্ত একবার ঝক্‌-ঝক্‌ করিয়া উঠিল।

'একটা লোকলজ্জাও আছে শ্রীমতী?'

শ্রীমতী আবার হাসিয়া বলিল, 'লোকলজ্জা তোমাকে যেন চারিদিকে ঘিরে রয়েছে! এত রাতে আর ঢলাঢলি ক'রো না বাপু, আর সহ্য হয় না, কই যাও দেখি, কত বড় সাধ্যি তোমার?'

'তবে যা খুসী কর, এ তোমার ভয়ানক অত্যাচার। বলিয়া জহর তাহার পিছনে-পিছনে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

খাটের উপর পরিষ্কার বিছানাটা দেখাইয়া দিয়া শ্রীমতী বলিল, 'উঠে শুয়ে পড়। আমার দুঃসময়ে কত করেছ তুমি, আমায় একটু সেবা করতে দাও? বল, পা টিপে দেবো?'

জহর চটিয়া উঠিয়া কহিল, 'ছি শ্রীমতী!'

শ্রীমতী মুখ টিপিয়া হাসিল, তারপর পুনরায় কহিল, 'ভয় নেই, লখিয়াকে নিয়ে আমি পাশের ঘরেই আছি। সবুজ আলোটা জ্বেলে শুয়ো, ওই বোর্ড-সুইচ, দরকার হলে ডেকো।'

'না, দরকার আমার হবে না।'

'না হলেই ভালো। দাঁড়াও মশারিটা ফেলে দিয়ে যাই।' বলিয়া সে মশারিটা ফেলিয়া অতি যত্নে তাহার ধারগুলি গদির নিচে গুঁজিয়া দিতে লাগিল।

জহর বলিল, 'বাড়ীওয়ালা মাতাল হয়ে গাল দিয়েছিল, অন্যায় করে নি। এসব মাতলামি ছাড়া আর কি? ঘর দোর পড়ে রইলো, এক গাড়ী জিনিস-পত্তর, আমি রইলাম এখানে, সেখানে যদি তালা ভেঙ্গে সব চুরি হয়ে যায়?'

'কী সর্ব্বনাশ হবে বল ত?' শ্রীমতী একেবারে শিহরিয়া উঠিল।

তাহার গলায় আওয়াজ শুনিয়া জহর পুনরায় কহিল, 'না, ঠাট্টা নয় শ্রীমতী, একদিন ত সে সবের দরকার হয়েছিল! মনে রেখো সে-ঘর একদিন আমাদের আশ্রয় দিয়েছে।'

শ্রীমতী কহিল, 'অতীতকালের দিকে মুখ ফেরানো আমার স্বভাব নয়। সেদিন সে-ঘর আশ্রয় দিয়েছে, আজ দিচ্ছে এই ঘর। আমার কাছে এদের দাম একই। ঐশ্বর্য কিম্বা দারিদ্র্যের মধ্যে আমার মন একই অবস্থায় থাকে। আজ যদি আমার এ আশ্রয় যায় আমি একটু অসুবিধায় পড়বো কিন্তু দুঃখিত হবো না। কিন্তু সে আমার নিজের কথা। তুমি দেখছি অত্যন্ত মায়াবদ্ধ মানুষ, তুমি এগিয়ে চল্‌তে জানো বটে কিন্তু পেছনের টান্ তুমি ছাড়তে পারো না। কে আমাদের কী বলে গাল দিল তাও যেমন শুন্‌বে না, আমাদের কী ছিল আর কী নেই এ নিয়েও মাথা ঘামাবে না। যাকে ছেড়ে এসেছ তাকে যেতে দাও।'

জহব বলিল, 'তোমার অনেক আছে তুমি ছাড়তে পারো কিন্তু আমি ভাবচি সেখানে আছে আমাব কুড়ি-পঁচিশ দিনের রাতের বাসা। খাই বা না খাই, রাতে গিয়ে ঘুমোতে পারবো।'

দক্ষিণ দিকের দুইটি জানালা খুলিয়া শ্রীমতী একবার দাঁড়াইল। প্রথম শুক্লপক্ষের চাঁদ একটু আগে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অনেকদূরে বড় রাস্তার দুই-একটা আলো দেখা যাইতেছিল। নিচের বাগানের উপর দিয়া যে-বাতাস ভাসিয়া আসিয়া তাহাব মুখ-চোখ স্পর্শ করিয়া ভিতরে ঢুকিতেছিল, তাহাতে মনে হইল, নূতন বসন্তকালে তাহাদের মাঠ ফুলে-ফুলে ছাইয়া গিয়াছে। নানাবর্ণের ফুলের এক প্রকার সংমিশ্রিত অতি-মিষ্ট গন্ধ তাহার প্রতি নিশ্বাসে প্রবেশ করিয়া কেমন যেন বিহ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইয়া সে ধীরে-ধীরে নিজের হাতেই দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আজ অন্ধকার রাত্রে একাকী আলো জ্বালাইয়া এই ঐশ্বর্য্য ও বিলাসময় ঘরখানির মধ্যে বসিয়া জহরের আর-একবার মনে হইল, এ পৃথিবী সত্যই অত্যন্ত কৌতুকময়। গত পরশু এক কর্দ্দমাক্ত মাঠের ধারে শুইয়া এ পাশ ও পাশ করিয়া তাহার রাত্রি কাটিয়াছে, কাল সমস্ত দিন ধরিয়া কয়েকজন ছোক্‌রার নিকটে স্বাস্থ্য ও সংযম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছে, রাত্রি যাপন করিয়াছে গঙ্গার ধারে একটা পানের দোকানে, বুড়ী পানওয়ালীকে মা মা বলিয়া এবং অশ্রুবিগলিত ভক্তিতে তাহার পদসেবা করিয়া এবং প্রসাদ পাইয়া। আর আজ? দুগ্ধফেনভিত শয্যা, রসনা-তৃপ্তিকর প্রচুর আহার, অনাবিল আরাম, প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং সর্ব্বশেষ এইমাত্র একটি পরমাসুন্দরী নারী তাহার উপর অভিমান করিয়া মরালগ্রীবা বাঁকাইয়া চলিয়া গেল। চমৎকার! এ পৃথিবী এখনও অত্যন্ত হাস্যরসাত্মক ও কৌতুকময়! বাঃ—সুন্দর, অপরূপ!

৫

ঘুম ভাঙ্গিতেই সে দেখিল সকালের রৌদ্রে তাহার ঘর ভরিয়া গিয়াছে। প্রথমেই তাহার মনে হইল সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ঘণ্টা দুই আগে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, মাথাটা তখনও অনিদ্রায় ভারী হইয়া আছে। সবুজ আলোটা জ্বলিতেছিল, মশারির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আগে সে আলোটা নিভাইয়া

দিল। ঘরের একদিকে প্রকাণ্ড একখানা আয়নার ভিতরে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। গত তিন দিন হইতে নিজের এই বিসদৃশ বাউল-পরিচ্ছদের দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। সেদিনকার নূতন কাপড়-জামাগুলি শুধু অপরিষ্কারই হয় নাই, কোথায় কেমন করিয়া যে এগুলি ছিঁড়িয়া ফাটিয়া গিয়াছে তাহাও সে অনেক চেষ্টা করিয়া মনে করিতে পারিল না। ঘরের চারিদিকের বহুমূল্য আসবাবগুলির সঙ্গে তাহার এই পরিচ্ছদ এমনিই বেমানান হইয়া উঠিল যে, সে জানালা দিয়া মাঠে লাফাইয়া পড়িয়া পাঁচিল টপ্‌কাইয়া পলাইবার কৌশল খুঁজিতে লাগিল। সমস্ত ঘরখানা যেন তাহার দিকে তাকাইয়া বিদ্রূপ করিতেছে।

প্রথমেই তাহার রাগ হইল শ্রীমতীর উপর। এমন দুর্দ্দমনীয় মেয়ে সে কোথাও দেখে নাই। সম্ভবত বাল্যকালে পিতামাতার আদর পাইয়াছে, শিক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু শাসন পায় নাই। কাল রাত্রির অন্ধকারে চলিয়া গেলে আজ এমন ভাবে তাহাকে লজ্জায় পড়িতে হইত না। জহর ক্রুদ্ধ হইয়া একখানা চেয়ারে আসিয়া বসিল। এক বেলায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল কিন্তু পাশের ঘরে রাজরাণী বোধকরি এখনও নিদ্রিত, দাস-দাসীরা পদসেবা না করিলে বোধ করি তাহার ঘুম ভাঙিবে না! বাস্তবিক, এই ধনী লোকগুলার উপর সে কোনদিন খুসি হইতে পারিল না। ইহারা অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা এবং স্বেচ্ছাচার লইয়াই শুধু ঘর করে না, ইহাদের চরিত্রের কোনো সঙ্গতি নাই, জীবনে ইহারা বৈচিত্র্যহীন, দরিদ্রকে শোষণ করা ইহাদের নীতি, মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করা ইহাদের ধর্ম্ম—ইহাদের মতো ভয়ঙ্কর জীব সংসারে আর কেহ নাই। ইহারা অচল এবং জড়, কিন্তু সচল যখন হয় তখন আরও ভয়ানক। ইহাদের লোভের খোরাক যোগাইতে শ্রমিকেরা হয় ক্রীতদাস; ইহারা আফিং খাওয়াইয়া মানুষকে নির্জীব করিয়াছে, মদ খাওয়াইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, যন্ত্র বসাইয়া মানুষকে বিকল করিয়াছে। ইহারা কোথাও বাড়ীওয়ালা, কোথাও মনিব, কোথাও বড়বাবু, কোথাও বা হুজুর। সমাজের শাসনভার ইহারা লয় আপনার উদরপূর্ত্তির জন্য, রাজ্যের শাসনভার লয় প্রজা শোষণের জন্য। ইহাদের পুঁজি আত্মশ্লাঘা, কাজ আত্মপ্রচার। কি ভাগ্য, ধনীর সংখ্যা এদেশে অল্প, তাই এখনও বাস করা চলিতেছে।

চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া সে দরজাটা খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু বাহির হইতে পারিল না, মার্ব্বেল পাথরের দালানটা বিদ্রূপ করিয়া যেন হাসিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, সুমুখের বড় আয়নাটা সে চুরমার করিয়া ভাঙিয়া দেয়। রাগে তাহার সর্ব্বশরীর রি-রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

পায়ের শব্দ পাইয়া সে একবার পিছনে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, লখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের ভিতরেই আর একটা দরজা খুলিয়া দিতেছে। ও-দরজাটা এতক্ষণ সে লক্ষ্যই করে নাই, এবার দেখিল সেটা বাথ্‌-রুম্‌। একখানা সাবান ও তোয়ালে রাখিয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় লখিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'এবার আপনার চা এনে দেবো।'

'আনো।' বলিয়া সে সোজা বাথ্‌-রুমে্‌ গিয়া ঢুকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইয়া দেখিল, একখানা টিপয়ের উপর চায়ের সহিত প্রচুর প্রাতরাশ সাজানো, লখিয়া তাহাকে দেখিয়া একখানি চেয়ার তুলিয়া আনিয়া কাছে পাতিয়া দিল। বাস্তবিক, ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে আতিথ্য লইলে সুবিধা অনেক। জহর সানন্দে আসিয়া বসিয়া গেল। ইহারা খাইতে জানে বটে!

লখিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, এইবার কহিল, 'আপনি কি এখুনি স্নান করবেন দাদাবাবু?'

জহর মুখ ফিরাইতে পারিল না, একটু বিপন্ন হইয়াই কহিল, 'এই—একটু দেরি আছে।'

'আপনার কাপড়-চোপড় সমস্তই কল-ঘরে রেখে এসেছি।'

জিজ্ঞাসা করিতে বাধিলেও জহর এবার বলিয়া ফেলিল, 'তাঁর ঘুম কি এখনো ভাঙে নি?'

লখিয়া কহিল, 'দিদিমণির কথা বল্‌ছেন? তিনি ত নেই, ভোরবেলাতেই মোটরে ক'রে বেরিয়ে গেছেন।'

'কখন্ আসবেন?'

'সে কথা বলে যান্ নি।'

জহর আবার একটু রাগিয়া গেল। কহিল, 'স্নান ক'রে আমাকেও এখনি বেরিয়ে যেতে হবে।'

মাথা দোলাইয়া লখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'সে হবে না, দিদিমণি আপনাকে যেতে মানা ক'রে গেছেন।'

জহর একটু শ্লেষের হাসি হাসিল। কহিল, 'তাই নাকি। বাঃ, তুমি ত বেশ বাংলা বল্‌তে পারো লখিয়া? এখানে কত মাইনে পাও?'

লখিয়া কহিল, 'কিছুই না।'

'কিছুই না? সে কি, তোমার চলে কি ক'রে? ও, বুঝতে পেরেছি এরা বুঝি ভালমানুষ পেয়ে তোমাকে শোষণ করছে?'

'আমার ত কিছুই দরকাব নেই দাদাবাবু?'

'দরকার নেই? সে কি, আজ যদি তোমার চাকরি যায় তবে কি সম্বল নিয়ে দাঁড়াবে?'

লখিয়া অকপটে জবাব দিল, 'আমি ত এখানে চাক্‌রি করি নে, আমি এ-বাড়ীর মেয়ে।'

মেয়েটির সহিত আলাপ করিয়া জহর অতি আনন্দ পাইতেছিল, বলিল, এ ধারণা অবশ্য থাকা ভাল। তোমাকে এখানে কি করতে হয় লখিয়া?'

'বিশেষ কিছুই না, ঘুরে ঘুরেই ত বেড়াই!'

জহর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আচ্ছা লখিয়া, তুমি কি ক'রে বুঝলে তোমার দিদিমণিব মানা আমি শুন্‌বো?'

লখিয়া হাসিমুখে বলিল, 'ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আজ অবধি কেউ দিদিমণির অবাধ্য হতে পারে নি। উনি ত কখনো অন্যায় কবেন না, তাই ওঁর কথা সবাই এত মানে। এত বড়মানুষের মেয়ে তবু পরের জন্য উনি চিরদিন দুঃখ পেয়ে এসেচেন। এর জন্য, কত লাঞ্ছনা, কত কলঙ্ক— যারা ওঁকে জানে না—' তাহার উল্‌কি-কাটা সুশ্রী মুখখানি দেখিতে-দেখিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিতে লাগিল, 'তারাই ভুল বুঝে ওঁকে অসম্মান করে, নিন্দে রটায়।'

জহর বলিল, 'এবার তোমাকে বুঝলাম। ওঁর অধীনে তুমি আছো, তুমি ত একথা বলবেই লখিয়া?' বলিয়া শেষ চুমুক দিয়া চায়ের পেয়ালাটা সে নামাইয়া রাখিল।

লখিয়া কিন্তু এবারেও বিনীত হাসি হাসিল। বলিল, 'আমাকে দমাতে পারবেন না ঠকাতেও পারবেন না। আপনি যদি এর চেয়েও কড়া কথা বলেন তা হ'লেও আমার অপমান হবে না দাদাবাবু।'

জহর মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইল। আঘাত খাইয়া লখিয়ার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু নির্ম্মল হাসির রেখা তাহার মুখের উপর হইতে কখনও সরিয়া যায় নাই। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

আমি ঝি নই, আমি দিদিমণির ছোট বোন।' বলিয়া লখিয়া আর দাঁড়াইল না, সমস্ত আঘাতগুলি যেন হাসিয়া ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

স্থাণুর মতো জহর নীরবে সেখানে বসিয়া রহিল। শুধু যে তাহার চলিয়া যাইবার উৎসাহই চলিয়া গিয়াছে তাহা নয়, তাহার নড়িবারও শক্তি ছিল না।

জানালা হইতে রৌদ্র সরিয়া গেল, বাহিরের বাতাস গরম হইয়া উঠিল, কেবল সূর্য্যের তরল কিরণে বসন্তকালের সুদূর আকাশটা তাহার অপলক দৃষ্টির সম্মুখে ঝক্-মক্ করিতে লাগিল। অলস মন্থর দিন। এই দীর্ঘ দিন লইয়া সে কি করিবে? গাছের শুকনো পাতা খসিয়া নূতন কিশলয় জন্মিতেছে, মুখে কুটি লইয়া এক-একটা পাখী এ-দিকে ও-দিকে ছুটাছুটি করিতেছে, জানালার নিচে বিস্তৃত সবুজ মাঠের গাছগুলি ফুলে-ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উদাসীন সে, তাহার কোন কাজ নাই। আজ বহুদিন পরে একটি অপরিচিত বেদনায় ভিতরটা তাহার টন্-টন্ করিয়া উঠিল। মনে হইল, তাহার

প্রতিদিনের দিন-যাপনের আড়ালে ভিতরে আর-একটা তৃষ্ণার্ত্ত মানুষ যে হা-হা করিতেছে, ইহাবে সে ভুলিয়া থাকে কেমন করিয়া? সে ত আপন প্রাপ্য বুঝিয়া পায় নাই।

অনেকক্ষণ বসিয়া-বসিয়া সে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমতী এখনও আসিয়া পৌঁছিল না, সে এবার স্নান করিয়া লইবে। দরজার বাহিরে আসিতেই দালানের একপ্রান্তে কল-ঘরটা দেখিতে পাইয়া সে সেইদিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। মাঝে গোটা-তিনেক বড় বড় ঘব পার হইতে হয়, শেষের ঘরটির কাছে আসিয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। সাড়া দিয়া বলিল, 'এইটি বুঝি তোমার ঘর লখিয়া? বাঃ, বেশ সাজানো-গোছানো দেখছি, এই ঘরে থাকো? বই-টইগুলো কে পড়ে? তুমি নাকি?'

লখিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া কহিল, 'ওসব আমার পড়া হয়ে গেছে, ওগুলো ইস্কুলের বই।'

'ইস্কুলের? তুমি কি এখন কলেজে পড় নাকি?'

'হ্যাঁ, গেল বছরে ভর্ত্তি হয়েছি।'

'বেশ, বেশ, বড় খুসী হলাম শুনে।' বলিয়া জহর সোজা কল-ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া স্নান করিয়া সে বাহির হইতেই সুমুখে দাঁড়াইয়া শ্রীমতী হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'বাঃ, এ যে একেবারে রাজবেশ! লখিয়া যেতে দেয় নি ত, কেমন জব্দ?'

জহর বলিল, 'শুনলাম তুমি বারণ ক'রে গেছ?'

'আমি? আমি কেন বারণ করবো? আমি কাউকে বাধা দিই নে।'

'এ মন্দ নয়, লখিয়া দেয় তোমার দোহাই, তুমি দাও লখিয়ার দোহাই। মাঝ থেকে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ—'

ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া লখিয়াও মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

জহর কহিল, 'তোমাকে যতটা বোকা আর শান্ত মনে হয়েছিল, তুমি ত তা নও লখিয়া? ডাল-রুটির সঙ্গে ঝোল-ভাতের তফাতই এই। যাই হোক, বুঝলে শ্রীমতী, সকাল-বেলা কোন কাজ ত ছিল না, বসে-বসে তোমার বিরুদ্ধে লখিয়াকে উত্তেজিত করলাম, নিন্দা করলাম, ধনী বলে গাল দিলাম কিন্তু লখিয়া তোমার নুন খায় বটে! মন্তর-টন্তর তুমি কিছু জানো। শেষকালে লখিয়ার ওপর চট্‌লাম, ঝি বললাম, বললাম তোমার চাকরি যাবে, এরা তোমাকে ঠকাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না, মুখের ওপর হেসে দিয়ে চলে গেল।'

শ্রীমতীর পিঠের পাশে মুখ লুকাইয়া লখিয়া হাসিতেছিল, শ্রীমতী কহিল, 'দাদাবাবুকে তোব কেমন লাগ্‌লো রে?'

লখিয়া বলিল, 'আর একবার আলাপ ক'রে বল্‌তে পারি।'

জহর এবং শ্রীমতী উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিল। শ্রীমতী কহিল, 'এতখানি সময় পেলি, চিন্‌লি নে?'

'কেমন ক'রে চিনবো, একটা দিক যে এখনো জানা হয় নি! তোমার কথা না তুল্‌লে আমি কাউকেই চিন্‌তে পারি নে দিদিমণি।'

কথাটা হাস্যকর সন্দেহ নাই, কিন্তু একটিমাত্র ছত্রের ভিতর দিয়া যে-ভঙ্গীতে এই হিন্দুস্থানী মেয়েটি তাহার দিদিমণির সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। লখিয়া মানুকে মুগ্ধ করিবার যাদু জানে।

শ্রীমতী কহিল, 'মুখপুড়ি, যা দূর হ।' বলিয়া আর কোনোদিকে না তাকাইয়া সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। লখিয়াও হাসিতে হাসিতে ঢুকিল অন্য ঘরে।

জহর ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। এটি শ্রীমতীর শয়ন-কক্ষ। আসবাবপত্রের আড়ম্বর নাই, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। একদিকে গোটা-চারেক পাথরের প্রতিমূর্ত্তি, তাহাদেরই মাঝখানে ব্রোঞ্জ্‌-এর বুদ্ধমূর্ত্তি। জানালার ধারে একটা মেহগনির ষ্ট্যাণ্ড-এর উপর বড় একটি স্ফটিকাধারের মধ্যে কয়েকটি রঙ-

বেরঙের মাছ জলের মধ্যে খেলা করিতেছে। পাশাপাশি সাজানো কয়েকটা আলমারির মধ্যে বই ঠাসা।

একবার চারিদিকে তাকাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় বেরিয়েছিলে?'

একখানা কৌচেব উপর দেহ ভাঙিযা শ্রীমতী কাৎ হইয়া পড়িযাছিল। বলিল, 'কতকগুলো কাজ সেরে এলাম, সরকারমশাই একা পারেন না। শোনো বলি, বসো, কাঁসারীপাড়ার বাসা উঠিয়ে দিযে এলাম, কী হবে রেখে?'

'জিনিসপত্রগুলো?'

'এমন কিছুই ছিল না, বিলিয়ে দিতে বলে এলাম।'

জহব চিন্তিত হইয়া কহিল, 'এটা কিন্তু ভাল দেখাবে না শ্রীমতী।'

'কোন্‌টা?'

'তুমি আমার সকল দিক বন্ধ ক'রে একটা দিক খুলে দিতে চাইছ। মনে হচ্ছে তুমি আব চাও না যে, আমি এ-বাড়ী থেকে যাই।'

শ্রীমতী কহিল. 'কেনই বা যাবে এখান থেকে? পা বাড়ালেই তুমি ত মরুভূমিতে গিয়ে পড়বে?'

জহব বলিল, 'পৃথিবীতে সকলের জন্যই ত গাছের ছাযা আব সবোবরের জল নেই, তার জন্য দুঃখ ক'বে লাভ কী! তবু আমি জানি, এ-পৃথিবী মরুভূমি নয়, মরুভূমি যদি থাকে ত সে আমারই মনে।'

কিযৎক্ষণ নীবব থাকিয়া শ্রীমতী কহিল, 'তুমি এখানে থাকতে চাও না?'

'না শ্রীমতী। এ ভুল তুমি আমাকে ক'বো না যে, তোমাব সঙ্গে এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস ক'বে আমি সব ভুলে যাবো। এমন যদি হয় যে এইজন্যই আমি অপেক্ষা কবেছিলাম তবে সে-লজ্জা থেকে আমাকে বাঁচাও শ্রীমতী। জগতে সকলেব চেযে বড পাপ আত্ম-প্রবঞ্চনা। কামিনী আর কাঞ্চন হলেই যে-জাতেব দুঃখটা ঘোচে, সে-জাতের দুঃখ আমার নয়।'

শ্রীমতী কহিল, 'কাঞ্চনটা না-হয বুঝলাম কিন্তু কামিনীটা কি আমি?'

'হাঁ, তুমি, একথা বল্‌তে আমার বাধা নেই। তোমার মধ্যে যে রসরূপ, তা আমায় নিশ্চিন্ত করবে, মুগ্ধ কববে, সে আমি চাই নে।'

'এ সব কি তুমি চাও না?'

'চাই, ভয়ানক চাই, কিন্তু এবা হচ্ছে মানুষকে অকর্ম্মণ্য করার অস্ত্র। বুকের ভেতরটা আমার কাঙাল, উপবাসী, কিন্তু খাবার সন্ধান পেলেই তাকে ছুট্‌তে দিই নে, অমনি রাশ টেনে ধরি। মানুষের সঙ্গে আমি মিশি অতি সন্তর্পণে, ভযে-ভযে, আল্গা হয়ে, পাছে আমার আসল রূপটা তাদের কাছে ধরা পড়ে। আমার সে-রূপ অতিরিক্ত লোভী, ক্ষুধাতুর দীন ও দরিদ্র। আমার চরিত্রে বিহ্বলতা নেই শ্রীমতী।'

শ্রীমতী কহিল, 'সেইজন্যেই তোমার দুঃখের পরিমাণ এত। নিজেকে ভাসিয়ে দিতে গেলে যে বিস্তৃত হৃদয়ের দরকার তা তোমার নেই। মনে-মনে তোমার কেবলই দ্বন্দ্ব। এ-দিকে যাবো, না ও দিকে যাবো? ভালবাসবো, কি বাসবো না; ছেড়ে দেবো, না ধরে রাখবো; সর্ব্বস্বান্ত হবো, না সর্ব্বগ্রাস করবো; সমস্যা নিয়েই কেবল তোমার বিপদ। বাঁচতে তোমাব রুচি নেই, অথচ মরবারও নামে ভয় পাও; ভগবানকে মানো না অথচ দুর্ভাগ্য এলে আকাশের দিকে তাকাও; ভূত বিশ্বাস করো না কিন্তু অন্ধকারে গা ছম্‌-ছম্‌ করে; ভালবাসার জন্যে ছুটে বেড়াও অথচ ভালবাসার ওপরে শ্রদ্ধা নেই—সংসারে তোমার চেয়ে দরিদ্র আর কেউ নয়। তুমি বেখাপ্পা, বেপরোয়া, বেলয়। তুমি উচ্ছৃঙ্খল নও, ছন্নছাড়াও নও, তুমি একটি আস্ত অনৈক্য। তুমি বীরও নও, বিদ্রোহী নও, তুমি বিধাতার বাঁকামুখের বিদ্রূপ!'

জহর মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল, এবার মুখ তুলিয়া কহিল, 'থাক্ আর গাল

দিয়ো না।'

শ্রীমতী কহিল, 'এ ত গাল নয়, এ তোমার সমালোচনা।'

'সমালোচনাই বটে, একেবারে আধুনিক সমালোচনা। প্রতিপাদ্য বিষয় ছেড়ে ব্যক্তিগত গালাগালিই এর লক্ষ্য।'

এমনি সময়টায় দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া লখিয়া বলিল, 'দিদিমণি, এবার খাবার দিতে বল্‌বো?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি ভাই লখিয়া। চল, ওঠো, বেলা হয়ে গেছে। খেয়ে-দেয়ে নাও, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।' বলিয়া শ্রীমতী নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জহরও উঠিল।

মহা সমারোহে শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হইয়া গেল। দিন-তিনেক ধরিয়া বিলাসপুরী মানুষের সমাগমে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রাদ্ধের পরে একে-একে বিদায় লইবার পর আবার চারিদিক স্তিমিত হইয়া আসিল।

কাজকর্ম্মের কয়েকদিন জহর আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে কিন্তু মাঝখানে আসে নাই, ভিড়ের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ানো তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। একবারেই সে চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু শ্রীমতী তাহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হয় নাই। জহরকে সে লখিয়ার মাষ্টার নিযুক্ত করিয়াছে, লখিয়া ছাত্রীর মত ছাত্রী। শ্রীমতী তাহাকে মাহিনা দিতে অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু জহর জানাইয়াছিল, বিনা বেতনে সে মাষ্টারী করিবে না। পরিশ্রমের বিনিময়ে পয়সা দিবে না, একথা একমাত্র শ্রীমতীব মতো ব্যবসাদার মহাজনই বলিতে পারে। বেশ ত, পয়সা লইয়া ফাঁকি দিতে না পারি, কাজকর্ম্ম তুমি বুঝিয়া লইয়ো! কিন্তু এ-কয়েকদিনের জন্য আমাকে ছুটি দিতে হইবে।

শ্রীমতী তাহাকে ছুটি দিয়াছিল। ছুটি ফুরাইলে জহর আবার লখিয়াকে পড়াইতে আসিল। এমন অনুগত, ভদ্র, সুশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ছাত্রী পাওয়া যে-কোনো শিক্ষকের পক্ষে সৌভাগ্য। সকালে একঘণ্টা এবং রাত্রে একঘণ্টা, এই পড়ানো। এ-বাড়ীতে জহরের আলাদা ঘর, আলাদা বাথ্-রুম্ এবং বারান্দা, শ্রীমতী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে—একেবারে একটা পৃথক ফ্ল্যাট্। তাহার সমস্ত খরচ মাসিক মাহিনা হইতেই কুলাইয়া যায়, এমন'কি বাসাভাড়া পর্য্যন্ত। সে বলিয়াছে, শ্রীমতীর কোনো অনুগ্রহ সে লইবে না।

অনুগ্রহ সে লইবে না এবং ইহাও জানাইয়া দিয়াছে বিনা নোটিশে সে যে-কোনোদিন এ চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিবে। চাকরি সে জীবনে বহুবার করিয়াছে এবং ছাড়িবার সময় বিনা নোটিশেই ছাড়িয়া দিয়াছে। অর্থের প্রয়োজন তাহাকে কোনদিনই বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

এ-বাড়ীতে জহরের স্থান অনেক উঁচুতে। মাষ্টারসাব্ বলিয়া তাহার পরিচয়। ফটকে ঢুকিতে এবং বাহির হইতে বন্দুকধারী গুর্খা-সিপাহী সৈনিকের কায়দায় কুর্নিশ, দরোয়ানের সেলাম, দাসদাসীর যুক্তকর, সরকার মহাশয়ের আন্তরিক সম্মান—সমস্ত মিলিয়া তাহাকে একটি বিশেষ উচ্চাসনে বসাইয়াছে। প্রত্যূষে এবং সন্ধ্যায় এক ফিরিঙ্গী ড্রাইভার মোটরে করিয়া তাহাকে মাঠে হাওয়া খাওয়াইয়া আনে, এ-গাড়ীখানি শ্রীমতীর বড় প্রিয়। দেখিয়া শুনিয়া এবং অখণ্ড বিলাসে গা ভাসাইয়া জহর একটি চমৎকার কৌতুক বোধ করে।

'আমার কাছে বৈষয়িক পরামর্শ চেয়ো না শ্রীমতী ও আমি বুঝি নে। তুমি এ-বাড়ীটাকে মেয়েদের হাসপাতাল না কি যেন করবার চেষ্টা করছ শুন্‌তে পাই?' একদিন সে বলিয়া বসিল।

শ্রীমতী হাসিয়া বলিল, 'জনশ্রুতি এই রকম।'

'তা বেশ, স্ত্রীলোকের হাতে সম্পত্তি এলে একটু-আধটু স্বেচ্ছাচার হয়ই। তবু কি ধরণের হাসপাতালটা হবে শুনি?'

'শুধু ত হাসপাতাল নয়, ও-বাড়ীটা হবে মেয়েদের ইস্কুল, দক্ষিণ দিকের বাড়ীটা হবে তাদের বোর্ডিং আর আশ্রম।'

'তবে আর মন্দিরের দিকটা খালি পড়ে থাকে কেন?'

'খালি থাকবে না, ওখানে তাঁত বস্‌বে, চরকা চল্‌বে, মেয়েদের অর্থকরী কাজকর্ম্ম হবে।'

'তাই ত, এত বড় সম্পত্তিটা এমনি করে জাহান্নমে যাবে?'

শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, 'আমিও তাই ভাবচি। এ ছাড়া এ-সব নিয়ে কী-ই বা করা যায়! যাক গে।'

'দানের মতো বিড়ম্বনা সংসারে আর কিছু নেই।' জহর বলিল, 'তার চেয়েও বিড়ম্বনা জনসাধারণের উপকারার্থে দান করা। কিন্তু এতদিনে তোমার এই পরিচয় পেয়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেল শ্রীমতী, তুমি একটা নগণ্য পরোপকারী ছাড়া আর কিছুই নও মেনে হচ্ছে।'

শ্রীমতী কহিল, 'কি করবো, এ আমার শাস্তি, তুমি কি বল ভোগের মধ্যে ডুবে থাকতে?'

জহর তাড়াতাড়ি কহিল, 'আধ্যাত্মিক আলোচনা থাক্, ও আমার সয় না। আমি বল্‌চি, তোমার আর কোন পথ খোলা নেই?'

'আমার সকল পথ খোলা আছে, কিন্তু এ-সম্পত্তির নেই। ঐশ্বর্য্য অনেকটা জলস্তম্ভের মতো। জীবন সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছোটে, ছুট্‌তে-ছুট্‌তে এক জায়গায় চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে।'

'বুঝলাম, কিন্তু তার গতি ত তোমার হাতে?'

'সে তোমাদের ভুল। ঐশ্বর্য্যের উপলক্ষমাত্র হচ্ছে তার মালিক। তার হাতে রাশ থাকে না, ঐশ্বর্য্য নিজের পরিণতি নিজেই সৃষ্টি করে, সে কিছুতেই স্থায়ী নয়, একদিন টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে চাবিদিকে ছড়িয়ে পড়বেই। এই তার নিয়ম।'

'আবার তোমার কথা অধ্যাত্মবাদ ঘেঁষে চলেছে। দোহাই তোমার, রসের আলোচনায় তত্ত্ব এনো না।'

শ্রীমতী হাসিল, 'রসও একটা তত্ত্ব, তবে এই সুবিধে যে সেটা রসতত্ত্ব।'

জহর তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া প্রথমে হাসিমুখে তাহার দিকে তাকাইল। তারপর বলিল, 'তাও না-হয় বুঝলাম, তবু একটা কথা থেকেই যায়, তোমার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে?'

শ্রীমতী কহিল, 'অত্যন্ত স্পষ্ট, পাঁচ বছরের ছেলেও বুঝতে পারে। দম দিয়ে যখন মেসিন্‌টা চল্‌তে থাক্‌বে আমি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো?'

'তা ত দেখবে, কিন্তু তোমার ইহকাল পরকাল?'

শ্রীমতী পুনরায় হাসিয়া কহিল, 'পরকালের ব্যবস্থাটা ত হয়েই গেল! যেটা এ-জগতের বড় প্রিয়, বাকি থাকে ইহকাল, সেটা ত তুচ্ছ।'

জহর বলিল, 'তুচ্ছ কিন্তু তাচ্ছিল্যের নয়। পেটে চাই অন্ন, আর পেট ঢাকতে চাই বস্ত্র, তার কি?'

শ্রীমতী হাসিয়া যুক্তকরে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে উপর দিকে তাকাইয়া কহিল, 'ভক্তকে রাখেন ভগবান!'

'আজকাল উলটো কথা, ভক্ত রাখে ভগবানকে। দেখ্‌ছ ত, পৃথিবী জুড়ে ভগবানকে বয়কট্ চল্‌চে, তাঁর সৃষ্টির বিরুদ্ধে চল্‌চে পিকেটিং, তাঁর একছত্র আধিপত্য প্রায় শেষ হয়ে এল, সভ্য সমাজে আর তাঁর স্থান নেই।'

শ্রীমতী রাগ করিয়া কহিল, 'তুমি কি বল্‌তে চাও যাদের জন্য এত করবো, তারা একমুঠো খেতে-পরতেও দেবে না?'

'না, কারণ তারা জন-সাধারণ, তাদের মধ্যে মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। জন-সাধারণ উপকার পেয়ে এমনিই আচ্ছন্ন থাকবে যে তোমার দিকে তাকাবার সময়ই তাদের হবে না। জন-সাধারণ

শুধু অকৃতজ্ঞই নয়, তারা বিশ্বাসঘাতক, আজকে তাদের জন্য তুমি যত বড় ত্যাগই কর না কেন, একদিন তোমার সামান্য ক্রটির জন্য তারা তোমাকে টেনে পাঁকের মধ্যে ফেলতে দ্বিধা করবে না। তাদের শ্রদ্ধাও যেমন সুলভ, অশ্রদ্ধাও তেমনি সহজলভ্য।'

শ্রীমতী কহিল, 'বেশ, যদি ঝি-গিরি করি তা হ'লেও ত—?'

'হ্যাঁ তাই বল। সেইখানেই তোমার সম্মান। পরিশ্রমের বদলে পয়সা, সে পয়সায় তোমার জীবিকা। এবার বল ত, তোমার এই বিরাট ত্যাগটা কাদের জন্য হবে?'

'বিরাট বলে ঠাট্টা ক'রো না, এ ত্যাগ ন্যায়-সঙ্গত। আমার যা কিছু হবে সমস্তই মেয়েদের জন্য।'

'মেয়েদের জন্য? মানে?'

শ্রীমতী কহিল, 'মানে স্ত্রীলোকেদের জন্য, অর্থাৎ যারা পুরুষ নয়।'

মুখের একটা শব্দ করিয়া জহর কহিল, 'নিজেদের দিকে এত ক'রে ঝোল-টানার আব্দার কেন?'

'এ আব্দার নয়, ভুল বুঝো না, এ হচ্ছে বিচার।'

'বিচারই বটে, কাজীর বিচার। মেয়েদের মাথায় ক'রে নাচা এখনকার নেশা! পুরুষরা তোমার কী করেছে শ্রীমতী যে, তারা তোমার সহানুভূতি হারালো?'

'পুরুষের কথা পুরুষেরা ভাবুক, আমি মেয়েমানুষ। আজ সব কাজ ফেলে মেয়েদের উন্নতির দিকটা দেখা দরকার।'

'মেয়েদের উন্নতি মানে তোমার সভা-সমিতি, পুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার, বড়বাজারে পিকেটিং, জেলে গিয়ে স্ত্রীলোকত্বের সুবিধে নেওয়া—কোন্‌টা?'

শ্রীমতী কহিল, 'তা নয়, তাদের বাঁচতে শেখানো। তাদের বলা যে তোমবা শুধু মেয়েমানুষ নয়, তোমরা মানুষ। আমাব কাজ তাদের নিয়ে যারা আলো দেখে নি, যারা আশাহীন, যাদের সকল স্বপ্ন, সব কামনা নষ্ট হয়ে গেছে।'

জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। শ্রীমতী কহিল, 'এমন মনে ক'রো না যে, আমি ছাঁচ তৈরী ক'রে স্বাধীন জেনানা তৈরী করবো। আমি এমন মেয়ে চাই নে যারা মাথার চুল পুরুষের মতো ছাঁটে, মুখে পাউডার ঘসে সিনেমায় ছোটে। আমি সে-সব মেয়ে চাই নে যারা সভায় দাঁড়িয়ে তোমাদের গাল দেয়, কাগজে লিখে মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল হতে বলে, একটা আন্দোলন সৃষ্টি ক'রে উদ্দেশ্যহীন পথে দৌড়ায়। সে-সব মেয়ে আমি চাই নে। মেয়েদের আন্দোলনটা যারা সমাজের দিকে না ফিরিয়ে রাজনীতির দিকে ফেরাতে চাইছে, তারা এদেশের মেয়েদের বোঝে না। মেয়েদের চরিত্রের দৃঢ়তাই আমার স্বপ্ন! তাদের জন্যই আমি সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেবো যাদের শরীরে স্বাস্থ্য নেই, নিশ্বাসের বাতাস নেই, শিক্ষার আলো নেই। পরিবারের অত্যাচার সয়েও যাদের মুখ ফোটে না, দারিদ্র্যে যারা শীর্ণ, অপমানে যারা নতমুখ, যাদের চারিদিকে সমাজ আর শাস্ত্রের শতকোটি বাঁধন, হৃদয়ের মূল্য যাদের কেউ স্বীকার করে না, রোগে শোকে দুঃখে চিরদিন যারা অসহায়—আমার কাজ তাদের নিয়ে।'

'তাদের দেখা তুমি কোথায় পাবে?'

'তারাই ত আছে দেশ ছেয়ে। তারা মরে যক্ষ্মায়, তারা মরে স্বামীর লাথির তলায়। তাদের বিয়ের পাত্র জোটে না, পেটে অন্ন জোটে না, পরণে জোটে না কাপড়। চোখে ঠুলি বেঁধে তারা সংসারে ঘানি ঘোরায়, তারপর একদিন কোথা দিয়ে চলে যায় তাদের স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন, তেজ, তারা হয় ক্রীতদাসী। আজ এই অগণ্য ক্রীতদাসীর কান্নায় দেশ ভরে উঠেছে। এদের মধ্যে আনতে হবে সংযম, দৃঢ়তা, উঁচু আদর্শ, জ্ঞান, চরিত্রের দীপ্তি। তাদের মরণ আর আমি সইতে পারি নে।' বলিয়া শ্রীমতী থামিয়া ভারাক্রান্ত চক্ষে বাহিরের দিকে তাকাইল।

জহর একবার তাহার বক্তৃতাকে বিদ্রূপ করিতে গিয়াও চুপ করিয়া গেল। শ্রীমতীর কণ্ঠে যে আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে আর ব্যঙ্গ করা চলে না। সে আস্তে আস্তে ডাকিল, 'শোনো?'

শ্রীমতী মুখ ফিরাইল। জহর বলিল, 'আজ বেশ লাগলো তোমাকে, চল একটু বেড়িয়ে আসি।'

'চল, এ-বেলা আমার কোনো কাজ নেই। দাঁড়াও গাড়ীখানা আন্‌তে বলি।' বলিয়া সে বাহিরে মোটরখানাকে প্রস্তুত হইতে বলিতে গেল।

মোটরে চড়িয়া সেদিন দুইজনে অনেকদূর পর্য্যন্ত বেড়াইতে-বেড়াইতে চলিল। বার-কয়েক গড়ের মাঠটাকে পরিক্রম করিয়া তাহারা চলিল দক্ষিণ দিকে। ফিরিঙ্গি ড্রাইভার তাহার অভ্যাস মতো ঠিক পথেই গাড়ী চালাইতেছিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই সময় স্নিগ্ধ হাওয়া এই দিকটায় প্রচুর। অত্যন্ত আরাম বোধ হইতেছিল। জহর একসময় হাসিয়া বলিল, 'এরকম মোটরে তা আমার চড়বার কথা নয়, চাপা যাবার কথা।'

শ্রীমতীও হাসিয়া জবাব দিল,'চাপা যাও নি এতদিন, বোধহয় এই মোটরখানায় চড়বার জন্যই। দুঃখ ক'রো না, কল্‌কাতা শহর, চাই কি একদিন সে ভাগ্য হতেও পারে।

'তা বটে।'

টালিগঞ্জ ঘুরিয়া একটা সরু রাস্তা দিয়া তাহারা লেক্-এর ভিতর আসিয়া ঢুকিল। মোটর খানিকদূর পর্য্যন্ত যাইতেই শ্রীমতী ইঙ্গিত করিয়া গাড়ী থামাইল। লোকজনের ভিড় এ সময়টা একটু বেশি, অনেকে এই ফিরিঙ্গী ড্রাইভারযুক্ত মির্নাভা-কারের মধ্যে বাঙালী দুইটি সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক-যুবতীর দিকে হাঁ করিয়া তাকাইতে লাগিল। বাস্তবিক, রূপের গর্ব্ব ইহারা করিতে পারে বটে। অমর্ত্ত্যলোকবাসী যেন কোন্ দেবতার ইহারা দুইটি সন্তান। একটি প্রৌঢ়া মহিলা ও-দিক দিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আহা বেঁচে থাক্ আশীর্ব্বাদ করি।

শ্রীমতী গাড়ী হইতে নামিয়া ঈষৎ হাসিমুখে কহিল, 'চল একটু ও দিকে যাই, এ-দিকে বড় লোকজন।'

দুইজনে বেড়াইতে-বেড়াইতে চলিল। দূরে জঙ্গলের ও-পারে তখনও সূর্য্যাস্তকালের আকাশটা রাঙা হইয়াছিল, তাহারই রক্তাভা মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হইয়া নিচে সুদীর্ঘ জলাশয়ের উপর নামিয়া আসিয়াছে। নিকটে বোধ করি ছোট একখানি গ্রাম, তাহারই উপর দিয়া একটা রেলপথ চলিয়া গিয়াছে, দক্ষিণ দিকে গাড়ী যায়।

কিছুদূর হাঁটিতে-হাঁটিতে আসিয়া মানুষের সমাগম হইতে খানিকটা দূরে এক জায়গায় জলের ধারে তাহারা বসিয়া পড়িল। পূর্ব্বদিক হইতে তখন সন্ধ্যার অল্প-অল্প অন্ধকার অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সুমুখে পরিষ্কার জল ছল্-ছল্ করিতেছিল, শ্রীমতী জুতা খুলিয়া তাহার সুন্দর সুকোমল দুইখানি পা জলে ডুবাইয়া দিল। নিকটেই কয়েকখানি ঘাসের ডগার উপর একটা ফড়িং উড়িয়া-উড়িয়া বেড়াইতেছে। শ্রীমতী কহিল, 'আচ্ছা এ ফড়িংটার ঘর কোথায় বলো ত?'

জহর বলিল, 'তোমার উপযুক্ত প্রশ্ন বটে। কি ভাগ্যি জিজ্ঞেস কর নি, ওই যে কাকটা উড়ে যাচ্ছে, ওর আত্মীয়স্বজন কুশলে আছে কি না?'

শ্রীমতী নির্ম্মল হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া কহিল, 'অথচ এমনিই আমার মন। আমার জানলার ধারে একটা দেবদারু গাছ আছে দেখেচ ত? তার অন্ধকার কোলে যখন সকালের আলো এসে পড়ে, আমি আর থাকতে পারি নে—কী যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে আমার মন, ইচ্ছে হয় ছুটে কোথাও চলে যাই।'

জহর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, 'তারপর বলিল, 'জলের ওপর থেকে পা তুলে নাও শ্রীমতী, কিছু কামড়াতে পারে।'

শ্রীমতী পা তুলিয়া লইল।

'আচ্ছা শ্রীমতী?' বলিয়া জহর তাহার একটি হাত ধরিয়া কহিল, 'আচ্ছা বলো ত, তুমি

তখন যা বললে সে কি তোমার মনের কথা?'

শ্রীমতী কহিল, 'সংসারে তুমি কি কিছু বিশ্বাস করতে আসো নি?'

'না, সব কিছুর মধ্যেই আমার একটা সন্দেহ থেকে যায়। ভয়ানক সন্দেহ, ভয়ানক দ্বন্দ্ব। কিন্তু তোমাকে এক-একবার যে আমার কী ভালই লাগে, কী যে আনন্দ পাই তোমার পাশে এলে তা আমি বোঝাতে পারি নে।'

'সে আমি বুঝতে পারি।'

'বুঝতে তুমি পারো না শ্রীমতী, আমি তোমার সঙ্গে অন্য কথা বলি, অন্য আলোচনা করি, তোমাকে বার-বার আঘাত ক'রে বসি, কিন্তু তুমি বুঝতে পারো না, তোমার কাছাকাছি এলে কী আমার হয়! আজ তোমার চারিদিকে অনেক মানুষ, অনেক জটলা, তারই একান্তে আমি থাকি তোমার কাছে, তোমার কাছে থাকাটা আমার যেন তপস্যা, আমার সকলের চেয়ে বড় কাজ। সেদিন তোমার এক টুকরো নিশ্বাস যখন আমার গায়ে লাগ্‌লো, আমার ভেতরে চারদিকে যেন বাঁশী বেজে উঠ্‌লো, চীৎকার ক'রে বলে উঠলাম, আমার জীবনেরো দাম আছে, ওরে, আমাকেও বাঁচতে হবে।' বলিয়া সে নিজের কোঁচার খুঁট্‌ লইয়া শ্রীমতীর পা দুইখানি আস্তে আস্তে মুছাইয়া দিতে লাগিল। আবেগে তাহার হাতখানা কাঁপিতেছিল।

শ্রীমতী হাসিল, কহিল, 'কি ভাগ্যি আমার, আজ হঠাৎ পায়ে হাত দিচ্ছ যে?'

'জল মোছ নি পাযেব, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।'

'আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। গায়ে হাত না দিয়ে যারা মেয়েদের আগে পায়ে হাত দেয়, তারা বেশি চালাক। চুপি চুপি বলে রাখি, মেয়েরা যেন না শোনে, আমাদের মুগ্ধ করার সকলের চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, আগে আমাদের পায়ে হাত দেওয়া।' বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

'তাই নাকি?' জহর হাসিয়া কহিল, 'এ ত জানা ছিল না?'

শ্রীমতী বলিল, 'মেয়েদের মন যে! যেখানে কড়া বাঁধন সেইখানেই তার ফাঁস-আল্গা!'

আকাশের কোলে-কোলে ঘনায়মান অন্ধকার আবছায়া অন্ধকার চারিদিকে নামিয়া আসিতেছিল। দূরে-দূরে এক-একটা গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বসন্তকালের সন্ধ্যা, পাশের জঙ্গল হইতে অখ্যাতনামা ফুলের মুখচোরা মিষ্ট গন্ধ থাকিয়া-থাকিয়া একটি ভীরু আবেদন জানাইয়া যাইতেছিল।

ইহারা পরস্পর পরস্পরকে একান্ত করিয়া ভালবাসিয়াছে একথা বলিলে কোথায় যেন একটা মিথ্যা থাকিয়া যাইবে। অথচ তাহাদের এই নিবিড় বন্ধুত্বের অন্তরালে রহিয়াছে একটি দুরতিক্রম্য ব্যবধান। সেখানে তাহারা উভয়েই একা। এত কাছাকাছি আসিয়াও এত দূরে থাকা বোধ করি ইহাদের মতো নরনারীর পক্ষেই সম্ভব। জীবনে কোনো ক্ষেত্রেই যাহাদের কোনো বন্ধন নাই, তাদের ভালবাসার অর্থ কী?

উঠিবার ইচ্ছা তাহাদের কাহারো দেখা গেল না। একজনের হাত আর একজনের হাতের ভিতর জড়ানো রহিল, একজন অন্যজনের গায়ের উপর গা হেলাইয়া স্থির হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল। আকাশে একটি-একটি করিয়া তারা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, নিষ্প্রভ সপ্তমীর চন্দ্র উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। চিরন্তন পুরুষ চিরন্তন নারীর পাশে বসিয়া যুগে-যুগে যেমন করিয়া আনন্দ ও বিষাদের মুহূর্ত্তগুলি যাপন করিয়াছে, আজিকার এই নরনারীর পাশাপাশি বসিয়া থাকার চিত্রটি যেন তাহারই অনুরূপ।

প্রথমে জহরই কথা কহিল। বলিল, 'আমি তোমার কথাই ভাবচি শ্রীমতী।'

শ্রীমতীর ধ্যানভঙ্গ হইল। বলিল, 'কি আশ্চর্য্য, আমিও যে ভাবচি তোমার কথা?'

'না, ঠাট্টা নয় শ্রীমতী। তোমার কথাই কেবল আমি ভাবচি। তুমি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যাবে তাতে আমার দুঃখ নেই; আমি ভাবচি, তার পরে কি? পরোপকারের নেশা যখন কাটবে নিজের দারিদ্র্যই যে তখন বড় হয়ে উঠ্‌বে। তখন তাকে সামলাবে কি দিয়ে?'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, শুধু ত জীবনটাই তোমার হাতে নেই, আর একটা বোঝা রয়েছে তোমার পিঠে। সে বোঝাটা যৌবনের। জীবনের একটা বিলিব্যবস্থা করা সহজ, না-হয় ঝি-গিরিই ক'রে কাটালে, কিন্তু যৌবনের? তাকে ত আর ধাপ্পা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে না?'

শ্রীমতী কহিল, তুমি কি বলতে চাইছ স্পষ্ট ক'রে বল, সাহিত্য ক'রে ব'লো না। তোমার কথার মানে সংসার পাতা? আর একবার বিয়ে করা? কী?'

জহর একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, 'তা বলি নি, আমি বলচি ছোটবেলা থেকে তুমি কি এই স্বপ্নই দেখে এসেছ যে, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে?'

শ্রীমতী কহিল, 'এই কথা? মিথ্যে বল্‌বো না, সে স্বপ্ন দেখলে আমি ধন্যই হতাম, হয় ত আমাকে দিয়ে আমার বিধাতা বড় কাজই করাতেন, কিন্তু মেয়েমানুষের মন, সংসারের বড় আদর্শ সে হয় ত ভাবতে পারে, বড় জীবনের আদর্শ তার কল্পনায় আসে না। ছোটবেলা থেকে আমি দেখেছিলাম অন্য স্বপ্ন।'

'স্বপ্ন তা হ'লে তোমার একটা কিছু ছিল?'

'ছিল, একটা অত্যন্ত সাধারণ স্বপ্ন, তার কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না।'

'কী সে? বল্‌বে?'

শ্রীমতী কহিল, 'না। তাকে প্রকাশ করতে গেলে সে হয় ত মিথ্যে হয়ে যাবে। তবু এইটুকু জেনে রাখো, আমি যে আজ সর্ব্বস্বান্ত হতে যাচ্ছি সে শুধু অবস্থার দায়ে। পরের জন্য সর্ব্বত্যাগী হওয়া হয় ত দরিদ্র-নারায়ণের পুজো হতে পারে, কিন্তু সে আমার আবাল্যের স্বপ্ন নয়।'

জহর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার একটা হাতের উপর চাপ দিয়া কহিল, 'তাই বল শ্রীমতী, তাই বল। বাঁচলাম। তোমাকে বুঝতে পেরে আমি বাঁচলাম। মানব-প্রীতির সুলভ উচ্ছ্বাসে যে তুমি আত্মহারা হও নি, তোমার মন যে অত্যন্ত সচেতন, এই জেনে আমি বাঁচলাম।'

শ্রীমতী কহিল, 'হ্যাঁ, অত্যন্ত সচেতন আমার মন, ঠিক সচেতন বললেও হয় ত ভুল হবে, স্পর্শাতুর। আমার মনকে যদি কেউ ছোঁয়, আমার নেশা লাগে। অথচ ছোটবেলা থেকে এই মন নিয়ে আমি বড় হয়ে উঠলাম। মনের খোরাক যোগাতে যখন বেরিয়ে পড়তাম, বাবার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য আমায় বেঁধে রাখতে পারতো না। ছুটতে-ছুটতে হয়রাণ হলাম কিন্তু আজো আশা আমার ভাঙলো না। এখনো সে গাঁয়ের পথে ছুটচে, যে-পথে গিয়ে মিশেছে কপোতাক্ষী, নদীর তীরে, চারিদিকে তার নীলফুল অপরাজিতার বন, যেখানে কাঠমল্লিকা আর রজনীগন্ধা গলাগলি ক'রে রয়েছে—'

'সেখানে? সেখানে তোমার কি শ্রীমতী?'

'সেখানেই ত আমার ঘর। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, আমার আনন্দ সেইখানে। সেখানে অশান্তি নেই, মানুষের জটলা নেই, জীবনের কোনো সংগ্রাম নেই—নিভৃত। নিভৃত আর নির্জ্জন। মেয়েদের মনে কত উদ্ভট কল্পনা থাকে, নানা বিষয়বুদ্ধিতে মন তাদের ভারাক্রান্ত, কিন্তু আমি ছিলাম স্পষ্ট। আমি চেয়েছিলাম সুন্দর আশ্রয়, ছোট্ট সংসার, সহজ জীবন। মালতী-লতায় আমার ঘরের চাল ছাওয়া থাকবে, আগড়ে থাকবে একটি হরিণের ছানা, উঠানে থাকবে তুলসীতলা, পথে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে পাবো নদী, কলসী নিয়ে নদীতে নাইতে যাবো, গলা জলে দাঁড়িয়ে শুন্‌বো নদীর জলে মাঝির সারিগান।

'তারপর?'

শ্রীমতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 'তারপর, তোমাকে বল্‌তে লজ্জা নেই, মনের মতো একটি পুরুষ, সে-পুরুষ হবে বন্য, বর্ব্বর, অশিক্ষিত, সরল, কিন্তু সে হবে মনের মতো। আমাদের ভালবাসা হবে অন্ধ, অজ্ঞান; অকৃত্রিম। আমাদের বাইরে সমাজ নেই, সভ্যতা নেই, ধর্ম্ম নেই। কোথায় হবে যুদ্ধবিগ্রহ, কারা করলো রাজ্যজয়, যন্ত্রজগতের কোলাহল, সমাজের আন্দোলন, কোথায় হ'লো

জাহাজডুবি, কারা ভাসলো দক্ষিণমেরুর পথে—তাদের কোন সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে না। নিরালায় আমাদের ঘর, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, অকুণ্ঠ প্রেম, সুন্দর স্বপ্ন।'

জহর কহিল, 'এ ত তোমার কবিত্ব শ্রীমতী?'

শ্রীমতী কহিল, 'তা হতে পারে। মানুষের যে কোন সুন্দর কামনাই কবিত্ব, এতে লজ্জার কিছু নেই।'

'এ কামনা কি তোমার এখনো আছে?'

'চিরদিন থাকবে, চিরদিন। এক বিনাশ হবে আমার মৃত্যুর সঙ্গে।'

'এ আশা তোমার মরীচিকা। যত ছুটবে ততই দূরে সরে যাবে।'

শ্রীমতী কহিল, 'অথচ মরীচিকা নয়, বিধাতার কাছে এ-ভিক্ষা আমার অতি সামান্য। এই সেদিনো মানুষের মতো মানুষ হবার একটা বড় লোভ আমার ছিল, জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে মহত্ত্বে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠবো, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আকাশকে স্পর্শ করবো—কিন্তু কেন? মানুষের উচ্চ আশার পাশেই যে থাকে একটা ভয়ানক যুদ্ধ, কেন সে যুদ্ধে আমি লিপ্ত হবো? আমি মেয়েমানুষ। আমার সব চেয়ে বড় কাজ যে, সুন্দর জীবন সৃষ্টি করা!'

দুইজনের কেহই এতক্ষণ দেখে নাই, কোমল, করুণ জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। যাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়াইতেছিল তাহারা ইতিমধ্যে কখন্ যে-যাহার চলিয়া গিয়াছে। সুমুখে জলের ভিতর চন্দ্র প্রতিফলিত হইয়া তাহাদের দুইজনেরই মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমতীর খোঁপাটা ভাঙিয়া জহরের কোলের ভিতর একাকার হইয়া পড়িয়াছে। নরম আঙ্গুলগুলি দিয়া অন্যমনস্ক হইয়া সে একটা হাত লইয়া দোলা দিতেছিল।

অনেক দেরীতে তাহাদের চমক ভাঙিল—হ্যাঁ, তখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। অপ্রতিভ হইয়া আত্মসম্বরণ করিবার সময়ও তখন অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তবু শ্রীমতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল, 'তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, দেখ ত খোঁপাটা আমার এলিয়ে দিয়েছ?'

জহর বলিল, 'মেয়েদের খোঁপার ওপর আমাদের বড় রাগ!'

দুই হাত তুলিয়া শ্রীমতী চুলটা আবার ফিরাইয়া লইল, তারপর হঠাৎ জহরকে একটু ঠেলিয়া দিয়া কহিল, 'তোমাব জন্যে আমিও লজ্জা-সরমের মাথা খেলাম, ভাগ্যি এ-দিকে কেউ নেই?'

'নেই কে বললে? হয়ত্ত কলেজের ছাত্র-টাত্র কেউ লুকিয়ে দেখছে!'

'ছি ছি, চল ওঠো, ও-দিকে যে রাত পুইয়ে গেল!' বলিয়া শ্রীমতী পায়ে জুতাটা পরিতে লাগিল। দিগন্ত জুড়িয়া জ্যোৎস্নাময়ী সুন্দর বসন্তরাত্রি তাহাদের পথের দিকে হাসিমুখে তাকাইয়া রহিল।

ইহার পর একটি মাস চলিয়া গিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলে এক মাসেরও বেশি হইবে। এ-বাড়ীতে লোকজনের আনাগোনা নিত্য-নিয়মিত চলিতেছে। ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসীয়ার, কন্ট্রাকটর এবং বহু ব্যবসায়ী আপন-আপন কাজের ভার লইয়া যাতায়াত করিতেছেন। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আসিতেছে, বাহিরে বড় একটা আপিস বসিয়াছে। সংবাদপত্রগুলিতে শ্রীমতীর ত্যাগের কথা বড়-বড় হরপে ছাপা হইতে লাগিল, প্রচার কার্য্য চলিতে লাগিল। সমুদ্রপারে বিদেশে ভারি-ভারি অর্ডার চলিয়া গিয়াছে।

এ-দিকে স্কুল বসিবে শুনিয়া ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর নিকট হইতে আবেদনপত্র আসিয়া জমিতে লাগিল, মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ নানা প্রস্তাব পাঠাইলেন। বোর্ডিংয়ের বনিয়াদ বসিল, তাহার সঙ্গে বসিল আর একটি আপিস এবং সর্ব্বশেষে ইতিমধ্যেই জনকয়েক বেকার লোকের বেশ একটা উপায় হইয়া গেল।

উপায় হইল না শুধু জহরের। বিধাতা তাহাকে সুবিধাবাদী করিয়া পাঠান নাই। বুদ্ধিমান

ও বিচক্ষণ হইলে সে শ্রীমতীর মতো নির্ব্বোধ মেয়েকে ভাঙাইয়া চিরজীবনের মতো বেশ কিছু গুছাইয়া লইতে পারিত, কিন্তু হতভাগার মন সেদিক দিয়াই গেল না, ফাঁকা কতকগুলা বাজে তত্ত্ব লইয়া সে উচ্ছন্ন গেল। শুধ তাহাই নয়, একমাসের মাষ্টারীর মাহিনা লইয়া সে যে সেই এ-বাড়ী হইতে উধাও হইয়াছে, আর দেখা নাই। কোথায় সে গেল, কেন গেল, কবে ফিরিয়া আসিবে, কাহারও উপর তাহার অভিমান হইল কিনা কিছুই বলিয়া যায় নাই, হয় ত দুলালচাঁদের মতো বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া আবার হয় ত কোন্ মাসীর ওখানে সিন্দুর লইতে গিয়াছে। নরাধম, অভদ্র, ইতর। এক সপ্তাহ গেল, দুই সপ্তাহ গেল—কিন্তু কোথায় সে? হয় ত জুয়া খেলিয়া দিন কাটাইতেছে, হয় ত কোন্ সন্ন্যাসীর আশ্রমে বসিয়া, আশ্চর্য্য কিছুই নয়—গাঁজা টানিতেছে, নয় ত কোনো বস্তির ভিতরে ঢুকিয়া পোটো আর ভিখারীদের ভিতর কলহ বাধাইয়া দিয়াছে। কী কদর্য্য তাহার রুচি, কী ঘৃণ্য তাহার জীবন! কোথাও বিবাগী হইয়া চলিয়া যায় নাই ত?

শ্রীমতী তাহার অজস্র ব্যস্ততার মধ্যে তাহার পথের দিকে তাকাইয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এতগুলি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত আলোকপ্রাপ্ত লোক লইয়াই তাহার কারবার কিন্তু ইহাদের কাহারও ভিতর সেই জীর্ণবেশ ছন্নছাড়া ও বিষয়বুদ্ধিহীন মানুষটিকে সে খুঁজিয়া পাইল না। ইহারা সবাই তাহাকে শ্রদ্ধা জানায়, প্রশংসা করে, সন্তুষ্ট করে, কুশল প্রশ্ন করিয়া তাহাকে খুসী করে, তাহার ফরমাস খাটে, কাগজে-কাগজে তাহার ছবি ছাপিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া, তাহাব বাণী প্রকাশ করিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন কবে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই দয়া-মায়াহীন অকরুণ মানুষটি নাই। ইহাদের সম্মিলিত স্তব-স্তুতির ভিতর সেই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বাজিয়া উঠে না, নির্ম্মম ব্যঙ্গের আঘাতে সে ছিন্নভিন্ন হয় না, অকুণ্ঠ সমালোচনার কশাঘাতে তাহার হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগে না। ইহাদের সবাই তাহাকে ভালবাসে, স্নেহ করে, পূজা করে, তাহার কাছে আবেদন, নিবেদন, প্রার্থনা, ভিক্ষা জানায়, কিন্তু এমন একজন মানুষ ইহাদের মধ্যে দুর্লভ, যে তাহাকে ভালবাসে নাই, যে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে, প্রয়োজন হইলে ঘৃণা করিয়াছে, সুন্দরী রমণী বলিয়া যে-মানুষটি কোথাও তাহাকে কোন বিশেষ সুবিধা দেয় নাই। আজ তাহার চারিদিকে যে অসংখ্য নরনারীর ভীড় লাগিয়া গিয়াছে, ইহারা সকলে একই মক্ষিকা, একই জাত, একই রূপ ইহাদের, ইহাদের কণ্ঠে-কণ্ঠে একই গুঞ্জনধ্বনি!

প্রতীক্ষা—প্রতিদিন দীর্ঘ দিন ধরিয়া প্রতীক্ষা! এত কাজ, এত আনাগোনা, এত ঘোরাঘুরি, তবু সময় কাটে না। কোথায় যেন শ্রীমতীর মধ্যে একটি মানুষ উপবাস করিয়া উপুড় হইয়া অভিমানে পড়িয়া আছে। প্রতীক্ষা, যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা! সেই বিপুল জীবনের স্পর্শ কোথাও নাই, তাহার পাশে থাকার সেই তীব্র আনন্দ, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা কোথাও নাই, সেই ঘাত-প্রতিঘাতের দুরন্ত উল্লাস, বক্ষরক্তধারার ব্যাকুল আন্দোলন, সে উদ্দাম অনুভূতি কোথাও নাই। এ যেন সমস্তটাই জলমিশ্রিত, কৃত্রিম, স্যাঁতসেঁতে, রং-চটা, বাজে, ইহাদের সবাই যেন আধমরা, ক্ষীণজীবি, দুর্ব্বল, ফাঁকা!

প্রতীক্ষা—প্রতি ক্ষণের, প্রতি পলের, প্রতি মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা! আবেগ-উদ্বেলিত বিদীর্ণ বক্ষের প্রতীক্ষা। ক্লান্ত, ক্লান্ত সে। বড় ক্লান্ত। বড় অবসন্ন। ক্লান্ত দিন, ক্লান্ত রাত। সূর্য্য ক্লান্ত, ক্লান্ত আকাশের তারকার ক্ষীণালোক। বড় ক্লান্ত!

প্রেম? প্রেম নয়, প্রয়োজন! তাহাকে বড় প্রয়োজন। আকাশকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া পিষিয়া ফেলিলে সে প্রয়োজন মিটিবে না। দিনের উজ্জ্বল আলোক, রাত্রির কোমল অন্ধকার দুই অঞ্জলি ভরিয়া নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেও সে প্রয়োজন ফুরাইবে না। সৃষ্টি যাক্ রসাতলে, প্রলয় হইয়া সমস্ত চুরমার হউক, ইহকাল-পরকাল যাক্, ইস্কুল-হাসপাতাল জাহান্নামে যাক্—তাহাকে আজ বড় প্রয়োজন। প্রেম? প্রেম নয়, প্রয়োজন।

অবশেষে একদিন জহর ফিরিয়া আসিল।

'এলেন দাদা এতদিন পরে? কোথায় ছিলেন বলুন ত? এ কী হয়েছে আপনার? এ কি

চেহারা? ঘরে আসুন।' বলিয়া লখিয়া তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া আসিল। তারপর বলিল, 'দিদিমণিকে না-হয় ভুলে থাকতে পারলেন, কিন্তু ছোটবোনকে? ছাত্রীকে? আপনি বড় নির্দ্দয়!'

জহর হাসিয়া তাহার চিবুকটি ধরিয়া নাড়িয়া দিল, কথা কহিল না।

অপরাহ্ণ বেলা। শ্রীমতী তাহার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। লখিয়া জহরকে ধরিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল। বলিল, 'চা না খেলে মুখ দিয়ে আপনার কথা বার করা কঠিন। দাঁড়ান।' বলিয়া দ্রুতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

কেহ কোথাও নাই, একবার একাকী পাইয়া মৃদু-কঠিন কণ্ঠে শ্রীমতী প্রশ্ন করিল, 'কোথায় থাকা হয়েছিল এতদিন?'

জহর কথা কহিল না।

'অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হচ্ছিল বুঝি? বোধ হয় অনেক গেল?'

কি যেন বলিতে জহর আসিয়াছিল কিন্তু শ্রীমতীর এই বিদ্রূপে তাহার হঠাৎ রাগ চড়িয়া গেল। বলিল, 'হ্যাঁ, অনেক গেল।'

শ্রীমতী কহিল, 'সে আমি জানি। দুলালচাঁদরা ভাল আছে ত? কত টাকা জেতা হ'লো জুয়া খেলে?'

তাহার কণ্ঠস্বরে ক্রুদ্ধ হইয়া জহর কহিল, 'সে হিসেব তোমাকে দিতে আসি নি।'

'তবে এলে কি মতলবে? বড়লোকের বাড়ীতে ঢুকে শরীরটা আবার সারিয়ে নিতে?'

'কী করিতে আসিয়া কী হইয়া গেল। অত্যন্ত শ্রান্ত, তবু হঠাৎ কলহ করিবার একটা উদ্দাম প্রবৃত্তিকে জহর আর সংযত করিতে পারিল না। নিতান্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া অভদ্র তিক্তকণ্ঠে উত্তর দিল, 'সে ছাড়া আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল, এই তোমারই সম্বন্ধে, কিন্তু সে-রুচি আমার আর নেই।'

'নেই কেন? পেট ভরা আছে?'

'হ্যাঁ, সেইটা তোমাকে জানাতে এলাম। না এলেও পারতাম, এসে দেখি তোমার ত দিব্যি একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এত সোরগোল, এত হৈ-চৈ, এতগুলো ভক্ত, আমাকে ত এখন ছেড়ে দেওয়া সহজ! তবু বলে যাই, রেখে-ঢেকে খেয়ো শ্রীমতী, তোমার যে-রকম হাঁকাই, হয় ত উদরাময় হতে পারে।'

শ্রীমতীর মুখখানা অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। একটা পায়ের উপর আর একটা পা রাখিয়া সে কেবলই ঘষিতে লাগিল।

জহর তাহার উদ্যত চাবুকের আর একবার শব্দ করিয়া কহিল, 'বড়লোকের মেয়ে কিনা তাই ভয় হয়, কত মাছির ডানা জড়িয়ে যাবে—আহা বেচারিরা! তবু, তার জন্য আমি ভাবি নে। আমার দুঃখ হয় লখিয়ার জন্য। মেয়েটি বড় ভাল, অকলঙ্ক, নিষ্পাপ। যদি পারো, দৌত্যকার্য্যের কুৎসিত দাসত্ব থেকে ওকে মুক্তি দিয়ো।'

শ্রীমতী তীক্ষ্ণ শ্লেষ করিয়া কহিল, 'আমাকে অপমান করাটা না-হয় বুঝলাম, বুঝলাম না লখিয়ার জন্য তোমার মাথা-ব্যথাটা। মতলবটা কি শুনি?'

জহর কহিল, 'এ জঘন্য প্রশ্ন মেয়েমানুষের পক্ষেই সম্ভব! আমার এই অকারণ ব্যথা কেন, সে-কথা শোনবার মতো সৎপাত্র তুমি নও শ্রীমতী, শুধু এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, লখিয়াকে আমি সত্যি ভালবেসেছি।'

ঠোঁট উলটাইয়া গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মিশাইয়া শ্রীমতী কহিল, 'ভালবাসা। কার মতন ভালবাসা? স্পষ্ট ক'রে শুন্‌তে পাই নে? ভালবাসার তুমি জানো কি?'

জহর মিনিট-খানেক নীরবে শুধু দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক্, ঝগড়া থাকুক। ভেবেছিলাম যাবার সময় বেশ আনন্দ নিয়েই যাবো, তা আর হ'লো না! ঘরের ভিতর কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া সে পুনরায় কহিল, 'হ্যাঁ, চা খাবার সময় আর আমার হয়ে উঠবে

না, আমি এখনই চললাম। আমায় ক্ষমা করো শ্রীমতী।' বলিয়া সে উঠিয়া দরজা দিয়া বাহির হইল।

শ্রীমতী ছুটিয়া আসিয়া তাহার পথ আগ্‌লাইয়া কহিল, 'কোথা যাও?'

জহর কহিল, 'পথ ছাড়ো শ্রীমতী, জীবনে নাটক সৃষ্টি করা আমার বড় অপ্রিয়। নাটক নয়, জীবনটা উপন্যাস!'

রুদ্ধনিশ্বাসে শ্রীমতী কহিল, 'তুমি যখন সত্যি অপমান কবো তখন আমার কথা ফুরিয়ে যায়। তবু, যাওয়া হবে না তোমার।'

'পথ ছাড়ো শ্রীমতী, মাঠের ওপর দিয়ে ওরা সব আনাগোনা করছে। কাজ করতে নেমে প্রথমেই যদি তোমার চরিত্র নিয়ে আন্দোলন ওঠে, তবে সমস্ত চুরমার হয়ে যাবে। পথ ছাড়ো শ্রীমতী, আমাকে যেতেই হবে।'

শ্রীমতী বিবর্ণমুখে সরিয়া দাঁড়াইল। তবু আর-একবার চেষ্টা করিয়া স্তিমিতকণ্ঠে কহিল, 'যেতেই হবে? বাইবে আমার চার জন দারোয়ান আছে মনে রেখো!'

তাহার কণ্ঠের সেই দীনতা দেখিলে হয় ত যে-কোনো লোকেরই কান্না পাইত!

'তাই নাকি? চার জন?' বলিয়া জহর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'তা হ'লে ত ভয় পাবারই কথা। মার খেয়ে অপঘাতে মরতে পারবো না শ্রীমতী, তার চেয়ে এসো, প্রেমালাপ ক'রে তোমার সঙ্গে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে যাই, এসো।' বলিয়া কঠিন মুষ্ঠিতে শ্রীমতীর হাত ধরিয়া সে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিল।

'কী হচ্চে, ছাড়ো, লখিয়া এসে পড়বে।' শ্রীমতী নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কাকড় গুছাইতে গুছাইতে সরিয়া গেল।

জহর কহিল, 'এসে দেখে ফেললেই ভাল হ'তো। দেখতো, ছদ্মবেশী একটা বন্য পশুকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারো না।'

'বন্য পশু বলে নিজেব প্রশংসা ক'রো না।'

'বেশ ত বন্য পশু এবং অসচ্চরিত্র—সোনায় সোহাগা। লখিয়াকে জানিয়ে যেতাম যে, আজ জহুরী জহর চিনেছে!'

নিজের পরিচয়টা নিজের মুখে বলিয়া সে এত রাগেও শ্রীমতীকে হাসাইয়া দিল। শ্রীমতী কহিল, 'চরিত্রহীন ছাড়া তোমার আর কি পরিচয়?'

'আর কিছু নয়, ওইটেই আমার সত্য পরিচয়।' বলিয়া সশব্দে একটা চেয়ার টানিয়া জহর বসিল। বলিল, 'চরিত্রহীন, আমি বাল্যকাল থেকে, তখন আমি সাত বছরের ছেলে, শুনবে শ্রীমতী?' বলিয়া শ্রীমতীর উৎসুক দৃষ্টির দিকে ক্ষণকালের জন্য একবার তাকাইয়া সে বলিয়া যাইতে লাগিল, 'এই কল্‌কাতা শহরে এক নগণ্য পল্লীতে দরিদ্রের ঘরে আমার জন্ম হ'লো। কী দুঃখে, কী আশায় বড় হলাম। সে কি উজ্জ্বল উন্মাদ স্বপ্ন, মানুষের মতো মানুষ হবো! বাল্যকাল কাট্‌লো স্কুলে, অবোধ কতকগুলি তরুণ মুখ মাষ্টারমশাইয়ের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাক্‌তো, আমিও ছিলাম তাদের একজন, জীবনের সম্বন্ধে কত আশা, কত সম্ভাবনা, কেবলই একটা সুদিনের অপেক্ষায় দিন গুণতাম। পরীক্ষার পর পরীক্ষা পাশ ক'রে গেলাম কিন্তু কেবলই মনে হ'তো, এ কিছু না, এ মিথ্যে, এরা আমার বড় হবার সহায় নয়, এভাবে আমার দিন কাট্‌লে চল্‌বে না। সেদিন থেকে কারো সঙ্গে আমার চরিত্র খাপ খায় নি, আমি চরিত্রহীন নয় ত কি?'

শ্রীমতী বিদ্রূপ করিয়া কহিল, 'কী পরিকল্পনাটা তোমার ছিল শুনি?'

এমন সময়ে লখিয়া চা ও খাবার লইয়া সাড়া দিয়া ঘরে ঢুকিল। টিপয়ের উপর সেগুলি রাখিয়া সে কহিল, 'যতই রাত হোক, আজকে আমার পড়া নিতে হবে দাদা, আমি বসে রইলাম ও-ঘরে।'

জহর হাসিয়া বলিয়া দিল, 'আচ্ছা ভাই।'

লখিয়া বাহির হইয়া গেল।

জহর বলিতে লাগিল, 'হ্যাঁ, পরিকল্পনা একটা আমার ছিল, সেইটেই আজ তোমাকে শোনাবো। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হতে লাগলাম। সে কী দারিদ্র্য, সে তুমি বুঝবে না, কোনোদিন ভাত জুট্‌তো, কোনোদিন জুটতো না। শাদা কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে ইস্কুলের পড়া লিখতাম, সে লেখা যখন পুরানো হয়ে যেত, তখন রগ্‌ড়ে মুছে ফেলে তার ওপর আবার লিখতাম। নতুন বছরে ক্লাসে উঠে বই কেনার সে কি ভয়ানক সমস্যা! আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত-অপরিচিত সকলের দরজায়-দরজায় কুকুরের মতো ভিক্ষা করতাম, অপমান আর উপেক্ষা আকণ্ঠ হয়ে উঠতো। ক্লাসে আমি ভাল ছেলেই ছিলাম, কিন্তু অবাক হয়ে ভাবতাম মাষ্টারগুলো কী পড়ায়, এর সঙ্গে ত আমার মন সাড়া দেয় না! তাদের ধারণা, একদিন আমরা দেশের মুখোজ্জ্বল কর্‌বো। মুখোজ্জ্বল করবার কোনো উৎসাহ কিন্তু আমাদের সে-বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে ছিল না। যাক্‌, ইস্কুল থেকে ত বেরোলাম। কিন্তু কোথায়? ছোট-ছোট ভাইবোনগুলি, বিধবা মা, সকলে পরমে আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, দিন তাদের এবার ফিরবে। দিন ফেরাবার মূলধন ত আমার নেই। বই পড়ে শিখেছি কতকগুলো উপদেশ, নীতি, কুসংস্কার, আর পেয়েচি কতকগুলো বাজে ইতিহাসিক তথ্য, বর্ত্তমান জীবনে তারা মূল্যহীন, কিন্তু বড় হবার সেই উদ্দাম অনুপ্রেরণা তার মধ্যে কোথায়? প্রথমেই এল জীবন সংগ্রাম, ঢেউয়ের পর ঢেউ, উত্তুঙ্গ, উত্তাল, তার সঙ্গে লাগলো সংঘর্ষ, ক্ষতবিক্ষত হলাম। তখন মন ছিল আমার নিষ্পাপ, দৃষ্টি ছিল নির্ম্মল। বিষয়-বুদ্ধি আমার নেই, সুবিধাবাদী আমি নই, তাই দেখলাম সবাই গেল এগিয়ে, আমি রইলাম পিছনে। শুধু দেখলাম তাদেরই সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেছে যাদের জীবনের অতীত ইতিহাসে রয়েছে ছল, চাতুরী, কপটতা, ভণ্ডামী। এক জায়গায় কিছুদিন চাক্‌রি করতে গিয়ে দেখলাম সে কী কর্দয্য জীবনযাত্রা। তোষামোদ, হীন স্বার্থবুদ্ধি, জঘন্য রুচি, অন্যায় অবিচার, অলজ্জ কাঙালপনা! যারা একটু ভাল লোক, অল্প পরিমাণ মহৎ, সাধারণ ভদ্র, যারা চলনসই মধ্যবিত্ত, সেই সাধারণ লোকগুলিই হচ্ছে তাদেরই ক্রীতদাস, যারা পরস্বাপহরণ ক'রে সমাজে বড় হয়েছে, যাদের পিছনে আছে শয়তানি, কূটচক্র, সর্ব্বনাশা স্বার্থপরতা, অকুণ্ঠ প্রতারণা! আমার সকল আশা চুরমার হতে লাগ্‌লো। পথে-পথে ঘুরে বেড়াই; ভাবি, সাধারণ হয়ে ভদ্র হয়ে জীবন যাপন করবার কি কোনো উপায় নেই? উপায় হয় ত ছিল, কিন্তু শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস যখন নষ্ট হয়ে যায় শ্রীমতী, স্বপ্ন আর আর্দশ যখন ভাঙে, তখন বেঁচে কী সুখ? সমস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের জীবন এই যে ব্যর্থ হয়ে গেল এর জন্য সমগ্র মানব-সমাজ কি দায়ী নয়? আমাদের শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, আনন্দ নেই, জীবনের উদার বিস্তৃতি নেই; এ কেন? ধর্ম্ম আমাদের অকর্ম্মণ্য করেছে, নীতি করেছে পঙ্গু, কুসংস্কার করেছে অন্ধ। আমাদের চারিদিকে জমেছে মানুষের হিংসা, বন্ধু-বান্ধবের প্রতারণা, পরিবার-পরিজনের অন্যায় শাসন, আমরা পরাধীন। আর পরপদানত। আত্মপ্রকাশ করবার পথ আমাদের বন্ধ, জীবনকে পরিব্যাপ্ত করবার পথ আমাদের কণ্টকাকীর্ণ। আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি শ্রীমতী, দেশের মৃত্যু, জাতির মৃত্যু, মানুষের মৃত্যু। পথে-পথে ঘুরে বেড়াই, নিজের চরিত্রকে উজ্জ্বল ক'রে সৃষ্টি করতে পারি নি, আমি ত নিশ্চয়ই চরিত্রহীন! আমার মতো আরো কয়েকজন চরিত্রহীনের দেখা পেলাম, তারাও নষ্ট হয়ে গেছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি নে, প্রগতি আর সভ্যতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই, জীবনের বহুতর সৌন্দর্য্য আর সম্ভাবনার প্রতি আমাদের তিক্ত বিদ্রূপ, তাই কেউ কোথায় নিঃস্বার্থ মহত্ত্ব প্রকাশ করেছে শুন্‌লে আমরা চম্‌কে উঠতাম, কাউকে অকারণ ভদ্র ব্যবহার করতে দেখলে অবাক হয়ে যেতাম, মানব-জাতির প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা। আমরা জেনেছিলাম এ-পৃথিবী দুঃখের, পীড়নের, বেদনা ও নিরানন্দের। একদিন পরামর্শ করা গেল—চল, মদ খাওয়া যাক্‌, এ দুঃখ ভুলতে হবে। কিন্তু মাতাল হয়ে আরো দুঃখ বাড়লো, ভেতর আরো রিক্ত হয়ে উঠ্‌লো, সে আর সান্ত্বনা মান্‌লো না। আগে ব্যথা পেলে চোখে জল পড়তো, এবার অশ্রুও গেল শুকিয়ে। মদ্যপান ক'রে আমরা অনর্গল বক্তৃতা দিতাম, সে আমাদের মতলামি নয় শ্রীমতী, আমাদের মর্ম্মমূলের উন্মত্ত

হতাশার কথা। মনে হ'তো, টুটি ছিঁড়ে সবাইকে জানাই কী যন্ত্রণা আমরা সইছি, বুকের হৃদ্‌পিণ্ডটা কেটে বার ক'রে দেখাই কোথায় আমাদের অভাব, কোথায় আমাদের দারিদ্র্য। আমরা হলাম সমাজচ্যুত একদল ছন্নছাড়া। কিছুই আমরা মানতাম না। গুরুজনকে শ্রদ্ধা, ভদ্রলোককে সম্মান, স্নেহাস্পদকে প্রীতি—মনে হ'তো এ-সব অত্যন্ত বাজে, মৌখিক, বাহ্যিক, ফাঁকা—এগুলোকে আমরা নিতান্ত উপেক্ষায় এড়িয়ে গেলাম, কী হবে এদের প্রশ্রয় দিয়ে? লোকের অপ্রিয় হয়ে ওঠাই ছিল আমাদের গৌরব, কুখ্যাত হয়ে জীবনধারণ করাতেই ছিল আমাদের আনন্দ! আমাদের নিন্দায় যখন চার দিক মুখর হয়ে উঠতো, আমরা অতি আরামে তা উপভোগ করতাম, খুসী হতাম, গোপনে তাদের প্রশংসা করতাম। সমাজের বুকের উপর দাঁড়িয়ে কেউ একটা কুৎসিত কাজ করেছে শুনলে আমরা তৃপ্ত হতাম, একটা উল্লাস ভেতরে-ভেতরে আন্দোলিত হয়ে উঠতো। স্বদেশ, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, এদের সম্বন্ধে যখন আমরা বক্তৃতা দিতাম তখন আশেপাশে শ্রোতার দল মুগ্ধ হয়ে শুনে যেত, বলাবলি করতো, কী আমাদের গভীর পাণ্ডিত্য আর অন্তর্দৃষ্টি! তারপর তারা দেখতো আমাদের কথার সঙ্গে আমাদের কাজের মিল নেই, ভেতরের সঙ্গে বাহিরের ঐক্য নেই। তারা চটে যেত, আমাদের অধঃপতনের জন্য দুঃখিত হ'তো, হয় ত বা একটু ব্যাথাও পেয়ে যেত। কী করবো শ্রীমতী? যারা আমাদের সত্যি স্নেহ করতো আমরা তাদের সকলের চেয়ে বড় আঘাত করতাম, সে আঘাত ফিরে এসে আমাদেরই বুকে বাজতো, কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। যারা আমাদের শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো তাদের উপর ছিল আমাদের হৃদয়হীন তাচ্ছিল্য, অকারণ অশ্রদ্ধা, মনে-মনে তাদের অনুকম্পা করতাম। পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। এ-পৃথিবীতে যে ফুল ফোটে, পাখী ডাকে, ঋতুবালারা বরণডালা সাজিয়ে আনে, সোনার রোদ্দুরে যে শরতের নীল আকাশ ঝক্-ঝক্ করতে থাকে, এ আমরা ভুলে গেছি। বৈশাখের রোদে আমরা দেখেছি কুলি-মজুর কেমন সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে মরে, সাদা আকাশ তৃষ্ণায় কেমন হা-হা করতে থাকে, শ্রাবণের ঘন বর্ষায় দেখেছি ফুটো চালার নীচে জলের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দরিদ্রবা কেমন ক'রে দিন কাটায়, শীতে দেখেছি গায়ের কাপড়ের অভাবে ঠাণ্ডায় মানুষ কেমন করে কাঁপতে থাকে। মহামারীতে চোখের সুমুখে সব উজাড় হয়ে গেল, দুর্ভিক্ষে, দুর্দ্দিনে, মন্বন্তরে মানুষ শিশু-সন্তান বিক্রি করলো, পাছে অন্নের ভাগ দিতে হয় এজন্য সন্তান হয়ে বৃদ্ধ পিতাকে গোপনে গলা টিপে হত্যা ক'রে দিল—শ্রীমতী, এ দৃশ্য দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখেছি। দেখেছি আমরা অনেক। আমাদের হৃদয় মরে গেছে, মানুষের যত কিছু সুকুমার বৃত্তি সে আমাদের শুকিয়ে গেছে, আমরা ফতুর হয়ে গেছি! দেশের যৌবন আজ অবরুদ্ধ কারাগারে বন্দী হয়ে কাঁদচে, তার চোখে আলো নেই, তার নিশ্বাসের বাতাস নেই, তার প্রাণধারণের খাদ্য নেই। সে-যৌবন অপমানিত, লজ্জা তার চারদিকে, দৈন্য তার পুঁজি, শাসন তার পাথেয়, সে মুক্তি পেল না। শ্রীমতী, মানুষের মতো মানুষ হয়ে সচ্চরিত্র হয়ে সুন্দর হয়ে বাঁচবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাঁচবার মত জায়গা কোথায়? এদের মধ্যে? এই দারিদ্র্য, এই লজ্জা, এই নৈতিক পঙ্গুতা, সংস্কারের গ্লানি, এই কদর্য্য রীতি, জঘন্য আচার—এদের মধ্যে বাঁচবো কেমন ক'রে? শ্রীমতী, অপমানে আত্মগ্লানিতে নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে মানুষকে মরতে দেখেছে? দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হতে দেখেছ? কেরোসিনের তেল গায়ে ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে নিরপরাধ নর-নারীকে আত্মহত্যা করতে দেখেছ? দেখেছ শ্রীমতী, শিক্ষিত ভদ্র সন্তান যুবক কেমন ক'রে রাত্রির অন্ধকারে রেল-লাইনের ওপর গলা রেখে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকে? মা হয়ে সন্তানের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেয় কেন তা জেনেছ শ্রীমতী? তুমি কি জানো, এক মুহূর্ত্তে কার জীবন কখন নির্ম্মম ভাবে ব্যর্থ হয়, বিষাক্ত হয়?'

ঘরময় কিয়ৎক্ষণ পদচারণা করিয়া জহর উদ্বেলিত কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিল, 'পথে পথে ঘুরে বেড়াই শ্রীমতী, এখানে ওখানে বিদেশে বিভূঁয়ে পালিয়ে বেড়াই, ঝরা শুকনো পাতার মতো উড়ে বেড়াই। বনে, পাহাড়ে, সমুদ্রতীরে, নদীর চড়ায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাই, মানুষের মুখ দেখলে ভয় করে, বুকের মধ্যে এক রকম শব্দ হতে থাকে। আমার স্বাস্থ্য যে তাদের হাতে, তারা ভাল না হলে

আমার ত ভাল হবার উপায় নেই! তারা কুৎসিত বলেই ত আমার প্রাণধারণের এত গ্লানি। আবার ফিরে আসি, পরিবার-পরিজনের মধ্যে মিশে যাই, এদের জন্যে মায়া হয়। আমি একা, নিতান্তই একা। আমার সঙ্গে এদের সুদূর ব্যবধান, মাঝখানে আমাদের অপার সমুদ্র। ইচ্ছে করে সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরে একবার চীৎকার ক'রে বলি, আমাকে যা ভাবচ আমি নিতান্তই সে রকম মানুষ নই। আমিও ভালবাসতে পারি, সুন্দর সংসার রচনা করতে পারি, আনন্দ দান করতে পারি, এ পৃথিবীতে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকার কারো চেয়ে আমার কম নয়; কিন্তু না, তাদের ওপর ঘৃণা হয়! আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে জঘন্য অশিক্ষা, অজ্ঞান, অনাচার, কদর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর জীবন-যাত্রা। আমার আত্মীয়-স্বজন আমার জীবনের সব চেয়ে বড় লজ্জা শ্রীমতী। অথচ বেচারীদের কীই বা দোষ! তাদের এই অধঃপতনের জন্য তারা যে একটুও দায়ী নয় এও ত সহজেই বুঝতে পারি! ঈশ্বরের নামে তারা শিখেছে ধর্ম্মান্ধতা, সমাজের নামে শিখেছে মানুষকে উৎপীড়ন করতে, নীতির নামে শিখেছে আত্মপ্রবঞ্চনা। দেবতা, মন্দির, লোকাচার, শাস্ত্র, নরকভীতি—এদের অত্যাচারে তাদের জীবন হয়েছে বিকল, যৌবন হয়েছে শক্তিহীন। অন্যায়কে অন্যায় বলে প্রচার করতে এরা ভয় পায়, অপমানের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে এদের সাহস নেই, অবিচারের প্রতিকার করার সহজ শক্তি এদের ফুরিয়ে গেছে। শ্রীমতী, পরাধীন জাতি পদদলিত হয় তার নিজের অপরাধে, বহু যুগের পাপে, বহুকালের অন্ধতায়। তাই তাদের আত্মশুদ্ধি হয় পীড়ন এবং হিংসার ভেতর দিয়ে। তাদের হাতেই এদের মুক্তি যারা এদেব চাবুক মারে, গলায় দড়ির ফাঁস টেনে প্রাণসংহার করে, জলে ডুবিয়ে খোঁচা দেয়, কুকুর দেয় লেলিয়ে হিংস্র ক্রীতদাসকে উত্তেজিত করে ছেড়ে দেয় রাত্রির অন্ধকারে এদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবার জন্যে।

তাহার উত্তেজিত মুখখানার দিকে তাকাইয়া শ্রীমতীর চোখের দৃষ্টি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কম্পিত কণ্ঠে কেবল বলিতে লাগিল, 'তারপর?'

তারপর আর কিছু নেই শ্রীমতী, আমি একা, উদাসীন। সব থাকা সত্ত্বেও ভিখারী হয়ে রইলাম। যৌবন আমার গেল ব্যর্থ হয়ে। অনেক মেয়েকেও দেখলাম কিন্তু কী আছে তাদের? শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, হৃদয় তাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, জীবনের কোনো উচ্চ আদর্শ তাদের নেই, তারা ভালবাসার কী বুঝবে? প্রেম বলতে তারা বোঝে শুধু দুর্ব্বল দেহ লালসা, আমিই বা ভালবাসবো কী দিয়ে শ্রীমতী? সর্ব্বহারা নগণ্য বাঙ্গালীর ছেলে, যার অতীত জীবন অন্ধকার, আর ভবিষ্যৎ কুহেলিকাচ্ছন্ন, ক্লেদ-ক্লিন্নতা নিয়ে যার দিন কাটে, প্রেম সঞ্চারিত হবার মতো সেই উদার ব্যাপকতা তার বুকের মধ্যে কোথায়? আমি দেখলাম শুধু বন্দী সতীত্ব, কাম জর্জ্জরতা, সন্তান-ধারণের অক্লান্ত অধ্যবসায়, আমি দেখলাম বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর কুৎসিত জীবন-যাত্রা, প্রেম ত আমি জানি নে! প্রেম? সে ত সৌখীন সমাজের স্বপ্ন-বিলাস। এদেশে প্রেম কোথায়? যেটুকু আছে সেটুকু যে কাঁচা নাটক-নভেলের সামান্য পুঁজি মাত্র!

'ক্ষমা করো শ্রীমতী, কোনো ভদ্রমহিলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আলাপ করা পর্য্যন্ত আমি ভুলে গেছি, ভেতরে মরচে ধরে গেছে। আমি ভালবাসবারো যোগ্য নই, ভালবাসা পাবারো উপযুক্ত নই। তোমাকে পেয়ে আমার কেবলি ভয় হয়েছে পাছে তোমার অসম্মান ক'রে ফেলি, পাছে তোমার এই সহৃদয় বন্ধুত্বের মর্য্যাদা না রাখতে পারি। তোমার দেওয়া কলঙ্ক আমি আজ মাথায় তুলে নিয়ে যাবো, আমি অসচ্চরিত্র, আমি চরিত্রহীন। এ আমার গৌরব নয়, লজ্জা। যদি পারো আমায় ক্ষমা করো শ্রীমতী।'

ইতিমধ্যে শেষ চৈত্রের আকাশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, অন্ধকারে কেহই এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য করে নাই। এবার অকস্মাৎ আকাশ দ্বিখণ্ডিত করিয়া এক ঝলক বিদ্যুৎ ঘরের ভিতরটাকে ঝলসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল এবং দেখিতে-দেখিতে পরমুহূর্ত্তেই গুরু-গুরু মেঘগর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বাহিরের দিকে তাকাইয়া শ্রীমতী ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'কোথা যাবে তুমি?'

'নির্দিষ্ট কোথাও নয়, শুধু ঘুরে বেড়াবো ট্রেণে-ট্রেণে, মাসিক একটা মাইনেও পাবো।'

শ্রীমতী ব্যাকুল হইয়া কহিল, 'আমি কী অপরাধ করলাম তোমার কাছে? কী করেছি আমি তোমার? চলেই বা যাচ্ছ কেন?'

জহর একটু হাসিল। বলিল, 'তোমার অপরাধ নয় শ্রীমতী, আমার অযোগ্যতা। তুমি আমার শ্রদ্ধেয়া, তোমার অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বকে নমস্কার করি। আমি আজ দূরে যাবো, পথে-পথে ঘুরে বেড়াবো, নানা জটিল প্রশ্নের ভিড় ঠেলে চলবো, আর মাঝে-মাঝে এক-একবার মনে হবে তোমার কথা। তোমার সব থেকেও কিছু নেই, অথচ তুমি এত বড়। এমন নিষ্পাপ মেয়ে তুমি, অথচ এতখানি তোমার শাস্তি। তুমি কাজ কর্‌তে নেমেচ অথচ বাঁচবার আনন্দ তোমার নেই।' বলিয়া জহর উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে প্রবল ঝড়-ঝাপ্টার সহিত বড়-বড় ফোঁটায় চড়-চড় করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। ক্রুদ্ধ বন্য জন্তুর মতো বাহিরে বাতাসের প্রচণ্ড দাপাদাপি চলিতে লাগিল।

শ্রীমতী উঠিয়া আসিয়া বলিল, 'আজ কি তোমার যেতেই হবে? ডাকি আমি তবে লখিয়াকে, তার কথা ঠেলে যাও দেখি ত?'

জহর তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, 'তার চেয়ে তোমার অনুরোধই বড় শ্রীমতী। কিন্তু আজ আমাকে যেতেই হবে, আজই আমার সময়, দুর্য্যোগেই আমার আনাগোনা। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

'আর কি আসবে না? কবে আবার দেখা হবে?'

'হয় ত আবার আসতে হবে এবং সেই দিনই আসবো, যে দিন নিজের কাছে পরিষ্কার ক'রেই জান্‌বো তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই শ্রীমতী। তোমার মতো নারীর পায়ে সেদিন নিজেকে আমি—' বলিতে-বলিতে বারান্দা পার হইয়া জহর নীচে নামিয়া গেল।

দরজার একটা কপাটে গা হেলাইয়া শ্রীমতী নিশ্চল ও নির্জীব হইযা দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল, তাহার মুখে চোখে রক্তের চিহ্ন নাই, জীবনের স্পন্দনও নাই।

চার বৎসর পরে

চার বৎসর পরে একদা রাত্রি জাগিয়া শ্রীমতী একখানি পত্র লিখিতেছিল ঃ

প্রিয়,

এতকাল পরে তোমার পত্র পেলাম। পাবার আশা আমি করি নি; অস্বাভাবিক বলে নয়, অপ্রত্যাশিত বলে। চিঠি পেয়ে কি খুসি হয়েছি? জানি নে, বোধ হয় কতকটা দুঃখই পেয়েছি। তোমার ভাষা আমাকে নতুন কথা শোনালো, অর্থাৎ তুমি যা নয় তারই পরিচয় পেলাম।

যেদিন তুমি বিদায় নিয়েছিলে মনে পড়ে? নিশ্চয়ই পড়ে। পুরুষের মনে থাকে কেবল ঘটনাটা, আমাদের মনে থাকে ফলাফলটা। শুধু কি ফলাফলই? মেয়েরা ডুবে যায় আরো গভীরে। তারা চেয়ে থাকে ঘটনার পিছনে মনের দিকে, হৃদয়ের দিকে। এই জন্যই তারা ভালবাসে গল্প, পুরুষেরা পছন্দ করে নাটক। চরিত্র-বিশ্লেষণে মেয়েদের একটা অদ্ভুত আনন্দ দেখা যায় কিন্তু এখন থাক্ সে কথা। তোমার চিঠি আমার কানে-কানে বললে, তুমি যা তুমি তা নও। কিছুকাল পূর্ব্বে আমারও সে-কথা মনে হয়েছিল। তোমাদের চরিত্রের প্রগ্রেস আছে, গতি আছে, আমাদের তা নেই। আমরা পাঁচেও যা, পঞ্চাশেও তাই। গোড়ায় আমাদের যে-ফুল ফোটে, আগায়

গিয়ে ধরে সেই ফুলেরই ফল। আমি জানি এই স্বীকারোক্তির ফলে মেয়েরা ছোট হবে না, তারা ছোট নয় কিন্তু তারা সীমাবদ্ধ—যেমন সীমাবদ্ধ পৃথিবী। কিন্তু তোমরা? তোমরা হচ্ছ আকাশ—সীমাহীন। আমাকে পরিষ্কার ক'রে জানবার জন্যে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিলে। তাই হয়। অপরকে জান্‌তে গেলে নিজেকে আগে জানা দরকাব। কিন্তু তার জন্যে বিচ্ছিন্ন হবার প্রয়োজন ছিল না, নির্লিপ্ত হলেই চলতো। এক-একজন মানুষ এমনি, তারা আত্ম-বিশ্লেষণ করে নিজেকে দূরে নিয়ে গিয়ে, গায়ে পথের হাওয়া লাগিয়ে। তাতে ফল হ'লো এই, তোমার কাছে আমি যা তাই রইলাম, কিন্তু তুমি গেলে আইডিয়ার দিক থেকে এগিয়ে। নিজের জীবনের সঙ্গে তোমার সমন্বয় ছিল না, এবার খুঁজে পেলে আইডিয়ার ঐক্য, আমিও তোমার মধ্যে পেলাম একটা সঙ্গতি। মেয়েমানুষ সঙ্গতির বড় ভক্ত।

কেমন আছি জানতে চেযেছ। ঠিক কেমন আছি বলা কঠিন। মেয়েরা কোন্ সময়ে কেমন থাকে বিধাতাও জানেন না। তাব মানে এ নয় যে, তারা রহস্য দিয়ে ঘেরা, তারা যে রহস্যময় একথা তোমাদের মুখেই শুনি। ওটা তোমাদেব কল্পনার চোখ। মেয়েদের রঙ নিত্যই বদলায়, সেটা রহস্য নয়, প্রকৃতি। আজ সন্ধ্যায় পাড়ার একটি মেয়ে বেড়াতে এসেছিল, যাবার সময় বলে গেল, পৃথিবীতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। সেই কথাটা শোনা থেকেই ভাবচি আজই রাতে তোমার উত্তর দেবার সময়। তার কথাটা কেবলই খোঁচার মতো বিঁধছে। সুখী বলেই হয় ত স্বস্তি পাচ্ছি নে। অথচ দুঃখের চেহারাও ত চোখে পড়চে না, দুঃখ কিছু একটা থাকলেও না-হয় তাকে নিয়ে একটু বিলাস করা যেতো, এখনকার দিনে ওটা কাজেও লাগে; দুঃখের নানা ব্যাখ্যায় দেশের বাতাস আজকাল থম্‌-থম্‌ করছে। ফেনিয়ে ফেনিযে একথা আমি বলতে চাই নে যে, আমার আরামের শয্যায় ফুট্‌ছে কাঁকর, সব থেকেও নেই—সেটা হবে সস্তার কবিত্ব! জীবনটা জীবনই—কবিত্ব আর একটা অংশ হতে পাবে কিন্তু সমগ্রটা নয়। হ্যাঁ, আমি ভাল আছি। ভাল থাকবো না কেন বলো? আপাতত আমি শুধু নিশ্চিন্ত নয, নিভৃত। তোমার পত্রখানি ঠিকানা-বদল হযে যেখানে এসে আমার হস্তগত হযেছে, সে নতুন দেশ, নতুন তার পারিপার্শ্বিক। যে-ঘরে শুয়ে তোমাকে চিঠি লিখছি সে একটি পর্ণকুটীর, মাটি আর বাঁকারির দেওয়াল, বাঁশের খুঁটি, ভিতরে যৎসামান্য গৃহসজ্জা, টিম্‌-টিম্‌ ক'রে আলো জ্বলছে। অবাক হলে—কেমন? অবাক আমিও হই। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এখানে এসে বাস করার একটা বিচিত্র আত্মপ্রসাদ আমি প্রায়ই অনুভব করি! এমন মনে ক'রো না, সব ছেড়ে দুঃখকে বরণ করেছি, সন্ন্যাস নিয়েছি—পুরুষের মত মেয়েদের ধাতুতে সন্ন্যাস নেই—ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে দারিদ্র্য বরণ করাটা ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোবৃত্তি; দারিদ্র্য আমার নেই। হ্যাঁ, ঘর থেকে বেরোলেই দালান, দেশী ভাষায় এর নাম দাওয়া, তার নিচে মাটির উঠোন, কবিতায় যাকে বলে অঙ্গন। অঙ্গন ভরা ফুল-ফলের গাছ; যেতে-আস্তে ফুলের ছোট-ছোট গাছগুলো আমার আঁচল টেনে ধরে। বেড়ার গায়ে মাধবী লতার ঝাড় মেঘের মতো ঘন হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। আগড় পার হলেই পথ। সেই পথ ধরে গিয়ে কাঁসাই নদীতে জল আনতে যাই, বেশ লাগে। কলসী ভাসিয়ে দিয়ে গলা-জলে নেমে জলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ছায়াও দেখি নে, তোমারও না, দেখি আমারই চেহারা। ভিজে কাপড়ে যখন ফিরি, কাঁকালের ঘটজল উছলে গায়ে পড়ে। থাক্‌ আর ঠাট্টা নয়, কাছে থাক্‌লে তুমি হয় ত একটা বেয়াড়া মন্তব্য ক'রে বসতে। কি করবো বল, কাব্যের মানবী রূপটা মেয়েদের বড় প্রিয়।

আগে একটা বৈষয়িক কথা বলে নিই। আমি আমার ঐশ্বর্য্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। ও আমার ধাতে খাপ খায় না। রমাকে ডেকেছিলাম তার বিষয়ের ভাগ নিতে কিন্তু সে রাজি হয় নি। স্বামীর স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি নিয়েই সে খুসি রইলো। আমার চাবপাশে জনসাধারণের সমারোহটা তুমি দেখে গিয়েছিলে; জনসাধারণকে নিয়ে কারবার করার মত বিড়ম্বনা সংসারে আর কিছু নেই। সে-গল্পটা সামান্যই। লখিয়ার কথা তোমার মনে আছে ত? নিশ্চয় আছে; তুমি তাকে ভালবেসেছিলে! বাস্তবিক এমন সচ্চরিত্র, ভদ্র ও হৃদয়বতী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। বছর দুই বাদে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার কবলাম লখিয়ার গর্ভে একটি সন্তান আসন্ন! আমি বুঝতে পারি নি আগে; যখন সত্যই সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লো, এ-লজ্জা সে সইতে পারলো না, ভেবেছিল আমার কাছে তার মাথা চিরদিনের জন্য বুঝি হেঁট হয়ে গেল। সন্তান হবার পবেই হাসপাতালের ঘরে সে আত্মহত্যা ক'রে ব'সলো। এত কাছে থেকেও সে আমাকে চিনলো না, এত সহজেই বিচাব ক'রে গেল। মানুষের নীতিবোধ এমনি। সামান্য প্রবৃত্তির জন্য মানুষের বৃহত্তর উদারতাকে আমরা অপমান করি—এই বোধ হয় ছিল লখিয়ার বিশ্বাস। বিধবার সন্তান হওয়াও যে সংসাবে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়; এই কথাটাই সে নিঃশব্দে জানিয়ে গেল, জীবন দান ক'রে। লখিয়ার মরণে সেদিন বড় দুঃখ পেয়েছিলাম।

কিন্তু তার মৃত্যুর পরে হাওয়াটা গেল বদলে। আমার আশ্রয়ে সে ছিল, অতএব তার এই তথাকথিত দুর্নীতির জন্য আমি দায়ী—এই বিশ্বাসে সকলেব চোখে আমি ঘৃণ্য হযে উঠলাম। মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি যে কী ক্ষণভঙ্গুব তা সেদিন সুস্পষ্ট বুঝলাম। কলঙ্কের কালি তারা মাখালো আমার মুখে, ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপে আমাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুললো। তা তুলুক, কিন্তু যে-সন্তান লখিযা রেখে চলে গেল তাকে আমি ফেলবো কেমন ক'রে? তার মা নেই কিন্তু আমিও ত তাব মা হতে পারি। সংসারেব সকল দরজায় আমার মাথা হেঁট হয়েছে, মা হয়ে সে-মাথা উঁচু হয় কিনা দেখা যাক্, তুমি কি বল? নারীপ্রকৃতির মধ্যে বাৎসল্যের স্থান সকলের আগে একথা যদি স্বীকার করি তবে আমাকে সেকেলে ব'লে ব্যঙ্গ ক'রো না, আমি প্রাচীন বৃক্ষের কোটরে নতুন বাসা বাঁধতে ভালবাসি। কিন্তু লখিয়ার ছেলেকে নিয়ে পড়লাম বিপদে—আশ্রয় নেই। বিস্মিত হ'য়ো না, সত্যই সেদিন মাথা রাখবার ঠাঁই ছিল না। অত বড় বাড়ী, জায়গা জমি, নগদ টাকা যা কিছু, যথাসর্ব্বস্ব, সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে মহত্ত্ব দেখিয়ে গেছি, সব গেছে ট্রাষ্টিদের হাতে—সেদিন তাই আমার দাঁড়াবার জায়গার অভাব। আর দাঁড়াবোই বা কেমন ক'রে? নিন্দায়-নিন্দায় আকণ্ঠ হ'য়ে তখন আমি সব ছেড়ে পালাতে পার্‌লে বাঁচি।

থাক্, বাকিটা তোমার আর শুনে কাজ নেই। দুঃখের সঙ্গে তোমাব পরিচয় আছে, তুমি বুঝবে আমার অন্তর-বাহিরের ইতিহাস।

আঘাতে আর সংঘাতে আমি পেয়েছি আমার জীবনের গতি। চারিদিকে এত সোরগোল কিন্তু আমার মন তপস্যা করছে একটি নিভৃত জীবন—অনাড়ম্বর, নিশ্চিন্ত ও স্বল্পতুষ্ট। সংসারে এসে কোলাহল করেছি, দল গড়েছি, প্রচারকার্য্য করেছি, হৈ-চৈ করে লোক জড়ো করেছি, খ্যাতি ও যশ আদায় ক'রে, বেড়িয়েছি, কিন্তু আমার মন তাতে বাঁধা পড়ে নি। আমার কেবলি ভাল লেগেছে একখানি—একান্ত কুটীর, দু'য়েকটি ফুলের গাছ, একটুখানি মিষ্টি আলো, সন্ধ্যার মেঘ—এরা আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য। আমি কেবলি চেয়েছি কেউ যেন আমাকে দেখতে না পায়, কেউ যেন আমাকে

চিনতে না পারে, অপরিচিত নিরুদ্দেশে আমি যেন অদৃশ্য হয়ে থাকি।—একটুখানি কবিত্ব করলাম, ক্ষমা ক'রো।

তোমাকে চিঠি লিখ্‌ছি, চারিদিক আমার নিবিড় হ'য়ে এসেছে। এই চিঠি সাধারণ মানুষের হাতে পড়লে তারা মনে করবে, এ বুঝি বা একখানা সৌখীন প্রেম-পত্র। মনে তারা করুক, তাদের মনের দৃষ্টি নেই। তোমার সঙ্গে যে আমার ধাতুগত বিরোধ, আমাদের মধ্যে যে নিগূঢ় ভালবাসার সম্পর্ক নেই এ কথা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিচার করার মতো নির্লিপ্ত মন আজকের দিনে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তোমাকে লিখ্‌ছি কিসের তাগিদে, ঘন অন্ধকার রাত্রি সে-রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্য মুখ বুজে তপস্যায় বসেচে। রাতজাগা একটা পাখী ডাকচে দূরে, বোধ হয় বাসা খুঁজে পায় নি; পোকা-মাকড়ের শব্দ শুন্‌চি, একটানা ঝিঁঝি ডাক্‌চে, গাছের পাতার ভিতর দিয়ে বাতাস বয়ে চলেছে; একান্ত ক'রে কান পেতে থাকলে কাঁসাই নদীর জলের শব্দও শোনা যায়। ঘরের মধ্যে টিম্‌-টিম্‌ ক'রে আলো জ্বলচে, সামান্য গৃহসজ্জা, খান-কয়েক সুন্দর বই, বিকালে-তোলা গুটিকয়েক গন্ধরাজ, একটি গ্রামোফোন, মধ্যে কয়েকটি আমার প্রিয় পুতুল। ওদের মাঝখানে আমি নিজেও একটা বড় পুতুল। আমি ওদের নিয়ে খেলা করি, কিন্তু আমাকে নিয়ে যে খেলা করে তাকে আমি দেখতে পাই নে। আমার কোলের কাছে কে শুয়ে আছে, বুঝতে পেরেছে ত? দু'বছরের ফুটফুটে ছেলে, নাম রেখেছি সূর্য্যকুমার। ঘুমে কাতর, তবু হাসি ফুটে রয়েছে মুখে, মোমবাতির মতো নাক, বেগুনী রেশমের মতো চুল, চোখ দুটির উপরে যেন দুটি কালো ভ্রমর এসে বসেছে। দেখে-দেখে তোমার মনে হবে যেন একটি নির্ব্বাসিত রাজশিশু। এমন পরিচ্ছন্ন, এমন নিষ্পাপ ও নির্ম্মল রূপ আর কোথাও তোমাদের চোখে পড়বে না। এর পাশে শুলে যে কেমন একটা অদ্ভুত মোহ আমাকে পেয়ে বসে। নিজেকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি সত্যিই এর মা নই? কে বলে? কেন এর গায়ে গা ঠেক্‌লে আমার বুকের দুই দিকে রোমাঞ্চ হয়? শরীরের স্নায়ুতন্ত্রীগুলোর মধ্যে কেন মধুর উত্তেজনা সঞ্চারিত হতে থাকে? কেন অপূর্ব্ব রসের আবেশে সর্ব্বশরীর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে? একে তোমরা কী বলো? বাৎসল্য? মাতৃত্ব?

মাটির সোঁদা গন্ধ পাচ্ছি? এই মাটিকে আমরা ভালবাসি, এ-মাটি পৃথিবীর। মাটির গন্ধ আমাকে ব্যাকুল করে, আমাকে দিশেহারা করে, আমার বন্ধনহীন আত্মাকে নিরুদ্দেশে নিয়ে যায়; এই গন্ধ আমার শিরায়-শিরায় সঙ্গীত জাগিয়ে তোলে, আমাকে বিভ্রান্ত করে, বিপর্য্যস্ত করে। যেদিন আমার দেহান্তর ঘট্‌বে সেদিন এই প্রার্থনাই রেখে যাবো, ফের ফিবে এসে আমি যেন ঘাসের ডগায় একটি ফুল হয়ে ফুটি, বসন্তের ঝরাপাতা হয়ে যেন উড়ে বেড়াই, বালুকণার মত যেন কোথাও এই মাটিকে ছুঁয়ে থাকি—একে যেন ছাড়তে না হয়। অযুত কোটি মানুষের পায়ের চিহ্ন রয়েছে এই মাটির বুকে, সেই অন্ধকার থেকে অন্ধকারের দিকে যাওয়া নশ্বর মানব জাতির পদলেখা যেন আমাকেও স্পর্শ ক'রে চলে যায়। এই মাটি আর এই পিতৃপরিচয়হীন শিশু—এই আজ আমার পথের পাথেয়, এদের নিয়েই আমি জীবনের দুঃখ ভুলবো। এ-কথা বলতে আজ সঙ্কোচ করবো না, আমার জীবনের বসন্ত চলে গেছে, এবার নেমেছে বর্ষা; ফুলের দিন গেছে, এখন ফলের কাল—শস্য উৎপন্ন হবার বেলা। নারীর জীবন এমনি। বসন্তে ছিল রঙ, বর্ষায় এলো রস। এই রসের দিগ্‌দিগন্ত প্রাণ-ধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে সৃষ্টি—পাই সঙ্গতি।

এইবার তোমার আসার সময় হয়েচে; প্রিয়, তুমি এসো। এই তোমার আসার কাল। তুমি কক্ষচ্যুত গ্রহ, পথের দিশা হারিয়েচে তোমার, তুমি অকৃতী ও অকরুণ, আমার কাছে এসো, আমি তোমার পরমায়ুকে সঞ্জীবীত করবো। তুমি আধুনিক যুগের প্রতীক—উৎপীড়িত ও অশান্ত, অতৃপ্ত আর বিক্ষুব্ধ—তোমাকে আমি চিন্‌তে চাই, তুমি আপন সত্যকে প্রকাশ করো। জীবনকে বিকশিত করার সাধ্য তোমার নেই, আশায় জর্জ্জর, ভাগ্যের দ্বারে চিরপ্রত্যাখ্যাত—আলোকের পথ তোমার চোখে লুপ্ত হয়েচে, অনন্ত ক্ষুধা রুদ্ধ ক্ষোভে তোমার মধ্যে মাথা কুটে মরচে; হে পরাধীন, হে নবীন, হে ব্যর্থ, তোমাকে আমি আশ্রয় দিতে চাই।

সত্যি, তুমি এসো। ঘর ক'রে রেখেচি তোমার জন্যে, ঘরের গায়ে আছে মালতী-লতার বেড়া, দক্ষিণের পথ রেখেছি খোলা। সন্ধ্যার প্রথম তারা জেগে থাকবে তোমার জন্য, প্রথম জ্যোৎস্না উঠে তোমার শিরশ্চুম্বন ক'রে যাবে; ধূপের ধোঁয়া আর কেয়াফুলের গন্ধে তোমার চোখে আসবে ঘুম। তৃষ্ণায় যখন জেগে উঠ্‌বে, মৃৎপাত্রে এনে দেবো ফলের রস, আমার যে সরোবরে পদ্ম ফুটে রয়েছে, তার জল এনে দেবো তোমার অঞ্জলিতে। শস্যময় প্রান্তরের তীরে দাঁড়িয়ে নতুন ধানের মঞ্জরীর দিকে চেয়ে তোমার চোখে যখন লাগবে স্বপ্নঘোর, তখন গাছের ছায়ায় বসে বাজাবো রাখালিয়া বাঁশী। ঘৃণা রেখো না মানুষের প্রতি, অভিমান ক'রো না তাদের ওপর—তারা নির্ব্বোধ, তারা অসহায়, অসীম সহানুভূতিতে তাদের সব অপরাধ ভুলে যেয়ো।

তোমাব অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে তুমি লজ্জা পাও, কিন্তু সে তোমার মৃত অতীত, সে থাক্ পিছনে—সম্মুখের পথে সে যেন তোমার বাধা না হ'য়ে দাঁড়ায়। তুমি অগ্রগামী, তোমার আছে রহস্যময় ভবিষ্যত, সেই তোমার পাথেয়। আমি তোমার অতীতকে চাই নে, আমি চাই তোমার ভবিষ্যত, আলোকোজ্জ্বল অপূর্ব্ব সম্ভাবনা। তোমার সেই অনাগত জীবন-গঠনের ভার আমি নিলাম।

আমার শরীর কেমন আছে জান্‌তে চেয়েচ। থাক্ শরীর, আজ মনের কথা বলো। শরীরের হিসাব-নিকাশ আমি বন্ধ করেচি, এবার খুলেচি মনের খাতা; তার জমা-খবচেব তালিকা নতুন পথ ধ'রে চলে? রসের ভাষায় যাকে তোমরা বলো যৌবন, সে আমার শেষ হয়ে গেছে, এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে চোখ মেলে চাইতে পেরেছি। যৌবনে নানা সোরগোল নানা চাঞ্চল্য—তখনকার জীবনে নিত্য উৎসব, নিরন্তর ব্যস্ততা, নিশ্বাস নেবার অবকাশ নেই, খরচের খাতা তখন খোলা। সেই যৌবনটাকে পার ক'রে দিয়ে এবার স্বস্তি পেয়েচি, এবার হয়েচে ভাবস্থিতি, নির্জ্জন বিরাম। আমার শরীরে এখন আর কাব্যের প্রেরণা নেই, ইতিহাসের বৃত্তান্তই কেবল পাবে।

লিখেছ, আমি স্বপ্নবাদিনী। কথাটা মিথ্যা নয়। স্বপ্নই আমার সম্বল। স্বপ্ন দেখি নি এমন একটা দিন আমার বুকে পাথরের মতো চেপে বসে। প্রকাশ্য সংরক্ষণশীলতা এবং প্রচ্ছন্ন অসংযম মেয়েরা ভালবাসে—এও তোমার আর এক অভিযোগ। কিন্তু এ-কথার উত্তর কাছে এলে দেবো। মেয়েরা ভক্ত আদর্শবাদের; তাদের প্রিয়, আইডল্ আর আইডিয়াল্। তোমাকেও জানি, তোমার আছে নিষ্ঠুর অবিশ্বাসবাদ, ঘোর সিনিক্ তোমার মন। ঈশ্বরের কথা তুমি হেসে উড়িয়ে দাও, মানুষ তোমার কাছে পাশবিকতার প্রতিমূর্ত্তি, প্রেম তোমার চোখে অতি সাধারণ দেহবিলাস, জীবন তোমার বিচারে কাঁচা-হাতে-লেখা বাজে একটা প্রহসন। কিন্তু এই সিনিসিজম্-এর আয়নায় তোমার

প্রতিফলিত চেহারা আমি দেখেছি। এ-পিঠে তুমি এই, ও-পিঠে তুমি ড্রীমার, রোমান্টিক্, আবেগময়। কিন্তু এ-তর্কও তুমি এলে করবো।

আর নয়, রাত হ'লো বলে বলছি নে, বলছি যে তুমি আর দেরী ক'রো না, চলে এসো। বাইরের দিকে তোমার আর পথ নেই, তোমার শেষ আশ্রয় এবার অন্দরে। যুগসন্ধির তীরে দাঁড়িয়ে তুমি কী পেয়েছ? তোমার মধ্যে রয়েছে যে-শুভবুদ্ধি, কল্যাণ কামনা, তাকে প্রকাশ করবার পথ কি তুমি পাবে কোনোদিন? উদার মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্বের দরবারে নালিশ জানাবার আর শক্তি কোথায়?—একদিন যারা মানুষের অন্তরে বিচারবোধের দীপ জ্বালিয়েছিল, তাদেরই নির্ব্বিচার বর্ব্বরতায় সেই দীপের প্রাণ আজ কণ্ঠাগত, আশা করবার আর কিছু নেই। তাই আজ নিতান্ত কৃপণের মতো নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জীবনযাত্রার পথটা বেঁধে রেখেছি, এর বাইরে আর পা বাড়াবো না। দুঃখ যাদের আকণ্ঠ, অপমান ও লাঞ্ছনায় যারা চিরদলিত, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যারা নতশির, এই প্রশান্ত সীমানার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা দু'জনে যেন তাদের পক্ষে অলজ্জ অনাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারি, আত্মবিস্মৃত দম্ভের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার যেন বজায় রাখতে পারি। এই আমার শেষ কথা জানিয়ে তোমার পথ চেয়ে রইলাম। ইতি—

তোমার
বান্ধবী

চতুষ্কোণ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজকুমারের মতো অসংখ্য ছেলে দেখেছি। তারা নানারকম, কিন্তু আসলে এক। রাজকুমারকে 'টাইপ' বলে ধরলে ভুল করা হবে। একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এই 'অনেক' যারা, তাদের মধ্যে মূলগত মিল আছে, তাই এটা সম্ভব হল। রাজকুমার একটু বেলুনের মতো ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু তাতে কিছু আসবে যাবে কি? আমার উদ্দেশ্যও তাই ছিল।

বেলা তিনটার সময় রাজকুমার টের পাইল, তার মাথা ধরিয়াছে। এটা নতুন অভিজ্ঞতা নয়, মাঝে মাঝে তার মাথা ধরে। কেন ধরে সে নিজেও জানে না, তার ডাক্তার বন্ধু অজিতও জানে না। তার চোখ ঠিক আছে, দাঁত ঠিক আছে, ব্লাডপ্রেশার ঠিক আছে, হজমশক্তি ঠিক আছে—শরীরের সমস্ত কলকবজাগুলিই মোটামুটি এতখানি ঠিক আছে যে মাঝে মাঝে মাথাধরার জন্য তাদের কোনওটিকেই দায়ী করা যায় না। তবু মাঝে মাঝে মাথা ধরে।

অজিত অবশ্য একজোড়া কারণের কথা বলিয়াছে ঃ আলসেমি আর স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিনীতিতে অবহেলা। রাজকুমার তার এই ভাসা ভাসা আবিষ্কারে বিশ্বাস করে না। প্রথম কারণটা একেবারেই অর্থহীন, সে অলস নয়, তাকে অনেক কাজ করিতে হয়। দ্বিতীয় কারণটা যুক্তিতে টেঁকে না, স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিনীতি না মানিলে স্বাস্থ্য খারাপ হইতে পারে, মাথা ধরিবে কেন?

অজিত খোঁচা দিয়া বলিয়াছে ঃ তোর স্বাস্থ্য খুব ভালো, না?

অসুখে তো ভুগি না।

মাথাধরাটা—

মাথাধরা অসুখ নয়।

মাথা খারাপ হওয়াটা?

আজ গোড়াতেই মাঝে মাঝে সাধারণ মাথাধরার সঙ্গে আজকের মাথাধরার তফাতটা রাজকুমার টের পাইয়া গেল। দু-চারমাস অন্তর তার এ রকম খাপছাড়া মাথাধরার আবির্ভাব ঘটে। নদীতে জোয়ার আসার মতো মাথায় একটা ভোঁতা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার সঞ্চার সে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, তারপর বাড়িতে বাড়িতে পরিপূর্ণ জোয়ারের মতো যন্ত্রণাটা মাথার মধ্যে থমথম করিতে থাকে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে না। মাথাধরা কমানোর ওষুধে শুধু যন্ত্রণার তীব্রতা বাড়ে, ঘুমের ওষুধে যন্ত্রণাটা যেন আরও বেশি ভোঁতা আর ভারী হইয়া দম আটকাইয়া দিতে চায়।

খাটের বিছানায় তিনটি মাথার বালিশের উপর একটি পাশবালিশ চাপাইয়া আধশোয়া অবস্থায় রাজকুমার বসিয়া ছিল। তৃষ্ণায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। মাথা ধরিলে রাজকুমারের এ রকম হয়। সাধারণ জল, ডাবের জল, শরবত কিছুতেই তার তৃষ্ণা মেটে না। এটাও তার জীবনের একটা দুর্বোধ্য রহস্য। শুকনো মুখের অপ্রাপ্য রস গিলিবার চেষ্টার সঙ্গে চাষার গোরু তাড়ানোর মতো একটা আওয়াজ করিয়া সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

চারকোণা মাঝারি আকারের ঘর, আসবাব ও জিনিসপত্রে ঠাসা ঘরখানাই রাজকুমারের শোয়ার ঘর, বসিবার ঘর, লাইব্রেরি, গুদাম এবং আরও অনেক কিছু। অনেক কালের পুরানো খাটখানাই এক চতুর্থাংশ স্থান—আরও একটু নিখুঁত হিসাব ধরিলে $\frac{৪৫৭}{১৭৭৬}$ স্থান রাজকুমার একদিন খেয়ালের বশে মাপিয়া দেখিয়াছে,—দখল করিয়া আছে। বই বোঝাই তিনটি আলমারি ও একটি টেবিল, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, ওষুধের শিশি, কাচের গ্লাস, চায়ের কাপ, জুতা পালিশের কৌটা, চশমার খাপ প্রভৃতি অসংখ্য খুঁটিনাটি জিনিসে বোঝাই আরেকটি টেবিল, তিনটি চেয়ার, একটি ট্রাংক এবং দুটি বড়ো ও একটি ছোটো চামড়ার সুটকেস, ছোটো একটা আলনা, এ সমস্ত কেবল পা ফেলিবার স্থান রাখিয়া বাকি মেঝেটা আত্মসাৎ করিয়াছে।

তবে রাজকুমার কোনওরকম অসুবিধা বোধ করে না। এ ঘরে থাকিতে তার বরং রীতিমতো আরাম বোধ হয়। ঘরখানা যেমন জিনিসপত্রে বোঝাই, তেমনি দিনের অভ্যাস ও ঘনিষ্ঠতার স্বস্তিতেও ঠাসা।

এই ঘরে মাথাধরার যন্ত্রণা সহ্য করিবার মধ্যেও যেন মৃদু একটু শান্তি আর সান্ত্বনার আমেজ আছে। জগতের কোটি কোটি ঘরের মধ্যে এই চারকোনা ঘরটিতেই কেবল নির্বিকার অবহেলার সঙ্গে গা এলাইয়া দিয়া সে মাথার যন্ত্রণায় কাবু হইতে পারে।

মাথাধরা বাড়িবার আগে এবং স্থায়ীভাবে গা এলানোর আগে কয়েকটি ব্যবস্থা করিয়া ফেলা দরকার। মনে মনে রাজকুমার ব্যবস্থাগুলির হিসাব করিতে লাগিল। রসিকবাবুর বাড়ি গিয়া গিরীন্দ্রনন্দিনীর মাকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ রাত্রে তাদের বাড়ি খাওয়া অসম্ভব। অবনীবাবুর বাড়ি গিয়া মালতীকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ সে তাকে পড়াইতে যাইতে পারিবে না। স্যার কে এল-এর বাড়ি গিয়া রিণিকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ তার সঙ্গে কারও পার্টিতে যাওয়া বা জলতরঙ্গ বাজনা শোনানোর ক্ষমতা তার নাই। কেদারবাবুব বাড়ি গিয়া সরসীকে বলিয়া আসিতে হইবে, সমিতির সভায় গিয়া আজ সে বক্তৃতা দিলে, সকলে শুধু উঃ আঃ শব্দই শুনিতে পাইবে। রাজেনকে একটা ফোন করিয়া দিতে হইবে, কাল সকালে কাজে ফাঁকি না দিয়া তার উপায় নাই।

এই কাজগুলি শেষ করিতে বেশিক্ষণ সময় লাগিবে না, গিরি, মালতী, রিণি আর সরসী চারজনের বাড়িই তার বাড়ির খুব কাছে, এক রকম পাশের বাড়িই বলা যায়। পশ্চিমে বড়ো রাস্তার ধারে স্যার কে এল-এর প্রকাণ্ড বাড়ির পিছনে তার বাড়িটা আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে, স্যার কে এল-এর বাড়ির পাশের গলি দিয়া ঢুকিয়া তার বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছিতে হয়। উত্তরে গলির মধ্যে তার বাড়ির অপরদিকে কেদারবাবুর বাড়ি। পুবে গলির মধ্যে আর একটু আগাইয়া গেলে ডানদিকে যে আরও ছোটো গলিটা আছে তার মধ্যে ঢুকিলেই বাঁ দিকে অবনীবাবুর বাড়ি। দক্ষিণে ছোটো গলিটা ধরিয়া খানিক আগাইয়া ডানদিকে হঠাৎ মোড় ঘুরিবার পর রসিকবাবুর বাড়ি এবং গলিটারও সেইখানেই সমাপ্তি। রিণি আর সরসী দুজনের বাড়িতেই ফোন আছে, রাজেনকে ফোন করিতেও হাঙ্গামা হইবে না।

কতকটা পাঞ্জাবি এবং কতকটা শার্টের মতো দেখিতে তার নিজস্ব ডিজাইনের জামাটি গায়ে দিয়া রাজকুমার ঘরের বাহিরে আসিল।

বাড়ির দোতলার অর্ধেকটা দখল করিয়া আছে স্বামী-পুত্র এবং স্বামীর দুটি ভাইবোন সহ মনোরমা নামে রাজকুমারের এক দূর সম্পর্কের দিদি। প্রথমে তারা ভাড়াটে হিসাবেই আসিয়াছিল এবং প্রথম মাসের বাড়ি ভাড়াও দিয়াছিল ভাড়াটে হিসাবেই। কিন্তু সেই এক মাসের মধ্যে প্রায় সম্পর্কহীন ভাইবোনের সম্পর্কটা একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ানোয় মনোরমা একদিন বলিয়াছিল, দ্যাখো ভাই রাজু, তোমার হাতে ভাড়ার টাকা তুলে দিতে কেমন যেন লজ্জা করে।

শুনিয়া রাজকুমার ভাবিয়াছিল, সেরেছে! এই জন্য সম্পর্ক আছে এমন মানুষকে ভাড়াটে নিতে অজিত বারণ করেছিল!

·মনোরমা আবার বলিয়াছিল, ভাড়া দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক তো তোমার সঙ্গে আমাদের নয়।

রাজকুমার কথা বলে নাই। বলিতে পারে নাই।

তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না? একলা মানুষ তুমি ঠাকুর-চাকর রেখে হাঙ্গামা পোয়াবার তোমার দরকার? আমি থাকতে ঠাকুরের রান্নাই বা তোমাকে খেতে হবে কেন?

গজেন মন্দ রাঁধে না।

আহা, কী রান্নাই রাঁধে! কদিন খেয়েছি তো এটা ওটা চেয়ে নিয়ে। জিভের স্বাদ তোমার নষ্ট হয়ে গেছে রাজুভাই, দুদিন আমার রান্না খেয়ে ওর ডাল তরকারি মুখে দিতে পারবে না।

প্রস্তাবটা প্রথমে রাজকুমারের ভালো লাগে নাই। একা নিজের জন্য ঠাকুর-চাকর রাখিয়া সংসার চালানোর যত হাঙ্গামাই থাক, যেভাবে খুশি সংসার চালানো এবং যা খুশি করা, যখন খুশি আর যা খুশি খাওয়ার সুখটা আছে। কিন্তু এখন মনোরমা আর অজানা অচেনা প্রায়-সম্পর্কহীনা আত্মীয়া নয়, এক মাসে সে প্রায় আসল দিদিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তার এ ধরনের প্রস্তাবে না-ই বলা যায় কেমন করিয়া?

সেই হইতে মনোরমা ভাড়ার বদলে রাজকুমারকে চারবেলা খাইতে দেয়, তার ঘরখানা গুছানো ছাড়া দরকারি অন্য সব কাজও করিয়া দেয়। রাজকুমার তার ঘর গুছাইতে দিলে যে মনোরমা নিজেই হোক বা তার ননদকে দিয়াই হোক এ কাজটা করিয়া দিত, তাতেও কোনও সন্দেহ নাই।

রাজকুমার বাহিরে যাইতেছে টের পাইয়া মনোরমা ডাকিল, কে যায়? রাজু? একবারটি শুনে যাবে রাজুভাই, শুধু একটিবার?

দিনের মধ্যে রাজকুমারকে সে অন্তত আট-দশবার ডাকে, কিন্তু প্রত্যেকবার তার ডাক শুনিয়া মনে হয়, এই তার প্রথম এবং শেষ আহ্বান, আর কখনও ডাক দিয়া সে রাজকুমারকে বিরক্ত করিবে না। দক্ষিণের বড়ো লম্বাটে ঘরখানার মেঝেতে বসিয়া মনোরমা সেলাই করিতেছিল। এ ঘরে আসবাব খুব কম। খাট, ড্রেসিং টেবিল আর ছোটো একটি আলমারি ছাড়া আর যা আছে সে সবের জন্য বেশি জায়গা দিতে হয় নাই। পরিষ্কার লাল মেঝেতে গরমের সময় আরামে গড়াগড়ি দেওয়া চলে।

এত শিগগিরি যাচ্ছ কেন রাজুভাই?

সেখানে যাচ্ছি না।

কোথায় যাচ্ছ তবে?

একটা ফোন করে আসব।

ও, ফোন করবে। পাঁচটার সময় ওখানে যেয়ো, তা হলেই হবে। কালী সেজেগুজে ঠিকঠাক হয়ে থাকবে, বলে দিয়েছি।

আজ যেতে পারব না দিদি।

মনোরমা হাসিমুখে বলিল, পারবে না? একটা কাজের ভার নিয়ে শেষকালে ফ্যাসাদ বাধানোর স্বভাব কি তোমার যাবে না, রাজুভাই? কালীকে আজ আনাব বলে রেখেছি, কত আশা করে আছে মেয়েটা, কে এখন ওকে আনতে যাবে?

আমার মাথা ধরেছে।

আবার মাথা ধরেছে? কতবার বললাম একটা মাদুলি নাও—না না, ও সব কথা আর আরম্ভ করো না রাজুভাই, ও সব আমি জানি, আমি মুখ্যু গেঁয়ো মেয়ে নই। মাদুলি নিলে মাথাধরা সেরে না যাক, উপকার হবে।

ছাই হবে।

কিছু উপকার হবেই। ভূতেও তো তোমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু রাতদুপুরে একা একা শ্মশান ঘাটে গিয়ে দেখো তো একবার, ভয় না করলেও দেখবে কেমন কেমন লাগবে। অবিশ্বাস করেও তুমি একটা মাদুলি নাও, আমার কথা শুনে নাও, মাথার যন্ত্রণা অন্তত একটু কম হবেই।

মনোরমা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল।

মাথা ধরুক আর যাই হোক, কালীকে তোমার আনতে যেতে হবেই রাজুভাই। না গেলে কোনওদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

বেশ বোঝা যায়, মনোরমা রাগ করে নাই, শুধু অভিমানে মুখভার করিয়াছে। স্নেহের অভিমান, দাবির অভিমান।

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা দেখি। যেতে পারলে যাবখন।

গিরীন্দ্রনন্দিনীর -া ঘবে ঘুমাইতেছিলেন। গিবি নিজেই দরজা খুলিয়া দিল। রোগা লম্বা পনেরো-ষোলোবছরের মেয়ে, তেরো বছরের বেশি বয়স মনে হয় না। রাজকুমারের পরামর্শে রসিকবাবু মেয়েকে সম্প্রতি একটি পুষ্টিকর টনিক খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। টনিকের নামটা বাজকুমার অজিতের কাছে সংগ্রহ করিয়াছিল।

অজিত বলিয়াছিল, এমন টনিক আর হয় না রাজু। ভুল করে একবার একটা সাত বছরের মেয়েকে খেতে দিয়েছিলাম, তিন মাস পরে মেয়েটার বাবা পাগলের মতো তার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করল।

গিরি মাসখানেক টনিকটা খাইতেছে কিন্তু এখনও কোনও ফল হয় নাই। তবু শেমিজ ছাড়া শুধু ডুরে শাড়িটি পরিয়া থাকার জন্য গিরি যেন সংকোচে একেবারে কাবু হইযা গেল। যতই হোক, বাঙালি গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তো, পনেরো-ষোলোবছর বযস তো তার হইয়াছে। ডুরে শাড়ি দিয়া ক্রমাগত আরও ভালোভাবে নিজেকে ঢাকিবার অনাবশ্যক ও খাপছাড়া চেষ্টার জন্য গিরির মতো অল্প অল্প বোকাটে ধরনের সহজ সরল হাসিখুশি ছেলেমানুষ মেয়েটাকে পর্যন্ত মনে হইতে লাগিল বয়স্কা পাকা মেয়েমানুষ।

ছোটো উঠান, অতিবিক্ত ঘষামাজায় ঝকঝকে, তবু যেন অপরিচ্ছন্ন। কলের নীচে ছড়ানো এঁটো বাসন, একগাদা ছাই, বাসন মাজা ন্যাতা, ক্ষয় পাওয়া ঝাঁটা, নালার ঝাঁঝরার কাছে পানের পিকের দাগ, সিঁড়ির নীচে কয়লা আব ঘুঁটের স্তুপ, শুধু এই কয়েকটি সংকেতেই যেন সযত্নে সাফ করা উঠোনটি নোংবা হইযা যাইতেছে।

কোথা পালাচ্ছ? শুনে যাও?

একধাপ সিঁড়িতে উঠিয়া গিরি দাঁড়াইল এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া রাজকুমার যা বলিতে আসিয়াছে শুনিল। তারপব কাতরভাবে অভিমানের ভঙ্গিতে খোঁচা দেওয়ার সুরে বলিল, তা খাবেন কেন গরিবের বাড়িতে!

আমার ভীষণ মাথা ধরেছে গিরি।

মাথা আমারও ধরে। আমি তো খাই!

তুমি এক নম্বরের পেটুক, খাবে বইকী।

আমি পেটুক না আপনি পেটুক? সেদিন অতগুলো ক্ষীরপুলি—গিরি খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল। ডুরে শাড়ি সংক্রান্ত কুৎসিত সংকেতের বিরক্তি সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের মন হইতে মিলাইয়া গেল রোদের তেজে কুয়াশার মতো। একটু গ্লানিও সে বোধ করিতে লাগিল। নিজের অতিরিক্ত পাকা মন নিয়া জগতের সরল সহজ মানুষগুলিকে বিচার করিতে গিয়া হয়তো আরও কতবার সে অমনি অবিচার করিয়াছে। নিজের মনের আলোতে পরের সমালোচনা সত্যিই ভালো নয়।

কৈফিয়ত দেওয়ার মতো করিয়া সে বলিল, সন্ধ্যা থেকে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকব কিনা, তাই খেতে আসতে পারব না।

খেয়ে গিয়ে বুঝি শুয়ে থাকা যায় না?

খেলে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে। আজ উপোস দেব ভাবছি।

গিরি গম্ভীর হইয়া বলিল, না খেলে মাথাধরা আরও বাড়বে। শরীরে রক্ত কম থাকলে মাথা ধরে। খাদ্য থেকে রক্ত হয়।

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, তোমার সেই ডাক্তার বলেছে বুঝি, যে তোমার নাড়ি খুঁজে পায়নি?

কয়েক মাস আগে গিরির জ্বর হইয়াছিল দেখিতে আসিয়া ডাক্তার নাকি তার কব্জি হাতড়াইয়া নাড়ি খুঁজিয়া পান নাই! হয়তো নাড়ি খুব ক্ষীণ দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, গিরির পাল্‌স নাই। সেই হইতে গিরি সগর্বে সকলের কাছে গল্প করিয়া বেড়ায়, সে এমন আশ্চর্য মেয়ে যে তার পাল্‌স পর্যন্ত নাই। সকলের যা আছে তার যে তা নাই, এতেই গিরির কত আনন্দ, কত উত্তেজনা। রাজকুমারের কাছেই সে যে কতবার এ গল্প বলিয়াছে তার হিসাব হয় না। রাজকুমার অনেকবার তাকে বুঝাইয়া বলিয়াছে, কী ভাবে মানুষের হার্টের কাজ চলে, কী ভাবে শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল করে—অনেক কিছু ঝুঝাইয়া বলিয়াছে। বোকা মেয়েটাকে নানাকথা বুঝাইয়া বলিতে তার বড়ো ভালো লাগে। কিন্তু গিরি বুঝিয়াও কিছু বুঝিতে চায় না।

সত্যি আমার নাড়ি নেই। আপনার বুঝি বিশ্বাস হয় না?

বাঁচিয়া থাকার সঙ্গে নাড়ির স্পন্দন বজায় থাকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাটা রাজকুমার অনেকবার গিরিকে বুঝাইয়া বলিয়াছে, কোনওদিন তার হাত ধরিয়া নাড়ির অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে নাই। আজ সোজাসুজি গিরির ডান হাতটি ধরিয়া বলিল, দেখি, কেমন তোমার নাড়ি নাই।

গিবি বিব্রত হইয়া বলিল, না না, আজ নয়। এখন নয়।

রাজকুমার হাসিমুখে বলিল, এই তো দিব্বি টিপ্‌টিপ্ করছে পালস্।

গিরি আবার বলিল, থাক না এখন, আরেকদিন দেখবেন।

গিরির মুখের ভাব লক্ষ করিলে রাজকুমার নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ছাড়িয়া দিয়া তফাতে সরিয়া যাইত এবং নিজের পাকা মনের আলোতে জগতের সহজ সরল মানুষগুলিকে বিচার কবিবার জন্য একটু আগে অনুতাপ বোধ করার জন্য নিজেকে ভাবিত ভাবপ্রবণ। কিন্তু গিরির সঙ্গে তামাশা আরম্ভ করিয়া অন্যদিকে তার মন ছিল না।

হাসির বদলে মুখে চিন্তার ছাপ আনিয়া সে বলিল, তোমার পালস্ তো বড়ো আস্তে চলছে গিরি। তোমার হার্ট নিশ্চয় খুব দুর্বল। দেখি—

ডুরে শাড়ির নীচে যেখানে গিরির দুর্বল হার্ট স্পন্দিত হইতেছিল, সেখানে হাত রাখিয়া রাজকুমার স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করিতে লাগিল। গিরির মুখের বাদামি রং প্রথমে হইয়া গেল পাঁশুটে, তারপর হইয়া গেল কালোটে। একে আজ গায়ে তার শেমিজ নাই, তারপব চারিদিকে নাই মানুষ। কী সর্বনাশ!

ছি ছি! এ সব কী!

রাজকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিল, কী হয়েছে?

গিরি দমক মারিয়া তার দিকে পিছন ফিরিয়া, একবার হোঁচট খাওয়ার উপক্রম করিয়া তরতর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। রাজকুমার হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। একী ব্যাপার?

ব্যাপার বুঝে গেল কয়েক মিনিট পরে উপরে গিয়া। গিরির মা পাটিতে পা ছড়াইয়া হাতে ভর দিয়া বসিয়া আছেন। দেখিলেই বুঝা যায়, সবে তিনি শয়নের আরাম ছাড়িয়া গা তুলিয়াছেন,—বসিবার ভঙ্গিতেও বুঝা যায়, মুখের ভঙ্গিতেও বুঝা যায়। মানুষটা একটু মোটা, গা তোলার পরিশ্রমেই বোধ হয়, একটু হাঁপও ধরিয়া গিয়াছে।

রাজকুমার বলিতে গেল, গিরি—

গিরির মা বাধা দিয়া বলিলেন, লজ্জা করে না? বেহায়া নচ্ছার কোথাকার!

এমন সহজ সরল ভাষাও যেন রাজকুমার বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

গিরির মা আবার বলিলেন, বেরো হারামজাদা, বেরো আমার বাড়ি থেকে।

গিরির মার রাগটা ক্রমেই চড়িতেছিল। আরও যে কয়েকটা শব্দ তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল সেগুলি সত্যই অশ্রাব্য।

রাজকুমার ধীরে ধীরে রসিকবাবুর বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল, ক্ষুব্ধ আহত ও উদ্‌ভ্রান্ত রাজকুমার। ব্যাপারটা বুঝিয়াও সে যেন ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ যেন একটা যুক্তিহীন ভূমিকাহীন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দামি জামাকাপড় পরিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে বাড়ির বাহির হইয়াছিল, হঠাৎ কীভাবে যেন পচা পাঁকভরা নর্দমায় পড়িয়া গিয়াছে। এই রকম একটা আকস্মিক দুর্ঘটন.র পর্যায়ে না ফেলিয়া এ ব্যাপারটা যে সত্যসত্যই ঘটিয়া গিয়াছে এ কথা কল্পনা করাও তার অসম্ভব মনে হইতেছিল।

নিছক দুর্ঘটনা,—কারও কোনও দোষ নাই, দোষ থাকা সম্ভব নয়। ভুল বুঝিবার মধ্যেও তো যুক্তি থাকে মানুষের, ভুল বুঝিবার সপক্ষে ভুল যুক্তির সমর্থন? গায়ে কেউ ফুল ছুঁড়িয়া মারিলে মনে হইতে পারে ফাজলামি করিয়াছে, সহানুভূতির হাসি দেখিয়া মনে হইতে পারে ব্যঙ্গ করিতেছে, কিন্তু ফুল আর হাসির আঘাতে হত্যা করিতে চাহিয়াছে এ কথা কি কোনওদিন কারও মনে হওয়া সম্ভব? কতটুকু মেয়েটা! বুকের স্পন্দন পরীক্ষা করিবার সময় বুকটা তার বালকের বুকের মতো সমতল মনে হইয়াছিল। যে মেয়ের দেহটা পুরুষের উপভোগের উপযুক্ত হইতে আজও পাঁচ-সাতবছর বাকি আছে সেই মেয়ের মনে তার সহজ সরল ব্যবহারটির এমন ভযাবহ অর্থ কেমন করিয়া জাগিল?

মাথাধারার কথাটা কিছুক্ষণের জন্য রাজকুমার ভুলিয়া গিয়াছিল, বাকি যে কয়েকটি কর্তব্য পালন করিবে ঠিক করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইতেছিল, সেগুলির কথাও মনে ছিল না। নিজের বাড়ির দরজাব সামনে পৌঁছিয়া মাথাধরা আর দরকারি কাজের কথা একসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু ফিরিতে আর সে পারিল না, নিজের ঘরখানার জন্য তার মন তখন ছটফট করিতেছে। জিনিসপত্রে ঠাসা ওই চারকোনা ঘরে যেন তার মাথাধরার চেয়ে কড়া যে বর্তমান মানসিক যন্ত্রণা তার ভালো ওষুধ আছে।

কে যায়? রাজু? একবারটি শুনে যাবে রাজুভাই, এক মিনিটের জন্যে?

এবার দেখা গেল, মনোরমা তার দেড় বছরের ছেলেকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছে। কচি কচি হাত দিয়া খোকা তার আঁচলে ঢাকা পরিপুষ্ট স্তন দুটিকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। রাজকুমারের দৃষ্টি দেখিয়া মনোরমা মৃদু একটা হাসিয়া বলিল, এমন দুষ্টু হয়েছে ছেলেটা! খায় না কিন্তু ঘুমানোর আগে ধরা চাই। মনে মনে খাওয়ার লোভটা এখনও আছে আর কী।

তুমিই ওর স্বভাবটা নষ্ট করছ দিদি। ধরতে দাও কেন?

মনোরমা আবার মৃদু হাসিল। দ্যাখো না ছাড়াবার চেষ্টা করে?

সরল সহজ আহ্বান, একান্ত নির্বিকার। পঞ্চাশ বছরের একজন স্ত্রীলোক যেন তার কাঁচাপাকা চুলে ভরা মাথা হইতে দুটি পাকা চুল তুলিয়া দিতে বলিতেছে দশ-বারোবছরের এক বালককে। গিরীন্দ্রনন্দিনীর বাড়ি ঘুরিয়া আসিবার আগে হইলে হয়তো রাজকুমার কিছুমাত্র সংকোচ বা অস্বস্তি বোধ করিত না, এখন মনোরমার প্রস্তাবে সে যেন নিজের মধ্যে কুঁচকাইয়া গেল।

মনোরমা একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, খোকাকে ছোঁয়ার নামেই ভড়কে গেলে! ছোটো ছেলেপিলেকে ছুঁতেই তোমার এত ঘেন্না কেন বলো তো রাজুভাই?

রাজকুমার বিব্রত হইয়া বলিল, না না, ঘেন্না কে বললে, ঘেন্না কীসের!

তারপর অবশ্য মনোরমার স্তন হইতে খোকার হাত দুটি ছাড়াইয়া দিবার চেষ্টা তাকে করিতে হইল। মনোরমা স্নেহের আবেশে মুগ্ধ চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল তার আধো ঘুমন্ত খোকার

নির্বিকার প্রশান্ত মুখে কান্না-ভরা প্রচণ্ড প্রতিবাদের দ্রুত আয়োজন আর জগতের অষ্টমাশ্চর্য দেখিবার মতো বিস্ময়ভরা চোখ মেলিয়া রাজকুমার দেখিতে লাগিল মনোরমার মুখ। খোকার কচি হাত আর মনোরমার কোমল স্তনের স্পর্শ যেন অবিস্মরণীয় সুগন্ধি অনুভূতিতে ভরা তেজস্কর রসায়নের মতো তার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিতে লাগিল। তার আহত মনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গেল।

খোকার হাত বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখা গেল না, তীক্ষ্ণগলার প্রচণ্ড আর্তনাদে কানে তালা ধরাইয়া সে তখন প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়িবার জন্য ছটফট করিতেছে।

মনোরমা বলিল, দেখলে?

রাজকুমার মেঝেতে বসিয়া বলিল, হুঁ, ছোঁড়াব সত্যি তেজ আছে!

মনোরমার হাসিভরা মুখখানা মুহূর্তে অন্ধকার হইয়া গেল। ভুরু বাঁকাইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলিল, ছোঁড়া মানে? ছোঁড়া বলছ কাকে শুনি?

রাজকুমার থতমত খাইয়া গেল।---আহা এমনি বলেছি, আদর করে বলেছি—

মনোরমার রাগ ঠান্ডা হইল না।—বেশ আদর তো তোমার! আমার ছেলেকে যদি আদর করে ছোঁড়া বলতে পার, আমাকেও তো তবে তুমি আদর করে বেশ্যা বলতে পার অনাযাসে! এ আবার কোন দেশি আদর করা, এমন কুচ্ছিত গাল দিয়ে!

ছোঁড়া কথাটা তো গাল নয় দিদি!

নয়? ছোঁড়া কাদের বলে শুনি? যারা নেংটি পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, পকেট মাবে, মদ-গাঁজা ভাং খায়, মেয়েদের দেখলে শিস দেয়, বিচ্ছিরি সব ব্যারামে ভোগে—আমি জানি না ভেবেছ!

অনেক প্রতিবাদেও কোনও ফল হইল না, আহতা অভিমানিনী মনোরমার মুখের মেঘ স্থায়ী হইয়া রহিল। নিজেই অবশ্য সে কথাটা চাপা দিয়া দিল, বলিল, সে যাকগে, থাক, ও কথা বলে আর হবে কী, আচ্ছা আচ্ছা, তোমার কথাই রইল রাজুভাই, তুমি কিছু ভেবে কথাটা বলোনি,— কিন্তু বেশ বুঝা যাইতে লাগিল, মনে মনে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আছে।

ফোন করেছ?

না, এইবার যাব।

ফোন করতেই না গেলে?

না, গিরিদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ফোন করার কথাটা মনে ছিল না।

খেয়াল খুশিব বাধা অপসারিত হওয়ার একটু পরেই খোকা আবার ঘুমাইয়া পড়িযাছিল। গম্ভীব মুখে অকারণে খোকার মুখে একটা চুমা খাইয়া মনোরমা বলিল, গিরিদের বাড়ি কেন?

গিরির মা রাত্রে খেতে বলেছিল, তাই বলতে গিয়েছিলাম আজ আর খেতে যেতে পারব না।

কে কে ছিল বাড়িতে? গিরি কী করছিল?

গিরি মার কাছে শুয়েছিল। ওরা দুজনেই বাড়িতে ছিল, এ সময় আর কে বাড়ি থাকবে?

দরজা খুলল কে?

এ রীতিমতো জেরা। মনোরমার মুখের গাম্ভীর্য যেন একটু কমিয়াছে, গলার সুরে বেশ আগ্রহ টের পাওয়া যায়।

রাজকুমারের একবার ক্ষণেকের জন্য মনে হইল, মনোরমাকে সব কথা খুলিয়া বলে। গিরি আর গিরির মা তাদের অসভ্য গেঁয়ো মনোবৃত্তি নিয়া অকারণে বিনা দোষে তাকে আজ কী অপমানটা করিয়াছে আর মনে কত কষ্ট দিয়াছে সবিস্তারে জানাইয়া মনোরমার সহানুভূতি আদায় করিয়া একটু সুখ ভোগ করে। খোকাকে ছোঁড়া বলার জন্য মনোরমা এমন খাপছাড়া ভাবে ফোঁস করিয়া না উঠিলে সে হয়তো বিনা দ্বিধাতেই ব্যাপারটা তাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া দিত। এখন

ভরসা পাইল না, খোকাকে উপলক্ষ করিয়া অসাধারণ ধীরতা, স্থিরতা, সরলতা আর সুবিবেচনার পরিচয় দিয়া মনোরমা তার মনে যে অগাধ শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়াছিল, কয়েক মিনিট পরে খোকাকে উপলক্ষ করিয়াই মনোরমা নিজেই আবার সে শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সব কথার ঠিক মানেই যে মনোরমা বুঝিবে সে ভরসা রাজকুমারের আর নাই। কে জানে নিজের মনে ব্যাপারটার কী ব্যাখ্যা করিয়া সে কী ভাবিয়া বসিবে তার সম্বন্ধে!

তাই সে বিরক্ত হওয়ার ভান করিয়া জবাব দিল, গিরি দরজা খুলল, কে আবার খুলবে?

মনোরমা কতক্ষণ কী যেন ভাবিল। মুখের গাম্ভীর্য ক্রমেই তার কমিয়া যাইতেছিল।

একটা কথা তোমায় বলি ভাই, রাগ কোরও না কিন্তু। তোমার ভালোর জন্যই বলা! আমি কিছু ভেবে বলছি না কথাটা, শুধু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। জেনে শুনে যদি দরকার মতো তোমায় সাবধান করেই না দিলাম, আমি তবে তোমার কীসের দিদি? অত বেশি যখন তখন গিরিদের বাড়ি আর যেয়ো না।

কেন?

আহা, কেমন ধারা মানুষ ওরা তা তো জানো? গেঁয়ো অসভ্য মানুষ ওরা, কুলিমজুরদের মতো ছোটো মন ওদের, সব কথার বিচ্ছিরি দিকটা আগে ওদের মনে আসে। বড়ো হলে ভাইবোন যদি নির্জনে বসে গল্প করে, তাতেও ওরা ভয় পেয়ে যায়। বড়ো-সড়ো একটা মেয়ে যখন বাড়িতে আছে, কী দরকার তোমার যখন তখন ওদের বাড়ি যাবার? বিপদে পড়ে যাবে একদিন।

ওইটুকু একটা মেয়ে—

মনোবমা বাধা দিয়ে বলিল, ওইটুকু মেয়ে মানে? আজ মেয়ের বিয়ে দিলে ওর মা একবছর পরে নাতির মুখ দেখবার আশায় থাকবে। ওরা তো আর তোমাদের মতো মানুষ নয় রাজুভাই যে ওইটুকু দেখায় বলেই ভাববে আজও মেয়ের ফ্রক পরে থাকার বয়েস আছে! যেমন ধরো ও বাড়ির রিণি, গিরির চেয়ে বয়সেও বড়ো এমনিও বড়ো দেখায় ওকে। সেদিন রিণিকে একা নিয়ে তুমি বায়স্কোপ দেখাতে গেলে, একদিন গিরিকে নিয়ে যাবার কথা বলে দেখো তো ওর বাপ মা কী বলে?

মনোরমার মুখের গাম্ভীর্য একেবারেই উপিয়া গিয়াছে, তার সুন্দর মুখখানিতে থমথম করিতেছে কথা বলার আবেগ।

তারপর ধরো সরসী। ওর বাড়ন্ত গড়ন দেখলে আমারই ভয় করে, সে দিন তুমি ওর হাত ধরে টানছিলে—

তামাশা করছিলাম।

তামাশাই তো করছিলে। কিন্তু একদিন তামাশা করতে গিয়ে ওমনি ভাবে গিরির হাত ধরে টেনো দিকি কী কাণ্ড হয়! সরসীর বাপ হাসছিল, গিরির বাপ-মা তোমায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। তুমি তো আর সামলে সুমলে চলতে জান না নিজেকে, তাই বলছিলাম, নাই বা বেশি মেলামেশা করলে ওদের সঙ্গে?

খোকাকে শোয়াইয়া দিয়া নিজেও মনোরমা কাত হইয়া তার পাশে শুইয়া পড়িল।

কালীকে আনতে যাবে না রাজুভাই?

যাব।

ঘরে গিয়া রাজকুমার বিছানায় শুইয়া পড়িল। মাথাধরার কথাটা আবার সে ভুলিয়া গিয়াছে। শুইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে থাকে আর থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, তবে কি গিরি আর গিরির মার কোনও দোষ ছিল না, সে-ই বোকার মতো একটা অসঙ্গত কাজ করিয়া

তার স্বাভাবিক ফল ভোগ করিয়াছে? মনোরমা পর্যন্ত জানে যে গিরির হাত ধরিয়া টানার অপরাধে তাকে জ্যান্ত পুড়াইয়া মারাটাই গিরির বাপ-মার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। তাই যদি হয়, এমনই সব রীতিনীতি চালচলনের মধ্যে এমনই সব মনের সাহচর্যে গিরি যদি বড়ো হইয়া থাকে আর দশটি মেয়ের মতো, তবে তো সে খাপছাড়া কিছুই করে নাই, ও অবস্থায় তার মতো আর দশটি মেয়ে যা করিত সেও তাই করিয়াছে। এবং মনোরমার কথা শুনিয়া তো মনে হয় ও রকম আর দশটি মেয়ের অভাব দেশে নাই।

বুঝিয়া চলিতে না পারিয়া সেই কি ভাবে অন্যায় করিয়াছে? কিন্তু রাজকুমারের মন সায় দিতে চায় না। ব্যাপারটা যদি সংসারের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত খাপছাড়া একটা দুর্ঘটনা নাও হয়, অসাধারণ কোনও কারণে ভুল করার বদলে আর দশটি মেয়ের মতো নিজের রুচিমাফিক সঙ্গত কাজই গিরি করিয়া থাকে, গিরির মার গালাগালিটাও যদি সংসারের সাধারণ চলতি ব্যাপারের পর্যায়ে গিয়া পড়ে তবে তো সমস্ত ব্যাপারটা হইয়া দাঁড়ায় আরও ভয়ানক, আরও কদর্য! এমন বীভৎস মনের অবস্থা কেন হইবে মানুষের? এমন পারিপার্শ্বিকতাকে কেন মানুষ মানিয়া লইবে যার প্রভাবে মানুষের মন এতখানি বিকারগ্রস্ত আর কুৎসিত হইয়া যায়?

মাথাটা আবার ভার মনে হইতে লাগিল। সত্যই কী আজ তার মাথা ধরিবে, না, অনেক চিন্তা আর উত্তেজনার ফলে আজ মাথাটা এরকম করিতেছে? একবার স্যার কে এল-এর বাড়ি গেলে হয় না, সে যে আজ তার পার্টিতে যাইতে পারিবে না এই কথাটা রিণিকে বলিয়া আসিতে? এবং একবার রিণির হাত ধরিয়া টানিয়া আসিতে?

রাজকুমারের মনে হইতে লাগিল, একবার রিণিদের বাড়ি গিয়া খেলার ছলে বিণির হাত ধরিয়া টানিয়া আর ব্লাউজের একটা বোতাম পরীক্ষা করিয়া সে যদি আজ প্রমাণ না করে যে ভদ্রমানুষ সব সময় সব কাজের কদর্য মানে করিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে না, তবে তার মাথাটা ধীরে ধীরে বোমায় পরিণত হইয়া ফাটিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

রিণি চমৎকার গান গাহিতে পারে। অন্তত লোকে তাই বলে। গলাটি তার মৃদু ও মিহি, সুরগুলি তার কোমল ও করুণ, গান সে শিখিয়াছে নামকরা এক ওস্তাদের কাছে। ওস্তাদের বুদ্ধি ছিল তাই তিনি শিষ্যাকে কিছুমাত্র ওস্তাদি শিখাইবার চেষ্টা করেন নাই, শুধু শিখাইয়াছেন মোলায়েম সুর। কেউ কেউ অবশ্য বলে যে রিণি গান করে না, বিড়ালছানার ছাড়া ছাড়া করুণ আওয়াজটাকেই একটানা উচ্চারণ করিয়া যায়, তবু অনেকের কাছেই রিণির গান ভালো লাগে। মনটা উদাস হইয়া যায় অনেকের, ঘুমের বাহন ছাড়াই স্বগত স্বপ্ন নামিয়া আসে অনেকের চোখে, লজ্জা ও বেদনার সঙ্গে অনেকের মনে হয় যে এত ঘষামাজার পরেও তো তারা মার্জিত জীবনযাত্রার পথে বিনা চেষ্টায় পিছলাইয়া চলিবার মতো মোলায়েম হইতে পারে নাই।

স্যার কে এল-এর বাড়ির সদরের সুশ্রী দরজাটি পার হইয়া ভিতরে পা দেওয়া মাত্র টের পাওয়া যায়, বাহিরের রাস্তাটা কী নোংরা। কতবার রাজকুমার এ দরজা পার হইয়াছে কিন্তু একবারও দরজাটি পার হওয়ার এক মুহূর্ত আগে এই অভিজ্ঞতা তার মনে পড়ে না। স্যার কে এল-এর বাড়ির ভিতরটা শুধু দামি ও সুশ্রী আসবাবে সুন্দরভাবে সাজানো নয়, সদর দরজার এ পাশে এ বাড়ির বিস্ময়কর রূপ ও শ্রীর মহিমাটাই শুধু স্পষ্ট হইয়া নাই, কী যেন একটা ম্যাজিক ছড়ানো আছে চারিদিকে,—পার্থক্য ও দূরত্বের ইঙ্গিতভরা এক অহংকারী আবেষ্টনীর দুর্বোধ্য প্রভাবের ম্যাজিক।

বাড়িতে ঢুকিলেই রাজকুমার একটু ঝিমাইয়া যায়। একটা অদ্ভুত কথা তার মনে হয়। মনে হয় অনেকদিন আগে একবার এক পাহাড়ে একজন সংসারত্যাগী কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর গুহায় ঢুকিয়া তার যেমন গা ছমছম করিয়াছিল, এখানেও ঠিক তেমনই লাগিতেছে। আরাম উপভোগের আধুনিকতম

কত আয়োজন এখানে, তবু তার মনে হয় এ বাড়িতে যারা বাস করে তারা যেন ধূলামাটির বাস্তব জগৎকে ত্যাগ করিয়াছে, রক্তমাংসের মানুষের হাসিকান্নায় ভরা সাধারণ স্বাভাবিক জীবনকে এড়াইয়া চলিতেছে।

উপরে গিয়া রাজকুমার টের পাইল, রিণি বড়ো হলঘরে গান গাহিতেছে। আজ পার্টিতে যে গানটি গাহিবে খুব সম্ভব সেই গানই প্র্যাকটিস করিতেছে। ঘরে গিয়া রাজকুমার রিণির কাছে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। বড়ো কোমল গানের কথাগুলি, বড়ো মধুর গানের সুরটি। রাজকুমার হয়তো একটু মুগ্ধ হইয়া যাইত, কিন্তু সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে টের পাইয়াও রিণি টের না পাওয়ার ভান করিয়া আপন মনে গাহিয়া চলিতেছে বুঝিতে পারিয়া গানটা আর রাজকুমারের তেমন ভালো লাগিল না।

গান শেষ করিয়া রিণি মুখ তুলিল। বাজকুমারের উপস্থিতি টের পাইয়াও টের না পাওয়ার ভান করিয়া এতক্ষণ গান করুক, ভাবাবেশে কী অপরূপ দেখাইতেছে রিণির মুখ!

এ গানটা গাইলেই আমার এমন মন কেমন করে! মনে হয় আমি যেন একা, আমি যেন—

ধীরে ধীরে রাজকুমারের হাত ধরিয়া রিণি তাকে আরেকটু কাছে টানিয়া আনিল, নিজের মুখখানা আরও উঁচু করিয়া ধরিল তার মুখের কাছে। গান গাহিযা সে সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। রাজকুমারের কাছে আর কোনওদিন সে এ ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়ে নাই।

প্রথমটা রাজকুমার বুঝিতে পারে নাই, তবে রিণির চোখ ও মুখের আহ্বান এত স্পষ্ট যে বুঝিতে বেশিক্ষণ সময লাগা রাজকুমারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। বুঝিতে পারিয়াই সে বিবর্ণ হইয়া গেল।

না, ছি।

ও।

বিণি উঠিযা দাঁড়াইয়া একটু তফাতে সরিয়া গেল। চোখে আর আবেশের ছাপ নাই, মুখে উত্তেজনার রং নাই। চোখের পলকে সে যেন পাথরের মূর্তি হইয়া গিয়াছে।

কী চাই আপনার?

কিছু চাই না, এমনি তোমায় একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আমার বড়ো মাথা ধরেছে, আজ আর তাই তোমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে পারব না।

রিণি বলিল, তা নিজে অসভ্যতা কবতে না এসে, একটা নোট পাঠিয়ে দিলেই পারতেন? যাকগে, মাথা যখন ধরেছে, কী করে আর যাবেন!

রাজকুমার মরিয়া হইয়া বলিল, তোমাব সঙ্গে বসে একটু গল্প করব ভেবেছিলাম রিণি।

রিণি যেন আশ্চর্য হইয়া গেল।—আমার সঙ্গে গল্প! আচ্ছা বসুন।

গল্প তাই জমিল না। একজন যদি মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে আর থাকিয়া থাকিয়া সুকৌশলে অতি সূক্ষ্ম ও মার্জিতভাবে খোঁচা দিয়া জানাইয়া দেয় যে অপরজন মানুষ হিসাবে অতি অভদ্র, গল্প আর চলিতে পারে কতক্ষণ?

কয়েক মিনিট পরেই রাজকুমার উঠিয়া গেল।

বিদায় নিয়া রাজকুমার তো ঘরের বাইরে চলিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে রিণি আবার আরম্ভ করিয়া দিল তার গানের প্র্যাকটিস। রাজকুমার তখন সবে সিঁড়ি দিয়া কয়েক ধাপ নামিয়াছে। রিণির গানের সেই অকথ্য করুণ সুর কানে পৌঁছানো মাত্র সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এত তাড়াতাড়ি রিণি নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারিয়াছে! সে তবে লজ্জা পায় নাই, অপমান বোধ করে নাই, বিশেষ বিচলিত হয় নাই? ব্যাপারটা রাজকুমারের বড়োই খাপছাড়া মনে হইতে লাগিল। সাগ্রহে মুখ বাড়াইয়া দিয়া চুম্বনের বদলে ধিক্কার শোনাটা এমন ভাবে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া তো মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

রেলিং ধরিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রাজকুমার ভাবিতে থাকে। তার ব্যবহারকে রিণি অসভ্যতা বলিয়াছিল। লজ্জা পাওয়ার বদলে সমস্ত ক্ষণ রিণির কথায় ব্যবহারে ও চোখের দৃষ্টিতে একটা অবজ্ঞা মেশানো অনুকম্পার ভাবই স্পষ্ট হইয়া ছিল। তখন রাজকুমার ভাবিয়াছিল, ও সব প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া। এখন তার মনে হইতে লাগিল, তার মনের সংকীর্ণতার পরিচয় পাইয়া প্রথমে একটু রাগ এবং তারপর বিরক্তি ও অনুকম্পা বোধ করা ছাড়া আর কোনও প্রতিক্রিয়াই বোধ হয় রিণির মনে ঘটে নাই। শ্রীমতী গিরীন্দ্রনন্দিনী ও তার মাকে আজ যেমন তার বর্বর মনে হইয়াছিল, তার সম্বন্ধেও রিণির ঠিক সেই রকম একটা ধারণাই সম্ভবত একটা ধারণাই সম্ভবত জন্মিয়াছে।

এবং সে জন্যই রিণিকে দোষ দেওয়া চলে না। সত্যিই সে রিণির সঙ্গে ছোটোলোকের মতো ব্যবহার করিয়াছে। কী আসিয়া যাইত রিণিকে চুম্বন করিলে? চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার চেয়ে এমন কী গুরুতর ব্যাপার নরনারীর আলগা চুম্বন? একটু প্রীতি বিনিময় করা, একটু আনন্দ জাগানো, মৈত্রীর যোগাযোগকে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্পষ্টতরভাবে অনুভব করা। রিণি তাই চাহিয়াছিল। কিন্তু নিজে সে গিরীন্দ্রনন্দিনীর পর্যায়ের মানুষ কিনা, চুম্বনের জের চরম মিলন পর্যন্ত টানিয়া না চলাটাও যে যুবকযুবতির পক্ষে সম্ভব এ ধারণাও তার নাই কিনা, তাই সে ভাবিতেও পারে নাই রিণির আহ্বানে সাড়া দিলেও তাদেব সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা বজায় থাকিবে, অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়া যাইবে না।

চুম্বন অবশ্য নরনারীর মিলনেরই অঙ্গ। সুপবিত্র কোনও আধ্যাত্মিক মিথ্যার ধোঁয়া সৃষ্টি করিয়া রিণির সঙ্গে তার চুম্বন বিনিময়কে সে ব্যাখ্যা করিতে চায় না। কেন সে ভাবিতে পারে নাই চুম্বনের ভূমিকাতেই সমাপ্তি ঘটানোর মতো সংযম তাদের আছে? চোখ মেলিয়া রিণির রূপ সে দেখিয়া থাকে, কাছাকাছি বসিয়া হাসিগল্পের আনন্দ উপভোগ করে, মাঝে মাঝে স্পর্শ বিনিময়ও ঘটিয়া যায় কিন্তু আত্মহারা হইয়া পড়ার প্রশ্নও তো তাদের মনে জাগে না। সে কি কেবল এই জন্য যে ওই পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতা দশজনে অনুমোদন করে? চুম্বন বিনিময়ের অনুমতি দেওয়া থাকিলে তো আজ তার মনে হইত না রিণিকে চুম্বন করা বিবেকের গায়ে পিন ফুটানো এবং একবার পিন ফুটাইলে একেবারে ছোরা বসাইয়া বিবেককে জখম না করিয়া নিস্তার থাকিবে না!

কেবল সে একা নয়, সকলেই এই রকম। অনেক পরিবারে পনেরো বছবের মেয়েরও বাপ ভাই ছাড়া কোনও পুরুষের সামনে যাওয়া বারণ। এমন একটি মেয়ে যদি কেবল চুপিচুপি দুটি কথা বলার জন্যও পাশের বাড়ির ছেলেটাকে ডাকে, ছেলেটা কী ভাবিবে? রিণি চুম্বন চাওয়াব খানিক আগে সে যা ভাবিয়াছিল।

এমন একটা বিকৃত আবেষ্টনীর মধ্যে তারা মানুষ হইয়াছে যে অস্বাভাবিক মিথ্যা অসংযমকেই তারা স্বাভাবিক সত্য বলিয়া জানিতে শিখিয়াছে। মানুষ কেবল পরের নয়, নিজেরও সংযমে বিশ্বাস করে না। অসংযমের চেয়ে সংযম যে মানুষের পক্ষে বেশি স্বাভাবিক, এ যেন কেউ কল্পনাও কবিতে পারে না।

হঠাৎ রিণির গান বন্ধ হইয়া যাওয়ায় রাজকুমার সচেতন হইয়া উঠিল যে, সিঁড়ির মাঝখানে সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি সে নীচে নামিয়া গেল।

নীচে হলঘরের এক কোণে অবনীবাবুর মেয়ে মালতী বসিয়া ছিল। সামনে ছোটো টেবিলটিতে একটি বই ও খাতা। খুব সম্ভব কলেজ হইতে ফিরিবার সময় স্যার কে এল-এর বাড়িতে ঢুকিয়াছে। এখানে একা বসিয়া দুহাতের আটটি আঙুলে টেবিলের উপর টোকা দিয়া টুকটাক আওয়াজ তুলিবার কারণটা রাজকুমার ঠিক বুঝিতে পারিল না। আট আঙুলে টোকা দেওয়ার কারণ নয়, এখানে একা বসিয়া থাকিবার কারণ। মালতী বড়ো চঞ্চল। চাঞ্চল্যটা শুধু আঙুলে সীমাবদ্ধ রাখিয়া সে যে স্থির

হইয়া বসিয়া আছে এটা সত্যই আশ্চর্যের ব্যাপার।

রাজকুমারকে দেখিবামাত্র টোকা দেওয়া থামিয়া গেল। চোখে মুখে তার যে দুষ্টামি ভরা চকিত হাসি খেলিয়া গেল, বনের হরিণী হাসিতে জানিলেও তার নকল করিতে পারিত না। সোজাসুজি তাকানোর বদলে মাথা একটু কাত করিয়া কোনাকুনি রাজকুমারের দিকে তাকাইয়া বলিল, এর মধ্যে তাড়িয়ে দিল?

তাড়িয়ে দিল মানে?

ও, তাড়িয়ে দেয়নি? আপনি নিজে থেকে চলে যাচ্ছেন। আমি ভাবলাম আপনাদের বুঝি ঝগড়া হয়েছে, আপনাকে তাড়িয়ে দিয়ে রিণি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

কাঁদছে নাকি?

দিনরাত কাঁদে মেয়েটা, সময় অসময় নেই। আচ্ছা অর্গান বাজিয়ে কাঁদে কেন বলুন তো? এ আবার কোন দেশি কান্না! আমি যদি কখনও কাঁদি, রিনির মতো আপনার জন্যেই কাঁদি, আমাকে আবাব একটা অর্গান কিনতে হবে নাকি?

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, রিণিকে জিজ্ঞেস করো অর্গান বাজিয়ে কাঁদে কেন। খুশি হয়ে তোমা' একটা চোখ কানা করে দেবেখন।

পুরোপুবি গম্ভীর হওয়া মালতীর পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার, যতটা পারে গাম্ভীর্যের ভান করিয়া সে বলিল, জিজ্ঞেস করিনি ভাবছেন বুঝি? ও যে আমাকে দুচোখে দেখতে পারেনা, আমিও কখনও ওদের বাড়ি আসি না, সেটা তবে কী জন্যে?

ওদের বাড়ি আসো না মানে? এই তো এসেছ সশরীরে।

আজকের কথা বাদ দিন। আজ না এসে উপায় ছিল না। কলেজ থেকে ফিরছি, দেখি আপনি সরাসবি এ বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। ব্যাপারটা ভালো করে না জেনে আর কী তখন বাড়ি ফিরতে পারি, আপনিই বলুন?

রাজকুমার রাগ করিয়া বলিল, ব্যাপার আবার কীসের? শরীরটা ভালো নেই, আজ ওর পার্টিতে আসতে পারব না, তাই বলতে এসেছিলাম।

মালতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার মতো সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা ঠিক। শরীর খারাপ বলে যে পার্টিতে আসতে পারবে না, সে নিজেই খারাপ শরীর নিয়ে খবরটা দিতে আসে বটে। বাড়িতে যখন একটার বেশি চাকর নেই।

অন্য দরকারও ছিল।

আমিও তো তাই বলছি।

দরকার ছিল মানে—

মানে বুঝিয়ে বলতে হবে না স্যার! এ তো অঙ্ক নয় যে আপনি বুঝিয়ে না দিলে মাথায় ঢুকবে না। তা চেয়ে বরং—কাছে আসিয়া গলা নামাইয়া ফিসফিস করিয়া বলিল,—সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ কী ভাবছিলেন তাই বলুন। বলুন না, কাউকে বলব না আমি, আপনার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।

মালতী কখনও তাকে স্যার বলে না। রাজকুমার তাকে পড়ায় বটে রোজ, কিন্তু ঠিক গুরুশিষ্যার সম্পর্কে তাদের নয়। তার কথা বলার ভঙ্গি রাজকুমারকে আরও বেশি বিব্রত করিয়া তুলিল। রিণির সঙ্গে সত্যসত্যই কিছু না ঘটিয়া থাকিলে হয়তো সে রাগ করিতে পারিত, যদিও মালতীর উপর রাগ করা বড়ো কঠিন। মালতী তামাশা করে, সব সময়ে সব বিষয়ে এ রকম হালকা পরিহাসের ভঙ্গিতেই কথা বলে, কিন্তু কখনও খোঁচায় না। পরিচিত সকলেই যেন তার কাছে নতুন জামাই আর সে তার মুখরা শ্যালিকা; মনে যদি কারও খোঁচা লাগে তার কথায়, সেটা তার মনের দোষ, মালতীর নয়।

হঠাৎ রাজকুমারের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।—কী দরকারে এসেছি, দেখবে? বলিয়া ঘরের একপাশে টেলিফোনের কাছে আগাইয়া গিয়া রিসিভারটা তুলিয়া নিল। কাল সে কাজে যাইতে পারিবে না রাজেনকে এই খবরটা দিয়া আরও কতগুলি আজেবাজে কথা বলিয়া রিসিভারটা নামাইয়া রাখিল।

দেখলে?

মালতী এতক্ষণ তার দুষ্টামির হাসি মুখে ফুটাইয়া রাখিয়াছিল, চার-পাঁচবার মাথা হেলাইয়া সায় দিযা বলিল, দেখলাম বইকী, নিশ্চয় দেখলাম। অমন কত দেখছি রোজ। শ্যামল করে কী জানেন, যখন তখন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয় আর আমাকে ডেকে বলে,—একটা ফোন করব। অন্য সবাই রয়েছে বাড়িতে, তাছাড়া ফোন করার জন্য কারও অনুমতি চাওয়ারও ওর দরকার নেই, কিন্তু আমাকে ডেকে ওর বলা চাই। আমি বলি, বেশ তো, ফোন করুন। তারপর এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে গল্প জমে যায়, বেচারির দরকারি ফোনটা আর করা হয় না।

কথার মাঝখানে রিণি ঘরে আসিয়াছিল। একবার বলিয়াছিল, মালতী নাকি?—কিন্তু মালতী তার দিকে চাহিয়াও দ্যাখে নাই। কথা শেষ হইতে সে তাই আবার বলিল, এই যে মালতী!

মালতী বলিল, হ্যাঁ, আমিই মালতী। চলুন রাজুদা, যাই। বড্ড দেরি হয়ে গেল।

এতক্ষণ রিণি মুখে মৃদু ও স্পষ্ট একটা বিরক্তির ভাবের উপর মাখানো ছিল সবিনয় ভদ্রতার প্রলেপ, এক মুহূর্তে সমস্ত মুছিয়া গিয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। এমনভাবে একবার সে ঢোক গিলিল যেন কড়াকড়া কতগুলি অভদ্র কথাই গিলিয়া ফেলিতেছে। মন চিরিয়া দেওয়ার মতো ধারালো দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড মালতীকে দেখিয়া হঠাৎ সে মুখ ফিরাইল রাজকুমারের দিকে।

শুনে যাও, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

মালতী ততক্ষণে আগাইয়া গিয়াছে বাহিরের দরজার কাছে, সেখান হইতে সেও তাগিদ দিয়া বলিল, শিগগির আসুন রাজুদা। দাঁড়াবেন না, চলে আসুন।

সুতরাং রাজকুমারের বিপদের আর সীমা রহিল না। তরুণী দুটির দৃষ্টি-বিনিময় দেখিয়া তার মনে হইতে লাগিল, এই বুঝি একটা খুনোখুনি ব্যাপার ঘটিয়া যায়। রাগে আর আত্মসংযমের চেষ্টায় রিণির সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মালতীর মুখখানা এখনও হাসি হাসি বটে, কিন্তু সে হাসি যেন লড়াই করার ধারালো অস্ত্র। চোখের পলকে চোখের সামনে দুটি ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে যে এমন একটা নাটক সৃষ্টি করিতে পারে, রাজকুমারের সে অভিজ্ঞতা ছিল না। আড়ালে আড়ালে ভূমিকার অভিনয়টা নিশ্চয় ঘটিয়া গিয়াছে, এ পর্যন্ত সে টেরও পায় নাই। যত আয়োজনই হইয়া থাক, আকাশে তো প্রথম মেঘ দেখা দেয়, তারপর বিদ্যুৎ চমকানোর সংকেত পাওয়া যায়, তারপর বজ্রপাত। এ যেন ঠিক বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটিয়া গেল।

কী করা যায় এখন? একজন তাকে ডাকিতেছে অন্দরে, একজন ডাকিতেছে বাহিরে। কারও ডাকে সাড়া দিবার উপায় নাই। নিজেকে যদি দুভাগ করিয়া ফেলা যায়, তবু দুজনকে খুশি করা যাইবে না। এমন হাস্যকর অথচ এমন গুরুতর অবস্থায় কী মানুষ কখনও পড়ে! রাজকুমার বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, দুজনের মধ্যে একটা সাময়িক ও কৃত্রিম আপস ঘটাইয়া দেওয়াও সম্ভব হইবে না। তার কাছে ছেলেমানুষি মনে হইতেছে, কিন্তু এটা ওদের ছেলেমানুষি নয় যে সমস্ত ব্যাপারটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে। তার কথার কোনো দাম এখন ওদের কাছে নাই। আর কিছুই আর কাছে এখন ওরা চায় না, শুধু চায় যে একজনের হুকুম মানিয়া আরেকজনের মাথা সে হেঁট করিয়া দিবে।

রিণি অধীর হইয়া বলিল, এসো?

মালতী হাসিমুখে বলিল, আসুন?

তখন রাজকুমার সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া মালতীকে বলিল, এদিকে এসো তো একটু।

মালতী বলিল, আবার ওদিকে কেন? চলুন যাই।

কিন্তু মালতী কাছে আসিল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতক ভীরু ও কাপুরুষ সৈনিকের মতো রাজকুমার তার পাশ কাটাইয়া পলাইয়া গেল বাহিরে। বাহির হইতে দরজার পিতলের কড়া দুটিতে বাঁধিয়া দিল পকেটের নস্যমাখা ময়লা রুমালটি। গেট পার হইয়া রাস্তায় পা দিয়া তার মনে হইতে লাগিল, মাথাধরাটা একেবারে সারিয়া গিয়াছে। একটু যেন কেবল ঘুরিতেছে মাথাটা, ছেলেবেলায় নাগরদোলায় অনেকক্ষণ প'ক খাইয়া মাটিতে নামিয়া দাঁড়াইবার পর যেমন ঘুরিত।

রিণি আর মালতী যে তারপর কমড়াকামড়ি করে নাই, সেটা জানা গেল সন্ধ্যার পর সরসীর মিটিংয়ে গিয়া।

রাজকুমার বাড়িতেই ছিল। শ্যামল একেবারে স্যার কে এল-এর গাড়ি লইয়া আসিয়া খবর দিল, সরসী ডাকিয়া পাঠাইযাছে, অবিলম্বে যাইতেই হইবে।

মালতীব কাছে আপনি যাবেন না শুনে সরসী একদম খেপে গেছে। শিগগির চলুন।

রাজকুমারের অচেনা এক ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড বাড়িতে মিটিং বসি বসি করিতেছিল। জন ত্রিশেক মেয়েপুরুষ উপস্থিত আছে। সকলে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে কিনা সন্দেহ, খুব সম্ভব সরসী সকলকে ঘাড় ধরিয়া টানিযা আনিয়াছে। রিণি এবং মালতীও উপস্থিত আছে। কারও মুখে আঁচড় কামড়ের দাগ নাই।

রাজকুমার এক ফাঁকে মালতীকে জিজ্ঞাসা কবিল, তারপব কী হল?

মালতী হাসিযা বলিল, কীসের পর?

আমি চলে যাবার পব?

কী আব হবে? ঘণ্টাখানেক গল্প করে আমিও চলে এলাম।

রাজকুমার বিশ্বাস করিল না। মাথা নাড়িয়া বলিল, উঁহু, মিছে কথা।

তখন মালতী তার দুষ্টামির হাসিকে সরল হাসিতে পরিণত করিয়া বলিল, সত্যি মিছে কথা। ওর সঙ্গে একঘণ্টা গল্প করতে হলে আমি দম আটকে মরে যেতাম না! সত্যি সত্যি কী হল তারপর শুনবেন? চাকর পাশের দরজা দিয়ে গিয়ে রুমালটা খুলে দিল। রিণি বলল, যাচ্ছ নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ যাচ্ছি। বলে চলে এলাম। আপনার রুমালটা আমার কাছে আছে, ওটা আর ফেরত পাচ্ছেন না।

তা না পেলাম। কিন্তু রিণি শুধু যাচ্ছ নাকি বলেছিল, যাচ্ছ নাকি ভাই বলেনি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। ও বলল, যাচ্ছ নাকি ভাই, আর আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই যাচ্ছি।

সরসী খুব সম্ভব এ বাড়ির মেয়েদের বুঝাইয়া সভায় আনিতে অন্দরে গিয়াছিল, লজ্জা সংকোচে একান্ত বিপন্না আট-দশটি মেয়ে বউকে গোরু তাড়ানোর মতো সভায় আনিয়া হাজির করিল। রাজকুমারকে দেখিয়াই অনুযোগ দিয়া বলিল, বেশ মানুষ তো? তোমার বক্তৃতার জন্য মিটিং, তুমি বলে বসলে আসতে পারবে না?

সরসীর রং একটু কালো, দেশের গড়নটি অপরূপ। অতি অপরূপ। কালো মেয়েরও যদি রূপ থাকে, তার মতো রূপসি মেয়ে সহজে চোখে পড়িবে না। সাধারণভাবে কাপড় পরার কোনো এক নতুন কায়দা সে আবিষ্কার করিয়াছে কিনা বলা যায় না, আবরণ যেন তার দেহশ্রীকে ঢাকা দেওয়ার বদলে ছন্দ দিয়াছে।

সমিতি গড়িতে আর মিটিং করিতে সরসী বড়ো ভালোবাসে। ঘরে তার মন বসে না, সারাদিন এইসব ব্যাপার নিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কখনও ব্যস্ত হয় না। সব সময় তাকে ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া মনে হয়। এদিক দিয়া সে মালতীর ঠিক উলটো। মালতী

চঞ্চল কিন্তু অলস, তার চাঞ্চল্য নাচের মতো, ছুটাছুটি বা কাজের নামেই তার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সরসী একদিনে পঞ্চাশটি জায়গায় কাজে যাইতে পারে অনায়াসে, কিন্তু চলে সে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া, আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে কথা, শান্ত দৃষ্টিতে তাকায়, কখনও উত্তেজিত হয় না।

প্রথমে যাকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার নোটিশে তিনি একেবারে শহর ছাড়িয়া পলাইয়া যাওয়ায় স্যার কে এল-কে প্রেসিডেন্ট করা হইয়াছে, সরসী ছাড়া আর কেউ তাকে এতটুকু সভায় আরেকজনের বদলিতে সভাপতিত্ব করিতে রাজি করাইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

সরসীই সভাপতিকে অভ্যর্থনা জানাইল, গাম্ভীর্য ও সহৃদয়তাব্যঞ্জক একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া স্যার কে এল এতক্ষণ যেখানে বসিয়াছিলেন, একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। তারপর সরসী বক্তা ও বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিচয়মূলক কয়েকটি কথা বলিয়া নিজেও বসিয়া পড়িল।

রাজকুমার একদৃষ্টিতে এতক্ষণ সরসীর দিকে চাহিয়া ছিল, শুধু তার এই বসিবার ভঙ্গিটি দেখিবার জন্য। সরসীর ওঠা-বসা চলাফেরার মধ্যে কী যেন একটা আকর্ষণ আছে, কেবলই তার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। সরসীর আকর্ষণ তার কাছে খুব বেশি জোরালো নয়, কিন্তু সরসীর প্রত্যেকটি সর্বাঙ্গীণ অঙ্গ সঞ্চালন মৃদু একটা উত্তেজনা জাগাইয়া তাকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

উঠবেন না?

অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য লজ্জিতভাবে রাজকুমার বক্তৃতা দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্প্রতি সে মাস চারেক মাদ্রাজে কাটাইয়া আসিয়াছে, আজ তাকে মাদ্রাজের নাবীজাতির সাধারণ অবস্থা ও প্রগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হইবে। একবার রাজকুমার মালতীর দিকে চাহিল। তাকে সচেতন করিয়া দিয়া মালতী ঘাড়ের পিছনটা খুঁটিতে খুঁটিতে দুষ্টামির হাসি মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, এখনও সে হাসি তেমনই স্পষ্ট হইয়া আছে। মালতীর এই হাসি দেখিয়া হঠাৎ সরসীর উপর রাজকুমারের বড়োই রাগ হইয়া গেল। চার মাস একটা দেশে থাকিয়াই সে দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার মতো জ্ঞান একজন সঞ্চয় করিয়া আসিতে পারে, এমন কথা সরসীর মনে হইল কেমন করিয়া? মাথার কি ঠিক নাই মেয়েটার? কী সে বলিবে এখন এতগুলি লোকের সামনে!

কী বলিবে আগে হইতেই কিছু কিছু সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু মনের মধ্যে সব এমনভাবে এখন জড়াইয়া গিয়াছে যে কী বলিয়া আরম্ভ করিবে ভাবিয়া পাইল না। তিনবার বক্তৃতা শুরু করিয়া তিনবার থামিয়া গেল। কান তার গরম হইয়া উঠিল। লজ্জায় নয়, আতঙ্কে। শেষ পর্যন্ত কিছুই যদি বলিতে না পারে, এমনিভাবে তোতলার মতো দু-চারটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া যদি তাকে বসিয়া পড়িতে হয়!

অবরুদ্ধ উত্তেজনায় সভা থমথম করিতেছে, একটা অঘটন ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে, তারই প্রত্যাশার উত্তেজনা। মরিয়া হইয়া মনে মনে রাজকুমার বলিতে থাকে, একটা কিছু করা দরকার, দু-একসেকেণ্ডের মধ্যে তার কিছু করা দরকার, শুধু ওইটুকু সময় হয়তো তার এখনও আছে। বক্তব্য? নাই বা রহিল বক্তব্য তার বক্তৃতার? বড়ো বড়ো কথা নাই বা সে বলিতে পারিল? যা মনে আসে বলিয়া যাক, অন্তত বক্তৃতা তো দেওয়া হইবে। চুপ করিয়া এ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকার চেয়ে সে অনেক ভালো।

একবার সে চাহিল রিণি মালতী সরসীর দিকে, তারপর বলিতে আরম্ভ করিল। মাদ্রাজের মেয়েদের সম্বন্ধে? কী সে বলিবে মাদ্রাজের মেয়েদের সম্বন্ধে? যে চিরন্তন রহস্য যুগে যুগে দেশে দেশে নারীজাতিকে দুর্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে, মাদ্রাজের মেয়েরা তো তার কাছে সে রহস্যের ঘোমটা খুলিয়া তাদের জানিবার বুঝিবার সুযোগ তাকে দেয় নাই। সুতরাং সাধারণ ভাবে দু-চারটি কথা বলাই ভালো। গরম কান ঠান্ডা হয়, কথার জড়তা কাটিয়া যায়, মৃদু মৃদু রহস্যের সুরে কখনও গম্ভীর ও কখনও হাসিমুখে রাজকুমার বলিয়া যায়। মাঝে মাঝে তার মনে হইতে থাকে বটে যে

সে আবোল-তাবোল বকিতেছে, কিন্তু নারীজাতি সম্বন্ধে তার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সভার মেয়েরা একেবারে অভিভূত হইয়া যায়।

রাজকুমার আসন গ্রহণ করিলে শ্যামল উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারের চেয়ে বয়সে দু-একবছরের ছোটো হইলেও লম্বা-চওড়া চেহারা আর মুখের ভারিক্কি গড়নের জন্য তাকেই বড়ো দেখায়। এতক্ষণ সে মালতীর পাশে মুখভার করিয়া বসিয়াছিল। তীব্রদৃষ্টিতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে নিজের মনে বিড়বিড় করিয়া মন্তব্য করিতেছিল : পাগলের মতো কী যে বকে লোকটা! মাথা খারাপ নাকি? যত সব চালবাজি!

মালতী ছাড়া আর কেউ মন্তব্যগুলি শুনিতে পাইতেছিল কি না বলা যায় না, একটা অত্যধিক কড়া কথা কানে যাওয়ায় মালতী একবার শুধু বলিয়াছিল : কী বললেন?

আপনাকে বলিনি। রাজুদা কী রকম আবোল-তাবোল বকছেন, শুনছেন তো? দাঁড়ান, ওঁর বাহাদুরি ভেঙে দিচ্ছি। মেয়েদের ধোঁকা দিয়ে—

কী করবেন?

দেখুন না কী করি।

ছোটোলোকের স্বপ্ন-কাম্য খেলনা পাওয়ার মতো রাজকুমারকে জব্দ করার কী যেন একটা সুযোগ পাইয়া সে সযত্নে পুষিয়া রাখিতেছে, ফাঁক করিতে চায় না, ভাগ দিতে চায় না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইতে তার উদ্দেশ্য কতকটা আন্দাজ করিয়া মালতী চাপা গলায় বলিল, না না থাক, বসুন। তার পাঞ্জাবির প্রান্ত ধরিয়া আলগোছে একটু টানও সে দিল, কিন্তু শ্যামল বসিল না।

আপনি কিছু বলবেন শ্যামলবাবু। এদিকে আসুন। সরসী বলিল।

এখান থেকেই বলি?

আচ্ছা বলুন।

অনেকগুলি চোখের, তার মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েলি চোখ, প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টি মুখে আসিয়া পড়িয়াছে অনুভব করিয়া এক মুহূর্তের জন্য শ্যামলের উৎসাহ যেন উপিয়া গেল। এখন মালতী আর একবার তার পাঞ্জাবির কোণ ধরিয়া একটু টানিলেই সে হয়তো বসিয়া পড়িত। অসহায়ের মতো এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে তাঁর চোখে পড়িয়া গেল, রাজকুমারের মুখে মৃদু অমায়িক হাসি ফুটিয়া আছে, ছোটোছেলে বাহাদুরি করিতে গেলে স্নেহশীল উদার গুরুজন যেমন প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন।

দেখিয়া শ্যামলের মাথা গরম হইয়া গেল

আমার কথা শুনে আপনারা অনেকেই ক্ষুণ্ণ হবেন। আমাকে কয়েকটি অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হবে। বিশ্বনারী বা মাদ্রাজি মহিলাদের সম্বন্ধে নতুন কিছু আপনাদের শোনাবার জন্য আমি উঠে দাঁড়াইনি, রাজকুমারবাবুর বক্তৃতার কয়েকটা মারাত্মক ভুল দেখিয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগতভাবে রাজকুমারবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি, উনি আমার অনেকদিনের বন্ধু—

রাজকুমারের মুখে আর হাসির চিহ্নও ছিল না। কী সর্বনাশ, এতগুলি লোকের সামনে তাকে অপদস্থ করার জন্য শ্যামল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে! নিরীহ শান্ত ভালোমানুষ শ্যামল। রাজকুমারের কোনো সন্দেহই ছিল না যে সে অনেক ভুল করিয়াছে। এখন তার আতঙ্ক জন্মিয়া গেল যে ভুলগুলি নিশ্চয় সাধারণ তুচ্ছ ভুল নয়, শ্যামল চোখে আঙুল দিয়া ভুলগুলি দেখাইয়া দিলে তার আর মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় থাকিবে না। সাংঘাতিক হাস্যকর ভুল না হইলে শ্যামল কি সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারিত? না জানি কী ভাবিবে সকলে, মনে মনে কত হাসিবে, তার জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতার খোলসটা যখন শ্যামল ছিঁড়িয়া ফেলিতে থাকিবে। রাজকুমারের সর্বাঙ্গ ঘামিয়া গেল। এতদিন সে জানিত, তার সম্বন্ধে মানুষ কী ধারণা পোষণ করে সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র মাথাব্যথা

নাই, এই সমস্ত অল্পবুদ্ধি অগভীর নরনারীর মতামতকে সে গ্রাহ্যও করে না। এক মুহূর্ত আগেও সে নিজের কাছে স্বীকার করিত না বক্তৃতা না জানিলে মন তার খারাপ হইয়া যাইবে। এখন শ্যামলের উদ্যত আঘাতে নিজের বাহাদুরির প্রাসাদ ভাঙিয়া পড়ার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, লোকে তাকে কী ভাবে তা কত দামি তার নিজের কাছে। অবজ্ঞার ভয়ে মরণ কামনা করার মতো দামি সকলের তাকে বাহাদুর মনে করা।

রাজকুমারের অপরিচিত একটি মেয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেখিলেই বুঝা যায় সে খাঁটি মাদ্রাজি মেয়ে। আর দশজন মেয়ের মধ্যে বসিয়াছিল বলিয়া এতক্ষণ সে রাজকুমারের নজরে পড়ে নাই, আসরে খাঁটি একজন মাদ্রাজি মেয়ে উপস্থিত আছে জানিলে রাজকুমারের বক্তৃতাটা আজ কী রকম দাঁড়াইত কে জানে।

মেয়েটি বলিল, রাজকুমারবাবু নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন। ভুল দেখিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে কি? এটা ডিবেটিং সোসাইটির মিটিং নয় আশা করি?

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ঠিক তো, রাজকুমার যাই বলিয়া থাক, তার বক্তৃতার সমালোচনা করিবার কী অধিকার শ্যামলের আছে?

স্যার কে এল হাসিমুখে বলিলেন, শ্যামল রাজকুমারের ভুল দেখিয়ে দিচ্ছে না, আমাদের যাতে ভুল ধারণা না জন্মায় সে জন্য নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছে। কী বলো শ্যামল?

শ্যামল তাড়াতাড়ি বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। যেমন ধরুন রাজকুমারবাবু বিশ্বের নারীজাতির বিস্ময়কর মিলের কথা বলেছেন। পৃথিবীর যে কোনো একটি দেশের পুরুষের সঙ্গে অন্য যে কোনো একটি দেশের পুরুষের যতটা পার্থক্য দেখা যায়, দুটি দেশের মেয়েদের পার্থক্য নাকি তার চেয়ে অনেক কম। কথাটা কি ঠিক? আমাদের দেশের পুরুষেরা যখন বিলিতি পুরুষদের সাজপোশাক চালচলন অনুকরণ করে তখন অতটা খারাপ দেখায় না, কিন্তু মেয়েরা ও দেশের মেয়েদের অনুকরণ করলে সেটা উদ্ভট আর হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় পুরুষ সহজেই সাজপোশাক চালচলনে তো বটেই, প্রকৃতিতে পর্যন্ত সাহেব হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মেয়েরা কোনোদিন মেমসাহেব হতে পারে না। রাজকুমারবাবু যে বিশ্বের নারীজাতির কথা বলেছিলেন তার কারণ বিশ্ব শব্দের একটা মোহ আছে, প্রথমে সকলকে বিশ্বের কথাটা মনে পড়িয়ে দিলে সকলের মন উদার হয়ে যায়, বাজে কথাও সকলে বড়ো বড়ো অর্থে গ্রহণ করে। ও একটা প্যাঁচ ছাড়া কিছু নয়। রাজকুমারবাবু—

মাদ্রজি মেয়েটি আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ জানাইল, এটা কি ব্যক্তিগত আক্রমণ হচ্ছে না?

স্যার কে এল হাসিমুখেই সায় দিয়া বলিলেন, খানিকটা হচ্ছে বইকী!

শ্যামল জোর দিয়ে বলিল, না না, ব্যক্তিগত আক্রমণ হবে কেন, রাজকুমারবাবুর সঙ্গে তো আমার শত্রুতা নেই! আমি বলছিলাম, মাদ্রাজের নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে রাজকুমারবাবুর ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, তিনি তাই বিশ্বের নারীজাতির কথা তুলেছিলেন, সমগ্রতার অস্পষ্টতায় যাতে খুঁটিনাটির অভাবটা চাপা পড়ে যায়। মাদ্রাজের নারীরাও বিশ্বের নারীজাতির অন্তর্গত বইকী। মাদ্রাজের নারীদের সম্বন্ধে রাজকুমারবাবু যে সব কথা বলেছেন তার অধিকাংশই বিশ্বের যে কোনো দেশের নারীজাতির সম্বন্ধে বলা যায়। মাদ্রাজি মেয়েদের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা রাজকুমারবাবু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যুগোপযোগী সংস্কারকে অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করবার অশিক্ষিতপটুতা তাদের নাকি বিস্ময়কর। স্কুল কলেজের শিক্ষার হিসাবে তারা নাকি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষ করে বাংলার তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছেন, কিন্তু জীবনযাত্রাকে নতুন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় সব প্রদেশকে হার মানিয়েছেন। এ ধারণা রাজকুমারবাবু যে কোথায় পেলেন কল্পনা করা কঠিন। মাদ্রাজের মেয়েরা তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিশেষ কোনো সংস্কারের আমদানি করেছেন, অথবা ও বিষয়ে তাঁদের উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দেখা গিয়াছে বলে তো মনে হয় না। নতুন আলো লাগা আর

সেই আলোয় নতুন দৃষ্টিতে জীবনকে যাচাই করার অসুবিধা ও সুযোগের অভাব অন্য সব প্রদেশের মতো মাদ্রাজের মেয়েদেরও কিছুমাত্র কম নয়।

রাজকুমার চুপ করিয়া শুনিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, এইবার সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সব সময় তার মুখে যে মৃদু একটু বিবর্ণতার ছাপ থাকে, রাগে এখন তাহা মুছিয়া গিয়াছে। তবু সে শান্ত কণ্ঠেই বলিল, আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারনি শ্যামল। আমি বলেছি অন্য প্রদেশের চেয়ে মাদ্রাজে মেয়েরা পরিবর্তনকে গ্রহণ করছে একটু ব্যাপকভাবে, সামান্য হলেও তার ব্যাপ্তি আছে। বাংলায় মেয়েদের খুব সামান্য একটা অংশ অনেক এগিয়ে গেছে, তাদের সংখ্যা এত কম যে ধর্তব্যের মধ্যে বলা চলে না। বাকি সকলে অর্থাৎ বাংলা দেশের মেয়ে বলতে যাদের বুঝায় তারা পড়ে আছে একেবারে পিছনে। মাদ্রাজের মেয়েদের একটা ক্ষুদ্র অংশ-বিশেষ এ ভাবে এগিয়ে না গিয়ে সকলে মিলে অল্পঅল্প অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাপারটা কেমন হয়েছে জানো, বাংলায় একটুখানি নারীপ্রগতি যেন সঞ্চিত হয়েছে কাচের সরু নলে, গভীরতা আছে কিন্তু ব্যাপ্তি নেই। আর মাদ্রাজের নারীপ্রগতিটুকু সঞ্চিত হয়েছে থালায়, গভীরতা নেই কিন্তু বিস্তার আছে। আমি মনে করি, মৃতদেহের একটা আঙুল প্রাণ পেয়ে যতই তিড়িংতিড়িং করে লাফিয়ে জীবনের প্রমাণ দিক, তার চেয়ে সর্বাঙ্গে একটুখানি প্রাণ সঞ্চার হয়ে শরীরটা যদি এক ডিগ্রিও গরম হয়, তাও অনেক ভালো।

রাজকুমার ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার ডবল উপমার ধাক্কায় শ্যামলের এতক্ষণের বড়ো বড়ো কথাগুলি যেন ধূলা হইয়া বাতাসে উড়িয়া গেল।

কিন্তু শ্যামল তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারকে জব্দ করিতে উঠিয়া নিজে জব্দ হইয়া আসন গ্রহণ করার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিল না। প্রাণপণ চেষ্টায় একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সে বলিতে গেল, রাজকুমারবাবু যে সব—

রিণি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখনও মাদ্রাজে গেছেন শ্যামলবাবু?

শ্যামল দমিয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল, আমি—? না, যাইনি।

ও! কিছু মনে করবেন না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

শ্যামল বোধ হয় আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, সুযোগ পাইল না। পাঞ্জাবির ডানদিকের পকেটে তার এমন জোরে টান পড়িল যে আপনা হইতেই সে বসিয়া পড়িল।

মালতী বলিল, চুপ করে বসে থাকুন।

কেন? আমার যা বলবার আছে—

চুপ। একটি কথা নয়। মুখ বুঁজে বসে থাকুন।

না বসব না। আমি যাই।

বসে থাকুন। সকলের সঙ্গে যাবেন।

মালতীর চাপা গলার তীব্র ধমকে শ্যামল যেন শিথিল, নিস্তেজ হইয়া গেল।

তারপর রিণি যখন সভাশেষের গান ধরিয়াছে, মেয়েরা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা আরম্ভ করিয়াছে, মাদ্রাজি মেয়েটির সঙ্গে সরসী রাজকুমারের পরিচয় করাইয়া দিল। মেয়েটির নাম রুক্মিণী, সরসীর সঙ্গে পড়িত। এখন নিজে আর পড়ে না, একটি স্কুলে মেয়েদের পড়ায়।

আপনি সুন্দর বলেছেন।

'রাজকুমার সবিনয়ে হাসিল।

আমি ভাবছিলাম একজন বাঙালি ভদ্রলোক আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বলবেন, এ তো ভারী আশ্চর্য, আমাদের দেশের মেয়েদের কথা তিনি ভালো করে জানবেন কী করে? খুব আগ্রহ নিয়ে তাই আপনার কথা শুনতে এসেছিলাম। ভারী খুশি হয়েছি আপনার বক্তৃতা শুনে। কেবল একটা কথা—দ্বিধা ও সংকোচের ভঙ্গিতে রুক্মিণী এতক্ষণ ইতস্তত করিল যে রাজকুমারের মনে হইল কথাটা বুঝি শেষ পর্যন্ত না বলাই সে ঠিক করিয়াছে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে।

আচ্ছা, মাদ্রাজের দু-চারজন মেয়েও কি বাংলার কাচের নলের মেয়েদের—মানে, যাঁরা খুব এগিয়ে গেছেন তাঁদের হতে পারেননি?

রাজকুমার ব্যস্ত হইয়া বলিল, তা পেরেছেন বইকী, অনেকেই পেরেছেন।

রুক্মিণী খুশি হইয়া বলিল, থ্যাঙ্কস।

তাই বটে। একজন মাদ্রাজি মেয়েও যদি চরম-বাঙালি মেয়েদের সমান না হইতে পারিয়া থাকে, রুক্মিণী তবে দাঁড়ায় কোথায়? রাজকুমার মনে মনে ভাবিল, রুক্মিণী মেয়েটি বেশ।

সকলের আগে স্যার কে এল বিদায় নিলেন। তাঁর অম্বলের অসুখ, লাইট রিফ্রেশমেন্টও সহ্য হইবে না। তা ছাড়া, এই সব ছেলেমানুষদের সভায় যদি বা এতক্ষণ থাকা গিয়াছিল, সভা এখন বৈঠকে পরিণত হইয়াছে, এখন আর থাকা চলে না। তাঁর কাজও আছে।

রাজকুমার বলিল, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই।

পথে স্যার কে এল আপন মনেই নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন, উপভোগ্য একটা রসিকতার রস যেন মন হইতে তার কিছুতেই মিলাইয়া যাইতেছে না।

অনেকদিন আগে এমনই একটা আসরে উপস্থিত ছিলাম রাজু। বিলাতে।

এমনি আসর?

অবিকল এই রকম। ইয়ং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। আমার মতোই একজন আধবুড়োকে প্রেসিডেন্ট করেছিল। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ রাজু? অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা সভা করে কিন্তু প্রেসিডেন্ট করে বুড়োকে? কম বয়সি কাউকে প্রেসিডেন্ট করতে বোধ হয় তাদের হিংসা হয়। কিংবা হয়তো প্রেসিডেন্ট বলতেই এমন একটা গম্ভীর জবরদস্ত মানুষ বোঝায় যে বুড়ো ছাড়া প্রেসিডেন্টের আসনে কাউকে বসাবার কথা তারা ভাবতেও পারে না।

রাজকুমার হাসিল।—বর্ণনাটা কিন্তু আপনার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

স্যার কে এল-ও হাসিলেন। কিছু কিছু খাপ খায় বইকী। বয়স তো হয়েছে, আমি হলাম অতীতের জীব, তোমাদের কাছে আমি এখন বুড়ো, স্থিতি লাভ করেছি। আমাকে প্রেসিডেন্টের আসনে বসিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চপলতা করা কত সুবিধা বলো তো!

চপলতা স্যার কে এল?

চপলতা রাজু, নিছক চপলতা। তোমাদের কপাল ভালো, এত সহজে এত সস্তায় চপল হতে পার। আমার আধ বোতল শ্যাম্পেন দরকার হয়, তিন চারটা ককটেল। তাও কি তোমাদের মতো চপলতা আসে! হয় দার্শনিক চিন্তা আসে, নয় ঘুম পায়।

স্যার কে এল-এর বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড়াইল। স্যার কে এল কিন্তু নামিলেন না।

এককাপ কফি খেয়ে যাবে রাজু?

কফি? কফি খেলে রাত্রে ঘুম হয় না।

রাজকুমার নামিয়া গেল। আসর তার ভালো লাগে নাই, বক্তৃতা শুনিয়া সকলে খুব হইচই করিয়াছে বটে শেষের দিকে, নিজে কিন্তু সে ভুলিতে পারে নাই আগাগোড়া সবটাই তাব ফাঁকি; সকলকে ভাঁওতা দিয়া সে হাততালি পাইয়াছে এবং একটু চিন্তা করে এমন যারা আসরে ছিল তাদের কাছে তার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সাফল্যের আনন্দের সঙ্গে সে তাই লজ্জাও বোধ করিয়াছিল, এখনও করিতেছে। শ্যামলের ব্যবহারেও মনটা বড়ো বিগড়াইয়া গিয়াছিল। তবু সেখানে যেন বাতাসে পাখা মেলিয়া উড়িয়া বেড়ানোর মতো হালকা মনে হইয়াছিল নিজেকে। তখন বুঝিতে পারে নাই। এখন স্যার কে এল-এর সঙ্গে এতটুকু পথ গাড়িতে আসিয়া এমন ভারী বোধ হইতেছে নিজ সত্তাকে যে সাধ যাইতেছে ফুটপাতে গা এলাইয়া শুইয়া পড়ে।

স্যার কে এল ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, ক্লাব।

বাড়ির দরজা পর্যন্ত আসিয়া স্যার কে এল ফিরিয়া গেলেন ক্লাবে এবং কোথাও যাইবার

কথা ভাবিতে না পারিয়া রাজকুমার ফিরিয়া গেল নিজের ঘরে।

আবার কি মাথা ধরিয়াছে তার? কেমন একটা ভোঁতা যন্ত্রণা বোধ হইতেছে মাথার মধ্যে। চারকোণা ঘরের বাতাস যেন চারিদিক হইতে মাথায় তার চাপ দিতেছে।

রাজকুমার মালতীকে পড়াইতেছিল।

সারাদিন অবিরাম বর্ষণের পর বৃষ্টি থামিয়াছিল সন্ধ্যার একটু আগে, কিন্তু মেঘ তখনও আকাশ ঢাকিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল। যে কোনো মুহূর্তে আবার ঝমাঝম ধারাপাত শুরু হইয়া যাইতে পারে।

প্রথমে মালতী ভাবিয়াছিল, আজ কি রাজকুমার এই বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাকে পড়াইতে আসিবে? তারপর আবার তার মনে হইয়াছিল, পড়াইতে যে রকম ভালোবাসে রাজকুমার, যতটুকু সময়ের জন্যই হোক বৃষ্টিটাও যখন থামিয়াছে, হয়তো সে আসিতেও পারে।

তাই, রাজকুমার আসিবে কি আসিবে না ঠিক না থাকায় দুপুরের গুমোটের স্বেদে আত্মগ্লানিময় শরীরটাকে সযত্ন প্রসাধনে একটু চাঙা করিয়া তুলিয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াই সে অপেক্ষা করিতেছিল।

না আসে রাজকুমার নাই আসিবে। যদি আসে—

রাজকুমার আসিল এবং কোনো রকম ভূমিকা না করিয়াই পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কেবল পড়িতে নয় পড়াইতে সে খুব পটু। মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অনেক সময় কথার অভাবে তাকে মূক হইয়া থাকিতে হয় কিন্তু আলাপ আলোচনার উপরের স্তরের চিন্তাগুলিকে খুব সহজেই শব্দের রূপান্তর দিতে পারে। কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার সময় সে মশগুল হইয়া যায়।

পড়ার সময় মালতীও কোনো রকম দুষ্টামি করে না। ইচ্ছাও হয় না, সাহসও পায় না। এ সময় বাজে কথায় রাজকুমার বড়ো বিরক্ত হয়। একদিন স্বভাব দোষে অতি হালকা আর অতি সূক্ষ্ম একটা খোঁচা দেওয়া রসিকতা করিয়া বসায় রাগ করিয়া রাজকুমার তিন দিন তাকে পড়াইতে আসে নাই। পড়ানোর জন্য রাজকুমার বেতন পায়, তবু।

বৃষ্টি না থামিলে হয়তো রাজকুমার মালতীকে আজ পড়াইতে আসিত না।

বিশ্বজগতের সম্রাট আজ আর সে নয়, সন্ধ্যার আগে বৃষ্টি আসার সময় পর্যন্ত সে যা ছিল। মানুষের মনের এটা কী জটিল রাজনীতির ব্যাপার কে জানে, সারাদিনের অবিরাম বর্ষণ হঠাৎ থামিয়া যাওয়াকে উপলক্ষ করিয়াই এক মুহূর্তে রাজা ভিখারি হইয়া যায়। বেশ ছিল সে সারাদিন। সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখিয়াছিল, রোদ নাই, জমাট বাঁধা কালো মেঘের গভীর ছায়া নামিয়াছে। কী যে তৃপ্তি বোধ হইয়াছিল রাজকুমারের তারপর বৃষ্টি নামিতে জাগিয়াছিল উল্লাস, জীবনে ফাঁকি ছিল না, অপূর্ণতা ছিল না, নিজের ঘরটিতে বন্দি হইয়া থাকিয়াও মনে হইয়াছিল বাহিরের যে জগৎ জলে ভাসিয়া যাইতেছে তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কীসের? ঘরে বন্দি থাক দেহ, কোটি বছর অমনই তৃপ্তি আর আনন্দের সঙ্গে মন রাজত্ব করুক নিজের রাজ্যে।

তারপর বৃষ্টি থামিয়া গেল। মেঘের ওপারেও তখন রোদ নাই। মেঘের ছায়া ধীরে ধীরে ঢাকিয়া যাইতেছে গাঢ়তর রাত্রির ছায়ায়। তখন মনে হইয়াছিল,' বৃষ্টি যখন নাই, এবার বাহির হওয়া যাইতে পারে—বাড়ির বাহিরে যে জগতে গিরি, রিণি, সরসী আর মালতী বাস করে সেই জগতে। কিন্তু এই বাদল দিনের শেষে বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হওয়া যায়, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো যায়

যত খুশি, ওদের কারও বাড়ি যাওয়ার অজুহাত তো তার নাই! যার কাছেই যাক, সে ভাবিবে ভিখারি আসিয়াছে ঃ রাজাকে ভিখারি সাজিয়া আসিতে দেখিয়া শুধু কথা ও হাসি ভিক্ষা দিতেই কত যে কার্পণ্য করিবে কে জানে!

ওরা কেউ তো বুঝিবে না কীভাবে সারাদিন ঘরে আটক থাকিয়াও একাই সে অনেক হইয়া নিজের জগৎ ভরিয়া রাখিয়াছিল, আবার কীভাবে সে একা হইয়া গিয়াছে, চারজনের একজনের সঙ্গেও দুটি কথা বিনিময়ের সুযোগ পর্যন্ত নাই বলিয়া মন তার কেমন করিতেছে।

না বুঝিলে কী আসিয় যায়? নিজেকে সে যে ভুলিতে আসিয়াছে এ কথা মনে করার বদলে যদি অন্যকে ভুলাইতে আসিয়াছে ভাবে, কী ক্ষতি আছে তাতে? মনে মনে না হয় ওরা কেউ একটু হাসিবে না হয় বলিবে মনে মনে, হে আত্মভোলা মহাপুরুষ, তোমার এত দিনের উদাসীন অবহেলার ফাঁকিটা তবে আজ ধরা পড়িয়া গেল? হে সিনিক, শেষ পর্যন্ত আমিই তবে তোমাকে রোমান্সের মধুতে ডুবাইয়া দিয়াছি? এই হাসি হাসিবার এবং এই কথা বলিবার অধিকার ওদের চিরন্তন, একদিন না হয় অধিকারটা সে খাটাইতে দিল?

কিন্তু মন মানে নাই রাজকুমারের। উপযাচকের কলঙ্ক জুটিবার ছেলেমানুষি ভয়ের জন্য নয়, এই কলঙ্ক যে আরোপ করিবে তারই ভয়ে। যে জটিল সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে ওদের সঙ্গে তার জট খুলিবে না, কেউ সহজ হইতে পারিবে না। একা থাকিতে না পারিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু এ একাকীত্ব যে তার কাছে অর্থহীন, দুর্বোধ্য রহস্যের মতো কাছে বসিয়া কথা বলিলে, কাছে আসিয়া এক হওয়ার খেলা খেলিলে যে এই একাকীত্বের দুঃখ তার ঘুচিবে না, এ সত্য অন্যের কাছে কোনো মতেই সত্য হইয়া উঠিবে না। মানুষ দুটি থাকিবে আড়ালে, একের সত্যতা শুধু পীড়ন করিবে অপরকে।

কেবল মালতীর কাছে যাওয়ার একটা বাস্তব অজুহাত আছে। মালতীও অনেক কিছু মনে করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু পীড়ন করার সুযোগ পাইবে না। বেতন পায় তাই বাদল অগ্রাহ্য করিয়া পড়াইতে আসিয়াছে, এই বর্ম গায়ে আঁটিয়া কিছুক্ষণ মালতীর সঙ্গে কাটাইতে পারিবে। তা ছাড়া, কথা আর হাসি ওখানে দরকার হইবে না, বাড়তি অস্বস্তির যন্ত্রণা জুটিবে না। পড়ানো তার কাজ— বেতনভোগীর নিছক কর্তব্য পালন করা। সেটুকু করিলেই চলিবে।

বাহিরে আবার যখন বৃষ্টি নামিল, ঘরের মধ্যে রাজকুমার বোধ হয় তখন ভুলিয়াই গেল কোথায় বসিয়া কাকে সে পড়াইতেছে। শুকনো কথার শব্দ জলের শব্দে খানিকটা চাপা পড়িয়া গেল। ভালো করিয়া শুনিবার জন্য টেবিলের উপর হাত রাখিয়া মালতী সামনের দিকে আরও ঝুঁকিয়া বসিল।

রাজকুমার হঠাৎ থামিয়া গেল, সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল, তুমি কিছু শুনছ না মালতী।

শুনছি। সত্যি শুনছি। কী করে জানলেন শুনছি না?

আমি জানতে পারি।

মালতী নীরবে আস্তে আস্তে কয়েকবার মাথা নাড়িল। অর্থাৎ সেটা সম্ভব নয়, কিছু জানিবার ক্ষমতা রাজকুমারের নাই।

রাজকুমার শ্রান্তভাবে একটু হাসিল। যাকগে, আজ পড়াতে ভালো লাগছে না।

ভালো লাগছে না।

মালতী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসু চোখ তুলিল। অর্থাৎ তাই যদি হয়, এতক্ষণ মশগুল হইয়া তুমি তবে কী করিতেছিল?

রাজকুমার চেয়ারটা পিছনে ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পুবের দেওয়াল ঘেঁসিয়া দুটি

বইভরা আলমারি অযথা গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, রাজকুমারে মনের গাম্ভীর্যের রূপধরা ব্যঙ্গের মতো হাজার মানুষের মনের যে গঞ্জনাকে প্রাণপণে সংগ্রহ করিয়া সে মনকে ভারী করিয়াছে, আলমারির এই বইগুলির চেয়ে তার ওজন কম নয়। চাপ দেওয়া ওজন—বুকের উপর বইগুলি স্তূপ করিয়া রাখিলে শুধু কাগজের যে চাপে পাঁজর ভাঙিয়া যাইতে চাহিবে, অদেহী অক্ষরের পেষণ তার চেয়ে ভারী।

একদিকের দুটি জানালাই খোলা। এদিক দিয়া ছাট আসে না। পাশের একতলা বাড়ির ফাঁকা ছাতে বৃষ্টিধারা আছড়াইয়া পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। বইয়েব আলমাবি ছাড়িয়া রাজকুমার জানালার গেল আবার ফিরিয়া আসিল।

এখন যাই মালতী।

বৃষ্টি পড়ছে যে?

তাই বটে, বৃষ্টি পড়িতেছে। মালতী যখন মনে পড়াইয়া দিয়াছে এখন বৃষ্টি মাথায় করিয়া চলিয়া যাওয়া অসম্ভব। মালতীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া রাজকুমার বলিল, নোট নিয়েছ?

চতুষ্কোণ টেবিলের অন্য তিনদিকের যেখানে খুশি দাঁড়াইয়া এ প্রশ্ন করা চলিত, মালতীর খাতাও দেখা চলিত। কিন্তু চতুষ্কোণ ঘরের মতোই চতুষ্কোণ টেবিলও মাঝে মাঝে প্রান্তরের বিস্তৃতি পায়, এত দূর মনে হয় একটি প্রান্ত হইতে আর একটি প্রান্ত!

মালতীর খোলা খাতার সাদা পৃষ্ঠা দুটিতে একটি অক্ষরও লেখা হয় নাই, দুটি পৃষ্ঠার যোগরেখার উপর লিখিবার কলমটি পড়িয়া আছে। রাজকুমার হাত বাড়াইয়া পাতা উলটাইয়া দেখিতে গেল অন্য পৃষ্ঠায় কিছু লেখা আছে কিনা। তার বুকে লাগিয়া মালতীর মাথাটিও নত হইয়া গেল। বাজকুমারের আঙুলে তারের মতো সরু একটি আংটি, তাতে একবিন্দু জলের মতো একটি পাথর। দুহাতে সেই আংটি পরা হাতটি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আরও মাথা নামাইযা আংটির সেই পাথবটিতে মুখ ঠেকাইয়া মালতী চুপ কবিয়া পড়িয়া রহিল। সে যেন পিপাসায় কাতর, জল-বিন্দুর মতো ওই পাথরটি পান কবিয়াই পিপাসা মিটাইতে চায়।

তখন এক কোমল অনুভূতির বন্যায় রাজকুমারের চিন্তা আর অনুভূতির জগৎ ভাসিয়া গেল, মনে হইল শুধু মমতায় এবার তার মরণ হইবে। মালতীর একটি চুলের জন্য তার এ কী মায়া জাগিয়াছে। এক মুহূর্তের বেশি সহ্য করাও কঠিন এমন এই আত্মবিলোপ। মালতীকে বিশ্বজগতের রানি করিয়া দিলে তার সাধ মিটিবে না, ফুলের দুর্গে লুকাইয়া রাখিলে ভয় কমিবে না, তাই শুধু মালতী ছাড়া কিছুই সে রাখিতে চায় না, নিজেকে পর্যন্ত নয়।

কয়েক মুহূর্তে শ্রান্ত হইয়াই সে যেন ধীরে ধীরে মালতীর চুলে মাথা রাখিল।

মুখ তোলো, মালতী।

মালতী মুখ তুলিল। তারপর ব্যস্তভাবে উঠিয়া সরিয়া গেল।

রাজকুমার বলিল, কী হয়েছে মালতী?

মালতী মৃদুস্বরে বলিল, শ্যামল এসেছে।

কোথায় শ্যামল?

মালতী ততক্ষণে খোলা দরজার কাছে আগাইয়া গিয়াছে। দরজার বাহিরে গিয়া সে ডাকিল, শ্যামল?

শ্যামল চলিয়া যাইতেছিল, বারান্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। জামা কাপড় তার ভিজিয়া চুপসিয়া গিয়াছে। দরজার বাঁ দিকের আধভেজানো জানালাটির নীচে মেঝেতে অনেকখানি জল জমিয়া আছে। শ্যামলের গা বাহিয়া তখনও জল পড়িতেছিল।

মালতী বলিল, এ কী ব্যাপার শ্যামল?

শ্যামল বলিল, একটা ফোন করতে এসেছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি নামল—

রাজকুমার আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের আগে তার চোখে পড়িল জলে ভেজা শ্যামলের উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। শিশু যেন হঠাৎ ভয় পাইয়া দিশেহারা হইয়া গিয়াছে।

মালতী বলিল, বৃষ্টি নেমেছে অনেকক্ষণ, এতক্ষণ ভিজে কাপড়ে কী করছিলে? বৃষ্টি যখন নামল, বাড়ি ফিরে গেলে না কেন? রাস্তায় ভিজে গেলে, তবু ফোন করতে এলে কী বলে?

জেরায় কাতর শ্যামল বলিল, দরকারি ফোন কি না, ভাবলাম একটু ভিজলে আর কী হবে! একটা শুকনো কাপড় আর গেঞ্জি দেবে আমাকে?

মালতী দ্বিধা করিল, যতক্ষণে দ্বিধার ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে ততক্ষণ, তারপর বলিল, শুকনো কাপড় দিয়ে কী করবে, রাস্তায় নামলেই তো কাপড় আবার ভিজে যাবে। একেবারে বাড়ি গিয়ে কাপড় ছাড়ো। বড়ো ছেলেমানুষ তুমি,—সত্যি।

একখানা শুকনো কাপড় দিয়া বৃষ্টি ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে না দিয়া ভিজা কাপড়ে তাকে একরকম তাড়াইয়া দেওয়া হইল। শ্যামল হয় মালতীর কথার মানেই বুঝিতে পারিল না অথবা বুঝিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না, এমনই এই অদ্ভুত বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সে খানিকক্ষণ মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর নীরবে বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ঘরে গিয়া টেবিলের দুপাশের দুটি চেয়ারে বসিয়া দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। মালতীর মুখখানি অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে-ই অস্ফুটস্বরে বলিল, শ্যামল সব দেখেছে।

সব? সব মানে কী? রাজকুমার আশ্চর্য হইয়া গেল। জানালা দিয়ে দেখছিল?

হ্যাঁ তুমি যখন পড়াও, প্রায়ই এসে বারান্দায় কেউ না থাকলে জানালা দিয়ে উঁকি দেয়।

রাজকুমার আরও আশ্চর্য হইয়া গেল। প্রাণপণে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, তার মানে—?

মালতী সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই। এমন ছেলেমানুষ আর দেখিনি। একটু বয়স বাড়লেই এ ভাবটা কেটে যাবে জানি, তবু এমন বিশ্রী লাগে মাঝে মাঝে! এ সব নীরব পূজার ন্যাকামি কোত্থেকে যে শেখে ছেলেরা!

ছেলেরা! যাদের সঙ্গে কলেজে পড়ে মালতী তারা কচি ছেলের দলে গিয়া পড়িয়াছে, এতই সে বুড়ি! রাজকুমারের এবার আপনা হইতেই হাসি আসিল।

একখানা শুকনো কাপড় চাইল, তাও দিলে না?

খুব অন্যায় হয়ে গেছে, না? একটু উদ্‌বেগের সঙ্গেই মালতী জিজ্ঞাসা করিল। তারপর মাথা নিচু করিয়া বলিল, দিতাম, অন্যদিন হলে দিতাম। আজ কাপড় দিলে বসে থেকে আমাদের জ্বালাতন করত।

আর পড়বে?

না। কী হবে পড়ে?

বলিয়া অনেকক্ষণ পরে মালতী তার দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসিল।

বৃষ্টি থামিল রাত্রি দশটার পর।

রাস্তায় কিছু কিছু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, জুতা ভিজাইয়া বাড়ির দিকে চলিতে চলিতে নিজেকে বড়ো নোংরা মনে হইতে লাগিল রাজকুমারের। পথের সমস্ত ময়লা যেন জলে ধুইয়া তারই পায়ে লাগিতেছে।

গলির মধ্যে তার বাড়ির সামনে শ্যামলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রাজকুমার ঠিক আঘাত পাওয়ার মতোই চমক বোধ করিল। এখনও শ্যামলের জামা কাপড় ভিজিয়া চপচপ করিতেছে। মালতীর বাড়ি হইতে বাহির হইবার পর হইতে এতক্ষণ সে কি এখানে দাঁড়াইয়া আছে? অথবা

বাড়ি হইতে শুকনো জামাকাপড় পরিয়া আসিয়া আবার জলে ভিজিয়াছে?

আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে রাজকুমারবাবু।

এসো না, ভেতরে এসো।

না, এখানে দাঁড়িয়েই বলি।

রাজকুমার একটু রাগ করিয়া বলিল, শ্যামল, মালতীর কথা বলবে বুঝতে পারছি, কিন্তু ভিজে কাপড়ে জালকাদায় দাঁড়িয়ে না বললে কি চলবে না তোমার? এমন ছেলেমানুষ তো তুমি ছিলে না, কী হয়েছে তোমার আজকাল? বলিয়া রাজকুমার দরজার কড়া নাড়িল।

দরজা খুলিবার সময়টুকুর মধ্যে শ্যামল একবার কয়েক পা আগাইয়া আবার আগের জায়গায় গিয়া দাঁড়ায়। যেন ঠিক করিতে পারিতেছে না রাজকুমারের বাড়িতে ঢুকিবে কি ঢুকিবে না। ভিতরে গিয়া তাকে রাজকুমারের একবার ডাকিতে হয়।

শ্যামল আগেও কয়েকবার রাজকুমারের কাছে আসিয়াছে, মনোরমা তাকে চিনিত। তাকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠে, ভিজে চুপচুপে হয়ে এত রাতে তুমি কোথা থেকে এলে ভাই? ও কালী, কালী, তোর রাজুদার ঘর থেকে একখানা শুকনো কাপড় এনে দে শিগগির।

গিরির সমবয়সি একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়ায়। গিরির চেয়ে তার স্বাস্থ্য ভালো, বোধ হয় সেই জন্যই তার মুখে কচিডাবের খানিকটা স্নিগ্ধ লাবণ্য আছে। মনোরমার তাগিদ সহিতে না পারিয়া রাজকুমার সরসীর সভার পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বর গিয়া কালীকে নিয়া আসিয়াছে।

রাজকুমারের সঙ্গে এত বড়ো (বারো তেরো কম বয়স নয় গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের) মেয়েকে পাঠানো সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিয়া মনোরমা আগেই মাসির কাছে পত্র দিয়াছিল, তবু কালীর মা মেয়েকে একা ছাড়িয়া দিতে সাহস পায় নাই। কালীর সঙ্গে তার সাত বছরের একটি ভাইও আসিয়াছে।

কালী বলে, কী দিদি?

মনোরমা বলে, বললাম যে? শুকনো কাপড় নিয়ে আয় রাজুদার ঘর থেকে।

মনোরমার উদারতায় মনে মনে রাজকুমারের হাসি পায়। শ্যামলের জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, আহা, অসুখ যদি করে ছেলেটার? ভাবিয়া বড়ো ব্যাকুল হইয়াছে কিনা মনোরমা, তাই, হাতের কাছে আনলাতে স্বামীর শুকনো কাপড় আলনাতেই থাক, রাজকুমারের ঘর হইতে কাপড় আনা হোক একখানা কালীকে দিয়া। এত হিসাব করিয়া অবশ্য মনোরমা কথাটা বলে নাই। তার মনেও আসে নাই এ মানে। এটা শুধু অভ্যাস।

থাক, আমার ঘরে গিয়েই কাপড় ছাড়বেখন।

বলিয়া শ্যামলকে নিয়া রাজকুমার ঘরে চলিয়া যায়। কালী মুচকি মুচকি হাসিতেছে দেখিয়া মনোরমা রাগের সুরে বলে, হাসছিস যে?

কালী তেমনিভাবে হাসিতে হাসিতেই বলে, তুমি যেন কী দিদি! বলিয়া এক দৌড় দেয় ঘরের মধ্যে, সেখানে তার মুচকি হাসি শব্দময় হইয়া উঠে!

ঘরে একটিমাত্র চেয়ার, একটির বেশিকে স্থান দেওয়া মুশকিল। শ্যামল সেই চেয়ারে বসে, রাজকুমার পা ঝুলাইয়া বসে তার খাটের বিছানায়।

এখন তার মনে হইতে থাকে, রাস্তায় সংক্ষেপে কথা সারিয়া শ্যামলকে বিদায় দিলেই ভালো হইত। শ্যামলকে ও ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হঠাৎ অতখানি মমতা ও সহানুভূতি বোধ করিয়াছিল কেন কে জানে! মনে হইয়াছিল, ধীর স্থির শান্তভাবে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ওর মানসিক বিপ্লব যতটুকু পারা যায় শান্ত করার চেষ্টা করা তার কর্তব্য। মর্মাহত ছোটো ভাইটির মতো ছেলেটাকে কাছে টানিয়া সান্ত্বনা না দিলে অন্যায় হইবে। কারণ তার বয়স বেশি, অভিজ্ঞতা বেশি, জ্ঞান বেশি, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বেশি!

এমন খারাপ লাগিতেছে এখন! উপদেশ দিয়া এই বয়সের দুরন্ত হৃদয়াবেগ সম্পন্ন

ছেলেমানুষটিকে শান্ত করা! সে তো পাগলামির শামিল।

এবার বলো শ্যামল, কী বলতে চাও।

একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া শ্যামল অন্যদিকে তাকায়, হঠাৎ কিছু বলিতে পারে না। এ তো জানা কথাই যে মনের মধ্যে তার ঝড় চলিতেছে, কথা আরম্ভ করা তার পক্ষে সহজ নয়। বাড়ির সামনে রাস্তায় ঝোঁকে হয়তো অনেক কথাই সে বলিয়া ফেলিতে পারিত, এতক্ষণের ভূমিকার পর খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে।

আপনি ওকে বিয়ে করবেন?

শ্যামলের কথা শুনিয়া রাজকুমার কিছুমাত্র আশ্চর্য হইল না। এইরকম প্রশ্ন সে প্রত্যাশা করিতেছিল।

এ কথা জিজ্ঞাস করছ কেন?

আপনি তা বুঝতে পারছেন।

না, বুঝতে পারছি না। তুমি মালতীর অভিভাবক নও, আত্মীয়ও নও। আমাকে এ প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নেই।

আমার অধিকার আছে।

শ্যামল এমন জোরের সঙ্গে কথাটা ঘোষণা করিল যে কথাটার সহজ মানে বুঝিতে রাজকুমারের একটু সময় লাগিল। মনে হইল সত্যসত্যই সম্পর্কে অন্য অধিকারও বুঝি শ্যামলের আছে।

কীসের অধিকার তোমার? তুমি নিজে মালতীকে বিয়ে করতে চাও, এই অধিকার?

শ্যামলের মেরুদণ্ড সিধা হইয়া গেল। সোজা রাজকুমারের চোখের দিকে চাহিয়া স্পষ্ট উচ্চারণে প্রত্যেকটি কথায় জোর দিয়া দিয়া সে বলিল, বিয়ে করি বা না করি, ওকে আমি স্নেহ করি। আপনাদের ও সব কথার মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না, সোজাসুজি এই বুঝি যে মালতীর এতটুকু ক্ষতি হলে আমার সহ্য হবে না। সেই দাবিতে আপনাকে স্পষ্ট একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি, সোজা ভাষায় জবাব দিন।

তুমি বড়ো ছেলেমানুষ শ্যামল।

বাজে কথা বলে লাভ কী?

তারপর দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া গেল।

শ্যামল খালি গায়ে বসিয়া আছে, রাজকুমারের শুকনো কাপড়খানা শুধু সে পরিয়াছে, জামা গায়ে দেয় নাই। প্রয়োজনের বেশি সামান্য একটু ভদ্রতাও সে যেন রাজকুমারের কাছে গ্রহণ করিতে চায় না। সুন্দর ছিপছিপে গড়ন তার দেহের, বোধ হয় অল্পদিন আগে ব্যায়াম আরম্ভ করিয়াছে, পেশিগুলি স্পষ্ট ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে কিন্তু এখনও কঠিন হয় নাই। প্রথম হইতেই রাজকুমার কেমন মৃদু একটা ঈর্ষা বোধ করিতেছিল। এতক্ষণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সুগঠিত মাংসপেশির জন্য একজন তরুণকে সে হিংসা করিবে? এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কী হইতে পারে! কিন্তু ছেলেটার তেজ দেখিয়া রাগে ভিতরটা জ্বালা করিতেছে জানিয়া, গলা ধাক্কা দিয়া ছেলেটাকে বাড়ির বাহির করিয়া দিবার ইচ্ছা জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে হইতেছে বলিয়া, ঈর্ষার অস্তিত্বটা আর নিজের কাছে অস্বীকার করা গেল না।

একটু আগে যার উপর গভীর মমতা জাগিয়াছিল, এখন তাকে আঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে, মালতীর প্রতি তার প্রথম যৌবনের ভাবপ্রবণ অন্ধ ভালোবাসার সুযোগ নিয়া হীন কাপুরুষের মতো অকারণ নিষ্ঠুর আঘাত করিবার সাধ জাগিতেছে।

শ্যামল বলিল, বলুন? জবাব দিন?

তুমি যাও শ্যামল।

আমার কথাটার জবাব দিন আগে? আপনার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দিন, আমি এক সেকেন্ডও আপনাকে জ্বালাতন করব না।

মুখখানা শ্যামলের কালো হইয়া গিয়াছিল, রাজকুমারের সাড়াশব্দ না পাইয়া হাতের উলটা পিঠ দিয়া সজোরে সে একবার কপালটা মুছিয়া ফেলিল। কপাল তার ঘামিয়া উঠিয়াছে।

বুঝতে আমি পারছি, উদ্দেশ্য ভালো হলে এত ইতস্তত করতেন না। তবু আপনার মুখ থেকে একবার শুনতে চাই।

শুনে কী করবে?

প্রশ্নটা যেন বুঝিতেই পারিল না, এমনই ভাবে শ্যামল খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, কী করব? তা জানি না। আপনি তো জানেন আমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

তুমি শুধু জানতে চাও?

এক মুহূর্তে রাজকুমার যেন নিজেকে ফিরিয়া পাইল। কী ছেলেমানুষিই এতক্ষণ সে করিয়াছে এই ছেলেমানুষের সঙ্গে! জীবনের কেনা-বেচার হাটে যাকে শুধু খেলনা দিয়া ভুলানো যায়, তার সঙ্গে এত সাবধানতার সঙ্গে শুরু করিয়াছে সুখদুঃখ হাসিকান্নার পণ্য নিয়া বুঝাপড়ার তর্ক!

রাজকুমার একটা সিগারেট ধরাইল, কথা কহিল ধীরে ধীরে, অন্তরঙ্গভাবে, বন্ধুর মতো।

তোমাকে একটা কথা বলি শ্যামল। মালতীকে তুমি ভালোবাসো। তোমার এ ভালোবাসা দুদিনের নয় নিশ্চয়? বিয়ে না হলেও চিরদিন তুমি মালতীকে ভালোবেসে যাবে নিশ্চয়?

কিন্তু—

কিন্তু জানি। তুমি বলতে চাও, তোমার কথা আলাদা। মালতীর জীবনে এতটুকু দুঃখ আনার চেয়ে মরে যাওয়া তুমি ভালো মনে কর। কারণ, তুমি যে ভালোবাসো মালীতকে। টোকা দিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া গলার সুব বদলাইয়া,—কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসি না, তাই আমার সম্বন্ধে তোমার দুর্ভাবনার সীমা নেই। তোমার মতে, ভালোবাসাটা তোমার একচেটিয়া সম্পত্তি, এ জগতে আর কেউ ভালোবাসতে পারে না, আর কারও ভালোবাসার অধিকার নেই।

অন্তত আপনার নেই।

শুনিয়া আহত বিস্ময়ে রাজকুমারের মুখে কথা ফুটিল না।

শ্যামল একটু ইতস্তত করিয়া আবার বলিল, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, সে শ্রদ্ধা বজায় থাকলে মালতীর সম্বন্ধে আমার এতটুকু ভাবনা হত না। কিন্তু আপনি নিজেই আমার শ্রদ্ধা ভেঙে দিয়েছেন।

সেদিন সভায় তোমায় অপদস্থ করেছিলাম বলে?

না। গিরির সঙ্গে কুৎসিত ব্যবহার করেছিলেন বলে।

তারপর শ্যামল চলিয়া যাওয়ার আগে আরও যে দু-চারটি কথা বলিল, রাজকুমারের কানে গেল না। যেমন বসিয়াছিল তেমনিভাবে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন অকথ্য গালাগালি দিয়াই তবে গিরীন্দ্রনন্দিনীর জননী তাকে রেহাই দেয় নাই, প্রায়শ্চিত্তের জেরটা যাতে আরও টানিয়া চলিতে হয় তার ব্যবস্থাও করিয়াছে।

গিরীন্দ্রনন্দিনীর সঙ্গে তার কুৎসিত ব্যবহারের সংবাদ আরও কত লোকে জানিয়াছে কে জানে।

জীবনে এই প্রথম মিথ্যা দুর্নামের সংস্পর্শে আসিয়া রাজকুমারের মন যেন দিশেহারা হইয়া গেল। কতবার ভাবিল যে, লোকে যা খুশি ভাবুক, তার কী আসিয়া যায়, সে তো কোনো অন্যায় করে নাই! সে কেন জ্বালাবোধ করিবে তার সম্বন্ধে কে কোথায় কী মিথ্যা ধারণা পোষণ করিতেছে ভাবিয়া? কিন্তু জ্বালা সে বোধ করিতেই লাগিল। অন্যায় না করুক, সেদিন ভুল সে করিয়াছিল, বোকামি করিয়াছিল। ভুলের শাস্তিও মানুষকে পাইতে হয় বইকী। গরম চায়ে পর্যন্ত মুখ পুড়িয়া

যায়।

এ দুর্নামের প্রতিবাদে তার কিছু বলিবার উপায় পর্যন্ত নাই। শ্যামলকে সমস্ত ব্যাপারটি খুলিয়া বলিলেও সে বুঝিত না, বিশ্বাসও করিত না। শ্যামলের মতো অন্য সকলেও বুঝিবে না, বিশ্বাস করিবে না। নীরবে এ অপবাদ তাকে মানিয়া নিতে হইবে।

এমনই যখন মানসিক অবস্থা রাজকুমারের, অবরুদ্ধ নিরুপায় ক্রোধের উত্তেজনায় ভিতরটা যখন তার ফেনার মতো ফাটিয়া যাইতে চাহিতেছে, আর সমস্ত জগতের উপর ভয়ংকর একটা প্রতিশোধ নেওয়ার অন্ধ কামনা জাগিয়াছে, তখনকার মতো জগৎকে পাওয়া না গেলেও হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই আঘাত করার জন্য ছটফট করিতেছে, ঘরে তখন আসিল কালী।

বলিল, দিদি ডাকছে, খেতে চলুন।

গিরির সমবয়সি কালী। গিরির মতো সেও সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বর্বরতার আবহাওয়ায় মেছুনি মায়ের কোলে মানুষ হইয়াছে। গিরিকে নিয়া একটা বদনাম যখন তার রটিয়াছে, কালীকে নিয়া আর একটা বদনামও রটুক। রটুক, কী আসিয়া যায়? মনটা শান্ত হওয়ার সময় পাইলে নিজের খাপছাড়া খেয়ালে নিজেরই তার হাসি পাইত। এখন মনে হইল, খেয়ালটা না মিটাইতে পারিলে কোনওমতেই তার চলিবে না।

কালী, শোনো।

কালী নির্ভয়ে কাছে আগাইয়া আসিল।—কী?

তোমার নাড়ি আছে কালী? অসুখ হলে ডাক্তাররা হাত ধরে যে পালস দ্যাখে, সেই নাড়ি। আছে না? ও পালস সবারই থাকে।

কালীর মুখে কৌতুকের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তোমার পালস নেই। এক একটি মেয়ের থাকে না।

পালস না থাকলে কেউ বাঁচে? মরে গেলে তখন পালস থাকে না। এই দেখুন—কালী ডান হাতটি বাড়াইয়া দিল।

কবজি ধরিয়া নাড়ি পরীক্ষার সুবিধা দেওয়ার জন্য ঘেঁষিয়া আসিল আরও কাছে।

তখন খেয়াল করে নাই, কিন্তু মনের মধ্যে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তির সময় রাজকুমারের মনে পড়িয়াছে, হাত ধরামাত্র গিরীন্দ্রনন্দিনী কেমন যেন শক্ত হইয়া গিয়াছিল। কালীর কৌতুকের হাসি আর নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব রাজকুমারের মনে অসন্তোষ জাগাইয়া তুলিল। এ রকম হওয়ার তো কথা নয়!

ইস! তোমার পালস তো ভারী দুর্বল কালী?

কালীর হাসি মিলাইয়া গেল।

সত্যি?

তোমার হার্ট নিশ্চয় ভারী দুর্বল।

আমি তো জানি না।

দেখি তোমার হার্ট—?

গিরির হৃৎস্পন্দন শুধু সে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিল, কালীর হৃৎস্পন্দন সে পরীক্ষা করিতে গেল এক হাতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়া যাইতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণে কালী নিস্পন্দ হইয়া রহিল, তারপর রাজকুমারের হাত সরাইয়া দিয়া নিজেও একটু তফাতে সরিয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া শঙ্কিত প্রশ্ন আর মৃদু ভয় ও ভর্ৎসনা দু-চোখে ফুটাইয়া রাজকুমারের দিকে চাহিয়া রহিল। এক মুহূর্ত পরে ছুটিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

রাজকুমার ভাবিল, এবার মনোরমা আসিবে। আসিয়া অকথ্য গালাগালি শুরু করিয়া দিবে।

মনোরমা আসিল। অনুযোগও দিল।

খাবে না রাজুভাই?

হ্যাঁ, যাই।

কালী নিশ্চয় মনোরমাকে কিছু বলে নাই। কালী ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাওয়ার যতটুকু সময়ের মধ্যে মনোরমা তাকে খাইতে ডাকিতে আসিয়াছে তার মধ্যে এত বড়ো একটা গুরুতর কথা কালীর বলা ও মনোরমার শোনা সম্ভব নয়। গিরির মতো এক নিশ্বাসে সমস্ত বিবরণ হয়তো কালী জানাইতে পারিবে না। ব্যাপারটার একটু আভাস দিয়াই তার মুখে আর কথা ফুটিবে না। মনোরমাকে তখন খুঁটিয়া খুঁটিয়া জেরা করিয়া সব জানিতে হইবে। তাতে কিছু সময় লাগিবার কথা। মনোরমার গালাগালিটা তবে ভবিষ্যতের জন্য তোলা রহিল?

খাইতে বসিয়া রাজকুমাব ঘাড় হেঁট করিয়া খাইয়া যায়। কাল মনোরমার হুকুমে কালী পরিবেশন করিয়াছিল। মনোরমা কি আজও তাকে ডাকিবে? ডাকিলে কালী যদি না আসে? ব্যাপার বুঝিতে গিয়া মনোরমা যদি সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝিয়া আসে? কী বিপদেই মনোবমা পড়িবে তখন! একটা মানুষকে খাওয়াইতে বসাইয়াছে, তার খাওয়াও নষ্ট করিতে পারিবে না, মনের রাগ চাপিযাও রাখিতে পারিবে না।

কালীকে তোমার কেমন লাগে রাজুভাই?

মুখের ভাতটা গিলিতে রাজকুমারকে তিনবার চেষ্টা করিতে হইল।

ভালোই লাগে।

বড়ো লাজুক হয়েছে মেয়েটা। কিছুতে তোমার সামনে আসতে চায় না। তা বড়োসড়ো হয়ে উঠছে, একটু লজ্জা হবে বইকী। চোদ্দো পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়েছে।

কালীর বয়সটা রাজকুমার জানিত, তার সাদাসিদে মা-টি রাজকুমারের কাছে বলিয়া ফেলিযাছিল। কালীর বয়সটা মনোরমা একেবারে দুবছর বাড়াইয়া দিতে চায কেন প্রথমটা রাজকুমার বুঝিযা উঠিতে পারিল না। তারপর একটা অবিশ্বাস্য কথা মনে আসায অবাক হইয়া মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তোমার নামে কালী কিন্তু আমার কাছে একটা নালিশ করেছে রাজুভাই।

মনোরমার মুখে কৌতুকের হাসি। চোখ দিয়া তার হাসি দেখিতে দেখিতে কান দিয়া তার কথা শুনিয়া রাজকুমারের যেন কিছুক্ষণের জন্য ধাঁধা লাগিয়া গেল। কালী তবে নালিশ করিয়াছে? কালীর নালিশ শুনিয়া মনোরমা তাকে অনুযোগ দিতেছে সকৌতুকে!

তুমি নাকি ওকে মিউজিয়াম দেখাতে নিয়ে যাবে বলেছিলে? বিকেলে আমায় বলছিল, তুমি নাকি ভারী খারাপ লোক, কথা দিয়ে কথা রাখো না। আমি বললাম, যা না, বলগে না তুই তোর রাজুদাকে? তা মেয়ে বলে কী, লজ্জা করে দিদি!

জলের গেলাস তুলিয়া রাজকুমার গেলাসের অর্ধেকটা খালি করিয়া ফেলিল। খাওয়ার পর অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসিয়া রাজকুমার সিগারেট টানিতেছে, দরজার কাছে বিছানো বারান্দার বালবের আলোয় একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। ছায়া আর নড়ে না। মনোরমার ছায়া নিশ্চয় নয়। ছায়া ফেলিয়া কারও ঘরের বাহিরে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া থাকার ধৈর্য মনোরমার নাই।

রাজুদা?

রাজকুমার সাড়া দিতেই কালী ঘরে আসিল।

মশলা নিন।

প্রতিফলিত আবছা আলোয় হাত বাড়ানো দেখা যায়। রাজকুমারের হাতের তালুতে মনোরমার সযত্নে প্রস্তুত মশলা দিয়া কালী বলল, আঁধার দেখে এমন ভয় করছিল! জানি আপনি আছেন, তবু ভাবছিলাম, যদি না থাকেন? আঁধারে আমি বড্ড ডরাই।

আলোটা জ্বালো।

জ্বালবো?

কালী বোকা নয়, কিছু শুধু জানে না। ইঙ্গিত ও সংকেতের ভাষা এখনও শেখে নাই। মালতী সরসী বা রিণি যদি ছুটিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার একঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া এভাবে ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, জ্বালব?—একটি শব্দে কী মহাকাব্যই সৃষ্টি হইয়া যাইত। কালী শুধু প্রশ্নের ভঙ্গিতে তার কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে।

আলো জ্বালিয়া কালী চলিয়া গেলে রাজকুমার ভাবে, অভিধান নিরর্থক। শব্দের মানে তারাই ঠিক করে, যে বলে আর যে শোনে কাজ ও উদ্দেশ্যের বেলাতেও তাই। কী ব্যাপক মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা!

বর্ষা শেষ হইয়াছে।

মাঝে মাঝে বাতাসে হঠাৎ যে শীতের আমেজ পাওয়া যায় এখনও তা ভিজা ভিজা মনে হয়, কান্নার শেষে তোয়ালে দিয়া মুছিয়া নেওয়ার পর মালতীর গালের শীতল স্পর্শের মতো। কালী মার কাছে চলিয়া গিয়াছিল, কয়েকদিনের জন্য আবার আসিয়াছে। মনোরমার তাড়া নাই, বিফল হাওয়ার ভয়ও যেন নাই। কালীর দেহে যৌবনের বিকাশে যেমন এতটুকু ব্যস্ততা দেখা যায় না অথচ বিকাশ তার অনিবার্য গতিতে ঘটিতেই থাকে, মনোরমার অভিযানও তেমনই ধীর স্থির মন্থর গতিতে গড়িয়া উঠে। খেলার ছলে হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করার বিরুদ্ধে কালীর প্রতিবাদ যেমন রাজকুমারের অজ্ঞাতসারেই তিলেতিলে হুকুম হইয়া মাথা তুলিতে আরম্ভ করে, তাকে ঘিরিয়া মনোরমার জাল বোনাও তেমনি হইয়া থাকে তার অদৃশ্য।

কালীকে মনোরমা কখনও বেশি সাজায় না, তার ঘরোয়া সাধারণ সাজেই বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। কালীর একরাশি কালো চুল আছে, কোনোদিন মনোরমা লম্বা বিনুনি ঝুলাইয়া দেয়, কোনোদিন রচনা করে ফুলানো ফাঁপানো খোঁপা। সকালে ঘরের কাজ করার সময় কালীর গায়ে সাদাসিধে ভাবে জড়ানো থাকে নিমন্ত্রণে যাওয়ার জমকালো দামি শাড়ি, বিকালে সযত্ন প্রসাধনের পর তাকে পরিতে হয় সাধারণ মিলের কাপড়।

সকালে কালী কাতর হইয়া বলে, ভালো কাপড়খানা নষ্ট হয়ে যাবে যে দিদি?

মনোরমা বলে, হোক। আঁচলটা জড়া দিকি কোমরে, ঘর দোর ঝাঁট দে রাজুর। খাটের তলাটা ঝাঁটাস ভালো করে।

বিকালে আরও বেশি কাতর হইয়া কালী বলে, এটা নয় দিদি, পায়ে পড়ি তোমার, ওটা পরি এখন, আবার খুলে রাখব একটু পরে?

মনোরমা বলে, না, অত ফ্যাশন করে কাজ নেই তোমার। গরিবের মেয়ে গরিবের মতো থাকো।

কাছে টানিয়া আদর করিয়া বলে, বোকা মেয়ে, ছেঁড়াকাপড়ে তোকে যে বেশি সুন্দর দেখায় রে।

রাজকুমারের কাছে, সে আপশোষ করে, বড়ো চপল মেয়েটা রাজু, বড়ো চঞ্চল!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে, তাও বলি, মেয়ে যেন মানুষের মন কাড়তে জন্মেছে? কী দিয়ে এমন মায়া জাগায় ছুঁড়ি ভগবান জানেন। ডাইনি এসে জন্মায়নি তো মানুষের পেটে? কদিনের জন্য তো এসেছে, সেখানে পাড়াসুদ্ধ সবাই অস্থির, রোজ সবাই জিজ্ঞেস করে, কালী কবে ফিরবে গো কালীর মা? যদুবাবু মস্ত বড়োলোক ওখানকার, বংশ একটু নিচু, তার গিন্নি মাসিকে এখন থেকে সাধাসিধে করছে, ছেলে বিলেত থেকে ফিরলে কালীকে আমায় দিয়ো কালীর মা।

তবে তো কালীর বিয়ের জন্য কোনো ভাবনাই নেই।

কে ভাবে ওর বিয়ের জন্যে?

মনোরমার কাছে এ সব শোনে আর কালীকে রাজকুমার একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে। তার মনে হয়, কেবল কথাবার্তা চাল চলন শিক্ষদীক্ষার দিক হইতে নয়, কালীর গড়নটি পর্যন্ত যেন ঘরোয়া ছাঁচের, বহুকাল আগে মিসেস বেলনসের আঁকা গত শতাব্দীর বাঙালি নারীর ছবির আদর্শে কালীর দেহ গড়িয়া উঠিতেছে।

এ রকম মনে হয় কেন? সাজ-পোশাকের এমন কোনো নতুনত্ব তো কালীর নাই যে জন্য এ রকম একটা ধারণা জন্মিতে পারে। সাধারণ বাঙালি সংসারের আর দশটি মেয়ের মতোই তার সাধারণ বেশভূষা। অন্য কোনো মেয়েকে দেখিয়া তো আজ পর্যন্ত তার মনে হয় নাই, দেয়াল আর ঘোমটার আড়ালে শুধু একজনের দৃষ্টিকে বিহ্বল করার জন্য তার রূপযৌবন, দেহটি শুধু তার সেবা আর গৃহকর্মের উপযোগী?

রিণি, সরসী আর মালতীর সঙ্গে, আত্মীয় এবং বন্ধু পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে, কালীকে মিলাইয়া দেখিয়া রাজকুমার রহস্যভেদের চেষ্টা করে। ট্রামেবাসে ঘোমটা টানা ঘোমটা খোলা বউ আর স্কুল কলেজের মেয়ে উঠিলে তাদের সঙ্গেও মনে মনে কালীকে মিলাইয়া দেখিতে তার ইচ্ছা হয়।

নিজের এক অলস কল্পনার ভিত্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে গিয়া এমন এক বিস্ময়কর সত্য প্রথম আবিষ্কারের অস্পষ্টতায় আবৃত হইয়া তার মনে উঁকি দিতে থাকে যে রাজকুমার অভিভূত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা আরও ভালো করিয়া বুঝিবার জন্য তার উৎসাহ বাড়িয়া যায়। তার এই খাপছাড়া গবেষণার যে একটি অতি বিপজ্জনক দিক আছে এটা তার খেয়ালও থাকে না।

যে বাজকুমারকে এতকাল দেখা পাওয়াই কঠিন ছিল হঠাৎ তার ঘনঘন আবির্ভাব ঘটিতে থাকায় এবং তার শান্ত নির্বিকার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠায় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের বাড়ির মেয়েদের চমক লাগিয়া যায়। রাজকুমারের ব্যগ্র উৎসুক চাহনি সর্বাঙ্গে সঞ্চাবিত হইতেছে দেখিয়া কেউ দারুণ অস্বস্তি বোধ করে, কেউ মনে মনে রাগিয়া যায়, কেউ অনুভব করে রোমাঞ্চ। প্রত্যেকে তারা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবিতে থাকে, এতকাল পরে আমার মধ্যে হঠাৎ কী দেখলযে এমন করে তাকিয়ে থাকে? কেউ তার সামনে আসাই বন্ধ করাই দেয়, কেউ কথা ও ব্যবহারে কঠিনতা আনিয়া দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করে, কেউ আরও কাছে সরিয়া আসিতে চায়।

রিণি, সরসী আর মালতী রাজকুমারের এই অদ্ভুত আচরণ তিনভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে তিন জনেই, অস্বস্তি বোধ করিয়াছে প্রায় একই রকম, কিন্তু ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টায় তাদের মনে এমন ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার উদয় হইয়াছে যে জানিতে পারিলে মানুষের মন সম্বন্ধেও একটা নূতন জ্ঞান খুব সহজেই রাজকুমারের জন্মিয়া যাইত।

রিণি ভাবে ঃ এতদিনে কি বুঝিতে পারা গেল সেদিন গান প্র্যাকটিস করার সময় সে অমন আগ্রহের সঙ্গে মুখ বাড়াইয়া দিলে রাজকুমার তাকে কেন অপমান করিয়াছিল? রাজকুমারের মন কবিত্বময়, বাস্তব জগতের অনেক উঁচুতে নিজের মানস-কল্পনার জগতে সে বাস করে; বড়ো ভাবপ্রবণ প্রকৃতি রাজকুমারের। তার মনের ঐশ্বর্য রাজকুমারকে মুগ্ধ করিয়াছে, তার হাসি কথা গান ভাবালোকের অপার্থিব আনন্দ দিয়াছে রাজকুমারকে, তার সান্নিধ্য অনুভব করিয়াই রাজকুমারের মন এমনভাবে অভিভূত হইয়া গিয়াছে যে একটি চুম্বনের প্রয়োজনও সে বোধ করে নাই। সেদিন রাজকুমার তাই চমকাইয়া গিয়াছিল, কী করিবে ভাবিয়া পায় নাই। গান শুনিতে শুনিতে যে মানুষটা স্বপ্ন দেখিতেছিল হঠাৎ সচেতন হওয়ার পর তার খাপছাড়া ব্যবহারে অপমান বোধ করিয়া সেদিন তার রাগ করা উচিত হয় নাই। হয়তো সেদিন রাজকুমারের প্রথম খেয়াল হইয়াছিল, যে শুধু মন আর হাসি গান কথা নয় একটা শরীরও তার আছে। হঠাৎ যে রাজকুমার এমন অসভ্যের মতো খুঁটিয়া খুঁটিয়া তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এটা হয়তো তার এই নূতন চেতনার প্রতিক্রিয়া। তার অপূর্ব রূপ প্রথম দেখিতে আরম্ভ করিয়া রাজকুমারের চোখে ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে।

সরসী ভাবে : এতদিন তার শরীটাই ছিল রাজকুমারের কাছে বড়ো। তার দিকে তাকাইলে মানুষ সহজে চোখ ফিরাইতে পারে না, তার এই দেহের বিস্ময়কর রূপ মানুষের মধ্যে দুরন্ত কামনা জাগাইয়া দেয়। এতকাল রাজকুমার তার শরীরটা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে, তাই লজ্জা সংকোচে তার দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে পারে নাই। তারপর রাজকুমার বুঝি তার অন্তরের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষের মন-ভুলানো মেয়েলি হাবভাবের সস্তা অভিনয় সে যে কখনও করে না, লজ্জাবতী লতা সাজিয়া থাকে না, নাকি সুরে কথা বলে না, ভাবপ্রবণতা পছন্দ করে না, বাজে খেয়ালে হালকা খেলায় সময় নষ্ট করে না, এ সব বোধ হয় রাজকুমারের খেয়াল হইয়াছে। খুব সম্ভব সেদিনের সভায় রাজকুমার তার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তার ভিতরের জন্য রাজকুমার তাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। ভালোবাসে বলিয়া এখন আর রাজকুমার তার দিকে চাহিতে সংকোচ বোধ করে না, মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়।

মালতী ভাবে : ছি ছি, রাজকুমার কেমন মানুষ? সে তো স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, রাজকুমারের এমন পরিচয়ও তাকে পাইতে হইবে! সে ভালোবাসে জানা গিয়াছে কিনা, তাই রাজকুমার এখন তাকে যাচাই করিতেছে। তাকে নয়, তার দেহকে। কোথায় তার কোন খুঁত আছে রূপের খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাই এখন বাহিব করিতেছে রাজকুমার। ভালোবাসার দৃষ্টিতে যদি এমন মনোযোগের সঙ্গে রাজকুমার তাকে দেখিত! কিন্তু চোখে তার ভালোবাসা নাই। মনে মনে কী যেন সে হিসাব করাইয়া করিতেছে আর যাচাই করার দৃষ্টিতে তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইতেছে!

কালীও অনেক কথা ভাবে। কিছু সে বুঝিতে পারে না, তার ভয় হয়, লজ্জায় সে আড়ষ্ট হইয়া যায়। আপনা হইতে কখনও যে ডাকিত না, হঠাৎ এতবার সে কেন অকারণে কাছে ডাকে? সামনে দাঁড় করাইয়া কেন বলে, এদিকে মুখ করো, ওদিকে মুখ করো, পিছন ফিরে দাঁড়াও?

মনোরমাও রাজকুমারের ভাবান্তরে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। এমন বোকা সে নয় যে মনে করিবে কালীকে হঠাৎ বড়ো বেশি পছন্দ হইয়া যাওয়ায় সর্বদা তাকে কাছে ডাকিয়া রাজকুমার তার সঙ্গে ভাব করিতে চায়। পছন্দ হইয়া থাকিলে আর ভাব করার ইচ্ছা জাগিয়া থাকিলে এভাবে যখন তখন বিনা কারণে ডাকার বদলে সে বরং বিশেষ দরকার হইলেও কালীকে ডাকিত না। রাজকুমারকে অন্য সকলে যতটা চেনে মনোরমা তার চেয়ে অনেক বেশিই চিনিয়াছে। গিরীন্দ্রনন্দিনীর সঙ্গে যেমন ব্যবহারই রাজকুমার করিয়া থাক, যদি ধরিয়াও নেওয়া যায় যে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সে অন্যায় ব্যবহারই করিয়াছিল, গিরির টানেই সে যে সেদিন তাদের বাড়ি গিয়াছিল, মনোরমা তা বিশ্বাস করে না। গিরির জন্য যাইতে ইচ্ছা হইলে সে কখনও বাড়ির চৌকাঠ মাড়াইত না।

মনোরমা ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছিল না, রাজকুমার তার সমস্ত ভাবনা মিটাইয়া দিল। সকাল বেলা রাজকুমার তাকে বলিল, কালীকে রিণিদের বাড়ি একটু নিয়ে যাচ্ছি দিদি।

ওমা, কেন?

শুধু ঘরে বসে থাকবে? দু-চারজনের সঙ্গে একটু ভাবসাব করে আসুক?

মনোরমার মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

বেশ তো নিয়ে যাও, আমায় আবার জিজ্ঞেস করা কেন?

কালীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য মনের মধ্যে বহিয়া নিয়া গিয়া রিণি, সরসী, মালতী আর অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে রাজকুমারের বড়ো অসুবিধা হইতেছিল। ও রকম আন্দাজি গবেষণার এত বড়ো একটা তথ্য কি যাচাই করা চলে? পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কালীর সঙ্গে অন্য মেয়ের দেহের গড়নের তুলনা না করিলে অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না।

কালীকে সঙ্গে করিয়া সে দুবেলা বাহির হয়, এক-একজনের বাড়ি গিয়া কালীর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেয়। সকলে তারা ভাবে, এ আবার কী খেয়াল রাজকুমারের? মনোরমা খুব খুশি হয়। একদিন তার শুধু আশা ছিল, এবার তার ভরসা জাগে যে আশা হয়তো তার মিটবে।

ধীরে ধীরে রাজকুমারের কাছে তার অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট অনুমান স্পষ্ট প্রমাণিত সত্য হইয়া উঠিতে থাকে। দ্বিধা সন্দেহ মিলাইয়া যায়। মাঝে মাঝে তার মনে হইতেছিল, মাথাটা বুঝি তার খারাপ হইয়া গিয়াছে, পাগলের মতো সে অনুসরণ করিতেছে নিজের বিকৃত চিন্তার। এই আত্মগ্লানির বদলে এখন সে অনুভব করিতে থাকে আবিষ্কারের গর্ব।

কালীকে দেখিয়া তার মনে হইয়াছিল, তার দেহের গড়ন ঘরোয়া, অন্তঃপুরের একটি বিশেষ আবেষ্টনীতে একটি বিশেষ জীবনের সে উপযোগী। এখন সে জানিতে পারিযাছে কেবল কালী একা নয়, সকলের দেহের গড়নেই এই সংকেত আছে, দেহ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় সমাজের নানা স্তরে জীবনের বহু ও বিচিত্র পরিবেশের কোনটিতে সে খাপ খাইবে।

শুধু মন নয়, দেহের গঠন দেখিয়াও বিচার করিতে হয় কোন জীবন কার পক্ষে স্বাভাবিক, কোন জীবনে কার বিকাশ বাধা পাইবে না।

দেহ? এতকাল রিণি, সরসী আর মালতীর মনেব সঙ্গেই তাব পরিচয় ছিল, আজ তাদেব দেহ কী বিস্ময়কর সংবাদই তাকে জানাইয়াছে! শুধু মনের হিসাব ধরিয়া সংসারে নিজেদের স্থান বাছিয়া নিতে গেলে জীবন ওদের ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অসংখ্য নাবী ও পুরুষের যেমন গিয়াছে।

একদিন সরসীকে রাজকুমার বলিল, রিণি আর মালতীকে নেমন্তন্ন কব না?

কেন?

এমনি। তোমাদের একটা গ্রুপ ফটো নেব।

কবে?

কাল সকালে।

হঠাৎ আমাদের ফটো নেবার শখ হল কেন?

শখের কি কেন থাকে সরসী?

এ সব শখের কথা থাকে। আচ্ছা বলব। কিন্তু সকালে কেন, বিকেলে বললে হবে না?

তাই বোলো। তিনটে চারটের মধ্যে যেন আসে।

রাজকুমাব একটু ভাবিল, খানিক ইতস্তত করিয়া বলিল, আচ্ছা, জ্যোৎস্না মমতা এদের বললে হয় না? আর তোমাব সেই রুক্মিণীকে?

ওদেরও ফটো নেবে নাকি?

দোষ কী?

সরসী হাসিল, না দোষ কিছু নেই। হঠাৎ এতগুলি মেয়েকে একত্র করে ফটো নিতে চাইলে একটু খাপছাড়া মনে হবে, আর কিছু নয়। সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। কিন্তু জ্যোৎস্না, মমতা আর রুক্মিণীকে নয় চিনলাম, ওদের কারা?

লিস্ট করে দিচ্ছি।

লিস্ট? প্রকাণ্ড গ্রুপ হবে বলো? এত সব অদ্ভুত শখ চাপে কেন তোমার? দুদিন যদি কিছু তুমি না করো, তিনদিনের দিন একটা কিছু করে অবাক করে দেবেই দেবে। এমনি চালচলন ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় বয়স বুঝি সত্তর পেরিয়েছে, হঠাৎ যে তোমার কী হয় বুঝি না।

রাজকুমার সতেরোটি মেয়ের নাম লিখিয়া লিস্ট করিয়া দিলে সবসী ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, এতগুলি মেয়েকে বলতে হবে? কী ধরনের গ্রুপ হবে এটা? বান্ধবী গ্রুপ, না শুধু চেনা মেয়ের গ্রুপ? কুমারী গ্রুপ বলা চলবে না, তিনজনের বিয়ে হয়েছে।

কী যেন বুঝিবার চেষ্টা করিতে করিতে চিন্তিতভাবে সরসী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, রাজকুমারের চোখে মানে আবিষ্কার করিতে চায়।

ফটোর কথা মিছে। কী যেন মতলব আছে তোমার। আমায় বলো রাজু।

ওদের সকলকে একত্রে করে দেখতে চাই।

কেন?

একটা ব্যাপার বুঝতে চাই। তুমি বুঝবে না, সরসী।

বুঝব না? তোমায় আমি সকলের চেয়ে ভালো বুঝি, তা জানো?

রাজকুমার একটু হাসিল। হাসিটা সরসীর পছন্দ হইতেছে না টের পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার গম্ভীর হইয়া গেল।

জানতাম না, কিন্তু মেনে নিচ্ছি। তবে এটা ঠিক আমায় বোঝার কথা নয়। এ অন্য ব্যাপার। রাজেনবাবুকে ভালো বুঝলেও তার নতুন মেটিরিয়াল স্পিরিচুয়ালিজমের থিয়োরি কি বুঝতে পারবে ভরসা করো?

থিয়োরি না বুঝতে পারি, থিয়োরিটা কোন বিষয়ে সেটুকু বুঝতে পারব বইকী।

তবে শোনো। মেয়েদের দেহের গড়নের সঙ্গে মনের গড়নের সম্পর্কটা বুঝবার চেষ্টা করছি।

ও, তাই বলো!

অন্ধকারে হোঁচট খাইতে খাইতে সরসী যেন হঠাৎ আলো দেখিতে পাইয়াছে। চোখে তার উত্তেজনা দেখা দেয়, মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

রাজকুমার বলিতে থাকে, আমার মতে দেহের গড়নের সঙ্গে মেয়েদের মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সরসী। সুস্থ স্বাভাবিক দেহের কথাই বলছি। যে আবেষ্টনীতেই একটি মেয়ে বড়ো হোক, তার দেহের গড়নের জন্য মনের কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকবেই। তোমার মানসিক ধর্মের কয়েকটা বিশেষ রূপ আছে, তুমি যদি জন্মের পরদিন থেকে অন্য একটি পরিবারে মানুষ হতে তবু এই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকত। যেমন ধরো, তোমার সাহস। তোমার দেহের গড়ন না বদলিয়ে কোনো প্রভাব তোমার সাহস নষ্ট করতে পারত না। প্রকাশটা হয়তো অন্যরকমের হত। অন্য বাড়িতে অন্য অবস্থায় মানুষ হলে তুমি হয়তো পথকে ভয় করতে, পুরুষকে ভয় করতে, বেলগাছকে ভয় করতে, মার খেয়ে কাঁদতে ভয় করতে,তবু কতগুলি দিকে সাহস তোমার থাকতই। অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদে বাড়ির মধ্যে হয়তো একা তোমার মাথা ঠিক থাকত, হাতে শুধু শাঁখা পরে তুমিই হয়তো হাসিমুখে বড়োবাবুর দশ হাজার টাকার গয়না পরা বউয়ের সঙ্গে গল্প করতে, তুমিই হয়তো—

বুঝেছি, বুঝেছি। আর শুনতে চাই না রাজু, থামো। তুমি সত্যি বাঁচালে আমায়। তোমার থিয়োরি না পাগলামি সে তুমিই জানো, কদিন থেকে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি এটুকু বুঝতে পারছি তাই আমার ঢের। এই জন্য অমন করে তাকাচ্ছিলে আমাদের দিকে, ট্রামেবাসে আদ্দির পাঞ্জাবি পরা ছোঁড়াগুলোও যেমনভাবে তাকাতে পারে না? কী আশ্চর্য মানুষ তুমি রাজু!

রাজকুমারকে সরসী চা করিয়া দিল, তিনরকম খাবার দিল। কথা বলিতে লাগিল অনর্গল। তার হাসি কথা চলাফেরা সব যেন হঠাৎ হালকা হইয়া গিয়াছে। কথা বলিতে বলিতে সরসী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তোমার ও থিয়োরি কি শুধু মেয়েদের সম্বন্ধে খাটে? ছেলেদের বেলা খাটে না? শুধু মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষা করার তোমার আগ্রহ কেন শুনি?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া রাজকুমার বলল, ছেলেদের বেলাও খাটে। নিয়ম একই। তবে পুরুষের দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অতটা ঘনিষ্ঠ নয়। দেহের গড়ন অনুসারে মনের যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সেটা একেবারে চাপা পড়ে যেতে পারে, থেকেও না থাকার শামিল হয়ে যায়। মেয়েদের ব্যাপার অন্যরকম।

তারা দেহসর্বস্ব বলে?

না, তাদের দেহ অন্যরকম বলে। দেহের অনুভূতি অন্যরকম বলে। দেহের উপযোগিতা অন্যরকম বলে। আরও অনেক কিছু আছে।

বিদায় দেওয়ার সময় সরসী বলিল, কাল তোমার লিস্টের সকলকে আসতে বলব, তুমি কিন্তু ওদের জানিয়ো না শখটা তোমার। গ্রুপ ফটো তোলার শখ আমার, তোমায় দিয়ে আমি ফটো তোলাচ্ছি। বুঝতে পারছ?

পরদিন কালীকে সঙ্গে করিয়া রাজকুমার সরসীর বাড়ি গেল। তিনটি মেয়ে আসিতে পারে নাই। তবু চোদ্দোটি মেয়ে আসিয়াছে, কালী আর সরসীকে ধরিলে ষোলোজন। এতগুলি মেয়েকে একসঙ্গে পরীক্ষা করার সুযোগ পাইয়াও রাজকুমার খুশি হইতে পারিল না। এতগুলি দেহ আর মনের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া দেখা রাজকুমারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। শুধু কথা বলিয়াই সময় কাটিয়া গেল।

জীবনে রাজকুমারের অনেকবার অনেকরকম ঝোঁক আসিয়াছে। এটা অবশ্য রাজকুমারের একচেটিয়া নয়, নেহাত গোবেচারি শ্লথ মানুষেরও ঝোঁক আসে। কোনো কোনো মানুষ ঝোঁকের মাথায় কখনও কোনো কাজ করে না, ভালো কাজও নয়। দুঃখ আর অশান্তি দূর করিয়া পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সুখী করার ঝোঁকও যদি এ সমস্ত মানুষের চাপে, যতক্ষণ ঝোঁক থাকিবে কিছুই তারা করিবে না। ঝিমাইয়া পড়া পর্যন্ত মনে মনে শুধু বিবেচনা করিয়া চলিবে কাজটা উচিত কি না আর লাভ লোকসানের খতিয়ানটা কী এবং নিজের সংযমের বাহুল্যে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিবে। সংযম যেন নিছক ধীরতা ও শৈথিল্য।

হঠাৎ-জাগা সমস্ত ইচ্ছাকে রাজকুমার অবশ্য আমল দেয় না, পাগল ছাড়া সেটা কারও পক্ষে দেওয়া সম্ভবও নয়। তবে ঝোঁকের মাথায় কাজ করার স্বভাব তার আছে। অনেক পুরস্কার ও শাস্তি, আনন্দ ও বিষণ্ণতা এমনিভাবে অর্জন করিয়াছে।

এবার যে সৃষ্টিছাড়া খেয়ালটি তাকে আশ্রয় করিল, আবির্ভাবটা তার আকস্মিক নয়। তবু এ খেয়ালটি ঝোঁকের মতোই প্রবল হইয়া উঠিল। প্রথমে মনের কোণে কথাটা একবার শুধু উঁকি দিয়া গেল। ভাঙা মেঘের মতো মনের আকাশের এক টুকরা অসঙ্গত আলগা চিন্তা। নিজের কাছেই যেন রাজকুমার লজ্জা বোধ করিল। এ সব চিন্তা কোথা হইতে ভাসিয়া আসে, আবার কোথায় চলিয়া যায়। এ চিন্তাটিরও ধীরে ধীরে মনের দিগন্তে মিলাইয়া যাওয়া উচিত ছিল, তার বদলে দিন দিন যেন স্পষ্টতর ও অবাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

শীতের আমেজে দেহের সংকোচন প্রক্রিয়া অনুভব করা যায়, কালীর হাতে সেলাই করা পাড়ের কাঁথা গায়ে টানিয়া শেষরাত্রে বড়োই আরাম বোধ হয়। আধো-ঘুম আধো-জাগরণের সেই যুক্তিহীন নীতিহীন নিষ্পাপ জগতের অবাস্তব অবলম্বনে একটি অপরূপ একটি নিরাবরণ দেহ আলগোছে ভাসিতে থাকে। বেশি দূরে নয়, হাত বাড়াইলে বোধ হয় স্পর্শ করা যায়, তবু অস্পষ্ট। কোন জীবনের উপযোগী এ দেহ, ভিতরের প্রকৃতির কোন পরিচয় আঁকা আছে এই দেহের বাহিরে, কিছুই টের পাওয়া যায় না। ঘুম ভাঙিবার পর ছায়া মিলাইয়া যায়, ওই রকম কয়েকটি দেহ পরীক্ষা করিবার ঔৎসুক্য শুধু জাগিয়া থাকে রাজকুমারের।

মোটা মোটা ডাক্তারি বই আর নোটবুক গুলির পাতা উলটাইতে উলটাইতে এই কথাটা সে মনে মনে নাড়াচাড়া করে। পরীক্ষার জন্য দেহ ভাড়া করা যায়, কিন্তু সে-সব নরনারীর দেহ পরীক্ষা করিয়া তার বিশেষ কোনো লাভ হইবে না। যাদের সে জানে, যাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সংবাদের সঙ্গে জীবন যাপনের রীতিনীতির পরিচয় সে রাখে, নিরাবরণ তাদের কয়েকর্জনকে সে যদি দেখিতে পাইত!

কিন্তু এদের কারও কাছে ইচ্ছাটা জানানো পর্যন্ত চলে না।

শোনামাত্র যুগ-যুগান্তরের সংস্কারে ঘা লাগিবে, তাকে মনে করিবে পাগল, অসভ্য, বর্বর। বুঝাইয়া বলিলে যে কেউ বুঝিবে সে ভরসাও রাজকুমারের নাই।

সে যে শুধু একটা সত্যের, একটা নিয়মের সন্ধান চায়, কেউ তা বিশ্বাস করিবে না। যতই ভীরু আর লাজুক মনে হোক, উদ্ধত অত্যাচারী সৈনিক বা যন্ত্রীর জীবন ছাড়া শ্যামলের সুখী হওয়ার

উপায় কেন নাই; কঞ্চির মতো যতই অবাধ্য ও স্বাধীন মনে হোক রিণিকে, শাসন-পিপাসু শক্তিমান পুরুষের উপর বউয়ের মতো নির্ভর করিতে না পারিলে রিণির জীবনের সার্থকতা কেন নাই; দেশে দেশে নগরে নগরে যাযাবর জীবন কেন স্যার কে এল-এর প্রয়োজন ছিল; ইতিমধ্যেই চার-পাঁচটি সন্তানের মা হইতে না পারায় সরসী কেন সভাসমিতি করিয়া বেড়ায়; এ সব প্রশ্নের জবাব জানিবার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না, কৌতূহলও কারও নাই। এগুলি প্রশ্ন বলিয়া তারা স্বীকার করিতে চায় কিনা সন্দেহ। মানুষের দেহে এইসব রহস্যের নির্দেশ সন্ধান করা ওদের কাছে অর্থহীন উদ্ভট ব্যাপার, ছি ছি করার ব্যাপার।

কিন্তু যেটুকু সে জানিয়াছে কেবল সেইটুকু জানিয়া থামিয়া থাকার কথা ভাবিলেও এদিকে জীবনটাই যেন অসঙ্গত মনে হয়। ঝোঁকের এই অভিশাপ চিরকালের—যখন যেদিকে গতি, সেদিক ছাড়া অন্য কোনোদিকে জগতের সার্থক অস্তিত্ব আছে ভাবা যায় না।

একদিন আলোচনা ও পরামর্শের জন্য রাজকুমার বিকালবেলা হাজির হয় বন্ধু পরেশের কাছে।

পরেশ বলে, অ্যানাটমি শিখতে চাও? সেটা তো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ওর আর কী, পয়সা দিয়ে মড়া কিনবে, ছুরি দিয়ে কাটবে—

মড়া! জীবনের সঙ্গে সে খুঁজিতেছে জীবন্ত মানুষের সংযোগ ও সামঞ্জস্যেব রীতি, মড়া কাটিয়া তার হইবে কী?

উৎসাহের সঙ্গে রাজকুমার পরেশকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতে আরম্ভ করে।

পরেশ ডাক্তার মানুষ, রাজকুমারের কথা শুনিতে শুনিতে সে হাসিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

হাত দেখার ব্যাপারটা জানি, শরীর দেখাটা নতুন ঠেকছে।

তুমি হাত দেখায় বিশ্বাস করো না?

না। ও সব বুজরুকি।

তুমি যা জানো না তাই যদি বুজরুকি হয়—

আমি জানি না বলে নয়। একটা কিছু সম্ভবপর কি না সাধারণ বুদ্ধিতেই মোটামুটি বোঝা যায়। ভবিষ্যৎ কখনও মানুষের হাতে লেখা থাকতে পারে! হাত দেখে কখনও বলা যেতে পারে একদিন মানুষের জীবনে কী ঘটবে না ঘটবে?

নগেনবাবু যে এক বছরের মধ্যে অন্ধ হয়ে যাবেন, তুমি কী করে জানলে?

সেটা ভিন্ন কথা। নগেনবাবুর চোখে অসুখ হয়েছে, চোখের এই অসুখে বছরখানেকের মধ্যে মানুষ অন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েকটা চেনা লক্ষণ দেখে তুমি জানতে পেরেছ, নগেনবাবুর চোখে অসুখ হয়েছে, কেমন? আগে আরও অনেকের চোখে এইরকম অসুখ হয়েছে, অল্পদিনের মধ্যে তারা অন্ধ হয়ে গেছে, তুমি তাই বলতে পারছ নগেনবাবুও অন্ধ হয়ে যাবেন। মানুষের হাতেও তো চেনা লক্ষণ থাকতে পারে, যা দেখে এ রকম ভবিষ্যৎদ্বাণী করা চলে? যেমন ধরো—পরেশের হাত টানিয়া আঙুলগুলির ঠিক নীচে হাতের তালুতে চারটি চিহ্ন দেখাইয়া দেয়, এগুলো দেখে আমি বুঝতে পারছি ডাক্তারিতে তোমার কোনোদিন পসার হবে না।

হাত দেখার বুজরুকিতে পরেশের হঠাৎ গভীর কৌতূহল দেখা যায়, আগ্রহের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করে, কী করে জানলে?

আরও অনেকের হাতে এ রকম চিহ্ন ছিল, দেখা গেছে তারা খুব ঢিলে অলস প্রকৃতির মানুষ। কোনো বিষয়ে চেষ্টাও থাকে না, পরিশ্রমও করতে পারে না। বছর পাঁচেকের মধ্যে তোমার উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

পাঁচ বছর পরে সম্ভব?

তা বলা যায় না। তবে উন্নতি না হওয়ার লিমিট পাঁচবছর সেটা জোর করে বলতে পারি। বাপের পয়সাতেই এ কটা বছর তোমায় চালাতে হবে। অবস্থায় ফেরে যদি স্বভাব বদলায়, হাতের এই চিহ্নগুলিও বদলে যাবে, তখন হয়তো তোমার কিছু হতে পারে। বছর পাঁচেক সময় তাতে লাগবেই।

পরেশ মনে মনে চটিয়াছিল, ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, তুমি এত বড়ো গণৎকার হয়ে উঠেছ তা তো জানতাম না। ডাক্তারি করার আগে তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তো ভুল করেছি!

শুধু ডাক্তারি তো নয়, তা বলিনি আমি। ডাক্তারিতে পসার হবে না, এ কথা তোমার হাতে লেখা নেই। থাকলেও সে লেখা পড়বার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার হাতে লক্ষণ আছে উন্নতি করার অক্ষমতার। নিজে উপার্জন করে বড়োলোক হওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই বলে তোমার যে টাকা হবে না তাও বলা চলে না। অন্য কেউ তোমার টাকা খাটিয়ে তোমাকে আরও বড়লোক করে দিতে পারে, কোনো আত্মীয় মারা গিয়ে সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারে, লটারির টিকিট কিনে টাকা পেতে পারো। তোমার হাত দেখে যদি বলি টাকা তোমার হবে না, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করো, সেটা হবে বুজরুকি। কিন্তু যদি বলি নিজের চেষ্টা আর পরিশ্রমে টাকা তোমার হবে না, সেটা হবে বিজ্ঞান। হাত দেখাও খানিকটা বিজ্ঞান, বাকিটা বুজরুকি। আর এই বুজরুকির জন্য খাঁটি জিনিসটুকুর ওপর লোকের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। বেশি ফাঁকির সুযোগ থাকলে বিজ্ঞান ভেস্তে যায়। ফুটপাতের তিলক-আঁটা উড়ে গণৎকারের মতো ডাক্তার গজাতে পায় না বলে তোমাদের লোকে বিশ্বাস করে, নিমুনিয়া হলে তোমরা অনেকে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করো, তবু।

তাই নাকি?

তাই। বিজ্ঞানের এত উন্নতি কেন সম্ভব হয়েছে জানো? জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের কথাও কেউ বিশ্বাস করতে পাবে না, এই নিয়ম মেনে চলা হয়েছে বলে। সামান্য একটি আবিষ্কার পর্যন্ত তাকে প্রমাণ করতে হবে, আগে শ-খানেক আবিষ্কারে মানুষকে চমকে দিয়েছে বলেই যে তার একশো এক নম্বর আবিষ্কারটি মেনে নেওয়া হবে, তা চলবে না। অনুমান করার অধিকার আছে কিন্তু সেটা অনুমান বলেই ঘোষণা করতে হবে। আমি বলছি বলে কোনো কথা বিজ্ঞানে নেই।

সত্যি, ভারী আশ্চর্য তো!

রাজকুমার মনে মনে হাসে। ঠিক এই প্রতিক্রিয়াই পরেশের কাছে প্রত্যাশা কবা চলে। অকর্মণ্য অসল মানুষের স্থিতিশীল অকর্মণ্যতাব এও একটা প্রমাণ। যা ভাবে না, যা জানে না, অন্যের কাছে তার ব্যাখ্যা শুনিতে এরা জ্বালা বোধ করে। মনে করে, তারই যেন সমালোচনা করিতেছে, উপদেশ দিয়া প্রমাণ করিতেছে তারই মূর্খতা।

আশ্চর্য বইকী, গাম্ভীর্যের ভান বজায় রাখিয়াই রাজকুমার বলিয়া যায়, আমি যে দেহ দেখে মানুষকে জানার কথা বলছিলাম তাও কতকটা হাত দেখার মতো। মানুষকে দেখে অনেক সময় তার স্বভাব চরিত্র টের পাওয়া যায় মানো তো?

কে জানে, জানি না।

যেমন ধরো সুরেশ। দেখলেই টের পাওয়া যায় ছেলেটা বিগড়ে গেছে। অনায়াসে বলা যায় ছেলেটা লেখাপড়াও শিখবে না, মানুষও হবে না। যেখানে ওকে তুমি রাখো, যে কাজেই লাগিয়ে দাও, ও কখনও ভালোভাবে চলতে পারবে না।

সুরেশ পরেশের ছোটো ভাই—কদিন আগে অতি কুৎসিত একটা অপরাধে ছ-মাসের জন্য জেলে গিয়াছে। সুরেশের পাংশু শীর্ণ মুখে সদা চঞ্চল কুটিল দুটি চোখ দেখিলে অপরিচিত মানুষও সত্যসত্যই টের পাইয়া যাইত তার ভিতরটা কী রকম বিকারে ভরা।

পরেশ মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

একটা রোগী দেখতে যাব।

বলিয়া সে চলিয়া যায় বাড়ির ভিতরে।

তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। পথে চলিতে চলিতে রাজকুমারের মনে হয় পরেশকে না চটাইলেই হইত। এরকম শস্তা অভিমান দেখিলেই কেন যে তার আঘাত দিতে ইচ্ছা হয়! ছেলেবেলায় ফাঁপানো খেলনা বেলুন দেখিলেই যেমন ফুটা না করিয়া থাকিতে পারিত না, এখন ফাঁকা মানুষের সংস্পর্শে আসিলেই ফাঁকিতে খোঁচা দেওয়ার সাধটা তেমনই সে দমন করিতে পারে না। মানুষের সঙ্গে এই জন্য তার বনে না। আবেগ আর অভিমানে সায় দেওয়ার তোষামোদ জানে না বলিয়া আত্মীয়বন্ধু অনেকের কাছেই সে পছন্দসই লোক নয়। দশজনের সঙ্গে খাপ খাইয়া চলার প্রধান মন্ত্রটিই সে বাতিল করিয়া রাখে।

ভাবিতে ভাবিতে গভীর একাকীত্বের অনুভূতি তাকে বিষণ্ণ করিয়া দেয়। মানুষের সঙ্গ লাভের এমন একটা জোরালো কামনা সে অনুভব করে যেন বহুদিন জনহীন অরণ্যে বা প্রান্তরে বাস করিতেছে। ক্লাবের কথা মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি সে সেখানে গিয়া হাজির হয়। টেনিস খেলার শখ জাগায় একদিন সে ক্লাবে যোগ দিয়েছিল, তারপর নিয়মিত চাঁদা দিয়া আসিতেছে কিন্তু ক্লাবে যাতায়াত করে কদাচিৎ। এই ব্যাপারটাও আজ যেন তার খেয়াল হইল প্রথম। ক্লাবের সে মেম্বার, ক্লাবে সুযোগ আছে খেলাধূলা ও দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করার, কিন্তু ক্লাবের জন্য কোনো আকর্ষণ সে অনুভব করে না। মানুষের সঙ্গ সে কি ভালোবাসে না? মানুষটা সে কি কুনো? অথবা দশজনের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে না বলিয়া দশজনকে এড়াইয়া চলে?

স্যার কে এল প্রায়ই ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলিতে আসেন। তিনজন অর্ধপরিচিতের সঙ্গে ব্রিজ খেলিতে বসিয়া রাত নটার সময় বিরক্তিতে রাজকুমারের চোখে যখন প্রায় জল আসিয়া পড়ার উপক্রম করিয়াছে স্যার কে এল-ই তাকে উদ্ধার করিলেন।

গাড়িতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ তুমি আজ এদিকে? রাজকুমার বলিল, আড্ডা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আড্ডা আমার একেবারে সয় না।

আমারও সয় না। তবু আড্ডা দিই।

পথে স্যার কে এল-এর এক বন্ধুর বাড়ি হইতে রিণিকে তুলিয়া নেওয়ার কথা ছিল। রিণি এখানে প্রায়ই রাত্রে টেনিস খেলিতে আসে। বিকালে সে খেলে না। খেলার পর যে শ্রান্তি বোধ হয় তাতে নাকি বিকালটা তার মাটি হইয়া যায়। রিণির দেখাদেখি আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে নাকি বিকালের বদলে রাত্রে টেনিস খেলার সুবিধা বুঝিতে পারিয়াছে।

তখনও খেলা চলিতেছিল। শর্ট আর শার্ট পরা রিণিকে যে সে দেখিতে পাইবে রাজকুমার তা কল্পনাও করে নাই। জোরালো কৃত্রিম আলোয় রিণির দ্রুত সঞ্চরণশীল হালকা শরীরটি তার চোখে যেন নতুন একটা বিস্ময়ের মতো ঠেকিতে লাগিল। প্রতিপক্ষ দলের মেয়েটি শাড়ি পরিয়াই খেলিতে নামিয়াছে, মাঝে মাঝে রিণির দিকে চাহিয়া তার ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিতেছে মৃদু হাসি।

খেলা দেখার জন্য দাঁড়াইয়া রাজকুমার শেষ পর্যন্ত দেখিয়া গেল শুধু রিণিকে।

খেলার শেষে রিণি বলিল, আরেকটু শীত না পড়লে খেলে আরাম নেই। যত শীত পড়ে তত তাড়াতাড়ি ঘাম শুকিয়ে যায়।

রাজকুমার বলিল, না খেললে ঘাম হয় না।

ফ্যাট হয়। আর রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। বাড়ি গিয়ে স্নান করলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসবে।

শরীর সম্বন্ধে রিণির যে এতখানি যত্ন আছে রাজকুমারের জানা ছিল না। স্যার কে এল-এর জন্য আজ গাড়িতে রিণির পাশে বসিতে না পারায় তার কেমন যেন ক্ষতি বোধ হইতে থাকে। রিণির গলা পর্যন্ত এখন ঢাকা, মুখ ফিরাইয়া কথা বলিতে গিয়া সে আবরণ সে যেন দেখিতে পায় না, টেনিস কোর্টের রিণিই যেন এত কাছে পিছনের সিটে বসিয়াছে মনে হয়। এই দেহাশ্রয়ী জীবটি আহ্লাদি মেয়ের মতো আদরের তাপে গলিতে চায়, শান্ত সুরক্ষিত সংস্কারময় অন্তঃপুরে স্বামী নামে প্রভুর তত্ত্বাবধানে বাস করিবার শুধু সে উপযোগী, এই সিদ্ধান্ত কি সে করিয়াছে এই রিণির সম্বন্ধে?

রাজকুমারের যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

রিণির সাহস আছে, একগুঁয়েমি আছে, তেজ আছে। এইগুলি সে অর্জন করিয়াছে তার আত্মবিরোধী জীবন যাপনের প্রক্রিয়ায়। রিণিকে সে যদি তার নূতন চিন্তাধারার সন্ধান দেয়? রিণির কাছে সে যদি তার অসঙ্গত দাবি জানায়?

স্যার কে এল-এর একটা কথাও রাজকুমারের কানে যায় না, নিজে সে কী বলিতেছে আব রিণি কী জবাব দিতেছে তাও ভালো খেয়াল থাকে না। কথা বন্ধ করিয়া হঠাৎ সে গম্ভীর হইয়া যায়।

শান্ত মনে কথাটা বিবেচনা করা দরকার। রিণিকে কিছু বলা না বলার উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে, ঝোঁকের মাথায় কিছু করিয়া বসিলে চলিবে না। রিণি রাগ করিতে পারে, চিরদিনের জন্য তার সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলিয়া দিতে পারে, মনে মনে তাকে ঘৃণা করিতে পারে, দুঃখ পাইতে পারে, হাসিযা উড়াইয়া দিতে পারে। অনেক রকম সম্ভাবনাই আছে। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার।

কিন্তু অনুরোধটা জানাইলে রিণির কাছে কী রকম প্রতিক্রিয়া আশা করা উচিত সে বিষয়ে তাকে ভাবিতে হইতেছে কেন? ঠিক কী রকম প্রতিক্রিয়া হইবে এতদিন রিণিকে জানিয়া এটুকুও সে কি অনুমান করিতে পারে না?

রিণি বাড়ির মধ্যে চলিয়া যাইতেছিল, রাজকুমার তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে রিণি। খুব দরকারি কথা।

রিণি আশ্চর্য হয় না। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ খাপছাড়া উত্তেজনার সঙ্গে খুব দরকারি একটা কথা বলিতে চাওয়া, রিণি তার মানে জানে। ঠিক এমনিভাবে ওরা চিরদিন কথাটা জানায়। বলার সুযোগ যখন থাকে তখন কিছু বলে না, আজকালের মধ্যে আবার সুযোগ আসিবে জানিয়াও অপেক্ষা করিতে পারে না, অসময়ে ব্যস্ত হইয়া উঠে।

কী কথা?

ঘরে চলো, বলছি।

দু-চারমিনিটে বলা হবে না বোধ হয়?

না। একটু সময় লাগবে। অনেক কথা বুঝিয়ে বলতে হবে তোমাকে।

আমারও বুঝতে সময় লাগবে নিশ্চয়। মালতীর মতো বুদ্ধি তো নেই।

রিণির এই ঈর্ষার খোঁচাটা রাজকুমারকে তিরস্কারের মতো আঘাত করিল। মালতীর কথা তার মনেই ছিল না। নূতন চিন্তাটাই কিছুদিন হইতে তার মন জুড়িয়া আছে। মালতী নামে যে একটি মেয়ে আছে জগতে, গত বর্ষার এক সন্ধ্যায় ওই মেয়েটিকে যে জগতের অন্য সব মেয়ের চেয়ে সে কাছে আসিতে দিয়াছে, এসব সে যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল।

মালতীকে সে আর পড়ায় না। এবার মালতীর পরীক্ষা, ভালোভাবে পাশ করার আগ্রহ তার চিরদিন খুব প্রবল। রাজকুমারের কাছে পড়িলে আর আর পাশ করার ভরসা নাই। রাজকুমার তাই নিজেই পড়ানো বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মালতীও আপত্তি করে নাই। তার আসা-যাওয়া যে একেবারে কমিয়া গিয়াছে, বাদ পড়িয়াছে অতি প্রয়োজনীয় অনাবশ্যক কথা বলা, সে জন্যও মালতীর কাছ

হইতে কোনো নালিশ আসে নাই। হয়তো মালতী ভাবিয়াছে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটানোর ভয়ে সে যায় না, পরীক্ষার আগে আবেগ ও উত্তেজনায় তাকে একটি দিনের জন্যও অশান্ত করিতে চায় না। ভাবিয়া মালতী হয়তো কৃতজ্ঞতাই বোধ করিতেছে।

তার ব্যবহারে মালতী দুঃখ পায় নাই—এই যুক্তি কিন্তু রাজকুমারের নিজের মানসিক শান্তি বজায় রাখিতে কাজে লাগে না। শ্যামলের কথাটা তার মনে পড়িয়া যায়। শ্যামল বলিয়াছিল, মালতীকে ভালোবাসিবার উপযুক্ত সে নয়। অসঙ্গত বলিয়া জানিলেও কথাটা এখন তাকে পীড়ন করিতে থাকে। রিণির কাছে যে প্রস্তাব করিতে সে চাহিতেছে, জানিতে পারিলে মালতী ব্যথা পাইবে। সে ব্যথার স্বাদ কত কটু, কত তীব্র তার জ্বালা, রাজকুমার অনুমান করিতে পারে। মালতী তার উদ্দেশ্য বুঝিবে না। রিণির রূপ যে সে দেখিতে চায় না, রিণিকে অনুরোধটা জানানোর আগে তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হওয়া আর গলা শুকাইয়া যাওয়ার কারণ যে মনের কোনো দুর্বলতা নয়, মালতী তা ধারণাও করিতে পারিবে না, বিশ্বাসও করিবে না। মালতীর কাছে সে উদারতা প্রত্যাশাও করা চলে না। আহত-বিস্ময়ে কত কী যে মালতী ভাবিবে! ক্ষোভ, দুঃখ, ঈর্ষা, ও ক্রোধে আরও কত আঘাত যে নিজের জন্য নিজেই সে চয়ন করিবে!

তবে, হয়তো মালতী জানিবে না। না জানার সম্ভবনাই বেশি। রিণি যদি রাগ করে, চিরদিনের জন্য যদি তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া দেয়, কারও কাছে সে কোনোদিন বলিতে পাবিবে না, ছদ্মবেশী এক বুনো জানোয়ারের কোনও দাবি একদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল।

মালতী জানিবে না। তবু রাজকুমার অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। স্তরে স্তরে সঞ্চিত সংস্কারের অবাধ্য প্রতিবাদ একটানা চাপের মতো মনে অশান্তি জাগাইয়া রাখে। মালতীর না জানা তো বড়ো কথা নয়! মালতীর জানার ফলাফলটা সে যতখানি কল্পনা করিতে পারে তারই গুরুত্ব যেন সকলের আগে বিবেচ্য। জানুক, বা না জানুক, আঘাত পাক বা না পাক, যে কাজ করিলে একটি মেয়ের সুখ-শান্তি ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে কাজ করা তার উচিত নয়। মনে তার পাপ নাই? —না থাক। পুণ্যের জন্যও অনেক কাজ সংসারে করা যায় না।

রিণির সঙ্গে গুরুতর বুঝাপড়ার লড়াই শুরু করিবার ঠিক আগে এ সব চিন্তা রাজকুমারকে একটু কাবু করিয়াছিল বইকী। কালও বা করা চলিবে আজ তা না করিয়া পালানোর কথাটাও একবার তার মনে আসিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবার জন্য আর একটু সময় নিলে কী আসিয়া যায়। হঠাৎ যেন একটু ভয় করিতে লাগিল রাজকুমারের, ভাবনা তার ছিল অনেক, এতক্ষণ ভয় এতটুকু ছিল না।

সময় যদি লাগে, তাহলে তুমি বোসো। নেয়ে এসে তোমার দরকারি কথা শুনব।

না, আগেই শুনে যাও।

বেশিক্ষণ লাগবে না নাইতে। মিনিট কুড়ি। কথাটা ততক্ষণ মনে মনে গুছিয়ে নাও বরং, বলতে সুবিধে হবে।

রিণি একটু হাসিল। এমন মধুর হাসি রাজকুমার কোনোদিন তার মুখে দ্যাখে নাই। রিণি যেন হঠাৎ আজ কেমন হইয়া গিয়াছে।

তবে আজ থাক, রিণি।

থাকবে কেন? তোমার আজ কী হয়েছে বল তো? খেলে এসে না নাওয়া পর্যন্ত আমার কী বিশ্রী লাগে তুমি বুঝবে না। বলতে চাও বলো, শুনতে কিন্তু আমার ভালো লাগবে না বলে রাখছি।

কথাটা শোনো আগে, বুঝতে পারবে নাইতে যাওয়ার আগে কেন বলতে চাই। আমি বাথরুমে থাকব, রিণি।

বাথরুমে থাকবে?

তোমার নাওয়া দেখব। তুমি নাইবে, আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকব চুপ করে।

রিণি কথা বলিতে পারে না। জোরে তার দাঁতে দাঁত আটকাইয়া গিয়াছে, মুখ দেখিলেই বুঝা যায়। রাজকুমার সোজা তার চোখের দিকে তাকায়। দ্বিধা সংকোচ ভয় সব তার এতক্ষণে কাটিয়া গিয়াছে।

কথাটা তোমার খুব অন্যায় মনে হচ্ছে? এখানে বোসো, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলছি।

বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি বুঝেছি। কোথায় গিয়েছিলে বাবার সঙ্গে? কটা পেগ গিলেছ?

পেগ? ও সব আমার নেই তুমি জান না?

এতদিন তাই তো জানতাম।

আজ আমাব কথা শুনে ধারণাটা বদলে গেছে, না? আমার সব কথা কিন্তু শোনোনি রিণি।

হাত ধরিয়া রিণিকে একরকম সে জোর করিয়া একটা সোফায় বসাইয়া দিল। বড়ো রাগ হইতেছিল রাজকুমারের। এত কথা ভাবিবার থাকিতে রিণি ভাবিয়া বসিল মদ গিলিয়া সে তার সঙ্গে ফাজলামি করিতে আসিয়াছে!

আগ্রহের সঙ্গে সে রিণিকে সব বুঝাইয়া দিতে থাকে। বিশেষ করিয়া জোর দেয় তার নিষ্পাপ নির্বিকার মনোভাবের উপর, তার উদ্দেশ্যের আসল মানের উপর। কী আবেগের সঙ্গেই সে যে বারবার ঘোষণা করে, বাথরুমে রিণিকে দেখিতে চাওয়ার মতো অভদ্র ছোটোলোক সে নয়, ও রকম ইচ্ছা জাগার মতো হীন নয় তার মন।

ব্যাখ্যা করিতে রাজকুমার চিরদিনই ওস্তাদ। বুঝিতে রিণির আর কিছুই বাকি থাকেনা। মুখের ভাবে তার পরিবর্তন কিন্তু হয় আশ্চর্য রকম, রাজকুমারের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। মনে হয়, রাজকুমারের প্রস্তাব শুনিয়া তার যেন শুধু চমক লাগিয়াছিল, রাজকুমার মদ খাইয়া আসিয়াছে ভাবিয়া তার যেন শুধু দুঃখ হইযাছিল। এতক্ষণে তার রাগ হইয়াছে, ব্যাখ্যা শুনিবার পর, সব বুঝিবার পর।

বুঝতে পেরেছে রিণি?

পেরেছি বইকী।

গলার আওয়াজেই রাজকুমার সচেতন হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ সুরকে চাপিয়া এ ভাবে দাঁতে কাটিয়া রিণিকে সে আর একদিন কথা বলিতে শুনিয়াছিল। গানের আবেশে বিহ্বলা রিণির বাড়ানো মুখের আমন্ত্রণ যেদিন সে গ্রহণ করে নাই। সেদিনও রিণির নাক এমনি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছিল রাগের মাথায় হঠাৎ বুঝি কামড়াইয়া দিবে—দুরন্ত ছোটো মেয়েরা যেমন দেয়।

ম্লান মুখে রাজকুমার একটু হাসিল।

জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, তুমি রাজি নও বুঝতে পারছি।

বুঝবে বইকী। তুমি তো বোকা নও।

কিছু মনে কোরো না বিণি।

না। মনে আবার কী করব।

আমি তবে যাই।

যাও। আর এসো না।

আচ্ছা।

রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল।

কথাটা তুমি আর একটু উদারভাবে নেবে ভেবেছিলাম, রিণি।

রিণিও উঠিয়া দাঁড়াইল।

তোমায় বোকা ভাবতে পারলে তাই নিতাম। তুমি তো বোকা নও।

রাজকুমার চলিয়া যায়, রিণি পিছন হইতে তাকে ডাকিল।

একটা উপদেশ নিযে যাও। আর একটি মেয়েকে যখন কথাটা বলবে, মালতীকেই বলবে বোধ হয়, কিছু বুঝিয়ে বলতে যেয়ো না। শুধু বোলো যে তোমার এ সাধটা না মেটালে তুমি পাগল হয়ে যাবে, সায়ানাইড খাবে। হয়তো রাজি হতে পারে।

রিণি কিছুই অস্পষ্ট বাখে নাই। কয়েকটি কথাতেই সব পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছে। যতই অসঙ্গত হোক, শুধু তার ইচ্ছার কথা হইলে নিজের নিরাবরণ দেহটি তাকে দেখাইতে রিণি রাজি হইলেও হইতে পারিত। সত্যসত্যই রাজি সে হয়তো হইত না, কিন্তু একটু দোমনা তো অন্তত হইত। একবারের জন্যও মনে তো হইত কী আসিয়া যায় মানুষটার ব্যাকুল প্রার্থনা মিটাইলে? বিমুখ করিয়া একটু আপশোষও হয়তো জাগিত। নিজের জন্য আবেদন জানানো ছাড়া রিণির মন এটুকু নরম কবারও আর কোনো উপায় নাই। কেবল রিণির নয়, সব মেয়ের সম্বন্ধেই এই এক কথা। রিণি তাই বলিয়াছে।

রাজকুমার কি কথাটা জানে না? যুক্তির দাম মেয়েদের কাছে নাই, একটুখানি আবেগেব বন্যায় বিশ্বের সমস্ত যুক্তিতর্ক উচিত-অনুচিত ভালোমন্দ ভাসিয়া যাইতে পাবে, একটু জ্ঞান কি সে সঞ্চয় করিতে পারে নাই এতদিনে? রাজকুমার লজ্জা বোধ করে। রিণি তাকে বোকা মনে করিতে অস্বীকার করিয়াছে, বোকামি কিন্তু সে করিয়াছে সত্যই। সায়ানাইড খাওয়ার কথা বলিলে বিণি গর্ব বোধ করিবে আর নিছক একটা থিয়োরি যাচাই করিতে তার সাহায্য চাহিলে সে বোধ করিবে অপমান, এটুকু তার খেয়াল রাখা উচিত ছিল।

তাছাড়া, রিণি প্রত্যাশা করিয়াছিল অন্য কথা। রাজকুমার বিশ্বাস করে না রিণি তাকে ভালোবাসে। তাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভালো না বাসিলেও ভালোবাসার ঘোষণা শুনিতে কে না ভালোবাসে? এদিকটাও তার খেয়াল করা উচিত ছিল।

নিজের চারকোণা ঘরে চারকোণা খাটে রাজকুমার চিত হইয়া পড়িয়া থাকে আর উত্তেজিত চিন্তা ছুটাছুটি করে তার মনে। সিলিংয়ের হাত তিনেক নীচে একটা মাকড়সা শূন্যে ঝুলিযা আছে, সূক্ষ্ম অবলম্বনটি চোখে পড়ে না। কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়া মাকড়সাটি আরও হাতখানেক নীচে পড়িয়া যায়। রাজকুমারের ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া ওঠে। না, দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার চেয়ে তার ব্যর্থতাই ভালো।

জীবনে আর কোনো মেয়ের কাছে এ দাবি সে করিবে না।

এক কাপ চা আনিযা কালী বলে, এখন চা খেলে ভাত খাবেন কখন? খিদে নষ্ট হয়ে যাবে।

খিদে থাকলে তো নষ্ট হবে।

খিদে নেই কেন?

ধরো খেয়ে এসেছি?

ধরো খেয়ে এসেছি মানে? খেয়ে এলে খেয়ে এসেছেন, নয়তো খেয়ে আসেননি। কোথায় খেলেন? কী খেলেন?

রাজকুমার মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, একটা মেয়ে খাইয়ে দিয়েছেন কালী। এত খাইয়েছে কী বলব। পেট ভরে বুক ভরে মাথা পর্যন্ত ভরে গেছে।

মাথা ধরেছে? শঙ্কিত কালী প্রশ্ন করে।

ধরেনি, ভরেছে।

রাজকুমারের হাসির জবাবে কালী কিন্তু হাসে না। মুখ ভার করিয়া বলে, আপনার শুধু মেয়ে বন্ধু, গন্ডা গন্ডা মেয়ে বন্ধু। বেটাছেলের অত মেয়ে বন্ধু থাকতে নেই।

তাহলে তো তোমার সঙ্গে আড়ি করতে হয়।

আমি তো বন্ধু নই। আমি অনেক ছোটো।

ওরাও বন্ধু নয় কালী। ওরাও আমার চেয়ে অনেক ছোটো, ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ! কালী অদ্ভুত অবজ্ঞার হাসি হাসে, ধেড়ে ধেড়ে সব মেয়ে, বিয়ে হলে অ্যাদ্দিন— সাত ছেলের মা হত, না?

কালী সায় দিয়া বলে, বিয়ে হয়নি কেন ওদের? পাত্র জোটেনি?

নাঃ, কই আর জুটল? আমি একবার বলেছিলাম ওদের, এসো তোমাদের সবাইকে আমি বিয়ে করছি। ওরা রাজি হয়ে গেল। কিন্তু ধেড়ে ধেড়ে মেয়ে তো সব, ভারী চালাক। প্রত্যেকে বলতে লাগল, আমায় আগে বিয়ে কর, তারপর আর সবাইকে বিয়ে করবে। তার মানে বুঝতে পারছ?

খুব পারছি। একবার বিয়েটা হয়ে গেলে অন্য কাউকে বিয়ে করতে দেবে না, একা বউ হয়ে থাকবে। আমি তো মেয়ে, মেয়েদের ব্যাপাব আমি সব জানি।

রাজকুমারও ক্রমে ক্রমে সেটা জানিতে পারিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতেছিল। আজকাল কালীব মুখ ফুটিয়াছে। রাজকুমারের সঙ্গে হালকা অথবা ভারী চালে সে অনর্গল আলাপ করিয়া যায়। অভিজ্ঞতার অভাব আছে কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে জ্ঞানের তার অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবু তার যে সরলতা মুগ্ধ করে সেটা ভান নয়, মুগ্ধ করার ক্ষমতাই তার সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ। রিণি-মালতী-সরসীর চেয়ে কালী বোকা নয়। কালীও সব বিষয়ে ওদেরই মতো। ওদের সঙ্গে কালীর তফাত দুপুরের রোদের সঙ্গে সকালের রোদের তফাতের মতো।

সহজভাবে নিশ্চিন্ত মনে কালীব সঙ্গে কথা বলা যায়। এ ভাবে কারও সঙ্গে কথা বলিবার সুখটা রাজকুমারের এতদিন জানা ছিল না। কথা বলার আগে কিছু ভাবিতে হয় না, ভাবিবার সময় কথা বলিযা যাইতে হয না। যতক্ষণ খুশি কথা বলো, এক মিনিট অথবা একঘণ্টা। কথা বলিতে চাও বলো, কথা শুনিতে চাও শোনো. নয়তো খুশিমতো চুপ করিয়া থাকো, বধির হইয়া যাও। সবই স্বাভাবিক, কেউ রাগ করিবে না। বলার কথাও খুঁজিতে হয় না। রিণি-মালতী-সরসীর সঙ্গে কথা বলার সময় কতবাব বলাব কথা না থাকায অস্বস্তি বোধ করিতে হইয়াছে, টানিয়া আনিতে হইয়াছে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি অথবা চেনা মানুষের সমালোচনা। ছেলেমানুষি আবোল-তাবোল কথা শুধু কালীর সঙ্গে বলা যায়।

মনোরমা হেঁসেল আগলাইয়া বসিয়া থাকে, ঘরে দুজনের গল্প চলে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ে ব্যথা ধরিয়া গেলে কালী কোণের টুলটা কাছে আনিয়া বসে। কালীর প্রসাধনের গন্ধটি তেজি ও স্পষ্ট। রিণি-মালতী সরসীর মতো কেবল সুবাসের মৃদু ইঙ্গিত নয়।

হঠাৎ এক সময় মনোরমার এদিকে ভয় হয়। এত দেরি? রাজকুমারের সম্বন্ধে ভাবনার কিছু নাই বটে, তবু, এত দেরি? বিবাহের আগে শুধু একদিন একজনের সঙ্গে মনোরমা আধঘণ্টা নির্জনে গল্প করিয়াছিল। কেউ বাধা দিয়া গল্পের সমাপ্তি ঘটায় নাই, বাধা সে দিয়াছিল নিজেই, নিজেকে বাঁচানোর জন্য। ভাবিয়াছিল, তাই উচিত। দুদিন পরে যার সঙ্গে বিবাহ হইবে, এখন তার কাছে ধরা না দেওয়াটাই নিয়ম। আজ অসময়। কিন্তু আর তো আসিল না সে মানুষটি? মনোরমা জানে, সেদিন ধরা দিলে সে আসিত। দুদিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য। সে তো বুঝিতে পারে নাই মনোরমার মনের কথা, হাত ধরা মাত্র তার রক্তেও কী আগুন লাগিয়াছিল। আজও তার তাপে মনোরমার মন জ্বলিয়া যায়। সে ভাবিয়াছিল, মনোরমা বুঝি ঠান্ডা, মন তার বরফের দেশ। কল্পনার শীতল মনোরমা তার ভালোবাসাকে জুড়াইয়া দিয়াছিল। তাছাড়া আর কি কারণ থাকিতে পারে তার না আসার, মনোরমাকে বিবাহ না করার?

সাড়ে নটার সময় কালী চা দিতে গিয়াছে, সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল। মনোরমার বুক ঢিপঢিপ করে। এত দেরি! খাইতে আসার তাগিদ দিতে রাজকুমারকে ডাকিতে গিয়া কালীকে বাঁচানোর জন্য

মনটা ছটফট করে মনোরমার। কিন্তু সে উঠিতে পারে না। শুধু আজের জন্য বাঁচাইতে গিয়া সে যদি কালীর চিরদিনের মরার ব্যবস্থা করিয়া বসে?

তারপর কালীর তীক্ষ্নহাসির শব্দ কানে আসে। মনোরমা জোরে নিশ্বাস ফেলে। সর্বাঙ্গে তার কয়েকবার শিহরন বহিয়া যায়। পিঁড়িটা ঠেলিয়া দেয়ালের কাছে গিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া সে চোখ বোজে। হাসি! আর ভয় নাই। যেখানে হাসি আছে সেখানে কোনো ভয় নাই।

রাজকুমার একদিন সন্ধ্যার পর মালতীর খোঁজ করিতে গেল। এইটুকু পথ যাইতেই চোখে পড়িল আলো আর দেবদারু পাতায় সাজানো তিনটি বাড়ি। ছাতে শামিযানা, শানাই বাজিতেছে। অগ্রহায়ণ মাস, চারিদিকে বিয়ের ছড়াছড়ি। রাজকুমারের মনে পড়ে, একটি বন্ধুর বিবাহে তার নিমন্ত্রণ ছিল। দুটি বছর খুঁজিয়া বাছিয়া একটি মেয়ে পাওয়া গিয়াছে পছন্দমতো। এ পছন্দের মানে রাজকুমার জানে। মেয়েটি সুন্দরী নয়, রং খুব ফরসা। তার আর একটি বন্ধু এ রকম বাছাই করা এক মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। অমন রূপ নাকি খুব কম দেখা যায়। বউ দেখিয়া তাকে নিজের বউ হিসাবে কল্পনা করিতে গিয়া রাজকুমার শিহরিয়া উঠিয়াছিল, এমন কুৎসিত ছিল সেই অত্যন্ত ফরসা রঙের মেয়েটি।

মালতীর বাড়ি গিয়া দেখা গেল, সরসী আর রুক্মিণী আসিয়াছে। দুজনেই বিশেষভাবে সাজিয়াছে, মালতীও দামি কাপড় পরিয়া নামিয়া আসিল তিনজনে বিবাহের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে, শ্যামলের সঙ্গে।

নিমন্ত্রণে যাওয়ার আগ্রহ তিনজনেরই প্রবল, শ্যামলের দেরির জন্য কারও কিন্তু বিরক্তি দেখা গেল না।

বোন আর বউদিকে নিয়ে আসবে।—মালতী বলিল।

দেরি করার অপরাধ তাই শ্যামলের নয়। দুটি মেয়েকে সঙ্গে আনিতে হওয়ায় দেরি যে তার হইবে, এটা সকলে ধরিয়াই রাখিয়াছে।

রাজকুমার বলিল, আমি তবে বিদায় হলাম।

সরসী বলিল, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে?

অনাহূত?

অনাহূত মানে? ধীনেরবাবু তোমায় বলেননি?

তোমরা ধীরেনের বিয়েতে যাচ্ছ নাকি? এ তো ভারী আশ্চর্য যোগাযোগ হল!

আশ্চর্য যোগাযোগ আবার হল কোনখানটায়? তুমি ধীরেনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে, আমি চেষ্টা করে একটা চেনা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা যাচ্ছি কন্যাপক্ষে, তুমি যাবে বরযাত্রী হয়ে। এ তো সোজা কথা।

আগে জানিলে কথাটা সোজাই মনে হইত। একটা বিবাহ ঘটানোর গর্বে এখন বিশ্বের সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরসীর আয়ত্তে আসিয়াছে, আশ্চর্য কিছু ঘটিবার উপায় নাই। রাজকুমার যে ঠিক আজ সন্ধ্যাতেই অনেকদিন পরে মালতীর খোঁজ করিতে আসিয়াছে, তাও সরসীরই বাহাদুরি। ধীরেনের দু-বছর খোঁজার পর পছন্দমতো মেয়ে পাওয়ার ব্যাপারটা রাজকুমার এবার বুঝিতে পারে। সরসীই তাকে মনে পড়াইয়া দেয় তার বাড়িতে মেয়েটিকে রাজকুমার একদিন দেখিয়াছিল। না, দু-বছর খুঁজিয়া পছন্দ করার মতো মেয়ে সে নয়। তবে মাঝখানে সরসী ছিল। সেই পছন্দ করাইয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই। সরসী সব পারে।

সকলকে আড়াল করিয়া সরসী একাই তার সঙ্গে কথা বলে। চিরদিন এই তার রীতি। দেখা হওয়া মাত্র রাজকুমারকে সে দখল করে। মনে হয়, রাজকুমারের জন্যই সে যেন ওত পাতিয়া ছিল।

তার সভাসমিতি করিয়া বেড়ানোর মানে আর কিছুই নয়, রাজকুমারের অদর্শনের কটা দিন বাজে বাজে কোনোরকমে সে সময় কাটায়।

মালতী বলে, তোমায় কেমন আনমনা ঠেকছে আজ?

সরসী সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের হইয়া জবাব দেয়, কবিত্ব করিস নে মালতী, থাম। একটা মানুষ ভালো করে চুল না আঁচড়ালেই তোর কাছে আনমনা ঠেকে। চিরুনিটা দেখি তোর।

সরসী নিজেই মালতীর চিরুনি দিয়া রাজকুমারের চুল ঠিক করিয়া দেয়। তার পিছনে দাঁড়াইয়া মালতী একটু হাসে।

রুক্মিণী বলে, চুল আঁচড়ালে কী হবে, রাজকুমারবাবুর চেহারাটাই কবির মতো।

সরসী মুখে এ কথার প্রতিবাদ করে না, শুধু ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে রুক্মিণীর মুখের দিকে তাকায়। রুক্মিণী একেবারে বিব্রত হইয়া পড়ে। কারও চেহারা কবির মতো, এ কথা বলা কি অসঙ্গত? প্রশংসার বদলে তাতে কি নিন্দা বুঝায়? কে জানে! অথচ সদ্য পরিচিত একজনকে ঠিক এই কথা বলায় পবদিন সকালে সে বাড়ি আসিয়া রুক্মিণীর সঙ্গে আলাপ করিয়া গিয়াছিল।

তাড়াতাড়ি সে আবার বলিতে যায়, কবির মতো চেহাবা মানে—

সরসী বলে, মানে, ওকে তোমার খুব পছন্দ হয়ে গেছে।

এবার রুক্মিণী নির্ভয়ে সহজভাবে জবাব দেয়, তা হয়েছে। তবে একপক্ষের পছন্দে আর লাভ কী।

রাজকুমার মনে মনে তার নিজস্ব অপদেবতার কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়। কিন্তু উপায় তো নাই, কথার পিঠে কথা চাপাইতেই হইবে। কোনোরকমে একটু হাসিয়া সে বলে, এ অনুমানটা আপনার ভুল।

ভুল নয় রাজকুমারবাবু, প্রমাণ আছে। পছন্দ দূরে থাক, আমায় আপনি অপছন্দ করেন।

আগে আপনাব প্রমাণ দাখিল করুন, আসামি জবাবদিহি কববে।

রুক্মিণী মৃদু মৃদু হাসে। এ ধরনের আলাপের সময় সকলেই হাসে, তবে ঠিক এ ভাবে নয়। কেমন যেন বাঁকা বাঁকা রুক্মিণীর হাসি। বুঝা যায়, সরসী অতি কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া আছে।

রুক্মিণী বলে, যেমন ধরুন, যাকে পছন্দ করে তার বাড়ি লোকে না ডাকতেই যায়। যাকে পছন্দ করে না, যাওয়ার কথা থাকলে তার বাড়িতেও ভদ্রতার খাতিরে যায়। যাকে অপছন্দ করে তার বাড়িতে যাওয়ার সব ঠিক থাকলেও যায় না।

তাই বটে। রুক্মিণী একদিন তাকে বাড়িতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সেও যাইবে বলিয়াছিল। কবে কটার সময় যাইবে তাও ঠিক ছিল। তারপর রুক্মিণীর অস্তিত্বই সে ভুলিয়া গিয়াছিল। না যাওয়ার অজুহাত দিয়া ক্ষমা চাহিয়া একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখে নাই। রুক্মিণী আহত হইযাছে, রাগ করিয়াছে। রাগ করার কথাই।

রাজকুমারের বিপদের টের পাইয়া সরসী মুখ খোলে।

কেন, রাজকুমারের চিঠি পাওনি তুমি?

রুক্মিণী বলে, চিঠি? কীসের চিঠি?

রাজকুমার ভাবে, চিঠি? কীসের চিঠি?

. সরসী বলে, আমার সামনে ও যে তোমায় চিঠি লিখল? হঠাৎ শিলং যেতে হল ওকে, নিজেই বলতে যাচ্ছিল তোমাকে, আমি বললাম চিঠি লিখে দিলে চলবে। চিঠি পোস্ট করেছিলে তো রাজকুমার?

রাজকুমার বলে, নিশ্চয়।

সরসী বলে, চিঠির কোনো গোলমাল হয়েছিল ´বোধ হয়। পোস্টপিসের ব্যাপার তো।

পোস্টাপিসের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া সরসী ব্যাপারটা শেষ করিয়া দেয়। কিন্তু রুক্মিণী নরম হইলেও এত সহজে রাজকুমারকে রেহাই দিতে পারে না।

শিলং থেকে ফিরে একদিন আসতে পারতেন তো?

এবার আত্মরক্ষার দায়িত্ব রাজকুমারের, সে দুঃখের ভান করিয়া বলে, এমন ব্যস্ত ছিলাম, কী বলব আপনাকে। তা ছাড়া, হঠাৎ গিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতেও ভরসা পাইনি।

আচ্ছা, এবার হঠাৎ গিয়ে আমায় বিরক্ত করার নেমন্তন্ন করে রাখলাম। ভুলবেন না যেন। বলিয়া রুক্মিণী এতক্ষণ পরে ক্ষমার সহজ হাসি হাসিল। অর্থহীন দীর্ঘ ভূমিকার পর।

রাজকুমার ভাবিতে লাগিল, সভ্যতার নামে এরা কী অসভ্যতাই শিখিয়াছে। প্রথমে দেখা হওয়া মাত্র এই হাসি হাসিলে কত সহজ হইয়া যাইত মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় করার ইচ্ছা জাগানো।

খানিক পরেই শ্যামল আসিল। ব্যস্ত সমস্ত, উদ্‌বিগ্ন শ্যামল। একঘণ্টার বেশি দেরি করিয়া ফেলার অপরাধে সে যেন নিজের মরণ কামনা করিতেছে। সঙ্গে তার বোন সুধা ও বউদিদি ইন্দিরা। দুজনের সাজসজ্জা একেবারে চমকপ্রদ। শ্যামলের যে মোটে ঘণ্টাখানেক দেরি হইয়াছে তাই আশ্চর্য।

রাজকুমারকে দেখিয়া শ্যামলের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। রাজকুমার মালতীকে পড়ানো ছাড়িয়া দিয়াছে জানিয়া সে স্বস্তি পাইয়াছিল।

রাজকুমার মাঝে মাঝে আসে তা সে জানিত কিন্তু সেদিন বর্ষা-সন্ধ্যার ব্যাপারটির পর রাজকুমারকে সে এ বাড়িতে দ্যাখে নাই।

রাজকুমার বলিল, কেমন আছ শ্যামল?

শ্যামল জবাব দিল না।

প্রশ্নের জবাব না দিবার সাধারণ কারণ থাকা সম্ভব মানুষের। হয়তো শ্যামল শুনিতে পায় নাই। মেয়েদের বিয়ে বাড়িতে পৌঁছিয়া দিবার হাঙ্গামায় যে রকম ব্যতিব্যস্তই সে হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু সেদিন মিটিংয়ের কথাটা সকলের মনে ছিল। সকলেরই তাই মনে হইল, সেদিনের অপমানের জন্যই বুঝি শ্যামল রাগ করিয়া রাজকুমারের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মালতীই যেন বিব্রত হইয়া পড়িল সকলের চেয়ে বেশি। শ্যামলকে সে একপাশে ডাকিয়া নিয়া গেল।

রাজুদার সঙ্গে কথা বল না?

না।

কেন?

ইচ্ছে হয় না।

ছি ছি, কবে সেই মিটিংয়ে কী হয়েছিল, আজও তা মনে করে রেখেছে? দোষ তো ছিল তোমার। তুমি কেন গায়ে পড়ে—

সে জন্য নয়। ও একটা রাসকেল মালতী।

উত্তেজিত অবস্থায় না থাকিলে কথাটা শ্যামল বলিয়া ফেলিত না। অত বোকা সে নয়। মালতীর মুখের সঙ্গে নিজের মুখখানাও তার বিবর্ণ হইয়া গেল।—তোমার বড্ড মাথা গরম। কাকে কী বলো ঠিক নেই। রাজুদা তোমাকে দশবছর পড়াতে পারে, তা জানো?

পেটে বিদ্যে থাকলেই লোকের মনুষ্যত্ব থাকে না।

রাজুদার মনুষ্যত্ব নেই, মুনষ্যত্ব আছে তোমার। লোকের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা বলতে পারো না তুমি। ওর তুলনায় তুমি তো কেঁচো।

মালতী ছিটকাইয়া রাজকুমারের কাছে সরিয়া গেল।

চলো, আমরা যাই।

চলো।

শ্যামল কোথা হইতে কার একটি গাড়ি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। একটা গাড়িতে এতগুলি মানুষের যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্তত দুজনের ট্রামে বা বাসে যাইতেই হইত। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো কথা উঠার আগেই মালতী চুপিচুপি রাজকুমারকে বলিল, শ্যামলের গাড়িতে আমি যাব না। চলো, আমরা ট্রামে যাই।

গাড়িতে যে জায়গা কম পড়িবে, এতক্ষণ সকলের সেটা খেয়াল হইয়াছিল। সরসী বলিল, গাড়িতে তো কুলোবে না সকলের। আমি বরং রাজকুমারের সঙ্গে—

মালতী তখন পথ ধরিয়া কয়েক পা আগাইয়া গিয়াছে। মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, তোমরা গাড়িতে যাও। আমরা দুজন ট্রামে যাচ্ছি। এসো।

সরসীর চোখের সামনে রাজকুমারকে সঙ্গে করিয়া মালতী বড়ো রাস্তার দিকে চলিয়া গেল।

একটা ট্রাম সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

মালতী বলিল, না। পরেব ট্রামে।—এখনও থাকিয়া থাকিয়া মালতী কাঁপিয়া উঠিয়েছিল।

কী হয়েছে মালতী?

শ্যামলের সঙ্গে কোনোদিন আমি যদি কথা বলি—

এতক্ষণে গলা ধরিয়া মালতীর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

কী করেছে শ্যামল?

আমায় অপমান করেছে।

অপমান করেছে? কী অপমান?

তোমায় রাসকেল বলেছে।

আমায় রাসকেল বলেছে তাতে তোমার অপমান হল কেন?

চুপ কবো। তামাশা ভালো লাগে না। যা হচ্ছে আমাব! শ্যামল কিনা বলে তোমার মনুষ্যত্ব নেই! নিজে থেকে ভিখাবির মতো আসে, দয়া করে হেসে কথা কই, তাইতে ভেবেছে, কী না জানি মহাপুরুষ হয়ে গেছি আমি। এবাব বাড়িতে এলে দূর করে তাড়িয়ে দেব।

অত রাগ কোরো না, মালতী। বেচারি তোমায় ভালোবাসে, সেদিন জানালা দিয়ে আমাদেব দেখে ওর মাথা বিগড়ে গেছে। আমাকে গাল তো দেবেই।

মালতী সন্দিগ্ধভাবে বলিল, ভালোবাসে না ছাই। অত ছোটো মন নিয়ে কেউ ভালোবাসতে পারে?

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, ভালোবাসে বলেই তো মন ছোটো হয়েছে? তাছাড়া, আমার ওপর ওর রাগের আর একটা কাবণ আছে।

জানি কাদের বাড়ির মেয়ের হাত ধরেছিলে তো?

রাজকুমার আশ্চর্য হইল না।

শ্যামল বলেছে?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না এমনিই শুনেছি। সবাই জানে। ও সব লোকের বাড়িতে যাওয়ার কী দরকার ছিল তোমার?

দরকারের কথা পরে বলছি। জেনেও তুমি চুপ করেছিলে যে?

তুমিও তো চুপ কবে ছিলে?

রাজকুমার কিছুক্ষণ কথা বলিল না। আর একটি ট্রাম সামনে দিয়া চলিয়া গেল।

ব্যাপারটা প্রথমে আমার কাছে এত তুচ্ছ ছিল মালতী, বলার কোনো দরকাব বোধ করিনি। পরে যখন দেখলাম আমার কাছে তুচ্ছ হলেও অন্যের কাছে তুচ্ছ নয়, তখন বলব ভেবেছিলাম। সময়মতো নিজেই বলতাম।

আমিও জানতাম তুমি সময়মতো নিজেই বলবে। তাই চুপ করেছিলাম। কিন্তু শ্যামলের কী স্পর্ধা! তোমার সমালোচনা করতে যায়!

আর একটি ট্রাম আসিতে দেখিয়া মালতী বলিল, যাবে? আমার কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না।

রাজকুমার বলিল, না চলো। সকলের সামনে বিয়ে বাড়ি যাব বলে বেরিয়েছি, না গেলে ওরা কী ভাববে?

মালতী হাসিল, লোকে কী ভাববে, তুমি আবার তা ভাবো নাকি? পরের বাড়ির মেয়ের হাত ধরতে যাও কেন তবে?

এই জন্যে।—বলিয়া রাজকুমার মালতীর হাত মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিয়ে বাড়িতে সময়টা কাটিল ভালোই। বন্ধু ও পরিচিত অনেকে উপস্থিত ছিল। রাত দশটার মধ্যে লগ্ন, বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ রাজকুমার বিবাহ দেখিল। কনেকে সত্যই আশ্চর্যরকম সুন্দরী দেখাইতেছে। রং তার অত্যন্ত ফরসা, সাধারণ অবস্থায় দিনের বেলা লাবণ্যের অভাবে চোখে ভালো লাগে না, এখন ক্রিম, পাউডার, স্নো, চন্দন আর ঘামে স্নিগ্ধ ও কোমল হইয়াছে মুখখানা। খুঁতগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে সাজানোর কায়দায় এবং খুঁতও মেয়েটির কম নয়। রাজকুমার অনাব্যশক সহানুভূতি বোধ করে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে এ ভাবে সাজিয়া থাকিবার সুযোগ মেয়েটি পাইবে না। দুপাশে চাপা কপাল, নিভাঁজ চোখের কোণ, নাকের নীচে ভিতর দিকে মুখের অসমতল খাদ, চোয়ালের অসামঞ্জস্য, এ সব লোকের চোখে পড়িতে থাকিবে। তবে, ধীরেনের চোখে হয়তো পড়িবে না। ফরসা রঙে তার চোখে যে ধাঁধা লাগিয়াছে, সেটা আর কাটিবার নয়। বাড়ির বউয়ের রঙের গর্বে বাড়ির অন্য মানুষেরাও হয়তো তার রূপের অন্য সব ত্রুটির কথা তেমনভাবে মনে রাখিবে না।

মেয়েটি একটু বোকা এবং অহংকারী। মুখ দেখিয়া এটুকু বোঝা যায়। কাপড়ে পুঁটুলি করা দেহটি দেখিয়া অনুমান করা যায়, ভোঁতা, অনাড়ম্বর, নিষ্ক্রিয় প্রেমের সে উপযোগী। নীরবে অনেকটা নির্জীব পুতুলের মতো নিজেকে দান করার জন্য সে চব্বিশ ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে; ধীরেনের যখন খুশি গ্রহণ করিবে যখন খুশি করিবে না, তার দিকে হইতে কখনও কোনো দাবি আসিবে না, কোনও সাড়া পাওয়া যাইবে না। স্বামীর সঙ্গে অন্তরালের জীবনটিও প্রথম হইতেই তার কাছে হইয়া থাকিবে প্রকাশ্য উঠা-বসা-চলা-ফেরার মতোই বাঁচিয়া থাকার নিছক একটা অঙ্গ মাত্র, আবেগ ও রোমাঞ্চের বাড়াবাড়ি যাতে বিকারের শামিল। দাবি সে করিবে, সুখ, সুবিধা ও অধিকার, কর্তৃক সে করিবে অনেক বিষয়ে, সংসারে নিজের স্থানটি দখল করিতে কারও সাহায্যের তার দরকার হইবে না, তার হুকুমেই ধীরেন উঠিবে বসিবে। নিস্তেজ প্রাণহীন শুধু সে হইয়া থাকিবে স্বামীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কে।

মেয়েটির সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু হয়তো স্পষ্টভাবে জানা যাইত, যদি—

মনের চোখে সে ভাবেই দেখিয়াছে। একটু বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে না, বিবাহের আসরে বন্ধুর কনেকে পর্যন্ত এ রকম অভদ্রভাবে কল্পনা করা? এদিকটা রাজকুমারের একবার খেয়ালও হয় নাই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আবেষ্টনীতে মেয়েটির জীবনে কী বৈশিষ্ট্য থাকিবে সেই অনুমানেই মশগুল হইয়া গিয়াছিল। কাপড় ঢাকা দেহ দেখিয়া কতটুকুই বা বুঝিতে পারা যায়? দশ মিনিটের জন্য যদি ভগবান যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন ঠিক তেমনই অবস্থায় মেয়েটিকে সে দেখিতে পাইত! বন্ধুর দাম্পত্য জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ ইতিহাস তার জানা হইয়া যাইত।

এগারোটার সময় সরসী কোথা হইতে আসিয়া বলিল, আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে চলো।

ওরা?

ওরা পরে যাবে—শ্যামলের সঙ্গে।

ওরা দেরি করছে কেন?

আড্ডা দিচ্ছে। এখনও খেতেও বসেনি।

তুমি খেয়েছ?

সন্দেশ মিষ্টি খেয়েছি, আমি নেমন্তন্ন খাই না।

এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে। আমি অবশ্য ঘবোয়া নেমন্তন্ন খাই, তুমি বললে তোমার বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসব। ভোজ কখনও খাই না।

কিছু খেয়েছ তো?

কই আর খেলাম? দুবার ডাকতে এল, আমি বললাম, সকলের সঙ্গে বসব না। বাস্ কেউ আর টুঁ শব্দটি করল না।

তুমি বড়ো ছেলেমানুষ রাজু। বিয়ে বাড়ি, পাঁচ-সাতশো লোক খাবে, প্রত্যেকের বিষয়ে অমন করে খোঁজ খবর বাখতে পারে? বললে না কেন তোমায় কিছু এনে দিতে? আমি বসব না মশায়, আমায় একটা প্লেটে সামান্য কিছু এনে দিন, এ কথাটা আর মুখ ফুটে বলতে পারলে না।

কথাটা ওদের বলাই উচিত ছিল না?

তোমরাই আবার মেয়েদের সেন্টিমেন্টাল বলো! সরসী হাসিয়া ফেলিল, আমি বলে দিচ্ছি, কিছু খেযে নাও। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?

নিশ্চয়।

রাজকুমারকে খাবার দেওয়ার কথা বলিলে সরসী কিন্তু যায় না, খোঁপা ঠিক করার অবসরে কত কী যেন ভাবিয়া নেয়।

তার চেয়ে আমার বাড়ি গিয়ে খাবে চলো।

বাঁচালে সরসী। লক্ষ্মী মেয়ে। হাটে বসে খাবার গিলতে সত্যি আমার কষ্ট হয়, সেন্টিমেন্টাল বলো আর যাই বলো।

আমি কিন্তু এ সব হাটে বসে দশজনের সঙ্গেই খেতে ভালোবাসি, রাজু। তোমায় মিছে বলেছিলাম, আমি খুব নেমন্তন্ন খাই। তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব বলে না খেয়ে ওদের আগে চলে এসেছি।

বলো কী সরসী? আমায় তো সাবধান হতে হবে।

তুমি আবার অসাবধান কবে? বাস তো কর দুর্গে, সাবধান আবার হবে কী?

কীসের দুর্গ সরসী? কাব দুর্গ?

তোমার নিজের দুর্গ। কীসের তা জানি না।

কথার কথা? কে জানে! বুঝিতে না পারিয়া রাজকুমার একটু বিরক্ত বোধ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া কথাটা স্পষ্ট করিতেও বাধো বাধো ঠেকিতে লাগিল। সরসীর ইঙ্গিত তার জিজ্ঞাসা না করিয়াই বুঝা উচিত।

সরসীদের বাড়ির সকলেই বিয়ে বাড়িতে গিয়াছিল, কেবল কেদার সকাল সকাল ফিরিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। রাত তিনটায় কাশিতে কাশিতে তাঁর ঘুম ভাঙিবে, তার আগে ভদ্রলোকের আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

চাকর দরজা খুলিয়া দিয়া হুকুমের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। সরসী বলিল, তুই শো গে যা লছমন।

একটু পুরানো ধাঁচের বড়ো চারকোনা বাড়ি, ঘরগুলি প্রকাণ্ড। নীচের হলটিতে রীতিমতো সভা বসানো চলে। এই হলে রাজকুমারকে বসাইয়া সরসী খুঁজিয়া পাতিয়া নানারকম খাবার আনিয়া হাজির করিল।

পেট ভরেই খাও। এখন একবার খেয়ে বাড়ি গিয়ে আর খাবার দরকার নেই।

পেট ভরে না খেলেও বাড়ি গিয়ে আর খেতাম না সরসী।

এখনও তোমার হজমের গোলমাল হয়?

সাবধান থাকলে হয় না।

খুব গুণের কথা হল, না? এই বয়সে বুড়োদের মতো খাওয়ার বিষয়ে সাবধান হয়ে চলতে হবে? তুমি একেবারে এক্সারসাইজ কর না। সারাদিন শুয়ে বসে ঘরের কোণে কাটালে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে?

সে জন্য খুব বেশি আসত যেত না সরসী। আসল কারণ হল, এককালে খুব এক্সারসাইজ করতাম, হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছি। চিরকালের আলসে লোকের শুয়ে বসে থাকাটা দিব্যি সয়ে যায়, হঠাৎ একদিন আলসে হলেই বিপদ।

ছাড়লে কেন? আবার তো ধরতে পার?

ধরব। শিগগির ধরব। দু-চারদিনের মধ্যে।

অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গে রাজকুমারের কথা বলার ধরনে সরসী একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। সে যেন সরসীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছে, দেহকে আর অবহেলা করিবে না, অবিলম্বে ব্যায়াম আরম্ভ করিবে। অপরাধের বিলম্বিত প্রায়শ্চিত্ত করার মতো। রাজকুমারের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত সরসী আর কথা বলে না, নীরবে তাকে দেখিয়া যায়। সেটা বিস্ময়কর ঠেকে রাজকুমারের কাছে।

এবার বিদায় নেওয়া যাক।

বোসো।

সেটা কি উচিত হবে? রাত কম হয়নি।

তুমি আমাকে উচিত অনুচিত শেখাতে এসো না।

নিজেও সরসী বসে। বসার পর একসঙ্গে বেশিক্ষণ রাজকুমারের মুখখানা দেখিতে না পাবায় এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে বারবার তার মুখের দিকে তাকায়। রাজকুমার নীরবে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। সরসীর কিছু বলিবার আছে অনেক আগেই সে তা অনুমান করিয়াছিল। তার কাছে কিছু আশা করিয়া সরসী সুযোগ পাইয়া এত রাত্রে তাকে খালি বাড়িতে ডাকিয়া আনে নাই, সরসীর কাছে এ সব হঠাৎ পাওয়া সুযোগ-সুবিধার কোনও মানে নাই। সে রকম ইচ্ছা থাকিলে কবে সকলে বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলে বাড়ি ফাঁকা হইবে সে ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া রাজকুমারকে দিয়াই হয়তো সে খালি একটা বাড়ি ভাড়া করার ব্যবস্থা করিত। কোনও কারণে তাকে আজ সরসীর দরকার হইয়াছে। খুব সম্ভব তাকে কিছু বলিবে সরসী এবং যতক্ষণ মুখ ফুটিয়া না বলিবে, কী যে সে বলিতে চায় কেউ কল্পনাও করিতে পারিবে না।

সরসীর প্রকৃতি আসলে খুব সহজ ও সরল। দরকারি নির্দোষ মিথ্যা সে অনর্গল বলিতে পারে, আজ সন্ধ্যায়ও অনায়াসে লাগসই কৈফিয়ত রচনা করিয়া নিজেকে সাক্ষী দাঁড় করাইয়া রুক্মিণীর কাছে তার লজ্জা বাঁচাইয়াছিল। বুদ্ধি তার ধারালো, মানুষের কাছে কাজ আদায় করার কোনও কৌশল বোধ হয় তার অজানা নাই: সস্তা আবেগ তার কাছে এতটুকু প্রশ্রয় পায় না।

কাল থেকে তোমার কথাই ভাবছি রাজুদা।

কেন?

তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ দিনকে দিন।

কেমন হয়ে যাচ্ছি?

কী রকম অস্থির দিশেহারা হয়ে পড়েছ। বেঁচে থাকতেই যেন ভালো লাগছে না, সব সময় একটা কষ্ট ভোগ করছ। অনেকদিন থেকেই তোমার এ ভাবটা লক্ষ্য করছি। কী হয়েছে তোমার?

রাজকুমার নীরবে মাথা নাড়িল।

সরসী ভ্রূ কুঁচকাইয়া একটু ভাবিল।—কী হয়েছে বুঝতে না পারা আশ্চর্য নয়। কিন্তু কিছু যে তোমার হয়েছে তাও কি বুঝতে পার না? অসুখ হলে তো সবসময় জানা যায় না কী অসুখ হয়েছে, শরীরটা শুধু খারাপ লাগে। নিজের ভেতরে সেই রকম কিছু বোধ কর না? অসুখের কথা

বলছি না। মনে তোমার কোনও রকম অস্বস্তি আছে, টের পাও না?

এ সব কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন সরসী?

বললাম না তোমার জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে? রিণির কাছে সব শুনে—

তাই বলো।

তুমি যা ভাবছ, তা নয়। রিণির কাছে সব শুনে আমার ভাবনা হয়নি, তার অনেক আগে থেকে তোমার সাধারণ চালচলন কথাবার্তার ধরন দেখেই ভাবনা হয়েছে। তবে রিণির ব্যাপারটা না জানলে আমি হয়তো চুপ করে থাকতাম। মানুষের কত কী, হয়, বিশেষ করে তোমার মতো যারা নিজের মনের মধ্যেই বেশি করে বাঁচে। তোমার ভেতরে কোনও একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটছে, আস্তে আস্তে আবার সামঞ্জস্য হয়ে যাবে মন করেছিলাম। একবার ভেবেছিলাম, লভে পড়েছ বুঝি, ছেলেখেলা নয়, আসল লভ। তারপর দেখলাম, সে সব কিছু নয়।

কী করে জানলে সে সব কিছু নয়?

সে রোগের সিমটম আলাদা, আমরা চিনতে পারি। একটা মেয়েকে ভালোবাসার মানে জানো? সকলকে ভালোবাসা, জীবনকে ভালোবাসা, বেঁচে থাকতেই মজা লাগা। তুমি কাউকে ভালোবাসো না, নিজেকে পর্যন্ত নয়। সব সময় তুমি ছটফট করছ, কী করলে একটু স্বস্তি পাবে। সর্বস্ব হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন পাগলের মতো খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, তুমিও ঠিক তেমনই ভাবে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছ। থিয়োরি? তুমি পাগল রাজুদা। দেহের গড়নের সঙ্গে মানুষের প্রকৃতির সম্পর্ক কী তাই টেস্ট করার জন্য কেউ এভাবে ব্যাকুল হয়? তোমার আরও সিরিয়াস কিছু হয়েছে, এ শুধু তার একটা লক্ষণ। আমার কান্না পাচ্ছে বুঝতে পারছ?

সেটা সহজেই বুঝা যাইতেছিল। গলা ভারী হইয়া চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছে। রাজকুমার তাড়াতাড়ি বলিল, কেঁদো না সরসী। কান্না আমি সইতে পারি না।

কান্না পেলেই আমি কাঁদি না কি?

তাই তো তোমায় ভালোবাসি।

ভালোবাসো না, ছাই। পছন্দ কর। ভালোবাসলে তো বেঁচে যেতে।

রাজকুমার করুণভাবে একটু হাসিল। সরসীকে সে পছন্দ করে, স্নেহ করে, একটু ভয়ও করে। নিজের সম্বন্ধে এই স্পষ্ট ও সহজ কথাগুলি সরসী ছাড়া কারও কাছে সে শুনিতে পাইত না। অনেকদিন হইতেই সরসী জানে তার ভিতরে গোলমাল চলিতেছে। নিজের সম্বন্ধে নিজে সে কখনও এ ভাবে চিন্তা করে নাই। যখন এ বিষয়ে কিছু ভাবিয়াছে, স্থূল বাস্তব জগতের আপেক্ষিকতার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছে, ব্যাপারখানা কী? নিজের সম্বন্ধে যত কেন জাগিয়াছে, তার সবগুলির জবাব খুঁজিয়াছে যে অভিধানে শুধু সাধারণ চলতি মানে পাওয়া যায়। মুদির হিসাবে যেন সুখ-দুঃখের হিসাব করিয়াছে। ভূমিকম্পের কারণ খুঁজিয়াছে মাটির উপরে। আরও যে অনেক উষ্ণ গহন স্তর আছে মাটির নীচে এ যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ সরসী মনে পড়াইয়া দিয়াছে, গভীর কৃতজ্ঞতায় অনেকদিন পরে রাজকুমারের হৃদয়গ্রন্থিতে স্রাব হয় চোখের জলের মতো নোনতা সুস্বাদু রসের, শুকনো মন একটু ভিজিয়া ওঠে।

সরসী বলিল, এত বড়ো হলে বসতে ভালো লাগছে না। ওপরে যাবে?

চলো।

উপরে দুটি পাশাপাশি ঘর সরসীর, একটিতে সে বসে, অপরটিতে শোয়। মাঝখানে একটি দরজা আছে, ঘর দুটির ব্যবধান বজায় রাখিতে দরজাটি সে অধিকাংশ সময় বন্ধ করিয়া রাখে, সামনের বাসিন্দা ঘুরিয়া যাতায়াত করে এ-ঘর হইতে ও-ঘরে।

বসিবার ঘরে রাজকুমারকে বসাইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একপাশে একটি চারকোনা টেবিলে সরসী লেখাপড়া করে, তার সভা-সমিতির কাগজপত্রেই টেবিলের অর্ধেকটা ভরিয়া আছে।

ছোটো একটি শেল্‌ফে বাছা বাছা বই, প্রত্যেকটি বই রাজকুমারের পড়া। নির্বিচারে ভালো-মন্দ সব বই পড়ার সময় সরসীর হয় না। রাজকুমারের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত আছে, রাজকুমার নিজে পড়িয়া যে সব বই তাকে পড়িতে বলে শুধু সেই বইগুলিই সে পড়ে—তার জ্ঞানবুদ্ধির আয়ত্তের বাহিরের বইগুলি ছাড়া। এ-ঘরে প্রায়ই অনেক মেয়ে জড়ো হয়, সোফা চেয়ারে ঘরটি একটু ঠাসিয়া ফেলিতে হইয়াছে। জানালার কাছে গেরুয়া আস্তরণ ঢাকা একটি ইজিচেয়ার, সরসী ওখানে বিশ্রাম করে। আস্তরণে মাথার চুলের দাগ পড়িয়াছে টের পাওয়া যায়। সারাদিন ছুটাছুটির পর ওখানে চিত হইয়া শ্রান্ত সরসী না জানি কী ভাবে! দশজনের সঙ্গে সরসীর কারবার, সর্বদা সে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, দু-চারজন সঙ্গিনী সারাদিন তার আছেই। সরসীকে এই ঘরে একা কল্পনা করিতে গিয়া রাজকুমারের মনে হয় সে যেন নিজেরই এক রহস্যময় ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতেছে।

সরসীর ফিরিতে দেরি হইতেছিল। এত রাত্রে তাকে একা বসাইয়া কী করিতেছে সরসী? আত্মসংবরণ করিতেছে? রাজকুমার নিজের কাছেই মাথা নাড়ে। যতই বিচলিত হোক সামলাইয়া উঠিতে সরসীর সময় লাগে না, নির্জনতার প্রয়োজন হয় না। নীচে তার যখন কান্না আসিয়াছিল তখনও এক মিনিটের জন্য উঠিয়া গিয়া কাঁদিয়া অথবা কান্না থামাইয়া আসিতে হয় নাই।

রাজকুমার মৃদুস্বরে ডাকে, সরসী?

কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয় সরসীর গলা। নীচে অত সহজে যে কান্না সে আটকাইয়াছিল, ও ঘরে গিয়া সত্যসত্যই তবে কি সেই কান্নাই সে কাঁদিতেছে? রাজকুমার কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে। রিণির কাছে তার খাপছাড়া প্রস্তাবের বিবরণ শুনিয়া এমন আঘাত লাগিয়াছে সরসীর মনে? রিণিকে কথাটা বলার আগে সে শুধু ভাবিয়াছিল, এ সব কানে গেলে মালতী কত কষ্ট পাইবে। সরসীর কথা তার মনেও আসে নাই। শেষ পর্যন্ত আঘাতটা তবে পাইল সরসী।

রাজকুমার ভাবিয়াছিল, সরসী বাহির হইতে ঘরে আসিবে। শোয়ার ঘরের দরজা খোলার শব্দে সেদিকে চাহিয়া তার চোখের পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল।

সরসী আগাইয়া আসিল আরও অনেক পা।

রিণির মতো রং নেই, আমি কালো। তবু ভাবলাম, তুমি তো রং দেখতে চাও না—

তুমি কাঁপছ সরসী।

মনের জোরে কুলোচ্ছে না। কী মনে হচ্ছে জানো? ছুটে গিয়ে খাটে তোষক গদির নীচে ঢুকে পড়ি। কিছু ভাবা আর করার মধ্যে কত তফাত! তখন থেকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি না ডাকলে দরজা খুলতেই পারতাম না।

তুমি বড়ো সুন্দরী সরসী।

চুপ। ও সব বোলো না। দম আটকে মরে যাবে।

মরবে না, শোনো। তোমার শরীর এমন সুন্দর বলে তোমার মনটাও সুন্দর। তোমায় এখন আমি প্রণাম করতে পারি। জানো?

অনির্বচনীয় আনন্দে রাজকুমারের চিত্ত ভরিয়া যায়, নিরবসন্ন সক্রিয় শান্তির মতো এক অপূর্ব অনুভূতি জাগে। শক্তি ও সহিষ্ণুতার যেন সীমা নাই। শ্রদ্ধা, মমতা, কৃতজ্ঞতা আর সহানুভূতি মেশানো যে মনোভাব সরসীর প্রতি জাগে, প্রেমের চেয়ে তা বোধ হয় কম জোরালো নয়। সরসী তাকে বোঝে, বিশ্বাস করে। ব্যাখ্যা করিয়া সরসীকে তার কিছু বুঝাইতে হয় নাই, রিণির কাছে তার বক্তব্যের ভাঙাচোরা বিকৃত বিবরণ শুনিয়া সে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছে তাই মনে করিয়াছে যথেষ্ট। আর জেরা করে নাই, তর্ক তোলে নাই, নিজের হইয়া ওকালতি করার যন্ত্রণা তাকে দেয় নাই, বিনা ভূমিকায় নিজের দেহটি তাকে দেখিতে দিয়াছে। সরসী ছাড়া আর কেউ তা পারিত না।

সরসীর মুখ বিবর্ণ হইয়াই ছিল, ধীরে ধীরে কখন আপনা হইতে তার চোখ বুজিয়া যায়, আর খোলে না।

এবার যাও সরসী।

তোমার কাজ হয়েছে? এসেছি যখন, মাঝখানে পালিয়ে গিয়ে লাভ হবে না। আর দু-তিন মিনিট কোনওরকমে সইতে পারব।

আর দরকার নেই।

সরসী শোয়ার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, কিন্তু বুঝা যায় দরজার কাছেই সে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় দম নিতেছে।

এবার তুমি যাও রাজুদা। আজ আর তোমায় মুখ দেখাতে পারব না।

আচ্ছা।

লছমনকে ডেকে নিয়ে যেও।

আচ্ছা। সরসী?

না-না-না। বোলো না রাজুদা। রাস্তায় নেমে গেলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে তোমার ভয় হল সরসী? সামনে থেকে সরে গিয়ে? আমি অন্য কথা বলছিলাম।

কী কথা?

আমি কাউকে ভালোবাসি না।

সে তো আমিই তোমাকে বলেছি একটু আগে।

তুমি বললে কী হবে, আমি তো জানতাম না। আজ জানতে পেরেছি। তোমায় একটা সার্টিফিকেট দিয়ে যাই। তোমার শরীর আর মন শুধু সুন্দর নয়, তুমি ভালো, তোমার বেঁচে থাকা সার্থক। তুমি আমাকে উঁচুতে তুলে দিয়েছ। তোমার সাহায্য না পেলে কোনওদিন হয়তো সেখানে উঠতে পারতাম না সরসী। তুমি আমার আর একটা উপকার করেছ সরসী। গিরির ব্যাপারটা জানো?

জানি।

ব্যাপারটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছি কিন্তু শক্‌টা কোনওমতে কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। একটা জ্বালা বরাবর থেকে গিয়েছিল। তুমি আজ জ্বালাটা দূর করে দিলে। মনে মনে কতখানি কষ্ট পাচ্ছিলাম এতদিন ভালো বুঝতে পারিনি, এখন মন শান্ত হয়েছে, এখন বুঝতে পারছি। কোনও মেয়ের সংস্পর্শে এলেই আপনা থেকে মনে হত, এও গিরির জাতের জীব, এর মধ্যেও নিশ্চয় খানিকটা গিরির উপাদন আছে তোমার সম্বন্ধে পর্যন্ত তাই মনে হত। যুক্তি দিয়ে বুঝতাম অন্যরকম, কিন্তু কিছুতে চিন্তাটা ঠেকাতে পারতাম না। তুমি আজ আমার বিকারটা কাটিয়ে দিয়েছ সরসী।

একটু দাঁড়াও রাজুদা, যেয়ো না।

কয়েক মিনিট পরে সাধারণ একটি শাড়ি পরিয়া ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে দিয়া সরসী এ ঘরে আসিল।

জোরে জোরে মাইল খানেক হেঁটে আসি চলো। আজ রাতে নইলে ঘুম আসবে না।

রাজকুমার ভাবে, কারও কাছে সে কি কোনওদিন কোনও অপরাধ করে নাই, পৃথিবী অথবা স্বর্গ অথবা নরকবাসী কারও কাছে?—যে অপরাধের অনুভূতি তাকে যন্ত্রণা দিতে পারে, যার প্রতিক্রিয়া জীবজগতের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে কারও উপরে একটু বিদ্বেষের জ্বালা অনুভব করিতে পারে?

রাগ নাই, অভিমান নাই। একটি মানুষের উপরেও নয়। জড়বস্তুকেও মানুষ কখনও কখনও হিংসা করে, হোঁচট লাগিলে অন্ধ ক্রোধে ইটের উপর পদাঘাত করে, কারাগারের লোহার শিক ভাঙিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু মানুষ নিষ্ক্রিয় নির্জীব পুতুল হইলে একটি পুতুলের মুখ তার পছন্দমতো নয় বলিয়া যতটুকু বিরক্তি বোধ করা চলিত, তাও সে বোধ করে না। মানুষের মনের অন্ধকার ও দেহের

শ্রীহীনতার অপরাধ সে ক্ষমা করিয়াছে। মানুষ যে কৃপণ তাতে তার কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ, মানুষের কাছে সে কিছু চায় না।

এই নির্বিকার ঔদার্য যেন জীবনের সেরা সম্পদ, কুড়াইয়া পাইয়াছে। দূর হইতে দিনের পর দিন শুধু চাহিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একদিন ধনীর দুলালের খেলনাটি বস্তিবাসী শিশুর হাতে আসিলে সে যেমন আনন্দে পাগল হইয়া ভাবে, জীবনে তার পাওয়ার আর কিছুই বাকি নাই, আর্য শান্তি আহরণের সৌভাগ্যে বিপরীত আনন্দের উন্মদনায় রাজকুমারেরও তেমনি মনে হইতে থাকে, এবার সে তৃপ্তি পাইয়াছে, সম্মুখে তার পরিতৃপ্ত জীবন।

সকলে জিজ্ঞাসা করে—কী হয়েছে রাজু? ডার্বি জিতেছ?

একে জিতেছি।—রাজকুমার দেখাইয়া দেয় নিজেকে, কখনও বুকের ডাইনে কখনও বাঁয়ে আঙুল ঠেকাইয়া।

যে কাছে আসে সেই পরিবর্তন লক্ষ করে, নদীতে জোয়ার আসার মতো এত স্পষ্টভাবে সে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনোরমা বিস্মিত হয়, আশা করিবে কী হতাশ হইবে ভাবিয়া পায না। আশাভঙ্গের ভয়টাই হয় বেশি। কালীর জন্য যদি বদলাইয়া গিয়া থাকে রাজকুমার, তাকে কিছু না বলিয়াই কি বদলাইত? এখন শুধু আশা করা চলে যে তাকে কিছু না বলিলেও কালীর সঙ্গে হয়তো তার কোনও কথা হইয়াছে, হয়তো অন্য কিছু ঘটিয়াছে। অন্য কিছু কী আর ঘটিবে, হয়তো কালীকে একটু আদর করিয়াছে রাজকুমার এবং কী করিবে না করিবে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়া সুখী হইয়াছে। এবার সময়মতো একদিন তার কাছে কথাটা পাড়িবে।

মনে মনে মনোরমা কিন্তু মাথা নাড়ে। রাজকুমারের খুশি হওয়া যেন সে রকম নয়। সে শান্তই ছিল চিরদিন, আরও শান্ত হইয়াছে, শুধু চোখেমুখে ফুটিয়াছে জ্যোতি, কথা ও ব্যবহার হইয়াছে নির্ভয় নিশ্চিন্ত সুখী মানুষের আনন্দময় সহজ আত্মপ্রকাশ। একটু তো উত্তেজনা থাকা উচিত ছিল আনন্দে, কালীকে চায় কি চায় না এ সমস্যার মীমাংসা যদি তার হইয়া গিয়া থাকে, শুরু যদি হইয়া থাকে কালীকে পাওয়ার দিন গোনা? কালীকে সে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে কালী, কী হয়েছে রে?

জিজ্ঞাসা করে অনেক বুদ্ধি খাটানো খানিকটা ভূমিকার পর। সে আর কালী ছাড়া রান্নাঘরে কেউ নাই, তবু হাত ধুইতে ধুইতে কালীকে সে শোয়ার ঘরে যাইতে বলে, একটা কথা আছে। একটু দেরি করিয়া নিজে ঘরে যায়, দরজা সযত্নে ভেজাইয়া দেয়। তারপর সামনে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে সুখবর প্রত্যাশা করার মতো ব্যগ্রভাবে প্রশ্নটা করে। যদি কিছু ঘটিয়া থাকে কালীর মতো বোকা মেয়েরও বুঝিতে বাকি থাকিবে না কোন বিষয়ে তার জানিবার আগ্রহ। মুখে কিছু না বলুক, কালীর মুখ দেখিয়াই সে সব বুঝিতে পারিবে।

কিন্তু হায়, কালীর মুখে বিস্ময় ছাড়া আর কোনও ভাব ফোটে না।

কীসের দিদি?

হতাশ ক্রোধে মনোরমা বলে, কচি খুকি, তুমি কিছু জান না। রাজু তোকে কিছু বলেনি? কিছু করেনি?

না তো?

না তো? বড়ো গর্বের কথা তোর, না? যা চেহারা, যা স্বভাব, কে তোকে পছন্দ করবে।

রাজকুমার আজকাল সকলের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। চেষ্টা না করিয়া কেউ আজকাল রাজকুমারকে কাছে পায় না। কাছে মনে পাশে বা সামনে নয়। সে ভাবে কারও কাছ হইতে রাজকুমার নিজেকে দূরে সরাইয়া নেয় নাই। দেখা-সাক্ষাৎ সকলের সঙ্গে যেমন চলিতেছিল প্রায়ে সেই রকমই বজায় আছে। যাদের সঙ্গে শুধু বাহিরের পরিচয় তারা বরং এমন কথা ভাবে

যে আরেকবারের আলাপে মানুষটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই বুঝি খানিকটা বাড়িয়া গেল। কিন্তু যাদের সঙ্গে তার পরিচয় ভূমিকা পার হইয়া জীবনের আনুষঙ্গিক দৃশ্যপট জানাজানিতে অন্তত পৌঁছিয়াছে, যারা উচ্চারণ করার আগেই তার দু-চারটি মনের কথা এতকাল টের পাইয়া আসিয়াছে, চেষ্টা না করিলে তারাও আর মনের তার নাগাল পায় না, ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি তুচ্ছ একটি কথারও পুনরাবৃত্তি যেন হয় না কারও সঙ্গে তাব দু-চারঘণ্টার আলাপে।

তিনদিন তার সঙ্গে মালতীর দেখা হইযাছে, দশজনের মধ্যে এবং নির্জনে। তিনদিন নিজের মধ্যে নিজেকে নিয়া মশগুল মানুষটাকে মালতী দেখিয়াছে, কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারে নাই।

প্রথমেই এই চিন্তা তার মনে আসিয়াছিল, একি শ্যামলের জন্য। শ্যামল আর তার সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া কি রাজকুমার হঠাৎ এভাবে বদলাইয়া গিয়াছে? রাজকুমারের পরিবর্তনের কত সম্ভবপর কারণের কথাই সে ভাবিতে পাবিত, কত রাগ আর অভিমান জাগিতে পারিত উপেক্ষার মতো বাজকুমারে নির্বিকার খাপছাড়া ব্যবহারে, তার বদলে শ্যামলকে কারণ হিসাবে মনে টানিয়া আনিযা বুকটা তার ধড়াস করিয়া উঠিল। সত্যই যেন শ্যামলের সঙ্গে তার কিছু হইয়াছে, শ্যামল যেন নিছক তার বন্ধু নয়। শ্যামলেব দিক হইতে ধরিলে হযতো সে তার নয়। হয়তো কেন, মালতী ভালোভাবেই জানে শ্যামলের মনকে বন্ধুর মন বলিয়া গণ্য করা শুধু ভুল নয়, নিষ্ঠুর অন্যায। মাঝে মাঝে শ্যামলের জন্য আজকাল জ্বালা করিয়া চোখে তার জল আসে, আজ অপমান করিলেও কাল সে বই ফেরত নেওয়ার ছলে গম্ভীর মুখে বাড়িতে আসে, বই হাতে পাওয়া মাত্র চোখ, তার ক্রুদ্ধ করুণ ছলছল আশ্চর্য চোখ, আড়াল করিতে অভিমানী শিশুর মতো মুখ ফিরাইয়া মাথা উঁচু করিয়া গটগট করিয়া চলিযা যাওয়ার উপক্রম করে, কিন্তু ডাকিবামাত্র ফিরিয়া আসিয়া বলে, কী বলছ শিগগির বলো, আমাব কাজ আছে। তবে এটা শুধু শ্যামলের দিক। সে তো কোনওদিন তাকে প্রশ্রয় দেয নাই, কাছে আসিতে আব কথা বলিতে দেওয়া যদি প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। বাজকুমারের ভাবান্তর তার আর শ্যামলের সম্পর্কেরই কোনও জটিল দুর্বোধ্য প্রতিক্রিয়া, প্রথমেই এ কল্পনা কেন তাকে চমকাইয়া দেয়? তারপর সারাদিন উতলা করিয়া রাখে, নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করায়? কদিন মালতী যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে দারুণ কিন্তু সে যেন কেমন এক ধরনের যন্ত্রণা, উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনা আর আত্মহারা অবসাদের বেদনাহীন পীড়ন, গা পোড়ানো জ্বরে হাড় কাঁপানো শীতের মতো।

আজ শ্যামল আসিবে। কাল মালতী নিজে তাকে আসিতে বলিয়াছে। শ্যামলের সঙ্গে তার সিনেমায় যাওয়ার কথা আছে। বাহিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়াকে কথা সে ভাবিতেছে, হঠাৎ তার মনে হইল, এভাবে চলিতে পারে না, এভাবে রাজকুমারকে দূরে সরিয়া যাইতে দেওয়া অন্যায, তারও অন্যায়, রাজকুমারেরও অন্যায়। চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া শুধু উতলা হইলে তার চলিবে না। আজ রাজকুমারকে তার কাছে পাওয়া চাই। শ্যামল যখন আসিল, বাজকুমারের সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়া মালতী সবে রিসিভারটা নামাইয়া রাখিয়াছে।

উৎসাহে শ্যামল অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। শিগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও মালতী, দেরি হয়ে গেছে।

আমি যাব না।

কেন? লক্ষ্মী চলো। প্লিজ।

কী আশ্চর্য, বলছি তোমার সঙ্গে যাব না, রাজুদার সঙ্গে আমার দরকার আছে, জোর করে নিয়ে যাবে তুমি আমায়?

জোর করে?

আমি তো কিছুই করিনি মালতী?

করোনি? দিনরাত পেছনে লেগে আছ তুমি আমার, কিছু করোনি? এই যে তাকিয়ে আছ অমন করে, এটা কিছু করা নয়, এই যে তর্ক করছ, এটাও কিছু করা নয়—তুমি কিছুই করো না,

বড়ো ভালো ছেলে তুমি! যেতে চলছি, চলে যাও না? তোমার কি মান-অপমান জ্ঞান নেই? এত অপমান করি, কিছুতেই তোমার অপমান হয় না?

তুমি আমায় কখনও অপমান করোনি।

করিনি? হাজারবার করেছি। অন্য কেউ হলে—

রাগের মাথায় কখনও দু-চারটে কথা বলছে, তাকে অপমান বলে না আসতে বারণ করে নিজেই আবার আসতে বলেছ।

আমি আসতে বলেছি? ছুতো করে তুমি নিজে এসেছো।

ছুতোগুলি তুমি মেনে নাওনি কেন? বই নিতে এসেছি, বই নিয়ে চলে যেতে দিলেই চুকে যেত। দু-চারদিনের বেশি তো আর ছুতো করে আসতে পারতাম না আপনা থেকে আমার আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত। মালতীর সঙ্গে কলহ বাধিলে চিরদিন শ্যামলের কথা জড়াইয়া গিয়াছে, আজ তাকে চাপা গলায় ধীরে ধীরে অপরিচিত ভঙ্গিতে কথা বলিতে শুনিয়া মালতীর হঠাৎ কেমন ভয় করিতে লাগিল। শ্যামল ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে। রাগে সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তবু সে এত আস্তে এত স্পষ্টভাবে বলিতেছে কী করিয়া?

যাকগে। ও সব কথা থাক শ্যামল।

না, থাকবে না।

মালতী ভীরু চোখ তুলিয়া শ্যামলের মুখের দিকে তাকায়। শ্যামলেব চোখে কী হইয়াছে—অমন করিয়া তার দিকে সে তাকায় কেন?

রাজকুমাবের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর শ্যামলেব সম্পর্কে মালতীব মনটা বিগড়াইযা গিয়াছিল। নিজে সে যাচিয়া রাজকুমারকে জানাইয়া দিয়াছিল, শ্যামলের সঙ্গে তার সিনেমায় যাওযার কথা আছে, শ্যামল এখনই তাকে নিতে আসিবে, কিন্তু রাজকুমারের সঙ্গে সে আজ সন্ধ্যাটা কাটাইতে চায়। ভাবিয়াছিল, শ্যামলকে বাতিল করিয়া তার সঙ্গ চায় শুনিয়া রাজকুমাব নিশ্চয় খুশি হইবে। খুশি সে হইয়াছিল কিনা ভগবান জানেন, শ্যামলের সঙ্গেই সিনেমায় যাওয়াব জন্য তাকে রাজি করাইতে কত চেষ্টাই যে রাজকুমার করিয়াছিল। শ্যামলের মনে নাকি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, শ্যামল তাকে ভালোবাসে। শেষে রাজকুমার বলিয়াছিল, ওকে অন্তত মিষ্টি কথা বলে ফিরিয়ে দিও মালতী, মনে যেন দুঃখ না পায়। আমার কাছে আসছ ওকে জানিয়ে দরকার নেই। ওর সম্বন্ধে আমার ভয় আছে মালতী, মাথাপাগলা ছেলে তো, কখন কী করে বসে। তার সঙ্গে সন্ধ্যাযাপনের জন্য রাজকুমাবকে রাজি করাইতে রীতিমতো চেষ্টা করিতে হওয়ায় মালতীর গা জ্বালা করিতেছিল, এ সব কথা শুনিতে শুনিতে তার মনে হইয়াছিল শ্যামলের চেয়ে বড়ো শত্রু বুঝি তার নাই। হয়তো ঈর্ষাতে নয়, শ্যামলের মনে কষ্ট দেওয়ার ভয়েই রাজকুমার তাকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাকে উপেক্ষা করিতেছে। শ্যামল রাজকুমারের পরিবর্তনের কারণ। তাকে ভালোবাসিয়া শ্যামল তার সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে।

মিষ্টিকথার বদলে অতি কড়া ভাষাতেই শ্যামলের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া সে তাই বাতিল করিয়া দিয়াছে। রাজকুমারের সঙ্গে তার দরকার আছে এ কথাটা জানাইয়া দিতেও কসুর করে নাই। এখন শ্যামলের রকম দেখিয়া তার বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতে লাগিল। এতক্ষণ বিশ্বাস করে নাই, এবার মনে হইতে লাগিল রাজকুমার হয়তো ঠিক বলিয়াছে, শ্যামল ভয়ানক কিছু করিয়া বসিতে পারে।

শ্যামল বলিতে থাকে, তুমি হয়তো সত্যি আমায় অপমান করেছ, বাঁদর নাচিয়েছ, আজ তাড়িয়ে দিয়ে কাল আবার ডেকে পাঠিয়ে পোষা কুকুরের মতো খেলা করেছ আমার সঙ্গে। করে থাকলে বেশ করেছ। আমি বোকা, বোকাই থাকতে চাই, আমার যা ইচ্ছা তাই আমি বিশ্বাস করব। তবে তোমাকে আর জ্বালাতন করব না মালতী, প্রতিজ্ঞা করছি। তুমি আর টেরও পাবে না শ্যামল বলে

কেউ এ জগতে আছে। সত্যি বলছি মালতী, কাল থেকে তুমি ধরে নিতে পারবে, আমি বেঁচে নেই।

তার মানে? এ সব কী বলছ? কী করবে তুমি? শক্ত করিয়া শ্যামলের কবজি চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত চোখে তার পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মালতী শিহরিয়া উঠিল, এই সব উদ্ভট মতলব জাগছে তোমার মাথায়। আমি আগেই জানতাম তুমি একটা ভীষণ কাণ্ড না করে থাকবে না। তোমার মতো যারা ছেলেমানুষ হয় চিরকাল তারাই লেকে ডুবে, সায়ানাইড খেয়ে জগতের ওপর শোধ নেয়—তোমার মতো যারা ভীরু আর কাপুরুষ।

আরও জোরে মালতী শ্যামলের হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, ছাড়িয়া দিলেই সে যেন সঙ্গে সঙ্গে লেকে গিয়া ডুব দিবে অথবা কলেজের ল্যাবরেটরিতে গিয়া সায়ানাইড গিলিবে, তোমায় একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো। এই যে মতলব তুমি করেছ—আগে শুনে নাও আমার কথা—এর মানে তো এই যে অন্যের হয়ে যাব, তুমি তা সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারবে না? আমার জন্যেই মরবে তো তুমি? কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখছ, আমাকেও তুমি কী ভাবে মেরে রেখে যাবে, এক মুহূর্তেব জন্য আমি শান্তি পাব না? আমি কী করে বাঁচব বলো তো? আমায় ভালোবাস বলে তোমায় মরতে হবে—আমাকে শাস্তি দিয়ে! একে ভালোবাসা বলে নাকি? আমায় পেলে না বলে মরতে পারবে, আমার সুখের জন্য বেঁচে থাকার কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে না!

শ্যামল মৃদুস্বরে বলিয়াছিল, তা বলিনি মালতী। সায়নাইড খাওয়ার কথা বলিনি। আমি বলছিলাম, আর তোমায় জ্বালাতন করব না, দূরে সরে যাব।

শুধু দূরে সরে যাবে?

হ্যাঁ, তোমায় আব বিরক্ত করব না।

ও!

মালতী নিশ্চিন্ত হইযাছিল সন্দেহ নাই। মুখ দেখিযা কিন্তু মনে হইয়াছিল সে যেন আহত হইযাছে, অপমানও বোধ করিয়াছে। যাকে ছেলেমানুষ মনে করিযা রাখা যায় তার কাছে ছেলেমানুষি করিয়া ফেলার লজ্জায় রাগও কী কম হয মানুষের!

আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না মালতী।

মালতী চুপ করিযাছিল। শ্যামল তাকে বুঝিতে পারে না, রাজকুমার তাকে বুঝিতে পারে না, সে নারী, সে রহস্যময়ী! শ্যামল তাকে পূজা করে, রাজকুমার তাকে অবজ্ঞা করে, কারণ সে নারী, সে রহস্যময়ী, তাকে কেউ বুঝিতে পারে না!

আমার একটা কথা রাখবে মালতী?

অত ভূমিকা কোরো না। কী কথা?

এক মাস বাইরে কোথাও ঘুরে আসবে?

তোমার সঙ্গে।

না। তুমি একা। কোনও আত্মীয়স্বজনের কাছে চলে যাও। পুনায় তোমার মাসিমার কাছে অনায়াসে যেতে পার। যাবে?

তখন মালতীর মনে হইয়াছিল, শ্যামল যেন আর ছেলেমানুষ নাই, ছোটো ছোটো আবেগে নিজেকে সে খরচ করিয়া ফেলে না, কখন সে যেন পরিণত পুরুষ হইয়া গিয়াছে, ধীর সংযত আত্মপ্রতিষ্ঠ তেজি পুরুষ, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ পুরুষ, হাসি কান্না আনন্দ বিষাদের রসজ্ঞ পাকা অভিনেতা। ঠিক কী অনুভূতি তখন তার জাগিয়াছিল আর আনুষঙ্গিক আরও কী সব কথা মনে হইয়াছিল পরে মালতী কোনওদিন স্মরণ করিতে পারে নাই। ওই কয়েক মুহূর্তের অভিজ্ঞতা শুধু তার মনে ছিল, নতুন চিন্তা আর অনুভূতির যেটা ফলাফল পরবর্তী প্রক্রিয়া। সে অভিজ্ঞতা বড়ো অদ্ভুত। শ্যামল নিষ্ঠুর, রাজকুমারের চেয়ে নিষ্ঠুর। রাজকুমার কি নিষ্ঠুর? যাকে আপন করিতে চাই সে ব্যথা দিবেই, প্রিয় নিষ্ঠুর হইবেই—কারণ জগতে কেউ আপন হয় না, কেউ প্রিয় থাকে না চব্বিশ ঘণ্টা। একদিন

রাজকুমার যখন শুধু তার চোখে চোখে চাহিয়াছিল, পলক না ফেলিয়া যতক্ষণ চাহিয়া থাকিবার ক্ষমতা মানুষের আছে ঠিক ততক্ষণ, মালতীর আর্তনাদ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছিল। এ সহজ সুবোধ্য কথা। কোলের শিশুকেও তো মার মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর মনে হয়। কিন্তু গুরুজনের মতো তাকে শহর ছাড়িয়া দূরে কোথাও গিয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়ার সময় শ্যামলকে দেখিবার কয়েকটি মুহূর্তে এ কী অভিজ্ঞতা তার জন্মিয়া গেল যে রাজকুমারের চেয়ে শ্যামলের নিষ্ঠুরতা গভীর ও মর্মান্তিক? তার আঙুলে গোলাপের কাঁটা ফুটিলে যে শ্যামলের মনে হয়তো লক্ষ কাঁটা ফোঁটার যন্ত্রণা হয়?

আমার ভালোর জন্য বলছ, তোমার কোনও স্বার্থ নেই, কেমন?

এবার শ্যামল চুপ করিয়া ছিল।

তুমি যাও শ্যামল। আমি বেরুব।

আমার সঙ্গে চলো?

তোমার সঙ্গে যাব না।

কখন ফিরবে?

তুমি আমায় পাগল ক'রে দেবে। যেতে বলছি, যাও না?

যাচ্ছি মালতী।

যাচ্ছি বলিয়াও শ্যামল মিনিট দুই দাঁড়াইয়াছিল।

আর আসব না তো?

তার মানে?

তুমি যদি সত্যি বারণ কর, তা হলে আর আসব না।

মালতী হতাশভাবে এতক্ষণ পরে বসিয়া পাড়িয়াছিল।

তোমার সঙ্গে সত্যি পারলাম না শ্যামল। কী যে করি তোমাকে নিয়ে আমি। আমি জানি তুমি একটা ছুতো খুজছ, নাটক করার মতো খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে আমি সত্যিসত্যি তোমাকে আসতে বারণ করব, তুমিও আমার হৃদয়হীনতায় আহত হয়ে চলে যাবে, আর আসবে না। প্রথমদিন ভাববে আমি রক্তমাংসের মানুষ নাই, পরদিন ভাববে আমি মাটি, পরদিন পাথর, পরদিন লোহা, পরদিন ইস্পাত—বেশ মজা হবে, না? সব ব্যাপারকে একেবারে চরমে না তুললে কি তোমার চলে না? তুমি জানো, ওভাবে তোমাকে আমি যেতে বলতে পারি না। তুমি বোধ হয় ভাব যে মেয়েরা যার সঙ্গে লভে পড়ে তাকে ছাড়া সকলের মনে কষ্ট দিয়ে সুখ পায়?

আর কিছু বলতে হবে না মালতী। আমি যাচ্ছি।

শোনো, তোমাকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। আজ আমার সময় নেই, ক্ষমতাও নেই। কাল সন্ধ্যার পর একবার এসো।

আমাকে আর কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না, মালতী।

হবে। সব কথায় কথা বাড়াও কেন? কাল এসো।

না এলে তুমি দুঃখিত হবে?

শ্যামল! ফের যদি তুমি আমার সঙ্গে এমনি করো কোনওদিন তোমার সঙ্গে কথা কইব না।

তারপর শ্যামল চলিয়া গেলে এমন শ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত আর অসহায় মনে হইয়াছিল নিজেকে, আধঘণ্টা মালতী চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। এখন আবার রাজকুমারের সঙ্গে বুঝাপড়া বাকি আছে। শেষ (বুঝাপড়া সে আজ করিবে রাজকুমারের সঙ্গে।) বুঝাপড়ার কী আছে, কিছুই সে জানে না। কিন্তু আর তার সহ্য হয় না। এই অনির্দিষ্ট অসহ্য-হওয়ার প্রতিকার চাই। এভাবে আর চলে না, চলিতে পারে না। হয় রাজকুমার তাকে লইয়া যাক সমুদ্রতীরের কোনও বন্দরে, পাহাড়ের মাথায়

কোনও শহরে, মাঠের ধারের কোনও গ্রামে, সেখানে সন্ধ্যা হইতে তাকে বুকে তুলিয়া এত জোরে পিষিতে থাক যেন শেষ রাত্রে তার দম আটকাইয়া যায়, নয়তো তাকেই অনুরোধ করুক জোরে তার গলা জড়াইয়া ধরিতে যাতে আর রাজকুমার নিশ্বাস নিতে না পারে। তার দুর্বোধ্য অর্থহীন যন্ত্রণার মতো এইরকম খাপছাড়া ভয়ানক কিছু ঘটুক।

রাজকুমার প্রতীক্ষা করিয়া আছে, সে যাচিয়া দেখা করিতে চাহিয়াছে বলিয়া রাজকুমার তার জন্য রাস্তার ধারে একটা বিলাতি দোকানের লাল বাড়ির সামনে গাড়ি-বারান্দার নীচে ফুটপাতে দাঁড়াইয়া তার প্রতীক্ষা করিতেছে, ক্রমাগত এই কথাটা মনে পড়িতে পড়িতে মালতীর মস্তিষ্কে উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তার পাক-খাওয়া কমিয়া আসিল। জীবনে মালতী একবার নাগরদোলায় চড়িয়াছিল, দশ এগারো বছর বয়সে। তার দুর্দশা পৌঁছিয়াছিল সেই সীমায় যার পরেই মূর্চ্ছা গিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। উঠিয়া জামাকাপড় বদলানোব সময় আজ তাব মনে হইতে লাগিল, এই মাত্র সে যেন নাগরদোলা হইতে নামিযা আসিযাছে। সে জানিত না, সম্প্রতি রাজকুমারেরও একদিন এই রকম মনে হইযাছিল।

রাজকুমাব বলিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে মানুষ দেখছিলাম মালতী, দেখতে দেখতে একটা অন্যায় কবে ফেলেছি।

সে কী?

এদিক থেকে একজন মহিলা আসছিলেন, সামনে দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবেন। যখন কাছাকাছি এলেন, আমি বুঝতে পারলাম তিনি আশা করছেন আমি একটু পিছু হটে তাকে পাশ কাটাবার আরেকটু জায়গা দেব। ভদ্রতা কবে এক পা পিছু হটতে গিয়ে আরেকজনেব পা মাড়িয়ে দিলাম, ছোটোখাটো একটু ধাক্কাও লাগল। যাব পা মাড়িয়ে দিলাম তিনি ঠিক মহিলা নন, কমবয়সি একটি বিদেশি মেয়ে।

তাবপব?

ঘুরে দাঁড়িয়ে বুঝলাম অন্তত গালে একটা চড় সে মারবেই। আমি অ্যাপলজি পর্যন্ত চাইলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিতে তাকিয়ে রইলাম। কুড়ি কী বাইশ সেকেন্ড। তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে সে চলতে আরম্ভ করল। কী বলে গেলে জানো? সরি।

তারপর?

তারপর আবার কী?

তোমার চোখেব দিকে কুড়ি-বাইশ সেকেন্ড তাকিয়ে থেকেই মেয়েটার রাগ জল হয়ে গেল কেন বুঝিয়ে বলবে না? ওটাই তো আসল কথা, গল্পের মরাল। আচ্ছা বলছি শোনো। ভুল হলে করেক্ট কববে। তোমার চোখেব দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পেরেছিল, মানুষ ভালো, মানুষ কখনও অন্যায় করে না, সমস্ত অন্যায় আপনি ঘটে যায়—ওগুলি জীবনের অ্যাক্সিডেন্ট। ঠিক হয়নি?

মালতী আজ রাজকুমারকে খোঁচা দিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে। মালতীর পক্ষে এটা একেবারে অসম্ভব বলিয়া জানিত কিনা রাজকুমার, তাই অনেকদিন পরে আজ ভালো করিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—মুখের ভাব না দেখিয়া কোনও কথার মানে বুঝা যায় না অনেক সময়। শহরেব শৌখিন প্রান্তর ডিঙাইয়া শেষ বেলার রোদ তাদের গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তাপের চেয়ে সে রোদের রং বেশি। মালতীর বিবর্ণ মুখে সত্যই তার কথার ব্যাখ্যা ছিল। তবু রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অসুখ করেছে?

না। অসুখ করেনি।

বাড়িতে না ডেকে এখানে আমাকে অপেক্ষা করতে বললে কেন মালতী?

বাড়ির বাইরে তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল তাই। হয় নিজের বাড়িতে নয় অন্য কারও বাড়িতে তোমার সঙ্গে এতদিন কথা বলেছি। আমায় একদিন সিনেমায় পর্যন্ত তুমি নিয়ে যাওনি আজ পর্যন্ত।

রাজকুমার একটু ভাবিল।

সাড়ে ছটার সময় স্যার কে এল-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। পিওন দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এমন করে লিখেছেন দেখা করার জন্য, একটা কিছু গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে। স্যার কে এল-কে ফোন করে দি, সাড়ে নটার সময় বাড়ি গিয়ে দেখা করব। তারপর সিনেমায় যাবে তো চলো।

না। আগে দেখা করে হাঙ্গামা চুকিয়ে এসো।

তুমি এতক্ষণ কী করবে?

আমি? এক কাজ করা যাক, হোটেলে একটা রুম নাও। তুমি স্যার কে এল-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবে, আমি বিশ্রাম করব—শুয়ে থাকব একটু।

তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, মালতী।

ছেলেমানুষ নই?

আগে ছিল, এখন কি আর তোমায় ছেলেমানুষ বলা যায়? তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ মালতী। আজ থেকে তুমি সুখী হবে।

শুনিয়া মালতীর ভয় করিতে থাকে। সুখ-দুঃখের কথা সে কখনও ভাবে নাই। সুখে অথবা দুঃখে কোনওদিন তার সচেতন হইতে খেয়াল থাকে নাই আমি সুখী অথবা আমি দুঃখী। নিজের সম্বন্ধে নিজের বিচারে এই হিসাবটা তার চিরদিন বাদ পড়িয়াছে। একটা অজানা মধ্যবিত্ত ফিরিঙ্গি হোটেলের একটা ঘরে তাকে রাখিয়া রাজকুমার স্যার কে এল-এর সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলে নিজেকে মালতীর বড়ো অসহায় মনে হইতে থাকে। অপরিচিত আবেষ্টনীতে নিজেকে একা মনে করিয়া নয়, বাঁচিয়া থাকার মতো সহজ স্বাভাবিক ব্যাপারটা হঠাৎ অতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া। তার নিজের জীবন আছে, জীবন যাপনের কঠিন আর জটিল কর্তব্য তাকে পালন করিতে হইবে, কিন্তু সে কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। তার বুদ্ধি নাই, সাহস নাই, অভিজ্ঞতা নাই। রাজকুমার যাই বলুক, সে সত্যই ছেলেমানুষ, এতকাল শুধু ছেলেখেলা করিয়াছে, ছেলেখেলা করা ছাড়া আর কোনও যোগ্যতা তার নাই। জীবন তো ছেলেখেলার ব্যাপার নয়।

হোটেলটি বড়ো রাস্তা হইতে খানিকটা তফাতে, পথের শব্দ কানে আসে না। হোটেলটিও ছোটো এবং প্রায় নিঃশব্দ। হোটেলের লোক খাটে দুজনের বিছানায় ফরসা চাদর পাতিয়া, পাশাপাশি দুটি করিয়া বালিশ রাখিয়া গিয়াছে। ছোটো গোল চায়ের টেবিলটার দুদিকে দুখানা চেয়ার। চারটি বড়ো বড়ো জানালায় এমন কৌশলে পর্দা দেওয়া যে ঘরের মধ্যে আলো আসে কিন্তু মানুষের দৃষ্টি আসে না। দেওয়াল যেন সবুজ রঙে গভীর হইয়া আছে। ড্রেসিংটেবলে প্রসাধনের আয়োজনের অভাব মালতীর অসম্পূর্ণতার অনুভূতিকে জোরালো করিয়া তোলে। আয়নায় যে-মালতীকে দেখা যায় তাকে মালতীর মনে হয় অন্য একটি মেয়ে।

শেষ মুহূর্তে রাজকুমার মালতীকে একা রাখিয়া স্যার কে এল-এর সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়ার ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, মালতী রাজি হয় নাই।

না, সব হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়ে এসো। আমার সঙ্গে কথা বলবে আর মনে মনে ভাববে রিণির বাবা কী জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমার তা সইবে না।

তা ভাবব না মালতী। ওটুকু মনের জোর আমার আছে।

মনের জোরের কথা নয়।

রাজকুমার চলিয়া যাওয়ার পর আধঘণ্টার মধ্যে মালতী অস্থির হইয়া উঠিল। সময় যে এত শ্লথ, শুইয়া বসিয়া ঘরের মধ্যে পাক দিয়া আর ক্রমাগত কবজিতে বাঁধা ঘড়িটির দিকে চাহিয়া সময়কে যে কিছুতেই তাড়াতাড়ি পিছনে ঠেলিয়া দেওয়া যায় না, আজ যেন সে তা জানিতে পারিল প্রথম। অথচ মনে মনে সে কামনা করিতে লাগিল, রাজকুমারের ফিরিতে যেন দেরি হয়। অনেক দেরি হয়।

ফিরিয়া আসিতে রাজকুমারের সত্যই দেরি হইয়া গেল।

স্যার কে এল-এর আপিস বেশি দূরে নয়, ট্যাক্সিতে পৌঁছিতে রাজকুমারের পাঁচ-সাতমিনিটের বেশি সময় লাগিল না। আপিসে লোকজন অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছে, কেবল তিনজন কেরানি তখনও ঘাড় গুঁজিয়া কাজ করিতেছে। নিজের ঘরে স্যার কে এল পাইপ কামড়াইয়া খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন আর ঘরের কোণে টাইপরাইটারের সামনে চুপচাপ বসিয়াছিল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে। বয়স তার রিণির চেয়ে হয় তো বেশি নয়, কিন্তু মুখে অনেক বেশি বয়সের ছাপ।

বসো রাজু।

স্যার কে এল নিজেই বসিলেন।

তুমি এখনও যাওনি যে মিস রেড্‌ল?

স্যার কে এল নিজেই তাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, মনে ছিল না। মিস রেড্‌ল চলিয়া গেলে রাজকুমারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন, একটা চিঠি টাইপ করাব বলে ওয়েট করতে বলেছি, একঘণ্টার বেশি চুপচাপ ওয়েট করছে! একবার যে মনে করিয়ে দেবে সেটুকু সাহস নেই। খাঁটি ইংরেজ মেয়ে হলে, ইংরেজ কেন, বাঙালি মেয়ে হলে, কখন খেয়াল করিয়ে দিত, চিঠিটাও টাইপ করানো হত আমার। যাকগে।

মুখে যাকগে বলিলেও বাজে চিন্তাগুলিকে যাইতে দিয়া সহজে কাজের কথা কিন্তু তিনি আরম্ভ করিতে পারেন না। এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করেন তার এক দুঃসাহসী টাইপিস্টেব কথা, মাসের শেষে যে ওভারটাইম চার্জ করিয়া তার কাছে বিল পাঠাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবশ্য বিদায় দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সেটা তার দুঃসাহসের জন্য নয়।

নিজের পাওনা বুঝে নেবার সাহস সকলের থাকবে, আমি তাই পছন্দ করি বাজু। তুমি তো জানো আমাকে, জানো না? আমার প্রিন্সিপল্ হল, কারও ওপর অন্যায় না করা। তাই বলে অভদ্রতাকে তো প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। আমি তাকে আপিস টাইমের পর থাকতে হুকুম দিইনি, অনুরোধ করেছিলাম। একেবারে বিল না পাঠিয়ে সেও যদি আমাকে—যাকগে।

রাজকুমার বুঝিতে পারে যে ব্যাপার সহজ নয়। এতক্ষণ স্যার কে এল শুধু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, দরকারি চিঠি টাইপ করানোর জন্য টাইপিস্ট বসাইয়া রাখিয়া তার উপস্থিতি পর্যন্ত ভুলিযা গিয়াছিলেন, তাকে দেখিয়া এখন ভয়ানক বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং প্রাণপণে সেটা দমন করার চেষ্টা করিতেছেন। নিজেকে একটু আয়ত্তে না আনিয়া আলোচনা আরম্ভ করিবার সাহস তার হইতেছে না। তাকে এমন কী বলার থাকিতে পারে রিণির বাবার যা বলা তার পক্ষে এত কঠিন? রিণির মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে স্যার কে এল-এর পরিচয়, ইদানীং কেবল সে পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, বয়স হইতে শুরু করিয়া অর্থ সম্মান শিক্ষাদীক্ষা চালচলনের পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও সহানুভূতির একটা যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে, এই মাত্র। স্যার কে এল-এর জীবনে কোনও অঘটন ঘটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?

হঠাৎ রাজকুমারের মনে হয়, যা ঘটিয়াছে সেটা স্যার কে এল-এর ব্যক্তিগত কিছু নয়, তার কেন্দ্র নিশ্চয় রিণি। নিজের জীবনে স্যার কে এল-এর এমন কিছু ঘটিতে পারে না তাকে যা না বলিলে তার চলে না এবং বলিতে গিয়া এমন নার্ভাস হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু রিণি? কী হইয়াছে রিণির?

রিণি কেমন আছে? অনেকদিন দেখা হয়নি রিণির সঙ্গে?

রিণিও তাই বলছিল। তুমি আর যাও না।

রাজকুমার একটু অস্বস্তির সঙ্গে স্যার কে এল-এর মুখের দিকে তাকায। রিণি কথা তোলা মাত্র তার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে, অতি ধীরে ধীরে তিনি কাগজ কাটা ছুরির ডগা দিয়া রেখা

আঁকিয়া চলিয়াছেন ব্লটিং প্যাডের এক প্রান্ত হইতে আরেক পর্যন্ত। তার কথা, ভঙ্গি ও মুখের ভাবের কোনও মানেই রাজকুমার বুঝিতে পারে না। রিণি কি স্যার কে এল-এর কাছে তার সেই অভদ্র অনুরোধের কথা বলিয়া দিয়াছে? স্যার কে এল কি সেই জন্য তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? কিন্তু সে যখন আর রিণিকে বিরক্ত করিতে যায় না, গায়ে পড়িয়া তাকে আপিসে ডাকিয়া পাঠাইয়া সে কথা তুলিবার তো কোনও অর্থ হয় না।

পরশু রিণি আমাকে সব বলেছে রাজু।

রাজকুমার চুপ করিয় বসিয়া থাকে। রিণি সব বলিয়াছে। ভালো কথা। স্যার কে এল তাকে কী বলিবেন? উপদেশ দিবেন? গালাগালি? লজ্জা, ভয়, আপশোষ কিছুই রাজকুমার বোধ করে না, রিণির উপর রাগও হয় না। রিণি মন তার অজানা নয়। সে মনে কত খেয়াল, কত ঝোঁক, কত জিদ, আর কত আত্মপীড়নের পিপাসা আছে সে তার পরিচয় রাখে। এ রকম মন যাদের হয়, জীবনকে জটিল করাই তাদের ধর্ম। কোনওদিন যদি অসাধারণ কিছু ঘটে জীবনে, সেই ঘটনার জের টানিয়া চলিতে চায় সারা জীবন, প্রেমে অথবা বিদ্বেষে সমাপ্তিকে অস্বীকার করিতে চায়, আগেই অতিরিক্ত মূল্য দিয়া ফেলায় শেষ হইতে দিলেই এখন তাদের লোকসান।

বন্ধু একদিন তার অনাবৃত দেহ দেখিতে চাহিয়ছিল, এ কী রিণি ভুলিতে পারে অথবা বন্ধুর সঙ্গে শুধু সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াই এমন একটা ব্যাপারকে শেষ হইতে দিতে পারে! স্যার কে এল রাজকুমারকে পছন্দ করেন? রাজকুমার যে কী ভয়ানক মানুষ তার প্রমাণ দিয়া বাপের ধাবণার নাটকীয় পরিবর্তন না ঘটাইয়া রিণি থাকিতে পারিবে কেন! রাজকুমারের প্রতি স্যার কে এল-এর ক্রোধ ও বিদ্বেষ জাগিবে, অতীতে বিলীন হইয়া যাওয়ার বদলে জের টানা চলিতে থাকিবে রাজকুমারের অসভ্যতার, রিণির হৃদয় মনে নূতন করিয়া ছোঁয়াচ লাগিবে উত্তেজনার, আগে হয়তো রাজকুমারের জ্বালা বোধ হইত, গিরির হাত টানার ব্যাপারে যেমন হইয়াছিল। এখন সে রিণির জন্য মমতাই বোধ করে। নিজের জন্য অকারণে যন্ত্রণা সৃষ্টি করার এই নেশা চিরদিন মেয়েটার জীবনের অভিশাপ হইয়া থাকিবে।

তোমার সম্বন্ধে আমার অন্য ধারণা ছিল, রাজু। আমার একটা অহংকার আছে, আমি মানুষ চিনতে পারি। এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমার সম্বন্ধে ভুল করেছিলাম, তুমি এতবড়ো রাসকেল। সোজাসুজি কয়েকটা কথা আলোচনা করার জন্য তোমাকে তাই ডেকে পাঠিয়েছি।

আলোচনা করে লাভ কী হবে?

রিণি আমার মেয়ে রাজু। আমার আর ছেলেমেযে নেই।

এ কথাটা কেন বললেন বুঝতে পারছি না।

স্যার কে এল পাইপটা মুখে তুলিয়া কামড়াইয়া ধরিলেন, তারপর আবার নামাইয়া রাখিলেন।

তুমি সব অস্বীকার করছে চাও?

না, অস্বীকার করতে চাই না। রিণির সঙ্গে অভদ্রতা করেছি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। আমার কী উদ্দেশ্য ছিল বলে লাভ নেই। আপনি বুঝতেও পারবেন না, বিশ্বাসও করবেন না।

অভদ্রতা! কী বছ তুমি?

রাজকুমার কিছুই বলিল না। রিণির সঙ্গে তার ব্যবহারের সংজ্ঞা লইয়া কি স্যার কে এল তর্ক করিতে চান? বলিতে চান ওটা অভদ্রতার চেয়ে আরও খারাপ কিছু?

ফাঁসির ভয় না থাকলে তোমায় আমি খুন করতাম রাজু। তুমি রিণির যা ক্ষতি করেছ সে জন্য নয়, তোমার এই মনোভাবের জন্য। রিণির কাছে সব শুনেও তোমায় আমি একা দোষী করিনি। রিণি ছেলেমানুষ নয়, তারও উচিত ছিল নিজেকে বাঁচিয়ে চলা। দুদিন ধরে আমি ক্রমাগত নিজেকে কি বুঝিয়েছি জানো? কেবল তুমি আর রিণি নও, আরও অনেক ছেলেমেয়ে এ রকম ভুল করেছে,

বিণি আমাব মেযে বলেই আমাব মাথা খাবাপ কবলে চলবে না, ভুল কবলে চলবে না। বিণিকে তুমি বিযে কববে কি না, না কবলে কেন কববে না, খোলাখুলিভাবে এই কথাগুলি জিজ্ঞেস কবব বলে তোমাকে ডেকে পাঠিযেছিলাম। কিন্তু এক বছব একটি মেযেব সঙ্গে খেলা কবা যখন তোমাব কাছে শুধু অভদ্রতা, তোমাকে আব কিছু জিজ্ঞেস কবতে চাই না। তোমাকে বলা বৃথা, তবু বলছি, যদি পাব সুইসাইড কোবো। তোমাব মতো মন নিযে কাবও বেঁচে থাকা উচিত নয। আচ্ছা, এবাব তুমি যাও বাজু।

কথা বলিতে বাজকুমাবেব সাহস হইতেছিল না। বিণি সব বলিযাছে যা ঘটে নাই, যা ঘটিতে পাবিত না। কিছুই বলিতে বাকি বাখে নাই। কেন বলিযাছে? কী চায বিণি? তাব উদ্দেশ্য কী? যতই বিকাব থাক মনে, বিণি তো পাগল নয। তাকে জডাইযা বাপেব কাছে এই অদ্ভুত অকথ্য কাহিনি সে বলিতে গেল কেন? তাকে সে পাইতে চায, বিবাহেব মধ্যে, চিবদিনেব জন্য? কিন্তু তাকে পাওযাব জন্য এই উদ্ভট উপায সে অবলম্বন কবিবে কেন? বিণি তো কোনওদিন জানিতেও দেয নাই, তাকে তাব চাই।

যদি ধবা যায তখন বিণিও নিজেকে জানিত না, সেদিনকাব বাগাবাগিব পব এতদিনেব অদর্শনে তাব খেযাল হইযাছে, নিজেই তাকে ক্ষমা কবিযা তাকে সে কাছে ডাকিতে পাবিত, চেষ্টা কবিতে পাবিত তাকে জয কবাব। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, তাকে পাওযাব আব কোনও উপায খুঁজিযা না পাইলে বিণি যদি এই পাগলামি কবিত, তাব একটা মানে বুঝা যাইত।

তোমায যেতে বলেছি বাজু।

কাল আমি একবাব বিণিব সঙ্গে দেখা কবতে চাই।

স্যাব কে এল সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, কেন?

বাজকুমাব উঠিযা দাঁডাইল।—আপনাব সঙ্গে কথা বলাব আগে বিণিব সঙ্গে আমাব কথা বলা দবকাব। এমন তো হতে পাবে, আপনি সব কথা জানেন না, বিণি আপনাকে সব বলতে পাবেনি? আপনি ধবে নিন, বিণি আব আমাব মধ্যে কযেকটা ভুলবোঝা আছে, ধবে নিযে কাল তাব সঙ্গে দেখা কবাব অনুমতি দিন।

ব্লটিং প্যাডেব দিকে চাহিযা স্যাব কে এল চুপ কবিযা বসিযা বহিলেন।

একটু অপেক্ষা কবিযা বাজকুমাবও নীববে বাহিব হইযা গেল।

পথে নামিতে মালতীব কাছে তাডাতাড়ি ফিবিযা যাওযাব জন্য বাজকুমাব ট্যাক্সি ডাকিল না, ধীবে ধীবে হাঁটিযা চলিতে লাগিল। দেহে মনে সুন্দব সবসীকে আশ্রয কবিযা সে যে আনন্দেব জগতে উঠিযা গিযাছিল, সেখান হইতে আবাব মাটিতে নামিযা আসিতে হইযাছে। চলিতে চলিতে বাজকুমাবেব মনে হয সে কি সত্যই কিছু পাইযাছিল, আনন্দ অথবা শান্তি? এখন তো তাব মনে হইতেছে, কযেকটা দিন সে শুধু অন্যমনস্ক হইযা থাকিবাব সুযোগ পাইযাছিল।

চলিতে চলিতে মালতীব কথা ভাবিযা বাজকুমাবেব শ্রান্তি বোধ কবে। কী মধুব ছিল মালতী সম্পর্কে তাব গুকতব কর্তব্যেব কল্পনা কযেক মুহূর্ত আগে। মালতীকে ভালোভাবে বুঝাইযা দিতে হইবে মালতী কী চায। জীবনেব স্রোতে ভাসিযা চলিতে চলিতে একটি বিচ্ছিন্ন ফুল অস্থাযী বাধায আটকাইযা গিযাছে, ভাবিতেছে এইখানে বুঝি তার ভাসিযা চলাব শেষ, আবাব তাকে ভাসিযা যাওযাব সুযোগ দিতে হইবে তাব নিজস্ব পরিণতি, স্থায়ী সার্থকতাব দিকে। এই কাজটুকু কবিবে ভাবিযাই নিজেকে বাজকুমাবেব দেবতা মনে হইতেছিল। ভীরু দুর্বল মানুষেব মতো এখন তার মনে হইতে থাকে, মালতীর মুখোমুখি হওয়া একটা বিপদ, মালতীকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা বিপজ্জনক সম্ভাবনায় ভরা।

অবিশ্বাস্য, তবু সত্য। মালতী যে ঘরে তার প্রতীক্ষা করিতেছিল তার রুদ্ধ দরজায় টোকা দেওয়ার সময় রাজকুমার পুর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিল যে, দরজার ও পাশে মালতীর স্পর্শ ছাড়া আর সমস্তই অর্থহীন। কথা অবশ্য সে বলিতে পারে যত খুশি, কিন্তু কথার কোনও মানে থাকিবে না। স্যার কে এল-এর শ্যাম্পেনের বোতল খোলার আওয়াজের মতো কথা হইবে শুধু তৃষ্ণার সংকেত, পানীয়ের আহ্বান।

আজ হঠাৎ নয়, চিরদিন এমনি ছিল, মনের অনেক দরজার ও পাশে অনেক মালতীর স্পর্শ। এইমাত্র শুধু সেটা জানা গেল। আকাশের মেঘে সে বাসা বাঁধিয়াছিল, সেখান হইতে নামাইয়া আনিয়া রিণি তাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাই জানা গেল। সন্দেহ করার ভরসাও তার নাই। অভিজ্ঞতার মতো এ ভাবে যা জানা যায় তাতে কী আর ভুলের সুযোগ থাকে? একটি রহস্য শুধু এখন বিস্ময়ের মতো জাগিয়া আছে যে, মালতী কেন? যার জন্য নিজের স্নেহকে একদিন ভালোবাসা মনে হইয়াছিল, সে কেন? রিণি আর সরসী থাকিতে মালতী কেন এ অভাবনীয় রূপকে পরিণত হইয়া গেল?

চুলোয় যাক। মালতীকে দুয়ার খুলিবার সংকেত জানাইবার পর মালতী দুয়ার খুলিয়া দেওয়া পর্যন্ত কয়েক মুহূর্ত রাজকুমার ভাবিয়াছিল—চুলোয় যাক। কী আসে যায় মালতী যদি শ্যামলকে ভালোবাসে আর সেই ভালোবাসাই তাকে ঠেলিয়া দেয় তাব পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজকুমারের দিকে, রাজকুমারকে সে শুধু ভালোবাসিত চায় বলিয়া, রাজকুমারকেই তার ভালোবাসা উচিত এই ধারণা পোষণ করে বলিয়া? এ তো সর্বদাই ঘটিতেছে। ভালোবাসিবার দুরন্ত ইচ্ছা যে ভালোবাসা নয় এ জ্ঞান অনেকের যেভাবে আসিয়াছে মালতীরও সেভাবে আসুক—আজ রাত্রি শেষে, অথবা আগামী কাল। সে নিজে অবশ্য সব জানে। কিন্তু জানা কথা না জানার ভান করা নিজের কাছে এমন কী কঠিন? তার ফরমুলা তো বাঁধাই আছে—আজিকার রাত্রি স্মরণীয় হোক, কাল চুলোয় যাক। ঘরের ভিতর গিয়া এ ভাবটা অবশ্য তার কাটিয়া গেল। কিন্তু জড়ের গতিবেগের মতোই আবেগের গতি, বেগ থামিবার পরেও গতি হঠাৎ থামে না। আপনা হইতেই খানিকটা আগাইয়া চলে।

খাটে বসিয়া রাজকুমার বলে, দেরি হয়ে গেছে, না?

মালতী অস্ফুট স্বরে বলে, হ্যাঁ।

একলা কষ্ট হচ্ছিল?

আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

রাজকুমার এতক্ষণে মালতীর দিকে তাকায়। দেয়ালে নিচু ব্র্যাকেটে আলো জ্বলিতেছে, মেঝে আর ওপাশের দেয়ালে মালতীর ছায়া পড়িয়াছে, ছায়ায় তার শাড়ির বিন্যাস ও অবিন্যাস স্পষ্টতর। পিছনের দেয়ালের পটভূমিকায় মালতীকে দেখাইতেছে মনের ক্যামেরায় তোলা পুরানো ফটোর মতো অস্পষ্টতার রহস্যে রহস্যময়ী—আধ-ভোলা স্মৃতি যেন ঘিরিয়া আছে তাকে। তাড়াতাড়ি কয়েকবার চোখের পলক ফেলিয়া রাজকুমার নিজের চোখের জলীয় ভ্রান্তিকেই যেন মুছিয়া দিতে চায়, তারপর হারানো গোধূলির নিষ্প্রভ দিগন্তে সোনার থালার মতো নতুন চাঁদকে উঠিতে দেখিয়া শিশু যেভাবে চাহিয়া থাকে তেমনি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিতে থাকে মালতীকে। সরসীকে তার মনে পড়িতেছে, হৃদয়-সাগর-মন্থনে উত্থিতা উর্বশী সরসীকে। সে যেন কতদিনের কথা, রাজকুমার যেন ভুলিয়া গিয়াছিল। তেমনি অনবদ্য নগ্নতার প্রতিমূর্তির মতো মালতীকে ওইখানে, যেখানে সে দাঁড়াইয়া আছে কৃত্রিম আলোয় সাজানো পুতুলের মতো, দাঁড় করাইয়া দুচোখ ভরিয়া তাকে দেখিবার জন্য রাজকুমারের হৃদয় উতলা হইয়া উঠে। দেহে মনে আবার সে যেন সেদিনের মতো নবজীবনের, মহৎ আনন্দের সঞ্চার অনুভব করে। তার আশা হয়, সরসীর মতো মালতীও আজ তাকে সমস্ত শ্রান্তি ও ক্ষোভ ভুলাইয়া দিতে পারিবে, আবার নিরুদ্‌বেগ মুক্তি জুটিবে তার, আবার সে উঠিতে পারিবে তার আকাশের আবাসে, যে কুলায় ছাড়িয়া নিজের ইচ্ছায় সে নামিয়া আসে নাই।

নিজের অজ্ঞাতসারে রাজকুমার উচ্চারণ করিতে থাকে, মালতী! মালতী! পথহারা শ্রান্ত মুমূর্ষু শিশু যেভাবে তার মাকে ডাকিয়া কাতরায়।

কিন্তু মালতী শুধু মাথা নাড়ে। রাজকুমার বুঝিতে পারে না, আবার আবেদন জানায়। মালতী মাথা নাড়ে আর আঁচলের প্রান্ত দিয়া নিজেকে আরেকটু ঢাকিতে চেষ্টা করে। কথা যখন সে বলে তার কণ্ঠস্বর শোনায় কর্কশ।

মালতী বলে, শোনো। আমার কেমন যেন লাগছে।

কেমন লাগছে মালতী।

গা গুলিয়ে বমি আসছে।

ক্রোধ, বিরক্তি আর বিষাদে রাজকুমারের অনুভূতির আধারে ফেনিল আবর্তের সৃষ্টি হয়। তীব্র সংকীর্ণ বেদনার পুনরাবৃত্তিময় সংক্ষিপ্ত আবেদন ক্ষণিকের নির্বিকার শান্তিতে লয় পায় আর আর্তনাদ করিয়া ওঠে। সে অনুভব করে, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতরভাবে অনুভব করে, ভয় ও শ্রদ্ধার বশ্যতা, কাব্য ও স্বপ্নের মোহ, আবেগ ও উত্তেজনার তাগিদ, কিছুই মালতীকে ভুল করিতে দিবে না। তার দিকে মালতীর গতি বন্ধ করিয়া কোনদিকে তাকে চলিতে হইবে দেখাইয়া দিবার কথা সে যা ভাবিয়াছিল, তার কোনেও প্রয়োজন ছিল না। মালতী আর আগাইবে না। সে ডাকিলেও নয়, হাত টানিলেও নয়। শুধু আজ নয়, চিরদিন এই পর্যন্তই ছিল মালতীর ভুলের সীমা। ভুল কী ভুল নয় তাও হয়তো মালতী জানে না, এখনও হয়তো সে ধরিয়া রাখিয়াছে আজ রাত্রিই তার প্রিয়মিলনের রাত্রি, কিন্তু রাজকুমার দুবাহু বাড়াইয়া দিলে সে আসিয়া ধরা দিবে না।

মালতীর সম্বন্ধে এ যে তার কল্পনা নয় সে বিষয়ে রাজকুমারের এতটুকু সন্দেহ থাকে না, অশোকতরুমূলে ক্লেশপাণ্ডুবর্ণা অধোমুখী সীতার দিকে চাহিয়া দেবতা ব্রহ্মা আর রাক্ষসী নিকষার পুত্র রাবণ যে যন্ত্রণায় অমরত্বের প্রতিকার চাহিত, রাজকুমারও তেমনি যন্ত্রণা ভোগ করে। রাবণের তবু মন্দোদরী ছিল, জীবনে রাবণ তবু ভালোবাসিয়াছিল সেই একটিমাত্র নারীকে, একটু ভালোবাসিবে রাজকুমার এমন তার কেউ নাই। তাছাড়া, তার সীতাকে সে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রায় গায়ের জোরের মতোই ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে ছলবলকৌশল করিয়া রাখিয়া এতদিন সে মালতীকে হরণ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ ভাবিয়াছিল, তার মনটি পর্যন্ত মুক্ত করিয়া শ্যামলকে ফিরাইয়া দিবে। এই উদারতার কল্পনাটুকু পর্যন্ত তার মিথ্যা, অকারণ অহংকার বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেল।

নিছক অহংকার, অতি সস্তা আত্মতৃপ্তি, নিজেকে কেন্দ্র করিয়া শিশুর মতো রূপকথা রচনা করা। মালতী কবে তার বশে ছিল যে আজ তাকে মুক্তি দেওয়ার কথা সে ভাবিতেছিল? কোনও কিছু দাবি করে নাই বলিয়াই তার সম্বন্ধে মালতীর মোহ এতদিন টিকিয়া ছিল, দাবি জানানো মাত্র মালতী ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া যাইত, হয়তো ঘৃণা পর্যন্ত করিতে আরম্ভ করিত তাকে।

বাড়ি যাবে মালতী?

একটু শুয়ে থাকি। বড়ো অস্থির অস্থির করছে।

রাজকুমার বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে মালতী গিয়া শুইয়া পড়িল।

দরজা বন্ধ করে এতক্ষণ ঘরে বসে ছিলাম বলে বোধ হয়।

তা হবে।

মিছিমিছি রুমটা নেওয়া হল।

তাতে কী।

সাতটা টাকা নষ্ট। কী চার্জ! একরাত্রির জন্য একটা রুম। তার ভাড়া সাত টাকা। কে জানত হঠাৎ বিশ্রী লাগবে শরীরটা?

ও রকম হয় মালতী।

এক হিসাবে ভালোই হয়েছে। তুমি বেঁচে গেলে।

মালতীর ঠোঁটে এলোমেলো নড়াচড়া চলে, চোখের পাতা ঘনঘন ওঠে নামে। চুলগুলি বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। তার শোয়ার ভঙ্গিতেই গভীর অবসন্নতা। মহাকাব্যের শৃঙ্গারশ্রান্ত রমণীর বর্ণনা রাজকুমারের মনে পড়িয়া যায়।

রাজুদা, একটা কথা বলি শোনো। তুমি কী ভাববে জানি না। আমি একটা বিশ্রী উদ্দেশ্য নিয়ে আজ এসেছিলাম। মানে, আমার উদ্দেশ্য ভারী খারাপ ছিল।

বলো কী, ভারী আশ্চর্য কথা তো!

মালতীর বিবর্ণ মুখে রঙের প্লাবন আসিয়া আটকাইয়া রহিয়া গেল।

তা নয়। ঠিক তা নয়। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে তাহলে তুমি বাধ্য হয়ে বিয়ে করবে।

কেন? নাও তো করতে পারতাম।

তামাশা করছ? এই কি তোমার তামাশার সময় হল? আমার এদিকে মাথা ঘুরছে, কী ভাবছি কী বলছি বুঝতে পারছি না—রাগ করেছ নাকি? তুমি নিশ্চয় রাগ করেছ। তাই এমনিভাবে ছাড়া ছাড়া কথা বলছ—রাগ হয়েছে তোমার।

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে বাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া তার রাগের চিহ্ন খুঁজিতে খুঁজিতে মালতী একেবারে উঠিয়া বসে।

রাগ করেছ কেন? তুমি তো জানো তুমি যা চাইবে তাই হবে, আমি কথাটি বলব না। সত্যি বলছি, বিয়ের কথা আর মনেও আনব না। এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম একলাটি ঘরে বসে। তুমি যখন ওসব অনুষ্ঠান পছন্দ করো না, আমার কাজ নেই বাবা বিয়ে-ফিয়েতে। কিন্তু মালতীব গলায় করুণ মিনতির সুর ফুটিয়া উঠিল, আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে। বলো রাখবে?

কী কথা মালতী?

একরাত্রির জন্য রুম নিযে নয়, চলো আমরা কোথাও চলে যাই দুজনে, মাস তিনেকেব জন্যে। অন্তত দুমাস। কিছুদিন একসঙ্গে এক বাড়িতে যদি না রইলাম—

আজ রাত্রিকে বাতিল করার সমর্থনে এই জোরালো যুক্তি মালতী আবিষ্কার করিয়াছে। আরম্ভ হওয়ার আগেই কাব্য প্রেম স্বপ্ন আর কল্পনা শুধু মনের উদ্‌বেগ আর দেহের অস্থিরতায় যে পরিণত হইয়া গেল তার তো একটা কারণ থাকা চাই? সে কারণটি এই। একটি বিচ্ছিন্ন রাত্রির অসম্পূর্ণ ভাঙা প্রেম তার ভালো লাগিবে না। কাল সকালে ছেদ পড়িবে ভাবিয়া মিলনকে সে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, শুধু এই কারণে দেহমন তার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারকে সে ভালোবাসে বইকী?

রাজকুমার নীরবে একটু হাসিল। ভাবিল, মালতী তার অর্থহীন হাসির যা খুশি মানে করুক, কিছু আসিয়া যায় না। মালতীর সঙ্গে বুঝাপড়ারও কোনও প্রয়োজন নাই। মালতী একদিন নিজেই বুঝিতে পারিবে। মালতীর পক্ষে সেভাবে সব বুঝিতে পারাই ভালো।

পরদিন ছুটি ছিল, সকালে কয়েকটি বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিল। রাজকুমার বেকার, তার ছুটিও নাই। একটু সে ঈর্ষা বোধ করিল বন্ধুদের জীবনে কাজের দিনগুলির মধ্যে ছুটির দিন সত্যসত্যই অনেকখানি পৃথক হইয়া আসে বলিয়া। অনেক বেলায় সরসীও আসিয়া হাজির। যত বড়ো বড়ো ঘটনাই ঘটুক সরসীর জীবনে, কোনওদিন তার মনে কিছু ঘটে না, কোনওদিন সে বদলায় না, চিরদিন সে একরকম থাকিয়া গেল। আজও তার প্রকাণ্ড একটা মিটিং আছে। রাজকুমার যেন নিশ্চয় যায়। একটু প্রস্তুত হইয়াই যেন যায়, কিছু বলিতে হইবে।

সেদিনের মতো কেলেঙ্কারি কোরো না।

কেলেঙ্কারি করেছিলাম নাকি সেদিন?

প্রায়। শেষটা সামলে গেলে তাই রক্ষা। ঘরোয়া মিটিং ছিল বলে সামলে নেবার সুযোগ পেলে, পাবলিক মিটিং হলে আগেই লোকে হাসতে আরম্ভ করত।

তা হইবে। সেদিন মস্ত একটা বাহাদুরি করিয়াছে এ ধারণাটা এতদিন বজায় রাখিতে না দিয়া আগে সরসী এ খবরটা দিলে ভালো হইত।

রিণির কি হয়েছে জানো? সরসী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল।

কী হয়েছে?

আমি তো তাই জিজ্ঞাসা করছি। বাড়ি থেকে নাকি বার হয় না, কারোর সঙ্গে দেখা করে না। পরশু গিয়েছিলাম, দবজা বন্ধ করে কী যেন করছিল, দরজা খুলল না, ভেতর থেকেই আমায় বসতে বলল। বসে আছি তো বসেই আছি, দরজা খোলে না। দুবার ডাকলাম, সাড়াও দিলে না। শেষে আমি যখন ডেকে বললাম, আমরা কাজ আছে আমি চললাম, একটা যাচ্ছেতাই জবাব দিলে।

কী বললে?

সে আমি উচ্চারণ করতে পারব না।

আমার সম্বন্ধে কোনো কথা?

না। তোমার সম্বন্ধে কী কথা বলবে? একটা বিশ্রী ফাজলামি করলে, একেবারে ইতরামি যাকে বলে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া, কালীর সঙ্গে একটু ভাব জমানোর চেষ্টা করিয়া সরসী চলিয়া গেল। সরসীকে কালী পছন্দ করে না, রাজকুমারের সঙ্গে তাকে কথা বলিতে দেখিলেই তার মুখ কালো হইয়া যায়। এক মিনিটের বেশি কাছে থাকিতে পারে না কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বারবার কাছে আসে। সরসী আর রাজকুমাবের মুখের দিকে তাকায়, ঠোঁট কামড়ায়, হঠাৎ একটা খাপছাড়া কথা বলে, দুপদাপ পা ফেলিয়া চলিয়া যায়।

সেদিন মনোরমার তিরস্কারের পর কালী কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। মনোরমা যতটুকু সাজাইয়া দেয় তার উপর সে নিজে নিজে আরেকটু বেশি করিয়া সাজ করে। গায়ে একটু বেশি সাবান ঘষে, মুখে একটু বেশি ক্রিম মাখে, একটু বেশি দামের কাপড় পরে।

সরসী চলিয়া যাওয়ামাত্র সে বলিল, এই মেয়েটা এলে আপনি পৃথিবী ভুলে যান।

এই মেয়েটা আমার কে কালী?

যার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করলেন—আপনার সরসী?

ওকে তুমি সরসীদি বলবে।

আমার বয়ে গেছে ওকে দিদি বলতে।

মুখ উঁচু করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া সিধা হইয়া কালী মূর্তিমতী বিদ্রোহের মতো দাঁড়াইয়া থাকে, তার চোখ দুটি কেবল জলে বোঝাই হইয়া যায়। রাজকুমার অন্যমনে রিণির কথা ভাবিতেছিল, অবাক হইয়া সে কালীর দিকে চাহিয়া থাকে। এতটুকু মেয়ের মধ্যে ভাবাবেগের এই তীব্রতা সে হঠাৎ ঠিকমতো ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না।

কী উদ্দেশ্যে এবং কেন কিছু না ভাবিয়াই, সম্ভবত আহত সকাতর শিশুকে আদর করার স্বাভাবিক প্রেরণার বশে, কালীর দিকে সে হাত বাড়াইয়া দেয়। কালীর নাগাল কিন্তু পায় না, দুহাতে তাকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া কালী ছুটিয়া পালাইয়া যায়।

সমস্ত দুপুর রাজকুমার বিষণ্ণ হইয়া থাকে। বাহিরে কড়া রোদ, ঘরে উজ্জ্বল আলো, রাজকুমারের মনে যেন সন্ধ্যার ছায়া, অমাবস্যা রাত্রির ছদ্মবেশী আগামী অন্ধকার। একটা কষ্টবোধও যেন সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রাত্রি জাগরণের পর যেমন হয। রাত্রে সে তো কাল ঘুমাইয়াছিল,

সমস্ত রাত ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে?

বিকালে রাজকুমার রিণিদের বাড়ি গেল।

দারোয়ানের কাছে খবর পাওয়া গেল স্যার কে এল বাড়িতেই আছেন, সারাদিন একবারও তিনি বাহিরে যান নাই। রিণির অসুখ, দুবার ডাক্তার আসিয়াছিল।

অসুখ? নীচের হলে গিয়া দাঁড়াইতে রিণির ভাঙা ভাঙা গানের সুর রাজকুমারের কানে ভাসিয়া আসে। তারপর হঠাৎ এত জোরে সে বাড়ির দাসীকে ডাক দেয় যে তার সেই শেষ পর্দায় তোলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন ঘরের দেয়ালে, ঘরের বাতাসে, রাজকুমারের গায়ে আঁচড় কাটিয়া যায়, ডাক্তারকে দুবার আসিতে হইয়াছিল রিণির এমন অসুখ! আগাগোড়া সবটাই কি রিণির তামাশা? কেবল তার সঙ্গে নয়, বাড়ির লোকের সঙ্গেও সে কী খেলা করিতেছে—তার বিকারগ্রস্ত মনের কোনো এক আকস্মিক ও দুর্বোধ্য প্রেরণার বশে?

ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া রিণিকে দেখিবামাত্র এ সন্দেহ তার মিটিয়া গেল। রিণির সত্যই অসুখ করিয়াছে। তার চুল এলোমেলো, আঁচল লুটাইতেছে মেঝেতে, মুখে ও চোখে একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বরের লক্ষণ। অথচ শুইয়া থাকার বদলে সে অস্থির ভাবে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে। একপাশে চেয়ারে মড়ার মতো হেলান দিয়া বসিয়া স্যার কে এল হতাশভাবে তার দিকে চাহিয়া আছেন।

রাজকুমারকে দেখিয়াও রিণি যেন দেখিতে পাইল না। কেবল স্যার কে এল হঠাৎ জীবন্ত হইযা উঠিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া রাজকুমারের সামনে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইলেন, রাজকুমারকে কিছু যেন বলিবেন। তারপর একটি কথাও না বলিয়া নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন।

ছোটো বুকশেল্ফটির কাছে গিয়া একটি একটি করিয়া বই বাছিযা মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে রিণি গুনগুনানো সুর ভাঁজিতে লাগিল।

রিণি!

কে? অ! রিণি একটু হাসিল, বোসো না? বইগুলো একটু বেছে রাখছি—যত বাজে বই গাদা হয়েছে।

তোমার কী হয়েছে? জ্বর?

কিছু হয়নি তো।

রাজকুমার বসিল। বই থাক রিণি। এখানে বোসো।

রিণি চোখের পলকে ঘুরিযা দাঁড়াইল।—দ্যাখো, হুকুম কোরো না বলছি। একশোবার বলিনি তোমায়, আমার সঙ্গে নরম সুরে কথা কইবে? তোমরা সব্বাই আমায় নিয়ে মজা করো জানি, তা করো গিয়ে যা খুশি, আপার আপত্তি নেই, কিন্তু ভদ্রভাবে করবে—রেসপক্টফুলি।—উঁ। তাই বটে, ভুলে গিয়েছিলাম। কী যেন বললে তুমি?

রাজকুমার অত্যন্ত নরম সুরে বলিল, বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রিণি আসিয়া পাশে বসিবার পরেও রাজকুমার তার দিকে চাহিয়া থাকে, কোন অনুভূতি হৃদয়ে আলোড়ন তুলিয়াছে বুঝিতে পারে না। কাছে আসিবার পর এখন রিণির চোখ দেখিয়া সে যেন বুঝিতে পারে তার কী হইয়াছে। রিণির চাহনি স্পষ্টভাবেই তার কাছে সব ঘোষণা করিয়া দেয়, কিন্তু মনে মনে রাজকুমার প্রাণপণে সে সংবাদকে অস্বীকার করে। তার মনে হয়, রিণির সম্বন্ধে এই ভয়ংকর সত্যকে স্বীকার করিলে তার নিজের মাথাও যেন খারাপ হইয়া যাইবে।

রিণি ব্লাউজের বোতাম লাগায় নাই, লুটানো কাপড় তুলিয়া রাজকুমার তার গায়ে জড়াইয়া দিল। রিণির সঙ্গে এখন কথা বলা না বলা সমান, কোনও বিষয়েই তার সঙ্গে আলোচনা করার আর অর্থ হয় না। তবু তাকে বলিতে হইবে। রিণি সুস্থ আর স্বাভাবিক অবস্থাতে আছে ধরিয়া

লইয়াই তার সঙ্গে আলাপ করিতে হইবে। নতুবা নিজে সে অসুস্থ হইয়া পড়িবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

তোমার বাবাকে ও সব বলতে গেলে কেন রিণি?

রিণির মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।—বাবাকে? কী বলেছি বাবাকে?

আমার সম্বন্ধে?

তোমার সম্বন্ধে? কই না, কিছুই তো বলিনি বাবাকে তোমার সম্বন্ধে? বাবার সঙ্গে আমি কথাই বলি না যে!

পলকহীন দৃষ্টিতে রিণি রাজকুমারের চোখের দিকে সোজা তাকাইয়া থাকে, তার মুখের ভাবের সামান্য একটু পরিবর্তনও ঘটে না। তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠে ক্রোধের অভিব্যক্তি।

দাঁড়াও, ডাকছি বাবাকে।

রাজকুমার ব্যস্ত হইয়া বলে, থাক, রিণি থাক। বারণ কানে না তুলিয়া সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত আগাইয়া গিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করিয়া রিণি স্যার কে এলকে ডাকিতে থাকে, বাবা? বাবা? ড্যাডি? ড্যাডি?

স্যার কে এল উপরে আসিতেই হাত ধরিয়া তাকে সে টানিয়া আনে রাজকুমারের সামনে, কাঁদোকাঁদো হইয়া বলে, রাজুদার নামে তোমায় আমি কী বলেছি বাবা?

স্যার কে এল শান্তকণ্ঠে বলেন, কই না, কিছুই তো বলোনি তুমি?

বলেছি। রাজুদা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, তাই বলেছি। নিন্দে করে কিছু বলিনি। বলেছি বাবা?

না। বলোনি।

নিশ্চিত হইয়া রাজকুমারের পাশে বসিয়া রিণি গভীর নিশ্বাস ফেলিল। বিড়বিড় করিয়া আরও কত কী সে বলিতে লাগিল বুঝা গেল না। একটু অপেক্ষা করিয়া স্যার কে এল চলিয়া গেলেন।

রাজকুমাব বলিল, একটু শুয়ে থাকবে রিণি?

রিণি উদাসভাবে বলিল, তুমি বললে শুতে পারি।

তোমার শরীর ভালো নেই, শুয়েই থাকো। আমি এখুনি ঘুরে আসছি।

তুমি আর আসবে না।

আসব, নিশ্চয় আসব।

বিনা দ্বিধায় রাজকুমার তাকে শিশুর মতো দুহাতে বুকে তুলিয়া বিছানায় লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল। তার অনেকদিনের লিপস্টিক ঘষা ঠোঁটে আজ শুকনো রক্ত মাখা হইয়া আছে। সন্তর্পণে সেখানে চুম্বন করিয়া সে নীরবে বাহির হইয়া গেল।

নিজের ঘরে স্যার কে এল টেবিলে মাথা রাখিয়া বসিয়া ছিলেন, টেবিলে তার মাথার একদিকে একটি আধখালি মদের বোতল অন্যদিকে শূন্য একটি গেলাস। রাজকুমারের সাড়া পাইয়া মুখ তুলিলেন।

নার্ভাস ব্রেক ডাউন? রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

স্যার কে এল মাথা নাড়িলেন।—ইনস্যানিটি।

.ডাক্তার কী বললেন?

এখন আর ওর বেশি কী বলবেন? সারতেও পারে, নাও সারতে পারে। ভালোরকম এগজামিনের পরে হয়তো জানা যাবে।

পরস্পরের মাথার পাশ দিয়া পিছনের দেয়ালে চোখ পাতিয়া দুজন অনেকক্ষণ নীরবে মুখোমুখি বসিয়া রহিল।

তারপর স্যার কে এল ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার আলমারি খুলে বোতল নিয়ে কদিন নাকি খুব ড্রিঙ্ক করছিল। কিছু টের পাইনি। ডাক্তার সন্দেহ করছেন খুব ধীরে ধীরে ইনস্যানিটি আসছিল,

অতিরিক্ত ড্রিঙ্ক করার ফলে দু-চারদিনের মধ্যে এটা হয়েছে। রিণি ড্রিঙ্ক করত নাকি জানো?

কদাচিৎ কখনও একটু চুমুক দিয়ে থাকতে পারে, সে কিছু নয়।

স্যার কে এল-এর মাথা নীচে নামিতে নামিতে প্রায় গেলাসে ঠেকিয়া গিয়াছিল তেমনি ভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নামে রিণি যা বলছিল রাজু?

সব কল্পনা।

তোমায় নিয়ে কেন?

তা জানি না।

আবার দুজনে নীরবে মুখোমুখি বসিয়া রহিল।

রিণির জন্য সকলের গভীর সহানুভূতি জাগিয়াছে। খবব শুনিয়া মালতী তো একেবাবে কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিল। রিণিকে কে পছন্দ করিত কে পছন্দ করিত না এখন আর জানিবার উপায় নাই। একেবারে পাগল হইয়া রিণি শত্রুমিত্র সকলের জীবনে বিষাদেব ছাযাপাত করিয়া ছাড়িয়াছে। দুঃখবোধ অনেকের আরও আন্তরিক হইয়াছে এই জন্য যে তাদের কেবলই মনে হইয়াছে, সকলেব মন টানিবার জন্য রিণি যেন ইচ্ছা করিয়া নিজেকে পাগল করিয়াছে। অহংকারী আত্ম-সচেতন রিণিকে আর কেউ মনে রাখে না, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন শুধু মনে পড়ে কী তীব্র অভিমান ছিল মেয়েটার, আঘাত গ্রহণের অনুভূতি তার চড়া সুরে বাঁধা সরু তারেব মতো মৃদু একটু ছোঁয়াচেও কী ভাবে সাড়া দিত।

সরসী অত্যন্ত বিচলিতভাবে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করে, ও কেন পাগল হয়ে গেল রাজু?

রাজকুমার নির্বোধের মতো পুনরাবৃত্তি করে, কেন পাগল হয়ে গেল?

সরসী তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, না, তুমিই বা জানবে কী করে?

বাজকুমার নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসে।

কিছুদিন আগে হলে তোমার প্রশ্নের জবাবে কী বলতাম জানো সরসী? বলতাম, রিণি কেন পাগল হয়েছে জানি, আমার জন্য!

তোমার জন্য?

আগে হলে তাই ভাবতাম। ও রকম ভাবার যুক্তি কী কম আছে আমাব! তুমি সব জানো না, জানলে তোমারও তাই বিশ্বাস হত।

সরসী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রাজকুমার অপেক্ষা কবে, অনেকক্ষণ। সরসী কিন্তু মুখ খোলে না।

কী সব জান না, জানতে চাইলে না সরসী?

না।

বললে শুনবে না?

শুনব।

মালতীকে আমি পছন্দ করি ভেবে মালতীকে রিণি ইতিপূর্বে দুচোখে দেখতে পারত না। একদিন নিজে থেকে যেচে আমার দিকে প্রত্যাশা করে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছিল। মাথা খারাপ হবার গোড়াতে স্যার কে এল-এর কাছে আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব কথা বলেছিল যে পরদিন তিনি আমায় ডেকে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন, কেন তার মেয়েকে বিয়ে করব না। এখন রিণি পাগল হয়ে গেছে, কারও কথা শোনে না, আমি যা বলি তাই মেনে নেয়। শুধু তাই নয়, অন্য সময় পাগলামি করে, আমি যতক্ষণ কাছে থাকি শান্ত হয়ে থাকে। আমার জন্য যে ও পাগল হয়েছে তার আর কত প্রমাণ চাও?

তোমার জন্য পাগল হওয়ার প্রমাণ ওগুলি নয় রাজু! শ্রদ্ধা ভয় বিশ্বাসের প্রমাণ, হয়তো ভালোবাসারও প্রমাণ।

হয়তো কেন?

ভালোবাসার কোনও ধরাবাঁধা লক্ষণ নেই রাজু।

রাজকুমার কৃতজ্ঞতা জানানোর মতো ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, তুমি সত্যি আশ্চর্য মেয়ে সরসী। আমার বিবরণ শুনে অন্য কোনও মেয়ের এতটুকু সন্দেহ থাকত না রিণি আমায় ভালোবাসত আর মাথাটা ওর খারাপ হওয়ার কারণও তাই।

রিণি তোমায় ভালোবাসত কিনা জানি না রাজু, তবে সে জন্য ও যে পাগল হয়নি তা জানি। একপক্ষের ভালোবাসা কাউকে পাগল করে দিতে পারে না, যতই ভলোবাসুক। রিণির পাগল হওয়ার অন্য কারণ ছিল। তোমায় যদি রিণি ভালোবেসে থাকে, মনে জোরালো ঘা খেয়ে থাকে, অন্য কারণগুলিকে সেটা একটু সাহায্য করে থাকতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। তোমার মতো সাইকোলজির জ্ঞান নেই, তবে এটা আমি জোর করে বলতে পারি। ডাক্তারও তো বলছেন, ধীরে ধীরে ইনস্যানিটি আসছিল। তোমার দায়িত্ব কীসের? তুমি কেন নিজেকে দোষী ভেবে মন খারাপ করছ? তার কোনও মানে হয় না।

ধীরে ধীরে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সরসী শেষের দিকে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। আবেগ ও উত্তেজনা চিরদিন সরসীর চোখে মুখে অভিনব রূপান্তর আনিয়া দেয় এবং এই রূপান্তর তার ঘটে এত কদাচিৎ যে আগে কয়েকবার চোখে পড়িয়া থাকিলেও রাজকুমারের মতে হয় হঠাৎ সরসীকে ঘিরিয়া যেন অপরিচয়ের রহস্য নামিয়া আসিয়াছে।

আমি তো বললাম তোমায়, আমি জানি রিণি আমার জন্য পাগল হয়নি।

তবে তুমি এমন করছ কেন?

সরসীর প্রশ্নে রাজকুমার আশ্চর্য হইয়া গেল।

কেমন করছি?

একেবারে যেন ভেঙে পড়েছ তুমি। মুখ দেখে টের পাওয়া যায় ভয়ানক একটা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছ। সবাই বলাবলি করছে এই নিয়ে। তোমার কাছে এ দুর্বলতা আশা করিনি রাজু।

সত্যি কথা শুনবে সরসী? আমার মন ভেঙে গেছে।

কেন?

কেন তোমায় কী করে বুঝিয়ে বলব। আমি নিজেই ভালো করে বুঝতে পারি না। কেবল মনে হয় আমার জীবনের কোনো সম্ভাবনা নেই, সার্থকতা নেই, আমি একটা ফাঁকি দাঁড়িয়ে গেছি। চিরদিন যেন ভাঙা-চোরা মানুষ ছিলাম মনে হয়, এখানে ওখানে সিমেন্ট করে বেঁধেছেঁদে আস্ত মানুষের অভিনয় করছিলাম, একদিনে ভেঙে পড়েছি। চব্বিশ ঘণ্টা নিজের কাছে লজ্জা বোধ করছি সরসী।

সরসী অস্ফুটস্বরে কাতরভাবে বলে, আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে পারো না রাজু? আমি যে কিছুই বুঝতে পারলাম না। অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলো।

রাজকুমার অনেকক্ষণ ভাবে। তার চোখ দেখিয়া সরসীর মনে হয়, মনের অন্ধকারে সে নিজের পরিচয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে। চোখে তার আলোর এত অভাব সরসী কোনওদিন দেখে নাই, এ যেন মুমূর্ষুর চোখ। সরসী শিহরিয়া উঠে। হাতের মুঠি সে সজোরে চাপিয়া ধরে ঠোঁটে, চোখ তার জলে ভরিয়া যায়। রাজকুমার কথা বলিতে আরম্ভ করিলে প্রথমদিকের কথাগুলি সে শুনিতে পায় না।

রাজকুমার বলে, ঘুরিয়ে বললেও বোঝাতে পারব না সরসী। যদি বলি, ভেতর থেকে জুড়িয়ে যেন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছি, ঠিক বলা হবে না। যদি বলি, বহুকাল থেকে আমি যেন ধীরে ধীরে স্যুইসাইড করে আসছি, তাও ঠিক বলা হবে না। আমার এই কথাগুলি কী ভাবে নিতে হবে জানো? গন্ধ বোঝবার জন্য তোমায় যেন ফুল দেখাচ্ছি।

কী ভাবো তুমি? মোটা কথায় তাই আমাকে বলো।

কী ভাবি? ভাবি যে আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কেন। কারও সঙ্গে আমার বনে না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। অন্য সবাইকে দেখি, খুব যার সংকীর্ণ জীবন, তারও কয়েকজনের সঙ্গে সাধারণ সহজ সম্পর্ক আছে, আত্মীয়তার বন্ধুত্বের, ঘৃণা বিদ্বেষের সম্পর্ক। কারও সঙ্গে আমার সে যোগাযোগ নেই। কী যেন বিকার আমার মধ্যে সরসী, আর দশজন স্বাভাবিক মানুষ যে জগতে সুখে বিচরণ করে আমি সেখানে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে পারি না। আমার যেন সব খাপছাড়া, উদ্ভট। নাড়ি দেখব বলে আমি গিরির সঙ্গে কেলেঙ্কারি করি, শুধু খেয়ালের বশে রিণি মুখ বাড়িয়ে দিলে আমার কাছে সেটা বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সৌন্দর্যের বদলে মেয়েদের দেহে আমি খুঁজি আমার থিয়োরির সমর্থন। আমার যেন সব বাঁকা, সব জটিল। বুঝতে পার না সরসী তোমাদের সঙ্গেও আমার যোগাযোগটা কী রকম? তুমি কখনও আমার বিচার কর না, শুধু আমায় বুঝবার চেষ্টা কর, তোমার সঙ্গে তাই প্রাণ খুলে কথা বলি। শুধু ওইটুকু সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার। আমার সঙ্গে শুধু আমার কথা তুমি বলবে, তোমার যেন আর কাজ নেই। তোমার সম্বন্ধে কিছু জানবার কৌতূহল কোনওদিন দেখেছ আমার? তোমার সুখদুঃখের ভাগ নেবার আগ্রহ দেখেছ কখনও? আমার প্রয়োজনে আমার জন্য তুমি একদিন আশ্চর্য সাহস আর উদারতা দেখালে তাই জানতে পারলাম তোমার দেহ মন কত সুন্দর। কিন্তু কৃতজ্ঞতা কই আমার?

কৃতজ্ঞতা চাইনি রাজু।

তুমি না চাও, আমার তো স্বাভাবিক নিয়মে কৃতজ্ঞতা বোধ করা উচিত ছিল? ওটা যেন আমার প্রাপ্য বলে ধরে নিয়েছি। তাহলেই দ্যাখো, তুমি যে আমার কাছে এসেছ সেটা শুধু বিনা বিচারে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে আমাকে তোমার গ্রহণ করার চেষ্টার পথে, অন্তরঙ্গতার পথে নয়। অন্য কেউ হলে আপনা থেকে তোমাকে বুঝবার চেষ্টা করত, পরস্পরের জানা বোঝার চেষ্টায় সৃষ্টি হত সুন্দর স্বাভাবিক বন্ধুত্ব। আমার সেটা কোনওদিন খেয়াল পর্যন্ত হয়নি।

তুমি আমায় কখনও উপেক্ষা করনি রাজু।

কেন করব? আয়নাকে কেউ উপেক্ষা করে না।

সরসী নতমুখে নিজের আঙুলের খেলা দেখিতে থাকে। আঁচলের প্রান্ত নয়, কোলেব কাছে জড়ো করা কাপড়ের খানিকটা পাকাইয়া কখন সে যেন আঙুল জড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাগ করলে সরসী? স্পষ্ট করে বললাম বলে?

সরসী মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। রাগ করেছিলাম। তুমি জিজ্ঞেস করলে বলে আর রাগ নেই। রাগ করি আর নাই করি তুমি স্পষ্ট করেই বলো—যত স্পষ্ট করে পার। রাজকুমার বলে, তোমার কথা আর বলব না। এবার মালতীর কথা বলি। মালতীর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে জানো? শ্রদ্ধাকে ভালোবাসা মনে করার সম্পর্ক। সোজাসুজি ভালোবাসলে হয়তো ওকে কাছে আসতে দিতাম না, ভুলেই থাকতাম মালতী বলে একটা মেয়ে এ জগতে আছে। কিন্তু ভিত্তিটা যখন ভুলের, দুদিন পরে ভুল ভেঙে যাবে যখন জানি, জটিল একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হতে দিতে আমার বাঁকা মনের আপত্তি হবে কেন? তারপর ধরো রিণি—

সরসী চেয়ারে পিছনে হেলান দিয়াছিল, সোজা হইয়া বসে। বুঝা যায় মালতীর চেয়ে রিণির কথা শুনিতেই তার আগ্রহ বেশি।

রিণি যতদিন সুস্থ ছিল, আমার সঙ্গে বনত না। আমি কাছে গেলেই যেন কঠিন হয়ে যেত। পাগল হয়ে এখন রিণি সকলকে ত্যাগ করে আমায় আশ্রয় করেছে, আমি ছাড়া ওর যেন কেউ নেই। আগে ওকে আমার পছন্দ হত না, এখন ওর জন্য আমার মন কাঁদে। বিশ্বাস করতে পার সরসী? এমন সৃষ্টিছাড়া কথা শুনেছ কোনওদিন? সাধারণ রিণির সঙ্গে নয়, পাগল রিণির সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠল।

সরসী বলে, সৃষ্টিছাড়া কথা বলছ কেন? পাগল হয়েছে বলেই তো রিণির জন্য তোমার মমতা জাগা স্বাভাবিক।

রাজকুমার বলে, আমার নয় মমতা জাগল। কিন্তু রিণি? আমি এমন খাপছাড়া মানুষ যে পাগল হয়ে তবে রিণি আমায় সইতে পারল! চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর কথা বলে না? রিণি আমায় তাই দেখিয়েছে সরসী। সুস্থ মনে আমায় বন্ধু বলে ও গ্রহণ করতে পারেনি, বিকারে শুধু আমায় চিনেছে।

সরসী কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলে, তাও যদি হয়, কথাটা তুমি ওভাবে নিচ্ছ কেন? খাপছাড়া হওয়াটা সব সময় নিন্দনীয় হয় না রাজু। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চিন্তাশীল প্রতিভাবান মানুষের খাপ না খাওয়াটাই বেশি স্বাভাবিক। সুস্থ অবস্থায় রিণি হয়তো তোমার নাগাল পেত না, তোমার বক্তিত্ব ওকে পীড়ন করত, তাই ও তোমায় সহ্য করতে পারত না। পাগল হয়ে এখন আর ও সব অনুভূতি নেই, তোমায় তাই ওর ভালো লাগে, বিনা বাধায় তোমায় শ্রদ্ধা করতে পারে।

রাজকুমার ম্লানভাবে একটু হাসে। বলে, চিন্তাশীল। প্রতিভাবান মানুষ! চিন্তাগ্রস্ত নিউরোটিক মানুষ বললে লাগসই হত সরসী। যত চেষ্টাই কর, আমার ট্র্যাজেডিকে আমার মহাপুরুষত্বের প্রমাণ বলে দাঁড় করাতে পারবে না, সরসী। নিজেকে আমি কিছু কিছু চিনতে পারছি।

সরসীর মধ্যে হঠাৎ উত্তেজনা দেখা দেয়, রাজকুমারের বাহুমূল চাপিয়া ধরিয়া সে বলে পারছ? তাই হবে বাজু। তাই হওয়া সম্ভব। নিজেকে জানবার বুঝবার চেষ্টা আরম্ভ করে তুমি দিশেহারা হয়ে গেছে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তোমার কী হয়েছে।

সমুদ্রের সংকেতে প্রতিবছর রাজকুমারেব সালতামামি হয়। দূরের সমুদ্র শহরে তার কাছে আসে। জীবনের কয়েকটা দিন ভরিয়া থাকে ভিজা স্পর্শ, আঁশটে গন্ধ আর বালিয়াড়ির স্বপ্ন। প্রতিমুহূর্তে তার মনে হয়, দীর্ঘকায়া চম্পকবর্ণা এক নারী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মাঠ বন নদী গ্রাম নগর পার হইয়া আগাইয়া আসিতেছে, শ্রোণিভারে থমথম করিতেছে তার গগনচম্বী রসটম্বুর দেহে স্তম্ভিত ছন্দের ঢেউ, কটিতটে সৃষ্টি হইয়াছে নতুন দিগন্তের বঙ্কিম রেখা, মুখ ঘিরিয়া খেলা করিতেছে নিঃশ্বাসে আলোড়িত মেঘ। মনে হয়, আসিতেছে।

পাড়ার একটি ছেলে প্রায় প্রতিবাত্রে বাঁশি বাজায়, রাজকুমার শুধু শুনিতে পায় এই কয়েকটা দিন। একতলায় রোয়াকে আর দোতলার বারান্দার আস্ত আস্ত ভাঙা কয়েকটি টবের ফুলগুলি চোখে পড়ে, খেয়াল হয় যে পাতার রং সত্যই সবুজ। তবু সে বিশ্বাস করে না, মানিতে চায় না যে প্রত্যেকে জীবনে আশীর্বাদ থাকিবেই, আশীর্বাদ কখনও ধ্বংস হয় না। নিজেকে সে ধমক দিয়া বলে, আমি অভিশপ্ত। বলে আর তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেয় সালতামামির সংকেত ও নববর্ষের প্রেরণা।

ভাবিয়া রাখে, ঘনিষ্ঠভাবে কারও সংস্পর্শে সে আর আসিবে না, কারও জীবনে তার অভিশাপের ছায়া পড়িতে দিবে না। ভগবান জানেন তাকে কেন ওরা শ্রদ্ধা করে, তার প্রভাব ওদের জীবনে কাজ করে কেন। কিন্তু আর নয়। তার সঙ্গে মেলামেশা সহজ ও সহনীয় করিতে ওদের যখন বিকার আনিতে হয় নিজেদের মধ্যে, তার কাজ নাই মেলামেশায়। অন্য কারও সঙ্গে নয়, কালী মালতী আর সরসীর সঙ্গেও নয়।

মনোরমাকে সে বলে, কালীকে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দাও দিদি।

খোকা পাশে ঘুমাইয়া আছে, মনোরমার কোনও অবলম্বন নাই। মাথা নিচু করিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে মৃদুকণ্ঠে সে বলে, গোড়াতেই কেন বললে না রাজুভাই? একটা কচিমেয়ের সঙ্গে খেলা করতে মজা লাগছিল? বিয়ের যুগ্যি কনের জন্য একটা বর গাঁথতে তার মতলববাজ দিদি কেমন করে ফাঁদ পাতে সেই রগড় দেখছিলে?

না, দিদি। গোড়া থেকে কালীকে আমার ভালো লেগেছিল।

মুখ তুলিয়া সাগ্রহে মনোরমা বলে, তবে?

রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আগ্রহ তার আপনা হইতে ঝিমাইয়া যায়। আবার মুখ নিচু করিযা খোকাব বালিশ হইতে একটি পিঁপড়ে ঝাড়িয়া ফেলে, ধীরে ধীরে মেঝেতে আঁচড় কাটিতে কাটিতে বলে, তোমাব দোষ নেই রাজুভাই, আমারই বোকামি হয়েছে। নিজের ইচ্ছেটাই আমি বড়ো করে দেখছিলাম। যদি বলি কালীর বিয়ের ভাবনা আমাদের ছিল না, বিশ্বাস করবে রাজুভাই? তুমি তো দেখে এসেছ, ওর বাবার অবস্থা খারাপ নয়। মেয়েটাকে সস্তায় তোমার ঘাড়ে চাপানো যাবে বলে চেষ্টা করিনি ভাই।

তা জানি দিদি। ও কথা আমার মনেও আসেনি।

ওর বয়সে আমিও ওর মতো হাবাগোবা মেয়ে ছিলাম রাজুভাই।

কালী হাবাগোবা মেয়ে নয় দিদি। বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, পাকামি নেই বলে হাবাগোবা মনে হয়।

মনোরমা যেন শুনিয়াও শোনে না, আপন মনে বলিতে থাকে, এমন ঝোঁক আমার কেন চাপল কে জানে! দিনরাত কেবল মনে হত, তোমার সঙ্গে ভাব হবে, বিয়ে হবে কালীর জীবন সার্থক হবে, আমারও সুখের সীমা থাকবে না। মস্ত একটা ভার যেন নেমে যাবে মনে হত।

মনোরমাকে দেখিলে চমক লাগিয়া যায। বিষাদ ও হতাশাব যন্ত্রণায মুখ যেন তার কালো হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। কালীব বদলে তাকেই যেন প্রত্যাখ্যান করিযাছে রাজকুমার, বুক তার ভাঙিয়া গিয়াছে, হাড়পাঁজর সমেত। মমতা বোধ করার বদলে তাকে রাজকুমারের আঘাত করিতে ইচ্ছা হয়। তার সংস্পর্শে আসিয়া তার সঙ্গে গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে কালীর মধ্যস্থতায় নিজের মনের আবছায়া গোপনতার অন্তরালবর্তিনী মনোরমা তার সঙ্গে কী অদ্ভুত যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়াছে দ্যাখো।

কালীর আবির্ভাবের আগের ও পরের মনোরমার অনেক তুচ্ছ কথা, ভঙ্গি ভাব ও চাহনি, অনেক ছোটোবড়ো পরিবর্তন, রাজকুমারের মনে পড়িতে থাকে। মনে পড়িতে থাকে, শেষের দিকে তার সমাদর ও অবহেলায় কালীর মুখে যে আনন্দ ও বিষাদের আবির্ভাব ঘটিত, কতবাব মনোরমার মুখে তার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াছে। কালীর চেয়েও মনোরমার প্রত্যাশা ও উৎকণ্ঠা মনে হইয়াছে গম্ভীর।

মনোরমা মরার মতো বলে আমি ভাবছি ও ছুঁড়ি না সারাটা জীবন জ্বলে পুড়ে মরে। এ আমি কী করলাম রাজুভাই?

মনোরমা পর্যন্ত বিকারের অর্ঘ্য দিয়া নিজের জীবনে তাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে, এ জ্বালা রাজকুমার ভুলিতে পারিতেছিল না। অশ্রুজলের ইতিহাস হয়তো আছে, নিপীড়িত বন্দী-মনের স্বপ্নপিপাসা হয়তো প্রেরণা দিয়াছে, তবু রাজকুমার মনোরমাকে ক্ষমা করিতে পারে না, নিষ্ঠুরভাবে ধমক দিয়া বলে, কী বকছ পাগলের মতো? কালী তোমার মতো কাব্য জানে না দিদি। দিব্যি হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে দেবে, তোমার ভয় নেই।

মনোরমা বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া থাকে। রাজকুমার আঘাত করিলেও সে বুঝি এতখানি আহত হইত না। দুদিন পরে নিজেই সে কালীকে তার মার কাছে রাখিয়া আসিতে যায়। আর ফিরিয়া আসে না। মাসকাবারে তার স্বামী বাসা তুলিয়া দিয়া সাময়িকভাবে আশ্রয় নেয় বোর্ডিংয়ে।

রাজকুমার বুঝিতে পারে যে সোজাসুজি তার বাড়ি ছাড়িয়া অন্য বাড়িতে যাইতে মনোরমা সংকোচ বোধ করিয়াছে। বোর্ডিংয়ের ভাত খাইয়া স্বামী তার রোগা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া দু-একমাস পরেই মনোরমা শহরে অন্য বাড়িতে নীড় বাঁধিবে। হয়তো কালীর শুভবিবাহের পর। ইতিমধ্যে যদি কালীর বিবাহ নাও হয়, কয়েক মাসের মধ্যে হইবে সন্দেহ নাই। মনোরমা তখন একদিন এ বাড়িতে আসিবে, কালীর বিবাহে তাকে নিমন্ত্রণ করিতে।

আঘাত করিতে আসিয়া মনোরমার চোখ যদি সেদিন হঠাৎ ছলছল করিয়া ওঠে? বিষাদ

ও হতাশায় আবার যদি মুখখানা তার কালো আর বাঁকা হইয়া যায়? রোমাঞ্চকর বিষাদের অনুভূতিতে রাজকুমারের সর্বাঙ্গে শিহরন বহিয়া যায়।

মালতীর সঙ্গে তার প্রায় দেখাই হয় না। মালতীও সাড়াশব্দ দেয় না। সরসীর কাছে রাজকুমার তার খবর পায়। আপনা হইতে সব ঠিক হইয়া যাইবে জানিলেও মালতীর সম্বন্ধে রাজকুমারের ভাবনা ছিল। আপনা হইতে সব ঠিক হইয়া যাওয়ার প্রক্রিয়াটি তো সহজ বা সংক্ষিপ্ত হইবে না মালতীর পক্ষে, কষ্টকর দীর্ঘ মানসিক বিপর্যয়েব মধ্যে তাকে কতদিন কাটাইতে হইবে কে জানে। তার সাহায্য পাইলে এই দুঃখের দিনগুলি হয়তো মালতীর আরেকটু সহনীয় হইত কিন্তু সে সাহস আর রাজকুমারের নাই। নিজের সম্বন্ধে তার একটা আতঙ্ক জন্মিয়া গিয়াছে। কয়েকটা দিন অত্যন্ত উদ্‌বেগের মধ্যে কাটাইয়া একদিন সে সরসীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিল। অকপটে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিযা প্রায় করুণ সুরে প্রশ্ন করিয়াছিল, কী করি বলো তো সরসী?

সরসী বলিয়াছিল, তোমার কিছু করতে হবে না। আমি সব ঠিক করে নেব।

রাজকুমার চিন্তিতভাবে বলিযাছিল, সেটা কি ঠিক হবে সবসী? যা বলার আমার বলাই উচিত, আমার হয়ে তুমি কিছু বলতে গেলে হয়তো খেপে যাবে। এমনিই কী হয়েছে কে জানে, একদিন ফোন পর্যন্ত করল না। যখন তখন ফোনে কথা বলতে পারবে বলে জোর করে আমাকে বাড়িতে ফোন নিইয়েছে। কিছু বুঝতে পারছি না, সবসী।

এমন অসহায নম্রতাব সঙ্গে রাজকুমারকে সরসী কোনওদিন কথা বলিতে শোনে নাই। ধরা গলার আওয়াজ রাজকুমাবকে শোনাইতে না চাওয়ায় কিছুক্ষণ সে কথা বলিতে পারে নাই।

তুমি কিছু ভেবো না রাজু। তোমার হয়ে মালতীকে বলতে যাবে কেন? যা বলাব আমি নিজে বলব, যা করার আমি নিজেই কবব। এ সব মেয়েদের কাজ, মেয়েরাই ভালো পারে। আমায় বিশ্বাস কবো, আমি বলছি, মালতীর জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। মালতী চুপ করে গেছে কেন বুঝতে পার না? ওর ভয় হযেছে।

কীসেব ভয?

তুমি যদি সত্যি সত্যি ওকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে চাও? এই ভয়। সেদিন নিজে থেকে তোমায় বলেছিল বটে, এখন কিন্তু ওর ভেতর থেকে উলটো চাপ আসছে। যেতে বললে যাবে কিন্তু ওর উৎসাহ নিভে গেছে। সেদিন হোটেলের রুমে যেমন বুঝতে পারেনি হঠাৎ কেন অসুস্থ হযে পড়ল, এখনও বেচারি সেই রকম বুঝতে পারছে না কী হয়েছে, অথচ তোমায় একবার ফোন করার সাহসও হচ্ছে না।

সরসী মালতীর ভার নেওয়ায় রাজকুমার নিশ্চিন্ত হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সরসীর উপর সে নির্ভব করিতে শিখিতেছিল, সব বিষয়ে সরসীব সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা ও পরামর্শ করার প্রেরণাও তার এই মনোভাব হইতে আসিয়াছে। তাকে রিণির প্রয়োজন, তাই শুধু উন্মাদিনী রিণির সাহচর্য স্বীকার করিয়া সকলের জীবন হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়াছে, বাদ পড়িয়াছে সরসী। সরসীকেও সে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিল, মুক্তি পাইতে সরসী অস্বীকার করিয়াছে। রাজকুমার তাকে ডাকে না, সরসী নিজেই তার কাছে আসে, বাড়িতে না পাইলে স্যার কে এল-এর বাড়ি গিয়া তার খোঁজ করে। রিণি তাকে সহ্য করিতে পারে না, নীচে বসিয়া রাজকুমারের সঙ্গে সে কথা বলে। বারবার রিণি তাদের আলাপে বাধা দেয়, রাজকুমারকে উপরে ডাকিয়া অনেকক্ষণ আটকাইয়া রাখে, সরসী ধৈর্য হারায় না, বিরক্ত হয় না, অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। মাঝে মাঝে রাজকুমারের মনে হয়, সে যেন সকলকে রেহাই দেয় নাই, তাকেই সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, একমাত্র সরসী তাকে ছাঁটিয়া ফেলে নাই, আরও তার কাছে সরিয়া আসিয়াছে।

স্যার কে এল-এর বাড়িতেই রাজকুমারের বেশির ভাগ সময় কাটে রিণির কাছে। রাজকুমার না থাকিলে রিণি অস্থির হইয়া ওঠে, কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের চুল ছেঁড়ে, রাগ করিয়া আলমারির

কাচ, চীনামাটির বাসন ভাঙে বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে, ধরিতে গেলে মানুষকে কামড়াইয়া দেয়, জামাকাপড় খুলিয়া ফেলিয়া নগ্ন দেহে রাজকুমারের খোঁজে বাহির হইয়া যাইতে চায় পথে। রাজকুমারকে দেখিলেই সে একেবাবে শান্ত হইয়া যায়, আশ্চর্যরকম শান্ত হইয়া যায়। প্রায় স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতো কথা বলে ও শোনে, চলাফেরা করে, খাবার খায়, ঘুমায়। একটু তফাত হইতে লক্ষ্য করিলে অজানা মানুষের তখন বুঝিবার উপায় থাকে না তার কিছু হইয়াছে। কোনও কোনও মুহূর্তে রাজকুমারের পর্যন্ত মনে হয় যে রিণি বুঝি সারিয়া উঠিয়াছে, একটা চমক দেওয়া উল্লাস জাগিতে না জাগিতে লয় পাইয়া যায়। রিণির চোখ। রাজকুমার যত কাছেই যাক, যতই সুস্থ ও শান্ত মনে হোক রিণিকে, দুটি চোখের চাহনি রিণির ক্ষণিকের জন্যও স্বাভাবিক হয় না।

প্রথম দিকে রাত্রে রিণিকে ঘুম পাড়াইয়া রাজকুমার নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু দেখা গেল এ ব্যবস্থা বজায় রাখা অসম্ভব। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া রিণি হইচই সৃষ্টি করিযা দেয়, কেউ তাকে সামলাইতে পারে না, শেষ পর্যন্ত রাজকুমারকে ডাকিয়া আনিতে হয়। রাত্রেও রাজকুমাবকে তাই এ বাড়িতে শোয়ার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

স্যার কে এল কিছু বলেন নাই। রাজকুমার নিজেই তার কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল।

আপনার আপত্তি নেই তো?

না।

লোকে নানাকথা বলবে।

বলুক।

রাত্রে মাথার কাছে বিছানায বসিয়া শিশুর মতো গায়ে মাথায় হাত বুলাইযা বিণিকে সে ঘুম পাড়াইল, তারপর নিজের ঘরে যাওয়ার আগে কথাটা আরও পরিষ্কাব কবিযা নেওয়াব জন্য আরেকবার গেল স্যার কে এল-এর ঘরে।

আপনি যদি ভালো মনে করেন, রিণিকে আমি বিয়ে করতে রাজি আছি।

কেন?

আপনি তো বুঝতে পারছেন, প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মতোই আমাদের দিনরাত একত্র থাকতে হবে—কতকাল ঠিক নেই।

রাজু, স্ত্রী পাগল হলে স্বামী তাকে ত্যাগ করে।

তবু আপনার মনে যদি—

আমার মনে কিছু হবে না রাজু। শুধু মনে হবে তুমি রিণিকে সুস্থ করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছ। সেদিন বলিনি তোমাকে, রিণিকে আমি তোমায় দিয়ে দিয়েছি? তোমাকে ছাড়া ওর এক মুহূর্ত চলবে না, আমার পাগল মেয়ের জন্য তুমি সব ত্যাগ করবে আর আমি নীতির হিসাব করতে বসব? তোমাকে আমি বাঁধতে চাই না রাজু। আমি চাই যখন খুশি তোমার চলে যাবার পথ খোলা থাকবে। তুমি ভিন্ন ঘরে বিছানা করেছ, দরকার হলে রিণির ঘরে গিয়ে শুযে থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন নেই। আমার মেয়েকে তুমি ভালো করে দাও, আমি আর কিছু চাই না, রাজু।

সরসীও এই কথাই বলিল রাজকুমারকে। বলিল যে রিণির সঙ্গে রাজকুমারের এই ঘনিষ্ঠতা তার কাছেও যখন এতটুকু দোষের মনে হইতেছে না, রাজকুমারেরও সংকোচ বোধ করার কারণ নাই। জীবন তো খেলার জিনিস নয় মানুষের।

যেদিন ফুটলো কমল

বুদ্ধদেব বসু

পরীক্ষায় যে-সব ছেলে পয়লা নম্বর, তাদের প্রতি পার্থপ্রতিমের অবজ্ঞার সীমা ছিলো না। অনার্সকোর্সের দৌড়ে ঘাড় নুইয়ে ছুটে-ছুটে মুখে ফেনা তুলে গেজেটের সবার উপরকার লাইনে যারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে; নোট মুখস্থ ক'রে, কেতাবগুলোকে রঙিন পেন্সিলে চিত্রিত ক'রে, অকারণ, অবান্তর ও শ্রুতিগম্ভীর বিবিধ জটিল প্রশ্নে অধ্যাপকদের শান্তিময় জীবন বিষাক্ত ক'রে তুলে, লাইব্রেরির দুর্গম অংশে অবস্থিত অনেক বিস্মৃত ও অস্পষ্ট বইয়ের অর্ধ-শতাব্দীর ধূলি-ধূসর স্বপ্নে ভেঙে দিয়ে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে যারা মরি-বাঁচি ক'রে সেনেটহলের খেলায় সবচেয়ে উঁচু লাফ দেয়, তারা—পার্থপ্রতিমের মতে—হচ্ছে গিয়ে এক রকমের জীব, যাদের সম্বন্ধে যত কম বলা হয় ততই তাদের পক্ষে ভালো। তারা তর্ক করবে, কী-কী কারণে কীটস Sensuons হ'লেও Sensual নন; রোমান্টিসিজম-এর স্রোত জার্মানিতে আরম্ভ হ'য়ে কোন-কোন রাস্তায় ইংলণ্ডে এসে পৌঁছলো এবং কোথায় ঠিক কতখানি মোড় বেঁকলো, তারা তার ম্যাপ এঁকে দিতে পারে; রাজা আর্থরের উদ্ভব প্রথমে ইংলণ্ডের মাটিতে না ফ্রান্সের, এ নিয়ে তারা অনায়াসে চার খাতা ভর্তি বাঙালি-ইংরেজি লিখে ফেলতে পারে; কোন গভীর দর্শনের বিচারে সত্যই সৌন্দর্য আর সৌন্দর্যই সত্য, ইংরেজ কবির এ-উক্তি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হ'য়ে গেছে, সে-সব সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা তাদের নখদর্পনে। মোটের উপর, তারা খেটেছে ঢের। অনেক কষ্টে তারা বিদ্যে ব'য়ে বেড়ায়, যতক্ষণ না পরীক্ষার খাতায় তার যতখানি সম্ভব বমি ক'রে ফেলতে পারে। বিদ্যে যেন তাদের সর্বাঙ্গে ফুটে রয়েছে পাঁচড়ার মতো, তাদের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। ও-সব ছেলেই বাৎসরিক বিজয়ের নিশেন উড়িয়ে কলেজ থেকে বেরোয়, পরে ঢোকে সরকারি চাকরিতে, তাদের পালায় করে অধ্যাপনা। তাদেরই জন্য দেশের অবিবাহিত, আই. সি. এস-ফশকানো মেয়ের মা-রা খেপে যান, এবং তাদের কারো বিয়ে হ'য়ে গেলে অনেক মা শোকে শয্যাগ্রহণ করেন। তাবাই হ'য়ে ওঠে যাদের বলা হয় দেশের মধ্যে গণ্যমান্য। কিন্তু তাদের কারো সঙ্গে পাঁচ মিনিট আলাপ করুন, আপনার হাড়গোড় পর্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে। এমন রক্তহীন নির্বুদ্ধিতা, আপনার ইচ্ছে করবে সেখানে কপাল ঠুকে মরতে। পেশাদার পাশদেনেওয়ালা, পরীক্ষা পাশ করা ছাড়া আর কিছুই এরা উপযুক্ত নয়। এদের সঙ্গে আলাপ করবার চাইতে সতেরোর ঘরের নামতা মুখস্থ করা অনেক বেশি উপভোগ্য।

এ-সব মন্তব্যই অবশ্য পার্থপ্রতিমের, আরো উদ্ধৃত করছি মাত্র। পাশ দেনেওয়ালাদের সম্বন্ধে পার্থপ্রতিম আরো নানারকম সব কড়া কথা বলতো, সেগুলো আমি এখানে লিখতে সাহস করলুম না। কোনোরকম অছিলা পেলেই এই 'জীববিশেষে'র উদ্দেশ্যে খোঁচা দিতে সে ছাড়ত না। বাড়াবাড়ি নিশ্চয়ই। আমারও তাই মনে হ'তো। ওর এ-সব কথার পিছনে আছে মনের একটা আক্রোশ, বাংলা ভাষায় যাকে বলে ঝাল। থাকতেই পারতো; কারণ, ওর ক্লান্তিহীন বিদ্রুপের যারা বিষয়, পার্থপ্রতিম নিজেও ছিলো তাদেরই একজন, বরাবর পরীক্ষায় সে পয়লা নম্বর এবং এই চিন্তা তার কাছে ছিলো বিষের মতো। পরীক্ষায় প্রথম হবার মতো এমন একটা সাধারণ ব্যাপার পড়েছে তার ভাগ্যে, এ-কথা ভাবতে তার অসহ্য লাগতো। আর তাই, সে প্রতিহিংসা নিতো পাশ-দেনেওলা অত্যন্ত অমায়িক ছেলেদের উপর; যে-জ্বালা তার নিজের জন্য, তা মেটাতো তাদের উপর দিয়ে। কেউ যদি কখনো তার কালেজি কৃতিত্বের সপ্রশংস উল্লেখ করেছে, সে এমনভাবে জ্ব'লে উঠেছে, যেন তাকে অপমান করা হ'লো। অপমানই তো, মুখে না হোক মনে মনে সে বলতো পরীক্ষার নম্বর দিয়ে আমাকে বাহবা দিতে আসা অপমান ছাড়া আর কী? 'আমি যদি পরীক্ষায় ভালো ক'রে থাকি,' সে বলতো, 'সে কি আমার দোষ? আমি ভালো করেছি—ইচ্ছে ক'রে নয়, চেষ্টা ক'রে নয়, না-ক'রে পারিনি ব'লে। যা হয়েছে, তা না-হওয়া অসম্ভব ছিলো, কারণ আমি যা, আমি তা-ই।' এমন বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের সুরে বলে যে শুনলে রাগ ধরে, কিন্তু সে-রাগটা মনে-মনে হজম ক'রে ফেলা ছাড়া

উপায় থাকে না, কারণ সবাই জানে যে সে যা বলছে, তা সত্যি। পার্থপ্রতিম ফিললজির ক্লাশে ব'সে নিতান্ত প্রকাশ্যভাবে নভেল পড়ে; টিউটরিয়াল একমাস বাকি ফেলে হঠাৎ ছেঁড়া খোঁড়া কাগজে দু-পাতা লিখে এনে দাখিল করে; পি.এইচ.ডি অধ্যাপক যখন শেলির বিশ্বমানবতা বিষয়ে বক্তৃতা করে, মুখের এমন ক্লিষ্ট চেহারা ক'রে তাঁর দিকে তাকায়, যেন কেউ তাকে মারছে। উইলিয়ম মরিস বলতেন, যে-লোক তাঁত বুনতে বুনতে মহাকাব্য লিখে ফেলতে না পারে, সে আবার কবি কিসের? তেমনি, পার্থপ্রতিম বলতো, 'কোনোরকম দুর্ভাবনা না ক'রে দিব্যি আরামে বসে থেকেই যদি পরীক্ষায় ভালো করা না গেলো, তাহ'লে সে-ভালো করার মানে কী? তার কথায় বেশ একটু অহংকার ছিলো, বস্তুত—আপনারা অবশ্য তা এতক্ষণে টের পেয়ে গেছেন—তার মনে নিজের সম্বন্ধে গর্ব ছিলো—বড়ো বেশি গর্ব, সবাই বলতো। থাকতেই পারে, গর্ব করবার কারণ থাকলে কে না করে? ক্লাশের ছেলেদের সে আমলের মধ্যেই আনে না, সারা বছর ভ'রে সে তাদের সঙ্গে সবসুদ্ধ পাঁচটা কথা বলে কিনা, সন্দেহ। প্রতিদিন বেঞ্চিতে পাশাপাশি ব'সে তাদের নামও সে ভালো ক'রে জানে না। ছেলেদের আড্ডায়, সভায়, ক্লাবে তাকে দেখা যায় না কখনো; রাস্তায় কোনো সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হ'লে সে তাড়াতাড়ি একটু পরিচয়সূচক মাথা নুইয়েই স'রে যায়। এবং অধ্যাপকদের সম্বন্ধে সে নাকি রোজ এই ব'লে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, 'প্রভু, এদের ক্ষমা করো; এরা জানে না, এরা কী করছে।'

পার্থপ্রতিমের ধারণা, সে কলেজে পড়তে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি নিছক একটা দয়া করছে। পয়লা নম্বরটা তার পক্ষে কিছু সম্মানই নয়—এর চাইতে অনেক বড়ো জিনিসের জন্য সে উদ্দিষ্ট। বরং, কালেজি শিক্ষার অন্ধ, মন্থর রুটিনপরিক্রমণ তার পক্ষে—যেমন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষেই তা হ'তে বাধ্য—একটা বিষম শাস্তি। 'আমি হচ্ছি', সে হেসে বলতো, 'বর্তমান বাংলার একমাত্র লোক, বুদ্ধিমান হ'য়েও যে পরীক্ষায় ভালো করেছে, এবং পরীক্ষায় ভালো করেও যার বুদ্ধি লোপ পায়নি।' 'আমাকে দিয়ে পরীক্ষা পাশ করানো,' একটা অত্যন্ত 'কাব্যিক' উপমা দিয়ে সে আরো বলতো, 'আর চাঁদের টুকরো দিয়ে আংটি গড়ানো একই কথা।' তার এ-উক্তির মানে এই যে চাঁদের টুকরো দিয়ে আংটি গড়ানো যদি সম্ভব হ'তো, আংটিটা খুবই সুন্দর হ'তো, সন্দেহ নেই; কিন্তু চাঁদের পক্ষে সেটা চরম চন্দ্রত্ব হ'তো না। তেমনি তাকে পাশ করতে দিলে ফল যে ভালো হবে, তা তো জানা কথাই; কিন্তু তার পক্ষে সে ভালো কিছু ভালো নয়, সেটা কিছুই নয়। সেখানে তার কোনো প্রকাশ নেই। এরই নাম অপব্যবহার। যে যা সবচেয়ে বেশি দিতে পারে, সে যেন তা-ই দেয়। তার চেয়ে ছোটো কোনো ব্যবহারে তাকে লাগানো—তাও একরকমের অত্যাচার।

পার্থপ্রতিম যে এ-সব কথা মনে করে এবং বলে, তার কারণ সে লিখতে পারে। লিখতে অবশ্য আমরা সবাই পারি; 'পত্রপাঠমাত্র অবশ্য তিরিশ টাকা পাঠাবেন, বিশেষ দরকার,' এই বলে বাবাকে, কি 'তুমি চলে যাবার পর পৃথিবী অন্ধকার ঠেকছে,' এই বলে স্ত্রীকে কে না চিঠি লিখেছে? কিন্তু পার্থপ্রতিম তার চেয়ে বেশি পারে; সে তার মনের কথা স্পষ্ট ক'রে বলতে পারে। বড়ো সহজ হ'য়ে গেলো শুনতে; আপনি হয়তো ভাবছেন, তা তো আমিও পারি। বেশ, কাগজকলম নিয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন। ভাবতে যা সবচেয়ে সহজ, প্রকাশ করতে তা-ই সবচেয়ে শক্ত। নেই, কথা নেই। না, আপনি মাথা খুঁড়ে মরলেও কথা খুঁজে পাবেন না; কিন্তু অন্য একজন, দেখবেন, ঠিক আপনারই মনের কথা অনেক আগেই লিখে রেখেছে—লিখেছে সহজ ক'রে, এবং তার চেয়ে বেশি সুন্দর করে। আপনার মনে যে ঠিক ঐ কথাই ছিলো, তা আপনি স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলেন অন্য একজনের সেই লেখা পড়ে। এরই নাম কথার ভোজবাজি, অর্থাৎ আর্ট।

পার্থপ্রতিম, তা'হলে লিখতে পারে এবং লিখেও থাকে—অজস্র। যখন তার খুশি, যেমন তার মরজি—নিজেরই গরজে। নিজেরই খুশির জন্য। যেন নতুন একরকম খেলা, যার সবচেয়ে মজা এই যে তাতে ক্লান্তি নেই; যত পুরোনো হয় মজা ততই ঘোরালো হ'য়ে আসে। স্রোতের জলের

মতো অজস্র সব লেখা, ব'য়ে চলেছে অবাধ—দায়িত্বের ভার নেই, কোনো উদ্দেশ্যের পিছুটান নেই—মুহূর্তের অস্তিত্বে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ, ঢেউয়ের পরে ঢেউ ভেঙে পড়ছে সূর্যের আলোয় রামধনু-ঝলকে। পার্থপ্রতিমের মগজের কোষে-কোষে অগুনতি ভাবনা ভিড় করে আছে, ঠেলাঠেলি করছে বেরিয়ে আসার জন্য—হাঁপ ধ'রে যায় কোনটাকে ফেলে কোনটাকে নেবে। তার মনের মধ্যে কত সময় কত কথা হঠাৎ জ্ব'লে ওঠে আলোর মতো—দিশে পায় না, এত আলো নিয়ে সে কী করবে। মনে-মনে বলে, দিলে যদি, এত অজস্র দিলে কেন; আর এত অজস্রই যদি দিলে, সে-অনুপাতে শক্তি কেন দিলে না যাতে সব ব্যবহার করতে পারি। অনেক ভাবনা অবশ্য মগজের মধ্যেই ভিড়ের চাপে মারা যায়, অনেক কথা মনের মধ্যেই যায় মিলিয়ে। কিন্তু সেজন্য পার্থপ্রতিম এক মুহূর্তও আক্ষেপ করে না; খোয়াতে খোয়াতে, হারাতে হারাতে, ছড়াতে ছড়াতে সে চ'লে যায় নতুন থেকে নতুনতরতে। যতক্ষণ একটা জিনিস লেখা হ'তে থাকে ততক্ষণই মজা; যে-মুহূর্তে লেখা শেষ হ'লো, সে মুহূর্তেই সেটা শেষ হ'য়ে গেলো, পার্থপ্রতিম সেটাকে ভুলে যায়, তার মন ছোটে এর পরে যেটা আসবে তার দিকে। নিজের লেখার মায়ায় সে জড়িয়ে পড়ে না কখনো; জিনিসটা কেমন হ'লো, তা একটু তাকিয়ে দেখার তার সময় নেই। লেখা যে হয়েছে, সেটাই ঢের, সেটাই সব। সেটুকুই মজা। তার সব লেখা বেহিশেবি নির্ভাবনায় ছড়িয়ে দেয়, উড়িয়ে দেয়,—কিছু হয়তো ছাপা হয় মাসিকপত্রে, কিছু প'ড়ে থাকে টেবিলের দেরাজে—একদিন হয়তো দেখা গেলো, জায়গার টানাটানি হচ্ছে—তখন ফেলে দিলে ছিঁড়ে। না-হয় খেয়াল হ'লো, পাঠিয়ে দিলে কতগুলো লেখা দূর শহরের বাসিন্দা কোনো বন্ধুর কাছে। তার লেখার পাঠকচক্র তারই দু-চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে আবদ্ধ, তাদের কাছে সে কখনো মত জিগ্যেস করে না, তারা কেউ গায়ে প'ড়ে প্রশংসা করলে স্পষ্ট খুশি হয়, নিন্দে করলে থাকে চুপ ক'রে। মোটের উপর, ও-সব ভালো ক'রে তার গায়েই লাগে না। বন্ধুরা সন্দেহ করে, লেখা সম্বন্ধে সে মোটেও সীরিয়াস নয়। 'তা তো নই-ই,' সে জবাব দেয়, 'যেটা মজার ব্যাপার, সেটাকে যদি ভাবনার বিষয় ক'রে তুলি, তাহ'লে তো সেটাকে প্রাণে মারলুম।' আবো বলে, 'লেখাটা ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তাতে কিছু এসে যায় না, কিছু একটা যে হ'য়ে উঠতে পেরেছে, সেটাই আসল কথা।' 'হয়তো,' একদিন ও আমাকে বলেছিলো, 'এই লেখার ভিতর দিয়ে আমিও হ'য়ে উঠছি।' আমি জিগ্যেস করেছিলুম, 'কী হ'য়ে উঠেছো?' 'কী আবার। আমি আমিই হ'য়ে উঠেছি।'

শ্রীলতা

পার্থপ্রতিম যখন এম.এ. পড়ে তার সঙ্গে এসে ভর্তি হ'লো শ্রীলতা দত্ত নামের এক মেয়ে। লোরেটোয় ভর্তি হবার আগে কোন শৈল শহরের কনভেন্টে সে পড়েছিলো। গুজব শোনা গেলো, ইংরেজিতে সে আগুন। সবার মনেই বিদ্যুতের মতো এ-কথাটা একবার খেলে গেলো—এবার যদি পার্থপ্রতিম একটা হার খায়।

শ্রীলতা সে সংগতিপন্ন ঘরের মেয়ে, তার শাড়ি-জামার বৈচিত্র্যই তার প্রমাণ দিচ্ছে। শোনা গেলো, কলকাতায় সে থাকে তার দাদার কাছে, যিনি এক বিলিতি বীমা-কোম্পানীর ছোটো কর্তা গোছের। উৎসাহী ছেলেরা রিচি রোডে তাদের বাড়ির নম্বরটা পর্যন্ত আবিষ্কার ক'রে ফেললে। কিছুদিন পর্যন্ত, শ্রীলতা দত্ত সম্বন্ধে নানারকম গল্পে ও প্রবাদে, তথ্যে ও রূপকথায় ইউনিভার্সিটির আবহাওয়া চঞ্চল হ'য়ে উঠতে লাগলো।

শ্রীলতার গড়ন ছিপছিপে লম্বা—পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আঁটো করে শাড়ি পরবার জন্য, যতটা নয়, তার চেয়েও লম্বা দেখায়। তার উজ্জ্বল কালো চুল ঠিক মাঝখানে ভাগ ক'রে সে দু-দিকে

টান করে নামিয়ে দিয়েছে, আর সে কালো চুলের নিচে তার ফর্শা মুখটি আশ্চর্যরকম ম্লান। আর সেই তার ম্লান মুখে, ঠোঁটের ঠিক নিচে ছিলো ছোটো, কালো একটা তিল—এমন মানানসইভাবে বসানো যে ছেলেরা প্রথমটায় সন্দেহ করেছিলো যে সেটা তুলিকৃত। কিন্তু দিনের পর দিন লক্ষ্য ক'রে বোঝা গেলো যে সেই তিলের উপর শ্রীলতার নিজের কোনো হাত নেই। অনেক তর্ক, অনেক গবেষণা তা নিয়ে ছেলেদের মধ্যে। বস্তুত, যে-কোনো লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিলো ঐ তিল লক্ষ্য-না-করা। শ্রীলতার বহিরাকৃতির ওটাই ছিলো প্রধান বিশেষত্ব।

এমন নয় যে সে ছিলো আমরা যাকে বলি সুন্দরী। তবে তার কতগুলো ধরন ছিলো—খানিকটা স্বাভাবিক, খানিকটা হয়তো বিলেতি স্কুল থেকে অর্জিত। সে কখনো ঋজুরেখায় হাঁটে না; তার পদক্ষেপের উপর দিয়ে খড়ি বুলিয়ে গেলে দেখা যেতো, তা একটা দীর্ঘ কর্ক-স্ক্রুর আকৃতি নিয়েছে। চলতে চলতে কারো সঙ্গে দেখা হ'লে সে তার খুব কাছে এসে পড়ে হঠাৎ থেমে যায়; থামতে গিয়ে শরীরের উপরকার অংশ পিছন দিকে ঈষৎ হেলিয়ে দেয়। আরো সে কতগুলো কাজ করে, যা বাঙালি মেয়েরা সাধারণত করে না; স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে মুক্তকণ্ঠে কথা কয়, হাসে পরিষ্কার গলায়, মুখে আঁচল চাপা না-দিয়ে, হাঁটবার সময় তাকায় এপাশে-ওপাশে—নানাভাবে প্রকাশ করে যে তার মনের স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের উপর ঘোমটা টানা তার অভ্যেস নয়। অন্য মেয়েরা বলে ঢং! মেয়েলি ভাষায় যার মানে হচ্ছে গিয়ে ভান, দেখানোপনা। কিন্তু আমি জানি, দেখানোপনা শ্রীলতার এতটুকু ছিলো না; সে যা, সে তা-ই; তার আচরণ, ব্যবহার অন্য রকম হ'তে হ'লে তাকে শ্রীলতা দত্ত না-হ'য়ে অন্য কেউ হ'তে হ'তো। আসল কথা, সে ছিলো প্রাণে পরিপূর্ণ, তার সমস্ত পাৎলা শরীর যেন প্রাণের একটা ফোয়ারা; সেই নিহিত প্রাণ এনে দিয়েছে দ্রুত ছন্দ তার জীবনে; তারই প্রেরণায় তাব শরীরের প্রতি ছোটো ভঙ্গি উজ্জীবিত, তা উপচে পড়ে তার হাসিতে আর কথায়, ঢেউ খেলিয়ে যায় তার চঞ্চলতায়। ও-সব জিনিসেই প্রকাশ তার। যেমন পার্থপ্রতিমের প্রকাশ তার অবাধ আর অজস্র লেখায়—স্রোতের জলের মতো যা ব'য়ে যাচ্ছে, ঝলমল করছে মুহূর্তের আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তপরে বঙিন বিস্মৃতিতে। প্রাণ এক; তার প্রকাশ অনেক ও বিচিত্র।

স্বাভাবিক মাত্র, শ্রীলতা দত্তর আবির্ভাব যে ইউনিভার্সিটিতে একটা সাধারণ তোলপাড় তুলবে। ঝড় উঠলো অনেক যুবকের মনে; তাদের মধ্যে যারা সাহসী, তারা এগিয়ে গেলো কোনো-একটা অছিলা ক'রে আলাপ করতে; আর যারা তা পারলে না, তারা দূরে দাঁড়িয়ে পূর্বোক্তদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে লাগলো নানারকম কটু বাক্য। তাদের আত্মসম্মানজ্ঞান হঠাৎ এমন টনটনে হ'য়ে উঠলো যে ছোঁয়া যায় না; আর শিভারলিতে তারা যেন প্রত্যেকেই এক-একটি স্যর গ্যালাহাড। 'কী বেহায়া! গায়ে প'ড়ে গেছে আলাপ করতে।' 'ভদ্রমহিলার সম্মান জানে না।' 'মেয়েদের সঙ্গে কি ও-রকম ব্যবহার করতে হয়!' তাদের আহত ভদ্র আত্মার ন্যায়ানুপ্রেরিত উষ্মা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতো, যখন তারা দেখতো ভদ্রমহিলাটির মনে কিছুমাত্র বিকার নেই; নির্লজ্জ ছেলেদের দুঃসাহসে তিনি নিজেকে বিপন্ন মনে ক'রে অদূরে অপেক্ষমান এবং লেশমাত্র অঙ্গুলি-হেলনে ছুটে-আসতে-প্রস্তুত গ্যালাহাডদের সাহায্য প্রার্থনা করছেন না। বস্তুত, শ্রীলতার সঙ্গে আলাপ করা ছিলো খুব সোজা—বড়ো বেশি সোজা, হয়তো। কারণ, মেয়েরা যে নিজেদের চারদিকে একটা বেড়া দিয়ে রাখে, সেটাই তাদের আকর্ষণ, আমন্ত্রণ; যেখানে ভালো করে আলো পড়ে না, সেই আবছায়াটুকুই তাদের মোহ। কিন্তু সেই বেড়া শ্রীলতার হয় কোনোকালেই ছিলো না, নয়তো সে তা ভেঙে দিয়েছিলো ইচ্ছে ক'রে। মোট কথা, নিজেকে সে কোনোভাবেই ঢাকা দিয়ে রাখে না, কি রাখতে পারে না, স্পষ্ট আর উজ্জ্বল, তাকে মনে হয় আগাগোড়া একটা ঝলসানি। অবাধে সে হাসে আর কথা বলে; তার খেয়াল থাকে না, যার সঙ্গে কথা বলছে সে মেয়ে না পুরুষ। পুরুষের চোখে যে তার বিশেষ একটা রূপ, তা সে ভুলে যায়; ভুয়ে যায় আব্রু টানতে, থমকে দাঁড়াতে। কোনো অবস্থাতেই নিজেকে সে সামলাতে পারে না। ঝর্নার মুখের জলধারার মতো, তার অজস্র প্রাণ ঝ'রে পড়ে যা-কিছু কাছে

আসে তারই উপর; মুহূর্তের মৃত্যু পার হ'য়ে মুমূর্ষু পরমুহূর্তের উপর।

এমন নয় যে পার্থপ্রতিমের মনেও ঢেউ গিয়ে না লেগেছিলো। প্রথম যেদিন সে শ্রীলতার উপর চোখ রাখলো পার্থপ্রতিম যেন চমকে উঠলো একটা ধাক্কা লেগে; যেমন আমরা চমকে উঠি অন্যমনস্কভাবে অনেকক্ষণ ধ'রে গলিঘুঁজি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ যখন এসে পড়ি বড়ো রাস্তায়, চেনা রাস্তা নতুন লাগে, মনে পড়ে যায়, পার হ'তে হবে সাবধানে। পার্থপ্রতিম যেন এমন একটা জিনিসের মুখোমুখি দাঁড়ালে, যা একেবারে নতুন, এমন আশ্চর্য যে ভাবা যায় না; পৃথিবীতে যার অস্তিত্ব আছে ব'লে যে কখনো সন্দেহ করেনি। তলিয়ে দেখতে গেলে, সে-জিনিশ অবশ্য নারীর শরীরের সৌন্দর্য। এখানে বলা দরকার, পার্থপ্রতিম তার একুশ বছরের জীবনের মধ্যে কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশেনি; সুযোগ পায়নি ব'লে নয়, সময় হয়নি ব'লে—বরং, খেয়াল হয়নি ব'লে। পৃথিবীতে একজন মাত্র মেয়েকে সে অন্তরঙ্গভাবে জানে—সে মেয়ে তার বিধবা মা। আর এই মা কে সে ভালোবাসে রাক্ষসের মতো।—সে ভালোবাসায় তাব বুকের ভিতরটা টনটন ক'রে ওঠে, তার ধারে তার সমস্ত সত্তা ক্ষ'য়ে যায়। এত তীব্র সে ভালোবাসা, এক-এক রাত্রে বিছানায শুয়ে তার কেমন ভয়-ভয় কবে।—এ ভার আমি বইবো কী ক'রে? তা যেন নিংড়ে বের ক'রে নেয় তার সব, সব; আচ্ছন্ন ক'রে রাখে তাকে, তার সম্পূর্ণতাকে। অন্য কোনো মেয়ে তার চোখেই পড়ে না; কিম্বা শুধু চোখেই পড়ে, দেখতে পায় না সে। কখনো সে ভাবেনি অন্য কোনো মেয়ের কথা, তার মত কখনো চায়নি অন্য কোনো ভালোবাসা। এবং যা আমরা চাই না, তা আমরা পেতেও পারি না; কেননা, চাওয়াই হচ্ছে পাওয়াব প্রথম ও প্রধান শর্ত।

কিন্তু শ্রীলতাকে পার্থপ্রতিম যে-মুহূর্তে দেখলো, তার মন আপনা থেকে বলে উঠলো, 'কী সুন্দর!' হঠাৎ যেন সে জেগে উঠলো—এক নতুনত্বে, এক অভাবনীয়তায়। কী সুন্দর—এই বিস্ময়-ধ্বনি তো শুধু একটা খুচরো মন্তব্য নয়, অ একটা স্বীকাব, পার্থপ্রতিমের অস্তিত্বের মধ্যে শ্রীলতারূপ সত্যের গ্রহণ। সে উক্তি বিদগ্ধ মনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ থেকে উৎসারিত নয়, তা উদ্ভূত পার্থপ্রতিমের সত্তা থেকে, সত্তার গোপন অন্ধকার থেকে। সে দেখতে পেলো, শ্রীলতা আছে; দেখতে পেলো শ্রীলতাকে। আর তার রক্তে লাগলো দোলা; অনেক অস্পষ্ট কথায় মর্মরিত হয়ে উঠলো তাব মন। তবু, শ্রীলতার সঙ্গে পরিচিত হতে সে কোনোরকম চেষ্টাই করলো না; তার কারণ অবশ্য সাহসেব অভাব নয়, তার গর্ব। শ্রীলতাকে ঘিরে যে-ভিড়, তার মধ্যে ঠেলাঠেলি করবাব কথা ভাবতে পারে না সে। সুতরাং সে রইলো দূরে, আব সময় ব'য়ে যেতে লাগলো।

প্রবন্ধপর্ব

ইতিমধ্যে এক ব্যাপার হ'লো। ইউনিভার্সিটিতে নতুন একটা প্রবন্ধ লেখবার প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হ'লো ঃ তার বিষয় একটু অদ্ভুত, 'মানুষ কেন অন্যায় করে।' সবারই মনে খটকা লাগল ঃ কথাটা যেন রসিকতার মতো শোনাচ্ছে। পুরো লাইব্রেরিটা যে-সব ছেলের নখদর্পণে, তারা ও-বিষয়ে কোনো রেফারেন্সের বই খুঁজে-খুঁজে হয়রান হ'তে লাগলো। মুশকিল, পাওয়া যায় না কোনো বই। এমনকী, ওটা ঠিক কোন বিষয়ের মধ্যে পড়ে, তা নিয়েও ডাকসাইটে ছেলেদের মধ্যে তর্ক লাগলো। কেউ বললে, বায়লজি, কেউ বললে, ফিলজফি ঃ অ্যান্থ্রোপলজি, সোশ্যলজি, ক্রিমনলজি ইত্যাদি আরো অনেক নাম উচ্চারিত হ'লো। বিষয়টা যে কী, সেটা অবশ্য আগে নির্ধারণ করা দরকার ঃ কেননা, তা জানতে পারলে তবে তো সে-বিষয়ের একরাশ বই পড়া যাবে, এবং একরাশ বই পড়তে পারলে তবে না প্রবন্ধকে করা যাবে এমন যে পরীক্ষক ভয় পেয়েই পুরস্কার দিয়ে দেবেন।

শেষটায় এক ফাজিল ছোকরা বললে, 'মিছিমিছি তোমরা জটলা করছো; প্রাইজটা কার জন্য,

তা তো আমরা সবাই জানি।

অম্বিকাচরণ ফিলজফিতে গোল্ড-মেডালিস্ট; অল্প বয়স থেকেই দাড়ি রাখছে। সে রুখে উঠে বললে, 'রেখে দাও। দু-পাতা ফুরফুরে ইংরিজি লিখতে পারলেই সব সময় চলে না।'

ইকনমিক্সের পয়লা নম্বর সোনার চশমাটার দু-দিকে একটু চাপ দিয়ে বললে, 'পার্থ! এ-সব বিষয়ের ও কী জানে! ও তো পড়ে লিট্রেচার—আর এ সে দস্তুরমতো সায়ান্সের এলাকা।'

কিন্তু মনে-মনে সবারই ভয়ে র'য়ে গেলো। পার্থ যে কিছুই জানে না, এমনকি, তার নির্বাচিত ইংরেজি সাহিত্যেও নয়, এ-বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কলম নিয়েও ও যে কী ভোজবাজি করবে, আর তাদের সবার নাকের সামনা থেকে ঝুলন্ত প্রাইজটা কেড়ে নিয়ে চলে যাবে...কিছুই বলা যায় না। বিদ্যার ভার যার যতই থাক, তা প্রকাশ করবার বিস্তৃত ক্ষেত্র চাই—আড়াই হাজার শব্দের মধ্যে কতটুকু আর ধরানো যাবে! কিন্তু কলমের ধার মুহূর্তের মধ্যে কেটে দিয়ে চলে যায়, চমক লাগে ততই। তার মানে, ফাঁকি দিতে পারলেই তুমি জিতবে। এটা এমনই অন্যায় যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও যায় না।

পার্থপ্রতিমের কথা ভেবে অনেক ছেলেই শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে গেলো; মনে মনে ভাবলে, লিখলে যে পাবো না, তা তো নিশ্চিত; যদি না লিখি, তাহ'লে লিখলে যে পেতুম না, এ-কথা কেউ জোর করে বলতে পারবে না। ডাকশাইটে ছেলেরা লেগে রইলো; প্রাইজের টাকার অঙ্কটা ছিলো লোভনীয়। সারা ইউনিভার্সিটি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, কী হয়।

প্রবন্ধ দাখিল করার যেদিন শেষ তারিখ, অম্বিকাচরণ পার্থকে গিয়ে বললে, 'আপনি সাবমিট করেছেন?'

'অনেক আগেই করেছি।'

'আমি এইমাত্র দিয়ে এলুম। এখন একটু ডিসকস করতে আপত্তি নেই—কী বলেন?'

'আপত্তি কখনোই ছিলো না।'

'আপনি জিনিসটাকে কোন দিক থেকে দেখেছেন—বড্ড বেজুত ব্যাপার, না?'

'কবে লিখেছি—কিচ্ছু মনে নেই এখন।'

অম্বিকাচরণ মনে-মনে বললে, 'দ্যাখো, এখনো আগলে রাখছেন—যেন ওঁরটা জানতে পেলে আমি গিলে ফেলবো।' মুখে বললে, 'অন্তত সেন্ট্রাল আইডিয়াটা—

পার্থপ্রতিম হেসে বললে, 'লিখেছি, ফুরিয়ে গেছে—তা নিয়ে কে এখন ভাবতে যায়। তাছাড়া, আমার লেখাটা ভালোও হয়নি।'

অম্বিকাচরণ বাঁকা হেসে বললে, তা না-ই বা হ'লো; আপনিই পাবেন প্রাইজ।'

পার্থপ্রতিম একটুও দ্বিধা না-করে বললে, 'তা হতে পারে।'

অম্বিকাচরণ চ'লে যেতে-যেতে অস্ফুটস্বরে বললে, 'বাবাঃ, দেমাক বটে!'

পার্থপ্রতিম যে বিনয় করে বলেনি, 'না, না, আমি কী করে পাবো,' তার কারণ সে সত্যি বিশ্বাস করতো যে সে-ই পাবে পুরস্কারটা। যদিও সে মনে-মনে জানতো যে লেখাটা খুব ভালো হয়নি। কিন্তু তার খুব-ভালো-নয় লেখার সঙ্গে অন্য কারো খুব-বেশি-ভালো লেখাও যে পাল্লা দিতে পারবে, এমন সন্দেহ তার মনে কখনো উঁকি দেয় না। সে যখন লিখেছে, তখন সেটাই যে সবচেয়ে ভালো দাঁড়িয়ে যাবে, এ তো জানা কথাই।

এদিকে ছেলেদের মধ্যে চলতে লাগল তুমুল জল্পনা, তর্কাতর্কি। কেউ বললে, 'দেখে নিয়ো অম্বিকাচরণই মেরে দেবে এটা। ভাবতে পারো ন্যাচরেল হিস্ট্রির বারোটা ভল্যুম ঘেঁটেছে।' কেউ বা ইকনমিক্সের পয়লা নম্বরের নাম করলে; সে নাকি মানবসমাজের ইতিহাস থেকে এমন সব দৃষ্টান্ত জড়ো করেছে, যা—মোট কথা, যা দেখে তাক লেগে যায়। পার্থপ্রতিমের নাম মাঝে-মাঝে উচ্চারিত হ'তো, এবং তৎক্ষণাৎ হেসে উড়িয়ে দেয়া হ'তো। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যেতো যে পার্থপ্রতিম

সম্বন্ধে ভয় আছে সবার মনেই, এবং তার হাত থেকে যদি এটা কোনোক্রমে ফশকায়, তাহ'লে সবাই পরম খুশি হয়।

গরমের ছুটির কয়েকদিন আগে ফল বেরোলো; প্রাইজ পেয়েছে শ্রীলতা দত্ত।

হঠাৎ স্রোত একেবারে ঘুরে গেলো। শ্রীলতার কথা কারো একবারও মনে হয়নি : কলকাতার সব সেরা কলেজ থেকে আগত বাছা-বাছা ছেলেদের ডিঙিয়ে কোত্থেকে একটা মেয়ে এসে কিনা কেড়ে নিয়ে গেলো এমন একটা প্রাইজ! একটা মেয়ে! মাস কয়েক আগে যে-সব ছেলে শিভলরির চাপে ফেটে মরছিলো এখন তাদেরই মধ্যে দেখা গেলো পৌরুষ আর বাঁধ মানছে না। তারা সবাই একযোগে ছি-ছি করতে লাগলো : এ নাকি সমস্ত পুরুষজাতির বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রতি অপমান, এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না। সবচেয়ে লজ্জার কথা এই যে পার্থপ্রতিমের প্রতি এত বড়ো অন্যায় করা হ'লো।

কারণ, আগে যারা পার্থপ্রতিমের ঘোর বিরোধী ছিল, তার হার হ'লে যারা খুশি হতো এখন তারাই হ'য়ে উঠলো তার পক্ষ নিযে কথা কইতে শতমুখ। জোর গলায তারা বলতে লাগলো, পার্থপ্রতিম যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী, সেখানে যে অন্য কেউ কাছাকাছিও আসতে পাবে, এটা দস্তুরমতো একটা স্ক্যান্ডল। এর অবিচার দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। আসল কথা, প্রত্যেকের পরাজয়ের লজ্জার তারা শোধ তুলতে লাগলো পার্থপ্রতিমকে উপলক্ষ করে। ইকনমিক্সের ছেলেটি সোনার চশমার ঝলক তুলে বললে, 'এ তো জানা কথাই; বাঁকা ছাঁদের হাতের লেখা দেখলেই ভুলে না যায়, এমন অধ্যাপক কে আছেন?' আর একজন জোগান দিলে, 'এই তো সেদিন দেখলুম ডক্টর কর মিস দত্তর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিগলিত হ'য়ে কথা কইছেন।' পরীক্ষকদের উদ্দেশ্য ক'রে আরো যে-সব কথা মুখ থেকে মুখে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো, এখানে তার পুনরাবৃত্তি না-করাই ভালো।

অম্বিকাচরণ পার্থপ্রতিমকে গিয়ে বললে, 'কী বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেলো মশাই।'

'বিশ্রী আর কী। যে-কোনো একজন তো পেতোই।'

'আমরা কিন্তু বরাবরই ভাবতুম আপনার চান্সই—'

'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলুম আমার লেখাটা তেমন ভালো হয়নি।'

অম্বিকাচরণ হতাশ হয়ে ফিরে গেলো। সে ভেবেছিলো পার্থপ্রতিম রাগে ফেটে পড়বে, আর সে পরোক্ষভাবে মিটিয়ে নিতে পারবে তার নিজের মনের ঝাল। মনে-মনে বললে, 'ধন্যি লোক! হেরে যাবেন, তবু ওঁর মান ষোলো আনা বজায় থাকা চাই।'

পার্থপ্রতিমের এই অভাবনীয় পরাজয় অধ্যাপকমহলেও আলোচিত হ'লো। কয়েকটা মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি :

'আমার বরাবরই মনে হয়েছে, পার্থ ছেলেটা একটু সুপারফিশল।'

'হ্যাঁ, যাচাই করে দেখতে গেলে ওর অনেকটাই ফাঁকি।'

'ফাঁকি দিলেই যার চলে, সে যদি ফাঁকি না দেয়, তাহ'লে তাকে বোকা বলতে হয়।'

'এত অনায়াসে এমন গুছিয়ে লেখবার ক্ষমতা আমি তো এই প্রথম দেখলুম।'

'চীফ ফ্যাসিলিটি! তাড়াতাড়ি লিখতে পারে ব'লেই বড্ড তাড়াহুড়ো করে।'

'ওর দোষ এই যে ও কেয়ার করে না। কখনো সীরিয়স হতে পারে না। একটু মন দিয়ে লিখলে ও-ই পেয়ে যেতো প্রাইজটা।'

শেষের উক্তিটি ডক্টর করের। মনে-মনে তিনি পার্থপ্রতিমকে একটু ভালোবাসেন। যদিও তিনি জানেন, তাঁর কোনো লেকচারের এক বর্ণও এ-পর্যন্ত পার্থপ্রতিমের কানে ঢোকেনি। বোধহয় সেইজন্যেই ভালোবাসতেন।

একদিন করিডর দিয়ে যেতে-যেতে পার্থপ্রতিমকে দেখতে পেয়ে তিনি তাঁকে ডাকলেন। ইংরেজিতে বললেন, 'দ্যাখো, দে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত তুমি প্রাইজটা পেলে না। আমরাই সবাই

আশা করেছিলুম—'

পার্থপ্রতিম বললে, 'এতে আর এমন কী এসে যায়।'

ডক্টর কর তবু গায়ে প'ড়েই বললেন, 'যে-ব্যক্তি পেয়েছে, তার লেখাটা এমন সম্পূর্ণ হয়েছিলো—তুমি বোধহয় তাড়াতাড়িতে—'

'সেই ব্যক্তির লেখা আমারটার চাইতে নিশ্চয়ই ভালো হ'যে থাকবে, 'পার্থপ্রতিম তাড়াতাড়ি জবাব দিলে।

সেই ব্যক্তি

এ-পর্যন্ত পার্থপ্রতিম আর শ্রীলতা কখনো বাক্যবিনিময় করেনি। কিন্তু ছুটি হবার আর দু-তিন দিন মাত্র যখন বাকি, হঠাৎ ওদের দেখা হয়ে গেলো লিফটে।

লিফটম্যান দরজা বন্ধ কবতে যাচ্ছিলো, একটু দূর থেকে দেখতে পেয়ে পার্থপ্রতিম তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ঢুকে পড়লো। ঢুকেই একেবারে শ্রীলতার মুখোমুখি। কোনো কথা না বললে ভালো দেখাতো না।

পার্থপ্রতিম বললে, 'একটা সুযোগ পেলুম আপনাকে কনগ্র্যাচুলেট করবার।'

'কী নিয়ে?'

'আপনার প্রাইজ। সত্যি আপনাকে প্রশংসা করতে হয়, যখন দেখা যাচ্ছে আমিও ওটার জন্যে চেষ্টা করেছিলুম।'

'আমাব ভাগ্য,' শ্রীলতা হেসে বলল, 'মানে, আপনি যে চেষ্টা করেছিলেন, সেটা আমার ভাগ্য।'

'কিন্তু ওটা আমি বলতে গেলে বাঁ হাত দিয়ে লিখেছিলুম।'

'আর সত্যি বলতে, আমার লেখাটা আমি নিজেই লিখিনি।'

মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লিফট থেমে গেলো। বেরিয়ে আসতে-আসতে পার্থপ্রতিম বললে, 'আপনার মুখের ও-মিথ্যেটা শুনে আমি কিছুমাত্র সান্ত্বনা পাবো না; কেননা, যে-কোনও লোক আমার চাইতে ভালো লিখবে, এ-চিন্তা আমার পক্ষে অসহ্য।'

শ্রীলতা হেসে উঠলো।—'যাই হোক, আপনাকেই ধন্যবাদ। আপনারই জন্য মনে করতে পারছি, ভয়ানক একটা-কিছু করে ফেলেছি।' দু-জনে ক্লাশের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে শ্রীলতা জিগ্যেস করলে, 'ছুটিতে কোথায় যাবেন, মনে করেছেন?'

পার্থপ্রতিম অনুভব করলো, মুহূর্তে তার মুখ একটু লাল আর গরম হয়ে উঠেছে। এ-প্রশ্নের মানেই এই, আমি তো গরম পড়লেই পাহাড়ে চ'লে যাই—আপনিও নিশ্চয়ই তা-ই? এদিকে পার্থপ্রতিম তো এ-পর্যন্ত দার্জিলিং চোখে দেখেনি। যে-কোনো জিনিস, যে-কোনো কথা—যতই পরোক্ষভাবে, যতই অনুদ্দিষ্টভাবে হোক, ইঙ্গিত করে তার দারিদ্র্যের দিকে, মনে করিয়ে দেয়, সে গরিব—তা-ই সে অত্যন্ত অপছন্দ করে, তার পক্ষে তা একটা বিশ্রী অস্বস্তি। সে ভুলে থাকতে চায়, সে সত্যি ভুলে থাকে যে সে গরিব। কারণ, পার্থপ্রতিম জানে, গরিবিয়ানা তাকে মানায় না। সে যে-রকমের লোক, তার সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দকেই মেলানো যায়। নিজেকে সে কখনো ভাবতে পারে না গরিব বলে। গরিব—এই কথাটার মধ্যেই কী হীনতা, কী অসহ্য অপমান। পার্থপ্রতিম তার জীবনকে বেঁধেছে তার সত্যিকারের অবস্থার অনেক উপরে—তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে কথা কয়, চলাফেরা করে। সেটাকে ভান বললে ভুল হবে, সেটাই তার মেজাজ। যদি কখনো বাইরের কোনো কারণে সে মনে করতে বাধ্য হয় যে তার ব্যয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত পরিমিত, তাহ'লে মেজাজে ঘা

লাগে, সেটা সহ্য হয় না।

'কোথাও যাবো না, এখানেই থাকবো,' স্পষ্ট গলায় পার্থপ্রতিম বললে।

'আমাকে বোধহয় দার্জিলিং যেতে হবে শিগগিরই। ভালো লাগে না আর দার্জিলিং।'

কথাটা শ্রীলতা বলেছিলো নেহাৎ সাধারণভাবে, নিছক একটা উক্তি হিসেবে; কিন্তু পার্থপ্রতিমের মনে তা খচ করে বিঁধলো। তার কানে সেটা শোনালো কিছু গায়ে-পড়া গোছের—যেন তাকে শুনিয়েই বলা। আমার কাছে তো দার্জিলিং প'চে গেছে—আর আপনি যে সেখানে যাবেন না, তা ইচ্ছে ক'রে নয়, যেতে পারেন না ব'লে। কিন্তু শ্রীলতার দার্জিলিং আর ভালো লাগে না, এটা সত্যি কথা মাত্র, আর পার্থপ্রতিমের ঘরের খবর জানবার কোনো উপায়ই তার নেই। কিন্তু এমনিই হয়। যেখানে নিজেদের সম্বন্ধে টনটনে সংকোচ, সেখানেই আমরা মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলি; যেখানে আমাদের মন সবচেয়ে দুর্বল, সেখানেই সবচেয়ে বেশি ভুল বোঝা। 'ভালো যদি না লাগে,' অনাবশ্যক জোর দিয়ে পার্থপ্রতিম ব'লে ফেললো, 'তাহলে কেন যাচ্ছেন?'

'তাই তো! ঠিক বলেছেন। অভ্যেস—তাছাড়া আর কী।' শ্রীলতা আরও বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রোফেসর এসে পড়লেন; দুজনে ঢুকে পড়লো ক্লাশে।

পার্থপ্রতিমের মনে একটা খচখচানি র'য়েই গেলো—যেন শ্রীলতাকে বলবার আরো কথা তার ছিল, যা বলতে না পারা অস্বস্তিকর। ক্লাশ শেষ হ'য়ে যাবার পর সে খুঁজে বার করলো শ্রীলতাকে। বললে, 'একটা কথা জিগ্যেস করি, যদি কিছু মনে না করেন।'

'কী কথা?'

'তখন কেন আপনি ও-মিথ্যে বললেন যে ওটা আপনার নিজের লেখা নয়?'

'সবাই তা-ই বলছে যে।'

'সবাই—কারা?'

'এই—ছেলেরা।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'পেরেছি জানতে।'

পার্থপ্রতিম প্রতিবাদ করলে না, চুপ করে রইলো। ছেলেদের স্বভাব জানে সে। স্ত্রীজাতির চ্যাম্পিয়ন তারা। বাস্-এ একটি মেয়ে উঠলে চারজনে জায়গা ছেড়ে দেবে। দৈবক্রমে কোনো ভদ্রলোক মেয়ের পাশে ব'সে পড়লে তাঁকে অপমান করতে ছাড়বে না। শিভালরি ফুটছে তাদের রক্তে টগবগ করে—কার সাধ্য চাপা দিয়ে রাখে। তাদেরই মানায় এ-কথা রটানো! উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো মেয়ের জয় তারা সহ্য করবে কী করে? মেয়েরা যে তা'হলে প্রায় পুরুষই হয়ে উঠলো তাহ'লে কাকে আর জায়গা ছেড়ে দিয়ে তারা জীবন ধন্য করবে?'

একটু পরে শ্রীলতা বললে, 'আপনি অত গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন? ও কথা ভাবতে যদি কারো ভালো লাগে তো ভাবুক না; ক্ষতি তো হচ্ছে না কোনো। তাছাড়া, একটু রাগ তো হতেই পারে আমার উপর—সেটা এমন কী অন্যায়। আর, ওদের মনে যে এতটা লেগেছে, তার কারণ অবশ্য এই যে আপনি হেরে গেলেন, এটা ওরা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।'

পার্থপ্রতিম সোজা শ্রীলতার চোখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলো; তারপর বললে, 'যদি কারো কাছে আমাকে হারতেই হ'তো, আপনার কাছে যে হেরেছি, এইটেই সুখের কথা।'

'ভালোই হ'লো যা হোক আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে,' শ্রীলতা আলাপের মোড় ফেরাবার চেষ্টা করলে।

'কেন? যেহেতু বুঝতে পারবেন, আমার দৌড় কতদূর?'

'তা যদিও হয়ও, উদ্দেশ্যটা অসৎ নয়। তাছাড়া, রাইভলদের মধ্যে বন্ধুতা থাকা খুব দরকার।'

'বন্ধুতা কি আর ইচ্ছে করলেই হয়।'

'দু-পক্ষ ইচ্ছে করলেই হয়।'

পার্থপ্রতিম কিছু বললে না। শ্রীলতা আপাতত অকারণে হেসে ফেলে বললে, 'ব'লেই ফেলি সত্য কথাটা। এখানে এসে অবধি চারদিকেই আপনার কথা শুনছি। একেবারেই আলাপ না-হ'লে বিশ্রী হ'তো।'

'আমারও খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা ব'লে।'

আলাপটা ভদ্রতার বাণী-বিনিময়ের দিকে ঝুঁকছিলো, হঠাৎ থেমে গেলো। পার্থপ্রতিম মনে-মনে ভাবছিলো, এইবার সে বিদায় নেবে কিনা, এমন সময় শ্রীলতাই আবার কথা পাড়লো, 'মাঝখানে তো দু-ঘণ্টা ছুটি—কী করবেন?'

'আমি বাড়ি যাব।'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'ভবানীপুরে।'

'ভবানীপুরে কোথায়?'

পার্থপ্রতিম রাস্তার নাম করলে।

'আমার বাড়ির কাছেই তো তাহ'লে। আমিও যাবো, চলুন।'

'কিন্তু আমি তো বাস্-এ যাব।'

'আমিও আজ তা-ই।'

বাস্-এ উঠে শ্রীলতা জিগ্যেস করলে, 'আদিত্য' কাগজে যে 'মূর্ছা' নামে একটা গল্প দেখলুম, সে কি আপনার লেখা?'

'হ্যাঁ, আমারই।'

'ও-গল্প আপনি কেন লিখতে গেলেন?'

'কেন, কী হয়েছে?

'কিছুই হয়নি।'

'কিছু হবে ব'লে তো ওটা লিখিনি।'

'তাহ'লে কেন লিখেছিলেন?'

'কেন? নিজের খুশির জন্য—তাছাড়া আর কী? আপনি যে-কারণে সাজগোজ করেন, আমিও সে-কারণে লিখি।'

'তার মানে? আমি সাজি তো যাতে অন্যের চোখে পড়তে পারি। তাহ'লে আপনি লেখেন নামের জন্য?'

'আপনি অন্যের চোখে পড়বার জন্য সাজেন, এ-কথা আপনাকে কে বলল? আপনার সাজটা হচ্ছে মনের ঘুরে বেড়াবার খানিকটা ফাঁকা জায়গা, আমার লেখাটাও তা-ই। দুটোই মনের পেখম-তোলো গোছের ব্যাপার।'

'উপমা কিন্তু গুলিয়ে গেলো।'

'দুঃখিত। কিন্তু আপনি, আশা করি, উপমা গুলিয়ে না-ফেলবার আর ইনফিনিটিভকে দ্বিখণ্ডিত না-করবার চেষ্টাতেই নিজেকে নিঃশেষ ক'রে ফেলেন না?'

পার্থপ্রতিমের চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রীলতা একটু হাসলো।—'নিয়ম ভাঙবার গৌরব আমার মতো লোকের জন্য নয়। সেটা মস্ত বড়ো দায়িত্ব।'

পার্থপ্রতিমের মনে হ'লো, লঘু পরিহাস থেকে শ্রীলতার গলায় হঠাৎ অন্যরকম সুর বেজে উঠলো। সে কোনো কথা বললে না। বাস্ ছুটে চলল বৌবাজারের সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে পুরো দমে। হঠাৎ তার খেয়াল হ'লো, বাস্-এর যাত্রীরা সবাই চুপচাপ—এতোগুলো লোকের মধ্যে তারা দু-জনই শুধু কথা কইছিলো। তাছাড়া আর কেউ কাউকে চেনে না। অতি সাধারণ ব্যাপার; রোজই

দেখি, কোনোদিন চোখে পড়ে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে পার্থপ্রতিমের কাছে তা নতুন লাগলো, আশ্চর্য লাগলো। মনে হ'লো, কী ভাগ্য আমার, আমি যার পাশে ব'সে, আমি তাকে চিনি, কথা বলতে পারছি তার সঙ্গে।

শ্রীলতাই আবার বললে, 'আমার মতো মানুষকে ছোটোখাটো যে-সব কাজ দেয়া হয়, তা যদি লক্ষ্মী ছেলের মতো ক'রে উঠতে পারি তা-ই যথেষ্ট। সম্প্রতি আমার কাজ হচ্ছে এম.এ. পাশ করা। বলতে পারেন, কী করলে পাওয়া যায় ফার্স্ট ক্লাশ?'

'কিছু না-ক'রেই আপনি পাবেন।'

'সে তো বুঝলাম,' শ্রীলতা হেসে বললে, 'কিন্তু একটা কথা ঃ থ্যাকারের সবগুলো নভেল কি পড়তেই হবে?'

'যদি প্রচুর সময় থাকে তো মন্দ কী?'

'সময়ের ছড়াছড়ি, তবে—' বলে শ্রীলতা চুপ করলো।

'তবে? আর কোনো আনন্দ না পান, রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, শেষ করবার আনন্দ তো পাবেন।'

'আনন্দের জন্য কেউ পরীক্ষা পাশ করে?'

'তা-ই বা নয় কেন? যদি মনে করেন ভার, তা'হলে শুধু বইয়ের চাপে মারাই পড়বেন; আর ভালো যদি লাগাতে পারেন, দেখবেন, কিছু গায়েই লাগছে না।'

'কিন্তু ভারই তো—তা ছাড়া আর কী? বিষম এক দায়—কোনোরকমে সাবতে পারলে বাঁচি।'

'পার্থপ্রতিমের একটা দোষ ছিলো যখন যে-কথা তার মনে হ'তো সহজে সে সেটা ছাড়তে চাইতো না, পল্লবিত ক'রে প্রজাপতি-লঘুতায় উড়ে যেতে চাইতো কথা থেকে তৎভব কথায়। দোষ বলছি এই জন্যে যে তাতে ক'রে সামাজিক আলাপের মসৃণতায় বিঘ্ন ঘটে। সে ভালোবাসে তার মনের ভাবের উপর একটু-একটু ক'রে রং চড়াতে—ভালোবাসে সেই রং, যা হচ্ছে গিয়ে কথা। সুতরাং, 'আমি দেখেছি,' সে বলতে লাগলো, 'কোনো কাজ ভালো লাগলেই ভালো ক'রে করা যায়। কিন্তু আজকালকার কথা হচ্ছে কোনোরকম কিছু না-লাগাই তারই নাম এফিসিয়েন্সি।'

'ও সব কথা পরে হবে, 'এক হাতের তেলোর অন্য হাতের আঙুলের ডগগুলো একবার চালিয়ে নিয়ে শ্রীলতা বললে, 'সম্প্রতি ফার্স্ট ক্লাসে পৌঁছবার একটা সোজা উপায় থাকে তো ব'লে দিন। প্রোফেসরদের বক্তৃতা যতই শুনছি, ততই যেন আমার মাথার মধ্যে সব এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে। আগে যে-সব জিনিস খুব সোজা ছিলো, অন্তত তা-ই মনে করতুম, আজকাল তা-ই ঠেকছে ধোঁয়াটে। ক্রমেই মনে হচ্ছে, কিছুই ঠিকমতো বুঝতে পারছি না।'

পার্থপ্রতিম হেসে উঠলো—'শক্ত জিনিসকে সোজা করতে গেলে ভুল করবার বিপদ আছে, প্রোফেসররা তার ধার দিয়েও যান না। তাঁরা যা করেন, তা হচ্ছে সোজা জিনিসকে অসম্ভব রকম শক্ত করে তোলা। তাতে মান বজায় থাকে। ছাত্র কিছুই বুঝতে না-পেরে মনে-মনে মাস্টার মশাইকে অনেক বাহবা দেয়। তাছাড়া, সেটা নিরাপদ। কেননা, যে-জিনিসের কোনো মানেই হয় না, তাতে ভুল ব'লে কিছু নেই।'

শ্রীলতা বললে, 'আচ্ছা, সত্যিই কি শেলির কবিতায় অমন ভালো-ভালো সব তত্ত্ব লুকোনো আছে?'

'পি.এইচ.ডি.-দের খাতিরে, অন্তত। তা না-হ'লে তারা থাকে কোথায়?'

এর পর খানিকক্ষণ তারা ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পেশাদারি আলাপ করলে। যাকে বলে গিয়ে শপ্। বাস্ পড়লো এসে চৌরঙ্গিতে। উইলিয়ম মরিস যে সত্যিকার ভালো কবি—এবং আজকালকার যে-সব চমকওলারা আর কোনো বিষয়ে নতুন কিছু করতে না-পেরে পদ্য লিখছে গদ্যের মতো

ক'রে, কি আজগুবি ঢঙে সাজাচ্ছে লাইনগুলো, তাদের পিছনে না-ছুটে মরিস পড়লে যে আমরা ঢের ভালো করবো—এ-সব কথা বলবার মাঝখানে পার্থপ্রতিম হঠাৎ থেমে গেলো। হঠাৎ তার মনে হ'লো, কেন বলছি এ-সব, কী এসে যায় এ-সব কথায়? মনে হলো যেন সে বড়ো বেশি চেঁচিয়ে কথা বলছিলো বড়ো বেশি উৎসাহ ছিলো তার কণ্ঠস্বরে। বোধহয় শ্রীলতা ভালো করে শুনছিলোও না।

একটা কথা আরম্ভ ক'রে সেটা ভালোরকম শেষ না-ক'রেই পার্থপ্রতিম থেমে গেলো, কিন্তু শ্রীলতা যেন তা লক্ষই করলে না। সে রইলো চুপ করে, মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। চৌরঙ্গি তে কেউ বড়ো একটা নামে না; বাস্ একটানা ছুটে চলেছে, এঞ্জিনের একঘেয়ে আওয়াজ শুনতে-শুনতে যেন ঘুম পেয়ে যায়। পার্থপ্রতিমও চুপ করে রইলো, আর ভুলে গেলো সে চুপ করে আছে।

থিয়েটার রোডের কোণে পুলিশের উত্তোলিত বাহুর সামনে বাস্ থামল। তখন শ্রীলতা তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলে রাস্তা থেকে, পার্থপ্রতিমের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনার সঙ্গে আরো আগে কেন আলাপ হলো না?'

পার্থপ্রতিম বললে, 'আমিও তা-ই ভাবছিলাম।'

সত্যি বলতে, সে জানতো না সে এতক্ষণ কী ভাবছিলো। কিন্তু শ্রীলতার মুখে ও-কথা শুনেই তার মনে হ'লো—না, সে বুঝতে পারলো যে তা-ই ভাবছিলো। শ্রীলতা যদি ও-কথা না বলতো, তাহলে সে তা বুঝতে পারতো না। এমন হয় প্রায়ই। আমাদের মনের কথা যখন শুনি অন্য একজনের মুখে, তখনই আমরা জানতে পারি, কী ছিলো আমাদের মনে।

মিনিট সাতেক পরে পার্থপ্রতিম বললে, 'আমি নামবো এখানে।'

'আমিও,' বলে শ্রীলতা উঠে দাঁড়িয়ে দড়ি ধরে টানলে।

পার্থপ্রতিমের বাড়ির রাস্তা দিয়েই যেতে হয় শ্রীলতার রাস্তায়। বাড়ির দরজায় এসে সে অনির্দিষ্টভাবে থেমে গেল। 'এই বাড়ি আপনার?'

'হ্যাঁ।' এর পর একটু চুপ ক'রে থেমে পার্থপ্রতিম যদি একটা বিশেষ সুরে বলতো, 'আচ্ছা,' ব'লে বাড়ির ভিতর ঢুকে যেতো, তাহ'লেও চলতো; কিন্তু সেটা হয়তো খুব ভালো দেখাবে না—তাই সে অপেক্ষা করলো। শ্রীলতারও ভাব দেখে মনে হলো যেন সে এক্ষুনি বলবে ঃ 'চলুন না আপনার বাড়িটা একবার দেখে আসি।' কিন্তু তা হতে পারে না, সে তা হতে দিতে পারে না। কেন? এটা তার স্বজ্ঞার স্বতঃস্ফূর্ত নির্দেশ। এর কোনো যুক্তি নেই—তখনকার মতো অন্তত ছিলো না।

(যদি পার্থপ্রতিম পরে ভেবে দেখে থাকে, তাহ'লে সে বুঝেছে যে কারণটা হচ্ছে নিজের উপর তার এই তীব্র চাপা রাগ যে সে—যে-কথাটাকে সে ঘৃণা করে, তা আর ব্যবহার করলুম না, যে তার বাইরের জীবনের যা সত্যিকার রূপ, তার মনের গড়নের সঙ্গে তার মিল নেই। টাকা, এটুকু সে বুঝতে শিখেছিলো, মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা মস্ত ব্যবধান, একটা অদৃশ্য দেয়াল, যা অনিবার্যরূপে বাধা দেবে কোনো সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধস্থাপনে। মানুষের মনের বিচরণ করবার যে-সব সাধারণ ক্ষেত্র, যা সমাজের, কোনোরকম ব্যক্তিগত বিবেচনার বাইরে, সেখানেও—হ্যাঁ, সেখানেও সেই অদৃশ্য দেয়াল, সেখানেও ঠিক মেলে না, কোথায় যে-অস্বস্তির কাঁটা ফুটে থাকেই। মানুষ, আমরা যা-ই বলি না কেন, সাধারণত তার দৈনন্দিন জীবনের প্রণালী দিয়ে নিয়ন্ত্রিত; সেখানে যদি মোটা বৈষম্য থাকে, অন্য সব জিনিস একত্র করেও সে-ফাঁক ভরানো সহজ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে-লোক নিজের গাড়ি নিয়ে যথেষ্ট বিচরণ করছে, আর যে-লোকের অনেক সময় মুদি-দোকান থেকে বাস্-ভাড়ার পয়সা ধার করতে হয়—এ দু-জনের বন্ধুতার পথে অনেক প্র্যাকটিকাল বিঘ্ন আছে।

পার্থপ্রতিমকে দু-একটি ধনীপুত্রের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে—অত্যন্ত ভদ্র তারা, বিনয়ী,

মধুভাষী—বড়ো বেশি ভদ্র, বড়ো বেশি বিনয়ী। পাছে অজান্তে কোথাও কোনোরকম ঘা দিয়ে ফেলে, যেন এই ভয় তাদের মনে। কারণ তারা জানে যে তাদেরই ক্ষমতা আছে ঘা দেবার। সুতরাং সৌজন্যের বাড়াবাড়ি। আর সেই বাড়াবাড়ি হচ্ছে একরকমের সূক্ষ্ম পিঠ-চাপড়ানো, আর পার্থপ্রতিম কিছুতেই কাউকে তার পিঠ চাপড়াতে দেবে না। সে-জিনিসটা সে ঘৃণা করে সবচেয়ে বেশি। কেউ হয়তো বলবেন, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স; নিজেকে নিজেই ছোটো ব'লে ভাবা, তাই সব সময় এই ভয়, কেউ বুঝি আমাকে ছোটো করলে। তা হ'তে পারে; আবার, নিছক আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও হ'তে পারে। একজন, শেষ পর্যন্ত, সম্পূর্ণই থাকতে চায়, থাকতে চায় তার নিজত্বের চক্রের মধ্যে আবদ্ধ। পার্থপ্রতিম, যা-ই হোক, 'বড়োমানুষ' ব'লে যে এক জাত আছে, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারলেই বাঁচে মনে-মনে তাদের সে ভয় করে—ভয করে তাদের বড়ো বেশি বিনয়ী, বড়ো বেশি ভদ্র পিঠ-চাপড়ানোকে, ভয় করে এবং ঘৃণা করে। বিনয়ের অবতার এরা, মধু-র ঝরনা! তাদের কথা ভাবলে পার্থপ্রতিমকে ঢোক গিলতে হয়। এতই রাগ।

রাগটা অবশ্য তার নিজের অবস্থাব উপর—রাগ, এ-জন্য নয় যে সে সেই শ্রেণীর লোক নয়, পয়সার টানাটানি হ'লে যারা রেলগাড়ির সেকেণ্ড ক্লাশে চড়ে—ধনীকে ঈর্ষা-রূপ গণমনের পাপ থেকে সে একেবারে মুক্ত ছিলো না। না, খুঁতখুঁত করা, নালিশ কবা, আব সেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নালিশকে বিবিধ যুক্তিতর্কে সাজিয়ে সমগ্র মানবজাতিব কান্না-হিসেব উপস্থাপিত কবা—এ-সব তার মাথায কখনো আসে না, তার স্বভাবেই নেই এ-সব। যে যা, তা-ই নিয়েই সে বেশ সুখী, তার কোনো অভাব নেই; অন্তত, আছে ব'লে ভাবে না। তার বাগ এই জন্য যে নিতান্ত দৈব, বাইরের, এবং তার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণ অবান্তর একটা ব্যাপাবে তার মনেব একটা জায়গা কাঁচা থাকবে, কারণ, পার্থপ্রতিমের এতটা বুদ্ধি আছে যে তার নিজের মনও তাকে ফাঁকি দিতে পারে না; সে বেশ বুঝতে পারে—ইচ্ছে করে না-বুঝে থাকে না—তার মনেব আসল ভাবখানা কী। সে অপছন্দ করে সেই দুর্বলতাকে, যা টানটান করে ওঠে সেই অদৃশ্য দেয়ালেব সঙ্গে কখনো ধাক্কা লাগলে। সে দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হ'তে চায় না সে। সে চায় নিজের মনে, নিজের জগতে থাকতে—যেখানে তার স্পর্ধা আগুনের শিখার মতো, যেখানে তার ক্ষমতায় সে স্বাধীন। এমন কোনো সংস্পর্শ সে স্বভাবতই এড়িয়ে চলে, যা তার মনের সেই কাঁচা জায়গায় ঘা দিতে পারে)

কয়েকটা অনির্দিষ্ট মুহূর্ত কাটলো—অস্বচ্ছন্দ। শ্রীলতার চোখের আলোয় যেন ভেসে উঠছে কথা। পাছে সে সত্যি-সত্যি কথাটা বলে ফেলে, পার্থপ্রতিম তাড়াতাড়ি বললে, 'চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'আর কে আছে আপনার বাড়িতে?' হাঁটতে-হাঁটতে শ্রীলতা জিগ্যেস করলে।

'মা।'

'আর?'

'আর কেউ না।' পার্থপ্রতিম অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করছিলো। তার ব্যক্তিগত জীবনে কেউ উঁকি দেবে, এটা সে পছন্দ করে না। সে যা, সে তা-ই; লোকে তাকে তা-ই ব'লে গ্রহণ করবে, কোনো সাংসারিক, কোনো পরিবারগত সম্পর্কের পটভূমিকা বাদ দিয়ে, এই তার ইচ্ছা। এর পরে শ্রীলতা কী জিগ্যেস করবে—সে ভেবে অবাক হ'লো।

মিটারের খটখট আওয়াজ করতে-করতে একটা ছেঁড়াখোঁড়া ট্যাক্সি চ'লে গেলো তাদের গা ঘেঁষে। অন্য কথা পাড়বার একটা সুযোগ পেয়ে খুশি, পার্থপ্রতিম বললে, 'চলুন পেভমেন্টে ওঠা যাক। এটা হাত কি পা ভেঙে বসায় কোনো মজা নেই।'

'আপনিও,' হঠাৎ শ্রীলতা বললে, 'একবার আসুন না দার্জিলিং।'

'কিন্তু কলকাতার দারুণ গ্রীষ্মই যে আমি ভালোবাসি,' পার্থপ্রতিম হেসে উঠলো।

'বরফও ভালোবাসবেন...আশা করি। একটা বাড়ি আছে, আমরা সেখানেই উঠি, দাদার এক

বন্ধু...' যেটুকু বলা হ'লো না, বোঝা গেল।

'আপনি কি সারা ছুটিটাই থাকবেন?'

'তা-ই তো কথা হচ্ছে।—আসবেন একবার? জায়গাটা অবশ্য নানারকম বাজে লোকে ভরতি; কিন্তু পাহাড়গুলো—সত্যিই সুন্দর। আর ফুলগুলো নেশার মতো।'

নেশার মতো! কথাটা হঠাৎ পার্থপ্রতিমের কল্পনাকে নাড়া দিয়ে গেলো; সে তার চোখের সামনে দেখতে পেলো এক আশ্চর্য সুন্দর দার্জিলিং—ফুলের রঙে-রঙে সমস্ত আকাশে যেন নেশা ধ'রে গেছে। সেই আকাশের নিচে, শাদা বরফে ঠিকরে-পড়া গোলাপি সূর্যাস্তের মাঝখানে—কী রহস্য, বাসনার কোন অস্পষ্টশ্রুত গুঞ্জরণ। পার্থপ্রতিমের কল্পনা বেশামাল হ'য়ে উঠলো। একটা গল্প, একটা সম্পূর্ণ গল্প উন্মুক্ত হ'লো তার মনে; সোনালি-নীল শহরে এক গ্রীষ্মযাপন, জীবনের একটা অবান্তর মধ্য পরিচ্ছেদ, রঙিন কতগুলো মুহূর্ত-সন্নিবেশ মিলে একটি আলোর রেখা। একটা ভালোবাসার গল্প, নিশ্চয়ই। সন্ধ্যার আবছায়ায়, কোনো রাস্তার মোড়ে, গাছের নিচে গোপন সম্মিলন; তাড়াতাড়িতে, পাগলামিতে লেখা সব চিঠি; বিছানায় চুপচাপ শুয়ে-শুয়ে কী মধুর কী অস্থির, কী প্রশান্ত ঘুম না-আসা; রাত্রির গভীরতায় রুদ্ধশ্বাসে উচ্চারিত সব কথা, অনুচ্চারিত সব কথা। একেবারে পুরো একটি গল্প—এখন শুধু লেখার অপেক্ষা। কোনো একদিন পার্থপ্রতিম এটা লিখে ফেলবে,—শিগগিরই। নয়তো হঠাৎ অন্য কোনো গল্প লাফিয়ে উঠবে তার মনে—এটা যাবে স'রে, চাপা প'ড়ে যাবে তলিয়ে—তারপর, অলক্ষিত, চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে সেই অজ্ঞাত অন্ধকারে, যেখানে সব বিস্মৃত চিন্তা, সব খণ্ডিত কল্পনার রাশীকৃত ভগ্নাংশ। হারিয়ে যাবে—আর, সে একবার মনেও করবে না, কখনো সেটা তার মনে ছিলো। কল্পনার হঠাৎ-আলোয় এই মুহূর্তের বিদ্যুৎ-উন্মেষ—সমস্ত জীবনের মতো এ-ই হবে লাভ।

'কিছু বলুন।'

পার্থপ্রতিম চমকে উঠলো, তারপর অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লো। 'দেখি, যদি যাওয়া হ'য়ে ওঠে—' অস্পষ্টভাবে সে বললে।

'দেখতে-দেখতে সময় চ'লে যাবে,' শ্রীলতা হেসে ফেললো। 'আসল কথা, আপনার ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে থাকলে সবই হয়; ইচ্ছে না-থাকলে কিছুই হয় না।'

'ইচ্ছে থাকলেও হয় না এমন জিনিসও আছে।'

'ইচ্ছে থাকলেই সব করা যায়—যদি সে-ইচ্ছার যথেষ্ট জোর থাকে।'

পালিত স্ট্রীট দিয়ে তারা রিচি রোডের মোড়ে এসে পড়লো। পার্থপ্রতিম বললে, 'আমি ফিরি এবার।'

'ঐ লাল বাড়িটা আমাদের। দু-মিনিটের জন্য আসবেন? চা খেয়ে যান না।'

'না, না,' পার্থপ্রতিম তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'আমি ফিরি।' ভিতরে-ভিতরে সে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ছিলো। তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে—তারও কি উচিত ছিল না এ-কথা বলা? শ্রীলতাকে একটু চা খেয়ে যেতে মৌখিক অনুরোধ করা? কিন্তু মুশকিল এই, শ্রীলতা হয়তো সে-অনুরোধ রক্ষা ক'রেই বসতো। 'আমি ফিরি', সে আবার বললে।

শ্রীলতা পিড়াপিড়ি করলে না। 'আচ্ছা, আপনাকে আর ধ'রে রাখবো না। কাল দেখা হবে ইউনিভার্সিটিতে। অনেক ধন্যবাদ।'

'কিছুমাত্র নয়', ব'লে পার্থপ্রতিম ফিরতে যাচ্ছিলো, শ্রীলতা বললে, 'একটা কথা। কাল শুক্রবার, দেড়টায় ছুটি—না?'

'তা-ই তো বোধ হচ্ছে।'

'ছুটির পর কাল কোথাও গিয়ে একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে—কী বলেন?'

'বেশ তো।'

'অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করা যাবে—কেমন?'

কিন্তু পরদিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পার্থপ্রতিম শ্রীলতাকে দেখতে পেলো না। মেয়েদের কমনরুমের বেয়ারার কাছে খোঁজ নিয়ে জানলো, মিস দত্ত আজ আসেননি। বাড়ি ফিরে এসে দেখলো, টেবিলের উপর অপেক্ষা করছে এক চিঠি। তার মা বললে, বেরিয়ে যাবার একটু পরেই একজন লোক এসে দিয়ে গেছে এটা। পুরু, হলদে রঙের খাম খুলে সে পড়লো :

'এইমাত্র ঠিক হ'লো আজই যেতে হবে দার্জিলিং। সুতরাং ইউনিভার্সিটিতে না-গিয়ে বেরোতে হচ্ছে দরকারি জিনিস-পত্তর কিনতে। (সমস্যা : প্রতিবারই কেন নতুন ক'রে জিনিস কিনতে হয়? But where are the snows of yesteryear?) (তারপর বাক্সের প্যাকিং প'ড়ে রয়েছে—সে এক ব্যাপার। কেন যে মানুষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়! মাঝখান থেকে আমাদের চা-টা মাঠে মাবা গেল। অত্যন্ত দুঃখিত। ফিসে এসে আবাব দেখা হবে।

শ্রীলতা'

ফিরে এসে। সমস্ত গ্রীষ্মের ছুটি। তিন মাস! কি দীর্ঘ সময় তিন মাস!'

শ্রীলতার বাড়িতে এক সন্ধ্যা

কেটে গেলো তিন মাস—আমার কলমের এক আঁচড়ে; কেটে গেলো একটা দ্রুত কম্পনের মতো, জলের উপর মেঘের ছায়ার মতো। দার্জিলিঙের পাহাড় থেকে পাহাড়ে কালো হ'য়ে নামলো বর্ষা, শ্রীলতা উঠে বসলো কলকাতার গাড়িতে, ইউনিভার্সিটি খুললো।

জানি, এমন বুদ্ধিমান পাঠক আছেন, যিনি বলবেন, 'বা, এ যে ফাঁকি! কী ক'রে কাটালো তিন মাস, তা বলো।' তিনি পড়েছেন সমালোচনার অনেক ভালো-ভালো কেতাব; জানেন সাহিত্যের সব কানুন; খপ ক'রে ধ'রে ফেলতে পারেন, কোথায় ফাঁকি দিলে লেখক। নিজের মনকে যদি বা খুশি করা যায়, তাঁর চোখে ধুলো দেয়া যায় না।

বলি তবে। এ-ক'মাস শ্রীলতা দেখেছে বরফের গায়ে রঙের খেলা; চা খেয়েছে জিমখানা ক্লাবে গিয়ে, দেখেছে নাচ, কখনো নিজেও হয়তো দু-এক পাক ঘুরেছে; কাঠের জুতো প'রে চর্কিপনা করেছে বরফের মেঝের উপর, যাকে বলে স্কেটিং, মন-খারাপ করেছে টেনিসে হেরে গিয়ে; আর-কিছু হাতে নেই, পিয়ানোয় ব'সে করেছে টুংটং, হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, কলকাতার বন্ধুকে আরম্ভ করেছে এক চিঠি, হয়তো উঠে এসেছে শেষ না-ক'রেই। আর পার্থপ্রতিম টেবিলের উপর জড়ো করেছে সাহিত্যের যে-সব শ্রেষ্ঠ কীর্তি বহুদিন থেকে সে নিজের কাছে প্রতিশ্রুত পড়বে ব'লে; যেমন, রুসোর কনফেশন্স, আর বজওয়েল, আর প্যারাডাইজ রিগেনড আর এমনি সব; কোনোটা দেখেছে পাতা উলটিয়ে, কোনোটা পড়েছে দু-পাতা প'ড়ে, ফেলেছে রাজ্যের নভেল, চলতি কালের নতুন সব বই; অবাক হয়েছে, দুঃখিত হয়েছে নিজের আচরণে; তারপর একদিন ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বলেছে : 'এবার থাক, এর পরে যখন সময় পাবো—নিশ্চয়ই।' এর পরের বার সে কিছুতেই আর নিজেকে সাময়িক (বাৎসরিক, মাসিক।) খ্যাতির মোহে লুব্ধ হ'তে দেবে না; এর পরের দীর্ঘ অবসর সে কাটাবে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, শুধু তা-ই নিয়ে। তার মনে হ'তে লাগলো যেন এখনই যে-কোনো কথা উঠলে বজওয়েলের একটা না-একটা চুটকি গল্প লাগসই ক'রে বলতে পারে সে; যেন গ্রীক নাটকের স্বাদ পেয়ে আধুনিক সাহিত্যে তার একেবারে অরুচি ধ'রে গেছে। নিশ্চিন্ত, সে

খুলে বসলো ডি. এইচ. লরেন্সের মরবার পর ছাপা-হওয়া জিপসির গল্প।

এ-ই তো। কিন্তু আসল কথাটা তো র'য়ে গেলো এই যে ছুটি ফুরোলো, কেটে গেলো তিন মাস। জীবন চলে ঢিমে তালে, এলোমেলোভাবে; যখন যা হওয়া উচিত, তা হয় না; চলে না, একটানা যেমন চললে ভালো হয় দেখতে; মাঝে-মাঝে ছিঁড়ে যায় বিশ্রী ফাঁকে, এখানে-ওখানে খামকা ফাঁকা। গল্প লিখতে ব'সে আমি কেন তার নকল করতে যাবো? আমি তা-ই করবো, যাতে আমার সুবিধে হবে; একলাফে পার হ'য়ে আসবো মস্ত ফাঁক, ছেড়ে আসবো যাতে আমার দরকার নেই; আবার একদিনের কাহিনী লিখবো পাতার পর পাতা, যখন বুঝবো ঠিক সময়। যাতে ক'রে গল্পটা সাজাতে পারি মনের মতো। ঐ সাজটাই তো গল্প।

প্রথম যেদিন দেখা হ'লো দু-জনে ইউনিভার্সিটিতে মিনিটখানেক আলাপ হ'লো। পার্থপ্রতিম বললে, 'খুব ভালো ছিলেন আশা করি দার্জিলিঙে?'

'যেমন ভাবা গিয়েছিলো, ঠিক তেমনি। আপনি এখানেই ছিলেন?'

পার্থপ্রতিম মাথা নাড়লো। 'এবার মনসুনটা বড়ো দেরি করছে।'

'দার্জিলিঙে কিন্তু পেয়েছিলুম দু-এক পশলা বৃষ্টি।'

একে আলাপ বলে না, বলে আলাপ করা। সব জিনিসের যেমন, কথা বলারও একটা ঠিক সময় চাই, চাই মনের বিশেষ একটা সুর। এমন-যে একটা অতি সাধারণ ব্যাপার, একজনের সঙ্গে আর একজনের আলাপ, তারও জন্যে আমাদের নির্ভর করতে হয়—মনের কোন গোপন রহস্যের, নিহিত কোন শক্তি-উৎসেব উপর। ছুটির মধ্যে মাঝে-মাঝে পার্থপ্রতিমের মনে পড়েছে শ্রীলতাকে—পলাতক ছায়াব মতো, ঈষৎস্ফুট প্রতিধ্বনিব মতো ঃ যেমন সারাদিন ধ'রে কবিতা প'ড়ে রাত্রে বিছানায় শুতে গেলে ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে ঢেউ দিয়ে যায় সেই সুরের দোলা, ঝিকিমিকি কাঁপে ছন্দের ছায়া। বোঝা যায় না, এ কি সেই ছন্দেরই প্রতিধ্বনি ঘুমের ফাঁকে ছাড়া পেয়েছে, না কি এই মুহূর্তে আমার মন নিজেরই ভিতব থেকে সৃষ্টি করলো এই নতুন সুর। আমি কি জেগে-জেগে আউড়ে যাচ্ছি যা পড়েছি দিন ভ'রে, না কি স্বপ্নের মধ্যে আমারই অজান্তে কেঁপে উঠছে তার অনুরণন। হঠাৎ হয়তো চমকে জেগে উঠি; দেখি, সুর গেছে হারিয়ে। তেমনি অস্ফুট, ছায়া-পলাতক, পার্থপ্রতিমেব মনে শ্রীলতার চিন্তা ঃ স্পষ্ট একটা উপস্থিতি নয়, সব উপস্থিতির আড়ালে একটা সূক্ষ্ম সুর—যেমন রেলগাড়িতে অনেকক্ষণ ধ'রে যেতে-যেতে মনে হ'তে থাকে, প্রচণ্ড লৌহচিৎকার ছাপিয়ে বেজে উঠছে বিশ্বের অন্তর্লীন চিরন্তন সুর—যা তখনকার মতো রূপ নেয় আমারই পরিচিত কোনো গানের সুরের, ফেলতে পারি তাকে ইচ্ছেমতো যে-কোনো সুরের ছাঁচে ঃ কানের উপর দিয়ে ভেসে যায় গাড়ির চাকার ঘর্ষণরব; মন দিয়ে শুনি গানের সুর। পার্থপ্রতিম অস্পষ্ট প্রত্যাশায় তাকিয়ে ছিলো শ্রীলতার ফিরে আসার দিকে—কেন? তার নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই; শুধু যেন তার মনের সুরসঞ্চার ছাপিয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে নিজেরই বেগে। মাঝে-মাঝে সে ভেবেছে দার্জিলিঙে শ্রীলতাকে ঃ ফিরে-ফিরে এসেছে যে-গল্পটা সেদিন বিকেলে হানা দিয়েছিলো তার মনে; কখনো বা লোভ হয়েছে লেখবার। কিন্তু বড়ো যে অস্পষ্ট গল্প; মাঝে-মাঝে ছিটোনো তার ফুলের রং—একটা ছবি শুধু। সেই ছবিরই চারদিকে তার মন ঘুরে বেড়ায়, গল্প গ'ড়ে ওঠে না। যদি ভাবে লেখার কথা, বুঝতে পারে না, কী লিখবে। এখন থাক, দিন থেকে দিন সে ঠেলেছে, পরে—আরো পরে। কিন্তু ততক্ষণে গল্পটা একটু-একটু ক'রে স'রে গেছে তার মন থেকে—সমসাময়িক উপন্যাসের আবর্তে গেছে হারিয়ে। শ্রীলতা ফিরে এলো ঃ পার্থপ্রতিমের মনে হ'লো যেন অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করার মতো অনেক কথা জ'মে উঠেছে দু-জনের মধ্যে। তার মনে পড়লো যে শ্রীলতাও বলেছিলো ও-কথা। লিখেছিলো... সেদিন, কতদিন আগে। কিন্তু কাছাকাছি এসে দেখা গেলো, কোনো কথা বলবার নেই; ছন্দ গেছে কেটে।

কয়েকদিন পরে পার্থপ্রতিম পেলো সেই খশখশে হলদে কাগজে আর একটি চিঠি ঃ

'বন্ধুরা জেনে গেছে আমার প্রাইজ পাওয়ার খবর। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রাইজটা তারাই পেয়েছে—অন্তত আমি যে পেয়েছি, সে কৃতিত্ব তাদেরই। সুতরাং তাদের বলতে হয়েছে চায়ে—কাল বিকেলে। আপনি আসবেন। যদিও, সত্যি বলতে, খুব ভালো হয়তো আপনার লাগবে না। তবু আসবেন। পাঁচটার পরে যখন আপনার সুবিধে।

শ্রীলতা'

চিঠি প'ড়ে প্রথম পার্থপ্রতিমের মনে হ'লো, না-যাবার কোন অছিলাটা সবচেয়ে ভদ্রগোছের হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই, কেনই বা সে যাবে না, সে ভাবলো। চিঠিখানা সে আর-একবার পড়লো। না, যেতে তাকে হবেই। সত্যি বলতে, শ্রীলতা ঠিকই লিখেছে, খুব ভালো তাব লাগবে না। এ-সব চা-সম্মিলন কী ব্যাপার, সে জানে। আড়ষ্ট, নির্বাক, তাকে ব'সে থাকতে হবে ঘণ্টা দুই সময়; কোনোদিকে তাকাতে সাহস হবে না, পাছে কারো দিকে খুব বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা হ'য়ে যায়; চারদিকে ব'য়ে চলবে কথার স্রোত—এলিসা ল্যাণ্ডির ভুরু নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নবতম নৃত্যনাট্য নিয়ে (কেউ একজন কবির নিজেব মুখে শুনে এসেছে), সুমিতা রায়ের নাচ নিয়ে (সে ব'সে আছে দশ গজ দূরে), জয়ন্তী সেনের দ্বিতীয় স্বামী একবার চৌরঙ্গীর এক রেস্তোরাঁয় ভোজনান্তে কী অবিশ্বাস্য বখশিষ দিয়েছিলো, তা নিয়ে (জয়ন্তী সেন সহাস্যে যোগ দেয় সে-আলাপে), পেট্রলের উপর নতুন ট্যাক্স বসবার পর মন্মথ চাটুয্যে যে তার গাড়ি বেচে দিয়ে ট্যাক্সি চড়ছে, তা নিয়ে—আর সে সারাক্ষণ ভাবছে, এখন উঠতে গেলে সেটা ভযঙ্কর অভদ্রতা হ'য়ে পড়ে কিনা। একটা সন্ধ্যা, পার্থপ্রতিম মনে-মনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো, একটা সন্ধ্যা নষ্ট! একটা সন্ধ্যা উৎসর্গিত ক্লান্তিকে, মৃত্যুকে। আর, এই সন্ধ্যা নিয়ে সে কী করতে পাবতো, কী না করতে পারতো!

সে যেমন ভেবেছিলো, পার্থপ্রতিম ব্যাপারটা মোটামুটি সেই গোছেরই দেখলো, সে যখন পরদিন সন্ধ্যায় গেলো শ্রীলতাব বাড়িতে। ছায়া-ঘনিয়ে-আসা বাইরের লনে বেতের চেয়ার ছড়ানো, মাঝে-মাঝে ছোটো, গোল টেবিল, চায়ের জিনিস রয়েছে তাব উপর। আগন্তুকেরা ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত; কোথাও বা দু-তিন জন একত্র হ'য়ে জটলা করছে এক কোণে দাঁড়িয়ে, কেউ বা বেড়াচ্ছে পাইচারি ক'রে। শাড়ির ঝলমলানি, হাসির কলস্বর। দেখতে ভারি সুন্দর, মোটের উপর।

কোনখান থেকে যেন শ্রীলতা নিঃসৃত হ'য়ে এলো। 'কখন এলেন?'

'এই তো, এইমাত্র।'

'খুব খুশি হয়েছি। আমার ভয় হচ্ছিলো, আপনি হয়তো আসবেন না। আসুন।' শ্রীলতা তাকে এগিয়ে নিয়ে গেলো একটা টেবিলে, যেখানে ব'সে ছিলেন নিখুঁত সাহেবি পোশাক-পরা, নিখুঁতভাবে চুল-উল্টিয়ে-দেয়া এক নিখুঁত ভদ্রলোক। শ্রীলতাকে দেখেই তিনি ব'লে উঠলেন, 'হ্যালো, শ্রী, কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?' তাঁর বাংলা উচ্চারণ বাঁকা ধরনের, যেন কষ্ট হয় বলতে। আর সম্ভবত, যে শোনে, তার কষ্ট হয় আরো বেশি।

শ্রীলতা বললে, 'মিস্টার কার, ইনি পার্থপ্রতিম দে।'

'ডিলাইটেড!' মিস্টার কারের মুখের কোনো-এক কোণে যেন এতক্ষণ একটা হাসি লুকিয়ে ছিলো, এইবার তিনি ইশারা করতেই বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সারা মুখে। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বাড়িয়ে দিলেন তাঁর হাত; পার্থপ্রতিম তার অনভ্যস্ত হাত দিয়ে তা গ্রহণ করলে।

শ্রীলতার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় হ'লো। কেউ বললে, 'আপনি ভবানীপুরেই থাকেন বুঝি?' কেউ বললে, 'আপনিই কি মাঝে-মাঝে মাসিকপত্রে লেখেন?' কেউ বা কিছুই বললে না। কেউ তাকে বিশেষ লক্ষ্য করলে না, সে তা আশাও করেনি।

একটু পরে শ্রীলতা, 'আমি একটু আসছি,' ব'লে অন্তর্হিত হ'লো। মিস্টার কার তাকে

সঙ্গদান করলেন চায়ে। প্রথম বার প্যারিসে গিয়ে ভালো ফরাসি না-জানায় তাঁকে কী-কী বিপদে পড়তে হয়েছিলো, সে গল্প ব'লে তিনি পার্থপ্রতিমকে আপ্যায়িত করলেন। পার্থপ্রতিম বললে, 'ভারি মজা তো।'

চা হ'য়ে গেলো। মিস্টার কার গভীবভাবে মাথা নত ক'রে বললেন, 'Excuse me—I'll take a turn or two round...' বলতে-বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

পার্থপ্রতিম বললে, 'নিশ্চযই! আমার জন্য ভাববেন না।'

দ্রুত পা চালিয়ে ভদ্রলোক একটু দূরে এক টেবিলে গিয়ে বসলেন, যেখানে দুটি মহিলা তৃতীয় এবং অনুপস্থিত কোনো মহিলার প্রণয়কাহিনীর আলোচনা করছিলেন। মিস্টাব কার গিয়েই খুব ধারালো একটা মন্তব্য করলেন; উঠলো হাসির রোল।

পার্থপ্রতিম রইলো একা ব'সে। অন্ধকার হ'য়ে এসেছে? কিন্তু পশ্চিমেব আকাশে বর্ষাসন্ধ্যাব লাল মেঘ এখনো ফিকে-গোলাপি। তার আশে-পাশের টেবিল থেকে আসছে কথার গুঞ্জন। পার্থপ্রতিম শোনবার চেষ্টা করলো। খুব বেশি চেষ্টাও করতে হ'লো না; চা-পরবর্তী স্বগোষ্ঠী-সঙ্গজাত উৎসাহে প্রায় সবাই একটু চেঁচিয়ে কথা কইছিলো। ঠিক তার পিছনে দুটি অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গ, দেখলে মাযা হয এমন চেহারাব যুবকের মাঝখানে এক ভদ্রলোক—জমকালো, এবং একটু আত্ম-সচেতন তাঁব গোঁফ, মুখে তাঁর ছ'ইঞ্চি লম্বা এক হাভানা—উচ্চস্বরে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করছিলেন ব'লে মনে হ'লো।

'. .ও একবার বলে সে-কথা?' পার্থপ্রতিম শুনতে পেলো, 'একবাব বলে? খুব তো দেখিয়ে বেড়ায সবাইকে জাঁক ক'রে, কিন্তু...' ভদ্রলোক চুরুটটা একবাব চুষলেন, 'অমন taste ওর কখনো হবে! নিজে ডিজাউইন ক'রে কত কষ্টে আমি আর্মি এণ্ড নেভিকে দিয়ে—' চুরুট আবার টান, 'কিন্তু আমি যে ওকে দিযেছিলুম খাটটা, ও একবাব বলে সে-কথা?'

ক্ষীণাঙ্গ ছেলে দুটি গভীর সমবেদনাসূচক অস্পষ্ট শব্দ কবলো।

'কী না করেছি আমি ওর জন্যে! ও আজ যেটুকু হযেছে, তা হ'তে পেরেছে কার জন্যে! আমি যদি না-থাকতুম ওর পিছনে, তাহ'লে সাধ্য ছিলো ওর—' আবার চুরুটে টান; ধোঁযা।

'আজ যে ওকে দেখছো, তড়বড় ক'রে চলে, কথা বলে চটপট—সে-সব তো আমাকেই ওকে শেখাতে হয়েছে হাতে ধ'রে। আগে একটা কথা বেরোতো না মুখ দিয়ে। প্রথম যখন ওকে নিয়ে গেলুম তপতীর কাছে, তপতী তো হেসেই খুন। আমাকে বললে, 'ওটাকে কেন ধ'বে এনেছো?' আমি বললুম, 'কেন, বেশ তো ছেলেটি।' তপতী বললে 'ও কি বসতে জানে!' আমি যা-ই বলি না কেন, কানেই তোলে না তপতী।'

ক্ষীণাঙ্গ ছেলেদের একজন বললে, 'সেই লোককেই তো শেষ পর্যন্ত বিয়ে...'

'হ্যাঁ, বিয়ে করলে, কিন্তু সে কি ওর গুণে? I had to do the wooing for him. আমিই তপতীকে জিতিয়ে দিলুম ওকে; ও একা হ'লে এখন সেই সতেরো টাকার স্যুট প'রে ঘুরে বেড়াতো ফ্যা-ফ্যা ক'রে। অথচ ও এখন সেই খাটের কথাটা পর্যন্ত একবার বলে না।'

ক্ষীণাঙ্গ ছেলেদের আর-একজন বললে, 'আশ্চর্য।'...

দুটি মেয়ে ঘুরতে-ঘুরতে পার্থপ্রতিমের পাশ দিয়ে চ'লে গেলো।

'...রোজ দাঁড়িয়ে থাকতো,' একজন বলছিলো, 'জিমখানা ক্লাবের দরজায়। বাড়ি থেকে বেরোবার জো নেই ওর জ্বালায়।'

আর-একজন বললে, 'তুই ওকে একটা খোঁয়াড়ে দিয়ে দিলেই তো পারতিস—যেখানে গোরু-ছাগল ভ'রে রাখে।

প্রথমা হেসে উঠলো। 'ছেলেটা দেখতে কিন্তু বেশ ছিলো। ভাবছিলুম...' তারা চ'লে গেলো পার্থপ্রতিমের শ্রুতিপথের বাইরে।

পাশের টেবিলটা খালি ছিলো, কখন যে এক যুগল এসে সেখানে বসেছে, পার্থপ্রতিম লক্ষ্য করেনি। আবছায়ায় যতদূর মনে হ'লো, মহিলাটি বেশ লম্বা, অত্যন্ত শ্বেতাঙ্গী; আর সেই শ্বেত অঙ্গের যতদূর সম্ভব প্রকাশ করছে তাঁর পোশাক। যে-বস্তুটা তিনি পরেছেন, সেটা শাড়িই বটে, কিন্তু এমন অদ্ভুত ফিরতি দিয়ে পরা যে পার্থপ্রতিমের সন্দেহ হ'লো, ইনি বাঙালি কিনা। এমন সময় মহিলাটি স্পষ্ট বাংলায় ব'লে উঠলেন, 'উঃ।'

সঙ্গের ভদ্রলোকটি বললেন, 'কী হ'লো?'

'Oh, Shut up.'

ভদ্রলোক বুজে গেলেন। চুপচাপ।

খানিক পরে শ্বেতাঙ্গী বললেন, 'ললিত গেলো আমাদের সামনা দিয়ে।'

'ওঃ, ললিত!'

'বেশ ছেলে ললিত—'he's a nice boy.' শ্বেতাঙ্গীর বাংলা কূল ছাপিয়ে ইংরেজিতে তরঙ্গিত হ'য়ে উঠলো, 'A nice boy. I used to be very fond of him' ভদ্রলোক নীরব।

'And he has a pretty wife, too. A lovely, little girl. She has a sweet face. A *sweet* face.'

'I don't see much in her, though.'

'Naturally, you being what you are.'

'I think I can know a pretty face when I see one.'

'A fat lot you think! But her face is *sweet.*'

'Well, come to think of it. She *does* seem to have a sort of Charm.'

'A sort of-What ?'

'Charm, She's rather charming in her way, you know.'

'Lord! You talking of Charm!'

'But didn't you—'

'Oh, for Heaven's sake, do try to think for yourself...for a change.'

'I do think she's charming.'

'Fancy Lalit's wife being charming!' মহিলাটি মৃদু, চাপা গলায় হেসে উঠলেন, 'Lord! Men *have* queer tastes.'

ভদ্রলোক আর কথা বললেন না। মহিলাটি একটা সিগারেট বের ক'রে ধরালেন। দেশলাইয়ের ক্ষণিক আলো তাঁর শ্বেত-পাণ্ডু মুখের উপর একটা লালচে আভা ফেলে মিলিয়ে গেলো। তারপর বললেন, 'Well, you needn't be so glum as all that. You needn't have...' মাঝখানকার কয়েকটা কথা শোনা গেলো না,..'if you can't keep up your spirits.'

নিঃশব্দে, ধূসর ছায়ায় ছায়ামূর্তির মতো শ্রীলতা এসে দাঁড়ালো তার সামনে। টেবিলের উপর এক হাত রেখে তার দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে বললে, 'আপনি একেবারে একা ব'সে আছেন দেখছি—'

শ্রীলতার আসন্ন অ্যাপলজিতে বাধা দিয়ে পার্থপ্রতিম বললে, 'না, একা আর কোথায়!' ব'লে নিজের চারদিকে একবার তাকালো।

শ্রীলতা বললে 'এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলুম সবাইকেই খুশি করবার বিষম চেষ্টায়। কিছু মনে করবেন না—'

'মনে করবার কী আছে। আপনি জানেন না, এতক্ষণ আমার কী চমৎকার সময় কাটছিলো।'

শ্রীলতা পাশের একটা চেয়ারে বসলো। পাশের টেবিলের মহিলাটির অধর-সংলগ্ন সিগারেটের প্রান্ত লাল একটা পোকার মতো মুহূর্তের জন্য ঈষৎ স্ফীতকায় হ'য়ে উঠে আবার ছোটো হ'য়ে গেলো।

'I say,' তাকে বলতে শোনা গেলো, 'Why can't you laugh a little more? It would clear your soul of its fungousness.'

পার্থপ্রতিম বললে, 'নিজেকে মনে হচ্ছিলো একটা দ্বীপের মতো, চারদিকের সব বিচিত্র ঢেউ যার গায়ে এসে ধাক্কা দিচ্ছে।'

শ্রীলতা একটু হেসে বললে, 'এই সব বর্বরদের ক্ষমা করবেন।'

'আজকালকার দিনে বর্বর আমরা সবাই—কম কি বেশি। সভ্যতার বর্বর।'

'আর, যে যা-ই বলুক, সব জড়িয়ে ব্যাপারটা বেশ চোখ-ভোলানো গোছের ঝলমল করে।'

'তারও বেশি—চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ভীষণ ঠাট্টা করবো, টুকরো টুকরো ক'রে দেবো বিদ্রূপে, অস্ত্রোপোচার করে বের করে দেখাবো ভিতরকার পচা শাঁস—আর এদিকে, বাঁচবো তারই মধ্যে, তার বাইরে গেলেই বাঁচবো না—উপায় নেই আমাদের এ ছাড়া। বেশ মজা।'

'আর অত খুঁতখুঁত করে, নালিশ করে, প্রতিবাদ ক'রে—অবিশ্রান্ত ছটফট ক'রেই বা লাভ কী? ইচ্ছে করলেই তো আমরা সুখী হতে পারি। নিজের মনেরই মধ্যে। বাইরের অবস্থা যা-ই হোক—কী এসে যায়? পৃথিবীর কথা ভেবে খামকা আমরা মনখারাপ করতে যাবো কেন?'

'পৃথিবীটা এক-এক সময় জোরে ঢুঁ মারে এসে—'

শ্রীলতা হেসে উঠলো। 'এমন খারাপই বা কী আমাদের পৃথিবীটা—সব দিক ভেবে দেখতে গেলে।'

'না, বরং ভালোই তো,' পার্থপ্রতিম শ্রীলতার হাসির প্রতিধ্বনি করলো, 'বিশেষত, ভালো চায়ের পর সন্ধ্যার ঠাণ্ডা ছায়ায় ব'সে খুবই ভালো।'

এ-সব কথার আড়ালে তাদের দু-জনের মাঝখানে যেন সংস্পর্শ ফিরে আসছিলো—অলক্ষিত, উষ্ণ সঞ্চরণে যেমন রক্ত ফিরে আসতে থাকে সদ্যরোগমুক্ত শরীরে। একটা, নতুন সমীপতা তাদের মধ্যে জন্ম নিলো—সন্ধ্যার অন্ধকারে, তারার প্রতীক্ষায় কম্পমান ম্লান-নীল আকাশের নিচে।

পাশের টেবিলের মহিলাটি হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেললেন, শূন্যে একটা অর্ধবৃত্ত এঁকে সেটা একটু দূরে গিয়ে পড়লো। 'Lord' ক্লান্ত সুরে তাঁকে বলতে শোনা গেলো, 'If only one...' তাঁর কথার বাকি অংশ মিলিয়ে গেলো অস্পষ্ট মর্মরের ভিতর।

হঠাৎ গম্ভীর গলায় ভদ্রলোকটি ব'লে উঠলেন, 'Do you know, perhaps I shall kill you one of these days' মহিলাটি সুতীক্ষ্ণ ও সংক্ষিপ্ত একটি হাসি নির্গত করলেন।

দার্জিলিং-ফেরতা মেয়ে দুটি ঘুরতে ঘুরতে আবার তাদের সামনে এসে পড়লো। একজন বলছিলো, '...শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিকর। ভেবে দেখতে গেলে, চুপচাপ একা ব'সে থাকাই সবচেয়ে ভালো।'

'তেমন কিছু খারাপ নয়, অন্তত—যদি একটা আয়না থাকে সামনে।'

'আয়না?'

'হ্যাঁ, জীবন্ত একটা আয়না, মুগ্ধ বিহ্বল একটা আয়না, রক্তমাংসের একটা স্তব...'

হঠাৎ শ্রীলতা বললে, 'আমার বন্ধুদের সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়? এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না।'

পার্থপ্রতিম একটু হাসলো। 'কিন্তু তাদের ভিতর যে মোহ ঠিকরে পড়ছে। আপনি জানেন তা।'

'এরা মেকি, এরা ফাঁকা, এরা মিথ্যে—এ সব কথা কি আপনি মনে মনে একবারও বলেন না?'

'এটা তো সত্য যে এরা রঙিন। আর সেই রঙটাই মনে লাগে সবচেয়ে বেশি। একটানা বিবর্ণতার মধ্যে তারই জন্যে কৃতজ্ঞ থাকতে হয়।'

'কিন্তু ক্রমেই এরা ফ্যাশনের বাইরে চ'লে যাচ্ছে। পাঁচ বছর আগে এদের যেটুকু মান ছিলো, এখন আর তাও নেই। আজকাল এদের অস্তিত্বটা কষ্টেসৃষ্টে সহ্য করা হচ্ছে মাত্র। আজকাল ঢেউ এসেছে আন্তবিকতার।'

'কিসের?'

'আন্তরিকতার। মানে, সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত পল্লী-প্রাণ। আপনাদের বাংলা সাহিত্য প'ড়ে বলছি।'

'আপনার দয়া।'

'না দেখুন,' শ্রীলতার হাসিতে সন্ধির প্রস্তাব ফুটে উঠলো, 'ব্যক্তিগত কোনো কারণ না থাকলে সাহিত্য কি দেশ কি জাতি কি ঐ রকম কোনো দূর ও অস্পষ্ট ব্যাপার নিয়ে আমরা কখনো রাগি না।'

'কিন্তু কারণটা ব্যক্তিগত, সে-ইঙ্গিত করলে আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক ঘা লাগে। আমি নিজের কাছে যে-রকম ভান করছি, আপনি সেই ভানটাকে চোখ বুজে মেনে চলবেন। সেটাই ভদ্রতা।'

'শুধু ভদ্রতার জন্য নয়, আত্মসম্মানেরই খাতিরে তা-ই করতে হয়—আপনি আবার আমার ভানটাকে মেনে চলবেন, এই ভরসায়। যদি আমরা প্রত্যেকে অন্য সবাইকে তলিয়ে দেখতে আরম্ভ করি, এবং সেই দেখাটাকে বলতে থাকি স্পষ্ট ক'রে তাহলে পোশাকি গোছের যা একটু বন্ধুতা মানুষে-মানুষে চলতি আছে, তাও লোপ পেয়ে যায়।'

'পোশাকি গোছের বন্ধুতা বললেন কেন?'

'তা নয় তো কী?'

'তোমার-জন্য প্রাণ-দিতে পারি গোছের বন্ধুতা না-হ'লেই তাকে উড়িয়ে দিতে চান?'

'তা নয়, কিন্তু বন্ধুতা—বন্ধু তো তাদেরই বলবেন, মনে-মনে যারা পরস্পরকে তীব্র অপছন্দ করে, অথচ বাইরে যারা একত্র হয় দৈবক্রমে, তারা এক পেশার কি এক শ্রেণীর ব'লে—নয়তো কোনো স্বার্থের খাতিরে।'

'হলোই বা স্বার্থ। স্বার্থ হ'লেই সেটা খারাপ হবে কেন? দু-জন লোক যদি পরস্পরের সঙ্গে কথা ব'লে সুখ পায়, সেটাও তো একরকম স্বার্থ।'

'কিন্তু বন্ধুতার ভিত্তি অন্য রকম হওয়া উচিত।'

'কী রকম? হৃদয়? ভালোবাসা? কিন্তু হৃদয় আমাদের কত দূরেই বা নিয়ে যেতে পারে? আর ভালোবাসা? যদি প্রশংসার যোগ্য কিছু না-থাকবে, তাহ'লে একজন সাবালক মানুষ আর একজন অনাত্মীয় সাবালককে ভালোবাসতে যাবে কেন?

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা থেকেই যায়—সম্পর্কটা ঠিক ব্যক্তিগত হ'য়ে উঠতে পারে না।'

'সে-ই তো ভালো। কারণ যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সেইখানেই ক্ষয়।' পার্থপ্রতিমের তার মা'র কথা মনে পড়লো। হৃদয়ের সব তীব্রতা—আর সেই তীব্রতার সব দুঃখ—পার্থপ্রতিমের পক্ষে তার মা-র মুখ তার প্রতিমূর্তি। এমন সময় আসে, যখন সে-মুখের দিকে তাকালে তার অসহ্য লাগে। তা ব্যাহত করে তার নিজের সম্পূর্ণতাকে, তা যেন তার নিজত্বের উপর অত্যাচার ঃ যেখানে তার সত্তা আত্মনিহিত ও স্পর্শাতীত, সেখানেও তা নেয় পথ ক'রে, ভেঙে দেয় তার আন্তরিক অখণ্ডতা। একটা অন্ধকার বন্যা, সেই তীব্রতা—অন্ধকারে উদ্যত, উজ্জ্বল খড়্গ—তা তাকে আঘাত ক'রে, ছিন্ন-

ভিন্ন ক'রে দেয় তাকে। সে তো চায় নিজেকে ছিনিয়ে নিতে, সেই রুদ্ধশ্বাস বেদনা থেকে মুক্ত হ'তে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে দখল করতে—আনন্দে একান্তরূপে নিজের মধ্যে নিজে হ'য়ে ওঠবার আনন্দে। কিন্তু তার মনের প্রতি তন্তুতে জড়িয়ে গেছে সেই তীব্র চেতনা—তা আঁকড়ে ধরেছে তাকে, উপায় নেই ছাড়া পাবার। 'না, ব্যক্তিগত দিক থেকে কাছে না-আসাই ভালো,' পার্থপ্রতিম আবার বলল, 'যে-মুহূর্তে আমরা জড়িয়ে যাই, তখনই টানাটানি, ছেঁড়াছেড়ি; যেখানে এক হবার চেষ্টা, সেখানেই সংঘর্ষ, টুকরো হ'য়ে যাওয়া। মানুষের সঙ্গে মানুষের নতুন একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠতে পারে—বিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছন্ন, যাতে সে মুক্ত থাকবে, থাকতে পারবে নিজের মধ্যে নিবিড় হ'য়ে, নিজেকে অবিশ্রান্ত খরচ ক'রে ফেলতে হবে না।'

'কিন্তু নিজেকে একেবারেই খরচ করবেন না, এ-ই বা কী-রকম অন্যায় জেদ।'

পার্থপ্রতিম মুখ তুলে একটু হাসলো, কোনো কথা বললো না। লঘু অন্ধকারে ভ'রে গেছে বাগান, কালো একটা পরদার মতো তা হাওয়ায় দোলায়িত হ'য়ে উঠছে। পাশের টেবিলের যুগল উঠে গেছে একটু আগে; কাছাকাছি কেউ নেই; অতিথির ভিড় কমতে কমতে এখানে ওখানে ছড়ানো দু-চারজনে এসে ঠেকেছে। পার্থপ্রতিম অনুভব করলো, তারও এখন ওঠা উচিত। শ্রীলতার দিকে সে একবার তাকালো, সে আছে মুখ ফিরিয়ে। অন্ধকারে শুভ্রতর তার মুখ, তার নীল রঙের শাড়ি গেছে হারিয়ে। কত দূর—এরই মধ্যে, এই মুহূর্তের নীরবতার অবকাশে কত দূরে সরে গেছে সে, তার গ্রীবার বাঁকা রেখায় কী দুরূহ নির্লিপ্ততা। একটু আগে পার্থপ্রতিম কোনো-কোনো কথা বলেছিলো, যা মনে করে তার প্রায় খারাপ লাগলো। কেন সে বলতে গিয়েছিলো ও-সব কথা? সে একটা সাধারণ নিয়ম ঠিক ক'রে রেখেছিলো—যে-সব কথা সে ভাবে তার নিজের মনে, সামাজিক আলাপের প্রসঙ্গে তা কখনো বলবে না, কেননা তা বোঝানো শক্ত, যদি না অন্য পক্ষের মনে সেই কথাই থেকে থাকে ভ্রূণাবস্থায়। প্রতিদিনের সামাজিক প্রয়োজন সে চালিয়ে দেবে খুচরো আলাপে। যে-কথা আমার মনের কথা, তা কারো কাছে বলা নিজেকে নগ্ন করার মতো, প্রায় নিজেরই উপর কোনো অত্যাচারের মতো। সবচেয়ে ভালো নিজেকে উন্মোচন না-করা, সব চাইতে নিরাপদ নিজের চারদিকে আবরণ।

'আপনি যদি,' হঠাৎ শ্রীলতা বলে উঠলো, 'নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, তাহ'লে আপনার নিন্দে হবে—লোকে বলবে, আপনি দাম্ভিক, আপনি সমাজবিরোধী।'

পার্থপ্রতিম চমকে উঠলো। যেন শুনতে পেলো তারই চিন্তার প্রতিধ্বনি। কিন্তু তখনই তার মনে পড়লো একটু আগে যে-কথা হয়ে গেছে—তারই জের টানছে শ্রীলতা। কিন্তু ও-বিষয় নিয়ে আর বেশি দূরে যাবার তার ইচ্ছা ছিলো না; সে শুধু বললে, হ্যাঁ, আমাদের দেশের লোক গ'লে যাওয়া স্বভাব বড়ো বেশি পছন্দ করে।'

তা করে, কথাটা ব'লেই পার্থপ্রতিম ভাবতে লাগলো, অনেক পরিচয় সে তার পেয়েছে। একরকমের গায়ে-পড়া, দাদা-ভাই গোছের বাঙালিয়ানা আছে, যেটাকে স্বজাতি চরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণ ব'লে আমরা সগর্বে ঘোষণা করে থাকি। আমরা গরম দেশের লোক, রীতিপালনের কাঠিন্য আমাদের বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। আমাদের বৈষ্ণব দেশ—লুটিয়ে পড়তে না পারলে, ঢলাঢলি করতে না-পারলে আমাদের শান্তি নেই। কোনো আব্রু নেই; এক কথায় আমরা অপরিচিতকে অন্তরঙ্গ ক'রে তুলি; যে আসছে, তার কাছেই আমরা উচ্ছ্বসিত, কারো কাছেই নিজেকে প্রদর্শন করতে আমাদের সংকোচ নেই। মাঝখানেই আমরা ছড়িয়ে আছি, অকারণে এবং অনায়াসে হৈ-হৈ করছি; ও ব্যক্তি যে আমার বন্ধু, তা দামামা পিটিয়ে চারদিকে রটিয়ে দিয়ে মনে করছি, বন্ধুতা আরো বেশি গাঢ় হ'লো। যে-ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি চিৎকার করতে পারে, সে-ই আমাদের মতে, সবচেয়ে হৃদয়মান; যে ব্যক্তি সবচেয়ে অধিসংখ্যক লোকের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি গা-ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে, তার মতো ভালো লোক আর নেই।

'আপনার, আর যা-ই হোক,' শ্রীলতা বললে, গ'লে যাবার কোনো ভয় নেই। বরং যাদের গলবার ধাঁচ, তারা আপনার সান্নিধ্যে জমে যেতে পারে।'

'এতটা খারাপ নয়, আশা করি,' পার্থপ্রতিম হেসে উঠলো তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলে, 'এখন যেতে হয়। অনেক ধন্যবাদ ইত্যাদি।'

'আপনি এখানে এসে খুব বেশি বিরক্ত হননি, আশা করি।'

'আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করবার ইচ্ছে আমার বরাবরই ছিলো।'

'দার্জিলিঙে একবার এলেই তো পারতেন,' পার্থপ্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীলতা উঠে দাঁড়ালো, 'কয়েকটা দিন ভারি সুন্দর ছিলো।'

পার্থপ্রতিম কোনো কথা বললে না; একটু সময়, দু-জনে নীরবে হেঁটে চললো। তারপর শ্রীলতা বললে, 'যদি বলি, মাঝে-মাঝে আসবেন? ভালো হয় তাহ'লে।

'আসবো।'

'একসঙ্গে একটু পড়াশুনা করা যাবে—যদি আপনার সময় হয়।'

'সে তো আনন্দের কথা।'

'মাঝে-মাঝে এমন ভয় করে পরীক্ষার জন্য। ঠিক আসবেন তো?'

'ঠিক।'

পার্থপ্রতিম তার কথা রাখলো। পরের সপ্তাহে সে একদিন গেলো শ্রীলতার বাড়িতে। দু-ঘণ্টা ধ'রে তারা আলোচনা করলো সতেরো শতকের ইংরেজি গীতি-কবিতা।

কবিতা

একদা এক পুরুষের স্বপ্নের মধ্যে জড়িয়ে গেলো এক মেয়ের চুল; জেগে উঠে সে দেখলো, নরম চুলের স্বাদে ভ'রে গেছে তার মুখ; মনে-মনে সে বললে, 'ঈশ্বর তাকে দাও, আমাকে তাকে দাও।' তার ফলে পাল উঠলো নৌকোয়, দিগন্ত থেকে দিগন্তে সমুদ্র উঠলো কেঁপে, লাগলো আগুন, ট্রয় ছাই হ'লো পুড়ে।

এ-ই তো গল্প। এ গল্প চ'লে এসেছে চিরকাল, সময়ের মরু-প্রসার পার হ'য়ে, শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রতিধ্বনিত হ'য়ে কোটি-কোটি মৃত্যু অতিক্রম করে ঢেউ তুলে গেছে মানুষের মনে। কোথায় সেই ট্রয়; কোথায় বা সে-মেয়ে, দেবীর কাছে যে উপঢৌকন নিয়ে যাবে নিজের বুকের ছাঁচে গড়া পেয়ালা—তবু আগুন ধরে স্বপ্নের অন্ধকারে, বাসনার সমুদ্রে ওঠে ঝড়, চূর্ণ হয়ে ভেঙে যায় কত হৃদয়—হতাশায়, উন্মাদনায়।

আমার এ গল্পকে আমি নিয়ে যেতে পারতাম সেই রোমাঞ্চিত আকাশে, সংঘর্ষের ফেনিল আবর্তে, দুঃসাহসের দুরূহ সংকল্পে, দুঃখের চরমে। কিন্তু না-চাইলে পাওয়া যায় না; পার্থপ্রতিম যদি তা না-ই চায়—সেই দুঃখের বিদ্যুৎস্পর্শ, অন্ধকারের রহস্যমর্মর—পার্থপ্রতিম যদি তা চাইতেই না পারে, তা'হলে কী করে সে তা পাবে, আমি কী করে তা নিয়ে আসবো এই গল্পে? না, এই গল্পকে চলতে হবে তার নিজের পথে, শান্ত স্রোতে, ঘূর্ণির সংকট বাঁচিয়ে, সর্বনাশের লুকোনো শিলা এড়িয়ে, দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো, পার্থপ্রতিম ভুলেই গেলো চাইতে।

এ-কথা ঠিক যে পার্থপ্রতিম গভীর আনন্দ পায়, যতক্ষণ সে থাকে শ্রীলতার সঙ্গে; সে ভালোবাসে সেই জানালা খোলা ছোটো ঘরটিতে ব'সে থাকতে—বাইরে আকাশ যখন ফেটে পড়ছে লাল আর সোনায়, একটি আলোর রেখা হয়তো লুটিয়ে পড়েছে শ্রীলতার চুলে—ভালোবাসে সেই শান্ত কোমল আবহাওয়া, মৃদু-মর্মরিত কবিতায় ঢেউ খেলানো—গ্রীষ্মের দীর্ঘ সোনালি গোধূলি ভ'রে, দিনের আশ্চর্য মৃত্যু মাঝখান দিয়ে—যতক্ষণ না ঘনায়মান ধূসরতায় ছাপার অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হ'য়ে

আসে, শ্রীলতা হঠাৎ তাকায় মুখ তুলে, একটা কথা বলতে গিয়ে পার্থপ্রতিম চুপ ক'রে যায়। শ্রীলতার আনত মুখ একটা অস্পষ্ট শুভ্রতা, তার কালো চুলের মাঝখান দিয়ে ঋজু, দীর্ঘ সিঁথি একটা চিহ্নের মতো, দূরের সংকেতের মতো—তার যে উপস্থিতি, তা-ই যেন একটু দূর, নৈর্ব্যক্তিক; যেন তা আদৌ শারীরিক নয়, বাস্তব নয়, কল্পনার এটা চেতনা। ঘরের ম্লান হ'য়ে আসা আলোর নিটোল সম্পূর্ণতাকে তা নষ্ট করে দেয় না, তা এক হ'য়ে যায় সেই গভীর নীরবতার সঙ্গে, তা যেন বাইরের কোনো জিনিস নয়, সেই সন্ধ্যা-সত্তারই একটা অংশ। টেবিলের উপর লঘুভাবে অবস্থিত শ্রীলতার হাত দুখানি যেন করুণায় স্তব্ধ, তার ছড়িয়ে-পড়া শাড়ির আঁচল যেন প্রশান্তির দৃশ্য রূপ।

আর পার্থপ্রতিম নিজেকে সুখী মনে করে—কবিতার রসে নিবিড় সেই সময়ে! প্রতি মুহূর্ত একটি পরিপূর্ণ আঙুরের মতো, যার ভিতর রয়েছে দীর্ঘ সাধনার সূর্য, ক্ষীণতম স্পর্শে ফেটে যাবার জন্য প্রস্তুত। ফেটে যেতে—মধুরতায়, উষ্ণ সূর্য-স্বাদে। সেই সূর্য-স্বাদ প্রতি মুহূর্তে, প্রতি মুহূর্ত চলে যেতে যেতে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে তার ঐশ্বর্য। সেই সময়ের মধ্যে পার্থপ্রতিম যেন হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ, তার মন কবিতার রঙিন আকাশে ছাড়া পায়। স্বচ্ছ মদের মতো রঙিন হ'য়ে উঠছে গোধূলি, তার মধ্যে সে কবিতা পড়ছে, রঙিন মনের মতো কবিতা—এর বেশি আনন্দ আর কী হতে পারে, পার্থপ্রতিমের পক্ষে? কারণ কবিতা তার জীবনের চরম উৎসাহ, তার এক আত্মগ্রাসী নেশা হচ্ছে কথা। কথা, অনেক দিন সে নিজের মনে ভেবেছে, কী আশ্চর্য জাদু এই কথার। যেন আলাদিনের মায়াপ্রদীপ তার হাতে এসেছে; একবার স্পর্শ, আর বাণীরূপী জিন নিয়ে আসবে গূঢ়তম রহস্যের সন্ধান। কথার সঙ্গে কথার ঘর্ষণে জ্বলে উঠছে আগুন, স্পর্শে বিদ্যুৎ, রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংগীত। এই তো সব ছোটো-ছোটো কথা আছে পড়ে—কে ফিরে তাকাবে এদের দিকে, প্রতিদিনের ব্যবহারের অভ্যাসে এরা মলিন—কেউ এসে তাদের জুড়ে দিলে তাদের গায়ে নতুন রং, সাজালো তাদের বিশেষ এক ছন্দে—আর অমনি, হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো অন্ধকারে, কথা ক'য়ে উঠলো রাত্রি। কথা : একটা সম্মোহন, উন্মাদনা, যার টানে হৃদয় কূল থেকে কূলে উচ্ছল হয়ে ওঠে। সেই স্রোত ছড়িয়ে পড়তে চায় চারদিকে, নিজের মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখতে গেলে তা সংকীর্ণতায় ব্যথিত হয়। তখন মন চায় কথা কইতে, অন্য কাউকে বলতে না পারলে আনন্দের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় না।

কথিত আছে, কেউ যখন কোনো জিনিস লেখে, তার তৃপ্তি হয় না যতক্ষণ না অন্য কাউকে তা পড়াতে পারে। কিন্তু মানুষের আত্মপ্রকাশের তাড়নার সঙ্গে মিশে আছে আত্মগোপনের ইচ্ছা; নিজের লেখার সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতই সংকুচিত, নিজের কোনো লেখা কাউকে দেখানো আর তার কাছে মনের কোনো গভীর সংগোপন অংশ উন্মোচন করা একই কথা। সেখানে আছে লজ্জার বাধা। তবু মন চায় অন্য কোনো মনের সংস্পর্শ : জানতে ইচ্ছে ক'রে, আমার এই কথা ঠিক ঝংকার তুলবে কিনা অন্য কোনো মনে : আমার মধ্যে যা অর্ধ-প্রকাশিত, ইঙ্গিতে ছায়াময়, তা যদি অন্য কোনো মনের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পূর্ণতা লাভ ক'রে, সেই সার্থকতা খোঁজে মন। আরো কত বেশি প্রবল—কারণ নিঃসংকোচ—যে লেখা আমার নিজের ভালো লেগেছে, তা অন্য কাউকে পড়াবার ইচ্ছা। যদি এমন আর-একজন পাই যে তা থেকে ঠিক একই আনন্দ পেয়েছে, তাহলে তার উপভোগের মধ্যে নিবিড়তর করে পাই আমারই অন্তরের রস। বস্তুত, আমার যে-জিনিস ভালো লাগলো, তাকে যেন আমি সম্পূর্ণ করে পেরেই পারি না, যতক্ষণ না আরো একজনের তা ভালো লাগে। পরম উৎসাহে, তাই, তা নিয়ে যাই অন্য কারো কাছে, মনে ভয় থাকে, পাছে তার মন থাকে অপ্রস্তুত পাশে ঠিক জায়গায় আঘাত না পড়ে। আমার উপভোগের বস্তু যদি লাঞ্ছিত হয় তার কাছে, সে যেন আমারই লজ্জা, অপমান—সে-দুঃখ কঠিন হ'য়ে বাজে। আর যদি ভাগ্য হয় প্রসন্ন, যদি খুশি ওঠে উচ্ছল হ'য়ে তারও মনে—কী আনন্দ! তা যেন আমারই একটা জয়, গৌরব। নিজের লেখার বিরূপ সমালোচনা শোনবার চাইতে প্রিয় কবির অপমান সহ্য করা আরো বেশি দুঃখের। আর, আমার প্রিয় কবিকে যদি কেউ ভালোবাসে, মন তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে কৃতজ্ঞতায়, মনে হয়, এ-ভালোবাসা

সার্থক করলো যেন আমাকেই।

পার্থপ্রতিম একলা গোছের মানুষ; তার মধ্যে ঘটেছে গর্ব আর লাজুক ভাবের এক অদ্ভুত মিশ্রণ, তাই সব সাধারণ সংসর্গ থেকে সে বিচ্ছিন্ন। বাড়িতেও তার কোনো ভাই-বোন নেই—এতে তার নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকার অভ্যাস আরো বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে। সে একটা জাদু-করা গোছের জীবন কাটিয়ে এসেছে—তার নিজস্ব এক পৃথিবীতে, স্বেচ্ছাবন্দী। তার একমাত্র মুক্তি ছিলো তার লেখা; অবরোধের যে-বাষ্প বিষাক্ত হ'য়ে উঠতে পারতো, লেখারই ভিতর দিয়ে তা নির্গত হ'তো, তাতে করেই সে নিজেকে দিতো বহির্জগৎকে। কিন্তু লেখার ভিতর দিয়ে মনের একরকমের পরিতৃপ্তি হয় মাত্র; এমন সময় আসে, যখন আমরা চাই আরো প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত কোনো সংস্পর্শ। এমন লোক ছিলো না, যার কাছে পার্থপ্রতিম তার সাহিত্যিক দেবতাদের স্তুতি করে শান্তি পেতে পারতো; তার সব আনন্দের উচ্ছ্বাস নিপীড়িত হ'তো তার নিজেরই মনের পরিসীমায়। তার মনের মধ্যে জমে উঠতে থাকতো অনেক কথা, অনেক তীব্র উপভোগ—একটা ভারের মতো কিছুকাল, উন্মুখতায় ধৈর্যহীন—যতক্ষণ না তা হারিয়ে যেতো বিস্মৃতিতে। এমন সময় শ্রীলতার সাহচর্যে তা ছাড়া পেলো; পার্থপ্রতিম পারলো কথা কইতে। এমন একটা মনের কাছে সে এলো, যে, সে অনুভব করলে, তারই জাতের—আর তার উৎসাহ উঠলো কূল ছাপিয়ে। উজাড় করে সে ঢেলে দিলে বহুদিনের সঞ্চিত আনন্দ, নতুন করে তার ভালো লাগলো পুরোনো সব জিনিস—যা, সে ভেবেছিলো, অভ্যাসে জীর্ণ হ'য়ে গেছে। যখনই আমরা কাউকে তা বলবার চেষ্টা করি, তখনই বুঝতে পারি, কোনো একটা জিনিস আমাদের কত ভালো লাগে। আর শ্রীলতা যে আনন্দ পাচ্ছে, সেই চেতনা প্রতি মুহূর্তে দোলা দিয়ে গেলো তার আনন্দকে। সেটা একটা পরিপূর্ণতা, যা পার্থপ্রতিম এই প্রথম জানলো। সে যেন ফুটে উঠলো—কোনো গোপন প্রাণশক্তির আকস্মিক আঘাতে। আর নিজেকে সে ঝরিয়ে দিতে লাগলো কথায়। দীর্ঘ সব সন্ধ্যা ভ'রে, মুহূর্তের পর সোনালি মুহূর্ত, সেই কইলো কথা—শ্রীলতা বেশির ভাগ মনে-মনে অবাক হয়ে চুপ করে রইলো।

দু-জন মানুষের পরস্পরের কাছে আসবার দুটো পথ আছে; এক হৃদয়ের দিক থেকে—যখন একজন আর-একজনকে বলে, 'তোমাকে ভালোবাসি,' আর তার পরে আর কোনো কথা বলবার থাকে না। সেটা আমাদের রক্তের মধ্যে কোনো আকর্ষণ—সেটা আমরা ইচ্ছে করলেই পেতে পারি না, ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যেতে পারি না। আমাদের চেয়ে প্রবল সে, তাই আমাদের আঁকড়ে ধরে কঠিন মুঠিতে। হঠাৎ জেগে ওঠে রক্তের প্রতি রক্তের ক্ষুধা, আর সমস্ত সৃষ্টি কুয়াশায় মিলিয়ে যায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের এ সম্পর্ক আদিম। এটা সহজ ব'লেই কঠিন এর সিদ্ধি; মুখে আমরা এর স্তব করি, কিন্তু এর নাম ক'রে যা সম্পন্ন করি জীবনে, নিছক দৈব-সংঘটিত জৈব সম্পর্ক ছাড়া তা কি আর কিছু! আর দু-জন মানুষ মিলিত হতে পারে বুদ্ধিতে—রুচির ঐক্যে, কোনো উদ্দেশ্যের সমতায়। দুজনের মনের ধর্ম এক হতে পারে; তখন তারা আসবেই—যদি তারা পরস্পরকে জানবার সুযোগ পায়—পরস্পরের কাছে। দু-জনের হ'তে পারে এক পৃথিবী, দু-জনে পরস্পরকে সহায়তা করতে পারে কোনো কর্মে, চেতনার গভীরতায়, দুজনের হতে পারে এক জীবন। এ-সম্পর্ক ব্যক্তিগত নয়, এতে গা ঘেষাঘেষি নেই, আসক্তির নিরবকাশ ঘনতা নেই; এতে আছে মুক্তি, আছে নীরবে নিজত্বে ফুটে ওঠা। এটা একটু দূর, একটু নির্লিপ্ত—কিন্তু এও একরকমের অন্তরঙ্গতা।

বর্ষার সুর

এরই মধ্যে এক বিকেলে নিবিড় হয়ে মেঘ করে এলো, যেন এক পাল বুনো হাতি ছাড়া পেয়েছে আকাশে। ছুটলো হাওয়া, রাস্তার সব ধুলো ঝেঁটিয়ে জড়ো ক'রে কেউ যেন আছড়ে ফেললো দু-পাশের বাড়িগুলোর গায়ে। বিয়ে বাড়ির লোকেদের মতো আকাশে মেঘেদের বড়ো ব্যস্ত ভাব—

ছুটোছুটি, কানাকানি, হাঁকডাক চলছে অবিরাম, যেন আয়োজন চলছে কোনো বিরাট সমারোহের। ছায়া নামলো পৃথিবীতে; গোধূলি-আচ্ছন্ন, স্বপ্নময় নতুন এক পৃথিবী—তা থেকে আমাদের ব্যবহারিক জগতের সব পরিচয়চিহ্ন লোপ পেয়ে গেছে। কাচের শার্সি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পার্থপ্রতিম তার বাড়ির সামনের পুরোনো রাস্তাকে ঠিক চিনতে পারলে না।

হঠাৎ হাওয়া থেমে গেলো ঃ অদ্ভুত স্তব্ধতা একটা প্রাণময় উপস্থিতির মতো। সমস্ত আকাশ প্রত্যাশায় রুদ্ধশ্বাস। আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো, এবার হবে আবির্ভাব। দুরন্ত মেঘগুলো কান পেতে চুপ ক'রে শুনছে।

আর হঠাৎ তা ভেঙে গেলো, সেই রুদ্ধতা, কানে-কানে-টানা ধনুকের ছিলার মতো সেই তীব্র প্রত্যাশা। যেন বিশ্বের অন্তরের কোন কঠিন বস্তু গ'লে গেলো, হাওয়া বইলো ঠাণ্ডা স্রোতে। তার স্পর্শে পার্থপ্রতিমের মেরুদণ্ড পর্যন্ত শিরশিরিয়ে উঠলো। তার ভিতরে যেন হঠাৎ ছিঁড়ে গেলো কোনো গিঁট, খুশির বান ডাকলো মনে। কেন এই খুশি তা সে জানে না, এর কোনো কারণ নেই, এ উঠছে তার ভিতর থেকে যেন উৎসের মুখে জল, ঝরে পড়ছে তার উপর অবাধে, উপচে যাচ্ছে তাকে ছাপিয়ে। কী করতে হবে একে নিয়ে তার কোনো নির্দেশ নেই। তার অন্তবের গভীর ঐশ্বর্যময় নিঃসঙ্গতা আচ্ছন্ন করেছে তাকে, এক বিশাল মুক্তি, নিজের সঙ্গে নতুন, সম্পূর্ণ মুখোমুখিত্ব। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি কোনো শক্ত স্বচ্ছ জিনিসের মতো এসে লাগলো জানলার কাচে, আরো বেশি অন্ধকার হ'য়ে এলো ঘব—পার্থপ্রতিম ব'সে রইলো স্তব্ধ হ'য়ে। তার মন মর্মরিত হ'য়ে উঠতে লাগলো ছন্দে, বিদ্যুৎ-চকিত অন্ধকারের গর্ভ থেকে উৎসারিত হচ্ছে কথা, স্নায়ুতে-স্নায়ুতে সে ঝংকৃত হচ্ছে। এই হচ্ছে কবিতার মুহূর্ত, এ-মুহূর্তের কাছে আত্মসমর্পণ না-ক'রে উপায় নেই। পার্থপ্রতিমের চৈতন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কথার রাশি—অজস্র, এলোমেলো; ছড়িয়ে যাচ্ছে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে, কথা হারিয়ে গিয়ে শুধু গুঞ্জন ক'রে বেড়াচ্ছে ছন্দটা। সে যেন মনে-মনে প'ড়ে যাচ্ছে অন্য কারো লেখা কবিতা, সবটা মনে পড়ছে না—মনে না-পড়লে ছেড়ে দিচ্ছে। তার এখনো সাহস হচ্ছে না কাগজ-কলম নিয়ে বসতে, পাছে তাতেই এই মোহ ভেঙে যায়। যেটুকু প্রকাশ পায়, তার আড়ালে থাকে যে-কল্পনার অদৃশ্য বিশালতা, তারই আলোড়ন চলছে ওর মনের মধ্যে।

দ্রুত পরম্পরায় আরো কয়েকটা বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা বেজে উঠলো গানের টুকরোর মতো। সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন মৃদু টোকা দিলো দরজায়। পার্থপ্রতিম খেয়াল করলে না। একটু পরে আবার টোকা—এবার বেশ জোরে।

কেউ—নিশ্চয়ই। ঠিক এই সময় কেউ না-এলেই খুশি হ'তো সে। উঠে গিয়ে দরজা খুললো। অবাক হ'য়ে গেলো শ্রীলতাকে দেখে।

'আপনি!'

'উঃ, ঠিক সময়ে এসে পড়া গেছে।' জোরে নিশ্বাস পড়ছে তার, চোখ ঝলসাচ্ছে, মাথাব চুল হাওয়ায় আর ধুলোয় এক কাণ্ড। তার ফিকে হলদে শাড়িতে এই মাত্র পড়েছে যে বৃষ্টির ফোঁটা, তা ফুটে রয়েছে কালো ছোপের মতো। স্পষ্টত, অনেক পথ সে দ্রুত হেঁটে এসেছে। পার্থপ্রতিমের অনুরোধের জন্য অপেক্ষা না-ক'রেই সে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। একটু পরে ঝমঝম ক'রে এসে পড়লো বৃষ্টি।

শ্রীলতা বললে, 'বাঁচলাম।'

পার্থপ্রতিম তার উশকোখুশকো, ধুলো-রঙিন চুলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কোথায় যাচ্ছিলেন এই বৃষ্টিতে?'

'যাচ্ছিলাম না, ফিরছিলাম। ট্রামের রাস্তা থেকে দু-মাইল দূরে বাড়ি নেবার এই শাস্তি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেও পৌঁছনো গেলো না—বাধ্য হলুম মাঝ-রাস্তায় আশ্রয় নিতে। ভাগ্যিস আপনার বাড়িটা ছিলো।' শ্রীলতা ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো, 'আপনার কোনো অসুবিধে করলুম

না তো?'

'ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঈশ্বরকে এই বৃষ্টির জন্য। যদি আজ এ-সময়ে বৃষ্টি না আসতো, যদি আপনি বাড়ি থেকে না-বেরোতেন, কি গাড়ি নিয়ে বেরোতেন—' পার্থপ্রতিম নিচু গলায় হেসে উঠলো— 'বিপন্ন নারীকে উদ্ধার করবার এমন সুযোগ আর আসবে না জীবনে। নিজেকে দস্তুরমতো ছোটোখাটো একটি সেইন্ট জর্জ মনে হচ্ছে ঃ এখন ভদ্রগোছের এক-আধটা ড্র্যাগন পেলে বল্লমের দু-খোঁচায় সাবাড় ক'রে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারি। কিন্তু বসুন। অন্ধকার লাগছে কি? আলোটা জ্বেলে দেবো?'

বৃষ্টির জলে ধূসর-হওয়া জানলার কাচের দিকে তাকিয়ে শ্রীলতা বললে, 'না, থাক। মুখ দেখবার পক্ষে যথেষ্ট আলো আছে।' নিচু একটা বেতের চেয়ারে সে বসলো, 'চমৎকাব—এই বৃষ্টি। ইলেকট্রিক আলোয় কেন তাকে নষ্ট ক'রে দেবেন?'

'হ্যাঁ, চমৎকাব—যদি না এমন হয় যে আপনি রাস্তায় আছেন।—ঠিক কথা, আপনি ভেজেননি তো?'

'না, ভিজিনি। দু-এক ফোঁটা জল যা পড়েছিলো, শুকিয়ে গেছে। আপনি বসুন।'

'হয়তো আপনি একটু চা—'

'চা আমি একটু আগেই খেলুম। এখন আর না। কিন্তু আপনি যদি এত ভদ্রতা করেন, তাহ'লে—' শ্রীলতার মুখে এসে পড়েছিলো, তাড়াতাড়ি সে তা সামলে নিয়ে চুপ ক'রে গেলো।

'তাহ'লেই বা কী? রোজ তো আর ঠিক আমার বাড়ির দরজায় এমন সুবিধেমতো বৃষ্টি নামবে না।' পার্থপ্রতিম বুঝতে পারলে যে কথাটা তার বলা উচিত হয়নি; কেউ যদি কোনো কথা না-বলতে চেয়ে থাকে, সেটা বুঝতে পারলেও তাকে বুঝতে দেয়া উচিত নয় যে বুঝেছি। কিন্তু তার মনের খুশি উঠছিলো উদ্দাম হয়ে, সে তা চাপা দিয়ে রাখতে পারছিলো না। তার ইচ্ছে করছিলো যা মুখে আসে তা-ই বলতে—এমন কোনো কাজ করতো যাতে কোনো দায়িত্ব নেই, ভাবনা নেই; একটা চঞ্চল লঘুতা, অবাধ মুক্তির বাতাস যেন ভ'রে তুলছিলো তাকে। 'অন্তত', শ্রীলতার নীরবতার ফাঁক সে তাড়াতাড়ি ভরিয়ে তুললো, 'মা-র সঙ্গে পরিচয়টা হোক। তিনি খুশি হবেন আপনাকে দেখে।' ভিতরের দিকের দরজাব কাছে দাঁড়িয়ে সে ডাকলো, 'মা।'

ইন্দিরা চশমা চোখে দিয়ে জানলার ধারে ব'সে ম্লান বাংলা তর্জমায় শ্রীঅরবিন্দর একখানা বই পড়ছিলেন, ছেলের ডাক শুনে হাতের বই রেখে দিয়ে উঠে এলেন। 'এই', ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে তিনি বলতে লাগলেন, 'জানলাগুলো সব বন্ধ করেছিস তো? না কি ছাঁট এসে—' কিন্তু শ্রীলতাকে দেখতে পেয়েই তিনি চুপ ক'রে গেলেন।

পার্থপ্রতিম বললে, 'মা, এঁর কথা তোমাকে বলেছি—শ্রীলতা দত্ত; আমাদের সঙ্গে পড়েন।'

শ্রীলতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, ইন্দিরা হাত তুলে বাধা দিলেন।—'বোসো, বোসো। এই বৃষ্টিতে—'

'বৃষ্টির জন্যেই', পার্থপ্রতিম বাধা দিলো, 'উনি এখানে। যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে—বৃষ্টি—আশ্রয় নিতে হ'লো।'

'তোমাদের বাড়ি তো কাছেই?' ইন্দিরা জিগ্যেস করলেন।

শ্রীলতা বললে, 'এই তো তিন মিনিটের রাস্তা। প্রায়ই তো যাই আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে।'

'এর আগেও তো আসতে পারতে একদিন।'

'সে-কথা যে মনে না হয়েছে, তা নয়। কিন্তু —হ'য়ে ওঠেনি আরকি।' শ্রীলতার চোখ পার্থপ্রতিমের উপর একবার ঝলসে গেলো। পার্থপ্রতিম অনুভব করলো তার মুখ একটু লাল হ'য়ে উঠছে। তার মনে পড়লো যে এতদিনের মধ্যে সে শ্রীলতাকে একবারও বলেনি—যতই প্রসঙ্গক্রমে, যতই বেসরকারিভাবে হোক—একবারও বলেনি তার বাড়িতে আসতে। কেন বলেনি? সে কি চায়নি

যে শ্রীলতা আসুক, না কি ভয় পেয়েছে পাছে সে না আসে? সে কি মনোযোগ দেয়নি, অবহেলায় ভুলে গিয়েছিলো, না কি ইচ্ছে ক'রে চেষ্টা করে বলেনি? এই মুহূর্তে, যা-ই হোক, সে কিছু বলতে চেষ্টা করলো—কোনো হালকা গোছের ধারালো কথা, যা শ্রীলতার গোপন শ্লেষকে কাটিয়ে দেবে—পারলো না বলতে। শ্রীলতা নিলো তার প্রতিশোধ।

'পার্থর কাছে শুনেছি তোমার কথা, শুনে অবধি দেখবার ইচ্ছে ছিলো', ইন্দিরা বললেন, 'দেখে খুব খুশি হলুম।'

এটা-ওটা আলাপ হ'লো খানিকক্ষণ। এমন সব বিষয়, যা নিয়ে মেয়েরাই কথা বলতে পারে, এবং বলবেই—বয়সের, রুচির কি জীবনের অবস্থার ব্যবধান যত বড়োই হোক। পার্থপ্রতিমের মনে হ'লো যেন সে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।

কথায়-কথায় শ্রীলতা বললে, 'জানেন বোধহয়, পার্থপ্রতিমকে খুব খাটিয়ে নিচ্ছি—নিজের স্বার্থের জন্য।'

'পার্থ তো বলে, তোমার সঙ্গে প'ড়ে ও খুব আনন্দ পায়।'

'সেটা ওঁরই গুণ—আমি সে-জন্য দায়ী নই। আনন্দ পাবার ক্ষমতাই ওঁর আশ্চর্য।'

'ভালো লাগাটাই তো আসল। তুমি এত পড়াশুনো করেছো—ভালো না-লাগলে কি করতে পারতে?'

চাপা গলায় শ্রীলতা হেসে উঠলো। 'ভালো না-লাগলেও অনেক কিছু করা যায় বইকি—দায়ে প'ড়ে, না-ক'রে উপায় নেই ব'লে—কি কোনো লাভের আশায়। বই আর পরীক্ষা—সত্যি, এ-সব জিনিস আমার ভালো লাগে না। আমি বরং নূতন একটা শাড়ি পরতে পেলে খুশি হই, কি সিনেমায় যেতে পারলে, কি কোনো বন্ধুর বাড়িতে যদি নিমন্ত্রণ থাকে, যেখানে অনেকে আসবে।'

'মেয়েদের সম্বন্ধে,' ইন্দিরা বললেন, 'পুরুষরা যে-মত প্রচার ক'রে বেড়ায়, তুমি তো তা-ই বলছো।'

'কিন্তু সেটা সত্যি যে।'

'তার কোনো পরীক্ষা হয়নি। আমার মনে হয় এই যে মেয়েরাও যখন মানুষ, তখন মানুষ যা পারে মেয়েদের তা না-পারবার কারণ নেই।'

কিন্তু মেয়েদের স্বভাবই যে খানিকটা আলাদা। বিশেষ-কোনো একটা জিনিসের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে থাকতে তারা চায় না; তারা চায় অনেক জিনিসের মধ্যে ছড়িয়ে থাকতে। তাই তো সংসার করায় তাদের অত আনন্দ।'

'মেয়েদের স্বভাব জিনিসটা অনেকটা কুসংস্কারের মতো। আমরা সবাই চোখ বুজে তো মেনে নিই।'

'আমি দেখেছি যে নিজেদের আড়ালে রেখে মেয়েরা কিছু করতে পারে না। তারা নিজেদের প্রকাশ করে—তাদের পোশাকে, কথা-বলায়, ভাবে-ভঙ্গিতে তাদের ভালোবাসায়। সবই যখনকারটা তখন, এক হাতে নিয়ে আরেক-হাতে-দাও গোছের—ও সব জায়গাতেই তারা উপস্থিত থাকে শরীর নিয়ে। কিন্তু যেখানে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে, শরীর দিয়ে দেখানো যায় না, যে-জগৎ কল্পনার কি চিন্তার শূন্যে ভরা—সেখানে মেয়েরা নেই।'

'শরীরের উপর মেয়েদের একটু দুর্বলতা তো থাকতেই পারে—এত কষ্ট ক'রে তারা তৈরী ক'রে তাকে। কিন্তু তার মানেই এ নয় যে মেয়েরা শরীরের বাইরে আর যেতেই পারে না।'

'চারদিকে তাকালে যা দেখা যায়, তাতে তা-ই মনে হ'তে পারে, অন্তত। যা তাদের নিজেদের বাইরে, তার ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে কোনো মেয়ে বেশিদূর এগোতে পারেনি। তাদের চরম.দান হচ্ছে অভিনয়ে—আর নাচে—যাতে নিজেরই ভিতর দিয়ে নিজেকে দিতে হয়।'

'তুমি যা বলছো, তার মধ্যে খানিকটা সত্যি তো আছেই। এ-কথা ঠিক যে মূর্তিপূজা মেয়েদের

রক্তে—তারা রূপক ভালোবাসে, চায় এমন কোনো প্রতিমা যাকে ধরাছোঁয়া যায়, নিছক শূন্য নিয়ে প'ড়ে থাকতে চায় না।'

'আর,' অনেকটা অবান্তরভাবে শ্রীলতা বললে, 'মেয়েরা পড়াশুনো কেন করে? যাতে ভালো বিয়ে হ'তে পারে—সেই জন্যেই তো?'

'সে-কথাই যদি বলো,' ইন্দিরা বললেন, 'কত ছেলেও তো পড়াশুনো করে, যাতে একটা চাকরি হ'তে পারে। সেটাই বা এমন-কী মহৎ উদ্দেশ্য। মেয়েরা বিয়ে হ'য়ে গেলে আর বই খোলে না—ক-টা ছেলেই বা কোনোরকমে একটা চাকরি পেয়ে গেলে খবরের কাগজ ছাড়া আর কিছু পড়ে? সাধারণ হচ্ছে সাধারণ—তাতে মেয়ে-পুরুষের ভেদ করতে যাওয়ার মানে হয় না।'

'মেয়েদের জীবনের প্রথম অংশ হচ্ছে বিয়ের জন্য তৈরী হওয়া, আর সেই বিয়ে হচ্ছে তাদের বাকি জীবন। আর এ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাঝে-মাঝে যারা প্রতিবাদ করে, তারা মেয়ে নয়। মেয়েরা তা-ই চায়।'

'যতটা চায় ব'লে লোকে মনে করে, ততটা নাও হ'তে পারে। স্বামী, ছেলে, ঘর-সংসার—সেটা একরকমের সুখ, সার্থকতা—তা ঠিক। সেটা খানিক দূর নিয়ে যায়, বেশি দূর নয়। একটু খোঁজ নিলেই এমন অনেক মেয়ের কথা আমরা জানতে পারবো, যারা বেশি চায়, কি চেয়েছে। তবে তারা বলতে পারে না; তাদের ভাষা নেই।'

'চাইতে পারাই তো পাওয়ার অর্ধেক।'

'দ্যাখো, লোকে বলে, মাতৃত্ব একটা গৌরব; আর এটাও সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে মেয়েরা প্রাণ দিয়ে তা-ই চায়। কিন্তু যদি প্রত্যেক মেয়ে তার মনের কথা বলতো, তাহ'লে হয়তো দেখা যেতো, সে-ইচ্ছেটা যত প্রবল ব'লে চলতি ধারণা, ততটা নয়। সে-গৌরবের বাড়াবাড়িতে অনেক মেয়ে মারা গেছে—সত্যি মরেছে, না-ম'রেও মরেছে। অনেক মেয়ে মা হয়—না হ'য়ে উপায় নেই বলে; ব্যাপারটা ভালো কি মন্দ, দুঃখের কি আনন্দের, তা বোঝবার সময় হয় না তাদের। এমন একটা সময় আমাদের দেশে প্রায় সব মেয়েব জীবনেই আসে, যখন সে মাতৃত্বকে দারুণ ভয়ের চোখে দেখতে আরম্ভ ক'রে; কিন্তু—তাকে যে বিশ্বাস করানো হয়েছে যে সেটাই তার গৌরব। বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না।'

'তবু তো তারা মেনে নেয় যে এ-ই তাদের জীবন।'

'তা ছাড়া আর কী তারা করতে পারে। হঠাৎ একদিন চমকে উঠে যদি সে-বিষয়ে সচেতন হয়, তাহ'লেই বেশি। আমি একজনকে জানতুম, পনেরো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়—তার সময়ের পক্ষে খুবই দেরিতে, বলতে হবে। ষোলো থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে সে তেরোটি সন্তান প্রসব করে—তার মধ্যে চারটি মারা গিয়ে ন-টি আছে। তার শেষ ছেলেটি যখন হ'লো, সে পড়লো কঠিন অসুখে, এমন আশা ছিলো না যে বাঁচবে। বছরখানেক দারুণ কষ্ট পেয়ে সে ভালো হ'য়ে উঠলো। এমন একটা অস্ত্র করা দরকার হ'লো তার শরীরে, যাতে আর সন্তান হবার কোনো সম্ভাবনা রইলো না। আস্তে আস্তে তার শরীর যেন নতুন প্রাণে ভ'রে উঠতে লাগলো। আরো কয়েক বছর কাটলো। কোলের ছেলেটি বড়ো হ'য়ে উঠলো—তাকে নিয়ে এখন ব্যস্ত না-থাকলেও চলে। তখন—চল্লিশ পার হ'য়ে এসে জীবনে প্রথম বার হাঁফ ছাড়তে পারলো, নিজের চারদিকে তাকাতে পারলো। সে সময়ে তাকে যারা দেখেছে, সবাই লক্ষ্য করেছে তার মধ্যে পরিবর্তন ঃ হঠাৎ যেন যৌবন ফিরে এলো তার। "তিরিশ বছর হ'তে চললো আমার বিয়ে হয়েছে," একদিন সে আমাকে বলেছিলো, "বুঝতেই পারলুম না, কী ক'রে গেলো এতগুলো বছর। একটি ছেলে কোল ছাড়তে-না-ছাড়তেই আর একটি হয়েছে; এক মুহূর্ত ফাঁক ছিলো না। এতগুলো বছর যেন একটানা আবছায়া। এতদিনে আমার সময় হয়েছে—বাঁচতে আরম্ভ করেছি।" এসেছিলো আমার কাছে একখানা বই নিতে। বললে, "ছেলেবেলায় বই পড়তে খুব ভালোবাসতুম; তার পর বছরের পর বছর কেটে গেছে, একটা ছাপানো

পাতার দিকে কখনো তাকিয়েও দেখতে পাবিনি। এখন—আর-কোনো ইচ্ছে আমার নেই; শুধু মনে হয় কেউ আমাকে রাশি-রাশি বই এনে দিক আর আমি ব'সে-ব'সে পড়ি।" একদিন আমি তাকে বলেছিলুম, "এ-বই কী পড়বে—এটা নেহাৎ বাজে।" সে বলেছিলো "বাজে! ছাপা যে হ'তে পেরেছে এ-ই আমার পক্ষে ঢের। যা-কিছু পড়ি, তা-ই আমার ভালো লাগে।" অথচ তার চেয়ে বেশি ছেলেমেয়ের যত্ন কোনো মা কখনো করেনি, তার মতো পাকা গিন্নি খুব কমই চোখে পড়ে।'

শ্রীলতা কোনো কথা বললে না। তার নীরবতা প্রতীক্ষমাণ। জানলায় বৃষ্টির নরম শব্দ; বৃষ্টি ঝ'রে পড়েছে যেন সমস্তটা আকাশকে লুঠ ক'রে নিয়ে। ইন্দিরা যতক্ষণ কথা বলছিলেন, সেই শব্দটা যেন চাপা ছিলো; এইবার হঠাৎ ফুটে উঠলো একটা অদ্ভুত, অস্পষ্ট বিশ্বব্যাপী উপস্থিতির মতো। খানিকক্ষণ—তা ছাড়া যেন কোনোখানে কিছু নেই।

তারপর ইন্দিরা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'একটু বোসো তোমরা; আমি চা ক'রে আনি।' শ্রীলতা আপত্তি জানাতে ভুলে গেলো। ইন্দিরার কথা বোধহয় ভালো ক'রে তার কানেও ঢুকলো না।

ইন্দিবা আর শ্রীলতা যতক্ষণ কথা কইছিলো, পার্থপ্রতিম একটু দূরে ব'সে চুপ ক'রে শুনছিলো; একটি কথা বলেনি। ইন্দিবা ঘর থেকে চ'লে যাবার একটু পরে সে বললে, 'কেন আপনি মা-ব কাছে এমন-সব কথা বলতে গেলেন, যা আপনি মোটেই বিশ্বাস করেন না?'

'কী ক'বে জানেন, করি না?' শ্রীলতা মুচকি হাসলো।

'জানি ব'লেই বলছি।'

'আমাব কথা থাক,' একটু চুপ ক'বে থেকে শ্রীলতা বললে, 'আপনার কথা বলুন। আমি যখন এলুম, আপনি কী করছিলেন?'

'মনে-মনে কবিতা বানাচ্ছিলুম একটা। না—একটাব বেশি; ভাবছিলুম, কোনটা লেখা যায়।'

'কবিতার হত্যা! কী ক'রে আমি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি?'

'সে জন্য ভাববেন না। ইচ্ছে করলে আমি এখনো লিখে ফেলতে পারি—আপনি যদি তা-ই চান।'

'আমি যদি চাই? থাক তবে—এখন বরং গল্প করুন? পরে ঢেব সময় পাবেন লেখার। আচ্ছা, কী ক'বে আপনি কাটান সন্ধেবেলাটা?'

'কী ক'রে? কী যেন, হিশেব দেয়া মুশকিল। একরকম ক'রে কেটেই যায়।'

'তার মানে, আপনি টের পান না, সময় যে কাটছে। ভাগ্যবান!'

'জীবনে এত জিনিস আছে ভালো লাগবার—'

'কী সেগুলো?'

'কী? সবই। এই বৃষ্টি—বিকেলের রোদ, বই, বাস্-এ বেড়ানো, কথা বলা, চুপ ক'রে থাকা—কী নয়?'

'আমি তো খুঁজে খুঁজে মরি কোথায় গেলে, কী করলে ভালো লাগবে।'

'সেটা খুঁজতে হলেই তো বিপদ। দিনগুলো সাধারণভাবে যেমন কাটে তারই ভিতরে ছোটোখাটো সব জিনিসে যদি মজা না পাই, তাহ'লে আর বেঁচে সুখ থাকে না। সবচেয়ে আমি ঘৃণা করি এ-কথা শুনতে, "ভালো লাগে না"।'

'রোজ সকালে উঠে আমার ভাবনা হয়, আজকের সন্ধেটা কী ক'রে কাটবে।—' শ্রীলতা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ থেমে গেলো।

'তারপর?'

'রোজই আছে কিছু-না-কিছু। হৈ চৈ, ফূর্তি। তারপর রাত্তিরে শোবার সময় হঠাৎ মনে হয়, যেমন হওয়া উচিত ছিলো, যেমন হবে ব'লে ভেবেছিলাম, ঠিক তেমনটি হ'লো না—কোথায় যেন

ফাঁক র'য়ে গেলো। সন্দেহ হয়, অন্যরকম হ'লে কি ভালো হ'তো এর চাইতে? পাছে কিছু হারাই, এই উদ্বেগ, প্রতি মুহূর্তে এই জেদ ক'রে ভালো-লাগানো—এর মধ্যে একটা হতাশা আছে।'

'যে সব লোকের কল্পনাশক্তি নেই, তাদেরই কপালে এই দুঃখ। খুশি হবার জন্যেও তাবা চলবে বাঁধা-ধরা পাকা রাস্তায়। ভালো আমার লাগবেই ব'লে উঠে প'ড়ে লাগলে কি কিছু ভালো লাগতে পারে? প্ল্যান ক'রে কি আর ফূর্তি হয়?'

'যা হয়, তা ক্লান্তি। এক ক্লান্তিকে কাটাতে আমরা তার চেয়েও বড়ো ক্লান্তিকে ডেকে আনি।'

'আমরা যদি সবাই নিজের ইচ্ছেমতো চলতে পারতুম, তাহ'লেই আর-কোনো মুশকিল থাকতো না। মানুষ বাঁচে কিসে? তার ইচ্ছায়।'

'আমার তো ধারণা আমি আমার নিজের ইচ্ছেমতো চলি।'

'ইচ্ছে অনেক রকম আছে—ফ্যাশনের ইচ্ছে, ঔচিত্যবোধের ইচ্ছে, যূথবদ্ধ মানবের—যার নাম হচ্ছে গিয়ে সমাজ, তার ইচ্ছে। এবং এগুলোকে আমরা ভুল করতে পারি নিজেব ইচ্ছে ব'লে। যে যে-সময়ে, যে-সমাজের মধ্যে জন্মায়, কতগুলো সংস্কাব, কতগুলো আইন থাকে তাব—সে তা-ই মেনে চলে, আর মনে করে যেন কী সব ভয়ানক কাণ্ড ক'রে ফেলেছে, কারণ সে-সব আইন আগেকার কোনো সময়ের, লুপ্তপ্রায় কোনো সমাজের উল্টো। আজকের দিনে যে-মেয়ে ঠোঁটে রং মেখে সিগাবেট খায়, সে তা-ই করে, যা কবা সে উচিত মনে করে, যা তার নিজের সমাজের বিধান। সে যদি তা ভালো লাগে ব'লেই করতো, তাহ'লে তা নিয়ে বড়াই করতো না। তাব ধারণা, সে সমাজকে ভাঙছে। হ্যাঁ, ভাঙছে; কিন্তু সেই সমাজকে, সে যার কোনো তোয়াক্কা বাখে না, যা তাকে আমলের মধ্যেই আনে না। সে তা-ই করছে, তার নিজের সমাজে যা শোভন ও সংগত ব'লে বিবেচিত। আসলে, সে অত্যন্ত কনভেনশনাল। যে-হিন্দু স্ত্রী বছরের পব বছব কখনো চেঁচিয়ে হাসে না, তার সঙ্গে এ মেয়ের আসলে কোনো তফাৎ নেই। দু-জনেই তা-ই করে, তাব পাশের লোকেরা, গোষ্ঠীর লোকেরা যা আশা করে তার কাছে। বেপরোয়া, উড়নচণ্ডী ব'লে আজকাল যারা খুব বাহবা পাচ্ছে, খুঁজে দেখতে গেলে তাদের মধ্যে ব'সে আছে সেই মামুলি সামাজিক জীব।'

'সমাজের ইচ্ছেকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েই কি বাঁচা যায়?'

'আমার তো মনে হয়, সমাজের বিরোধী হওয়া—অন্তত, সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের প্রতি কর্তব্য। সুখী হবার সেটাই একমাত্র উপায়। গণ-ইচ্ছার তাড়নায় যেন কখনো কিছু না করি। কর্তব্যবোধের খাতিরে যেন নিজের প্রেরণাকে অস্পষ্ট ক'রে না ফেলি। সমাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? অন্য লোকের জন্য আমার কী মাথাব্যথা? আমার যা ইচ্ছে, আমি তা-ই; শুধু একটা স্পষ্ট ক'রে বুঝতে হবে যে ইচ্ছেটা আমারই নিজের।'

'এ-সব কথা আমার মতো লোকের জন্য নয়।'

'কেন নয়? নিজের জীবনের উপর প্রত্যেকেরই অধিকার আছে।'

'আইন তৈরী করে অসাধারণ লোকেরা সাধারণ লোকের জন্য—আরো বেশি অসাধারণ লোকের ভাঙবার জন্য। আমার পক্ষে,' শ্রীলতার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো, 'আইন মেনে চলাই সহজ। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলবো, সব দিক বজায় রেখে চলবো—নিজেকে প্রতি পদে খাপ খাইয়ে নেবো—তার জন্যে আমি। বিদ্রোহের রাস্তা আমার নয়—সে দুঃখ আমার সইবে না।'

'কিন্তু ঠিক যে নিশেন উড়িয়ে বিদ্রোহ—তাও তো নয়। অতখানি স্বীকারই বা করতে যাবেন কেন? শুধু দূরে স'রে আসা, শুধু স্বীকার না-করা, ভাবনা থেকে ছাড়া পাওয়া। আমার পক্ষে যার অস্তিত্ব নেই, তা আমার কোনো ক্ষতি করতে তো পারে না।'

'আপনার কথা বড়ো স্বার্থপর শোনাচ্ছে।'

'স্বার্থপর—নিশ্চয়ই। স্বার্থপর কে নয়? যে বলে স্বার্থপর নয়, সে হয় মিথ্যাবাদী, না হয়

জন্ম-ইডিয়ট। আমার নিজের মতো আর কে আছে—আমার পক্ষে? আমি যদি মোক্ষের আশায় সংসার ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ি, তাও তো আমার নিজেরই জন্য।'

'আপনার কথা বুঝতে পারি—দরকার, হ'লে, লোককে চমক লাগাতে হ'লে বলতেও পারি ও-রকম কথা। কিন্তু আসলে—মেনে চলা আর মানিয়ে চলাই সবচেয়ে ভালো।'

'সত্যি আপনার তা-ই মত?'

কিন্তু এর পরে আর কোনো কথা হ'লো না। হঠাৎ দু-জনেই চুপ—দুজনের মনেই এই কুণ্ঠা, যেন বড়ো বেশি ব'লে ফেলেছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার যেন কার ঘন চুলের মতো ভারি। শ্রীলতা ব'সে আছে জানলার কাছে, তবু তার মুখ দেখা যায় কি না যায়। দেহের রেখাগুলো অস্পষ্ট, আর তার শাড়ির ভাঁজ ফিকে স্মৃতির মতো। বাইরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। একটানা, একঘেয়ে, বিরামহীন শব্দ—শুনতে শুনতে মনে হয় যেন বিশাল, চিরন্তন শূন্যতা হঠাৎ কথা ক'য়ে উঠেছে। যেন সৃষ্টির আগেকার বিশ্বে এসে পড়েছি—যেখানে কিছু নেই, শুধু নিরবচ্ছিন্ন মহাব্যোম আকাশে-আকাশে প্রসারিত। সেই দিবারাত্রিহীন নিঃসময়ের ভয়ংকর স্তব্ধতা—তা-ই যেন রূপায়িত হয়ে উঠেছে এই বর্ষণস্বরে। অনেকক্ষণ ধ'রে শুনলে চেতনার দেয়াল দূরে সরতে-সরতে অসীমে মিলিয়ে যায়, পৃথিবী যায় লুপ্ত হ'য়ে, নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়। গাঢ় ঘুমের মতো নামে আত্মার উপর—অস্তিত্বের অবসান। মোহাচ্ছন্ন, ওরা দু'জনে শুনলো বৃষ্টির শব্দ, খানিক পরে তাও আর শুনলো না। মুহূর্তগুলি ব'য়ে চললো।

তারপর ইন্দিরা এলেন চা নিয়ে; জিনিসগুলো একটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'কী-রকম খাও জানিনে, নিজেই ঢেলে নাও।' হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলেন তিনি। আলোয় ভেসে গেলো ঘর, ফিরে এলো পৃথিবী, শূন্য ভ'রে উঠলো লক্ষ-লক্ষ শতাব্দীর ধারাবাহিকতায়। আর বৃষ্টির শব্দ—তা শুধুই বৃষ্টির শব্দ, বঙ্গোপসাগরের উত্তাপসঞ্চয়ের আত্মমোচনের নির্ঘোষ—তা ছাড়া কিছু না।

পেয়ালায় চা ঢালতে-ঢালতে শ্রীলতা বললে, 'বৃষ্টিটা কি আজ আর থামবে না।'

পার্থপ্রতিম উঠে গিয়ে একটা জানলা খুলে দিলে। তাব মুখের উপর লাগলো মৃদু ছাঁট। ভারি ঠাণ্ডা—বেশ লাগলো তার। এত বৃষ্টি—তবু গরম। সে একটুখানি তাকিয়ে থাকলো বাইরের দিকে, তারপব আবার শার্সিটা বন্ধ ক'রে দিলে। বললে, 'একটু কমেছে।'

চা খাওয়া শেষ হ'তে হ'তে বৃষ্টি আরো ক'মে এলো। রাস্তায় লোকজন শোনা যাচ্ছে। ছপছপ শব্দে একদল চ'লে গেলো।

পার্থপ্রতিম বললে, 'রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে।'

'রাস্তার আর দোষ কী? কলকাতার কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ।'

'কী করে যাবেন?'

'যেতে পারবোই একরকম করে। দেখি, কী অবস্থা।'

পার্থপ্রতিম উঠে গিয়ে দরজাটা খুললো। শ্রীলতা এলো সঙ্গে। বাইরে তাকিয়েই বলে উঠলো, 'বাঃ!'

রাস্তায় এক হাঁটু জল। ফুটপাত ভেসে গেছে। ঘোলা জলে গ্যাসের আলো চিকচিক করছে। একটা গাড়ি গ'লে গেলো ছলছলিয়ে, ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো দু-ধারের বাড়িগুলোর গোড়া পর্যন্ত।

শ্রীলতা একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'ভারি মজা তো।'

পার্থপ্রতিম আকাশের দিকে তাকালো।—'এখনো মেঘ আছে, আবার আসবে হয়তো খানিক পরেই। এই ফাঁকে পালান।'

শ্রীলতা একটা হাত বাড়ালো ফোঁটা ধরতে।—'এখনো পড়ছে একটু-একটু।'

'এখানেই দাঁড়ান—একটা রিকশা এসে পড়লেই ধরতে হবে। তা ছাড়া উপায় নেই।'

দরজায় দাঁড়িয়ে দু-জনে অপেক্ষা করতে লাগলো, এক সময়ে চোখাচোখি হ'লো দু'জনের। কেউই চোখ সরিয়ে নিলে না। শ্রীলতার ঠোঁট অর্ধেক খুললো—যেন কিছু বলতে যাচ্ছে, কিন্তু কথার বদলে মৃদু একটু হাসি বেরোলো তার গলা দিয়ে।

আর শ্রীলতার চোখের দিকে তাকিয়ে কেন, তা না-জেনে, দুর্নিবার, আকস্মিক, পার্থপ্রতিমও হঠাৎ হেসে উঠলো।

সেই রাত্রে পার্থপ্রতিম যখন খেতে বসেছে, ইন্দিরা বললেন, 'বেশ মেয়েটি, লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু শুকিয়ে যায়নি। ভিতরে প্রাণ আছে।'

পার্থপ্রতিম বললে, 'হুঁ।'

পরিচ্ছেদ

এখানে যদি কোনো বুদ্ধিমান পাঠক বলেন, 'বুঝেছি', তাঁকে শুধু এ-ই বলতে পারি যে তাহ'লে তিনি আর যেন না পড়েন ঃ কাবণ, আমাব এই গল্প সে-শ্রেণীর নয়, কী হয় কী-হয় গোছের রুদ্ধশ্বাসে পাঠককে যা চুল ধ'রে পাতার পর পাতা টেনে নিয়ে যায়, ঘটনার পর ঘটনার ফাঁসে পাঠকের মন আটক ক'রে মোচড়ের পব মোচড়ে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলে, যাতে অবকাশ নেই মুহূর্তের। ও-রকম গল্প যদি পড়তে চান, আপনার জন্য আছে অনেক লেখক, উত্তেজনায় ডোবানো তাদের কলম, উদ্ভাবনায় শ্রান্তিহীন তাদের মন। অনেক তাদের কৌশল, অপূর্ব তাদের চাতুরী। এক মুহূর্ত আগে আপনাকে জানতে দেবে না, কী আসছে এখন; কৌতূহলকে ধারালো ক'রে রাখবে সব সময়; অবাক হ'তে হ'তে, ধাক্কা খেতে-খেতে, যা আপনার কাছে মনে হবে অসম্ভব জট-পাকানো, তা কী ক'বে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে আনা হচ্ছে, তা দেখতে-দেখতে—বই মুড়ে রেখে আপনি বলে উঠবেন 'শাবাশ!' কোথাও একটু ঢিলে সুতো বেবিয়ে নেই; সব একেবারে খাপেখাপে, মুখে-মুখে মিলে গেছে। শাবাশ! আর তার পরেই ছুটবেন চমক-লাগানো-তর গল্পের সন্ধানে, জমাট থেকে জমজমাটে, ঠাশবুনানির নিরেট থেকে নিরেটতমতে।

তারার মাঝে-মাঝে থাকে আকাশের ফাঁক, যার ভিতর দিয়ে রাত্রি নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। গানকে ঘের দিয়ে রাখে নীরবতার বেড়া—তাই না উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারে রেশ থেকে রেশে, প্রতিধ্বনির পরিপূর্ণতায়। কবিতার আগে আর পিছে আলস্যের লীলা—সেখানেই কল্পনার আলো খেলে যায় মুহূর্তে মুহূর্তে রঙে-রঙে। একটা কবিতা পড়ি, প'ড়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকি ঃ সেই নিষ্ক্রিয় নীরবতাই তার উপভোগ। যতক্ষণ পড়ছি, ততক্ষণ মন শুধু গ্রহণ করতেই ব্যস্ত; যখন পড়া শেষ হ'য়ে যায়, অথচ মনের মধ্যে তার অনুরণন থেমে যায় না, নিজের মনের রসে ভিজিয়ে তাকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করি, তখনই তো আনন্দ। কবিতা যদি একটার পর একটা উর্ধ্বশ্বাসে গিলতে হ'তো, তাহ'লে অত বেশি ঠাশাঠাশিতে মারা পড়তো সবগুলোই। যেখানে অবকাশ নেই, সেখানে আনন্দ নেই।

আমি এ-গল্প লিখতে বসেছি পার্থপ্রতিমকে চিনি ব'লে—ভেবে দেখিনি, ব্যাপারটাকে ঠিক গল্পের ছাঁচে ফেলা যায় কি যায় না। পার্থপ্রতিমকে আমি পছন্দ করি ঃ শ্রীলতাকে দেখেছি দূর থেকে। এদের দুজনের মধ্যে কী যে রহস্য ঘনিয়ে উঠছে তার খানিকটা পেয়েছি আভাসে আর ইঙ্গিতে, বাকিটা বুঝেছি অনুমানে। যেটুকু জানি আর অনেক বেশি যা জানি না, তার মাঝখানটা ভরিয়ে দিয়েছি কল্পনায়। ওদের অনুভব করেছি কল্পনা দিয়ে, প্রবেশ করেছি যেন ওদের মনের গহনে; মনে হচ্ছে, সবই যেন জানি আমি, যেন আমার চোখের সামনে পল্লবের পর পল্লবে ফুটে উঠছে ওদের মন। আর এই হয়তো সবচেয়ে বড়ো রহস্য, সবচেয়ে আশ্চর্য—দ্রৌপদীর অফুরন্ত শাড়ি; স্তরের

পর স্তর অবিশ্রাম খুলে-খুলে দেখালেও মনের শেষ নেই।

এখন, মাঝপথে এসে একবার আশে-পাশে তাকিয়ে দেখছি, মনে হচ্ছে গল্প লেখবার জন্য পার্থপ্রতিমকে না-নিলেই ভালো করতুম। কেননা ও সে-রকমের মানুষ নয়, যার বিষয়ে এটা সহজে ভাবা যায় যে সে কোনো মেয়ের জন্য সর্বস্ব পণ কববে। এমনকি আমার এও সন্দেহ হয়, এতদিনের মধ্যে শ্রীলতার প্রেমে পড়বার কথা ওর কখনো মনে হয়েছে কিনা। সে সম্ভাবনার প্রতি যেন ওর খেয়ালই নেই। কোনো মেয়ের প্রণয়ী হিসেবে সে একটি অপদার্থ গোছের। প্রথম কথা, সে বড়ো ঢিলে; অকারণে অসম্ভব দেরি করে ফেলবে। তারপর, সে আর্দ্রস্বরে কখনো তার প্রেমের শপথ-বাণী উচ্চারণ করবে না; বিয়ে করার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে যাবে না; চাইবে না প্রণয়িনীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে—কোনোরকমেই প্রকাশ পাবে না যে কোনোরকম আলোড়ন চলছে তার মনে। আলোড়ন চলছে কিনা, সেটাই যে সন্দেহের। হ'তে পারে তার মনে সে-উত্তাপ, সে-তীব্রতাই নেই—কিন্তু হয়তো সেটা ব্যয়িত হ'য়ে যায় অন্য ভাবে, অন্য স্রোতে। কথায়, কবিতায়। আমি জানি, এ-সময়ে পার্থপ্রতিম খুব বেশি কবিতা লিখছিলো, এবং সে-সব লেখার সময়—সে নিজেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারতো—শ্রীলতাই থাকতো তার মনে, শ্রীলতার সংস্পর্শে আসবার জন্যই যেন নতুন সুরে কথা ক'য়ে উঠছে তার মন। কিন্তু কোনো মেয়েকে উদ্দেশ্য ক'রে কবিতা লেখা এক কথা; আব তাকে ভালোবাসা আর। কবিতা লেখার জন্য শুধু একটু উশকোনি দরকার—বাকিটা, যে লেখে তারই মনের কাণ্ড। কবিতা লেখার জন্য সব সময় ভালোবাসবার দবকার করে না; এমনকি, সত্যিকাব কোনো সংস্পর্শে না-এসেও তা লেখা যায়। যত মেয়েকে উপলক্ষ ক'রে একজন কবিতা লেখে, সবাইকে যদি ভালোবাসতে হ'তো তাহ'লে আর উপায় ছিলো না। কবিতা হচ্ছে মুহূর্তের একটা জ্ব'লে ওঠা, সেই মুহূর্তেই তার শেষ; মনের ক্ষণিক কোনো ভাবের বিভঙ্গ; তার সবগুলো কথাই যদি লেখকের ব্যক্তিগত অঙ্গীকার ব'লে ধরা হয়, এমন কবি নেই যে আপত্তি না করবে। হঠাৎ আলো লাগে মনে; অস্থায়িতার বৃন্তে টলমল ক'রে ওঠে ফুল; কে-ই বা তার হিসেব রাখে, আব কে-ই বা ফিরে তাকায়। তা নিয়ে একজনকে চেপে ধরা যায় না; সে নিজেই নিজের কাছে দায়ী নয়। আর পার্থপ্রতিম তা ভালো ক'রেই জানে; তাই সে তার মনে কোনো মোহ সঞ্চারিত হ'তে দেয়নি; মুহূর্তের জন্যও এমন অনুমান করেনি যে যেহেতু শ্রীলতা হয়ে উঠছে তার কবিতার মেয়ে, সে সেইজন্যই তাকে, যাকে বলে, ভালোবাসে। আর সত্যি বলতে, ভালোবাসা ব্যাপারটা থেকে তার মন স্বতই যেন একটু পেছিয়ে যায়; অত বেশি অন্তরঙ্গতা তার ভাবতে ভালো লাগে না। তার মনের মধ্যে একটা ভীরুতা আছে—সেটা কি নিরাপদ থাকার, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, না কি বুদ্ধির অতিরিক্ত চর্চায়, কল্পনার জিনিস নিয়ে বড়ো বেশি তন্ময়তার ফলে সে হারিয়ে ফেলেছিলো শরীরের জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ, যেখানে বাজছে রক্তের অণুতে অণুতে বাসনার সুর? অবশ্য একই কথা হ'লো; পার্থপ্রতিমের সম্পর্কে, অন্তত, একটা থেকে আর-একটাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু আমারও মনে হয়েছে, পার্থপ্রতিম পরস্পরের মধ্যে মিশে যাওয়া গোছের সম্পর্ক অপছন্দ করে, সে যেন নিজেকে দিতেই পারে না সে-রকম ক'রে, বেরিয়েই আসতে পারে না নিজের ভিতর থেকে। সে অপছন্দ করে সেই জিনিসই, যা তার নিজের ক্ষমতার বাইরে। আমার, অন্তত, তা-ই মনে হয়েছে।

আর এদিকে, শ্রীলতার কথা তো আগেই বলেছি, সে যে ঝোঁকের মাথায় কিছু ক'রে ফেলবে, তা সম্ভব নয়। তার চালচলন নেহাৎই সোজাসুজি; সে এত বেশি স্পষ্ট যে সে নিজের সম্বন্ধে যেটুকু বুঝতে দেয়, তার বেশি কল্পনা করা শক্ত। সে যদি পার্থপ্রতিমকে ভালোইবাসে, তাহ'লে নিজের কাছে সেটা লুকোবে না; আর নিজের কাছে না-লুকোলেই অন্যের কাছেও সেটা যথাসময়ে প্রকাশ পেয়ে যাবে। এখন এই দু-জনের মধ্যে মুশকিলই এই যে ওরা এত বেশি সহজ আর স্পষ্ট; যেখানে ভান নেই, সেখানে ভালোবাসা সহজে আসে না। যে-কোনো ভালোবাসার ব্যাপারেই প্রথম দিকটায় খানিকটা অচেতন, খানিকটা সচেতন অভিনয়ের দরকার। আমরা যদি যা মনে আসে তা-ই বলি,

যদি অন্যের মনকে স্পষ্ট বুঝেও তা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করি যদি সব সময় চেষ্টা না করি নিজেকে আড়ালে রাখবার—মোট কথা, দু-জনের মধ্যে যদি এটা প্রণয়ের যুদ্ধ না হয়, তা'হলে...তা'হলে প্রেম হয় না।

নিতান্ত খোলাখুলি ভাব বন্ধুদের মধ্যে ভালো, প্রণয়ীদের মধ্যে অসংগত। কেননা যাকে ভালোবাসি, তাকে দেখি সমগ্র জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে; তাব মধ্যে প্রচ্ছন্ন যেটুকু, তাতেই তার প্রকাশ; যেখানে তার রহস্য, প্রেমের রাজধানী সেখানেই। তাকে খানিকটা কল্পনা ক'রে না নিলে চলে না। কিন্তু ওরা দু-জন কল্পনার কোনো জায়গা রাখেনি, শ্রীলতা আর পার্থপ্রতিম, ওরা দেখছিলো পরস্পরকে বুদ্ধির আলোয় স্পষ্ট ক'রে। দু-জনে দু-জনের পর্যবেক্ষণে ছিলো সীমাবদ্ধ।

একটা দৃষ্টান্ত। এক বিকেলে (সেই বৃষ্টির সন্ধের পর শ্রীলতা মাঝে-মাঝে আসছে পার্থপ্রতিমের বাড়িতে) শ্রীলতা দরজায় টোকা না দিয়েই হঠাৎ ঢুকে পড়লো পার্থপ্রতিমের ঘরে, সে তখন টেবিলের উপর নিচু হ'য়ে কী লিখছে। 'না,' শ্রীলতা ব'লে উঠলো, 'আপনার বাড়িতে আর আসা যাবে না, দেখছি। সব সময় এত কী লেখেন? এসে কী যেন দোষ ক'বে ফেলেছি, মনে হয়।'

'দোষ আমারই।' পার্থপ্রতিম চোখ তুলে হাসলো, 'কিন্তু কতদিন যে আমি চুপচাপ ব'সে ছিলুম কি অনর্থক পাইচারি করছিলুম ঘরের মধ্যে কি—কি কিছুই করছিলুম না—তখন তো আপনি আসেননি।'

'এ-কথার জবাব পরে দেবো, এখন চুপ করছি—লেখা শেষ করুন।'

'শেষ করেছি। আপনি একেবারে ঠিক সময়ে এসেছেন।' পার্থপ্রতিম তার কাগজপত্র টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে তার উপর একটা বই চাপা দিয়ে রাখলো।

শ্রীলতা এসে দাঁড়ালো তাব চেয়ারের পাশে। জিগ্যেস করলে, 'দেখতে পাবি কী লিখেছেন?'

'সানন্দে।' পার্থপ্রতিম রাইটিং-প্যাডের উপরের পাতাটা ছিঁড়ে শ্রীলতার হাতে দিলো।

শাদা কাগজের উপর দিয়ে সরু-সরু সাপের মতো কয়েকটা লাইন চ'লে গেছে, মাঝে-মাঝে দু-একটা কথা কালি ভরতি ক'রে দিয়ে সযত্নে কাটা হয়েছে, দেখাচ্ছে যেন—উপমাটা শ্রীলতার তখন-তখন মনে হ'লো—শাদা দেয়ালের গায়ে ছড়ানো, মরা কয়েকটা মাছির মতো। তাব নিজের মনে শুড়শুড়ি দিলো উপমাটা। ভাবলে, পার্থপ্রতিমকে সেটা বলে কিন্তু শেষ মুহূর্তে কথাটা ঘুরিয়ে বললে, 'আপনার কাটা-কুটিগুলো তো চমৎকার হয়।'

'সমস্ত জিনিসটার মধ্যে আপনি কি ওইটুকুই পেলেন প্রশংসা করবার?'

'না-প'ড়ে যতটা প্রশংসা করা যায়...কিন্তু পড়ছি।'

ছোটো একটা কবিতার টুকরো, দু-মিনিট লাগলো না পড়তে। শ্রীলতা কাগজটা পার্থপ্রতিমকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, 'এই আমি প্রথম কোনো কবিতার প্রথম পাঠক হলুম। আমার বোধহয় রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত।'

'আমারও', হাসির উত্তরে হাসি ফিরিয়ে দিলে পার্থপ্রতিম। 'কেননা আপনার মতো প্রথম পাঠক এই আমার প্রথম জুটলো।'

'কোথায় ছাপা হবে?'

'দেখি।'

'মুখে বলতে যা লজ্জায় বাধে, তা বলবার জন্যই কবিতা। অথচ সেই কবিতা ছাপা হ'য়ে বেরোয়, পড়তে পায় যে-কেউ, মন্তব্য করতে পারে যেমন খুশি। তখন আর লজ্জা করে না। ভারি মজা।'

'বিশ্রী লাগে বইকি একটু। আমি তো কবিতা ছাপা হওয়া পছন্দ করি না। দান্তের সময়ে বেশ ছিলো; কবিতা লেখা হ'লে পাঠিয়ে দেয়া হ'তো অন্যান্য কবি-বন্ধুদেরই কাছে। এমনি বিনিময় হ'তো পরস্পরে—যথেষ্ট প্রচার। এখন ছাপাখানা কবিতার জাত মেরেছে। বাছা-বাছা কয়েকজনের

বেশি কবিতার পাঠকের দরকার করে না, সত্যি।'

'আমার তো মনে হয়, এমন এক ধরনের কবিতা আছে, যা অন্য একজন পড়লেই যথেষ্ট।'

'দুঃখের বিষয়', পার্থপ্রতিম হাসলো, 'এমন প্রায়ই হয় যে সেই মানুষের পক্ষে কবিতা আর প্রলাপ একই কথা। দান্তের বিয়াত্রিচের কথা সব যদি জানা যেতো—'

'আপনার অবস্থা, আশা করি, অত খারাপ নয়।'

'না—এ কবিতার বেলায়, অন্তত, তা-ই তো দেখা গেলো।'

শ্রীলতা কপাল কুঁচকোলো।—'আপনি এ-কথা বলতে চান না যে—'

'হ্যাঁ, আপনি', খোলা গলায় হেসে উঠলো পার্থপ্রতিম, 'সত্যি বলতে কবিতাটা আপনাকে লেখা। কিছু মনে করবেন না—এতে এতটুকু কিছু এসে যায় না।'

শ্রীলতা একটু চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, 'আমি অনেক দিন মনে-মনে ভেবেছি, কবিতার উদ্দিষ্টা হ'তে না জানি কেমন লাগে। এখন জানলুম।'

'কেমন আবার লাগবে। ওতে তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না।'

'কিন্তু আমি বরাবর ভেবে এসেছি যে ব্যাপারটা—ব্যাপারটা একটু অন্য রকম।'

'তাতে কোনো ক্ষতি হয় না, আর যা-ই হোক। আমি ঘরে ব'সে আপনার উদ্দেশ্যে যত খুশি কবিতা বানাতে পারি—আপনি যা আছেন, তা-ই থাকবেন। আপনার একচুল ক্ষতি নেই; আমার লাভ প্রতি পদে—প্রতি লাইনে।'

'বা রে, আমাকে ভাঙিয়ে আপনি ফাঁকের উপর লাভ ক'রে নেবেন!'

'কিন্তু কী-ই বা ক্ষতিপূরণ করতে পারি, বলুন। কবিতা লিখে যদি পয়সা হ'তো আমাদের দেশে, তবে না-হয় তা থেকে একটা পার্সেন্টেজ দিতুম আপনাকে। এর বেশি আর কী? কলম তো আর থামাতে পাবেন না।'

'এ যে দেখছি দস্তুরমতো exploitation!'

'দেখুন, আপনি যদি না হ'তেন তাহ'লে অন্য কেউ হ'তে পাবতো। রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে একবার মাত্র দেখেছি, এমন মেয়েকে ভেবেও আমি কবিতা লিখেছি। মনে যদি কোনো কথা থাকে বলবার, যে-কোনো ছুতো পেলেই তা বেরিয়ে পড়ে। তবু, এবারকার ছলটা যে আপনি হয়েছেন, সে-জন্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার অনুগ্রহে সত্যি কয়েকটা ভালো কবিতা লিখে ফেলেছি।'

'চমৎকার! শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিলো, কবিতার কারখানায় আমি যেন একটা যন্ত্র। তার বেশি কিছু না।'

চেয়ারের পিছনে মাথা হেলান দিয়ে পার্থপ্রতিম হেসে উঠলো। 'আচ্ছা,' হাসি থামলে পর নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবে—এমনভাবে, যেন বিষয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি—সে বলতে লাগলো, 'আচ্ছা, আপনার কি কখনো মনে হয়নি যে কীটসের কবিতা কখনো-কখনো এত বেশি মিষ্টি...'

দু-খানা চিঠি

পুজোর ছুটি এসে পড়লো। শ্রীলতার বাড়ির সবাই যাচ্ছে পুরীতে। পার্থপ্রতিমকে সে বললে, 'এবার আপনাকে আসতেই হবে আমাদের সঙ্গে।'

'দুর্ভাগ্য,' পার্থপ্রতিম বললে, 'আমাকে যেতে হবে সাঁওতাল পরগনার এক শহরে মা-কে নিয়ে।'

সত্যি বলতে এক মিনিট আগেও কিছু ঠিক ছিলো না; ধাঁ করে ব'লে ফেললো যা এলো মুখে। আর বলবার সঙ্গে-সঙ্গে তা যেন সত্যি ঠিক হ'য়ে গেলো। হ্যাঁ, সাঁওতাল পরগণাতেই সে

যাবে—যেখানে তার মামা ডাক্তারি করেন, তিনি অনেকদিন ধ'রে তাকে লিখছেন একবার আসার জন্য। তাঁর বাড়ি নাকি শহর ছাড়িয়ে, ভদ্রলোকের বসতি ছাড়িয়ে ধূ-ধূ মাঠের মধ্যিখানে, মনে হয় যেন পৃথিবীর শেষ সীমায়। সামনে দিয়ে চলেছে গেরুয়া রঙের এক পাহাড়ি নদী, পাথর থেকে পাথরে লাফ দিয়ে-দিয়ে অনায়াসে যা পার হ'য়ে যাওয়া যায়। মন্দ মজা হবে না, পার্থপ্রতিম ভাবলে।

শ্রীলতা চোখ তুলে তাকালো। 'এখন পর্যন্ত,' হঠাৎ সে জিগ্যেস করলে, 'কেন আপনি আমাকে ঠিক মেনে নিতে পারছেন না?'

পার্থপ্রতিম হালকা সুরে বললে, 'কারণটা যদি খুঁজেও পাই, তাতে কিছু এগোবে ব'লে মনে হয়?'

শ্রীলতা চুপ। সে হয়তো ভেবেছিলো যে পার্থপ্রতিম ভদ্রতার খাতিরেও প্রতিবাদ কববে একবার।

পার্থপ্রতিমই আবার বললে, 'আশা করি আপনাকে ক্ষুণ্ণ করলুম না।' কিন্তু শ্রীলতাদের সঙ্গে পুরী যাওয়ার প্রস্তাবে তাব মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না—তাদের সঙ্গে অতটা ঘেঁষাঘেঁষি ভাবতেই তার কেমন যেন খাবাপ লাগলো।

শ্রীলতা চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠলো হাসি। আস্তে বললে, 'আসল কথাটা আমি জানি—আপনিও জানেন। আপনি আমাদের মনে করেন অন্য জাতের, অন্য জগতের। কিন্তু তাই ব'লে এতটা পিঠ চাপড়াবার দরকার ক'রে না।'

পার্থপ্রতিম কথাটাকে টুকরো ক'রে দিলো হাসি দিয়ে। 'আসুন অন্য কোনো কথা বলি,' একটু পরে সে বললে।

সাঁওতাল পরগনার আকাশ এত নীল যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। তার দিকে তাকিয়ে, এক দুপুরবেলায়, জানলার ধারে ব'সে পার্থপ্রতিম আকাশ-পাতাল ভাবছে, এমন সময় তার নামে চিঠি এলো শ্রীলতাব কাছ থেকে।

'এখানে এসে,' শ্রীলতা লিখেছে, 'ক'দিন খালি বৃষ্টি আব বৃষ্টি। সমুদ্রের যা চেহাবা, তাকানো যায় না। সারাক্ষণ বেগে আছে; শাদা-শাদা দাঁত বেব ক'রে তেড়ে আসছে—যেন গিলে খাবে বিশ্ব-সংসার। কালো জল; শিষের বঙেব আকাশ; ছুঁচের মতো সরু সরু মুখে প্রায় অদৃশ্য বৃষ্টির ফোঁটা। যেন আত্মা পর্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হ'যে গেলো। ঘরে বসে বসে শুধু শুনেছি সমুদ্রের গর্জন, আর ভেবেছি, না-এলেই হ'তো এখানে; যে কোনো সময়ে বাড়ি বসে থাকাই সবচেয়ে ভালো। প্রতি বছর এই নিয়ম করে বেরোনো, সত্যি—শেষ পর্যন্ত এতে ক্লান্তি আসেই।

'ছুটিবিলাসীরা সব দু-দিনই হাঁপিয়ে উঠলো। বীচের ভিড় পাতলা, যারা প্রাণসংশয় ক'রেও স্বাস্থ্য ভালো করবে পণ করেছে, তারাই শুধু দু-একটা ক'রে ডুব দিচ্ছে বদমেজাজি সমুদ্রে। লোকে বলাবলি করছে, এমন খারাপ ওয়েদার এ সময়ে পুরীতে কখনো হয না—সীজনটাই এবার মাটি হ'য়ে গেলো। আমরা গরম দেশের লোক—সূর্য না-হ'লে আমাদের প্রাণ বাঁচে না। যে-সূর্য আমাদের গায়ের চামড়াকে করেছে এমন মসৃণ শ্যামল, তারই মধ্যে আমাদের প্রাণের উৎস। এ কী বিশ্রী ঘেরাটোপদেয়া আকাশ—সারা পৃথিবীটাবই যেন অসুখ করেছে, সে শুয়ে আছে জড়োসড়ো হ'য়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে।

ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন, আজ উঠেছে রোদ। আকাশের গায়ে এখনো লেগে রয়েছে টুকরো-টুকরো ছেঁড়া মেঘ, কিন্তু যেখানে নীল বেরিয়ে পড়েছে, সে একটা মির‍্যাকল। সমুদ্র আজ বেজায় খুশি—শেষ নেই ওর ছেলেমানষির। হাত-

পা তুলে লাফাচ্ছে আর চ্যাঁচাচ্ছে আর লুটিয়ে পড়ছে মুখ থুবড়ে। বীচ থেকে উচ্চহাসির আওয়াজ আসছে ভেসে। এক মোটা ভদ্রলোক সাঁতারের পোশাক প'রে আস্তে আস্তে যাচ্ছেন সমুদ্রের দিকে—ঠিক Oxo-র বিজ্ঞাপনের মতো দেখতে। একপাল ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে খিলখিল ক'রে হাসতে-হাসতে ছুটে যাচ্ছে বালির উপর দিয়ে—একজন পড়লো হোঁচট খেয়ে। আমি ভেবেছিলুম সে কাঁদবে, কিন্তু সে উঠে আরো বেশি জোরে হাসতে-হাসতে একমুঠো বালি তুলে ছুঁড়ে দিলে এগিয়ে যাওয়া সঙ্গীদের উদ্দেশে। খুশির ধুম প'ড়ে গেছে চারদিকে। বারান্দায় ইজি-চেয়ারে ব'সে দাদা পাইপ টানছেন, চেনা গন্ধ পাচ্ছি; পাশের ঘর থেকে আসছে বৌদির গুনগুনানি, অনুমান করছি তাঁর হাতে আছে রঙের তুলি। জানলা দিয়ে একটু চৌকো রোদ এসে পড়েছে আমার পায়ের কাছে—মাঝে মাঝে নিবে যাচ্ছে, যেমন মেঘ ঢাকছে সূর্যের মুখ—যেন একটা বেড়াল আদরের লোভে পায়ের কাছে এসে সাড়া না পেয়ে স'রে স'রে যাচ্ছে। আমি ব'সে আছি ঃ দেখছি; শুনছি; শুঁকছি। সকাল থেকে আমাকে আলস্যে পেয়েছে ঃ কখন থেকে ভাবছি নাইতে যাবো সমুদ্রে; উঠতে আর ইচ্ছে করে না। শেলফের উপর রয়েছে ম্যাক্স বিয়ারবোমের চমৎকার গল্পের বই ঃ অর্ধেকটা পড়েছি, বাকিটা পড়তে ভীষণ কৌতূহল—তবু, হাত বাড়ালেই যদিও বইটা পাই, হাত বাড়ানোই হ'য়ে উঠছে না। সময় আলগোছে, অলক্ষিতে খ'সে খ'সে প'ড়ে যাচ্ছে হাত থেকে, কিছুই হচ্ছে না। মানুষ সুখ খোঁজে, আমোদ খোঁজে, ভালো লাগবে ব'লে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটোছুটি করে, ওড়ায় পয়সা, বাড়ায় সরঞ্জাম, কত তার আয়োজনের ঘটা, কী বিষম তার দাপাদাপি। কিন্তু এই যে নিজের মনে চুপচাপ ব'সে থাকা, কিছু না-করায় ভ'রে ওঠা সকালবেলা—এটাই বা কী কম? আমার এই আলস্যের নেশা থেকে আপনাকে চিঠি লিখছি ঃ আপনি এখন কী করছেন?

'ছুটিতে বেড়াতে এসে যাদের সঙ্গে সাধারণত দেখা হয়, তারা কেউ আবির্ভূত হয়নি—এখন পর্যন্ত না। ভাবছি, পুরী কি জাতে নেমে গেছে শৌখিন সমাজে, তবু ভিড় তো কিছু কম দেখিনে। কিন্তু তারা বোধ হয় এ-ক'দিন চাপা প'ড়ে ছিলো বৃষ্টিতে—এইবার বেরোবে এক-এক ক'রে, গর্তের ভিতর থেকে রোদ-পোহাতে আসা চকচকে, শ্লথগতি সাপের মতো। (উপমাটা ঠিকই হয়েছে ঃ মনে ক'রে দেখুন তাদের শাড়ির ঝলমলানি—আর কী-রকম পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে শরীরটাকে জাপটে ধ'রে তা উঠে গেছে পায়ের গোড়ালি থেকে বুক পর্যন্ত, তারপর হঠাৎ সরে গিয়ে পিছলে পড়েছে বাঁ কাঁধের উপর—কোথায় লাগে তার কাছে সাপের খোলশ!) ইতিমধ্যেই একজন এসেছিলেন—আমাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটা গোলাপি রঙের গোল বাড়িতে থাকেন তাঁরা—একেবারে—এইবার অবহিত হোন—আস্ত, জ্যান্ত এক আই. সি. এস-এর স্ত্রী—তিনি (মানে, আই. সি. এস.টি) আবার গল্প লেখেন! তিনি (মানে, আই. সি. এস-পত্নী) বললেন, সমুদ্রটা "aw-f 'ly dull," লোকে যে কী দেখতে পায় এর মধ্যে। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, "কই, সবাই তো পায় না", কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুবুদ্ধি হ'লো; খ'সে পড়লুম সেখান থেকে। ভাগ্যিস বৌদি ছিলেন। পৃথিবীতে বৌদির অস্তিত্বের জন্য মাঝে মাঝে এত কৃতজ্ঞ বোধ করতে হয়!

'মোটের উপর, এখন পর্যন্ত বলতে গেলে একাই কাটাচ্ছি। একা। কথাটা আমার পক্ষে বরাবর ভয়ের মতো ছিলো—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একা থাকাটাও বেশ ভালো ঃ হাঁশফাঁশ করা, ছটফট করা—মস্ত কীর্তির ইমারৎ গ'ড়ে তোলা যেমন অনেকখানি, চুপ ক'রে থাকা, কিছু না-করা—সেটাও কিছু কম নয়। মনে হচ্ছে,

ছুটি কাটাতে আমরা যেখানে আসি—যে-সব দরকারি শখের জায়গা—সেখানে এসে তো কলকাতারই জীবন, খামকা শুধু ম্যাপের এক ডট থেকে অন্য ডটে স'রে এলুম। ছুটিটা হবে মনের, শুধু ক্যালেণ্ডারের লাল তারিখের নয়। যদি দেশসুদ্ধ লোকের একই দিনে ছুটি না হ'তো তাহ'লে এত ঠেলাঠেলি হ'তো না; আর তা হ'লেই মানে হ'তো ছুটির। পুরীতে আসতে চাননি বলে আপনার সুবুদ্ধির তারিফ করছি : অনেক ভালো সাঁওতাল পরগনার নির্জনতা—হওয়া উচিত, অন্তত, কারণ সেখানে এমন-কোনো বিখ্যাত জিনিস নেই যাকে "aw-f 'ly dull" ব'লে কোনো আই. সি. এস-গৃহিণী আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে পারেন।

'সেই জঙ্গলে ব'সে আপনি কি বেন জনসনের "ডিসকাভরিজ" পড়ছেন, না কি ডুব দিচ্ছেন রবার্ট হেনরিসনের এখানে-ওখানে—শুধু দেখতে, কেমন—না কি ব্রাউনিঙের জটিলতর কবিতার সঙ্গে কুস্তি করছেন? না কি, মুখ বদলাবার জন্য গ্রীক নাটক, এবার? কী লিখছেন? নতুন কবিতা? যদি আপনার কোনো আলগা কবিতা প'ড়ে থাকে হাতের কাছে, যাতে আপনার এক্ষুনি কোনো দরকার নেই, চিঠির সঙ্গে ভ'রে পাঠিয়ে দেবেন আমাকে? হঠাৎ ইচ্ছে হ'লো।'

পার্থপ্রতিম চিঠিটা একবার পড়লো, দু-বার পড়লো, সারাদিন ধ'রে মনের মধ্যে গুনগুনানি শুনলো তার; তারপর রাত্রে শোবার আগে উত্তর লিখলো :

'পুরীতে গিয়ে আপনার খুব ভালো লাগছে জেনে খুশি হলুম। আমার এত ভালো লাগলো আপনার চিঠি পড়তে—তা-ই থেকে বুঝতে পারছি। সব জড়িয়ে নিশ্চয়ই চমৎকার—সমুদ্র আর আই. সি. এস-এর স্ত্রী—আর যা কিছু আপনি লিখেছেন। আর, সঙ্গীও আপনার জুটবে—যথাসময়ে। মানুষকে কথা কইতে হয়—অন্তত, মাঝে মাঝে। সম্প্রতি, বাক্যহীনতার চাপে আমি মারা যাচ্ছি। বিশেষত, আপনার চিঠি পড়বার পর কথা বলার ইচ্ছেটা যেন একটা ব্যাধির মতো হয়ে উঠছে। মানুষ ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করে—আবার মানুষ না-হ'লেও কারো প্রাণ বাঁচে না; কোনোদিকেই নিস্তার নেই। জীবনটা এমন জট-পাকানো।

'এখানে এমন নির্জন আর রাত্রি এত গভীর আর তারাগুলো এমন ক'রে তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে—আশ্চর্য। মানুষের কাজ আর ভাবনা, কথা আর জল্পনার পরিধির বাইরে যে রহস্যে আবছায়ায় গুঞ্জনে ইঙ্গিতে ভরা এমন এক বিশাল জগৎ রয়েছে, তা আমরা সাধারণত অনুভব করি না, কিন্তু যখনই করি, কেমন চমকে উঠতে হয়। কখনো ভাবিনি, রাত্রি এত কাছে এসে এমন নিবিড় ক'রে চেপে ধরতে পারে বুকের উপর, কথা কইতে পারে কানের কাছে মুখ রেখে—কী কথা, তা ঠিক বুঝি না, শুধু একটু যেন ভয় ক'রে শুনতে, আরো বেশি ভালো লাগে। এই রাত্রি একটা মহান উপস্থিতির মতো; আকাশে-আকাশে ছড়িয়ে-যাওয়া এই জমাট অন্ধকার—আর কী অন্ধকার! আমাদের শহরে চোখে এই অন্ধকারই মনে হয় যেন কতকালের হারিয়ে যাওয়া একটা জিনিস ফিরে পেলুম। রাত্রির খোলা জানলার দিকে তাকালে—ঠিক যেন কেউ একটা মিশকালো পরদা ঝুলিয়ে রেখেছে সেখানে, এমনি লাগে চোখে। সবুজ আলোর হিজিবিজি নকশা এঁকে যায় জোনাকির দল—অবাক হ'য়ে আমি তাকিয়ে থাকি। ঝিঁঝি ডাকে একঘেয়ে সুরে, যেন সন্ধ্যার পৃথিবীর ভিতর থেকে উঠছে ক্লান্তির কারুণ্য। আর, এখানকার রাত্রিতে কত রকম শব্দ, দূরের বন থেকে

ভেসে আসে অস্পষ্ট মর্মর, পাখি উড়ে যায় ডানার ঝটপটানির ঢেউ তুলে, ঘাসের মধ্যে খশখশ ক'রে দ্রুত গতিতে কী চলে যায়—অথচ সব মিলিয়ে এমন এক স্তব্ধতা, যার কাছে এলে বুদ্ধির যেন বিলোপ ঘটে। (প্রসঙ্গত, প্রকৃতির খুব নিবিড় মাখামাখিতে, দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত মানুষই পরাস্ত হয়; যাদের বলা যেতে পারে প্রকৃতির জীব, তারা কখনো সভ্যতার কোনো স্তরেই উঠতে পারেনি, এবং—অতীত ইতিহাস দিয়ে বিচার করতে গেলে, পারবেও না। আমাদের দেশের সাঁওতাল ইত্যাদি আদিম জাতিদের 'আদিমত্ব'টা কোথায়, এই রাত্রির দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারি। মানুষের পক্ষে এটা বড়ো বেশি—বড্ড বেশি। ভারতবর্ষের সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে গঙ্গার ধারে-ধারে। সেখানে তারা প্রকৃতিকে পেয়েছে প্রথমত সব প্রয়োজন মেটাবার দাসী হিসেবে—তারপর অবসর সময়ে একটু বিলাস করবার সঙ্গিনী রূপে। নদীতীরবর্তী সমতল ভূমিতে প্রকৃতি দেখা দিয়েছে সংকীর্ণ হ'য়ে, পরিমিত হ'য়ে, মানুষের ভোগের যন্ত্র হ'য়ে। যেখানে তা হয়নি, মানুষ যেখানে প্রকৃতির 'অন্তরঙ্গ' সেখানে বলতে গেলে মানুষই নেই। বিষুবরেখার আর মেরুপ্রদেশের সমীপবর্তীদের কথা ভাবুন।)

'বাড়ির কাছে আছে একটা নদী—ভদ্রতা ক'রে তাকে নদী বলতে হয়, নাম তার চল্‌নি। জানি না, এ-নাম এখানকার বাঙালিদেরই দেয়া কিনা, কিন্তু সে যে চলে তাতে সন্দেহ নেই। এই তো ছোট্ট দেখতে, অথচ কী তার স্রোত—যেন কোথায় গিয়ে পৌঁছতে হবে এক্ষুনি, সময় নেই একটুও। হাসি পায় দেখে, ছোটো মেয়ের যেন গিন্নি-গিন্নি খেলা। মাঝে-মাঝে বড়ো-বড়ো কালো পাথর মাথা উঁচিয়ে আছে—তাতেই চলে সাঁকোর কাজ; আর সন্ধ্যাবেলা হয়তো সেই পাথরে এসে বসে কালো কোনো সাঁওতাল মেয়ে, লালচে, ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে।

'এ-নদী কোনো কাজেই লাগে না; জলভরা এর বালি; আর এত কম জল যে সব চেয়ে যেখানে গভীর সেখানে হয়তো কোমর ডোবে না, তবু নামার উপায় নেই স্রোতের তাড়নায়। এ শুধু চলতে চলতে হেসে ওঠে খিলখিল ক'রে, তার জলে পা ডুবিয়ে ব'সে থাকা সাঁওতাল মেয়েরই মতো। এ শুধু দেখতে সুন্দর—আর সেটা অবশ্য কম কথা নয়।

'কাল বিকেলে চল্‌নির ধারে গিয়ে দেখি, হলদে রঙের একটা সাপ প'ড়ে আছে নিঃসাড় হ'য়ে, রোদ চিকচিক করছে তার গায়ের খোলসে, টান, যেন একটা কাঠি; বিছিয়ে দিয়েছে চিকচিকে মসৃণ শরীরটাকে সূর্যের নিচে। অন্য সময় হলে আমি নিশ্চয়ই ভয় পেতুম, তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতুম সেখান থেকে। কিন্তু তখন, আমি যেন মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম—টান ক'রে মেলে-ধরা তার উজ্জ্বল শরীরের দিকে, শান্ত-সোনালি বিকেলে মিলিয়ে-যাওয়া তার গভীর, গভীর তৃপ্তির দিকে। সে একটুও নড়ছিলো না, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে লাগলুম—তার ছোট্ট সোনালি মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত একেবারে স্তব্ধ। এখন একটা ঢিল তুলে নিয়ে মাথায় ছুঁড়ে মারলেই—ব্যস্। কিন্তু আমার তখন মনে হ'লো, ওকে আমি কেন মারতে যাবো? আমি ওকে মারবার কে? এই সূর্যের উপর ওর অধিকার আছে আমারই মতো; ওর জীবন ঠিক ততটাই ওর, যতটা আমার জীবন আমার। আমি হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলুম ওই সাপের সঙ্গে অস্তিত্বের সম স্তরে, সূর্যপ্রার্থী, প্রাণ-লিপ্সু। সেখানে তার সঙ্গে আমার যদি কিছু প্রভেদ থাকে, তা শুধু এই যে তার রং সুন্দর সোনালি, আর আমার ম্যাটমেটে তামাটে। তুলনায় ঠকবো আমিই।

'খানিক পরে সাপটা একটু ন'ড়ে উঠলো, তারপর শ্লথ, অলস গতিতে

এঁকেবেঁকে চ'লে গেলো একটা ঝোপের আড়ালে, আমার দৃষ্টির বাইরে। সে চ'লে গেলো ব'লে আমি খুশি হলুম; আরো খানিকক্ষণ থাকলে হয়তো বসতুমই একটা ঢিল ছুঁড়ে। সাপটাও যেন আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলো না, ভয় পেয়ে পালাচ্ছে, এমন কোনো লক্ষণ দেখলুম না তার। অনেক জায়গা এখানে; অনেক আলো, অজস্র সূর্য; দরকার করে না কাড়াকাড়ি মারামারি করবার। যে-সাপ ভয়ংকর, যাকে চোখে দেখলেই আঁৎকে উঠতে হয়, এখানকার এই সোনায়-নীলে ঝলোমলো আকাশের নিচে, দিগন্তে লুটিয়ে-পড়া মাঠের মাঝখানে, হাসিতে আলোতে চঞ্চল এই চল্‌নি নদীর ধারে, তাকে এমন সুন্দর মানিয়ে গিয়েছিলো যে অনায়াসে মনে করা যেতো সে এক স্থানীয় দেবতা, কোনো গহ্বরের উষ্ণ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে মুহূর্তের জন্য চুপে-চুপে, নিয়ে এসেছে সূর্যের কাছে কোনো নিবিড় গহন প্রাণের প্রার্থনা। অকারণ নয়, দক্ষিণী আদিমদেব প্রধান দেবতা যে সাপ।

'এখন দুপুর। ঝাঁ-ঝাঁ করছে আকাশ; অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে চল্‌নির ছলছলানি। খাওয়ার পর ইজিচেয়ারে ব'সে ব'সে একটু তন্দ্রর মতো এসেছিলো, রোধ করবার চেষ্টা করিনি। এখানে এসে কেবলই মনে হচ্ছে, অনেক সময় আছে। দু-হাতে অনায়াসে ছড়ানো যায়, এত সময়। তাড়া নেই কোনোকিছুর। এখানে খবরের কাগজ আসে বাসি হ'য়ে; আমি তা ছুঁইও না। সময়ের বাইরে চ'লে যেতে বেশ লাগে; বর্তমানের প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবার চেষ্টা কেনই বা—পিছিয়ে পড়া বেশ, খুব ভালো থমকে দাঁড়ানো, নিশ্চল উদাসীনতায় হারিয়ে যাওয়া। আসবার সময় বাক্সে জায়গা ছিলো না ব'লে শুধু একখানা বই নিয়ে এসেছি—পাতলা কাগজের এক ভল্যুম নিয়েই যাচ্ছি, পড়া আর হবে না। বই ঘেঁটে ঘেঁটে প্রায় ঘেন্না ধ'রে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন দেখছি বই-ই আমাদের একমাত্র ত্রাতা। বেচারা সুইফটকে তুলো ধুনে ফেললুম। বাড়িতে কতগুলো বাঁধানো মাসিকপত্র আছে; তাদের দু-একটা করে পাতা ওলটাই, পাছে চট করে ফুরিয়ে যায়। এমন জিনিস পড়তে ইচ্ছে করছে, এখানকার নিঝুম নিরিবিলির সঙ্গে যা মানিয়ে যায়; গল্প নয়, না, কবিতাও না—বাঁধা-ধরা যে-সব সাহিত্যরূপ আছে, তার কোনোটাতেই মন ঠিক সাড়া দিতে পারছে না। এমন লেখা, যা বেসরকারি, যা নিরুদ্দেশ, যা দৈবাৎ এসে পড়েছে কোনো এক খেয়ালের ঝোঁকে—যা বিশেষ কোনোখানেই নিয়ে যায় না, অগোছালোভাবে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। ও-রকম অনেক বইয়ের নাম মনে পড়ছে, তাদের একখানাও যদি থাকতো এখন আমার কাছে! মনে মনে ভেবেই সুখ পাচ্ছি। আপনি চেয়েছেন আমার কবিতা পড়তে, কিন্তু, হায়, আমার লেখার তাড়া সব র'য়ে গেছে কলকাতায়; একটা টুকরো নেই যে আপনাকে পাঠাতে পারি। নতুন ক'রে যে লিখে দেবো, তাও এক্ষুনি হ'য়ে উঠবে না—আকাশ দেখে-দেখেই কেটে যাচ্ছে সময়।'

প্রস্তাবনা

এখানে ছেড়ে যাচ্ছি অনেকগুলো মাসের অবান্তরতা। ইতিমধ্যে ওরা এম. এ. পরীক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে নিরাপদে এসে অবতীর্ণ হ'লো প্রথম শ্রেণীর নরম মাটিতে; দু-জনার মাঝখানে রইলো অনেকগুলো নম্বরের জমি। উঠে ব'সে, গা হাত-পা ঝেড়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ওরা মুচকি হাসলো। মজা মন্দ নয়।

ফল যা হ'লো, কোথাও কোনো বিস্ময়ের উদ্রেক করলে না। ইউনিভার্সিটির সবাই বলাবলি করলে, 'জানতুম!' পার্থপ্রতিমকে কেউ আমলের মধ্যেই আনলে না, শ্রীলতার ছবি বেরোলো 'প্রবাসী'তে ও কোনো-কোনো মেয়েদের মাসিকে। সে সৃষ্টি করলে একটু সাময়িক চাঞ্চল্য সাময়িক পত্রের পাঠকদের মধ্যে; ফোটোগ্রাফটা ছিলো ভালো।

যার উপর পার্থপ্রতিম মন্তব্য করলে, 'শিম্পাঞ্জিকে চুরোট খেতে দেখলে আমরা এমনি বাহবা দিই। আপনার আপত্তি করা উচিত।'

শ্রীলতা বললে উত্তরে, 'ছাড়া যে পেয়েছি, সেই আনন্দে ক্ষমা করতে পারছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—এবং আপনাকেও।'

পার্থপ্রতিম বললে, 'যে-কোনো কাজ তা যতই তুচ্ছ হোক, অর্থহীন হোক—ভালো ক'রে করতে পারার একটা আনন্দ আছে বইকি।'

শ্রীলতা বললে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'কী আরাম, ভাবুন একবার—এতদিনে অধিকার পেলুম শুধু সে-সব বই পড়ার, সত্যি যা ভালো লাগে। এখন বুঝতে পারবো কোনটা লোকে ভালো বলে ব'লে ভালো মনে করি, আর কোনটা ভালো লাগে আমার নিজের।'

'মস্ত লাভ!' পার্থপ্রতিম সায় দিলে, 'তারই জন্যে সার্থক এতদিনের এত যন্ত্রণা!'

ছাত্ররা যারা দেখছিলো দূর থেকে সকৌতুকে এই বিদ্যে-ফলানো হাইজাম্প, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আশা করেছিলো—দুরাশা করেছিলো, বলা যায়—যে শেষ পর্যন্ত পার্থপ্রতিম নেমে যাবে—তাহ'লে কথা বলবার মতো কিছু হ'তো বটে। কিন্তু যা ভাবা গিয়েছিলো, তা-ই যখন ঘটলো, তাদেরই দেখা গেলো সবচেয়ে উল্লসিত—'হাজার হোক, মেয়ে তো!' তারা বললে, 'কত আর হবে!' অক্ষুণ্ণ রইলো তাদের পৌরুষের মান; বাঁচলো তারা হাঁপ ছেড়ে।

একদিন সকালে চায়ের টেবিলে ব'সে শ্রীলতার দাদা কুমুদনাথ কথায়-কথায় বললেন, 'শ্রীলতার এবার বিয়ে হ'লে ভালো হয়।'

নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে শ্রীলতা স্টেটসম্যানের পাতা থেকে চোখ তুলে তাকালো।

মানসী, শ্রীলতার বৌদি, নিজের পেয়ালায় আর একটু চা ঢালছিলেন, হাত থেকে পাত্রটি নামিয়ে রেখে বললেন, 'যত দিন যাচ্ছে, বিয়ে ব্যাপারটা শক্ত হ'য়ে উঠছে ততই। এমন-কোনো ছেলেই নেই, যার কথা ভাবা যায়।'

কুমুদনাথ বললেন, 'একটা বয়স আছে, যার পরে মেয়েদের বিয়ে না হ'লে আর মানায় না।'

'আজাকালকার ছেলেদের যেন কী হয়েছে, বিয়ে করতেই চায় না—আর যারা চায় তাদের চাওয়াতে কিছু এসে যায় না।' মানসী তাঁর মন্তব্য নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন।

'সাহস পায় না, বলো।'

কুমুদনাথের মন চ'লে গেলো কয়েক বছর আগে, যখন বিলেত থেকে বীমা-কোম্পানির নবিশির পালা সেরে দেশে এসে তাঁর দেখা হয়েছিল মানসীর সঙ্গে। প্রথমটায়, তিনিও পাননি সাহস। তাঁর কাছে বড়ো বেশি আশা করা হচ্ছে, তিনি অনুভব করেছিলেন। প্রতি পদে যেন তাঁকে নেয়া হচ্ছে বাজিয়ে; মানসীর পরিবারে তাঁর যেটুকু খাতির তা সবই বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, নির্দিষ্ট একটা পরিণতিকে লক্ষ্য ক'রে, তা থেকে কখনো তিনি এতটুকু ভ্রষ্ট হয়েছেন ব'লে যদি সন্দেহ করা যায়, তাহ'লে মুহূর্তের মধ্যে সব জমে যাবে বরফ হয়ে। মোটের উপর, ব্যাপারটা আরামের নয়; আরামের নয়, সব সময় সতর্ক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরীক্ষার নিচে থাকা; সব সময় মনে ক'রে রাখা সেই দায়িত্ব, যে-দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হবে ব'লে নীরব বোঝাপড়া হয়েছে। ব্যাপারটা রীতিমতো মন খারাপ করে দেয়া—কষ্টের, প্রায়। কিছু বলতে গেলে বলতেই হবে যে এই হচ্ছে 'প্রেম করা', কিন্তু তাতে সুখ ছিলো না কোনো; ঠিক যেন আঁটোসাঁটো শুকনো এক টুকরো কর্তব্য, যা করতে

হয় নিজের গরজে নয়, লোকমতের খাতিরে। আর এ-ই যে চলবে ভালোবাসার নামে, কুমুদনাথ তাতে মনে মনে আহত হয়েছিলেন; সারাটা সময় নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হয়েছিলো তাঁর। বিয়ে করে বাঁচলেন তিনি। মেয়েটি—মহিলাটি বলা উচিত—যেন হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—দরজায় কড়া পাহারা। প্রার্থী এলো, বের করলো পকেট থেকে তার টিকিট—তার পরিচয়পত্র, তার সুপারিশের চিঠি—অনেক তার যাচাই, দীর্ঘ তার পরীক্ষা; তারপর সে-সব যদি কপালগুণে পেরোতে পারলো তো মেয়েটি মনে মনে মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে অলসভাবে মাথা এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।' একে, আর যা-ই হোক, 'প্রেম করা' বলে না।

স্বামীর অন্যমনস্ক মুখের দিকে তাকিয়ে মানসী বললেন 'সাহস যদি না পায় তো সাহস দিতে হবে।'

শ্রীলতা ছিলো এতক্ষণ চুপ করে, এইবার বলে উঠলো, 'তোমরা দু-জনে মিলে তাহলে ঠিক করে ফেলো আমার ভাগ্য।' তার কথার সুরে ছিলো ঝাঁঝ, আর সেই সঙ্গে পরিহাসের লঘুতা—যার অভাবে ঝাঁঝ তেতো হয়ে উঠতে পাবতো।

কুমুদনাথ চোখ দিয়ে হাসলেন শ্রীলতার দিকে তাকিয়ে। তিনি আশাই কবেছিলেন যে শ্রীলতা এ-রকম কোনো মন্তব্য করবে। বোনকে তিনি জানতেন ভালো করেই ঃ সে যখন বেণী দুলিযে ইশকুলে যায়, তখন থেকেই তাঁর উপর তার ভার। আর তিনি তাকে বেড়ে উঠতে দিয়েছিলেন নিজের ইচ্ছেমতো, নিজেরই প্রাণের শক্তিতে। যে-ইচ্ছা, যে-খেয়ালিপনা আমাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কঠোর চেষ্টায় চাপা দিয়ে রাখা হয় প্রতি মুহূর্তে, কুমুদনাথ জানতেন তারই মধ্যে মানুষেব জীবনের উৎস। তিনি যত্ন নিয়েছিলেন সেই ক্ষীণ, সূক্ষ্ম আগুন যাতে নিবে না যায়। শ্রীলতাকে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, যাতে সে অবকাশ পায় নিজের মধ্যে নিজে ফুটে ওঠবার, যাতে সে বইতে পারে—এবং বইতে চায়—তার নিজের দায়িত্ব। শ্রীলতা কী করে, কোথায় যায়, কী করে কাটায় সময়, তিনি কখনো তার খোঁজ নিতে যান না; কখনো তাকে গায়ে-পড়া প্রশ্ন করেন না। আর তিনি ভালোবাসতেন তার মুখের উষ্ণ রং, তার মুক্ত, ঋজু ভঙ্গি, নিজের মধ্যে তার সম্পূর্ণতার ভাব। 'এ মেয়ে যাকে ভালোবাসবে,' মনে মনে তিনি বলেছেন, 'তাকে ভাগ্যবান হলে চলবে না, ভাগ্যকে তার তৈরি করতে হবে।'

'তুই যদি মনে মনে কিছু ঠিক করে থাকিস—অন্তত ভেবে থাকিস', মুখে তিনি বললেন, 'সেটাই আমরা জানতে চাই।'

'বিয়ে কি করতেই হবে—এখনই?'

'যদি করতেই হয়—আর না ক'রে শেষ পর্যন্ত চলেও না—তবে তো এখনই ভালো।'

শ্রীলতা একটা চামচ দিয়ে পেয়ালার গায়ে মৃদু টোকা দিতে লাগলো, কিছু বললো না।

'যদি ভুল বুঝে না থাকি', একটু পরে কুমুদনাথ বললেন, 'তাহলে পার্থপ্রতিমকে একবার ডেকে পাঠাই। অনেকদিন সে আসে না।'

ঈষৎ লাল হ'লো শ্রীলতার গাল। মুখ নিচু ক'রে তাকিয়ে রইলো শূন্য পেয়ালার মধ্যে।

'পার্থপ্রতিম!' মানসী ঠোঁটের কোণে হাসলেন। 'ভালো ছেলে, কিন্তু জুতোর খরচ জোগাতে পারবে তো!' গাঢ়তর হলো শ্রীলতার মুখের রং।

'সেটা,' কুমুদনাথ বললেন, 'খুব জরুরি কথা, কিন্তু আপাতত সেটা মুলতুবি থাকলেও ক্ষতি নেই।'

স্বামীর এই চটুলতায় মানসী বিস্মিত হলেন। চোখ ঝলসে বললেন, 'তুমি কি সত্যি-সত্যি ভাবছো—'

'আমি তো মনে মনে পার্থকেই ঠিক ক'রে রেখেছি। এখন শ্রীলতা মত করলেই—'

কুমুদনাথ তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না, মানসী বাধা দিলেন—'কী পাগলামি! কোথাকার

কে, সহায় নেই, সম্বল নেই—না হয় পরীক্ষা পাশ করতে ভালোই পারে— তা এমন তো কত ছেলেই আছে দেশে। দ্যাখো গিয়ে খোঁজ নিয়ে তারা কে কী করছে।'

শ্রীলতা মৃদুস্বরে বললে,—না বলে পারলো না, 'ও যদি কিছু না হয়, তাহলে ও কিছুই নয়, আর যদি কিছু হয়, তার কারণ এ নয় যে ও ভালো পরীক্ষা পাশ করতে পারে।'

'আর তাছাড়া,' কুমুদনাথ বললেন, 'ওর মতো ছেলেকে ঠেকিয়ে রাখবে কে?'

'তাহ'লে,' মানসী কথাটাকে প্র্যাকটিকাল স্তরে নামিয়ে আনল, 'ওকে বলো আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে, তারপর যদি—'

'বেশ বলছো! ওকে কষ্ট ক'রে আই. সি. এস. দিতে হবে, ঢুকে পড়তে হবে যেমন করে হোক সেই জ্যোতিশ্চক্রে, ঘুরে আসতে হবে বিলেত, তারপর—তারপর যদি—! কী দয়া! আর তখনও পার্থপ্রতিম সেই মানুষই, যা সে এখন আছে।'

'মানুষ দেখে আবার বিয়ে হয় কবে!'

'আমারও প্রায়ই মনে হয়েছে, মেয়েরা যেন খাঁচায় পোরা রংচঙে পাখির ঝাঁক—খাঁচার গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা FOR SALE। আসছে আই. সি. এস., আই. ই. এস., আই. পি. এস.-এর দল ঃ বেছে-বেছে নিয়ে যাচ্ছে যার যেটিকে পছন্দ। এই হ'লো ম্যারেজ আ লা মোড।'

হঠাৎ রক্ত উঠে এলো মানসীর সুন্দর মুখে। 'মেনে নিলুম তোমার ঠাট্টা, কিন্তু—তুমি কী বলো? ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে গভীর, প্রেম—না, কী?'

'ছেঁড়া কাঁথাই হ'তে হবে, তার মানে নেই। কিন্তু—তোমাদের যুগের বাঙালি মেয়েরা—কী তারা? জীবনের অর্ধেক তারা কাটিয়ে দেবে মাঝে মাঝে আয়নায় মুখ দেখে আর সময় পেলে একটু সেতার নিয়ে টুংটাং ক'রে ঃ আর যেই আসবে কোনো লোক, যার আছে আশানুরূপ অর্থ আর প্রতিপত্তি, নির্বিবাদে ঢ'লে পড়বে তার কোলে—তার মোটরগাড়ির কোলে, বলা যায়। এদিকে সেই লোকটি—বাইরের দিক থেকে জীবনকে সে যেটুকু বাগে আনতে পেরেছে, তার জন্য তাকে হয়তো সইতে হয়েছে কত দুর্ভোগ, যেতে হয়েছে কত দুঃখের ভিতর দিয়ে, নিজেকে পীড়ন করতে হয়েছে কত কঠিন পরিশ্রমে। সে-সময়ে তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি। তার স্ত্রী ছিলো না দুঃখের ভাগ নিতে, সে এলো মজা লোটবার বেলায়। It isn't fair.'

'মনে মনে রাগ থাকলে,' একটু চুপ ক'রে থেকে মানসী বললেন, 'এমন কোনো জিনিস নেই, যাকে বিকৃত করে দেখা না যায়।'

'সে তুমি যেমন মনে করো', বলে কুমুদনাথ সিগারেট ধরালেন।

এর পর খানিক চুপচাপ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোথায় যেন সূক্ষ্ম চিড় ধ'রে গেলো; যেটুকু বলা হ'লো, তার আড়ালে ঝিলিক দিয়ে উঠতে লাগলো অনেকটা অব্যক্ত। এ অবস্থায় কিছু না বলাই সবচেয়ে ভালো। কুমুদনাথ তাঁর সিগারেটে একটা কিছু পেলেন করবার; মানসী টেবল-ক্লথের উপর নখের আঁচড় কাটতে লাগলেন; শ্রীলতার অস্বস্তি স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

হঠাৎ মানসী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাই, চায়ের টেবিলে সারা সকাল ব'সে থাকলেই তো চলবে না।'

'বেলা হয়ে যাচ্ছে আমারও। কিন্তু, শ্রীলতা, তোমার কথা তো শোনা হ'লো না।'

'আমাকে একটু ভাবতে দাও, দাদা; পরে বলবো তোমাকে।'

সে-দিনের সমস্তটা শ্রীলতা কাটালো তার ঘরের মধ্যে। চেষ্টা করলো ভাবতে, পারলো না। বসলো বই নিয়ে, মন বসলো না। দু-লাইন পড়া হ'তেই খেই যায় হারিয়ে; সে তাকিয়ে থাকে বইয়ের পৃষ্ঠার দিকে, দেখতে পায় না কোনো অক্ষর। বিরক্ত হ'য়ে বই ফেলে রেখে সে ঘুমোতে চাইলো; ঘুম এলো না। চোখ বুজে সে চেষ্টা করলো, কিছু না-ভাবতে, একেবারে কিছু না-ভাবাই তার মনে হ'লো সবচেয়ে ভালো। কিছু না, একটা শূন্যতা, ঘুম। কিন্তু অনেক দূরে ঘুম; অনেক, অনেক দূরে।

চোখ বুজে থাকতে তার যেন রীতিমতো কষ্ট হ'তে লাগলো। চোখ মেলে সে তাকিয়ে রইলো জানলা দিয়ে আকাশে। দিন যেতে লাগলো কেটে। তারপর, সন্ধেবেল, কুমুদনাথ যখন আপিশ থেকে ফিরে এসে বসেছেন দক্ষিণের বারান্দায় ডিটেকটিভ উপন্যাস হাতে নিয়ে, শ্রীলতা গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালো।

'কী লতা?' কুমুদনাথ বই থেকে চোখ তুললেন। শ্রীলতার চোখের পাতা কেমন ভারি হ'য়ে এলো। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া কুমুদনাথ তাকে লতা ব'লে ডাকেন না।

'তোমার যা ইচ্ছে, দাদা, তুমি তা-ই করো,' শ্রীলতা বললে।

পরের দিন বিকেলের ডাকে পার্থপ্রতিম পেলো এই চিঠি, ইংরেজিতে লেখা, কুমুদনাথের কাছ থেকে ঃ

'বললে অদ্ভুত শোনায়, যে-কথা আজ বলতে হচ্ছে আমাকে; কিন্তু হয়তো আপনি খুব অবাক হবেন না শুনে। কথাটা আমার বোন শ্রীলতার সম্পর্কে, যার সঙ্গে, যদি আপনার মনে মনে কিছু ঠিক হয়ে থাকে, সে তো ভালো কথা; আর যেটুকু হয়নি, তা ঠিক করবার ভার নিতে চাই আমরা। জানতে পেরেছি শ্রীলতার মনের ঝোঁক, আর আপনি অবশ্য জানেন আপনার মন। এ-বিয়ে হবে সুখের, কেননা এ-বিয়ে হবে মুক্ত ইচ্ছার। তা ছাড়া আর-কিছু ভাববার নেই।'

'আপনার উত্তরের অপেক্ষা করবো।'

পার্থপ্রতিম উত্তর লিখতে বসলো তখনই ঃ

'অবাক একটু হয়েছি বইকি। কখনো ভাবতে পারিনি, এত বড়ো সম্মান আসতে পারে আমার কাছে। এ আমার পক্ষে সম্ভাবনার অতীত ঃ আমার অনেক, অনেক উপরে। শুধু অবাক হ'তেই পারছি।

'গল্পে পড়েছি, রাজকুমারীর বিয়ে হ'লো রাস্তা থেকে ধ'রে আনা যে-কোনো লোকের সঙ্গে, তারপর—কোনো আশ্চর্য, অনির্দিষ্ট উপায়ে, সেই লোকই উঠলো কীর্তির চূড়ায়, দীপ্তির চরমে—যার সঙ্গে সংযোগে রাজকন্যাই ধন্য হলেন। কিন্তু হায়, এটা গল্প, রূপকথা।

'যদি জানতেই চান, শ্রীলতার সঙ্গে আমার কখনোই মনে-মনে কিছু 'ঠিক' হয়নি। আপনি যা বলছেন, আপনার চিঠি পড়েই আমার প্রথম সে-কথা মনে হলো। যা অনুভব করছি আমার উপর আপনাদের একান্ত দয়া, অনেক ধন্যবাদ সে-জন্য। কিন্তু এত বড়ো ভার গ্রহণ করতে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই। কেননা, কোনো মির‍্যাকল ঘটবে না—অনর্থক দিতে হবে দুঃখ আর নিতে হবে। বিয়ে ব্যাপারটা সমশ্রেণীর মধ্যে হলেই সুখের হ'তে পারে।

'শ্রীলতার কথা যা লিখেছেন, সেটা হয়তো তাঁর মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতি—নিশ্চয়ই তা-ই, আমার মনে হচ্ছে। তাঁকে যেটুকু জানি, তাঁর বুদ্ধি তাঁকে আত্মপ্রতারণার সুযোগ দেবে না। কিন্তু সময়-সময় আমাদের তীক্ষ্ণতম বুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন ক'রে তোলে মোহ। সেটা ক্ষণিক।

'কোনো চিঠি লিখতে কখনো আমার এত কষ্ট হয়নি। বুঝিয়ে বলতে পারলাম না কিছুই; অনেক কথা লিখতে গিয়েও লিখতে পারছি না—পাছে না জেনে আঘাত দিই কাউকে, বা নিজের উপর অবিচার ক'রে ফেলি। আপনারা বুঝতে পারবেন নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়ে, এই আশা করছি।

'যদি এর ফল এই হয় যে আপনারা মনে করেন আমি কপট আচরণ করলুম, কি যা আমার করা উচিত ছিল তা করলুম না—যদি, মোট কথা, এ-রকম সন্দেহ আপনাদের মনে ওঠে যে আমি "শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে গেলুম," সেটা আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি জানি, ও-কথা সত্যি নয় ঃ আমার নিজের মধ্যে কোনো সংশয় নেই, কোনো দুর্বলতা।

'এর ফলে যদি এমন হয় যে শ্রীলতার সঙ্গে আমার চেনাশোনা শেষ ক'রে দিতে হবে এখানেই, মস্ত ক্ষতি মনে করবো সেটাকে। সবচেয়ে দুঃখ এই যে ব্যাপারটা এমন-কিছু নয় যার জন্যে তাঁর বন্ধুতা হারাতে পারি। যা হ'লো, তা হবার কোনো দরকার ছিলো না।'

চিঠিখানা লিখে খামে ভ'রে পার্থপ্রতিম বেবোলো বাস্তায়, নিজের হাতে ফেলে দিয়ে এলো ডাক-বাক্সে।

পরদিন, শ্রীলতার হাতে যখন পড়লো সে-চিঠি, সে পড়া শেষ ক'রে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ব'লে উঠলো, 'সব রকম দেমাক সইতে পারি, দারিদ্র্যের দেমাক সইতে পারি না।'

মা ও ছেলে—ও একটি কবিতা

সেই বাত্রে, খাওয়ার পরে, জঠরের মধ্যে সদ্যমুক্ত জীর্ণকারী অ্যাসিডের প্রভাবে পার্থপ্রতিমের যখন ঈশ্বরের পৃথিবীকে মনে হচ্ছে সুন্দর আর জীবনকে নিঃসংশয়ে ভালো, সে বললে তার মাকে : 'আজ একটা চিঠি পেয়েছিলুম শ্রীলতার দাদার কাছ থেকে।'

হাতের মাসিকপত্র থেকে চোখ তুলে সোনাব চশমার ফাঁক দিয়ে ইন্দিরা ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। একটু পরে বললেন : 'কী লিখেছেন?'

'লিখেছেন—মানে, ব্যাপারটা এই যে তাঁরা চান শ্রীলতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।'

'তারপর?' বলবার আগে ইন্দিরা একটু চুপ ক'রে রইলেন।

'আমি লিখে দিয়েছি যে আমার তেমন অবস্থা নয়—'

'লিখে দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ। কেন—কী হয়েছে?'

মাসিকপত্র ইন্দিরার হাত থেকে কোলের উপর খ'সে পড়লো।—'তুই এত তড়বড় ক'রে লিখতে গেলি কেন? আমাকে একবার বলতে হয় না?'

'আমি নিশ্চযই জানি এ-বিয়ে হ্বার নয়।'

'তাই ব'লে একটু ভেবে-চিন্তে দেখতে হয় না?'

'ভাববাব আর কী আছে? এ তো স্পষ্ট যে এ অসম্ভব। ওঁরা নিজেরাও দু-দিন পরে মনে-মনে বলবেন, "উঃ, খুব বেঁচে গিয়েছি!"

'আমি যদি মেয়ের কেউ হতুম, তোর বোকামিতে আমার তাক লেগে যেতো।'

পার্থপ্রতিম মৃদু হেসে বললে, 'তুমি তো কোনোকালেই আমার মধ্যে বোকামি ছাড়া কিছু দেখতে পাওনি। আর সেটা ভালোই—কারণ, বুদ্ধির চর্চা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। এমন একটা জায়গা থাকা দরকার, যেখানে বোকা হ'তে পারা যায়।'

ইন্দিরা তাঁর চোখ থেকে চশমা খুলে টেবিলের উপর রাখলেন। আস্তে বললেন : 'আশ্চর্য। আমার কিন্তু বারবার মনে হয়েছে যে শ্রীলতার সঙ্গে তোর বিয়ে হ'লে বেশ হয়।'

'শেষটায় তুমিও!' খানিকটা অতিরঞ্জিত স্বরে ও ভঙ্গিতে পার্থপ্রতিম কথাটা বললে।

'তোর কি কখনো মনে হয়নি ও-কথা?'

'যদি বলি "না", তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না।'

'তুই কোনো এক সময়ে বিয়ে করবি তো?'

'তা-ই তো ধ'রে নিতে হয়—যদিও সম্প্রতি সে-জন্য কোনো তাগিদ অনুভব করছি না মনের মধ্যে।'

'আর, শেষ পর্যন্ত, সেই যে-কোনো একজন মেয়েকেই তো করবি।'

'বিয়ে যদি করতেই হয়, যে কোনো একজনকে করবো না, বিশেষ একজনকে করবো। একমাত্র একজনকে, বলতে পারো?'

'শ্রীলতাকে কি তোর ভালো লাগে না?'

'ভালোর চাইতে অনেক বেশি লাগে।'

'তবে?'

'কী তবে?' ভালো যাকে লাগে, তাকেই যদি বিয়ে করতে হয়, তাহ'লে তো বহুবিবাহেও কুলোয় না।'

'তুই ঠিক জানিস যে মনকে তুই চোখ ঠারছিস না?'

'ঠিক জানি। সেইজন্যই তো—'

'তোর কথার মানে বোঝা যায় না। শ্রীলতাকে তোর ভালো লাগে, সেই জন্যেই তুই তাকে বিয়ে করবি না?'

'সে-কথা নয়, মা। যদিও সেও একরকমের কথা আছে। কবিতায় তা খুব ভালো শোনায়। শেলিয়ান-প্লেটোনিক গোছের মনের ভাব। সিউডো-শেলিয়ান-প্লেটোনিক। নেহাৎ ফাঁকা কথা ঃ যারা ও-সব বলে, আসলে শরীর ব্যাপারটাকে তারা সইতেই পারে না। ওটা একরকমের পার্ভার্শন।'

কথাগুলো ব'লে পার্থপ্রতিম কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালো মা-র মুখের দিকে, কী-রকম ফল হয়েছে তা লক্ষ্য করার জন্য। এটা তার একটা প্রিয় দুষ্টুমি, ইন্দিরার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর মাথার অনেক উপর দিয়ে বোঁ করে একটা তীর চালিয়ে দেয়া—তাঁকে স্তম্ভিত ক'রে দেবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু এতে অভ্যস্ত, ইন্দিরা কোনো আমলেই আনলেন না এ-সব কথাকে।

'বাজে কথা রাখ', তিনি বললেন, 'তোর মনের কথাটা কী, শুনি?'

'মনের কথা বলা বড়ো শক্ত, মা। কুমুদবাবুকে খানিকটা লেখবার চেষ্টা ক'রেই বুঝেছি।'

পার্থপ্রতিমের কথার সুরে মনে হয়, সে যেন ফাজলামি করছে। ইন্দিরা বিস্মিত হলেন, একটু আহত হলেন। কিন্তু এই ওর ধরন, সব-কিছু নিয়েই ওর খেলা। ও শেখেনি গম্ভীর হ'তে · যে-সমস্যা কঠিন, যাতে অনেক ভাবনা, অনেক বিতর্কের অবকাশ—তার উপর দিয়ে ওর মন চলে যায় হাসতে-হাসতে, অবাধে, যেন কিছুই ব্যাপার নয়। আর হয়তো, ইন্দিরা এক ফাঁকে ভাবলেন, সেটা একরকমের মন্দ উপায় নয় সমস্যা সমাধানের—ভাবনার দেয়ালে কপাল ঠুকে ম'রে গেলেও যখন আমরা অনেক সময়ই কিছু করতে পারি না।'

'তোর যা ইচ্ছে, তা-ই তো করেছিস,' আলাপটাকে শেষ ক'রে আনবার ধরনে ইন্দিরা বললেন, 'কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল—'

'তোমার ইচ্ছে।' বলে উঠলো পার্থপ্রতিম, 'তোমার তো কত রকমই ইচ্ছে হয়। উঃ, তোমরা মেয়েরা! বাজারে গিয়ে যে-কোনো সুন্দর জিনিস দ্যাখো, তা-ই তো কিনতে ইচ্ছে করে।'

'আমার এ ইচ্ছেটা যে আজগুবি ছিলো না, তা তো প্রমাণ হ'লো।'

'কিন্তু মা, তুমি কি জানো না, আমাদের চাইতে ওরা কত উঁচুতে? অনেক ওদের অর্থ, মস্ত ওদের মান। তোমার এ-বাড়িতে শ্রীলতাকে ধরতো কোথায়?'

'শ্রীলতা এলে এই ঘরই কত সুন্দর হ'য়ে উঠতো। ভালোবাসায় কী না হয়।'

—'যদি ভালোবাসা হয়। তার সুযোগ দাও আগে। কিন্তু এখন—আমি যদি শ্রীলতাকে বিয়ে করি, কী হবে? হঠাৎ এক-লাফে আমি উঠে যাবো উচ্চ সমাজে, রাতারাতি গজিয়ে ওঠা ব্যাঙের ছাতার মতো, ঐশ্বর্যের চাঁদোয়া আমার মাথার উপর। সেটা আমি কী ক'রে সহ্য করবো? নিজেকে এমন প্রকাণ্ড ফাঁকি মানুষ দিতে পারে! আমাকে যদি বড়ো হ'তেই হয়, হ'তে হবে নিজেরই জোরে ঃ যদি উঠতেই হয় উপরে, ঠেলে-ঠুলে একটু একটু ক'রে উঠবো কঠিন চেষ্টায়, প্রতি পদে টের পাবো—এবং অন্যকে পাওয়াবো—যে কিছু হচ্ছে। সেটাই সুখ। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ আমার পছন্দ হয় না—আর, তুমি যা-ই বলো, মা—তা হয় না। গিয়ে দেখবো, সেটা ভুল স্বর্গ।'

'কিন্তু এটা যে মস্ত সুযোগ ছিলো তোর পক্ষে। এমন আর নাও আসতে পারে।'

'যেতে দাও, মা। সব ব্যাপারেই তো আমাদের ব্যবসাদারি করতে হয় আজকালকার দিনে;

বিয়েটা অন্তত থাক।'

'ও-রকম ক'রে দেখার দরকার কী? ঠেলে-ঠেলে উঠতে যখন তোর খুব অসুবিধে হচ্ছে, প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিস, তখন যদি কেউ হাত বাড়ায় তোর দিকে, তুই কি তা ফিরিয়ে দিবি? পৃথিবীতে বাঁচতে হ'লে আমাদের কার না সাহায্য নিতে হয় অন্যের? যে বলে, অন্য কাউকে আমি চাই না, সে মিথ্যে জাঁক করে।'

'সাহায্য তাদের কাছে থেকেই নেয়া যায়, মা, যাদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক। সেখানে আমি চেয়ে নেবো—যদি আমার দরকার হয়। কিন্তু এখানে—আমার টাকা নেই, তাঁদের আছে। ওঁরা চাচ্ছেন আমাকে কিনে নিতে। মনে কোরো না, তাঁরা মনে-মনে কী বলছেন তা আমি বুঝি না। বলছেন ঃ "আহা—ছেলেটার মধ্যে জিনিস ছিলো, কিন্তু বাইরের কোনো সুযোগ নেই। ওকে আমরা মানুষ করবো, তৈরি করবো। ও হবে আমাদের গৌরবের জিনিস।' অন্যের গৌরবের উপলক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবার শখ নেই আমার।'

'মনে কর না কেন যে এটা তোর কৃতিত্বের পুরস্কার। কত ছেলেই তো আছে—আর কাউকে তো তারা চাইলো না।'

'অবাক হচ্ছি তাতেই। আর পুরস্কার—এমন কোনো কীর্তি আমার নেই—যার জন্য স্বয়ং রাজকন্যা ফুলের মালা হ'য়ে লুটিয়ে পড়তে পারে আমার গলায়।—অর্ধেক রাজত্বের কথা না-ই বললাম, 'একটু শুকনো হেসে পার্থপ্রতিম জুড়ে দিলে। 'যেটা পুরস্কার', হঠাৎ যেন একটা নতুন কথা মনে হয়েছে, এইভাবে সে আবার বললে, 'অনেক কষ্টে সেটা অর্জন করতে হয়। তা সহজ নয়। সহজে যা আসে তা আমি চাই না।'

'যেমন তুই বুঝিস,' ইন্দিরা সংক্ষেপে বললেন।

'রাগ করলে?' পার্থপ্রতিমের মুখে হাসি খেললো, 'কিন্তু বোঝো না কেন—আমি যদি শ্রীলতাকে বিয়ে করি, এ-সন্দেহ আমি কিছুতেই এড়াতে পারবো না যে আমি তা করেছি ওর টাকার লোভে, ওর সঙ্গে জড়িয়ে অনেক যে-সব সাংসারিক সুবিধে আসবে আমার কাছে, তার লোভে। মনে-মনে যদি জানিও যে তা সত্যি নয়, তবু সংকোচ থেকেই যাবে, নিজেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারবো না। সে-অবস্থাটা সুখের নয়।'

'শ্রীলতার বাড়ির অবস্থা যে ভালো সেটা কি তার অপরাধ?'

'তা নয়, কিন্তু উপস্থিত, তার অবস্থা থেকে তাকে আলাদা ক'রে দেখা যাচ্ছে না। আর, বিয়ে করতে হলে স্ত্রীর জন্যেই করা ভালো—কী বলো?'

ইন্দিরা বলতে যাচ্ছিলেন, 'এ-বিষয়ে শ্রীলতার হয়তো কিছু বলবার থাকতে পারে, তার কথা তুই একেবারেই ভাবছিস না।' কিন্তু কথাটা না বলাই তাঁর ভালো মনে হলো। থাক, আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। এ-সব ব্যাপারে সবচেয়ে খারাপ হ'লো দুঃখের দোহাই পাড়া। যে-মন সব সময় সোজাসুজি চলতে চায়, তার উপর অন্যায় সুবিধে নেয়া হয় তা'হলে। যে-মন সব সময় নিজের প্রতি খাঁটি, তার কাছে যদি কোনো জিনিস কর্তব্যচ্যুতি হিসেবে ধরা হয়, তা'হলে মিছিমিছি কষ্ট দেয়া হবে তাকে। পার্থর কাছে কর্তব্য বলে সত্যি কিছু নেই; আছে শুধু ইচ্ছে।

ইন্দিরা শুতে গেলেন। পার্থপ্রতিম তার চেয়ারে চুপচাপ ব'সে ভাবতে লাগলো। না—ঠিক যে ভাবতে লাগলো তা নয়—তার মন যেন একটা নির্লিপ্ত শূন্য আকাশ, যার উপর দিয়ে অলস শাদা মেঘের মতো ভেসে যাচ্ছে ভাবনাগুলো। রাত বেশি হয়নি, রাস্তার ওপারে পানের দোকানে চলছে উড়েদের হল্লা—সংগীতপ্রিয় এরা, সন্দেহ নেই। এরা দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে গান গাইবে—মানে গান সম্বন্ধে তাদের যা ধারণা—অন্ধকারে গান গাইবে, বৃষ্টিতে গান গাইবে, আর চাঁদের আলো হয়েছে তো কথা নেই, একেবারে খেপে যাবে তখন। চাঁদের আলো সম্বন্ধে বড়ো সহজ এদের প্রতিক্রিয়া। কথাটা ভেবে পার্থপ্রতিমের হাসি পেলো।

পানের দোকানের গান শুনলে আমার মাথায় খুন চেপে যায়, পার্থপ্রতিম ভাবতে লাগলো, কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই আনন্দ পায় তাতে, নয়তো অমন মরীয়া হ'য়ে গান গাইবে কেন? আর, ওরা যদি আনন্দই পায়, তাহ'লে আমার আপত্তির, আমার অবজ্ঞার কী মূল্য? আমার কথা ওরা ভাবতে যাবে কেন, ঐ যে লোকটি থাকে উল্টোদিকের ঘরে, তার বুঝি কাজের ব্যাঘাত হ'লো কি ঘুমের। আমি বলবো, আমি অনেক উঁচুদরের জীব, আমার সময়ের, সুখ-সুবিধের মূল্য বিস্তর, যার কাছে পানওলা প্রভৃতি মনুষ্যকুল, তাঁবেদারি করতে বাধ্য। কিন্তু তা-ই কি? কে জানে? কোনোখানে, কারো কাছে হয়তো এই নিছক প্রবৃত্তিচালিত পানওলা আর শিক্ষিত, সূক্ষ্মমন, অতিসভ্য, নাগরিক আমাতে কোনো প্রভেদ নেই। এই পানওলার কি জীবনের উপর ততটা অধিকার নেই, যতটা আছে আমার, শিশির ভাদুড়ীর, উদয়শঙ্করের, এমনকী রবীন্দ্রনাথের? ও যখন গান করে চাঁদের আলোয়, তখন তো ব্যক্ত করে জীবনের উপর সেই আদিম প্রবল অধিকার—আমি ওকে তেড়ে মারতে আসবার কে? আসল কথা আমি ওকে দেখেছি দূর থেকে, একেবারে বাইরে থেকে—আমার পক্ষে ওর অস্তিত্বই নেই। সত্যি বলতে, ওকে আমি কখনো দেখিইনি। যদি কখনো দেখতুম, তাহ'লে ওর একটা রূপ ধরা পড়তো আমার চোখে, যা বিশেষ, যা অর্থময়। যদি কখনো মুহূর্তের জন্যও প্রবেশ করতে পারতুম ওর ভিতরে, তা'হলে কিছুতেই পারতুম না ওকে কেবলই দূরে ঠেলে রাখতে, স্বীকার ক'রে নিতে হ'তো ওকে বিশ্বের মধ্যে একটা স্পন্দন বলে। তাহ'লে ওর গান—ভালো না লাগুক, বুঝতুম তার সার্থকতা। কিন্তু তার বাধা কত—সমাজের, অভ্যাসের, আমাদের প্রাত্যহিকতার খোপ-কাটা সংকীর্ণতার। এখানে আমি বসে আছি আমার বুদ্ধির, আমার শিক্ষার বড়াই নিয়ে—কিন্তু একজন শাদা চামড়ার মানুষের কাছে আমি অর্থহীন, প্রায় অস্তিত্বহীন। আমার পক্ষে, তেমনি, একজন সাঁওতালে কী এসে যায়? আমি শুধু বাহবা দিয়েছি তার চেহারা দেখে, নাচ দেখে—তার বেশি আর কী? আমার তো হাসি পায় অস্ট্রেলিয়ানদের কথা ভাবলে—মনে করি ওরা শুধু ভেড়ার চাষ করলো আর খেললো ক্রিকেট, জীবনের ওরা কী জানলো, জীবনের মূল স্রোত থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন। এদিকে কোনো অস্ট্রেলিয়ান যদি বাংলাদেশের নাম শুনে থাকে তো যথেষ্ট। পৃথিবীতে কত দূর, অখ্যাত সব দেশ রয়েছে, প্যাসিফিকের দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্ত, মধ্য আফ্রিকার অরণ্যময় বিস্তৃতি—অবাক লাগে ভাবতে, সেখানেও মানুষ আছে, কী করুণা হয় তাদের জন্য, আহা-বেচারা বলে কত তাদের পিঠ চাপড়াই। কোনো কীর্তি নেই তাদের, কোনো সৃষ্টি নেই, যা দিয়ে দূর দেশের লোক তাদের মনের স্পর্শ পেতে পারে, যৌন মনস্তত্ত্বের বইয়ের নানারকম উদ্ভট উদাহরণ মানবসভ্যতায় তাদের একমাত্র দান। কিন্তু তারা হয়তো বেশ সুখেই আছে—যে শাদা মানুষ তাদের ঘরের পাশ দিয়ে নিত্য যাতায়াত করে ক্যামেরা আর টাইপরাইটার নিয়ে, তাকে তারা হয়তো একটুও ঈর্ষা করে না—বরং মনে-মনে করুণাই করে। তারা হয়তো নিজেদের জানে খোদ ঈশ্বরের কাছ থেকে পরোয়ানা নিয়ে এসেছে পৃথিবীকে ভোগ করবার। তাদের আছে নিজেদের জীবন—আছে নৃত্যের উৎসব, বসন্ত-আমন্ত্রণের গাম্ভীর্য, পার্বণের প্রাণ-লীলা, রীতির কাঠিন্য। কোনো প্রত্যক্ষ আর্টের ভিতর দিয়ে তাদের প্রকাশ ঘটে না; হয়তো তাদের মন্থর, সুসমঞ্জস জীবনের মধ্যেই ফুটিয়ে তোলে নিজেদের। এমনও হতে পারে, আমার চাইতে তারা কম বাঁচলো না এতটুকু। এত বৈপরীত্য, এত বিরোধ, বৈচিত্র্য, অথচ একই পৃথিবী, একই জীবন। জীবন—জীবন কী? কিন্তু কেন তা ভাবতে যাওয়া? বাঁচাই তো যথেষ্ট শক্ত কাজ, তা নিয়ে ভাবতে গিয়ে কেন তাকে জটিলতর করে তোলা? ছেড়ে দাও—জীবনকে মেনে নাও যেমন আসে, দু-হাতের অঞ্জলি ভরে নাও, প্রাণ ভ'রে নাও।

পার্থপ্রতিমের ঘুম আসছিলো না। দেরি করে শোওয়া তার অভ্যেস, কিন্তু আজ সে ঘুমোতে পেলে খুশি হয়—যদি ঘুম আসে। সে ভেবে পাচ্ছে না এখন কী করে। মন যাচ্ছে না কোনো কাজে—অথচ এত সময় হাতে। চেয়ার থেকে উঠে সে একটু দাঁড়ালো জানলার ধারে। চাঁদ উঠবে কখন? কাল রাত বারোটার সময় আধখানা পাংশু চাঁদ দেখা দিয়েছিলো আকাশে, তার সে দীপ্তি নেই, দেখে

মনে হয় যেন অসুখ করেছে—তবু সে চাঁদ। আজ আরো দেরি হবে। প্রতি রাত্রে শুতে যাবার আগে চাঁদের দেখা পেতে পার্থপ্রতিম ভালোবাসে, কৃষ্ণপক্ষে যত দেরি হ'তে থাকে চাঁদ উঠতে, সেই অনুসারে যদি ঘুমোবার সময়ও পেছিয়ে দেয়া যেতো! কিন্তু তা হয় না, শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে পড়তেই হয় পাল্লায়। অনেক চাঁদহীন রাত্রি জীবনে, অনেক অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারই কি কম সুন্দর! তারায়-তারায় উঠে গেছে রাত্রির অন্ধকার স্তম্ভ—কোন অদৃশ্যে, কোন সময়হীনতায়। পার্থপ্রতিম জানলা দিয়ে একবার রাস্তার দিকে তাকালো—উল্টো দিকের ফুটপাতে শুয়ে আছে কতগুলো লোক—তাল-পাকানো মাংসপিণ্ড, পার্থপ্রতিম ভাবলো, কাঁচা, খোলস-ছাড়ানো মানবতার স্তূপ। একজন নিঃসঙ্গ উড়ে ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে জের টেনে চলেছে গানের, যেন নিজের সঙ্গে বাজি রেখে। তা ছাড়া শান্ত রাস্তা : যতদূর সে দেখতে পেলো, একটি লোক নেই। ম্লান-সবুজ গ্যাসের আলোয় বিছিয়ে রয়েছে ধূসর ক্লান্তি।

In your arms was still delight
Quiet as a street at nigh—

পার্থপ্রতিম মৃদুস্বরে আবৃত্তি করলো। বেশি রাত্রে শহরের কোনো রাস্তার দিকে তাকালেই তার মনে পড়ে ও-দুটি লাইন। ও-কবিতা যদি লেখা না হতো, তাহলে সে কখনো জানতো না, কী সুন্দর এই রাত্রির রাস্তা, কী আশ্চর্য তার শান্তি! ও-কবিতা ভালোবাসে বলেই, বোধহয়, সে ভালোবাসে রাত্রির রাস্তা। যে কোনো সময়ে, যখনই একটু বেশি রাত্রে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, রাস্তায় পা দিয়েই তার মনে পড়েছে :

In your arms was still delight
Quiet as a street at night.

তার মাথার মধ্যে ছন্দেব বাজনা—কত তার প্রতিধ্বনি, কী সূক্ষ্ম তার অনুরণন। কতবার বলেছে মনে মনে, তবু যেন পার পায়নি ঐ একটি বিক্ষিপ্ত শ্লোকের। কে বলে জাদু নেই—এর চেয়ে আশ্চর্য জাদু আর কী হতে পারে—এই ছন্দের, এই কথার? কথার শক্তি অসীম। অনির্বচনীয় তার রহস্য, তৌল করা যায় না তার মহিমাকে। কেননা কথা নিজেকে ছাড়িয়ে যায় সংগীতে, ধ্বনিতে হয়ে ওঠে ইঙ্গিতময়। তারই নাম মন্ত্র।

পার্থপ্রতিমের ভাবনার খেই হারিয়ে যাচ্ছিলো। তার মন যেন এলোমেলো হয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক থেকে অপ্রাসঙ্গিকে। এতক্ষণ সে যা-কিছু ভেবেছে, তার আড়ালে কী-যেন এক অস্ফুট কথার গুনগুনানি—যা সে চাপা দিয়ে রাখতে চাইছে, হয়তো নিজেরই অজ্ঞাতে, অবান্তর ভাবনার পরদা দিয়ে। সে চায় না, ও-সব ভাবতে সে চায় না। ও-সব প'ড়ে থাক মনের তলায়, সেখানে তারা কারো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যতক্ষণ তার উপরকার মন ব্যাপৃত ছিলো নিজেকে দেখানো গোছের ভাবনা নিয়ে, তার চেতনার গভীরতায় যেন চলছে অন্য কোনো ভাবনা, তার সচেতন মনের সাহায্য না নিয়েই। যেমন অর্কেস্ট্রার উত্তাল সংগীত তরঙ্গের আড়ালে সারাক্ষণ ব'য়ে চলে কোনো সূক্ষ্ম, একটানা সুর—সযত্নে কান পেতে না থাকলে যা শোনা যায় না। যা ছিলো অস্পষ্ট, তা যেন নিজেরই মধ্যে আলোড়িত হয়ে নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে উঠছে। আসল যে-কথাটা পার্থপ্রতিম হাৎড়ে ফিরছে না-জেনে, তা যেন ধরা পড়ছে ছন্দে। হঠাৎ তার একটা কবিতার লাইন মনে পড়লো। পেয়েছে, এতক্ষণে সে পেয়েছে। কথা পাওয়া গেছে, তাই সে বুঝতে পারছে তার মনের ভাব। এই কথাই তো সে বলতে চেয়েছে তার নিজের কাছে, মা-র কাছে—আজ কতক্ষণ ধরে। আশ্চর্য—আগে তার কেন মনে হয়নি? আস্তে-আস্তে সে ফিরে গেল তার চেয়ারে, বসলো কাগজ কলম নিয়ে। অনেক রাত্রে তৈরি হলো এই কবিতা :

যাহারা স্মরণ করি' সিন্দুর দিতেছো শুভ্র ভালে,
হে সুন্দরী, সে কি তব হৃদয়ের সীমাপ্রান্ত-' পরে

নামে বর্ষণের মতো? উচ্ছলিত লীলাভঙ্গি-ভরে
তরঙ্গ তুলিয়া যায় খরস্রোতে, তীব্রদ্রুততালে?
তুমি কি দেখেছো তারে হৃদয়ের স্তব্ধ রাত্রিকালে
বিশ্বের রহস্য-তল উন্মীলিত প্রহরে-প্রহরে?
চরম মিলন-লগ্নে নিবিড়-নিমগ্ন পরস্পরে—
কী দুর্লভ আবিষ্কার তবু যেন রয়েছে আড়ালে!
অথবা লভেছো তারে বিধানের অন্ধ মূঢ়তায়,
বাসনা-উত্তাপ-হীন নিশ্চেতন, সংকীর্ণ সংগমে?
অনায়াস যুগ্মযাত্রা চিন্তাহীন অভ্যাসে মসৃণ?
অথবা কি পরস্পরে কামনার উন্মত্ত বিভ্রমে
মুহূর্তে নিঃশেষ করি', হারায়ে ফেলেছো, উদাসীন,
প্রাত্যহিক তুচ্ছতায়, তন্দ্রাবিজড়িত জড়তায়?

কবিতাটা একটা কাগজে টুকে নিয়ে তার নিচে পার্থপ্রতিম লিখলো দু-লাইন ঃ

'অনেকদিন আগে আপনি একবাব আমার কবিতা পড়তে চেয়েছিলেন। তখন পারিনি, আজ পাঠালুম আপনাকে এই কবিতা—আপনারই জন্য লেখা।'

তারপর কাগজটা খামে ভ'রে তার উপর লিখলো শ্রীলতার নাম আর ঠিকানা, পাঠিয়ে দিলে পরের দিনের ডাকে। পার্থপ্রতিমের মনে আশা ছিলো, শ্রীলতা কিছু লিখবে উত্তরে। পরের দিন গেলো, চিঠি এলো না। দু-দিন, তিন দিন কাটলো; কোনো সাড়া নেই। তখন পার্থপ্রতিম বুঝলো যে যা ছিলো, তা ছিলো। এখন আর নেই।

মানসীর মান

অনেক রাত। পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার ছড়িয়ে আছে শ্রীলতার বাগানে। হাওয়াটা শিবশিরে, গায়ে লাগলে একটু শীত-শীত করে। চারদিকে স্তব্ধতা। আকাশ ছেঁড়া মেঘে এলোমেলো, তারই ফাঁক দিয়ে কয়েকটা তারা আছে চুপচাপ তাকিয়ে। এইমাত্র উঠলো কৃষ্ণ-পক্ষের ভাঙা তামাটে চাঁদ—যেন ঘোর অনিচ্ছায়, নিতান্ত দায়ে ঠেকে। সে মরতে বসেছে; তার যেটুকু আলো, তাতে নিজেকে মাত্র প্রকাশ করতে পারছে অতি কষ্টে। যেন নেহাৎই তাকে খাতির করে অন্ধকার একটু আবছায়া হ'য়ে এলো।

সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে শ্রীলতা দাঁড়িয়ে তার ঘরের সামনেকার বারান্দায়, রেলিঙে ভর দিয়ে। শাদা শাড়ির আঁচল তার গায়ে জড়ানো, চুল বাঁধা কোনোরকমে একটা খোঁপা করে। চাঁদের প্রেত-আলো পড়েছে তার মুখে, তাতে তা দেখাচ্ছে আরো বেশি শাদা।

মনে হতে পারতো, চাঁদের মধ্যে শ্রীলতা বিশেষ কৌতূহলের কিছু দেখছিলো, এমন নির্নিমেষ তার দৃষ্টি। কিন্তু সে-দৃষ্টিতে শূন্যতা, যেন সামনে কিছু-একটা আছে বলেই সে তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁট চাপা, তার মুখের ভাব একটু শক্ত—ক্লান্ত, মুমূর্ষু চাঁদ যা আরো বেশি ফুটিয়ে তুলছিলো। হাওয়ায় চুল এসে উড়ে পড়ছে তার কপালে, কিন্তু তা সরাবার জন্য সে একবারও হাত তুলছে না।

শ্রীলতা যদি জানতো, এ-সময়ে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে, তাহলে সে নিশ্চয়ই একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতো, কি অস্ফুট স্বরে আউড়ে যেতো একটা সুরের টুকরো, কি—যা হোক কিছু করতো, দাঁড়িয়ে থাকতো না অমন স্তব্ধ হয়ে। কিন্তু সে নিজেই যেন হারিয়ে গেছে এই রাত্রির নীরবতায় আর আবছায়ায়—কী করে সে দেখতে পারে পিছনে তাকিয়ে? আর যদি বা দেখতো,

তাহলেও তার কিছু চোখে পড়তো না। কারণ বারান্দা ছায়াময়, আর যে-চোখ একটু দূরে থেকে, পাশের ঘরের দরজার আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করছে, তা গভীর কালো। কালো আর উজ্জ্বল। সে চোখে কৌতুকের ছটা, বিদ্রূপের ক্ষীণ আভাস। আর, সে চোখ যে মাথায় বসানো, সাপের তুলে-ধরা ফণার মতো তা গর্বিত ও উদ্ধত। আর তেমনি সুন্দর।

মানসীর পরিপূর্ণ যৌবন যেন তাঁর শরীরের প্রতি রেখায় কথা কয়ে উঠছে। তাঁর রং ফর্সা নয়, কিন্তু লাবণ্য উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গে। অনর্থক নয়, কুমুদনাথ যে তাঁর জন্য অত দুঃখভোগ করতে রাজি হয়েছিলেন। আর মানসী জানতেন তাঁর নিজের আকর্ষণ; জানতেন তাঁর যৌবনের গৌরব। তিনি সেই ধরনের আমাদের দেশে বিরল মেয়ে, যাঁরা জীবন আরম্ভ করেন একটা স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং তার সিদ্ধিতেও উত্তীর্ণ হন, যেমন করেই হোক। মানসীর শরীর যেমন দৃঢ়, তাঁর সংকল্পও তেমনি তেমনি। স্বপ্ন নিয়ে তিনি কখনো বিলাস করেননি; অস্পষ্ট ইচ্ছা, মনের মধ্যে রহস্যের স্বর—ও-সব তিনি বোঝেন না, ছেলেবেলা থেকে তিনি জেনেছেন—এবং চেয়েছেন—যে স্বামী তাঁকে এনে দেবেন সুখের সমস্ত উপকরণ; পারিপার্শ্বিক দীপ্তির মধ্যে দীপ্তিময়ী, তিনি রাজত্ব করবেন। তাঁর সে-সাধনা থেকে তিনি ভ্রষ্ট হননি একদিনের জন্যও। আর তা-ই হলো—যতটা আশা করা গিয়েছিলো, ততটা হয়তো নয়; কিন্তু এও মন্দ নয়। এবং আরো আছে ঃ এখনো প'ড়ে আছে অনেক ভবিষ্যৎ। লোকে যাকে ভালোবাসা বলে, তাঁর পক্ষে তার কোনো অর্থ ছিলো না। তিনি কি তাঁর স্বামীকে ভালোবাসেন না? হ্যাঁ, যেমন আশা করা যায়, একজন মেয়ে তার স্বামীকে ভালোবাসবে। কিন্তু হৈ-চৈ করার মতো তিনি কিছু দ্যাখেন না তাতে; সেটা এমন-কিছু নয়, তাঁর মনে হয়, যাতে ভয়ানক কিছু এসে যায়। ভালোবাসা তো হবেই—সেটা জানা কথা। যা নাও হতে পারে, এবং যা হওয়াটা সবচেয়ে দরকাবি, তা হচ্ছে—বাদ-বাকি যা কিছু। ভাবনা তারই জন্য।

দরজার ধার থেকে সরে এলেন মানসী। তাঁর আঁচল লুটিয়ে পড়েছিলো মেঝেতে, সেটা কুড়িয়ে তুলে নিলেন গায়ের উপর। তাঁর খোলা চুল পিঠের উপর ছড়ানো—একরাশ কালো আগুনের মতো, সে-সময়ে তাঁকে লক্ষ্য করার কেউ থাকলে তার মনে হতে পারতো, পরস্পরের সঙ্গে বিজড়িত অসংখ্য বাঁকা-বাঁকা দীর্ঘ শিখার মতো। আগুনের মতো দীপ্তি সে চুলের, আগুনের মতো তা দৃপ্ত ভঙ্গিতে বিসর্পিত। বারান্দার ম্লান অন্ধকারে মানসী আস্তে-আস্তে শ্রীলতার দিকে এগোতে লাগলেন। নিঃশব্দে। শাড়ির তলা থেকে তাঁর ছোটো দুটি পা যেন কোনও কৌতূহলী, অন্ধকারের জীবনের মতো উঁকি দিয়ে-দিয়ে যাচ্ছে। শ্রীলতার ঠিক পিছনে এসে তিনি থামলেন, মৃদু হাতে স্পর্শ করলেন তাঁর কাঁধের ওপর।

শ্রীলতা এমন প্রবলভাবে চমকে উঠলো যে কয়েক মুহূর্তের জন্য তার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। সে ফিরে তাকালো, কিন্তু নিশ্বাসের দ্রুত গতি গোপন করার জন্য একটু সময় কোনো কথা বললে না। তারপর, যখন সে বুঝতে পারলে তার নিশ্বাস আবার স্বাভাবিক হয়ে বইছে, তখন বললে, 'এত রাত্রে তুমি এখানে। তার হাসবার চেষ্টা ঠিক সফল হলো না।

'আমিও তোমাকে সে-কথাই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলুম।'

'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো—বড়ো গরম—এসে একটু দাঁড়ালুম এখানে। —তুমি কেন উঠে এসেছো?' শেষের প্রশ্নটায় একটু তীব্রতা ছিলো। বৌদির মনের ধরন শ্রীলতা জানে; যেখানেই তাঁর নিজের সঙ্গে মেলে না, সেখানেই তিনি তামাশা করতে ভালবাসেন। সে প্রায় এমন সন্দেহ করলো যে তাকে লক্ষ্য করবার জন্যই বৌদির এই নৈশ উত্থান। তার নিজস্ব গোপনতায় এই অনাহূত প্রবেশ তার ভালো লাগলো না। আর ভালো লাগলো না মানসীর চোখে ধারালো হাসির ঝিলিমিলি।

'আমারও তা-ই দশা। বড়ো গরম', মৃদু, চাপা গলায়, যেন কী গোপন কথা জানাচ্ছেন, এমনি সুরে মানসী বলে উঠলেন। বলেই হাসলেন একটু, চাঁদের ঘোলা আলোয় তাঁর সুন্দর শাদা দাঁতের সারি ঝলসে উঠলো।

শ্রীলতা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার ইচ্ছে হলো এই মুহূর্তে এখান থেকে সরে পড়ে, নিজের ঘরে গিয়ে খিল এঁটে দেয়। এই মুহূর্তে।

তার কানের কাছে মৃদু, অন্তরঙ্গ সুরে মানসীর স্বর শোনা গেলো, 'রাত কত হলো?'

শ্রীলতা তীব্রভাবে মুখ ফেরালো তার বৌদির দিকে।—'কী হয়েছে? অমন ফিশফিশ করে কথা বলছো কেন?'

'আমি শুধু জানতে চেয়েছিলুম, ক-টা বাজলো।' মানসীর স্বরে কপট সরলতা।

'আড়াইটে হবে বোধহয়। কি বেশিও হতে পারে,' অপেক্ষাকৃত নরম সুরে শ্রীলতা বললে।

'তুমি কি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এলে?'

শ্রীলতা তার উৎপীড়কের মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। গলার আওয়াজ শান্ত করলো চেষ্টা করে।—'হ্যাঁ—এই তো খানিকক্ষণ।'

'কী ভাগ্যি তুমি জেগে আছো। আমার একটুও ঘুম পাচ্ছে না।'

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, শ্রীলতা মানসীর দিকে স্থির চোখে তাকালো।—'হ্যাঁ, তোমার চোখ বড্ড চকচক করছে। এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। কী হয়েছে তোমার?'

'আমার মন কেমন করছে,' রুদ্ধস্বরে বললেন মানসী।

'Nerves', শ্রীলতা একটু ভেবে বললে, 'বোধহয় তুমি ঘর-সংসারের এটা-ওটা নিয়ে বড্ড বেশি ভাবছো?'

'জানি না তা-ই কিনা।' মানসী একটু থামলেন, পরে যেটা বলবেন, সেটাকে একটু বেশি জায়গা দেবার জন্য। 'এই আশ্বিন মাসের রাতগুলো যেন কেমন। হঠাৎ মাঝরাতে হাওয়া দেয়, যেন কী-কথা কইতে চায়। শুয়ে-শুয়ে ঘুম আসে না চোখে।' বিপক্ষেব পরিভাষা মানসীর ভালোই জানা ছিলো।

শ্রীলতা কোনো কথা বললে না। তার ভিতরে-ভিতরে আত্মিক বমি-ভাব গোছের হচ্ছিলো। উঃ, এর স্থূলতার অসহনীয়তা! কেউ যেন একটা কালিমাখা, মোটা বুড়ো আঙুল দিয়ে তাকে টিপে-টিপে দেখছে। কেন একজন আর-একজনকে একা থাকতে দেয় না?

মানসী আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, মুখে তাঁর বিষাদ। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দেখছো মেঘ?'

'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বৌদি,' মনে মনে শ্রীলতা বললে, 'একটু বেশি নাটুকে হয়ে পড়ছে। আর্টের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে প্রায়। এটা আশা করা যায়নি তোমার মতো উঁচুদরের অভিনেত্রীর কাছে।' মুখে বললে, 'দেখছি তো।'

'আচ্ছা, কী মনে হয় তোমার এই কালো-কালো নরম মেঘগুলোকে দেখে?'

'তোমার কী মনে হয় শুনি?'

'আমার এইমাত্র মনে হচ্ছিল, যেন ওরা লুকিয়ে রেখেছে কোনো গোপন কথা।'

'কী কথা?' শ্রীলতার কাছে যে-কথা প্রত্যাশিত, সে তা-ই বললে। সেও খেলছে তার খেলা।

'আমি কী জানি।' মানসীর চোখের পাতা মুহূর্তের জন্য আনত হলো তাঁর চোখের উপর। ঈষৎ কেঁপে উঠলো লম্বা, কালো পালকের সার। তারপর চোখ খুলে, শ্রীলতার উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে বললেন, 'তুমি জানো না?'

শ্রীলতা যেন নিজেরই অজান্তে একটু পিছনে সরে এলো। বললেন, 'ঘুম পাচ্ছে আমার।'

'এখনই?'

'এই ঠাণ্ডা হাওয়া—মনে হচ্ছে, শুলেই ঘুমিয়ে পড়বো।'

মানসী একটু চুপ করে রইলেন। তারপর, 'কী ভাবছিলে তুমি একটু আগে?' হঠাৎ সোজাসুজি আক্রমণ করলেন তিনি। 'অবশ্য', পরের মুহূর্তে তিনি জুড়ে দিলেন, 'এমনও হতে পারে যে তুমি

নিজেও তা জানো না। আমরা যখন একা থাকি, আর রাত হয় গভীর—সেই অন্ধকারে কী যে আমরা ভাবি, না!'

শ্রীলতার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো। ইনি তাকে পরাজিত করবেনই, দীপ্তিতে কঠিন, স্পর্ধায় নিষ্ঠুর এই মেয়ে—তাকে বেঁকতেই হবে তাঁর উত্তপ্ত ইচ্ছার চাপে। তাঁর সেই ইচ্ছাকে সে অনুভব করলো যেন একটা অন্ধ, মন্থর শারীর শক্তি তাকে একটু-একটু করে ঠেসে ধরছে। সে তা দেখতে পেলো মানসীর উজ্জ্বল চোখে, যার দিকে সে তাকিয়ে রইলো, যেন মুগ্ধ। তাকে সে ঘৃণা করে—মানসীর চোখের সেই আত্ম-সচেতন আলো-কে, তবু তা থেকে ফেরাতে পারছে না চোখ। যেমন অনেক সময়, যে-জিনিস আমরা দেখতে চাই না, মনের কোনো দুর্বোধ বিকৃতির ফলে তারই দিকে আরো বেশি করে তাকিয়ে থাকি।

'পার্থপ্রতিম কী লিখেছে তার চিঠিতে?' হঠাৎ মানসী জিগ্যেস করলেন। এমন সুরে, যেন কোনো প্রসঙ্গ-পবিবর্তনই হয়নি, যেন গোড়া থেকেই এ-কথা হচ্ছিলো।

শ্রীলতা এর জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিলো। 'বাঁচা গেলো, এটা যে এসেছে,' মনে মনে সে বললে, 'বাঁচা গেলো। এসেছে যখন শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে।' শিগগিরই ছাড়া পাবে ভাবতে সে খুশি হলো যদিও সবচেয়ে অসহ্য এখনই। যেমন ডাক্তার আসবে অস্ত্রোপচার করতে, রোগী তার আগের দিন-রাত ভয়ে অবশ হয়ে থাকে, তবু পরদিন সকালে যখন ডাক্তারের আবির্ভাব হয়, একটু আশা হয় তার প্রাণে, যদিও তখনই তার আতঙ্কের চরম। শিগগিরই, যা-ই হোক, শেষ তা হবে।

মুখে শ্রীলতা বললে, 'তুমি আমার চিঠি দেখলে কেন?' যথেষ্ট ঝাঁঝ ছিলো তার কণ্ঠস্বরে।

'দেখিনি বলেই তো জিগ্যেস করছি। খামের উপর লেখা দেখে যেন মনে হলো পার্থর। কী লিখেছে?'

কবিতাটার টুকবো-টুকরো কথা শ্রীলতার মনে পড়লো। মনে পড়লো পার্থপ্রতিমের সযত্ন-বিন্যস্ত, নিখুঁত, 'সাহিত্যিক' হস্তাক্ষর—বড়ো বেশি সুন্দর, বড়ো বেশি 'সাহিত্যিক'। সে হাতে যা কিছুই লেখা হোক, মনে হবে প্রেসের কপি। চিঠি লেখার জন্য তা নয়। মানুষটার মতোই তার ভাব—অতি-মার্জিত, অতিরিক্তরকম সভ্য এবং সরকারি। আর সেই হাতের লেখার খানিকটা নমুনা তার কাছে পাঠানো—কী নির্বোধ কাজ, কী স্থূল! কী প্রচণ্ড এর হিউমারহীনতা। শ্রীলতা কখনো ভাবেনি, পার্থপ্রতিমকে দিয়ে এ-রকম কাজ সম্ভব হতে পারে। কবিতা! কবিত্ব ফলাবার চমৎকার সময় বটে! 'আপনাকে পাঠালুম এই কবিতা—আপনারই জন্য লেখা।' পার্থপ্রতিমের, যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে, তার জন্য একটা কবিতা লিখে তাকে ধন্য করতে! কবিতা! ছোটোখাটো, চমৎকার একটি উপদেশ, ছন্দের বুনোনিতে পরিপাটি করে গুছানো। তাকে এই সমস্ত কথা বলা—ছেলে-মানুষকে নীতি-শিক্ষা, উঁচুদরের কথার রঙচঙে খেলনা—তাকিয়ে দেখবার মতো কিছু, নিয়ে সময় কাটাবার মতো কিছু। উঃ, এই লিখনেওয়ালাদের আত্ম-সর্বস্বতা, জীবনের ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার অক্ষমতা, যে-কোনো সমস্যা থেকে পালিয়ে কথার কুয়াশায় গা ঢাকা দেবার অভ্যেস! তাদের দুর্বলতা, তাদের নিষ্ফলতা!

'কী লিখেছে?' মানসী আবার জিগ্যেস করলেন।

'তুমি তা জানতে চাও কেন?' হঠাৎ হাওয়া লেগে শ্রীলতার বুকের ভিতরটা যেন শিরশির করে উঠলো। শাড়ির আঁচলটা সে আরো নিবিড় করে গায়ে জড়িয়ে নিলে।

'বলো না। তাতে তোমার ভালোই হবে।'

'আমার ভালোর জন্য এত ভাবনা তোমার?'

মানসীর দৃপ্ত রক্তিম ঠোঁটের কোণ পাতলা, সূক্ষ্ম হাসিতে বেঁকে গেলো। 'আমি বলি কী', আবার সেই রুদ্ধস্বর এনে তিনি বললেন, 'মিছিমিছি মনখারাপ করে লাভ নেই।'

'মন খারাপ তো করিনি।'

'যদি না-করে থাকো সে তো আরো খারাপ। আরো খারাপ?' হলদে চাঁদের নিচে মানসীর চোখ ঝলসে উঠলে। 'তুমি কি বলবে, এ-ও তোমার গায়ে লাগেনি—এই অপমান?'

'অপমান কিসের?'

'বেশ কথা বলছো! কী সাহস, কী দুঃসাহস! এত জাঁক ওর কিসের যে—'

'থাক, বৌদি, আর ঘেঁটে লাভ কী? যার যেমন ইচ্ছে, সে তা-ই তো করবে।'

'আমি আগেই বলেছিলুম,' মানসী যেন শ্রীলতার কথা শুনতেই পেলেন না, 'আমি গোড়া থেকেই জানতুম, যে গরিব, সে গরিবই। ওর কাছে যা এসেছিলো, ও কী করে বুঝবে তার মূল্য।'

'ওর কাছে সব মূল্যই হয়তো অন্য রকম।'

'কী করে হবে! কী করে হবে!' তীব্র চাপা গলায় মানসী বলতে লাগলেন, 'বড়ো সমাজে তো মেশেনি কখনো। তুমি ভুল করেছিলে ওকে অতটা আমল দিয়েই।'

বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো শ্রীলতা। তাঁর এ-সব কথার আন্তরিকতায় সন্দেহ করা অসম্ভব। স্পষ্টত, তাঁর আত্মসম্মানে বেশ আঘাত লেগেছে। মানসীর, শ্রীলতা জানে, জাতিবিচার অতি প্রখর, তিনি ভয়ানকরকম উঁচু-নাকের মানুষ। মানসীর বাবা শুধু তাঁর বুদ্ধির মূলধন নিয়ে জীবন আরম্ভ করেন; জর্মান যুদ্ধের সময় কী করে যেন পাট-রপ্তানির ব্যবসায় ঢুকে পড়ে হঠাৎ বড়লোক হয়ে যান। নতুন বড়োলোকের মেয়ে, মানসীর বাল্যকালও অপেক্ষাকৃত দারিদ্রে কেটেছে, ঐশ্বর্যে অনভ্যস্ত, ঐশ্বর্যের পূর্ণতম ব্যবহার তিনি জানলেন। এককালে টানাটানি ছিলো, তাই টাকার মূল্য বুঝলেন তিনি, শিখলেন টাকাকে শ্রদ্ধা করতে। টাকাই হলো তাঁর একমাত্র বিশ্বাসের স্থল। টাকা যার নেই, সে-ও তাঁর পক্ষে নেই। দারিদ্র্যের সঙ্গে লেশমাত্র সংস্পর্শ তিনি এড়িয়ে চলেন সর্বান্তঃকরণে; দারিদ্র্যকে ভয় করেন তিনি। কেননা সেটা তাঁরই বাল্যের অবস্থার স্মারক। আর তিনি সেই সব জিনিসকেই ঘৃণা করেন, যা তাঁকে মনে করিয়ে দেয়—আগেকার কথা। যাকে বলা যেতে পারে স্পর্শদোষ, তাঁর পক্ষে তা বিভীষিকা। জাত সবার আগে। তাঁর জীবনের যা কিছু উচ্চাশা, যা কিছু সাধনা সব ঐ টাকার বেড়া-দেয়া সাম্প্রদায়িকতাকে অবলম্বন করে। সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন; আমরা যে যা চাই, তা-ই হয়। তাঁর কৌলীন্যের শুভ্রতায় কোনোরকম কলঙ্কের ছায়া তাঁর পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা। আশ্চর্য নয়, পার্থপ্রতিম সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব যে তীব্র হবে। ব্যাপারটা যেন তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত অপমান। এটাই তাঁর পক্ষে অসহ্য যে কেউ টাকা সম্বন্ধে, সমাজে উচ্চ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এমন উদাসীন হতে পারে। এটাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। মনে মনে পার্থপ্রতিমকে তিনি সন্দেহ করছেন নির্বোধ বলে। কুমুদনাথ যখন এই বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তিনি অবশ্য মর্মাহত হয়েছিলেন, স্তম্ভিত হয়েছিলেন। কিন্তু কুমুদনাথ যখন চিঠি লিখলেনই, তিনি তখন চেষ্টা করলেন কোনোরকমে ব্যাপারটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার; মনে করলেন—থাক, মজা মন্দ হবে না; আস্ত একটা বুনোকে পোষ মানানো—খেলাটা ভালোই। (তাঁর নিজস্ব কৌলীন্যের বহির্ভূত যে-কেউ অবশ্য আস্ত বুনো; পার্থপ্রতিমের সঙ্গে শ্রীলতার মেলামেশা তিনি কখনোই ভালো চোখে দেখতে পারেননি—আর, সে-কথাই যদি ওঠে, শ্রীলতার অনেক জিনিসই মনে মনে তিনি অপছন্দ করেন।) কিন্তু যা হলো, তা যে হতে পারে, মানসীর পক্ষে তা কখনো কল্পনা করা সম্ভব ছিলো না। সৌভাগ্য হাতের কাছে এসে বলছে, 'আমাকে নাও', আর সে কিনা রইলো মুখ ফিরিয়ে! মানুষ এত বোকাও হয়!

'বোকা! বোকা!' তিনি বলে উঠলেন, 'আমাদের সাহায্যে ও একটা মানুষ হতে পারতো, কোথায় যে উঠতে পারতো তা ও এখন ভাবতেও পারে না। কী হবে ওর জীবনে? ও পচবে

ওর অন্ধকার খুপরিতে ওর গরিবিয়ানার দেমাক নিয়ে।'

'তা-ই হোক না। তুমিই বা এত ভাবছো কেন ওর কথা?'

'আমি কেবল ভাবছি, কিসের জোরে—'

'হয়তো আছে কোনোরকম জোর। বাইরে থেকে আমরা কতটুকুই বা বুঝতে পারি।'

'আসল কথাটা অন্য রকম।'

'কী সেটা?'

'তোমার মন পার্থর প্রতি দুর্বল—এখনো।'

দূরের দিকে তাকিয়ে, যেন অনেকটা আপন মনে শ্রীলতা বললো,—'যদি কখনো দুর্বলতা হয়েই থাকে, তা—আছে।'

'ঠিক তোমারই মতো কথা হলো। আমি ভেবেছিলুম, তোমার একটু লজ্জা আছে অন্তত।'

'লজ্জাকে তারস্বরে ঘোষণা করলেই লজ্জা ঢাকে না।'

'থাক, তুমি আর কথা বোলো না। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো যে তোমার শরীরে রক্ত নেই। তুমি যদি চাইতেই, তুমি কি পারতে না ওকে তোমার পায়ের উপর লুটিয়ে ফেলতে!'

ক্ষীণ একটু হাসি শ্রীলতার ঠোঁটের উপর খেলা করে গেলো।—'বৌদি, তুমিই বা ওকে ভুলতে পারছো না কেন? যার কোনো দামই নেই, তা হারিয়ে অত ছটফটানি কিসের?'

'আমি ভুলবো। আমার শরীর খড় আর ন্যাকড়া নিয়ে তৈরি নয়। অবাক হচ্ছি তোমাকে দেখেই।'

'আমি কি করলে তোমার খুব স্বাভাবিক মনে হতো? কী চাও তুমি আমার কাছে?' শ্রীলতা যেন কর্তব্যের প্রেরণায়, জিগ্যেস করলো। তার মনে হচ্ছিলো, তার সামনে দাঁড়ানো এই দীপ্তিময়ী যুবতীর উপর রয়েছে তার আধ্যাত্মিক কল্যাণের ভার—তাঁর কাছে তাকে সবই মেনে নিতে হবে, ফিরিয়ে দিতে পারবে না তাঁর কোনো কথা। আর তার ক্লান্ত লাগছিলো—গভীরভাবে ক্লান্ত।

'শোনো—একটা কথা।'

'কী, বলো?'

'তুমি আর পার্থর সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখতে পারবে না। তোমার নিজের কথা তুমিই জানো, কিন্তু তোমার দাদার—আমার সম্মান—'

'তোমাদের সম্মানের হানি হয়,' শ্রীলতা আস্তে-আস্তে বললে, 'এমন কোনো কাজ আমি করবো না।'

'ও যদি আবার আসে—'

'আমি তোমাকে বলতে পারি, ও আর আসবে না।'

বিছানায় শুয়ে, শ্রীলতা চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো অন্ধকারের দিকে। কী সে কথা, যা সে তার নিজের কাছে বলতে চাইছে, বলতে পারছে না? সে ভাবতে চেষ্টা করলো—বরং না ভাবতে—চেষ্টা করলো শুধু স্তব্ধ, স্তব্ধ হয়ে থাকতে, শুধু নিঃসাড় হয়ে থাকতে এই রাত্রির মাঝখানে। যথেষ্ট হয়েছে মানসীর সঙ্গে মুখোমুখিত্বেই। ক্লান্ত, ক্লান্ত; সে যদি শুধু অন্ধকারের মধ্যে মিশে যেতে পারতো—তার হৃদয়ে এই অতল স্তব্ধতা। জানলার দিকে সে একবার তাকালো—ফ্যাকাশে ধূসর, ভোর হলো বলে। না কি, মরা চাঁদের আলো বিছিয়ে রয়েছে আকাশ ভরে, মেঘে মেঘে প্রতিহত হয়ে? ভাবতে তার ভালো লাগলো, কাল সকালে উঠে দেখবে রোদ, নতুন একটা দিন। নতুন নতুন দিন।

শ্রীলতা পাশ ফিরে চোখ বুজলো। প্রতিদিন জীবন নতুন করে জন্ম নেয়, পার হয়ে যায় কত মৃত্যু। ঐ সূর্যের আলোয় প্রাণের অজস্রতা। শ্রীলতা মনে মনে ছবি আঁকতে লাগলো পরের দিন প্রভাতের। খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লো।

পূর্বরাগ

পার্থপ্রতিম ভাবের মানুষ। তার মন বাইরের প্রেরণায় সাড়া দেয় সহজেই; যেন এক হাওয়ার লঘু ছোঁওয়ায় ঝংকৃত হয়ে ওঠে তারে-তারে, সহজে তার রেশ মিলোয় না। কোনো ঘটনাকে হয়তো সে তার মনের উপর দিয়ে বয়ে যেতে দিলে আলগোছে, বিশেষ লক্ষ্য করলে না—কিন্তু পরে দেখলো তারই প্রতিধ্বনিতে ছেয়ে গেছে মনের নেপথ্য। দুর্দম তার কল্পনা ঃ যে কোনো ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করে তা তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়—কোন রহস্যলোকে, কোন অদৃশ্যে। প্রায় একটা ব্যাধির মতো, তার এই কল্পনাশক্তি—সে তাকে সামলাতে পারে না কিছুতেই, বন্যার মতো তা প্রবল। তার মনে জাগে ছবি—ছায়ায় আভাসে ইঙ্গিতে অস্পষ্টতায় যেন ছমছম করছে ঘুমন্ত বন। সে মগ্ন হয়ে যায় তার মধ্যে, ভুলে যায় মূল ঘটনা, হারিয়ে ফেলে স্থূল উপলক্ষ্যটাকে। বাস্তবকে, প্রাকৃতকে সে বেশিক্ষণ রাখতে পারে না চোখের সামনে; তার তরঙ্গিত কল্পনায় কোথায় তা ডুবে যায়। শ্রীলতা ঠিকই ভেবেছিলো—যেখানে জীবনের ঘটনার, ঘটনাপ্রসূত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, সেখানে পার্থপ্রতিম একেবারে অক্ষম, নিষ্ফল। যেখানে দৃঢ় সংকল্পে নিতে হবে কঠিন কাজ, সেখানে সে শিশুর মতো অসহায়। সে করতে পারে না কিছুই, শুধু ভাবতে পারে।

এখন, শ্রীলতার সঙ্গ সে পেয়েছে যতদিন ধরে, পার্থপ্রতিমের মন তাকে গ্রহণ করছে সচেতনভাবে, উজ্জ্বল করে তাকে দেখছে বিদ্যার পরিমণ্ডলে। আর কিছু নয়। সে ভালোবেসেছে তার সঙ্গে গল্প করতে, কারণ এই একটি মানুষ, যার সম্বন্ধে নিশ্চিত মনে করা যায় যে সে কথা বললে বুঝবে, হাসতে পারবে ঠিক জায়গায়—এবং যে-কোনো সময়ে যে-কোনো প্রসঙ্গে এমন কিছু তার বলবার থাকবে, যা শোনবার মতো। শ্রীলতা যে মেয়ে, তার এ-পরিচয় ছিলো চাপা পড়ে; সেদিক থেকে তার দিকে তাকিয়ে দেখার কথা পার্থপ্রতিমের মনে হয়নি। সে-রকম ভাবে, অন্তত, নয়, যাতে তার হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠতে পারে। দু-জন পরস্পরের যতই কাছে এসে থাক, পার্থপ্রতিমের মধ্যে একটা আত্মসম্পূর্ণতা ছিলো, একরকমের উদাসীনতা, যা পরোক্ষে যেন জানিয়ে দিতো যে শেষ পর্যন্ত এতে কিছু এসে যায় না। সে হয়তো কিছু কবিতা লিখে থাকতে পারে শ্রীলতাকে মনে করে, সেটা নেহাৎই খেয়ালি ব্যাপার, মনের রঙিন ঝলসানি, তার নিজেরই অন্তরে রয়েছে যে-আনন্দ, তার খানিকটা আকস্মিক উপচে-পড়া। বস্তুত, সেই কবিতাই, কাব্য উপভোগের সেই রস-নিবিড় আবহাওয়াই শ্রীলতাকে রেখেছিলো প্রচ্ছন্ন করে ঃ আত্ম-মগ্ন, আত্ম-বিস্মৃত, পার্থপ্রতিম শ্রীলতাকে ভালো করে দেখবারই সুযোগ পায়নি—সত্যি সত্যি সে কেমন তা যেন সে জানেই না।

কিন্তু ব্যাপার যা হলো, তাতে পরে পার্থপ্রতিমের চমক ভাঙলো। শ্রীলতাকে সে দেখতে পেলো—এই প্রথম দেখতে পেলো—তার দীপ্তির আকর্ষণে, তার চোখে ঝলক-লাগানো আবেষ্টনীর মধ্যে নয়—তাকে দেখতে পেলো বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে বিশাল নির্জন। সেখানে সে একা। সেখানে সে বিশেষ। দেখতে পেলো নিজের মনের অন্ধকারে তার ছবি। সেই ছবির চারদিকে কল্পনার কত রঙিন সুতোর টানা-পোড়েন। ছবি কখন বলি? যখন কোনো কিছুকে আমরা ভাব দিয়ে দেখি, নিজের অন্তরের মধ্যে নতুন ক'রে তাকে সৃষ্টি করি; সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন তা উন্মোচিত হয় আমাদের দৃষ্টিতে—বিস্ময়ের অপরূপত্বে। নিজেকে তার মধ্যে মেশাতে পারলে তবে তা ছবি হয়। যেটা ছবি, তাতে ছবির বস্তু যতখানি আছে, তার চেয়ে বেশি আছেন চিত্রকর। তাঁর যে-দেখাটাকে তিনি আঁকেন কিংবা লেখেন, তারই ভিতর দিয়ে সেই বস্তু পায় রূপের সম্পূর্ণতা, তাতেই তার রহস্য নিজেকে অতিক্রম করে লীলায়িত হয়ে ওঠে। শিল্পীর মনে লাগে বিস্ময় ঃ 'এ যে এমন, তা তো আগে কখনো জানিনি।'

তেমনি পার্থপ্রতিমও নিজের মনে বলে উঠলো, 'এ কী আশ্চর্য। অলক্ষিতে কখন শ্রীলতা

ছুঁয়ে গেছে তার মন ঃ সে জানতেও পারেনি। শ্রীলতার সঙ্গে তার বিয়ে—সেটা তার পক্ষে অভাবনীয় ঃ এবং যখন সেটা উল্লিখিত হলো, সেটাকে উড়িয়ে দিতে সে মুহূর্তকাল দ্বিধা করেনি। কিন্তু একদা যে তা উল্লিখিত হয়েছিলো—এটা তো রয়ে গেলো; আর তার মতো লোকের পক্ষে, যার কাছে ভাব আর বাস্তবের ভেদ খুব স্পষ্ট নয়—তা-ই যথেষ্ট। সেটাকে সে তত সহজে উড়িয়ে দিতে পারলে না, উড়িয়ে দিতে চাইলেই বা কই। বরং, ভাবনাটাকে সে অনেকখানি প্রশ্রয় দিয়ে ফেললো; হঠাৎ আবিষ্কার করলো, তার মনের অনেকটা জায়গা ছেয়ে গেছে শ্রীলতা সম্বন্ধে কৌতূহলে আর জল্পনায়। যাকে সে এতদিন নেহাৎই দূরে রেখে এসেছিলো নৈর্ব্যক্তিকতার নৈরাজ্য, তার কাছে আসবার সম্ভাবনা যেই হলো (এবং সে সম্ভাবনাকে প্রত্যাখান ক'রে—প্রত্যাখান করেছে ব'লেই বোধহয়), অমনি তার মন কম্পিত হয়ে উঠলো উৎসুকতায়, সে জানতে চাইলো, আরো বেশি জানতে চাইলো। এমনিই হয় ওর মতো স্বভাবের লোকের। যখন কোনো ব্যাপার ঘটে, সেটাকে অনায়াসে ঘটতে—বা না ঘটতে—দেয়, বিশেষ লক্ষ্য করে না; কিন্তু পরে—একটু পরে তা নিয়েই তার মন উচ্ছল হয়ে ওঠে।

পার্থপ্রতিমের মন থেকে থেকে উঠছে কেঁপে, যেন সূর্যের প্রতীক্ষায় উষার আকাশে আরক্তিম রোমাঞ্চন। এখনো ওঠেনি সূর্য, শুধু তার প্রস্তাবনায় দিগন্ত আভাময়। আকাশ রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঝংকৃত—সম্ভাবনায়, প্রত্যাশায়। কাছে পেয়েও পার্থপ্রতিম যাকে পেতে চায়নি, আর তার মন সুর দিয়েছে তাকে ঘিরেই। সেখানে রহস্যের পার নেই।

পার্থপ্রতিম ব্যাকুল হয়ে উঠলো শ্রীলতার দেখা পেতে। কিন্তু বাধা আছে, সে অনুমান করলো, বাধা তৈরি হয়ে উঠেছে। তার সেই কবিতার প্রাপ্তিস্বীকারও আসেনি। যথেষ্ট আভাস তা-ই। দিন কেটে যাচ্ছে ঃ রিচি রোড নীরব। এই ছেদ কি আর উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না? কিন্তু কেন, কেন? এর কী দরকার ছিলো? এমন কেন হবে যে এক একটি মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, নয়তো তার মুখ দেখতেও পাবো না? কী অন্যায়! কি অবিচার! যেন এমনিতেই একজন মানুষের আর একজনের সঙ্গে মেশবার স্বাভাবিক অধিকার নেই। কেন আমরা মিছিমিছি গায়েপড়া ব্যবস্থা দিতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ককে জটিল করে তুলি? আমি যদি কাউকে চাই তো আমি তাকে চাই; কেন তার পিছনে কোনো ধরা বাঁধা উদ্দেশ্য থাকতেই হবে? আমি যে তাকে চাই, এ-ই তো যথেষ্ট কারণ। কেন চাই? বন্ধুতা বিরল, আরো বিরল অন্তরঙ্গতা; যে বন্ধুকে মনে মনে ভাবি, সমস্ত জীবনেও তাকে পাওয়া যায় না। তবু সেইজন্যেই, যার মধ্যে তার এতটুকু ভগ্নাংশও দেখতে পাই, মন ছোটে তারই দিকে। আমরা একজন আর একজনের কথা বুঝি না, বোবা চোখে তাকিয়ে থাকি পরস্পরের দিকে, তাই যখনই শুনতে পাই একটু অনুরণন, দেখতে পাই কোনো চোখে পরিচয়ের ঝিলিমিলি, তখনই মন কূল ছাপিয়ে যায় আনন্দে, কৃতজ্ঞতায়। মন চায় তাকে, যে আমার ভাষা বোঝে, যে অনেকটা আমারই মতো, আমার স্বজাতি। সহজে তাকে পাওয়া যায় না ঃ যদি কারো মধ্যে তার খানিকটা পাই, কী করে তাকে ছেড়ে দিতে পারি, কী করে তাকে ফেলতে পারি হারিয়ে?

কেন এরকম হতে গেলো, পার্থপ্রতিম বার বার নিজের মনে বলতে লাগলো, এসব হবার কী দরকার ছিলো? যেখানে মেলা এত সহজ সেখানে, কেন এই মূঢ় অন্তরায়? সঙ্গে সঙ্গে তার এও মনে পড়লো যে শ্রীলতা ইচ্ছে করলেই হেলায় উত্তীর্ণ হয়ে আসতে পারে এই মূঢ়তা; কিন্তু—সে তা ইচ্ছে করছে না। কাকে পার্থপ্রতিম দোষ দিচ্ছে, রাগ করছে কার উপর? বিশ্বাস করা শক্ত যে এ-ব্যাপারে শ্রীলতার মনেও বিকৃতি ঘটেছে। এতে কী এসে যায়, একচুল কী এসে যায় এতে? শ্রীলতা কি তা বোঝে না? তবে কেন সে নিজেকে সরিয়ে নিলো এমন করে? পার্থপ্রতিমও কি তাহ'লে মিলিয়ে যাবে দূরের দিগন্তে, সমস্ত ব্যাপারটা মুছে ফেলার চেষ্টা করবে, যেন কিছুই নয়? কিন্তু তার মনের মধ্যে যে দশ দিক থেকে কথা কয়ে উঠেছে হাওয়া, নদীতে জেগেছে ঢেউ।

নতুন দিন

আবার পুজোর ছুটি। কলকাতা বহির্গমনের আয়োজনে মুখর। প্রতিবার এই আইনমাফিক হাওয়া বদলের পালা। শরীরটা বদলি হয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়—আর আমরা মনে করি, খুব হলো। আসলে, যদিও, ফিরে আসি ছুটিসম্ভোগ থেকে আরো বেশি ক্লান্ত হয়ে। কাজের রুটিন সহ্য হয়, সহ্য না-করে, অন্তত উপায় নেই; কিন্তু ছুটির রুটিন আমাদের মনের পরাভব, তা অপমান করে আমাদের মনুষ্যত্বকে। সেটাই বেশি মর্মান্তিক।

কিন্তু, খবর-কাগজ থেকে চোখ তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শ্রীলতা ভাবলো, কিন্তু কী সুন্দর এই আকাশ, কী অনির্বচনীয় নীল। সোনালী আলোর গানে-গানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। বকের পাখার রঙের মস্ত মেঘগুলো ভেসে চলেছে নিরুদ্দেশ আলস্যে, যে আলো তাদের উপর প্রতিফলিত মনে হয় তা যেন তাদেরই শরীর থেকে বিচ্ছুরিত। এত উজ্জ্বল আলো, আলোর চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়। এই আকাশের দিকে তাকালেই ইচ্ছে করে, রেলগাড়িতে ছুটে চলি এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সবুজ দিগন্তরেখা বার বার ঘুরে যাক আমাকে প্রদক্ষিণ করে—আকাশ থেকে নতুন আকাশে, দূরতব, নীলতর নীলিমায়। কী মোহ এই আলোয়, মনকে যেন জড়িয়ে ধরে অস্পষ্ট স্মৃতির মতো, পুরোনো, পরিচিত কোনো ক্ষীণ গন্ধের মতো। প্রাত্যহিক জীবনের যত কাজ, যত ভাবনা—ইচ্ছে করে, সব ভুলে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। একটা মেঘ শ্রীলতার দৃষ্টিপথ থেকে আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হলো; শ্রীলতা তার দৃষ্টি সরিয়ে আনলো আকাশ থেকে খবর কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতায়।

কুমুদনাথ আর মানসীর মধ্যে শিলং পাহাড় আর বিন্ধ্যাচলের তুলনামূলক সমালোচনা চলছিলো। গেলো বছর গেছে সমুদ্র, এ-বছর তাই, পাহাড় হতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে, ভারতবর্ষের ভদ্রগোছের পাহাড় সব ক-টাই উল্লিখিত হচ্ছিলো। তাঁরা মনস্থির করতে পারছিলেন না।

হঠাৎ তাঁদের আলাপের মাঝখানে শ্রীলতা ব'লে উঠলো; 'ভবানীপুরের এক মেয়ে-কলেজের জন্য ইংরিজি পড়াবার লোক চায়। আমাকে নেবে, তোমার মনে হয়, দাদা?'

কুমুদনাথ একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি মুখের কাছে তুলে ছিলেন; একটু থেমে বললেন, 'তার মানে? তুই চাকরি নিবি নাকি?'

'ভাবছিলুম।'

'কেন হঠাৎ, তোর এতই টাকার দরকার?'

'টাকার জন্য নয়। যদিও—উপার্জন করবো ভাবতে ভালোই লাগছে।' মানসী ভুরু তুলে বাঁকা চোখে শ্রীলতার দিকে তাকালেন। সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শ্রীলতা বলল, 'তাছাড়া, সময়ও কাটে না কিছু না-করলে।'

'ঠিক জানিস যে মাস্টারির কাজ তোর ভালো লাগবে?'

'যে-কদিন লাগে।'

'এমন যদি হয়,' কুমুদনাথ বললেন, 'যে এটাকে তুই নিতে চাচ্ছিস অন্য কোনো কিছুর অভাবে, তাহলে বরং না নিলি।

শ্রীলতা শান্ত স্বরে বললে, 'তা নয়। এতদিন তো কাটলো একভাবে—এবার হোক না একটু অন্যরকম। এটাও একরকমের ছুটি।'

'পাগলামি?' হঠাৎ মানসীর ধারালো স্বর শোনা গেলো, 'স্রেফ পাগলামি। লোকে কী মনে করবে? বলবে না কি—'ভদ্রলোকের কাণ্ডটা দ্যাখো—বোনকে দিয়েছে কাজ করতে।'

'ও-ধরনের কথা যারা বলে, 'কুমুদনাথ উত্তর দিলেন, 'তারা যা-কিছুই বলুক তাতে এসে যায় না।'

'তুমি তো ঐ রকমেই ভাবো ঃ নিজের সম্মান তুমি নিজে খোওয়াবে—তাও বুঝতে পারবে না!'

'এত তোমার ভয় কেন, মানসী, পাছে কেউ এমন সন্দেহ করে যে সে যেমন ভেবেছিলো তার চেয়ে একটুও কম টাকা আছে তোমার স্বামীর?'

'কাজ জিনিসটাই খানিকটা ভালগার। মানুষ কাজ করে পেটের দায়ে। যেখানে কাজ, সেখানেই বুঝতে হবে অভাব। অভাব থাকলে লোকে তা গোপন করার চেষ্টা করে ঃ অভাব নেই, তবু তা বুঝতে দিতে যাবো কেন?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছো তোমাকে এই সুন্দর আলস্য জোগাবার জন্য একজনকে কাজ করতে হয় আট ঘণ্টা রোজ। তার অসহ্য ভালো লাগাটি তোমাকে এতটুকু পীড়া দেয় বলে তো মনে হয় না।'

মানসী বাঁকা ঠোঁটে হাসলেন।—'পুরুষদের কথা আলাদা। তারা তো কাজ করবেই। তারা কাজ না করলে চলবে কী করে?'

'আর মেয়েরা?'

'মেয়েরা শুধু থাকবে। শুধু হবে। সেটাই শোভা। তারা যে আছে, সে-জন্য তাদের কিছু দাম দিতে হবে না ঃ সে দাম দেবে পুরুষ।'

কুমুদনাথ নিচু গলায় হেসে উঠলেন।—'তোমার বিশ্বাসের জোর আছে যা হোক—ভাগ্যিস এ-সময়ে বাংলাদেশেই জন্মেছিলো।'

'অন্য রকম হলে কী হতো জানিনে,' গ্রীবার সুন্দর ভঙ্গি করে মানসী বললেন, 'কিন্তু এ-পর্যন্ত বলতে পারি যে বর্তমান যা ব্যবস্থা, তাতে আমি পরম তৃপ্ত। কারো সঙ্গে চাইনে জায়গা বদল করতে।'

যে-মুহূর্তে মানসী কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন, শ্রীলতা আবার খবর কাগজে চোখ ডুবিয়েছিলো ঃ এতক্ষণে কথা বললো, 'তুমি নিজে খুশি থেকো বৌদি, কিন্তু অন্যের খুশিতে বাধা দিতে এসো না।'

'বাধা আমি দিচ্ছি না, দিতে গেলেও ফল হবে না, জানি। আমি শুধু আমার মত জানাচ্ছি। তুমি যে কাজ নেবার কথা ভাবছো, আমি তা একেবারেই পছন্দ করতে পারি না। শেষটায় মাস্টারনি হবে তুমি!'

শ্রীলতার কানের গোড়া একটু লাল হয়ে উঠলো। বললে 'স্বাধীন হবার একটা আনন্দ আছে—তুমি তা বুঝবে না।'

'স্বাধীন! রোজ ঘড়ি ধরা সময়ে হাজিরা দিয়ে মাসের শেষে মাইনে নিয়ে আসা—তাকে বলো স্বাধীন হওয়া! আমি স্বাধীনেরও বেশি হতে চাই—আমি চাই রাজত্ব করতে।'

'সবচেয়ে বড়ো রাজত্ব হ'লো নিজের উপর।'

শ্রীলতা এত আস্তে বললে কথাটা মানসী তা শুনতে পেলেন না, না কি শুনতে পেয়েও গ্রাহ্য করলেন না, ঠিক বোঝা গেল না। 'তাছাড়া', তিনি বললেন, 'মেয়েরা কোনো কাজকর্ম নিলেই অকালে বুড়িয়ে যেতে থাকে। সেটা অন্যায়। যৌবনকে নষ্ট করার অধিকার নেই কোনো মেয়ের। আমার মতে,' হঠাৎ স্বর নামিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে তিনি বললেন, 'তোমার এখন বিয়ে করা উচিত। বিয়ের জন্যই মেয়েদের সৃষ্টি।'

'যেমন,' কুমুদনাথ ব'লে উঠলেন, 'ডিম পাড়ার জন্যই মুরগির সৃষ্টি। মুরগি না থাকলে আমরা ডিম খেতে পারতুম না, স্ত্রীলোক না থাকলে পারতুম না বিয়ে করতে—সুতরাং মুরগির জন্য, এবং স্ত্রীলোকের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

মানসীর মুখ একটু কঠিন হ'লো। এক মুহূর্ত দেরি করে তিনি বললেন, 'আমার সবচেয়ে

রাগ হয়, পুরুষ যখন গায়ে প'ড়ে মেয়েদের প্রতি দরদ দেখাতে আসে। মেয়েদের স্বার্থ সবচেয়ে ভালো বোঝে তারা নিজেরাই।'

'সে বিষয়ে,' কুমুদনাথ বললেন, 'যদি বা কিছু সন্দেহ ছিলো তোমাকে দেখে তা দূর হলো।'

'তোমার এখন উচিত, শ্রীলতার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে, এমন কোনো ছেলের খোঁজ করা। চারদিকে তাকিয়ে একজনকেও কি চোখে পড়ে না?'

শ্রীলতা হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো, তীরের মতো সোজা। 'আমার ভাবনা তোমাদের আর ভাবতে হবে না ঃ তোমরা বরং বিন্ধ্যাচল যাবে না শিলং যাবে তার মীমাংসা করে ফেলো। সেটা ঢের বেশি জরুরি।' বলে দ্রুত পায়ে চলে গেলো সেখান থেকে।

শ্রীলতার গায়ের ধাক্কায় কম্পমান পরদার দিকে তাকিয়ে কুমুদনাথ বললেন, 'মিছিমিছি রাগিয়ে দিলে মেয়েটাকে।'

'রাগিয়ে দিলুম মানে? তোমার প্রশ্রয় পেয়েই ও যা খুশি তা-ই করবার মতো সাহস পায়।'

'যা খুশি তা-ই কোনটা করলো?'

'আর কথা কেটো না। সত্যি যদি তোমার বোনের ভালো চাও, তাহ'লে আমি যা বলছি তাই করো এখন।'

'ভেবে দেখি', বলে কুমুদনাথ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন।

নিজের ঘরে, শ্রীলতা তার চাকরির আবেদন লিখতে বসলো। কয়েকদিন ধ'রেই সে খবর-কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন লক্ষ্য ক'রে আসছে—এটার মতো আর কোনোটা তার পছন্দ হয়নি। বাংলাদেশে মেয়েরা এখন ইচ্ছে করলে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সে-জন্য। এটা যদি ফাকায়, নিতে হবে অন্য একটা। বেছে বেছে আরো কয়েকটা জায়গায় আবেদন পাঠিয়ে দেবে সে। যেটা হয়। একটা হবেই। শ্রীলতার মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে সে অধ্যাপনা করবে। নিজেকে সে স্পষ্ট দেখতে পেলো সেই ভূমিকায়। ভালোই লাগলো তার ভাবতে। যা-ই হোক, সেটা কিছু তো। অন্তত, সেই জগৎ থেকে দূরে সরে যাওয়া, যেখানে তার বৌদি 'রাজত্ব' করেন। সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—এটা নিয়ে আর ওটা নিয়ে ঃ এখন তার অত্যন্ত দরকার হ'য়ে পড়েছে জীবন-বইয়ের নতুন একটা পাতা ওলটানো।

কলমের জন্য টেবিলের দেরাজ খুললো সে। খুলেই চোখে পড়লো শক্ত, শাদা একটা খাম। পার্থপ্রতিমের চিঠি। আগের দিন এসেছে। সে অবাক হয়েছিলো, পার্থপ্রতিম যে তাকে আবার চিঠি লিখেছে। সে আশা করেনি। শ্রীলতা খামটা তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ উল্টে-পাল্টে দেখলো, যেন তাতে করে কোনো গভীর অর্থ সে ইঙ্গিতে বুঝে ফেলবে। তারপর চিঠিটা বের করে আর-একবার পড়লো।

পার্থপ্রতিম লিখেছে ঃ

'এমন চুপচাপ কি হতেই হবে? যে-ব্যাপারটা তুচ্ছ, অর্থহীন, পরের মুহূর্তেই ভুলে যাবার মতো, সেটাকে যদি দাঁড় করে তুলি মাঝখানে—তা যে কী হাস্যকর, তাও কি আপনার মনে হয় না? আমি বসে বসে ভাবছি, এত বড়ো সহজ জিনিসটাও কি আপনার চোখ এড়াবে! বুঝে উঠতে পারছি না কিছুতেই। যদি রাগ করে থাকেন, তা দেখুন, আমার কী দোষ, দোষ দিন আপনার দাদাকে। আমি আর কী করতে পারতুম বলুন তো? আপনি অন্তত বুঝবেন এই আশা রাখি মনের মধ্যে। আর আপনার রাগটাও মনে মনে ঠিক কল্পনা করতে পারছি না—আপনি গম্ভীর হয়ে গিয়ে কারো সঙ্গে একটি কথা বলছেন না, কি কম খাচ্ছেন, কি সারাদিন শুয়ে থাকছেন—আপনার সম্বন্ধে এর যে-কোনোটা ভাবতেই হাসি পায়। রাগ যদি হতেই হয়, তাহলে তাই হোক, কবি যাকে বলেছেন "rich anger"—তা ভেঙে পড়ুক

আমার উপর উত্তাপে আর সৌন্দর্যে, সেই অগ্নিবর্ষণে বরং মাথা পেতে দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া—এর কী দরকার? আগে যেমন ছিলো, তেমনি আবার সব হতে পারে না কেন?

'আমার বিশ্বাস, আপনি অবিচার করছেন নিজেরই প্রতি—হয়তো কিছু না ভেবে, না-হয় কোনো ভুল ধারণা পেয়ে বসেছে আপনাকে। কিন্তু দোহাই দেবতার, আমরা যেন কোনো ভান না করি, আমরা যেন সহজ হতে পারি। মনের সত্যকে যেন কিছুতেই চাপা পড়তে না দিই। অনেক সময় এমন হয় যে যেটা ক্ষণিক ও অপ্রাসঙ্গিক, সেটাই মনে হয় যেন সব-কিছু জুড়ে রয়েছে। তখন তাকে ভেদ করে আমাদের দেখতে পারা উচিত—অন্তত চেষ্টা করা উচিত। তাহ'লেই আর কোনো জটিলতা থাকে না। একটু যদি সোজা দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পারি তাহ'লেই অনেক সংশয়, অনেক বিরোধের দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি, এবং অন্যকেও।

'আমি সত্য কথা বলবো—আমার এখন ইচ্ছে করছে আপনাকে আবার দেখতে। মনে পড়ছে আপনার শাড়ির ভঙ্গি—সেই ভঙ্গির সঙ্গে এত বেমানান, এমন বিসদৃশ—এই সব! আপনি যা ছিলেন, তা-ই তো আছেন; তবু কেন—কেন আমাকে এই চিঠি লিখতে হচ্ছে? যদি ভুল করে থাকি, তাহ'লে তো বুঝতেই পারবো; কিন্তু আমার মনে এই আশাই রইলো যে ভুল আমি করিনি।

পার্থপ্রতিম।'

পড়া শেষ করে শ্রীলতা চিঠিটা আবার দেরাজে রেখে দিলে। তারপর কলম তুলে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলো চাকরির আবেদন।

প্রণয়-জিজ্ঞাসা

শ্রীলতাকে দ্বিতীয় চিঠি ডাকে দিয়েই পার্থপ্রতিম বুঝতে পেরেছিলো সে ভুল করেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলো রাস্তার মাঝখানে...লাল ডাকবাক্সটার নিষ্ঠুর, নিরুত্তর গহ্বরটার দিকে তাকিয়ে। এখন যদি চিঠিটা ফিরিয়ে আনা যেতো! কিন্তু যে-চিঠি ডাকে দেয়া হয়েছে, তা উচ্চারিত কথার মতো, নিক্ষিপ্ত তীরের মতো—তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তবু মুখের কথা যায় হাওয়ায় হারিয়ে; তীর কোথায় গিয়ে পড়ে, আর খোঁজ পাওয়া যায় না—চিঠি সম্বন্ধে সেটুকুও ভরসা নেই। চিঠি যথাস্থানে পৌঁছয়; চিঠি থেকে যায়।

মন-খারাপ করে পার্থপ্রতিম বাড়ি ফিরে এলো। মনে মনে ভাববার চেষ্টা করলো চিঠিটার কী ফল হবে শ্রীলতার মনে। সে দেখতে পেলো শ্রীলতাকে, শক্ত শাদা খামের উপর তার হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে আছে—হয়তো অবাক হচ্ছে, হয়তো বুঝতে পারছে, কী আছে এর ভিতর। সে তাকে দেখতে পেলো—খামটা ছিঁড়তে; তারপর—পড়া হয়ে গেলো, চিঠিটা পড়ে রইলো কোলের উপর, ভুলে গেলো তুলে রাখতে। তাকিয়ে রইলো সামনের দেয়ালের দিকে—একটু হাসি কি তার ঠোঁটের কোণে? দুর্বল দুর্বল। শ্রীলতার আনুমানিক মন্তব্যের প্রতিধ্বনি জেগে উঠলো পার্থপ্রতিমের মনে; নিজেকে উদ্দেশ করে সে বলতে লাগলো; দুর্বল দুর্বল। অর্থহীন চিঠি। অর্থহীন, নিষ্প্রয়োজন, অকারণ। তাছাড়া, অযাচিত। অযাচিত, অবাঞ্ছিত। পার্থপ্রতিম তার চিঠিটাতে দম্ভ আর নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু দেখতে পেলে না। প্রার্থী হ'য়ে গিয়ে পিঠ-চাপড়াবার চেষ্টা। দীনতাকে গোপন করার

জন্য আত্মবিশ্বাসের উদ্ধত অভিনয়! কী ক'রে চিঠি লিখতে পারলো সে; লিখতে-লিখতেই সে-না বুঝে পারলো কেমন ক'রে যে সে কী করছে? ভেবে-ভেবে পার্থপ্রতিম রীতিমতো অসুখী ক'রে তুললো নিজেকে।

কিন্তু মনের কোনো প্রচ্ছন্ন কোণে সে এ-ও অনুভব করলে যে সে যা লিখেছে, তা সত্য। সত্য, সত্য। কিন্তু বলতে গেলে তার এমন মেকি শোনায় কেন? সে তার কথাগুলোকে মনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলে—আর একা ঘরে ব'সে নিজের কাছেই লাল হ'য়ে উঠলো লজ্জায়। এই কথাই কি আরো ভালো ক'রে বলা যেতো না? সহজ ক'রে? ছোটো-ছোটো কথায়? কিন্তু তা যে শোনাতো প্রণয়নিবেদনের মতো; আর সেটা হ'তো আরো খারাপ; কেননা, শ্রীলতাকে প্রণয় নিবেদন করতে সে চায় না—চায় না কি? পার্থপ্রতিমের কপাল ঘেমে উঠলো ঃ যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ভালোবাসার সূত্রপাত সেখানেই, যেখানে আমরা একজনকে বিশেষ-একজন ক'রে দেখি, বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখি অসংখ্য মানুষের সাধারণতা থেকে ঃ যেখানে সে স্বতন্ত্র, নিঃসঙ্গ। সেই নিঃসঙ্গতা, জ্বলন্ত তারার চতুঃসীমায় যেমন অন্ধকার—তা যখন ধরা পড়ে, তখনই সে হ'য়ে ওঠে রহস্যময়। ভেবে-ভেবে কূল পাই না তার। তখনই তার উপমা খুঁজে আনি চাঁদ থেকে আর সূর্য থেকে। তাকে মনে হয় যেন নিশীথরাত্রির মতো আশ্চর্য। তাকে বর্ণনা করতে গিয়েই কথা হ'যে ওঠে কবিতা। অন্বেষণের শেষ নেই; আবিষ্কারের শেষ নেই। যে-মুহূর্তে ভালোবাসি, তার মধ্যে সৃষ্টি করি রহস্য। যাকে ভালোবাসি তার মধ্যে যদি রহস্য না থাকবে, কী ক'রে তাকে ভালোবাসতে পারতুম? একজন যখন আর-একজনের প্রেমে পড়ে, আমরা দর্শকরা বলাবলি করি ঃ 'কী যে ও দেখতে পেয়েছে ওর মধ্যে, বুঝতে পারি না।' কিন্তু সেটাই যে ঠিক ঃ তা আমাদের বুঝতে পারার কথাও নয়। আমরা যদি তা-ই দেখতে পেতুম, তাহ'লে প্রেমে পড়তুম যে আমরাই।

এই হচ্ছে গোড়াকার কথা। এ ছাড়া ভালোবাসা হয় না ঃ যা হয়—আমরা ভালো ক'রেই জানি, কী হয়। আর এর পরে—এর পরে কী? কী ক'রে তাকে কাছে পাবো, কী ক'রে তাকে গ্রহণ করবো জীবনের মধ্যে?

পুরুষের এই স্বভাব যে সে চায় তার ভাগ্যকে জয় করতে। যুদ্ধ তার রক্তে ঃ যা সে অর্জন করেনি, তা ভোগ করতে তার পৌরুষ লজ্জিত হয়। সে ভালোবাসে বিপদের তীব্রতা ঃ সে ভালোবাসে নিজেকে ঢেলে দিতে দুঃসাহস থেকে দুঃসাহসে। জীবনের সঙ্গে জুয়োখেলায় সে দেউলে হ'য়ে যাবে সেও ভালো; তবু ব'সে-ব'সে হাত বাড়ালেই যা পাওয়া যায়, তা নিয়ে তৃপ্ত থাকবে না। যেমন সে গ'ড়ে তোলে তার কীর্তি প্রতিকূলতার মুখে, যেমন সে অনিচ্ছুক ভাগ্যকে কঠিন পণে পরাজিত করে—তেমনি সে চায়, যাকে ভালোবাসে, তাকে জয় করতে। কেমন ক'রে? না, প্রেমে, প্রেমের শক্তিতে। তাকে ঘরে ব'সে হাতের কাছে পেতে চায় না ঃ দুঃসহ মূল্য দিয়ে তাকে তুলতে চায় দুর্লভ ক'রে। কারো হাত থেকে সে তার প্রিয়াকে নেবে না। প্রিয়া তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে নিজেরই অন্তরের প্রেরণায়।

এ-সব কথা যে পার্থপ্রতিমের মনে স্পষ্ট রূপ নিয়েছিলো, তা নয়। শুধু তার মধ্যে ইচ্ছার ঢেউয়ের ছলছলানি; অস্ফুট আভাস, অনির্দেশ্য ছায়া। তাকে সে ভাষা দিতে পারে না—ভাষা দিতে, হয়তো, চায়ও না। শুধু চুপ ক'রে শোনা মনের সঙ্গে নিজের কানাকানি। শ্রীলতা যখন কাছে এসেছিলো সে তাকে চায়নি, কিন্তু এখন—সে গেছে দূরে স'রে, লুপ্ত হ'য়ে গেছে নীরবতায়—এখন তার কেবলই মনে হচ্ছে, কী ক'রে আমি তার মূল্য দিতে পারি? কী ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে পারি তার আচ্ছাদন, কী ক'রে তাকে দেখতে পারি মুখোমুখি? কোথায় সে আলো, যাতে আমার চোখে উদ্‌ঘাটিত হবে তার পরিচয়? কাছে থেকে যে আমার চোখে পড়েনি, আজ দূরে থেকে তারই ছায়া যে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে আমাকে। পার্থপ্রতিমের মনে পড়লো সে কুমুদনাথকে লিখেছিলো, 'কোনো মির‍্যাকল

কখনো ঘটবে না।' কিন্তু তা-ই যে ঘটলো ঃ এত বড়ো মির‍্যাকল আর কী হ'তে পারে? তার সমস্ত পৃথিবীর চেহারা গেছে বদলে, কিছুই আর আগেকার মতো নেই। যা-কিছু তার চোখে পড়ে, তা-ই যেন নতুন, তা-ই যেন এইমাত্র সৃষ্ট হ'লো। এতদিন সে বই পড়েছে, কাব্যচর্চা করেছে, বাস করেছে সাহিত্যের রামধনু-আবছায়ার আড়ালে। আজ যেন হঠাৎ রঙিন ধোঁয়ার সেই পরদা গেলো স'রে, পৃথিবীকে সে প্রত্যক্ষ করলো প্রথম বার। কে জানতো এত রহস্য আছে পৃথিবীতে, মনে-মনে সে বললে, কে জানতো আমার মধ্যে আছে সেই দুর্ভেদ্য, দুর্বোধ্য অরণ্য। সেখানে কি দুঃখ পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠছে বিষাক্ত লতার মতো, না কি আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছে ডালে-পাতায় সবুজ অজস্রতায়? কিছু বোঝা যায় না, শুধু মনে হয়, এ আশ্চর্য; এমন আশ্চর্য আর কিছু নেই।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে পার্থপ্রতিম চোখ মেলে তাকালো। ঘরের মধ্যে অন্ধকার কী যেন কথা বলছে ফিসফিস ক'রে, চারদিক স্তব্ধ হ'য়ে আছে তা শুনবে ব'লে। মশারির ফাঁক দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে তার ঘরের আসবাব—ধূসর প্রেত-রেখায় নির্দেশিত দেয়ালের কোণে তার আয়নাটা তারার-আলোয় দেখা জলের মতো ম্লান। এখন আর তার এই ঘরকে চেনবার উপায় নেই ঃ এই জিনিসগুলোর যেন একটা নিজস্ব সত্তা আছে—তা. প্রকাশিত হয়েছে এই অন্ধকারে, এই ঘুমেভরা শূন্যতায়। সারাদিন ভ'রে যাদের ব্যবহার করি কিছু না-ভেবে, এখন তারা গেছে কত দূরে স'রে—যেন কোন অতীতে, যেন কোন স্বপ্নে। পার্থপ্রতিম বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ তার চোখ গেলো জানলা দিয়ে বাইরের আকাশে। সেখানে ম্লান আধখানা চাঁদ ক্লান্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার আলোয় নেই তেজ ঃ জানলার কাছে এসেই হাঁপিয়ে পড়ছে, ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। একটু হয়তো ফ্যাকাসে আভা অন্ধকারের গায়ে লেগেছে কি লাগেনি। অনেকক্ষণ তারা মুখোমুখি তাকিয়ে রইলো—সে, আব ম্লান একটি চাঁদ; তারপর চাঁদ অলক্ষিতে অন্তর্হিত হ'য়ে গেলো পার্থপ্রতিমের দৃষ্টি থেকে। হঠাৎ যেন সারা আকাশ ফাঁকা হ'য়ে গেলো; পার্থপ্রতিমের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। সে নেই, সে নেই; আকাশ তার বিরহে ভ'রে গেছে।

তারপর সে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারলে না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে প'ড়ে উঠলো ন-টার সময়। ইন্দিরা দু-বার চা নিয়ে ডাকা-ডাকি ক'রে ফিরে গেলেন। দিনটা কেমন শূন্য লাগলো তার কাছে—যেন আলোর অন্তর্লীন যে-প্রাণের তেজ, সেটা নিবে গেছে। চা খেতে-খেতে সে ভাবলো কিছুদিন কলকাতার বাইরে ঘুরে এলে হয়। কোথায় যাবে? যে-কোনো জায়গায়—সেটা পুরী হোক, বা রাঁচি হোক বা কাশী হোক কিছু এসে যায় না। কোনোরকমে কিছু টাকার জোগাড় করা যাবেই। তার হঠাৎ মনে পড়লো, শ্রীলতা তাকে পুরী থেকে যে-চিঠি লিখেছিলো। পুরী সে কখনো যায়নি, যাবার ইচ্ছে অনেকদিন ধ'রে। গেলো বছর হয়তো যেতো, যদি না—বাকিটা সে নিজেকে ভাবতে দিলে না। পার্থপ্রতিম মনস্থির ক'রে ফেললো, পুরীতেই সে যাবে।

দেখা

ভিড়ের ঠেলাঠেলি, হোটেলে এক ঘরে দু-জনের শোবার ব্যবস্থা, হোটেলের দুষ্পাচ্য ও সুবিস্তৃত ভোজন, হাওয়ার ঠেলায় কেরোসিনের আলোয় রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ায় অসুবিধে—এ-সব সত্ত্বেও পুরী পার্থপ্রতিমের ভালো লাগলো। আকাশে সূর্য; সমুদ্র নীল; আর-একটি চঞ্চল আকাশের মতো সমুদ্র। আর, নতুন জায়গায় এসে প্রথম কয়েকদিন মন ব্যস্ত থাকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে—সেটা মন্দ লাগে না। সবচেয়ে তার ভালো লাগলো নিজের সম্পূর্ণ একাকীত্ব। পরিচিত পারিপার্শ্বিকে নিঃসঙ্গ হ'লেও আমরা যেন ঠিক একা হ'তে পারি না; বাড়ি, দোকান, পথ-ঘাট—মূক, অচেতন সব জিনিস, তারাই পদে-পদে আমাদের জড়িয়ে ধরে, বলে, 'কী খবর?' বলে, 'আরে

শোনোই না।' আর ঠিক সেই মুহূর্তে হয়তো সম্ভাষিত হ'তে চাই না আমরা। কিন্তু পুরী আর সে পরস্পরের একেবারে অচেনা; দু-জনে দু-জনকে দূর থেকে দেখে নিচ্ছে আড়চোখে—কেউ কথা বলছে না। রূপক বাদ দিলেও, পার্থপ্রতিম সারাদিনের মধ্যে কথা বলতো খুব কমই; সেটাও তখনকার মতো মিলে গিয়েছিলো তার ইচ্ছের সঙ্গে।

এক বিকেলে, সমুদ্রের ধার দিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটতে-হাঁটতে সে চ'লে গিয়েছিলো অনেক দূরে, যেখানে ভিড় নেই। চারদিক ফাঁকা; এবড়োখেবড়ো ব্রাউন রঙের কর্কশ জমি, মাঝে-মাঝে ফণিমনসার ঝোপ। দৃষ্টি বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে একটা বাড়ি, পুরোনো, রং উঠে আসা—নাটকের দৃশ্যপটের মতো। জায়গাটার রুক্ষ, বন্ধ্যা ভাব পার্থপ্রতিমের মনকে নাড়া দিলে। এ কারো সঙ্গে মিশতে চায় না; নিজের মধ্যে এ সম্পূর্ণ ও নিহিত; এ সুদূর, এ বিচ্ছিন্ন। এর মধ্যে প্রশ্রয় নেই, সান্ত্বনা নেই। ফণিমনসার কাঁটায় এ নিজেকে আগলে রয়েছে, সবুজের বন্যায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়নি। এমন সময় আসে, যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি দেয়াতে আর নেয়াতে, সংস্পর্শে আর সংঘাতে; যখন আমরা বুজে যেতে চাই নিজের মধ্যে। এই বালুম্লান, নিষ্করুণ প্রকৃতি যেন মনের সেই অবস্থার দৃশ্যমান রূপ।

পার্থপ্রতিম বসলো, ঘন, নরম বালির উপর পা ছড়িয়ে। খুলে ফেললো জুতো। তার পায়ের নিচে গড়িয়ে যাচ্ছে সমুদ্র। ঢেউগুলো তার পায়ের একটু দূর পর্যন্ত এসে ফিরে যাচ্ছে; রাগ ক'রে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে আরো জোরে, তবু পার হ'তে পারছে না সেই সীমা। যেন সমুদ্রকে ঠাট্টা ক'রে পার্থপ্রতিম তার পায়ের আঙুল আরো একটু বাড়িয়ে দিলে। এক-একটা ঢেউ সিংহের মতো লাফিয়ে প'ড়ে যেন তার চেয়েও বড়ো কোনো শক্তির আঘাতে প্রবল পিছু-টানে নেমে যাচ্ছে। সেই নির্জনতায়, পার্থপ্রতিমের রক্তে এক উচ্ছ্বাস জাগলো, তার মনে হ'লো, সে-মুহূর্তে সে-ই হচ্ছে চরম শক্তি; এই উন্মাদ, বিশাল সমুদ্র নিয়ে সে খেলা করছে। এক হাতে কতগুলো ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে সে এক-একটা আগন্তুক ঢেউয়ের গায়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারতে লাগলো, তাতে আনন্দ পেলো ছেলেমানুষের মতো।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, দিগন্ত ফেটে পড়ছে লালে-সোনায়। এত ঐশ্বর্য কেন, মৃত্যুতে কেন এত সমারোহ? যখনই কোনো বর্ষার সূর্যাস্ত পড়েছে পার্থপ্রতিমের চোখে—বাস্-এ করে চৌরঙ্গি দিয়ে যেতে-যেতে ময়দানের দিকে তাকিয়ে একটু মন-খারাপ হ'য়ে গেছে তার। কী অন্যায়! অজস্র আছে ব'লে কি এমন অকৃপণ-ভাবে খরচ করতে হয়? এখানে আলোর শেষ নেই, বন্যা নেমেছে রঙে-রঙে; অথচ আমাদের জীবনে এই রঙের এই আলোর এক কণার জন্য কী আর্ত ভিক্ষা, তার অভাবের কী নিষ্ঠুর দৈন্য—কত দুঃখে কী তীব্র চেষ্টায় মেলে তার ক্ষীণতম স্পর্শ। আমাদের জীবনে এত দৈন্য, এত মলিন, জীর্ণতা, এদিকে আকাশের গায়ে, দ্যাখো, কী অকারণ, কী অপ্রার্থিত বাহুল্য। কার জন্য এ-সব? আমাদের, প্রথম কথা, সময় নেই, আমাদের অনেক কাজ, অনেক ভাবনা। আর তাছাড়া, সৌন্দর্য জিনিসটা আমাদের ঠিক সহ্য হয় না। আমাদের কষ্ট হয় তার দিকে তাকাতে, মনে হয় মুহূর্তের মন ভোলাবার এই খেলা আর কেন, আমরা তো জানি আমাদের জীবন কী। সূর্যাস্ত মিলিয়ে যাবে ক্ষণিকে, জীবন তো থাকবে। চোখ বিশ্রাম খোঁজে পরিচিত সাধারণতায়, অভ্যস্ত বিবর্ণতায়। বাস্ চৌরঙ্গি থেকে ধর্মতলায় মোড় ঘুরতেই পার্থপ্রতিম অনেক সময় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। যাক্, সৌন্দর্যের কোনো ভান, অন্তত, এখানে নেই ঃ একেবারে অকপট, আন্তরিকভাবেই এ কুশ্রী।

কিন্তু, পার্থপ্রতিম ভাবতে লাগলো, সূর্যাস্তের অর্থ হয় কলকাতাতেই ঃ সেখানেই, সমস্ত ব্যস্ততা আর বিক্ষোভের মধ্যে মানুষকে যেন তা বাণী প্রেরণ করে অন্যকোনো জগতের, অকল্পিত কোনো শান্তির। এখানে, এই সমুদ্রের উপর, পৃথিবীর বিস্তীর্ণ নীরবতার উপর তা অর্থহীন। এখানে তা নিজের গৌরবে নিজে মগ্ন। নিষ্ফলতায় জ্ব'লে-জ্ব'লে যাচ্ছে এত আগুন—অথচ কিছুই তার বলবার নেই। তা যেন অনেক দূরের কোনো মায়া-পুরীর শখের বাজি পোড়ানো; আমাদের জীবনের সঙ্গে কিছুমাত্র

সংস্রব নেই তার। পার্থপ্রতিমের মনে হ'লো, সে কোনো ছবি দেখছে, সুন্দর ছবি—কিন্তু তার বিষয় এমন নয়, যা তার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে। চোখকে তা খুশি করে, মনে এনে দেয় না মোহ। পার্থপ্রতিম একটা ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে বালির উপর দাগ কাটতে-কাটতে অলস চোখে তাকিয়ে রইলো।

আর হঠাৎ, তার আর সূর্যাস্তের মাঝখানে অন্য কিছু এসে দাঁড়ালো। বরং, সূর্যাস্তের শরীর থেকেই যেন উঠে এলো এই লালের ঝলসানি—পার্থপ্রতিমের চোখের সামনে। সিঁদুরের মতো লাল। আস্তে-আস্তে তা কাছে আসছে, শাড়িটার ভঙ্গি পার্থপ্রতিমের চেনা মনে হ'লো। আগুনের আকাশের গায়ে আগুন জ্বেলে দিলে কে—এই সিঁদুর-রঙের শাড়ির আভা? তা এসে পড়ালো আরো কাছে ঃ কিন্তু পার্থপ্রতিম আগেই চিনতে পেরেছিলো। সে শরীরের কোনোরকম ভঙ্গি করলে না, চোখও আনলো না ফিরিয়ে। শুধু, যে-হাত সে বালিতে কাটছিলো, সেই হাতটি স্তব্ধ হ'লো।

শ্রীলতা আগে কিছু লক্ষ্য করেনি; একেবারে কাছে এসে প'ড়ে থমকে দাঁড়ালো। একটু ইতস্তত করলো ঃ কিন্তু না-চিনলেই সবচেয়ে বেশি চেনা হ'তো। তাই সে সহজভাবে বললে, 'আপনি!'

'আমিও সে-কথা বলতে যাচ্ছিলাম।'

পার্থপ্রতিম উঠে দাঁড়ালো। তাদের চোখ পড়লো পরস্পরের উপর। এখন শুধু একটি উপায় আছে ঃ সহজ হওয়া—যেন কিছুই ঘটেনি, এমনিভাবে কথা বলা।

'আপনারা পর-পর দু-বছরই পুরীতে—' পার্থপ্রতিম কথা আরম্ভ করলে।

'দৈবাৎ হ'য়ে গেলো। কথা ছিলো বিন্ধ্যাচল, কিন্তু দাদার এক বন্ধু বাড়ি ঠিক করেছিলেন এখানে—শেষ মুহূর্তে তাঁদের কার অসুখ করলো ব'লে আসা হ'লো না, বাড়িটা দাদা নিয়ে নিলেন। তাই—'

'বুঝেছি। ভালোই হ'লো; এই বিভ্রাটটুকু হ'লো ব'লেই আপনাকে দেখতে পেলুম এইমাত্র, যেন সূর্যাস্তে নেয়ে উঠলেন।'

শ্রীলতা মুখ ফেরালো সমুদ্রের দিকে; নীরবতার কয়েকটা সোনালি মুহূর্ত গড়িয়ে গেলো।

তারপর শ্রীলতা বললে ঃ 'কোথায় আছেন এখানে?'

পার্থপ্রতিম একটা হোটেলের নাম করলে।

'কেমন লাগছে?'

'বেশ। খুব ভালো।'

'কেমন! আমি আপনাকে বলিনি—' শ্রীলতা মাঝপথে থেমে গেলো।

'আপনার অনুমোদনের কথা মনে ক'রেই এসেছিলুম। এবার বৃষ্টি হচ্ছে না ভাগ্যিস।'

'হোটেল কেমন?'

'যেমন হ'য়ে থাকে। বিশেষ এসে যায় না, যা-ই হোক। থাকি তো বাইরে। এবার কোনো আই. সি. এস.-গিন্নী আপনার প্রতিবেশিনী হননি আশা করি?'

'না,' হাসলো শ্রীলতা। 'কিন্তু হ'লেই যেন ভালো হ'তো—এক-এক সময় তা-ই মনে হয়। বাড়িটা এমন নির্জন। মানুষ, যা-ই বলুন না, সামাজিক জীব।'

'তা-ই তো বলে সবাই। কিন্তু সমাজের সঙ্গে বেশি মেশামেশি হ'লেই গা শিরশির ক'রে ওঠে কেন?'

'দর্শক হ'তে পারেন, অনাসক্ত দর্শক। সেটা মন্দ লাগে না।'

'ঠিক কথা। বেশির ভাগ লোকের কথা ভাবতে চমৎকার লাগে—দূর থেকে। বেশির ভাগ লোককে শুধু তখনই সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসা যায়, যখন—এবং যতক্ষণ—তারা দূরে থাকে।'

'একটু যদি নেমে আসতে পারেন মাঝে মাঝে—তাতে লাভই হবে। অন্তত, নিজের ভালো লাগার ক্ষেত্রকে অত ছোটো ক'রে আনতে হয় না।'

'চেষ্টা তো করি, কিন্তু মনের ছটফটানি থামে না। মনের মধ্যে এত খুঁত-খুঁতেপনার শয়তান সারাক্ষণ উসখুস করছে—তাকে থামানো শক্ত। ফলে ভালো লাগার ক্ষেত্র অত্যন্ত পরিমিত হ'য়ে পড়ে—সে-কথা ঠিক। আমি যদি জোন ক্রফোর্ডের নাকের ডগা নিয়ে, সবচেয়ে নতুন রেকর্ডের সবচেয়ে ঢ'লে-পড়া গজল-ঢঙি, রশুনগন্ধি গান নিয়ে, এডসনের প্রতিটি ছোটো উদ্ভাবনের সঙ্গে মানবসভ্যতার এক-এক পা অগ্রগতি নিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'তে পারতুম, তাহ'লে জীবন কী সহজ, কী সুখের হ'তো, ভাবুন তো। কিন্তু হয়তো,' একটু চুপ ক'রে থেকে পার্থপ্রতিম বললে, 'বিস্তৃতির দিক থেকে আমার যা ক্ষতি, নিবিড়তায় লাভ হয় তার বেশি। অমি যখন উপভোগ করি, এমন গভীরভাবে করি, গণ-উচ্ছ্বাসীরা যা কল্পনা করতে পারে না। তা-ই মনে ক'রে, অন্তত, সান্ত্বনা পেতে হয়। কিন্তু, সমুদ্র থেকে চোখ ফিরিয়ে পার্থপ্রতিম বললে। 'দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবেন? বসা যেতে পারে। বেশ নরম আর শুকনো আর পরিষ্কার বালি।'

শ্রীলতা বললে, 'আমি আরো খানিকটা হাঁটবো ভেবেছিলাম।'

'তার আগে বরং বিশ্রাম ক'রে নিন একটু।'

'দাদা আর বৌদিকে পিছনে ফেলে এসেছি—ঐ যেখানে সমুদ্র বেঁকে গেছে, তার পিছনে। বৌদি ক্লান্ত বোধ করলেন। বসতে চাইলেন। আমি ভাবলুম,—একটু এগিয়ে যাওয়া যাক ততক্ষণ।'

'বেশ তো। তাহ'লে বসুন, ওঁরাও হয়তো এসে পড়বেন এদিকে।'

না, আমি বরং ফিরি।'

'যেতেই হবে?'

শ্রীলতাব মুখ নিচের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লো।—'একটা কথা', দ্রুত, চাপা গলায় সে বলল—যেন সময় নেই একেবারেই, 'আপনি ক-দিন আছেন এখানে?'

'ঠিক নেই। কিন্তু বেশিদিন না।'

'কাল কোথায় দেখা হ'তে পারে আপনার সঙ্গে?'

'যে-কোনো জায়গায়। এখানে?'

'বেশ, এখানেই। আপনি ঠিক আসবেন তো? সাড়ে-ছ-টা?'

'কী ক'রে বলি? ঘড়ি নেই সঙ্গে। সময়ের শাসন অনেক সহ্য করেছি—ভেবেছিলাম, ঘড়ি ফেলে এসে তার প্রতিশোধ নেবো। অন্তত কয়েকটা দিন ভাবতে পারবো যে সময় আর নেই।'

'বেশ,' শ্রীলতার ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির খেলা, তাহ'লে বলা যাক এই রকম সময়। সূর্যাস্তের সময়। আচ্ছা—' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলো সে। একটুখানি গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার বললো, 'কাল।'

'কাল।'

খানিক দূর গিয়ে শ্রীলতা দেখলো কুমুদনাথ আর মানসী তার দিকে আসছেন। সে থেমে অপেক্ষা করলো, যতক্ষণ না কাছে এলেন তাঁরা। 'ক-মাইল হেঁটে এলে?' কুমুদনাথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'মুখ-টুক যে লাল হ'য়ে উঠেছে।'

'অনেক হেঁটেছি,' শ্রীলতা বললে, 'আর ওদিক গিয়ে কাজ নেই। চলো ফিরি।'

নতুন রাত্রি

'এত দেরি করলেন যে?'

'বা রে! সময় তো আর নেই—আপনিই তো বলেছিলেন।'

'সময় যে আছে, তা এতক্ষণ ধ'রে খুব ভালো ক'রেই টের পাচ্ছিলুম।'

'কতক্ষণ ধরে?'

'অনেকক্ষণ। একটু পরেই তো অন্ধকার হ'য়ে যাবে।'

'দাদা-বৌদি গেলেন বি. এন. আর. হোটেলে—তাঁদের কোন এক বন্ধু আছেন সেখানে। ততক্ষণ দেরি করতে হ'লো।'

'শেষ পর্যন্ত যে এলেন, তা-ই আমার ভাগ্য।'

শ্রীলতা বালির উপর বসলো, পার্থপ্রতিমের পাশে। ধূসর-হয়ে-আসা সমুদ্র ছড়িয়ে আছে দিগন্তে। দু-জনে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেদিকে, চুপচাপ। একটু অস্পষ্ট লজ্জা তাদের মাঝখানে। সম্প্রতি যা-কিছু ঘটেছে, তাদের ভান করতে হচ্ছে যেন কিছুই ঘটেনি। অথচ দু-জনেই মনে-মনে অনুভব করছে, সে প্রসঙ্গ তুলতে পারলেই ভালো হ'তো। তাহ'লে একটা ব্যবধান যেতো দূর হ'য়ে ঃ সেটাই শেষ পর্যন্ত, ভালো হ'তো।

'কী গর্জন আজ সমুদ্রের,' নীরবতা ভাঙলো শ্রীলতা।

'রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে এই শব্দ শুনি—ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে তা অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে যায়। ডেভিড কপারফীল্ড মনে পড়ে।'

'হ্যাঁ—সেই ছোটো শাদা কাঠের ঘর; ঠিক পাশে সমুদ্র।'

'মনে হয়, আমি যেন সেই ছোটো ছেলে, শুয়ে-শুয়ে ঢেউয়ের শব্দ শুনতুম—অনেক আগে, অন্য কোনো জন্মে। এতদিন তা ভুলে ছিলাম নানা বাজে জিনিসের ভিড়ে—আজ মুছে গেছে মাঝখানকার সব অবান্তরতা ঃ নিজেকে ফের মনে পড়েছে। ছেলেবেলায় যে-সব বই পড়া যায়, তারা বড়ো অদ্ভুত ছাপ রেখে যায় মনে। স্পষ্ট কিছু মনে থাকে না; এখানে-ওখানে ভেসে থাকে দু-একটা ছবি। বড়ো হ'য়ে এক-এক সময় সন্দেহ হয়—এ কি পেয়েছি কোনো বইয়ে—না কি এ আমারই জীবনের কোনো ঘটনা—দূর কোনো শিশুকালের, অন্য-কোনো অস্তিত্বের? মোট কথা,' পার্থপ্রতিম ছোটো ক'রে হাসলো, 'ক-দিন ধ'রে এ-ধারণা কিছুতেই মনে থেকে তাড়াতে পারছি না যে আমিই হচ্ছি—কি ছিলুম—ছেলেবয়সের ডেভিড কপারফীল্ড।'

'সমুদ্রের শব্দ অনেকক্ষণ ধ'রে একমনে শুনলে আমার মনে হ'তে থাকে যেন সময় অনেক পিছনে স'রে গেছে, যখন পর্যন্ত সৃষ্টি আরম্ভ হয়নি। সেখানে কিছু নেই, সেখানে আমি নেই। কেমন ভয় করে।'

'নিজেকে নিঃসঙ্গতায় দেখতে যে-ভয়, এ তা-ই। আমরা যে-খোলসের মধ্যে বাস করি, সেটাই আরামের। আমাদের মনকে একেবারে খুলে দেখতে আমরা নিজেরাই সাহস পাই না।'

'তা ঠিক,' শ্রীলতা বললে, 'আমাদের প্রতিদিনের সামাজিক জীবনে নিজেদের সম্বন্ধে যে-ধারণা আমরা করি, তা থেকে আমরা যে এতটুকুও আলাদা, সে কথা মনে না-করতে পারলেই বেঁচে যাই।'

'তবু মাঝে মাঝে একটু উঁকি দেয়া মন্দ নয়।'

'আশ্চর্য—আমি ঠিক কেমন, তা পৃথিবীতে অন্য-কেউ জানতে পারবে না কখনো। আমরা মেলামেশা করি, মিশি, কথা বলি—যার সঙ্গে যেমন দরকার, যে যেমন আশা করে। রাত্রির অন্ধকার বিছানায় শুয়ে নিজের মনে যে-কথা বলি, তা কখনো কেউ জানতে পারবে না।'

'আর সে-ব্যবস্থাই তো ভালো। শেষ পর্যন্ত, একজন মানুষ তাব নিজেরই সবচেয়ে বেশি। তার মধ্যে আছে একটা নির্জনতা, যেখানে একমাত্র নিজের সঙ্গে সে মুখোমুখি। সেখানেই সে সবচেয়ে সম্পূর্ণ, যেখানে সে সবচেয়ে একা। সে যদি নিজেকে দিতে চায় কারো কাছে, সে সব দেবে, সব—শুধু তার নির্জনতাকে দেবে না।'

'কী এক পৃথিবীতে আমরা বাস করি?' শ্রীলতা ব'লে উঠলো, 'আমাদের সব ভালোবাসা, অন্তরঙ্গতা—কী তার মানে? দু-জনের মনে একটুখানি ছোঁয়াছুঁয়ি হয়তো হ'লো, আর আমরা অস্থির

হ'য়ে উঠলুম, কত ব্যাখ্যা তার, কত কল্পনা তা নিয়ে। অথচ সব সময়—কী অপার ব্যবধান মাঝখানে।'

'সেইজন্যেই তো এত আনন্দ ভালোবেসে। যাকে ভালোবাসি, সে কেমন জানি না; তাই তো সৃষ্টি ক'রে নিতে পারি নিজের মনের মধ্যে। একজন আর-একজনকে বলে, "তোমার মতো আর দেখিনি। কখনো"; আমরা দূর থেকে শুনে হাসি। কিন্তু সত্যি যে তা-ই ঃ তার মনে ধবা পড়েছে সেই ব্যক্তির যে বিশেষ একটি রূপ, তেমন তো আর-কারো চোখেই পড়েনি। যার কল্পনাশক্তি নেই, সে ভালোবাসতে পারে না।'

'কী সর্বনাশ! পৃথিবীতে কত যে লোক সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করছে, তাদের কথা ভাবুন একবার। তাদের কী দশা তাহ'লে?'

'তাদের জন্য ভেবে কী হবে? তারা যা পায় না, তা নিয়ে আক্ষেপ করে না কখনো—কেননা তারা জানবেই না যে কিছু বাদ প'ড়ে গেলো।'

'কিন্তু তারাও কি আর ভালোবাসতে না পারে—তাদের সাধারণ, নিরভিমানভাবে?'

'ভালোবাসাব নামে তো কত জিনিসই চলে।'

'আপনাব নিজস্ব ব্রান্ডটাই যে খাঁটি সেটা তো নিশ্চিত?'

পার্থপ্রতিম নিচু গলায় হাসলো। 'নিজের মন দিয়েই তো আমবা বিচার করতে পারি—তার বেশি পারিনে।'

'কত মানুষ আছে,' শ্রীলতা বললে, 'যারা বলবে, 'অত-শত বুঝিনে, এইটুকু বুঝি যে ভালো লাগে, সব সময় ভালোও লাগে না, কিন্তু সে না-থাকলে ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।'' তাদের স্তরে নেমে এলে—না, উন্নীত হ'লে?—হয়তো দেখবেন, তাদের সেই ভালো-লাগাতেই তারা সার্থক।'

'সে তো নিশ্চয়ই,' সেই ধূসর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে পার্থপ্রতিম শ্রীলতার চোখের সন্ধানে তাকালো, 'সে তো নিশ্চয়ই। তারা যে এর বেশি চায়ইনি ঃ তারা যে জানেই না, এ ছাড়া কিছু আছে। হয়তো দেখবো, শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থাই ঈর্ষাযোগ্য। তারা যা চেয়েছিলো, তা পেয়েছে; আমি যা চাই, তা পাবোই, এমন ভরসা করা যায় না। বড়ো জিনিস চাইবার দুঃখ তো আছেই।'

শ্রীলতা কিছু বললে না, পার্থপ্রতিমের দিক থেকে ফিরিয়ে নিলে মুখ। আলাপে ছেদ পড়লো। আকাশ ভ'রে নামলো সন্ধ্যা; সমুদ্র কালো হ'য়ে এলো। তারা দু-জনেই জানে, কী বলতে চায় পরস্পরকে, কিন্তু তাদের মুখের সব কথা ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে তার চারিদিক দিয়ে, ঠিক জায়গায় ঘা দিতে পারছে না। আচ্ছাদনে, অন্তরালে সেই কথারই আভাস; কিন্তু যে-মুহূর্তে স্পষ্ট ক'বে বলবার সময় এলো, তখনই নীরবতা। যে কথা বলা হ'লো না, দুজনের মাঝখানে তা অদৃশ্য মধ্যবর্তীর মতো। দূর করো বাধা; প্রকাশ করো পরস্পরকে। না, এখনো নয়, পার্থপ্রতিম নিজের মনে বললে, এখনো নয়। কী দীর্ঘ সময় আমরা নিই, সে ভাবতে লাগলো, অতি সহজে যা হ'তে পারে, কী দীর্ঘ সময় নিই তার সম্পাদনায়। কিন্তু সেটাই তো স্বাভাবিক, একটি ফলকে রসে ভ'রে তুলতে কত সূর্য জ্ব'লে যায়; মাটি থেকে কী তীব্র আকর্ষণে শিকড়ে-শিকড়ে উঠে আসে অন্ধকার প্রাণের উত্তাপ। প্রতি মুহূর্তে কোষে-কোষে কী কঠিন সংগ্রাম—সামঞ্জস্যের, সুষমার জন্য। যা সুন্দর, যা পরিণত, পরিপূর্ণ তা কখনো সহজে হয় না। বাইরে থেকে মনে হ'তে পারে হঠাৎ ফুটে উঠলো, কিন্তু নেপথ্য যে-সৃষ্টির লীলা, সেখানে আক্লান্ত ধৈর্য, কঠিন প্রস্তুতি, অজস্র অপচয়। ছোটো যে-একটি চারা আজ উঁকি দিয়েছে মাটির তলা থেকে, তার জন্য দিতে হয়েছে সহস্র বীজের অপমৃত্যুর দাম। প্রকৃতি মন্থর; হঠাৎ কিছু ক'রে ফেলে সে খরচ বাঁচাতে চায় না; যে-কোনও সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ক্ষুদ্রতম অংশের জন্য তার দারুণ সক্রিয়তা, পরিপূর্ণ কালক্ষেপ। আমবা যদি পরিপূর্ণ স্বাভাবিকতায় কিছু লাভ করতে চাই, আমাদেরও আনতে হবে সেই সুন্দর মন্থরতা, সেই ধৈর্য। মানুষ তখনই সভ্য হ'লো, যখন সে অপেক্ষা করতে শিখলো। যখন সে বুঝলো যে হাতের কাছে যা-কিছু পাওয়া যায়, তার ভিতর দিয়ে হাতে-হাতে

চরিতার্থতা খোঁজা নিষ্ফল। বর্বরের লোভ গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করে, তাকে তো উপভোগ বলে না। যেখানে অধৈর্য, যেখানে তাড়াহুড়ো ক'রে যা-হোক একটা কিছু ছিনিয়ে নেবার ঝোঁক, সেখানেই অন্তরের দীনতা। যতক্ষণ আমরা চোখে দেখামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই, মুহূর্তকাল নষ্ট হ'তে দিতে চাই না, ততক্ষণ, বুঝতে হবে, গ্রহণ করার শক্তি আমাদের হয়নি। যে-মানুষ প্রকৃতপক্ষে সভ্য তার কাছে সেই শক্তি; তাই উর্ধ্বশ্বাসে ব্যস্ততা থেকে তার মন স্বভাবতই সংকুচিত হয়। সে অপেক্ষা করতে জানে—অপেক্ষা করতে চায়। তার ইচ্ছার লক্ষ্যকে সে কাঁচা অবস্থায় চিবিয়ে-চিবিয়ে ফেলে দেবে না; তাকে ফ'লে উঠতে দেবে উষ্ণ রক্তিম পক্কতায় নিবিড় সূর্য-রসে।

সভ্য মানুষের ভালোবাসা, তাই দীর্ঘ সময় নেয়, অনেক স্তর অতিক্রম করতে-করতে তা নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তোলো পূর্ণতার জন্য। অনেক তাতে বিচ্ছেদ, অনেক দূরত্ব। তা শুধু কাছে পেতেই ব্যগ্র নয়, কাছে পাওয়ার নিবিড়তাকে সে সুরময় ক'রে তুলতে চায় নানা অন্তরাল দিয়ে—নয়তো তার মন তৃপ্ত হয় না। এই তো আমি ব'সে আছি, পার্থপ্রতিমের মন ভেবে চললো, শ্রীলতা আছে আমার পাশে। কি সহজ হ'তো এখন তাকে আমার কাছে টেনে আনা? কী সহজ, তাকে এখন তার নিজের ভিতর থেকে বের ক'রে এনে স্বীকৃতিতে উন্মোচিত করা। এখনই যদি বলি, যে-কথা এক সময়ে বলতেই হবে। কিন্তু এ-ই তো বেশ? দূর থেকে পাচ্ছি তার সৌরভ, তার সূক্ষ্ম সত্তা যেন মৃদু নেশার মতো আমাকে আচ্ছন্ন করছে। আমি অনুভব করছি তার উপস্থিতি যেন রক্তের মধ্যে, আমি পূর্ণ হ'য়ে আছি তাকে দিয়ে। যথেষ্ট এ-ই তো যথেষ্ট; এর বেশি কেন চাইবো?

অন্ধকারে কখন এত তারা ফুটলো? সমুদ্রের জল অন্ধকারে লুপ্ত; শাদা-শাদা ফেনাগুলো চোখে ঠেকছে স্বপ্নের মতো। পার্থপ্রতিম শ্রীলতার মুখের দিকে তাকালো; চোখ পড়লো গ্রীবার একটু নরম রেখা—আর খানিকটা অস্পষ্ট শুভ্রতা। কোনও ম্লান নিশীথ-ফুলের মতো, তার মুখ। অন্ধকারে ফুল ফুটেছে—কোথায়, বোঝা যাচ্ছে না; কিন্তু রাত্রি মদির হ'য়ে উঠলো তার সৌরভে।

আরো অন্ধকার। আরো তারা আকাশে। একটু শব্দ নেই কোনোখানে—সমুদ্রের শব্দ ছাড়া। কিন্তু তা এমন একটানা, বিরামহীন, এক-সুরে-বাঁধা সে স্তব্ধতাকে তা ব্যাহত করে না; বরং তাকে মনে হয় স্তব্ধতারই অংশ, তা থেকে অবিচ্ছেদ্য। স্তব্ধতাকে, এক হিশেবে, তা গভীরতর ক'রে তুলছে, এমনিতেই যা ছড়িয়ে যেতো, হারিয়ে যেতো, তা সেই চির-পুনরুক্ত শব্দের মধ্যে যেন সংহতি পেলো, একটি নির্দিষ্ট রূপ। দু-জনের অলক্ষিতে, ঢেউয়ের পর সমুদ্রের ঢেউয়ে, মুহূর্তের পর মুহূর্তে, তারার কম্পনের পর কম্পনে, সময় গড়িয়ে যেতে লাগলো।

তারপর শ্রীলতা মুখ ফেরালো পার্থপ্রতিমের দিকে। যেন অন্ধকারই চুপি-চুপি স্বরে কিছু বলে উঠলো। খুব আস্তে শ্রীলতা বললে, 'কিছু বলুন। কিছু বলবার নেই আপনার?'

একটু সময়, পার্থপ্রতিম একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, শ্রীলতার মুখ স্পষ্ট ক'রে দেখবার জন্য। তারপর বললে, 'না, বলবার আর কী আছে। একদিন হঠাৎ আমার মনে অসহ্য ইচ্ছে জেগে উঠলো আপনাকে দেখবার জন্য—আর সেই দেখা তো আজ হ'লো। এ ছাড়া আর কী।'

'আপনার চিঠি দুটো পেয়েছিলাম—' শ্রীলতা আরম্ভ করলো।

'থাক,' পার্থপ্রতিম তাড়াতাড়ি বাধা দিলে, 'ও-সব কথা থাক।'

'কী দরকার ছিলো লেখবার? আমি তো বুঝেইছিলাম।'

'সমস্ত ব্যাপারটারই কিছু দরকার ছিলো না।'

'কিন্তু কেন আপনি সহজভাবে তাকে নিতে পারেননি—যে-জিনিস নেহাৎই বাইরের, যা তুচ্ছ, অবান্তর, তার কথা অত না-ভেবে?'

'গর্ব।' পার্থপ্রতিম ব'লে উঠলো, 'দুর্বলতা! কত সময় আমরা ইচ্ছে ক'রে জটিল জীবনকে আরো বেশি জটিল ক'রে তুলি। কিন্তু তা-ই তো মানুষের ধর্ম।'

'গর্ব ছিলো আমারও। আমি ভাবিনি, আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে।'

আমি জানতুম, দেখা আবার হবে। কিন্তু কে জানতো তা হবে এত শিগগির—আর তা এই সমুদ্রে-ভ'রে-যাওয়া আশ্চর্য অন্ধকারে।'

বাতাস ঠান্ডা হ'য়ে আসছে ঃ হঠাৎ শ্রীলতার শরীর ঈষৎ কেঁপে উঠলো। 'কী রাত্রি', অর্ধ-স্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ করলে—'কী অন্ধকার!'

'তারপর আর কিছু না। শেষ হ'লো—যে জন্য তাদের এত ভয়, এত উৎপীড়ন মনে-মনে, সে-কথা বলা হ'লো। যন্ত্রণার মতো—ও-সব কথা উচ্চারণ করা; বুকের ভিতরটা মুচড়ে-মুচড়ে যেন প্রতিটি কথা নিঃসৃত হচ্ছে। নিজের উপর তা অত্যাচার। কিন্তু তা শেষ হ'লো—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই তার শেষ। আর ভয় নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এই অন্ধকারের জন্য। কী সান্ত্বনা, কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না ঃ সেইজন্যই এটা সম্ভব হ'লো। অন্ধকারের দুটো অশরীরী স্বর, তার বেশি তারা কিছু নয় পরস্পরের কাছে। তারা ডুবে গেছে রাত্রির মধ্যে, হারিয়ে গেছে এই অন্ধকারে। রাত্রির গভীর সত্তা তারায়-তারায় কথা ক'য়ে উঠছে—তার বেশি আর কিছু না।

আকাশে তারারা জাযগা বদল কবছে; মহাশূন্যে পৃথিবী তার সূর্যপ্রদক্ষিণে কযেক সহস্র মাইল এগিয়ে গেলো, সহস্রবার স্পন্দিত হ'লো তাদের হৃৎপিণ্ড—পার্থপ্রতিমের আর শ্রীলতার। তাদের হৃদয়ে যেন ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে প্রতি মুহূর্তের প্রস্থান।

তারপর শ্রীলতা জিগ্যেস করলে, 'রাত কি অনেক হ'লো?'

পার্থপ্রতিম বললে, 'বুঝতে পারছি না।'

'আমার হাতে একটা ঘড়ি ছিলো—দেখা যাচ্ছে না কিছুই।'

'সময় থেমে গেছে।'

আবার দুজনে চুপ।

'যাই এবার,' শ্রীলতা চেষ্টা ক'রে উচ্চারণ করলে।

'চলুন।'

'আমাকে একটু এগিয়ে দেবেন?'

'ভয়?'

'না, ভয় না।'

আরো খানিকক্ষণ কাটালো।

'কই, উঠুন।'

'আপনিও তো ব'সে আছেন।'

'এবার যেতেই হয়।' কিন্তু শ্রীলতা উঠলো না, পার্থপ্রতিমও ব'সে রইলো। তারা থেকে তারায় ইশারা ঝলসে যাচ্ছে।

'নাঃ, এবার সত্যি—'

'আমি তো প্রস্তুত।'

'কই, আপনিও তো ব'সেই আছেন।'

'আপনি তো তা-ই।'

দু-জনে হেসে উঠলো একসঙ্গে।

'অসম্ভব।'

'আর-একটু বসলেই তো হয়।'

'পাগল! আমার ভয় হচ্ছে, একটু পরেই বুঝি ভোর হ'য়ে যাবে!'

'হলোই বা।'

শ্রীলতার মৃদু হাসির স্বর শোনা গেল।—'এমন করলে কি চলে। উঠুন।'

'এই তো উঠছি।' পার্থপ্রতিমের শরীর একটু ন'ড়ে উঠলো। 'কিন্তু—'

'কী হ'লো?'

'জুতোটা কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তাহ'লে বসি আর একটু।'

'এই—এক মিনিট।'

শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালো দু-জনে। কোন দিকে আপনার বাড়ি? পার্থপ্রতিম জিগ্যেস করলো।

'চলুন।'

আকাশ-ভরা তারার তলা দিয়ে প্রায় দু-মাইল অতিক্রম করলো তারা। সারা পথ কেউ কোনও কথা বললে না।

তারপর শ্রীলতা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। বললে, 'ওই যে।' একটু দূরে লম্বা, একতলা বাংলো ধরনের একটা বাড়ি অস্পষ্ট দেখা গেলো। জানলায় আলো জ্বলছে। 'ওঁরা ফিরেছেন দেখছি,' শ্রীলতা বললো।

'আমার আর আসবার দরকার নেই বোধহয়?'

'না!—শুনুন, একটা কথা মনে রাখবেন। আপনি আমাদের বাড়িতে কখনো আসবেন না।'

'বুঝেছি।

'এখন যাই। —কাল—সেখানেই।'

'আচ্ছা।—ঘুমের আগে একবার মনে করবেন আমার কথা।'

শ্রীলতা অস্ফুটে কী বললে বোঝা গেলো না। দ্রুত পায়ে সে এগিয়ে গেলো বাড়ির দিকে। তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো পার্থপ্রতিম, অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো, নি শব্দ সঞ্চারে কাঠের নিচু ফটক ঠেলে সে বাড়ির বাগানে ঢুকছে। একটু পরে বাড়ির অভ্যন্তর তাকে গ্রাস করে নিলো।

'বৌদি, তোমরা কখন ফিরলে?' ঘরে ঢুকে খুব হাসিখুশি গলায় বললো শ্রীলতা।

'এই তো খানিকক্ষণ,' লেডীজ হোম জর্নালের পাতা থেকে চোখ তুললেন মানসী।

'তারপর—তাকে পেয়েছিলে, যার সঙ্গে গিয়েছিলে দেখা করতে?' শ্রীলতা ঘরের মধ্যে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

'হ্যাঁ, আমাদের জন্য অপেক্ষাই করছিলো সে।'

'খুব এঞ্জয় করলে, আশা করি?

'তা মন্দ কী। তোমার কথা জিগ্যেস করছিলো ওরা, তুমি গেলে না—'

'ওঃ, বৌদি—কী রাত্রি! একবার তাকাও বাইরে। এমন রাত্রি কি হোটেলের ঘরে ব'সে ভদ্র আলাপ করার জন্য তৈরি হয়েছে? এই রাত্রিতে আমি ভ'রে গেছি।' শ্রীলতা মাথা হেলিয়ে হাসলো একটু। 'বৌদি, বিছানায় শুয়ে খোলা জানলা দিয়ে একবার চোখ দুটিকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ো।..একটা গান করবে, বৌদি?'

'হ'লো কী তোমার?' মানসী তার চোখের দিকে তাকালেন।

'কিছু হয়নি। একটা গান করো না।'

'তার আগে খেয়ে নিলে হয় না?'

'তাই তো—নিশ্চয়ই। খিদেয় মারা যাচ্ছি। তোমরা ব'সে ছিলে বুঝি আমার জন্য? চলো! এক মিনিট—কাপড়টা বদলে আসি। একটা গান কিন্তু শোনাবে। আমি কেন গাইতে পারি না? তোমাকে ভীষণ হিংসে হচ্ছে, বৌদি—আমি যদি একটুও গাইতে পারতুম!—আমি আসছি এখুনি।' হালকা পা ফেলে বেরিয়ে গেলো শ্রীলতা।

নিজের ঘরে, শাড়িটা ছেড়ে ফেলে, সে আয়নার সামনে দাঁড়ালো একটু। 'কাল', অস্ফুটে উচ্চারণ করলে সে, 'কাল।' আয়নায় ছায়ার ঠোঁট ন'ড়ে উঠলো। শ্রীলতা তাকিয়ে রইলো, যেন সে এমন কাউকে দেখছে, যাকে আগে কখনো দ্যাখেনি। গোলাপি আভায় আপ্লুত তার মুখ, আর

এ কী আশ্চর্য দীপ্তি তার চোখে। এই রাত্রি, মনে-মনে সে বললে, এই রাত্রি বাসা বেঁধেছে আমার মধ্যে, আর তা-ই উপচে পড়ছে আমার শরীর দিয়ে লাবণ্য হ'য়ে।—কিন্তু কে জানতো এত সুন্দর হবার ক্ষমতা তার আছে!

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হোটেলের দিকে যেতে-যেতে পার্থপ্রতিমের মনে হ'তে লাগলো যেন এইমাত্র রাত্রিতে একটা নতুন অনুভূতি লেগেছে, নতুন-কোনো চেতনায় ছেয়ে গেছে আকাশ। কিছু বৃথা নয়, অর্থহীন নয়; সমস্ত বিশ্ব বাণীময়, সেই বাণী বেজে উঠেছে অন্ধকারের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। এই অতল অন্ধকার আর তারা-ভরা আকাশ নিয়ে রাত্রি কিসের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হ'য়ে আছে। সম্মোহিতের মতো পার্থপ্রতিম চলতে লাগলো। হঠাৎ এক সময়ে তার যেন মনে হ'লো, এতক্ষণে তার যেখানটায় আসা উচিত, সেখানে সে আসেনি। সে ভালো ক'রে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো—না, জায়গাটা অনভ্যস্ত ঠেকছে। আরো খানিক দূর এগিয়ে সে বুঝতে পারলো যে সে পথ ভুল করেছে। কিন্তু তাতে কী। আন্দাজি যে-কোনো এক রাস্তা ধ'রে হাঁটতে আরম্ভ করলো সে। ফেরার তাড়া নেই। তার পা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু সেটা কিছু নয়; এই রাত্রির মধ্যে মগ্ন হ'য়ে গিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়ানো—তার মতো আর কী? নিজেকে সে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ কবলো রাত্রির হাতে—এই নতুন রাত্রি, নতুন প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস। চুপ করো, চুপ করো, নিজের উদ্দেশে বারবাব সে বলতে লাগলো, রাত্রিকে কথা বলতে দাও, রাত্রির স্বর বেজে উঠুক তোমার বুকের মধ্যে। সে লক্ষ্য করলো না। কোনদিকে যাচ্ছে; অনেক রাস্তা ঘুরে-ঘুরে, অনেক বালি ডিঙিয়ে শরীর-ভবা ক্লান্তি নিযে শেষ পর্যন্ত যখন হোটেলে পৌঁছলো রাত তখন এগারোটা, হোটেলের অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে, আর সামনের বারান্দায় অনেক কসরতে হাওয়া থেকে লণ্ঠন বাঁচিয়ে এক দল খেলছে ব্রিজ, আর সিঁড়ির মাথায় একজন ভৃত্য দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমুচ্ছিলো, তার পায়ের শব্দ শুনেই ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ রগড়ে জিগ্যেস করলে, 'বাবুর জন্য কী খাবার দেবো? লুচি না ভাত?'

'ভাবনা কাহারে বলে?'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শ্রীলতার মনে হ'লো, এখনই কেন সন্ধ্যা হ'লো না? দিনটা তার পক্ষে হ'য়ে উঠলো সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা। মোহের মধ্যে কেটে যেতে লাগলো ঘণ্টাগুলো। প্রাত্যহিক যা-কিছু কর্তব্য—স্নান, আহার, টুকরো-টুকরো কথাবার্তা, অপর্যাপ্ত ওজোন-সেবনে কার স্বাস্থ্যের কতখানি এবং কী রকম উন্নতি হচ্ছে, এই হারে কালো হ'তে থাকলে সূর্যের ছায়াময় বার্নিশ কত গভীর হ'য়ে লাগবে তাদের চামড়ায়, এ সব নিয়ে আলোচনা—কোনোটাই সে বাদ দিলে না; কিন্তু সব সময়, তার জীবনে যেন ব'য়ে চলেছে অন্য কোথাও। শ্রীলতা নিজেই অবাক হ'য়ে গেলো। এই যে সে পায়ের আঙুলগুলো বাঁকাচ্ছে আর খুলছে, এই যে তাব হাত অলসভাবে প'ড়ে আছে কোলের উপর, এই যে মাঝে-মাঝে তার চোখ জড়িয়ে আসছে যেন দুপুরের আলোয় ক্লান্ত হ'য়ে—এই সবই যেন অর্থময় হ'য়ে উঠলো আজ, সবই তাকে মূল্যবান ক'রে তুলছে।

বৌদির কাছে তার প্রতিজ্ঞার কথা শ্রীলতার মনে পড়লো। তিনি এখন কী বলবেন—যদি জানতে পারেন? হয়তো শেষ পর্যন্ত, খুব অবাক তিনি হবেন না। এ-রকম যে হ'তে পারে, তিনিও কি মনে-মনে তা না জানেন! জানেন ব'লেই নিজের ইচ্ছেটাকে তিনি খাটাতে চেয়েছেন অমন জোর ক'রে, অমন তীব্রভাবে। আর—তার নিজের মনেও তো গর্ব ছিলো, সেই গর্ব সে নিজেকে আঘাত দিয়েছিলো আর অন্যকে। তারা দু-জনেই দু-জনকে আঘাত করেছিলো তাদের গর্বে। কী অন্ধতা! আজ দূর হ'লো সেই ভান। এতদিন কী করছিল তারা, কেমন ক'রে বেঁচে ছিলো?

চুল বাঁধতে কাপড় পরতে বড্ড বেশি সময় নিয়ে ফেললো সেদিন। আয়নার দিকে তাকিয়েই

তার মনে হ'লো—সে সুন্দর। 'তোমাকে আজ বড়ো বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে, শ্রীলতা', মনে-মনে বললে কথাটা, তারপর খুব আস্তে উচ্চারণ করলে। কী ক'রে সে গোপন করবে নিজেকে—তার সারা শরীর যে প্রতারণা করছে তার সঙ্গে। তার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে এত সুন্দর হওয়া যেন খানিকটা লজ্জার, নগ্নতার নামান্তর যেন। মনকে এমন উন্মুক্ত ক'রে দেখাবার অধিকার কারো শরীরের নেই। মানসীর তীক্ষ্ণ চোখ মনে পড়লো তার—কিছু কি ধরা পড়বে তাঁর চোখে? তিনি কি কোনো বাঁকা প্রশ্ন করবেন? শ্রীলতার হাত ন'ড়ে উঠলো, মনে হলো কোথায় আঁচলটা একটু কুঁচকে আছে। মুগ্ধ হ'য়ে গেলো হাতের সেই ভঙ্গি দেখে। কী সুন্দর এই শরীর—কী স্বাচ্ছন্দ্য তার ব্যবহারে, কী লাবণ্য তার লীলায়। শ্রীলতা যেন ভুলে গেলো এর পরে কী করতে হবে; যদিও অনেকটা সময় হাতে নিয়ে তৈরি হচ্ছিলো, তবু একটু দেরি হ'য়ে গেলো বেরোতে—অন্তত তার তা-ই মনে হ'লো।

ঘর থেকে বেরিয়েই মানসীর সঙ্গে দেখা।

'বৌদি, তোমরা আজ আর বেরোবে না বুঝি?'

'একটু পরে। রোদ পড়ুক।'

'রোদই ভালো—এই বিকেলের রোদ। আমি আর দেরি করতে পারছি না—চললুম।'

'কোনদিকে আজ?'

'কোথায় যেন একরাশ রঙিন ঝিনুক দেখেছিলুম কাল, যদি খুঁজে পাই তো নিয়ে আসবো।'

'কী বা হবে ও দিয়ে?'

'কী হবে? কী দিয়েই বা কী হয়।'

'ঝিনুক প'ড়ে থাকলেই ভালো দেখায়।'

'তবে না-আনলুম। ছড়াতে-ছড়াতে আসবো সারা পথ—যদি কেউ আমার পিছন-পিছন আসে, তার জন্য রেখে দেবো চিহ্ন।' শ্রীলতা হেসে উঠলো।

মানসী একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এত খুশি আজ কেন তোমার?'

'বৌদি, এত ভালো লাগে।'

'কী ভালো লাগে?'

'কী? কী না? সব—সব। এত ভালো লাগে, বৌদি, যে ভয় হয় পাছে ম'রে যাই।' বলতে-বলতে, হাসতে-হাসতে শ্রীলতা বাগান পেরিয়ে রাস্তায় এলো।

বাগানের ছায়া

স্বপ্নের মতো কেটে গেলো। তারপর পার্থপ্রতিম আবিষ্কার করলো, তার টাকা ফুরিয়ে এসেছে। তার জীবনে বলতে গেলে প্রথমবার, সে আক্ষেপ করলো তার আরো টাকা নেই ব'লে। কেন যে যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে না? আজকালকার দিনে তো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রবল জনরব শোনা যাচ্ছে। আমরা নাকি কেউ কারো হুকুম তামিল করবার জন্য জন্মাইনি : আমরা স্বাধীন। এই স্বাধীনতা নিয়ে আমরা ঝগড়া করি, মারামারি করি সেটা আমাদের একটা মহৎ বিশ্বাস। মধুর, মধুর বিশ্বাস। তেমনি কোনো সময়ে আমরা বিশ্বাস করতুম যে এ জন্মের দুঃখের প্রচুর ক্ষতিপূরণ হবে জন্মান্তরে। সবচেয়ে সহজ হচ্ছে বিশ্বাস করা। আইন বাঁচিয়ে, স্বকাল সম্বন্ধে যথোচিত গর্ব নিয়ে আমরা বলাবলি করছি, বা কায়দা ক'রে আইনকে ফাঁকি দিয়ে, যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারি আমরা। হ্যাঁ, সবই পারি, শুধু সম্প্রতি, পারি না আর দুটো দিন পুরীতে থাকতে।—কিন্তু আজকের দিনটাও যে আছি সেটাই কি কম কথা?

সেদিন সমুদ্রের পাড় ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে তারা কোথায় যে চ'লে এলো—মনে হয়, মানুষ

এর আগে কখনো সেখানে আসেনি। সমুদ্রের শেষ নেই, শেষ নেই এই বালু-বন্ধ্য পীত-ধূসর প্রসারের। সবুজের আগুন একে স্পর্শ করেনি; শতাব্দীর পর শতাব্দী, এ যেন প'ড়ে আছে প্রাণের প্রতীক্ষায়, এক বিশাল, আদিম ঔদাস্যে আচ্ছন্ন। রাত্রি নামলো।

তখন পার্থপ্রতিম বললো, 'কাল চ'লে যাচ্ছি।'

'কালই?'

এর পর তারা যে সব কথা বললে, তা এখানে বলবার মতো নয়। বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছে কিনা, গাড়িতে রাত্রে হয়তো শীত করবে, পার্থপ্রতিম কি ট্রেনে বই পড়তে ভালোবাসে, কোনও সহযাত্রী আলাপে প্রবৃত্ত হ'লে কী ক'রে আত্মরক্ষা করতে হয়, ইত্যাদি। সন্ধের একটু পরেই তো গাড়ি—কাল হয়তো তাদের আর দেখা করবার সুবিধে হবে না। তারা হঠাৎ উপলব্ধি করলো যে এই তাদের শেষ দেখা—মানে, আপাতত। সঙ্গে-সঙ্গে তারা দু'জনেই একটু অস্বস্তি বোধ করলে, তাদের যেন মনে হ'লো কিছু আর বলবার নেই, এখন ছাড়াছড়ি হ'লেই ভালো। এ আব বহন করা যাচ্ছে না, এই পরস্পর-চেতনার ভার, একের মনের উপর অন্যের এই নিষ্পেষণ।

ফেরার সময় অনেকটা পথ তারা চুপচাপ এলো। তারপব যেখানে তাদের দু-জনের বাস্তা গেছে দু-দিকে, সেখানে এসে একটু দাঁড়ালো তাবা। 'আজ খুব শিগগির ফেবা হ'লো,' পার্থপ্রতিম বললে।

অন্ধকারে, শ্রীলতার হাত পার্থপ্রতিমের হাতেব উপব এসে পড়লো। একটু সময, তা সেখানে প'ড়ে রইলো, নবম আর উষ্ণ, উষ্ণ একটুখানি প্রাণের মতো। এক টুকরো উষ্ণ প্রাণ, সেই হাত। শান্ত, নরম একমুঠো আগুন। যে-আগুন। তার বক্তে, যে আগুনের আভা তাব গোলাপি গালে, তার ঠোঁটের আরক্ত রেখায়। সেই আগুন, পার্থপ্রতিম অনুভব করলো, অসংখ্য সূক্ষ্ম স্রোতে সঞ্চারিত হচ্ছে তার শরীরের কোষে-কোষে। প্রদীপ থেকে জ্ব'লে উঠছে প্রদীপ। সেই ছোটো, নবম হাতের চাপে পার্থপ্রতিম যেন চূর্ণ হ'য়ে গেলো।

শ্রীলতা হাত ছেড়ে বললে, 'যাই—' ব'লেই বাড়ির রাস্তা ধ'রে হাঁটতে লাগলো দ্রুত পাযে।

আর সেই বাত্রে, তন্দ্রার মাঝখানে, পার্থপ্রতিম যেন হঠাৎ কোনো আঘাতে জেগে উঠলো। রাত কত? কেউ জানে না। সমুদ্র কী বলতে চাইছে স্পষ্ট ক'রে, বাতাসে হু-হু ক'রে উঠছে কাব চাপা কান্না। পার্থপ্রতিম বিছানার উপর উঠে বসলো; কান পেতে একটু শুনলো, সে কী করছে, তা ভালো ক'রে বুঝতে না-পেরেই নামলো বিছানা ছেড়ে; চেয়ারের পিঠ থেকে তুলে গায়ে গলিযে নিলে জামা। রাত্রি তাকে ডাকছে বাইরে, সে চলেছে স্বপ্নেব মধ্যে।

বাইরে, তারায়-তাবায় তীক্ষ্ণ রাত্রির স্পর্শে তার শরীর অণুতে অণুতে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। অন্ধকার যেন দু'দিকে স'রে-স'রে যেতে লাগলো তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে। কত বালি সে ডিঙোলে, কত মোড় সে ঘুরলো, কত ঘুম সে পার হ'য়ে এলো—কিছুই সে বুঝতে পারলো না।

খোলা জানালার ধারে টেবিলে ব'সে শ্রীলতা বই পড়ছিলো—কিছু একটা করতে হবে ব'লে, কিছু তাকে করতেই হবে ঃ ভয়, বিছানায় শুয়ে ঘুম যদি না আসে। এত রাত হ'লো—একটুও কি ঘুম পেতে নেই? বই আর ভালো লাগছে না। এর আগে সে কি ঘুমিয়েছে কখনো? উঠে দাঁড়ালো গিয়ে জানলার ধারে। নিচু জানলা ঃ চৌকো আলো অন্ধকার বাগানের অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে। হঠাৎ শ্রীলতার মনে হ'লো যেন একটা অস্পষ্ট মূর্তি সেই আলোকিত চতুষ্কোণ থেকে ছায়ায় স'রে গেলো।

'কে? কে ওখানে?' শ্রীলতার গলা থেকে অস্ফুট চিৎকার বেরোলো।

একটু পরে আলোয় দেখা গেলো একজনকে। 'তুমি!' বলতে গিয়ে শ্রীলতার গলা যেন ভেঙে গেলো।

'ধরা প'ড়ে গেলুম', পার্থপ্রতিম বললে, 'ভেবেছিলুম লুকিয়ে তোমাকে দেখে যাবো। যাই।'

'না', শ্রীলতা বললে, 'যেয়ো না। এসো। ওদিক দিয়ে দরজা। এসো। বেশি শব্দ কোরো না।'

শ্রীলতা গিয়ে দরজাটা খুলে দিলে। যেই বাইরের সমস্ত রাত্রি নিয়ে পার্থপ্রতিম ঢুকলো। 'কেন এলে এখন?'

'তোমাকে দেখতে।'

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'কী উজ্জ্বল তোমার চোখ।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে না, ঘুম পাচ্ছে না।'

'চোখ বোজো', বললো, পার্থপ্রতিম।

'আমার চোখের মধ্যে রক্ত দপদপ করছে।'

'রাত্রি দিয়ে চোখ ভ'রে নাও।'

'তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছি না।'

'অন্ধকারকে হ'তে দাও তোমার মধ্যে।'

আর খানিকক্ষণ, রইলো কেবল অন্ধকার, সময়ের বুকের উপর স্পন্দিত।

তারপর শ্রীলতা বললে, 'তুমি যাও।'

'তুমিও চলো।'

'যাও, আর দেরি কোরো না।'

'চলো, তুমি চলো।'

—শ্রীলতা বললে, 'পরে আসবো। তুমি এখন যাও।'

'না, আর একটু থাকি।'

'না, যাও। কোনো ভয় নেই।'

আর, শ্রীলতার মুখের কথা শেষ হ'তে হ'তেই পার্থপ্রতিম বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো শ্রীলতা। খানিকক্ষণ সে রইলো স্তব্ধ হ'য়ে—যেন তার নিশ্বাস পড়ছে না। তারপর তার দুই চোখে ছাপিয়ে জল এলো।

অতিরিক্ত

কলকাতায় ফেরার সপ্তাহখানেক পর পার্থপ্রতিম এই চিঠি পেলো :

'কাল ফিরেছি কলকাতায়। একাই। একটা মেয়ে-কলেজে চাকরির জন্য লিখেছিলুম, তারা ডেকে পাঠিয়েছে। দেখা করলুম তাদের সঙ্গে। চাকরিটা এখন আমার—চাইলে পরেই। দাদাকে লিখে দিলুম চিঠি। সঙ্গে বৌদিকে এক লাইন : "যা-ই বলো না, বৌদি, মাস্টারির চাইতেও সাংঘাতিক কাজ মানুষ করেছে—ইতিহাসে তার ছড়াছড়ি। এবং ভবিষ্যতে আরো করবে, সন্দেহ নেই। মাঝখান থেকে হাতের এত কাছে এসে আমার চাকরিটা কেন ফসকায়?" বৌদি, বুঝতে পারেন না, রোজ যথেষ্ট খেতে পেলেও মানুষ কোনো কাজ করতে চায় কেন? তাঁকে দেখে-দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে যাই; তিনি হচ্ছেন যাকে বলা যেতে পারে স্বভাবতই রাজকন্যা।

'আমার ইচ্ছে ছিলো, কলকাতার বাইরে যাই কোনো কাজ নিয়ে; কিন্তু এখন

এটার উপরই ভীষণ লোভ হচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে, তাছাড়া, কলকাতার বাইরে যাবার আমার গরজও কম। ভাবতে ভালোই লাগছে যে এখন আর আমাদের মধ্যে কোনো বাধা নেই।

'তোমার সঙ্গে কবে দেখা হ'তে পারে?

শ্রীলতা'

পার্থপ্রতিম লিখলো উত্তরে ঃ

'দেখা হ'তে পারে যেদিন তুমি চাও। তাড়া নেই। কিন্তু তার আগে একটা কথা তোমাকে বলি। এ-কথা কেন লিখেছো, "এখন আর আমাদের মধ্যে কোনো বাধা নেই?" এখন—মানে, তুমি চাকরি নিচ্ছো ব'লে? তুমি যা, তুমি তো তা-ই-কী এসে যায় অন্য কিছুতে? এমনিতেই কি কোনো বাধা ছিলো? যাকে আমি মনে-মনে ভাবি সে তো তুমি, সংসারে তোমার যা পরিচয় তার স্থান সেখানে কোথায়? যদি তোমার কোনো সম্বল না থাকে তবু তো তোমার আমি আছি। আর যদি আজ তোমার লাখ টাকা থাকতো, নিশ্চয়ই জেনো আমি তা দুই হাতে মনের খুশিতে ওড়াতুম।

'কিন্তু ও-সব কথা ওঠেই না। আসল কথাটা হচ্ছে—সে তো তুমিই বলেছো। এখন যেন আমরা ভয় না করি ঃ আমরা যেন হ'তে পারি—তুমি আর আমি—জীবনের আনন্দ আর আতঙ্ক আর রহস্যের মধ্যে।

'তোমাব কথা শুনতে আশা কববো।

পার্থপ্রতিম'

শ্রীলতা আবার লিখলো ঃ

'আমার কথা? একদিন আমি মনে-মনে ভেবেছিলাম, যেখানে তুমি আমাকে অস্বীকার করলে, সেইখানে আমি তোমাকে ছোটো করবো। সেটা ছিলো আমার গর্ব। আজ তা তৃপ্ত হয়েছে; কিন্তু এখন আর তার কোনো অর্থ হয় না আমার কাছে। আমার সব গর্ব তুমি নিয়েছো; এইবার আমাকে তুমি নাও।

শ্রীলতা'

জিয়াভরলি

সুবোধ ঘোষ

আকাশ খুব পরিষ্কার। ভোরের দিকে অবশ্য সামান্য একটু কুয়াশার ঘোর ছিল। কিন্তু সকালবেলার রোদের সাড়া ঝলমল করে জেগে উঠতেই সে-কুয়াশা শুকিয়ে গিয়েছে। আকাশ পাড়ি দেবার জন্যে একশো এগারো নম্বর ফ্লাইটের ডাকোটা ঠিক সময়েই গুমরে উঠেছে।

কলকাতা থেকে গৌহাটি, তারপর গৌহাটি থেকে তেজপুর; এই ডাকোটার একদফা আকাশযাত্রা তেজপুরে গিয়ে শেষ হবে। অনেক যাত্রীর মত শুক্তি বসুও তেজপুরে নেমে যাবে।

প্লেনে ওঠবার সিঁড়িটার কাছে পৌঁছেই একবার থমকে দাঁড়ায় শুক্তি; মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে, হ্যাঁ, ওরা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ছোট্ট সুকুর ছোট্ট হাতটা ছটফট করে রুমাল দোলাচ্ছে। আর মনে হল, বড় পিসি যেন তাঁর চশমাটাকে শাড়ির আঁচলে তাড়াতাড়ি করে একবার মুছে নিয়েই আবার চোখে পরলেন।

বোধ হয় বেশ আনমনা হয়ে গিয়েছিল শুক্তি; তাই বুঝতে পারেনি, প্লেনটা কখন আকাশে উঠে পড়েছে। পাল্টে গিয়েছে ডাকোটার গুঞ্জনের সুর। নীচের এয়ারপোর্টের কিছুই আর দেখতে পাওয়া গেল না। শুধু দেখতে পাওয়া গেল, ধানক্ষেতের উপর দিয়ে টানা টেলিগ্রাফের তারে সাদা বকের সারি চুপ করে বসে আছে।

প্লেন ছাড়বার আধঘন্টা আগে দমদম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে বড় পিসিমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল শুক্তি, পিসিমা যেন শুক্তির কোনও কথা শুনতে পাচ্ছেন না। আনমনার মত উসখুস করছেন, আর, আকাশের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করছেন।

হেসে ফেলেছিল শুক্তি।—ওরকম করে কী দেখছ, বড় পিসি?

বড় পিসি চমকে ওঠেন।—কী বললে?

শুক্তি আবার হাসে। —একটুও ভেবো না। ভাবনা করবার কিছু নেই। ওটা আমার চেনা আকাশ।

কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলেনি শুক্তি। হ্যাঁ, চেনা আকাশ। বছরে অন্তত পাঁচবার যে মেয়েকে বিমানযাত্রিনী হয়ে কলকাতা থেকে তেজপুরে যাওয়া-আসা করতে হয়, তার কাছে ওই আকাশের সব কিছুই চেনা। মেঘের চেহারা দেখেই বলে দিতে পারবে শুক্তি, ওটা গাবো পাহাড়ের মেঘ; কুয়াশা দেখেই বুঝে নিতে পারে শুক্তি, প্লেন এইবার ব্রহ্মপুত্র পার হবে। জানে শুক্তি, ঠিক কখন প্লেনের জানলার কাচের কাছে চোখ দুটো এগিয়ে নিলে দেখতে পাওয়া যাবে, ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘের ঘূর্ণি উড়ছে আকাশে। সিটবেল্ট কোমরে জড়াবার জন্যে রঙিন নির্দেশের লেখা এখনি দপ করে জ্বলে উঠবে। ঝড়ো হাওয়ার দাপট এড়াবার জন্য ছটফট করে গা-ঝাড়া দিয়ে উপরে উঠবে প্লেন। কিন্তু নীচের ওটা কি তিস্তার বেনো জলের স্রোত? তবে তো আর দেরি নেই; শেষ এয়ার-পকেট পার হতে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। এলোপাথাড়ি বাম্প করবে প্লেন।

ঠিকই, যেন চেনা আকাশ দেখতে পেয়ে ভয়কাতুরে পাখির ডানা হঠাৎ খুশির সাহসে ছটফটিয়ে উঠেছে। সঙ্গে কাউকে যেতে হয় না; একাই এভাবে একহাতে শুধু ছোট্ট একটা ব্যাগ, আর, অন্য হাতে এয়ার-প্যাসেঞ্জের টিকেট বইটাকে দোলাতে দোলাতে চলে যায় শুক্তি। কলকাতা থেকে তেজপুর; তেজপুর থেকে কলকাতা একাই যায় আর ফিরে আসে। বড় পিসি তাই একটু আশ্চর্য না হয়ে পারবেন কেন, এই মেয়েই যে কলকাতায় থাকতে ঘরের বাইরে একা বের হতে চায় না। কোনওদিন একা বের হবার দরকার হলে শুক্তির অমন কালো চোখ দুটোও যেন আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

আজ এখন মনে পড়তেই শুক্তির সাহসখুশি প্রাণটা বেশ লজ্জা পায়। ছি, মিছিমিছি অবুঝ হয়ে বড় পিসিকে কত না বিরক্ত করা হয়েছে। বড় পিসির গাড়ির ড্রাইভার কেষ্টবাবু সাতদিনের ছুটি নিয়েছিলেন। সেই সাতদিন কলেজ কামাই করে ঘরেই রইল শুক্তি। বড় পিসি কত করে বোঝালেন, ট্রামে-বাসে একা যেতে ভয় কিসের? কত মেয়েই তো একা-একা ট্রামে-বাসে যাওয়া-আসা করে কলেজ করছে। না, শুক্তির আপত্তি টলাতে পারেননি বড় পিসি। অথচ ওইটুকু মেয়ে, ওই কৃষ্ণাটা

সেদিন যেন আরও খুশি হয়ে একাই বের হয়ে গেল; ট্রামে চড়ে স্কুলে গেল আর ফিরে এল।

এক-আধ বছর নয়; এই চার বছর ধরে চেনা আকাশের পথে যাওয়া-আসা করতে গিয়ে, আর বার বার দেখে দেখে শুক্তির চোখে অনেক মুখও চেনামুখ হয়ে গিয়েছে। শুক্তি তাদের চেনে, তারাও শুক্তিকে চেনে। এই ডাকোটার পাইলট, যিনি আজ শুক্তিকে দেখতে পেয়েই মৃদুহাসির সঙ্গে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু হেলিয়ে দিলেন, তাঁকে চিনতে একটুও দেরি হয় না শুক্তির। গত বছর গরমের ছুটির শেষে তেজপুর থেকে কলকাতায় ফেরবার ডাকোটাতে ইনিই ছিলেন পাইলট। শুক্তির হাতব্যাগটা হঠাৎ খুলে গিয়ে একগাদা ফটো প্লেনের মেজের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিন এই পাইলট ভদ্রলোক সেইসব ফটো কুড়িয়ে তুলে দিয়েছিলেন।

ওই তো, আরও একটা চেনামুখ। ওই এয়ার-হোসটেস মেয়েটির নাম শান্তি কাপুর। প্রায় এক বছর আগে একবার দেখা হয়েছিল। শুক্তির হাতের কাছে গরম কফির পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে প্রায় দশ মিনিট ধরে গল্প করেছিল শান্তি কাপুর। খুব মাথা ধরেছিল শুক্তির, এই শান্তিই সেদিন ব্যস্ত হয়ে মাথাধরা ওষুধের একটা মিষ্টি ট্যাবলেট নিয়ে এসে শুক্তির কফির পেয়ালাতে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বড় পিসি আর ওরা, সবাই কি এখনও এই উড়ন্ত ডাকাটোর দিকে তাকিয়ে রানওয়ের শিকল-বেড়াটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে? সুকু কি এখনও রুমাল দোলাচ্ছে? বেণী কামড়াচ্ছে কৃষ্ণাটা? কী আশ্চর্য, কৃষ্ণাকে কতবার ধমক দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল, এটা একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস। তবু যখন তখন আনমনা হয়ে যায় কৃষ্ণা, আর, বেণীটাকে মুখের কাছে টেনে নিয়ে কামড়ায়।

বুঝতে পারে শুক্তি, মনটা কেন হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। কী দরকার ছিল কৃষ্ণাকে এত ধমক-ধামক দেবার? একটু আদর করে, গলা জড়িয়ে ধরে আর গাল দুটো টিপে দিয়ে, একটু মিষ্টি করে বলে দিলেই তো হত, বেণী কামড়াতে নেই কৃষ্ণা ওতে অসুখ হতে পারে।

শুক্তিরই বড় পিসির মেয়ে কৃষ্ণা। ঠিক শুক্তিদির মত শক্ত করে বাঁধা একটা বেণী না দোলালে ওর শখের ইচ্ছেটা সুখী হতে পারে না। তেরো বছর বয়স; কিন্তু এখনও তিন বছর বয়সের বাচ্চার মত ফোলা-ফোলা গাল। না, শুক্তির হাত নিসপিস করলেও কৃষ্ণাকে গাল টিপে আদর করবার এখন আর কোনও উপায় নেই। হাতব্যাগের ভিতর থেকে একটা ফটো বের করে দেখতে থাকে শুক্তি। একটা গ্রুপ ফটো। শুক্তির দশ বছর বয়সের পিসতুতো ভাই ওই ছোট্ট সুকুর জন্মদিনে এই তিন মাস আগে এই ফটো তোলা হয়েছিল।

পিসেমশাই আর বড় পিসি পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছেন। তাঁদের সামনে বসে আছে কৃষ্ণা আর সুকু। সুকুর হাতে জন্মদিনের উপহার সেই চকোলেটের তাজমহল। তাজমহলটাকে দু'হাতে করে কোলের উপর বসিয়ে, কেমন সুন্দর শান্তটি হয়ে আর চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সুকু। আর, কী আশ্চর্য, কৃষ্ণাটা বেণী কামড়াচ্ছে।

ঝিকঝিক করে হাসতে থাকে শুক্তির চোখ দুটো। শুক্তির কলকাতার জীবনে ওই সুকু আর কৃষ্ণা যে শুক্তির দুটি ভাই আর বোন। জানে না শুক্তি, বুঝতেও পারে না, আপন ভাই-বোন থাকলে ওরা সুকু আর কৃষ্ণার মত না হয়ে অন্য রকমের কিছু হত কিনা।

আর বড়দা? বড় পিসির ছেলে দিবাকরই তো শুক্তির বড়দা। আজ প্রায় দেড় বছর হল সাত দিনের জন্যেও ছুটি নিতে পারেননি। তাই দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় আসতে পারেননি। করুণা বউদিও দেড় বছর হল দিল্লীর বন্দিনী হয়ে পড়ে আছেন।

ভুলতে পারেনি শুক্তি, আজ এখন বরং আরও বেশি করে মনে পড়ছে, দিল্লী রওনা হবার আগের দিন শেক্সপিয়রের কমেডির ভল্যুমটা হাতে তুলে নিয়ে আর চোখ পাকিয়ে শুক্তিকে শাসিয়েছিলেন বড়দা—ফাইনালের ফল যদি ভাল না হয়, তবে জেনো, এই বই দিয়ে পিটিয়ে তোমার ওই তিলফুল নাসিকা আমি থেঁতো করে দেব।

ফাইনাল তো এগিয়ে আসছে। কিন্তু বড়দা বোধ হয় এখনও জানেন না যে, এ বছর ফাইনাল না দেবার জন্যেই তৈরি হয়েছে শুক্তি। বড় পিসিও বলেছেন, থাক এবার, এখনও ক্যালকুলাসের একটা লিমিট বুঝতে হিমসিম খায় যে মেয়ে, সে মেয়ের পক্ষে টেস্ট পার হওয়াই অসম্ভব। ফাইনাল তো স্বপ্ন।

ভাবতে ভয় ভয় করে। বড় পিসি কি পরশু দিনের সেই চিঠিতে বড়দাকে সত্যিই ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছেন?

করুণা বউদির চিঠিটা কিন্তু একটা সান্ত্বনা। মাসখানেক আগে ইন্দ্রপ্রস্থে বেড়াতে গিয়ে পা মচকে গিয়েছিল করুণা বউদির। পা-মচকানির ব্যথা এখন সেরে গিয়েছে। শুক্তির জন্যে খুব সুন্দর দেখতে একটা রেশমি ওড়না কিনেছেন করুণা বউদি, কুমায়ুনি গাঁয়েব মেয়েরা বিয়ের দিনে যে ওড়না গায়ে জড়ায়। সব কথার শেষে লিখেছেন—পরীক্ষার জন্যে ভাবনা করে মুখ শুকনো করার কোনও দরকার নেই। কোনও ভয় নেই শুক্তি, একটুও ভেবো না। তোমার আসল ফাইনালের সময় আমি তোমার কাছেই থাকব।

কিন্তু এ কেমন সান্ত্বনা? ভাষাটাও কেমন যেন! ভুল ধাবণা কবে একটা ভুল নির্ভয়ের বাণী জানিয়েছেন করুণা বউদি। বউদি জানেন না যে, ফাইনাল না দেবার জন্যেই তৈরি হয়ে শুক্তি আজকাল বেশ ভাবনাহীন মনের খুশিতে দুবেলা এসরাজ হাতে তুলে নিয়ে কৃষ্ণাকে জোর করে গান শেখায়—কত গান তো হল গাওয়া...।

দেখতে পায়নি শুক্তি, শান্তি কাপুর কখন এসে কাছে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে। শান্তি বলে—চিনতে পারছেন?

শুক্তি—নিশ্চয়।

শান্তি—হাসছিলেন কেন?

চমকে ওঠে শুক্তি। —অ্যাঁ? হাসছিলাম? হবে।

শান্তি কাপুর এইবার মুখ টিপে হাসে। —বোধ হয় কোনও খুব-ভাল-কথা ভাবছিলেন।

শুক্তি—হ্যাঁ, আমার বোন কৃষ্ণার কথা ভাবছিলাম। আবার যেদিন কলকাতায় ফিরব, সেদিন কৃষ্ণাকে একটা গল্প বলে আশ্চর্য করে দেব।

শান্তি কাপুর—কিসের গল্প?

শুক্তি হাসি। —গল্পটা এই যে, হঠাৎ মনে হল, আপনার এই ডাকোটার গম্ভীর শব্দটা যেন চুরি করে একটা গান গাইছে।

দুই চোখ বড় করে শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শান্তি কাপুর। কোনও কথা বলে না।

শুক্তি বলে—আপনারও নিশ্চয় অনেকবার এরকম মনে হয়েছে। কোনও গানের লাইন মনে পড়ে গেলেই মনে হবে যে, বাইরের শব্দগুলি যেন...। তাই নয়? কী বলেন আপনি?

শান্তি কাপুর আবার মুখ টিপে হাসে। —বুঝলাম, গান গাইছে আপনার হৃদয়টি। ইওর হার্ট ইজ সিংগিং।

ব্যস্তভাবে চলে যায় শান্তি কাপুর। কিন্তু শুক্তির মুখের উপর কেউ যেন একটা লাজুক কুহকের আবির ছিটিয়ে দিয়েছে। সারা মুখ লালচে হয়ে গিয়েছে। মাথাটাও একটু হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। মুখ তুলে আর তাকিয়ে দেখতে সাহস হয় না, শান্তি কাপুর এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আর কী করছে।

কৃষ্ণাটার মনে বুদ্ধি-সুদ্ধি নামে কোনও পদার্থ নেই। তা না হলে সেদিন অনায়াসে আস্তে একটা কথা বলে অন্তত ইশারায় জানিয়ে দিতে পারত কৃষ্ণা, শুক্তিদি সাবধান, শ্যামলদা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তোমার গান শুনছেন আর হাসছেন।

শুক্তি দেখতে পায়নি, কিন্তু কৃষ্ণা দেখতে পেয়েছিল। কৃষ্ণা যে সোজা দরজার দিকে মুখ করে ঘরের ভিতরে চেয়ারটার উপরে বসেছিল। শুক্তি বসেছিল ঘরের কোণের ছোট কোচের উপরে, মখমলে মোড়া একটি পালকের বালিশকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গান গাইছিল। ওই গান, কত গান তো হল গাওয়া...। শুক্তি কেমন করে দেখবে যে, দরজার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না আছে?

ঘরের ভিতরে ঢুকল শ্যামল। শুক্তির দিকে একবার তাকাল। শুক্তির বুকের ভিতর থেকে যেন এক ঝলক লাজুক রক্তের ভয় উথলে উঠে সারা মুখে রঙিন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পালকের বালিশটাকে তুলে নিয়ে মুখ ঢাকা দেয় শুক্তি।

কৃষ্ণার হাতে মস্ত বড় একটা মাটির কমলালেবু তুলে দিয়ে চলে গেল শ্যামল।—এর চেয়ে ভাল কমলালেবু বাজারে পাওয়া যায় না কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—লিচু?

শ্যামল বারান্দায় দাঁড়িয়ে জবাব দেয়—এটা লিচুর সিজন নয়।

কৃষ্ণা—বাঃ, মাটির লিচুর আবার সিজন কি? চালাকি পেয়েছেন?

—তবে দেখব চেষ্টা করে, পাই কিনা। ...কাকিমা কোথায়? বলতে বলতে চলে গেল শ্যামল, বোধ হয় দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির দিকে, কিংবা নীচের তলার ওই ঘরটার দিকে, যেখানে সুকুর টিউটর গণেশবাবু এখন চুপ করে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন।

মনে পড়বে না কেন? খুব মনে পড়ছে, শ্যামলবাবুও আজ এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। শুক্তি যখন বড় পিসিকে প্রণাম করে বিদায় নিল, তখন সুকুর পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্যামলবাবু। বেশ বিপদে ফেলেছিলেন বড় পিসি। একবার নয়, বার বার তিনবার শুক্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে একটি কথা বললেন, শ্যামলকে দু-একটা কথা বলে যাও, শুক্তি।

পিসিমাকে একবার স্পষ্ট করে বলে দিতে ইচ্ছে করেছিল, আমাকে দিয়ে বলাবার চেষ্টা কেন? তোমাদের যা ইচ্ছে হয়, যা ভাল মনে কর, তাই করে ফেললেই তো হয়। তোমাদের এই অদ্ভুত সন্দেহ কেন যে, আমি একটা বেহায়া বিদ্রোহিনীর মত তোমাদের ইচ্ছের কথায় একেবারে 'না' করে বসব।

তবে হ্যাঁ, যা আমি পারি না, তা আমি পারি না। শ্যামলবাবুকে কিছু বলতে-টলতে পারব না। তোমাদেরও জেদ আর মরজির রকম বুঝতে পারি না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, শ্যামলবাবুর কাছে আমাকে দিয়ে কথা না বলিয়ে নিলে তোমরা যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছ না। কিন্তু করুণা বউদিকে আমি তো কবেই বলে দিয়েছি, শ্যামলবাবুর মত চমৎকার মানুষ হয় না। আর কত বলব? কি-ই বা বলবার আছে?

না, আজ আর মুখ লুকোতে চেষ্টা করেনি, ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করেও ওঠেনি, শ্যামলের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে একটা কথা বলে দিতে পেরেছে শুক্তি—আসি তবে।

বড় পিসি নিশ্চয় খুব আশ্চর্য হয়েছেন। বোধ হয় ভাবছেন, যে মেয়ে আজ এত সহজে একেবারে শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পেরেছে, সে মেয়ে এতদিন মুখ বন্ধ করে ছিল কেমন করে?

হাতঘড়ির দিকে তাকায় শুক্তি। হ্যাঁ, এতক্ষণে সবাই চলে গিয়েছে। বড় পিসির গাড়ি এতক্ষণে বোধ হয় আলিপুর ব্রিজ পার হল। ওদিকে বড় পিসেমশাই এতক্ষণে নিশ্চয় তাঁর চেম্বারে যাবার জন্যে ছটফট করে গাড়ির খোঁজ করছেন। আজ শুক্তিকে বিদায় দিতে বড় পিসেমশাইও এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নিশ্চয় আসতেন। কিন্তু আসতে পারলেন না। শুধু বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে এসে শুক্তির পিঠে হাত বুলিয়ে আক্ষেপ করেছেন, যেতে পারলাম না শুক্তি। সকাল থেকে টেলিফোনে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছেন মক্কেল, আজ আপিলের শুনানি। আমি আজ খুবই ব্যস্ত। লক্ষ্মী মেয়ে, তেজপুরে পৌঁছেই তার করে একটি খবর দিও।

শ্যামলবাবুও চলে গিয়েছেন। কে জানে কতক্ষণ ওখানে ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। কে জানে কী মনে করে চলে গেলেন।

একটা হাত তুলে, চোখ বন্ধ করে, বাঁ চোখের ভুরুর উপর শক্ত করে একটা আঙুল চেপে রাখলেও মনের ভিতরে এ ছাই চিন্তাগুলি একটুও চাপা থাকতে চায় না। ভাবতে কষ্ট হয় বইকি। শ্যামলবাবু হয়ত আজ সন্ধ্যে হতেই ভুল করে, সেই ভবানীপুর থেকে আলিপুরে বড় পিসির বাড়িতে হঠাৎ একবার এসে পড়বেন। শুক্তির এসরাজটার দিকে তাকিয়ে চুপ কবে বসে থাকবেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়বেন আর চলে যাবেন—না, আজ আমি আর চা খাব না কাকিমা। চলি কৃষ্ণা, যাচ্ছি রে সুকু।

আবার চমকে উঠতে হল। চোখ মেলে তাকায শুক্তি। শান্তি কাপুর বলছে—মাথা ধরেছে বোধ হয়।

শুক্তি হাসে। —না।

২

কৃষ্ণার চেয়ে বয়সে ন' বছরেব বড়, তাব মানে, বাইশ বছব বযস হয়েছে এই মেয়ের, যার নাম শুক্তি। এখনও ভাবছে, এবার ফাইনাল না দিয়ে একটা বছর পিছিয়ে থাকলে কেমন হয? কে জানে কবে বি-এ, এম-এ পাস করবে এই মেয়ে। কোনওদিন পাস করতে পাববে কিনাও সন্দেহ। তাব উপর যদি ফাইনালের ভয়ে এভাবে এক-একটা বছর নষ্ট করতে থাকে, তবে তো...।

জয়ন্ত সরকার বলেন—তুমিও ভুল করেছ। তোমার পরামর্শে মেয়েটা অঙ্ক নিতে বাধ্য হল। তুমি নিজে অঙ্কের গ্র্যাজুয়েট বলে মনে করেছ, সবাই...।

সুমিত্রা বলেন—স্বীকার করি, ভুল হয়েছে। কিন্তু তুমিও ভুল পরামর্শ দিয়েছিলে। হিস্ট্রি নিলে শুক্তির একটুও সুবিধে হত না। তোমার মত শুক্তিরও কিচ্ছু মনে থাকে না।

সত্যি কথা, শুক্তির বড় পিসেমশাই জয়ন্ত সরকার আর বড় পিসি সুমিত্রা, দু'জনেই শুক্তিব জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে যতটা চিন্তা করেন, তাঁদের নিজের মেয়ে কৃষ্ণার জীবনেব ভবিষ্যৎ নিয়ে তার সিকিভাব চিন্তাও করেন না। শুক্তির বাবা গগন বসু যেন প্রতিজ্ঞা কবে মেয়েটাব জীবনটাকে নিয়তির ইচ্ছার কাছে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিয়েছেন। লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছে হলে শিখবে, ইচ্ছে না হলে শিখবে না। যদি বিয়ে কবতে চায় তো বিয়ে করবে, না চায় তো চিরকুমারী হয়ে থাকবে। ব্যস্ গগন বসু এর বেশি আর কিছু বলতে ভাবতে কিংবা কোনও চেষ্টা করতে পারবেন না।

শুক্তির বাবা, কদমবাড়ি চা-বাগানের বড় মালিক গগন বসুর এই একরোখা ঔদাসীন্য কি মেয়ের প্রতি বাপের বিরূপ মনের একটা কঠিন ভর্ৎসনা? মোটেই নয়। জানেন সুমিত্রা, তাঁর দাদা ওই গগন বসু আজকাল দিনরাত শুধু শুক্তির কথাই ভাবেন। শুক্তির মা কিরণলেখাও মাঝে মাঝে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে কদমবাড়ি থেকে চিঠি লেখেন, কবে আসবে শুক্তি? কলেজের ছুটি শুরু হবে কবে? এদিকে মানুষটা যে সব কাণ্ড শুরু করেছে, সে সব আর লিখে কুলোতে পারব না। বিছানার কাছে একটা ছোট টেবিলে শুক্তির একটা ফটো দাঁড় করিয়ে রেখেছে; ঘুম ভেঙে তাকালেই মেয়ের মুখটি যাতে চোখে পড়ে।

গগনদার দুই মেয়ে, অঞ্জনা ও অর্চনার বিয়ে কবেই হয়ে গিয়েছে। ছেলে নেই গগনদার। তাই এই তৃতীয়া কন্যাটি, বাইশ বছর বয়সের এই শুক্তিকে যেন কোলের মেয়েটি বলে মনে করেন গগনদা।। তা করুন না কেন, কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু বুঝতে পারেন না সুমিত্রা, শুক্তির বিয়ের কথা তুলে কোনও মতামত জানতে চাইলেই গগনদার জবাবের চিঠিটা কেন অদ্ভুত এক

আতঙ্কের ভাষায় মুখরিত হয়ে ছুটে আসে; না, ওসবের মধ্যে আমি আর নেই।

মাঝে মাঝে গগনদার এমন চিঠিও আসে, যার মধ্যে কী-যেন বুঝিয়ে বলবার একটা করুণ চেষ্টার আর্তস্বর শোনা যায়। চিঠিটাকে বার বার দু-তিনবার পড়ে বুঝতে চেষ্টা করেন সুমিত্রা, কী বোঝাতে চাইছেন গগনদা। 'তোমরা যারা শুক্তির জীবনের ভাল চাও, তারা যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি কোনও দায়িত্ব নিতে পারব না। কিন্তু শুক্তি কি নিজেই কিছু বলেছে? বলে থাকলে ভালই।' গগনদার চিঠির এমন জিজ্ঞাসার সামনে বসে ভাবতে গেলে দায়িত্ব নেবার আনন্দটাও একটু করুণ হয়ে যায় বইকি। তাই ভাল, শুক্তি নিজেই বলুক।

কিন্তু কী অদ্ভুত ভীরু স্বভাবের মেয়ে এই শুক্তি। শ্যামলের সঙ্গে আজও ভদ্রভাবে একটু মেলামেশা করতে পারল না। ইচ্ছের কথাটা মুখ খুলে বলতেও পারছে না। অথচ, নিজের কানে শুনেছেন সুমিত্রা, কলেজ থেকে ফিরে এসেই কৃষ্ণাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করেছে শুক্তি, শ্যামলবাবু এসেছিলেন নাকি, কৃষ্ণা?

সুমিত্রার বড় জা সুধাদির বড় ছেলে এই শ্যামল। শুধু কি দেখতে সুন্দর? গুণে জ্ঞানে ও রোজগারেও কিছু কম সুন্দর নয় শ্যামল। তিন বছর হল ভিয়েনা থেকে ফিরেছে, সার্জারিতে শ্যামল সরকারের হাতযশ এখন কলকাতার হাসপাতাল ও ডাক্তার মহলের বৈঠকে নিত্যদিনের গল্প হয়ে উঠেছে। এই তো, গত মাসে রাজস্থানের এক কুমারসাহেব এসে শ্যামলের নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। পেটের একটা ভয়ানক ম্যালিগনেন্ট টিউমার অপারেশন করিয়ে, আর এক হাজার এক টাকা দক্ষিণা দিয়ে, বেশ খুশি হয়ে রাজস্থানে ফিরে গিয়েছেন সুস্থ কুমারসাহেব।

শ্যামল সরকারের ভবানীপুরের বাড়িতে একদিন সন্ধ্যা হতেই বেশ সুন্দর একটি উৎসবের আনন্দ জেগে উঠেছিল। শ্যামলের জন্মদিনে চেনা-শোনা বন্ধু ও স্বজনের হাসিখুশি মেলামেশা আর খাওয়া-দাওয়ার উৎসব। বড় জা সুধাদি চিঠি দিয়ে সুমিত্রাকে জানিয়েছিলেন, তোমরা সবাই আসবে।

সবাই গিয়েছিল। অ্যাডভোকেট জয়ন্ত সরকারের মনটা সেদিন জজের একটা রূঢ় কথার আঘাতে খুবই বিষণ্ন ছিল। তবু, তিনিও শ্যামলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। যায়নি শুধু শুক্তি। করুণা বউদি শুক্তিকে কত সাধাসাধি করে কত কি বোঝালেন। কিন্তু শুক্তি যেতে রাজি হয়নি।

অথচ, কী আশ্চর্য, কৃষ্ণাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে, কৃষ্ণার হাতে ফুলের একটা তোড়া ধরিয়ে দিয়েছিল শুক্তি।—শ্যামলবাবুকে দেবে, ভুলে যেও না কিন্তু।

না, এরপর আর শুক্তির ঘরকুনো স্বভাবটার উপরে রাগ করতে পারেননি বড় পিসি সুমিত্রা। করুণা বউদি তো খুশি হয়ে হেসেই ফেলেছিলেন।

একদিন চন্দননগর থেকে বাড়ি ফিরে আরও একটু আশ্চর্য হয়ে আরও একটু বেশি খুশি হয়েছিলেন সুমিত্রা। বাড়িতে আর কেউ ছিল না, শুধু ছিল শুক্তি। ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন সুমিত্রা, একটা বই হাতে নিয়ে মিররের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শুক্তি।

সুমিত্রা বলেন—এ কী? সন্ধে হয়ে এল, এখনও সেই দুপুরবেলার শাড়িটা পরে রয়েছ?

শুক্তি বলে—শ্যামলবাবু এসেছিলেন।

চমকে ওঠেন সুমিত্রা—তাই নাকি। তারপর?

শুক্তি বলে—বেশিক্ষণ ছিলেন না।

সুমিত্রা—তা তো বুঝলাম, কিন্তু...।

শুক্তি—হ্যাঁ, চা খেয়েছেন শ্যামলবাবু।

সুমিত্রা—কে চা করলে? তুমি?

শুক্তি—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—কী বললে শ্যামল?

মুখ না ফিরিয়ে মিররের দিকে তাকিয়ে থাকে শুক্তি। দেখতে পেয়েছিলেন সুমিত্রা, মেয়েটার মুখটা সত্যিই যেন একটা লজ্জার রক্তগোলাপ। চোখের তারা দুটো সন্ধ্যাতারার ভীরু হাসির মত কাঁপছে। না, আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করে মেয়েটার এই মূক লাজুক প্রাণটাকে ত্যক্ত করার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া, ভাবতে গিয়ে নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়েন সুমিত্রা। সত্যিই তো, শ্যামল যে কথা শুক্তিকে বলেছে, সে কথা শুক্তির বড় পিসির না শুনলেও চলবে। শুক্তি বলবেই বা কেন?

কিন্তু একটু পরেই বাগানের কদম গাছের মাথায় সন্ধ্যার অন্ধকার যখন বেশ কালো হয়ে উঠেছে, ঠিক তখন কৃষ্ণার মুখ থেকে একটা উদ্বেগের প্রশ্ন শুনতে পান সুমিত্রা।—শুক্তিদির বোধ হয় জ্বর হয়েছে, মা।

—কে বললে?

—শুক্তিদি চুপ করে, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বসে আছে।

ছুটে এলেন সুমিত্রা। —কী হল শুক্তি, লক্ষ্মী মা? মাথা ধরেছে বোধ হয়?

চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে হেসে ফেলে শুক্তি।—কিছু হয়নি। মিছিমিছি মাথা ধরবে কেন, ছি!

সুমিত্রা—তবে ওঠো। হাতমুখ ধুয়ে সাজ বদলে নাও। সেই কাশ্মীরি মসলিনের শাড়িটা পরো, করুণার মা যেটা তোমাকে উপহার দিয়েছেন। শাড়িটা সত্যিই খুব সুন্দর, কী বলিস কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—সত্যি, চমৎকার। হংসমিথুন আঁকা, ঝলমল ছলছল...।

কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে ধমক দেন সুমিত্রা।—এতক্ষণে কথা ফুটেছে বোকাটার মুখে। কেন, একবার তো শুক্তিদির হাত ধরে বলতে পারতিস, ওঠো শুক্তিদি, গান গাইবে চলো।

কৃষ্ণার স্কুলের পাঠ্য একটা বইয়ে একটা গল্প আছে। কৃষ্ণার ধারণা, ওটাই সব চেয়ে মজার গল্প। একদা এক কাঠুরিয়া কুঠার হাতে লইয়া পলাশবনে প্রবেশ করিয়াছিল।...

কিন্তু কাঠ কাটতে পারেনি কাঠুরিয়া। কোনও পলাশের গায়ে কুঠারের কোপ বসাতে পারেনি। ফাল্গুন মাসের টাটকা ফোটা পলাশফুলের রঙের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই কাঠুরিয়ার চোখ। কাঠুরিয়ার মন বলিল, আহা, এমন শোভা ধরিতে পারে যে তরুর ফুল, তাহার গায়ে কুঠার হানিতে নাই।

শ্যামল ছেলেটি যেন পলাশবনের কাঠুরিয়ার চেয়েও নরম মনের মানুষ। বড় পিসি একদিন জানতে পেরেছিলেন, আর করুণা বউদি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিলেন, শ্যামলের একটা মায়াময় অনুরোধের কথা শুনে কী অদ্ভুত রূঢ় অভদ্রতার কাণ্ড করে ফেলেছিল শুক্তি।

—চলো না, আমাদের ওখানে একবার ঘুরে আসবে। আমার সঙ্গেই চলো। এই তো সামান্য একটা কথা। বারান্দার টবের গোলাপটার কাছে, যেখানে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লেস বুনছিল শুক্তি, সেখানে এগিয়ে যেয়ে শুক্তিকে শুধু এই কয়েকটি কথা বলেছিল শ্যামল।

বারান্দার একটা চেয়ারের উপর হাতের লেস আর কাঁটা তখনি ঝুপ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরে গেল শুক্তি। সোজা সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে আর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বসে রইল।

কিন্তু শ্যামলের চোখ দেখে বোঝা যায়, একটুও রাগ করেনি শ্যামল। দুঃখিত ব্যথিত বিষণ্ণ, কিছুই হয়নি শ্যামল। শ্যামলের চোখে মুখে কোনও রূঢ় বিস্ময়ের ছায়াও দেখতে পাওয়া যায়নি। শুক্তির নামে ঠাট্টা করেও সামান্য একটু শক্ত ভাষায় কথা বলতে পারেনি শ্যামল। বরং শ্যামলের মুখের শান্ত হাসিটা যেন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল, শুক্তির এই অদ্ভুত অভদ্র লজ্জার কাণ্ডটাই একটা মায়ার শোভা হয়ে শ্যামলকে আশ্চর্য করে দিয়েছে।

করুণা বউদিকে দেখতে পেয়ে শ্যামল শুধু বলেছিল—শুক্তি আমাকে ভুল বুঝল না তো, বউদি?

শ্যামল চলে যাবার পর, করুণা বউদিও সোজা দোতলার ঘরে গিয়ে শুক্তির দিকে বেশ রুক্ষ দুটো চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। —একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, শুক্তি।

শুক্তি—কী হল?

—শ্যামলের কথার একটা জবাবও না দিয়ে আর ওরকম করে ছুটে পালিয়ে এলে কেন?

শুক্তি—কেন? তাতে কি কোনও দোষ হয়েছে?

—হয়েছে। শ্যামল তোমাকে কী মনে করেছে, সেটা ধারণা করতে পার?

—পারি। শ্যামলবাবু কিছুই মনে করেননি। হাসতে থাকে শুক্তি। করুণা বউদি হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হয়ে প্রশ্ন করেন—এর মানে কী?

শুক্তি—তুমিই বুঝতে ভুল করেছ।

শুক্তির মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন করুণা বউদি। তারপর সরে যান। বুঝতে একটু ভুলই হয়েছে বোধ হয়।

এটা তো দেড় বছর আগের ঘটনা। করুণা বউদির আর দেখবার সুযোগ হয়নি, কিন্তু সুমিত্রা নিজের চোখে দেখেছেন আর নিজের কানে শুনেছেন, সুকুর পড়ার ঘরের ভিতরে বসে কৃষ্ণাকে বার বার শ্যামলের কথা জিজ্ঞাসা করছে শুক্তি।—শ্যামলবাবু কি কখনও তোমার কাছে আমার নামে কোন কথা বলেছেন?

কৃষ্ণা—হ্যাঁ, কতবার বলেছেন।

—কী বলেছেন?

—তোমাদের শুক্তিদি আমাকে কেন এত ভয় করে বুঝি না।

—তুমি কী বললে?

—বললাম, শুক্তিদি ভয়ানক ভীরু।

—একথা কেন বলতে গেলে?

—তবে কী বলব?

—বলতে পারলে না কেন, যে যাকে ভয় করে সে কি তাকে নিজের হাতে চা তৈরি করে খাওয়াতে পারে?

—তুমি আবার কবে শ্যামলদাকে চা খাওয়ালে?

—খাইয়েছি, তুমি জান না।

—যা জানি না, তা বলব কী করে?

—তর্ক করো না। যা বলছি, মন দিয়ে শোনো।

—বলো।

—শ্যামলবাবু যদি আবার কোনওদিন আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলে দিও, শুক্তিদি আপনার ওপর কোনওদিন একটুও রাগ করেনি।

শুক্তির কথাগুলিকে বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছিলেন বলেই সেই ঘরের দরজার একপাশে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সুমিত্রা। ঘরের ভিতরে আর ঢোকেননি। কৃষ্ণার টনসিলের পেন্টমাখা তুলিটা হাতে ধরে নিয়ে নেপথ্যের এক অবাক কৌতূহলের ছবির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও সুমিত্রার মুখের হাসিটা আর চুপ করে থাকতে পারছিল না। তাই সরে গেলেন সুমিত্রা, আর বারান্দা পার হয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে বলেই ফেললেন—কৃষ্ণাকে দিয়ে বলানো কেন? নিজের মুখে বলে দিলেই তো পারো।

রান্নাঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন রাঁধুনি ঠাকরুণ নিশির মা। —কী মা? কী বলতে হবে বলুন।

সুমিত্রা হাসতে থাকেন।—আপনাকে কিছু বলছি না, বলছি শুক্তিকে। মন যা চাইছে, তা

কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারবে না মেয়েটা।

নিশির মা মাথা নাড়েন। —হ্যাঁ মা, একেই বলে আপ্তভীরু মেয়ে। ওটা বয়সের রীতি মা; কী আর করবেন, বলুন?

সেদিন বার বার অনেকবার ভেবেছিলেন সুমিত্রা। ঠিকই, শুক্তির প্রাণটা যেন নিজেকেই ভয় করে করে চলেছে। শ্যামলের কাছে দুটো-একটা কথা বলতে হলে ভুল করে আর লজ্জার মাথা খেয়ে মস্ত একটা ভালবাসার কথা বলে ফেলতে হবে, যেন এইরকম একটা মিথ্যে ভয়ের ছায়া মেয়েটার মন জুড়ে ছমছম করছে। কিন্তু বয়সের রীতি বললে চলবে কেন? সুকুর মাস্টার ওই যে গণেশবাবুর মেয়ে স্নিগ্ধা, তার বয়সও তো কুড়ি-একুশের কম নয়। সে মেয়ে কত স্পষ্ট করে গণেশবাবুকে বলে দিতে পেরেছে, টেলিফোনের শশাঙ্ককে আমি কথা দিয়ে দিয়েছি, বাবা। তুমি আপত্তি করতে পারবে না।

গণেশবাবু নিজেই সুমিত্রার কাছে মেয়ের ইচ্ছার এই কীর্তির কথা বলেছেন। বলতে গিয়ে গণেশবাবুর গলার স্বরও মাঝে মাঝে বেশ গম্ভীর ও বেশ তিক্ত হয়ে কেঁপে উঠেছে। কিন্তু আপত্তি করেননি গণেশবাবু। গত বৈশাখে শশাঙ্কের সঙ্গে স্নিগ্ধার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

জয়ন্তবাবু কিন্তু সুমিত্রার ধারণাটাকে বাজে চিন্তার এরিথমেটিক বলে ঠাট্টা করেন।—না না, আপ্তভীরু-টীরু নয়; ওটা নিতান্ত বাজে কথা। এটা হল একটা লজ্জার বাধা। তুমি আর করুণা গল্প করে চারদিকে রটিয়ে দিয়েছ যে, শ্যামলের সঙ্গে শুক্তির বিয়ে হলে ভাল হয়। কাজেই, শ্যামলের কাছে ঘেঁষতে চায় না শুক্তি। ঠিকই তো, যা অবধারিত, তাব জন্যে ছটফট করে লাভ কী?

সুমিত্রা—বুঝলাম না।

জয়ন্তবাবু—ভালবাসাবাসি তো হবেই একদিন। বিয়ে হলেই ওসব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। কাজেই ড্রামার মত স্টেজিং-এর আগে ভালবাসার রিহার্সাল, ওটা কোনও কাজেব কথা নয়।

দিবাকর একবার বলেছিল—না না, ভয়-টয় নয়। শুক্তি বোধ হয় একটু দেরি করতে চায়। অন্তত বি-এ'টা পাস না করে বিয়ে করতে চাইবে না শুক্তি। শুক্তির লজ্জাটা হল মুখ্খু হয়ে থাকবার লজ্জা। তোমরাই বলো, শ্যামলের মত ছেলেকে কোন সাহসে এখনই বিয়ে করতে রাজি হবে শুক্তির মত মেয়ে, যে মেয়ে জীবনে অঙ্কেতে একত্রিশের. বেশি নম্বর পেল না?

করুণা বলেছিল—আমার মনে হয়, শুক্তির মনটা ওর বাবার ওপরেই রাগ করে...না, একটা অভিমান করে রয়েছে বলেই আজও মুখ খুলে কিছু বলতে পারছে না।

চমকে উঠেছিলেন সুমিত্রা। —কেন? কেন? শুক্তির কবে এমন মাথাখাবাপ হল যে, গগনদার মত মানুষের ওপর...

করুণা—আপনার কাছে শুক্তির বাবার যে চিঠিটা পরশুদিন এসেছে, সে চিঠি পড়েছে শুক্তি।

ঠিকই দেখতে পেয়েছিলেন করুণা বউদি, গগনবাবুর চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে পড়েছে শুক্তি। পড়ছে আর হাসছে। চিকচিক করে হাসছে চোখ দুটোও। আর মুখের হাসিটা যেন ছোট্ট একটা ব্যথার টোকা খেয়ে কাঁপছে। ঠোঁট দুটোও ফুলে উঠেছে বলে মনে হয়।

—আমার ইচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করো না, সুমি। আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলব না। যা বলবার হয় মেয়েই বলবে। গগনবাবুর লেখা চিঠির মধ্যে এই তো মাত্র তিন লাইনের কয়েকটি কথা। এর জন্যে তাঁর মেয়ের মনটার ব্যথিত ও অভিমানিত হবার কোনও কারণ আছে কি?

সন্দেহ হয় সুমিত্রার, আছে বোধ হয়। তা না হলে শুক্তি কেন আজও ওর ইচ্ছেটাকে এমন করে বোবা করে দিয়ে মনের ভিতরে লুকিয়ে রাখবে? কিন্তু এরকম একটা অভিমানের সমস্যা থাকলে মেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে? বাপ কিছু বলবেন না, মেয়েও কিছু বলবে না, বাঃ।

আজ এখন এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকে সবার আগে যে ঘরের ভিতরে গিয়ে আর চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সুমিত্রা, সেটা শুক্তির শোবার ঘর। মেয়েটার অভ্যাসটা

তো একটুও এলোমেলো নয়। যেমন নিজেকে, তেমনই ওর এই ঘরের চেহারাকেও বেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখতে ভালবাসে শুক্তি। আজ কিন্তু দেখা যায়, বেশ কয়েকটা ভুল করেছে শুক্তি। বিছানার উপর শুক্তির একটা ছাড়া শাড়ি, কল্কাপাড় একটা টাঙ্গাইল, এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আয়নার টেবিলের পাউডারের ডিবেটাও খোলা।

শুক্তি নেই; বাড়িটাকে আজ বেশ খালি-খালি মনে হয়। সুমিত্রার মনটা তবু আজ কেন-যেন খুশি হয়ে রয়েছে। শুক্তির ভুলো মনের এই কাণ্ডটাকে দেখতে ভাল লাগছে। হোক না বড় পিসির বাড়ি, শুক্তি যেন এখানেই ওর মনটাকে রেখে দিয়ে দুদিনের জন্য বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়েছে। একটুও মিথ্যে তো নয়; বছরের যে ক'টা মাস এখানে থাকে, তার মধ্যে কোনও একটি দিনেও তেজপুরে কিংবা চা-বাগানে যাবার জন্যে মেয়েটার মনে কোনও ইচ্ছার তাড়না ছটফটিয়ে ওঠে কিনা সন্দেহ। অন্তত ওর কথার মধ্যে এরকম কোনও তাড়নার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খুব ভাল হত, শুক্তি যদি গত মাসের তোলা ওর ফটোটাকে এই টেবিলের উপরে নিজেই রেখে দিয়ে চলে যেত। তা হলে আর বুঝতে কিছু বাকি থাকত না, কার চোখের খুশির জন্য ফটোটাকে রেখে গিয়েছে শুক্তি।

যাই হোক, আজ যেটুকু বুঝতে পেরেছেন সুমিত্রা, তাতেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এতদিন ধরে এ বাড়ির মনে কতই না মিথ্যে উদ্বেগের জল্পনা-কল্পনা আর গবেষণা চলছিল। সব ভুল। আজ যদি দেখতে পেত করুণা, প্লেন ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে বিদায় নেবার সময় শ্যামলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শুক্তির মুখটা কী সুন্দর হয়ে উঠেছিল, তবে করুণাও আজ চেঁচিয়ে হেসে উঠত, না, আর ভাবনা করবার কিছু নেই।

—আসি তবে। এই সামান্য ছোট্ট একটা কথা বলতে গিয়েই শুক্তির প্রাণটা যেন একবুক লজ্জার জলে ডুবে গিয়ে রাঙা হয়ে গেল। তবু তো বলতে পেরেছে। ভয় ভেঙেছে। শ্যামলের সঙ্গে এই প্রথম কথা বলল মেয়েটা। দু'মাস পরে, না হয় আর এক বছর পরে মেয়েটা ওর ভয়-ভাঙা প্রাণের সাহসে শ্যামলের কাছে সে কথাটা বলে দিতে পারবে, যে কথা ওর মুখে আজ সবচেয়ে ভাল শোনায়, সবচেয়ে ভাল মানায়। তখন আর গগনদাকে চিঠি লিখে নিশ্চিন্ত করতে কোনও অসুবিধে থাকবে না, তুমি শুনে সুখী হবে, দাদা; শুক্তি নিজেই বলেছে।

বারান্দার মেঝের উপর গড়িয়ে বসে আর প্লাস্টিকের একটা এরোপ্লেন নিয়ে ওটা আবার কী খেলা খেলছে সুকু?

নীর খড়ি ঘষে মেজের উপর একটা আকাশ এঁকেছে সুকু। তার উপর সাদা খড়ির দাগ টেনে দিয়ে একটা লাইনও এঁকেছে। লাইনের আরম্ভে মাঝখানে ও শেষে পর পর তিনটে লাল খড়ির গোলদাগ, দমদম—গৌহাটি—তেজপুর।

সুকু জিজ্ঞেস করে—শুক্তিদি এখন কত দূরে, মা? প্লেন কি গৌহাটি পার হয়েছে?

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই হাসতে থাকেন সুমিত্রা।—হ্যাঁ।

প্লাস্টিকের খেলনা এরোপ্লেনটাকে এক ঠেলায় গৌহাটি পার করে দেয় সুকু।

৩

মণিমালা, তেজপুরের মণিমাসি বললেন—আমি যে তোর বড় পিসির চিঠির একটি কথারও মানে বুঝতে পারি না।

শুক্তি—কেন?

মণিমাসি—তুই নাকি ঘর ছেড়ে বের হতেই চাস না? একা কলেজে যাবার দরকার হলে

ভয়ে আধমরা হয়ে যাস? কথা-টথা বলতেও নাকি তোর ভয়ানক অনিচ্ছে? বিশেষ করে বাইরের কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে তোর যেন মাথায় বাড়ি পড়ে, শুধু বোবার মত...অ্যাঁ? তোর বড় পিসি মিথ্যে তোর নামে এত নিন্দে করেন কেন?

শুক্তি হেসে ফেলে। —নিন্দে কেন হবে? সত্যি কথা।

সত্যি কথা? বিশ্বাস করলে যে একটা অদ্ভুত অসম্ভব বিস্ময়কে বিশ্বাস করতে হয়। কিরণদির মেয়ে এই শুক্তি আজ সকাল সাড়ে দশটার পাঁচ মিনিট আগে তেজপুরে পৌঁছেছে। ঘরে ঢুকেই মণিমাসির গা ঘেঁষে মাত্র একটি মিনিট শান্ত হয়ে বসেছে। তারপরেই ছটফট করে উঠে গিয়েছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে স্নান করে আর তড়বড় কবে শুধু ভাত ডাল আর আধখানা ভাজা দিয়ে আধপেটা একটা খাওয়া সেরে নিয়ে বাইরে বের হবাব জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। —রাজবাহাদুরকে একবার বলে দাও মণিমাসি, গাড়িটাকে যেন এখনি গ্যারেজে না নিয়ে যায়।

মণিমাসি—কোথায় যাবি?

শুক্তি—যাই একবার মালতীর সঙ্গে দেখা করে আসি। তারপর...শীতলকাকার বাড়ি তো যেতেই হবে। হ্যাঁ, তারপর হয়ত অঞ্জলিদির বাড়িতেও একবার যেতে হতে পাবে।

রাজবাহাদুরকে ডাক দিয়ে কিছু বলবার দবকার হয় না মণিমাসির। ফটকের দিকে একবাব তাকিয়ে নিয়ে আর গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই বের হয়ে যায় শুক্তি। যেতে যেতে হাসতে থাকে— মালতীর সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসব। তারপব যদি ইচ্ছে হয়...হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কলকাতার বড় পিসিকে একটা তার করে দিতে হবে যে, আমি তেজপুরে পৌঁছে গেছি।

মণিমাসি হাসতে থাকেন। —সব হবে, সব হবে। কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

মণিমাসি বেশ একটু মোটাসোটা ভারি চেহারার মানুষ। নড়াচড়া করতে ভালবাসেন না, পারেনও না। তাই বলে শুক্তির এই ছুটোছুটির অভ্যাসটাকে যে একটুও অপছন্দ কবেন, তা নয়। বরং একটু ভালইবাসেন। টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে আর কলম হাতে তুলে নিয়ে শুক্তিব বড় পিসির কাছে তখুনি একটা চিঠি লিখতে শুরু করে দেন। —শুক্তি এখন আমাব এখানে আছে। ভালই আছে। কিন্তু একটা কথা ভেবে একটু আশ্চর্য হচ্ছি সুমিত্রা; তোমাদের ওখানে কেন এত ভিতু হয়ে আর ঘরকুনো হয়ে পড়ে থাকে শুক্তি।.আমার এখানে তো বেশ মনের আনন্দে থাকে; ঘরের বাইরে বেড়িয়ে আসতে ভালবাসে, আর...।

না, শুক্তির নামে এখনই আরও কিছু লিখে ফেলা কি উচিত হবে? লেখা বন্ধ করে আর কলমটাকে টেবিলের উপর শুইয়ে রেখে কী-যেন ভাবতে থাকেন মণিমাসি।

বেশ তো, মালতীদের বাড়ি না হয় একবার ঘুরেই এল। মালতীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে শুক্তির এই তর-সয়-না ব্যস্ততার তবু একটা মানে হয়। কিন্তু অঞ্জলিদের বাড়িতে কেন?

শুক্তির বাবা গগন বসুর ছাত্রজীবনের বন্ধু পরমেশ হাজরিকার মেয়ে মালতীও একদিন শুক্তির ছাত্রী জীবনের বান্ধবী ছিল। সে আজ দশ বছরেরও আগের কথা, শিলংয়ের এক কনভেন্ট স্কুলের হোস্টেলের একটি ঘরে বসে একদিন দুই মেয়েই কান্নাকাটি করে প্রায় একরকমের ভাষায় চিঠি লিখে বাড়ির মানুষকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। —শিগগির নিয়ে যাও, এখানে থাকলে মরে যাব।

আজও জিজ্ঞেস করলে ওদের দুজনের একজনও বলতে পারে না; মালতী কিংবা শুক্তি, মরে যাবার মত দশা কেন হয়েছিল? আজ বরং ওরা বেশ হাসাহাসি করে গল্প করতে পারে, হোস্টেলের ঘরের জানালার কাছে গোলাপ গাছের গায়ে সব সময় একটা টিকটিকি বসে থাকত, তাই বোধ হয়।

মালতীর বাবা পরমেশ হাজরিকা আজ আর বেঁচে নেই। মুনসেফ হয়ে কাজের জীবন শুরু করেছিলেন; সাবজজ হয়ে অবসর নিয়েছিলেন। তেজপুরের কোলিবাড়ি পাড়াতে শান্ত নিরালায়, একসারি কচি নারকেলের আড়ালে একটি বাসাধাঁচের পাকাবাড়ি ছাড়া এমন কিছুই তিনি রেখে যেতে

পারেননি, যাকে বিষয়-সম্পত্তি বলে মনে করা যেতে পারে। পারবেনই বা কেমন করে? শৌখিন মানুষ; প্রতি বছর দু-তিন হাজার টাকা খরচ করে গাঁয়ের বাড়িতে বিহু পরবের আনন্দ মাতিয়ে তুলে খুশি হতেন। তার উপর ছিল, থিয়েটারের শখ। যখন যেখানে থাকতেন, তখন সেখানে একটা নাট্যকে সমিতি গড়ে তুলতেন। স্টেজ তৈরির খরচ থেকে শুরু করে অভিনেতাদের চা-বিস্কুটের খরচ পর্যন্ত, টাকা খরচের সব দায় নিজেই নিয়েছেন।

মৃত্যুর এক বছর আগে আরও একটা কাণ্ড করেছিলেন পরমেশবাবু। বড় ছেলে শিশির তখন কলেজের ছাত্র, তবু শিশিরের বিয়ে দিলেন। তার মানে প্রমীলাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে এলেন। প্রমীলা হল নওগাঁ আদালতের সেই টাইপিস্ট কেরানি মহেন্দ্র ফুকনের মেয়ে, যিনি হঠাৎ একদিন আদালতের অফিসঘরে মাথা ঘুবে পড়ে গেলেন আর মরেও গেলেন। পরমেশবাবুর আত্মীয় আব কুটুম্বদের অনেকে অখুশি হয়েছিলেন, এত গরিবের ঘরের মেয়েকে ঘরে আনা কেন? এটাও কি পবমেশবাবুর একটা শখের খেয়াল? হতে পারে। কিংবা, হয়ত একটা মমতার খেয়াল।

মারা যাবার একমাস আগে, বড়পেটা থেকে তেজপুরে ফিরে আসবার সময় হাতির দাঁতের দুটি চিরুনি কিনে নিয়ে এসেছিলেন পরমেশবাবু; একটি মালতীর জন্যে, আর একটি শুক্তির জন্য:

সেই পরমেশবাবুর মেয়ে মালতী এখন বাড়িতেই পড়ে। মাইনে দিয়ে কলেজে পড়তে অসুবিধা আছে। প্রাইভেট বি-এ দিতে পারবে বলে আশা করছে। আর, মালতীর দাদা শিশির, যে ছেলেকে তিন বছর আগে দেখা গিয়েছিল, টেনিস ব্যাট হাতে নিয়ে আর স্কুটারে চড়ে ছুটছে; সে ছেলে আজ একটি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। পরমেশবাবুর হঠাৎ-মৃত্যুর খবর পেয়ে শিলং থেকে সেই যে চলে এল শিশির, আর তার ফিরে যাওয়া হল না। বি-এ পরীক্ষাও দেওয়া হল না। অথচ, শিলং কলেজের প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, বোটানিতে ফার্স্ট ক্লাস পাবেই শিশির হাজরিকা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আবার চিঠি লিখতে শুরু করেন মণিমাসি।—আশা করি সবাই ভাল আছ। সুকু আর কৃষ্ণাকে আমার আদর জানাবে। করুণার কি এখনও কোনও নতুন খবর নেই? হ্যাঁ, সাহস করে কলকাতার মানুষকে আবার অনুরোধ করছি; একবার তেজপুরে বেড়িয়ে যাও। শীতের সময়ে এসো।

ফিরে এসেছে গাড়িটা। শুক্তিও এসেছে। কিন্তু ঘরে ঢুকে মণিমাসির গা ঘেঁসে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিয়েই ব্যস্ত হযে ওঠে।—তবে যাই মণিমাসি, ঘুরেই আসি।

—কোথায়?

—শীতলকাকার বাড়ি।

—যাও, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

—কিন্তু...।

—কী?

—মালতীকে দেখে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। চাকরি করতে চায় মালতী, তা না হলে আর চলে না। বাড়িতে এতগুলি মানুষ; মা আছে, দুটো ছোট ভাই আছে। প্রমীলাও আছে। কী করে চলে? মালতীর দাদা শিশিরবাবুর ওই তো মাইনে, মাত্র একাশি টাকা। আর, প্রাইভেট টিউশনি করে আরও পঞ্চাশ টাকা। দেখলাম, জ্বর হয়েছে তবু একগাদা কাপড় নিয়ে কাচতে বসেছে প্রমীলা। শিশিরবাবুও খুব গম্ভীর; মাথায় হাত দিয়ে ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে আছেন, কী-যেন ভাবছেন।

—কার কথা বলছিস, শুক্তি? কোলিবাড়ির শিশির হাজরিকার কথা? বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে বের হয়ে আসেন মহিমবাবু।

শুক্তি বলে—হ্যাঁ, মেসোমশাই।

মহিমবাবু বলেন—হ্যাঁ, মাথায় হাত দিয়ে একটু ভাবতেই হবে। রাগের মাথায় একটা ভুল করে বসলে, শেষে ওরকম ভাবতেই হয়।

মণিমাসি—ছেলেটা কষ্টে পড়েছে, অভাবে আছে। তাই দুশ্চিন্তা করতে হচ্ছে। ভুল আবার কোথায় হল?

মহিমবাবু হাসেন।—না, তোমরা জান না, তাই বুঝতে পারছ না। আমি বুঝেছি। স্কুলের ছেলেদের নিয়ে ভালুকপং বেড়াতে যাবে, জঙ্গলের একটা ঝর্নার কাছে বসে আর পিকনিক করে ফিরে আসবে; সেই জন্যে নেফা অফিসে গিয়ে ইনার লাইন পার হবার পারমিট চেয়েছিল শিশির।

শুক্তি—সেটা আবার কী?

মহিমবাবু—নেফাতে ঢুকতে হলে সরকারের অনুমতি চাই।

শুক্তি—পাসপোর্ট?

মহিমবাবু—না, না, পাসপোর্ট নয়, পারমিট।

মহিমবাবু—যাই হোক, অফিসার ভদ্রলোক বললেন, হবে না। শিশিরেরও জেদ; কেন পারমিট দেওয়া হবে না? এইরকম কেন কেন করে তর্কাতর্কি হতে হতে শেষে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম।

শিশির বলে—নেফা কি আপনার জমিদারি?

অফিসার বলেন—হ্যাঁ, যতদিন আমি সার্ভিসে আছি, ততদিন আমারই জমিদারি।

শিশির—বাজে কথা বলবার এত সাহস পেলেন কোথায়?

অফিসার—এখানে গোলমাল করবার এত সাহস পেলেন কোথায়? এম-পি কুটুম আছে বোধ হয়?

শিশির—না, নেই। আপনার বোধ হয় মিনিস্টার কুটুম আছে?

অফিসার—চুপ, আর একটিও কথা বলবেন না, চলে যান। নইলে...।

—পুলিশ ডাকবেন?

—ডাকতে বাধ্য হব।

—ডাকুন তা হলে?

মহিমবাবু এইবার জানালার দিকে তাকিয়ে, বোধ হয় দূরের নেফা-পাহাড়ের মাথায় সাদা মেঘটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—আমি তখন সেখানে ছিলাম। আমিই দুজনের মাঝখানে পড়ে আর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঝগড়াটা থামিয়ে দিয়েছিলাম।

শুক্তি বলে—অফিসার ভদ্রলোকই বা কেমনতর মানুষ? পারমিট দিলেন না কেন?

মহিমবাবু—বোধ হয় সরকারের নিয়ম।

হেসে ফেলে শুক্তি।—সরকারই বা কেমনতর?

শুক্তিকে নিয়ে গাড়িটা ফটক পার হয়ে চলে যাবার পরেও জানালাটার কাছে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন মহিমবাবু; মহিম দস্তিদার, পনেরো বছর আগে যিনি দিনাজপুরের স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। এই ছিপছিপে সুগৌর বুড়ো মানুষটির কপালে কোনও রেখা ফুটে ওঠে না। চোখ-মুখ সব সময়েই হাসছে; চমৎকার একটি আশাসুখী চেহারা। জীবনে যা আশা করেছিলেন, তার সবই পেয়ে গিয়েছেন। আরও যা আশা করেন, তাও পেয়ে যাবেন। তিন ছেলে আছে; তিন ছেলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। রমেন, রথীন, রজত, তিনজনেই দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে কাজ করে। কেউই কনিষ্ঠ কেরানি নয়; তিনজনেই জ্যেষ্ঠ অফিসার।

গণ্ডগোল তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাটি পছন্দ করেন না মহিমবাবু। তিনি চান, ভাগ্য যা দিয়েছে তাই নিয়ে সহজে শান্ত হয়ে থাক আর আশা কর। ভেবে একটু দুঃখও বোধ করেন মহিমবাবু; মানুষের মন এত সহজে ধৈর্য হারায় কেন? একটু সহ্য করতে অসুবিধে কোথায়?

রবার বাগানের এক প্রান্তের এই বাড়ি, যে বাড়িকে 'ভারতী' নাম দিয়ে খুশি হয়েছেন মহিম দস্তিদার; সে বাড়ি তৈরির সব টাকা দিয়েছে রমেন। গাড়িটা কিনে দিয়েছে রথীন। আর, সেগুন কাঠের সুন্দর আসবাব দিয়ে বাড়িটাকে ভরে দিয়েছে যে, সে হল রজত। মুগার চাদরটি গায়ে জড়িয়ে,

ভারতীর চওড়া বারান্দার উপরে যখন পায়চারি করেন মহিমবাবু, তখন অনেক স্বদেশি গান তাঁর মনের ভিতরে গুনগুন করে বাজে। এক-একদিন পাশের বাড়ির লাহিড়ীবাবুর ছেলে, দশ বছর বয়সের হীরক যখন চেঁচিয়ে গান গেয়ে ওঠে—ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে—তখন মহিমবাবুও চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে বলেন—আরও জোরে গাও, হীরক।

মহিমবাবুর বোধ হয় এই সেদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গিয়েছে; তাই জানালা দিয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে ওরকম করে তাকিয়েছেন। এই তো সেদিন, মাস তিন আগে, বিদেশি এক বোটানিস্ট সাহেব এসে সার্কিট হাউসে উঠলেন। নেফার উদ্ভিদের খবর যোগাড় করতে চান এই বোটানিস্ট সাহেব। বললেন, জঙ্গলে ভরা ওই নেফাকে তিনি দ্বিতীয় এক ইডেন বলে মনে করেন।

দিল্লী আর শিলং থেকে সরকারি মহলের কত মানী মহোচ্চ ও পদস্থের কত শুভেচ্ছার চিঠি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সেই বোটানিস্ট সাহেব, ডক্টর সি. টি. এলগিন। চারজন ভি-আই-পি, যাঁরা সে সময় সার্কিট হাউসে ছিলেন, তাঁরাও বোটানিস্ট সাহেবকে চা খাওয়াবার জন্য যখন-তখন ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। নেফা অফিসের জিপও যখন-তখন ছুটে এসে বোটানিস্ট সাহেবের দরকারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। সাহেবের জন্য হেলিকপ্টর যোগাড়ের কত চেষ্টা করলেন নেফা-অফিসের সেই মিস্টার মনোহরলাল, শিশির যাকে সেদিন মিছিমিছি বিরক্ত করেছে।

ইনার লাইনের পারমিট পেতে বোধ হয় এক ঘন্টাও দেরি হয়নি; স্বাগত অতিথির মত খুশির হাসি হেসে, সরকারি জিপের আরোহী হয়ে, আর সরকারি শ্রদ্ধার গুরুজন হয়ে নেফা চলে গেলেন বোটানিস্ট এলগিন। তেজপুর থেকে ফুটহিল; ফুটহিল থেকে চাকু; তারপর কে জানে কোন দিকে। এর চেয়ে বেশি কোনও খবর আর পাননি মহিমবাবু। সেদিন বোটানিস্ট এলগিনকে বিদায় দেবার সময় সার্কিট হাউসের বারান্দায় দশজন ভি-আই-পি আব অফিসারের ভিড়ের এক পাশে মহিমবাবুও দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—শুক্তি কোথায় গেল? জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মহিমবাবুর চোখ মুখ হাসতে থাকে।

মণিমালা—কেন?

মহিমবাবু—জিজ্ঞেস করতাম, এবছব গগনবাবুর বাগানের কিরকম প্রফিট হল?

মণিমালা—নতুন পাড়ার শীতলের বাড়িতে বেড়াতে গেল শুক্তি।

৪

মণিমালা কিন্তু বেশ একটু আশা-অসুখী মানুষ; যদিও হাসি-খুশি মানুষ। তাঁর তিন ছেলে যেন তিন ভিন্ন জগতে থাকে, যেখানে সবার উপরে ছেলের-বউয়ের ইচ্ছা আর অভিরুচিই সত্য, তাহার উপরে নাই। ছেলেরা তিন বছরের পাওনা ছুটি জমিয়ে নিয়ে সস্ত্রীক বিদেশে বেড়াতে যায়। তারা তেজপুরে আসে না; আসতে পারে না। এই পাঁচ বছরে তিন ছেলের একজনও তেজপুরে আসেনি। বুঝতে পেরেছেন মণিমালা, পুত্রবধূর সম্মতি না পেলে কোনও পুত্রের আর তেজপুরে আসবার দুঃসাহস হবে না। তবে হ্যাঁ, তারা নিয়মিতভাবে টাকা পাঠায়, আর, মাঝে মাঝে চিঠিও লেখে।

মহিমবাবুর মনে কিন্তু কোনও অভিযোগ নেই। তিনি হাসেন আর বলেন—মন্দ কী? ছেলেদের কর্তব্যবোধ তো ঠিক আছে।

মণিমালা বলেন—শুধু টাকা পাঠিয়েই কর্তব্য।' ভাল কথা। সুখে থাকুক।

সবই আছে, তবু কিছু নেই; মণিমালা যেন এইরকমের একটা চমৎকার শূন্যতাব মধ্যে থাকেন। আর, সেই জন্যেই বোধ হয় দিদির মেয়ে এই শুক্তিকে এত আপন করে নিয়ে কাছে ধরে রাখতে

চান। এ যেন উপোসি মায়ের-প্রাণের একটা তেষ্টা মেটাবার চেষ্টা। জানেন কিরণলেখা, শুক্তিকে কেন এত বেশি ভালবাসে মণিমালা।

জানেন মণিমালা, শীতলের বাড়িতে একবার না যেয়ে পারবে না শুক্তি। গিয়েছে, ভালই করেছে। শীতলেব বউ মীরা শুক্তিকে দেখতে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবে। সব কাজ ফেলে রেখে শুক্তির শক্ত বেণীটাকে খুলে দিয়ে খোঁপা বেঁধে দিতে চেষ্টা করবে। মীরার ওই এক অভ্যেস; শুক্তির মাথাটার দিকে চোখ পড়লেই মীরার হাত যেন নিসপিস করে।

শুক্তিরই বাবা গগন বসুর অনেক দূরসম্পর্কের এক কুটুমের ছেলে নতুন পাড়ার শীতল বিশ্বাস, তেজপুর বাজারে যাঁর সামান্য ধরনের একটা বস্ত্রালয় আছে। মহাজনের দেনা ঠিক সময়ে শোধ করতে না পেরে মাঝে-মাঝে মহিমবাবুর কাছে টাকা ধার চাইতে আসেন শীতল।

শীতল বিশ্বাসের ভাই রতন, নেফা মেডিক্যালের পিয়ন; বছরে দু-একবার কাজের ছুটি নিয়ে তেজপুরে আসে, নতুন পাড়ার বাড়িতে একটা দিন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে পার করে দেয়। কিন্তু পরের দিনই ছটফট করতে থাকে, ঘুম-টুম হয় না। তার পরের দিন নেফা চলে যায় রতন; শীতল আব মীরার আপত্তির কোনও কথা গ্রাহ্য করে না। মীরাও রাগ করে তার এই বিচিত্র স্বভাবের দেবরটিকে কথা শোনাতে ছাড়ে না—পাঁচ বছর নেফাতে চাকরি করে তুমিও আস্ত একটা দফলা হয়ে গিয়েছ।

রতন কিন্তু রাগ করে না। হেসে হেসে দফলা ভাষাতে জবাব দিয়ে মীরার রাগটাকে ঠাট্টা করে। সে ভাষার একটা কথাও বুঝতে না পেবে মীরা আরও রেগে যায়।

এবার কিন্তু রতন বেশ জব্দ হযেছে! প্রায় এক মাস হতে চলল, তেজপুরে এসেছে রতন। কিন্তু যাই-যাই করেও যেতে পাবছে না।

সেটা একটা কাণ্ডই বটে; রতনেব কাণ্ড! সেদিন নেফা থেকে এসে, আর, নতুন পাড়াব বাড়িতে ঢুকেও মেজের মাদুরের উপবে ঘুমিয়ে পড়ে থাকবার আনন্দটাকে ভুলে গেল। তখুনি বের হয়ে গেল, আর দু'ঘণ্টা পরে ফিরে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—দেখে যাও বউদি, নেফা থেকে কী বস্তু নিয়ে এসেছি।

নেফার বস্তু? সে কী? রাক্ষুসে মোনপা-মুখোশ? বুনো কুমড়ো? ভুর্জ কাঠের ডিবে? ইয়াক দুধের মাখন? চকচকে একটা দফলা দা? কিছুই ধারণা করতে না পেরে, আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে ঘরের বাইরে এসে চমকে উঠেছিল মীরা। রতনের পাশে দাঁড়িয়ে একটা দফলা মেয়ে হাসছে।

তেজপুর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ওই দফলা মেয়ে, যার নাম রেনকি। মাসখানেক আগে নেফা মেডিক্যালের চিঠি নিয়ে আর রেনকিকে নিয়ে পিয়ন রতনই তেজপুরে এসেছিল। হাসপাতালে রেনকিকে ভর্তি করে দিয়েই ফিরে গিয়েছিল রতন, ওর চাকরির সেই জায়গাটিতে, খালোয়া বেস থেকে একদিনের হাঁটাপথ সেই এরিয়াতে, যার নাম বিলং।

শীতলবাবুর বাড়িতে গিয়ে মণিমাসিও একদিন দফলা-মেয়ে রেনকিকে দেখে এসেছিলেন। বয়স কত হবে মেয়েটার? উনিশ কুড়ি কিংবা একুশ? ফুলো ফুলো দুটো ভুরুর ছায়ার নীচে দুটো ছোট্ট মিটমিটে খুশি চোখের তারা চিকচিক করে হাসছে। মেয়েটার দুই গালে কেউ আলতা বুলিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু ওটা ওর রক্তেরই রঙের আভা। আর কব্জিটা! বলতে গিয়ে হেসে ফেলছিল মীরা। —রেনকিকে একদিন শাড়ি-ব্লাউজ পরিয়ে সিনেমার ছবি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, মণিদি। আমার তো হাতঘড়ি নেই, তাই ভদ্রলোকের হাতঘড়িটাকে রেনকির হাতে পরাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু রেনকির কব্জিতে পুরুষ ঘড়ির ব্যাণ্ডও টাইট হয়ে ছিঁড়ে গেল। শেষে সিল্কের ফিতে দিয়ে...।

হাসি থামিয়ে নিয়ে মীরা আবার বলে—অমন কব্জি হবে না কেন? মেয়েটা নিজের হাতে ক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙে আর কাঠ কাটে।

এবার কিন্তু একমাসের ছুটি নিয়েছে রতন। আর নেফা মেডিক্যালও অনুমতি দিয়েছে, হ্যাঁ,

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ট্রাইবালের মেয়ে রেনকিকে কোনও ইন্ডিয়ান পরিবারের বাড়িতে কয়েকটা দিনের জন্য থাকতে দিতে পারা যায়; যদি অবশ্য সে বাড়িতে কোনও রেসপনসিবল বয়স্কা মহিলা থাকেন।

গাঁওবুড়ার মেয়ে রেনকি। খুঁড়িয়ে হাঁটত রেনকি। হাঁটুর কাছে একটা মাংসপেশি কুঁচকে গিয়ে শক্ত ঢেলার মত হয়ে গিয়েছিল। হাঁটতে গেলেই ব্যথা পেয়ে কটকট করত হাঁটুটা। সোজা টান হয়ে দাঁড়াতে পারত না। অপারেশনের পর সেই হাঁটু ভাল হয়ে গিয়েছে। এখন দৌড়তেও পারে। তাই রেনকিকে নিয়ে যেতে চায় রতন। কিন্তু রেনকি বলে আরও কিছুদিন থাকি।

রতন বোধ হয় এখনও চলে যেতে পারেনি। না গিয়ে থাকলে ভালই হবে। শুক্তি তা হলে মেয়েটাকে দেখতে পাবে। খুব খুশি হবে, খুব আশ্চর্য হবে শুক্তি। ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলেন মণিমাসি। দফলা-মেয়েটাকে নিয়ে মীরা কত কাণ্ডই না করেছে। যখন-তখন মেয়েটাকে খেলার পুতুলের মত সাজিয়েছে। দু'বেলা দু'রকম করে খোঁপা বেঁধে দিয়েছে। একদিন মেয়েটাকে দিয়ে লুচি ভাজিয়েছিল মীরা। কালোর মা'র কাছে সে গল্প বলতে গিয়ে হেসে-হেসে লুটোপুটি করেছে মীরা, যার বয়স এখন প্রায় চল্লিশের কাছে এসে ঠেকেছে। তা হলে শুক্তির মত মেয়ে এখন রেনকিকে নিয়ে কী যে কাণ্ড করবে, ভগবান জানেন। শুক্তি এতক্ষণে বোধ হয় দফলা-মেয়েটাকে গান শেখাতেই শুরু করে দিয়েছে, কত গান তো হল গাওয়া...।

নিজেরই কল্পনার মধ্যে মন ডুবিয়ে দিয়ে হাসতে থাকেন মণিমাসি। তারপর আরও দুটো চিঠি লেখা সেরে ফেলেন। তারপর হঠাৎ শুক্তির গলায় স্বর শুনে চমকে ওঠেন,—একটু অপেক্ষা করো বাজাবাহাদুর, আমি এখনই আবার বের হব।

শুক্তি বলে—কী চমৎকার মেয়ে রেনকি। আমি ওর গলায় পাউডার মাখিয়ে দিয়েছি, ওর শাড়িতে সেন্ট ছড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু...।

মণিমাসি—কী?

শুক্তি—আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলেছে রেনকি।

—কেন?

—এখনই চলে যেতে হবে বলে।

—চলে যাচ্ছে নাকি?

—হ্যাঁ। কী আর করবে বলো? রতনকাকা বলেছেন, আর একটি দিনও দেরি করতে পারবেন না। দেরি করলে রতনকাকার চাকরি চলে যাবে।

আনমনার মত একটু চুপ করে থেকে শুক্তি আবার কথা বলে—উঃ, কী ভয়ানক রেগে গেল রেনকি। রতনকাকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে রইল; তার পরেই ঘরের ভিতরে ছুটে গেল। গায়ের শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ, সব সাজ খিমচে টেনে সরিয়ে দিয়ে ওর নিজের সাজ পরে বের হয়ে এল। কী খসখসে ধোকড় কাপড়ের একটা লম্বা কোর্তা পরে, ঝুঁটি করে চুল বেঁধে, শক্ত করে কোমরে চাদড় জড়িয়ে, আর, রতনকাকার কাছে এগিয়ে যেয়েই ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রেনকি। —চলো।

মণিমাসি কোনও কথা বলেন না। মণিমাসিও যেন আনমনা হয়ে গিয়েছেন। শুক্তি নিজেই বিড়বিড় করে—ওরা রওনা হবার আগেই আমি পালিয়ে এসেছি। আমার খুব ভয় করছিল মণিমাসি।

মণিমাসি হাঁপ ছাড়েন। —তুই কি এখনই আবার বের হবি?

শুক্তি—ও...হ্যাঁ...একবার অঞ্জলিদির সঙ্গে দেখা করে আসি।

মণিমাসি—যাও, কিন্তু বেশি দেরি না করে চলে এসো।

শুক্তি—না, দেরি করব না। কিন্তু রতনকাকার মুখের দিকে অমন কটমট করে তাকাল কেন রেনকি? রতনকাকা কী দোষ করলেন?

মণিমাসির চোখ চমকে ওঠে। —মীরা তোকে কিছু বলেনি? বলেছে বুঝি?

—না, কই, মীরা কাকিমা তো আমাকে কিছু বলেননি।

মণিমাসি আবার হাঁপ ছাড়েন। —না, রতনের দোষ কেন হবে? ওটা হল সরকারি নিয়ম, ট্রাইবালের মেয়েকে ট্রাইবালের ঘরেই থাকতে হবে।

—কি বিদ্‌ঘুটে নিয়ম? হাসতে গিয়ে শুক্তির ঠোঁট দুটো কুঁচকে যায়।

চলে গেল শুক্তি।

মণিমাসির মনের এতক্ষণের ছায়া-ছায়া কিন্তুটা এইবার সুস্পষ্ট একটা প্রশ্নের কায়া হয়ে ফুটে ওঠে। এত ব্যস্ত হয়ে অঞ্জলির বাড়িতে কেন বেড়াতে গেল শুক্তি? মালতী ওর অনেকদিনের চেনা-জানা বান্ধবী। শীতলবাবুর বাড়ি ওর কুটুমকাকার বাড়ি। কিন্তু অঞ্জলি তো এমন কেউ নয় যে, নেমন্তন্ন করে না ডাকলেও তার বাড়িতে ছুটে যেতে হবে। অঞ্জলি যে শুক্তির ডবল বয়সের এক মহিলা। অঞ্জলি যে বিধবা মানুষ।

সোম সাহেবের মেয়ে অঞ্জলি আর ছেলে অনিমেষ, দুজনেই আজ মণিমাসির কাছে একেবারে অজানা জগতের মানুষ নয়। সোম সাহেব ছিলেন রয়্যাল নেভির একজন অফিসার। মহিমবাবু বলেছেন, তাই জানতে পেরেছেন মণিমাসি, সে সময়ে সোমসাহেব ছাড়া মাত্র আর তিনজন ইণ্ডিয়ান ভাগ্যবান রয়্যাল নেভির অফিসার হতে পেরেছিল। জার্মান সাবমেরিনের টর্পেডোতে ঘায়েল হয়ে ব্রিটিশের যে যুদ্ধ-জাহাজটা জিব্রাল্টার থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে সমুদ্রজলে ডুবে গিয়েছিল, সে যুদ্ধ-জাহাজেই ছিলেন সোমসাহেব। মারা গেলেন সোমসাহেব।

সোম লজ; গণেশঘাটের কাছাকাছি যে লালরঙা বাংলোর বারান্দায় বসে ব্রহ্মপুত্রের আষাঢ়ে ঢলের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়, সে বাড়ি প্রায় পনেরো বছর ধরে খালি পড়েই ছিল। এক মালী ছাড়া আর কেউ সে বাড়িতে ছিল না। অঞ্জলি, অঞ্জলির মা, অঞ্জলির ভাই অনিমেষ, সবাই পাটনাতে সোম সাহেবের দাদার বাড়িতে, ব্যারিস্টার পি.কে. সোমের বাড়িতে থাকত। রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যেদিন শিলিগুড়িতে চলে এল অনিমেষ, তার দশদিন পরে অঞ্জলিকে সঙ্গে নিয়ে অঞ্জলির মা পাটনা থেকে এসে সন্ধ্যায় সোম লজে ঢুকলেন, ধূপচন্দন পোড়ালেন, আলো জ্বাললেন।

এমন কিছু পুরনো দিনের ঘটনা নয় যে এরই মধ্যে ভুলে যাবেন মণিমাসি। মাত্র দেড় বছর আগের একটা সকালবেলার ঘটনা। সেদিন শুক্তির সঙ্গে নতুন পাড়ার মীরার বাড়িতে মণিমাসিও গিয়েছিলেন। মণিমাসিরই ইচ্ছে হয়েছিল, গাড়িটা একটু এদিকে-ওদিকে ঘুরে, পদ্মপুকুরের সড়ক ধরে একটু বেড়িয়ে চলে যাক। কিন্তু পদ্মপুকুরের কাছাকাছি এসেই গাড়িটার ইঞ্জিনের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। বেচারা রাজাবাহাদুর আধঘন্টা ধরে ইঞ্জিনের যত কলকব্জা টানাটানি আর ঠোকাঠুকি করে শুধু ঘেমে উঠল আর হয়রান হল, কিছুই করতে পারল না। স্টার্ট নিতেই চায় না গাড়িটা।

এক মহিলা, তাঁর সঙ্গে অল্প বয়সের এক ভদ্রলোক, যাঁরা দুজন চমৎকার দুটি হাসি-মুখ নিয়ে গল্প করতে করতে আর আস্তে আস্তে হেঁটে এদিকেই আসছিলেন, তাঁরা এবার গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। শুক্তির কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে মণিমাসি বলেন—নিশ্চয় দিদি আর ভাই। দেখছিস না, একেবারে একধাঁচের মুখ?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সেই অল্পবয়সের ভদ্রলোক, রাজাবাহাদুরকে কী-যেন জিজ্ঞাসা করলেন। গাড়ির ইঞ্জিনের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে কী-যেন দেখলেন। নিজেই হাত চালিয়ে একটা প্লাগকে শক্ত করে চেপে বসিয়ে দিলেন। তারপর নিজের হাতেই স্টার্টিং হ্যান্ডেলটাকে শক্ত করে ধরে এক পাক ঘুরিয়ে দিলেন। গর্‌গর্‌ করে গর্জে উঠল গাড়ির স্তব্ধ ইঞ্জিন।

মণিমাসির দিকে তাকিয়ে আর কালিমাখা হাত তুলে একটা নমস্কার জানিয়ে চলেই যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। সেই মহিলা, যিনি এতক্ষণ সড়কের একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিও চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু মণিমাসি বাধা দিলেন—কে আপনারা? যেচে উপকার করলেন, অথচ

একটুও পরিচয় না দিয়ে চলে যাচ্ছেন?

—আমরা গণেশঘাটের সোম লজে থাকি।

মণিমাসি চমকে ওঠেন। —আপনারা কি সোম সাহেবের ছেলে আর মেয়ে?

—হ্যাঁ, উনি আমার দিদি।

মণিমাসি—তা তো দেখেই বুঝেছি। কিন্তু এভাবে চলে গেলে তো চলবে না।

—আজ্ঞে?

গাড়ির ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে, সেই মহিলার দিকে তাকিয়ে মণিমাসি বলেন—আমি সোম সাহেবের মেয়েকেও বলছি, এভাবে চলে গেলে তো চলবে না।

এগিয়ে এসে মণিমাসিকে নমস্কার করে হাসতে থাকেন সোম সাহেবের মেয়ে। —বলুন, কী করলে চলবে?

মণিমাসি—হয়, আমার সঙ্গে এখনই এই গাড়িতে তোমরা দুজনে আমার বাড়ি যাবে আর চা খাবে। নয়, তোমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে চা খাওয়াবে।

সোম সাহেবের ছেলে আর মেয়ে দুজনেরই মুখের হাসি এইবার খুশির-ফোয়ারার মত উথলে ওঠে। —চলুন, আমাদের বাড়ি চলুন।

অগত্যা, কিছুটা নিজেরই কথার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে জব্দ হয়ে, কিছুটা সোম সাহেবের ছেলে আর মেয়ের দুটি চমৎকার হাসিমুখ-অনুরোধের মায়ায় পড়ে সোম লজে না যেয়ে পারেননি মণিমাসি।

হঠাৎ-ঘটনার মত সোম লজের মা দিদি আর ভাই-এর পরিচয় পাওয়ার সেই প্রথম দিনেই দেখতে পেয়েছিলেন মণিমাসি, সোম সাহেবের মেয়ে অঞ্জলির মুখের দিকে তাকিয়ে শুক্তি যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। অঞ্জলি যেন একটা ভিন-জগতের বিস্ময়।

কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, একুশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছে, আজ চল্লিশ বছর বয়সের কাছে এসে পৌঁছেছে অঞ্জলি। তবু অঞ্জলির মুখের হাসি দেখলে মনে হবে, যেন ভোরের শিউলি হাসছে। সাদা সিল্কের শাড়ি, সাদা গরদের ব্লাউজ, সাদা ভেলভেটের চটি, হাতঘড়ির ব্যান্ডও সাদা। আর, মুখের রঙ যেন দুধে ঘষা লালচন্দনের রঙ। অঞ্জলির ঘরের টেবিলে বই-এর পাহাড়; পরলোকের যত কাহিনীর বই।

মণিমাসি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও শুনতে পেয়েছিলেন, অঞ্জলি বলছে—আমার মুখের দিকে ওরকম করে তাকিয়ে থাকতে নেই শুক্তি। বেশি কাছে আসতেও নেই। আমি হলাম সেই ওই ওদের মত, যাদের শরীর হয় কিন্তু ছায়া হয় না।

বোকার মত তাকিয়ে বিড়বিড় করে শুক্তি—তা কি কখনও হয়? হতে পারে না, অসম্ভব।

অঞ্জলি হাসে। —হতে পারে। হয়ে থাকে। ওরা শুধু চোখের একটি দৃষ্টি দিয়ে পুকুরের জল শুষে নিতে পারে। ফুলগাছের দিকে তাকালে মুহূর্তে গাছ শুকিয়ে যায়। টুপটুপ করে সব ফুল ঝরে পড়ে যায়।

হেসে ফেলে শুক্তি। —বুঝলাম, আপনি আমাকে কৃষ্ণার মত একটা বোকা খুকি মনে করেছেন, আর তামাসা করে ভয় দেখাচ্ছেন। আমি কিন্তু ভিতু মেয়ে নই, অঞ্জলিদি।

মণিমাসিকে বড়ি ফেরার তাড়া দেবার জন্য পাশের ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই শুনতে পেয়েছিল শুক্তি, অঞ্জলিদির মা কথা বলছেন—আমার ওই একুশ বয়সের বিধবা মেয়েকে ডাইনি বলে গালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন মেয়ের শাশুড়ি, শিক্ষিতা এম-এ পাস করা শাশুড়ি। একেবারে শূন্য হয়ে এক-কাপড়ে আমার কাছেই ফিরে এল মেয়ে। মেয়েটা ওর স্বামীর একটা ফটোও সঙ্গে আনতে পারেনি, মেয়ের হাত থেকে ফটোটাকে কেড়ে নিয়েছিল ওর শাশুড়ি।

কিন্তু শুক্তির ওই মুগ্ধ চোখের করুণ আবেদন ব্যর্থ হয়নি। শুক্তির অনুরোধের জের রক্ষা করতে গিয়ে অঞ্জলি অনেকবার এই বাড়িতে, রবার বাগানের এই ভারতীতে এসেছে, বসেছে, হেসেছে।

কিন্তু শুক্তির সঙ্গে দু-চারটে কথা বলাবলি করে, আর পাঁচ মিনিটও পার না হতেই চলে গিয়েছে।

অঞ্জলির সঙ্গে অঞ্জলির ভাই অনিমেষও এ বাড়িতে এসেছে। ঘরের ভিতরে বসে শুক্তির সঙ্গে কথা বলতে অঞ্জলির যেটুকু সময় লাগত, সেটুকু সময়ে বাইরের বারান্দার এদিকে-ওদিকে আস্তে আস্তে হাঁটাহাঁটি করেই পার করে দিত অনিমেষ। বার বার বলে অঞ্জলিকে ধরে রাখতে না পেরে শুক্তি এক-একদিন অনিমেষের দিকে তাকিয়ে, আর বেশ একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ফেলত—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চললেন, এটা কিন্তু একটু ভাল দেখাচ্ছে না।

অনিমেষ হাসে।—আমার তো ইচ্ছে, আরও কিছুক্ষণ থাকি। কিন্তু...।

হেসে হেসে এত মনখোলা ভাষায় একটা কথা বলে দিয়েও অনিমেষ যেন আরও একটা কথাকে মনচাপা দিয়ে রেখে দিল।

একদিন মণিমাসি আর অঞ্জলির সামনেই অনিমেষ ছেলেটা কত সহজে ওর মনচাপা কথাটাকে স্পষ্ট করে বলে দিয়ে হেসে উঠল—আমি একা এলে নিশ্চয় আরও কিছুক্ষণ থাকতাম।

শুক্তিও হাসে।—তা...এলেই পাবেন. কে বারণ করছে।

সেবার শুক্তির কলকাতা চলে যাবার আগে হঠাৎ একদিন একাই এসেছিল অনিমেষ। মণিমাসির সঙ্গে শুধু একটি কথা—কেমন আছেন? শুক্তির সঙ্গেও শুধু একটা কথা—কলেজ খুলছে কবে? এ ছাড়া আর কোনও কথা বলেনি অনিমেষ। শুধু শুক্তির মেসো মহিমবাবুর সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে প্রায় আধঘন্টা ধরে অনেক কথা আলাপ করে চলে গেল অনিমেষ।

কিন্তু কলকাতা রওনা হবার আগের দিনে শুক্তি কি ওর বিস্ময়ের সে অঞ্জলিদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে যায়নি? গিয়েছিল। সেখানে অঞ্জলি ছাড়া কি আর কারও সঙ্গে কথা বলেনি শুক্তি? বলেছিল। সোম লজের বারান্দাতে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে সে সন্ধ্যায় শুধু কি ব্রহ্মপুত্রের জলের শব্দ শুনে চলে এসেছিল শুক্তি? আর কারও কথা শোনেনি? শুনেছিল।

মণিমাসিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ফিরতে এত দেরি কেন হল রে শুক্তি?

শুক্তি—অনিমেষবাবুর জন্যে।

মণিমাসি—কেন? তার মানে?

শুক্তি হাসে। —অনিমেষবাবুর গল্প বলা আর ফুরোতে চায় না।

—কিসের গল্প?

—যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প।

—পরলোকের গল্প?

—না না। যত সব ইহলোকের গল্প।

—তার মানে?

—এই তেজপুরের যত পাহাড় বন নদী আর মন্দিরের গল্প। এটাই নাকি শোণিতপুর, বাণরাজার রাজধানী।

—অনিমেষ তো ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। ওর মনে আবার এসব গল্পের মায়া কেন?

—আমিও অনিমেষবাবুকে এই কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

—কী শুনিয়েছিস?

—বলেছি, আপনি ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে একজন বেদব্যাস হলেই পারতেন।

সেবার, সেদিনের শুক্তির মুখের কথা শুনে মণিমাসি হেসেছিলেন। কিন্তু তারপর আর ঠিক ওভাবে হাসতে পারেননি, বরং একটু গম্ভীর হয়ে ভেবেছিলেন।

কলেজের ছুটির পর আবার কলকাতা থেকে যেদিন তেজপুরে ফিরে এল শুক্তি, সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনিমেষকে এবাড়ির বারান্দার একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখে একটু চমকে উঠেছিলেন মণিমাসি।

অনিমেষের হাসিমুখের একটা খুশিভরা কথা শুনে আরও একটু চিন্তিত হন মণিমাসি। অনিমেষ বলে—আমিও আজ শিলিগুড়ি থেকে ফিরেছি।

মণিমাসি—খুব ভাল; তোমাকে দেখে খুব খুশী হলাম। চা খাবে নিশ্চয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শুক্তি কোথায় যেন গিয়েছে, বোধ হয় কোলিবাড়িতে ওর বান্ধবীর সঙ্গে একবার দেখা...।

—হ্যাঁ, আপনাদের বেয়ারা বলেছে, দিদি এখন বাড়িতে নেই।

শুক্তির বাড়ি ফিরতে আর কত দেরি হবে, কে জানে? চা খাওয়া হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ বসে রইল অনিমেষ। তারপর চলে গেল।

দেখতে ভুল হয়নি মণিমাসির, অনিমেষ এসেছিল শুনেই কেমন যেন আনমনার মত চোখ করে দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল শুক্তি। রাত আটটার শব্দ বাজিয়ে দিয়ে ঘড়ির বড় কাঁটা নামতে শুরু করেছে—টিক্ টিক্! টিক্ টিক্! মেয়েটাও যেন ওর বুকের ভিতরের একটা শব্দকে শুনছে আর শুনছে।

শুক্তিকে নিয়ে যাবার জন্য চা-বাগানের গাড়ি এল যেদিন, সেদিনও আবার এসেছিল অনিমেষ। মণিমাসি শুনতে পেয়েছিলেন, বাইরের ঘরে অনিমেষের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে শুক্তি—আমি সেদিন বাড়িতে ছিলাম না বলে আপনি কিছু মনে করেননি তো?

—না, না, মনে করবার কী আছে? আমি তো জানতামই যে, আপনি বাড়িতে নেই; তবু ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তা ছাড়া, তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

—তাই বলুন। বলতে গিয়ে শুক্তির গলার স্বরটা যেন একটা হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

না, সেদিন আর নেই, যেদিন মণিমাসির ধারণা হয়েছিল যে, শুক্তি শুধু ওর বিস্ময়ের এক অঞ্জলিদিকে দেখবার জন্য গণেশঘাটের সোম লজে যায়। শুক্তির কলকাতার কলেজের যখন ছুটি শুরু হয়, ঠিক তখনই শিলিগুড়ি থেকে রেলের ইঞ্জিনিয়ার অনিমেশও ছুটি নিয়ে তেজপুরে চলে আসে, এটাও কি দুটো ছাড়া-ছাড়া হঠাৎ ঘটনার মিল? নয় বোধ হয়। মণিমাসি অনেকবার ভেবেছেন, এখনই চিঠি দিয়ে কিরণদিকে স্পষ্ট করে কিছু বলা উচিত হবে কিনা?

৫

—কান্ছা। ডাক দিলেন সোম লজের অঞ্জলি।

সোম লজের বাচ্চা নেপালি চাকর ঃ কথাটা না শুনে শুধু ডাক শুনেই কাজ করতে ছুটে যাওয়া ওর অভ্যাস। ছুটতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাওয়া, আর মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়াও ওর অভ্যাস। দিগ্বিদিক বুঝবার কোনও ধার ধারে না কান্ছা।

এহেন এক কান্ছা ছুটে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকে, আর জলভরা একটা কাচের গেলাসকে টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে অঞ্জলির ঘড়িটারই উপর ধপ করে বসিয়ে দেয়।

গেলাসটা ঝনঝন করে দশ টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। গুঁড়ো হয়ে যায় অঞ্জলির ঘড়ির কাচ।

চমকে ওঠে শুক্তি।—এ কী!

কিন্তু অঞ্জলি হাসেন।—আমি তো জল চাইনি, কান্ছা। চাইছিলাম...থাক, তুমি যাও।

শুক্তি আশ্চর্য হয়; এমন একটা কাণ্ড দেখেও অঞ্জলিদি একটুও রাগ করতে পারলেন না। অঞ্জলিদির প্রাণটা কি রাগ করতেই ভুলে গিয়েছে?—সত্যি অঞ্জলিদি, আপনি কারও ওপর একটুও রাগ করতে পারেন না কেন, বলুন তো?

অঞ্জলি—পারি; শুধু একজনের ওপর। সে ছাড়া আর কারও ওপর আমার রাগ নেই।

শুক্তি—জিজ্ঞেস করলে বলবেন কি, কে সে?

অঞ্জলি—সে হল সে, যার সঙ্গে উনিশ বছর আগে শেষ দেখা হয়েছিল।

শুনে খুশি হয় না শুক্তি। এটা আবার কী এমন নতুন কথা বলছেন অঞ্জলিদি। অঞ্জলিদির মা'র মুখ থেকে মণিমাসি তো কবেই শুনেছেন, উনিশ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন অঞ্জলিদি, তার এক বছর পরেই সায়েন্সের এক ডক্টরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। খুব ভালমানুষ ছিলেন সেই ডক্টর বিনয় সেন। অঞ্জলিদিকে ফরগেট-মি-নট বলে ডাকতেন।

অঞ্জলি বলেন—অনু আমার চেয়ে বারো বছরের ছোট। সেদিন আমার সেই ছোট্ট ভাই অনুও আমাকে কাঁদতে দেখে কেঁদে ফেলেছিল—আমার যে বিনয়দার ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছে, দিদি।

শুক্তির মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। শুনতে ভাল লাগে না এসব কথা। কিন্তু অঞ্জলিদির মুখের হাসিটা যেন লালচে হয়ে কাঁপছে। বুঝতেও পারা যায় না, কোন দিকে তাকিয়ে কী দেখছেন।

আবার, কথাও বলছেন অঞ্জলিদি। —দেখা তো হবেই একদিন। তখন জিজ্ঞেস করব, ফরগেট-মি-নট মানে কি ডাইনি?

একটা শনশনে হাওয়া জানালার পর্দা কাঁপিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকছে। অঞ্জলিদির সাবানঘষা মাথার চুল এলোমেলো হয়ে ফুরফুর করে উড়ছে।

অঞ্জলিদি!—ডাকতে গিয়ে শুক্তির গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

অঞ্জলি হাসেন। —হ্যাঁ শুক্তি; আমার গল্প শুনতে নেই। বরং...।

বরং, অনুর গল্প শুনে বাড়ি চলে যাও, এই তো বলতে চাইছেন অঞ্জলিদি। কিন্তু অনিমেষবাবুর গল্পের কাছেও যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারা যায় না। বেশ ভয় ভয় করে। তা ছাড়া, নতুন করে আর কী-ই বা বলবেন অনিমেষবাবু? সেই তো যত সব...এই তেজপুরের গল্প।

তেজপুরই বা কেমনতর একটা জায়গা? বাণ রাজার মেয়ে উষা এখানে স্নান করতেন, ওখানে ফুল তুলতেন, সেখানে বসে থাকতেন। আর, অনিরুদ্ধ এসে উষার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, ওখানে ছুটে যেতেন, সেখানে বসে ছটফট করতেন। না, ওসব গল্পের ঘাট পাহাড় আর কুঞ্জবন, পাথর মূর্তি আর ভাঙা মন্দির দেখবার জন্যে শুক্তির প্রাণে কোনও সাধ নেই।

না, অবজারভেটরি হিলের মাথায় দাঁড়িয়ে নেফা-পাহাড়ের উত্তুরে স্নো-লাইনের ছবি দেখতেও ইচ্ছে করে না। ব্রহ্মপুত্রের চরের শরবন আর ধানক্ষেতের উপর বিকেলের রোদের খেলা দেখবারও ইচ্ছে নেই। অনিমেষবাবু নিজে একাই গিয়ে ওসব মায়াময় শোভা দু-চোখ ভরে দেখে আসুন না কেন?

সোম লজের বারান্দাটা সাঁচির রেলিং ডিজাইনের গ্রিল দিয়ে ঘেরা; তার উপর চকচকে সোনা-রঙের পেন্টের প্রলেপ। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, যেন একটা সোনার খাঁচা হাসছে। অঞ্জলিদির ঘর থেকে বের হলেই এই বারান্দা চোখে পড়ে; একটু চমকে উঠতে হয়; একটু থমকে দাঁড়াতেও হয়। কতবার মনে হয়েছে, দম বন্ধ করে, আর, একটা দৌড় দিয়ে বারান্দাটা পার হয়ে গেলেই তো ভাল। কোথাও না থেমে, একেবারে সোজা হেঁটে গিয়ে আর গাড়ির ভিতরে ঢুকে বলে ফেললেই তো হয়—চলো রাজাবাহাদুর। শিগগির চলো।

কিন্তু এ কী অদ্ভুত বিপদ। ইচ্ছে করলেও ওভাবে চলে যাওয়া যায় না। বারান্দার একটা চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন অনিমেষবাবু। যেন শুক্তির পায়ের শব্দ শোনবার জন্য একটা অপেক্ষার ধ্যান দাঁড়িয়ে আছে। কোনওদিনও কি একটুও ভুল হল অনিমেষবাবুর? না, কোনওদিনও না। বৃষ্টির ঝাপটায় বারান্দা ভিজে গেলেও যেমন, আর ফুটফুটে চাঁদের আলো বারান্দায় গড়িয়ে পড়লেও তেমন, ভদ্রলোক ঠিক ওখানে চেয়ারে কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

এরকম করে যদি ইচ্ছে করে একটা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন অনিমেষবাবু, তবে দেখুন না কেন। কিন্তু তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য শুক্তিকে আটক করে থামিয়ে রাখার কী দরকার?

কে জানে, আজ আবার কিসের গল্প বলবার জন্য তৈরি হয়েছে অনিমেষবাবু। না, আজ আর সময় নেই। গল্প শোনা সম্ভব হবে না। দু মিনিটের জন্য হলেও না। না, আর কিছু শোনবার দরকার নেই।

এগিয়ে যায় শুক্তি, বারান্দায় উঠেও থামে না। হেঁটে যেতে যেতে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে শুধু ছোট্ট একটি কথা বলে নেয়—চলি আজ।

অনিমেষ—যাচ্ছেন? আচ্ছা আসুন।

থমকে দাঁড়ায় শুক্তি। হেসে হেসে কথা বলছে অনিমেষ, কিন্তু গলার স্বরে যেন একটা করুণ আপত্তির মৃদু গুঞ্জন। কত শান্ত আর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুক্তিরই দিকে তাকিয়ে আছে অনিমেষ।

অনিমেষের দিকে না তাকিয়ে, শুধু দূরের সড়কের একটা গাড়ির হেড লাইটের ছুটন্ত আলোর ছটার দিকে তাকিয়ে কথা বলে শুক্তি—মনে হচ্ছে, আপনি যেন কেমন একটা রাগ করে কথাটা বললেন।

অনিমেষ—হ্যাঁ।

শুক্তির চোখের পাতা শিউরে ওঠে। বুকের ভিতরে শব্দ হয়। রুমাল তুলে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে হাতটাও কাঁপে।

ভয় করছে? হ্যাঁ, অনেক বছর আগে ঠিক এইরকম একটা ভয় পেয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল শুক্তির। শিলংয়ের সেই ঝর্নার শব্দের প্রতিধ্বনিটা পাইনবনের বাতাসে একবার করুণ হয়ে মিলিয়ে আর ফুরিয়ে যায়; আবার হঠাৎ গুমরে ওঠে। শুনতে ভয় করে বইকি।

কথা বলে না শুক্তি। কিন্তু অনিমেষ বলে—আপনি আমার একটাও অনুরোধের কথা শুনলেন না।

শুক্তি হাসতে চেষ্টা করে। —তাতে কী হয়েছে?

অনিমেষ—কিছু হয়েছে বইকি।

শুক্তি—কী যে বলেন! ভৈরবী পাহাড়ের গুলঞ্চ পিয়াল আর নাগকেশরের ছায়াতে বসে পাখির ডাক না শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?

উত্তর দেয় না অনিমেষ। কিন্তু অনিমেষের চোখ দুটো তেমনই খুশি হয়ে শুক্তির মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

হেসে ফেলে শুক্তি। —এই তো, এখানে আপনার কাছেই দাঁড়িয়ে গল্প করছি। বাইরে গিয়ে গল্প না করলেও চলে।

অনিমেষ—বাগানে যাচ্ছেন কবে? দিন ঠিক করেছেন?

শুক্তি—না। আচ্ছা, চলি এবার।

এইবার সত্যিই প্রায় একটা দৌড় দিয়ে ছুটে চলে যায় শুক্তি। রাজাবাহাদুরও গাড়ি স্টার্ট করতে দেরি করে না। স্টেশন ক্লাবের পাশের সড়কের অন্ধকারের কাছে গাড়িটা পৌঁছে যেতেই হাঁপ ছাড়ে শুক্তি।

অদ্ভুত মানুষ এই অনিমেষবাবু। কী মনে করেন ভদ্রলোক, তেজপুর কি সত্যিই একটা রূপকথার জগৎ? মনে কিংবা মুখের ভাষাতে কোনও লজ্জা না রখে ভদ্রলোক একদিন কত স্পষ্ট করে সত্যি বলেই দিলেন, হ্যাঁ তাই। একবার জিজ্ঞেস করলে হত, শুক্তি বসু যদি তেজপুরে আর না আসে, তবুও কি আপনি এই তেজপুরকে একটা রূপকথার জগৎ বলে মনে করতে পারবেন?

একটুও ভাবলেন না, একটু বুঝেও দেখলেন না অনিমেষবাবু; আবার একদিন কত স্পষ্ট করে একটা ভয়ানক কথা বলেই ফেললেন—আপনি তো এখনও কিছু বলছেন না।

সেদিন চুপ না করে থেকে বলে দিলেই হত—বিশ্বাস করুন, এখানে এই বারান্দার আলোর কাছে দাঁড়িয়ে আপনার গল্প শুনতে ইচ্ছে করে, ভালও লাগে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না, বলতে পারি না। আপনি জিজ্ঞেসও করবেন না।

—নামুন দিদি, বাড়ি তো পৌঁছে গিয়েছি। রাজাবাহাদুর ডাক দিল বলেই চমকে ওঠে শুক্তি, চোখ মেলে তাকায়। গাড়ি থেকে নেমে যায়।

মণিমাসি বলেন—বাড়ি ফিরতে এত দেরি করলি কেন?

শুক্তি—বাগানের গাড়ি কবে আসবে আমাকে নিতে?

মণিমাসি—আসছে সোমবারে আসবে।

শুক্তি—তার মানে আরও সাতদিন পরে।

—হ্যাঁ।

—না মণিমাসি। তোমার গাড়িতেই আমাকে বাগানে পাঠিয়ে দাও।

—দেব।

—কালই সকালে।

—না, কখ্খনও না। আমাকে রাগাবি না। সাবধান।

—রেগো না মণিমাসি, আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে কালই সকালে যেতে হবে।

—কেন?

—দরকার আছে, তুমি বিশ্বাস করো।

—বেশ।

—একটা কথা। সোম লজের কেউ যদি আসেন, অঞ্জলিদি কিংবা অনিমেষবাবু, তবে বলে দিও, আমাকে হঠাৎ দরকারে চলে যেতে হল, যেন কিছু না মনে করেন।

—তাই বলব। কথাটা বলেই গম্ভীর হয়ে যান মণিমাসি।

ভাবতে ভাল লাগে না মণিমাসির; বোধ হয় একটা সন্দেহও করছেন যে, শুক্তি যেন নিজেরই ইচ্ছেটার হাত থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যেতে চাইছে। কিন্তু কী দরকাব? অনিমেষ তো খুবই ভাল ছেলে।

দুঃখ করে একটা কথা বলেছিলেন কিরণদি, মেয়েটা যেন পাখির স্বভাব পেয়েছে। হঠাৎ শিকলি কেটে পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস। আজ কলকাতা, কাল তেজপুর, পরশু চা-বাগান; এই করে করে মেয়েটা এরকমের একটা উড়ো-উড়ো ছটফটানির মন পেয়েছে, কিন্তু মানুষের জীবনে তো পাখির স্বভাব খাটে না।

চেয়ারটার উপর একটা ক্লান্ত-শ্রান্ত চেহারা নিয়ে চুপ করে বসে আছে শুক্তি। ওর চোখ দেখে মনে হয়, দেয়াল-ঘড়ির টিক টিক শব্দের টোকাগুলিকে মনে মনে শুনছে।

না, না, শিকলি-কাটা মন নয়। যা কল্পনা করছে মণিমাসি, তাই বোধ হয় ভাবছে শুক্তি। একটু স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে আরও নিশ্চিন্ত হবেন মণিমাসি। তাই জিজ্ঞেস করেন—কিন্তু তুই কি ওদের কারও ওপরে রাগ করে...।

হেসে ফেলে শুক্তি।—কী যে আবোল-তাবোল সন্দেহ করছ মণিমাসি! কোনও মানুষ কখনও অঞ্জলিদির মত মানুষের ওপর রাগ করতে পারে না।

মণিমাসি—আমি বলছি, হয়ত অনিমেষের ওপর রাগ করে...।

হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শুক্তি।—অনিমেষবাবুর মত মানুষের ওপর আমি রাগ করব। কখ্খনও না।

মণিমাসি ব্যস্ত হয়ে হাঁক-ডাক করেন—ও কালোর মা, শুক্তিকে খেতে দিতে আর দেরি করো না।

৬

নেফার পাহাড়ের ওই মেঘ যেন ঘন-ঘোর এক খেয়ালের প্রহেলিকা। মতিগতির কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। গলে গিয়ে ক্ষয় হতে হতে উপরে উঠতে থাকে; আবার কখনও বা নীচে নেমে যায়। হঠাৎ আবার বিনা ঝড়েই পাহাড়ের গা থেকে যেন আল্‌গা হয়ে খসে পড়ে আর এদিকের আকাশে ভেসে আসে। সমতলের ধানক্ষেতের বুকের উপর কালোছায়া ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাবার সময় কদমবাড়ি চা-বাগানের উপর এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়। গগন বসু আজ এই কদমবাড়ি চা-বাগানের বারো-আনা মালিক।

বয়সটা সত্তর না হোক, পঁয়ষট্টি বছরের কম হবে না। কিন্তু গায়ে চকোলেট রঙের সিল্কের গেঞ্জি, পরনে সাদা জিনের হ্রস্ব হাফ-প্যান্ট, পায়ে ছোট মোজা, এক হাতের ফেল্টের হ্যাট, আর এক হাতে তামাকের পাইপ; গগন বসুকে তাই চিনে নিতে কারও অসুবিধে নেই যে, উনি একজন প্ল্যান্টার সাহেব।

গগন বসুর স্ত্রী, প্রায় ষাট বছর বয়সের কিরণলেখাকে দেখলে মনে হতে পারে, উনি একজন শাড়িপরা মেমসাহেব, এমনই ধবধবে ফরসা ওঁর গায়ের রঙ। আজকাল আর দেখা যায় না, আগে প্রায়ই দেখা যেত, মাসের মধ্যে অন্তত একবার, তেজপুরের সড়ক ধরে ছুটে চলে যাচ্ছে ঝকঝকে চেহারার একটি মোটরগাড়ি; গাড়িতে প্ল্যান্টারসাহেব গগন বসুর গা-ঘেঁসে বসে একটা চণ্ড বলিষ্ঠ চেহারার বুলডগ মুখ বাড়িয়ে রয়েছে, আর পথের যত মানুষের ভিড়কে ধমক দিয়ে দিয়ে দুরন্ত এক রাগের ডাক ডেকে চলে যাচ্ছে। গগন বসুর স্ত্রীও সেই গাড়িতে বসে আছেন; নতুন প্যাকেট ছিঁড়ে বিস্কুট বের করে বুলডগের মুখের কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন।

পঁচিশ বছর আগে, মধ্যপ্রদেশের এক দেশি রাজার ট্রেজারির চাকরি ছেড়ে দিয়ে গগন বসু যেদিন এখানে এসে কদমবাড়ি চা-বাগানের এই সুন্দর সাহেবকুঠির লনের উপর একটি চেয়ার পেতে আর শক্ত হয়ে বসেছিলেন, সেদিন তিনি ছিলেন এই চা-বাগানের চার-আনা মালিক। ওই চার-আনা স্বত্ব গগন বসুর বাবা কান্তি বসুর উইলের দান। একমাত্র ছেলেকে তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু দিয়ে যেতে পারেননি। শেষ বয়সে কান্তি বসু আর এদেশে ছিলেন না। তিনি লন্ডনেই ছিলেন, আর, ত্রিশ বছর আগে সেখানেই মারা গিয়েছেন। গগন বসুর বিদেশিনী সৎ-মা রেবেকা বসুও আজ প্রায় বিশ বছর হল লণ্ডনে মারা গিয়েছেন।

সেই কঠিন মামলাতে শেষ পর্যন্ত গগন বসু জয়ী হয়েছিলেন। রেবেকা বসুর ছয়-আনা স্বত্ব গগন বসুরই স্বত্ব হয়ে গেল। রেবেকা বসুর দুই ভাইপো, দুই পিটার্স ভ্রাতা, আর্নল্ড আর আর্থারের দাবি সে মামলায় মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল। দুই-আনা স্বত্বের মরিসও দশ বছর আগে হঠাৎ একদিন লন্ডন থেকে এসে, আর, গগন বসুর কাছে স্বত্ব বিক্রি করে দিয়ে চলে গেলেন।

বারো-আনা মালিক গগন বসু আজও এখনও পুরনো অভ্যাসের নিয়মে কদমবাড়ি চা-বাগানের তার-কাঁটার বেড়ার ওদিকে, উঁচু টিলার উপর এই সাহেবকুঠির বারান্দায় এসে লাভের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করেন। আর, ম্যানেজার, ডাক্তার, এমন কি বাগানবাবুও গগন বসুর চোখের সামনে চেয়ারগুলিতে বসে থাকেন।

আজকের এই গগন বসু নিশ্চয় দশ বছর আগের সেই গগন বসু নন। তা না হলে, বাগানবাবু কোন ছার, ম্যানেজারও কি গগন বসুর চোখের সামনে চেয়ারের উপর বসতে পারতেন, বসবার সাহস পেতেন?

যে গগন বসু একদিন তেজপুর বাজারে গিয়ে অনেক খোঁজ করেও তাঁর কুকুরের জামার জন্য পছন্দসই ফ্লানেল না পেয়ে দোকানের লোকগুলিকে কুকুরের চেয়েও অধম জীব বলে মনে করেছিলেন, আজকের এই গগন বসু ঠিক সেই গগন বসু নন।

যে গগন বসু একদিন চা-বাগানের মেশিন ঘরের সামনে মজুর আর কামিনদের একটা হল্লার শব্দ শুনে গুলিভরা বন্দুক হাতে তুলেছিলেন, সেই ভয়ানক কড়া মেজাজের গগন বসু আজ বেশ শান্ত হয়ে বসে শুনতে পারেন, শুনেও বেশ শান্ত হয়ে দেখতে পারেন, অফিস-ঘরের দরজা আটক করে আর হল্লা করে কেরানিবাবুকে শাসাচ্ছে আর ভয় দেখাচ্ছে মদে মাতাল একদল মজুর।

এই যে, দুলাল দত্ত নামে একজন মানুষ, গগন বসুরই এক কুটুম্বজন, যাঁর বয়স তাঁর চেয়ে চার বছরের ছোট, আজ এখন চেঁচিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে গদি-আঁটা চেয়ারের উপর পা তুলে দিয়ে বসলেন, তাঁর সঙ্গে দশ বছর আগে কখনও হেসে হেসে কথা বলেছেন গগন বসু? কখনও না। দুলাল দত্তকে চোখে পড়তেই কিরণলেখাকে ডাক দিয়ে, আর দুই চোখে দুটি কঠিন অপ্রসন্নতার ভ্রূকুটি নিয়ে আদেশ করতেন গগন বসু—তোমার ওই বিচিত্র মেজদাটিকে ওদিকে থাকতে বলো; আমার কাছে যেন আসে না।

আজ আর সেদিনের মত পাইপ দাঁতে চেপে, একটা শক্ত তৃপ্ত আর উদাত্ত অত্মশ্লাঘা হয়ে কিরণলেখার কাছে সে কথা বলেন না, বলতে পারেনও না গগন বসু, যে কথা আট বছর আগেও একবার বলেছিলেন। —এই দুলাল দত্ত লোকটার জীবনের সবই যেন ষোল-আনা ব্যর্থতা, আমার জীবনের সবই তেমনই, অন্তত বারো-আনা তো সফলতা। বাগানের আর চার-আনা স্বত্ব ছেড়ে দিতে জনসনকে রাজি করাতে বড় জোর আর একটা বছর লাগবে।

আজ বরং দুলাল দত্তের মুখের ওই হো-হো হাসির সামনে গগন বসুব মুখেব হাসিটা বেশ একটু করুণ হয়ে চুপসে যায়। কারণ, জানা আছে গগন বসুর, সব কথার আগে যে কথাটা চেঁচিয়ে বলবেন এই লোকটি; বয়সে কিরণলেখার চেয়ে মাত্র সাড়ে সাত মাস বড়, কিরণলেখারই জেঠতুতো দাদা, মেজদা, এই দুলাল দত্ত। অঞ্জনার খবর কী? অর্চনা কেমন আছে?

অঞ্জনা আর অর্চনা, গগন বসুর বড় মেয়ে আর মেজ মেয়ে, দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দশ বছর আগে অঞ্জনার, আট বছর আগে অর্চনার। অঞ্জনা আর অর্চনা, দুই মেয়ের একজনও আর বোধ হয় এই কদমবাড়িতে বাপ-মায়ের কাছে মুখ দেখাতে আসবে না; সাংঘাতিক অভিমানে আহত দুটি মুখ। ছয় বছর আগে দুই মেয়ের হাতের লেখা সেই চিঠি দুটো শেষ চিঠি হয়ে গগনবাবুর টেবিলের দেরাজের ভিতরে পড়ে আছে। কিন্তু দেরাজটা কাঠের তৈরি না হয়ে পাঁজরের তৈরি হলে এতদিনে বোধ হয় গুঁড়ো হয়ে যেত। অঞ্জনার চিঠি আর অর্চনার চিঠি, দুই চিঠিরই ভাষা প্রায় একরকমের—ভালই তো আছি। ভালই থাকব। বলতে পারি না, কদমবাড়ি কবে যাব।

ঘর-বর সবই নিজে পছন্দ করেছিলেন গগন বসু। নিজে খোঁজ নিয়ে সব জেনে নিয়েছিলেন। নিজে গিয়ে সবই চোখে দেখেছিলেন। যেমন দিল্লির সুকমল তেমনই নাগপুরের প্রভাত; দুই ছেলের রূপ-গুণের মধ্যে তিনি তাঁর আশার দুটি আইডিয়াল ছেলের জীবনের পরিচয় পেয়েছিলেন। যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, ভাল সার্ভিসে আছে, বিদ্যা আছে; আর কী চাই? কালচার ভাল, স্টেটাস ভাল, প্রেস্টিজ ভাল; এমন দুই ফ্যামিলির দুই ছেলে। খুশি হয়ে দুই মেয়ের বিয়ে দিলেন গগন বসু। দিল্লির ডাক্তার সুকমলের সঙ্গে অঞ্জনার; নাগপুরের মিল ম্যানেজার প্রভাতের সঙ্গে অর্চনার।

কিন্তু অঞ্জনা এখন মিরাটের এক মেয়ে-স্কুলের টিচার, পঁচাশি টাকা মাইনে পায়। মেয়ে-স্কুলের হোস্টেলে থাকে অঞ্জনা। আর, অঞ্জনার স্বামী সুকমল থাকে দিল্লীতেই; একটি ফিরিঙ্গি নার্স মেয়ে এখন তার ঘরোয়া জীবনের বে-আইনি সঙ্গিনী।

অর্চনা তার স্বামীর ঘরেই আছে; মাতাল মিল-ম্যানেজার প্রভাতের হাতের চাবুকের একটা মারের দাগ কপালে নিয়েও অর্চনা বেঁচে আছে। ম্যানেজার ব্যানার্জিকে নাগপুরে একবার পাঠিয়েছিলেন গগন বসু। দেখে এসেছে ব্যানার্জি, ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে একটা ছেঁড়া তোয়ালে সেলাই করছে অর্চনা। চোখের কোণে কালি, ঘুম হয় না মেয়েটার। হাত দুটো শুকনো রোগা কাঠ-কাঠ, রগ দেখা যায়। অর্চনা হেসেছে। —বাবাকে বলবেন, ভালই আছি।

একদিন মাঝরাতে হঠাৎ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে, আর মাথাটাকে দু'হাত দিয়ে যেন শক্ত করে খিমচে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন গগন বসু—আমি কী তা হলে একটা অপয়া, একটা জঘন্য আহাম্মক? দুলাল দত্তের চেয়ে দশগুণ আনফরচুনেট জীব? শুনছ কিরণ, কি বলছি আমি?

কিরণলেখা শুধু কেঁদেছিলেন; কোনও জবাব দিতে পারেননি।

চোখ-মুখ আর মাথা ধুয়ে, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়ে, খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন, গগন বসু, যেন নিদারুণ এক ক্লান্ত মানুষের নিঃশ্বাস। —শুক্তির বিয়ের জন্য আমাকে কিন্তু চেষ্টা করতে বলবে না কিরণ, কখনও না, সাবধান। আমি পারব না। আমি মানুষ চিনতে জানি না।

—কবে এলেন। কখন এলেন দুলাল মামা? হেসে চেঁচিয়ে আর লাফিয়ে লাফিয়ে হেঁটে আসে শুক্তি। ধড়াস করে একটা চেয়ারকে কাছে টেনে নিয়ে বসে পড়ে। তখুনি আবার চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে—আমার চা এখানে পাঠিয়ে দাও, মা। আমি এখন দুলাল মামার গল্প শুনব।

গগনবাবুও হাসেন। —বলুন স্যার মেজদা; এবার আপনার রাজ্যি থেকে কী রত্ন নিয়ে এলেন।

দুলাল দত্ত তাঁর সাদা মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে হাসতে থাকেন। —এনেছি একটা ধনেশ।

—কই কই? চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি।

কিরণলেখা আসেন। চায়ের কাপ শুক্তির হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েই বলেন—লাফাসনি শুক্তি। একটু শান্ত হয়ে বস। গল্প শোন।

আজই এসেছেন দুলাল মামা; কাল চলে যাবেন। এইরকমই তাঁর আসা-যাওয়ার রীতি। যখন আসেন, তখন তাঁর জীবন ও জীবিকার জংলি রঙ্গভূমি ওই নেফা রাজ্যের একটা-না-একটা প্রাণের নমুনা সঙ্গে নিয়ে আসেন। আজ নিয়ে এসেছেন, একটা ধনেশ পাখি। এর আগে একবার এনেছিলেন একটা সাদা ময়ূরের বাচ্চা। একবার একটা রঙিন বনবিড়াল। আর কত কী এনেছেন, তার হিসাব তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন।

কিন্তু এবাড়ির সকলেরই জানা আছে, কাল যখন আবার তাঁর নিজের রাজ্যে রওনা হবেন দুলাল দত্ত, তখন ধনেশ পাখিটাকে সঙ্গে নিয়েই চলে যাবেন। সাদা ময়ূরের বাচ্চা, রঙিন বনবিড়াল, আর পোকা-মাকড় যা-কিছু সঙ্গে এনেছিলেন, সবই আবার সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছেন। কিছুই রেখে যাননি। কিরণলেখা জানেন, তাঁর এই মেজদার মাথায় একটু ছিট আছে।

বিয়ে করেননি দুলাল দত্ত। তিনি একা মানুষ। সেই কবে, ত্রিশ বছর আগে, দুলাল দত্তের বয়স যখন ত্রিশ কিংবা একত্রিশ, তখন দেশের বাড়ি বেচে দিয়ে আর আশি হাজার টাকা নিয়ে কাঠের কারবার শুরু করেছিলেন। নেফার জঙ্গলের লিজ নিয়ে বছরের পর বছর কত ছুটোছুটি আর হাঁটাহাঁটি করলেন। কত বার দেঁতো শুয়োরের চোখের সামনে পড়লেন, রাগী হাতির ডাক শুনলেন, ভালুকের পাশ কাটিয়ে দৌড় দিলেন। তবু কোনও বিপদ হয়নি। কিন্তু তাঁর কারবার যেন মরীচিকার ছলনা হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল, শুধু রেখে গেল তাঁকে, ওই নেফারই জংলি মায়ার মধ্যে, সে মায়ার বন্ধন আজও তিনি ছাড়িয়ে উঠতে পারেননি। তিনি আজ চারদুয়ারের কাঠের গোলাদার আগরওয়ালার জঙ্গল সরকার। তার মানে আগরওয়ালার নিজের জঙ্গলের যে কূপে যখন গাছ কাটার কাজ হয়, তখন তিনি সেখানে যান; আর, কাটা গাছের ধড়গুলিকে গুনে নিয়ে চারদুয়ারের গোলাতে একটা হিসেব পাঠিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের পাওনার হিসেব, গাছ প্রতি চার আনা।

তাঁর পাওনার টাকা নেবার জন্যে বছরে দু'তিনবার চারদুয়ারে আসেন দুলাল দত্ত, তাই কদমবাড়ি চা-বাগানে তাঁর খুড়তুতো বোন কিরণের বাড়িতে এসে, বোধ হয় শুধু গল্প বলবার জন্যেই দুটো-একটা দিন থাকেন।

আরও একটা ছিট আছে দুলাল দত্তের মাথায়, কিংবা প্রাণে। ফিরে যাবার সময় একটা ঝুলি ভর্তি করে কেষ্টবিষ্টুর আর শিবের হরেক রকমের ছবি তেজপুর বাজার থেকে কিনে নিয়ে যান। টাকায় কুলোলে রবিবর্মার গঙ্গাবতরণ, হরধনুর্ভঙ্গ আর সীতার পাতালপ্রবেশও কিনে ফেলেন। কিরণলেখা জানেন, এসব ছবির বেশির ভাগই নেফার জঙ্গলের যত গাঁয়ের ঘরে বিলিয়ে দেন মেজদা।

ছবিগুলিকে যত্ন করে বাঁধা-ছাদা করবার সময় কিরণলেখাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে হেসে ফেলেন দুলাল দত্ত।—তোমার তো নিশ্চয় মনে আছে কিরণ, আমাদের জনাই-এর বাড়ির বাইরের ঘরে এরকমের আরও কত ছবি ছিল।

কারবারের জগতে যাঁরা হাঁটাহাঁটি করেন, বিশেষ করে যাঁরা স্লিপার আর তক্তা ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁরা জানেন, সেই আশি হাজার টাকায় দুলাল দত্ত আজকাল আশি টাকার মুখ একসঙ্গে দেখতে পান কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেজন্য দুলাল দত্তকে কখনও উদ্বিগ্ন হতে, একটু গম্ভীর হতে, কিংবা নেফার পাহাড়ের মেঘের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও দেখা যায় না।

শুক্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে গল্প করতে গিয়ে দুলাল মামা যে সব কথা বলেন, তার সরল অর্থ এই যে, ভূলোকে কোথাও যদি স্বর্গ থাকে তবে ওই ওখানে, যেখানে তিনি থাকেন, আকাদেব একটা গাঁয়ের কাছে আর জঙ্গলের পাশে তাঁর মাচানঘরটি যেখানে দাঁড়িযে আছে। —ওখানে থাকলে মেঘদূত তোর আর পড়বার দরকার হবে না শুক্তি, নিজেই একটা মেঘদূত লিখতে পারবি। একেবাবে কবিনী কালিদাসী হয়ে যাবি।

কিরণলেখার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা হাতে নিযে দুটি চুমুক দিয়ে দুলাল মামার গলার স্বরের উল্লাস আরও প্রবল হয়ে ওঠে। —তুমি বিশ্বাস করো কিরণ, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। জায়গাটা একেবারে কণ্বমুণির তপোবনেব মত। শুক্তিকে ওখানে ঠিক একটা শকুন্তলা বলে মনে হবে।

শুক্তি—কিন্তু গাছের বাকল-টাকল পবে ঘুরে বেড়াতে পাবব না।

—বাজে কথা বলিস না। ওসব কিছুই পরতে হবে না। আকা মেয়েগুলোও বাকল-টাকল পরে না। কিন্তু..

শুক্তি—কিন্তু কী?

—একটা আকা মেয়ে যখন বনসুমের ঘন ছায়ার মধ্যে বসে, আর একটা কাঠবেড়ালিকে কোলে নিয়ে আদর করে, তখন সত্যিই মনে হয়, যেন একটা শকুন্তলা মৃগশিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছে।

শুক্তি—আমার কিন্তু মৃগশিশু চাই; কাঠবেড়ালিকে আদর করতে পারব না।

—মৃগশিশু কেন? কপালে থাকলে হস্তিশিশু পেয়ে যাবে।

শুক্তি শিউরে ওঠে—ওরে বাবা!

—ওরে বাবা কববার কিছুই নেই। হাতির বাচ্চা দেখলেই গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করবার জন্য হাত সুড়সুড় করবে।

শুক্তি—আপনি নিজে কি কোনওদিন...।

—না। দূর থেকে দেখেছি, একটি হাতির বাচ্চা ওব ছোট্ট শুঁড় দিয়ে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে দুলছে। আবার, কচি বাঁশের কচি পাতা, তার মানে নবীর রেণু কিশলয় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন দুলাল মামা।—আরও কত কী দেখছি, বললে বিশ্বাস করবি না।

শুক্তি—আগে বলুন। শোনাবার পর বুঝব, বিশ্বাস করা যায় কিনা।

—সত্যি, কালিদাস যেমনটি লিখেছেন, ঠিক তেমনি কাণ্ড করে প্রেম করে জঙ্গলের হাতি

আর হাতিনী। উনি শুঁড়ে করে একটা ফুলেল লতা নিয়ে ওঁর গলার উপর ফেলে দিচ্ছেন। তিনি আবাব একগাদা শুকনো ধুলো শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাঁর গলায় মাখিয়ে দিচ্ছেন। নাই বা হল পদ্মরেণু, ধুলোর পাউডারই বা কম কিসে? তারপর শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি করে দুজনের সে কী পীরিতের খেলা।

গগন বসু অপ্রস্তুতের মত এদিকে ওদিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই সরে যান। কিরণলেখা তাঁর মুখের হাসিটাকে আঁচল দিয়ে চেপে ধরেন।—থামুন মেজদা।

দুলাল দত্ত—কেন? কী হল?

কিবণলেখা—আপনার মুখ খুললে ভয় করে।

দুলাল মামা—আশ্চর্য, সত্যি কথাকে তোমবা এত ভয় কর কেন?

শুক্তি চেঁচিয়ে ওঠে।—আমার ভয় করে না, দুলাল মামা। আপনি বলুন।

কিরণলেখা—চুপ কর শুক্তি।

কদমবাড়িতে এসে যখনই শুক্তিকে দেখতে পেয়েছেন দুলাল মামা, তখনই চেঁচিয়ে উঠেছেন—চল শুক্তি, আমার ওখানে গিয়ে অন্তত পাঁচটে দিন কাটিযে আয়। আজও তেমনই উৎফুল্লভাবে সাদা মাথাটাকে হেলিয়ে দুলিয়ে আর চেঁচিয়ে হেসে কথা বলেন দুলাল মামা।—চল একবার; তা হলেই বুঝবি, আমি সত্যি কথা বলছি কিনা।

শুক্তি হাসে।—সব মিথ্যে কথা।

—কেন? কেন? আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন দুলাল মামা।

শুক্তি—তিন বছর ধরে এই একই কথা বলেছেন, কিন্তু নিয়ে তো গেলেন না।

দুলাল মামা একবার তাঁর সাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে আর বেশ শান্ত-নবম স্বরে কথা বলেন—টাট্টু চড়তে পারবি তো? রূপা থেকে দু'দিনের ফুটমার্চ, চড়াই-উতরাই রাস্তা। তারপর আমার আশ্রম। ভেবে দেখ, যদি সাহস থাকে তো বল, কবে যাবি?

শুক্তি—আজই চলুন।

দুলাল মামা—আমার ওখানে কিন্তু রোজ চা পাবি না।

শুক্তি—মাঝে মাঝে পাব তো? তা হলেই হবে।

দুলাল মামা—কিন্তু বিনা চিনির চা।

শুক্তি—বেশ তো। কোনও অসুবিধে নেই।

—খাওয়ার মধ্যে শুধু ভাত আর কচুর ঝোল। নযত মকাইযেব ছাতু।

—খুব ভাল।

—খুব ঠাণ্ডা আছে কিন্তু।

—ঠাণ্ডা আমি খুব পছন্দ করি।

—কিন্তু জংলি হাতির ডাকও কি পছন্দ করিস?

—শুনতে পেলে নিশ্চয় পছন্দ করব।

—বেশ, তা হলে কথা রইল, আসছে বছর পুজোর ছুটিতে...

হেসে ফেলে শুক্তি। হেসে ফেলেন কিরণলেখা।

দুলাল দত্ত—তোমাদের এই জায়গাটি অবিশ্যি খুব খারাপ নয়, কিরণ। কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব সুবিধার নয়। ক্ষিদে হয় না, ঘুমও হয় না। নইলে দু-চারটে দিন থাকতাম।

কিরণলেখা—একবার সাতটা দিন থেকেই দেখুন না কেন।

দুলাল দত্ত—অসম্ভব।...এই এই এই শুক্তি, লক্ষ্মী' সোনা...।

শুক্তিকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যেতে দেখে আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে উঠলেন দুলাল মামা। শুক্তি থমকে দাঁড়ায়।—কী হল?

দুলাল মামা—আমার পাখিটাকে বিস্কুট-টিস্কুট খাওয়াসনি মা। এই নে, নিয়ে যা, আমার কাছে পাকা জংলি ডুমুর আছে।

ঝোলা থেকে পাকা জংলি ডুমুর বের করে শুক্তির হাতে দেন দুলাল মামা। শুক্তিও চলে যায়।

৭

পর পর তিনটে দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরেছে। আর বৃষ্টি নেই; কিন্তু এমন একটা আশ্বিনে দিন ঠিক একটা আষাঢ়ে দিনের মত স্যাঁতসেঁতে হয়ে রয়েছে।

সবুজ ধানক্ষেতের বুকের উপর দিয়ে যেন একটা পঙ্কিলতার দাগ গড়িয়ে চলে গিয়েছে, ওটা কি একটা সড়ক? থইথই করছে কাদা। এখানে-ওখানে এক-দেড় হাত গভীর এক-একটি গর্ত; যার মধ্যে থিতিয়ে আছে জল। মাঝে মাঝে একটু শুকনো আর শক্ত মাটির পিঠও দেখতে পাওয়া যায়, যার কাছে জংলি আনারসের ঝোপ ঘন হয়ে ছড়িয়ে আছে। বকের ভয়ে ধানক্ষেতের জলের চ্যাং ছটফটিয়ে লাফ দিয়ে সড়কের গর্তের জলের ভিতর লুকিয়ে পড়তে চায়।

সাইন পোস্টে লেখা আছে—কদমবাড়ি রোড। তাই বিশ্বাস করতে হয়, ওটা একটা সড়কই বটে। মাঝে মাঝে সুরকির লালচে কাদা আর ইঁটের খোয়াও ছড়িয়ে পড়ে আছে, এই কদমবাড়ি রোড অনেক দূরে গিয়ে নর্থ ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে মিশেছে।

খুব ভাল করেছে শুক্তি; তেজপুরে একটা দিনও আর দেরি না করে, বেশ খট-খটে একটা শুকনো দিনে কদমবাড়ি চলে এসেছে। আর একটি দিন দেরি করলে, শুক্তির মণিমাসির ওই ছ'সিলিণ্ডার গাড়িকে আর কদমবাড়ি পৌঁছতে হত না। গাড়ি তা হলে মাঝপথে সড়কের কাদার মধ্যে আটক হয়ে পড়ে থাকত, একটা গণ্ডার বাচ্চা যেমন একদিন...।

গত বছরের আশ্বিন মাসের একটি ভোরবেলায়, যখন সারারাতের বৃষ্টির ঝরানি মাত্র এক ঘণ্টা হল থেমেছে, তখন কদমবাড়ি চা-বাগানের একদল মজুর লাঠিসোটা নিয়ে আর হই-হই করে ওই সড়কের দিকে ছুটে গিয়েছিল। আর, কাদামাখা একটা গণ্ডারের বাচ্চাকে ধরে নিয়ে এসেছিল; সড়কের কাদায় আটক হয়ে আর অচল হয়ে পড়েছিল গণ্ডারের বাচ্চাটা।

শুকনোর সময়েই সড়কটার যা অবস্থা, তা তো জানাই আছে। তার উপর পর-পর তিনদিনের বৃষ্টি, সড়কটা বোধ হয় পচেই গিয়েছে।

জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পান গগন বসু, ওই সড়ক ধরে পর-পর দশটা মিলিটারি ট্রাক চলে যাচ্ছে। তাঁবুর বোঝা আর বোধ হয় আটা-ময়দার বস্তায় ভরাট হয়ে একটা কনভয় চলেছে। হোঁচট খেয়ে, হুমড়ি দিয়ে, কাত হয়ে, কখনও বা হেলে-দুলে, কখনও বা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক-একটা ট্রাকের চাকা কাদাজলের ছলক তুলে চলে যাচ্ছে। মনে হয়, ভালুকপং যাবার রাস্তা ধরতে চায় মিলিটারির সম্ভারের এই কনভয়। কিংবা ওদিকে, আরও কাছে, নদী জিয়াভরলির এপাশে সেগুন জঙ্গলের কিনারায়, যেখানে মিলিটারির একটা নতুন ছাউনি হয়েছে, সেখানে পৌঁছবার চেষ্টা করছে কনভয়।

কথাটা মেয়ের মুখ থেকেই শুনতে পেয়েছেন গগন বসু। শুক্তি বলেছে, নদী জিয়াভরলির এপাশে আর ওদিকে আরও এক মাইল দূরে মাটি খুঁড়ে অনেক বাংকার তৈরি করা হয়েছে।—ওই যে, পরশু রাত্রিবেলা গুম্ গুম্ শব্দ শুনে তোমার ঘুম ভেঙে গেল বাবা, ওটা বাজ পড়ার শব্দ নয়। লাইট মেশিনগান প্র্যাকটিস করছে ডোগরা রেজিমেন্টের একটা কোম্পানি।

কে জানে কোথা এসে এসব খবর শুনতে পেয়েছে শুক্তি। খুব সম্ভব ম্যানেজার ব্যানার্জির

কাছ থেকে শুনেছে। এই তো মাত্র সাতদিন হল কলকাতা থেকে কদমবাড়িতে এসেছে। এই সাতদিনের মধ্যে যে তিনটে দিন বেশ শুকনো ছিল, সারা বাগান জুড়ে সকাল-বিকেল রোদ ঝলমল করেছিল, সে তিনটে দিন রোজই সকালবেলা বাংলোর সামনের লনের উপর দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে হাঁকাহাঁকি করেছে শুক্তি—মহারাজা! মহারাজা!

ছুটে এসেছে মহারাজা; গগন বসুর আদরের বুলডগ। মহারাজার সঙ্গে ছুটোছুটি করে লনের নরম ঘাস তছনছ করেছে শুক্তি।

বিকেল হয়েছে যখন, তখন দেখা গিয়েছে, চা-বাগানের একটা শিরীষের ছায়াতে বেতের মোড়ার উপর বসে বই পড়ছে শুক্তি। কিন্তু সত্যিই পড়ছে কি? কিরণলেখা বলেন, বই পড়ে না ছাই পড়ে। হাতে ধরা বইটা একটা ছুতো; চোখ বন্ধ করে শুধু চুপ করে বসে থাকে শুক্তি। হঠাৎ চমকে ওঠে আর চোখ মেলে তাকায়, যেন একটা তন্দ্রার আবেশ হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে। মাটির ঢেলা তুলে শিরীষ গাছের গায়ে-চড়া একটা কাকলাসের গায়ের উপর ছুঁড়তে থাকে। ঝুপ করে পড়ে যায় আতঙ্কিত কাকলাস।

কনভয়টাকে আর দেখা যায় না। কিন্তু দেখতে পেলেন গগন বসু, সাহেবকুঠির জিপ, নীলরঙা হুডের জিপ গাড়িটা ওই ভয়ানক সড়কের দিকে উল্লাসের হরিণের মত ছুটে চলেছে।

চমকে ওঠেন গগন বসু। কী আশ্চর্য, ড্রাইভার কৈলাস তো নেই; তবে কে এখন ওভাবে জিপটাকে ওই সড়কের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? গগন বসু একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকতে থাকেন—কিরণ, কিরণ, শুনছ?

কিরণলেখা আসেন।—বলো।

—শুক্তি কোথায়?

—এই তো এতক্ষণ এখানেই ছিল; তাই তো, কোথায় গেল মেয়েটা? শুক্তি! শুক্তি!

বার বার ডাক দিয়েও শুক্তির কোনও সাড়া শুনতে পান না কিরণলেখা। গগন বসু বলেন—ওই দেখো।

দেখতে পেলেন কিরণলেখা। আর সন্দেহ করবার কিছু নেই। শুক্তিই জিপ নিয়ে বের হয়েছে।

এখনই দৌড়ে গিয়ে শুক্তিকে থামতে বলা কি কারও পক্ষে সম্ভব? সম্ভব নয়। আর বোধ হয় তিন মিনিটেও সময় লাগবে না, জিপ গাড়িটা ওই সড়কের কাদাজলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে; তারপর চাকা স্লিপ করবে। হয়ত একটা গর্ত পার হতে গিয়ে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েই যাবে।

বারো বছর আগে, ওই মেয়ে যখন দশ বছর বয়সের একটা খুকু, তখনই একবার চুপি চুপি চা-বাগানের কলঘরে ঢুকে একটা হাতল টেনে দিয়ে ভয়াবহ একটা কাণ্ড বাধিয়ে ছিল। কলঘরে আগুন ধরে গিয়েছিল, মেশিনের বেল্ট পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সেই মেয়ে আজ এত বড় হয়েও যেন ভুলে গিয়েছে যে, ওর বয়স বেড়েছে। কাউকে না জানিয়ে চুপি-চুপি গ্যারেজ থেকে জিপ বের করে নিয়ে দূরের সড়কের দিকে ছুটে চলেছে। নিজে না বুঝলে কে ওকে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে, এরকমের দুরন্তপনা ওকে এখন আর একটুও মানায় না? পঁয়ষট্টি বছর বয়সের বাপ, আর ষাট বছর বয়সের মা; দুটো মায়াদুর্বল শাসনের মন এখন একটু রাগ করেই কামনা করে, জিপটা যেন এখনই অচল হয়ে যায়।

সত্যিই অচল হয়ে গেল নাকি জিপটা? জিপটা যে সত্যিই থমকে দাঁড়িয়েছে। কিরণলেখা বিড়বিড় করেন—ভাল চাস তো ফিরে চায় আয়, আর এগুতে চেষ্টা করিসনি।

গগন বসুর শুকনো চোখ দুটো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। —কে যেন হাত তুলে জিপটাকে থামিয়েছে।

—কে? কে? প্রশ্ন করতে গিয়ে কিরণলেখার গলার স্বরেও যেন একটা ভয় ছলছল করে।

গগন বসু—চিনতে পারছি না। যাই হোক, লোকটা যে ভদ্রলোকের মত দেখতে সেই

রেপটাইলটা না হয়। যদি হয়, তবে আজ আমি আর রাইফেলে গুলি ভরতে একটুও...।

ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে কাঁপতে থাকেন গগন বসু।

কিরণলেখা বলেন—সুজিত বোধ হয়।

সেই মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায় গগন বসুর উত্তেজিত মূর্তিটা।

সত্যিই যদি ওই লোকটা সুজিত হয়ে থাকে, তবে তাঁর এত ক্ষুব্ধ হবার কারণ থাকে না; বরং ব্যাপারটা একটা দৈব বিস্ময় বলে মেনে নিতে হয়। একবার দু'বার নয়, কত কতবার, ওই সুজিত ছেলেটা শুক্তির অবুঝ দুরন্তপনাকে ভয়ানক ভুল থেকে বাঁচিয়েছে।

একবার সাহেবকুঠির মেহেদি বেড়ার ওদিকে কামিনদের ঝুমুরনাচের হুল্লোড় দেখবার জন্যে পিলখানার পিছনে একটা পুরনো উইটিবির উপরে উঠেছিল শুক্তি। সে উইটিবির ভিতরে গোখবো সাপেব বাসা। সেদিন সুজিত হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে বলেছিল, শিগগির নেমে আসুন। একবার খুব ব্যস্ত হয়ে আর বিস্কুট হাতে নিয়ে একটা অচেনা কুকুরের কাছে এগিয়ে চলেছিল শুক্তি। হঠাৎ পিছনে থেকে ডাক দিয়ে সুজিতই বলেছিল, কাছে যাবেন না, ওটা ক্ষেপা কুকুর।

আরও একটা ভুল, যেটা শুধু একা শুক্তির ভুল নয়; সাহেবকুঠির বাপ মা ও মেয়ে, তিনজনেরই ভুল; সে ভুলের ফলে কী ভয়ানক কুৎসতি হয়ে দেখা দিয়েছিল একটা বিপদ। সেদিনও সুজিত হঠাৎ ছুটে এসেছিল।

সুজিত ছেলেটা ভাল; কারও বিপদ হবার মত চরিত্র সে নয়। তা ছাড়া সেবকমও কিছু নয় যে, ওকে দেখে কদমবাড়ির সাহেবকুঠির কারও চোখ আশ্চর্য হতে পারে।

দু'বছর আগে, পুজোব ছুটিতে, ঠিক এরকমই একটা শুকনো আশ্বিনের দিনে, কলকাতা থেকে কদমবাড়ির বাগানে এসে যেদিন পৌঁছল শুক্তি, ঠিক সেদিনই গগনবাবুব রাইফেলটাকে আলমারিব ভিতর থেকে বের করে নিয়ে নারকেল গাছের দিকে তাক করেছিল। কচি ডাবের ছড়া ঝুলছে গাছেব মাথার কাছে। গুলি করে ছড়ার বোঁটা ঘায়েল করে ডাব নামাতে চায় শুক্তি।

কে জানে কোথায় দাঁড়িয়ে শুক্তির এই দুরন্ত খেয়ালের কাণ্ডটাকে দেখতে পেয়েছিল সুজিত। তাই দৌড়ে গিয়ে আর হাত তুলে শুক্তির হাতের রাইফেলটাকে চেপে ধরেছিল। —গুলি চালাবেন না, গাছের উপরে লোক বসে আছে।

চমকে ওঠে শুক্তি, রাইফেল-ধরা হাতটা শিউরেও ওঠে। সেদিন শুক্তির স্তব্ধ চোখের ভীরু-ভীরু বিস্ময় চিকচিক করে দেখতেও পেয়েছিল, ঠিকই, গাছের মাথায জড়সড় হয়ে ছোট্ট একটা মানুষের চেহারা বসে আছে।

সুজিত ডাক দেয়—নেমে আয রাজু। ভয় নেই, কেউ তোকে বকবে না।

চা-বাগানের মজুরদের মেট বুধন সরদারের ছেলেটা কাঁদ-কাঁদ হয়ে নারকেলের মাথা থেকে নীচে নেমে এল।

শুক্তিকে খুব বকেছিলেন কিরণলেখা। —কী অবুঝ আক্কেলহারা মেয়ে! ভুল করে যে একটা হত্যার কাণ্ড করতে চলেছিলি। ছি ছি! দেশ-গাঁয়ে এমন মেয়েকেই তো গেছো মেয়ে বলে।

সেই পুজোর ছুটি শেষ হবার ঠিক দশদিন আগে এই শুক্তি, যাকে একটা নিদারুণ গেছো মেয়ে বলে নিন্দে করেছিলেন কিরণলেখা, সেই মেয়ে এই বারান্দার উপরে একটা চেয়ারে বসে, আর, একটা পায়ের পাতা দু'হাতে চেপে ধরে, সেই সঙ্গে কেঁদে কঁকিয়ে ফুঁপিয়ে একটা দুঃসহ করুণ আতঙ্কের কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল। শুক্তির ডান পায়ের গোড়ালির কাছে ছোট্ট একটা লালচে স্ফীতি দপদপ টনটন করছে।

কুমুদ ডাক্তার এসে বললেন—এটা একটা ফোঁড়া, মুখ নেই। শুধু একটু ওপেন করে দিতে হবে।

কার সাধ্যি শুক্তির এই সামান্য ফোঁড়াকে ওপেন করে। ছুরি হাতে তুলে আর মনে মনে

হরিনাম জপে নিয়ে যতবার তৈরি হন কুমুদ ডাক্তার, শুক্তিও ততবার আর্তস্বরের চিৎকার ছেড়ে পা সরিয়ে নেয়। —চলে যান ডাক্তারবাবু, এরকম বুচারি করবেন না। ছিঃ, কিরকমের মানুষ আপনি। শিগগির চলে যান।

গগন বসু আর কিরণলেখা মেয়েকে কত মিষ্টি কথায় কতই না বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝল না শুক্তি। হার মেনে, অসহায়ের মত ঘরের বাইরে দরজার কাছে দুজনে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বোধ হয় কুমুদ ডাক্তারও হার মেনে চলে যেতেন, কিন্তু যেতে পারলেন না। কারণ হঠাৎ ঘরের ভিতরে ঢুকল সুজিত। শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আর হেসে-হেসে কথা বলে সুজিত—একটু শান্ত হয়ে বসুন।

শুক্তি—বাজে কথা বলবেন না।

সুজিতও আর কোনও কথাই বলেনি। শুধু দু'হাত দিয়ে শুক্তির ডান পা'টাকে শক্ত করে চেপে ধরেছিল।

শুক্তির চিৎকার শুনে চমকে উঠে আবার ঘরের ভিতরে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন গগন বসু আর কিরণলেখা, শুক্তি রাগ করে আর চিৎকার করে সুজিতের কামিজের কলারটাকে খিমচে ধরে একটা টান দিয়ে ফরফর করে ছিঁড়ে দিল। কিন্তু সুজিত অবিচল। কোলের উপর একটা তোয়ালে পেতে নিয়ে তার উপর শুক্তির পা'টাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে সুজিত। কুমুদ ডাক্তার আধ মিনিটের মধ্যেই ফোঁড়া কেটে নিয়ে দু'মিনিটের মধ্যেই ওয়াশ ও ড্রেস করে দিলেন। দু'হাত দিয়ে মুখ চেপে শুক্তি শুধু কাঁপতে আর ফোঁপাতে থাকে। শুক্তির ব্যাণ্ডেজ করা পা'টাকে কোলের উপর থেকে আস্তে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সুজিত।

আজ এখন সাহেবকুঠির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন গগন বসু আর কিরণলেখা, জিপের ভিতর থেকে ঝুপ করে রাস্তার উপরে নেমেই নাচুনে পাখির মত লাফালাফি করে গাড়ির চারদিকে ঘুরছে শুক্তি। শুক্তির বেণীটাও এই লাফালাফির ঠেলায় কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দিকে গড়িয়ে পড়ে ঝুলছে আর দুলছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে একটা চাকার দিকে তাকিয়ে রইল শুক্তি। আর, সেই লোকটাও এগিয়ে এল; শুক্তির পাশে দাঁড়িয়ে জিপের চাকাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

৮

রোগীর বুকে স্টেথিস্কোপ ছোঁয়াবার আগে পাঁচবার, আর রোগীর হাতে ওষুধ তুলে দেবার আগে মনে মনে দশবার হরিনাম জপে নেন চা-বাগানের ডাক্তার, যাঁর নাম কুমুদ রায়।

অনেকদিন আগে গগন বসু একবার হেসে-হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন—ফোঁড়া কাটবার ছুরি হাতে নেবার আগে কতবার হরিনাম জপতে হয়, কুমুদবাবু?

কুমুদবাবুও হেসে জবাব দিয়েছিলেন—বিশ বার।

—তাই বলুন। আমার ধারণা হয়েছিল, একশো একবার।

এই ডাক্তার, এই কুমুদনাথ রায়ের ভাইপো সুজিত। কাকা আশা করেছিলেন, তাঁর ভাইপো একদিন লেখাপড়া শিখে অন্তত ডাক্তারিটা পাস করবে।

কিন্তু কাকার আশা সফল হয়নি, হবেও না কোনওদিন। ডাক্তারি পড়া দূরে থাকুক, স্কুলের পড়ার শেষ ক্লাসটাও পার হতে পারেনি সুজিত।

বেশ বুড়ো হয়েছেন কুমুদবাবু, তবু চা-বাগানের লোকেরা তাঁকে বলে, নতুন ডাক্তার। কারণ, মাত্র এই দু'বছর হল তিনি এই চা-বাগানের ডাক্তার হয়েছেন। আগে ছিলেন ডুয়ার্সের এক চা-

বাগানে। পুরো একটি বছর নিজেই পক্ষাঘাতের মত একটা রোগে আড়ষ্ট হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন বলে তাঁর চাকরি গিয়েছে; সেখানে এক ছোকরা বড় ডাক্তার এসেছেন।

ম্যানেজার ব্যানার্জি বলেছিলেন—সাহেব নিজে বুড়ো হয়েছেন বলেই বোধ হয় বুড়ো জীবনের কষ্ট বুঝতে শিখেছেন। তা না হলে কুমুদবাবুর মত একটা অপদার্থ বুড়ো ডাক্তারকে চাকরি দেবেন কেন? শুধু কি তাই? কুমুদ ডাক্তারের অপদার্থ ভাইপো সুজিতকেও চাকরি দিতে রাজি আছেন সাহেব। সুজিতের একটা গতি করে দেবার জন্যে সাহেবের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছেন ডাক্তার। সাহেব বলেছেন—বেশ তো, গৌহাটিতে গিয়ে অন্তত কম্পাউণ্ডারিটা শিখে আর পাস করে, আর একটা সার্টিফিকেট নিয়ে চলে আসুক সুজিত। কম্পাউণ্ডার মথুরাপ্রসাদ যেদিন কাজ ছেড়ে দিয়ে কাশীবাস করতে চলে যাবে, সেদিন সুজিতকে কাজে নিয়ে নিতে অসুবিধে হবে না।

কম্পাউণ্ডার মথুরানাথ কাজ ছেড়ে দিয়ে কবেই চলে গিয়েছে। নতুন কম্পাউণ্ডার নন্দলালও কবেই এসে কাজ ধরে ফেলেছে। আব সুজিত আজও সেই সুজিত। কাজ নেই, কাজের চেষ্টা নেই; সেজন্যে কোনও লজ্জা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ নেই। ডাক্তার কুমুদনাথ রায়ের ভাইপো সুজিতনাথ রায় যেন এই কদমবাড়ি চা-বাগানের আলো-ছাযার মধ্যে এক পরম শান্তিব যোগী হয়ে জীবনের দিনগুলিকে ক্ষয় করে দিচ্ছে।

সুজিতের বাবা আর মা, দু'জনের কেউই আজ নেই। পাবলিক ওয়ার্কসের সাব-ওভারশিয়াব মণিভূষণ রায় ডিনামাইট দিয়ে নেফার পাহাড়ের পাথর ফাটাতে গিয়ে যেদিন জখম হলেন আর তেজপুর হাসপাতালে এসে মারা গেলেন, সেদিন তাঁর ছেলে সুজিতনাথের বযস ছিল চার বছব। আর, সেই মণিভূষণ রায়ের বিধবা স্ত্রী তরুলতা যেদিন তেজপুর হাসপাতালেরই রোগীর বিছানায একমাস পড়ে থাকবার পব মারা গেলেন, সেদিন তাঁর ছেলে সুজিতের বয়স ছিল সাত বছর।

কাজেই কাকা আর কাকিমার কাছে থেকে আর খেয়ে-পরে আজ পঁচিশ বছব বয়সেব জোযান হয়ে উঠেছে যে ছেলে, সে আজ কাকা আর কাকিমারই মন-প্রাণের ছেলে। কুমুদ ডাক্তারেব বাড়িতে আর কোনও ছেলে বা মেয়ে নেই। তিনি নিঃসন্তান।

কাকার আক্ষেপ, সুজিত মানুষ হল না। কিন্তু কাকিমা মানুষটার মনে কোনও আক্ষেপ নেই। সুজিত যে চাকরি-বাকরি করতে চায় না, চেষ্টাও করে না, সেজন্যে কাকিমা প্রিয়বালার মনে কোনও অভিযোগ নেই। পঁচিশ বছর বয়সের ভাসুরপো যেন এখনও চার বছর বয়সের একটা শিশু। যেন হারাই-হারাই সদা ভয় হয়, সারাক্ষণ তুকুপুকু করছে প্রিয়বালার মনটা। কোথায় গেল ছেলেটা? রান্নার কাজের ব্যস্ততার মধ্যেই বার-বার উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসেন, আর এদিকে-ওদিকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে থাকেন, কী করছে সুজিত? বাইরে অনেক দূরে কোথাও চলে গেল নাকি ছেলেটা?

এমনিতে কথা বলে কম, কিন্তু কি বিচ্ছিরি একটা কথা একদিন বলে ফেলেছিল ছেলেটা। —সে জায়গাটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে কাকিমা।

কাকিমা—কোন জায়গাটা।

সুজিত—নেফা পাহাড়ের একটা জায়গা; কাকা বলেছেন, জায়গাটার নাম খেলং। ওখানে নাকি এখনও সড়কের ধারে সেই পাথরটা আছে; যেটা ফাটাতে গিয়ে বাবা মারা গেলেন।

চেঁচিয়ে ওঠেন কাকিমা—চুপ, চুপ, কখ্খনও এরকম অলক্ষুণে ইচ্ছের কথা বলবি না।

বলতে গেলে কিছুই হয়নি; কুঞ্জলতার গাছটা একদিন শুধু একটু হেলে পড়েছিল। তাই একটা বাঁশ-বেঁধে দিয়ে লতার হেলান ঠিক করে দিচ্ছিল সুজিত। কিন্তু এতেই কাকিমার মনের অস্বস্তি ছটফট করে উঠেছে। চেঁচিয়ে ডাক দেন প্রিয়বালা—ও সুজিত, ওখানে ওরকম করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঘরে আয়। ওখানে বিচ্ছিরি পোকামাকড় আছে। শিগগির চলে আয়।

এমনও ব্যাপার হয়েছে, দুপুরের ভাত খাওয়া সেরে নিয়ে সুজিত যখন বিছানার উপর গা গড়িয়েছে, ঠিক তখন পেতলের রেকাবিতে চারটে বড় বড় নারকেল-নাড়ু নিয়ে এসে সুজিতের প্রায়

মুখের কাছেই তুলে ধরেন প্রিয়বালা।

এ কী! এখুনি তো ভাত খেলাম। আপত্তি করে সুজিত।

তাতে কি হয়েছে। অনায়াসে এমন অদ্ভুত কথাটাও বলে ফেলেন প্রিয়বালা।

এখন রেখে দাও, বিকেলে খাব।

এখন অন্তত একটা খা।

ঠিক এই রকম এক-একটি ঘটনার সঙ্গে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কাকিমা প্রিয়বালা আরও একটা কথা, চেঁচিয়ে নয়, বেশ একটু চাপাস্বরে বলেই ফেলেন—চাকরি-বাকরির কোনও দরকার নেই। তোর কাকার কোনও কথায় একটুও কান দিবি না।

কাকিমার ভীরু প্রাণের একটা কঠিন বিশ্বাস বোধ হয় এই সারসত্য বুঝে ফেলেছে যে, এই পৃথিবীকে বিশ্বাস নেই। তাঁর এই ঘরের বাইরে কোথাও দয়া মায়া মমতা বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। নিষ্ঠুর নিয়তির ডিনামাইট কখন যে কার প্রাণের উপর ফেটে পড়বে, কোনও ঠিক নেই। আজও ভুলতে পারেনি প্রিয়বালা, তরুদি যে ঠিক সেদিনই বড়দাকে বলেছিলেন, আজ আর বাইরে বের হয়ো না। কিন্তু বড়দা তো তরুদির কথা একটু গ্রাহ্যও করলেন না, কাজে বের হয়ে গেলেন। হায় রে কাজ?

চা-বাগানের সকলেই জেনে ফেলেছে, কুমুদ ডাক্তারের এই শক্ত-সমর্থ জোয়ান ভাইপো সুজিত একটি অদ্ভুত ঘরকুনো স্বভাবের ছেলে। ঘরের বাইরে বের হবার জন্য ছেলেটার প্রাণে কোনও চাড় নেই, তাগিদ নেই। তেজপুরে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে, বাগানের বুধন সরদারও একদিন তেজপুরে গিয়ে সার্কাস দেখে এসেছে। কিন্তু সুজিত যায়নি। কম্পাউণ্ডার নন্দলালও সুজিতকে কতবার সাধাসাধি কবেছে, সার্কাস দেখতে তেজপুরে যাবার সঙ্গী করতে চেয়েছে। কিন্তু যেতে রাজি হয়নি সুজিত।

হ্যাঁ, এই এক বছরেব মধ্যে মাত্র দু'বার কদমবাড়ি বাগানের বাইরে গিয়েছিল সুজিত। তাও নিজের কোনও ইচ্ছের জন্যে নয়; সাহেব বলেছিলেন বলে।—সুজিত, তুমি আজ তেজপুরে গিয়ে কোলিবাড়িতে আমার বন্ধু পরমেশের বাড়ির বাগানের রাজগাঁদার কিছু চারা নিয়ে এসো। পরমেশ তো নেই; তার ছেলে শিশিরকে আমার নাম করে বললেই দিয়ে দেবে।

কিন্তু কুমুদ ডাক্তার জানেন, আগে তো সুজিতের এরকম আর এতটা ঘরকুনো স্বভাব ছিল না। সকালবেলা ঘুড়ি ওড়াতে বের হয়ে বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে আসত। একবার না বলে-কয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গিয়েছিল। ফিরে এসেছিল তিন দিন পরে, কেঁদে-কেঁদে প্রিয়বালার যখন আধ-পাগল অবস্থা। এসব না হয় অল্প বয়সের ঘর-পালানো ছেলেমানুষিপনা কাণ্ড। কিন্তু বড় হয়েও, এই তিন বছর আগেও, ডুয়ার্সের বাগানে থাকতে মাছ ধরবার জন্যে কোথায় না চলে যেত সুজিত! মহাশোল ধরবার জন্যে তোর্সার জলে ডিঙি ভাসিয়ে আর জাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে সারা দিনটা পার করে দিয়েছে। গো-বাঘা মারবার জন্যে সাঁওতাল সরদারের তীর-ধনুক নিয়ে তিন ক্রোশ দূরে গদাই ফকিরের জঙ্গলে ঢুকেছে। শুধু এই কদমবাড়িতে আসবার পরেই দেখা গেল যে সুজিত যেন ওর প্রাণটাকে একেবারে অলস করে দিয়েছে। এই চা-বাগানের বাইরে গিয়ে কিছু দেখতে শুনতে ও খুঁজতে ওর আর ইচ্ছেই করে না। এই চা-বাগানের বাইরে যেন পৃথিবীটাই আর নেই।

সেদিন একটু লজ্জিত না হয়ে পারেননি কুমুদ ডাক্তার, সাহেবের মেয়ে শুক্তি প্রথম যেদিন এসে সুজিতকে বেশ মিষ্টি স্বরে একটা শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।—কী আশ্চর্য, মানুষও এত কুঁড়ে হয়! বুঝতে পারি না, আপনি কাজ করেন না কেন?

কুমুদ ডাক্তারের বাড়ির গেটের গা-ঘেঁষে কুঞ্জলতার গাছটার কাছে সুজিত; আর সাহেবকুঠির মেয়ে শুক্তি বুলডগ মহারাজার একটা কান শক্ত করে ধরে নিয়ে সুজিতের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

উত্তর দেয়নি সুজিত। হেসে ফেলেছিল শুক্তি। —গায়ে তো সিংহের জোর, তবে কাজ করতে সাহস নেই, কেন?

সুজিত—কী বললেন?

শুক্তি—উঃ কী সাংঘাতিক জোর দিয়ে আমার পা'টাকে চেপে ধরেছিলেন। আর একটু হলে—

সুজিত হাসে। —কী করব বলুন, আপনি যে কারও কথা শুনছিলেন না, কাউকে বিশ্বাসও করছিলেন না।

শুক্তি—কিন্তু আপনি তখন হুট করে কোত্থেকে ছুটে এলেন? ছিলেন কোথায় আপনি?

সুজিত—আমার মনে হয়েছিল, ফোঁড়াকাটার ভয়ে আপনি একটা গণ্ডগোল বাধাবেন। তাই আমি সাহেবকুঠির ফটকের কাছেই ছিলাম।

শুক্তি—বাঃ, বেশ লোক আপনি।

চলে গেল শুক্তি।

সেদিন চলে গেলেও আরও অনেকবার এসেছে শুক্তি। বুলডগ মহারাজাকে সঙ্গে নিয়ে সারা বাগান টই-টই করে ঘুরে বেড়াবার অভ্যাসের সঙ্গে যেন আরও একটা অভ্যাস তৈরি করে নিয়েছে। কুমুদ ডাক্তারের বাড়ির গেটের কুঞ্জলতার কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়াবে। হয় সুজিতের কাকিমা প্রিয়বালার সঙ্গে, নয় সুজিতের সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলে চলে যাবে।

প্রিয়বালাকে দেখতে পেলে শুক্তি ওই সেই একই কথা বলে—আপনাদের সুজিত যতই অকেজো মানুষ হোন না কেন, আমার কিন্তু কয়েকটা উপকার করেছেন।

আর, সুজিতকে দেখতে পেলেও ওই সেই একই কথা বলে শুক্তি—আমি যদি বাবাকে বলি, তবে আপনার এখুনি একটা কাজ হয়ে যাবে।

উত্তর দেয় না সুজিত।

শুক্তি—আপনি জানেন না, আমি কিন্তু বাবাকে বলেছি। বাবা আপনাকে কাজ দিতে রাজি হয়েছেন। কাজটা হল, বাগানবাবুর কাজ; এমন কিছু খাটুনির কাজ নয়। একটা টুল নিয়ে ছায়াশিরীষের কাছে বসে থাকবেন। বসে বসে শুধু দেখবেন, কামিনগুলো ঠিকমত পাতি ভাঙছে কিনা, কলম চায়ের গোড়ায় ঠিকমত জল পড়ছে কিনা; আর দেখবেন, চৌপলের চারার পাতা মশাতে চুষে শুকিয়ে দিচ্ছে কিনা; দরকার হলে ঝারি করে একটু গন্ধকজল ছিটিয়ে দেবেন, বাস, এই তো কাজ।

ঘরের ভিতর থেকে প্রিয়বালা বের হয়ে এসে, আর বেশ একটু খুশি হয়ে কথা বলেন—আমি তো মনে করি এটা ভাল কাজ। দূরদেশে যেতে হবে না, বাড়িতে থেকে বাড়ির ভাত খেতে পাবে, অথচ চাকরি করাও হবে।

শুক্তি—এই তো, আপনার কাকিমাও বলছেন। কিন্তু আপনি চুপ করে আছেন কেন?

সুজিত—একটু ভেবে দেখছি।

—ভেবে দেখুন তবে। বলতে বলতে চলে যায় শুক্তি। কিন্তু তখুনি আবার থমকে দাঁড়ায়। —আমি কিন্তু কলকাতায় চলে যাচ্ছি। বার বার তাগিদ দিয়ে মনে করিয়ে দিতে আর আসব না।

সুজিত—না, না, আপনি আর আসবেন কেন? আমার খুব মনে থাকবে। তবে...।

শুক্তি—কী তবে?

সুজিত—তবে এখানে কোনও কাজ না নিয়ে বরং বাইরে কোথাও গিয়ে একটা কাজের চেষ্টা করা ভাল।

শুক্তি—খুব ভাল। তাই করুন। আপনার কাকার তো এই অবস্থা, একশো পঁচিশ টাকা মাইনে পান। তার ওপর আবার বুড়ো হয়েছেন। আপনার একটু ভেবে দেখা উচিত সুজিতবাবু।

সুজিত—হ্যাঁ...আচ্ছা...কিন্তু...

শুক্তি—কী? বলুন।

সুজিত—মজুমদার কি আজও একবার আসবেন?

শুক্তি—ওরকম করে বলবেন না। হয় বলুন, মিস্টার মজুমদার। নয় বলুন, সুশান্তবাবু।

সুজিত—হ্যাঁ, সুশান্তবাবুর কথাই বলছি।

শুক্তি—হ্যাঁ, আসবেন। কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?

সুজিত—না, এমনই; এর আগে তাঁকে আরও দেখেছি কিনা, তাই মনে হল...।

শুক্তি—উনি তো মস্ত বড় কন্ট্রাক্টর।

সুজিত—হ্যাঁ, ডুয়ার্সে থাকতে দেখেছি, রেলওয়ের অনেক স্টোরে উনিই সাপ্লাই করতেন।

শুক্তি—আপনার কথা বলব সুশান্তবাবুকে? তাঁর কাছে নিশ্চয়ই অনেক চাকরি আছে। ইচ্ছে করলে আপনাকে তাঁর কোনও একটা অফিসে অন্তত ফাইলবাবুর কাজ দিতে পারবেন।

সুজিত—না, বলবেন না।

শুক্তি হাসে।—অদ্ভুত মানুষ আপনি।

শুক্তির হাতে একটা ট্রানজিস্টর রেডিও ঝুলছে। গান গাইছে রেডিও। শুক্তির রঙিন শাড়ির আঁচলটা যেমন, শুক্তির মুখের হাসিটাও তেমন, ফুরফুর করে উড়ছে।

সুজিত বলে—আপনি কি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন?

শুক্তি হাসে।—একথা কেন আপনার মনে হল? আমি কি বেড়াতে যাবার সাজ পরেছি? না, ফিকে নীল শাড়ি ছাড়া আমি বেড়াতে বের হই না।

সুজিত হাসতে চেষ্টা করে।—আমি কী করে বুঝব, বলুন?

শুক্তি—ঠিক কথা, আমাকে ক'দিনই বা চোখে দেখেছেন যে, বুঝতে পারবেন? এই তো...বোধ হয় মাত্র এক বছর হল আপনারা কদমবাড়িতে এসেছেন, তাই না?

সুজিত—হ্যাঁ।

শুক্তি—সুশান্তবাবুও বোধ হয় আপনাদের আসবার মাস দু'তিন পরে, ও হ্যাঁ, সেই যে আপনি ছুটে গিয়ে আমার হাতের বন্দুকটা চেপে ধরলেন, ঠিক সেদিনই সুশান্তবাবু প্রথম এসেছিলেন।

সুজিত—হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

শুক্তি চলে যেতেই কাকিমা প্রিয়বালা দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে বারান্দার উপরে দাঁড়ান; তারপর সুজিতের কাছে এগিয়ে চোখমুখ করুণ করে নিয়ে আর গলা-কাঁপা স্বরে কথা বলেন—সবই তো শুনলাম, সাহেবের মেয়ে যা বলে গেল। কিন্তু তুই কি সত্যিই চাকরির চেষ্টায় বাইরে যাবি?

সুজিত বলে—না।

কোথাও যায়নি সুজিত। শুক্তি কলকাতা চলে যাবার পর সারা দিন-রাতের মধ্যে ঘরের বাইরে একবারও বের হয়েছে কিনা সন্দেহ। দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন প্রিয়বালা। দেখে খুব কষ্ট বোধ করেছেন কুমুদ ডাক্তার। এ কী ভয়ানক আলস্য দিয়ে জীবনটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছে সুজিত। ঘুমের মানুষও নিশির ডাক শুনে চমকে ওঠে আর বাইরে বের হয়ে যায়। কিন্তু সুজিতের ঘুম যেন ভয়ানক একটা রুপোর কাঠি ছোঁয়ানো ঘুম, ভাঙতেই চায় না।

ম্যানেজার ব্যানার্জিও কুমুদ ডাক্তারকে কথা শোনাতে ছাড়েন না।—কানে জল ঢেলে দিলেই ঘুম ভেঙে যাবে। আপনারা শুধু মায়া নিয়ে তুকুপুকু করবেন, কিছু বলবেন না; তবে ও-ছেলের শিক্ষা হবে কেমন করে?

তিন মাস পরে কলকাতা থেকে ফিরে এসে গগন বসুর মেয়ে শুক্তিও কুমুদ ডাক্তারের বাড়ির কুঞ্জলতার কাছে সুজিতকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।—এ কী, আপনি এখনও আছেন? কোথাও যাননি তবে?

সুজিত—না।

দুই চোখের দুটি শক্ত ভ্রূকুটির সঙ্গে শুক্তির চোখের তারা দুটোও যেন বেশ শক্ত হয়ে যায়। —আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।

আর একটিও কথা বলে না শুক্তি। শুধু বুলডগ মহারাজার মাথায় আস্তে একটা টোকা দিয়ে বলে—চল।

জানালার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে পেয়ে খুশি নন প্রিয়বালা, সাহেবের দুর্দান্ত মেয়ে সকালবেলার শান্ত বাতাসে যেন একটা ঝড় তুলে দিয়ে আর আঁচল উড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ভালই হয়েছে। রাগ করেছে করুক, কিন্তু গরিবের বাড়িতে এসে যেন ধমক-ধামক আর না করে।

শীতের দুপুর যখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন সাহেবকুঠির ভিতরের দিকে বাগানমুখী নিরালা বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে শুক্তিও ভাবে, ঠিকই, ওরকমের মানুষের কাছে এতবার যাওয়াই ভুল হয়েছে, এত কথা বলাও ভুল হয়েছে। ভাল কথার সম্মান দিতে জানে না, ওরা হল সেই রকমের মানুষ।

কী অদ্ভুত স্তব্ধতা। কোথাও একটা শব্দ নেই। মহারাজাও ডাকে না। বাবা ঘুমিয়ে আছেন তাঁর অফিসঘরের আরাম-চেয়ারে। মা ঘুমিয়ে আছেন শুক্তির ঘরে। শুক্তিরই বিছানায়। কিন্তু বাগানের কলঘরের বয়লারও কি ঘুমিয়ে পড়েছে? পাতি ভাঙবার কামিনগুলোও কি গান গাইতে ভুলে গেল?

পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে শুক্তি। কী আশ্চর্য, কুঠির এদিকের এই বারান্দায় কেমন করে এত শব্দহীন হয়ে চলে গেলেন সুশান্তবাবু? কেমন করেই বা বুঝলেন যে, শুক্তি এখন এদিকের এই নিরালা বারান্দার এক কোণে চুপ করে বসে আছে? তবে কি লনের কিনারা ধরে নরম ঘাস মাড়িয়ে আর খুব আস্তে আস্তে হেঁটে এসেছেন?

সুশান্ত মজুমদারের কাঁধের সঙ্গে একটা ক্যামেরা ঝুলছে। সুশান্ত মজুমদারের হাতের পাইপের মুখ থেকে যেন সিরসির করে সরু ধোঁয়ার সাপ বের হয়ে কাঁপছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই সুশান্ত মজুমদার তো কতবার এই বাড়িতে এসেছেন। কিন্তু কোনওদিন সুশান্তবাবুকে দেখতে এত অদ্ভুত লাগেনি শুক্তির। সুশান্তবাবুর চোখ দুটোকেও কোনওদিন এত লাল হয়ে হাসতে দেখেনি শুক্তি।

—আমি এখন একজন গরিব কন্ট্রাক্টর, কাকাবাবু। এই কথা বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার, যেদিন হঠাৎ কদমবাড়িতে এসে গগন বসুর কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেখেই চিনতে পেরেছিলেন গগন বসু।—চিনেছি, তুমি সুশান্ত।

হ্যাঁ, সেই সুশান্ত। গগন বসুর দার্জিলিংয়ের বন্ধু হেমেনের ছেলে সুশান্ত। দার্জিলিংয়ে হেমেনের তিনটে গার্ডেন আছে, সে গার্ডেনের বৈশাখী ফ্লাশের অরেঞ্জ পিকো'র কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই গেল, হৈমন্তী ফ্লাশের ব্রোকেন পিকো শুশংও প্রায় সোনার দরে বিকিয়ে যায়। কলকাতার ব্রোকারদের সঙ্গে ঝগড়া করে হেমেন একবার বলেছিল, আমি আর আমার চা অকশনে দেব না; বাগান থেকে সোজা লন্ডনে চালান করে দেব।

সুশান্ত বলে—আমি এখন তেজা সিং-এর পার্টনার। রেলওয়ে সাপ্লাই বলুন, মিলিটারি সাপ্লাই বলুন, এমন কি হর্তাকর্তাদের মেয়ের বিয়ের সামিয়ানা সাপ্লাই পর্যন্ত, অনেক কিছু ঝঞ্ঝাট আপনাদের এই সুশান্তকে সহ্য করতে হয়।

গগন বসু হাসেন।—ভালই তো। যথেষ্ট উন্নতি করেছ।

সুশান্ত—বছরে তেত্রিশ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিই; আর কত দেব কাকাবাবু? বলুন?

গগন বসু—তুমি এখন কোথায় থাক?

সুশান্ত—সর্বঘটে থাকি, কাকাবাবু। পার্লামেন্ট হাউসের গ্যালারিতে আমাকে দেখতে পাবেন। মিনিস্টারের বাড়িতেও দেখতে পাবেন। আর, খোঁজ নেন তো দেখতে পাবেন, আমি একজন সামান্য রোড ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে গাছতলায় বসে আছি। আপনি কি স্বীকার করবেন না কাকাবাবু, এটা যে

সত্যিই একটা ইয়ে?

গগন বসু—কী বলছ?

সুশান্ত—এটা যে টাকার যুগ?

গগন বসু বোধ হয় প্রশ্নটাকে এড়াবার জন্যেই হাসতে থাকেন।—হতে পারে। দেখছি, তুমি বেশ অকপট মনে কথা বলতে পার, সুশান্ত।

সুশান্ত—হ্যাঁ কাকাবাবু; আমার আর কিছু না থাকুক, আপনাদের আশীর্বাদে অন্তত ওই আসেটটুকু আছে, অকপটতা।

সেদিন শুক্তির সঙ্গে কথা বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার।—আমি ভাবতে পারিনি যে, আপনি এখানে থাকেন। আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। মাঝে মাঝে আসব, কিন্তু বিরক্ত হতে পারবেন না।

মাঝে মাঝে, আর বার বার অনেকবার এ বাড়িতে এসেছেন এই সুশান্ত মজুমদার। যখনই এসেছেন, তখনই শুক্তির জন্য ঝুড়ি ভর্তি করে অজস্র ফুল এনেছেন।

—এই সবই তেজা সিং-এর মিসামারি বাগানের ফুল। ফুল ফলাবার মত সময় আমার নেই, মিস শুক্তি বসু। শিলং থেকে ফ্লাই করে তেজপুরে আসি, স্টেশন ক্লাবে থাকি, তারপর তেজা সিং-এর গাড়িটি নিয়ে এখানে ছুটে আসি। কেন আসি বুঝি না।

শুক্তিকে একদিন এরকমের হেঁয়ালিধরনের কথাও বলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন সুশান্ত মজুমদার। তারপর আরও কত কথা বললেন, সব কথাই চুপ করে শুনেছে শুক্তি, আর হাসতে চেষ্টাও করেছে।

গগন বসু বলেন, সুশান্ত কিন্তু বেশ অকপট মনের মানুষ। কিরণলেখা বলেন, হ্যাঁ। শুক্তি বলে, তাই তো মনে হয়।

কিরণলেখা একদিন শুক্তিকে একটা অদ্ভুত কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর গলার স্বরে একটা কৌতূহলও বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছিল।—সুশান্ত তো তোরই সঙ্গে বেশি কথা বলে; কী মনে হয় তোর? বেশ ভাল ছেলে?

শুক্তি—তাই তো মনে হয়।

শুক্তিকে একদিন বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার, আমি আপনাকে দেখবার জন্যেই আসি। ওকথা না বললেই ভাল করতেন; কিন্তু শুধু এই একটি কথার জন্যেই মানুষকে অভদ্র বলে মনে করা উচিত নয়। বলেছেন, আরও কত কথা বলেছেন, তার মধ্যে কোনও অভদ্রতা ছিল না, যদিও শুনে খুব খুশি হয়নি শুক্তি। বলেছেন, ইচ্ছে করে যে, রোজই এখানে এসে আপনার সঙ্গে একটু টেনিস খেলে চলে যাই।

কিন্তু, সেদিন সত্যিই একটু বেশি কথা বলে ফেলেছিলেন।—চলুন মিস শুক্তি বসু; একটু প্লেজার অভিযান করে ফিরে আসি। মিসামারির কাছে গাভরু নদীর জলে রবার বোট ভাসিয়ে দুজনে একটু ভেসে আসি। দেখবেন, কত ভাল-ভাল মিলিটারি অফিসারের স্ত্রী আর বান্ধবী সেখানে রবার বোটে ভাসছে, কোরাস গান গাইছে আর ফ্লাস্ক থেকে পানীয় বের করে মনের আনন্দে মুখে ঢালছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

চমকে উঠেছিল শুক্তি। বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তবু বেশ শান্ত ভাষাতেই জবাব দিয়েছিল—ওসব কথা আমাকে বলবেন না। বলে লাভ নেই।

সুশান্তর চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের একটা করুণতা নিয়ে কাঁপতে থাকে।—তবে কি আমাকে এখানে আসতেই মানা করে দিচ্ছেন?

শুক্তি—না না; মানা করব কেন? আসবেন বইকি।

সেই সুশান্ত মজুমদার আবার এসেছে। শুক্তির মুখের দিকে অপলক দুটো চোখ নিয়ে তাকিয়ে

খুব মৃদুস্বরে কথা বলে সুশান্ত।—আমি বলি, বরং আরও একটু দূরে গিয়ে ধানসিরি নদীর জলে একটু আনন্দ করে আসা ভাল। আপনি কী বলেন? আপনার সুইমিং কস্ট্যুম আমি যোগাড় করে দেব।

চমকে ওঠে শুক্তি।—কী বললেন?

হঠাৎ শুক্তির কাছে এগিয়ে যেয়ে আর চাপা-স্বরে যেন আরও একটা গভীর অনুরোধের কথা বলেন সুশান্ত মজুমদার।

শুক্তি বসুর দুই চোখের তারা দুটো স্তব্ধ হয়ে যায়। গায়ের শাড়িটাকে দুই হাতে শক্ত করে খিমচে আর চেপে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে শুক্তি। একটা কালো কঠিন আতঙ্কের বোবা পাথর যেন শুকিয়ে মুখের উপর চেপে রয়েছে; কথা বলতে পারে না শুক্তি।

কিন্তু কে একজন হঠাৎ এসে সেই নিরালা বারান্দার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে।

—সুজিতবাবু! ডাক দিয়েই বারান্দা থেকে ছুটে এসে সুজিতের একটা হাত শক্ত করে ধরে কাঁপতে থাকে শুক্তি।

সুজিত বলে—না, কিচ্ছু হয়নি। কোনও ভয় নেই।

হাঁপাতে থাকে শুক্তি।—আমি পড়ে যাব, আমাকে শক্ত করে ধরুন।

দুহাতে শুক্তির দুই হাত শক্ত করে ধরে জিজ্ঞাসা করে সুজিত—এইবার বলুন, কী হয়েছে?

যেন একটা লজ্জার যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে করুণ হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে শুক্তির গলার স্বর।—ফটো তুলতে চায়; ভয়ংকর ফটো।

সুজিতের দুই চোখ দপ করে জ্বলে উঠে শুধু দেখতে পায়, কেউ নেই বারান্দায়। বোধ হয় ওদিকের রেলিং টপকে চলে গিয়েছেন সুশান্ত মজুমদার। হ্যাঁ, চলেই গেলেন। শুনতেও পাওয়া গেল, গাড়ির শব্দটা সাহেবকুঠির ফটক থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে শুক্তির মুখটা অদ্ভুত এক উজ্জ্বলতায় ভরে যায়। —কী আশ্চর্য, আবার আপনি!

সুজিতও হাসে।—হ্যাঁ; কিন্তু এইবার আমি যেতে পারব। আর আমার এখানে থাকবার দরকার নেই।

শুক্তি—এতদিন এখানে কী দরকারে ছিলেন?

সুজিত—এই তো এই জন্যে, এখনই যা হয়ে গেল। আমি জানতাম, আপনি এরকম একটা বিপদে পড়বেন।

চমকে ওঠে না শুক্তি। কিন্তু শুক্তির চোখের তারা ঝিকঝিক করে।—আশ্চর্য!

সুজিত হাসে।—কিন্তু আর আপনার আশ্চর্য হতে হবে না।

শুক্তি—কী বললেন?

সুজিত—আপনি যা বলেছিলেন; এবার কাজের চেষ্টায় বাইরে বের হতে হবে।

—কোথায় যাবেন?

—দেখি কোথায় যাই। এখনই কিছু ঠিক করিনি।

বাগানের ঝাউয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী-যেন ভেবে নেয় শুক্তি। তারপরেই বলে—আমি কিন্তু আপনাকে একটা ঠিকানা দিতে পারি, চিঠিও দিতে পারি, যেখানে গেলে আপনার কাজ হবে।

সুজিতও চুপ করে শুক্তির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী-যেন ভেবে নেয়। তারপরেই বলে—দিন তবে।

—একটু দাঁড়ান। চিঠিটা লিখে আনছি।

সাহেবকুঠির বাইরের বারান্দার সিঁড়ির কাছে গিয়ে চুপ করে একটা নিরেট পাথরের মত

শান্ত ও সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুজিত। ঘরের ভিতরে টেবিলের কাছে বসে চিঠি লেখে শুক্তি—মেজর পি. বোস, আসাম রাইফেলস, লোখরা। আমাদের বাগানের ডাক্তারবাবুর ভাইপো সুজিত রায়কে যদি একটি চাকরি করে দিতে পারেন কাকা, তবে খুশি হব। এবার ছুটির সময় নিশ্চয় আপনার ওখানে যাব। ইতি—শুক্তি।

৯

জিপের চাকার টায়ার চুপসে গিয়েছে, হাওয়া নেই। ভিতরের টিউব বোধ হয় ফেটেই গিয়েছে। সুজিত বলে—তা ছাড়া চাকার রিমও ফেটে গিয়েছে দেখছি।

শুক্তি বলে—ছেড়ে দিন। চলুন যাই। জিপ পড়ে থাকুক এখানে, উপেন মিস্তিরি এসে নিয়ে যাবে।

সুজিত—চলুন। কিন্তু আপনি যাচ্ছিলেন কোথায়?

শুক্তি হাসে—বলব না।

সুজিত—ওই সড়কে উঠলে কিন্তু আপনার বিপদ হত। গর্তে পড়ে বোধ হয় উলটেই যেত জিপটা।

শুক্তির হাসির দোলা লেগে মাথার বেণীটাও দুলে ওঠে। —কেন বিপদ হবে? বিপদ থেকে বাঁচাতে আপনি তো আছেন!

সুজিত হাসে। —সে কথা বললে কি চলে? আজ তো আর একটু হলে...যদি চাকার হাওয়া ফুরিয়ে গিয়ে আর রিম ফেটে গিয়ে গাড়িটা হঠাৎ অচল হয়ে না যেত...।

শুক্তি—ভুল বলছেন। টিউব বার্স্ট করবার আগেই জিপকে থামিয়ে দেবার জন্যে আপনি হাত তুলেছিলেন।

সুজিত—তা হবে।

শুক্তি—এ তো বড় মজার নিয়ম হয়ে উঠল দেখছি।

সুজিত—কী বললেন?

শুক্তি—আমার একটা বিপদ হতে চললেই আপনি কোত্থেকে এসে হাজির হবেন।

সুজিত—না না; আজ কিন্তু আমি সত্যিই জানতাম না যে, আপনি জিপ নিয়ে বের হয়ে এই সাংঘাতিক সড়কের দিকে যাচ্ছেন।

শুক্তি—আমি কিন্তু জানতাম যে, আপনি এখন ওদিক থেকে আসছেন।

সুজিত—আপনি ঠাট্টা করছেন।

শুক্তি—ঠাট্টা করব কেন? কুঠির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে কি দেখা যায় না যে, আপনি এই সড়কের কিনারা ধরে আস্তে-আস্তে হেঁটে এদিকে আসছেন?

সুজিত হাসতে থাকে। —তাই বলুন।

শুক্তি—কিন্তু আপনি কোত্থেকে আসছেন?

সুজিত—কেন? লোখরা থেকে আসছি।

—সত্যি কথা বলছেন তো? এতদিন লোখরাতে ছিলেন? সত্যিই কাজ করছেন সেখানে? সাহেবকুঠির খুশি মেয়ে শুক্তির মুখের ভাষা, গলার স্বর আর চোখের বিস্ময়, সবই যেন এক সঙ্গে উথলে উঠেছে।

সুজিত—আমার কাকা কি আপনাকে কিছু বলেননি? কাকিমার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়নি?

শুক্তি—না; কেউ আমাকে কিছু বলেননি। কারও সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি।

সুজিত—এই এক বছরের মধ্যেও কি আপনি কারও কাছ থেকে শুনতে পাননি যে...।

শুক্তি—না, কিছুই শুনিনি, যদিও এক বছরের মধ্যে তিনবার কদমবাড়িতে এসেছি আর কলকাতা চলে গিয়েছি। আমি শুধু জানতাম যে, আপনি এখানে নেই। কিন্তু...।

হঠাৎ চুপ করে আর মুখ টিপে হাসতে থাকে শুক্তি।—কিন্তু বলুন তো, কেমন করে জানতে পেলাম যে, আপনি কদমবাড়িতে নেই?

সুজিত—বোধ হয় মেজরসাহেব আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, আমি লোখরাতে চাকরি করছি।

শুক্তি—না। একদিন বাগানের নালার জলের হাঁস ধরতে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। জলে ডুবে যেতেই চলেছিলাম, কিন্তু আপনি তবু এলেন না। তখনই বুঝলাম, আপনি এখানে নেই।

জিপের সুইচের চাবিটাকে দুই হাতে লোফালুফি করে হাসতে থাকে শুক্তি।

সুজিত কিন্তু হাসে না; চোখ দুটোও অদ্ভুত হয়ে কেঁপে ওঠে।—তারপর কী হল?

শুক্তি—নালার ধারের ঘাসের ঝুঁটি দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সামলে গেলাম আর উঠে এলাম।

সুজিত—আপনি সাঁতার জানেন?

শুক্তি—না।

সুজিত—তা হলে বুঝে দেখুন, আপনি খুব ভুল করেছেন। জলের হাঁস ধরতে যাওয়া আপনার একটুও উচিত হয়নি।

শুক্তি—আঃ, ওসব কথা এখন রাখুন। আগে বলুন, কী কাজ করছেন?

সুজিতের গায়ে খাকি জিনের শার্ট, খাকি ফুল প্যান্ট। চকচক করছে খাকি নেয়ারের বেল্টের পেতল। পায়ে কাদামাখা গামবুট। সুজিতের এই নতুন মূর্তিটাও হাসছে। সুজিত বলে—আমি আসাম রাইফেলের হাবিলদার। আপনার কাকা মেজর সাহেব আমাকে খুব পছন্দ করে এই চাকরি করে দিয়েছেন।

শুক্তির খুশির মনটা যেন চেঁচিয়ে ওঠে।—কী আশ্চর্য! আপনি সোলজার! চমৎকার! আপনি একটা কাণ্ডই করেছেন সুজিতবাবু! খুব ভাল হল। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে...কাজ পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছেন তো?

সুজিত—নিশ্চয়।

শুক্তি—তবে চলুন।

সুজিত—কোথায়?

শুক্তি—বাবার কাছে আপনাকে নিয়ে গিয়ে একবার দেখাই।

সুজিত—আপনি যখন বলছেন তখন সাহেবের কাছে নিশ্চয় একবার গিয়ে দেখা করে আসব। কিন্তু এখন এই কাদামাখা গামবুট পায়ে...।

শুক্তি—ঠিক আছে। ওতে কিছু আসে যায় না। চলুন।

সুজিতের সঙ্গে গল্প করে কাঁকরের ছোট রাস্তা ধরে সাহেবকুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে শুক্তি। শুক্তির হাঁটবার ভঙ্গিটাও অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে, যেন একটা উতলা খুশির হিল্লোল। শুক্তি যেন কদমবাড়ির সাহেবকুঠিকে একটা জয়ের ট্রফি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে।

দেখে খুশি হলেন গগন বসু।—ভালই করেছ সুজিত, মন দিয়ে কাজে লেগে থাকো। তা হলে আরও ভাল হবে।

শুক্তি—সুজিতবাবুকে এই কাজটা কিন্তু আমি পাইয়ে দিয়েছি, বাবা।

গগন বসু—তুমি?

কিরণলেখা—তুই পাইয়ে দিয়েছিস, মানে?

সুজিত—মেজর সাহেবকে উনিই একটা চিঠি দিয়েছিলেন।

হেসে ফেলেন গগন বসু। সুজিতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।—কেমন আছে প্রণব?

সুজিত—আজ্ঞে?

গগন বসু—তোমাদের মেজর সাহেব, মেজর পি. বোস কেমন আছে?

সুজিত—ভাল। আপনাদের সবাইকে একবার যেতে বলেছেন।

গগন বসু—আর আমার যাওয়া! ওটা আর সম্ভব নয়। হ্যাঁ, এরা যদি যেতে চায় তো যাবে।

কিরণলেখা—আমার তো যেতে ইচ্ছে করে ঠিকই, কিন্তু...।

শুক্তি—আমি কিন্তু যাবই। কাকার বাড়ির কৃষ্ণচূড়ার দোলনাটা নিশ্চয় এখনও আছে।

কিরণলেখা—হ্যাঁ যেও, আর আবার একটা বিপদ বাধিও।

শুক্তি—বাধালেও ভয় নেই। এখন সুজিতবাবু ওখানে আছেন। বিপদ থেকে বাঁচাতে ছুটে আসবেন।

হেসে ফেলে সুজিত। হাত তুলে গগন বসু আর কিরণলেখাকে নমস্কার জানায়।—আসি।

চলে যায় সুজিত। আকাশের দিকে তাকিয়ে শুক্তি বলে—এরকম কড়া রোদ্দুর আরও দুটো দিন থাকুক, সড়কটাও শুকিয়ে যাক, এদিকে ড্রাইভার কৈলাসও এসে পড়ুক, বাস, তারপব আব কোনও কথা নয়, আমি কিন্তু লোখরাতে কাকাব বাড়িতে অন্তত দুটো দিনের জন্য বেড়িয়ে আসব।

কিরণলেখা—সাতদিনের মধ্যে একটা দিনও তোকে বই ছুঁতে দেখলুম না। এর মানে কী? অথচ সুমিত্রার সব চিঠিতে ওই একই কথা পড়তে হয়; শুক্তি সব সময়েই পড়ায় ব্যস্ত। এত ব্যস্ত যে, সময়মত স্নান করতে, খেতে আর ঘুমোতে ভুলে যায়। মেয়েকে নাকি সবই মনে করিয়ে দিতে হয়।

শুক্তি—বড় পিসি মিথ্যে কথা লেখেন না।

কিরণলেখা—বড় পিসি মিথ্যে কথা লেখেনি। কিন্তু তুমি এখানে এসে বড় পিসির কথাটাকে মিথ্যে করে দিচ্ছ কেন?

শুক্তি—মনে হচ্ছে তুমি রাগ করে কথা বলছ।

কিরণলেখা—পড়ার কথা বললেই যদি রাগের কথা হয়, তবে তাই।

গগন বসু—যাকগে, পড়তে ভাল লাগলে পড়বে, না লাগলে পড়বে না। ও নিয়ে এত মাথা ঘামাবার আর ব্যস্ত হবার কী আছে?

শুক্তি—আমি লোখরা থেকে একবার ঘুরে আসি, মা; তারপর দেখবে, দিনরাত পড়ি কিনা।

কিরণলেখা—সেটা আর হবে না; হতে বলছিও না। তবে একটু শান্ত হয়ে বাড়িতেই থেকো, যখন-তখন টই-টই করে ঘুরে বেড়িও না।

চলে যায় শুক্তি; ঘরের ভিতরে গিয়ে কিছুক্ষণ বেশ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; তারপর টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে।

বই পড়তে চেষ্টা করলে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে আর ঘুম পেয়ে যায়। আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলে চোখ দুটো যেন ধড়ফড় করে জেগে ওঠে আর ভুরু টান করে বই পড়তে থাকে; শুক্তির অবস্থা দেখে হেসে ফেলেন কিরণলেখা।—বেশ তো, আগে লোখরা থেকে একবার ঘুরে আয়, তারপর পড়া শুরু করিস।

নেফার পাহাড়ের মাথায় মেঘ নেই। সারা দিনের রোদ খেয়ে শুকিয়ে গেল বাগানের পুরনো পিলখানার সামনের কাদাটে মাঠটা। সেই শুকনো মাঠের উপর কাকের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ঠোঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে কাঁকড়া মারছে। তেড়ে যাচ্ছে বুলডগ মহারাজা।

আজই তো ড্রাইভার কৈলাসের ফিরে আসবার কথা। বিকেল ফুরল, সন্ধ্যা হল, নারকেলের পাতার ঝালরে টাটকা চাঁদের আলোর ঝিলিমিলিও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কৈলাস এল না।

মঙ্গলদই থেকে কদমবাড়ি আসতে কী এমন সময় লাগে যে, সকালে বেব হলে সন্ধ্যার মধ্যেও পৌঁছতে পারা যায় না?

কৈলাস আসেনি; কিন্তু কেউ একজন এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু কে? কে এই সময় বাইরের বারান্দায় গগন বসুর সঙ্গে কথা বলতে পারে? কিরণলেখা তো এখন শুক্তির এই ঘরের একটা আলমারির জিনিস সাজাতে গিয়ে পুরনো কালের ছোট্ট একটা ফ্রক হাতে তুলে নিয়েছেন আর হাসছেন; সেই দুরন্ত ছোট্ট শুক্তির ফ্রক, এখনও কলঘরের কালির ছোপ গেলে আছে ফ্রকের গায়ে।

হঠাৎ বই বন্ধ করে আর কান পেতে শুনতে থাকে শুক্তি। হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে কথা বলছেন কুমুদ ডাক্তার। বেশ অদ্ভুত রকমের কথা।—আপনি তো জানেন স্যার, গল্পে আছে যে, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল আর হাজার বছরের ঘুম ভেঙে গেল। আমাদের সুজিতকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। সেই আলসেমির ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেছে। খুব খুশি হয়ে কাজ করছে।

গগন বসু—সুজিতকে দেখে আমারও তাই মনে হল।

কুমুদ ডাক্তার—আমি কিন্তু আগে জানতাম না স্যার, আজ জানতে পেলাম, আপনাব মেয়ে শুক্তিই চিঠি লিখে সুজিতকে এই কাজটা পাইয়ে দিয়েছে।

গগন বসু হাসেন।—হ্যাঁ, আমিও আজ জানতে পেলাম। দেখছি, শুক্তিও তা হলে দেশের বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করতে শিখেছে, যদিও...।

কুমুদ ডাক্তার—আজ্ঞে?

গগন বসু—যদিও এটুকু চিন্তা করতে শেখেনি যে, নালার জলের হাঁস ধরতে গেলে পা পিছলে যেতে পারে।

কুমুদ ডাক্তার—তা স্যার...ছেলেমানুষের মন স্যার...ওরকম একটু...আচ্ছা আসি স্যার।

হেসে ফেলে শুক্তি। হাতের বইটাকে টেবিলের ওপব ফেলে রেখে দিয়ে আর ছুটে গিয়ে এক হাতে গগন বসুর গলা জড়িয়ে ধরে, আর এক হাতে গগন বসুর মুখটাকেও চেপে ধবে।—তুমি আমাকে এত ঠাট্টা করবে না, বাবা।

কদমবাড়ির চা-বাগানের সাহেবের সোনার ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে ফসকে পড়ে যায়; হাতের পাইপটাও আর একটু হলে পড়ে যেত। গগন বসুর চেহারাটা যেন গলে যেতে চাইছে, গলার স্বরও যেন এক বিগলিত তৃপ্তির কলরোল।—কোথায় থাকিস তুই, শুক্তি? দেখছিস, আমি এখানে একা-একা বসে আছি, তবু তুই ওদিকে পড়া নিয়ে পড়ে আছিস? কাছে এসে একটু বসবি তো।

শুক্তি—নিশ্চয়। লোখরা থেকে ফিরে আসি, তারপর রোজ তোমার কাছে এসে বসব।

শুক্তির লোখরা যাবার স্বপ্নটাকে আর দুটো দিনও অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। সড়ক শুকিয়ে গেল, কৈলাসও এসে গেল। বিকেল হতেই সাহেবকুঠির টুরার গ্যারেজ থেকে বের হয়ে গেটের সামনে শুধু এক মিনিটের মত দাঁড়াল আর শুক্তিকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

কদমবাড়ি থেকে লোখরা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে? দেড় ঘণ্টার বেশি নয়। কিন্তু এই শুকনো সড়কের রাক্ষুসে গর্তগুলি টুরারের স্পিড মিথ্যে করে দিয়ে লোখরা পৌঁছতে কত দেরি করিয়ে দেবে কে জানে?

কৈলাস বলে—এই সড়কের মেরামতের জন্যে এ বছরের কন্ট্রাক্টর কত টাকা নিয়েছে, সে খবর তো আপনি জানেন না দিদি।

শুক্তি—কত টাকা?

কৈলাস—একান্ন হাজার টাকা।

শুক্তি—কিন্তু কই, মেরামত করা তো হয়নি।

কৈলাস—মেরামত করবার দরকার কী? বিল তো মজেসে বন যাতা হ্যায়; আওর মজেসে

পাস হো যাতা হ্যায়।

শুক্তি—কে কন্ট্রাক্টর?

কৈলাস—মিসামারিকা তেজা সিং আওর মজুমদার।

শুক্তি—তোমার স্ত্রীর অসুখ এখন কেমন? সেরেছে?

কৈলাস—একটু সেরেছে। হ্যাঁ, আপনি তো বলবেন...।

শুক্তি—আমি কিছু বলছি না, তুমি চুপ করো।

কৈলাস—রাগ করবেন না দিদি। আপনি বলবেন, এটা নেহরু-রাজ। হম বোলেঙ্গে, হায় ভগবান রাজ। চোরের জোর, চোরের খাতির, চোরের ইজ্জৎ। চোরলোগ ওই নেফার পাহাড়কেও গিলে খেয়ে ফেলবে। একদিন বলবেন, ঠিকই বলেছিল মুরুখ কৈলাস।

শুক্তি—আমি বলছি, তুমি চুপ করো।

কৈলাস—চুপ তো করতেই হবে, দিদি। আমার মত গরিবেরও দশটা টাকা খেয়ে নিয়ে তবে আমার লাইসেন্স রিনিউ করেছে পুলিশ। তাই বাড়ির রোগী মানুষটার জন্যে আমি এক টাকারও ওষুধ কিনে দিয়ে আসতে পারিনি। কাকেই বা বলব একথা?

শুক্তি—আমি তোমাকে পাঁচ টাকা দেব। তুমি চুপ করো।

কৈলাস—আপনি আমাকে না হয় দিলেন। ভগবান আপকো ভালা করে! কিন্তু আরও যে কত কৈলাস আছে দিদি; তাদের কে দেবে?

শুক্তি—জানি না। কিন্তু তুমি তোমার মহাভারত থামাবে কিনা?

কৈলাস—হ্যাঁ, থেমেছি, থেমেই তো আছি।

শুক্তি—কী বললে?

কৈলাস হাসে। —এই তো মেজর সাহেবকা কোঠি।

চমকে ওঠে শুক্তি। হেসেও ফেলে। লোখরার কাকার বাড়ির গেটের সামনে থেমে আছে গাড়িটা। বাড়ির বারান্দায় আলো জ্বলছে; তাই দেখতে অসুবিধে নেই, দাঁড়িয়ে আছে আর হাসছেন বাণী কাকিমা।

গাড়ি থেকে নামে শুক্তি। —কৈলাস, তুমি একটু জিবিয়ে নিয়ে আর চা খেয়ে তারপর যেও।

কৈলাস—কবে আবার আসতে হবে?

শুক্তি—আমি খবর দেব।

১০

বাণী কাকিমা বলেন—আগেই বলে রাখছি, শুক্তি, যাব-যাব করতে পারবে না। এসেছ যখন, তখন অন্তত দশটা দিন থাকো।

শুক্তি—আমার তো দশটা বছর থাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু...ও কী। ও কী। কে ওটা?

ঘরের ভিতরে চোখ পড়েছে শুক্তির; আর, যেন সাংঘাতিক একটা লোভের বস্তু দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

—ইস! এতদিন ধরে কত ছাই আজেবাজে কথা মনে পড়েছে, অথচ এটার কথা মনে পড়েনি। বলতে বলতে ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে বিছানা থেকে একটা বাচ্চাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে শুক্তি। এটা হল বাণী কাকিমার সেই বাচ্চাটা, এক বছর আগে যেটা বিছানায় শুয়ে শুধু হাত-পা ছুঁড়ত, হামা দিতেও পারত না। আজ এখন সেটা বিছানার উপর বসে, আর, একটা হাত তুলে শুক্তিকে যেন ছোট্ট একটা ঘুসি দেখিয়ে হাসছিল।

বাণী কাকিমা হাসেন। —এটার একটা আশ্চর্য অভ্যেস হয়েছে; ঘরের লোকের কোলে উঠতে কোনও চাড় নেই। কিন্তু বাইরের লোক দেখতে পেলেই কোলে ওঠবার জন্য উসখুস করবে, হাত ছুঁড়বে।

শুক্তি—এটা কী রকমের কথা হল কাকিমা? আমি কি বাইরের লোক?

বাণী কাকিমা—আঃ, আগে শুনে নাও কথাটা। ওই যে, যে লোকটিকে তুমি চাকরির জন্য চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলে, কী-যেন নাম, সুজিত? হ্যাঁ, সে লোকটিকেও কী অদ্ভুত চিনে রেখেছে এইটুকু বাচ্চা! ওকে দেখলেই হাত ছুঁড়বে, কোলে ওঠবার জন্যে ছটফট করবে।

শুক্তি—সুজিত কী করে? কোলে নেয় না?

বাণী কাকিমা—নেয় বইকি। মাঝে মাঝে কাজের অর্ডার নেবার জন্যে তোমার কাকার কাছে সুজিত যখন আসে, তখন সেই তাড়াতাড়ির মধ্যেও দুষ্টুটাকে কোলে নিয়ে পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-সেদিক বেড়িয়ে আসে।

শুক্তি—দুষ্টুর নামটা কী?

বাণী কাকিমা—নাম তো এখনও কিছু হল না। তোমার কাকা ডাকেন, হনুমান।

শুক্তি—ধেৎ! এটার নাম তুলতুল! সত্যি এটা কী নরম তুলতুলে হয়েছে, কাকিমা!

গগন বসুর খুড়তুতো ভাই প্রণব বসু, মেজর বোস; শক্ত করে পাকানো বড়-বড় এক জোড়া গোঁফ যাঁর লম্বা-চওড়া শরীরটার সঙ্গে চমৎকার মানায়, তিনি এক বছব আগে এই ঘবেব ভিতবে শুক্তির দিকে তাকিয়ে, আর হাত তুলে বাণীকে দেখিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—এই মহিলা কেন যে আমাকে বিয়ে করলেন, বুঝি না। তুই কিছু বুঝিস নাকি শুক্তি?

শুক্তি—হ্যাঁ, খুব বুঝি।

প্রণব বসু—কী?

শুক্তি—আপনি এই মহিলাকে বিয়ে করলেন বলে?

প্রণব বসু—যাই হোক, হনুমানের মা একবার বলুক, আমি ওর কোন স্বপ্নটা ব্যর্থ কবে দিলাম। সব সময় কিসের এত অভিযোগ?

বাণী—পুরো তিনটি বছর হল শান্তিপুর যাইনি শুক্তি। তুমিই বলো, মানুষ এই অবস্থা সহ্য করতে পারে?

প্রণব বসু—আমি কোনওদিনও আপত্তি করিনি। আমি তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছি, যত দিন খুশি বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারো। কিন্তু আমার ইচ্ছের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলব, না। যেতে দিতে আমার ইচ্ছে করে না।

বাণী—কেন করে না?

প্রণব বসু—আমি একটি খাঁটি স্ত্রৈণ স্বামী, তাই করে না। বাস, এর ওপর আর কথা কিসের?

কিন্তু প্রণব বসুর মুখের অদ্ভুত গম্ভীরতা তখুনি চেঁচিয়ে হেসে ফেলে। —যাবে যাবে, আমি কথা দিচ্ছি। ডিসেম্বরের আগেই তোমাকে শান্তিপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।

সেদিনের সে ঘটনার হাসির শব্দটাকে এখন হঠাৎ যেন মনের ভিতর শুনতে পেয়েছে শুক্তি। তাই জিজ্ঞাসা করে—প্রণব কাকা কোথায়? কোনও সাড়া পাচ্ছি না কেন?

বারান্দা থেকে একজোড়া শক্ত জুতোর খটমট শব্দ বাজতে বাজতে ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ঘরে ঢুকেই মাথার টুপিটাকে তুলে নিয়ে আর তুলতুলের মাথায় পরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে প্রণব বসু। —শুক্তি, তুই তা হলে সত্যিই এসেছিস? তা হলে এইবার একবার জিজ্ঞেস কর তো বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যাটিকে, গত ডিসেম্বরে তাঁর শান্তিপুর যাওয়া কেন হল না।

বাণী ডাকেন—শুক্তি, তুমি ওর আজেবাজে কথায় কান না দিয়ে এখন বরং...।

প্রণব বসু—আমি সব ব্যবস্থা করেছিলাম, শুক্তি; কিন্তু এই মহিলাই রাগ করে বললেন,

আমাকে শান্তিপুরে পাঠাবার জন্যে তুমি হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন? এখন তুই বল...।

বাণী—তুমি এসো শুক্তি। ওঘরে চলো। দুজনে মিলে চা তৈরি করি আর গল্প করি।

শুক্তি—চলো।

প্রণব বসু—আমারও একটা কথা আছে, শুনে যা। এসেছিস যখন, তখন একদিন এগজিবিশন দেখে, আর একদিন মাছ ধরা দেখে তারপর কদমবাড়িতে যাবি।

শুক্তি—কৃষ্ণচূড়ার দোলনাটা কি নেই?

চেঁচিয়ে ওঠেন প্রণব বসু—আছে বইকি। আয় আমার সঙ্গে, দেখবি আয়।

তখুনি টেবিলের উপর থেকে একটা টর্চ তুলে নিয়ে আর জানালার কাছে এগিয়ে যেয়ে বাইরের অন্ধকারের উপর আলো ফেলেন প্রণব বসু।—ওই দেখ আছে কিনা? ঠিক কিনা?

দেখে খুশি হয়ে হাসতে থাকে শুক্তি। হ্যাঁ ঠিক আছে। সেই কৃষ্ণচূড়া আর সেই দোলনা।

হলই বা ছেচল্লিশ বছর বয়স, প্রণব কাকা আজও ঠিক সেই প্রণব কাকা; এক বছরে একটুও বদলাননি। এই প্রণব কাকাকে তাই বেশ ভাল লাগে। এই লোখবাকেও তাই ভাল লাগে।

বাণী কাকিমা অবশ্যি খুবই শান্ত মানুষ; রাগ করলেও জোরে কথা বলতে পারেন না। প্রণব কাকার হই-চই স্বভাবের শখগুলিকে একটুও পছন্দ করেন না। বাণী কাকিমাকে কিন্তু এইজন্যেই ভাল লাগে।

বছর দুই আগে, সেবারের পুজোর ছুটিতে যখন লোখরা এসেছিল শুক্তি, তখন এই ঘরে বসে কথায় কথায় শুক্তির কাছে অদ্ভুত একটা অভিযোগও করে ফেলেছিলেন বাণী কাকিমা।—বয়সের হুঁস নেই তোমার কাকার। বড় বেশি ছেলেমানুষি বাতিক। দোলনাতে বসে গল্পের বই পড়ে।

শুক্তি হেসে ফেলেছিল।—তাতে তোমার এত আপত্তি কেন?

বাণী—আপত্তি করব না কেন? এতদিন কিছু ছিল না, ছিল না; সে এরকম ভালই ছিলাম। এবার আমাকে কী লজ্জায় ফেলেছে, বলো দেখি?

শুক্তি আশ্চর্য হয়েছিল।—তোমার লজ্জা কিসের? তুমি তো আর দোলনাতে দুলছ না।

বাণীও সেদিন একটু আশ্চর্য হয়ে আর চোখ বড় করে শুক্তির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। তারপরেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে আর হতাশ-উদাস স্বরে একটা আক্ষেপের কথা বলেছিলেন—আমার মাথা খারাপ হয়েছে। কার কাছে কী কথা বলছি!

শুক্তি—কী হল?

বাণী—তুমি ঠিক বলেছ। আমার আবার কিসের লজ্জা? যাই হোক, তুমি কিন্তু এখনও সেই দোলনা-দোলা মেয়েটি, একটুও বড় হওনি।

আজ আবার কাকিমা সেই দু'বছর আগের পুরনো কথার মত একটা কথা বলে হেসে উঠলেন।—এবার আমি আশা করেছিলাম, তুমি একটু বদলেছ। কিন্তু যা দেখছি, তাতে তো মনে হচ্ছে, এই এক বছরেও একটুও বড় হওনি।

শুক্তি—না, বড় হইনি। কিন্তু ওরকম হেঁয়ালি করে কথা বললে আমি এখনই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দোলনাতে বসব আর দুলব।

বাণী—না শুক্তি, লক্ষ্মী, তুমি এখন ওসব আরম্ভ করলে ভদ্রলোকও এখনি বিউগল বাজাতে শুরু করবে।

শুক্তি—কিন্তু কী বলছিলে, বলো।

বাণী—বলবার মত এমন আশ্চর্যের কথা নয়। কিরণদিকে একটা চিঠি দিয়েছি। জানতে চেয়েছি, এখন তোমার বয়স ঠিক কত।

শুক্তি—বাইশ বছর হয়ে গিয়েছে।

বাণী—কিরণদিও তাই লিখেছেন। আমিও শান্তিপুরের চিঠির জবাবে সে কথা জানিয়ে দিয়েছি।

কথা বলে না শুক্তি। শুধু কোলের তুলতুলের দু'হাতের থাবাথাবির নরম উৎপাতের কাছে একটা হাত অলসভাবে এলিয়ে রেখে দিয়ে জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে আনমনার মত তাকিয়ে থাকে। বাণী কাকিমা মুখ টিপে হাসেন। —দেখছি, সত্যিই বড় হয়েছ। ভাবতে শিখেছ তা হলে? আমি মিথ্যে সন্দেহ করেছিলাম।

শুক্তি—আমিও তো দেখছি, তুমি এই একবছরে কত বুড়ি হয়ে উঠেছ।

বাইরের ঘরে প্রণব কাকার নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। শুক্তি বলে—এ কী? কাকা এখুনি ঘুমিয়ে পড়লেন?

বাণী—চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছেন। চায়ের গন্ধ নাকে গেলে জেগে উঠবেন।

শুক্তি—কিন্তু তার আগে তো কাকার এরকম অভ্যেস দেখিনি।

বাণী—সাধে কি অভ্যেস হয়েছে? শেষ রাতে উঠে বেরিয়ে যেতে হয়, ফিরে আসতে এক একদিন বিকেল হয়ে যায়। খুব খাটুনি পড়েছে। নতুন প্লেটুনগুলোর মর্টার ট্রেনিং শুরু হয়েছে।

শুক্তি—অনেক দূরে যেতে হয় বোধ হয়?

বাণী—হয় বইকি। জিপ নিয়ে ছুটছেন, কখনও এ-জঙ্গলে কখনও সে-জঙ্গলে। আব, নদীর কাছে কোনও এক্সারসাইজ থাকলে তো কথাই নেই; ফিরতে রাত হয়ে যায়।

ঘুমন্ত প্রণব কাকা বোধ হয় চায়ের গন্ধ পেয়েছেন। তাই তাঁর ডাক শোনা যায়। —চা কি হল?

শুক্তি হেসে ফেলে। কিন্তু বাণী কাকিমা হাসেন না। বরং বেশ একটু অপ্রসন্ন স্বরে কথা বলেন।—তুমি মনে করছ, শুধু কাজের জন্যেই বাড়ি ফিরতে রাত হয়? না। কাজ শেষ হবার পর মাছ ধরবার জন্যে নদীর জলে ছিপ ফেলে বসে থাকবে। একবার ভেবেও দেখবে না যে, এদিকে একটা মানুষ একা পড়ে আছে।

চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেলেন বাণী কাকিমা।

লোখরার এই রাতটাকে দেখতে বেশ ভাল লাগছে। জানালার দিকে তাকাতেই চোখে পড়েছে শুক্তির, এইটুকু এককুচি চাঁদের আলোতেই আকাশের কালোমেঘ যেন সাদা ধবধবে গুঁড়োর মত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষ্ণচূড়ার মাথা দুলিয়ে দিয়ে হু হু করে ছুটছে লোখরার ময়দানের হাওয়া। কোলের তুলতুল ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই রাত যখন শেষ হয়ে আসে, তখন প্রণব কাকার বুটের খুটখাট শব্দ, কিংবা বাণী কাকিমাব চা-তৈরির ঠুং-ঠাং শব্দ শুক্তির ঘুম ভেঙে দিতে পারে না; এমনই নিবিড় ঘুম। কিন্তু ভোরের দিকের আরও নিবিড় ঘুম হঠাৎ একটা বিউগলের শব্দে ভেঙ্গে যায়।

ধড়ফড় করে বিছানা থেকে নেমে একেবারে খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় শুক্তি।

বাণী কাকিমা বলেন—এ কী? তুমি ওরকম করে হঠাৎ জেগে উঠলে কেন?

শুক্তি—এ কী রকমের বিউগলের শব্দ?

বাণী কাকিমা হাসেন। —কী রকমের আবার? রোজই তো এইরকম বিউগলের শব্দ আর মার্চ করে ওরা চলে যায়।

বাণী কাকিমা ঠিক কথাই বলেছেন। শুনতে পায় শুক্তি, ভোরের বাতাসকে তালে তালে শিউরে দিয়ে বুটের শব্দের কাতার চলে যাচ্ছে। পাশের বাংলোর ক্যাপ্টেন থাপার চাকর কয়লাচাপানো উনানটাতে আগুন ধরিয়ে রাস্তার উপর রেখে দিয়েছে। ধোঁয়া ছড়াচ্ছে উনানটা। তাই দেখতে পাওয়া গেল না, কারা মার্চ করে চলে গেল।

ভোরের বিউগল রোজই বাজে। মেজর বোসের বাড়ির ফটকের ঠিক সামনে এসেই বেজে ওঠে। একদিন বলেই ফেলে শুক্তি।—আমার কী-রকম মনে হয় জান, কাকিমা? বিউগলের শব্দটা যেন ইচ্ছে করে আমাদের বাংলোর ঠিক গেটের কাছে এসে বেজে ওঠে।

বাণী কাকিমা বলেন—হতে পারে। ওরা হয়ত মনে করে, বিউগলের শব্দ শুনে খুশি হবেন মেজর সাহেব।

না, কেষ্টচূড়ার দোলনাতে চড়ে বাণী কাকিমাকে আতঙ্কিত করতে চেষ্টা করেনি শুক্তি, যদিও পাঁচটা দিন এই লোখরাতেই কেটে গেল। বিকেল হয়েছে যখন, তখন এক হাতে তুলতুলকে দোলনাতে বসিয়ে আর ধরে রেখে, আর-এক হাতে আস্তে দুলিয়েছে।

সন্ধে হয়। চায়ের টেবিলে বসে বাণী কাকিমার সঙ্গে কথা বলে শুক্তি।—এবার আমাকে কদমবাড়ি ফিরে যেতে হয় কাকিমা, আর দেরি করা চলে না। বাগানে একটা খবর পাঠাবার...।

শুক্তির কথাটা না ফুরোতেই পাশের ঘর থেকে প্রণব কাকা বলে ওঠেন।—হ্যাঁ, শুক্তি, বি রেডি। এখনই বের হতে হবে।

বাণী কাকিমা আশ্চর্য হয়ে বলেন—কী বলছেন ভদ্রলোক?

প্রণব কাকা—বলছি, শুক্তিকে এখন এগজিবিশন দেখাতে নিয়ে যাব।

বেশ সুন্দর আর বেশ অদ্ভুত এগজিবিশন। মস্ত বড় সামিয়ানার নীচে ময়দানের একপাশের একটা জায়গার উপর নানারকমের তৈরি-করা বিচিত্রতা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নদীর উপর পনটুন ব্রিজ, পুরো প্যাক কাঁধে নিয়ে নদী পার হচ্ছে সৈনিক। দুশমনের মেসিনগানের দিকে তাক করে গ্রেনেড ছুঁড়ছে একলা একজন ভয়ানক শক্ত চেহারার জমাদার। রিমাউন্টের টাট্টু ঘোড়ার তিনটে সত্যিকারের নতুন বাচ্চা শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দানা খাচ্ছে। স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ক্যাপ্টেন থাপার বাগানের টমেটো, যার সাইজ ক্রিকেট বলের চেয়েও বড়। আর ওদিকের ওগুলো বোধ হয় নেফার পাহাড়।

মস্ত বড় একটা ত্রিপলকে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে নেফার পাহাড় তৈরি করা হয়েছে। কালো রঙের প্রলেপ দিয়ে পাহাড়ের পাথুরে গা, আর সবুজ রঙ দিয়ে জঙ্গল আঁকা হয়েছে। ঝর্ণা আর নদীগুলো সাদা। সড়কটা মেটে রঙের। আর পেঁজা তুলোর মোটা একটা লাইন আঠা দিয়ে সেঁটে বরফঢাকা সীমান্তের চেহারাও আঁকা হয়েছে। নীল আলোর খুব ছোট এক-একটা বাল্‌ব জ্বলছে সেই তুলোর বরফ-লাইনের এখানে আর ওখানে—তোয়াং, ঢোলা, ঝুমলা, থাগলা।

সত্যিই যে সুজিতবাবু দাঁড়িয়ে আছে এখানে। হেসে ওঠে শুক্তি। —আপনি এখানে কী করছেন?

সুজিত বলে।—এটা আমি তৈরি করেছি।

শুক্তি—আপনি?

সুজিত—হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন থাপা বলেছেন, আমার এই নেফার পাহাড়ই ফার্স্ট প্রাইজ পাবে।

শুক্তি—বেশ, খুব সুখবর শোনালেন। সত্যিই দেখতে খুব চমৎকার হয়েছে এই নেফা-পাহাড়।

লম্বা একটা স্টিক হাতে তুলে নিয়ে, আর স্টিকের ডগাটাকে বুমলার বরফের গায়ে ছুঁইয়ে দিয়ে সুজিত হাসতে থাকে।—আরও একটা সুখবর পেয়েছি। এই বুমলাতে আমাদের প্লেটুনের পোস্টিং হবে।

—তাই নাকি। খুব ভাল হল। সত্যি খুব ভাল খবর। শুক্তির দুই চোখের তারার উপর নীল বাল্‌বের বুমলার আলোটাও যেন নীলাভ বিস্ময়ের আলো হয়ে হাসতে থাকে।

এতক্ষণ ওদিকে ব্যান্ড-স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন থাপার সঙ্গে গল্প করছিলেন প্রণব কাকা। এইবার হাত তুলে ইশারায় শুক্তিকে ডাক দিলেন। চলে গেল শুক্তি।

আজ ছিল একজিবিশনের শেষ দিন। কাজেই আর একটি দিন পরে ময়দানের সামিয়ানাও অদৃশ্য হয়ে গেল। শুক্তি বলে—আর দেরি করব না কাকা। এবার কদমবাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে দিন; কৈলাস গাড়ি নিয়ে এসে আমাকে নিয়ে যাক।

প্রণব কাকা—আজ নয়, কাল খবর পাঠাব। আজ তুই বরং এখুনি তৈরি হয়ে নে। কুইক।

শুক্তি—কেন?

প্রণব কাকা—মাছ ধরবি, চল।

বাণী কাকিমা ভ্রূকুটি করেন।—এ কী কথা।

প্রণব কাকা—তার মানে আমি মাছ ধরব, শুক্তি শুধু বসে বসে দেখবে।

বাণী কাকিমা—তাতে শুক্তির লাভ কী?

প্রণব কাকা—শুক্তির লাভ, বসে বসে নদীর বিউটি দেখবে। নদী জিয়াভরলি, একেবারে জীবন্ত বুঝলি।

শুক্তির আপত্তি নেই। তাই বাণীও আর আপত্তি করেন না। বরং রান্নাঘরে ঢুকে এক ঘন্টার মধ্যে একগাদা লুচি ভেজে আর হালুয়া তৈরি করে হাঁপিয়ে উঠলেন। এক হাতে খাবারের বাস্কেট তুলে নিয়ে, আর-এক হাতে শুক্তির একটা হাত ধরে প্রণব কাকাও জিপে উঠলেন।

গরগর করে শব্দ করছে জিপের ইঞ্জিন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর জিপের দিকে তাকিয়ে বাণী বলেন—আস্তে চালিও।

মেজর পি. বোস সেই মুহূর্তে তাঁর বাঁ পায়ের বুটের গোড়ালির সব জোর দিয়ে অ্যাক্সিলেটার চেপে দিলেন। চিতে বাঘের মত তিনটে লাফ দিয়েই মত্ত হয়ে ছুটে চলল জিপ।

—অনেকটা রাস্তা। তাড়াতাড়ি না গেলে তাড়াতাড়ি ফিরব কি করে? তোর কাকিমার কমনসেন্স একটু কম, যদিও মানুষ ভাল। মেজর বোসের গলার স্বরও যেন একটা ছুটন্ত আনন্দে গরগর করে হাসতে থাকে।

—ওই যে ছেলেটা, তোব চিঠি নিয়ে চাকরির জন্যে আমার কাছে এসেছিল...।

শুক্তি—সুজিত।

মেজর বোস—হ্যাঁ, সুজিত ছেলেটা আমার চেয়েও বড় ট্যালেন্ট।

শুক্তি—কী বললেন কাকা?

মেজর বোস—মাছ ধরতে সাংঘাতিক ওস্তাদ। সেদিন আমাকে কেমন সরল করে বুঝিয়ে দিল, টোপের ঝুল আরও দু'হাত বাড়িয়ে দিন; তা না হলে এরকম স্রোতের জলে বড় মাছ পাবেন না। সত্যি, টোপের ঝুল বাড়িয়ে দিয়ে ছিপ ফেলতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইয়া বড় একটা সাতসেরি চিতল গেঁথে ফেললাম। তাই আমি...।

লোখরা ময়দানের সীমানা পার হয়ে জিপ এখন একটা আমবাগানের ছায়াঘেঁষা কাঁকরে রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। আমবাগানের ভিতরে অনেক তাঁবু।

মেজর বোস হঠাৎ ব্রেক দাবিয়ে জিপ থামালেন।—তাই আমি যখনই মাছ ধরতে যাই, তখন হাবিলদার সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে যাই। আগেই ওকে একটা খবর দিয়ে রাখি। থাপাকে বলে ওর একবেলার ছুটি করিয়েও নিই।...ওই যে এসে পড়েছে।

আমবাগানের তাঁবুর ভিড়ের ভিতর থেকে বের হয়ে, একটা ছিপ আর একটা থলি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে সুজিত।

ছিপ-ধরা হাতটা জিপের বাইরে রেখে পিছনের সিটের উপর উঠে বসে সুজিত। সামনের সীট থেকে শুক্তি মুখ ফিরিয়ে তাকায় আর হেসে ফেলে।—আপনি মাছ ধরতে ওস্তাদ?

সুজিত হাসে—সাহেব তাই বলেন।

মেজর বোস—পটাশালিতেই যাওয়া যাক, কী বল সুজিত?

সুজিত—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

কলকল করে জিয়াভরলির জলের স্রোত যেন পটাশালির যত শিলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার এক বিপুল কল্লোল তুলে ছুটে চলেছে। ভেসে চলেছে রঙিন হাঁসের সারি। কিনারা থেকে লতার

ঝোপ ঝুঁকে ঝুঁকে জিয়াভরলির জলের দুরন্ত ফূর্তির বুকটাকে দেখছে। জলের ভিতর থেকে ছোট ছোট উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক হঠাৎ ছটফটিয়ে লাফিয়ে উঠেই আবার ডুবে যায়। রোদ লেগে হীরার কুচির মত ঝিকমিকিয়ে জ্বলে ওঠে উড়ুক্কু ছোট-মাছের গা।

সুজিত যেখানে বসতে বলেছে, ঠিক সেখানেই বসেছেন মেজর বোস। শক্ত করে ছিপ ধরে আর ফাতনার দোলার দিকে তাকিয়ে ধ্যানীর মত বসে থাকেন। চার ঘন্টার মধ্যে তিনটে ফলুই তুললেন সাইজ আর ওজন মন্দ নয়।

শুক্তি যখন খাবারের বাস্কেট খোলে, তখন তিনটে খাবারের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসতে থাকেন মেজর বোস।—তোর কাকিমার বেশ কমনসেন্স আছে, তাই না, শুক্তি? তিনটে প্যাকেট করে দিয়েছে, তোর আর খাবার নাড়া-চাড়া করবার কোনও ঝঞ্ঝাটে ভুগতে হল না। ওসব অভ্যেসও তোর বোধ হয় নেই।

শুক্তি হাসে।—তা হলে বাড়ি গিয়ে বাণী কাকিমাকে একটা ধন্যবাদ জানাবেন।

এতক্ষণে প্রণব কাকার পাশে বসে আর জলের শব্দ শুনে শুনে শুক্তির চোখের পাতা তিনবার জড়িয়ে গিয়েছে; ঘুমের আবেশ সামলাতে গিয়ে কয়েকবার হেলেপড়া মাথাটাকেও সামলাতে হয়েছে। প্রণব কাকা অবশ্য একবার বলেছেন, ঘুমোতে হলে যা, জিপের সিটে বসে ঘুমোগে। কিন্তু কাকার কথার তো কোনও মানে হয় না; জিপের কাছে একটা গাছের ছায়াতে যে চুপ করে বসে আছে সুজিত।

খাবারের একটা প্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে সেই গাছের ছায়ার দিকে তাকায় শুক্তি। সুজিতও এসে খাবারের প্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

শুক্তি বলে—আর কত দেরি করবেন, কাকা?

প্রণব কাকা বলেন—মনে হচ্ছে, চুপ করে বসে থাকতে তোর আর ভাল লাগছে না, তাই না?

শুক্তি হাসে—হ্যাঁ।

প্রণব কাকা—তবে কী করবি?

শুক্তি—আমি বরং...

প্রণব কাকা—বেশ তো, একটু ঘুরে ফিরে দেখ।

ঘুরে ফিরে আর কী দেখবারই বা আছে? দেখতে পায় শুক্তি, একটু দূরে সেগুনের ছায়ার কাছে সাদাটে চেহারার একটা পাথর স্রোতের জল ছুঁয়ে একটা আরামের বেদির মত পড়ে আছে।

এগিয়ে যেয়ে, সাদাটে পাথরের উপর বসে, আর উঁকি ঝুঁকি দিয়ে নীচের স্রোতের জলের ঘূর্ণিটাকে দেখতে থাকে শুক্তি।

—জলে পা ডোবাবেন না কিন্তু। ডাক দেয় সুজিত। শুনতে পায় শুক্তি।

মুখ ফিরিয়ে দেখতেও পায় শুক্তি, এগিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুজিত। এদিকের এই সাদাটে পাথরের দিকে তাকিয়ে আছে আর হাসছে।

শুক্তি বলে—ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছেন? এখানে এসে দেখুন।

আরও কাছে এগিয়ে আসে সুজিত। সাদাটে পাথরটার উপরে উঠেই ব্যস্তভাবে বলে—আঃ, এখানে এই ঘূর্ণিটাকে এত দেখছেন কেন? হঠাৎ মাথা ঘুরে যেতে পারে। বরং ওখানে তাকিয়ে দেখুন।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, স্রোতের এই ঘূর্ণিটার দিকে আর না তাকিয়ে, মাঝনদীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকে শুক্তি।

ওখানে মাঝনদীর রোদমাখানো জল, যেন গলা সোনার ঢল। এখানে ছায়া। সেগুনের পাতার

আড়ালে বসে কতরকমের সুরে শিস দিচ্ছে পাখি। জলের গুঁড়ো ছিটকে এসে চোখে-মুখে লাগছে। জলের শব্দটাও অদ্ভুত; পাথরের কাছে এসে ছলছল করে, ছায়ার কাছে কলকল করে।

যেন হঠাৎ-বিহ্বল একটা খুশির গুঞ্জন। আপনমনের একলা ভাষার মত গুনগুন করে কথা বলে শুক্তি।—সত্যি চমৎকার। জিয়াভরলি সত্যি জিয়া ভরলি। প্রাণ ভরে গেল।

১১

গৌহাটি থেকে যাত্রীতে ভর্তি হয়ে আর অনেক মেঘ পার হয়ে প্লেন এখন কলকাতার কাছাকাছি আকাশে এসে পড়েছে। বোধ হয় আর দশ মিনিটের মধ্যে দমদম পৌঁছে যাবে এই প্লেন, এই ডাকোটা যার পাইলট হলেন সেই চেনা-মুখ ভদ্রলোক।

কিন্তু এ তো বড় অদ্ভুত অস্বস্তি। এই চেনা আকাশের আসা-যাওয়ার পথে কোনওদিনও এরকমের অস্বস্তি বোধ করেনি শুক্তি। অস্বস্তিটা যেন একটা করুণ কৌতুক।

এ অস্বস্তিকে ভয় করবার কিছু নেই, লজ্জা করবারও কোনও মানে হয় না। কিন্তু, কী আশ্চর্য, শুক্তি হেসে ফেললেও অস্বস্তিটা যেন লজ্জিত হয় না, সরেও যায় না; বরং বেশ করুণ-শান্ত মুখটা নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, আকাশের পশ্চিমের একটা মেঘের দিকে চোখ তুলে তাকায়; তারপর সিগারেট ধরিয়ে কোন দিকে যেন চলে যায়।

কদমবাড়ি থেকে রওনা হবার দিন সত্যিই মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর একবার তেজপুরের একটা দিন; তারপর আর নয়। তারপর আর যা-কিছু দেখতে হল আর শুনতে হল, তার সবই তো মন হাসিয়ে দেবার মত এক-একটা বিস্ময়ের আচমকা আলোর ঝিলিক। শুধু এই অস্বস্তিটা, যেটা গৌহাটি থেকে প্লেন ছাড়তেই শুক্তির মনের শান্তির একটা নতুন উৎপাত হয়ে উঠেছে, সেটা শুক্তিকে হাসিয়ে দিয়েও হঠাৎ এক-একবার একটু গম্ভীর করে দেয়।

কথা ছিল ড্রাইভার কৈলাস গাড়ি নিয়ে শুক্তিকে কদমবাড়ি থেকে তেজপুরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু কৈলাস নয়; শেষ পর্যন্ত উপেন মিস্তিরি এসে সাহেবকুঠির টুরারের স্টিয়ারিং-এ বসল আর শুক্তিকে তেজপুরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

মঙ্গলদই থেকে চিঠি পেয়েছে কৈলাস, কৈলাসের স্ত্রী মারা গিয়েছে। কিন্তু কাঁদেনি কৈলাস, শুধু গ্যারেজের একটা পুরনো গাড়ির সিটের ছেঁড়া গদির উপর অনেকক্ষণ ধরে স্তব্ধ মড়ার শরীরের মত লুটিয়ে পড়ে রইল। তারপরেই উঠে এল কৈলাস; সাহেবকুঠির সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আর গগন বসুর মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে, ফরফর করে ওর লাইসেন্সটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিল—মাপ করবেন হুজুর, আমি আর চাকরি করব না।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করে কৈলাস, কিন্তু হাসতে পারে না। তবু বেশ শান্তস্বরে বলে—আপনার কাছ থেকে পাঁচ টাকা বকসিস নেবার আর দরকার হল না, দিদি।

শুক্তি—তুমি এখন কোথায় যাবে? কী করবে?

এইবার হেসে ফেলে কৈলাস।—দেখি, কোথায় যাই। দেখি কী করতে পারি। ভিখারী যোগী কিংবা পরমহন্স, কিছু একটা হতে হবে তো।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কৈলাস। তারপর কৈলাসের চোখ দুটো যেন শক্ত হয়ে ইস্পাতের গুলির মত চিকচিক করে উঠল।—শুনেছি সেই পুলিশ মহারাজ মঙ্গলদই থেকে বদলি হয়ে তেজপুরে এসেছেন। তরক্কি হয়েছে তাঁর, আওরভি উঁচা তক্ত পর বসেছেন। আচ্ছা চলি; নমস্তে হুজুর, নমস্তে দিদি।

বাবাকে একবার বলে দেখলে হত, কৈলাসকে অন্তত দু'মাসের মাইনের মত টাকা বকসিস

করে দাও। যাকগে, না বলে ভালই হয়েছে। সে বকসিস নিতে কৈলাস রাজি হত কিনা সন্দেহ। কৈলাসের তো মাথার ঠিক নেই।

না, ইনি চেনা-মুখ নন, এই এয়ার-হোসটেস। ইনি বোধ হয় সাউথ ইন্ডিয়ার মেয়ে। শান্তি কাপুর থাকলে আজও নিশ্চয় সেবারের মত নিজেই কাছে এসে আর গল্প করে চলে যেত। কিন্তু কে জানে, আবার হঠাৎ কী-কথা বলে ফেলত আর মুখ টিপে হাসত। শান্তির চোখের কোণে সব সময় যেন ভয়ানক একটা বুদ্ধির হাসি চিকমিক করে।

মালতীর চোখে কিন্তু আগের মত সেই দুষ্টু খুশির হাসি আর চিকচিক করে না। হাসে বটে মালতী, কিন্তু বড় বেশি শান্ত হাসি। জিজ্ঞাসা করেছিল শুক্তি, হাতির দাঁতের সেই চিরুনিটা আছে তো মালতী?

মালতী—আছে।

শুক্তি—মাঝে মাঝে মাথায় দাও তো?

মালতী—এই তো মাথাতেই রয়েছে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে, আবাব হেসেও ফেলে মালতী।

মালতীর দাদা শিশিরবাবু একটা নতুন চাকরি নেবার খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাননি। মালতী বলে—সরকারি এগ্রিকালচারের চাকবি। একটা পরীক্ষাও হয়েছিল, ইন্টারভিউও হয়েছিল। সব চেয়ে বেশি নম্বরও পেল দাদা। জানই তো, দাদা খুব ভাল বোটানি জানে।

শুক্তি—জানি।

মালতী—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না।

শুক্তি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পেল কে?

মালতী—পেয়েছে সুবীর শর্মা নামে কে একজন, কোন এক মিনিস্টারের সেক্রেটারির ভাগ্নে, ইন্টারমিডিয়েটও পাস করেনি। আজ আবার...।

শুক্তি—আজ আবার কী হল?

মালতী—বোধ হয় বেলওয়ে কিংবা এল আই সি-র চাকরি, দরখাস্ত করবাব ফরম আনতে সরকারি অফিসে গিয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যে আর ফরম পাওয়া হল না।

শুক্তি—কেন?

হেসে ফেলে মালতী।—কেরানিবাবু বললেন, ফরম পেতে হলে অন্তত আমার সঙ্গে একটু ভদ্রতা করুন।

শুক্তি—তার মানে?

মালতী—তার মানে অন্তত পাঁচটা টাকা দিন, পান খাওয়ার জন্যে।

শুক্তিও হেসে ফেলে।—কী রকম লোক রে বাবা!

মালতী—তারপর যা হবার তাই হয়েছে। দাদার যা স্বভাব, কেরানিবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বলেও কোনও ফল হল না। তিনি বললেন, বাড়ি যান মশাই, মাথা গরম করবেন না।

শুক্তি—শিশিরবাবু এখন বাড়িতে নেই বোধ হয়।

মালতী—না; বউদিকে নিয়ে ডাক্তার মুখার্জির কাছে গিয়েছে।

শুক্তি—কী হয়েছে প্রমীলার?

মালতী—হার্টের কষ্ট।

শুক্তি—সেরে যাবে নিশ্চয়।...আচ্ছা চলি...না, আজ আর চা খেতে ইচ্ছে করছে না, মালতী।

মালতীদের বাড়ির বাইরে এসে একবার, আর রবার বাড়িতে ফিরে এসে একবার, খুব জোরে হাঁপ ছেড়েছিল শুক্তি।

সব শুনেও মেসোমশাই মহিমবাবু কিন্তু অদ্ভুত কথা বললেন আর হাসলেন।—হ্যাঁ, এসব একটু দুঃখের কথা বটে; কিন্তু ঝগড়াঝাটি আর তর্কাতর্কিও কাজের কথা নয়। একটু সহ্য করতে হয়ই। তা ছাড়া, ভাগ্য নামে একটা ব্যাপার আছে; সেটাও তো অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীর চওড়া বারান্দার মোজেয়িকের উপর আস্তে-আস্তে হাঁটছেন আর কথা বলছেন মহিম দস্তিদার। মাঝে মাঝে আলোর কাছে এসে থামছেন আর মুগার চাদরটাকে ভাল করে গায়ে জড়াচ্ছেন। দেখতে অদ্ভুত লাগে, মেসোমশাই মানুষটা নিজে এত আলোকিত বলেই বোধ হয় বাইরের কোনও অন্ধকার তাঁর চোখে পড়ে না। ভাল কথাই তো বললেন মেসোমশাই, কিন্তু কেমন-যেন হেঁয়ালির মত কথা। ঠিক বুঝতে পারা যায় না।

শুধু কি একা মহিম দস্তিদার? এই ভারতীর বাইরের ঘরে মহিমবাবুর যেসব বন্ধু আসেন আর গল্প করে চলে যান, যেমন শৈলেশ্বর শইকিয়া আর মহাদেব চৌধুরী, তাঁরাও সবাই ঠিক ওই রকম হেঁয়ালির মত কথা বলেন, আর দুঃখিতভাবে হাসেন। শৈলেশ্বর শইকিয়ার অনেক বাড়ি আছে এই তেজপুরে; তা ছাড়া গৌহাটিতে আর শিলং-এ। ইনকম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী তিন ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন; দুই জামাইকে দুটি বাড়ি উপহার দিয়েছেন। তা ছাড়া যখন-তখন, প্রায় প্রতি মাসে সোনা কেনাও তাঁর একটা অভ্যাস।

কিন্তু মণিমাসি হঠাৎ খুশি হয়ে যেকথা বলে উঠলেন, তার মধ্যে কোনও হেঁয়ালির ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। ভাবতে পারেনি শুক্তি, মণিমাসির মত মানুষ, যিনি সোম লজ থেকে ফিরতে একটু দেরি হলে দশবার দশবকমের কথা জিজ্ঞেস করেন, তিনি নিজেই এরকম একটা কথা বলে ফেলবেন।

সেই সোম লজ। ভিতরেব ঘরে অঞ্জলির সঙ্গে গল্প করছেন মণিমাসি। আর, সোনালি রঙের গ্রিল দিয়ে ঘেরা বারান্দার ঠিক সেখানে সেই চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে অনিমেষ।

ব্রহ্মপুত্রের জলের কোনও ঢেউযের শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু শুক্তির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনিমেষের গলার স্বরে যেন ঢেউ জেগেছে, যদিও গল্পের কথাগুলি নতুন রকমের কোনও কথা নয়। তেজপুর এয়ারপোর্ট থেকে সামান্য একটু দূরে একটা বিল আছে; নাম শোলমারা বিল।

—নাম শুনে ঘাবড়ে যাবেন না। লোকে বলে, আকাশে যদি পূর্ণিমা চাঁদ থাকে, আর বিলের জলে তখন যদি একটা সাদা হাঁস উড়ে এসে নামে, তবে তখুনি দেখা যাবে যে, বিলের জলের উপর নীলপদ্ম ফুটে রয়েছে। কাল তো পূর্ণিমা, চলুন না, একবার দেখেই আসি, সত্যি নীলপদ্ম ফোটে কিনা।

অনিমেষের এই উতলা অনুরোধের একটা জবাব দিতে হবে। কিন্তু কী জবাব দিতে পারে শুক্তি? নীরব শুক্তির নিঃশ্বাসের বাতাসের সঙ্গে যেন হাঁসফাঁস করছে শুক্তির প্রাণের সব সাহস।

কিন্তু কী আশ্চর্য, মণিমাসি নিজেই হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে কত সহজে বলে দিলেন—বেশ তো, যাও না দু'জনে, একবার জায়গাটা বেড়িয়ে দেখে এসো।

অনিমেষ হাসে।—উনি যদি আপত্তি না করেন তবেই তো যাওয়া সম্ভব।

মণিমাসি—না, না, আপত্তি করবার কী আছে? আপত্তি করবে কেন শুক্তি?

শুক্তিও এইবার হাসতে চেষ্টা করে।—আমি আপত্তি করছি না। কিন্তু...।

মণিমাসি—কিসের কিন্তু?

শুক্তি—কলকাতা থেকে ফিরে আসি, তারপর না হয় যে কোনও দিন...

মণিমাসি—বেশ তো; তাই না হয় হবে, আপত্তি না থাকলেই হল।

সেদিনের পর আর যে দুটো দিন তেজপুরে থাকতে হয়েছিল, তার মধ্যে আর একবারও সোম লজে যাওয়া হয়নি শুক্তির, যদিও অনেকবার মনে পরেছে, সন্ধ্যাবেলায় সোম লজের বারান্দায় একটা চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন অনিমেষবাবু। আপত্তি নেই, শুধু এই

একটা কথার মধ্যে কে-জানে-কিসের সান্ত্বনা পেয়ে গেলেন অনিমেষবাবু, যে জন্যে শুক্তির মুখের দিকে ও রকম অদ্ভুত শান্ত একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইলেন।

নতুন পাড়ার মীরা কাকিমাও যে অদ্ভুত একটা গল্প বলে হাসিয়ে দিলেন। কল্পনা করতে পারেনি শুক্তি, মীরা কাকিমার কাছে গেলে হঠাৎ এরকম একটা গল্প শুনতে হবে। গল্প বটে, কিন্তু সেটা মীরা কাকিমার নিজেরই একটা চিন্তার কীর্তি।

শীতল বিশ্বাস গরিব মানুষ, মীরাও গরিবের ঘরের মেয়ে। কিন্তু মীরার মামার বাড়ি খুবই বড় ধরনের বড়লোকের বাড়ি। সেকথা তো জানাই ছিল শুক্তির; মণিমাসিও শুক্তির কাছে শীতলের বউ মীরার মামার অগাধ সম্পত্তির কাহিনী অনেকবার বলেছেন। আমেরিকা থেকে জাহাজে বোঝাই হয়ে মীরার মামার আমদানির মেশিন আসে। কারবারের হেড অফিস বোম্বাই, সে অফিস দেখাশোনা করে মীরার মামার বড় ছেলে রাজীব। মীরার মামা-মামী থাকে নাসিকে, গোদাবরীর কাছে শখের দুর্গের মত মস্ত বড় এক বাড়ি। সে বাড়ির বাগানের ভিতরে টেনিস খেলবার তিনটে কোর্ট আছে।

দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত এই রাজীবের গল্প বলে বলে শুক্তির মনের যত সন্দেহ বিস্ময় আর কৌতুকের প্রাণ অক্লান্ত করে দিলেন মীরা। রাজীব সত্যিই রাজীব, দেখতে খুব ভাল। স্বভাবে বা কথায় এক ফোঁটা অহংকার নেই। রাজীব একদিন ওর অফিসের কেরানি সদাশিব নাইডুর বুড়িমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল।

হেসে ফেলে শুক্তি।—আমাকে হঠাৎ একটা ট্রেজার আইল্যান্ডের গল্প শুনিয়ে তোমার লাভ কী মীরা কাকিমা?

মীরা—আমার লাভ এই যে, তোমার লাভ হতে পারে।

শুক্তি—বাস, আর নয়, এইবার এখানে তোমার গল্প থামিয়ে অন্য কথা বলো।

মীরা—আমি কিন্তু নাসিকে মামীর কাছে চিঠি লিখে দিয়েছি।

শুক্তি—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

মীরা—রাগ করলে নাকি?

শুক্তি হেসে ফেলে। —এত মজার একটা গল্প শুনে কি কেউ রাগ করে?

মীরা—যাক, তা হলেই হল।

হঠাৎ শুক্তির চোখ দুটো একটু চমকে ওঠে, আর বড়-বড় হয়ে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকায়। —দেয়ালের গায়ে ওটা কী বস্তু ঝুলিয়ে রেখেছ, মীরা কাকিমা?

একটা সামান্য বস্তু। ছোট-ছোট রঙিন পাথর-নুড়ির একটা মালা। ছোট মেয়ের খেলবার জিনিস নয়, মীরার মত বয়সের বাঙালি নারীর গলায় পরবার জিনিসও নয়।

মুখে হাত রেখে হাসি চাপতে চেষ্টা করেন মীরা।—বলতে পারি, কিন্তু বলা উচিত নয়; মণিদি বলে রেখেছেন, শুক্তির কাছে কখনও এ-গল্প বলবে না।

শুক্তি—তা হলে বলো না।

মীরা—তা হলে বলেই ফেলি। ওটা হল দফলা-মেয়ে সেই রেনকির রাগের মালা।

শুক্তি—তার মানে?

মীরা—তার মানে অনুরাগের মালা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, রেনকি একদিন এই মালাটাকে ওই ঝোলার ভেতর থেকে বের করে রতন ঠাকুরপোর হাতের কাছে...

শুক্তি—থাক, এবার তুমি চুপ করো।

কিন্তু মীরা কি চুপ করে থাকবার মত মানুষ? তাড়াতাড়ি করে একটা রেকাবি ভর্তি করে একগাদা জিলিপি নিয়ে এসে শুক্তির হাতের কাছে এগিয়ে দিলেন।—খাও আর শোনো। এমন কিছু বাজে কথা নয় যে শুনতে তোমার খারাপ লাগবে।

রেনকি সেদিন রাগ করে চলে যাবার পরেই দেখতে পেয়েছিলেন মীরা, ঘরের কোণে একটা

বাক্সের পিছনে ওই মালাটা পড়ে আছে। রেনকি নয়; রতনই মালাটাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল। মীরার কাছে একদিন একেবারে স্পষ্ট করে বলে ফেলেছিল রেনকি, আমি তোমাদের রতনের কাছে বউ হয়ে থাকব।

মীরা জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু রতন কী বলে?

রেনকি—রতন বলে, তা হয় না।

মীরা—তবে কী করে হবে?

রেনকি—তবে আমার মুখে রঙ দিয়েছিল কেন রতন?

মীরা—দিয়েছিল নাকি?

রেনকি—নিশ্চয়, রতনকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

মীরা—তোমার মুখে কেন রঙ দিল রতন?

রেনকি—আমি বলেছিলাম।

মীরা—কেন বলেছিলে?

রেনকি—রতন বলেছিল, যাকে ভাল লাগে তার মুখে রঙ মাখিয়ে দিয়ে পরব করে ওর দেশের লোক।

মীরা—কিন্তু তোমাদের বিয়ে কী করে হবে রেনকি? সরকারি মানা আছে যে?

আর কোনও কথা বলেনি রেনকি। শুধু ঘরের আয়নাটার দিকে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

মীরা বলে—সত্যি শুক্তি, রেনকি যেন আয়নাতে ওর মাথার ওই নতুন খোঁপা, গায়ের জরি-হাতা ব্লাউজ, আর রঙিন তাঁতের শাড়িপরা চেহারাটারই ওপর রাগ করে মুখ ফিরেয়ে নিল। দেখতে আমারও বেশ একটু কষ্ট হয়েছিল শুক্তি।

শুক্তি—রতন কাকা নেফা থেকে আর এখানে আসেননি?

মীরা—না।

শুক্তি—আসবেন নিশ্চয়। ছুটি পেলেই আসবেন।

মীরা—তাই যেন হয়।

বেচারা দফলা-মেয়ে, বোকা রেনকি! বেচারা রতন কাকা, নেফা মেডিক্যালের পিয়ন। কিন্তু সরকারি আইনের নিষেধটাকে বেচারা বলতে একটুও ইচ্ছে করে না। মীরা কাকিমার কাছ থেকে এ গল্পটা না শুনলেই ভাল ছিল। হাতে ধরা গল্পের বইটার পাতার উপর শুক্তির চোখ পড়ে থাকলেও হঠাৎ এক-একবার চোখের সামনে যেন রেনকির পাথুরে মালাটা দুলে ওঠে। তাই বইটাকে এখন বন্ধ করে রেখে দিতে ইচ্ছে করে।

গৌহাটি এয়ারপোর্টের মাথার উপর এসে আর কাত হয়ে প্লেন নামতে শুরু করেছে। খোলা বইটা বন্ধ করে হাতব্যাগের ভিতরে ভরে দেয় শুক্তি।

তারপর আর নেফার দফলা-মেয়ে রেনকির কথা নয়, কদমবাড়ির গগন বসুর মেয়ে শুক্তি বসুরই একটা অদ্ভুত হঠাৎ-বিস্ময়ের অস্বস্তিকে এতক্ষণ ধরে হাসিমুখে সহ্য করতে চেষ্টা করেছে শুক্তি। মনে হয়, এই প্লেন থেকে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত এই অস্বস্তি দূর হবে না। দমদম পৌঁছতে কি দশ মিনিটের আরও বেশি সময় লাগবে?

গৌহাটিতে নেমে বিরামের পঁচিশ মিনিট সময় অনায়াসে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের কোচের উপর আর গল্পের বই পড়ে কাটিয়ে দিতে পারা যাবে, এই তো আশা করেছিল শুক্তি। কিন্তু সে আশা যেন একটা আচমকা আষাঢ়ে গল্পের সামনে পড়ে মিথ্যে হয়ে গেল।

পাইলট ভদ্রলোক হঠাৎ কোথা থেকে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন।—আমি আপনাকে চিনি। কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন না; পরিচয় দিলেও চিনতে পারবেন বলে মনে হয় না।

চমকে ওঠে শুক্তি।—আমি তো সত্যি আপনাকে চিনি না। শুধু আগে দু'একবার দেখেছি। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে?

—এখানে অনেকেই তো আপনাকে চেনে। জিজ্ঞেস করলে ক্যান্টিনের ম্যানেজারও বলে দিতে পারবেন যে, আপনি প্ল্যান্টার বোস সাহেবের মেয়ে। কাজেই আপনার পরিচয় জেনে নিতে আমার বেশি খোঁজ করতে হয়নি।

শুক্তি—প্লেন ছাড়তে আর কত দেরি?

—দেরি আছে। অন্তত আরও বিশ মিনিট না পার হলে প্লেন ছাড়বে না। আপনার বাণী কাকিমা কিন্তু আমাকে চেনেন। আমাদের বাড়ি শান্তিপুর। আমার নাম পরিতোষ মৌলিক।

শুক্তি—আমি শান্তিপুর কখনও দেখিনি।

পরিতোষ—দেখলে আপনার খুব খারাপ লাগবে না মনে হয়। আপনার বাণী কাকিমার বাবা হলেন আমাদের পাশের বাড়ির প্রতাপবাবু; আত্মীয় না হয়েও তিনি আমাদের প্রায় আপন-জন। ছেলেবেলায় প্রতাপকাকাকে খুব ভয় করতাম; উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে যখন বুঝতাম যে প্রতাপ-কাকা বাড়ি নেই, তখন ডাণ্ডাগুলি হাতে নিয়ে খেলতে বের হতাম।

শুধু হাতঘড়ির উপর দু'চোখের দৃষ্টিটাকে বসিয়ে রেখে, আর নিজেকে একেবারে নীরব করে নিয়ে বসে থাকে শুক্তি।

পরিতোষ—আপনি বোধ হয় একটু আশ্চর্য হয়েছেন, আর বেশ বিরক্ত বোধ করছেন। সবই বুঝেছি; তবু সাহস করে আপনাকে আর একটু আশ্চর্য করে দিতে চাইছি।

শুক্তি—কী বললেন?

পকেট থেকে একটা ফটো বের করে পরিতোষ।—এটা নিশ্চয় আপনার ফটো?

চমকে ওঠে শুক্তি—এ কী!

পরিতোষ হাসে।—চুরি করিনি।

শুক্তি—একথা কেন বলছেন? আমি কি তাই মনে করেছি?

পরিতোষ—তবে কী মনে করলেন?

শুক্তি—ভাবছি, আপনার কাছে আমার ফটো কেমন করে এল?

পরিতোষ—মনে নেই কি আপনার? অনেক দিন আগে একবার আপনার ব্যাগ থেকে...।

শুক্তি—হ্যাঁ, কয়েকটা ফটো পড়ে গিয়েছিল আর আপনি কুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পরিতোষ—তবু বলছি, সন্দেহ করবেন না। তখুনি চুরি করে আপনার এই ফটোটাকে লুকিয়ে রাখিনি। আপনি প্লেন থেকে নেমে যাবার অনেক পরে, হঠাৎ আমার চোখে পড়েছিল, এই ফটোটা সিটের নীচে পড়ে আছে। হ্যাঁ, বলতে পারেন, আপনার ঠিকানায় ফটোটা ফেরত পাঠিয়ে না দেওয়া অন্যায় হয়েছে।

কোনও কথা না বলে আবার চোখ নামিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় শুক্তি। পরিতোষ বলে—এই নিন আপনার সেই ফটো; আর, কিছু মনে করবেন না যেন।

ফটোটাকে শুক্তির হাতব্যাগের উপর রেখে দিয়ে সরে যায় পরিতোষ। এইবার ব্যস্তভাবে নিজেরই হাতঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর এগিয়ে যেয়ে লাউঞ্জের বাইরের বারান্দায় লতানে গোলাপের কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের একটা মেঘের দিকে তাকায়। তারপর সিগারেট ধরায়। তারপর অন্যদিকে চলে যায়।

বুঝতে পারে না শুক্তি, ফটোটাকে হাতব্যাগের ভিতর ভরতে গিয়ে হাতটা কেঁপে উঠল কেন? পরিতোষবাবুকে কি একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল? কিংবা, বলে দেওয়াই উচিত ছিল, ও ফটো আর ফেরত দেবারই বা কী দরকার? দেড় বছর ধরে যে ফটো একজন অচেনা মানুষের কাছে ছিল, সে ফটো শুক্তি বসুর নিজের ফটো হলেও হাত দিয়ে স্পর্শ করতে সত্যিই যে বেশ

অস্বস্তি বোধ করতে হয়।

ভদ্রলোককে কিন্তু মুখর স্বভাবের মানুষ বলে মনে হল না। তবে চক্ষুলজ্জা নিশ্চয় একটু কম। অজানা অচেনা মেয়ের ফটো দেড় বছর ধরে নিজের কাছে পুষে রেখেছেন, এই কথাটাকেই তো খুব ভদ্রভাবে বলে চলে গেলেন। কিছু মনে করবেন না, একথা বলবারও কোনও মানে হয় না।

বাষ্প করেনি প্লেন, কিন্তু শুক্তি বসুর এই অস্বস্তির মন যেন হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে ওঠে। বুকের ভিতর একটা ভীরু নিঃশ্বাসের বাতাস ভয়ানক একটা সন্দেহ হয়ে দুলতে থাকে। লোখরা থেকে বাণী কাকিমার শান্তিপুরে লেখা চিঠিটার মানে কি এই পাইলট ভদ্রলোক, এই পরিতোষ মৌলিক?

আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে না, ভালও লাগে না। এই অস্বস্তি এখানেই মরে যাক। চেনা আকাশের পথে এ কী বিশ্রী দুর্ঘটনার মত একটা অচেনা মেঘের উপদ্রব!

যাক, এইবার নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। নামতে শুরু করেছে প্লেন।

প্লেন থেকে নেমে দমদমেব মাটিতে পা দিয়েই একেবারে ফুল্ল হয়ে হেসে ওঠে শুক্তির এতক্ষণের অস্বস্তির মন। ওই তো, দাঁড়িয়ে আছে ওরা; ড্রাইভার কেষ্টবাবু, কৃষ্ণা আর সুকু।

১২

কলকাতা থেকে যাবার সময় যে মেয়ের ব্যস্ততাকে পালিয়ে যাবার ছটফটানি বলে মনে হয়, সে মেয়ে বোধ হয় কলকাতায় ফিরে আসবার জন্যেও ছটফট কবে উঠেছিল। তা না হলে ঘরে ঢুকে এরই মধ্যে শেলফের সব বই পরিপাটি করে সাজিয়ে ফেলবে কেন শুক্তি? কত ব্যস্ত হযে কাজ করছে শুক্তি। আলনার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে।

ঘরে ঢুকেই বড় পিসি সুমিত্রা যেন একটা হাসি চাপতে চেষ্টা করে কথা বলেন—কী দেখছ তুমি?

আলনাতে একটা কল্কা পাড়ের টাঙাইল। শাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে শুক্তি বলে—শাড়িটাকে এরকম এলোমেলো করে ভাঁজ করলে কে?

সুমিত্রা হাসেন।—কৃষ্ণা।

শুক্তি—কৃষ্ণা কেন?

ঘরে ঢোকে কৃষ্ণা।—শাড়িটাকে কোথায় রেখে গিয়েছিলে, মনে পড়ে?

হেসে ফেলে শুক্তি।—মনে পড়েছে। তাড়াতাড়িতে ভুল করে বিছানার উপর ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলাম।

কৃষ্ণা—সেই জন্যে আমি...।

সুমিত্রা হাসেন।—সেই জন্যে কৃষ্ণা রাগ করে শাড়িটাকে আলনাতে তুলে রেখেছে, পুঁড়িতে দিয়ে দেয়নি।

শুক্তি—কেন?

কৃষ্ণা—প্রমাণ করে দিলাম কিনা, তুমি সব ভুলে যাও।

কৃষ্ণার গাল টিপে ধরে শুক্তি।—কী ভুলে যাই?

কৃষ্ণা—তুমি কলকাতার বাইরে গেলে একটা চিঠি দিতেও ভুলে যাও কেন।

শুক্তি—চিঠি দিতে ভুলেই যাই ঠিকই, কিন্তু তোমাকে তো ভুলে যাই না।

কৃষ্ণা—শ্যামলদাও বলছিলেন, তোমার শুক্তিদি কি কলকাতাকে ভুলে গেল? কলেজের

পুজোর ছুটি তো তিন দিন হল শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু আসে না কেন?

সুমিত্রা তবু দাঁড়িয়ে আছেন। সরে যাবেন বলেও মনে হয় না। কৃষ্ণাকে এখন কী কথা বলে ওর মুখ বন্ধ করা যায়, তাও ভেবে পায় না শুক্তি।

কৃষ্ণার এটা অভিমানের মুখরতা বটে; কিন্তু শুক্তির চোখ-মুখের অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন একটা কঠোর জিজ্ঞাসার ডাক শুনতে পেয়েছে শুক্তি।

কৃষ্ণা বলে—আমি সত্যি খুব রাগ করেছি, শুক্তিদি।

হাসতে চেষ্টা করে শুক্তি। —রাগ কবো না কৃষ্ণা। দিদির উপর কখখনও রাগ করতে নেই।

কৃষ্ণা—আমাদের ভুলে যাও কেন?

শুক্তি—ভুলিনি কৃষ্ণা; আমি কাউকেও ভুলিনি।

সুমিত্রা হাসেন। —চুপ কর কৃষ্ণা, শুক্তিকে আর বেশি বিরক্ত করিস না।

চলে গেলেন সুমিত্রা।

বাড়ি থেকে কলেজ, আর কলেজ থেকে বাড়ি; এই চেনা পথের জীবনে নতুন করে দেখে আশ্চর্য হবার মত কোনও ঘটনা নেই, কোনও দৃশ্যও নেই। হাজরার মোড়ে সেই খোঁড়া ভিখারীটা এখনও হরেকৃষ্ণ বলে চেঁচিয়ে ওঠে আর হাত পেতে ভিক্ষে চায়। চেতলার পুল পার হবার সময় দেখা যায়, সেই ভাঙা নৌকাটা নালাব কাদার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

শুক্তির সুন্দর মুখটা কী আরও সুন্দর হয়ে গিয়েছে? তা না হলে শুক্তির বড় পিসি কেন বার বার শুক্তির মুখের দিকে ওরকম করে তাকিয়ে থাকেন? যখন তখন শুক্তির কাছে এসে দাঁড়াবেন, শুক্তিব পিঠে হাত বোলাবেন। সুমিত্রার এ এক নতুন অভ্যেস হয়ে উঠেছে! দিন দিন আদর বাড়িযে চলেছেন সুমিত্রা। শুক্তি তাই না হেসে আর না বলে থাকতে পারে না।—তুমি এসব কী আরম্ভ কবলে বড় পিসি? দেখতে পেলে কৃষ্ণা যে হিংসেতে ছটফট করবে।

সুমিত্রাও হাসেন।—ছাই করবে কৃষ্ণা। ও মেয়েকে আমি চিনে নিয়েছি। আমাকে ওর একটু কাছ ঘেঁষে বসতেও দেয় না। ঠেলে সরিয়ে দেয়। ওর নাকি ভয়ানক গরম লাগে।

শুক্তি—আজ বুঝছে না, কিন্তু পরে একদিন বুঝবে, কী ভুল করছে বোকাটা।

আজকাল শুক্তির মুখের এক-একটা কথা শুনে সুমিত্রার মায়াকাতর মন যে কত গভীর তৃপ্তিতে ভরে যায়, সেটা তিনি বুঝতে পারেন বটে; কিন্তু চোখে তো দেখতে পান না যে, তাঁর মুখের হাসিটাও কত নিবিড় নিয়ে থমথম করে। সে ছবি দেখতে পায় শুক্তি, কিন্তু বুঝতে পারে না, বড়পিসির মন এত বেশি খুশি কেন?

শ্যামল আসে মাঝে মাঝে, যদিও শ্যামলের কাজে ব্যস্ততার অন্ত নেই। পশারের নাম-ডাক যেমন বেড়ে চলেছে, পেশার হাঁকডাকও তেমনি বাড়ছে। তবু তো, এই অফুরান দায়িত্বের ছুটোছুটির মধ্যেও একটু সময় করে নিয়ে এক-একবার, মাসে অন্তত দুটো-তিনটে দিন আলিপুরের এই বাড়ির চা খেয়ে যেতে ভুলে যায় না শ্যামল।

শ্যামলকে দেখে শুক্তিও আর সারামুখের চেহারা লালচে করে, চোখ নামিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে না। বসুন আপনি, কৃষ্ণাকে ডেকে দিচ্ছি; বেশ তো স্পষ্ট করে ভদ্রতার ভাষণ শুনিযে দিয়ে চলে যেতে পারে শুক্তি। কথা বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলে ভীরু নিঃশ্বাসের বাতাস গিলতে হয় না। সবই দেখতে পান সুমিত্রা।

কত সহজে সেদিন ভবানীপুরে যেতে রাজি হয়ে গেল শুক্তি, যেদিন সুমিত্রা বললেন—সুধাদি আমাদের সবাইকে ডেকেছেন, তুমিও যাবে নাকি শুক্তি?

কেন কিসের জন্য ভবানীপুরের বাড়ি থেকে এই আহ্বান এসেছে, তার কিছুই জানে না শুক্তি। সুমিত্রা অবশ্য বলতেই যাচ্ছিলেন যে, সুধাদি কীর্তনগান শুনতে খুব ভালবাসেন, তাই ব্যবস্থা করেছেন, সুধাদিরা চেনা এক সুগায়িকা মহিলা আজ তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে কীর্তন গাইবেন।

কিন্তু শুক্তির যাবার ইচ্ছা যেন তৈরি হয়েই ছিল। কিছুই জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইল না শুক্তি, কেন আর কিসের জন্য ভবানীপুরের বাড়ি থেকে আজ হঠাৎ একটা আমন্ত্রণ উপস্থিত হল। সুমিত্রা শুধু একটু প্রশ্ন করে কথাটাকে বলেছেন, আর, শুক্তিও সেই মুহূর্তে রাজি হয়ে জবাব দিয়ে দিল—যাব।

ভবানীপুরের বাড়ির বড়ঘরে সেই সন্ধ্যাবেলায় অনেক মানুষের আসরটিকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিয়ে সুগায়িকা মহিলা যখন চলে গেলেন, তখন ঘরভরা এলোমেলো কলরবের মধ্যেই শুনতে পেলেন আর দেখতে পেলেন সুমিত্রা, দরজার কাছে শ্যামলের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, কত খুশি হয়ে আর হেসে-হেসে কথা বলছে শুক্তি।

শ্যামল হাসছে আর বলছে—আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না।

শুক্তি—বিশ্বাস করুন, আমি আপত্তি করিনি।

শ্যামল—আপত্তি না কর; কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় তো আসনি। কাকিমা বলেছেন, তাই এসেছ।

শুক্তি—এর মানে কি অনিচ্ছার আসা?

শ্যামল—হ্যাঁ।

শুক্তি—তা হলে আমি আর কী করতে পারি?

শ্যামল—একদিন কি নিজেই ইচ্ছে করে আসতে পার না?

শুক্তি—কী জবাব দেব, বুঝতে পারছি না।

শ্যামল—আসতে ইচ্ছে করে?

শুক্তি—হ্যাঁ।

রাত ফুরোতে দেরি আছে মনে করে মানুষের চোখ আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে যদি দেখতে পায় যে, লাল সূর্য হাসছে, তবে সে মানুষের চোখের বিস্ময়ও আচমকা রঙিন হয়ে যায়। সুমিত্রার চোখের ও মনের অবস্থাও প্রায় তাই। মনে করেছিলেন, নিজের মুখে শ্যামলের কাছে যা বলবার তা বলতে বেশ দেরি করে ফেলবে শুক্তি, বড় বেশি লাজুক ভীরু আর মনচাপা স্বভাবের এই মেয়ে। কিন্তু কই, দেরি তো করল না শুক্তি। মিথ্যে লজ্জা করল না, ভয়ও পেল না, বেশ মন খুলে ইচ্ছের কথাটা বলে দিল।

দিল্লীতে করুণার কাছে চিঠি লিখলেন সুমিত্রা। সাতদিনেব মধ্যে করুণার জবাবের চিঠি পৌঁছে গেল।—আপনি এর চেয়ে আর বেশি কিছু জানতে চাইছেনই বা কেন? এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর কী-ই বা বলতে পারে শুক্তি? আপনি এখন অনায়াসে কদমবাড়িতে চিঠি দিতে পারেন যে, শুক্তি নিজেই বলেছে।

জয়ন্ত সরকার সব কথা শুনে খুশি হয়েও শেষে আক্ষেপ করেন।—আমার কিন্তু একটা দুঃখ রয়ে গেল।

সুমিত্রা—কিসের দুঃখ?

জয়ন্ত সরকার—মেয়েটাকে বছরের পর বছর ধরে আমরা কাছে রাখলাম, এইবার বিয়েও দেব, সবই ভাল। কিন্তু মেয়েটার লেখা-পড়া আর এগুল না।

চুপ করে কী-যেন ভাবতে থাকেন সুমিত্রা। তাঁরও মনে বোধ হয় ছোট্ট একটা ব্যথার কাঁটা বিঁধছে।

জয়ন্ত সরকার মৃদুভাবে হাসেন।—আমি তো যখন তখন তেজপুরের চিঠি পাব বলে ভয় পাচ্ছি। শুক্তির মাসি নিশ্চয় বলবেন, আর বললেও অন্যায় বলা হবে না যে, শুক্তিকে আমরা ভাল করে লেখা-পড়া না শিখিয়ে শুধু তাড়াহুড়ো করে একটা বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

সুমিত্রা—আমি বলি, শুক্তি এই বছরেই ফাইনালটা দিয়ে দিক, তারপর কিরণ বউদিকে চিঠি দেব।

হ্যাঁ নেফা; এখন শুক্তির মনের কাছে অনেক দূরের সে নেফা যেন আবছায়াময় এক প্রহেলিকার দেশ। ক্ষীণ স্মৃতির একটা ছবি। সেখানে বাচ্চা হাতির খেলা দেখছেন দুলাল মামা। বনের গাছের ছায়ায় শকুন্তলার মত বসে আছে আকা মেয়ে। ক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙে দফলা-মেয়ে রেনকি।

শুক্তির পরীক্ষা শুরু হল যেদিন, সেদিন সুমিত্রাকে আর না বলে থাকতে পারলেন না জয়ন্ত সরকার। —তুমি এত নার্ভাস হয়ে গেলে কেন?

সারাটা রাত ঘুমোতে না পেরে জেগে জেগে উসখুস করছেন সুমিত্রা। সকাল হতেই আবার চিন্তা শুরু করেছেন, আজ এখন কী খাবে শুক্তি? চা না খেয়ে এক কাপ কোকো খেলে কি ভাল হবে?

জয়ন্ত সরকার হাসেন। —চা ভাল, কোকোও ভাল। মোট কথা পাস করবে শুক্তি, তুমি মিথ্যে চিন্তা করবে না।

পরীক্ষার হলঘরে শুক্তি ঢুকে পড়লেও দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সুমিত্রা। বাড়ি ফিরে গিয়েও দেড় ঘন্টার মধ্যে আবার ফিরে আসেন। সন্দেহ আছে সুমিত্রার, তিনি নিজে গিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে না থাকলে, শুক্তি ওই খাবারের ডিবের একটা সন্দেশও মুখে দেবে না; ড্রাইভার কেষ্ট জোবগলায় যতই বলুক না কেন, মা অনেক করে বলে দিয়েছেন, খাবার যেন ফেলা না যায়।

শুক্তির পরীক্ষার শেষ দিনটি শেষ হল যেদিন, সেদিন সন্ধ্যাবেলা কোর্ট থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন জয়ন্ত সরকার সুমিত্রা তখনও বিছানার উপর শুয়ে পড়ে আছেন আর হাসছেন। জয়ন্ত সরকার হাসেন। —কী ব্যাপার? ব্রত সাঙ্গ হয়েছে, তাই বুঝি খুব নিশ্চিন্ত।

উঠে বসেন সুমিত্রা। কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলার স্বরেই নিশ্চিন্ত মনের আনন্দটা ধরা পড়ে যায়।—সত্যি তাই। আমার এখন ভাবনা করবার কিছু নেই।

এখন শুধু সামান্য দুটি কাজ বাকি; ইচ্ছে করলে সে দুটি কাল-পরশু যেকোনও দিন সেরে ফেলতে পারেন সুমিত্রা। শুক্তিকে তেজপুরের প্লেনে তুলে দেওয়া, আর কদমবাড়িতে কিরণ বউদির কাছে সব-কথা জানিয়ে চিঠিটা লিখে ফেলা।

জয়ন্ত সরকার বলেন—আব দেরি করো না; শুক্তিকে দু-চার দিনের মধ্যেই তেজপুর রওনা করিয়ে দাও। ওর বাবার মনের অবস্থাটা তো কল্পনা করতে পার।

ঠিক পরের দিন, বৈশাখী সন্ধ্যায় আলিপুরের বাড়ির বাগানে একটা ঝড়ের বাতাস যখন ছুটোপুটি করতে শুরু করেছে, তখন কোর্ট থেকে ফিরে আর ঘবে ঢুকে দেখতে পেলেন জয়ন্ত সরকার, বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে আছেন সুমিত্রা, আর চোখ দুটোও ছলছল করছে।

সুমিত্রার একটা হাত তখনও একটা চিঠিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। জয়ন্ত সরকারের সন্দেহ করতে দেরি হয় না ওই চিঠিটাই একটা নিদারুণ আঘাত, যেজন্য সুমিত্রার মুখটা আহত মানুষের মুখের মত করুণ হয়ে গিয়েছে।

চিঠিটাকে পড়লেন জয়ন্ত সরকার। কদমবাড়ির থেকে শুক্তিব মা'ব লেখা একটা চিঠি। তারপর আর বুঝতে কিছু অসুবিধে থাকে না; হ্যাঁ, সুমিত্রার নিশ্চিন্ত মনের স্বপ্নটাই চুরমার হয়ে সুমিত্রাকে কাঁদিয়েছে।

তেজপুর থেকে মণিমালার একটা চিঠি পেয়েছেন কিরণলেখা, তাই কলকাতাতে সুমিত্রাকে জানিয়েছেন : ছেলেটি সবদিকেই ভাল, শুক্তির সঙ্গে চেনা-শোনা আর মেলামেশাও হয়েছে। মণিমালা লিখেছে, শুক্তির আপত্তি নেই। তাই ভাবছি, তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাওয়া ভাল। শুক্তিকে একটু তাড়াতাড়ি রওনা করিয়ে দাও। পরের চিঠিতে আরও কথা জানতে পারবে!

পরের দিন যে চিঠি এল, সেটা তেজপুর থেকে লেখা শুক্তির মণিমাসির চিঠি।

—আপনারা শুনে সুখী হবেন যে...ইত্যাদি।

তেজপুরের সোম লজের ছেলে অনিমেষের রূপগুণের অনেক প্রশংসা করে আরও এমন

কয়েকটি কথা লিখেছেন তেজপুরের মণিমালা দস্তিদার, যেকথা একেবারে সন্দেহবিহীন একটা ভরাট বিশ্বাসের যত খুশি আবেগের কথা। তাই চিঠির ভাষাও বেশ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কোথায় কোন বিলের জলে নীলপদ্ম ফোটে, শুক্তি আর অনিমেষ দুজনে মিলে সে গল্পও করে।—কাজেই, ওদের দুজনের মনে যখন কোনও অনিচ্ছা নেই, তখন আমি তো মনে করি যে, এ বিয়ে হলে ভালই হবে।

ভাল হলেই ভাল। সুমিত্রার দুটো চোখ শুকনো হয়ে খটখট করে। মন শক্ত করতে চেষ্টা করেন সুমিত্রা, যেন তাঁর কষ্টের কোনও আক্ষেপ শব্দ করে বেজে উঠতে না পারে; যেন শুক্তি শুনতে না পায়।

এঘরে বসেই শোনা যায়, বারান্দার ফুলের টবের কাছে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করছে আর হাসছে শুক্তি। হাসুক। শুক্তিকে যেন এভাবে আরও দুটো দিন হাসিযে রেখে ভালয়-ভালয় তেজপুরের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে পারেন, এ ছাড়া এখন সুমিত্রার আব কিছু চিন্তা করবার বা আশা করবার নেই।

তবে তাঁর মনের ভিতরে একটা করুণ বিস্ময়ের প্রশ্ন যেন কথা বলতে চায়; ওখানে দাঁড়িয়ে হেসে-হেসে কথা বলছে যে শুক্তি, সে কি সেই শুক্তি, যাকে এতদিন তিনি শুক্তি বলে চিনতেন? যে মেয়ে এখানে শ্যামলের কাছে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে, সে মেয়ে ওখানে অনিমেষের সঙ্গে নীলপদ্মের গল্প করেছে?

তবে কি শুক্তিকে ঘেন্না করতে চাইছে শুক্তির বড় পিসিব মন? ছি ছি, অসম্ভব। শুক্তিকে ঘেন্না করতে হলে যে সুমিত্রার বুকের ভিতরের সব মায়ার নিঃশ্বাস নিজের লজ্জায় জ্বালায পুড়ে মবে যাবে।

উচিত-অনুচিতের বিচার করে আর লাভ কী? না হয় ভুল করেই একটা ফুল কুড়িয়েছে শুক্তি; কিন্তু সেজন্যে কি শুক্তির হাতটাকে ঘেন্না করে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে? শত হলেও এটা যে শুক্তিরই হাত।

ভুল বলেই বা মনে করতে হবে কেন? হয়ত ওটাই আসল সত্য, এটা তেমন কিছু নয়। না, সুমিত্রার আর কিছু বলা সাজে না। শুক্তির ভালবাসার ভাগ্য নিজেই নিজেকে চিনে নিক।

কিন্তু শুক্তি কি বড় পিসিব এই খটখটে শুকনো চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারে? পারে না বোধ হয়; তা না হলে বড় পিসির হাত ধরে টানটানি করে আর আদুরে অভিমানের স্বরে এমন কথা বলতে পারত না, আমি যে আর দুদিন পরে তেজপুরে চলে যাব, সেটা যেন তুমি ভুলেই গিয়েছ বড় পিসি?

সুমিত্রা হাসেন।—একথা তোমার মনে হল কেন?

শুক্তি—আমার গান শুনতে পেয়েও তুমি আমার ঘবে ঢুকলে না, তাড়াতাড়ি ওদিকে কোথায় যেন চলে গেলে?

সুমিত্রা—খবরের কাগজটাকে তোমার পিসেমশাইয়ের ঘরে রেখে এলাম।

শুক্তি—উঃ, কী মস্ত কাজ করলে!

চোখ কাঁপে সুমিত্রার। মুখের হাসিটাও কেঁপে ওঠে। তখুনি সরে যান সুমিত্রা, তাড়াতাড়ি হেঁটে একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে রাঁধুনি ঠাকরুণের সঙ্গে কথা বলেন—নিশির মা, শুনছেন? পায়েসে বেশি মিষ্টি দেবেন না কিন্তু; বেশি মিষ্টি হলে শুক্তি সে পায়েস মুখে তুলবে না।

ট্রেনের টিকেট কিনে নিয়ে এসেছেন ড্রাইভার কেষ্টবাবু। আজকের রাতটার শুধু ফুরিয়ে যাওয়া বাকি, কাল সকালেই রওনা হয়ে যাবে শুক্তি।

ঘরের আলোর কাছে বসে ডাক দিলেন সুমিত্রা—শুক্তি, শোনো।

—কী বড় পিসি? ডাক শুনেই ছুটে আসে শুক্তি।

সুমিত্রার চোখ-মুখ হাসছে। কী অদ্ভুত শান্ত অথচ জ্বলজ্বলে হাসি। —তেজপুরের সোম লজের অনিমেষকে তুমি চেন নিশ্চয়?

চমকে ওঠে শুক্তি—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—তোমার মণিমাসি লিখেছেন, অনিমেষ খুবই ভাল ছেলে। তোমার কী মনে হয়? সত্যি খুব ভাল?

শুক্তি—আমার তো তাই মনে হয়।

সুমিত্রার মুখের হাসিটা এবার বড় বেশি স্নিগ্ধ হয়ে যায়। —বেশ তো; ভালই; আজ আর কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে বেশি রাত করে দিও না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে।

যেন ভাল ঘুম হয়, যেন শরীর খারাপ না হয়, তাই বেশি রাত না করে শুয়ে পড়তে বলেছেন বড় পিসি। রাত ন'টাও হয়নি, শুয়ে পড়ে শুক্তি।

কিন্তু কিছুতেই যে ঘুম আসে না। বন্ধ চোখ দুটো হঠাৎ ছটফট করে খুলে যায়, ঘরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। বালিশটা তো বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু এপাশ-ওপাশ করলেও মাথাটা কোনও ঠাণ্ডা খুঁজে পায় না কেন? শক্ত করে বাঁধা বেণীটাই বোধ হয় দুমড়ে গিয়ে ঘাড়টাকে জ্বালাচ্ছে।

বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালে শুক্তি। বেণীটাকে ভেঙে দিয়ে ঢিলে করে একটা খোঁপা বাঁধে। এই ভাল। ওরকম একটা দোলানো বেণী আর দেখতে একটুও ভাল লাগে না। ভাল দেখায়ও না।

আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে শুক্তি। কিন্তু সন্দেহ হয়, ঘুম কি হবে? চোখের পাতাগুলি যেন কাঁটার মত শক্ত, নরম হতেই চায় না। উঠে পড়তে ইচ্ছে করে; ছুটে গিয়ে বড় পিসিকেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে; তুমি তো আজ আমাকে কোনও অদ্ভুত কথা বলেনি, তবে আমার ঘুম আসে না কেন, বড় পিসি?

জাগা পাখির মত শুক্তির প্রাণটাও যেন উসখুস করে, কখন ভোর হবে।

ভোর হয়। বৈশাখী সকালবেলার রোদও তেতে উঠতে দেরি করে না। দমদম এয়ারপোর্টের রানওয়ের শুরুপথে সেই অনেকচেনা শিকল-বেড়া; ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে তেজপুর যাবার ডাকোটা। হেসে হেসে কৃষ্ণা আর সুকুর গলা জড়িয়ে ধরে শুক্তি। বড় পিসিকে প্রণাম করবার সময় আর চোখ তুলে তাকাতে পারে না; তাই দেখতে পায় না, বড় পিসির চোখে কোনও মায়া আজও আবার আগের মত তেমনি সজল হয়ে উঠল কিনা।

১৩

দেখলে তো মনে হয় না যে, তেজপুরের জল মাটি আর আলোছায়ার চেহারা এই সাত মাসের মধ্যে একটুও বদলেছে। এদিকে ব্রহ্মপুত্র, ওদিকে নেফার পাহাড়, আশে-পাশে ধানের ক্ষেত; সবই তো ঠিক তেমনই আছে। সেই সার্কিট হাউস, স্টেশন ক্লাব আর চক-বাজার। সেই আদালত, নেহরু ময়দান আর রিজার্ভ পুলিশ লাইন। মীনা পার্কের ফোয়ারার জল সেই পাথুরে শিশুর সাপজড়ানো মাথাটাকে ঠিক তেমনই করে ভিজিয়ে দিয়ে ঝরে পড়ছে। কিন্তু তেজপুরের জীবনের চেহারাতে রদবদলের নানা নতুন ঘটনার দাগ পড়েছে, পড়ছে, ও আরও পড়বে বলে মনে হয়।

একটি কম্বলে বিড়ির আগুনের পোড়া দাগ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সে কম্বল এখন শিশির হাজরিকার বাড়ির বাইরের ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। এটা হল গগন বসুর ড্রাইভার কৈলাসের কম্বল। কৈলাস এখন তেজপুর জেলের কয়েদি। পুলিশ অফিসার পরেশ ভট্টাচার্যকে

বাজারের চকের কাছে দেখতে পেয়েই গলা টিপে ধরেছিল কৈলাস। সেই অপরাধের শাস্তি, এক বছরের শক্ত কয়েদ।

কৈলাসের জামিন হয়েছিল শিশির। মামলাতে কৈলাসকে ডিফেণ্ড করবার জন্য উকিল আর আদালতের সব খরচ দিয়েছিল শিশিরের তিন বন্ধু; অমল ঘোষ, হিতেন রায়, জগদীশ কাকতি। কিন্তু কিছুই হল না। রায় শোনাবার পর কৈলাস সবাইকে নমস্তে জানিয়ে পুলিশ ভ্যানের দিকে চলে গেল।

শীতল বিশ্বাসের সেই ক্ষুদ্র বস্ত্রালয়টিকে তেজপুরের বাজারে আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

কী যন্ত্রণাই না ভুগলেন শীতল বিশ্বাস। দোকানের খাতা-পত্র ঝোলায় ভরে নিয়ে ইনকাম ট্যাক্সের অফিসে যান আর ফিরে আসেন। সামান্য আয়ের কৈফিয়ত দিতে দিতে হয়রান হন। সবই সহ্য করছিলেন শীতল বিশ্বাস। কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী একদিন বেশ ভ্রূকুটি করে হাসলেন। —আপনি যে একজন শীতল অবিশ্বাস নন, সেটা প্রমাণ করতে পারবেন?

—আজ্ঞে না।

—তা হলে এসব খাতাপত্রের সাধুতা দেখাতে আর আসবেন না।

—তা হলে কী করব, বলুন।

—আমার একজন লোক, নাম মধুবাবু, আপনার কাছে যাবে। তাকে খুশি করে দেবেন।

মধুবাবু এসে বলেছিলেন।—অন্তত দেড় হাজার টাকা দিন। শীতল বিশ্বাস বলেন—না। টাকা থাকলেও দিতাম না।

একদিন মহিম দস্তিদারও বলেন—এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুন শীতলবাবু। আর, আমার টাকাটাও শোধ করে দিন। আপনার কাছ থেকে ইন্টারেস্ট পেতে আমি আর ইন্টারেস্টেড নই।

এর পর আর দেরি করেননি শীতল বিশ্বাস। দোকান বিক্রী করে দিয়ে মহিমবাবুর পাওনা টাকা সুদসুদ্ধ শোধ করে দিয়েছেন। মহিমবাবু অবশ্য দুঃখিতভাবে হেসেছেন।—এখন তা হলে সম্পত্তি বলতে আপনার কিছু রইল কি, শীতলবাবু।

শীতল বিশ্বাস—হ্যাঁ, একটা পুরনো মরচে পড়া তোবড়ানো ট্রাঙ্ক রয়ে গেল।

মহিমবাবু—তা হলে তো অনাদায় ট্যাক্সের জন্য ওটাই ক্রোক হবে।

শীতল বিশ্বাস হাসেন।—হলে হবে, কিন্তু ওরা ঠকবে।

মহিমবাবু চোখ টান করেন।—ঠকবে কেন?

শীতল বিশ্বাস—ক্রোক করতে আসবার আগেই ওটাকে একটা মুগুর দিয়ে পিটিয়ে দেব, চমৎকার একটা অপদার্থের পিণ্ডি হয়ে যাবে। সে মাল ওরা নীলাম করে ষাট টাকাও পাবে কিনা সন্দেহ।

হাসতে থাকেন শীতল বিশ্বাস। অদ্ভুত হাসি। যেন একটা ক্ষেপা রোগীর হাসি।

মহিমবাবু দুঃখিতভাবে হাসেন।—এঃ, আপনি বড় ক্রোধী মানুষ, শীতলবাবু। ক্রোধ কিন্তু একটা রিপু।

কোলিবাড়িতে শিশির হাজারিকা নিজেই এখন ওই বাড়ির একজন ভাড়াটিয়া বাসিন্দা। বাড়িটা এখন শৈলেশ্বর শইকিয়ার সম্পত্তি।

মালতী বলেছিল, চাকরী করতে চাই, তা না হলে চলবে কী করে? দিন দিন যে দেনা বেড়েই চলেছে। মালতীর কথা শুনে সেই যে রাগ করে চেঁচিয়ে আর ধমক দিয়ে উঠল শিশির, তার ঠিক সাতদিন পরে বাড়িটাকে বিক্রী করে দিল।

জগদীশ বলে—তাড়াহুড়ো করে এত অল্প দামে বাড়িটাকে বিক্রী না করলেই ভাল করতে, শিশির।

বাড়ির সামনে কচি নারকেলের পাতার ঝালরে চাঁদের আলো চিকচিক করে; চোখ পড়তেই

মুখ ফিরিয়ে নেয় শিশির, জগদীশের কথার কোনও জবাব দেয় না।

শৈলেশ্বর শইকিয়া দুঃখিতভাবে হেসেছেন।—তোমার বাবাকে আমি চিনতাম শিশির। মানুষটিকে আমার খুব ভাল লাগত। তাই ইচ্ছে করেই আমি বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে বাড়ি কিনে নিলাম। কিন্তু আমি চাই, তুমি একদিন উন্নতি করে এর চেয়ে অনেক ভাল বাড়ি তৈরি করবে আর সুখে থাকবে।

নেফা মেডিক্যালের পিয়ন রতন বিশ্বাস আজকাল নতুনপাড়ার বাড়ির একটি ঘরের মেঝেতে মাদুরের উপর যেন দুর্ঘটনায় জখম একটা মানুষের চেহারার মত করুণ হয়ে পড়ে থাকে, যদিও রতনের হাতে পায়ে ও মাথাতে কোনও ব্যাণ্ডেজ নেই।

ঘরের দেওয়ালে অবশ্য একটা রঙিন নুড়িপাথরের মালা এখনও ঝুলছে। কিন্তু ঘরের জানালা সব সময় বন্ধ করে রাখে রতন, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত, যেন বাইরের কোনও আলো এসে ঘরের অন্ধকার ভেঙে না দেয়, আর কোনও রঙিন জিনিস যেন চোখে না পড়ে।

রতনের চাকরি নেই। নেফার আইন রতনকে ক্ষমা করতে পারেনি। কারণ, দফলাদের গাঁ বিলং একদিন দা হাতে নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে নেচেছে আর নালিশ করেছে, গাঁওবুড়ার মেয়ে রেনকিকে নষ্ট করতে চেষ্টা করেছে মেডিক্যালের পিয়ন রতন।

শীতল বিশ্বাস তাঁর গলায় স্বর চেপে আস্তে আস্তে কথা বলেন—হ্যাঁ, ম্যালেরিয়া-ইন্সপেক্টর ধীরেনের কাছ থেকে সব কথা শুনলাম। পলিটিকাল খোসলা সাহেব নিজের হাতে রতনকে গলাধাক্কা দিয়ে কোয়ার্টার গার্ডে পুরেছিলেন। তিনটে মাস কোয়ার্টার গার্ডে বন্ধ ছিল রতন। এক বছরের মাইনে থেকে জমানো টাকার সব টাকা, পুরো পাঁচশো টাকা জরিমানা দিয়েছে রতন। সে টাকা নিয়ে বিলং-এর দফলারা মিথুন কিনেছে, কেটেছে আর খেয়েছে।

মীরা—কিন্তু রতন ঠাকুরপো কি সত্যিই...আমার তো বিশ্বাস হয় না।

শীতল—কিন্তু রতন যে নিজেই স্বীকার করেছে।

চমকে ওঠেন মীরা।—কী স্বীকার করেছে?

শীতল—রেনকিকে একদিন জড়িয়ে ধরেছিল রতন।

মীরার মুখটা করুণ বিষাদে ভরে যায়—রেনকি কিছু বলেনি?

শীতল—রেনকি শুধু একবার গাঁ থেকে পালিয়ে এসে কোয়ার্টার গার্ডের বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল আর কেঁদেছিল। তারপর আর কোনও গণ্ডগোল না করে চলে গেল।...রতন জেগেছে মনে হচ্ছে?

শব্দ শোনা যায়, ঘরের জানালা খুলছে রতন। কারণ সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ কালো হয়ে উঠেছে।

ডক্টর সি টি এলগিন, সেই বোটানিস্ট সাহেব, তিনিও নেফা ফিরে এসেছেন। সরকারি সমাদর তাঁকে তোয়াং থেকে হেলিকপ্টরে তুলে নিয়ে তেজপুরে পৌঁছে দিয়েছে। নেফা-অফিসার মনোহর লাল সার্কিট হাউসে এসে এলগিনের কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।—অনুমান করি, আপনাকে কোনও অসুবিধে ভুগতে হয়নি স্যার?

এলগিন হাসেন।—একটুও না। আপনার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন।

মনোহর লাল—কর্তব্য করেছি, এইমাত্র। আমাদের সার্ভিস তো ঠিক চাকরির ব্যাপার নয় স্যার, এটা একটা ডেডিকেশন।

এলগিন খুব সত্য কথা।

মহিমবাবু আসেন, শৈলেশ্বরবাবু আসেন; সরকারি গণ্যমান্য আর পদস্থেরাও আসেন। সকলের কুশল-জিজ্ঞাসার জবাবে এলগিন বিনীতভাবে বলেন—আমার পিলগ্রিমেজ প্রায় শেষ হয়েছে। এবার

শুধু সাতটা দিন এই তেজপুরেব এদিক-ওদিক একটু ঘুরে-ফিরে আর চোখ তৃপ্ত করে চলে যাব।

মহিমবাবু—কিন্তু চলে যাবার আগের দিন যদি আমার বাড়িতে এসে সামান্য একটি চায়ের আসরে বসে টাউনের এলিটের সঙ্গে একটু আলাপ করেন, তবে আমাদের পক্ষে সেটা খুবই সুখের বিষয় হবে।

এলগিন—নিশ্চয় যাব; এ তো আমার সৌভাগ্য।

মহিমবাবু—তা হলে আশা করছি, আগামী শনিবার সন্ধ্যায় আপনাকে আমাদের মধ্যে দেখতে পাব।

এলগিন—ও ইয়েস! নিশ্চয়।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা, সার্কিট হাউসের বারান্দায় একা-একা একটি চেয়ারে বসে আর টেবিলের আলোর কাছে একটা কাগজ বেখে যখন দুটি চোখের সব আগ্রহ ঢেলে দিয়ে কী-যেন দেখছিলেন আর পড়ছিলেন এলগিন, তখন হঠাৎ কয়েকটা ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন। সেই মুহূর্তে কাগজটাকে ছিঁড়ে কুচি-কুচি কবে ঝুড়ির ভিতরে ফেলে দিলেন।

ছায়া নয়; শিশির, হিতেন আর অমল এসে দাঁড়িয়েছে। আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে বেশ স্নিগ্ধভাবে হাসেন এলগিন।—আসুন।

শিশির—নেফার ফ্লোরা সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই। আর, কয়েকটা কথাও আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।

একবার শিশিরের, একবার অমলের, একবার হিতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিযে, তারপব খুব জোরে একবার কেশে নিয়ে হেসে ওঠেন এলগিন।—খুব ভাল কথা। আপনারা কাল বিকেলে আমার এখানে আসুন। আমি খুব খুশি হযে নেফার ফ্লোরার অনেক চমৎকার কথা আপনাদের শোনাব।

কিন্তু পরের দিনের বিকালে নয়, শনিবারের সন্ধ্যাতেও নয়; এই তেজপুরে প্রায় একশোটি বিকেল আর সন্ধ্যা এসেছে আর চলে গিয়েছে, তবু বোটানিস্ট সাহেব এলগিনকে কেউ আব দেখতে পায়নি। সার্কিট হাউসে গিয়ে এলগিনকে দেখতে না পেয়ে শিশির, অমল আর হিতেন হেসে ফেলেছিল। মহিমবাবুর বাড়িতে শনিবারের সন্ধ্যার চায়ের পার্টি একটু দুঃখিতভাবে বিস্মিত হয়েছিল।—এভাবে হঠাৎ কেন উধাও হয়ে গেলেন এলগিন?

মহিমবাবুর বাড়ি ভারতীর কালোর মা একদিন কিন্তু বেশ একটু ভয় পেয়ে বাড়ির ছাদ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে চলে এলেন।

রাতের কাজ শেষ হবার পব জপের মালা হাতে নিয়ে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কালোর মা। হঠাৎ চোখে পড়ে, দূরে উষাপাহাড়েব গায়ে আগুন জ্বলছে। আগুনটা যেন পাহাড়েব গাযে উঠছে নামছে আব হেঁটে বেড়াচ্ছে।—ভাল লক্ষণ নয মা। বলতে গিয়ে কালোর মা'র গলার স্বব কেঁপে ওঠে।

মণিমালা বলেন—ও কিছু নয়। ওটা সেই পাগলা সাধুর ধুনির আগুন।

বোধ হয় খুব ভুল কথা বলেননি মণিমালা; অনেকেরই এ-গল্প জানা আছে; একজন পাগল সাধু, যার ভয়-ডরের কোনও বালাই নেই, মাঝে-মাঝে উষাপাহাড়ে উঠে ধুনি জ্বালায় আর রাত কাটায়।

কিন্তু তেজপুরের ভিতরে-বাইরে আনাচে-কানাচে আর আশেপাশে সত্যিই যে একটা উপকথার জগতের যত অলক্ষুণে কায়া ছায়া আর ভাষা ঢুকেছে; ঘুরছে ফিরছে হাসছে আর ছুটছে। বিচিত্র অদ্ভুত করুণ আর কুৎসিত।

মুরগিতে ভরতি হয়ে ছুটে যাচ্ছে টাস্কারের রোড-ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল সাহেবের জিপ। ফুটহিলের কাছে এসে ইনার লাইন পার হবার আগেই সড়কের গর্তে পড়ে মিলিটারির ট্রাকের চাকা ভেঙে গিয়েছে। উল্টে গিয়েছে ট্রাক। ট্রাক থেকে গড়িয়ে পড়েছে সাজানো পেটির স্তূপ; পেটি ভেঙে বোতল;

আর বোতল ভেঙে গড়িয়ে যায় তরল সোলান আর সাহারানপুর।

বাজারের আড়তদারের গদিতে বসে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে শুধু হাসছেন আর হাসছেন আর টাকা গুনছেন মিলিটারির এক খুশি অফিসার। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে এসে সরকারি পারমিটের একজন কর্তা অফিসার তাঁর সভ্য-ভব্য স্যুট-শোভিত চেহারা নিয়ে এমন একজন কারবারি মহাজনের হাত ধরে হাসছেন আর কথা বলছেন, যাঁর পরনে একটি খাটো ধুতি আর কাঁধে একটি গামছা। হোটেলের টেবিলের এপাশে কন্ট্রাক্টর, ওপাশে ইঞ্জিনিয়ার, মাঝখানে দুটি বিয়ারের বোতল। সাপ্লাইয়ের চালান তখনি তৈরি হয়; বিলও তখনি। সেই বিল আর চালান তখনি সই করে দিয়ে হেসে ওঠেন ইঞ্জিনিয়ার। কন্ট্রাক্টরও তখনই হাঁক দেন।—জলদি করো বয়, আউর দু'বোতল।

বুঝতে পারা যায় না, চারজন বাইজি কেন এসে ডাকবাংলোতে ঠাঁই নিয়েছে। ওরা বমডিলাতেই বা কেন যেতে চায়? মাইফেলের বায়না পেয়েছে নাকি ওরা?

এত রাতে ওখানে ওটা কিসের ভিড়? মিলিটারির দু'জন অফিসার মানুষেব উপরে মারমুখী হয়ে ঝগড়া করছে কেন শিশির আর অমল? একজন পুলিশ এস-আই বা কেন নির্বিকার অসহায়তার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন?

সিনেমা হাউসের সামনে রাস্তার একপাশে একটা রিক্সার উপর বেঁহুস হয়ে শুয়ে পড়ে আছে একটা অল্পবয়সের মেয়ে, বোধ হয় গাঁয়ের চাষির ঘরের মেয়ে। মেয়েটার গায়ে নতুন কেনা একটা হালফ্যাশনের মেয়েলি ওভারকোট, মুখ মদের গন্ধ।

মিলিটারির দুই অফিসার একসঙ্গে ছড়ি ঘুরিয়ে নেশাজড়ানো স্বরে ধমক দেন।—আমরা কিছুই জানি না। রিক্সাওয়ালা কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে—আমি কিছু জানি না; মেলিট্রিসে পুছিয়ে।

মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে পুলিশ এস-আই কাতরস্ববে ডাকেন।—শিশিরবাবু, প্লিজ; আমার কথা রাখুন। মিথ্যে গোলমাল বাধাবেন না।

টাস্কারের পতাকাব হাতির-মাথা দুলে দুলে হাওয়া খায়, ছুটে ছুটে হাওয়া খায় টাস্কারেব গাড়ি। এ ব্যস্ততা যেন একটা মত্ততা। বাজারের লোকে বলাবলি করে, ওদের পান আনতে জিপ ছোটে, আর সিগারেট আনতে ট্রাক।

শিশির বলে—সত্যিই কি ওরা রোড তৈরি করে, না ম্যাপ আর মডেলের মধ্যে রোডের দাগ টানে?

জগদীশ বলে—তা জানি না; কিন্তু ওদের অফিসার-মেসের সন্ধ্যাবেলার আলোর ঝলমলানি দেখে মনে হয়, যেন একটা কার্নিভালের ফুর্তি চলছে সেখানে।

ফোর্থ ডিভিসনের একটা ব্যাটেলিয়ন এসেছিল অনেকদিন আগে। তারা নেফার পাহাড়ের এদিকে-ওদিকে কবেই চলে গিয়েছে। কিন্তু তারপর আর যারা এসেছে তাদের যেন কোথাও যাবার কথা নেই। তেজপুর আর মিসামারির সেনা-বারিক যেন দুটো বিশ্রামসুখের ধরমশালা। ব্যস্ততা বলতে শুধু পিকনিকের ব্যস্ততা। এদিকে পিকনিক, ওদিকে পিকনিক; নিয়মিত রুটিন উৎসবের মত পিকনিক।

স্টেশন-ক্লাবে এসে পানীয় মুখে ঢেলেই মেজর নায়ার বলেন—চিনারা অ্যাগ্রেস করবে, এটা একটা কক অ্যান্ড বুল স্টোরি।

রেলের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার মুস্তফি তাঁর হাতের গেলাস নামিয়ে রেখে ঢেঁকুর তোলেন। —আমি একজন ক্যাপ্টেনের মুখেও ঠিক একথা শুনেছি।

—কাজেই আমাদের ফোর্স এখানে থাকবে; এর চেয়ে বেশি এগিয়ে যাবার দরকার হয় না।

—ঠিক বলেছেন, ইউ আর রাইট।

—যেটা নিতান্ত বর্ডার পুলিশের কাজ, সে কাজে আর্মিকে ভিড়িয়ে দেওয়া খুবই অসঙ্গত।

—আরও সত্যি কথা; ইউ আর মোর দ্যান রাইট।

—বর্ডার পুলিশ যেন ভয় না পায়, মরেল ঠিক রাখতে পারে; সেজন্য বড় জোর ইনফ্যান্ট্রির কয়েকটা প্লেটুন পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

—উপরের এইরকম ইনস্ট্রাকশন আছে বোধ হয়?

মেজর নায়ার হঠাৎ শক্ত করে ভুরু কুঁচকিয়ে বলে ওঠেন—একজন সিভিল চ্যাপ কোন সাহসে আশা করে যে, আমি তার কাছে মিলিটারির একটা সিক্রেট প্রকাশ করে দেব?

মিস্টার মুস্তফি একটা হাই তুলে নিয়ে উঠে পড়েন; গেলাসের দিকে আর তাকান না। চলে যান।

কিন্তু কন্ট্রাক্টর তেজা সিং-এর মিসামারি বাগানে একটি খানাপিনার আসরে, লালপানি আর ভাজা মাংসের ঢালাও উৎসবে, একদিন এই মিলিটারি নায়ার আর সিভিল মুস্তফি দুজনে হাত ধরাধরি করে হাসলেন আর গল্প করলেন। দু'জনের অন্যহাতে তখন দুটি চকচকে প্লাস্টিকের ফোলিও ব্যাগ ঝুলছে; তার ভিতরে তেজা সিং-এব কৃতার্থতার উপহার একগাদা একশো টাকার নোট কিন্তু কোনও শব্দ করে না।

অনেকে যাকে বলে তেজা সিং-এর এজেন্ট, সেই সুশান্ত মজুমদারের টেলিফোনের একটা ডাক শুনে উতলা হয়ে যান, এমন পদস্থ সিভিলের সংখ্যাও কম নয়। মজুমদার সাহেব শিলং চলে যাবেন শুনতে পেয়ে সোজা একেবারে এয়ারপোর্টে হাজির হলেন সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কাসের চন্দ্রনাথন; ইনি সেই চন্দ্রনাথন, যিনি পণ্ডিচেরি ভঙ্গিতে ফরাসি ভাষা বলে পোস্টমাস্টারকে একদিন খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। ফবেস্টের গোস্বামিও সোজা এবাযপোর্টে ছুটে আসেন। বিদায় নেবাব আগে ব্যাগ উপুড় কবে গাড়ির সিটের উপরে নোটের তাড়া ঢালেন মজুমদার। গোস্বামি হাসেন। —আশা করি আবার দেখা হবে। চন্দ্রনাথন হাসেন। ওর্‌ব্‌ রাভোয়াব।

মিসামারি থেকে মাত্র পাঁচ মাইল; ছোট নদীর কিনারায় আমবাগানের ছায়াকে মিষ্টি করে দিয়েছে ফাল্গুন মাসের কোকিলের ডাক। পিকনিক সেরে নিয়ে শিশির আর শিশিবের স্কুলের ছেলের দল সড়কের ধারে নিমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ফুটহিলের দিক থেকে বাস আসবে; ওবা সবাই আবার তেজপুরে ফিরে যাবে।

ছেলেদের চোখগুলি হঠাৎ এদিকে ঘুরে গেল। বুটের শব্দের সঙ্গে সড়কের ধুলো উড়ছে। কাঁদের উপর পুরো প্যাক আর রাইফেল, জাঠ রেজিমেন্টের একটা প্লেটুন আসছে। বেশ শান্ত চাইনি, বেশ শক্ত চেহারা, হাসিমাখা মুখ; জওয়ানদের কপালের ঘাম ধুলোতে ভরে গিয়ে কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছে। কারও পায়ে ছেঁড়া বুট; কারও গায়ে ছেঁড়া আস্তিনের উর্দি। ওবা বোধ হয় ফুটহিলের ক্যাম্পের কাছে গিয়ে জিপে উঠবে।

কিন্তু কী অদ্ভুত শিশির হাজারিকার কড়া মেজাজের মন। শিশিরের শুকনো চোখে কোনও সমবেদনার একছিটে ছায়াও কাঁপে না। বরং ছেলেদের সাবধান করে দেয় শিশির।—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো আর দেখো। হাততালি দেবে না, কথা বলবে না, হই-হই করবে না।

চলে গেল জাঠ প্লেটুন। কিন্তু তেজপুর যাবার বাস আসতে বোধ হয় আরও আধঘণ্টা লাগবে। ছেলের দল নিমের ছায়ায় চুপ করে বসে থাকতে না পেরে ছটফট করে।

শিশির হঠাৎ আবার ছেলেদের সাবধান করে দেয়।—কেউ কথা বলবে না। কারণ, ধুলো উড়িয়ে, বুটের শব্দ বাজিয়ে আর একটা জওয়ান-দল কাছে এসে পড়েছে। এটা আসাম রাইফেলের একটা প্লেটুন।

কিন্তু নীরব শিশিরের শক্ত-উদাস চোখ দুটো হঠাৎ চমকে ওঠে। দেখতে পেয়েছে শিশির, বেশ শক্ত শক্ত বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা আর বেশ অল্প বয়সের ওই প্লেটুন হাবিলদার শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে আর হেসে চলে যাচ্ছে।

কথা বলে ফেলে শিশির—সুজিতবাবু, আপনি!

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

হাত তুলে নেফার একটা পাহাড়ের মেঘলা রঙের মাথাটাকে দেখিয়ে দেয় সুজিত।

ফাল্গুন গেল, চৈত্র গেল, বৈশাখও যায়-যায়; মণিপিসি একদিন খুব খুশির স্বরে হাসতে থাকেন। —কি কালোর মা, ঊষাপাহাড়ের আগুন আর কখনও চোখে পড়েছে?

—জানি না মা, আমি আর ওদিকে তাকাই না।

—তুমি তো মিথ্যে ভয় করে একটা অলক্ষণ দেখতে পেলে; কিন্তু লাহিড়িবাবুর মেয়ে কি বলে গেল শুনবে?

—বলুন, শুনি।

—সকালবেলাতে অগ্নিগড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেয়েছে লাহিড়িবাবুর মেয়ে, বরফে ঢাকা সাদা গৌরীচেন চূড়া উত্তুরে আকাশে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে।

শুনে খুশি হন কালোর মা। —শুনেছি, এটা নাকি খুব সুলক্ষণ।

মণিমালা—খুব সুলক্ষণ। মেয়েটাকে আমি বলেছি; তোব বিয়ে হবে শিগগির, শিবের মত বর হবে তোর।

কথা শেষ করেও হাসতে থাকেন মণিমাসি। হঠাৎ আরও খুশি হয়ে বলে ওঠেন—শুনেছ তো কালোর মা, আজ যে শুক্তির আসবার কথা।

—শুনেছি মা।

—আমারও ইচ্ছে, শুক্তি একবার অগ্নিগড়ে গিয়ে দেখে আসুক উত্তুরে নেফার ওই গৌরীচেন; একটু ভাল করে দেখে আসুক।

১৪

শুক্তিকে দেখতে বেশ রোগা-রোগা মনে হয়েছে, তাই একটু দুঃখিত হয়েছেন মণিমাসি। আর, দুঃখের ভাষাটা যেন একটা উদ্বেগের ভাষা। —এখন এরকম একটা রোগাটে মূর্তি ধরলে তো চলবে না। তাড়াতাড়ি শরীর সারিয়ে ফেলতে হবে। শুনছিস তো শুক্তি?

শুক্তি—শুনছি।

মণিমাসি—শরীর ভাল না করে কদমবাড়ি যেতে পারবে না। আমি আগেই বলে রাখছি।

শুক্তি—তা হলে তো আজকেই কদমবাড়ি যেতে হয়।

মণিমাসি—কেন? কেন?

শুক্তি—আমার শরীর খুব ভাল আছে, যথেষ্ট আছে।

মণিমাসি—না, নেই।

শুক্তি—তা হলে আমারও আর কিছু বলবার নেই।

মণিমাসি—আমি কিরণদিকে আজ চিঠি দিচ্ছি, তুমি বেশ কিছুদিন এখানে থাকবে।

শুক্তি হাসে—বেশ কিছুদিন করো না মণিমাসি; অন্তত পরীক্ষার ফল বের হবার আগেই আমাকে সরে পড়তে দিও।

মণিমাসি—পরীক্ষার ফলের কথা ভেবে এত ভয় করবার কী আছে?

শুক্তি—আমার একটুও ভয় নেই। ফেল করলে বড় পিসি ভয়ানক কষ্ট পাবেন, শুধু এই ভয়।

—তা তো বটে; তোর বড় পিসি দুঃখিত না হয়ে পারবেন কেন? একে তো বিদুষী মানুষ,

তার ওপর তোকে পড়াতে গিয়ে মানুষটা এই বয়সে নিজেও কত খেটেছে। কিন্তু এখন তো আর তোর পাস-ফেল নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই।

মাঝে মাঝে মনে হয় মণিমাসির, শুক্তি যেন বড় বেশি ভাবছে। হাতে কোনও গল্পের বই নেই, রেডিওটারও মুখ বন্ধ, তবু ঘরের ভিতরে একা একটা চেয়ারে বসে শুধু আংটিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঙুল থেকে খুলছে, আবার পরিয়ে ফেলছে।

মণিমাসি বলেন—অনিমেষ এখন তেজপুরে নেই। থাকলে কি আর এই দশদিনের মধ্যে একটা দিনও না এসে পারত? কিন্তু আসবে। অঞ্জলি বলেছে, বড়জোর আর দেড় মাস। তারপর ছুটি পেতে অনিমেষের আর কোনও অসুবিধা হবে না।

মাঝে মাঝে মনে হয় মণিমাসির, শুক্তি যেন বড় বেশি শান্ত হয়ে গিয়েছে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করছে রাজাবাহাদুর, শব্দ শুনে আর দেখতে পেয়েও ছটফট করে ওঠে না শুক্তি।

মণিমাসি বলেন—কী হল তোর শুক্তি? না মীরা, না মালতী, কারও সঙ্গে একটিবার দেখা করতেও গেলি না, অথচ এক মাসেরও বেশি হল তেজপুরে এসেছিস।

শুক্তি—যাব একদিন।

মণিমাসি—আমি বলি, একদিন অবজারভেটরি হিলে গিয়ে উত্তুরে নেফার গৌরীচেন দেখে আয়। সাদা চূড়াটাকে আজকাল বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

শুক্তি—যাব একদিন; এখন যেতে ইচ্ছে করে না।

মণিমাসি হাসেন। —একা একা যেতে ইচ্ছে করে না বুঝি!

এক-একবার সন্দেহ হয় মণিমাসির, এবার যেন কলকাতা থেকে একটা ক্লান্ত শরীর নিয়ে তেজপুরে এসেছে শুক্তি। তা না হলে আজকাল এত ঘুমোতে আর শুয়ে পড়ে থাকতে চায় কেন মেয়েটা?

তেজপুরের জষ্ঠি মাসের গরমের জ্বালায় উষাপাহাড় যতই শুকনো আর রুক্ষ হয়ে যাক না কেন, রবার বাগানের বাড়ি ভারতীর কোনও ঘরে সে জ্বালার কোনও ছোঁয়া ঢুকতে পায় না। খস ঘাসের মোটা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে ভারতীয় সব ঘরের জানালা আর দরজা। প্রতি ঘণ্টায় পিচকারি দিয়ে জল ছিটিয়ে সে পর্দা ভিজিয়ে রাখবার জন্য দুজন চাকর দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে। পাখা ঘোরে; ঘরের বাতাস ঠাণ্ডা, বাতাসে ভিজে খসের সুগন্ধ। ঢিলে খোঁপাকে আরও ঢিলে করে দিয়ে, বিছানার উপর শুয়ে আর চোখ বন্ধ করে যেন স্নিগ্ধ একটা স্বপ্ন দেখতে চাইছে শুক্তি। দেখতে পেয়ে মণিমাসির তো তাই মনে হয়।

এগিয়ে আসেন মণিমাসি। শুক্তির বিছানার একপাশে বসে শুক্তির কপালে বেশ কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে নিয়ে চলে যান। বোধ হয় ডাকপিয়ন এসেছে। বোধ হয় কিরণদির কাছ থেকে আর-একটা চিঠি এসেছে।

ভুল নয় মণিমাসির অনুমান। কদমবাড়ি থেকে কিরণলেখার বেশ বড় একটা চিঠি এসেছে। সে চিঠিকে খুব মন দিয়ে বার বার তিনবার পড়লেন মণিমাসি।

কিন্তু চিঠিটা তাঁর হাত থেকে বোধ হয় টুপ করে ঝরে পড়ে যাবে। আলগা হয়ে ঝুলছে তাঁর হাতের চিঠিটা। আর চোখের দৃষ্টিটা যেন কুচি-কুচি হয়ে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। চিঠিটা সত্যিই যে তাঁর এতদিনের একটা সুন্দর বিশ্বাসের গায়ে কালি ছিটিয়ে দিয়ে ভয়ানক ঠাট্টা করছে।

লিখেছেন কিরণলেখা—কলকাতা থেকে সুমিত্রার চিঠি পেয়ে এখন আমার মনে হয়েছে, তুমি চিঠিতে একটু বেশি তাড়াতাড়ি করে অনিমেষের কথা লিখে ফেলেছ। আরও কিছুদিন পরে লিখলে বোধ হয় ভাল করতে। শুধু একা সুমিত্রা নয়, আলিপুরের বাড়ির সবাই, জয়ন্তবাবু, দিবাকর আর করুণা, এমনকি নিশির মা'রও বিশ্বাস যে, শ্যামলের কাছে শুক্তির কোনও আপত্তি নেই। শ্যামলের সঙ্গে শুক্তির চেনা-শোনা আর মেলা-মেশাও হয়েছে। শ্যামলকে চিনতে পারলে তো? সুমিত্রার

বড়জায়ের ছেলে শ্যামল সরকার, ডাক্তার, খুব কৃতী ছেলে। সুমিত্রা একটু দুঃখ করে লিখেছে, ওরা সবাই এতদিন ধরে যা দেখেছে, শুনেছে আর বুঝেছে, সেটা কি একেবারে মিথ্যে?

অনেকদিন আগে তেজপুরে একটা সার্কাস-দল খেলা দেখাতে এসেছিল। মণিমালা একদিন সেই সার্কাসের খেলা দেখে এসেছিলেন। বেশ হাসি-খুশি চেহারা, বেণী দুলিয়ে একটা মেয়ে তারের উপর নেচেছিল। দুজন দু'রকমের চেহারার ক্লাউন; একটার মুখে সাদা রঙের, আর-একটার মুখে লাল রঙের ছাপ; মাটিতে দাঁড়িয়ে তারের দু'পাশের দু'দিক থেকে হাতছানি দিয়ে মেয়েটাকে ডাকে। মেয়েটা তারের উপর দিয়ে নেচে নেচে এসে একবার এই ক্লাউনের মাথাতে, একবার ওই ক্লাউনের মাথাতে রঙিন হাতাটা ছুঁইয়ে দিয়ে হাসতে থাকে।

একটা রঙ্গিলা খেলা; তামাসার জীবনে ওরকম খেলা চলতে পারে। কিন্তু শুক্তির মত মেয়ের জীবনে এ খেলা যে বিশ্রী একটা ভুলের খেলা। শুক্তির কি এটুকুও বুঝবার চেষ্টা নেই যে, সার্কাসের মেয়ের খেলাতে যেটা তামাসা, ঘরের মেয়ের জীবনে সেটা একটা ঘেন্না। এ কী কাণ্ড করে বসে আছে শুক্তি?

কিরণদির এই চিঠির কী উত্তর দেবেন মণিমালা? ভাবতে গিয়ে মনের মধ্যে একটাও কথা খুঁজে পান না। যেন ভাষা ভুলে গিয়েছেন মণিমালা। এত ভাল একটা শুভেচ্ছা, এত সুন্দর একটা আশা, আর এত ব্যস্ত একটা চেষ্টা, কত হঠাৎ একটা মিথ্যের জঞ্জাল হয়ে গেল। মণিমালার বুকের ভিতরে যেন একটা কান্না মুখ বন্ধ করে শুধু হাঁসফাঁস করতে থাকে। শুক্তির ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে মণিমালা।

এখন তো বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে, অনেক রাতে ছাদে উঠে উষাপাহাড়ের গায়ে যে আগুনটাকে জ্বলতে দেখেছিল কালোর মা, সেটা একটা অলক্ষুণে ইঙ্গিত। ভবানীপুরে আপত্তি নেই, সোম লজেও আপত্তি নেই, ছি ছি, কোনও ভালবাসার মন কি এমন কুৎসিত কথা বলতে পারে?

সত্যি কি তাই বলেছে শুক্তি? ও মেয়ের মুখ দেখে তো বিশ্বাস করতেই পারা যায় না যে, দু'জায়গায় দু'জনের কাছে মন সঁপে দিয়ে ও মেয়ের সাধ-স্বপ্ন সবই নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছে। অঞ্জনা আর অর্চনা, ওরা তো এই শুক্তিরই দুই দিদি, ওরা যে জীবনে কোনওদিন এক ছাড়া দুই ভাবতেই পারেনি। ওদের ভাগ্য ওদের ঠকিয়েছে, ওরা ইচ্ছে করে আর ভুল করে ভাগ্যটাকে ঠকাতে চায়নি। কিন্তু শুক্তি যে ইচ্ছে করে আর ভুল করে...। শুক্তির ঘুম ভেঙেছে মনে হয়।

শুক্তির ঘরে ঢুকে, শুক্তির মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর জিজ্ঞাসা করেন মণিমালা—ভবানীপুরের শ্যামলের সঙ্গে তোমার তো বেশ চেনাশোনা হয়েছে।

চমকে ওঠে শুক্তি।—হ্যাঁ।

মণিমালা—তুমি নাকি বলেছ যে, ওখানে তোমার কোনও আপত্তি নেই?

লালচে হয়ে যায় শুক্তির মুখ। মাথা হেঁট করে আর মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দেয় শুক্তি—অনেক দিন আগে করুণা বউদির কাছে বলেছিলাম।

মণিমালা—বেশ করেছিলে। কিন্তু তোমার আপত্তি নেই, এই কথাটা তো মিথ্যে নয়।

শুক্তি—তা আমি কেন আপত্তি করতে যাব, বলো? আমাকে ওকথা জিজ্ঞাসা করাই বা কেন?

মণিমালা—কেন নয়?

শুক্তি—তোমরা আছ কী করতে?

মণিমালা—আমি থাকলেই বা কী, আর না থাকলেই বা কী?

শুক্তি হাসে।—কেন?

মণিমালা—আমি তো আমার বোকা মনে বিশ্বাস করেছিলাম, অনিমেষের সঙ্গে তোমার কোনও আপত্তি নেই।

শুক্তি—আমি কি কখনও বলেছি যে, আপত্তি আছে?

চমকে ওঠেন মণিমালা।—তোমার কথাটা আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগল না। খুব বাজে কথা, খুব ভুল কথা।

শুক্তি—কেন? কিসের ভুল হল?

মণিমালার গলার স্বর যেন একটা ভর্ৎসনার ধমক হয়ে ফেটে পড়তে চায়। তবু খুব চেষ্টা করে গলার স্বরের সঙ্গে ভাষার রূঢ়তাও সামলে নিলেন মণিমালা। কিন্তু তাঁর চোখ রুক্ষ হয়ে কাঁপতে থাকে।—আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি একটা মানুষ, না দুটো মানুষ? তোমার কি একটা প্রাণ, না দুটো প্রাণ? গগনবাবুর কি শুক্তি নামে দুটো মেয়ে আছে; একজনের মন ভবানীপুরে, আর একজনের মন তেজপুরে? খুব দুঃখের কথা; আমি কোনওদিন ভাবতেও পারিনি যে, তোমার মত মেয়ে ঠিক বরেন ঘোষের মেয়েটার মত এরকম একটা দোমনা কাণ্ড করবে।

—মণিমাসি! চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি।—আমিও কোনওদিন ভাবতে পারিনি যে, তুমি আমাকে এত শক্ত কথা বলবে।

শুক্তির চোখের তারা দুটো যেন ভয় পেয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। থেকে-থেকে শিউরে উঠছে এক-একটা নিঃশ্বাস। মণিমাসির কথাগুলি তো কথা নয়; উষাপাহাড়ের আগুনটাব যত ফুলকি, ছুটে এসে শুক্তির মাথার উপর কুচি-কুচি জ্বালার মত ঝরে পড়ছে।

শক্ত কথা সামলাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন মণিমালা। শুক্তি এগিয়ে এসে মণিমালার দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে। শুক্তির বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাস যেন ক্ষেপে উঠেছে।—আমি ছাড়ব না, বলতেই হবে মণিমাসি, কী দোষ করলাম আমি?

মণিমাসি—আর কত বলব?

শুক্তি—না, আরও বলো। আমাকে বুঝিয়ে দাও।

মণিমাসি—তুমি বুঝে দেখো।

শুক্তি—আমি বুঝতে পারছি না।

মণিমাসি—অনিমেষকে ভাল লাগে?

শুক্তি—হ্যাঁ।

মণিমাসি—শ্যামলকে ভাল লাগে?

শুক্তি—হ্যাঁ।

মণিমাসি—লজ্জার কথা। তুমি ভুল করে তোমার মনটাকে নষ্ট করেছ।

হঠাৎ শান্ত হয়ে যায় শুক্তি। মণিমালার হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু হাত তুলে আর খোঁপাটাকে বাঁধতে পারে না। দুঃসহ একটা লজ্জার ভারে ভারী হয়ে গিয়েছে হাত দুটো। সে লজ্জা শুক্তির গলার স্বরেও একটা যন্ত্রণার আত্মবিলাপের মত বেজে ওঠে।—বুঝতে পেরেছি মণিমাসি; কিন্তু আমি ইচ্ছে করে ভুল করিনি।

মণিমালার চোখমুখ এইবার যেন অদ্ভুত এক উতলা করুণতায় ভরে যায়। শুক্তির হাত ধরে টানতে থাকেন মণিমালা।—আয়, চোখমুখ ধুয়ে নিয়ে আমার কাছে একটু বসবি, আয়।

চোখমুখ ধুয়ে মণিমালার কাছে চুপ করে বসে থাকলেও শুক্তিকে ঠিক আর সেই শুক্তির মত দেখায় না। ঝড় বৃষ্টির পর ভারতীর বাগানের ছোট কামিনী গাছটাকে যেমন দেখায়, শুক্তিকেও প্রায় সেইরকম দেখায়; শান্ত অথচ এলোমেলো। সবই তো বুঝতে পারা গেল, মনটা তাই শান্ত। কিন্তু এর পর যে কী হবে, বুঝতে না পেরে প্রাণটা এলোমেলো।

রাতের কাজ শেষ হবার পর জপের মালা হাতে নিয়ে ছাদে ওঠেন কালোর মা। শুক্তিও ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মণিমালা আপত্তি করেন, না না না, যাসনি শুক্তি। কিন্তু শুক্তি হাসে। —সত্যি আমার খুব ভাল লাগে, তুমি মানা করো না, এখনই চলে আসব।

যেন চেনা-আকাশের তারা খুঁজছে শুক্তির চোখ। দেখতেও অসুবিধে নেই। দুটো তারা জ্বলছে।

ভালই করলেন মণিমাসি। ভুল বুঝিয়ে দিতে গিয়ে কিছু বলতে আর বাকি রাখেননি। বরেন ঘোষের মেয়ে। যেটুকু বলতে বাকি ছিল, সেটুকু ওই একটি তুলনার কথা দিয়ে একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

বরেন ঘোষের মেয়ের গল্প করতে গিয়ে মীরা কাকিমা যে কথাটা বলেছিলেন, সে কথাটাও কী ভয়ানক একটা স্পষ্ট কথা, ডবল প্রেম। শেফালিকা ঘোষ শিলংয়ে থাকতে দুজনকে ভালবেসে শেষে একটা বিশ্রী মামলার কাণ্ড বাধিয়েছিল। আদালতে একটা ফটো দাখিল করেছিলেন উকিল; দু'হাতে দুজনের হাত ধরে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে শেফালিকা ঘোষ।

সেদিন শেফালিকা ঘোষের গল্প শুনে শিউরে উঠেছিল শুক্তি। আজ নিজের কথা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠতে হয়। কেউ যদি আজ এখন চুপি-চুপি এখানে এসে শুক্তির একটা ফটো তুলে নিয়ে চলে যায়, তবে সেই ফটোতেও দেখতে পাওয়া যাবে, চেনা-আকাশের দুটো তারার দিকে তাকিয়ে শুক্তি বসুও দাঁড়িয়ে আছে।

লজ্জা পেলে তো সত্যটা আর মিথ্যে হয়ে যাবে না। গোলাপকে যে নামে ডাক, শুক্তি বসুর এই আপত্তি-নেই মনটা যে ভালবাসারই মন। বুঝতে চেষ্টা না করে, ভুলে থাকতে চেষ্টা করে, কিংবা লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে কি এই ছাই অদ্ভুত মনের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায়? যায় না, যাবেও না। একটা মামলার আদালত যদি এখনই এসে শুক্তির গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়ে বলে যে, মরবার আগে সত্যি কথাটা স্বীকার করে যাও, তবে তো বলতেই হবে, হ্যাঁ, এখনও আপত্তি নেই। শ্যামলবাবুর জন্মদিনে একটা ফুলের তোড়া পাঠাতে, আর অনিমেষবাবুর সঙ্গে বিলের জলের নীলপদ্ম দেখতে যেতে একটুও খারাপ লাগবে না।

দোতলার বারান্দার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মণিমালা ডাকলেন—আর দেরি করো না, শুক্তি। এবার চলে এসো।

এ ছাড়া মণিমালার মনের মায়াটার যে আর কোনও কাজও নেই। আশা করবার কিছু নেই; শুক্তিকে শুধু যত্ন করে আর সাবধানে আগলে রাখতে হবে, যতদিন এখানে থাকতে চাইবে ওর মন।

সব চেয়ে কষ্ট হয় তখন, যখন বুঝতে পারেন মণিমালা, কিরণদিকে আর লিখে জানাবার মত কিছু নেই। আর কিছু লেখবার দরকারও হয় না। কিরণদি এবার তাঁর মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই সব বুঝে নিতে পারবেন। তবু কষ্ট হয় বইকি। গগনবাবুর কথা ভেবেও কষ্ট হয়। কিরণদিরও যে বার বার শুধু এই কথাটাই মনে হবে, শুক্তিকে নিজের মেয়ের মত মনে করে যে-দুটি মানুষ শুক্তির ভাল করতে চেয়েছিল, তাদের আর কিছুই চেষ্টা করবার রইল না। শুক্তিই তাদের চেষ্টার হাত ভেঙে দিয়েছে। কিরণদির এই বয়সের জীবনে এটা কি একটা কঠিন আঘাত হয়ে বাজবে না?

কলম হাতে তুলে নিয়েও কিছু লিখতে পারেন না মণিমালা, একটিও কথা না লিখেও হাতটা যেন ক্লান্ত হয়ে যায়। তবু লিখে ফেললেন—আমি আর কিছু বলতে পারছি না, কিরণদি। কিছু মনে করো না। তুমি শুক্তিকে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিও।

ভাঁজ করা চিঠিটাকে খামে বন্ধ করতে গিয়ে আবার একটু ভাবেন মণিমালা। তারপর চিঠির ভাঁজ খুলে আবার লিখতে থাকেন।—না, চিন্তে করবার কিছু নেই, কিরণদি। শুক্তির শরীর এখন বেশ ভাল আছে। আরও ভাল হবে। আরও কিছুদিন, অন্তত পরীক্ষার ফল বের হওয়া পর্যন্ত শুক্তি আমার কাছেই থাকুক।

নেফার পাহাড়ের মাথায় মাঝে মাঝে কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। এক-আধ পশলা বৃষ্টি আশা করছে তপ্ত শহর তেজপুর। শুক্তিও আশা করে; আর দেরি নেই বোধ হয়, এইবার পরীক্ষার ফল বের হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর?

শুক্তি বলে—তারপর আর দেরি করো না। মণিমাসি; মা'র চিঠি আমাকে যেতে বলুক আর না বলুক, তোমার ইচ্ছে হোক বা না হোক, আমাকে কদমবাড়ি পাঠিয়ে দিও।

মণিমাসি—তাই হবে গো মেয়ে। আমি তো একটা মাসি মাত্র, ইচ্ছে থাকলেও কত আর ধরে রাখতে পারব।

সেদিনই কলকাতা থেকে সুমিত্রা সরকারের একটা চিঠি পেলেন মণিমালা,—শুক্তিকে বলবেন, আর সাতদিন পরে পরীক্ষার ফল বের হবে।

—তবে আর কী? মাসির বকা-ঝকা থেকে রেহাই পেয়ে আর সাতদিন পরেই হাঁপ ছাড়বি, শুক্তি।

শুক্তি হাসতে চেষ্টা করে।—তুমি ওরকম করে মিথ্যে কথা বলো না, মণিমাসি। তুমি আবার কবে আমাকে বকা-ঝকা করলে?

মণিমাসির চোখ ছলছল করে। করেছি বইকি। তুই হয়ত রাগও করেছিস, কিন্তু...।

শুক্তি হাসে।—এইবার কিন্তু আমি সত্যিই রাগ করব, যদিও আগে কখনও রাগ করিনি।

মণিমাসি—তোকে চলে যেতে দিতে সত্যিই আমার একটুও ভাল লাগছে না।

শুক্তি—কী আশ্চর্য, আমি যেন আর তোমার কাছে আসবই না, তুমি এরকম একটা মিথ্যে ধারণা করে যা-খুশি-তাই ভাবছ।

মণিমাসি—না না, কিছু ভাবছি না। ষাট, আসবি বইকি; যখন ইচ্ছে হয় তখনই চলে আসবি। তবে...।

শুক্তি—কী?

মণিমাসি—তবে, পরীক্ষার ফল বের হবার পর আরও পাঁচ-দশটা দিন তোকে এখানে আটকে রাখলে কিরণদি কিছু মনে করবেন না বোধ হয়।

শুক্তি হাসে।—সেটা তুমি জান, আর তোমার দিদি জানে।

কিন্তু পরের দিন সকালবেলা মণিমাসির মনের এই মায়ার বিলাপ যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে, জব্দ হয়ে যায়, আর বোবা হয়ে ছটফট করে। এখনই শুক্তির কাছে ছুটে গিয়ে বলে দিতে ইচ্ছে করে, না, তোর এখন আর এখানে থাকতে হবে না, থেকে কাজ নেই, থেকে লাভ কী, থাকা উচিত নয়, তুই আজই কদমবাড়ি চলে যা।

বলে দিতে ইচ্ছে করলেই কি বলতে পারা যাবে? শুক্তি কি একটু আশ্চর্য হয়ে যাবে না? তারপর হঠাৎ যদি মেয়েটা মুখ খুলে বলেই দেয়—তুমি যেন তোমার মান বাঁচাবার জন্যে সাবধান হয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ, মণিমাসি; তবে সে কথাটা সহ্য করবেনই বা কেমন করে? কিন্তু সেটা তো খুব-একটা মিথ্যে কথা হবে না।

সোম লজের মালী এসে মণিমালাকে খবর দিয়েছে; মা আপনাকে বলতে বললেন, শিলিগুড়ি থেকে দাদাবাবু কাল এখানে এসে পৌঁছবেন।

তারপর? তারপর যা হবে সেটা কল্পনা করতেও অসুবিধে নেই। অনিমেষ নিজেই এখানে আসবে। শুক্তির সঙ্গে কথা বলবে। শুক্তি কথা বলবে। যেকথা আর যেমন কথাই হোক না কেন, সেসব কথার তো কোনও মানে হতে পারে না। দেখতে ও শুনতে বড় জোর একটা ভাল থিয়েটারের মত লাগবে, এই মাত্র। অনিমেষ তেজপুরে পৌঁছাবার আগেই শুক্তির কদমবাড়ি চলে যাওয়া ভাল।

কিন্তু সে কথা বলতে হলে যে মণিমালার বুকের ভিতর একটা লজ্জা মাথা খুঁড়ে মরতে চাইবে। জীবনে কোনওদিন শুক্তিকে একথা বলবার দুর্ভাগ্য হয়নি মণিমালার, তুই এবার চলে যা, শুক্তি। আজ কি সেই ভয়ানক নিষ্ঠুর কথাটা বলতে হবে?

দেখতে পাননি মণিমালা, শুক্তি কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে। মণিমালার গলার

স্বর ছটফট করে।—কী শুক্তি? কী বলছিস, লক্ষ্মী মা?

শুক্তি—পরীক্ষার ফল তো আর ছ'দিন পরে বের হবেই, সবাই জানতেও পারবে।

মণিমাসি—হ্যাঁ।

শুক্তি—কিন্তু আমি তার আগেই কদমবাড়ি চলে যাই না কেন? পরীক্ষার ফল জানবার জন্যে আমায় আর এখানে না থাকলেও তো কিছু আসে যায় না?

মণিমাসি—যেতে চাস?

শুক্তি—হ্যাঁ। রাজাবাহাদুর কোথায়?

মণিমাসি—কেন?

শুক্তি—আমি আজই কদমবাড়ি যাব। রাজাবাহাদুরকে গাড়ি বের করতে বলো।

মণিমাসি—এখনই রওনা হতে চাস নাকি?

শুক্তি—হ্যাঁ।

১৫

কদমবাড়ির চা-কলমের গায়ে কচি পাতা ধরেছে। নেফার পাহাড়ের মেঘ বার বার অনেকবার ভেসে এসেছে আর গুঁড়ো বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে। আবার রোদ উঠেছে। আষাঢ়ের এই ফাঁকা চেহারা যে আর বেশিদিন থাকবে না, তারই আভাস দিয়ে কদমবাড়ির আকাশে ঘোর মেঘলা আবেশও মাঝে মাঝে কাল হয়ে ওঠে।

বুলডগ মহারাজা কতবার শুক্তির কাছে এসে ছুটোছুটির হাতছানি দেখবার জন্যে ছটফট করে, শুক্তির শাড়ির আঁচল কামড়ে ধরে টানাটানিও করে। কিন্তু সাহেবকুঠির মেয়ে শুক্তি শুধু চুপ করে বসে থাকে। কখনও বারান্দার এককোণের একটি মেহগনির চেয়ারে, কখন লনের পাশে কংক্রিটের ছোট বেদিটার উপরে, কিংবা পুরনো পিলখানার সামনে বকুলের ছাযার কাছে রাখা পদ্মকাটা পাথরটার উপর, যেটাকে পঞ্চাশ বছর আগে পাবলিক ওয়ার্কসের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রবার্টসন ভালুকপংয়ের কাছাকাছি পুরাকালের একটা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে কুড়িয়ে আর হাতি দিয়ে টানিয়ে এনে এখানে রেখেছিলেন।

কিরণলেখা বলেন—তোকে একটা কথা একটু বুঝিয়ে বলবার ছিল শুক্তি।

শুক্তি—বলো।

কিরণলেখা—বলবই তো, কিন্তু এটা কী? তোমার নতুন শখ, না নতুন বাতিক?

শুক্তি—কী?

কিরণলেখা—তোমার গায়ের এই শাড়ি? একেবারে সাদা একটা গরদ।

নেহাতই সাদা একটা গরদ, পাড়ও নেই। এ যেন এই বয়সের জীবনের সব রঙ ধুয়ে মুছে একেবারে একলা হয়ে থাকবার একটা ইচ্ছার সাজ। লনের এক পাশে সবুজ ঘাসের উপর মিথ্যা ও শান্ত একটি সাদা অস্তিত্ব হয়ে বসে আছে শুক্তি। শুক্তিকে দেখতে তো একটুও খারাপ দেখায় না; তবু কিরণলেখার দেখতে ভাল লাগে না। চোখে পড়তেই তাঁর চোখের চশমার কাচ বেশ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে; তাই এগিয়ে এসেছেন আর প্রশ্ন করেছেন।

শুক্তি হাসে। —খারাপ দেখাচ্ছে?

কিরণলেখা—না, খারাপ দেখাবে কেন? কিন্তু ভাল দেখাচ্ছে না।

শুক্তি—আমি তো ভাল দেখাবার জন্যে সাদা গরদ পরিনি।

কিরণলেখা—তবে কেন পরেছিস?

শুক্তি—ভাল লাগল, তাই পরেছি।

আর কথা না বাড়িয়ে, শুধু শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মনের প্রশ্নটাকে মনের মধ্যেই চেপে রাখেন কিরণলেখা। বলতে ইচ্ছে করে, আজ হঠাৎ তোমার কেন ভাল লাগছে এই সাদা সাজ? কী এমন ব্যাপার হল যে, এত শান্ত হয়ে বসে থাকতে হবে? কিসের এত ক্লান্তি যে, এত কম কথা বলতে হবে? সবই যে নতুন বাতিক বলে মনে হয়।

কিরণলেখার চোখে চশমার কাচ ঝাপসা হবেই বা না কেন? বেণী নেই, মস্ত বড় একটা খোঁপা, তার উপর এই সাদা গরদ; এ যেন অন্য একটা মেয়ে, শুধু মুখটা শুক্তির মত। একটা বছরও পার হয়নি, এত হাসি-খুশি আর এত দুরন্ত মেয়েটাকে কে যেন মনে-প্রাণে আর চেহারাতেও একেবারে অন্যরকম করে সাজিয়ে কদমবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মাঝে অবশ্য একটি দিন, যেদিন শুক্তিব পাসেব খবরটা নিয়ে কলকাতা থেকে সুমিত্রাব চিঠি এল, সেদিন খুব খুশি হয়ে হেসেছিল শুক্তি।—আঃ, আমাব কী ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন কেটে গেল, মা।

—কী বললি?

—তিনটে মাস ধরে সমস্তক্ষণ ভয়-ভয় করেছে; শুধু মনে হয়েছে, ফেল করলে বড় পিসির মনে কী কষ্টই না হবে।

গগন বসুও না হেসে থাকতে পারেননি—সুমির কাছে থাকলে কারও কি লেখাপড়া না শেখবার সাধ্যি আছে?

কিরণলেখাও খুশি হয়ে হাসেন।—আসল কথা হল শুক্তির ভাগ্য। শুক্তিকে একটু হিংসে করলে মন্দ হয় না।

গগন বসু—কেন বল তো?

কিরণলেখা—সুমিত্রার মত পিসি আর মণিমালার মত মাসি থাকতে শুক্তির আব ভাবনা কিসের? পিসির যত্নে বি-এ পাস করা হল, আর মাসির যত্নে রোগা চেহারা দু'মাসেই ভাল হয়ে গেল।

গগন বসু—ঠিক কথা। শুক্তির মণিমাসির স্নেহচ্ছায়ায় থাকলে কি কারও রোগা হয়ে থাকবার সাধ্যি আছে?

কিরণলেখা—ঠাট্টা করছ কেন? মণি বেচারা এমন কিছু মোটা নয়।

কদমবাড়ির সাহেবকুঠির জীবনে সুখী কলরবের সেই দিনটির পর পুরো ত্রিশটি দিন পার হয়ে গেলেও কিরণলেখা কিন্তু এখনও শুক্তির কাছে সেই কথাটা আজও বলতে পারেননি, যেকথা শুক্তির জীবনের একটি সুখী উৎসবের ইচ্ছার কথা।

বলতে গিয়েও অনেকবার কুণ্ঠিত হয়ে চুপ করে গিয়েছেন কিরণলেখা। শুক্তির চোখ দুটো যেন দুটো চোখ মাত্র, তার মধ্যে কোনও ভাবনা আর কল্পনার চঞ্চলতা নেই। দুরন্তপনার সেই ছটফটে মেয়ের এত শান্তপনা দেখতে একটুও ভাল লাগে না কিরণলেখার। সুমিত্রার আর মণিমালার চিঠির অমন শুকনো হতাশ-উদাস ভাষাও ভাল লাগেনি। কিরণলেখার শুধু মনে হয়েছে, আর মনে হতেই বেশ একটু আশ্চর্যও হয়েছেন যে, সবাই যেন চোখের ভুলে মিথ্যে একটা কালোছায়া দেখে ভয় পেয়েছে আর গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। না, মোটেই না; সাদা গরদ পরতে ভাল লাগবে শুক্তির, এমন কোনও অপরাধ করেনি শুক্তির মন।

তাই কিরণলেখা যেন একটা সুখী লগ্নের অপেক্ষায় আছেন। বোধ হয় কামনা করেন কিরণলেখা, রাতের আকাশের মেঘ হঠাৎ একটু ভেঙে যাক, মুখঢাকা চাঁদটা একবার ঝিক করে হেসে উঠুক, কদমবাড়ি অন্ধকারের গায়ে একটু জ্যোৎস্না ঝরে পড়ুক, আর সাহেবকুঠির বারান্দার কোচের উপর বসে হঠাৎ গুনগুন করে গান গেয়ে ফেলুক শুক্তি; তখনই শুক্তির কাছে গিয়ে বসে

আর হেসে-হেসে কথাটা তুলতে পারবেন কিরণলেখা। বলে দিতে পাববেন, না, তোমার এত গম্ভীর হয়ে যাওয়ার মত কিছুই হয়নি। এরকম হয়েই থাকে। ওটা একটা সমস্যাই নয়; কোনও গিঁট নয়, কাঁটা নয়, ময়লা ধুলোও নয়।

আজ থাক তবে। আজ এখন এই লনের ঘাসের উপর চুপ কবে বসে থাকুক শুক্তি। যদিও বিকেল ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু এমনই একটা ঘন মেঘলার দিন যে, পশ্চিমেব আকাশে একটা লালচে আভার রেখাও ফুটে উঠতে পারেনি। আজ এ সময় কথাটা তুলতে গেলে শুক্তির চোখ দুটোও বোধ হয় ভয় পেয়ে মেঘলা হয়ে যাবে, মুখ ফিরিয়ে নেবে, হয়ত কোনও কথাই বলবে না।

সন্ধ্যা হতেই সাহেবকুঠির সব ঘরে যখন আলো জ্বলতে শুরু করে, তখন বারান্দার চেয়ারে বসে অফিসের হিসাবেব খাতায় সই করেন গগন বসু। তারপর পাইপ ধরান। তারপর খবরেব কাগজটাকে তুলে নেন।

বৃষ্টি নেই, শুধু ফুরফুরে হাওয়া। সাহেবকুঠির একটি ঘরেব রঙিন কাপড়ের পর্দা ফুলে-ফেঁপে কাঁপতে থাকে। সে ঘরের বিছানার উপর বসে আর কোলের উপর একটা বই রেখে আনমনাব মত কী-যেন দেখতে থাকে শুক্তি। তারপর কী-যেন শুনতে পেযে চমকে ওঠে।

গগনবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন কুমুদ ডাক্তার। গগন বসু হাসছেন—তা আপনি আর কী কববেন? আপনিও ওইরকম দু-একটা কথা বলে ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে রাখুন।

কুমুদ ডাক্তার—তা তো বলছিই; সব সময় বলছি; কিন্তু মানতে কি চায়? মুনসি চাপরাশি দফাদাব কামদার সরদার, যাকে দেখতে পাবে, তাকেই ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, হ্যাঁ গো, বুমলা জায়গাটা কোথায়? এখানে থেকে কত দূর? এবেলা গিয়ে ওবেলা ফিরে আসতে পারব তো?

গগন বসু—ওরা কী জবাব দেয়?

কুমুদ ডাক্তার হাসেন। —আমি ওদের সবাইকে যা শিখিয়ে দিয়েছি, তাই ওরা বলে দেয়। ওই তো ওখানে, চাবদুয়ারের কাছে বুমলা। মুড়ি-মুড়কি আর কইমাছ, সব কিছুই সেখানে পাওযা যায়। তবে, এখন সেখানে যেতে অসুবিধা আছে। পথের উপর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, কাউকে যেতে দেয় না।

গগন বসু—সুজিতের চিঠি-পত্র পাচ্ছেন?

কুমুদ ডাক্তার—পাচ্ছি। কিন্তু সে সব চিঠি লুকিয়ে রাখতে হয়।

গগন বসু—কেন?

কুমুদ ডাক্তার—না লুকিয়ে উপায় কী? সুজিতের কাকিমার হাতে সে চিঠি পড়লে কি তাব আর বুঝে ফেলতে কিছু বাকি থাকবে?

গগন বসু—কী লেখে সুজিত?

কুমুদ ডাক্তার—আমি ভাল আছি, শুধু এই একটি কথা লিখলেই তো কোনও গোলমালের ভয় থাকত না। কিন্তু হেন তেন অনেক আজে-বাজে কথা লেখে।

গগন বসু—আজে-বাজে কথা?

কুমুদ ডাক্তার—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার, যেন কোনও প্রাণের বন্ধুকে খবর জানাতে চাইছে, সেইরকমের যত সব কথা। খুব ভাল জায়গা বুমলা। খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর পোস্ট। মাসে একবার করে হেলিকপ্টর উড়ে এসে ওদের চাল-ডালের বস্তা ড্রপ করে দিয়ে চলে যায়। রাত্রিবেলায পাহারাব সময় মাথার লোহার টুপির ওপর এক ইঞ্চি পুরু বরফ জমে যায়। খবর পাওয়া গিয়েছে, চিনাবা আমাদের সীমানার লাইনের কাছে ঘুরঘুর করছে।

খবরের কাগজটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গগন বসু বলেন।—হ্যাঁ, আজ দেখছি, কাগজেও একথা বলছে।

কুমুদ ডাক্তার—একদিন পেট্রলে বের হয়ে হঠাৎ একটি কস্তুরি হরিণ দেখতে পেয়েছিল সুজিত।

কিন্তু ধরতে পারেনি।

গগন বসু—হ্যাঁ, শুনেছি, তোয়াং-এর কাছে পাইনের জঙ্গলে কস্তুরি হরিণ পাওয়া যায়।

কুমুদ ডাক্তার—এখন বলুন স্যার, এসব কথা জানতে পেলে কি আর কিছু বুঝতে বাকি থাকবে ওর কাকিমার, বুমলা কোথায়? মানুষটা একটু বোকা বটে, কিন্তু খুব বোকা তো নয়।

ফুরফুরে হাওয়াটা এতক্ষণে বেশ একটু উতলা হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের যত শিরীষ মাথা দোলাতে শুরু করেছে। শুক্তির ঘরে ঢুকে আর আয়নার তোয়ালাটাকে হাতে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন কিরণলেখা। কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন।

কিরণলেখা হাসেন। —তোর হাতে ওটা কিসের বই, শুক্তি?

শুক্তি—এটা একটা বই...একটা গল্পের বই না না, এটা একটা ছবির বই, এভারেস্টের ছবি।

যাই হোক, বইয়ের পাতায় এভারেস্টের ছবি যত সাদা হোক না কেন, শুক্তির মুখটা যে রঙিন হয়ে হাসছে। এগিয়ে এসে শুক্তির বিছানার উপর বসেন কিরণলেখা। —কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় শ্যামলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

শুক্তি—না।

কিরণলেখা—তেজপুর থেকে আসবার আগে অনিমেষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

শুক্তি—না।

কিরণলেখা—কিন্তু তোর তো নিশ্চয় ইচ্ছে হয়েছিল, দু'জনের কেউ একজন এসে দেখা করুক।

শুক্তি—কী বললে?

কিরণলেখা—শ্যামল হোক, কিংবা অনিমেষ হোক, যাকে দেখতে পেলে তোমার বেশি ভাল লাগে...।

শুক্তি—না না, এসব কথা বলো না। আমি তোমার কথার কোনও মানে বুঝতে পারছি না, পারবও না।

কিরণলেখা—তা হয় না শুক্তি।

শুক্তি—কী হয় না?

কিরণলেখা—দু'জন কখনও সমান হয় না। আর, দুজনকে কখনও সমান ভাল লাগে না।

শুক্তির মাথাটা ঝুঁকে পড়ে যেন সাদা এভারেস্টের ছবির মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু কিরণলেখা আজ বোধ হয় শুক্তির প্রাণেরই হেঁট-মাথা ভঙ্গিটাকে একেবারে মিথ্যে করে দেবার জন্য তৈরি হয়েছেন। কিরণলেখা বলেন—লজ্জা করবার কিছুই নেই, শুক্তি। দু'জনের সঙ্গে চেনাশোনা হয়েছে, দু'জনকে ভাল লেগেছে, ভালই হয়েছে। ওতে কিছু আসে যায় না। ওরকম হয়েই থাকে। কিন্তু...।

শুক্তির আরও কাছে এগিয়ে এসে, শুক্তির মাথায় হাত রেখে কিরণলেখা বলেন—শুধু একটু বুঝে নিতে হয়, কাকে বেশি বেশ লাগে। এই যে তোমার বাণীকাকিমা, সে মেয়ে কী করেছিল, শুনবে? দু জায়গা থেকে বাণীর বিয়ের কথা এসেছিল। দু'জনেই ভাল ছেলে। কিন্তু বাণী বলেছিল, প্রণব বসুকে বেশি ভাল বলে মনে হয়। কাজেই তোমার প্রণবকাকার সঙ্গে বাণীর বিয়ে হয়ে গেল।

কিরণলেখার মুখের দিকে দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকে শুক্তি। শুক্তির মাথায় হাত বুলিয়ে কিরণলেখা বলতে থাকেন—তোমার অসুবিধে তোমার বাণীকাকিমার অসুবিধের চেয়ে একটুও কঠিন কিছু নয়। ওই দুই ছেলের কারও সঙ্গে বাণীর চেনা-শোনা ছিল না, আর তোমার সঙ্গে দুজনের চেনা-শোনা হয়েছে, এই তো তফাত। তোমার তো বরং ভেবে নিতে ভুল হবার ভয় আরও কম, কাকে বেশি ভাল লাগে।

শুক্তি—তুমি এবার চুপ করো।

কিরণলেখা—চুপ করছি। কিন্তু বলবি তো? বলিস লক্ষ্মী, আমার কাছে বলতে তো কোনও লজ্জা নেই।

শুক্তি—বলব।

কিরণলেখা—কিন্তু বেশি দেরি কবো না যেন। সুমিত্রা আর মণিকে একটু তাড়াতাড়ি চিঠি দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিলেই ভাল; ওরাও তো ভাবছে।

চলে গেলেন কিরণলেখা। শুক্তির মনের ভিতরে যেন একটা দীপের আলো জ্বেলে দিয়ে চলে গেলেন। তা না হলে শুক্তির চোখে এমন একটা জ্বলজ্বলে হাসি এতক্ষণ ধরে ফুটে থাকতে পারত না। এই কয়েকটা মাস নিজেকে একটা ভুলের অন্ধকার বলে বিশ্বাস করে যে লজ্জা পেয়েছে শুক্তি, সে লজ্জা যে একটা মিথ্যা ভয়ের অন্ধকার। মা'র কথাগুলি কত স্পষ্ট। কিন্তু এত স্পষ্ট করে বলে দিতে পারলেন বলেই তো শুক্তির মন এমন একটা সান্ত্বনা পেয়ে গেল। চেনা-আকাশে শুধু দুটো তারা; শুক্তিকে শুধু একবার বলে দিতে হবে, কাকে বেশি বেশ লাগে। তা তো বলতেই হবে। অন্তত মা'র কাছে বলে দিতে কোনও লজ্জা নেই।

কিন্তু মাঝরাতে ঘুম হঠাৎ ভেঙে যাবার পর আর ঘুম আসে না যখন, ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাওয়া যায় না যখন, তখন ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারে শুক্তি, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ভালবাসার আশাটা কাকে বেশি খোঁজে আর কাকে কম; হিসেব করতে গেলে সবই এলোমেলো হয়ে যায়। সন্দেহ হয়, সবই মিথ্যে। শুক্তির জীবনের আকাশে ওরা দুজন দুটো তারাই নয়।

কিন্তু অস্বীকার কববাব যে সাধ্যি নেই। নীলপদ্মের গল্প শুনতে কি ভাল লাগেনি? কৃষ্ণাব হাত দিয়ে ফুলের তোড়া পাঠাতে গিয়ে মনটা কি খুশিতে ভরে যায়নি? শুক্তির ঘুম-ভাঙা চোখের মত শুক্তির চিন্তার সব যুক্তি-বুদ্ধিগুলিও শুধু ছটফট করে; কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারে না। এখন যদি শেষরাতের ঘুমটা হঠাৎ একটা স্বপ্ন এনে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে, কাকে বেশি ভাল লাগে। কিন্তু স্বপ্নের দোহাই দিয়ে তো জবাব দেবার দায় থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। বলতেই হবে। ছি, ছি, তবে কি লটারি কবে ঠিক করতে হবে?

ধড়ফড় করে উঠে বসে শুক্তি। সাহেবকুঠির বারান্দায় যেন অনেকগুলি ছটফটে পায়ের শব্দ ঘোরাঘুরি করছে। টর্চের আলো জ্বলছে আর নিবছে।

শুনতে পাওয়া যায়, কথা বলছে মালী হরদেও, কথা বলছে দারোয়ান কপিলরাম। কথা বলছেন গগন বসু আর কিরণলেখা। শুক্তিও আশ্চর্য হয়ে আর ব্যস্তভাবে ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার এই সন্দেহের জটলার এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।

দারোয়ান কপিলামের সন্দেহ; অনেকক্ষণ ধরে যে অদ্ভুত একটা ছায়া ঘুরঘুর করছিল পুরনো গ্যারাজের কাছে, সেটা এখন গ্যারেজের ভিতরে ঢুকেছে।

মালী হরদেও বলে—বন্দুকের আওয়াজ করুন, তা হলেই বের হয়ে আসবে।

কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ করতে হয়নি। একজন মানুষ হাসতে হাসতে পুরনো গ্যারেজের খালি ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এল। দারোয়ান কপিলরাম চেঁচিয়ে ওঠে।—মামাবাবু!

সত্যিই দুলাল দত্ত, শুক্তির দুলাল মামা এসেছেন। সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন দুলাল দত্ত।—সঙ্গে আমার একজন বন্ধুও এসেছেন কিনা, তাই তাঁকে পুরনো গ্যারেজের ওই খালি ঘরের ভিতরে রেখে এলাম।

গগন বসু—আপনার বন্ধু?

দুলাল দত্ত—ইয়েস স্যার।

কিরণলেখা উদ্বিগ্ন স্বরে কথা বলেন।—বন্ধুকে ওখানে কেন রেখে এলেন মেজদা? আপনার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না। এত রাত্রে আপনি এলেনই বা কোথা থেকে?

দুলাল দত্ত—নেফা থেকে। আমার আশ্রম থেকে। তা ছাড়া আবার কোথা থেকে? কিন্তু তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না কিবণ, আমার বন্ধু চা খান না।

কিরণলেখার কাছে এগিয়ে এসে চাপা-স্বরে কথা বলেন গগন বসু।—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে কিরণ। তোমার মেজদার মেজাজ স্বাভাবিক নয়।

কিরণলেখা—আপনি এখন বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, মেজদা।

দুলাল দত্ত—নিশ্চয়।

কিন্তু বারান্দার একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন দুলাল দত্ত। তারপর খুব জোরে একটু আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে নিয়ে হাসতে থাকেন।—ব্যাপারটা কী জানেন, গগনদা? আমি একজন অবাঞ্ছিত, একজন আন-ডিজায়ারেবল। নেফা সরকার আমাকে নোটিস দিয়ে সাতদিনের মধ্যে নেফা ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। আমিও কলা দেখিয়ে তিনদিনের মধ্যে নেফা ছেড়ে বের হয়ে এসেছি। আর যাব না; ডেকে ডেকে মরে গেলেও, পায়ে ধরে সাধলেও যাব না।

গগন বসু—হঠাৎ এরকম একটা নোটিস কেন?

দুলাল দত্ত—ওই তো, ওরা ঠিক ধরে ফেলেছে, আমি একটা বাইরের মতলবের লোক, ট্রাইবাল বেচারাদের খাঁটি ধর্ম নোংরা করে দিচ্ছি। ওদের ঘরে ঘরে যত কেষ্ট বিষ্টুর ছবি বিলিযেছি। বাস, আর কি রক্ষে আছে? ভাগো অবাঞ্ছিত, জলদি ভাগো।

কিবণলেখা মিনতি কবে বলেন—মেজদা, আপনি এখন চুপ করে ওঘবে গিয়ে শুযে পড়ুন। যাও হবদেও, মামাবাবুকো বাত্তি দেখা কর লে যাও।

কিন্তু চেয়ার থেকে নড়েন না দুলাল দত্ত। এদিকে ওদিকে তাকান আব বিড়বিড় কবেন। কী ভয়ানক শূন্য উদাস আব ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে দুলাল দত্তের দুই চোখ।

—উঠুন মেজদা। কিরণলেখা আবার অনুরোধ করেন।

দুলাল দত্ত—তোমাদের এখানে ভাল গিরগিটি পাওয়া যায়?...নাঃ, আমি জানি পাওয়া যাবে না। আচ্ছা গুডনাইট। আমি চললাম কিরণ।

উঠে গিযে পুবনো গ্যারেজের সেই খালি ঘরের ভিতরে ঢুকলেন দুলাল দত্ত, যেখানে কিছুক্ষণ আগে তাঁর রহস্যময় এক বন্ধুকে রেখে এসেছেন।

কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে বেব হয়ে আসতে বেশ দেরি করছেন দুলাল দত্ত। গগন বসু এইবার উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন—কপিলরাম, তুমি গিয়ে দেখ একবার, কী করছেন মামাবাবু। আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে।

এগিয়ে যেয়ে, ঘরের ভিতরে টর্চের আলো ফেলেই আতঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কপিলরাম—খুন হুয়া হুজুর।

দুলাল দত্তের রোগা ছিপছিপে চেহারাটা অদ্ভুত কঠোর ও গম্ভীর একটা মূর্তি হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। হাতে একটা দা, কাদামাখা প্যান্টালুনে রক্তের দাগ, হাতেও ফোঁটা ফোঁটা রক্তের ছিটে। আর, ঘরের ভিতরে রক্তমাখা একটা বস্তার ভিতর থেকে একটা মস্তবড় চন্দ্রবোড়া সাপের গলাকাটা ধড় অর্ধেক বের হয়ে রয়েছে।

হাতের দা'টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিযে আর বেশ শান্ত স্বরে মালী হরদেওয়ের কাছে জল চাইলেন দুলাল দত্ত। হাত ধুয়ে নিয়ে বললেন—ওটা এতদিন আমার কাছে ছিল। যেখানেই যাক না কেন, ফিরে এসে আমার চং-এর নীচে একটা গর্তের ঘাসের ভিতরে শুয়ে থাকত। ওর চামড়া দিয়ে বেশ ভাল জুতো হবে, জান তো হরদেও?

আবার কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেন দুলাল দত্ত। তারপর সাহেবকুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে চললেন। কপিলরাম ডাকে—মামাবাবু, শুনিয়ে।

কিন্তু কোনও জবাব না দিয়ে চলে গেলেন দুলাল দত্ত।

সাহেবকুঠির বারান্দায় আলোটা দপ দপ করে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন গগন বসু আর কিরণলেখা। কথা বলতে গিয়ে শুক্তির গলার স্বর শিউরে ওঠে।—আমার যে খুব ভয় করছে, মা।

কিরণলেখা বলেন—না, ভয় কিসের?

গগনবাবু বলেন—ভোর হয়ে এল বোধ হয়।

১৬

এটা আবার কিসের ভয়? কী রকমের ভয়? বুঝতে পারলে হয়ত এই ভয় ভেঙে যেত। মনে হয়, তেজপুরের মণিমাসির বাড়ির কালোর মা'র মনটাও বোধ হয় ঠিক এই রকম ভয় পায়; একটা অলুক্ষণে সংকেত দেখবার ভয়। ভয়টা তখনই মনের ভিতরে ছমছম করে, মাঝরাতে যখন ঝুর-ঝুর বৃষ্টি শুরু হয়, আর ঘুম ভেঙে যায়।

মনে পড়ে, ছাদের উপরে জপের মালা হাতে নিয়ে এক-একদিন নিজের মনে কী সব অদ্ভুত কথা বলতেন কালোর মা। —তুমি অবিচার করবে আমার ওপর; কিন্তু আমার দুঃখ যে একদিন তোমার বিচার করবে। সেটা ভুলে যাও কেন?

নতুন পাড়ার মীরা কাকিমার কাছে শুনেছিল শুক্তি, কালোর মা'র স্বামী কলকাতার স্কুলের মাস্টার ছিলেন। কলকাতাতে তাঁর একটা বাড়িও ছিল। মিথ্যে মামলা করে একদিন বিধবা কালোর মাকে স্বামীর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দিল তাঁর সেই দেবর, যাকে তার ছেলেবেলার জীবনে কোলে বসিয়ে ভাত খাওয়াতেন কালোর মা। সে দেবরের এখন ভিখিরী-দশা; ঠোঙা বেচে, জুয়া খেলে আর ফুটপাতে শুয়ে থাকে।

হঠাৎ শুক্তিকে দেখতে পেয়ে যেন একটু লজ্জিত হতেন কালোর মা। —তুমি এখন নীচে যাও দিদিমণি। অনেক রাত হয়েছে। আমার আবোল-তাবোল কথা শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।

শুক্তি—কিন্তু আপনি ছাদে উঠে আর এই রাতের বেলাতে এখানে বসে ওসব কথা রোজই বলেন কেন?

কালোর মা—ভয় হয়, তাই বলি। চুপি-চুপি বলি। কাউকে শোনাবার জন্যে তো বলি না।

শুক্তি—সকলেই জানে, আমিও জানি; আপনি আপনার সেই কবেকার কলকাতার ভয়ের কথা মনে করে এসব কথা বলেন। কিন্তু আর বলে লাভ কী?

কালোর মা—শুধু কলকাতার কথা মনে করে নয় দিদিমণি, তোমাদের এই তেজপুরেরও যা-সব দেখছি আর শুনছি, মনে করলে ভয় হয় বইকি। যদি শুনতে চাও, তবে একটা গল্প বলতে পারি।

শুক্তি—বলুন!

কালোর মা—এক রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে চলেছেন। হঠাৎ কোথা থেকে একটা অতিক্ষুদ্র মৃগশাবক এসে রাজার পথের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলে, রাজপুত্র আমার মাকে হত্যা করে মাংস খেয়েছে। আমি এখনও ঘাস খেতে শিখিনি রাজা, মায়ের দুধই আমার বেঁচে থাকার সম্বল ছিল। এখন আমি বাঁচি কী করে? আপনি বিচার করুন। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার বেঁচে থাকবার দরকার নেই। রাজা তখুনি তরবারির এক কোপে মৃগশিশুর প্রাণসংহার করলেন। কিন্তু শেষে কী হল শুনবে, দিদিমণি?

—শুনব।

—শত্রুকে সংহার করবার জন্যে তরবারি তুলতে গিয়েই রাজা বুঝলেন, তরবারিটা যেন

সাত-মণ পাথরের মত ভারী। তরবারী তুলতে পারলেন না রাজা, হাতটাই ভেঙে গেল। শত্রুরা হেসে হেসে রাজার মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে গেল।

শুক্তি হেসে ফেলে।—বুঝতে পারছি না, এটা কিসের গল্প বললেন, কালোর মা?

কালোর মা—অবিচারের গল্প। রোজই ঠাকুরের কাছে এই ভয় নিবেদন করি আর বলি, অবিচার দূর করো ঠাকুর।

চুপ করে আবার মালা জপতে থাকেন কালোর মা।

আজ এই কদমবাড়ির মাঝরাতের অবুঝ ভয়টাকে সহ্য করতে গিয়ে কালোর মা'কে মনে পড়ে, কালোর মা'র সব কথা আর সব গল্পও মনে পড়ে। তবু শুক্তির অবুঝ ভয়টা যেন ছায়া-ছায়া অস্বস্তির মত মনের আনাচে-কানাচে ঘুর-ঘুর করে, সরে যেতে চায় না।

সরে যায় তখন, শুক্তির ঘরে ঢুকে যখন আলো জ্বালেন কিরণলেখা।—শুক্তি, শুনছিস?

—কী মা?

—আমি জেগেই আছি। তুই ঘুমো।

এটা কিরণলেখার একটা নতুন অভ্যাস। সে রাতের সেই ভয়ানক বিদ্‌ঘুটে ব্যাপারের পর রোজই একবার মাঝরাতে উঠে এসে শুক্তির ঘরে ঢোকেন আর আলো জ্বালেন কিরণলেখা।

ভাদ্দুরে মেঘের শেষ ঝরানি ফুরিয়ে যেতে কতদিনই বা লাগে? বেশিদিন লাগেওনি। একদিন মাঝরাতেও যখন ঝুরু-ঝুরু বৃষ্টির কোনও শব্দ আর শোনা গেল না, কদমবাড়ি চা-বাগানের উপর সিবসিরে শিহর ছড়িয়ে দিয়ে একটা উত্তুরে হাওয়া উড়ে চলে গেল, তখন শুক্তির বিছানার মাথার কাছের জানালার শার্সি একেবারে খুলে দিয়েই বলে উঠলেন কিরণলেখা—তারায় ছেয়ে আছে আকাশ। নেফার পাহাড়েও মেঘ নেই। শুক্তি ঘুমোচ্ছিস?

আবার ঝলমলে আশ্বিনের দিন। ঘাসের শিশিরে সকালবেলার রোদ হেসে-হেসে চিক-মিক করে। উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে উড়ে উড়ে নেফার পাহাড়ের উপর দিয়ে নতুন হাঁসের ঝাঁক আসছে; নামবে গিয়ে জিয়াভরলির জলে।

শুধু কদমবাড়ির আকাশে নয়, বোধ হয় আলিপুরে শুক্তির বড় পিসি, আর তেজপুরে শুক্তির মণিমাসির মনেও মেঘের গুমোট ভেঙে গিয়ে নতুন রোদের আলো হেসে উঠেছে; তা না হলে কিরণলেখার কাছে ওরকম খুশি ভাষার দুটো চিঠি তাঁরা লিখতে পারতেন না।

সুমিত্রা লিখেছেন—আপনি আমার মনের খুব খারাপ একটা ভুল ভেঙে দিয়েছেন, কিরণ বউদি। এখন ভাবতে বেশ লজ্জাও হচ্ছে! নিজের পছন্দমত কিছু না হলেই আমরা মনে করে বসি যে, সংসারটা বুঝি ভুল করছে। আপনি শুক্তিকে যা বলেছেন, তার চেয়ে ঢের ভাল কথা ও সত্য কথা আর কিছু হতে পারে না।

মণিমালা লিখেছেন—তোমার চিঠি আমার দুশ্চিন্তার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছে। তুমি বুঝিয়ে দিলে বলেই তো বুঝলাম কিরণদি; তা না হলে আমার মুর্খ মন কোনওদিনও বোধ হয় বুঝত না যে, ভুল করে মেয়েটাকে কত ভুল কথাই না শুনিয়েছি। শুক্তিকে দেখতে যে খুব ইচ্ছে করছে। খুব অন্যায় করেছি। ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি শুক্তিকে যে কথা বলেছ, সেটাই তো খাঁটি কথা।

এরই মধ্যে কবে, সারাদিনের ঝলমলে রোদের ছোঁয়া পেয়ে শুক্তির সাজের চেহারা বদলে গিয়ে আবার রঙিন হয়ে গেল, সেটা শুক্তিও ঠিক হিসেব করে বলতে পারবে না। গায়ে আবার ফিকে-নীল তাঁতের শাড়ি, কাঁধের উপর আলগা হয়ে পড়ে আছে আর ঝুলছে কচি-সবুজ রঙের একটা হালকা উলের জামা। সাহেবকুঠির শিউলি গাছের ডাল নাড়া দিয়ে ফুল ঝরাতে গিয়ে শুক্তির হাতের উপর ফুলের সঙ্গে গাছের পাতার শিশির-জলও ঝরে পড়ে। শুক্তির চোখের তারাও কেঁপে কেঁপে হাসে। তবে কি এইবার শেষ কথাটা বলে দেবার জন্যে তৈরি হয়ে শুক্তির মন হাসতে শুরু করেছে? তাই তো মনে হয় কিরণলেখার। তাই জিজ্ঞাসা করতেও আর বেশি দেরি করেন না।

—আর তো বেশি দেরি করা উচিত নয়, শুক্তি।

শুক্তি—কী?

কিরণলেখা—কী বুঝলে আর কী ঠিক করলে, এবারে বলে দাও। লজ্জা করবার তো কিছু নেই।

শুক্তি কিন্তু বেশ লজ্জিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকায়।—পরে বলব।

কিরণলেখা—তা বলো। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি বলো। কী হল? হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আবার কী ভাবতে শুরু করলে?

শুক্তি—কিছু না।

কিরণলেখা—মনে হচ্ছে, বলতে খুব দেরি করবে?

শুক্তি—না না, শিগগিরই বলব। দেরি হবে না।

কিরণলেখা চলে যাবার পর, সেই শিউলির ছায়ার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুক্তি যেন নিজেরই মনের যত এলোমেলো কথার শব্দ শুনতে থাকে। পিসেমশাইয়ের মক্কেলরা যেমন কৈফিয়ত দেবার জন্য সময় চেয়ে দরখাস্ত করে, শুক্তির প্রাণটাও যেন ঠিক সেরকম দরখাস্ত করে শুধু সময় চাইছে। এক-একবার মনে হয় মা'কে এখনই স্পষ্ট করে একটা নাম বলে দিলেই তো হত, শ্যামলবাবু। চিন্তা করবার সব ঝঞ্ঝাট মিটে যেত। কিন্তু তখুনি লজ্জা পেয়ে চমকে উঠেছে শুক্তির মন, ছি-ছি, বোধ হয় একটা মিথ্যে কথাই বলে ফেলা হত। এরকম করে না বুঝে-সুঝে হঠাৎ অনিমেষের নাম করলে সেটাও যে একটা তাড়াহুড়ো মিথ্যের কথা হবে না, তারই বা ঠিক কি?

বারান্দার সোফার উপর বসে থেকেই ডাক দিলেন গগনবাবু—ওখানে ওটা কিসের ভিড়, শুক্তি? কিছু বুঝতে পারছিস?

সাহেবকুঠি থেকে বেশ একটু দূরে, ম্যানেজার ব্যানার্জির বাংলোর সামনে একটা চালতে গাছের ছায়া যেখানে ছড়িয়ে আছে, সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, ভিড়টা যেন উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনছে।

শুক্তি আশ্চর্য হয়। —বুঝতে পারছি না বাবা। কিন্তু কপিলরাম কেন দৌড়ে দৌড়ে আসছে?

কপিলরাম এসেই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলে।—নেফা পর হামলা শুরু হুয়া হুজুর। থাগলা'মে চিনালোগ আসাম রাইফেলকা চৌকি ঘির লিয়া।

গগনবাবু—কওন বোলা?

কপিলরাম—রেডিও বোলতা হ্যায়, হুজুর।

সাতদিন হল কদমবাড়িতে খবরের কাগজ এসে পৌঁছয়নি। চারদুয়ারের কাগজওয়ালা বসন্তলাল, আট-দশদিনের কাগজ একসঙ্গে বাণ্ডিল করে হঠাৎ একদিন আগরওয়ালার ঠিকে-জঙ্গলের গাছ-কাটা সরকারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার তার নিয়ম। তা ছাড়া, সরকারি ডাকঘরের ছাপ নিয়ে যে কাগজটা আসে, সেটা খুব দ্রুতগতিতে এলেও পাঁচদিন দেরি না করে আসবে না।

লোখরা থেকে শুধু মেজর পি. বোসের একটা চিঠি এল।—বাণী এখন শান্তিপুরে তার পিত্রালয়ে আছে। আমিও এখন স্ট্যান্ড-বাই অবস্থায় আছি, বউদি। নেফার গোলমাল বেড়েছে। আরও ফোর্স পাঠাতে হচ্ছে। খুব ব্যস্ত আছি। তাই শুক্তিকে আর লোখরাতে বেড়াতে আসতে বলব না।

লোখরার চিঠিটা পড়ে নিয়ে, আর গগনবাবুকেও একবার শুনিয়ে দিয়ে কিরণলেখা যখন শুক্তির ঘরে ঢুকলেন, তখন টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে শুক্তি। শুক্তির মাথার কাছে রেডিওটা তখন শুধু চাপা-স্বরে একটা গান গাইছে। থাগলার খবর অনেকক্ষণ হল শেষ হয়ে গিয়েছে।

—শুনছিস শুক্তি?

চমকে জেগে ওঠে শুক্তি।—কী মা?

—বাণী এখন লোখরাতে নেই।

—কোথায় তবে?

—শান্তিপুরে।

শুক্তি হাসে। —এবার তা হলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি প্রণব কাকা।

কিন্তু ওরা আবার কারা, নতুন তিনজন আগন্তুক মানুষ, কপিলরাম যাদের পথ দেখিয়ে সাহেবকুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসছে?

একজনের তো গায়ের খাকি পোষাক দেখেই বোঝা যায়, উনি একজন পুলিশ অফিসার। ঢিলে-ঢালা বুশশার্ট আর ঢলঢলে ট্রাউজার, আর-দুজনের একজনের হাতে একটা ফাইল, একজনের হাতে চুরুট। এরাও অফিসার বোধ হয়।

তিনজনেই সাহেবকুঠির বারান্দায় উঠে গগন বসুর কাছে একে একে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করেন।

—আমি মেহরা, সি আর পি।

—আমি মতিলাল, সি আই বি।

—আমি কলিতা, এস আই বি।

গগন বসু আশ্চর্য হয়ে বলেন—বসুন।

আশ্চর্য হবারই কথা। একজন নেফা-পুলিশ, একজন খাস সেন্টারের গোয়েন্দা পুলিশ, একজন সাবসিডিয়ারি গোয়েন্দা পুলিশ; সাহেবকুঠির বারান্দায় একসঙ্গে এহেন তিন অফিসারের আবির্ভাব, একটা অভাবিত বিস্ময় বলেই তো মনে হবে।

নেফা-পুলিশ মেহরা তাঁর খাকি ক্যাপ তুলে মাথা চুলকিয়ে নিলেন। সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের মতিলাল ক্লান্তভাবে হাই তুলে নিলেন। আর এস-আই-বি'র কলিতা তাঁর নিবু-নিবু চুরুটে মুখ দিয়ে বেশ জোরে একটা টান দিলেন।

মতিলাল বলেন—ডক্টর সি.টি. এলগিনের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

গগন বসু—এলগিন? কে সে?

কলিতা—আপনি তাকে চেনেন না?

গগন বসু—না।

মেহরা—কিন্তু আমাদের ইনফরমেশন এই যে, এলগিন আপনার এই বাগানে অনেকদিন ছিল।

কলিতা—সে একজন স্পাই, আমাদের শত্রুর চর।

মতিলাল—নেফাতে ঢুকে সে লোকটা অনেক কিছু জেনে নিয়ে সরে পড়েছে।

গগন বসু ভ্রূকুটি করে তাকান। —বুঝলাম, স্পাই পালিয়ে যাবার পর আপনারা খুব অ্যাকটিভ হয়েছেন। ভাল কথা, কিন্তু এই অদ্ভুত ইনফরমেশন কোথা থেকে পেলেন যে, স্পাইটা আমার এখানে ছিল?

মেহরা—হাই কোয়ার্টার থেকে পাওয়া ইনফরমেশন, অদ্ভুত বললে তো চলবে না।

গগন বসু—আপনার হাই কোয়ার্টার মানে কী? মিনিস্টার?

মেহরা—তা তো বটেই, কিন্তু এক্ষেত্রে মিনিস্টারের একজন বিশেষ ট্রাস্টেড ও রেস্পেক্টেড ব্যক্তি। তিনিই বা অকারণে একটা মিথ্যে ইনফরমেশন দেবেন কেন, বুঝতে পারছি না।

গগন বসুর দুই চোখের তারা হঠাৎ যেন আগুন-রঙের ঝিলিক দিয়ে কেঁপে ওঠে। ভুরু দুটো কুচকে যায়। তামাকের পাইপটাকে হাঁটুর উপর একবার ঠুকে নিয়েই গগন বসু বলেন—একবার খোঁজ করে দেখুন, মিনিস্টারের এই ট্রাস্টেড ও রেস্পেক্টেড ব্যক্তিটি একটি স্কাউন্ড্রেল কিনা?

মেহরা—আপনি বেশ উত্তেজিত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

গগন বসু—খোঁজ করে দেখুন, এই স্কাউন্ড্রেলের নাম সুশান্ত মজুমদার কিনা?

—ওয়েল ওয়েল। দিল্লির আই বি'র মতিলাল চমকে উঠে নেফা-পুলিশ মেহরার মুখের দিকে তাকান। এস আই বি'র কলিতা তাঁর নিবু নিবু চুরুট শক্ত করে কামড়ে ধরে মতিলালের মুখের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকেন।

হঠাৎ হেসে ওঠেন মতিলাল।—তিন পিয়ালি চা ফরমাইয়ে মিস্টার বাসু।

কলিতা বলেন—আপনি কিছু মনে করবেন না, মিস্টার বাসু।

মেহরা বলেন—আর আপনাকে কিছু বলবার নেই, স্যার।

আবার হাই তুলে নিয়ে মতিলাল বলেন—দেখুন তো, মিছিমিছি কী পরেশানি। আমাদের সবারই সন্দেহ ছিল, মজুমদারের ইনফরমেশন বোধহয় একটা ব্লাফ। সে মহাশয়ের কিছু খবর তো রাখি। কিন্তু...।

গগন বসু—কিসের কিন্তু?

মতিলাল—কিন্তু কী করব বলুন? মজুমদারের ম্যাজিক স্টিক যে দিল্লি, শিলং, গৌহাটি আর কলকাতাকেও ছুঁয়ে রয়েছে।

কলিতা—ধরুন, আপনি কাস্টমকে ফাঁকি দিয়ে বিদেশ থেকে দশ লাখ টাকার ডিউটিয়েবল জিনিস আনতে চান; আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। মজুমদারকে বললেই চমৎকার ব্যবস্থা করে দেবে।

চা আসে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মেহরা বলেন—কোনও এক বন্ধু-বিদেশের এমব্যাসি থেকে খবর পাওয়া গেল, বোটানিস্ট বলে নিজেকে পরিচিত করে আর ডক্টর এলগিন নাম নিয়ে একটা লোক নেফাতে ঢুকে নেফার যত লজিস্টিক আর মিলিটারি পোস্টের খবর নিয়ে সরে পড়েছে। তখন তো আর...।

গগন বসু হাসেন। —তখন আপনাদের হুঁস হল।

মেহরা—আমাদের দোষ কোথায় বলুন? সরকারের অর্ডার ছিল, এলগিনের সব সুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে। আমিই তো মশাই সে বেটাকে রোজ মুরগি খাইয়ে খাইয়ে তোয়াং থেকে সেলা, সেলা থেকে দিরাং, দিরাং থেকে রূপা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি।

গগন বসু হাসেন।—জানি না, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। সরকারকে না আপনাদের সবাইকে?

মতিলাল উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।—আচ্ছা! আচ্ছা! আপভি উপনিষদ পড় চুকেঁ?

গগন বসু—জি হাঁ, বহুত থোড়া।

মতিলাল—তব তো হমভি উপনিষদ বোলেঙ্গে।

গগন বসু—বোলিয়ে।

মতিলাল—অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ। জৈসা সরকার তৈসা অফিসার। জৈসা গাঁও তৈসা ভঁইস। আচ্ছা...গুড বাই।

চলে গেলেন তিন অফিসার। গগন বসুও ক্লান্তভাবে আর বেশ বিষণ্ণ-উদাস স্বরে ডাক দেন। —শুক্তি, আমাকে ঠাণ্ডা জল খাওয়াবি?

১৭

তেজপুর থেকে মণিমালার তিনটে চিঠি পেয়েছেন কিরণলেখা। সব চিঠিরই সার-কথা, তেজপুরে চলে এসো, কিরণদি।

মণিমালার শেষ চিঠিটা বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলছে। —বুঝতে পারছি না, গগনবাবুর

শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল কেন? কুমুদ ডাক্তারের চিকিৎসায় কোনও সুফল হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া নেফার খবরও ভাল নয়। কাজেই, তোমাদের সবারই এখন তেজপুরে চলে এলে ভাল হয়।

বেশ অসুস্থ হয়েছেন গগন বসু। সব সময় একটা কষ্টকর অবসন্ন ভাব। মাথাটা ভার-ভার, শ্বাস টানতেও একটা হাঁস-ফাঁস ভাব। আর, যখন-তখন পিপাসা। দশ মিনিট পর-পর জিভ শুকিয়ে যায়; ঠাণ্ডা জল খেতে চান গগন বসু।

হঠাৎ অসুস্থতা বটে; কিন্তু বুঝতে তো কোনও অসুবিধে নেই, এই অসুস্থতা শুরু হয়েছে ঠিক সেইদিন থেকে, যেদিন পুলিশ আর গোয়েন্দা-পুলিশের তিন অফিসার এসে একটি ইনফরমেশনের রহস্য প্রকাশ করে দিয়ে চলে গেলেন।—মানুষ কত নীচ হতে পারে। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন গগন বসু।—আমার মনে হয়, কিরণ, তোমাদের ভগবানও স্কাউন্ড্রেল সুশান্তকে ভয় করে।

কিরণলেখা—চুপ করো। শান্ত হও। জল খাও।

শুধু বিকেল পর্যন্ত, তারপর আব সাহেবকুঠির বাবান্দাব চেয়াবে বসে থাকতে পারেন না গগন বসু। যতক্ষণ রোদ থাকে ততক্ষণ একটু ভাল লাগে। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই যখন অক্টোবরের কুয়াশা নিবিড় হয়ে কদমবাড়িকে ছেয়ে ফেলে, তখন আর কিছু ভাল লাগে না। ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়েন।

শুক্তিও দেখে বেশ আশ্চর্য হয়। সন্ধ্যা হলেও বাগানের কামিনদের ঝুমুরের নাচ-গান আর হই হল্লার সাড়া শোনা যায় না। মালী হরদেও হঠাৎ এক-একবার ব্যস্ত হয়ে ফটকের বাইরে কোথায় যেন চলে যায়; আর কী-যেন শুনে মুখ শুকনো করে ফিরে আসে। সন্দেহ হয়, কুয়াশার ভিতরে যেন নানা রকমের জল্পনা আর কল্পনা চুপি-চুপি ফিসফাস করে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন সত্যিই যত মেচ আর ভোটিয়া মজুর-কামিন কাউকে কিছু না বলে পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় চাপিয়ে আর বাগান ছেড়ে চলেই গেল।

তার দু'দিন পরে চলে গেল সব দফাদার কামদার আর ডান্টিচুনাই কামিন দল।

যেদিন সিটি বাজল না, কলঘরের বয়লার নীরব হয়ে রইল, সেদিন ম্যানেজার ব্যানার্জি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে গগন বসুর কাছে এসে দাঁড়ালেন।—খুব সন্দেহ হচ্ছে, স্যার।

গগন বসু—কী?

ব্যানার্জি—বাগানে কেউ আর থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।

গগন বসু—কেন? চিনারা কি কদমবাড়ির ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে?

ব্যানার্জি কুণ্ঠিতভাবে হাসেন।—না স্যার; সে কথা নয়। কিন্তু মজুমদার সাহেবের লোক রোজই এসে বাগানের লোকের কাছে যে সব খবর পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে তো...।

চমকে ওঠেন গগন বসু। গগন বসুর শুকনো চোখ দুটো হঠাৎ যেন রক্তমাখা হয়ে গিয়েছে, লালচে হয়ে কাঁপতে থাকে; গলার স্বরও কাঁপে।—বলুন, থামলেন কেন?

ব্যানার্জি—মনে হচ্ছে, খুব শিগগির কদমবাড়ির উপর চিনা হামলা এসে পড়বে। যারা থাকবে, তারা বিপদে পড়বে।

গগন বসু—আপনিও কি মজুমদারের লোকের কথা বিশ্বাস করেন?

ব্যানার্জি—লোকের কথা নয়, স্যার। মজুমদার সাহেব নিজে বলেছেন।

গগন বসুর চোখে একটা কঠোর ভ্রূকুটি থরথর করে।—কোথায় মজুমদার?

ব্যানার্জি—তিনি কদমবাড়ি রোডের উনিশ মাইলপোস্টে প্রায়ই আসেন। আমাদের কেরানিবাবুকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। তাঁর মত মানুষের কথা তুচ্ছ করা উচিত হবে? ঘটনা খুবই জটিল, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিৎ, নয় কি স্যার?

গগন বসু—কিন্তু কী এমন একটা ওলট-পালট কাণ্ড হয়েছে যে, এখনই এত বিচলিত হতে

হবে? খবব তো শুধু এই যে, থাগলাতে গোলাগুলি চলেছে।

ব্যানার্জি— সেটা তো জানি। কিন্তু বুঝতে পাবছি না স্যাব, তিলগাঁও বাজভাটি আব সকবাড়ি বাগানেব সব সাহেব কেন প্লেন চার্টাব কবে সপবিবাবে সবে পড়েছেন।

গগন বসু—তাই নাকি?

ব্যানার্জি—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যাব। আজ সকালে জিতনগব টি এস্টেটেব ম্যাকফার্সন আমাদেব এই কদমবাড়ি বোড দিয়েই গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেলেন।

গগন বসু—কিন্তু ম্যাকফার্সনেব বাগান কি খালি হয়ে গিয়েছে?

ব্যানার্জি—না।

গগন বসু—তা হলে বলুন, শুধু কদমবাড়ি বাগান খালি হতে শুরু হয়েছে।

ব্যানার্জি—হ্যাঁ।

গগন বসু—আপনি কি আমাব কাছে কোনও পবামর্শ চাইছেন?

ব্যানার্জি—হ্যাঁ, স্যাব।

গগন বসু—আমাব কিছুই বলবাব নেই। আপনি আসুন এখন।

ম্যানেজাব ব্যানার্জিব চোখমুখেব চেহাবা দেখলে মনে হয়, ভদ্রলোকেব সব যুক্তি-বুদ্ধি যেন জটিল একটা বিপদে পড়ে করুণ হয়ে গিয়েছে। গগন বসুব কথা শুনে তাঁব চোখমুখ আবও করুণ হয়ে যায়। —কিন্তু আপনাবও তো এখন ।

গগন বসু—না, আমি কোথাও যাব না।

চলে গেলেন ব্যানার্জি। কিন্তু এই চলে যাওযা যেন ফিবে এসে গগন বসুকে শেষ কথাটা বলে দেবাব জন্য তৈবি হওয়া।

তিনদিনেব মধ্যে বাগানেব সব লোকজনেব মাইনে-কড়িব পেমেন্ট চুকিয়ে দিয়ে ব্যানার্জি আবাব যেদিন গগন বসুব সঙ্গে দেখা কবতে এলেন, সেদিন কদমবাড়িব সন্ধ্যাব কুযাশা নিবেট হয়ে গেল। অদ্ভুত স্তব্ধতা, তাব মধ্যে ম্যানেজাব ব্যানার্জি আব কুমুদ ডাক্তাবেব পাযেব জুতোব সামান্য শব্দও যেন অমানুষিক আগন্তুকেব ভযানক পাযেব শব্দেব মত বাজতে থাকে।

গগন বসুব ঘবে ঢুকে বিছানাব কাছে দাঁড়ালেন ম্যানেজাব ব্যানার্জি আব কুমুদ ডাক্তাব। গগন বসু বলেন—আপনাবা বোধ হয় এখন বওনা হবেন?

ব্যানার্জি—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি অনুমতি দিন, স্যাব।

কুমুদ ডাক্তাব—মিথ্যে কথা বলব না, সত্যিই থাকতে খুব আতঙ্ক বোধ কবছি। আপনি খুশি হয়ে আমাকে যেতে আজ্ঞা করুন স্যাব।

গগন বসু হাসেন। —খুশি হয়েই বলছি, আপনাবা চলে যান। যেদিন ফিবে আসতে ইচ্ছে হবে সেদিন চলে আসবেন। ইচ্ছে না হয়, আসবেন না।

ব্যানার্জি—এই ক্যাশ, সব পেমেন্টেব পব যা ছিল, সেটা এখন তো আপনাবই কাছে বাখতে হয় স্যাব।

গগন বসু—বাখুন।

ম্যানেজাব ব্যানার্জিব আব কুমুদ ডাক্তাবেব চোখ ছলছল কবে।—আপনি এখন ।

গগন বসু—আমি যাব না।

চলে গেলেন ব্যানার্জি আব কুমুদ ডাক্তাব।

ঘরেব বাইবে এসে বাবান্দায দাঁড়িয়ে ডাক দেন কিবণলেখা—হবদেও, শুনে যাও।

কোনও সাড়া শোনা যায না। কেউ জবাব দেয না।

কিবণলেখা ডাকেন—-কপিলবাম, তুমি কোথায?

কেউ জবাব দেয না। কোনও সাড়া শোনা যায না।

গ্যারেজের পিছনের ঘরে শুধু একটা আলো আর দুটো ছায়া নড়ছে দেখা যায়।

লণ্ঠন হাতে নিয়ে সাহেবকুঠির বারান্দার কাছে এগিয়ে এল উপিন মিস্তিরি আর তার বউ। —কাকে ডাকছেন মা? কেউ আর নেই।

কিরণলেখার গলার স্বর শিউরে ওঠে।—কেউ আর নেই? শুধু তোমরা দুজন আছ?

উপেন—হ্যাঁ, মা। এই আট মাস ভারী মানুষটাকে নিয়ে হঠাৎ এখন যাব কোথায়? যাবই বা কেমন করে?

মাথার কাপড় টেনে দিয়ে উসখুস করে উপেন মিস্তিরির বউ।

কিরণলেখা—আচ্ছা, এসো।

উপেন—দরকার হলে ডাক দেবেন, মা।

বিছানার উপর উঠে বসেন গগন বসু।—আমি বলি, কাল সকালে উপেন তোমাদের দুজনকে তেজপুরে পৌঁছে দিয়ে চলে আসুক।

কিরণলেখা—আমি যাব না! শুক্তি যাক।

শুক্তি বলে—আমি যাব না।

রাতের কদমবাড়ি যেন প্রেতকুয়াশার আঁচল দিয়ে ঢাকা একটা সমাধি; তার মধ্যে সাহেবকুঠিব ঘর আর বারান্দার আলোগুলি শুধু জীবন্ত প্রাণের চক্ষু। শুক্তির ঘরের টেবিলের উপর শুধু ছোট্ট রেডিও সেট কথা বলে; কী অদ্ভুত গুমরে ওঠে বেডিওর খবরের এক-একটা কথা—চিনা দুশমনের হেভি মর্টার ফায়ার তুচ্ছ করে ঢোলা এখন মরিয়া হয়ে লড়ছে। খিঞ্জেমানের তিনটি কোম্পানি পোস্ট দিন-রাত সমানে মেশিনগান চালিয়ে দুশমনের অ্যাডভান্স ঠেকিয়ে রেখেছে। ফায়ারিং লাইনের বাংকার থেকে বের হয়ে, একাই জয়হিন্দ হাঁক দিয়ে আর গ্রেনেড হাতে নিয়ে চার্জ করেছে, দুশমনের মেশিনগানের গর্জন স্তব্ধ করে দিয়েছে আর মরে গিয়েছে এক জমাদার।

দুই চোখ অপলক করে আর একেবারে নিথর নীরব হয়ে রেডিওর কথা শুনছে শুক্তি, দেখতে পেয়ে কিরণলেখা একটু আশ্চর্য না হয়ে পারেন না। ওসব খবরের মধ্যে এরকম মন-প্রাণ দিয়ে শোনবার কী আছে? খবর তো নয়, এক-একটা সর্বনাশের হুংকার।

বিছানা থেকে নেমে ঘরের ভিতরে পায়চারি করেন গগন বসু। বোধ হয় রেডিওর সব খবর শুনতে পেয়েছেন, তাই হঠাৎ এই অস্থিরতা।—আমি আবার বলছি, তোমরা দুজনে তেজপুরে চলে যাও।

কিরণলেখা—তুমিও চলো।

গগন বসু—না। এদিকে-ওদিকে কোনও চা-বাগানের লোকজন সরে পড়েনি; সবার আগে আমার কদমবাড়ির বাগান খালি হয়ে গেল, এটা শুধু আমাকে জব্দ করবার জন্যে এক শয়তানের কারসাজি ছাড়া আর কী হতে পারে?

কিরণলেখা ভয় পান।—তা হলে তো তোমারই সবার অগে চলে যাওয়া ভাল ছিল।

গগন বসু—না। হাতে হাতে একটা নিষ্পত্তি করে দিয়ে তারপর যাব।

ঝিক করে জ্বলে উঠেছে গগন বসুর চোখ। প্ল্যান্টার সাহেব গগন বসু তো কবেই তাঁর সেই ভয়ানক শিকারের শখ ছেড়ে দিয়েছেন। মাচানে বসে নরখাদক বাঘের মাথা তাক করে বন্দুক তুলতে গিয়ে তাঁর চোখ দুটো যে ঠিক এইরকম ঝিক করে জ্বলে উঠত।

কিন্তু মনের জেদ দিয়ে কি শরীরের অসুখটাকে সব সময় জব্দ করা যায়? যায় না। গগন বসুও পারেন না। ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে আর জানালা খুলে সাহেবকুঠির ফটকের দিতে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা রাত পার করে দিয়েই বুঝলেন গগন বসু, জ্বর হয়েছে। রাত-জাগা ক্লেশ আর জ্বরের ঘোর, বিছানার উপর শুয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া তন্দ্রার মধ্যে শুনতে থাকেন, শুক্তির ঘরের রেডিওটা খবর বলছে—খিঞ্জেমান নেই, ঢোলাও নেই। এগিয়ে এসেছে চিনারা।

শুক্তির যেন আর কোনও কাজ নেই। শুধু গল্পের বই পড়া, বার বার খোঁপা বাঁধা, আর যখন-তখন রেডিওর সামনে এসে বসে থাকা। একটি একটি করে পার হয়ে যায়, নীরব নির্জন কদমবাড়ির রোদ-ভরা দিন আর কুয়াশা-ভরা রাত।

সেদিন সকালবেলাতেই রেডিওর খবরটা যেন চেঁচিয়ে উঠল।—বুমলা।

এগিয়ে যেয়ে রেডিওর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে শুক্তি। বুমলাতে যুদ্ধ চলছে। ফিয়ার্স ফাইটিং। চিনাদের পুরো একটা ডিভিশন বুমলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যাবেলার রেডিও বলে—বুমলার পতন। শুক্তির মাথাটা হঠাৎ অলস হয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে; ঠুক করে ঠোকা খায় কপালটা। এক হাতের দুটো আঙুল দিয়ে কপালটাকে শক্ত করে টিপে ধরে শুক্তি। এই তো সেই বুমলা, যেখানে বরফে ঢাকা পাহাড়ের পাথুরে বুকের উপর দিয়ে দৌড়ে ছুটে পালিয়ে যায় কস্তুরি হরিণ; তাকে আর ধরতে পারা যায় না।

কপালে ছোট্ট একটা কালশিরার কালো দাগ; তার মধ্যে ছোট্ট একটা ব্যথাও চিনচিন করে। আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে আর বই হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দার আলোর কাছে একটা চেয়ারে বসে শুধু কমদবাড়ির রাতের নিরেট কুয়াশার চেহারা দেখতে থাকে শুক্তি।

গগন বসুর জ্বরের শরীরটা সন্ধ্যা থেকে গভীর ঘুমে অসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। গভীর ঘুম হলেই তো ভাল, বাবার জ্বর তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। একবার উঠে গিয়ে আর ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখে আসে শুক্তি, মা'ও ঘুমিয়ে পড়েছেন। মা'র চোখের উপর খবরের কাগজটা পড়ে আছে।

উপেন মিস্তিরির ঘরে এখন আর আলো জ্বলছে না। কদমবাড়ির সব শব্দ মরে গিয়েছে। শুধু এই বারান্দার আলোর কাছে পোকাগুলির ছটফটানির শব্দ শোনা যায়।

কিন্তু ফটকের কাছে মুখলুকানো জানোয়ারের মত দাঁড়িয়ে আছে, কী ওটা? গাড়ি? এত শব্দহীন হয়ে কখন এল গাড়ি? কার গাড়ি? শুক্তির চোখের কালো তারা দুটো জ্বলে জ্বলে আর ফুলে-ফুলে দেখতে থাকে, এগিয়ে আসছে সুশান্ত মজুমদার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শুক্তি। ততক্ষণে সুশান্ত মজুমদারও বারান্দার সিঁড়ির ধাপের কাছে এসে গিয়েছে। শুক্তি বলে—স্টপ! আর এক-পা এগুবেন না।

সুশান্ত—তোমার সেই বয়ফ্রেন্ড, কী যেন নাম, হ্যাঁ, সেই সুজিত রায় কোথায়?

শুক্তি—আছে।

সুশান্তর হাতে একটা ফ্লাস্ক টলমল হয়ে দুলছে। এক ধাপ উঠে এসেই চোখ কুঁচকে হেসে ওঠে সুশান্ত।—কোথায় আছে? বুমলাতে? তবে তো গেছে।

শুক্তি—না, আছে।

সুশান্ত দাঁত চিবিয়ে হাসে।—তবুও আছে? কোথায়? হৃদয়ে নাকি?

শুক্তি—দেখবেন, আছে কিনা? আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি।

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে রাইফেলটাকে আঁকড়ে ধরে শুক্তি। টেবিলের দেরাজ থেকে দুটো বুলেট নিয়ে লোড করেই আবার ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। কিন্তু সুশান্ত মজুমদারও ততক্ষণে সরে গিয়েছে। গাড়িটাকেও কে-যেন স্টার্ট করে ফেলেছে।

কিন্তু শুক্তির রাইফেলের বুলেট সেই মুহূর্তে চোরাগাড়ির হুডের উপর গিয়ে আছড়ে পড়ে। তখনি আবার, আবার একটা আওয়াজ। যেন কদমবাড়ির রাতের নিরেট কুয়াশার বুকটার সব আক্রোশ ফেটে পড়েছে। একটা বুলেটের চোট খেয়ে চুরমার হয়ে ঝরে পড়ে যায় চোরাগাড়ির কাঁচ। আর একটা বুলেটের আঘাত খেয়ে চোরাগাড়ির বুকের ভিতরে যেন একটা কালো কুণ্ডলি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ঝুপঝাপ করে জখম ভালুকের মত দৌড়ে চলে গেল গাড়িটা।

উপেন মিস্তিরির ঘুম-ভাঙা আর ভয়-পাওয়া ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। কিরণলেখা এসে শুক্তির

হাত চেপে ধরে কাঁপতে থাকেন। গগন বসু এসে শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

শুক্তি বলে—সুশান্ত মজুমদার।

গগন বসু—ভাল হল। আরও ভাল হয়, যদি শুনতে পাই যে, ওটা মর্গে গিয়েছে। আমি তো তিনশো দুইয়ের আসামি হবার জন্য তৈরি হয়েই আছি।

কিরণলেখা বলেন—আর কি আমাদের এখানে থাকা উচিত?

গগন বসু বলেন—না; এবার আমারও যেতে আপত্তি নেই।

১৮

তেজপুর শহর যেন দম-বন্ধ করে রাত সাড়ে আটটার আকাশবাণীর খবর শুনছে। ঘরে ঘরে রেডিওর সামনে বসে আছে উৎকণ্ঠ আর উৎকর্ণ বাপ-মা-ছেলেমেয়ের জটলা। নাতিকে কোলে নিয়ে ঠাকুরমাও শুনছেন। মুখ শুকনো, চোখ করুণ, এক-একটা স্তব্ধতা; কিন্তু সে স্তব্ধতার ভিতরের প্রাণটা ছটফট করছে।

বাজারের যেখানে যেখানে যে দোকানে রেডিও বাজে, সেখানে সেখানে সে দোকানের সামনে মানুষের বিপুল ভিড়। সাইকেল থামিয়ে ব্যস্ত মানুষ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর শুনছে। থমকে আছে রিক্সা, শুনছে, রিক্সাওয়ালা আর রিক্সার আরোহী। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছে পথের মুটে-মজুর আর ফেরিওয়ালা।

আকাশবাণীর খবর হঠাৎ বলতে শুরু করে।—দুঃখের বিষয়...।

সব ভিড়ের সব প্রাণ চমকে ওঠে। সব শ্রোতার চেহারা শক্ত হয়ে ভয়ানক এক খবরের আঘাত সহ্য করবার জন্য তৈরি হয়।

আকাশবাণীর খবর কাটা-কাটা স্বরে গরগর করে।—তোয়াং নেই; দুশমননে কব্জা কর লিয়া! আমাদের ফৌজ পিছনে হটে এসে নতুন পজিশন নিয়েছে, লড়বার জন্যে তৈরি হয়েছে।

গুমরে ওঠে ভিড়ের বিচলিত বোবা স্তব্ধতা। এ কী হল! ঘরের রেডিওর দিকে তাকিয়ে ঠাকুরমা ডুকরে ওঠেন—হায় ভগবান!

রবার বাগানের বাড়ি ভারতীর দোতলার একটি ঘরে রেডিওর দিকে তাকিয়ে শুক্তি বসুর চোখের তারা দুটোও কেঁপে ওঠে।

কে জানে কেমন দেখতে এই তোয়াং। কল্পনা করে দেখতে চেষ্টা করলে শুধু ছোট্ট একটা নীল আলোর বাল্‌ব ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

পাশের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছেন গগন বসু। বিছানার কাছে দুই চেয়ারে বসে গল্প করছেন কিরণলেখা আর মণিমালা। কিন্তু মহিম দস্তিদার কোথায়?

কালোর মা দোতলার বারান্দায় এসে ডাক দেন—মা, আপনি কোথায়? একবার নীচের তলায় যান।

মণিমালা—কেন?

কালোর মা—একবার দেখুন গিয়ে; বাবা কেমন-যেন ছটফট করছেন। আমার কথার জবাব দিলেন না।

দেখেছেন কালোর মা, মহিমবাবুর গায়ের মুগার চাদরটা পড়-পড় হয়ে গায়ের সঙ্গে ঝুলছে। এক-পায়ে জুতো নেই, অস্থির হয়ে ঘরের এদিকে-ওদিকে হাঁটাহাঁটি করে ঘুরছেন।

ব্যস্ত হয়ে আর বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উপরতলা থেকে নেমে এলেন সবাই; প্রথমে মণিমালা আর কিরণলেখা—তারপর গগন বসু আর শুক্তি।

—কী হল? এরকম করছ কেন? কিসের অস্থিরতা? মণিমালা জিজ্ঞেস করেন।

মহিম দস্তিদার হাসেন।—এমন কিছু ব্যাপার হয়নি। তোয়াং গিয়েছে, তাতে আমাদের এত বিচলিত হবার কী আছে? কিন্তু...।

গগন বসুর দিকে তাকিয়ে কথা বলেন মহিম দস্তিদার।—কিন্তু কথাটা কী জানেন? এই গবমেন্ট কি আমাদের বাঁচাতে পারবে? আশা করবার মত যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

গগন বসুও হাসেন—আমার কাছ থেকে এসব প্রশ্নের জবাব পাবেন না। আমি জবাব জানি না। তবে আমি বিচলিত নই; আমার কোনও আশা-টাশা নেই; যেটুকু ছিল সেটুকুও অনেকদিন আগে চুকেবুকে গিয়েছে।

মণিমালা—কিন্তু কে যে কোথায় আর কখন বিচলিত হল, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

মহিমবাবু—তুমি বুঝতে পারবে না।

মণিমালা—এই তো, রাজাবাহাদুরেব কাছে এখনই শুনলাম, কাল বিকালে নেহরু-ময়দানে মস্ত বড় সভা হবে। লড়বার জন্যে জান কবুল করবে সবাই; চিনাদের শয়তানি কেউ সহ্য করবে না। তা ছাড়া, তুইও তো দেখতে পেয়েছিস শুক্তি, কিছুক্ষণ আগে কত বড় দুটো মিছিল জয় হিন্দ করে চলে গেল।

মহিমবাবু হাসেন।—ওদের কথা ছেড়ে দাও। যাদের কিছু নেই, তাদের কোনও ক্ষতির ভয়ও নেই, বিচলিত হবাব প্রশ্নও নেই। যাক সেসব কথা।.. আপনি আজ একটু ভাল বোধ করছেন তো, গগনবাবু?

গগন বসু—হ্যাঁ, অনেকটা ভাল।

মহিম দস্তিদার মানুষটি যে হেঁয়ালির ভাষাতে কথা বলেন, সেটা শুক্তিরও কিছু-কিছু জানা আছে। আজ কিন্তু মনে হয়, মেসোমশাই নিজেই একটা হেঁয়ালি। আজই সকালে এই ভারতীর দোতলার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িযে শুনতে পেয়েছিল শুক্তি, নীচের তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির বাচ্চা ছেলেটা, যার নাম হীরক, তার সঙ্গে কথা বলছেন মেসোমশাই; রাজপুত বীরবালকের নাম করে হীরককে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ সময় এসে গেছে হীরক, দেশের মাটির মান রাখবার জন্যে এবার তোমাকেও তরোয়াল ধরতে হবে। মরব তবু নড়ব না, এই হবে তোমার আমার সবারই প্রতিজ্ঞা।

একটু পরেই শুক্তিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন মহিমবাবু।—তুই কি ঠিক বলতে পারবি, গগনবাবু তাঁর চা-বাগান বিক্রী করবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন কিনা?

শুক্তি—না।

মহিমবাবু—করে ফেললেই ভাল করতেন। আমিও তো দেখছি, এখন আর আমার এই বাড়িটাকে উচিত দাম দিয়ে কেনবার গরজ কারও নেই।

শুক্তি হাসে।—আপনি এসব কী বলছেন, মেসোমশাই? মণিমাসি শুনলে খুব রাগ করবেন।

মহিমবাবু—তাঁর কথা ছেড়ে দাও। তাঁর অসীম ধৈর্য; তিনি মনে করেন ধৈর্য ধরা একটা মস্ত গুণ। কিন্তু ধৈর্য ধরতে গিয়ে এই তো দেখা গেল যে, আমার এই বাড়ি কিনে নেবার মত খদ্দের আর নেই।

মহিম দস্তিদার যতই আরও জটিল হেঁয়ালি হয়ে উঠুন না কেন, তেজপুর শহরের জীবনে কোনও হেঁয়ালি নেই। পরের দিন বিকালে যখন নেহরু-ময়দানে বিপুল জনতার সভায় জান-কবুল প্রতিজ্ঞা গুমরে ওঠে, ঠিক তার কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যার আকাশবাণীও জানিয়ে দেয় রাষ্ট্রপতির ঘোষণা; এমার্জেন্সি।

গগনবাবুর কাছে এসে বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মহিমবাবু। তারপর বলেন —এমার্জেন্সি কথাটার সরল অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, সরকার এখন যা-খুশি-তাই করবেন।

ভদ্রলোকদের বাড়ি-টাড়ি কেড়ে নিয়ে সৈন্য-সামন্ত রাখবেন। আপনি কী মনে করেন, গগনবাবু?

গগনবাবু—আমি কিছুই মনে করি না।

চলে গেলেন মহিমবাবু। ফিরে গিয়ে আর বারান্দাতে নয়, ঘরের ভিতরে তাঁর প্রিয় সেই সবুজ রঙের রেক্সিনের আরাম-কেদারাটিতে আধ-শোয়া হয়ে বসে থাকেন। এই ভারতীর বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াতে আর ভাল লাগে না। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে একটা উঁকি দিতেও ইচ্ছে করে না। পাশের বাড়ির হীরক চিৎকার করে গান গাইছে—বল বল বল সবে...। উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেন মহিমবাবু। শুনতে ভাল লাগে না।

কিন্তু তেজপুরের ঘরে ঘরে তখন হীরকের মত গলা ছেড়ে এই গান গাইছে যত রেডিও।

সকাল হলে আরও স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, বদলে গিয়েছে তেজপুর। সেই অদ্ভুত আর ভয়ানক উপকথার তেজপুর যেন হঠাৎ একটা নতুন রকমের প্রাণ পেয়েছে আর চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

খবরের কাগজের হকারের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর কাগজ কিনছে পথের লোক। উড়ছে হেলিকপ্টর; আকাশে অদ্ভুত শব্দের হর্ষ ছড়িয়ে দিয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে। মুখ তুলে হেলিকপ্টরের দিকে তাকিযে পথের লোকের অনেক আশার চোখগুলি চিকচিক করে; হাত তুলে আর রুমাল উড়িয়ে হই-হই করে ওঠে শুভযাত্রার কামনা।

শিলিগুড়ি থেকে একটানা ছুটে এসে তেজপুর স্টেশনে পৌঁছে যায় মিলিটারির তিনটে স্পেশাল ট্রেন। এসেছে শিখ ব্যাটালিয়ন, জাঠ কোম্পানি আর গোর্খা ব্রিগেড। স্টেশনে লোকের ভিড় জয় হাঁক দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। স্কুলের একদল ছেলে জওয়ানদের মাথার উপর ফুল ছুঁড়তে থাকে। একটা ফুল হাতে লুফে নিয়ে পকেটে রাখে আর হাসতে থাকে একজন অল্পবয়সী শিখ ক্যাপ্টেন।

যো বোলো সো নিহাল, সৎশ্রী অকাল! হাঁক দিয়ে আর মার্চ করে চলে গেল শিখ ব্যাটালিয়ন।

দিনে রাতে সব সময় এয়ারপোর্টের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, নামছে, থামছে; আবার ফিরে চলে যাচ্ছে এয়ারফোর্সের ট্রান্সপোর্ট প্লেন। মিলিটারির সম্ভার নিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার ভাইকাউন্টও আসছে আর চলে যাচ্ছে। ঘুমোবার মত এক ঘন্টারও সময় পান না প্লেনের কম্যান্ডার; লাল হয়ে ফুলে আছে চোখ, কিন্তু মুখে শান্ত হাসি।

তেজপুর থেকে মিসামারি, মিসামারি থেকে ফুটহিল; ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে ছুটে চলে যায় মিলিটারির জিপ। যাচ্ছে আর্মি মেডিক্যালের সম্ভার। যাচ্ছে ফিল্ড সিগন্যালের ইউনিট আর আর্টিলারির জওয়ানদের সেকশন।

আর দেখা যায়, কোলিবাড়িতে শিশির হাজরিকার বাড়ির নারকেল-গাছের গায়ে ছোট একটি কাঠের বোর্ড, তার উপর সাদা হরফে ইংরেজিতে লেখা ছোট একটি কথা—ইয়েস; ইয়ুথ এমার্জেন্সি সার্ভিস।

টাকা-পয়সার সম্বল নেই, জননেতার ব্লেসিং নেই, সরকারি কর্তার পেট্রনি শুভেচ্ছার বাণী নেই; ইয়েস যেন তেজপুরের সামান্য-সাধারণ প্রাণের একটা ব্যস্ততা। শিশির, হিতেন, অমল ও জগদীশ, আর, আরও ওইরকম কয়েকজনের ব্যস্ততা। ওরা ছুটে ছুটে কাজ করতে চায়। কাজের জন্যে তৈরি হতে চায়। ওরা ট্রেঞ্চ কাটে, ফার্স্ট-এড আর ফায়ার ফাইটিং-এর ট্রেনিং নেয়।

দেখতে অদ্ভুত লাগে, সেই শিশির হাজরিকা আজ ইয়েস ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে রাঙাপাড়াতে গিয়ে আর সড়কের পাশে একটা ক্যান্টিন করে জওয়ানদের হাতে গরম চায়ের পেয়ালা তুলে দিচ্ছে।

কম্বল দাও, লেপ দাও, গরম কাপড় দাও। নেফার পাহাড়ের দুরন্ত বরফ আর শীতের কামড় সহ্য করছে লড়াইয়ের জওয়ান, তাদের জন্য মমতার উপহার চাই। আবেদন জানিয়ে তেজপুরের সড়কে সবার আগে মিছিল করে ঘুরে গেল যারা, তারা ওই ইয়েস ছেলের দল।

মিছিলটা রবার বাগানের ভারতীর সামনে এসে দাঁড়াতেই বাইরের ঘর ছেড়ে ভিতরের ঘরে চলে যান মহিমবাবু। সবার আগে কালোর মা বের হয়ে এসে মিছিলের হাতে তার নিজের গায়ের

কম্বলটাকে তুলে দিয়ে চলে যান। বের হয়ে আসে শুক্তি, হাতে দুটো গরম আলোয়ানের একটা প্যাকেট। একটু আশ্চর্য হয়ে হেসে ওঠে শুক্তি।—আপনি? মালতীর খবর কী?

শিশির হাসে।—ভাল আছে।

শুক্তি—প্রমীলা?

শিশির—ভালই আছে।

মিছিলটা অনেক দূরে চলে গিয়েছে। মিছিলের গানের স্বর কানে এলেও গানের ভাষার কোনও কথা আর স্পষ্ট করে শোনা যায় না। শুক্তির মনটা কিন্তু বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারে, কিছুই ভাল লাগছে না। ভাবতে গেলে মনের সব চেষ্টা মিথ্যে করে দিয়ে আর নাগাল-ছাড়া হয়ে শুক্তির প্রাণটা হঠাৎ এক-একবার যেন দুরন্ত ছেলেমানুষের মত একটা দৌড় দিয়ে ওই কদমবাড়িতে ফিরে যেতে চায়। কেউ নেই কদমবাড়িতে, তবু যেন অনেক কিছু আছে। বাগানের নালার জলে হাঁস সাঁতার দেয়, ছায়া-শিরীষের গায়ে কাকলাস বসে থাকে, কুঞ্জলতার পাতার ঝোপে কিচির-মিচির করে চড়ুই লাফিয়ে বেড়ায়। তেজপুরের যত মিছিল মুখরতা আর চঞ্চলতার কাছে এসে যেন আরও একলা হয়ে গিয়েছে শুক্তি।

উপরতলার ঘরে মা'র কাছে বসে কত কথাই না বলছেন মণিমাসি। কিন্তু কোনও নতুন কথা নয়। সোম লজে এখন কেউ আর নেই। ওরা এখন দার্জিলিং-এ আছে। অনিমেষ কয়েকবার এসেছিল। আশা করেছিল অনিমেষ, শুক্তি নিশ্চয় কদমবাড়ি থেকে তেজপুরে শিগগির চলে আসবে। অনিমেষের মা কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, কবে আসবে শুক্তি?

কিরণলেখা বলছেন—সুমিত্রার চিঠি পেয়েছি। শ্যামল বলেছে, নেফাতে যখন একটা গোলমাল বেধেছে, তখন ওদিকে এখন আর না থাকাই ভাল; শুক্তির এখন কলকাতায় চলে আসাই তো উচিত।

এসব কথা আর এরকমের কথা অনেক শোনা হয়েছে। আরও শুনতে হবে, যতদিন না শুক্তির নিজের মুখের একটা কথা ওসব জল্পনার ব্যস্ততা শান্ত করে দেয়। কিন্তু তার আগে কি একটা ভাল খবরের কথা শুনতে পাওয়া যাবে না? কী আশ্চর্য, এত খবর শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে খবরটা যেন নিরেট বোবা একটা পাথর হয়ে নেফার পাহাড়ে কোথায় কোন জঙ্গলে না বরফ-ঢাকা বাংকারের ভিতর পড়ে আছে!

পার্লামেন্টে প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন, চিনাদের আমরা থামিয়ে দিয়েছি, উই হ্যাভ হল্টেড দেম। ভালই তো। এবার তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দিলে আরও ভাল হয়।

রেডিওতে দিল্লির সরকারি বক্তৃতা শুনে শুনে ঝিমিয়ে পড়া, তারপর একটা বই হাতে নিয়ে, হয় চেয়ারে বসে নয় বিছানায় শুয়ে বই-এর একটা পাতাও না পড়া, তেজপুরের জীবনের দিনগুলি কেটে যাচ্ছে বেশ; বেশ চমৎকার একটা কুয়াশার ফাঁকি। কিছুই দেখতে বুঝতে আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যিই হেসে ফেলতে আর সব ভুলে যেতে ইচ্ছে করে।

বিকাল হয়েছে; এখন এভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকলে মা আবার ডাকাডাকি করবেন, মণিমাসি এসে হাত ধরে টানাটানি করবেন।

উঠে পড়ে শুক্তি। বার বার মিছিমিছি খোঁপা বেঁধেই বা কতটুকু সময় কাটিয়ে দিতে পারা যায়? তার চেয়ে ভাল, বাগানের রোদ গায়ে লাগিয়ে...।

চমকে ওঠে শুক্তির চোখ। জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেয়েছে শুক্তি, মালতী আর একজন অচেনা মহিলা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রাজাবাহাদুরকে কী-যেন বলছে। হাত দুলিয়ে ডাক দেয় শুক্তি।—মা মালতী, এসো। ওপরে উঠে এসো।

কী আশ্চর্য, মালতীও যেন একটা ব্যস্ততা। খুব ব্যস্তভাবে কথা বলে মালতী।—দাদার কাছে শুনেছি, তুমি এখানে আছ। তাই মনে হল, তোমাকে ছেড়ে দেব কেন? তোমাকেও কাজ করতে হবে।

শুক্তি—কাজ?

অচেনা মহিলা বলেন—আমাদের সমিতি...।

মালতী—ইনি কমলা দত্তবড়ুয়া। প্লিডার শরৎবাবুর স্ত্রী।

কমলা—আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি, আর্মির জওয়ানদের জন্য উলের মোজা সোয়েটার কিংবা মাফলার, যা-ই কিছু, যেটা আপনার সুবিধে হয়, বুনে দিন। খাকি রঙের উল হলেই ভাল। সোয়েটার হলে ফুল স্লিভ হবে।

শুক্তি—তাই বলুন! এই কাজ! আচ্ছা, বেশি না পারি অন্তত একটা সোয়েটার বুনে দেব।

কমলা—আপনাকে কিন্তু আমরা উল এনে দেব না। আপনি নিজেই কিনে নেবেন।

মালতী—ওকথা আর শুক্তিকে বলবার দরকার হয় না। এখন চলুন, নতুনপাড়ার দিকে একবার যাই।

শুক্তি হাসে।—উঃ, মালতীর যেন একটা হাঁপ ছাড়বারও সময় নেই মনে হচ্ছে।

মালতী হাসে।—রাগ করো না, আবার দেখা হবে।

নানা রঙের উলের গোছা দিয়ে ঠাসা-ভরতি ঝোলাটাকে হাতে তুলে নিয়ে চলতে থাকে মালতী। বিদায় নিলেন কমলা দত্তবড়ুয়া, তাঁরও হাতে একটা ঝোলা।

মালতীর সঙ্গে দেখা হল, ভালই হল। মনের কাছে না হোক, অন্তত হাতের কাছে একটা কাজের ছুতো ধরিয়ে দিয়ে গেল মালতী। দিনের কিছু সময় একটা কাজের নামে ফুরিয়ে দিতে পারা যাবে। মা আর মণিমাসি অবশ্য মনে করবেন যে, শুক্তি খুব ব্যস্ত হয়ে একটা চ্যাবিটিব কাজ করছে।

উল কেনার জন্যে টাকা দিয়ে রাজাবাহাদুরকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়েই সন্দেহ হয় শুক্তির, রাজাবাহাদুর কি উল পছন্দ করতে ভুল করে ফেলবে না? কিন্তু বেশ ভাল করেই তো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। রঙ খাকি হবে বটে, কিন্তু যেন খসখসে না হয়। পাকা ধানের রঙ হলেই ভাল। একেবারে চকচকে রেশমি ভাব না হোক, একটু নরম মোলায়েম ভাব যেন থাকে। কিন্তু টু-প্লাই হলে চলবে না। যা শীত, ফোর-প্লাই চাই।

ভুল সন্দেহ করেনি শুক্তি। শক্ত দড়ি-দড়ি চেহারার উল নিয়ে এল রাজাবাহাদুর; সে উল দিয়ে সোয়েটার বুনতে শুক্তির হাতে রুচি নেই, রুচি হবেও না। আরও দু'বার বাজারে গিয়ে অনেক বাছাই করে যে উল কিনে নিয়ে এল রাজাবাহাদুর, সেটা অবশ্য অপছন্দ করবার মত কিছু নয়।

কাজটা মন্দ নয়। ভালই তো লাগে। তিনদিনের মধ্যে শুধু দুপুরবেলার সময়টুকু বিছানায় গা গড়িয়ে, সোফার কোণ ঘেঁষে বসে এই সোয়েটারের যেটুকু বুনতে পারে শুক্তি, তাতেই পিঠের সবটা আর বুকের অর্ধেকটা হয়ে যায়। শুক্তির হাতে একটা কাজ ধরিয়ে দিতে গিয়ে মালতী যে সত্যিই শুক্তির মনেও একটা ব্যস্ততার ছোঁয়াচ ধরিয়ে দিয়েছে।

মিছিমিছি খোঁপাটাকে এক টানে খুলে দিয়ে মিররের সামনে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা, আর, আবার নতুন করে খোঁপা বাঁধা; শুক্তি বসুর এই নতুন বাতিক কিন্তু এখনও বন্ধ হয়নি। উলের কাঁটা থামিয়ে রেখে, কোলের উপর থেকে উলের গোছা আর সোয়েটারের আধখানা বুক নামিয়ে রেখে হঠাৎ এক-একবার ব্যস্তভাবে সোফা থেকে উঠে পড়ে শুক্তি। মিররের সামনে এসে দাঁড়ায় আর খোঁপা খুলে ফেলে। আর, দেখতেও থাকে, কপালের মাঝখানে সেই ফিকে কালশিরার আবছা কালো দাগটা এখনও আছে, একেবারে মুছে যায়নি।

মা বোধ হয় এর মধ্যে একটি দিনও শুক্তির মুখের দিকে ভাল করে তাকাননি। তাই কপালের এই আবছা কালো-দাগটাকে দেখতে পাননি। দেখতে পেলে নিশ্চয় চোখ বড় করে আর গলা কাঁপিয়ে বলেই ফেলতেন, কোথায় মাথা ঠুকেছিস, বল? গাড়ি থেকে নামতে, না অন্ধকারে আলোর সুইচ হাতড়াতে গিয়ে ঘরের দেয়ালে? মনে করে দেখ।

হেসে ফেলে শুক্তি।

আর তো কোনও কাজ নেই। আর যা আছে, সেটা যেন তিনটে তিনরকম জগতের ভাষা চুপ করে শোনা, আর শুনে নিয়েই সরে যাওয়া।

তেজপুরের এই নভেম্বরি শীতের বিকালের নরম রোদের আলো গায়ে মেখে বাগানের কামিনী গাছের মাথায় একটা একলা টুনটুনি যখন চুপ করে বসে থাকে, তখন ড্রাইভার রাজাবাহাদুরও গ্যারেজের সামনের চাতালের এক পাশে ঘাসের উপর বসে ওর মাথার নেপালি টুপির ছেঁড়াগুলিকে সেলাই করে হাসতে থাকে।

রাজাবাহাদুর বলে—বোহোৎ মজা হুয়া, দিদি।

শুক্তি—কী বললে?

রাজাবাহাদুর—লড়াইকে লিয়ে হামি চান্দা দিয়েছে সাত রূপিয়া। হাসপাতালকা জমাদারিনলোগ দিয়েছে বিশ রূপিয়া। নতুনপাড়াকা শীতল কাকাবাবু দিয়েছে দু'শো রুপিয়া। লেকিন...।

কী-যেন বলতে গিয়ে থেমে যায় রাজাবাহাদুর, আর মাথা চুলকোতে থাকে। শুক্তি বলে—লেকিন কেয়া? বলেই ফেল না।

বাজাবাহাদুর—লেকিন বাবা কুছ নেহি দিয়া।

শুক্তি—কে? মেসোমশাই?

রাজাবাহাদুর—হাঁ, দিদি। বাবা এক পয়সা নেহি দিয়া। শইকিয়া সাহেব আওর চৌধুবী সাহেবভি নেহি।

সন্ধ্যাবেলার রেডিওতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বলে—আমাদের জয় হবেই। রেডিওর গানগুলিও বলে, হবে জয়।

কালোর মা বলেন—হবে বিচার।

রাত হয়েছে। স্তব্ধ নীরব প্রহর। তারায় ভরে আছে আকাশ। কালোর মা'র গায়ে কম্বল নেই; ছাদের উপর একটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন। আর পুরু ব্লেজার ফ্লানেলের গ্রেট-কোট গায়ে জড়িয়ে ছাদের এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ায় শুক্তি।

কালোর মা'র কথা শুনে থমকে দাঁড়ায় শক্তি। —কী বললেন?

কালোর মা—বলছি, আরও কত অবিচার হল।

একগাদা অবিচারের গল্প বলেন কালোর মা।—তোমাদের ড্রাইভার কৈলাসের জেল হয়েছে। বতনের চাকরি গিয়েছে। শীতলবাবুর দোকান গিয়েছে। শিশিরের বাড়ি গিয়েছে।

হঠাৎ গল্প থামিয়ে আর জপের মালা হাতে তুলে নিয়ে চোখ বন্ধ করেন কালোর মা।

চোখ পড়ে শুক্তিব, অনেক দূরের একটা গাছের মাথার অন্ধকারে মিটমিট করছে জোনাকির কুচি-কুচি আলো। আর নেফা-পাহাড়ের শক্ত নিরেট ধড় যেন কুয়াশা হয়ে গলে গিয়েছে।

শুক্তির চোখের উপরেও যেন কুয়াশা গলে পড়তে চাইছে। সরে যায় শুক্তি। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে সিঁড়ি ধরে নেমে চলে যায়।

কিন্তু থামতে বোধ হয় ইচ্ছে করে না। ঘরে ঢুকে আর বিছানাটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই আবার বের হয়ে যায় শুক্তি। যেন শুক্তির বুকের ভিতরে একটা অবিচারের গল্প আজ হঠাৎ উতলা হয়ে উঠেছে। বাঃ, এ তো বেশ অদ্ভুত ভুলো মন, একবার খোঁজ নিতে চেষ্টাও করে না, মানুষটার কী হল বা না হল?

লোখরার প্রণব কাকা নিশ্চয় একটা কিছু খবর দিতে পারেন। এতক্ষণে কি ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রণব কাকা? রাত এগারোটা তো এখনও হয়নি।

নীচের তলার একটি ঘরের কাছে এসে দেয়ালের গায়ের আলোর সুইচ টিপে দেয় শুক্তি। দরজা ঠেলে দিয়ে ভিতরে ঢোকে।

টেবিলের উপর থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে আর অনেক ডাকাডাকি করেও

কিন্তু কোনও ফল হয় না। এক্সচেঞ্জ শুধু বার বার ওই একই কথা বলে।—প্লিজ ছেড়ে দিন। নো পার্সোনাল কল।

শুক্তি—কেন?

—সিকিওরিটি।

বিসিভার নামিয়ে রেখে দিয়ে শুধু একটা করুণ স্তব্ধতার মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শুক্তি। কপালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম; চোখের তারা নড়ে না।

চমকে ওঠে শুক্তি। মণিমাসির গলার স্বর ঘরের দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে। ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে কথা বলেন মণিমালা—এত রাতে এখানে এসে তুই কার সঙ্গে হ্যালো হ্যালো করছিস?

শুক্তি—লাইন পেলাম না। লোখরাতে প্রণব কাকার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

মণিমালার পিছন থেকে কিরণলেখার গলার স্বর আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে—কেন?

শুক্তি হাসে।—যুদ্ধের একটা খবর জানতে ইচ্ছে হয়েছিল।

কিরণলেখা—যুদ্ধের খবর? রেডিও তো সব সময় যুদ্ধের খবর বলছে।

শুক্তি—রেডিওতে সুজিতবাবুর কোনও খবর তো থাকে না।

হেসে ফেলে কিরণলেখা।—সুজিত কি একটা জেনারেল যে, ওর খবর বলবে রেডিও? সবারই কথা বলতে গেলে রেডিওতে কুলোয় না।

শুক্তি—কিন্তু বলবে তো, বুমলার যুদ্ধের পর রাইফেলের লোকগুলোর কী দশা হল? রইল, না গেল? আছে, কি নেই?

কিরণলেখা—সে সব খবর একদিন পাওযাই যাবে। খববের কাগজ আছে কী করতে? কিন্তু সেজন্যে কি এত বাতে রিং করে প্রণবের ঘুম ভাঙাতে হবে? খেযালেব যে কোনও মাত্রা নেই! তা ছাড়া আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবি তো?

শুক্তি আশ্চর্য হয়।—তোমাকে আবার কি জিজ্ঞেস করব?

কিবণসেখা—আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো বলে দিতাম, প্রণব এখন লোখরাতে নেই, জোরহাটে আছে।

মণিমালা হাসেন।—যা, এবার শুয়ে পড় গিয়ে, যদি আবার রোগা হবার বাতিকে না পেয়ে থাকে।

কী আশ্চর্য! ঘুমটাও একটা দুঃসহ লজ্জার ঘুম। বিশ্রী স্বপ্ন তাড়াতে গিয়ে ঘুমটা বার বার ভেঙে যায়। ডান পায়ের গোড়ালিতে কোনও ফুস্কুরির ব্যথা টনটন করছে না, তবু একজনের কোলের উপর পা তুলে দেওয়া। স্বপ্নটার একটুও লজ্জা হল না। কোনও বিপদ-আপদ নেই, বাঘে-ভালুকে তাড়াও করেনি, তবু ছুটে গিয়ে একজনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরা! ঘুম ভেঙে যাবার এতক্ষণ পরেও স্বপ্নটার ছোঁয়া গায়ে লেগে রয়েছে। নিঃশ্বাসের সব বাতাস অলস হয়ে গিয়েছে। বুকটা টিপটিপ করছে। জীবনের কোনও মুহূর্তেও এমন লজ্জা পায়নি শুক্তি।

ঘুম আর হবে না। এমন ঘুম আর না হলেই ভাল। রাত আর কতটুকুই বা আছে? আর না ঘুমোলেও চলবে। বাকি রাতটুকু জেগে বসে কাটিয়ে দিলে ক্ষতি কী? চোখের চেহারা দেখে মণিমাসি শুধু একটু সন্দেহ করে বলবেন, আজ তোকে এত রোগা-রোগা দেখাচ্ছে কেন রে, শুক্তি?

বিছানা থেকে নেমে পড়ে শুক্তি। আলো জ্বালে আর জানালাটাকেও খুলে দেয়।

না, এটা রাত নয়। ভোর হয়েছে। হিমেল বাতাসের কনকনে ঠাণ্ডায় গাছপালার মাথা শিউরে শিউরে কাঁপছে। দূরের শঙ্খের শব্দের মত একটা ফিকে গম্ভীর শব্দ ভেসে আসছে। ভোমরাগুড়ি ঘাট থেকে ভোরের ফেরির স্টিমার ছাড়ল বোধ হয়। স্টিমারের বিদায়ধ্বনির স্বরও শীতে কাঁপছে।

১৯

তেজপুরের এদিকে-ওদিকে সবদিকেই ধুলো উড়ছে। পথের লোক একটু বেশি তাড়াতাড়ি করে হাঁটে; রিক্সা একটু বেশি বেগ নিয়ে দৌড়ে যায়। আর গাড়ির হর্নের শব্দগুলিতে যেন ছুটে চলে যাবার জন্য একটা হঠাৎ-ব্যাকুলতার চিৎকার।

তোয়াং-এর গোমফার বুদ্ধমূর্তির কাছে দীপ জ্বেলে দিতে সেখানে কেউ আর আছে কিনা, ঠিক বুঝতে পারা যায় না। বরং সন্দেহ হয়, কেউ বোধ হয় নেই।

চলে এসেছে, চলে আসছে, আরও চলে আসবে নিশ্চয়, ঘর-ছাড়া যত মোনপা ভোটিয়া আর শারদুকপেন।

আসছে, এসে পড়েছে, আশ্রয় ক্যাম্পের দিকে চলে যাচ্ছে ঘর-ছাড়াদের এক-একটা দল। অনেক রিনচিন আর অনেক ম্রিং, লেই, দোবজি, সাংগে, সাংজো আর কেজাং; ওরা বড় গম্ভীর।

মাথাতে মোটা মোটা বেণী দুলছে যাদের, রিলিম, সোনাম, পেম, আর পুতি; ডোয়েমা হোক বা লামু হোক, ওবা সবাই মিটিমিটি হাসে।

ছোয়াং, মেদি, ডাবু আর নোরবু; বুড়ো আচি সেতু আর ছোকরা মুখরো সেতু; ওরা বেশ বিরক্ত হয়ে তাকায় আর হাঁপায়।

ওদের কাঁধে পিঠে আর মাথায় বোঝা, ওদের টাট্টু খচ্চর আর বুড়ো ঘোড়ার পিঠে বোঝার ভার। ধুলোমাখা হয়ে, হেসে কেশে রেগে হাঁপিয়ে আর ফুঁপিয়ে, অসহায় ক্লান্তির মিছিলের মত এরা তেজপুরের গা-ঘেঁষা সড়ক ধরে চলে যাচ্ছে। বাচ্চা-কাচ্ছা, বুড়ো-বুড়ি আর ছোঁড়াছুঁড়ি; কে না আছে?

কিন্তু কোনও দফলা-গাঁয়ের একটিও মানুষ আসেনি। রতন যতই ছুটোছুটি করুক, কঠিন আশার মূর্তি হয়ে সড়কের মাইল-স্টোনের উপর বসে আর চোখ তুলে আগন্তুকের মিছিলের মধ্যে চেনামুখ খুজতে যতই চেষ্টা করুক, শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে যায় রতন।

ক্লাস ওয়ান টু থ্রি আর ফোর; নেফার সরকারি কাজের উত্তমাধম সবাই চলে আসছেন। উত্তমেরা অনেকে একটু আগে এসে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার কোথায় যেন চলে গিয়েছেন। নর্থ ব্যাঙ্কের এদিকে কোথাও নয়, হেথা নয়, আরও দুরে; অন্য কোনওখানে।

চলে গিয়েছেন দশটি বাড়ির মালিক লাহিড়িমশাই, তাই হীরকের গলার স্বদেশি গানের কাকলি আর শোনা যায় না। চলে গিয়েছেন একুশটি বাড়ির মালিক শৈলেশ্বর শইকিয়া। চলে যাবার জন্যে ছটফট করছেন ইনকাম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী; সিক লিভ চেয়ে দরখাস্ত করেছেন, তার উপর গৌহাটিতে তিনবার টেলিগ্রাম করে রিমাইণ্ডারও দিয়েছেন। চার্টার প্লেন উড়ে উড়ে এসেছে, আর এদিক-ওদিকের যত চা-বাগানের বিদেশি সাহেবকে সপরিবারে তেজপুরের মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে।

মণিমালার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে, আজকের দিনটা যে স্মরণ করে খুশি হবার একটা দিন। অনেক আনন্দের স্মৃতি দিয়ে চিহ্নিত একটি দিন, যেদিন এই ভারতীর ফটকের দু'পাশে দুটি মঙ্গলঘট রেখে তিনি গৃহপ্রবেশ করেছিলেন। মুগার চাদরটি গায়ে জড়িয়ে আগে-আগে চলেছেন মহিমবাবু, পিছনে মণিমালা। তাঁর হাতের থালার উপর কর্পূরের বাতি জ্বলছে। সেদিনটি ছিল আজকেরই মত একটি আঠারোই নভেম্বর।

কোনও বছরে এই দিনটিতে গগনবাবু কিরণদি আর শুক্তিকে কাছে পাননি মণিমালা। তাই তাঁর ইচ্ছে হয়েছে, খুব একটা হই-চই উৎসব নয়, একটু হাসিখুশির কলরব নিয়ে গৃহপ্রবেশের বার্ষিকীর দিনটা সুখী হোক। কিংবা বোধ হয় ছানার পোলাও, রুইয়ের পেটি দিয়ে কোর্মা আর সরভাজা তৈরি করবার মত একটা দিন খুঁজছিলেন মণিমালা। আজ সেইরকম একটি দিন পেয়েছেন।

নিজে খাটলেন, কালোর মা তো খাটছেনই; তার উপর শুক্তিকেও একটু না খাটিয়ে থাকতে পারলেন না মণিমালা। শুক্তিকে দিয়ে সর ভাজিয়ে নিলেন।

দিনটাও না হেসে থাকতে পারবে কেন? ভাজতে গিয়ে প্রথমেই সরের তিনটে পিস কড়া জ্বালে পুড়িয়ে লাল করে দিয়ে শুক্তি যখন আতঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, সর্বনাশ হল, সব গেল মণিমাসি, তখন শুক্তির হাত থেকে ঝাঁঝরাটাকে কেড়ে নিয়ে হেসে ওঠেন মণিমালা।

কিন্তু শুধু একবার, আর ভুল হয়নি শুক্তির।

দুপুরবেলায় খাবার টেবিলের উপর দিয়েও মাঝে মাঝে যেন হাসির শব্দ গড়িয়ে যায়। গগন বসু বলেন—প্রণবের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে শান্তিপুরে গিয়ে যে সরভাজা খেয়েছিলাম, তার স্বাদ মনে আছে। কিন্তু আজকের সরভাজা খেয়ে মনে হচ্ছে, আরও পাকা কোনও কারিগরের হাতের সরভাজা; অদ্ভুত স্বাদ।

মহিমবাবু—হ্যাঁ; আমাদের তেজপুরের লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হরগোবিন্দ খুবই ওস্তাদ কারিগর।

গগন বসু—ভুল নাম বললেন, মহিমবাবু!

মণিমালার মুখের দিকে তাকিয়ে মহিমবাবু হাসেন।—বোধ হয় গোলকবিহারীর দোকানের সরভাজা? তাই না?

গগন বসু—না, কারিগরের নাম হল শুক্তি বসু।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মহিমবাবু কুণ্ঠিতভাবে হাসেন।—তুই? কলকাতার কলেজে সরভাজাও শেখায় নাকি?

শুক্তি—না। তেজপুরের ভারতী কলেজে শেখায়।

মহিমবাবু—ভারতী কলেজ?

শুক্তি—জানেন না?

মহিমবাবু—না। কখনও তো শুনিনি।

শুক্তি—প্রিন্সিপালের নামটাও শোনেননি?

মহিমবাবু—না।

শুক্তি—তা হলে শুনবেন? বলব?

মহিমবাবু—বলবি বইকি।

শুক্তি—নাম, শ্রীযুক্তা মণিমালা দস্তিদার।

হাসতে গিয়ে গগনবাবুর হাতের চামচ পড়ে যায়। কিরণলেখা হাসি চাপতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শুক্তিকে ধমক দিতে গিয়ে হেসেই ফেলেন।—মুখ-কাটা মেয়ে—এরকম একজন গম্ভীর গুরুজন মেসোর সঙ্গে কি-রকম ঠাট্টা তামাসা শুরু করেছে।

মহিমবাবু এইবার কিরণলেখার মুখের দিকে তাকান।—মনে হচ্ছে, আপনিই শুক্তিকে এই ঠাট্টাটা শিখিয়ে দিয়েছেন।

মণিমালা, ব্যাপার দেখে সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন যিনি, তিনি তাঁর হাসির ভাব সামলাতে গিয়ে কোনও কথাই বলতে পারেন না।

বিকাল হতেই গানের মিষ্টি সুরের ছোঁয়া লেগে ভারতীর ঘরের বাতাসও মিষ্টি হয়ে গেল। শুক্তিকে বেশি বলতে হয়নি, শুধু একবারই বলেছিলেন মণিমালা—কতদিন তোর গান শুনিনি শুক্তি।

শুক্তির গান শেষ হবার পর মণিমাসি আরও খুশি হয়ে বলেন—শুক্তির গলার এত মিষ্টি গান আমি আগে কখনও শুনিনি।

কী যেন ভেবেছেন কিরণলেখা; শুক্তির ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোখে যেন আর-একটা উৎসবের আশার ছবি আজ খুব ব্যস্ত হয়ে হাসছে।

যদি এখন মালতী হঠাৎ উপস্থিত না হত, তবে বোধ হয় এখনই শুক্তির ঘরে ঢুকে আর শুক্তিরই চোখের সামনে বসে গল্প করতেন কিরণলেখা।

—এসো মালতী। ডাক দিলেন কিরণলেখা।

চমকে ওঠে শুক্তি। মালতীকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়েও শুক্তি যেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে হাসে। —এখনও ফিনিশ করতে পারিনি মালতী।

মালতী—এতদিনের মধ্যে একটা সোয়েটার বুনে দিতে পারলে না? একটু তাড়াতাড়ি করো, শুক্তি।

চলে গেল ব্যস্ত মালতী। শুক্তির ঘরে ঢুকে কিরণলেখা হাসেন।—আজ নিশ্চয় স্পষ্ট করে বলতে পারবি। তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম।

বুঝতে অসুবিধে নেই শুক্তির, মা এখন কিসের জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। তেজপুরের বাতাসের ধুলো লালচে গোধূলির মত রঙিন হয়ে উঠতে চাইছে।

কিরণলেখা—আর তো দেরি করা উচিত নয়। ভেবে দেখতে এত দেরিই বা হবে কেন? তুমি বড় হয়েছ, তোমার তো বুঝে নিতে কোনও অসুবিধে নেই।

শুক্তির নীরব মুখটার উপরেও যেন রঙিন গোধূলির একটা আভা লুটিয়ে পড়েছে। কিরণলেখা বলেন—তুমি কৃষ্ণার মত একটা খুকু মেয়ে হলে, কিংবা ষোলো বছর বয়সের একটা বোকা অবুঝ মেয়ে হলে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না। যা করতাম আমরাই করতাম। তা ছাড়া, তোমার বাবার ইচ্ছের কথাটাও তো জান; তুমি যা বলবে, তাই হবে।

শুক্তি বলে—বলব। আর দেরি হবে না।

কিরণলেখা—কবে বলবি?

শুক্তি—আজই।

কিরণলেখার মুখের শান্ত হাসিটা যেন নিবিড় তৃপ্তি নিয়ে থমথম করে। চলে যান কিরণলেখা।

টেবিলের উপর পড়ে আছে উলের গোছা, কাঁটা দুটো আর পরিপাটি করে গোটানো সোয়েটার। ঠাসা বুনোট পেয়ে উলের পাকা ধানের রঙ আরও ঘন আর চকচকে হয়েছে। বুকের সবটাই হয়েছে, পুরো একটা হাতও হয়ে গিয়েছে। আর একটা হাতের অর্ধেক হয়েছে। এত কুঁড়েমি না করলে বাকি অর্ধেক হাতটাও কবেই হয়ে যেত।

না, আজ আর ইচ্ছে করে না। শুধু হাত দুটো নয়, মনটাও আর ওই উলের কাঁটা ধরবার জন্য ব্যস্ত হতে চায় না। বরং চুপ করে খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে।

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। নেফার পাহাড়ের মাথায় রোদের ছোঁয়া সিরসির করে কাঁপছে। আর ক্লান্ত স্বরে গুরগুর শব্দ করে উড়ে আসছে দুটো হেলিকপ্টর; পাখাতে রোদের আভার সোনা-রং জ্বলছে। দুটো সোনালি পাখি বলে মনে হয়।

কিন্তু রাজাবাহাদুর যেন কেমন অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করে, আর ছোট ছোট চোখ দুটোকে কুঁচকে আরও ছোট করে দিয়ে, আর্ত মানুষের মত একটা বিষাদের মুখ নিয়ে হেলিকপ্টর দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে।

—ওরকম করে কী দেখছ রাজাবাহাদুর? জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হেসে ফেলে শুক্তি।

রাজাবাহাদুরের গলার স্বর ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে। —জওয়ানকা লাস আতা হ্যায়, দিদি।

—কী বললে? প্রশ্নটা যেন শুক্তির বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে দিয়ে আর স্তব্ধ নিঃশ্বাসটার ভিতর থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসে।

রাজাবাহাদুর বলে—জখম লোগভি আতা হ্যায়।

শুক্তি—কিন্তু কোথায় আতা হ্যায়?

রাজাবাহাদুর বলে—এয়ারপোর্টকা ময়দানমে; কিন্তু আমি ঠিক জানি না দিদি।

সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি কালো হয়ে গেল আর কনকনে ঠাণ্ডায় ভরে গেল তেজপুরের শীতের এই অদ্ভুত সন্ধ্যা।

শুক্তির ঘরের ভিতরে কিন্তু দপ করে আলো জ্বলে ওঠে। কে যেন ঘরে ঢুকেছে। আর সুইচ টিপেছে। মুখ ফিরিয়ে না তাকিয়েও বুঝতে অসুবিধা নেই শুক্তির, কে এসেছে।

কিরণলেখা বললেন—শুক্তি, চা খাবি চল।

কিন্তু কিরণলেখার এই স্নিগ্ধ আহ্বানের শান্ত হাসিটাকে চমকে দিয়ে ধুলো-ধুলো করে দেয় শুক্তির মুখের একটা কথা, শুকনো পাতার ঝড়ের মত একটা কথা—আমি কিন্তু আজ কিছুই বলতে পারব না, মা।

কিরণলেখা—কেন?

শুক্তি—সুজিতবাবুর একটা খবর না পেয়ে আমি কিছুতেই বলতে পারব না।

কিরণলেখা—কেন?

শুক্তি—আমার কথায় চাকরি নিয়ে একটা মানুষ খুশি হয়ে যুদ্ধ করতে বুমলাতে চলে গেল। আজ পর্যন্ত তার কোনও খবর পাওযা গেল না। ভাবতে আমার খুব খারাপ লাগছে; লজ্জা হচ্ছে, স্বস্তিও পাচ্ছি না।

কিরণলেখা—কথাটা ঠিক। আমারও তো কয়েকবার মনে হয়েছে, কী হল ছেলেটার? কিন্তু সেকথা ভেবে এদিকের সব কিছু তো অন্ধকার করে রাখা চলে না। সেটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

শুক্তি—কিন্তু এরকম বিশ্রী একটা অস্বস্তির মন নিযে আমিও যে কিছু বলতে পারছি না। বলতে ইচ্ছেই করছে না, বলতে ভালও লাগছে না।

কিরণলেখা—অদ্ভুত তোমার মন। বড় গোলমেলে মন।

শুক্তি হাসে।—তুমি আমাকে মিথ্যে নিন্দে করছ, মা।

কিরণলেখাও হাসতে চেষ্টা করেন।—বড় নরম মন তোমার। যাই হোক, এখন তা হলে জোরহাটে তোমার প্রণব কাকার কাছে একটা চিঠি দিয়ে দেখো, সুজিতের কোনও খবর পাওয়া যায় কিনা।

ও কী? রাস্তা দিয়ে একটা হল্লা ছুটে গেল কেন? এগিয়ে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিরণলেখা। ফটকের কাছে আবছা আলো-আঁধারের ভিতর থেকে রাজাবাহাদুরের গলার স্বর চেঁচিয়ে ওঠে।—সেলা খতম।

—দুঃখের বিষয়...। ওদিকের ঘরে কড়কড় করে বেজে উঠেছে রেডিও।—আমাদের সেলা ঘাটির পতন হয়েছে। শত্রুর হামলা আরও এগিয়ে এসেছে; আমাদের জওয়ানেরা পিছিয়ে এসে বমডিলার ঘাটিতে দাঁড়িয়েছে। দিনরাত যুদ্ধ চলছে।

টলমল করে তেজপুর। খবরের চকিত আঘাতে আহত আর উদ্বিগ্ন তেজপুর। সিনেমা হাউসের কাউন্টারে টিকিট-কেনার ভিড়ও বিচলিত হয়ে সরে যায়। রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সিট বুকিং-এর তাড়াহুড়ো ব্যস্ততার ভিড়ে ভরে যায়। বড়-বড় আর ভাল-ভাল অনেক মোটরকারের ধকধকে জ্বলন্ত হেডলাইট এয়ারপোর্টের সড়ক ধরে ছুটে চলে যেতে থাকে।

নীচের তলা থেকে একটা উতলা কণ্ঠস্বরও যেন টলমল করে আর সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে। —মা, আপনি কোথায়? একবার দেখুন এসে, বাবা কার সঙ্গে কী সব অদ্ভুত কথা বলছেন।

কালোর মা এসে যে কথা বলেন, সে কথা ভারতী নামে এই বাড়িটারই অদৃষ্টের একটা ভয়ানক খবর।—বাড়ি বিক্রী করতে চাইছেন বাবা।

কালোর মা'র কথা শুনে মণিমালার চোখেও একটা নির্বোধ বিস্ময় টলমল করে। নীচে চলে যান মণিমালা। গগন বসু আর কিরণলেখাও নামেন, পিছনে শুক্তি।

মহিমবাবুর হাতে বাড়ি-বিক্রীর একটা ডিডের খসড়া। টেলিফোনে কথা বলছেন মহিমবাবু। —আপনি আজ এখনই চলে আসুন মিস্টার দোরজি। আমার সবই রেডি। ...ও ইয়েস,

আজই তেজপুর ছেড়ে চলে যাব।...না, কোনও আক্ষেপ নেই। টাকা হাতে থাকলে সবই আমার দেশ।

টেলিফোনের আলাপ বন্ধ হবার পর গগন বসুর দিকে তাকিয়ে আর মৃদুভাবে হেসে কথা বলেন মহিমবাবু। —এবার চিনারা এসে গৃহপ্রবেশ করুক; আমার কোনও আপত্তি নেই; আমার আর কোনও আক্ষেপও নেই, গগনবাবু।

গগন বসু—আপনার কথা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

মহিমবাবু—বাড়ি বিক্রীর ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কালিম্পং-এর মার্চেন্ট মিস্টার দোরজি এই বাড়ি কিনতে রাজি হয়েছেন।

—শুনলে তো কিরণদি। কী সুন্দর ব্যবস্থা। আমার গৃহপ্রবেশের স্মরণদিন কী চমৎকার স্মরণীয় হয়ে উঠল। মণিমালার দু'চোখ থেকে বড়-বড় জলের ফোঁটা ঝরতে থাকে।

মহিমবাবু—আমি আজই রাত্রে তেজপুর ছেড়ে চলে যাব। আপনি কী করবেন, গগনবাবু?

গগন বসু—যা বলেন। থাকতে বলেন, থাকব; যেতে বলেন, যাব। আর, এরা কেউ যদি আমাকে বাধা না দেয়, আমি তবে কদমবাড়িতে চলে যাব। আমাব তো কোনও অসুবিধে নেই।

কিরণলেখা—আমরা তা হলে কলকাতা চলে যাই।

কালোর মা বলেন—আমি আর কোথায় যাব? শিববাড়ির মন্দির গিয়ে পড়ে থাকব।

এতক্ষণ মণিমালার হাত ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল শুক্তি। এইবার আস্তে আস্তে এগিযে যেয়ে মহিমবাবুর চোখের সামনে দাঁড়ায় আর হাসতে থাকে। —মেসোমশাই!

শুক্তির মুখের হাসিটাও অদ্ভুত; যেন দুরন্ত-করুণ একটা আবেদন। মহিমবাবু বলেন—তুই আবাব কী বলতে চাইছিস?

শুক্তি—রাগ করে বাড়িটা বিক্রী করবেন না মেসোমশাই।

মহিমবাবু—কিন্তু...।

শুক্তি—না, না, আপনি আর কোনও কিন্তু-টিন্তু বলবেন না। বলতে বলতে মহিমবাবুর হাতের উপর লুটিয়ে পড়ে বাড়ি-বিক্রীব ডিডের খসড়াটাকে ধরে টানাটানি করতে থাকে শুক্তি।

মহিমবাবু—ওরকম করতে নেই শুক্তি। তুমি সংসারের নিয়মকানুন বোঝ না।

শুক্তি—হ্যাঁ, আমি কিছুই বুঝি না, বুঝবও না। কিন্তু আপনি এটাকে এখন আমার কাছে রেখে দিন।

মহিমবাবু—কিন্তু গবমেণ্ট তো আমার সম্পত্তি বাঁচাতে পারবে না।

শুক্তি—দেখুন না, কী হয়? আরও ক'টা দিন ধৈর্য ধরতে দোষ কী?

মহিমবাবু—আর ধৈর্য!

মুখ ফিরিয়ে নিলেন মহিমবাবু; শুক্তির হাতে খসড়াটাকে ফেলে দিলেন।

কিরণলেখার চোখে তবু একটা প্রশ্নের ছায়া লেগে থাকে।—আজই যদি চলে যেতে হয় তবে...।

মণিমালা চেঁচিয়ে ওঠেন।—না, কখনও না, কারও যাওয়া হবে না। এত যাব-যাব কববাব মত কিছু হয়নি।

২০

আবার একটা খবর। এ খবর যেন তেজপুরের শেষ আশার উপর একটা কঠোর ঠাট্টার বিস্ফোরণ, শেষ ধৈর্যের উপর একটা রূঢ় ধিক্কার আর শেষ বিশ্বাসের উপর একটা তিরস্কারের ঘোষণা। সন্ধ্যার রেডিও বলে দিল—বমডিলা শেষ।

রাতের রেডিওতে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা জানিয়ে দিল—আসামের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রইল।

রাতের আকাশে একটি হেলিকপ্টর তীব্র আলোর ছটা ছড়িয়ে ঘুরিয়ে নীচের তেজপুরের চেহারা দেখতে থাকে, কেমন করে ছটফট করছে তেজপুর।

পথের জনতার মুখে আতঙ্কের রব—চিনা প্লেন। বোমা ফেলবে চিনারা।

শিশির, অমল আর আরও কয়েকটি ইয়েস ছেলে সারা শহর ছুটোছুটি করে বেড়ায়—চিনা প্লেন নয়; আমাদের হেলিকপ্টর।

তেজপুরের ঘরে ঘরে রাত-জাগা মানুষের প্রাণ ছটফট করে। পাড়ায় পাড়ায় বাড়ির দরজার কাছে ঘরের মানুষের জটলা আর অনিশ্চয় অদৃষ্টের গুঞ্জন—যাব কি যাব না? থাকতে পারা যাবে কি যাবে না? আর থাকা উচিত হবে কি?

গোটা পাঁচেক আতঙ্কিত সাইকেল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে যায়। —চিনা আহিল! চিনা আহি গইছে। চিনালোগ আ গিয়া! এসে পড়েছে চিনারা!

—কোথায়? কোথায়? কত দূরে? একসঙ্গে শত লোকের শত মুখের করুণ প্রশ্ন হল্লা করে বেজে ওঠে।

—এই তো বালিপাড়ার কাছে এসে পড়েছে। আতঙ্কিত সাইকেলের ছুটন্ত ছায়া পাড়ার রাস্তা ছাড়িয়ে উধাও হয়ে যায়।

জগদীশ, হিতেন আর আরও কয়েকটি ছেলে সাইকেল নিয়ে ছুটে ছুটে ভুল আতঙ্কের ঝড় শান্ত করতে চেষ্টা করে।—না, না, সব মিথ্যে কথা। বাজে কথা, ওসব গুজবে একটুও বিশ্বাস করবেন না।

—কিন্তু মশাই, এটাও কি একটা বাজে গুজব যে, টাস্কারের দল দুমদাম করে সব সরঞ্জাম আছড়ে ভেঙে পুড়িয়ে আর গুঁড়ো করে দিয়ে সরে পড়ছে?

জগদীশ বলে—শুনেছি, ওরা নানারকম কাণ্ড করে পালিয়ে যাচ্ছে।

—টাস্কার অফিসার-মেস তো একেবারে শূন্য। নয় কি? ওরা বোধ হয় কালকেই যঃ পলায়তি স জীবতি করেছে!

হিতেন হাসে। —তাই তো মনে হয়।

পাড়ায় পাড়ায় মিলিটারির অফিসারদের ভাড়া-করা এক-একটি বাড়ির ভিতরে নিঃশব্দ চুপি-চুপি ব্যস্ততা। লটবহর বাঁধাছাঁদা করে তৈরি হয়ে গিয়েছে অফিসারের দারা-সুত-পরিবার। হুস হুস করে মিলিটারির জিপ আসছে, আলো মৃদু করে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে। অফিসারের প্রিয়-পরিজনে বোঝাই হয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে মিলিটারি জিপ।

—ও শিশিরবাবু, মিলিটারির সব ফ্যামিলি যে চমৎকার সরে পড়ছে।

শিশির বিব্রতভাবে বলে—তা, কী আর করা যাবে বলুন।

—কিন্তু মুরগির খাঁচা আর মদের বোতলের বাক্সে বোঝাই হয়ে মিলিটারির ট্রাকও যে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে শুরু করেছে।

অমল—হ্যাঁ, দেখেছি।

—একবার খোঁজ নিলেই তো পারেন, আমাদের মেজর কর্নেল আর ক্যাপ্টেন মশাইরা আর্মি কোয়ার্টারে এখনও আছেন, না কেটে পড়েছেন?

শিশির—মনে হচ্ছে, এখন ওরা বোধ হয়...।

—চম্পট দেবার তালে আছেন বোধ হয়।

শিশির—তাই তো মনে হয়।

—জওয়ান মশাইরাও কি বোঁচকাবুঁচকি কাঁধে তুলে ফেলেছেন?

অমল—তাঁবুও গুটিয়ে ফেলছে।

—এরাও কি বমডিলার টাইগারদের মত জঙ্গলে ঢুকে পড়বে?

অমল—সেটা আমি কি করে বলি? তবে শুনেছি, ওরা শিলিগুড়ির দিকে সরে পড়তে চায়।

—লজ্জার কথা! এই সব চম্পটপটু বীরদের জন্যেই না শীতের রাতে বাচ্চা ছেলেটার গা'র উপর থেকে লেপ তুলে নিয়েছি আর দান করেছি। ছিঃ।

যাব কি যাব না? রাত-জাগা শহরের স্বস্তিহীন প্রাণের আক্ষেপ আর প্রশ্ন ভোরের আলো দেখতে পেয়েও কোনও ভরসার সঙ্কেত দেখতে পায় না। বরং দেখা যায়, একরাতের মধ্যেই শহরের এখান-ওখান থেকে কেউ যেন এক-একটা খাবলা দিয়ে মানুষের সাড়া তুলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। নীরব হয়ে গিয়েছে বড়-বড় বাড়ি। গ্যারাজ খালি। এয়ারপোর্টের এপাশে-ওপাশে সব ডাঙা জুড়ে প্রভুবিহীন মোটরকার ছড়িয়ে পড়ে আছে।

দোকানে বেচা-কেনার সাড় জাগে না, যদিও সকালবেলার রোদ তেতে উঠে বেলা বাড়িয়ে দিতে থাকে। সড়কের পাশে অলস হয়ে পড়ে আছে রিক্সার সারি। পানওয়ালার দোকানের ঝাঁপ অর্ধেক খোলা। কোর্ট কাছারি নিঝুম।

চক-বাজারের পথের জনতা হঠাৎ চমকে ওঠে, ও কী? কী বলছে মাইক।

—আপনা লোকে যেনে পারে টাউন এরি নিরাপদ ঠাঁই লৈ যাওক। আপনা লোকে যেনেকৈ পারে...। উচ্চকিত মাইকের স্বরে উপদেশ প্রচার করে করে চলে যাচ্ছে সরকারি পাবলিসিটির মোটর ভ্যান।

টলমল তেজপুর ভেঙে পড়ে। ধরো বাস, ধরো ট্রাক, ধরো ট্রেন, চলো ভোমরাগুড়ি ঘাট।

নেবাও উনানের আগুন, হাঁড়ি নামিয়ে রাখো, চলো, বেরিয়ে পড়ি।

গরুর গলার দড়ি খুলে দাও, থাক সাইকেলটা বারান্দাতেই পড়ে থাক। শুধু নগদ টাকা-পয়সা আর গয়না-টয়না যা আছে একটা ছোট বোঝাতে ভরে নাও। আর যদি পার তো সের দুয়েক চাল, কয়েকটা আলু আর নুন।

আরে, রেখে দাও এখন তোমার নিত্যসেবার দেবী এই পিতলের জগদ্ধাত্রীটাকে; শিববাড়ির মন্দিরের দরজার কাছে রেখে দিয়ে চলে এসো। ট্রাক না পাই হেঁটেই রওনা হব।

আঃ, মানুষ বসতে জায়গা পাচ্ছে না, আপনি আবার আপনার টিয়ে পাখিটাকে খাঁচাসুদ্ধ ট্রাকে তুলছেন। উড়িয়ে দিন ওটাকে আর খাঁচাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিন।

না মশাই, চলুন আমরা বরং ভোমরাগুড়ি হয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে চলে যাই। সড়ক ধরে যেতে হলে ধানসিরি ব্রিজের কাছে আটক হয়ে পড়ে থাকতে হবে। কেন জানেন তো? শোনেননি কিছু? আগে মিলিটারি পালাবে, তারপর আমরা সিভিলেরা। শীতলবাবুর ট্রাক বোকা হয়ে ফিরে এসেছে।

না, ভোমরাগুড়ি ঘাটে খুব বেশি অসুবিধে হবে না। ওখানে ইয়েস ছেলেরা আছে। ওরা খুব যত্ন করে স্টিমারে তুলে দেয়।

পুলিশ কোথায়? সরকারি কেষ্টবিষ্টুরা কোথায়? সবাই বুঝি ভাগোরথী হবার চেষ্টায় আছে। শুধু এই কয়েকটা ইয়েস ছোকরা আর কত ছুটোছুটি করে খাটবে?

একজন নিওমোনিয়া রোগী, তিনটি পোয়াতি মানুষ আর একজন অন্ধ; আমাদের পাড়ার এই মানুষগুলোর কী গতি হবে, ও শিশিরবাবু? এরা যাবে কী করে?

শিশির—চিন্তা করবেন না। একটু অপেক্ষা করুন। আমরা ঠিক সময় মত এসে এদের ট্রাকে তুলে নিয়ে ভোমরাগুড়ির ঘাটে পৌঁছে দেব।

যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে চলে যেতে থাকে শহরের অসহায় প্রাণটার যত দুঃখ আক্ষেপ আর আতঙ্কের কলরব। ব্যাগ, ঝোলা ও পোঁটলা হাতে নিয়ে বাড়ির মানুষ পথের উপর ছোট ছোট ভিড়

হয়ে আর ট্রাকের আশায় উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকেল ফুরিয়ে যায়, সন্ধ্যা ফুরিয়ে যায়, রাত হয়; তবু ওরা নড়ে না। সাড়া জাগে তখন যখন এক-দুজন ইয়েস ছেলে ট্রাক নিয়ে এসে ডাক দেয়—চলে আসুন।

তেজপুরের এই রাত; কী অদ্ভুত একটা চটুল-নিলাজ কালো রাত। কত তাড়াতাড়ি খালি হয়ে গেল, নীরব নির্জন আর স্তব্ধ হয়ে গেল শহরটা।

সার্কিট হাউসে আলো নেই। থানাতে পুলিশ নেই। হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, মেথর কেউ নেই। একলা রোগী বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। জেলে কয়েদি নেই, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাগলা ফটক খুলে দেওয়া হয়েছে।

পদ্মপুকুরের কিনারায় মাঠের ঘাসের উপর দাউ-দাউ করে নতুন নোটের স্তূপ জ্বলেছে আর পুড়ছে। ছায়া-ছায়া চেহারা, কারা যেন আবার ওদিকের এক অন্ধকারে ভয়ানক এক গোপন অন্ত্যেষ্টির মত সরকারি অফিসের যত টাকার হিসাবের খাতা আর ফাইল পুড়িয়ে ফেলেছে। শেয়াল ডাকছে ব্রহ্মপুত্রের চরে।

আর, বড়লোকের বাড়ি হয়েও, গ্যারেজে দুটো গাড়ি থাকতেও, ভারতীর নীচের তলায় বড় ঘরে রাত-জাগা আলো জ্বলছে। এবাড়ির মানুষগুলি এখনও যায়নি।

সামনের সড়কের অন্ধকারের মধ্যে একটা জ্বলন্ত টর্চের আলো দুলছে। থেমে আছে হিতেনের সাইকেল। ভারতীর গেটের কাছে এগিয়ে এসে ডাক দেয় হিতেন।—এ বাড়ির কেউ এখনও আছেন নাকি?

রাজাবাহাদুর জবাব দেয়।—আছে। কেন?

হিতেন—এখন তো চলে যাওয়াই ভাল।

আবার টর্চ দুলিয়ে আর সাইকেল ছুটিয়ে চলে যায় হিতেন।

কিরণলেখা বলেন—শুনলি তো শুক্তি। এখন চলে যাওয়াই ভাল।

শুক্তি—হ্যাঁ...কিন্তু আর একটুখানি থেকে যাই, মা।

যাবার জন্য তৈরি হয়েই আছে এ বাড়ির সব মানুষ। যা কিছু সঙ্গে নেবার ছিল, তার সবই দুই গাড়িতে তোলা হয়ে গিয়েছে। তবু যে রওনা হতে এত দেরি হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ আর কিছু নয়, শুধু এই শুক্তি।

মণিমালা তো অনেকক্ষণ হল চোখ মুখে শান্ত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু শুক্তি হঠাৎ আনমনা হয়ে গিয়েছে। যেন চলে যেতে বাধছে। যেন বিপদের সঙ্গে প্রাণটাকে জড়িয়ে নিয়ে বসে থাকাও একটা মায়ার খেলা। তাই বার বার অনেকবার শুধু ওই একটা কথা বলে এই চলে যাওয়ার ব্যস্ততাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে শুক্তি।—যাচ্ছিই তো, কিন্তু একটু দেরি করো মণিমাসি।

মণিমালা—কিন্তু আর দেরি করা কি উচিত হবে? শহরে তো আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।

সত্যিই কি তেজপুরের কোনও ঘরে কেউ আর নেই?

আছে। নতুনপাড়ার শীতল বিশ্বাস আছেন; এই মাঝরাতে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে লড়বড়ে একটা পুরনো ট্রাকের চাকায় জল ঢালছেন। আর, রতন যেন একটা নতুন আশার কালো-ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়; মাঝে মাঝে ডাকবাংলোর কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এক-একবার শিশিরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। শিশির বলে—জ্বর গায়ে নিয়ে তুমি আবার এত রাতে মিছিমিছি ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? বাড়ি যাও রতন।

আছে; শীতল বিশ্বাসের মত আরও দু'চারজন এখনও আছে, যারা বুঝে নিয়েছে যে, রামেও মারবেন, রাবণেও মারবেন, পালিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই।

আর আছেন তাঁরা, যাঁরা মুখ লুকিয়ে সরে পড়বার জন্য মাঝরাতের গভীর অন্ধকারটার

অপেক্ষায় এতক্ষণ আড়ালে অদৃশ্য হয়েছিলেন।

হেসে ফেলে শিশির!—ওই দেখো অমল, দণ্ডমুণ্ডের একজন মহাপ্রভু কেমন চুপি-চুপি সরে পড়ছেন।

ঠিকই, অগ্নিগড়ের উঁচু টিলার মাথাতে একটি সরকারি অফিসার-ভবনের জানালার আলো হঠাৎ নিভে গেল, আর সড়ক ধরে একটা গাড়ি আস্তে আস্তে গড়িয়ে এসে তারপর জোরে স্পিড নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

—কিন্তু ওখানে একটা গাড়ি যে পিছু-বাতি নিবিয়ে দিয়ে একেবার চুপটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। চলতে চলতে কথা বলে অমল। গাড়িটার কাছে এসে টর্চ ফ্ল্যাশ করে শিশির।

চমকে ওঠে অমল।—অ্যাঁ? মাফলার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে একটা বুদ্ধুর মত গাড়ির ভিতরে বসে আছে, কে ওটা?

শিশির বলে—তাই তো? এ যে দেখছি বিখ্যাত নেফা-অফিসার মিস্টার মনোহর লাল, নেফা যার জমিদারি। কথা বলতে গিয়ে শিশিরের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে।

গাড়ির বাম্পারের উপর একটা পা তুলে দিয়ে অমল চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনার তো পালিয়ে গেলে চলবে না স্যার। আপনি চলে গেলে ইনার লাইন যে কেঁদে মরে যাবে।

কোনও কথা বললেন না মনোহর লাল। একেবারে ধীর স্থির শান্ত বোবা একটি মাটির পুতুলের মত নিরীহ হয়ে গাড়ির সিটের কোণে বসে থাকেন। তারপর চমকে-চমকে আর কেঁপে কেঁপে এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন, যেন একটা ভুতুড়ে হাত তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

হেসে ফেলে শিশির।—যেতে দাও, অমল। চলো, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

সরে আসে অমল। সঙ্গে সঙ্গে মনোহর লালের গাড়িটাও স্টার্ট নিয়ে নড়ে ওঠে। অমল বলে—তবে যান মিস্টার আই এফ এ এস! পদ্মশ্রী পেলে কিন্তু আমাদের একবার স্মরণ করবেন।

ভাগ্যিস পাওয়ার হাউসের কয়েকটি কাজের মানুষ পালিয়ে যায়নি; তাই এই মাঝরাতের তেজপুরের নিরেট অন্ধকারে ভরা সড়কের এখান-ওখানে লাইটপোস্টের মাথায় কিছু আলো জেগে আছে। কিন্তু ওখানে, একটু দূরে, গাছতলার বিদঘুটে অন্ধকারটাকেই বেছে নিয়ে কয়েকটা অপ্রাকৃত প্রাণী যেন ধস্তাধস্তি করছে। একটা গোঙানির শব্দও শোনা যায়; কেউ যেন কারও গলা টিপে ধরেছে। দৌড়ে এগিয়ে যায় শিশির আর অমল।

পাওয়ার হাউসের বুড়ো চাপরাশি বেচারাকে জাপটে ধরেছে একটা লোক। আর, একটা লোক এক হাতে বুড়োর মুখ চেপে ধরে বুড়োর জামা-কাপড় আর টাকা-পয়সা কাড়ছে। খাটো জাঙ্গিয়া আর ছোট কোর্তা পরা রূঢ় চেহারার দুটো জেল-ছাড়া কয়েদি।

অমলের হাতের স্টিকের বাড়ি খেয়ে সরে যায় কয়েদি দুটো। তারপর দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায়। বুড়োর হাত ধরে শিশির।—ভয় নেই। কিন্তু এত রাত্রে বের না হলে কি চলত না?

বুড়োকে বাজারের কাছাকাছি রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার ঘুরে যায় শিশির আর অমল।

এদিকের অন্ধকারে নয়, শহরের ওদিকে আমলাপটির রাস্তার একটা আলোর কাছে একটা লোক যেন শক্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সামনেই একটা বাড়ির দরজার কাছে একটা জিপগাড়ি, জিনিসপত্রে বোঝাই। বাড়ির দরজা মাঝে মাঝে একটু ফাঁক হয়, তারপরেই যেন শিউরে উঠে বন্ধ হয়ে যায়।

শূন্য তেজপুরের এই ভয়ানক কালো মাঝরাত, কি নিদারুণ এক কৌতুকের সুখে বিচার-অবিচারের হিসাব-নিকাশ করবার একটা খেলা দেখাতে চায়? তা না হলে এরকম এক-একটা ঘটনা এখানে-ওখানে চমক-ছবির মত দেখা দেয় কেন?

শক্ত পাথরের মত দেখতে ওই লোকটা হল জেল-ছাড়া কয়েদি, কৈলাস। আর ওই যে

জিপ জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওটা পুলিশ লাইনের একটা জিপ। আর, মাঝে মাঝে বন্ধ জানালা ফাঁক করে কৈলাসকে দেখতে পেয়েই কাঁপা হাতে জানালা বন্ধ করে দিচ্ছেন যিনি, তিনি সেই উন্নতিময় পুলিশ অফিসার পরেশ ভট্টাচার্য, সরে পড়বার জন্য তৈরি হয়েও সরে পড়তে পারছেন না।

কিন্তু আর কতক্ষণ? বাড়ির বন্ধ দরজার কপাট খুলে বাইরে বের হয়ে এলেন পরেশ ভট্টাচার্য, পিছু পিছু পরেশ ভট্টাচার্যের স্ত্রী, যিনি উসকো-খুসকো মাথা আর শুকনো মুখ-চোখ নিয়ে, আর, একটা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছেন।

কৈলাসের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরেশ ভট্টাচার্যের গলার স্বর ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।—আমার স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ। সাত দিনেরও বেশি হল জ্বরে ভুগছে।

কৈলাসের চোখ, ইস্পাতের গুলির মত চকচকে শক্ত চোখ হঠাৎ যেন চুপসে নরম হয়ে যায়। কৈলাসের পাথুরে মাথাটাও দুলে ওঠে। মুখে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির ছটফটে হাসি।

খাটো জাঙ্গিয়া, গায়ে ছোট কোর্তা, কাঁধে বিড়ির আগুনে পোড়া ফুটো-ফুটো একটা কম্বল, কৈলাস যেন একজন যোগী পরমহংসের মত ভঙ্গি ধরে চলে গেল। পরেশ ভট্টাচার্যের মুখের দিকে আর একবারও তাকাল না; একটি কথাও বলল না।

এদিকে ডাকবাংলোর গেটের কাছে হঠাৎ ছুটে গিয়ে রতনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে নিল শিশির। আর, একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে অমলের পিছনে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে থাকেন পলিটিকাল খোসলা সাহেব।

সরে পড়েছিলেন খোসলা সাহেব। গাড়ির ভিতরে সব জিনিসপত্র তুলেও ফেলেছিলেন। আর, স্ল্যাক-পরা ও ঘাড়ছাঁটা অদ্ভুত চেহারার এক ফিরিঙ্গি তরুণী-নারীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠতেও যাচ্ছিলেন। কিন্তু উঠতে পারেননি। কোথা থেকে ছুটে এসে খোসলা সাহেবের ঘাড়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে রতন—ক্যারেক্টার! পিয়নকা ক্যারেক্টার তো বহুত খারাপ হোতা হ্যায়, লেকিন বড়া সাহেবকা ইয়ে কওনসা ক্যারেক্টার?

রতনকে ঠেলে ঠেলে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় শিশির।—ওর ক্যাবেক্টার নিয়ে ওকে সরে পড়তে দাও, তুমি বাড়ি যাও।

রাগে ফুলে ফুলে গজগজ করে রতন।—আমার চরিত্র খারাপ বলে ইনি আমার চাকরি খেয়েছেন। এখন এঁর চাকরি খায় কে?

অমল হাসে।—ওর চাকরি কেউ খাবে না। সেটা গ্রেট ডেমোক্রেসির নিয়ম নয়। কিন্তু তুমি চলো এখন।

কে জানে জগদীশ আর হিতেন এখন কোন দিকে ঘুরছে। হাসপাতালে রোগী দুটোর কাছে এখন কে আছে? বিলাস আর বিভূতি বোধ হয়। কিন্তু লুটপাট করতে পারে, এমন কুমতলবের কিছু প্রাণী এদিকে-সেদিকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। টাউনটাকে একবার চক্কর দিয়ে ঘুরে দেখলে কেমন হয়?

নতুনপাড়াতে এসে শীতল বিশ্বাসের তোবড়া লক্কড় ট্রাকটাকে নিয়ে ঘুরতে থাকে শিশির আর অমল। স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে হিতেন আর জগদীশকে দেখতে পেয়ে ট্রাকে তুলে নেয়। চেঁচিয়ে হাসতে থাকে জগদীশ।—আমার যে কেমন একটা রাজা-রাজা ভাব হচ্ছে হিতেন। তোমার হচ্ছে না বোধ হয়।

হিতেন—না। আমার এখন এক পেয়ালা গরম চায়ের জন্য প্রাণটা ভিক্ষুক-ভিক্ষুক হয়ে রয়েছে।

মাধববাবুর শূন্য বাড়ির সামনের ঘরের দরজাটা খোলা; টর্চের আলো ফেলতেই দেখা যায়, চা চিনি দুধ কেটলি টি-পট আর পেয়ালা, সবই এক জায়গায় জড়ো আছে। কোনও অসুবিধে নেই,

শুধু জল গরম করে নিলেই পেয়ালা ভরে চা খেয়ে নিতে পারা যায়। শিশির হেসে হেসে ধমক দেয়।—না হিতেন, এখানে থামবে না। চলো।

এস আই বি'র অফিসবাড়ি উত্তরায়ণ; গোয়েন্দাকুলচন্দ্র বিনা এ বৃন্দাবনও অন্ধকার। উত্তরায়ণের বারান্দাতে একটা বাছুর দাঁড়িয়ে আছে। সড়কের একটা লেটারবক্সের উপর একটা সাদা বিড়াল।

রবার বাগানের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ট্রাক থামিয়ে কী যেন দেখতে থাকে শিশির। নীরব নির্জন সড়ক ধরে এক বুড়ো ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন কোথায়?

ট্রাক থেকে নামে শিশির।—শুনছেন? কোথায় যাবেন আপনি?

—মহিম দস্তিদারের বাড়ি খুঁজছি।

শিশির—এই তো, এই যে সামনেই মহিমবাবুর বাড়ির ফটক।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি।

বুড়ো ভদ্রলোক ভারতীর ফটকের ভিতরে ঢুকতেই আবার ট্রাক ছুটিয়ে চলে গেল শিশির আর ইয়েস ছেলের দল।

ভারতীর বারান্দায় উঠে ডাক দেন বুড়ো ভদ্রলোক।—কেউ আছেন নাকি?

রাজাবাহাদুর এসে চেঁচিয়ে ওঠে।—মামাবাবু!

বড় ঘরের দরজা খুলে কিরণলেখা আর মণিমালা বাইরে এসে চমকে ওঠেন।—মেজদা।

শুক্তি এসে হেসে ওঠে।—কী আশ্চর্য, দুলাল মামা এসেছেন? দেখলে তো মণিমাসি, আমি দেরি করিয়ে দিলাম বলেই না দুলাল মামাকে ফিরে পাওয়া গেল?

সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে দুলাল দত্ত হাসেন।—পাগলা ফটক খুলে দিয়েছে, তাই বের হয়ে এলাম; না এসে উপায় কী?...আচ্ছা, আমি এখন একটু জিরিয়ে নিই, কী বলো কিরণ?

শুক্তির মুখের হাসিটা এইবার যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে।—এখন আর জিরোতে পারবেন না, দুলাল মামা।

—কেন?

—এখন তেজপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমরা সবাই যাব।

—কেন? তোমরাও সবাই অবাঞ্ছিত হয়ে গেলে নাকি?

—একরকম তাই।

—শুনলাম, নেফা থেকেও নাকি অবাঞ্ছিত হয়ে দলে দলে সবাই চলে আসছেন।

—আমিও শুনেছি। আপনি কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে যাবেন।

—তা মন্দ হয় না।

বাইরে আসেন গগন বসু।—আমিই স্টিয়ারিং-এ বসি। শুক্তি আমার পাশে বসুক।

শুক্তি—আমি ড্রাইভ করি, বাবা।

গগন বসু—না, আমিই পারব। আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও তোর চেয়ে কিছু কম নয়।

কালোর মা বলেন—আমি তা হলে শিববাড়ির মন্দিরে...।

মণিমালা আর কিরণলেখা এক সঙ্গে ধমক দেন।—বাজে কথা বলো না কালোর মা। চুপ করে গাড়িতে উঠে পড়ো।

রাজাবাহাদুর ডাকে—বাবা আসুন।

মহিমবাবু তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটেন, এগিয়ে যান, গাড়িতে উঠেই চোখ বন্ধ করেন।

ভারতীর ফটক খোলা রেখে দিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল দুই গাড়ি। এখান থেকে বের হয়ে, তারপর নর্থ ট্রাঙ্ক রোড ধরে এগিয়ে...তারপর দেখা যাক, কোথায় কতদূরে গিয়ে থামা যায়। মঙ্গলদই পৌঁছতে পারলে নরেশ কাঞ্জিলালের বাড়িতে কিছুক্ষণ রেস্ট নিতে পারা যাবে।—নরেশ

কাঞ্জিলালকে চিনলি তো শুক্তি?

শুনতে পায় না শুক্তি। শুক্তির শূন্য মনটা যেন মানুষের পরিত্যক্ত ওই তেজপুরের ভয়ানক কালো মাঝরাতের অন্ধকারের মধ্যেই পড়ে আছে।

গগন বসু ডাকেন—শুক্তি!

যেন ধড়ফড় করে জেগে উঠে জবাব দেয় শুক্তি—কী বলছ, বাবা?

গগন বসু বলেন—আমাদের বাগানের মেশিনারি সাপ্লাই করে কলকাতার যে কাঞ্জিলাল অ্যাণ্ড সন্স, তারই মালিক নরেশ কাঞ্জিলাল।

২১

ফিরে চলো ঘরের টানে! একদিন, দু'দিন, তিনদিন; তারপর পাল্টে গেল নাটকের সিন। সরে যাবার স্রোত এইবার যেন ফিরে আসার স্রোত হয়ে শূন্য দহ ভরে ফেলতে শুরু করেছে। ফিরে আসছে তেজপুরের লোক।

তেজপুরের ভাগ্যটাও বোধ হয় সেই সার্কাসের মেয়েটার মত একটা মেয়ে, তারেব উপব নাচছে। একবার ওদিকের ক্লাউনের হাতছানিতে ওদিকে চলে যায়, আবার এদিকের ক্লাউনের হাতছানিতে এদিকে ফিরে আসে।

ট্রেন ভরতি হয়ে, স্টিমার ভরতি হয়ে, আর চারদিকের যত সড়ক ধরে ছুটন্ত জিপ-ট্রাক-বাস আর মোটরকারে ভরতি হয়ে চলে আসছে তেজপুর শহরের পলাতক প্রাণের কল্লোল।

চিনারা যুদ্ধ-ক্ষান্তি ঘোষণা করেছে। বলেছে, ওরা আর এগুবে না। কিছুদিনেব মধ্যেই ফিরে যেতে শুরু করবে। কিন্তু শর্ত এই যে...।

প্লেন-ভরতি হয়ে উড়ে উড়ে আসছেন যত পলাতক সম্পত্তিময় প্রাণ। এয়ারপোর্টের কাছে অনাথ হয়ে পড়েছিল যত মোটরকার, তারা আবার সনাথ হযে আর খুশি-হর্নের হর্ষ তুলে বড়-বড় বাড়ির গ্যারেজে ফিরে এসেছে আর আসছে।

দোকান-পাট খুলছে। ঘরে ঘরে উনানের ধোঁয়া। ছাড়া গরুর গলায় আবার দড়ি পড়েছে। আর, পাবলিকের মরেল বুস্ট করবার জন্য নেতা, ভি-আই-পি আর মন্ত্রীও আসতে শুরু করেছেন। সার্কিট হাউসের খানসামার হাতে ট্রে-ভরতি পেয়ালাতে আবার গরম চা টলমল করে।

শিলিগুড়ি থেকে মিলিটারির ট্রেন এসে পড়েছে। কোর হেডকোয়ার্টারে অফিসারেব ব্যস্ততা উঁকি-ঝুঁকি দেয়। ময়দানে সকালবেলার রোদে জওয়ানের প্যারেড মচমচ করে।

কী আশ্চর্য। হাসপাতালে ডাক্তার, পুলিশ লাইনে পুলিশ, আর আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট! তেজপুরের মানুষের চোখে দৃশ্যটা যেন ডি এল রায়ের কবিতার কথার মত একটা বল-কি-হে বিস্ময়!

মঙ্গলদই-এর কাঞ্জিলাল মশাই একটা জেদ করে ভালই করেছিলেন, গগন বসুকে আর তাঁর সঙ্গের সবাইকে শুধু দু'চার ঘন্টার রেস্ট নিয়েই চলে যেতে দেননি। পুরো তিনটে দিন সবাইকে খুব যত্ন-সমাদর দিয়ে প্রায় বন্দি করে রেখেছিলেন।—এখান থেকে আবার এত তাড়াতাড়ি সরে যাবার কী দরকার, গগনবাবু? কিছুদিন থেকেই যান না কেন? সরে যাবার হলে আমাদেরও তো সরে পড়তে হবে।

কিন্তু রেডিও, খবরের কাগজ আর মঙ্গলদই-এর রাস্তার হল্লা একটু নতুন খবর ছড়িয়ে দিতেই হেসে উঠেছিলেন কাঞ্জিলাল মশাই।—এখন আপনাদের তা হলে তেজপুরেই ফিরে যাওয়া ভাল, গগনবাবু।

হ্যাঁ, তাই আর দেরি করেননি, ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হলেন কদমবাড়ির গগন বসু,

কিরণলেখা আর শুক্তি। তেজপুরের মহিমবাবু, মণিমালা, কালোর মা আর রাজাবাহাদুর। আর একজন মানুষ, নেফার এক আকা গাঁয়ের পাশে আর বনসুমের জঙ্গলের ছায়ার কোলে যাঁর নিঃস্ব জীবনের একমাত্র শখের বাসাঘর, বাঁশ-বাঁখারির একটা চং এখনও নড়বড় করছে কিনা কে জানে, সেই দুলাল দত্ত তাঁর সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে বলেন—আবার তেজপুর!

ফিরে যাবার টানে আবার দুটি মোটর গাড়ি সকালবেলার রোদে ছুটে ছুটে আর ধুলোমাখা হয়ে তেজপুরে ফিরে আসে, আর রবার বাগানের ভারতীর খোলা ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকেই যেন রেস্ট ফিরে পাওয়ার সুখে অলস হয়ে থেমে যায়।

দোতলাতে শুক্তির ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যেয়েই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে শুক্তি।—আশ্চর্য মণিমাসি, আমার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। নিবিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম নাকি?

মণিমালার সারা মুখ জুড়ে আর-একরকমের খুশির হাসি থমথম করে।—ওঘরের ঘড়িটা এখনও কেমন টিক-টিক করে বেজে চলেছে, শুনছিস শুক্তি?

শুক্তির ঘরের টেবিলে দোয়াতের কালিও শুকিয়ে যায়নি, কলমটাও ঠিক সেখানেই পড়ে আছে, আর চিঠি লেখার কাগজের প্যাডও আছে।

এখন একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপাটাকে খুলে ফেলতে, তারপর একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে কোচের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার আগে জোরহাটে প্রণব কাকার কাছে চিঠিটা লিখে ফেলাই ভাল।

কালোর মা যখন চা খাওয়ার জন্যে শুক্তিকে ডাকতে আসেন, তার আগেই শুক্তির চিঠি-লেখা শেষ হয়ে যায়। খুব বেশি কথা লেখবার তো কিছু নেই।—আপনি শুধু খোঁজ নিয়ে জানাবেন কাকা, আপনাদের নতুন প্লেটুনের হাবিলদার সুজিত রায়, বুমলাতে পোস্টিং হয়েছিল যার, সে এখন কোথায়? ফিরে এসেছে কি?—প্রণতা শুক্তি।

রবার বাগানের ভারতীর দোতলার একটি ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আর উঁকি দিয়ে তেজপুরের জীবনের কতটুকুই বা দেখতে চিনতে আর শুনতে পারা যায়, আবার কী-রকমের মুখর উপকথায় ভরে গিয়েছে তেজপুর? আর নেফার পাহাড়ের শুধু ওই মেঘলা রঙের চেহারাটাকে দেখেই বা কি আর কতটুকু বুঝতে পারা যাবে, ওখানে ঝুমের আগুন পোড়া ক্ষেতের মাটির শক্ত ঢেলা ভাঙতে গিয়ে দফলা মেয়ে রেনকি এখনও রতনকাকার জন্যে কেঁদে উঠছে কিনা? নেফার পাহাড়, জড়সড় হয়ে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা জড়তার পাহাড়। একটা নিরেট বোবা পাথরের পাহাড়।

খবরের কাগজে বিবৃতি হয়ে ছাপা হবার জন্যে কী ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এক-একটি ত্যাগ সাহস আর কর্তব্যনিষ্ঠার গল্প। টেলিফোনে ডেকে ডেকে আর গাড়ি পাঠিয়ে হোটেলে-হোটেলে প্রেসের মানুষ খুঁজছেন ওঁরা, বিবৃতি দেবার জন্য উন্মুখ যত সিভিল মিলিটারি আর পলিটিকাল। খবরের কাগজে ছাপার হরপের গল্প পড়ে তেজপুরের মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়, অফিসার মনোহর লাল সারারাত জেগে একাই হাসপাতাল পাহারা দিয়েছেন; মাঝে মাঝে রোগীদের মুখে জল দিয়েছেন। আর সিন্‌হা সাহেব একা বন্দুক হাতে নিয়ে সারারাত টেলিগ্রাফ অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুলিশের ভট্টাচার্য তাঁর অফিসের টেবিলের উপরেই সারারাত শুয়ে ছিলেন, এক পা'ও নড়েননি।

কিন্তু ওরা কোথায়, যারা শূন্যনগর তেজপুরের দুটো ভয়ানক কালো রাতে রাজা-রাজা হয়ে ঘুরে বেড়াল? ওরাও আছে বইকি। কিন্তু থেকেও নেই। ওরা আবার সেই সামান্য সাধারণ পুরনো ছায়া হয়ে গিয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের হাজিরা খাতার দিকে তাকিয়ে হিসেব করে শিশির, আর কতজন ছাত্রের ফিরে আসতে বাকি আছে। সামনের টেস্ট পরীক্ষার ভয় ভুলতে গিয়ে সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে হাউসের বারান্দায় ঘুর-ঘুর করে হিতেন। অমল আর জগদীশ বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে পান খায় আর গল্প করে।—আজ আবার ডোগরা রেজিমেন্টের কিছু লোক বের হয়ে চারদুয়ারে পৌঁছেছে।

—তুমি আজ চারদুয়ার গিয়েছিলে নাকি?

—হ্যাঁ। বমডিলা থেকে ওরা জঙ্গলে-জঙ্গলে দিনরাত হেঁটেছে, এক মুঠো ছোলাও খেতে পায়নি, মাঝে মাঝে শুধু বুনো কলা পুড়িয়ে খেয়েছে; দারুণ শীতে মুখের চামড়া ফেটে গিয়েছে, পায়ের ফোস্কা ঘা হয়ে গিয়েছে। ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতো, কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ছে, দেখলে মন ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়।

জোরহাট থেকে প্রণবকাকার চিঠি আসতে খুব বেশি দেরি হল না। শুক্তিকে শুধু সাতটা দিনের অপেক্ষা সহ্য করতে হয়েছে।

ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়ে শুক্তি। হাতটা চমকে চমকে কাঁপতে থাকে। তারপর শুক্তির দুই চোখ যেন অন্ধের দুটো নকল চোখের মত চকচকে পাথর হয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

লিখেছেন প্রণবকাকা।—কোনও খবর নেই, শুক্তি। তবে বুমলাতে আমাদের আসাম রাইফেলের পোস্টের কী দশা হয়েছে, সেটা অনুমান করতে অসুবিধে নেই। হয় সবাই মরেছে, নয় কিছু মরেছে কিছু বেঁচেছে। যদি কিছু লোক বেঁচে থাকে, তবে তারাও হয় চিনাদের হাতে সবাই বন্দি হয়েছে, নয় কিছু বন্দি হয়েছে, কিছু পিছনে সরে আসতে পেরেছে। যদি কিছু লোক পিছনে সরে আসতে পেরে থাকে, তবে তারাও শেষে নিশ্চয় স্ট্র্যাগল্ আউট করেছে।

শুক্তির দুই ঠোঁটও যেন শক্ত পাথর হয়ে গিয়েছে, কোনও করুণ আক্ষেপও তাই বিড়বিড় করে উঠতে পারে না। শুধু মাথাটা যেন রাগ করে কবে জ্বলছে আর বলছে—সবাই মরেছে, বাঃ, তার মানে সুজিতও মরেছে। মরলেই হল! এত সহজে মরে গেলেই হল? চালাকি? অসম্ভব। একটুও বিশ্বাস করা উচিত নয়।

চিঠিটাকে শক্ত মুঠোর চাপে দুমড়ে-মুচড়ে দুবে ছুঁড়ে ফেলে দেয় শুক্তি।

চিনাদের হাতে বন্দি হয়েছে? হোক না। মন্দ কী? একদিন তো ফিরে আসবে। ফিরে এসে না হয় আবার লড়তে যাবে।

স্ট্র্যাগল্ আউট করেছে? তা হলে তো ভালই করেছে। না করে উপায়ই বা কী? জঙ্গলে জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে আর দিশেহারা পথে ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্ট পাবে। তবু তো একদিন ঘরে পৌঁছে যাবে। হাত-পা না ভাঙলেই হল।

তবে কি সুজিত সত্যিই ফিরে আসছে? নিশ্চয় আসছে।

কিন্তু ফিরে আসতে আর কত দেরি করবে সুজিত? আর কাউকে ভাল করে না চিনুক সুজিত, অন্তত ওর কাকিমাকে তো ভাল করে চেনে। ভেবে ভেবে কত ছটফট করছেন ওর কাকিমা বেচারা, সেটা সুজিতের মত মানুষের পক্ষে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। সুজিতের মনও সেরকম নয়। তবে আর দেরি না করে চলে এলেই তো পারে। কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ নেই; নিশ্চয় ইচ্ছে করে দেরি করছে না। যা বিশ্রী পাথর জঙ্গল আর পোকা-মাকড়ে ভরা ওই নেফা।

কিরণলেখা এসে বেশ একটু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করেন—জোরহাট থেকে তোর প্রণবকাকার চিঠি এসেছে মনে হল?

শুক্তি—হ্যাঁ।

কিরণলেখা—কি লিখেছে? সুজিতের খবর কী?

শুক্তি—হয়ত মরেছে; কিংবা...।

কিরণলেখা শিউরে ওঠেন।—ছি, ওরকম ভয়ানক বাজে কথা হয়ত করেও বলতে নেই।

শুক্তি—প্রণবকাকা যা লিখেছেন, আমি তাই বলছি। হয়ত বেঁচে আছে। বেঁচে থাকলে চিনাদের হাতে বন্দি হয়েছে কিংবা লুকিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে হাঁটা দিয়ে চলে আসছে। কিরণলেখা—তাই বল। তাই যেন সত্যি হয়। তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক ছেলেটা।

চলে গেলেন কিরণলেখা। বললে একটু খারাপ শোনায় তাই শুক্তিকে একটা কথা বলতে পারলেন না। তাই পাশের ঘরে গগন বসুর কাছে গিয়ে কথাটাকে বলেই ফেলেন কিরণলেখা।—এটা তো একরকম খবর পাওয়াই হল।

মরে-টরে যাওয়া, চিনাদের হাতে বন্দি হওয়া, আর জঙ্গলে-জঙ্গলে লুকিয়ে চলে আসা; সবই তো এক-একটা খবর। সুজিত ছেলেটার ভাগ্য নিশ্চয় এই তিন খবরের কোনও একটা খবর হয়ে গিয়েছে।

গগন বসু—কিন্তু কোন খবরটা ঠিক?

তবে তো এই দাঁড়ায় যে, সুজিতের ভাগ্যের একটা ঠিক খবর যেদিন মুখর হয়ে উঠবে সেদিন শুক্তির মনের ইচ্ছাটাও মুখ খুলবে। তার আগে নয়। এটাই বা কেমনতর কথা। ওরকম একটা খবরের অপেক্ষা করে করে শুক্তির ভাগ্যটাও কি দিনের পর দিন অচল হয়ে পড়ে থাকবে?

শুক্তি কিন্তু ভাবতে ভুল করে না। না, এরকম করে শুধু একটা আওনকি আওয়াজ শোনবার জন্যে কান পেতে আর চুপ করে বসে থাকবার কোনও মানে হয় না। শুক্তির প্রাণটা কি রাতের বেলগাড়ি যে, কেউ একজন এসে সবুজ বাতি দুলিয়ে দেবে, তবে চলতে শুরু করবে?

শুক্তির চোখে আনমনা ভাবনার ছায়া, কিন্তু দুই ঠোঁটে যেন শক্ত করে চেপে ধরা একটা অদ্ভুত হাসি। দেখতে পেয়ে একদিন মণিমালা জিজ্ঞাসা করেন—তুই তো এখনও কিরণদিকে ঠিক করে কিছু বললি না, শুক্তি। আমরা সবাই যে আশা করে তৈরি হয়ে রয়েছি।

শুক্তি—কী বললে?

মণিমালা—মাঘ হলে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়; না হয় ফাল্গুনেই হল। কিন্তু তুই বলবি তো?

শুক্তি—বলব।

মণিমালা—কিন্তু তুই নাকি বলেছিস যে, সুজিত নামে সেই হাবিলদার ছেলেটার একটা খবর না পেয়ে...।

শুক্তি হাসে। —হ্যাঁ বলেছি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমি একটা খবরের সঙ্গে চুক্তি করে বসে আছি। খবর পেলে পাওয়া যাবে, না পেলে পাওয়া যাবে না।

মণিমালা—তা হলে...।

শুক্তি—প্রণবকাকাকে আর একটা চিঠি দিয়েছি। সে চিঠির জবাব আসুক। তারপর...।

মণিমালা—তারপর কী?

মণিমালার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে হাসতে থাকে শুক্তি। —তারপর যা বলবার বলেই দেব। তুমি এখন যাও তো মণিমাসি।

কিন্তু জোরহাট থেকে প্রণবকাকার চিঠির আশায় চুপ করে বসে থাকতেও যে ভাল লাগে না। বার বার শুধু মনে হয়, এতদিনে নিশ্চয় এসে পড়েছে সুজিত। শুধু ওর খবর জানবার জন্যে কেউ ব্যস্ত নয় বলেই সুজিত একটা অচেনা বস্তুর মত কোথাও পড়ে আছে। কে জানে কুমুদ ডাক্তার এখন কোথায় আছেন? সুজিতের কাকিমাই বা কোথায়? ওঁরা কিছু জানতে পেলেন কি না পেলেন, সেটাও তো জানবার কোনও উপায় নেই।

ও দৃশ্য দেখলে চোখ জ্বলে যায়। নেফার পাহাড়ের উপর দিয়ে কত হেলিকপ্টর রোজই আসছে। রাজাবাহাদুরও রোজ সেই একই কথা বলছে; আওরভি আয়া, আওরভি জখম জওয়ান লোগ আ রহা।

কিন্তু নাম-ধাম জানবার তো কোনও উপায় নেই। অদ্ভুত এক সিকিওরিটি ওদের কম্বলে জড়িয়ে আর আড়ালে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

শুক্তির ইচ্ছের জেদ সহ্য করতে গিয়ে রাজাবাহাদুরকে একদিন লোখরা ঘুরে আসতে হল।

না, লোখরাতে এখনও কোনও ফিরতি জওয়ান পৌঁছয়নি। হাবিলদার সুজিত রায়ের খবরও কেউ বলতে পারেনি। রাজাবাহাদুরের পুরনো বন্ধু জমাদার ধনরাজ লিমবু খুব জোরে মাথা কাঁপিয়ে আক্ষেপ করেছে, না, আর ভাবনা করবার কিছু নেই। গঙ্গোপানি পি লিয়া হাবিলদার সুজিত।

—কী বললে রাজাবাহাদুর? শুক্তির গলার স্বর শিউরে ওঠে।

রাজাবাহাদুর—জমাদার লিমবু বোলতা হ্যায়, বুমলাওয়ালা জওয়ান লোগ সব খতম হো গিয়া।

—যত সব মিথ্যে কথা। মাথামুণ্ডু নেই, বাজে কথা।

সরে যায় শুক্তি। রাজাবাহাদুর যা বলছে, সেটা তো একটা নিরেট অজ্ঞতার মন-গড়া যত জল্পনার রক্তমাখা উল্লাস। জঘন্য। শুনলে কান দুটোও যেন ঘিনঘিন করে।

সরে গিয়েও কোথাও কিন্তু শান্ত হয়ে বা শ্রান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না শুক্তি। ঠিক খবর যে পেতেই হবে। চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না।

নীচের তলায় নেমে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডাকাডাকি করে শুক্তি। —হ্যালো...পি টি আই...আপনি পি টি আই? মিস্টার গাঙ্গুলি?

—হ্যাঁ।

—আপনি নিশ্চয় বলতে পারবেন, স্ট্র্যাগলার যারা চলে আসতে পেরেছে, তাদের নাম কেমন করে জানা যায়?

—এখন জানবার উপায় নেই। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি যেদিন জানাবেন, সেদিন জানতে পারা যাবে, তার আগে নয়।

—যারা আসছে, কিন্তু এখনও পৌঁছতে পারেনি, তাদের নামও কি জানতে পারা যায় না?

—এটা কী-রকমের কথা বললেন? হেসে ফেলেন গাঙ্গুলি।

—আমি বলছি, যারা চলে আসতে পেরেছে, তারা তো বলতে পারে, আর কে কে আছে, কোথাও তাদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়ে থাকতেও তো পারে।

—তা হয়ত হয়েছে। তা হলে আপনি একটা কাজ করুন। কাউকে চারদুয়ারে পাঠিয়ে খোঁজ নিতে চেষ্টা করুন। শুনছি, সেখানে রাজপুত রেজিমেন্টের কিছু লোক এসেছে।

—আমি আসাম রাইফেলের একজনের খবর চাইছি।

—তা হলে বরং আপনি আজই কাউকে রাঙ্গাপাড়া পাঠিয়ে দিন। আসাম রাইফেলের একজন ডাক্তার, ডাক্তার চক্রবর্তী সেখানে আজ তিন-চারদিন হল এসেছেন। শুনেছি তিনি স্ট্র্যাগল করে প্রায় একুশদিন পরে খুব কাহিল অবস্থায় রাঙ্গাপাড়াতে পৌঁছেছেন।

—রাজাবাহাদুর! তুমি কোথায়? ডাকতে থাকে শুক্তি।

—জি হ্যাঁ, দিদি; বলুন।

শুক্তি—তোমাকে এখনই একবার রাঙ্গাপাড়া যেতে হবে।

—বোহৎ আচ্ছা।

শুক্তির সব উপদেশ আর নির্দেশ মন দিয়ে শুনে নিয়ে রাঙ্গাপাড়া রওনা হয়ে যায় রাজাবাহাদুর।

সবই দেখতে আর শুনতে পান কিরণলেখা। শুক্তি যেন মরিয়া হয়ে একটা ব্যাকুল ব্যস্ততার খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে। আর ছুটে ছুটে হয়রান হচ্ছে বেচারা রাজাবাহাদুর।

এই ব্যস্ততাকে যেন একটা নিয়ম করে ফেলেছে শুক্তি। সারাদিনের মধ্যে অন্তত একবার টেলিফোন করে পি টি আই-এর গাঙ্গুলিকে বিরক্ত করা আর জেনে নেওয়া, নেফার জঙ্গলি বাধা ভেদ করে কে কোথায় ফিরে এল। তারপর রাজাবাহাদুরকে একবার তাড়া নিয়ে দৌড় করানো। —যাও, রাজাবাহাদুর। শুনে এসো, কী বলে ওরা, কোনও খবর দিতে পারে কী না?

যাও রাজাবাহাদুর, আজ একবার ফুটহিলের ক্যাম্পে গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে এসো। আজ

একবার চারদুয়ারে যেতে হবে রাজাবাহাদুর। আজ একবার এল বি রোডে সামন্তবাবুর বাড়িতে যাও। একজন ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন রায় এখন সে বাড়িতে আছেন। নেফার ভেতর থেকে এই তিন দিন হল বের হয়ে এসেছেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে এসো তো, কোনও খবর দিতে পারেন কিনা।

আরও দুদিন দু'বার দু'জায়গাতে গিয়ে আর খোঁজ নিয়ে ফিরে এসেছে রাজাবাহাদুর। শুধু শ্রান্ত আর ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে রাজাবাহাদুর। যার খবরই নেই, তার খবর দেবে কে? কী আশ্চর্য; কেন যে ঝুটমুট এত তকলিফ করছেন দিদি, কিছু বোঝা যায় না।

অনেক গল্প এনে দিয়েছে রাজাবাহাদুর। আর কত আনবে? ডাক্তার চক্রবর্তীর গা বিছুটির ঘষা খেয়ে খেয়ে ঘা হয়ে গিয়েছে। একটা পাথরের খাড়াই টপকাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন, বাঁ পায়ের দুটো আঙুল ভেঙে গিয়েছে।...কিন্তু সুজিত হাবিলদার নামে কারও খবব তো আমি জানি না। তবে সেলা থেকে সরে আসবার আগে শুনেছিলাম, আমাদের বুমলা পোস্টের কয়েকজন জওয়ান রিট্রিট করতে পেরেছিল।

ক্যাপ্টেন রায় বলেছেন—আমাদের খুব বেশি অনাহার সহ্য করতে হয়নি। বুঝলাম না, দাগানিয়া বস্তির আকারা আমাদের কেন এত সাহায্য করল? বুঝলাম না, ওদের ঘরে ঘরে কেষ্টবিষ্টুর এই ছবিই বা এল কী করে? মজার ব্যাপার; পাকা চুলে ভরা সাদামাথার এক সুবেদারকে ওরা সব চেয়ে বেশি যত্ন-আদর করেছে। মকাই চাল মাংস, যা যোগার করতে পেরেছে তাই এনে ওরা আমাদের খাইয়েছে। আমাদের অনেক লোককে ওরা ওদের জামা-কাপড় পরিয়ে ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। চিনারা দেখেও কিছু বুঝতে পারেনি।...হ্যাঁ, বেশ কষ্ট হয়েছিল পিঞ্জোলি রোডহেড পর্যন্ত পৌঁছতে। সারা রাত ধরে বেতের জঙ্গল কেটে কেটে রাস্তা করা, আর আগুন জ্বেলে হাতি খেদানো।...কিন্তু আসাম রাইফেলের কারও সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি। শুনেছি, বুমলার কেউই সবে আসতে পারেনি।

চারদুয়ার ক্যাম্পেব রাজপুত রেজিমেন্টের নায়েক কুন্দন সিং বলেছে, হ্যাঁ শুনেছি, বুমলাতে আসাম রাইফেলেব একজন হাবিলদার একা দাঁড়িয়ে আর এল এম জি নিয়ে কভারিং ফায়ার রেখেছিল; কিন্তু সে কি আর আছে?

ফুটহিলের ক্যাম্পের কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে আর অনেক চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারেনি রাজাবাহাদুর। ক্যাম্পের বাইরে একজন সুবেদারকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বড় বড় চোখ করে চমকে উঠেছেন। —বুমলা? আসাম রাইফেলকা হাবিলদার? বাস্, আওর কুছ পুছিয়ে নেহি। নমস্তে!

বাস্, তবে আর কী? এইবার একটা উড়ন্ত হেলিকপ্টরের দিকে তাকিয়ে, আর হাত তুলে একটা নমস্তে জানিয়ে দিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেই তো হল। ডেড বডি কোলে নিয়ে আর উড়ে-উড়ে খবরহীন জগতের মেঘের ভিতরে চিরকালের মত মিলিয়ে যাক হেলিকপ্টর। শুক্তির প্রাণটাও এই অদ্ভুত মিথ্যে ব্যস্ততার সব ধুলো ধুয়ে মুছে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিন্তু সকালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতেই শুক্তির মনে যেন একটা পাগল-পাগল শখের লোভ ছটফট করে হাসতে থাকে। একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না কেন? মা বলবেন, তোর মাথা খারাপ হয়েছে। বাবা বলবেন, ওখানে সিকিওরিটির নিষেধ আছে, কাছে যেতে পারবি না, জেনে শুনে মিথ্যে হয়রান হবার দরকার কী? মণিমাসি বলবেন, এতদিন পরে তোর আজ আবার হঠাৎ ছুটোছুটি করবার ইচ্ছে হল কেন?

শুক্তি—রাজাবাহাদুরকে একবার বলে দাও, মণিমাসি।

মণিমাসি—কী বলব?

শুক্তি—আমি একবার বের হব।

কিরণলেখা—কোথায় বের হবি?

শুক্তি হাসে। —একবার এয়ারপোর্ট ঘুরে আসি।

মণিমালা—এয়ারপোর্ট কি বেড়াবার জায়গা?

শুক্তি—বেড়াতে তো যাচ্ছি না, শুধু একটু দেখতে যাচ্ছি।

কিরণলেখা—কী দেখবার আছে সেখানে?

শুক্তি—রাজাবাহাদুর বললে, ফুটহিলের ক্যাম্প থেকে ট্রাকে করে জখম জওয়ানদের এয়ারপোর্টে আনছে আর প্লেনে তুলে দিচ্ছে।

কিরণলেখা—ওটা কি দেখবার মত একটা চমৎকার দৃশ্য?

শুক্তি—আমি ভাবছি, হঠাৎ যদি সুজিত বাবুকে দেখতে পাওয়া যায়।

কিরণলেখার কথাগুলি বেশ রুক্ষস্বরে বেজে ওঠে।—কী অদ্ভুত তোমার শখ। দেখে এসো তা হলে।

অদ্ভুত শখ নয়; জাগা চোখে স্বপ্ন দেখবার অদ্ভুত বাতিক। মিথ্যে বলে বুঝতে পেরেও দেখতে ইচ্ছে করে।

এয়ারপোর্টে গিয়েও কিছু দেখতে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। একটা ট্রাকেব ভিতর থেকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা তুলে সুজিত উঁকি দিয়ে তাকাবে, এটাও একটা মিথ্যে আশা। কেউ কাউকে দেখতে পাবে না, তবু এয়ারপোর্টের বাতাসে প্রতিধ্বনির মত একটা শব্দ বেজে উঠবে, আমি এসেছি; এমন চমৎকার একটা ম্যাজিক ব্যাপারও সম্ভব নয়। তবু সত্যিই যে একবার ঘুবে আসতে ইচ্ছে করে। কত খোঁজই তো মিথ্যে হয়ে গেল, না হয় এই শেষ খোঁজও মিথ্যে হয়ে যাবে।

শুক্তি বলে—আমি শুধু একটা চান্স নিচ্ছি, মা। জানি কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না, তবু যদি হঠাৎ...!

হেসে ফেলেন কিরণলেখা।—যাও, কিন্তু ফিরতে দেরি করো না।

২২

শুক্তি বলে—একটু আস্তে চলো রাজাবাহাদুর।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পিড মৃদু করে দেয় রাজাবাহাদুর। শুক্তি যদি না বলত, তবে রাজাবাহাদুর বোধ হয় সামনের ওই দুই মিলিটারি ট্রাকের পাশ কাটিয়ে সবেগে এগিয়ে চলে যেত।

তাঁবুর মত করে ছাউনি দিয়ে ঢাকা দুটো ট্রাক আস্তে আস্তে এয়ারপোর্টের দিকে চলে যাচ্ছে। পিছনে শুক্তির গাড়ি। দেখতে অসুবিধে নেই, বুঝতেও অসুবিধে নেই, কয়েকজন জখম সৈনিককে বয়ে নিয়ে চলেছে এই দুই ট্রাক। ট্রাকের ভিতরে আর্মি মেডিক্যালেব একজন অফিসার একটা কাঠের বাক্সের উপর চুপ করে বসে আছেন। দুটো স্ট্রেচারকে তো বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কম্বলে ঢাকা হয়ে এই স্ট্রেচারে শুয়ে আছে যে দুজন আহত, তাদের মুখের সামান্য একটু আবছা-চেহারা শুধু দেখা যায়।

নিঃস্পন্দ মূর্তি, নিষ্পলক চোখ, শুক্তির বুকটাও যেন সব নিঃশ্বাসকে নীরব করে দিয়ে ধরে রেখেছে।

সামনের ট্রাকের চাকা বড় বেশি ধুলো ওড়াতে শুরু করেছে। শুক্তির নিষ্পলক চোখ দুটো চমকে ওঠে।—একটু থামো, রাজাবাহাদুর।

গাড়ি থামে। ট্রাক দুটো বেশ দূরে চলে যায়। দেখতে পাওয়া যায়, ওদিক থেকে উড়ন্ত ধুলোর ভিতর দিয়ে একটা সাইকেল-রিক্সা সড়কের গর্ত মাড়িয়ে আর ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে এগিয়ে আসছে।

বড ভুল হত শুক্তিব, যদি এই সময ধুলোব ভযে রুমাল তুলে চোখমুখ ঢাকা দিত। দেখতেই পেত না যে, রিক্সাব উপবে এমন একটি মানুষ বসে আছে, যাব কথা আজও শুক্তিব একবাব মনে পড়েছে।

রিক্সাতে বসে আছেন আব হাসছেন সুজিতেব কাকিমা। তাঁব পাশে খুব বোগা দেখতে মাঝবযসী এক ভদ্রলোক লাল সুতিব চাদব গাযে জডিযে বসে আছেন।

এটা তো আব জাগা-চোখে দেখা একটা স্বপ্ন নয। এটা কল্পলোকেব একটা জাযগাও নয। গর্তে ভবা একটি সত্যিকাবেব সডকেব উপব দিযে তেজপুবেব সাইকেল রিক্সা লাফিযে লাফিযে আসছে। কিন্তু শুক্তিব চোখ দুটো যেন কল্পলোকেবই একটা বিস্ময দেখে ছটফট কবতে থাকে। আব বুঝতেও দেবি হয না, সুজিতেব কাকিমা কেন এত হাসছেন।

—এই রিক্সা থামো। শুনছেন? চিনতে পাবছেন? শুক্তিব ডাক শুনে রিক্সাব ভিতব থেকে একটা খুশি-উতলা মূর্তি ধবে নেমে আসেন সুজিতেব কাকিমা, প্রিযবালা। —ওমা? এ কী? সাহেবেব মেযে নাকি?

গাডি থেকে নামে শুক্তি—হ্যাঁ, আমি শুক্তি। আপনি কোথায গিযেছিলেন?

—গিযেছিলাম ওখানে, এযাবপোর্টে। বোজই তো যেতাম। তিনদিন হল তেজপুবে এসেছি।

—আপনি ওখানে কেন যেতেন?

—যাব না? না যেযে পাবি? কেউ যখন আমাব সুজিতেব কোনও খবব দিলে না, তখন বলাই বললে, চলো মামি, এযাবপোর্টে গিযে দেখি, শুনেছি ওখানে বাইফেলেব লোকজন আসছে আব চলে যাচ্ছে।

—বলাই কে?

—এই তো বলাই।

লাল সুতিব চাদব গাযে জডানো, বোগা ভদ্রলোক রিক্সা থেকে নেমে এসে বলেন—আমি রিফিউজি মানুষ। একটা রিক্সা খাটাই, এ ছাডা আব কোনও বোজগাব নেই। পঙ্গু স্ত্রী, বুডো মা, আব ।

প্রিযবালা—তেজপুবে বলাইযেব বাডিতেই আছি। আপনাদেব ডাক্তাববাবু এখন আছেন বঙ্গিযাতে। খুব অসুস্থ। আমিও বঙ্গিযা থেকেই এখানে এসেছি। এইবাব ফিবে যাব।

—সুজিতবাবুব খোঁজ পেযেছেন নিশ্চয?

—পেযেছি, পেযেছি। এই তো আজ এইমাত্র পেলাম। তাই তো ফিবে যাচ্ছি।

—কে দিল খবব।

বলাইবাবু বলেন—আজ এযাবপোর্টে লোখবাব একজন জমাদাবেব সঙ্গে হঠাৎ দেখা হযে গল। তাব কাছেই শুনলাম, সুজিত ফিবেছে, ভাল আছে, শুধু তিনটে দিন হাসপাতালে ছিল।

প্রিয়বালা মাথা নাডতে থাকেন।—বাবা বে বাবা, কি মিথ্যুক ছেলে এই সুজিত। ওব কাকাও কী ভযানক মিথ্যুক। আমাকে হেনতেন কত কী না বুঝিযে দিলে, বুমলা নাকি চাব দুযাবেব কাছে খুব ভাল একটা জাযগা। ও ছেলে যে যুদ্ধেব চাকবি নিযে সেই নেফা পাহাডে সবে পডবে, যে নেফাব পাথব ওব বাপকে মেবেছে, এ তো আমি স্বপ্নেও সন্দেহ কবিনি। কেঁদে কেঁদে আমাব চোখে ঘা হয়ে গিয়েছে। এই দেখুন আপনি, একবাব নিজেব চোখে দেখে নিন।

শুক্তি—যাক, যা হবাব হযে গেছে, এবাব নিশ্চিন্ত হযে বঙ্গিযা ফিবে যান।

প্রিয়বালা—হ্যাঁ, খুব নিশ্চিন্ত। দুঃস্বপ্ন গেল। হ্যাঁ, আপনাদেব খবব একটু বলুন। সাহেব কোথায় আছেন? আপনাব মা কোথায়?

শুক্তি—আমবা সবাই এখন তেজপুবে আছি।

প্রিয়বালা—কদমবাডি যাবেন কবে?

শুক্তি—ঠিক জানি না।

প্রিয়বালা—আমাদের আব কদমবাড়ি যাওয়া হবে না। ভাবলে বড় দুঃখ হয়।

শুক্তি—কদমবাড়ি আর যাবেন না কেন?

প্রিয়বালা—ওর ভাঙা শরীরে আর চাকরি পোষাবে না। ভাগ্যি ভাল যে, এককালে রঙ্গিয়াতে একটা কুঁড়েঘর তুলে রেখেছিল, এখন তাই একটা ঠাঁই হল।

শুক্তি—আচ্ছা, আপনি আসুন এখন।

প্রিয়বালা—আপনারা কোন পাড়াতে আছেন?

শুক্তি—রবার বাগানে; বাড়ির নাম ভারতী।

বলাইবাবু বলেন—হ্যাঁ, মহিমবাবুর বাড়ি; সে বাড়িকে কে না চেনে?

প্রিয়বালা—যাই বলুন, রঙ্গিযা বলুন আর তেজপুর বলুন, কদমবাড়িব মত সুন্দর কেউ নয়। কদমবাড়ির গাছের দুটো রাঙাজবাতে পুজোর থালা ভরে যায়। এক জ্বালের দুধে এই মোটা সর পড়ে। জল-বাতাসও কত মিষ্টি।

শুক্তি হাসে।—তবু তো কদমবাড়িকে ছেড়ে দিলেন।

প্রিয়বালা—ভাগ্য যদি ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে আর কী করবার আছে বলুন? আচ্ছা, চলি।

চলে গেল রিক্সা।

এইবার রাজাবাহাদুরকে গাড়ি ফেরাতে বললেই তো হয়। কত খুশি হযে হাসছে রাজাবাহাদুর। সুজিতের কাকিমার সব কথার সবই তো শুনতে পেয়েছে।

অনেকক্ষণ তো হল, তবু চুপ কবে দাঁড়িয়ে আছে শুক্তি। পথের লোক দেখলে সন্দেহ করবে, গাড়িটা বুঝি অচল হয়ে গিযেছে। কিন্তু রাজাবাহাদুব ঠিক সন্দেহ করবে, অচল হয়ে গিয়েছে দিদি।

রাজাবাহাদুর এখন যদি সত্যিই হঠাৎ একটা কবিত্ব করে বলে দেয়—আওন কী আওয়াজ তো মিল গিয়া, দিদি, এখন ফিরে চলুন; তবে? শুক্তি কি তবে না হেসে আর খুব গম্ভীর হয়ে বলতে পারবে, হ্যাঁ চলো।

কী আশ্চর্য, রাজাবাহাদুর সত্যিই যে গাড়িটাকে ফেরাতে শুরু করেছে। গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলে শুক্তি।—হ্যাঁ, ঠিক করেছ, বেশ করেছ, চলো।

ভারতীর একটি ঘরের ভিতরে বসে কিরণলেখাও হাসছেন। শুক্তি এসে পৌঁছতে আরও খুশি হয়ে হেসে উঠলেন কিরণলেখা।—জোরহাট থেকে তোর প্রণবকাকার চিঠি এসেছে, শুক্তি।

শুক্তি—বলতে পারি, কী লিখেছেন প্রণবকাকা। সুজিতবাবু ফিরে এসেছেন।

কিরণলেখা—কী করে বুঝলি?

শুক্তি—তোমার মুখের হাসি দেখেই বুঝেছি। তা ছাড়া পথেও একজনের মুখে হাসি দেখলাম।

কিরণলেখা—কে?

শুক্তি—ডাক্তারবাবুর স্ত্রী; সুজিতের কাকিমা।

কিরণলেখা—তাই নাকি? যাক, খুব ভাল হল, ডাক্তার-গিন্নি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবে।

শুক্তি হাসে।—আমাদের রাজাবাহাদুরও এইবার হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হবে।

কিরণলেখা—হবেই তো। সামান্য একটা খবর জানবার জন্যে ছুটোছুটি করে লোকটা এতদিন কী হয়রানই না হয়েছে।

হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে কিরণলেখারও মন। তা না হলে এখন শুক্তির মুখের দিকে ওরকম শান্ত আর স্নিগ্ধ দুটো মায়ার চোখ তুলে তিনি তাকিয়ে থাকতে আর হাসতে পারতেন না।

আর শুক্তি? কিরণলেখার চোখের সামনের কোচের উপর একটা ক্লান্ত শরীরের সব ভার অলস করে লুটিয়ে দিয়ে বসে আছে যে শুক্তি, সে শুক্তি সত্যিই একটা হাঁপ ছাড়ে। তারপর উঠে

দাঁড়ায়; আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়। আজ শুক্তি নিজেই যে সব চেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত একটা শ্রান্তি।

কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে আর মিররের সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলতে গিয়েই চমকে ওঠে শুক্তি; মনের কথা বলে ফেলে।—এ কী হল?

ছি ছি, চোখ দুটো জলে ভরে গেল কেন? বুকটা এমন করে ফুঁপিয়ে উঠল কেন? শুধু একটা কথাই বা বার বার মনে পড়ছে কেন?

খোঁপা বাঁধে শুক্তি। চোখ মুছতে হবে, তাই তোয়ালেটাকে হাতে তুলে নেয়। কিন্তু ভাবতে অদ্ভুত লাগে, কী আশ্চর্য, একথা তো কোনওদিন মনে হয়নি। কোনওদিন তো বুঝতেও পারা যায়নি।

তবে আর কী? কিছুই না। কিন্তু মা যেন সেই অদ্ভুত কথাটা আর জিজ্ঞেস না করেন যে, কাকে ভাল লাগে? ও কথার জবাব দেবে না, দিতে পারবে না শুক্তি। মা যেন শুধু জিজ্ঞেস করেন, কাকে ভাল মনে হয়।

তেজপুরের শীতের বিকেলের শেষ আলোতে দূরের ধুলোর চেহারা রঙিন গোধুলির মত হয়ে উঠল কিনা, সেটা আজ আর দেখতে চেষ্টা করে না শুক্তি। হাতে-ধরা বইটার উপর যেন ঘুম-ঘুম চোখের একটা ক্লান্ত দৃষ্টি গড়িয়ে দিয়ে সোফার উপর চুপ কবে বসে থাকে। হঠাৎ এক-একবার মনে পড়ে যায়, আর মনে পড়তেই হেসে ফেলে, দিবুদা মাঝে-মাঝে যে কবিতার বইটা খুব সুর করে পড়তেন, সে কবিতার শেষে একটা চমৎকার কথা ছিল—তামাম শোধ।

এই বিকালের ডাকে আরও কয়েকটা চিঠি এসেছে, সেগুলিও যেন এক-একটা নিশ্চিন্ততার চিঠি। কদমবাড়ি থেকে ম্যানেজার ব্যানার্জির অনেক চিঠি নিয়ে একজন লোক এসেছে। সেসব চিঠি এখনও পড়ে শেষ করতে পারেননি গগন বসু।

শৈলেশ্বরবাবুর চিঠি পেয়েছেন মহিমবাবু। সাতদিনের মধ্যেই তেজপুরে ফিরে আসছেন শৈলেশ্বরবাবু, কারণ তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি ফেলেছে কয়েকজন ভাড়াটিয়া। বাড়িভাড়া আদায়েব জন্য তিনি মামলা করতে চান।

ইনকাম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরীর চিঠিও পেয়েছেন মহিমবাবু। তিনিও আসছেন। কারণ তাঁর কাছে বিশেষ কয়েকজনের অ্যাসেসির জন্য বিশেষ দরকারের কথা বলতে সুশান্ত মজুমদার খুব শিগগিব তেজপুরে এসে পড়বেন।

কলকাতা থেকে সুমিত্রা সরকারের চিঠি পেয়েছেন কিরণলেখা—এবার স্পষ্ট করে একটা খবর দিন, কিরণ বউদি। আর দেরি করা কী ভাল দেখায়?

আরও যে দুটো চিঠি এসেছে, সে দুটো চিঠি দু'বার পড়ে নিয়ে হাসাহাসি করেছেন কিরণলেখা আর মণিমালা। নাসিক থেকে মীরার একটি চিঠি এসেছে। শান্তিপুর থেকে বাণীর একটি চিঠি।

কিরণলেখা—বাণী দেখছি এখনও শান্তিপুরেই আছে।

মণিমালা—মীরা যে গোলমালের সময় তেজপুর ছেড়ে একেবারে অতদূরে নাসিকে চলে গিয়েছে, এ খবর তো আমাকে কেউ দেয়নি।

কিরণলেখা হাসেন। —যাই হোক, বাণীর আর মীরার এসব কথার এখন তো আর কোনও মানে হয় না।

মণিমালা—না। শুক্তিকে তবে এখানেই ডাকি।

এখানে মানে ভারতীর বাইরের বারান্দার এইদিকে, যেখানে এরই মধ্যে একটি আলো জ্বলতে শুরু করেছে, কয়েকটি চেয়ার পড়ে আছে, আর এই চেয়ারে বসে এতক্ষণ কথা বলছিলেন কিরণলেখা আর মণিমালা। এদিকেরই বাইরের ঘরের ভিতরে একটি টেবিলের কাছে বসে চেক লিখছেন গগন বসু। ম্যানেজার ব্যানার্জি জানিয়েছেন, বাগান চালু করতে হলে এখন বেশ কিছু টাকার দরকার হবে।

মণিমালার ডাক শুনতে পেয়েই চলে আসে শুক্তি।—বাঃ, সন্ধ্যে ভাল করে না হতেই আলো জ্বেলে বসে আছ, মণিমাসি।

মণিমাসি—না রে মেয়ে; সে জন্যে নয়। অনেক চিঠি পড়তে হল। আলো না থাকলে চিঠির লেখা কী এই বয়সের চোখে আর পড়া যায়?

কিরণলেখা বলেন—কলকাতা থেকে তোর বড় পিসির চিঠি এসেছে শুক্তি। জানবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুমিত্রা, তুই কী বলতে চাস?

তড়বড় করে হেঁটে বেড়ায় না, ছটফটও করে না; বেশ শান্ত হয়ে এক-ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি। কিন্তু জবাব দিতে গিয়ে হেসে ফেলে। —আমি কিছু বলতে পারব না।

কিরণলেখা—একথার মানে?

শুক্তি—তোমরা ভেবে ঠিক করে নাও, কাকে বেশি ভাল মনে হয়।

কিরণলেখা—আমরা যদি বলি, শ্যামল?

শুক্তি—হ্যাঁ, তবে তাই।

মণিমাসি—আমি তো মনে করি, অনিমেষ ভাল।

শুক্তি হাসে—হ্যাঁ, তবে তাই ভাল।

কিরণলেখার চশমার দুই কাচ আশ্চর্য হয়ে চিকচিক করে।—তোমার নিজের কোনও পছন্দ-অপছন্দ থাকবে না, এটা কেমন কথা?

শুক্তি—এ কথা তুলে আর কোনও লাভ নেই, মা।

কিরণলেখা—তুমি সত্যি কথা বলছ?

শুক্তি—একটুও মিথ্যে বলছি না।

কিরণলেখা—তা হলে তোমার বাবাকে এই কথা বলি?

শুক্তি—বলো। কিন্তু বলে লাভ কী? বাবা তো বলেই রেখেছেন যে...।

কিরণলেখা—কী বলে রেখেছেন?

শুক্তি—বাবার মানুষ চিনতে খুব ভুল হয়। অনেক দেখেও মানুষ চিনতে পারেন না।

হঠাৎ মাথাটা ঝুঁকিয়ে হেঁট করে দিয়ে মুখ লুকোতে চেষ্টা করে শুক্তি। কারণ, বাইরের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন গগন বসু, আর বারান্দার শুক্তির মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছেন। গগন বসুর হাতের পাইপে ধোঁয়া নেই; তাঁর কপালের সেই গভীর তিনটে রেখা হঠাৎ যেন আরও গভীর হয়ে গিয়েছে। আবার ঘরের ভিতরে চলে গেলেন গগন বসু।

কিরণলেখা বলেন—শান্তিপুর থেকে বাণীও যে একটা অদ্ভুত চিঠি লিখেছে। পাইলট অফিসার পরিতোষের সঙ্গে তোমার তো কয়েকবার দেখা আর আলাপও হয়েছে।

শুক্তি—হ্যাঁ।

কিরণলেখা—তবে কি বলব যে, পরিতোষও ভাল?

শুক্তি—ভাল বইকি? খারাপ কেন হবে?

কিরণলেখা—তোমার আপত্তি নেই?

শুক্তি—না।

কিরণলেখার মনের এতক্ষণের দুঃসহ বিস্ময় এইবার যেন আর্তনাদ হয়ে বেজে উঠবে—মীরার মামার ছেলে রাজীবের কথাও তো মীরার কাছে তুমি শুনেছ।

শুক্তি—শুনেছি।

কিরণলেখা—রাজীবও নিশ্চয় খুব ভাল ছেলে।

শুক্তি—হ্যাঁ। শুনে তাই তো মনে হয়।

কিরণলেখা—তবে কি রাজীবের মা'র কাছে চিঠি দেব?

শুক্তি—দাও।

কিরণলেখা—আপত্তি নেই তোমার?

শুক্তি —না।

কিবণলেখা—তুমি কি পাগল হযে গেলে?

শুক্তি—বাগ কবো না, মা। কেউ চেনা, কেউ শোনা, এই মাত্র। তাব বেশি তো কিছু নয। কাকে কাব চেযে ছোট মনে কবব বলো? এবা সবাই সমান।

কিবণলেখা আব কোনও কথা বলেন না। কথা বলেন মণিমালা। —আমি বলি কিবণদি, শুনছেন কিবণদি?

কিবণলেখা—বলো।

মণিমালা—শুক্তিকে আব কিছু জিজ্ঞেস কবা উচিত নয। ববং আমবাই ভেবে দেখি ।

কিবণলেখা—হ্যাঁ, অগত্যা তাই। আচ্ছা, শুক্তি, তুমি এবাব যাও।

চলেই যাচ্ছিল শুক্তি। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁডাতে হল। চোখে পড়েছে শুক্তিব, গেটেব দিক থেকে হেঁটে আসছে বাজাবাহাদুব, আব পিছনে আবও দুজন। গেটেব বাইবে বাস্তাব উপব একটা বিক্সা দাঁডিযে আছে।

সে দুজন সোজা এগিযে এসে একবাবে বাবান্দাব উপবে উঠে দাঁডায। হেসে কথা বলেন কিবণলেখা।—এ কি? ডাক্তাবগিন্নি যে! এখন কোথায আছেন আপনি?

প্রিযবালা—আছি বঙ্গিযাতে।

কিবণলেখা—এই মেয়েটি কে?

প্রিযবালা—আমাব দূব সম্পর্কেব ভাগ্নে হয বলাই, তাবই বাডিতে এই মেযে এইতো মাত্র মাস দুই হল এসেছে। বলাইযেব এক জ্ঞাতিখুডোব মেযে। এ মেযেব বাপও নেই, মাও নেই।

কিবণলেখা—বসুন আপনি, তুমিও বসো।

প্রিযবালা—সাহেব ভাল আছেন?

কিবণলেখা—হ্যাঁ।

প্রিযবালা—কিন্তু আব বসব না। যাচ্ছি ইস্টিশানে। সন্ধ্যেব ট্রেনেই বঙ্গিযা ফিবে যাব।

এগিযে আসে শুক্তি।—ট্রেন ছাডবে কখন?

প্রিযবালা—এই তো, এই সন্ধ্যে ছটায।

শুক্তি—তবে তো এখনও সময আছে।

প্রিযবালা—তা সময একটু তো আছে, কিন্তু নেই বললেই চলে।

শুক্তি—আপনি আব মাত্র পাঁচটি মিনিট বসুন।

প্রিয়বালা হাসেন।—কেন? আপনাব ইচ্ছেটা কী?

শুক্তি হাসে।—না, আপনাকে কেক-বিস্কুট খাওযাব না, শুধু একটা জিনিস দেব।

প্রিয়বালা—জিনিস?

প্রিযবালাব কথাব কোনও জবাব না দিযে চলে যায শুক্তি। ফিবে এসে একটা চেযাবেব উপব শক্ত হযে বসে, হাসে, আব কাগজে মোডা একটা সোযেটাবকে কোলেব উপব বাখে, উলেব কাঁটা হাতে তুলে নেয।—আপনি একটু দেবি করুন। এমন কিছু সময লাগবে না। হাতটা পুবো হযেই গিযেছে। শুধু কাঁধেব সঙ্গে জুডে দেওযা, বাস। শুনছেন, সুজিতবাবুকে দেবেন এই সোযেটাব। ভুলে যাবেন না যেন।

প্রিযবালা হাসেন।—সোয়েটাব?

শুক্তি—হ্যাঁ। মালতী এসে যদি কখনও জিজ্ঞেস কবে, তবে বলে দিতে পাবব, সোযেটাব বোনা ফিনিশ কবেছি, একজন যুদ্ধেব মানুষকে ওটা দিযে দিযেছি, ফাঁকি দিইনি।

খুব ব্যস্ত শুক্তি। শুক্তিব হাতে উলেব কাঁটা যেন সময জয কববাব জন্য ছটফটিযে কাজ কবছে। পাকা ধানেব বঙ, নবম ফোবপ্লাই উলেব সোযেটাব শুক্তিব কোল থেকে হঠাৎ

এক-একবার পড়-পড় হয়ে ঝুলে পড়ে। তখুনি ব্যস্ত হাতে আবার কোলের উপরে টেনে তুলে নেয় শুক্তি।

কিরণলেখা আর মণিমালা, দুজনে শুধু নীরব হয়ে বসে আছেন আর দেখছেন। সুজিতের কাকিমা প্রিয়বালাও তাই একেবারে নীরব। তিনি শুধু সাহেবকে একবার দেখতে পেলেন, ঘরের ভিতরে সাহেব যেন ছটফট করে ঘুরছেন। মাথার কাপড়টাকে টেনে আরও বড় করে নামিয়ে দেন প্রিয়বালা।

—এই নিন, হয়ে গেছে। সোয়েটারটাকে প্রিয়বালার হাতে তুলে দেয় শুক্তি। বেশ জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে। তারপর, যাকে চোখে দেখতে পেয়েও এতক্ষণের এই ব্যস্ততার জন্য যার সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারেনি শুক্তি, তারই সঙ্গে কথা বলে—তুমি কে? তোমার নামটাও তো শুনতে পেলাম না।

মেয়েটি বলে—পূরবী।

বেশ দেখতে পূরবী। একটু রোগা রোগা বটে, কিন্তু বেশ নরম দুটো ঠোঁট। চোখেও বেশ জ্বলজ্বলে একটা হাসি। বয়স কত হবে? শুক্তির সমান না হোক, বড় জোর দু-তিন বছর ছোট। ঢাকাই তাঁতের শাড়িতে ছোট-ছোট রঙিন বুটি। গায়ে জড়ানো ধূপছায়া ছাপের একটা স্কার্ফ। খোঁপাটাও ঢিলে ছাঁদে বাঁধা হয়ে ঘাড়ের একদিকে তোলা।

প্রিয়বালা এইবার অদ্ভুত একটা তৃপ্তিভরা হাসি মুখে নিয়ে কথা বলেন—আপনাদের কাছে পূরবীকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাব বলেই তো এলাম। এ মেয়ে এখন আমার কাছে থাকবে। বুঝলেন তো, সুজিতের জন্যে এই মেয়েকে রঙ্গিয়া নিয়ে চললাম। ওখানেই বিয়ে হবে।

শুক্তি—তাই বলুন। এমন চমৎকার খবরটা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন কেন? আর তুমিই বা কেমন? ধরা পড়ে যাবার ভয়ে বুঝি চুপটি করে বসে আছ, কোনও কথা বলছ না?

কী যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারে না পূরবী? চোখ নামিযে আর মাথাটা ঝুঁকিযে দিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শুক্তির মুখের হাসিটা এইবার যেন খুশি ঝর্নার শব্দের মত উথলে ওঠে।—দেখছেন তো আপনার পূরবী সত্যিই যে বিয়ে হবার আগেই ধরা পড়ে গেল।

—দেখেছি। খুব খুশি হয়ে হেসে ফেললেন প্রিয়বালা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন।—এবং আমরা আসি।

প্রিয়বালা আর পূরবী দুজনেই কিরণলেখা আর মণিমালার দিকে হাত তুলে নমস্কার জানায়। আর, শুক্তির দিকে হাত তুলে নমস্কার জানাতে গিয়ে পূরবীর মুখটা হঠাৎ লাজুক হয়ে হাসি লুকোতে চেষ্টা করে।

পূরবীর কাছে এগিয়ে আসে শুক্তি; গলার স্বর একটু চেপে দিয়ে, দুই চোখ বড় করে, হেসে-হেসে আর ফিসফিস করে কথা বলে—খুব ভাল হল। ছুটির সময় দু'জনে মিলে একবার বেড়াতে বের হয়ে জিয়াভরলি নদীটা দেখে এসো। কী চমৎকার সেই জিয়াভরলি। দেখলে প্রাণ ভরে যাবে।

মীরার দুপুর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

এক

চশমা চোখে মীরাকে কত ছোট্টটি দেখায়। মনে হয় স্কুলে পড়ছে। অথচ যখন চশমা থাকে না, একদিন নয় বহুদিন, বহুবার, মীরার চোখের দিকে চোখ পড়তে হীরেনের মনে হয়েছে, স্কুলে-পড়া মেয়ে কি, অনেক অভিজ্ঞতায় গড়া, পুরো তেইশটি বসন্ত নির্বিঘ্নে অতিক্রম ক'রে আসা, অনেক অভিজ্ঞতায় তনু মন জড়ানো পূর্ণবয়বা চতুরা এক নারী।

আশ্চর্য, চশমা পরলে আর-দশটি মেয়েকে যেমন বেশ ভারিক্কি দেখায়, শিক্ষয়িত্রী মনে হয়, কারুর চেহারা নার্স কি ডাক্তারে রূপান্তরিত হয়, মীরার বেলায় তা হয় না। একেবারে অন্যরকম।

চোখের ওপর ওর বড়ো বেশি শান্ত গম্ভীর চোখে 'ক্রুক্‌স'-এর লেন্‌স দুটো ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে গাল দুটোর বয়স যেন দশ বছর ক'মে যায়, মনে হয় সারাক্ষণ ঐ গালে টোল প'ড়ে আছে, ঠোঁটের কিনারে এমন একটা হাসি লুকোনো আছে, যা এক্ষুনি অকারণে, বিনা দ্বিধায়, প্রচণ্ড আবেগে ফেটে পড়বে, আর ফেটে পড়া ডালিম-খোসার ফাঁক দিয়ে যেমন লাল ডালিম-দানা ঝিকিয়ে ওঠে, তেমনি ঠোঁটের আবরণ স'রে গিযে ওর মুক্তার মতো শাদা সুন্দর দাঁত ও রক্তাভ মাড়ির ঝলক উঠবে।

কি আবার এমনও মনে হয় বুঝি হাসিটা দপ্‌ ক'রে নিবিয়ে দিয়ে মীরা আঃ ক'রে উঠবে, একটা দাঁতে, ওর মুক্তার মতো ঝকঝকে দাঁতের গোড়ায় সাংঘাতিক ব্যথা, যন্ত্রণায় কথা কইতে পারছে না, গাল ফুলে গেছে, ঠাণ্ডা না লাগে ভেবে হীরেন ব্যস্ত হ'য়ে হাতের কাছে মাফ্‌লার খুঁজছে, 'এক্ষুনি জড়িয়ে রাখো, ভালো ক'রে গাল-গলা ঢেকে দাও।' হীরেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে মীবা অসহায়, বেদনাকাতর, দু-দিক ঈষৎ চাপা একটু সরু-হ'য়ে-আসা সুঠাম থুতনি ওপরের দিকে তুলে ধ'রে বলবে, 'দাও, তুমি জড়িয়ে না দিলে ফোলাটা ঠিকমতন ঢাকা পড়বে কি?'

হীবেন ভাবে। অবশ্য বিয়ের পর মীরার কোনোদিন দাঁতের যন্ত্রণা হয়েছে হীরেনেব মনে পড়ে না। চশমা-পরা মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, এই মুখে সেই অসহায়তা সেই কোমল নির্ভরতার মধুমর্মর জেগে আছে। পুরুষের কাছে নারীর সলজ্জ মৃদু প্রার্থনা। সেবার, স্নেহেব, অভিভাবকত্বের।

বিডন স্ট্রীটে বেথুন কলেজের কাছাকাছি ভট্চাজের ফটোর দোকানে তোলা ডিমের আকারে বাঁধোনো ফটো। সেকেন্ড-ইয়ারে পড়ার সময় মীরা তুলিয়েছিলো ওটা। তাই ও বলে।

হীরেন চশমা-পরা মীরাকে স্তব্ধ হ'য়ে দেখে। ছবি দেখা হ'য়ে গেলে সে ঘরের অন্যদিকের দেয়ালের কাছে দাঁড়াবে ব'লে একটু-একটু পায়চারি করতে থাকে। একটা নিশ্বাস ফেলে।

অবশ্য চশমা-ছাড়া মীরার ফটোর কাছে সে তখুনি গিয়ে দাঁড়ায় না। হীরেন ঘুরে যায়। এক-পা দু-পা ক'রে সে এগিয়ে যায় টেবিলের কাছে দুটো চাঁপাফুল রেখে গেছে মীরা একটা পেপারওয়েটের পাদমূলে। গ্লাসে গরম দুধ। প্লেটে নরম ক'রে ভাজা দু-খানা টোস্ট। গ্যাসট্রিকের ঘায়ে বিক্ষত অন্ত্রের প্রাতরাশ, হীরেন খাবে।

দুর্বল একটা নিশ্বাস ফেলে সে অন্যদিকের দেয়ালের কাছে স'রে গেল।

মীরার ফটোর দিকে চোখ পড়ার আগে বাঁ-দিকের দেয়ালে টাঙানো আয়নায় হীরেন নিজেকে দেখলো।

হাসপাতাল-প্রত্যাগত রুগীর প্রতিবিম্ব। ছোটো ক'রে ছাঁটা চুল, শুকনো গলা, অসম্ভব মোটা দেখাচ্ছে চশমার ফ্রেম দুটো। বুকের কাছে পিঠের দিকে পাঞ্জাবিটা বেমানান ঢিলে-ঢিলে। যেন অনাবশ্যক কাপড় সেখানটায়। এতটা কাপড় লাগে না হীরেনের জামায় মীরার বোঝা উচিত ছিলো, একটা নিশ্বাস ফেলে হীরেন মনে-মনে হাসলো না ঠিক, ভাবলো।

ট্রাউজার অবশ্য এমনি ঢিলে থাকে।

শাদায়-কালোয় ডোরা-কাটা ক্যালিকো। মীরা পছন্দ ক'রে কিনেছে। হীরেনের চেয়ে মীবার পছন্দ ভালো, এটা হীরেনও স্বীকার করে। তা ছাড়া অবশ্য এখানকার এই জামা-কাপড়ের কথা হচ্ছে না, এখন তো একরকম অচল হ'য়ে সে ঘরে বসা, যা-কিছু কেনাকাটার দরকার সব মীরা করছে। আগে, বিয়ের ঠিক এক মাস পর একদিন দু-জনে বাজারে বেরিয়ে দরজা ও জানলার পর্দার কাপড় কিনতে গিয়ে গজ-পিছু হীরেন প্রায় চার আনা ঠকতে বসেছিলো। সাহস ক'রে মীরা এক লাফে আট আনা কমিয়ে জিনিসটার দর করতে দোকানী হাসতে-হাসতে তা মীরার হাতে তুলে দেয়। লজ্জায় হীরেন দোকান থেকে বেরিয়েও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে নি, তারপর এক-সময় মীরাব কানে-কানে সে বলেছিলো, 'তুমি না থাকলে কী ভীষণ ঠকতে হ'তো আজ আমায়।' উত্তরে মীরা কিছু বলে নি। ট্র্যামের বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে ও চুপ ক'রে চেয়ে ছিলো। সেদিন, হীরেনের হুট্ ক'রে আজ আবার মনে পড়লো, মীরার চোখে চশমা ছিলো না। বিজয়নী, দুঃসাহসিনী। মীরার উন্মুক্ত ধারালো ভুরু চোখের পাতা, গাল ও নুয়ে-পড়া লম্বা ঘাড়ের রেখার দিকে তাকিয়ে হীরেন মনে-মনে বলেছিলো।

আয়নায় নিজেকে দেখতে-দেখতে হীরেন বুদ্ধিমতী মীরাকে দেখলো ঃ তার জামায়, কাপড়ে, কালো স্ট্র্যাপ পরানো বার্মিজ স্যান্ডেলে, হাতঘড়িতে। এই তো সেদিন, হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে হীরেন দেখলো তার রিস্টওয়াচ সুন্দর করে সারিয়ে এনে মীরা টেবিলে রেখে দিয়েছে। অসুখের আগে হাত থেকে প'ড়ে গিয়ে ডায়েলের কাচটা ভেঙে যায়। হীরেন সাহস পাচ্ছিলো না ষোলো টাকা খবচ করে ঘড়ির মুখে কাচ পরায়।

'আট টাকা নিলে। সামান্য ক-টা টাকার জন্যে ওটা অ্যাদ্দিন প'ড়ে ছিলো।' বলছিলো মীরা হাসতে-হাসতে হীরেনের কব্জিতে ঘড়ির নতুন ব্যাণ্ডটা পরিয়ে দেবার সময়।

'আমিও তো অচল হয়ে হাসপাতালে পড়েছিলাম। হীরেন বলছিলো।' না-হাসলেও মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা কবেছিলো সে। এবং অবাক স্তব্ধ চোখে মীরাকে দেখছিলো। নুয়ে ব্যাণ্ডের হুক্ আঁটছিলো ও, ঠিকমতো লাগছিলো না। 'আর-একটা ছিদ্র করা দরকার।' অস্ফুটে মীরা বললো। 'আলসাবে ভুগে কব্জি অসম্ভব সরু হ'য়ে গেছে তোমার।' শেষের কথাটা মীরা বলতে পারতো কিন্তু বলে নি। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নাসাবন্ধ্র স্ফুরিত ক'রে অপার সংযম ও দক্ষতাব সঙ্গে হীরেনের হাত থেকে বন্ধনী তুলে নিয়ে চামড়ার গায়ে পেরেক ঠুকতে ও ব্যস্ত। তখন হাতের কাছে আর-কিছু না পেয়ে পেপাবওয়েট দিয়ে পেরেকের মাথায় ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে আঘাত করছিলো। মীরার সুন্দর শরীর কাঁপছিলো, অন্যদিকের দেয়ালে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে হীরেন একটু পরে। সবে স্নান সেরে এসেছিলো মীরা, চোখে চশমা ছিলো না।

আজ আয়ানায় নিজের হাতঘড়ির ওপর একটু-সময় চোখ রেখে হীরেন সেদিনের নিশ্বাসটাব পুনরুক্তি করলো মাত্র।

তারপর আস্তে-আস্তে স'রে গেল সেই দেয়ালেব কাছে, যেখান থেকে উন্মুক্ত কৃপাণের মতো প্রখর ভ্রূযুগল, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ কালো চক্ষু ও বুদ্ধিমার্জিত পরিচ্ছন্ন একটি চিবুক নিয়ে মীরা ঘরের মেঝের দিকে হীরেনের টেবিলের দিকে, খাটের দিকে, কোনার টিপয়ের দিকে, উত্তর দিকের স্যুটকেস দুটোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। একসঙ্গে এতগুলো দেখা অদ্ভুত ক্ষমতা।

সেইজন্যেই হীরেন, হ্যাঁ, তার স্ত্রীর চোখের দিকে তাকাতে ভয় পায়।

চশমা না থাকলে মীরার চোখকে আর কারুর চোখ বলে মনে হয়, বেশ লক্ষ্য করে সে। বলতে কি, তখন হীরেন থেকে মীরা যেন বেশ দূরে সরে যায়। একরকম তার নাগালের বাইরে।

অসামান্য ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, ক্ষমতা, চাতুর্য, আর হ্যাঁ, রূপ নিয়ে এক নারী।

মীরা নয়।

মীরার এমন চোখ-ঝলসানো রূপ নেই, এত বুদ্ধি থাকবার কথা নয়, একলা বেরিয়ে এমন অদ্ভুত ভালোভাবে ও বাজার করতেও যে জানে হীরেন জানতো না। এখন জানছে, দেখছে।

ভাবতে-ভাবতে হীরেন হঠাৎ কেমন দমে যায়। যেন কে তাকে প্রশ্ন ক'রে, মীরাকে তুমি কদ্দিন জানো, কতটুকু দেখেছিলে ওর।

ঘাড় হেঁট ক'রে হীরেন একলা ঘরে পায়চারি করে। কদ্দিন, কতটুকু।

আর সবচেয়ে বেশি সে অবাক হয়, যখন ভাবে, বিয়ের আগে একদিন একটু-সময়ের জন্যেও কি চশমা-চোখে নেই অবস্থায় মীরাকে সে দেখলো না।

পাঞ্জাবির পকেটের মধ্যে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে যায় হীরেনের। পায়চারি থেমে যায়।

মুখ তুলে ফের সে ফটোর দিকে তাকায়। সেদিন তোলা হয়েছে ওটা। হীরেনের অসুখের অল্প কিছুদিন আগে। ধর্মতলার বিখ্যাত ও. কে. স্টুডিওর কাজ।

আশ্চর্য, কেন যে হীরেনেরই সেদিন শখ হয়েছিলো চশমা ছেড়ে মীরা ফটো তুলুক এবার। চশমা-পরা, মানে বিয়ের আগের তোলা ছবি তো রয়েছেই।

ছবি দেখতে-দেখতে হীরেনের ঘাড় আবার মেঝের দিকে নুয়ে পড়ে।

কুমারী মেয়ে নয়, স্ত্রী মীরা। পায়চারি করতে-করতে ভাবে সে, কুমারী থাকতে হীরেনের কাছে যে অনেক ফুল, একটা পার্কার পেন, সিল্কের গুটিকতক ব্লাউজ-পিস উপহার পেয়েছিলো এবং সুযোগমতো চুম্বন, সেই মীরা, চশমা চোখে ওই দেয়ালে মিটিমিটি হাসছে।

এই দেয়ালের মীরাকে রেশন আনতে যেতে হচ্ছে। তার স্বামীর পেটে সম্প্রতি একটা বড়োরকমের অপারেশন হয়েছে। দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুন চাকরি নেই এবং আরও কতকাল ঘরে প'ঙ্গু হ'য়ে বসে থাকবে তার স্থিরতা নেই। সম্প্রতি মীরা উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়েছে।

হীরেন ভাবলো, ওপরের পাটির দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধ'রে ভাবলো আর পায়চারি করলো।

বিয়ের আগের মীরার সঙ্গে বিবাহিতা মীরার মিল থাকতে পারে না। কিন্তু সেই অমিল যে এত বেশি হীরেন জানতো না।

বিয়ের পর থেকেই চশমাটা ও একটু-একটু সময়ের জন্যে খুলে রাখতো, তারপর কয়েক দিনের জন্যে ক-দিন সমানেও মীরার চোখে চশমা দেখা যেতো না।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে হীরেন একেবারেই তা দেখলো না।

অবশ্য হীরেনের জিজ্ঞেস করা হয় নি কি ওর চোখের পাওয়ার বেড়েছে, না মাইয়োপিয়ার দোষ সেন্টপার্সেন্ট সেরে গেছে।

ব্যস্ত মীরাকে রুগী ও সংসারের কাজে সারাক্ষণ এত বেশি ব্যস্ত দেখে হীরেন যেন সাহসই পাচ্ছে না জিজ্ঞেস করতে।

শুধু সে দেখলো চশমা ছাড়া মীরার চোখ অনেক বেশি সুন্দর, সংসারের কাজে ওর আশ্চর্য দক্ষতা। এদিকে হীরেনের সেবা-শুশ্রুষা থেকে আরম্ভ ক'রে ডাক্তার ডাকা ওষুধপথ্যের যোগাড় একলা মীরাই করছে। করছে সব ঘড়ির কাঁটার মতো নির্ভুল নিয়মে।

চশমা-পরা কুমারী চোখের দিকে তাকিয়ে হীরেন একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললো। কেন, জানি, অপারেশন-থিয়েটারে উঠবার আগের দিন বিকেলে হাসপাতালের বেড-এ শুয়ে একটা রক্তাভ জানলার দিকে চোখ রেখে যতবার সে মীরার কথা ভেবেছিলো ততবার ওর ঐ ছবিটাই মনে পড়ছিলো।

সেই মীরা এই মীরা?

টুক্ টুক্ টুক্...

'কে?'

'আমি, আমি বুলা।'

অন্যমনস্কতার দরুন প্রথমটায় কেমন একটু চমকে ওঠে হীরেন, তারপর মুখের ভাব স্বাভাবিক ক'রে দরজার ছিট্‌কিনি খুলে দেয়। হাওয়ায় পর্দাটা ফুলে এসে হীরেনের গায়ে ঠেকে, দরজার একপাশে সে স'রে দাঁড়ায়, পর্দা ঠেলে ভিতরে এসে ঢোকে বাইশ তেইশ বছর বয়সের একটি মেয়ে। হীরেনের খুড়তুতো বোন।

বুলার পরনে লাল-হলুদ ছোপ দেওয়া পাতলা বোম্বাই। কম দামী কাপড়, দেখলেই বোঝা যায়। সাধারণ ছিটের ব্লাউজ। পায়ে সস্তা কানপুরী চটি।

'চুপ করে রইলি যে?' হীরেন কথা বললো আগে—' বোস।'

'না, বসবো না।' বুলা হাতের ব্যাগটা হীরেনের খাটের একপাশে রাখলো। মুক্ত হাত দুটো একবার খোঁপার গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ঘরের ভিতরের চারদিক।

'বউদি কাজের মানুষ।' বুলা বললো।

'ওই ব'লে-ব'লেই তো তোরা ওর দর বাড়িয়ে দিলি।' হীরেন গম্ভীর।

'কি রকম?' বুলা হাসলো।

'এখন আর এক মিনিট সময় নেই ওর স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার, দুটো কথা বলবার।'

বুলা চুপ।

'কি মিথ্যে বলছি?' হীরেন হাসলো। হাসির ফাঁক দিয়ে চোরা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরুলো যদিও। 'একলা ঘরে বসে থেকে হাঁপিয়ে উঠলাম রে বুলা।'

'তা করবে কি।' বুলা অস্ফুটে বললো। হীরেনের চোরা নিশ্বাস ও টের পায়। কিন্তু বুঝতে না দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মীরার সাজানো টেবিল, গোছানো আলনা, একদিকের দেয়াল ঠেকিয়ে কাঠের চৌপায়ার ওপর মনোরম ভঙ্গিতে রাখা চামড়ার স্যুটকেস দুটো এবং অন্যদিকের দেয়ালের কাছে ছোট্ট একটা টিপয়, টিপয়ের ওপর মীরার হাতের বোনা ধবধবে সুন্দর ঢাকনা ও তার ওপর কাচের গ্লাসে জল দিয়ে জিইয়ে রাখা একমুঠো রজনীগন্ধা দেখতে-দেখতে বুলা উচ্ছ্বাসিত হ'য়ে উঠলো। 'সত্যি বউদি শুধু ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী পায় নি, ঘর গোছানোর ডিপ্লোমাও আছে ওর।'

'নিশ্চয়।' হীরেন যোগ করলো, 'সেই সঙ্গে বাজার করার, রুগীর সেবাযত্ন করার, টাকাপয়সার ব্যবস্থা করার লন্ড্রি ও ইলেকট্রিকের বিলগুলো যত্ন ক'রে তুলে রাখার ঝি ঝাড়ুদার দুধওয়ালীর হিসেব রাখার,—কোন্‌টার জন্যে ডিপ্লোমা মীরা পায় নি, তুই বলতে পারিস বুলা?'

যেন একসঙ্গে অনেকগুলো কথা ক'য়ে হীরেন হাঁপাতে লাগলো, হাসতে লাগলো।

বুলা হীরেনের চোখে-চোখে তাকায়।

'ঈর্ষা করছো নাকি সেজন্য বউকে? খাটের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসলো বুলা। 'বউদি গেছে কোথায়?'

হীরেন এবার চট্‌ ক'রে জবাব দিলে না। আড়চোখে কব্জির ঘড়ি দেখলো এবং নিজের মনে বিড়বিড় করলো, ন-টা দশ, ইতিমধ্যে ওর ফিরে আসা উচিত ছিলো।'

'কোথায় গেছে?' বুলা প্রশ্ন করলো।

'মিস্টার লাহিড়ির কাছে, তপেশ লাহিড়ি, বলি নি তোকে?' বুলার চোখে-চোখে তাকালো হীরেন।

ঘাড় নাড়লো বুলা।

'কিন্তু টালিগঞ্জ থেকে এতক্ষণ ফিরে আসা উচিত।' হীরেন আস্তে-আস্তে যেন আবার নিজের মনে কথা বললো, 'অবশ্য মিস্টার লাহিড়ি যদি খামোকা না ধ'রে রাখে।

'কাজটা হয়ে যাচ্ছে আশা করা যায়, কি বলো?'

'হ্যাঁ, হয়ে তো যাবেই, না হলে...হীরেন ঢোক-গিলে চুপ করে রইলো।

'খুব বড়ো ফার্ম বুঝি তপেশ লাহিড়ির?' বুলা প্রশ্ন করলো।

'জানি না, আমি কিছুই জানি না লাহিড়ি কি তার ফার্ম সম্পর্কে, বলেছি তো।' মুখভার গুরুগম্ভীর হীরেনের। 'ওর, মানে মীরার মামাবাবুর বন্ধু, তাঁর চিঠি নিয়ে দেখা করতে গেছে।'

বুলা আর প্রশ্ন করলো না।

একটুক্ষণ চুপ থেকে দেয়াল থেকে দেয়ালে চোখ বুললো। তাকালো পাশের জানলার দিকে। বর্ষার পরিপুষ্ট সবুজ সুঠাম দেবদারুচারা রৌদ্রে ঝলমল করছে। লাল ডগডগে একটা ফড়িং ঘুরপাক খাচ্ছে অবিশ্রাম জানলা ও গাছের মধ্যবর্তী শূন্যে।

'তারপর তোর খবর কি?' হীরেন প্রশ্ন করলো, 'আজ স্কুল ছুটি?'

বুলা ঘাড় নাড়লো। জানলার দিক থেকে চোখ সরিয়ে হীরেনের দিকে তাকালো।

'চমৎকার ঘর হয়েছে তোমার, প্রখর আলো হাওয়া খেলে।' যেন এতক্ষণ ও ঘরের কথাই চিন্তা করছিলো। 'কত ভাড়া বলছিলে সেদিন?'

'পঁয়তাল্লিশ।'

'রান্নাঘর তো ওপরেই রয়েছে, বাথরুম-পায়খানা।' বুলা বিড়বিড় ক'রে উঠলো, 'তা পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়া ঘর হিসেবে সস্তা, পাড়াটাও পরিচ্ছন্ন, বেশ ছিমছাম। উঃ, কী ঘরেই না ছিলে আগে তোমরা!'

অল্প হেসে হীরেন ঘাড় নাড়লো। 'তোর বউদি তো সেজন্যই খোঁচা দেয় আমায় উঠতে-বসতে। খারাপ ঘরে থেকে-থেকে আমার অসুখের সৃষ্টি।'

'মিথ্যে কি।' বুলা হীরেনের দিকে তাকালো না। 'এই ঘরও তো তুমি পেয়ে গেছো বউদির দৌলতে, তাই না? বলছিলে ওর এক পিসেমশাই যোগাড় ক'রে দিয়েছেন?' একটা বালিশের ওপর বুলা নখের আঁচড় কাটাতে লাগলো।

হীরেন বুলার চোখের ভিতর তাকাতে চেষ্টা করলো। 'না-হ'লে আজও আমায় পটলডাঙায় পায়রা-খুপ্‌রিতে পচতে হ'তো। হাসপাতাল থেকে বেরুবো শুনে রাতারাতি ঘর যোগাড় করে ফেললো মীরা।'

'একেবারে অন্যরকম জীবন আরম্ভ হ'লো তোমার, নতুন ঘর, বউদি চাকরি করবে।' বুলা খাট ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগালো। হীরেন চুপ।

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে বুলা ঘাড়-তুলে মীরার ফটো দেখছিলো।

'কিন্তু এমন ভালো ঘরেও আমার ভালো লাগছে না বুলা।'

'কেন?' অন্যমনস্কতার দরুন বুলা একটু চমকে ওঠে। মীরার ফটো দেখা শেষ না ক'রেই ও হীরেনের সামনে এসে দাঁড়ায়। 'অসুস্থ তুমি, একলা-একলা তাই—'

'ঠিক তা-ও না।'

তবে?'

'ওদিকের সব ক-টা জানলা বন্ধ তুই দেখতে পাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।' টিপয়ের দিকের দেয়ালের সবগুলো জানলা বন্ধ, এখন লক্ষ্য করলো বুলা। 'দুর্গন্ধ আসে?'

'ওরে বাপ্‌!' হীরেন ভুরু পাকালো। 'আর্টিস্টের সুরভি নিশ্বাস।' কথার শেষে হীরেন হাসলো।

বুঝলো বুলা। উলটো দিকের ফ্ল্যাটে এক তরুণ আর্টিস্ট আছেন। মীরা বলেছিলো বুলাকে। 'সারাক্ষণ ঘরে থাকেন বুঝি?'

'হুঁ, ছবি আঁকেন। ফাঁক পেলেই বারান্দায় এসে দাঁড়ান আর চেয়ে থাকেন আমার ঘরের দিকে।'

'ভালোই তো।' হীরেনের ভ্রূভঙ্গি ও আঙুল নাড়া দেখে বুলা হাসলো। 'আর্টিস্টের চোখে ভালো লেগেছে তোমার ঘর।'

'তাই। হীরেন মাথা নাড়লো। 'তিনি বলেন, মিসেস চক্রবর্তীর মতো সুন্দর বডি নেই কারুর এ-অঞ্চলে।'

বুলা মেঝের দিকে তাকালো।

'আর্টিস্ট বলেন, মেয়েদের শাড়ি-ব্লাউজের ফ্যাশন বদলাচ্ছে যেমন রোজ তেমনি ওদের রূপেরও ফ্যাশন অহরহ বদলাচ্ছে। কাল যে-মেয়ে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ছিলো, আজকের পুরুষের রুচির কাছে সে ব্যাকডেটেড।' হীরেন টেনে-টেনে হাসে। 'আর্টিস্ট বলেন, যেমন এককালে নাক চোখ নিয়ে মারামারি ছিলো, এককালে শরীরের রং নিয়ে দহরম মহরম চলতো, সে-যুগ এখন বাসী। এখন পুরুষের চোখ খুঁজছে মেয়েদের শরীর, সুন্দর শরীরের মেয়ে।'

'মীরা—' বুলা কথা বলতে যাচ্ছিলো, হীরেন বাধা দিলে ঃ 'আমায় শেষ করতে দে। আর্টিস্ট বলছে, চিবুক থেকে কাঁধের দূরত্ব থাকবে এতটা, কাঁধ থেকে কোমরের দৈর্ঘ্য হবে অত ফুট—আর, সবচেয়ে দরকার যা, কোমর থেকে পায়েব গোড়ালির দৈর্ঘ্য হবে এতখানি, এক ইঞ্চির এদিক-সেদিকে মেয়েদের সেকেলে হবার আশঙ্কা, থাক না তিন ফুলের মতো নাক, রামধনুছাঁদ ভুরু। মিসেস চক্রবর্তী লেটেস্ট মডেলের মেয়ে।'

বুলা হীরেনের মুখেব দিকে তাকায়। দাদার চেহারা বদলে গেছে।

'অ্যাস্থেটিক কালচার এখন হাড় ও মাংস জরিপে এসে ঠেকেছে, বুঝলি।' হীরেন অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

'জানলা দুটো বন্ধ রেখে ভালো করেছো তুমি।' নখ খুঁটতে-খুঁটতে বুলা বললো।

'কিন্তু রাখলে হবে কি। স্কাউন্ড্রেলটা নিচে গিয়ে দাঁড়াবে, মীরা কখন বাড়িতে ঢোকে, বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, ওর দাঁড়িয়ে দেখা চাই-ই।'

'আশ্চর্য নিলর্জ্জ।' বুলা বিড়বিড় ক'রে উঠলো।

হীরেন উঠে হাত দুটো পিছনে রেখে ঘরের মেঝেয় পায়চারি করতে লাগলো। পায়চারি করাব সময় একবার এই-দেয়ালের মীরার ফটো একবাব ঐ-দেয়ালের মীরার ফটো দেখতে লাগলো।

'তোমার দুধ ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ খাবো।' হীরেন মুখ ফেরালো। 'তুই চললি?'

হাতে ব্যাগ নিয়ে বুলা টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়।

'তুমি খেয়ে নাও এইবেলা, আমি চললাম, একটু কাজে এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম মীরা বউদির চাকরি হ'লো কি না খবরটা নিয়ে যাই।'

'হবে, হ'য়ে যাবে নিশ্চয়। না-হ'লে চলবেই বা কি ক'রে।' হীরেন চৌকাঠের দিকে তাকালো, বুলা চৌকাঠের বাইরে।

'কিন্তু হ'য়ে যাওয়াটাই তো সব কথা নয়।' হীরেন বুলার মুখের দিকে তাকিয়ে গলার একটা শব্দ করলো। 'তা আসবি, সময়-সময় এসে আমার সঙ্গে দুটো গল্প করবি, বুঝলি মনটা ভালো থাকে।'

হীরেনের চোখে কাতরতা।

ঘাড় বেঁকিয়ে বুলা বললো, 'আসবো।' সিঁড়ি বেয়ে ও নিচে নেমে গেল।

পটলডাঙায় হীরেনের প্রতিবেশী ছিলেন বুলার বাবা। হীরেনের দূরসম্পর্কীয় কাকা। একটা অফিসে কেরানী ছিলেন, সম্প্রতি ক্যানসারে মারা গেছেনে। এক-দঙ্গল ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন তিনি বিধবার জন্যে।

বুলা সকলের বড়ো সন্তান। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে মাস্টারি করছে। তার আয়ের ওপর গোটা পরিবার দাঁড়িয়ে।

হীরেন পায়চারি করতে-করতে বুলার কথা ভাবলো। এখনো বিয়ে হয় নি, কারণ অনেক চেষ্টা করেও ও আজ পর্যন্ত ভালো একটা চাকরি যোগাড় করতে পারছে না যে অন্তত কিছুদিন চলে, এমন ক-টা টাকা মার হাতে তুলে দিয়ে ও বিয়ে করে।

বিয়ের পর মা-ভাইবোনকে টাকা দেওয়া না-দেওয়া ভবিষ্যৎ পুরুষের ওপর নির্ভর করে।

একদিন বলছিলো ও গল্পচ্ছলে হীরেনের কাছে, 'অবশ্য দরকার হ'লে কি স্বামীর জন্যে মেয়েরা চাকরি করে না, করছে, কিন্তু, আমার কাছে কেন জানি হারেমই ভালো, হারেমবিলাসিনীরা সুখী।' বলতে-বলতে ওর চোখ চকচকে হ'য়ে গিয়েছিলো সেদিন, হীরেনের মনে আছে। 'আমি চাই, আমি চাইছি সারাক্ষণ একটি পুরুষ আমায় ধ'রে রাখুক, আমাকে দেখুক, আর প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি সামগ্রী আমার চারদিকে এনে জড়ো করুক। হারেম ছেড়ে কোনোদিন আমায় যেন বাইরে গিয়ে না-দাঁড়াতে হয়। বাইরের পৃথিবী কঠিন, বড়ো কঠিন হিরুদা।—ব'লে বুলা হাই তুলেছিলো। যেন একটু সময়ের জন্য ওর ঘুম পেয়েছিলো। ঐ একদিন, একবার। মেঘ থমথমে শ্রাবণ দুপুর। শনিবারের স্কুল সেরে বাড়ি ফেরার পথে হীরেনের ঘরে ঢুকে গল্প করছিলো বুলা।

কথাটা ভাবতে হীরেনের পায়চারি থেমে গেল হঠাৎ। থমকে দাঁড়ালো সে। সেদিন বুলা যখন গল্প করছিলো পাশে দাঁড়িয়ে মীরা শুনছিলো না? হীরেনের পরিস্কার মনে আছে। বিয়ের অল্প ক-দিন পরের ঘটনা, মীরা ছিলো ঘরে। কিন্তু আজ হীরেনের মনে পড়ছে না হারেমবিলাসিনীর স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখের দিকে তাকিয়ে মীরার চোখে কি রং ধরেছিলো, কি ভাবাবেগ।

মীরা কাজে ব্যস্ত ছিলো, জলখাবার করতে, চায়ের সরঞ্জাম সাজাতে, ঘর গোছাতে।

বুলার দিকে তাকাতে বুলার কথা শুনে এক ঝলক দীর্ঘশ্বাস ফেলতে সময় ছিলো না মীরার।

কাজ, কাজ...

বিয়ের পর থেকেই লক্ষ্য করছে হীরেন, কাজের আবরণ প'রে নিজেকে ঢেকে রাখতেই যেন মীরা পছন্দ করছে বেশি।

যাদের কাজ নেই তারা কাচের মতো ঠুন্‌কো ওর চোখে। এক-এক সময় মীরার ভাব দেখে তা-ই মনে হয়। বুলার অলস গান, বিয়ের পর শুধু স্বামীর অঙ্কশায়িনী হ'য়ে থাকার কল্পনা মীরাব মনে স্বপ্নজাল তৈরি কবছিলো না, হীরেন এ-সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ।

তখন ছিলো শুধু ঘরের কাঁজ।

পেট কাটিয়ে হীরেন হাসপাতাল থেকে পঙ্গু হ'য়ে ফিরে এসেছে পর মীরার কাজের সীমানা কেবল ঘর নয়, ঘরের বাইরে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথায় কোন্ পিসেমশাইকে ধ'রে বাড়ি ঠিক করা, মামামশাইর চিঠি নিয়ে টালিগঞ্জবাসী ধনাঢ্য তপেশ লাহিড়িকে ধরা চাকরির জন্যে। তা ছাড়াও হীরেনের হাসপাতালে থাকাকালীন সংসারের যাবতীয় খরচ, দুধের দাম, ফলের দাম, পটলডাঙায় বাড়ির দু-মাসের বাকি ভাড়া একসঙ্গে মিটিয়ে রাতারাতি নতুন পাড়ায় এমন সুন্দর এক বাড়িতে কি করে মীরা উঠে এলো, উঠে আসতে পারলো এই দুর্দিনে, হীরেন ভাবে।

প্রশ্ন করা বৃথা, বোঝে হীরেন। কেননা, তার উত্তর একরকম।

হাসপাতালে যাবার আগে থেকেই সে একটু-একটু শুনছিলো। একটি কথা এ-মাসে, ও-মাসে দুটো। 'আরো পঞ্চাশ টাকা দাদার কাছে ধার করতে হলো। তোমার মাইনের টাকায় ঠিক সতেরো দিন গেছে। এখনো তেরো দিন—কয়লা, তেল, চিনি, নুন কিছুই নেই ঘরে।'

'আগামী মাসে শোধ করে ফেলবো।' হীরেন বেশ জোর দিয়ে বলেছিলো। 'অন্তত বাড়িভাড়া বাকি রেখেও।'

মীরা কথা বলে নি।

পরের মাসে, দশ দিন পার হ'তেই হীরেনের বেদনা শুরু। ডাক্তার, ওষুধ, ইনজেকশন এবং পথ্য বাবদ রাজকীয় খরচের সমারোহ।

হীরেনের মাইনে তো বটেই, এক-শ' পঞ্চাশ টাকা দাদার এবং মীরার বিয়ের একটা আংটি। অবশ্য মীরার দাদা অঞ্জন মুখার্জি যে বড়োলোক তা নয়, বিয়েতে মীরাকে অনেক সোনাদানা দেওয়া হয়েছিলো তাও নয়, ভদ্রলোক আলিপুর কোর্টের উকিল। মোটামুটিরকম পসার। পঁয়ত্রিশে পা দিয়েছেন। কিন্তু বয়স ও আয়ের অনুপাতে সংসারের চাপটা একটু বেশি ব'লে এদিকে অনেকটা দ'মে গেছেন। না-হ'লে খেলাধুলো গান-বাজনা, ক্লাব-মিটিং ক'রে কাটাতেন ভদ্রলোক।

বাবার পলিসির হাজার পনেরো টাকা হাতে এসেছিলো তাই অঞ্জনবাবু বড়ো দুটো বোনকে পার করতে পারলেন। ইরা গেছে অ্যাডভোকেটের কাছে, মীরার বিয়ে হ'লো অধ্যাপকের সঙ্গে। হীরেন চক্রবর্তী। ইউনিভার্সিটির কৃতী ছেলে তো বটেই, সাহিত্যে, সংগীতে প্রবল অনুরাগ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। উদাবচরিত্র ও প্রাণবন্ত। মীরার ইচ্ছাক্রমেই মীরার এই বিবাহ। হীরেনকে দেখে প্রথম দিনই অঞ্জনবাবুর ভালো লেগেছিলো।

মীরার প্রখর দৃষ্টি বা বুদ্ধি ইরাতে ছিলো না। বন্ধুবান্ধব এবং নিজের চেষ্টায় অঞ্জনবাবু অ্যাডভোকেট পাত্রটি সংগ্রহ করেছিলেন। ভূপেশ নাগ। ভালো মানুষ। হীরেনের অমিত বুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি না রাখলেও ঈশ্বর ভূপেশকে সুখী করার মতন, সুখে থাকার মতন অবলম্বন দিয়েছিলেন। তার পরলোকগত পিতা বেলেঘাটায় ছোট্ট একটা গেঞ্জির ফ্যাক্টারি রেখে গেছেন।

নামেমাত্র প্র্যাক্‌টিস, তা ছাড়া সবটা শক্তি মনোযোগ ও উদ্যম মোজা-গেঞ্জিতে ঢেলে দিয়ে ভূপেশ উত্তরোত্তব ভালোই করছিলো। কয়েক কাঠা জমি কিনেছে হালে, বাড়ি করছে, নিজে বেশ মোটা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে স্ত্রী ইরাও। চার বছরে তিনটি বাচ্চা হয়েছে ওদের। সময় ও কালের বিচাবে ভূপেশ ও ইরা সুখী। অবশ্য হীরেন ও মীরার বেলায় আর্থিক অসচ্ছলতা নিয়ে অঞ্জনবাবু খুব যে একটা মাথা ঘামান তা নয়। কেননা, তাঁর মোটামুটি যা ধারণা, দু-জনই ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল জীব। অর্থকে তাবা প্রকাণ্ড কবে দেখতে পারে, আবাব অর্থ ধুলোর মতো পা দিয়ে মাড়াতে পারে। যা তিনি শোনেন বার-লাইব্রেরির আড্ডায় বসে।

এ-বিষয়ে জুনিয়র সিনিয়র একমত।

এক সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী দু-জনেরই উচ্চশিক্ষা ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধ থাকলে সেই দাম্পত্যজীবনের সুখ-অসুখকে সাধারণের সুখ-অসুখেব পর্যায়ে ফেলে বিচারে করা চলে না। কেননা, এটা পরিষ্কার দেখা গেছে, অনেক সময় টাকা দিয়েও মানুষের রুচি ও সংস্কৃতির ভোল ফেরানো যায় না। প্রচুর টাকা পেলেই যে হীরেন চক্রবর্তী সকাল-সন্ধ্যা রবীন্দ্রনাথ এলিঅট পড়া কি তাঁদেরই কারোর ওপর প্রবন্ধ লেখা বন্ধ রাখবে আর হীরেনের পাশে বসে মীরা বেহালায় ছড় টানা কি নতুন কোনো গৎ-এব সন্ধানে রোজ বিলিতি জার্নাল হাতড়ানো স্থগিত রেখে শাড়ি-গয়নার দোকানে ছুটবে সে একটা কথা নয়, বা টাকা নেই বলে নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি কি রুচির ওপর অভিমান ক'রে দু-জনে গালে হাত দিয়ে ব'সে পৃথিবী অন্ধকার দেখবে, অঞ্জনবাবু তা বিশ্বাস করেন না। চিরকাল মীরাকে দেখে এবং এই মীরার মুখেই অনর্গল হীরেনের গল্প শুনে-শুনে অঞ্জনবাবুর তাই ধারণা হয়েছিলো।

তা ছাড়া হীরেন তো একটা কলেজে চাকরি করছেই। এবং মীরা,—ইরা হলে অঞ্জনবাবু বেশ একটু নার্ভাস হ'য়ে পড়তেন, মীরা অনেক বেশি শক্ত ধাতের মেয়ে, ধৈর্যশীলা, বুদ্ধি সম্পর্কে তো প্রশ্নই নেই। ইরার প্রায় বছর চারেকের ছোটো যদিও ও।

বিয়ের অব্যবহিত আগে ও পরে মীরা তাদের দুই বোন ও দুই জামাই সম্পর্কে দাদা কি বলেন, হীরেনকে সব শোনাতো। ইদানীং অঞ্জনবাবু সম্পর্কে মীরা একেবারে নীরব।

দু-বার টাকা ধার করার পর তৃতীয়বার আর যখন ও মনোহরপুকুর রোডে গেল না, নিজের আংটি বিক্রি ক'রে টাকা যোগাড় করলো তখনই হীরেন অনেকটা আঁচ করেছিলো। একদিন, হীরেন

তখন হাসপাতালে, অঞ্জনবাবুরা (তাঁরা স্ত্রী ও চারটি সন্তান) কেমন আছেন জিজ্ঞেস করায় মীরা বলেছিলো ও বাড়িতে সে অনেকদিন যায় না। কেন যায় না হীরেন প্রশ্ন করে নি। অবশ্য অঞ্জনবাবু, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এক রবিবার হাসপাতালে হীরেনকে দেখতে গিয়েছিলেন। এবং মীরা কেন আর বেড়াতে যাচ্ছে না তাঁরাও সেদিন প্রশ্ন তোলেন নি।

মীরা ব্যস্ত। মীরাব চোখ দেখে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। ঘর হাসপাতাল ক'রে মোটে সময় পাচ্ছে না বেড়াবার, কোথাও বেরুবার। দাদা, বউদি, রুগীর খাটের একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তাঁদের চার ছেলে-মেয়ে। মীরা ছিলো খাটের ও-পাশে। হাসপাতালের নম্বরমারা মগ্ থেকে কাচের গ্লাসে হীরেনের জন্য দুধ ঢালছিলো। ওর আনত চোখের পাতায়, স্থির ভ্রূযুগলে, আড়ষ্ট অধরোষ্ঠে, চোয়ালে, চিবুকে কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অপার বাকসংযম দেখে কেউ বিস্মিত হয় নি।

একলা মীরাকেই এখন সবদিক সামলাতে হবে, হচ্ছে। হীরেনের অপারেশনের কথা শুনে মীরার নার্ভাস হ'লে চলবে না।

অঞ্জনবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর চোখ থেকেও গাম্ভীর্য ঝরছিলো।

মেরুন রঙের শাড়ি পরনে ছিলো মীরার। ওটাই ওর সবচেয়ে সুন্দর কাপড়। বিয়েতে উপহার পেয়েছিলো, কোনো-এক বড়োলোক আত্মীয় মীরাকে আর্শীবাদ কবেছেন। অনেক দাম ঐ শাড়িব।

অঞ্জনবাবু নিজে বড়োলোক না হলেও তাঁর বড়োলোক আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সারা কলকাতায় ছড়িয়ে।

হীরেন জানতো। মীরা বলেছে। হাসপাতালের বেড-এ শুযে ও শুনলো দাদাব সঙ্গে নিতান্তই কাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলছিলো না মীরা। থেকে-থেকে অঞ্জনবাবু উদ্বিগ্ন ভুরু হানছিলেন, পরে মীরার এক-একটি নাম প্রস্তাবে প্রফুল্ল হয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ছিলেন। 'হ্যাঁ।' অঞ্জনবাবু বলছিলেন, 'আমার সঙ্গে এখন কারোর আর তেমন ভালো জানাশোনা নেই, সাংসারিক ঝামেলায় বেরুতেই পারি না, তুই যা, তুই নিজে গেলে মামাবাবু চিনবেন। ভালো বাড়ি জুটিযে দেবেন।'

মীরা চুপ করে ছিলো। প্রথমত ওই শাড়িটা পরনে, তার ওপর অত্যাধিক গম্ভীর ছিলো বলে কেমন অন্যরকম লাগছিলো মীরাকে যোয়ান-অব-আর্কের মতন। হীরেন সেদিন ভাবছিলো। মীরার চোখে চশমা ছিলো না।

খুব বেশি ক্লান্ত ব'লে হীরেন মীরার দিকে অনেকক্ষণ তাকাতে পারে নি।

রক্তাভ বড়ো একটা কাচের জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। রুগীর পাশে দাঁড়িয়ে চার্ট নিয়ে নার্সরা যেমন নিচু গলায় আলোচনা করে তেমনি অপারেশন-থিয়েটারে উঠবার যোলো ঘণ্টা আগে সে মীরা ও অঞ্জনবাবুকে তার সংসারখরচ ইত্যাদি ছাড়াও বাড়ি বদলানো এবং মীরার চাকরি নেওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছিলো। ওখানেই সব ফাইন্যাল হ'য়ে যায়।

তারপর একটি-একটি ক'রে মীরা ক'রে যাচ্ছে। নতুন বাড়ি ভাড়া করা এবং আরো-কিছু টাকা ধার ক'রে ঘর সাজাবার উপযোগী দু-একটা ফার্নিচার পর্যন্ত কেনা হলো সেদিন। কোনোটা একদম নতুন কোনোটা সামান্য পুরোনো। এনে আবার রং ফেরানো হয়েছে। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ইলেকট্রিক হিটার কিনেছে মীরা, ওর অনেক দিনের শখ। খরচ একটু বেশি হচ্ছে। হবেই। এটা জানা কথা। বুলাও এইমাত্র ব'লে গেল 'গ্র্যাজুয়েট মেয়ে, দেখতে ভালো, আড়াই-শ' পাবে বউ।'' অর্থাৎ হীরেনের রোজগার প্রায় দ্বিগুণ। এখন ভালোয়-ভালোয় কাজটা হ'য়ে যায়, মীরাও বার-বার বলছিলো কাল রাত্রে।

তপেশ লাহিড়িকে হীরেন জানে না, দেখে নি। হীরেন পায়চারি বন্ধ রেখে ঘড়ি দেখলো। দশটা দশ। একবার সে জানলার কাছে গেল। এখনই তাকানো যায় না বাইরে। দেবদারু-পাতার

সবুজ লাবণ্য রৌদ্রে পুড়ে কালো হ'তে চললো। মীরার এত দেরি হবার কথা কি। পায়চারি করতেও হীরেন আর হাঁটুতে জোর পাচ্ছিলো না। ইজিচেয়ারে ব'সে দুই আঙুলে কপালের রগ টিপে ধরলো।

দুই

মীরা ঘরে ঢুকছে হীরেন দেখতে পেলো।

ঘুমোয় নি সে, ঘুমের ভান ক'রে ইজিচেয়ারে শুয়েছিলো, আধবোজা চোখ দরজার দিকে ফেরানো।

বুলা ঘর থেকে বেরোবার পর হীরেন আর দরজার ছিটকিনি দেয় নি। কাজেই মীরার কড়া নাড়তে কি দরজায় টোকা দিতে বা হীরেনকে ডাকতে হ'লো না। আধবোজা চোখের পাতার ভিতর দিয়ে হীরেন দেখলো মীরা জুতোর ফিতে খুলছে, হাতেব ব্যাগটা খাটের শিয়রের ধারে রাখছে, রুমাল দিয়ে গাল গলা অল্প-অল্প চাপড়াতে-চাপড়াতে একটু সময়েব জন্যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে।

তারপর পরনের ঝকঝকে বেগনি মাদ্রাজি শাড়ি ছেড়ে ফেললো ও, ছাড়ালো চকচকে কালো শাটিনের ব্লাউজ। শুধু সায়া, রক্তের মতো লাল সায়া আর জংলি ছিটের আধময়লা ব্রেসিয়ারে মীরাকে, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য যদিও, মীরার শরীরটাকে কেমন অদ্ভুত হিংস্র অশ্লীল মনে হয় হীরেনের।

তারপর অবশ্য আটপৌবে ঢাকাই বুটিদারে ও শরীর জড়িয়ে ফেলে। শান্তশিষ্ট ঘরোয়া মীরা।

ঘরোয়া মীরা; হিংস্র মীরা; সবুজ বেগনি মেরুনে ঢাকা উজ্জ্বল এঞ্জেল মীরা।

মীরা চুলের ফিতে খুললো। সাবানের বাক্স ও তোয়ালে হাতে নিলো, তারপর টেবিলের ওপব দুধের গ্লাস ও রুটির টুকরো দুটো পড়ে আছে দেখে আস্তে-আস্তে হীরেনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'ঘুমোচ্ছো?' মীরা ডাকলো।

হীরেন চোখ খুললো।

'সকালের খাবার প'ড়ে আছে তোমার?' মীরা প্রশ্ন করলো।

'না, ইচ্ছে হ'লো না।' হীরেন হাই তুললো। 'কখন ফিরলে?'

'এই তো।' মীরা জানলার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট নিশ্বাস ফেললো। 'তুমি খেলে না কেন?'

'একটু-একটু পেন্ হচ্ছিলো পেটে যেন।' হীরেন বললো। টেবিলের দুধ ও রুটির দিকে চেয়ে সে একটু অবাক। সত্যি কি খাওয়ার কথা তার মনে ছিলো না!

'বুলা এসেছিলো।' বললো হীরেন।

'কখন?' মীরা ঘাড় ফেরালো। তারপর যেন হঠাৎ খাটের দিকে চোখ পড়তে শয্যার এ-প্রান্তের ঈষৎ কোঁচকানো ঢাকনার ওপর চোখ পড়তে চুপ করে গেল। হীরেনের চোখ এড়ালো না। বুলা ঘরে ঢুকে চেয়ার টুল বেতের মোড়া অর্থাৎ ঘরে যে-আসনটি থাক-না, খাট ছাড়া, খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসা ছাড়া বসতে পারে না, হীরেন বহুদিন লক্ষ্য করেছে। নিশ্চয় মীরাও তা লক্ষ্য করে। হীরেন নিঃসন্দিগ্ধ।

'কি বললে ও?' মীরা হীরেনের দিকে চোখ ফেরায়।

'তোমার কাজের কথা জিজ্ঞেস করছিলো, চাকরি হ'লো কি না। হীরেন মীরার দিকে তাকাতে পারলো না।

'চাকরি তো হ'য়েই আছে, কেবল মিস্টার লাহিড়ির সঙ্গে একবার দেখা করার অপেক্ষা।' যেন নিজের মনে কথা বললো মীরা। পায়চারি করতে-করতে টিপয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো একটুক্ষণ, রজনীগন্ধার আর ক-টি কলি বাকি আছে ফুটতে নুয়ে মনোযোগ দিয়ে তাই দেখলো।

'কাল থেকেই জয়েন্ করতে হচ্ছে।' মুখ তুলে মীরা বললো।

হীরেন চমকে উঠলো।

'কাল?' হাসি-হাসি চেহারা যদিও হীরেনের, মুখের কথাটা প্রায় ফিসফিসানির মতো শোনালো। মীরা মাথা নাড়লো, তারপর আর একবার খাটের কোঁচকানো অংশের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কান কাড়া ক'রে চুপচাপ ব'সে রইলো। হীরেন। স্নানের ঘরের দরজার শিকল নামানোর শব্দ, জলের শব্দ মীরার চুড়ির রিনরিন ছাড়া আর-কোনো শব্দ তার কানে এলো না কতকক্ষণ। আশ্চর্য, হীরেন ভাবলো, ভেবে অবাক হ'লো, কোথায় সে মীরাকে প্রশ্ন করবে, ফিরতে এত দেরি কেন, তপেশ লাহিড়ি কেমন লোক, কি কথা হ'লো, জয়েনিং ডেট্ কবে, মেয়ে-কলিগ অফিসে আর ক-টি, মীরা কবে থেকে কাজে লাগছে, তা না, তার কিছুই হ'লো না। তার আগে প্রশ্ন হ'লো, 'বুলা কখন এসেছিলো, কতক্ষণ ছিলো, কি বললো, বুলা বসেছিলো কোথায়?

হীরেন উঠে-আবার পায়চারি আরম্ভ করে।

বাথরুম থেকে শব্দ আসছিলো। জলের শব্দ চুড়ির নিক্কণ, মীরাব গানের গুনগুনানি!

'আশ্চর্য, সকালে তুমি খেলে না কেন?' ভাত খেতে ব'সে মীরা প্রশ্ন করলো। হীরেনের জন্যে আলাদা ঝোল। আদাবাটা আর হিঞ্চে শাক।

'একটু পেন্ হচ্ছিলো মনে হ'লো যেন। ঝোলেব বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে হীরেন বললো, 'মাছ নেই?'

'মাগুর মাছ পেলে না, মালতী বললে তো।'

হীরেন আর কথা বললো না।

মালতী হীরেনের বাড়ির ঠিকে-ঝি। মসলা বাটে, থালাবাসন ধোয়, জল তোলে, দশ টাকা মাইনে। মীরা দু-দিন অন্ত বাজার করায়, তার জন্যে নগদ দু-আনা ক'রে আদায় করছে মালতী। আর বলছে যদি দিদিমণি চাকরি করতে যায় তো রান্নাবান্নারও একটা ব্যবস্থা করে দেবে ও।

মীরা বললো, 'কাল থেকে কি মালু রান্না করবে?'

'বিকেলে ও এলে কথা হবে।' হীরেন গম্ভীর। হাঁসের ডিমের ঝোল দিয়ে মীরা ভাত মাখছে। মালতী দাদাবাবুর মাছ পায় নি, দিদিমণির ডিম নিয়ে এসেছে বাজার থেকে। লঙ্কা পিঁয়াজ গরমমসলা দিয়ে আলাদা করে রাঁধা। মীরা নিজেব হাতে রেঁধে গেছে বেরোবার আগে। সেই ভোর পাঁচটায় আজ ওর ঘুম ভেঙেছিলো।

হীবেন সতৃষ্ণ চোখে যেন চুবি ক'রে মীরাব পাতের তেলতেলে সোনালী ঝোল দেখছিলো, তারপর চোখ ফেরালো তার আদার ঝোলের দিকে। ফ্যাকাশে সবুজ শাদাটে নির্জীব।

তেল-হলুদের জৌলসে মীরার পরিপুষ্ট আঙুল আগুনের শিখার মতো জ্বলছিলো।

শীর্ণ, বিবর্ণ, নিস্তেজ আঙুল হীরেনের।

কিন্তু তবুও তার গলা গাম্ভীর্যে থমথম করছিলো। 'মিস্টার লাহিড়ি কি বললেন?'

'জিজ্ঞেস করলেন নাম, তোমার নাম।' মীরা মুখ তুললো।

হীরেন মুখ নামালো।

'আর?'

'আগে কোথাও চাকরি করেছি কি না।'

হিঞ্চে শাকগুলো হীরেন আলগোছে তুলে পাতের কিনারে ফেলে দিলে।

মীরা অপাঙ্গে স্বামীর ভুরু দেখলো।

'আর?'—নিস্তেজ আঙুলে যথাসম্ভব জোর দিয়ে হীরেন নেবুর টুকরোটা নিংড়ে-নিংড়ে রস বা'র করছিলো। আর কি জিজ্ঞেস করলেন লাহিড়ি?'

'তুমি এখন কেমন আছো, কার ট্রিটমেণ্টে আছো। বাড়িভাড়া আমাদের কত দিতে হচ্ছে, কতদিন সার্ভিস হয়েছিলো তোমার, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড-টণ্ড কিছু ছিলো কি না।' বাঁ-হাতে কাচের গ্লাস তুলে মীরা একটু জল খেলো। 'মামাবাবুর বিশেষ বন্ধু কিনা, তাই মিস্টার লাহিড়ি আমার,—আমাদের—'

মীরার চোখে চোখ রেখে হীরেন বললো, 'ইন্টারেস্টেড।'

'ঠিক তা না।' —যেন সঠিক শব্দটা হাতের কাছে খুঁজে না পেয়ে মীরা বিপরীত দিকের দেয়ালে চোখ রাখলো।

'নেচার অব্ ওয়ার্ক সম্বন্ধে কিছু আভাস দিলে কি,—তোমার?' হীরেন জলের গ্লাস মুখের কাছে তুললো। 'কি রকম পে-টে হবে?'

'কি আর কাজ হবে, ঐ লেখাপড়ার কাজ—কেরানীগিরি, ডেস্‌প্যাচ্ কি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টে দেবে আর কি। মেয়ে-কেরানী।' কথাটা ব'লে মীরা হঠাৎ শব্দ ক'রে হাসলো। অ্যালাওয়েন্স নিয়ে শ'-আড়াই হবে বোধহয়।'

হীরেন হাসতে পারলো না।

মীরার ঘোরানো বেণীর ওপর চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বললো, 'কেরানী নয়, কেরানীর কি আরম্ভেই অত মাইনে হয়!'

'কাল দুপুর থেকে ভয়ানক একলা থাকতে হবে আমায়।' হীরেন হাত ধুতে উঠে পড়লো। মীরা চুপ। এঁটো থালা বাটি গ্লাস একত্র করে ও।

জানলার ভারী নীল পর্দাগুলো টেনে দিলে মীরা, পিছনের সিঁড়ির মুখের এবং সামনের দরজার প্রত্যেকটি কবাট ভেজিয়ে দিলে। সূর্য ওঠার আগে কি সূর্যাস্তের পর নরম ছায়া-ছায়া আলোয় যেমন পৃথিবী ভরে যায়, তেমনি রৌদ্র-উজ্জ্বল প্রশস্ত রাসবিহারী অ্যাভিনিউর এই ছোট্ট ঘরটি নরম ফুটফুটে আলোয় ভরে গেল।

হীরেনের ভালো লাগলো।

আঙুল দিয়ে টেনে-টেনে মীরা বিছানার কোঁচকানো অংশ পালিশ করে দিলে, বুলা যেখানটায় বসেছিলো। সমান করে সাজিয়ে দিলে হীরেনের জোড়া বালিশ, পাশ-বালিশ।

হীরেনের বুকের মধ্যে টিবটিব করছিলো। সূক্ষ্ম চোখে সে তাকিয়ে দেখছিলো তারপর মীরা কি করে। নিজের বালিশ দুটো শিয়রে না রেখে এক পাশে সরিয়ে রাখলো মীরা। হীরেন অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

'এসো শোবে।' মীরা ডাকলো।

'তুমি?' হীরেন ইজিচেয়ার থেকে উঠলো না। মীরা ঘরে না থাকলে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ওখানেই সে বিশ্রাম করে।

'আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।' মীরা বললো।

'আবার? হীরেন মীরার চোখ দেখলো। 'এই তো এলে—' আস্তে-আস্তে বললো সে।

'তোমার সেই ক্যাপসুলের আর একটা...ফাইল...নিয়ে আসি।'

'ও, সেজন্যে, তা বিকেলে আনলেও চলবে।' হীরেন হাসতে চেষ্টা করলো। 'এখন এই রোদে বেরুবে কি! তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কি? মীরা স্থির চোখে হীরেনের মুখ দেখছিলো।

'ও খুব সামান্য পেন্, প্রায় না-হওয়ার মতন, হয় নি, হয়তো, আমার মনে হচ্ছিলো যেন বুঝি আবার সেই পেন্—'

'অদ্ভুত তুমি।' মীরা অস্ফুটে বললো, আমি জানি সকালে তুমি আজ টিফিন খাবে না, খেতে পারবে না। পেন্-ফেন্ বাজে ওজর।'

ঘাড় নামিয়ে হীরেন চুপ ক'রে রইলো।

'আসলে তোমার মন খারাপ হ'যে আছে আমি চাকরিতে ঢুকছি বলে। তুমি কোনোরকমেই এটা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারবে না, পারছো না। আমি জানতাম।'

'এই দেখ!' হীরেন প্রতিবাদ করতে চাইলো, 'আমি কি বলছি, বলেছি তোমাকে যে, তা ছাড়া, তা ছাড়া—হীরেন থেমে গেল।'

'তুমি রীতিমতো ঈর্ষা করছো।' মীরা ঠোঁটে ঠোঁট চাপলো। 'হাসপাতাল থেকে বেরোবার দিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি—।'

'যে তুমি সুন্দরভাবে সংসার চালাচ্ছো? আমি ছাড়া, আমাকে ছাড়া সব-কিছুর শৃঙ্খলা রেখে—' হীরেন মৃদু হাসতে লাগলো। 'তোমার ভুল ধারণা, মীরা।'

মীরা কথা বললো না।

'তা ছাড়া কতদিন আমার এই অবস্থা থাকবে তার ঠিক কি। একটা কিছু তোমাকে না করলে চলবে কেন।'

'হাতে যে-টাকা আছে বড়োজোর আর এক সপ্তাহ যাবে। পরশুদিন রেশন আনতে হবে।'

হীরেন চুপ ক'রে শুনলো।

'এখানকার দুধওয়ালা পনেরো দিন পব-পর টাকা নেয়, মাসের হিসেব জানে না।'

'তা ছাড়া মাসেব শেষে আবার এতগুলো বাড়িভাড়া।' হীরেন যোগ করলো।

'তাই বলছিলাম, তুমি জানো, কিন্তু জানতে চাও না। বোঝো, অথচ বোঝো না,' মীবা আস্তে-আস্তে পায়চারি করে।

হীরেন নীরব।

মীরা হাত বাড়িয়ে একটা জানলার পর্দা সরিয়ে দেয়। একটুক্ষণ দাঁড়ায় সেখানে। তারপর স'রে এসে হীরেনেব সামনে দাঁড়ায়।

'গেল-মাসটা কি ক'রে ম্যানেজ করেছি তুমি আইডয়া করতে পারো?'

হীরেন মীরার চোখে চোখ রাখলো। 'না, আবার কিছু বিক্রি করতে হয়েছিলো কি?'

'না, বিক্রি করবার আব আছে কি।' আস্তে-আস্তে মীরা জানলার কাছে ফিরে গেল। 'পুষ্পর কথা বলেছি তোমায়? পুষ্প দে?' মীরা এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

'কে?' হীরেন জানলার দিকে তাকায়, মীরার মুখের দিকে। 'তোমার কেউ কি—'

'না আত্মীয় নয়। আপন দাদার কাছেই যখন তৃতীয় বার টাকা ধাব চাইতে পারি নি তো এমন কে আত্মীয় আছে যে গিয়ে হাত পাতবো?' মীরা মৃদু নিশ্বাস ফেললো। 'আমার একটি বন্ধু।'

'পুরুষ কি মেয়ে?' প্রশ্ন করতো হীরেন, হীরেনের কৌতুহলাচ্ছন্ন দৃষ্টি। কিন্তু কিছু বললো না। মীরার দিকে চেয়ে রইলো শুধু।

'বেথুনে এক সঙ্গে পড়েছি আমরা। মস্ত বড়োলোকের মেয়ে। মোটরগাড়ির এজেন্সি আছে পুষ্পর বাবার, ধর্মতলায় দোকান।' দুই হাতের কব্জি বেণীর ওপর রেখে কনুই দুটি ঘাড়ের দু-দিকে প্রসারিত করে দিলে মীরা। শাদা সুন্দর বাহুযুগল। রাজহংসীর পক্ষবিস্তারের কথা মনে পড়লো হীরেনের। 'পুষ্পকে তুমি দেখ নি,' মীরা বললো, 'আমার চেয়েও দেখতে সুন্দর, এই লম্বা টাইপের শরীর, সবচেয়ে মারাত্মক ওর ভুরু, বর্ণনা নেই, তুলনা নেই এর।' মীরার চোখ বুজে এলো সখীর রূপবর্ণনা করতে-করতে।

'আমি দেখি নি। হীরেন আস্তে বললো।

চশমা-পরা, আদুরে চেহারার, গালে অভিমান লেগে-থাকা একটি মেয়েকে ছাড়া আর কোন মেয়েকেই বা দেখেছিলাম, হীরেন ভাবলো এবং এখন ভেবে অবাক হয়. সে কতকাল কতদিন মীরা অভিমান করছে না। কেন?

অভিমান কবতে পাবতো, মীবাকে আজ দেখলে মনে হয কি?

'পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে পুষ্প, চাইতেই সেদিন দিযে দিলে।' মীবা বললো।

'তাই নাকি।' হাসতে চেষ্টা কবলো হীবেন।

মীবা হীবেনেব হাসি দেখাব অপেক্ষা কবলো না। জানলা থেকে স'বে গিযে আলনা থেকে নীল মাদ্রাজি শাড়িটা টেনে নামালে, আব জংলি কাঁচুলি, একটা গোলাপী সাযা।

'তুমি আবাব বেকচ্ছো?'

'হুঁ।' মুখ তুললো না মীবা। আটপৌবে ঢাকাই ছেড়ে গোলাপী সাযা পবতে ব্যস্ত। কাঁচুলি ঢাকলো সোনালী ছাইবঙা ব্লাউজে। সূক্ষ্ম লালপাড়বসানো হাতা।

'বললাম তো কাজ নেই এখন ক্যাপসুল এনে, ওই এর্মনি একটু পেন হচ্ছিলো, হবাব উপক্রম কবছিলো, হযতো হয নি।' হীবেন বললো।

'না, তোমাব ওষুধ না আনলেও আমায বেবোতে হবে। আবো ক-টা টাকাব দবকাব। কাব কাছে বা চাই—' মীবা গলায গালে পাউডাব মাখে। আযনাব দিকে ফেবানো মুখ। 'কাব কাছে গিযে এখুনি আবাব হাত পাতি।' বিড়বিড় কবলো ও গম্ভীব হযে।

হীবেন কথা বলছে না।

আযনা থেকে স'বে এসে মীবা বললো, 'শাড়ি এখন কিনবো না, আব টাকাই-বা কোথায শাড়ি কেনাব, একটা শু না হ'লে চলছে না, কাপড়েব জুতো পবে তো অফিস কবা চলে না।'

'তা তো না-ই।' হীবেন মীবাব পাযেব দিকে তাকায, লাল কাপড়েব ওপব জবি-বসানো হাল্কা শৌখিন চটি, বিয়েতে যেটা উপহাব পেযেছিলো। মীবা তা-ই পবে এখন কাজ চালাচ্ছে, বাইবে যাচ্ছে।

'শু না হ'লে অফিসে যাবে কি কবে?' উদ্বিগ্ন চোখ মীবাব মুখেব দিকে তুলে ধবলো হীবেন। 'পাবে কি কাবো কাছে ক-টা টাকা?'

'দেখি।' মীবা হাতে ব্যাগ নিলে। 'অমবেশেব কাছে চেযে যদি পাই।'

'কে অমবেশ,' অস্ফুটে বলতে গেল হীবেন। মীবা দবজাব কাছে সবে গেল। যেন কথাটা কানে ঢুকলো না। চৌকাঠেব বাইবে গিযে একবাব ঘুবে দাড়ায ও। 'তিনটেব সময মালতী আসবে, যদি ওভালটিন খাও ওকে বোলো জল গবম ক'বে দেবে।'

'আচ্ছা।' ঘাড় নাড়লো হীবেন।

মীবা আব দাঁড়ায না। সিঁড়িতে ওব পাযেব শব্দ হতে পাশেব ঘবে একটা বিশ্রীবকম গলা-খাঁকাব হীবেন শুনতে পায।

'স্কাউন্ড্রেল।' দাঁতে দাঁত ঘষে হীবেন বিড়বিড় ক'বে উঠলো। তাবপব কতক্ষণ চুপ কবে দাঁড়িযে বইলো একভাবে। আর্টিস্টেব চবিত্রসমালোচনায বেশিক্ষণ মন দিতে পাবলো না সে।

ভাবছিলো সে মীবাব কথা। কে অমবেশ? কি হয ওব? আত্মীয? বন্ধু?

আত্মীযেব কাছ থেকে মীবা টাকা কর্জ কববে না। পাঞ্জাবিব দুই পকেট দু-হাতেব মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ কবে হীবেন পাযচাবি শুরু কবে।

তিন

কে অমবেশ তা হীবেনকে যে বলতেই হবে তাব কি অর্থ আছে। মীবা ভাবলো।

কাব কথা না বলেছে ও বা না বলছে।

আব খুব সুখেব ব্যাপাবে তো কাবো কাছে অগ্রসব হচ্ছে না সে, যে—

তা ছাড়া, সারা ট্রাম রাস্তা রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে চৌরঙ্গি, চৌরঙ্গি থেকে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের জংশন পর্যন্ত আসতে-আসতে মীরা ভাবলো, যদি আজ এমন হতো হীরেনের সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অমরেশের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মীরার এবং অমরেশ-মীরার সংসারখরচের টাকার জন্যে মীরা হীরেনের কাছে ছুটছে, তো মীরা কি অমরেশের প্রশ্নের উত্তরে হীরেনের সমস্ত পরিচয় দিতো, না দিতে পারতো?

হয়তো অমরেশ প্রশ্নই করতো না।

এমন হওয়া যে সম্ভবও ছিলো।

হ্যারিসন রোডের ডান-পেভমেন্টে ধ'রে পুবদিকে অগ্রসর হবার সময়ও মীরা কথাটা চিন্তা করলো। টা-টা করছে রোদ।

পথের এ-পাশে ট্যাক্সি ও-পাশে রিকশার সারি। মীরাকে ডাকছে হাতছানি দিয়ে গলা খাঁকার দিয়ে রিক্‌শাওলা ট্যাক্সিওলা।

কিন্তু মীরার লক্ষ্য হোটেল ডি ল্যুক্সের কোলাপ্‌সিবল্‌ গেট।

রুমাল দিয়ে গলা ও গাল একটু চাপড়ে নিলে মীরা গেট পার হওয়ার সময়।

আগে দরজার কাছে দারোয়ান ও কুকুর দেখতে পেতো সে, এখন তারা কেউ নেই।

যেন সমস্ত হোটেলটাই মিইয়ে আছে। টবের পাতাবাহার শুকনো।

সিঁড়ির গালচে ফুটো হয়ে গেছে এখানে-ওখানে, দিনকাল খারাপ হোটেলের। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মীরার বুকের মধ্যে দুব্‌দুব্‌ করছিলো। অমরেশ আছে কি এখনো এখানে?

যেন হোটেলটার মতো অমরেশও মিইয়ে আছে, প্রায় মরে যাচ্ছে তার সকল স্মৃতি মীরার মনে। তাই কি? চোখের কোনা ভিজে-ভিজে অনুভব করলো মীরা।

বিয়ের আগে হীরেন মীরার প্রেমে পড়েছিলো। তারও আগে পড়েছিলো অমরেশ। ঈষৎ পিঙ্গল চোখ, প্রশস্ত কাঁধ, কোঁকড়ানো চুল। হ্যাঁ, যদি প্রেমের প্রশ্নই ওঠে, ভালোবাসার স্বত্বাধিকার তো—

দোতলার বাঁ-হাতি বারান্দায় উঠে মীরা একটু-সময় দাঁড়ায়।

A. CHATTERJEE—IN

সেই পুরোনো নেম-বোর্ড। ১৯৪৩-এ যেমন ছিলো ১৯৫০-এও ঠিক তেমনি এক জায়গায় একইভাবে ঝুলছে। কেবল পরিবর্তনের মধ্যে বোর্ডের ওপরের দিকের একটা কোনায় আধুলির সাইজের একটা মাকড়সার জাল মীরার চোখে পড়লো।

সতেরো নম্বর কামরায় দরজায় যেতে মীরা ভয়ংকর ঘামছিলো।

দরজায় টোকা দেবার আগে আর একবার ও রুমাল দিয়ে ভালো করে গলা ও ঘাড় মুছলো।

'কে?'

'আমি।'

দরজা খুলে দিয়ে অমরেশ প্রথমটায় একটু অবাক, তারপর অল্প শব্দ করে হাসলো, 'আরে!'

'ভয় পেলে?' আস্তে বললো মীরা, মুচকি হেসে।

'না, ভয় কেন।' অমরেশ মীরার হাত ধরতে গেল, কিন্তু পারলো না-বরং সেই হাতে দরজার পর্দাটা একদিকে ঠেলে দিয়ে বললো, 'এসো এসো।

মীরা ঘরে ঢুকলো।

'মরুর দেশে নীহারকণা।' বলে অমরেশ বারবার মীরার আপাদমস্তক দেখতে লাগলো। 'বোসো।'

'না, বসবো না।' দাঁড়িয়ে থেকে স্থির-চোখে মীরা দেখতে লাগলো পিঙ্গল চোখ, কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত কাঁধ। কিন্তু কেমন-একটু শুকিয়ে গেছে অমরেশ, না? মীরা লক্ষ্য করলো।

কাঁধেব সেই প্রশস্ততা নেই। পিঙ্গল চোখ নিষ্প্রভ। উস্কুখুস্কু চুল। শবীবেব বজ্র-আঁটুনি যেন স্খলিত হয়ে পড়ছে।

অমবেশেব পবনে ডোবা-কাটা স্যালুযা, গাযে একটা বাগ জডানো।

'তোমাব শবীব ভালো নেই?' মীবাব স্বব কাঁপছিলো, চাউনিতে উদ্বেগ।

'না, এই এমনি, একটু ইনফ্লুযেঞ্জাব মতন।' অমবেশ মলিন হাসলো। 'বোসো, তাবপব খবব কি?'

মীবা বসলো না এবং কথাবও উত্তব দিলে না। অমবেশকে দেখা শেষ কবে ও তাব ঘব দেখছে। সেই সরু সিঙ্গল খাট, এলোমেলো হযে আছে। বালিশ দুটো সবে গেছে, সুজনিব প্রায অর্ধেকটা স্থানচ্যুত হযে মেঝেব ওপব গডাচ্ছে, ছাইদানি ভবে গিযে পোড়া-সিগাবেটেব টুকবোগুলো বিছানায, কিছু-বা মাটিতে ছডিযে-ছিটিযে।

ফাউন্টেনপেন, বিস্টওযাচ থেকে আবম্ভ কবে আযনা, চিরুনি, টুথব্রাশ তোযালে, নেক্‌টাই কাচেব গ্লাস, ক্রীমেব কৌটো, জুতোব ব্রাশ সব গিযে জডো হযেছে একটা টেবিলে। কাচেব গ্লাসটা গডিযে টেবিলেব এমন কিনাবে এসে ঠেকেছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে পডে গিযে ওটা ভাঙতে পাবে।

মীবা ছোট্ট নিশ্বাস ফেললো।

'হাসছো যে?' মীবা প্রশ্ন কবলো অমবেশেব মুখেব দিকে চোখ পডতে। অমবেশ তখনো মীবাকে আপাদমস্তক দেখছিলো, দেখছে আব অল্প-অল্প হাসছে।

'আশ্চর্য সুন্দব হযেছো দেখতে বিযেব পবে,' অমবেশ বললো, 'বোসো।'

'না বসবাব সময কোথায।' মীবা ফেব টেবিলেব দিকে চোখ ফেবালো। 'ক-টা টাকা কর্জ দাও।'

'তাব অর্থ? হঠাৎ?' অমবেশ গম্ভীব।

মীবা অমবেশেব চোখে চোখ বাখলো।

'মিস্টাব চক্রবর্তীব খুব অসুখ, আবো দুটো ইনজেকশন কিনতে হবে আজ।'

'কি অসুখ?' অমবেশ আস্তে-আস্তে বললো, 'জানি না তো।'

'পেটে অপাবেশন হযেছিলো। এখনো ভযংকব দুর্বল। মাঝে-মাঝে বুঝি স্লাইট পেনও হয।'

'কি মুশকিল।' অমবেশ পব-পব দুটো ঢোক গিললো, 'আমি তো, আমি যে, অবশ্য—গত দু-মাস ছিলামও না কলকাতায।'

'কি মুশকিল।' মীবা বললো, 'থাকলেই বা তুমি জানতে কি কবে আমাব ঠিকানাও যে তুমি জানো না।'

অমবেশ কথা কইলো না।

মীবা খাটেব ওপব বসলো। ডান-হাতে ব্যাগটা ধবে বাঁ-হাতেব দুই আঙুলে ও কপালেব দুটো বগ টিপে ধবে।

'ঘোবাঘুবি কবে তুমি নিশ্চযই খুব টাযার্ড?' অমবেশ মীবাব কাছ ঘেঁষে দাঁডায, 'মাথা ধবেছে?'

'না।' হাত সবিযে মীবা মৃদু হাসলো। যেন ঘুম থেকে উঠেছে, ঘুম থেকে উঠে অমবেশেব মুখেব দিকে চেযে স্বপ্নিল হাসছে।

'তুমি হাসছো, কিন্তু—' বিষণ্ণ মুখে অমবেশ বিডবিড় কবে।

'কি?' মীবা অমবেশের হাত ধবে। 'কি ভাবছো?'

'তুমি লুকোচ্ছো, কিন্তু বুঝতে পাবছি বেশ কষ্টে পডেছো।'

'তা কি কবা, কি কবতে পাবো তুমি যদি আমাব অদৃষ্টে কষ্ট লেখা থাকে।' মীবাব হাসি এবাব শব্দ কবে উঠলো পাহাডী ঝবনাব ঝিবিঝিবানিব মতো।

হাত ছাড়িযে নেয় অমবেশ। পাযচাবি কবে একটুক্ষণ। 'সত্যি আমি কি কবতে পারি—'

অভিমানে গম্‌গম্ করছিলো পুরুষের গলা। 'আমি কে—'

মীরা চুপ।

কোন্-একটা কামরা থেকে অদৃশ্য ঘড়ির টিকটিক ভেসে আসছিলো।

অমরেশ হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায়।

'ক-টাকা তোমার দরকার, কি পরিমাণ টাকা হলে এখন চলে?'

'এই, গোটা পঞ্চাশ?' মীরা আস্তে বললো।

অমরেশ নিঃশব্দে টেবিলের কাছে সরে যায়। তোয়ালে আবশি ঘড়ি পেন-এর আবর্জনা সরিয়ে একটা অ্যাটাচি টেনে বাব করে এক-শ টাকার একটা কারেন্সি নোট তুলে পরে মীবার কাছে ফিরে আসে। নোটটা মীরার কোলের ওপর রাখলো সে। মীরা অপাঙ্গে টাকাটা দেখলো, কথা বললো না, একটু পরে ভাঁজ করে ওটা ব্যাগে পুরলো। অমরেশ সিগারেট ধরায়।

'বাইরে কোথায় গিয়েছিলে?' মীরার প্রশ্ন।

'শিলং।' অমরেশ মীরার বুকের ওপর চোখ বাখে। চাকা-চাকা ধোঁয়া উদগিরণ করে, ধোঁয়ায় মীরার চোখ ছল ছল করতে থাকে।

'তোমার ঠিকানা জানি না, কিন্তু আমার ঠিকানা তো তুমি জানতে!' অমরেশের প্রশ্ন।

মীরা মুখ নুইয়ে আছে।

'না কি হ্যারিসন রোডের দিকে বিয়ের পর মুখ ফেরাও নি?'

'অনেকটা সেই রকমই।' মীরা মুখ তুললো।

'হারেম ছেড়ে বুঝি চক্রবর্তী বাইরে আসতে দেয় না?'

'দিচ্ছিলো না।' মীরা গলা পরিস্কার করলো। 'কিন্তু ঈশ্বর তার সেই সাধ পূরণ করে নি।'

কথা না বলে অমরেশ ওপরের দিকে তাকায়। 'হ্যাঁ, একটা কিছু তোমায় এখন করতেই হচ্ছে। চাকরি বা মাস্টারি।'

'মাস্টারিতে পয়সা কোথায়।' মীরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। 'আমার এক ননদ করছে, দেখি তো।'

'অবশ্য আমার কতগুলো সোর্স আছে, যদিও সব বিলিত আমেরিকান কনসার্ন, চেষ্টা করলে—'

মীরাব চোখ উৎসাহে ঝকঝকে করে। 'দাও না ঢুকিয়ে কোথাও, বেশ ভালো মাইনে-টাইনে দেয় এমন কোনো—'

'দেখি চিন্তা করে।' অমরেশ ঘাড় ফেরায়।

মীরা উঠে দাঁড়ালো। 'চললুম আজ।'

'আবার কবে আসছো?' অমরেশ মীরার হাত ধরলো।

মীরা দু-বার তাকায় চৌকাঠের দিকে। 'কি অসম্ভব নির্জন লাগছে এত বড়ো হোটেলটা।' আস্তে বলে সে।

'দুপুরে কেউ থাকে না বড়ো।' অমরেশ গলা পরিষ্কার করে। 'আসছো তা হলে আর একদিন?'

গ্রীবা কাত করলো মীরা। 'আসতে হবে, ভালো একটা কাজটাজ না হলে আমার চলছে না, অমর।' মাথা নত করে মীরা জুতোর মধ্যে পা ঢোকায়।

যেন কবে আলতা পরেছিলো ও। যা কোনোদিনই অমরেশ দেখে নি। বুঝি বিয়ের পর থেকে পরছে মীরা, হয়তো চক্রবর্তীর পছন্দ, কিন্তু বাইরে ছুটোছুটি করে আলতা ফিকে হয়ে গেছে, মুছে যাচ্ছে।

'চলি।' মীরা আর দাঁড়ালো না।

অমরেশ কথা বললো না।

মীরা সরে যাচ্ছিলো সিঁড়ির দিকে। ওর শরীরটা নড়ছিলো। দরজায় দাঁড়িয়ে অমরেশ স্তব্ধ।

হ্যারিসন রোডে নেমে লজ্জা দুঃখ রাশি-রাশি ব্যর্থতা মীরাকে জড়িয়ে ধরলো।

না, অমরেশের কাছে টাকা চাওয়ার জন্যে নয়, একদিন এই অমরেশকে না-চাওয়ার জন্যে।

পিঙ্গল চোখ, কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত কাঁধ, হাসি, কথা—সব, সব ভালো ছিলো অমরেশের, ওব নানা ফ্যাশনের সুন্দর সব দামী জামা গায়ে দিয়ে কলেজে আসা।

মীরা চেয়ে থাকতো, মীরা প্রায় ঝাঁপ দিয়েছিলো। কিন্তু আইডিয়ার পূজারিনী তখন ও। অ্যাথলেটের চেয়ে স্কলার ওকে বেশি টেনেছিলো। কলেজ-ম্যাগাজিনে ছড়িয়ে-ছিটিযে দেওয়া হীরেন চক্রবর্তীর ঝকঝকে সব প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ, রোলা, বার্নার্ড শ।

ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ুয়া মীরা জর্জেট ছেড়ে শান্তিনিকেতনী ধরলো। বেণীর রিবন খুলে চুলে ফুল গুঁজলো। পাউডারের পরিবর্তে মুখে মাখলো সিন্থেটিক লোধ্ররেণু।

হোক রংপুরের জমিদারের ছেলে। অমরেশ চ্যাটার্জি বার-এ ঢুকে ড্রিঙ্ক করছে, রেস খেলছে। ওব কাজ কলেজের ক্রিকেট টিমের পাণ্ডাগিরি করা, সোশ্যাল ফাংশনে ফিমেল স্টুডেন্টদের চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানা। চারদিক থেকে ছি-ছি।

তাই মীরা ঘাড় ঘুরিয়েছিলো চোখ ফিরিয়েছিলো ডায়াসের ওপর উপবিষ্ট সেদিন বর্ষামঙ্গল-সন্ধ্যার সুন্দর অতিথি শান্ত ভদ্র মার্জিত হীরেন চক্রবর্তীর দিকে।

আর, কলেজের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে মীরা কলেজের সবচেয়ে পণ্ডিত গুণী চক্রবর্তীর চিত্তজয় করেছে, খবরটা যেন ঢেউ দিয়ে গিয়েছিলো সমস্ত সুধী-সমাজে।

মীরার মনে পড়লো। না, এখন ঠিক মনে নেই বিয়ের সন্ধ্যায় কোন্ কোন্ অধ্যাপক আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন।

মীরার কেবল মনে আছে কলেজের সব ছেলেমেয়ের মধ্যে অমরেশকে ও দেখে নি।

আশ্চর্য, মীরা এখন ভাবে, বিয়ের আসরে তাকে না দেখেও কি করে সে মন খারাপ না করে থাকতে পেরেছিলো।

মানুষের মন কত অদ্ভুত। ভাবে মীরা। ক্রসিং পার হয়ে ও জুতোর দোকানে ঢুকলো। জীবনে এই প্রথম সবচেয়ে বেশি দামের জুতো কিনতে পারলো সে অমরেশের টাকায়।

জুতোর দোকান থেকে বেরিয়ে মীরা ঢুকলো শাড়ির দোকানে।

জুতোর সঙ্গে পরা চলে এমন কাপড় দাও। শো-কেসের একটা জমকালো শাড়ি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ও।

মীরার বুকের ভিতর দুব্‌দুব্ শব্দ হচ্ছিলো। রক্তে কলোচ্ছ্বাস। ঘড়িতে আড়াইটা। এক গোছা নোট তুললো ও ব্যাগ থেকে। নিশ্চয়ই, হাত ভরে অমরেশ টাকা দিয়েছে, হাত উজাড় করে মীরা জিনিস কিনছে নিজের জন্যে, কিনবে।

নিজের জন্যে মীরা কীই-বা কিনেছে এই ক-মাসে। ক্যাশমেমো ভাঁজ করতে-করতে মনে-মনে গম্ভীর হয়ে গেল ও।

হ্যাঁ, পারেই তো। মীরার চাকরি হয়েছে। পুষ্প আদর করে বান্ধবীকে এই শাড়ি দিয়েছে। 'তোর বেরোবার ভালো কাপড় নেই।'

হীরেনকে কথাটা বলতে মীরার একটুও আটকাবে না।

ধরতে গেলে একরকম বিয়ের পর থেকেই তো মীরা কর্জ করে সংসার চালাচ্ছে, তার ওপর রুগীর পথ্য, ওষুধের খরচ।

আজকের টাকাটা যদি ও ওখানে না ঢালে, আলাদাভাবে খরচ করে তো দোষের হবে কি! অমরেশ যেমন তার জীবনে সংগোপনে রয়েছে, তেমনি এই টাকাটাও গোপন থাক। ইচ্ছে হলে মীরা শোধ করবে, ইচ্ছে না হলে করবে না। ওটা ওর নিজস্ব। কিন্তু তবু মীরা এর একটা অংশ সংসারের জন্যে হীরেনের জন্যে খরচ করলো। না-করে পারলে না।

পাশের স্টেশনারি দোকানে ঢুকে এক-টন কোয়েকার ওটস্‌, মাখনের কৌটো, একটা জেলি, একটা ভালো রেজর কিনলো মীরা। হীরেনের ভালো সেফটি-রেজর কোনো কালেই নেই। বিদ্বানরা চিরকালই নিজের সজ্জা শোভা বিলাস প্রসাধন সম্পর্কে উদাসীন। হীরেনও তাই।

কিন্তু তাঁদের মতো যদি সে উদার হতো।

বিয়ের পরে, বিয়ের পর থেকেও বেশি অসুখের পরে, মীরা বেশ লক্ষ্য করছে, ঈর্ষান্বিত হীরেন। শুধু কি ঈর্ষা, ঈর্ষায় লোকের চোখের তারা আচমকা এত ধারালো হয়ে ওঠে না, একদিকে সূক্ষ্ম প্রশ্ন অন্যদিকে সমবেদনার উচ্ছ্বাস,—বস্তুত হীরেন যে সময়-সময় কি করে, কি রকম হয়ে ওঠে তার গলায় সুর, চাউনি, মুখের হাবভাব তা সে নিজে বুঝতে পারছে না। মীরা বোঝে। স্ত্রীকে সন্দেহ করার তাগ-মুহূর্তে পুরুষ এই হয়। এই হলো হীরেন শেষ পর্যন্ত।

শাড়ির প্যাকেটটা বাম বগলের নিচে চেপে ধরে মীরা ট্র্যামের অপেক্ষায় দাঁড়ালো। জুতো, মাখন জেলি, ওট্‌সের কৌটো পুরেছে ও একটা থলের ভিতর। ডান-হাত টন্‌টন্‌ করছে ব্যাগ ও থলের ভারে। দরদর করে ঘাম ঝরছে গাল-গলা বেয়ে, বডিসটা প্যাচ্‌পেচে হয়ে উঠেছে। খোঁপার নিচটা লাগছে কেমন আঠা-আঠা।

ট্র্যামের দেরি দেখে বাসে উঠতো মীরা, প্রায় পা বাড়িয়েছে, স্থির হয়ে দাঁড়িযে গেল।

পুষ্পর বিশালকায় বুইক মীরার শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। টাট্‌কা ফুলের গন্ধে জায়গায ভবে ওঠে।

'খুব যে মার্কেটিং করছিস!' পুষ্প হাসছে। লম্বা গলা বাড়িয়ে দিয়েছে গাড়ির জানলাব বাইরে। রোদে কানের হীরা জ্বলছে।

'কদ্দুর?' মৃদু হেসে মীরা প্রশ্ন করলো।

'আপাতত ফিরপো, সেখান থেকে—' পুষ্প হঠাৎ মীরার দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে গাড়ির ভিতরে তাকালো। 'বলো?'

সুদর্শন তরুণ অল্প-অল্প হাসছে। লজ্জিত, আরক্ত। 'আমি কি করে বলবো, তুমি বলো।' পুষ্পর কোলের ওপর হাত রাখে সে। পুষ্প ঘাড় ঘোরালো মীরার দিকে।

'সেখান থেকে প্রিন্সেপ ঘাটে একটু বসে সোজা বোটানিক্যাল গার্ডেনে। এ-বেলার মতো এই প্রোগ্রাম।' ম্যানিকিওর-করা ডালিমদানার মতো ঝকঝকে নখে পুষ্প থুতনি চুলকালো। 'তোর খবর কি?'

'কি আর খবর!' গম্ভীর হয়ে মীরা গাড়ির ভিতরে চোখ রাখলো।

'অনুপ,—সুশীলের সঙ্গে পড়ে।' পুষ্প পরিচয় করিয়ে দেয়। ইনি মীরা চক্রবর্তী, আমার বন্ধু একসঙ্গে বেথুনে পড়েছি।'

মীরা হাত তুললো না, পুরুষ অনুপকুমার দুই হাত একত্র করে মীরাকে নমস্কার জানায়। ভোমরার চিকন পাখার মতো নতুন গোঁফের রেখা, পরিচ্ছন্ন আবেশচঞ্চল চোখ। সুশীলের সঙ্গে পড়ে মানে এ-বছর স্কটিশ থেকে আই.এ.পাস করলো।

'বেশ আছো।' মীরা পুষ্পর চোখে চোখ রেখে অল্প-অল্প হাসে।

'তুই-ই বা মন্দ আছিস কি।' পুষ্প একটা সিগারেট ধরায়। 'নয় কি?'

'কি রকম?' মীরা ভুরু কোঁচকালো।

'এই —অধ্যাপকের সঙ্গে প্রেম করলি, অধ্যাপককে বিয়ে করলি। গিন্নীবান্নী হয়ে এখন

বাজারটাজার নিয়ে ঘরে চললি।'

'ও।' মীরা ঠিক হাসলো না।

'তারপর? মিস্টার চক্রবর্তী আছেন কেমন?' পুষ্প সামাজিক হতে চেষ্টা করলো।

'এই একরকম।'

'এখন বেরুতে পারেন তো?'

'না, শরীর ঠিক শক্ত হচ্ছে না।'

পুষ্প চুপ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো। ডালিমদানার মতো লাল ঝকঝকে নখের ফাঁকে ধরা দামী সিগাবেট।

বাস এসে গেছে।

মীরা বললো, 'চলি।'

পুষ্প হাত বাড়িয়ে বাধা দেয়।

'কই, আর তো তুই আমাদের বাড়িতে গেলি না?'

'যাবো সময় পাচ্ছি কই।' মীরা অর্ধেক ঘুরে দাঁড়ালো। টাকা কর্জ করার পর পুষ্পর সঙ্গে আর একদিনও সে দেখা করে নি। মনে হতে মীরা বেশ লজ্জা পেলো।

'মিস্টার চক্রবর্তী বেশি বাইরে-টাইরে যাওয়া পছন্দ করেন না বুঝি?'

পুষ্প ফুলের পাপড়ির মতো লাল ঠোঁট ছড়িয়ে হাসলো।

'করতেন না, কিন্তু বাইরে এখন যাচ্ছে কে, কে আছে আর—'

'সে তো ঠিকই।' পুষ্প মৃদু ঘাড় নাড়লো।

'কিন্তু অকৃতজ্ঞ।' মীরা অকুণ্ঠে সখীকে জানায়।

পুষ্প চুপ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছড়ায়। অনুপ নতমুখ হয়ে বসে। শুনছে।

অপাঙ্গে একবার ওকে দেখে পুষ্প বললো,'ভয়ংকর স্বার্থপর জীব ওরা, পুরুষরা।'

'বাড়িতে না থাকলেই দুর্ভাবনায় মরে। মীরা গাঢ় নিশ্বাস ফেললো।

'তাই।' পুষ্প বলবো, 'যাক্‌গে, তুই পেসেন্স হারাবিনে, অসুখে ভুগে হযতো ব্রেন একটু ইরিটেটেড।'

'না-না, পুষ্প, ওই স্বভাব। বিয়ের আগে পুরুষের সব চেনা যায়, ওটা—

'কিন্তু তা হলে তো চলবে না, বাইরে তোকে আসতেই হবে। একটা কাজটাজ না করলে সংসার চলবেই বা কি করে?'

মীরা বললো, 'তাই বলছিলাম বেশ আছিস, এত তাড়াতাড়ি যদি বিয়েটা না করতুম।'

'তা এখন করবি কি।' পুষ্প, কুমারী পুষ্প পুরুষালি ভঙ্গিতে থুতনি তুললো, আবার একরাশ ধোঁয়া বার করলো মুখ ও ওর অদ্ভুত নিটোল নাসারন্ধ্র থেকে। 'আমি জানতাম, আমি জানি বলেই ও-কাজ করি নি, করছিনে।' অপাঙ্গে সে আবার গাড়ির ভিতরের পুরুষকে দেখলো।

মীরা একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেললো।

'চলি।' বললো ও আগতপ্রায় তৃতীয় বাসের দিকে চেয়ে।

'সুশীল গেছে বয়স্কাউটদলের সঙ্গে পুরীতে পিকনিকে করতে। অনুপ পড়েছে একলা। বলছিলো কাল, দিদি ড্রাইভিং শিখি নি, সুশীল ফিরে আসার আগে আমায় ওটা শিখিয়ে দাও। স্কাউট না হয়েও যে আমি অমানুষ হই নি এটা প্রমাণ করবো।' বলে পুষ্প ঠোঁট টিপে হাসলো।

'বেশ তো ভালো করে শিখিয়ে দাও।' মীরাও ঠোঁট টিপলো। আড়চোখে আর-একবার ও তরুণ শিক্ষার্থীর চিকন গোঁফের রেখা, পাউডারের ছোপ লাগা সুবলিত ঘাড়, কানের নিচ পর্যন্ত টানা তেরছা নিখুঁত জুলুপি, পাঞ্জাবির তলা থেকে উঁকি দেওয়া নেট্‌-এর গেঞ্জির ফুটকি, বাঁ-কব্জির ঘড়ি, পকেটের সিল্কের রুমালটা দেখে শেষ করলো।

'বাই-বাই।' পুষ্পর এক হাত স্টীয়ারিং হুইলে, অন্য হাত নেড়ে ও মীরাকে বিদায় জানায়।

'বাই-বাই। মীরা হাত তুললো।

পুষ্পর গাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

মীরা দাঁড়িয়ে থেকে তৃতীয় বাসটাও চোখের সামনে চলে যেতে দেখলো। তখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হলো না ওর। যেন ঘুরতে ইচ্ছে হচ্ছিলো এমনি, অকারণ।

কোথায় যাই, কোথায় যাবো ভাবতে-ভাবতে অজান্তে কখন ও এসপ্ল্যানেড-মুখো ট্র্যামে উঠে পড়লো।

চার

মেটে-রং জামার ওপর নীল টাই ঝুলিয়ে এসেছে বিপদবরণ।

যেন এইমাত্র সে সেলুন থেকে ফিরছে। সাবানের শুকনো ফেনা কানের নিচে, ঠোঁটের ডগায়। হীরেন লক্ষ্য করলো।

'বোসো।' আঙুল দিয়ে উকিল-বন্ধুকে সে একটা বেতের মোড়া দেখিয়ে দেয়, সুইচ জ্বেলে দেয়। অন্ধকার হয়ে গেছে ঘর।

কিন্তু বিপদের কানে কথা ঢুকছে না।

'নাইস্ নাইস্!' টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সে চেঁচাচ্ছে, কখনো ছুটে যাচ্ছে টিপয়ের কাছে।

'ওটা কি, ক্রীমারি বাটার। খাঁটি অস্ট্রেলিয়ান চীজ। সারা কলকাতা শহর ঘুরে সেদিন আমি একটা যোগাড় করতে পারি নি, ব্রাদার।'

'মীরা এনেছে।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। ওয়ান্ডরফুল তোমার মিসেস।' বিপদ চড়া-গলায় বললো। 'এই পর্দার কাপড় কত করে আনলো?' বিপদের চোখ চলে গেছে জানলায়।

'দেড় টাকা, কি পৌনে দু-টাকা গজ।' হীরেন আমতা-আমতা করে বললো, 'আমি সঠিব জানি না।'

'বিউটিফুল।' বিপদ আর-একবার পর্দার গায়ে আঙুল বুলোয়। যেন পর্দাটাকে আদর করলো আঙুল বুলিয়ে। 'তারপর, মিসেস গেছেন কোথায়?'

'এই এলো বলে। হীরেন মোড়ার দিকে আঙুল দেখায়। 'তুমি বোসো।'

'বসবে, বসবো।' কেবলই ঘুরে-ঘুরে বন্ধুর গৃহ ও গৃহসজ্জা দেখছিলো বিপদ। 'এখানে চাঁপা ওখানে রজনীগন্ধা।' টেবিল ও টিপয়ের ওপর চোখ-বুলিয়ে উকিল হীরেনের কাছে ফিরে এলো। 'তোমার মহিষীর রুচি আছে।'

'তারপর, তোমার খবর কি?'

'ক্রাইসিস! টের পাচ্ছো তো?' ভয়ংকর ময়লা একটা রুমাল বার করে বিপদবরণ তার মোটা ঘাড় মুছলো।

'তারপর, তোমার খরব কি?'

এই তো, প্রায় মরণের দরজা থেকে ফিরে এলাম।' হীরেন মন্দ গলায় হাসলো।

'হ্যাঁ, শুনছিলাম কার মুখে। কিন্তু জানো তো ব্রাদার লক্ষ ভাবনা মাথায়। আর এদিকে লক্ষ দিন ভাবছি চক্রবর্তীকে একদিন দেখতে যাই। অথচ কার্যত—'

হীরেন চুপ।

'যাক্‌গে, সেরে যে উঠেছো। এত বড়ো অপারেশন।' বিপদ চোখ ফেরালো চশমা পরা মীরার

ফটোর দিকে। ঘাড় মোছা শেষ করে রুমালটা পকেটে ঢোকালো।

'তোমার প্র্যাকটিস চলছে কেমন?' হীরেন প্রশ্ন করলো।

'অষ্টরম্ভা।' বিপদ চোখ না ফিরিয়ে বললো, 'দু-বেলা দুটো ট্যুইশানি করছি প্র্যাকটিসের ওপর, তবু কুলোতে পারছি না। কোর্টে দুপুরের টিফিন সারি এখন চিনাবাদাম চিবিয়ে, উড়ের চা-এ, ভাতের নিত্যসঙ্গী দাঁড়িয়েছে বিউলি-ডাল আর পুঁইডাঁটা।'

হীরেন চুপ।

'ভালো।' বিপদ হঠাৎ অধ্যাপকের দিকে মুখ ফেরায়, যেন কি-একটা কথা মনে পড়েছে তার। 'তুমি—তোমাদের আজকাল—'

বিপদ থেমে গেল।

'বলো, থামলে কেন। হীবেন উকিলের চোখ দেখে। 'মীরার দাদা কিছু-কিছু হেলপ করছে।'

'তাই।' উকিল রুমালটা আবার পকেট থেকে টেনে বার করে। 'আমিও ভাবছিলাম।' বলে সে ঘাড়ে রুমাল বুলোতে-বুলোতে আবাব বন্ধুর গৃহ ও গৃহসজ্জা দেখতে থাকে।

একসঙ্গে পড়েছে দু-জন, এক স্কুলে, এক কলেজে।

হীরেনের মাথা বেশি, হয়েছে অধ্যাপক। বিপদের গলা বড়ো হয়েছে উকিল।

'স্টার্টিং-এই ক্রাইসিস শুরু হলো তো আমরা করবো কি।' বিপদ এক-সময়ে নিচু গলায় বললো।

হীরেন থুতনি নাড়লো।

'তা তোমার স্ত্রীর যখন ডিগ্রী আছে, একটা দুটো মেয়ের ট্যুইশানি করতে পারেন।'

হীবেন কিছু বললো না।

'কি চাকবিতে দিতে পাবো।' যেন বন্ধুব স্ত্রী সম্পর্কে বন্ধু সসংকোচে প্রস্তাবটি তুললো, কি করা, আজকাল অনেকেই এটাও করছে। একলার আয়ে কারুব দশ দিনের বেশি চলছে না। মিডল ক্লাসটা একেবারে মরে যাবে।'

'দেখি।' হীরেন এমন সুরে কথাটা বললো, যেন মীরা সম্পর্কে এখনো কিছু স্থির হয় নি। বলে সে উলটোদিকের দেয়ালে চোখ রাখে।

'যদি ও ম্যাট্রিক পাস, তবু আমি ঢুকিয়ে দিতাম আমার বউকে কোনো অফিস-টফিস। কিন্তু সদিচ্ছা আমাদেব পূরণ হয় কই।' বলে বিপদবরণ লম্বা একটা নিশ্বাস ফেললো।

হীরেন উকিলের মুখের দিকে তাকায়।

'তিন বছর বিয়ে হয়েছে। অলরেডি দুটো এসে গেছে, আরও একটি আসছে।' বিপদ হাতের তিনটি আঙুল তুলে ধরলো, 'চাকবি করবেন উনি কখন।'

হীরেন মৃদু হাসলো।

'না ব্রাদার। ইচ্ছে ছিলো একটু ভালো স্ট্যাণ্ডার্ডে থাকবো, একটু স্টাইলে চলবো, তা—' বিপদবরণ আক্ষেপের নিশ্বাস ফেললো।

'ভালো কথা, যতির খবর কি?' যেন প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে হীরেন যতিশঙ্করের কথা তুললো। তাদেরই আর একটি বন্ধু। কিন্তু কপালগুণে উকিল ও অধ্যাপকের চেয়ে অনেক বেশি উঠে গেছে। মুখ বা মাথা নয়, তার ছিলো বেশি সাহস। প্রথমে ঢোকে এমনি সৈন্য হয়ে যুদ্ধে। এখন আছে কমিশনড র‍্যাঙ্কে। পাইলট।

'ও, তুমি বুঝি শোনো নি।' বিপদের চেহারাটা এবার একটু প্রফুল্ল দেখায়। 'ভয়ানক ট্র্যাজেডি ঘটেছে ওর জীবনে, ওদের, শুনলাম।'

'কি রকম?' হীরেনের চেহারা কালো।

'বউটা বেজায় সুন্দরী ছিলো, জানতে তো?'

হীরেন থুতনি নাড়লো। 'খুব বেশিদিন তো বিয়ে হয় নি?' বললো সে।

'ওই, ওই ছ-মাস ন-মাসেই ওদের যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ—'বিপদ গলার স্বর মিহি করলো 'ওর বাবা হায়ার-সার্কেলের মানুষ—আমাদের গরিবদের আলোচনা করা সাজে না যদিও কিন্তু—' বিপদ তৎক্ষাণাৎ চোখ বড়ো করলো, 'যা ফ্যাক্ট তা বলতে দোষ কি। আর, আর সত্যি, যতির জন্যে দুঃখু হয়, আমাদেরই ও একজন ছিলো তো।'

'কি ব্যাপার?' হীরেন অস্পষ্ট গলায় প্রশ্ন করলো।

'পালিয়েছেন শ্রীমতী।' বিপদ খসখসে গলায় বললো, 'অবশ্য প্রথমটায় যতিও বুঝতে পারে নি। চিরকালই ওর মনটা শাদা, জানো তো।'

হীরেন মাথা নাড়লো।

'অমুক অফিসারের বাড়িতে পাঠিয়েছে বউকে ডিনার খেতে, তমুক অফিসারের লন-এ পাঠিয়েছে টেনিস খেলতে।' বিপদ গুজগুজ করে হাসলো। 'অবশ্য না পাঠিয়েও উপায় ছিলো না, ওদের যা ল্যাজকাটা সোসাইটি নব-দিল্লির!'

'তারপর?'

'আর তারপর কি।' বিপদ হাসি বন্ধ করে হীরেনের চোখে চোখ রাখলো। 'যতির ভালোমানুষির অ্যাডভান্টেজ নিলে মেয়েটা। ল্যাজ কাটালো।'

হীরেন নীরব।

বিপদ রুমালটাকে ভাঁজ করে-করে একটা অমলেটের সাইজে এনে দাঁড় করালে। একটুক্ষণের স্তব্ধতা। বুঝি ঝি এসে গেছে। রান্নাঘরের টুকটাক আওয়াজ শুনে হীরেন অনুমান করে।

'আমাদের অশান্তি টাকাপয়সা না-থাকার, রোগশোকের, আর ওদের অশান্তি—'

বিপদ কথাটা শেষ করার আগে হীরেন বললো, 'আমার মনে হয়, আমি ভাবছিলাম, যতি যদি একটু শক্ত হাতে—'

হীরেনকে শেষ করতে না দিয়ে বিপদ প্রবল বেগে মাথা নাড়লো, চোখ টিপলো।

'কিসসু না ব্রাদার; বলছো, যদি শক্ত হাতে রাশ টেনে ধরতো—উঁহু, বেরোবার যে সে বেরোবেই। ওই এক-একটা টাইপ থাকে। সে-সব মেয়ে যে কি আমি তুমি আইডিয়া করতে পারি না।'

হীরেন কথা বললো না।

'আমি ঠিক গুলি করে মেরে ফেলতাম।'—বলে উকিল ঘোঁৎ করে নাকের শব্দ করলো। 'তারপর, তোমার মিসেস যে এখনো—'

'আসবে, এক্ষুনি এসে যাবে।' হীরেনের গলায় অস্বস্তি ছিলো, অবশ্য তা ধরতে পারার মতো সূক্ষ্ম বোধশক্তি উকিলবন্ধুর নেই বুঝে হীরেন অল্প হাসলো। ' তোমার এত তাড়া কিসের, কোথায় যাচ্ছো?'

'বা—রে, সাতটা বাজে ট্যুইশানি আছে না? আচ্ছা, বেশ—' বলে উকিল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

'একটু চা-টা—'আমতা-আমতা করে হীরেন।

'আরেক দিন। মিসেস ঘরে নেই তো ঝিয়ের হাতে চা খাওয়াবে নাকি? বিপদ চৌকাঠের দিকে এগিয়ে গেল। 'আরেক দিন।'

এবং চৌকাঠ পার হওয়ার আগে সে আর-একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুর ঘর দেখলো, ঘরের ভিতরের সজ্জা টেবিল, টিপয়, দেয়াল, দেয়ালে-টাঙানো মীরার ফটো, ফটোর নিচে ঝুলানো একটা বিলিতি কোম্পানির ক্যালেণ্ডার।

'নাইস্ নাইস্।'

ঠিক কোন্ জিনিসটিকে লক্ষ্য করে উকিল শেষবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো হীরেন টের পেলো না।

'চললে?'

'হুঁ।' জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করে বিপদবরণ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। 'সাময়িক অসুখ যদিও তোমার, আমার চেয়ে তুমি ঢের ভালো আছো হে, ভালো থাকবে।'

'কি রকম?' হীরেন ঢোক গিললো।

বিপদ সিঁড়ির কাছে চলে যায়। 'ওই তো বললাম, আমার ওটা শুধু খাওয়া ঘুম আর ইয়ে দেবার জন্যে সংসারে এসেছে। তোমার উনি, মিসেস চক্রবর্তী অনেক বেশি স্মার্ট, বুঝেসুজে চলেন।' বলতে-বলতে উকিল সিঁড়ির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিপদবরণের ভাবধারায় হীরেন দু-বার চিন্তা করলো। এ-ঘরে একটি শিশু থাকলে কেমন হতো। মীরার ছেলে, ছেলে বা মেয়ে। হীরেনের চোখের সামনে নতুন ছবি ঝুলছিলো।

একটা দোলনা ঝুলিয়েছে মীরা ওই কোনায়। টিপয়টা রজনীগন্ধাহীন হয়ে একটা ফীডিং-বট্ল্ ধরে আছে। বেবি-পাউডার আব তোযালে রাখা হযেছে বোতলের পাশে। কাজলের কৌটো। হীরেন মাথা নাড়লো। নিশ্চয়ই শিশুকে কোলে নিয়ে মীরা পরিচর্যা করতো না, করবে না। ওই হতো। হীরেন ভাবলো, আর পরক্ষণেই আবার তার মনে হলো, মীরার পেটে কোনো শিশুই হয়তো আসবে না। হয়তো কেন, নিশ্চত। এ-ঘরে দোলনার জায়গা কই। এঞ্জেল মীরা চক্রবর্তীর ঘর এটা।

হীরেন চশমাহীন মীরার ফটোর দিকে তাকিয়ে একটা স্তিমিত নিশ্বাস ফেললো।

টেবিল থেকে গ্লাস তুলে একটু জল খেলো। তারপর ফিরে গেল কুমারী মীরার কাছে। যদি ঘরে শিশু থাকতো তো মীরা কক্ষনো এতক্ষণ বাইরে থাকতো না। ছুটে আসতো। হীরেনের অসুখের দরুন কোনো কাজে বাইরে গেলেও ও বেশিক্ষণ বাইরে থাকতো না। কিন্তু সে এ নয়। অন্য টাইপ।

সারা সকাল বাইরে ঘুরে এসে ওই যে স্নানের সময়, খেতে বসে একটু সময়ের জন্যে মীরা ঘরোয়া সাজ ধরেছিলো, তাও এখন একটানা, দু-ঘণ্টা এই ঘরে একলা থাকার পর হীরেন প্রায় ভুলতে বসেছে। নিশ্চয়ই, এ-ঘরে অসুস্থ স্বামী আছে, তার দুধ, দম দেওয়া ঘড়ি, গরম রাগ, থার্মোমিটার, রুগীর মনকে প্রফুল্ল রাখতে দু-রকমের ফুল। চাঁপা আর রজনীগন্ধা। হীরেন পায়চারি করলো, আরো-কিছু সময় পায়চারি করলো। ঘড়ি দেখলো। সাতটা বেজে বত্রিশ মিনিট।

'মলতী কি করছো?'

'এই-যে দাদাবাবু।'

লম্বা গড়ন। কালো-রং, কালোপাড় ফর্সা একখানা কাপড় পরনে। টান করে বাঁধা খোঁপায় মালতী শুকনো মোরগ-চণ্ডী ফুল কি খয়েরি ট্যাসেল জড়িয়েছে, ঘোমটাটা হঠাৎ টেনে দিলে বলে হীরেন ভালো দেখতে পেলো না। রান্নাঘরের চৌকাঠের এ-পাশে দাঁড়ায় সে।

'তোমার দিদিমণি এখনো ফিরলো না।'

'কোথায় গেল?' মালতী মিশিমাখা দাঁতে অল্প-অল্প হাসে।

'একটু কাজে বাইরে গেছে।' গম্ভীর হয়ে হীরেন মেঝের দিকে চোখ নামালো। মেয়েটি অঞ্জনবাবুর বাড়ি থেকে এসেছে, মানে অঞ্জনবাবুর বাড়িতে যে পুরোনো ঝি-বুড়ি আছে তার মেয়ে। মালতী মীরার ঝি। মীরার মানুষ। দিদিমণি কাল থেকে কাজে বেরোবে তাই ও এসেছে রান্নাঘর সামলাতে।

'দাদাবাবুর কিছুর দরকার আছে?' মালতী প্রশ্ন করলো। 'এক্ষুনি তোমার ওভালটিনের জল গরম হবে।'

ফিরে যাচ্ছিলো হীরেন, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়।

'তোমার স্বামী আছে, মালতী?'

'আছে দাদাবাবু, সিঁথিতে সিঁদুর দেখছো না?' মালতী ভ্রূভঙ্গি করে হাসলো।

হীরেন মালতীর সিঁথিমূলে সিঁদুর দেখতে পেলো। বয়স ত্রিশ অতিক্রান্ত। তাই মীরার চুলের মতো এই চুলে যৌবনের চাকচিক্য তত না থাকলেও ধূসর হয়ে যায় নি।

'তুমি যে খুব ছটফট করছো, দাদাবাবু।'

'কি রকম?' হীরেন চমকে ঝিয়ের চোখ দেখে।

মালতী মুখ নামিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে। দুপুরের এঁটো গ্লাস ও বাটি ধুচ্ছিলো ও। হাতে একগাছি করে পাতলা সোনার চুড়ি। জল ঘেঁটে-ঘেঁটে মালতীর হাতের আঙুল ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—হীরেনের চোখে পড়লো।

'তোমার স্বামী কি করে?'

'সিনেমা-কোম্পানির দারোয়ান।'

'ভালো।' হীরেন এক-পায়ের ওপর দাঁড়ায়। 'তোমরা দুজনেই রোজগার করছো।'

মালতী একটু চুপ থেকে বাসনগুলো মুছে-মুছে সাজিয়ে রাখে।

'না, স্বামী আমার রোজগারে খায় না। আলাদা থাকা খাওয়া চলছে।'

'কি রকম?' হীরেন চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'তোমরা লেখাপড়া জানা লোক গো বাবু, মাজাঘষা মন। মুখ্খুর কীর্তি শুনলে হাসবে ছাড়া কি।' মালতীর চোখের হাসিতে এখনো বেশ ধার আছে, হীরেন লক্ষ্য করলো।

'মুখ্খু কি করছে শুনি?' ঠিক হাসলো না হীরেন, কৌতূহলে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়ালো।

'মান হয়েছে বাবুর।' মালতীর চোখ এবার হাসলো না, ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ঝরলো সুগোল নাসারন্ধ্র থেকে।

'কি হয়েছে বলো না ছাই!' হীরেন হাসির ভঙ্গিতে এবার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলো। 'অত ঘোরাচ্ছো কেন।'

যেন ফিক্ করে মালতী এই একটু হেসে আবার পলকে গম্ভীর হয়ে যায়।

'গোঁয়ায়, গোঁয়ারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমার মরণ হয়েছে।' মালতী ঠুক্ করে গরম জলের কেটলিটা উনুনে বসায়, শেল্ফ থেকে কাপ-ডিশ টেনে নামায়, দুধের টিন ওভালটিনের কৌটো রাখে পায়ের ধারে মাটিতে।

'এমন বিয়ের কপালে নাথি মারি, এমন ভালোবাসার মুখে আগুন। মালতী আর-এক ঝলক গরম নিশ্বাস ফেললো। হীরেন চুপ। মালতী বললো, 'আর আসবে না মিন্সে এই দোরে, আসুক কাটারি দিয়ে নাক কান কেটে দেবো। আমার বয়েস যায় নি, আমি মরবো না।'

কাটারির পরিবর্তে মালতী হাতের দুটো লম্বা আঙুল বাড়িয়ে দেয় হীরেনের সামনে।

কালো আঙুলে শাদা পাথর বসানো আংটির ঝলক ওঠে।

কিন্তু মালতীর চোখে কাটারির ধার।

কলেরায় মরে যায় ললিত, ললিতের অচৈতন্য দেহ নিয়ে রাত দুটোর সময় একলা ও ক্যাম্পবেল হাসপাতালে ছোটে।

'অ্যাম্বুলেনস' ছিলো না। প্রতিবেশী গোপাল স্যাক্‌রার কাছে রাত দুপুরে, ধরতে গেলে জলের

দরে, কানপাশা দুটো বিক্রি করে টাকা যোগাড় করলো মালতী। তারপর ট্যাক্সি করে ললিতকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

যমের দরজা থেকে ফিরে এসে ললিত হাজরা জেরা করে, রাত্রে একলা কেন স্যাকরার দোকানে ঢুকেছিল মালতী, ওর বাইরে গিয়ে ট্যাক্সি ডাকার দরকার ছিলো কি। পাড়ায় আর লোক ছিলো না, ঘরে কি বুড়ি মা ছিলো না? না-হয় ম'রে যেতো ললিত।

হীরেনের চোখে চোখ রাখে মালতী। 'ব্যারাম শাশুড়ীবুড়িরও হয়েছিলো। বুড়িকে না দেখে জোয়ান স্বামীকে দেখলুম কিনা, তাই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ও আমার কানপাশার কথা জিজ্ঞেস করলো না, দশদিন কি খেনু খোঁজ নিলে না, করলো আমার চরিত্রি সন্দেহ। পুরুষ!'

'এর আগে বুঝি তুমি বাইরে যেতে না?' হীরেন নিচু-গলায় বললো।

মালতী মাথা নাড়লো। 'ও যেতে দেবে বাইরে! বলে কি, খাই না-খাই, বাঁচি মরি কুটোটির জন্যে আমি তোকে বাইরে পাঠাচ্ছি না, তুই আমার বুকের পায়রা, ঘরের পরী।'

হীরেন দুই পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়। 'বেশি ভালোবাসতো আর কি বউকে ললিত।'

'ভালোবাসার ফাঁস, ফাঁসি পরিয়েছিলো ও গলায় আমায় দিনরাত আট্‌কে রেখে।' মালতী ওভালটিনের কাপ হীরেনের হাতে তুলে দেয়। 'মিন্‌সের মন ছোটো গো দাদাবাবু।'

হীরেন বাটিতে চুমুক দেয়, তারপর মুখ তোলে।

মালতী চুপ। যেন আর-কিছু বলার নেই। হাত বাড়িয়ে বঁটি নেয়, টুকরি থেকে একটা বেগুন দুটো শুকনো ঝিঙে তোলে।

শূন্য কাপটা হাত থেকে এক-সময় নিচে নামিয়ে রাখলো হীরেন।

'এই-যে ঘরে-ঘরে এখন দিদিমণিরা সব বাইরে যাচ্ছে, দিনভর বাইরে থাকছে, চাকরি করছে, ঠেস খেয়ে, গা ঘেঁষে চলছে রাস্তায় গাড়িতে রাজ্যের পুরুষের, দাদাবাবুরা কেউ মন খারাপ করে মুখ ভার করে বসে আছে কি?'

তরকারি কুটতে-কুটতে মালতী নিজের মনের কথা বলে। 'থাক তুই তোর মনের খুঁতখুঁতুনি নিয়ে। আমার দিন কাটবে। তোর কাজে রাতে একলা বাইরে গেছি তো আমার জাত গেছে কেমন?'

হীরেন কড়িকাঠের দিকে তাকায়।

'বলেছি, সব বললাম সেদিন মীরা দিদিমণিকে; বলে, কোন্ দুঃখে তুই আর ললিতের কাছে যাবি, মিছে বদনাম দিলে যে। লেখাপড়া জানা মেয়ে তো, বুদ্ধি পরামর্শ দেয় ভালো।' মালতী হীরেনের মুখের দিকে তাকায়। 'গেল-বোশেখে মিন্‌সে একবার সাধতে এসেছিলো।'

'এখন বুঝি একলা আছো?'

'কোন্ দুঃখে?' মালতী মুচকি হাসে। মাথার কাপড় সরে যেতে হীরেন দেখলো সুন্দর খয়েরি রঙের একটা ট্যাসেল জড়ানো ওর খোঁপায়। 'আমি বুড়িয়ে গেছি তুমি বলছো কি গো দাদাবাবু?'

'না, তা না—' হীরেন অস্পষ্ট গলায় বললো, 'আমি জানি না সব তোমার, জিজ্ঞেস করছি।'

দাদাবাবুর চোখ দেখে মালতী সন্তুষ্ট হয়। ভুরু নামিয়ে বলে, 'আছি কেশবের সাথে। হিঁদুর মেয়ের তো দু-বার বিয়ে নেই, অই এক সঙ্গে থাকা আর কি।'

'কি করে কেশব?' ইচ্ছে না থাকলেও হীরেন প্রশ্ন করে, আরও একটু সময় চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'রেশনের ট্রাক চালায়। দিদিমণি জানে।'

'ভালো।'

'দু-জনে রোজগার করছি, আছি সুখে।' মালতীর চোখ ঝল্‌সে ওঠে। 'এই নতুন আংটি করলাম, চুড়ি গড়ালাম। স্বামীর ঘরে থাকতে তেল পাই নি গো দাদাবাবু মাথায় মাখবার, গায়ে মাখতে একদিন একটা সাবান। এক-কাপড় সেলাই করে ন-মাস পরেছি।'

ললিতকে ছেড়ে এসে ভালোই হয়েছে' হীরেন বলতে চায়, হাসতে চায়।

কিন্তু মালতী তখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে একটা পিঁপড়ে নিয়ে। পিঁপড়েটা বুঝি ওর ঘোমটার নিচে ঢুকে ঘাড় ও পিঠে ছুটোছুটি করছে। দাঁড়িয়ে মালতী তাড়াতাড়ি আঁচল ঝাড়লো—পিঠ চুলকালো। খোঁপা ভেঙে পিঠময় ছড়িয়ে পড়ে। মালতীর অনেক চুল।

সদ্যফোটা বকুল ফুলের গন্ধ নাকে নিয়ে হীরেন আস্তে-আস্তে সেখান থেকে সরে এলো।

পাঁচ

ভোমরা।

ভোমরা কাঁপছে, ওর ঠোঁট নড়ছে উত্তেজনায়। চোখের রং ঠিক লাল নয়, গোলাপী হ'য়ে আছে চাপা চোখের জলে, চাপা আগুনে, ক্রোধে।

সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো, মীরাদের মধ্যে সবচেয়ে দেখতে ছোটো। কলেজে থাকতে যেমন ছিল এখনও তেমনি। পুতুলের মতো নাক চোখ গলা, ছোট্ট শরীর নিয়ে সেই ভোমরা। এখনো ফ্রক পরতে বাধা নেই।

মীরা ওর কাঁধের ওপর হাত রাখলো আস্তে। কি, তুই আমায় সব বল্ না।'

'ব'লে কিছু লাভ নেই।' ভোমরা মীরার হাত সরিয়ে দুর্বাব ওপর বসে পড়লো।

কার্জন পার্ক। শ্রাবণের আকাশ মেঘে-মেঘে কালো নীল হ'য়ে আছে।

হোয়াইটওয়ের ঘড়িতে চারটে বেজে পনেরো। একটু দূরে একঝাঁক সূর্যমুখী মাথা জাগিয়ে চেয়ে আছে মীরাদের দিকে। আর আল্তো হাওয়ায় একটু-একটু নড়ছে। সূর্যমুখীর জঙ্গলের ও-পাশ দিয়ে ঘড়ঘড় ক'রে আর-একটা ট্র্যাম চ'লে গেল।

মীরা ও ভোমরা চুপ।

'তারপর, তুই কেমন আছিস?' ভোমরা মীরার চোখের ভিতরে তাকায়।

'এই একরকম।' মীরা হাতের জিনিসগুলো ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখে। ভোমরা আড়চোখে দেখলো নতুন শাড়ি, জুতো, মাখন, জেলি, ওটসের কৌটো।

'বাজার করতে বেরিয়েছিলি বুঝি?' এক ঝলক নিশ্বাস ফেলে ভোমরা বললো, 'তোর সঙ্গে এত বছর পর হঠাৎ ট্র্যামে এমনভাবে দেখা হবে সত্যি ভাবি নি।' ভোমরার চোখে চকচক করছে।

মীরা চুপ।

ভোমরা ওয়েলিংটনের কাছাকাছি হঠাৎ কোথা থেকে গাড়িতে ওঠে। দুই সখীতে আচমকা তখন দেখা।

'বিয়ের পর থেকে বরাবর তোরা কোডার্মায় ছিলি?' মীরা প্রশ্ন করলো।

'হুঁ।' ভোমরা ঘাড় ফেরালো। 'চার বছর।'

'কলকাতায় তুই কবে এসেছিস?'

'এক মাস। কিছু বেশি।'

'এই এক বছর ছিলি কোথায়, কার কাছে?' মীরা সামনের দিকে ঝুঁকে বসে।

'দিদির কাছে, মীরাটে।'

ভোমরা মীরার চোখের ভিতরে তাকায়। মীরাও ভোমরার চোখ থেকে চোখ সরায় না।

'কি বলছে মিস্টার মজুমদার?' অস্ফুটে মীরা প্রশ্ন করলো।

বলার আগে আবার ভোমরার ঠোঁট নড়লো, গলার স্বর কাঁপলো, মৃদু ঘন নিশ্বাস ফেললো একটা :

"তুমি দিন-দিনই আমার চোখে, আমার কাছে ছোটো হয়ে যাচ্ছো ভোমরা, ছোট্ট হয়ে গেছো।"

মীরা চুপ।

ভোমরা তার স্বামী মিস্টার মজুমদারের উক্তির পুনরুল্লেখ করছিলো :

"আমি দিন-দিনই যেন কেমন আর্টিস্ট হয়ে উঠছি। চোখ কেবলই এখন লম্বা-টাইপ খুঁজছে, তোমার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা শরীরের মেয়ে।"

মীরার চোখের পাতা নড়ে না।

"ডল্—সময়-সময় ও আমায় আদর করে ওই ডাকতো।' ভোমরা মীরার ভুরুর ওপর দৃষ্টি রাখে। 'বলতো—'কিন্তু আমি টায়ার্ড, সত্যি অত ছোট্ট পুতুল নিয়ে আর খেলা এখন ভালো লাগছে না।"

ভোমরার পাখির নাকের মতো বাঁকা সরু ছোট্ট নাকের ওপর চোখ রেখে মীরা দুঃখে ঠোঁট কামড়ালো। 'পশু, বিস্ট!' মীরা বিড়বিড় করে উঠলো, 'তো জিজ্ঞেস করেছিলি কি, কি অপরাধ তোর? কেবল শরীরে ছোট্ট হওয়া?'

ভোমরা নিঃশব্দে নখ দিয়ে একটা দূর্বাঘাসের বুক চিরে ফেললো।

'দীর্ঘাঙ্গীর দেখা পেয়েছে কি? অমানুষ!' মীরা ফিসফিসিয়ে উঠলো, 'লালসা।'

ভোমরা নীরব। কিছুক্ষণের স্তব্ধতা।

দূরে সূর্যমুখীরা বাতাসে কাঁপছে। আর-একটা ট্র্যাম যাচ্ছে নতুন সবুজ আলো জ্বেলে। ভোমরা আড়চোখে আপন হাতঘড়ির সঙ্গে চৌরঙ্গির ঘড়ির সময় মেলায়। তারপর চুপ করে থাকে। ছ-টা পনেরো।

'বেবি কার কাছে?' মীরা প্রশ্ন করলো।

'আমার কাছে। মৃদু কেশে ভোমরা গলা পরিস্কার করলো।

'ঐ একটি তো?'

'হুঁ।' ভোমরা বললো, 'অবিশ্যি কলকাতায় আসার আগে আমি দিদির কাছে রেখে এসেছি খোকাকে, মীরাটে।'

'না রেখে এসে করবি কি। অতটুকুন বাচ্চা নিয়ে ঘুরবি কত এখানে?'

ভোমরা আকাশের দিকে মুখ করে চুপ।

একটু পরে মীরা বললো, 'এখানে মিস্টার মজুমদার কোথায় আছেন জানিস না?'

ভোমরা মাথা নেড়ে 'না' বললো।

'তুই আছিস কোথায়?'

'কাকাবাবুর বাসায়।'

মীরার মনে পড়লো ভোমরার এক কাকাবাবু আছেন গড়পাড় রোডে।

সেই ভোমরা, মীরার মনে আছে, কলেজের কমনরুমে পিং-পঃ কি বাগাটেলির আসরে যোগ না দিয়ে নিজের মনে স্ট্যাম্প-এর অ্যালবাম খুলে বসতো, কি বিলিতি বা ভালো বাংলা উপন্যাস। তখনই বোঝা গিয়েছিলো সত্যি ওই ছোট্ট মেয়ের মধ্যে একটা বিশেষ কিছু আছে, একটা বিশেষ ঘটনা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, নইলে, ও এমন আলাদা হয়ে যাবে কেন,—যাচ্ছিলো কেন হঠাৎ এক-ছুটিতে শিলং-এ থেকে ঘরে এসেই। বোঝা গিয়েছিলো পরের ছুটিতে যখন আবার ও শিলং-এ চলে যায়।

আর ফিরে এলো না।

ভোমরার আর বি. এ. পরীক্ষাই দেওয়া হয় নি। দেখতে সকলের চেয়ে ছোটো। কিন্তু পরীক্ষায়, মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে দামী পরীক্ষায় ও সকলের বেশি নম্বর তুলেছিলো।

কলেজে বেশ সোরগোল পড়ে গিয়েছিলো বিলেত-ফেরত পাকাপোক্ত কোনো-এক ইঞ্জিনীয়ারের

সঙ্গে ভোমরার প্রেম ও আকস্মিক পরিণয়ে। বিয়ের পর ও শিলং পাহাড় থেকে কোডার্মার খনিতে উড়ে গেছে প্লেনে।

কলকাতায় সখীদের সঙ্গে আর দেখাই করে নি। বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের গিন্নী হয়ে মীরাদের মনের আকাশে সুদূর নক্ষত্রের মতো বিরাজ করছিলো প্রতিভাশালিনী এই ডল্। সত্যি, কী ভয়ংকর ঈর্ষা করেছিলো সেদিন মীরা আব তার সখীবা তাদের খুকীর মতো দেখতে বান্ধবীকে।

নক্ষত্র ছিটকে পড়লো মাটিতে।

ভোমরা ফিরে এসেছে।

আলো-অন্ধকারে বিচিত্র হয়ে গেছে পার্ক। মুখের রেখা দেখা যায়, রং বোঝা যায় না।

'উঠি, চলি এবার।' ভোমরা নড়ে ওঠে।

'বোস।' মীরা মৃদু ধমকের গলায় বলে, 'তোর কাকাবাবু জানেন?'

'বলেছি, না বলে করবো কি।' ঝিরঝিরে একটু হাসি এলো যেন ভোমবার গলায়।

মীরা ঢোক গিললো। কি বলেন তিনি।'

"তোমরা সব আধুনিক-আধুনিকা, তোমাদের মতিগতি বোঝা আমার পক্ষে কঠিন, যা খুশি করো।"

'দুঃখে বলেছেন,' মীরা বললো, 'এর বেশি আর কি বলবেন তিনি, কী-ই-বা করার আছে তাঁর।'

চৌরঙ্গির আকাশে বিজ্ঞাপনের রক্ত-ঝড় বইছিলো, ভোমরা একদৃষ্টে চেয়ে। উইলস, ফোর্ড, ডিল্যুক্স। এক সেকেন্ড তিনটে গাড়ি ও পাঁচটা সিগারেটেব নাম পড়লো মীরা।

'কি কববি এখন ঠিক করেছিস?'

'কিছুই না।' ভোমবা মীবার দিকে মুখ ফেরায়। 'যদি আমার অবস্থা তোর হতো তুই কি করতিস, কি করা উচিত তুই-ই বলে দে মীরা। বুদ্ধি ঠিক কবতে পাবছি না।'

মীরা চুপ।

'দিদি বলছে ফিরে যেতে কাকাবাবু বলছেন তুই আমাব কাছে থাক, পড়াশোনা কর। কিন্তু এ-দিনে আর একজনের ওপর—'

মীরা বুঝলো ভোমবা কি বলতে চায়।

'একটা বাচ্চা হয়ে আমি ঠেকে গেছি, নইলে, তা না হলে, আমিও কি একটা চাকরি-টাকরি নিয়ে থাকতে পারি না, মীরা। রঙের নেশায় আমিও কি চোখ ভরে রাখতে পারতুম না আলাদাভাবে বেঁচে? কিন্তু বেবিকে কোথায় রাখি, কাকে দিই—'

অস্পষ্টতায়, দীর্ঘশ্বাসে শেষের দিকের কথাগুলো বোঝা গেল না। ভোমবা আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ায়। মীরা তখুনি উঠতে পারলো না। ভোমরা চলে যাওয়ার পর তার খেয়াল হয় ওর ঠিকানা রাখা হলো না। ভোমরাব কাকাবাবুর বাসার নম্বর মীরার আজ আর মনে নেই।

উঠে আস্তে-আস্তে মীরা মাঠ পার হলো।

অমরেশের দশ টাকা এখনো তার ব্যাগে রয়েছে। সে এখানে এসেছে নিউমার্কেট উদ্দেশ্য করে। কতকাল টাকার অভাবে ও দু-একটা বিলিতি ম্যাগাজিন কিনতে পারছে না। অমরেশের বাকি টাকাটা সে এভাবে খরচ করবে। একটা দুটো কেন, চার-ছ-টা পত্রিকা কিনে নিয়ে গেলেও হীরেনের কিছু বলার নেই—বলা উচিত নয়।

কর্তব্য, কর্তব্য। আধুনিক-আধুনিকার কথায় মীরার নিজের ঘর মনে পড়লো। 'কত খেলো।' কর্তব্যের প্রাচীর তুলতে গিয়ে প্রাচীর পরিবেষ্টিত রুগ্ন, অকর্মণ্য স্বামীর চোখ চিন্তা ও চেতনাকে মেয়েরা সুচের মুখের মতো ধারালো করে তোলে, মীরার জীবনে তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কী করে স্ত্রী এমন সুন্দরভাবে সব ম্যানেজ করছে। জুতো কিনতে গিয়ে মীরা শাড়ি, রুগীর তিনরকম

পথ্য এবং তার ওপর ম্যাগাজিন ও চৌকাঠের সামনে রাখার একটা পুরু সুন্দর পাপোশ কিনে নিয়ে এলো। আশ্চর্য।

কত টাকা ও কর্জ করলো। সব টাকা অমরেশ দিয়েছে? কে অম—

বুকের রক্ত দ্রুত ওঠা-নামা করছিলো মীরার। এতগুলো জিনিস বইতে না পেরে ও প্রথমে রিকশা, তারপর সেই চিন্তা বাদ দিয়ে ট্যাক্সি ডাকলো।

কর্তব্যের গিঁট এখন থেকে একটু-একটু ঢিলে করে দেবে ও।

দেওয়া ভালো। মীরা ভাবলো।

কাল থেকে তো ও চাকরিতে যাচ্ছে। কাজ থেকে ফিরে এসেই আর রান্নাবান্না, কি হীরেনের টিফিন, কি রাত্রির খাওয়া নিয়ে সে মেতে উঠবে না, বরং বেহালাটা নিয়ে নতুন কোনো গৎ—

সাংসারিক কাজের জন্যে ও একজন ঝি রেখেছে। ইচ্ছে করলে মীরা কেবল সন্ধ্যা কেন, সারা দিন রাত গানের চর্চায় মেতে থাকতে পারে। ইচ্ছে করলে ও কাল থেকে চাকরি করতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা পর্যন্ত বাতিল করতে পারে।

কোনো পুরুষের কাছ থেকে কর্জ করে ঘরে নিয়ে আসা টাকা ও একটা পুরুষ-প্রতিষ্ঠানে চাকরি-করে-আনা টাকার মধ্যে বেশ কম কি।

সন্দেহের অনুপাতে তো দুটোর ওপরই একরকম থাকা উচিত, রাখা উচিত।

ট্যাক্সিতে বসে অসুস্থ হীরেনকে মনে-মনে মীরা অনুকম্পা করলো।

ইচ্ছে করেই মীরা আজ দেরি করছে, দেরিতে ঘরে ফিরছে।

বেড়াতে ভালো লাগছিলো তার চৌরঙ্গির রাস্তায় রেড রোডে, মনুমেন্টের পাদদেশে—যদি বলে, যদি বলতে থাকে ও ঘরে ফিরে, তো হীরেন নিশ্চয়ই রাত্রে খাবে না,—পেট ব্যথা করছে, আজ আবার কিডনির একটু যন্ত্রণা হচ্ছে বলে নির্ঘাত চুপ করে শুয়ে পড়বে। দেয়ালের দিকে ফেরানো ইউনিভার্সিটির ঝকঝকে রত্ন হাইলি ইন্টেলেক্‌চুয়্যাল আধুনিক হীরেন চক্রবর্তীর চেহারা সন্দেহ শীর্ণ কাতর স্তিমিত হয়ে গেল।

অনুকম্পা করে বৈকি মীরা।

ভোমরার দুঃখ এসেছে একভাবে। মীরার দুঃখ আসছে অন্যভাবে। আসবেই।

উৎপত্তি এক, না দুই।

প্রেম, তারপর বিবাহ।

তোমাদের নিয়ে যদৃচ্ছ ব্যবহার আমরা করবোই। পুরুষ। ডবল সার্টিফিকেট দিয়েছো যে।

কিন্তু ভোমরা চুপ করে থাকতে পারে, কাঁদতে পারে,—মীরা, মীরা হুল ফোটাবেই, যদি ফোটায় তো কি করতে পারে হীরেন, কি করবে—গাড়ির এক-একটা ঝাঁকুনির সঙ্গে মীরার বুকের মধ্যে আবর্ত উঠছিলো, দুঃখের, অভিমানের রাগ ও চাপা ঘৃণায়।

ভাবতে মীরার সত্যি সময়-সময় কান্না পায়, ভয়ংকর ঘৃণা হয়। বিয়ের পর থেকে মীরা যত করছে, সংসারটাকে টেনে তুলছে, ধরে রাখছে, একটু ভালো চেহারা দিতে চাইছে, ততই অক্ষম হীরেন অপরিচিতের বিস্ময় নিয়ে মীরার দিকে চাইছে, মীরাকে দেখছে। যেন এমন হাওয়া উচিত ছিলো না, এত ভালো। হীরেন যে অনেক সময় চেষ্টা করে হাসে, মীরা কোনো জিনিস ঘরে নিয়ে গেলে বা নির্বিঘ্নে একটি কাজ সম্পন্ন করলে অমিত উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে ওঠে, বলে 'তুমি বলেই সম্ভব হলো, আমি হলে পারতাম না, পারি না মীরা।' সেই উচ্ছ্বাসের আড়ালে না-পারার ঈর্ষা-হিংসা-হীনতার যন্ত্রণা পুরুষের চোখকে কুটিল শানিত করে দেয়। মীরা ইজিচেয়ারে শায়িত হীরেনের সূচীমুখ চোখ দেখে, দেখেছে রোজ।

ট্যাক্সি রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোড় ঘুরলো। ঘড়িতে দশটা।

মীরা বিচলিত হলো না।

শাড়ির প্যাকেটটি কোলের ওপর চেপে ধরে ও স্থির হয়ে বসে থাকে।

কাল থেকে তার সাত ঘণ্টা অফিসে খাটার রুটিন শুরু।

শক্ত, শক্ত বৈকি একটি মেয়ের পক্ষে। হারেমবিলাসিনী জীব। তাই আজ মীরা একটু রাত করে ঘরে ফিরলো, বেড়িয়ে।

হ্যাঁ, সংসারের যা প্রয়োজন, কর্জ করে আজও তা সে সম্পন্ন করেছে। টাকা যোগাড় করে কেবল মীরার নয় হীরেনের জন্যেও অনেক জিনিস কিনে মীরা ঘরে ফিরছে। ফেরার সময় একটু বেশিক্ষণ বেড়িয়ে এলো এই-যা। না, একটু পরে মীরা ভাবলো, সিগারেট খাক আর অনুপকুমারকে ড্রাইভিং শেখাতে বোটানিক্যাল গার্ডেন নিয়ে যাক, পুষ্প—মীরা ও ভোমরার সখী—পুষ্প চ্যাটার্জি আজও বিয়ে না করে অনেক বেশি বুদ্ধি ও পরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় দিয়েছে। মীরা চলন্ত ট্যাক্সির গর্ভ থেকে চাপা নিশ্বাস ফেললো।

ছয়

হীরেন চমকে উঠলো।

লোকটা যে এমন অভদ্র-বেহায়া-নির্লজ্জ হতে পারে হীরেনের ধারণায় ছিলো না।

এক মাস হতে চললো এই বাড়িতে এসেছে সে, একদিন হীরেন তার ঘরের দরজায় গেল না, কথা বলে নি ওর সঙ্গে, যতটা সম্ভব এড়াচ্ছে। কিন্তু জাতে আর্টিস্ট বলে কি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে ওদের বোধশক্তিটা একেবারে ভোঁতা মেরে গেছে!

অদ্ভুতভাবে হীরেনের চৌকাঠের সামনে চলে এসেছে, দেশলাই চাইছে আর্টিস্ট।

হীরেন নিঃশব্দে দেশলাই বাড়িয়ে দিলে। অবাঞ্ছিত আগন্তুক ' মনে-মনে বললো সে।

লাল ট্রাউজার, ভায়োলেট পপ্‌লিনের হাওয়াই শার্ট গায়ে, হাওয়ায় ওড়ে এমন কোঁকড়ানো লম্বা চুল, তেল নেই।

'থ্যাঙ্ক ইউ।' আর্টিস্ট যেন মন্ত্রোচ্চারণ করলো।

হীরেন কথা না কয়ে দেশলাই ফিরিয়ে নিলে।

'মিসেস এখনো ফেরেন নি বুঝি?'

'না। হীরেন আর্টিস্টের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিজের ঘরের দিকে তাকায়।

'ভা-রি ইন্টারেস্টিং আপনার ঝি মালতী। আর্টিস্ট ঝরঝর করে হেসে সিগারেটের অজস্র ধোঁয়ায় ঘরের সামনেটা আচ্ছন্ন করে দেয়।

'আমার ঘরের সবই ইণ্টারেষ্টিং। হীরেন বিড়বিড় করে বললো নিজের মনে।

'আচ্ছা।' চলে যাচ্ছিলো স্কাউড্রেল, আবার ঘুরে দাঁড়ালো। হীরেন বিরক্ত হয়।

'আপনার ঝি কি চলে গেছে?'

'কেন?' রুক্ষ গলায় হীরেন প্রশ্ন করলো।

'একটা দেশলাই ওকে দিয়ে আনিয়ে রাখতাম, রাত্তিরের জন্যে।'

'ননসেন্স।' হীরেন প্রায় অস্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করলো। 'নির্লজ্জ, অশিক্ষিত।' বললো সে মনে-মনে।

আচ্ছা, সারাদিন ওই ঘরটার মধ্যে বসে হাম্বাগটা করেই বা কি। হীরেন ভাবে।

ওর সারাদিনের আঁকা সব ছবি যায়ই বা কোথায়, কে কিনছে! কাপড়জামা, চালচলন, খুব যে একটা গরিবের মতন তা-ও নয়।

'মালতী চলে গেছে।' হীরেন গম্ভীর গলায় বললো, আর মনে-মনে বললো, 'মালতী আমার

চাকরানী, তোমার নয় যে দোকানে গিয়ে তোমার রাত্রির নেশার রসদ কিনে আনবে।'

আর্টিস্ট বেশ সুন্দরভাবে শিস দেয়। পাখি কি হরিণ দেখলে মানুষ যেভাবে শিস দেয়।

তোমরা আর্টিস্ট বলেই এ-সব সম্ভব। হীরেন মনে-মনে বললো। হীরেন নির্বাক। আর-একজনের দরজায় দাঁড়িয়ে সে-কি এভাবে শিস দিতে পারতো? আইনত হোক বা জোর করে হোক লোকটা এ-বাড়িতে আছে, থেকে যাচ্ছে মাসের পর মাস হীরেনের পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী হয়ে। অথচ সঙ্গে ফ্যামিলি—স্ত্রীলোক বলতে কেউ নেই। নিটোল একলাটি। এখানে নাকি এ-সব নিয়ে আপত্তি করা চলে না, এই পাড়ায়। এখানকার সবাই আর্টের পূজারী। মীরা বলে। এই নিয়ে হৈ-চৈ করলে লোকে তাদেরই নিন্দে করবে। আর্টিস্টের কিছু হবে না।

তবে কি জেনেশুনে, এক-এক সময় হীরেনের মনে হয়, মীরা এ-বাড়িতে এসেছে।

আশ্চর্য, আশ্চর্য মীরার রুচি।

মীরার এক-একটা রুচির পরিচয় পেয়ে হীরেন স্তব্ধ বিমূঢ়। সেই এঞ্জেল মীরা, নীল মেরুনে মোড়া পালিশ ঝকঝকে মীরা।

মীরার বাইরের পোশাকটা হীরেনের চোখের সামনে ভাসে। এই মীরা প্রায়ই হীরেনকে বোঝায়, 'বাড়িওয়ালা কি অন্য প্রতিবেশীরা যখন আপত্তি করছে না, মাথা ঘামাচ্ছে না ভদ্রলোকের সঙ্গে স্ত্রী আছেন কি নেই, না কি বিয়েই করে নি, আমাদের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলাটা অশোভন।'

কোনো ফ্যামিলি-কোয়ার্টারে স্ত্রী-বর্জিত একটি পুরুষ প্রতিবেশীর অধিষ্ঠানে যে কত বিরক্তিকর, আর কেউ না পাক, হীরেন মর্মে-মর্মে টের পাচ্ছে।

তা ছাড়া তিনি শিল্পী।

মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা কৌতুহল আর দশটি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল, প্রখর।

রাগে হীরেনের গা জ্বলে।

যেহেতু শিল্পী সেজন্যে তার বেয়াদবি বর্বরতাও তোমায় মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। সভ্য আধুনিক সমাজের বিধান।

হীরেন ভুলে গেছে। উকিল বিপদবরণের সঙ্গে কনসালট্ করা উচিত ছিলো। স্কাউন্ড্রেলটার ওপর যে-কোনো উপায়ে একটা ইজেক্টমেণ্ট্ নোটিশ আনা দরকার।

'চুপ করে যেন কি ভাবছেন?'

হীরেন চমকে ওঠে। মুখ তুলে তাকায়।

কথার শেষে আর্টিস্ট আবার শিস দিচ্ছে। চোখ দুটো চকচক করছে। যেন খুব উৎফুল্ল একটা কিছু ভেবে। 'ননসেন্স' হীরেন বিড়বিড় করলো।

'ওই মেয়েটি কে, রোজ আপনাকে দেখতে আসে?'

'বুলা, আমার বোন।' হীরেন রাগে দাঁত ঘষে ঘৃণায়। 'কেন?' বেশ রুক্ষভাবে তাকালো সে।

'না, এমনি। দেখছি কিনা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে।'

'সিঁড়ি দিয়ে যে-ই ওঠানামা করুক তুমি চেয়ে থাকবে, অসভ্য।' হীরেনের বুকের মধ্যে গর্জে উঠলো, চুপ করে রইলো।

'ইন্টারেস্টিং গার্ল, দেখে মনে হয়।' আর্টিস্ট হীরেনের চোখে চোখ রেখে অল্প হাসে।

'মেয়ে মাত্রই ইন্টারেস্টিং তোমার কাছে।' হীরেন চোখ ফেরায়। ভেবে সে ঠিক করতে, পারছিলো না কি বলে ইডিয়টকে তার দরজা থেকে বিদায় করে।

'কিন্তু-কিন্তু মিসেস চক্রবর্তীকে তা মনে হয় না।'

'কি মনে হয়?' হীরেন প্রকাণ্ড ঢোক গিললো, দুই পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে।

'অত্যন্ত স্মার্ট মনে হয়।' আর্টিস্ট বললো।

'আর, আর কিছু মনে হয় না?' হীরেনের চোখ পিটপিট করছিলো।

'আপনি চটছেন।' আর্টিস্ট হঠাৎ ঠোঁট টিপে হাসে। 'মিস্টার চক্রবর্তী, বলুন?'

'না, তা কেন হবে।' হীরেন, যেন হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে চেহারায় স্বাভাবিক রং ধারণ করলে; হেসে বললো, 'আপনারা শিল্পী। মেয়েদের শরীরের রেখার মতো ওদের প্রকৃতি, স্বভাবও আপনাদের মনে রেখাপাত করে, তা শুনে, তা এখন আপনার মুখে শুনছি বলে রাগ করলে আমার চলবে কি? আর্টের আমি কি বুঝি।'

আর্টিস্ট তার ঈষৎ লাল চুলের আঙুল বুলালো। সিগারেটের টুকরোটা মাটিতে ফেলে দিয়ে জুতো দিয়ে দু-বাব ওটাকে ঘষলো।

'আসুন না?'

'কোথায়?'

'ঘরে, ওই আমার স্টুডিও।' আর্টিস্ট আঙুল দিয়ে নিজের ফ্ল্যাট দেখালো। 'মিসেস চক্রবর্তী এতক্ষণে ফেরেন নি যখন, হয়তো আরও কিছুটা দেরি হবে ফিরতে।' এক চোখ তেরছা করে সে হীরেনের দিকে তাকায়, মৃদু শিস দেয়।

হীরেন কথা বলতে পারে না, গরম একটা নিশ্বাস ফেললো। 'চলুন।' বেশ বিষণ্ণ গলায় বললো সে একটু পর। 'মীরা সম্পর্কে যদি হাম্বাগটার আরো-কিছু বক্তব্য থাকে শুনে রাখা ভালো।' ভাবলো সে মনে-মনে এবং আর্টিস্টের পশ্চাদনুসরণ করলো।

স্টুডিও বটে।

ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে টাঙানো, ইজেলে আঁটকানো সমাপ্ত অর্ধসমাপ্ত অনেক ছবি। আর্টিস্ট হলদে টিন থেকে সিগারেট তুলে হীরেনকে অফার করলো।

'ওটা কি?' হীরেন আঙুল দিয়ে একটা ছবি দেখায়। দেয়ালে ঝুলছে।

'ওটাও একটি মেয়ের ছবি।' আর্টিস্ট গম্ভীর গলায় বললো, 'মায়া মিত্তির। যেমনটি দেখেছি এঁকেছি।'

হীরেন স্তম্ভিত। হাত-পা-চুল ও মুখ বসানো লম্বা একটা থার্মোমিটার।

উদ্ধত লাল রং। আর সিলিণ্ডারের মধ্যে নীল রক্তের শিরার মতো পারদের রেখা এক-শ দশ ডিগ্রীতে উঠেছে।

'ব্লাড টেম্পারেচার।' হীরেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে আর্টিস্ট ফিসফিসিয়ে উঠলো, স্মার্ট একটি মেয়ের অ্যাম্বিশনের মাত্রা দেখানো হচ্ছে।'

শুনে হীরেন চুপ করে রইলো। ভয পেলো।

বুঝি কোন মায়া মিত্তিরকে নিয়ে তৈরি করা আর এক স্ক্যাণ্ডাল শোনাবার জন্যে স্কাউন্ড্রেল ওরকম ছবি এঁকেছে, হীরেন ভাবলো এবং গল্পটা যাতে না শুনতে হয় তাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে আর-একটা ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তিনটে সদ্যফোটা ডালিয়া। তিনটি মেয়ের মুখ।

হীরেন ছবি থেকে মুখ তুলে আর্টিস্টের চোখের দিকে তাকায়।' হীরেনের মুখ কালো হয়ে গেছে।

'তিন বোন। হেনা-মোনা-ডায়না।' আর্টিস্ট একটু থেমে পরে বললো, 'কিন্তু এমন সুন্দর মুখ থেকে রাতদিন পোকা ঝরতো, বিষাক্ত কীট। কেননা, বিয়ের পর একদিনের জন্যে কেউ শান্তি পায় নি, আশানুরূপ স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে পারছিলো না তাদের স্বামীরা, তাই অহর্নিশ গালাগাল, গোসা, বিদ্রুপের বিষ ঝরছে বোনদের মুখ থেকে, জিভ থেকে।'

ফুলের বুকের পরাগ-কেশরগুলি কুৎসিত পোকার চেহারা নিয়ে কিলবিল করছে। হলদেটে রং যেন লালার রসে সিক্ত হয়ে জ্যাবজ্যাব করছে। হীরেন ছবি থেকে চোখ সরায়। তার কেমন গা বমি করছিলো।

'এমন সুশ্রী যাদের চেহারা, তাদের ভিতরটা এত বীভৎস আমি বিশ্বাস করি না।' অস্ফুটে হীরেন এই প্রথম বললো, 'এই সিনিসিজ্‌মের অর্থ হয় না।'

'হয়, মিস্টার চক্রবর্তী, হতে হয়েছে।' আর্টিস্ট হীরেনের মুখের সামনে এসে দাঁড়ায়। বিলিয়ার্ডের টেবিল থেকে সরে এসে আই. সি. এস. নীলগোপাল দাশ, আনন্দ চ্যাটার্জি, হারীত সোম ক্লাবের দেয়ালে মাথা ঠুকেছে, কেঁদেছে রোজ সন্ধ্যার পর। আমি দাঁড়িয়ে দেখতাম। দিনের শেষে ঘরে ফিরলে অর্ধাঙ্গিনীদের ভ্রুকুটি ও বিষনিশ্বাসে বেচারাদের তৎক্ষণাৎ ঘরছাড়া করে দিতো, ক্লাবঘরে এসে ঠাঁই নিতো তিনজন।'

হীরেন গম্ভীর।

লোকটাকে হঠাৎ 'হাম্বাগ বলে হীরেন আর উড়িয়ে দিতে পারছিলো না যেন। যেন কোথায় একটা ব্যথা লুকোনো আছে ওর মধ্যে, ওর লালচে চোখে।

ঢোক গিলে, অনেকটা জোর করে হেসে পরে প্রশ্ন করলো, 'আপনি, আপনিই-বা ক্লাবঘরে গিয়ে ওদের সঙ্গে এত আড্ডা দিতেন কেন? তার চেয়ে—'

'যেহেতু আমি শিল্পী, বনের ধারে নদীর কিনারায় সন্ধ্যাটি না কাটিয়ে—' আর্টিস্ট হাসলো, 'কেমন?'

'না, ঠিক তা নয়।' হীরেন নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করলো।

'মানুষ কি মানুষের সংসর্গ ছেড়ে থাকতে পারে যত অদ্ভুট উদ্ভত আইডিয়া নিয়ে শিল্পী ঘুরুক না কেন।' কথার মাঝখানে শিল্পী থামলো, মৃদু হাসলো, তারপর যেন চুপিচুপি কথা বলার মতো হীরেনের চোখের দিকে চেয়ে আস্তে বললো, 'চিরকালই কি আর আমি আর্টিস্ট ছিলাম।'

'কি ছিলেন?' হীরেন একটু অবাক।

'ইঞ্জিনীয়ার। ক্রেন, বয়লার, টিউব, কাঁটা-কম্পাসের মানুষ ছিলো এই মৃগাঙ্ক মজুমদার।'

হীরেন আবার আর্টিস্টের আপাদমস্তক দেখলো। লাল স্যালুয়া, ভায়োলেট হাওয়াই, লম্বা বাদামী চুল। আঙুলের মাথাগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে অনবরত সিগারেটের নিকোটিন মেশানো ধোঁয়া লেগে-লেগে। আবার নতুন সিগারেট জ্বললো। হলদে টিন হীরেনের নাকের সামনে এগিয়ে এলো। ধন্যবাদ জানিয়ে হীরেন 'অফার' প্রত্যাখ্যান করলো। এত কড়া সিগারেট সে সহ্য করতে পারে না, বললো, মৃদু গলায়। ইঞ্জিনীয়ার কিছু বললো না।

ঘরটা অস্বাভাবিকরকম নীরব হয়ে গেছে।

'সামাজিক, ফুলফ্রেজেড গৃহী ছিলাম, মিস্টার চক্রবর্তী।' আর্টিস্ট নীরবতা ভাঙলো, 'কাজ সেরে দিনের শেষে ক্লাবে গেছি বিলিয়ার্ড খেলতে, শুধুই খেলার লোভে।'

'তখন বুঝি বন্ধুরা তাদের ঘরের অশান্তিগুলো আপনার কানে ঢালতো?' হীরেন সত্যিকারের দুঃখ-প্রকাশের চেহারা করলো।

'আরে না না,' বাদামী চুলের মধ্যে হাতের আঙুল ডুবিয়ে মজুমদার মন্থর হাসলো, 'তার চেয়েও জোরালো জাঁকালো রসের ঢেউ আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো কাঁটা-কম্পাস ছেড়ে তুলি ধরবার। কড়া ইনসপিরেশ্যান ছিলো আমারই ঘরে।'

'কি সে, কি তা?' হীরেন বিড়বিড় করলো।

আর্টিস্ট দেয়ালের একটা ছবির দিকে আঙুল বাড়ায়।

হীরেন আবার কেন জানি বোকা হয়ে গেল।

অদ্ভুত ছবি। মাথা খারাপ না হলে কেউ তা আঁকবে কেন, ছবি দেখতে-দেখতে হীরেন ভাবে। থার্মোমিটার কি ফুল নয়।

অ্যাশট্রে, অ্যাশট্রে থেকে পোড়া-সিগারেটের ধোঁয়া উঠছে, আর সেই ধোঁয়ায় চুল মেলে দিয়ে বুক মেলে দিয়ে চোখ বুজে একটি মেয়ে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিচ্ছে। বকের মতো সুন্দর শাদা গলা। 'কে ইনি? হীরেন ফিসফিসিয়ে বললো।

'আমার স্ত্রী।' ইঞ্জিনীয়ার রুদ্ধস্বরে জবাব দিলো, 'একজন অ্যাম্বিশাস ওম্যান।'

কে সিগারেট খেয়েছিলো?' হীরেন প্রশ্ন করলো, 'কখন?'

'রাত দশটায় একদিন ক্লাব সেরে বাড়ি ফিরে দেখি ঘরের দরজায় পান্না সিন্ধিয়ার গাড়ি।'

'কে পান্না?' হীরেন বিড়বিড় করে উঠলো।

'আমার বস, সিন্ধিয়া মাইকো মাইনের স্বত্বাধিকারী। ইঞ্জিনীয়ার মোটা-গলায় হাসলো, 'কোডার্মাব খনি এলাকার নাম-করা ডিবচ।'

হীরেন চুপ থেকে ঢোক গিললো।

আর্টিস্ট পায়চারি করলো একটু-সময়।

হীরেন ছবি দেখে।

'যেমনটি দেখেছি এঁকেছি।' আর্টিস্ট বলছে, 'কি করে ওই এক টুকরো শরীরে অত অ্যাম্বিশন লুকিয়ে রেখেছিলো তাই ভাবি, ঠিক চার ফুট হাইট ছিলো বডির, মিস্টার চক্রবর্তী।' আর্টিস্ট হীবেনের দিকে মুখ করে ঘুবে দাঁড়ায়। 'আর-আর বন্ধুর স্ত্রীদের মতন 'ডল্' বোকা ছিলো না, অন্য অফিসার পত্নীদের মতন।'

হীরেন ফ্যাল-ফ্যাল করে আর্টিস্টের চেহারা দেখে, কথা শোনে।

'আর-আর স্ত্রীর মতো ও অপেক্ষা করে নি, ঝগড়া করে নি স্ট্যাণ্ডার্ডে উঠি নি বলে বাঁকা রাস্তা ছেড়ে বরং নিজেই সোজা পথে এগিয়ে গেছে।'

কি করেছিলো?' হীরেন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করলো।

'আমার বিলেতে যাবার দরখাস্ত স্যাংশন করিয়েছিলো সিন্ধিয়াকে দিয়ে তারপবেই মাইকো-মাইনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার হই আমি, বেতন সোয়া চাব-শ' থেকে চোদ্দ-শ।' ইঞ্জিনীয়ার একনিশ্বাসে বললো।

'তারপর?' হীরেন রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলো।

'আই কিকড হার আউট।' আর্টিস্টের দাঁত কিড়মিড় করে উঠলো, 'আই ওয়াজ টায়ার্ড অব দ্যাট লিটল ডল্।'

হীরেন হঠাৎ খুব নরম গলায় বললো, 'আমার শরীরটা একটু খারাপ ঠেকছে, আমি ঘরে চললাম মিস্টার মজুমদার।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' আর্টিস্টও শাদা সরল গলায় এবার হাসলো, 'আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে রেখেছি, মিস্টার চক্রবর্তী।'

'না না, তাতে কি, অনেকগুলো ভালো ছবি দেখা গেল।' হীরেন বিনয়ে গলে গেল। 'সময় পেলেই আসবো, আমি তো সারাদিনই বাড়িতে আছি। এসে আপনার ছবি দেখবো।'

প্রতিপক্ষ থেকে আর-কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। চৌকাঠ পার হয়ে হীরেন তাড়াতাড়ি করিডরে চলে এলো।

ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘর পার হয়েছে অনেকক্ষণ। মীরার কেনা নতুন বিগবেন ঘড়ি টেবিলে বাসনো। হীরেন স্থিরচোখে একবার দেখলো।

বস্তুত মীরাকে কোনো প্রশ্ন করবে না, মীরার সঙ্গে কথা বলবে না, হীরেন স্থির করলো। ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বে কি না হীরেন একবার তা-ও চিন্তা করলো। এমন সময়—

হীরেন দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালো। ঘরে ঢুকে মীরা হাতের জিনিসগুলোর কয়েকটা খাটের ওপর বাকিগুলো মেঝের ওপর নামিয়ে রাখলো। হীরেন তাকালো না।

মীরা বুঝলো গৃহিণীর বিলম্বে ঘরে ফেরার দরুন গৃহস্বামীর এই চেহারা হয়েছে।

এবং সে নিজেও যতটা সম্ভব কম কথা বলবে বাড়ি ফেরার পথেই ঠিক করে এসেছে। মীরা চুপ।

কিন্তু কথা এক-সময় বলতে হয়।

হীরেন চোখ তুলে দেখলো মীরা মাদ্রাজি ছেড়ে আটপৌরে পরেছে।

হাতমুখ ধুয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছে। খোঁপা খুলে গিয়ে পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে চুল।

'এত দেরি করে ফেরার কারণ কি তোমার?'

চমকে মীরা ঘাড় ফেরালো।

এক চোখ ছোটো করে হীরেন বললো, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

স্বামীর চোখে চোখ রেখে মীরা চাপা উষ্ণ একটা নিশ্বাস ফেললো।

হীরেনের ঠোঁটে চুড়মুড়ে একটুখানি হাসি।

মীরা তা-ও লক্ষ্য করলো।

হীরেন ইজিচেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। 'অনেক কিছু কেনাকাটা হয়েছে। কত টাকা কর্জ করলে?'

মীরা নীরব।

টেবিলে ঢাকা-দেওয়া দুটো প্লেট।

মীরা ঢাকনা তুললো। 'এসো খাবে।'

'আমি খাবো কি না ভাবছি।

'কেন?'

'পেটটা কি রকম—'

মীরার নিশ্বাসপতনের শব্দ হলো।

'আমার ওষুধ এনেছিলে?' যেন ভয়ে-ভয়ে, আস্তে হীরেন একটু পরে প্রশ্ন করলো। ভুলে গেছো?'

গম্ভীর গলায় মীরা বললো, 'তখন বললে দরকার নেই, পেটব্যাথা নয় ওটা, ওমনি,—ওষুধ আনা হয় নি।'

'ভালো।' হীরেনের নিশ্বাসপতনের শব্দ হলো।

কতক্ষণের স্তব্ধতা।

'কত টাকা কর্জ করলে? হীরেনের গলা।

'এসো।' যেন প্রশ্নটা কানে ঢোকে নি, দুটো কাচের গ্লাসে জল ভরে মীরা টেবিলে রাখে চেয়ার দুটো টেনে আনে। 'সত্যি তুমি খাবে না?'

'না।' হীরেন সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ায়। সরে যায় জানলার কাছে।

বুঝি মীরা নিজের প্লেট টেনে নিয়ে একলা খেতে আরম্ভ করবে। হীরেন ঘাড় ফেরালো।

'অমরেশ কে, তুমি বললে না তো?'

'আমার বন্ধু।'

'বন্ধু।' হীরেন নির্লিপ্তের মতো মীরার সিঁথির দিকে তাকালো, ঢোক গিললো। 'কিন্তু আগে তো ওর নাম শুনি নি তোমার মুখে।'

'ইউনিভার্সিটিতে পড়তো, তুমিও দেখেছো হয়তো।'

'তা তো কত ছেলেকেই দেখেছি।' হীরেন ভাঙা-গলায় হাসলো। 'কত টাকা দিলে?'

মীরা চুপ।

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে কি না জানতে চাই।'

'উত্তর তো দিয়েই চলেছি।' কঠিন হয়ে গেল মীরার মুখাবয়ব। বলতে কি, হীরেনের চোখের দিকে তাকাতে তার কেমন ঘৃণা হচ্ছিলো। তাড়াতাড়ি একটা বড়ো ভাতের গ্রাস তুলে ও মুখে পুরলো।

হীরেন পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে আবার পায়চারি করে।

মীরা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলো।

'মালতী কখন গেছে?'

মীরার প্রশ্নের উত্তর দিলে না হীরেন।

'ওব তো অত সকালে চলে যাওয়ার কথা নয়।' তোযালে দিযে মুখ মুছতে-মুছতে মীরা বললো, 'কাল ছ-টায় এসে ওর উনুন ধরানো চাই, ন-টার মধ্যে আমাকে বেরোতে হবে।'

'চাকরি করছে বলেই যে সকাল-সকাল তোমাব কাছে আসবে এবং দেরি করে তোমাব বাড়ি থেকে বেরোবে তা মনে কোরো না মীরা, —অবশ্য তুমিও জানো, ও তো তোমারই লোক— লাভার নিয়ে ঘর করছে যখন বেচারা।' খোঁচা দেওয়ার মতো চিকন গলায হীরেন চিবিয়ে-চিবিয়ে বললো।

'আমার লোক মানে?' মীরা চোখ বড়ো করলো।

' তোমার লোক, তুমি ওকে এনেছো, তার জীবনেব প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তুমি ভালোভাবে জানো।'

' বেশ তো।' মীরা চোখ নামালো। 'ঝি ঝি-ই-—টাকা দেবো কাজ করবে— যদি ভালো না লাগে তুমি আর-কাউকে নিযুক্ত করো।'

'আমি যে ঘর থেকে বেরোতে পারছি না, আমি যে পঙ্গু হযে গেছি, মীরা।' যেন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো হীরেন। মীরার হাত থেকে কাচের গ্লাসটা পড়ে গেল মাটিতে, ঝন কবে শব্দ হয়, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে কাচের গুঁড়ো।

নিচের দিকে তাকিয়ে মীরা সন্তর্পণে পা রাখে।

'তোমার কি ইচ্ছে পরিষ্কার বলো না—বেশ তো, আমিই কিছুই দেখবো না, কোনো ব্যাপারে নেই, চালাও তুমি। —কী দরকার আমার লোকের কাছে গিযে টাকা ধাব করার, বাজার করাব— তুমি আছো, তুমি থাকতে—' বলতে-বলতে একটা চোখ ছোটো হযে গেল মীরার। 'আজ একটু রাত করে ঘবে ফিবেছি, তাই হাজার প্রশ্ন,—কাল, কাল যখন সারাদিন বাইরে কাটিয়ে বাড়ি ফিরবো, জানি না, আমার তো মনে হয় তুমি স্ট্যান্ড করতে পাবনে না, খামোকা—'

চকচকে চোখে মীরা চেয়ে থাকে।

'কথা বলছো না যে?'

হীরেন মাথা নিচু করে ।

'দবকার নেই আমার চাকরিতে গিয়ে।' একটু পরে কার্পেট থেকে কাচেরগুঁড়ো তুলতে-তুলতে মীরা নিজের মনে কথা বললো, 'তুমি কাল—আর দরকারই বা কি লোক রাখার—কাল আমি মালতীকে বরং জবাব দেবো, ঘর থেকে তো আর বেরোচ্ছি না, একলাই সব করবো।'.

হীরেন ইজিচেয়ারে ফিরে যায়।

'কিন্তু চাকরি না-করে কি চালাতে পাববে?' হীরেন বেশ কিছুক্ষণ পর গলা পরিষ্কার করলো।

'তা আমি জানি না। তোমার চোখে রাতদিন সন্দেহ ঝুলবে আর আমি পশুর মতো খাটবো, এ তুমি কি করে আশা করো?'

হীরেন নীরব।

আলো নিবিয়ে দিলে মীরা।

সাত

আর-একটি সকাল।

আশ্চর্য প্রশান্তি মীবাব চোখে-মুখে। অদ্ভুত দৃঢ়তা।

মুখ-হাত ধুয়ে এসেই মীরা শাড়ি বাব করলো। সেই চোখ-ঝলসানো মেরুন।

'কোথায় চললে?' হীরেন অবাক।

'একটু বেড়িয়ে আসি। 'মীরা মুখ তুললো না।

'ও।' অস্ফুট শব্দ বেরুলো হীরেনের ঠোঁট থেকে। মাথানত করে সে তাব শুকনো শীর্ণ হাতের আঙুল দেখলো কতক্ষণ।

'কখন ফিরছো।' মীবাব কাপড়-পরা হযে গেলে হীবেন প্রশ্ন করলো।

'এই তো, একটু বাদে।'

'আমাব দুধ?'

'মালতী এসে দেবে।'

যেন হীরেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো। বাগাবাগির মাথায় আজ এখন থেকেই না মীরা ঝিকে জবাব দিয়ে দেয় সেই আশঙ্কা করছিলো সে।

হীবেনের চেহাবায় এবার প্রশান্তি নামলো।

মীবা তখন গালে-মুখে পাউডাব ঘষছে।

হীরেন অল্প হেসে বললো, 'তবে তুমি ওই কাজে যাবে না ঠিক করছো?'

'হ্যাঁ।'

'কি করে চলবে, এতগুলো টাকা বাড়িভাড়া, বেশন, ঝিয়ের মাইনে?' হীরেন মীবাব চিবুকেব ওপর চোখ রাখে, তখনো অল্প অল্প হাসছে সে।

'যে-ভাবে চলছে সে-ভাবেই চলবে।' মীরা মুখ না ফিরিয়ে উত্তর করলো। কঠিন গলার স্বব।

'ধার-কর্জ ক'রে?'

'হ্যাঁ।'

হীরেন নীবব।

'চলি।' হাতে ব্যাগ তুলে নিলে মীবা।

'কখন ফিরবে, কখন ফিবছো, একটু যদি সকাল-সকাল—চা না-খেয়েই বেরুচ্ছো, এটা কেমন।' হীরেন চৌকাঠে দাঁড়ায়।

আর-কোনো কথা বলবে না বলেই মীরা ঠিক করেছিলো, কিন্তু না-বলে পারলে না। 'সকালে না-গেলে ওকে পাবো না।'

হীরেন, আশ্চর্য, যেন দশ মন বোঝা ওর মুখে কে চাপিয়ে দিয়েছে, জিভ নাড়তে পারলে না, ঠোঁট খুলতে পারলে না।

কি প্রশ্ন সে করতো মীরা জানে। তাই বিষাক্ত একটা হাসির-ঝিলিক ঠোঁটে নিয়ে তরতর করে ও নিচে নেমে গেল।

নিশ্চয়ই। চরম বিদ্রোহ বুকে নিয়ে মীরা রাস্তায় নামে। ঘৃণায় দুঃখে তার কেমন জ্বর-জ্বর ঠেকছিলো। মীরা একটা চায়ের দোকানে ঢুকলো। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে সে ভালো করে ভাবতে চায়।

আজই তো শেষ নয়, আজকের পর আবার কাল একটা দিন আসবে। কালকের পর পরশু। হীরেনের এই রোগ সারবে না, কারো কখনো সারে নি।

মীরার চোখের সামনে পুষ্পর ফুলের জীবন ফুটে ওঠে। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করার নেই, মীরা চোখ বুজে চায়ের কাপে চুমুক দিলে। কিন্তু ভোমরা? মালতী? যেন হঠাৎ সজীব হয়ে ওঠে মীরা। তবু ওদের জীবন ভালো, এক জায়গায় শান্তি আছে, পঙ্গু শিথিল অকর্মণ্য স্বামী ওদের মুখের দিকে চেয়ে নেই, ওদের ফেরার অপেক্ষায় ঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখে প্রহর গোনে না। সন্দিগ্ধ নির্ভরশীল পুরুষ।

কি করা, কি করবে। চা খেতে-খেতে মীরার নাক ঘামলো, কপাল ঘামলো। আঃ—একবার মীরার ইচ্ছে হলো, কাল যেমন ও তাকে প্রশ্ন করেছিলো, আজ সে তাকে—ভোমরাকে হাতের কাছে পেলে প্রশ্ন করতো, 'আমায় বুদ্ধি দে ভোমরা, এই অবস্থা।'

ভাবতে-ভাবতে মীরা রেস্তরাঁর দরজা পার হয়ে আবার এসে রাস্তায় দাঁড়ালো। এর মধ্যেই চন্‌চন্‌ করছে রোদ। মাটি গরম।

হ্যাঁ, টাকা কর্জ করতে বেরিয়েছে ও, টাকা না নিয়ে তো ফিরতে পারে না।

প্রথম বাস দেখেই মীরা হাত তুললো।

নিশ্চয়ই। আর দরজায়-দরজায় নয়, যে-দরজায় তার যাওয়া সাজে, যেখানে আকাশ এখনো অভিমানে নীল হয়ে আছে, যে নিঃসঙ্গ ঘরের ছায়ায় ভালোবাসা মৃতবৎসাব মতো পড়ে আছে, মীরা সেই ঘরের দরজায় টোকা দেবে, হাত পাতবে, 'ওঠো, জগো,' বলে চিৎকার করে সাবা দুপুব কাঁদবে। শুধু আজ নয়, কাল, পরশু—এখন থেকে রোজ মীরা অমরেশের কাছ থেকেই টাকা আনবে। এনে হীরেনকে খাওয়াবে। আর কিছু করার নেই তার—আর কিছু করতে সে জানে না।

যন্ত্রচালিতের মতো মীরা বাসের পাদানিতে পা বাড়ালো।

ঘর থেকে অমরেশ বেরুবার আগে আর-একজন বেরুলো। ভোমরা। অবশ্য অমরেশও সঙ্গে-সঙ্গে পর্দা সরিয়ে বাইরে মুখ বাড়ায়, 'কে; মীরা!'

মীরা নীরব, নিশ্চল।

ভোমরা মীরার দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই অমরেশের চোখে চোখ রাখে, 'কই, দাও?'

অমরেশ মৃদু হাসছে।

'আশ্চর্য,' ভোমরার হাতে হাত রেখে অমরেশ বললো, ' তোমার হঠাৎ টাকার অভাব হলো? কোডার্মা, কানপুর দিল্লি, রাঁচির অনেক রাজা-উজীর মেরে তো কলকাতায় এসেছো, নিজেই গল্প করছিলে। আমার মতো গরিবের কাছে শেষে হাত পাততে—'

অমরেশের কথা শেষ হতে না দিয়ে ভোমরা তার গালে টোকা দিলে। 'চুপ করো, চুপ করো—সত্যি, লক্ষ্মীটি, অভাব না-হলে তোমার কাছে এসেছি! ভয়ানক, খুব বেশি ইচ্ছে করছে একটু ড্রিঙ্ক করি।' ভারি ক্লান্ত শোনালো ভোমরার গলা। 'দাও ক-টা টাকা—মীরা যদি তোমায় একদিন ভালোবাসতো, নিশ্চয়ই অন্তত মনে-মনে হলেও তোমায় আমি ভালোবেসেছি—কি, ঠিক কি না মীরা, বল?'

পিঙ্গল চোখ, প্রশস্ত কাঁধ, কোঁকড়ানো চুল পুরুষের। হাসে অমরেশ।

মীরা স্তব্ধ।

'কিন্তু ওর দরকার বেশি টাকার—ওর স্বামী অসুস্থ।' বলছিলো অমরেশ মীরার দিকে চেয়ে, 'কথা বলছো না মীরা—তুমি তো ভোমরার মতো মদ খেতে আর টাকা চাইছো না, প্রয়োজন।'

কী সাংঘাতিক নির্জন দিন দুপুরের হ্যারিসন রোডের হোটেল, ভাবছিলো ও মনে-মনে।

আট

ঘড়ির কাঁটায় চোখ হীরেনের। পাথরের মতো স্থির সে।

ছেঁড়া টুপিটা টেবিলের কোনায় রেখে উকিল বিপদবরণ বললো, 'না যাবে কোথায়—মিসেস ঠিক আসবেন, মোটে তো এখন পৌনে একটা—আর, আর—' ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে উকিল মন্থর গলায় হাসলো। 'এ তুমি আমি—সোসাইটি গার্ল তো আর বিয়ে করি নি আমরা, যে যতিশঙ্করের অবস্থায়—'

'হা— হা—' টেনে-টেনে হীরেনও শুকনো গলায় একটু হাসলো। 'না, ফিরবে ঠিক—আর তেমন তো ঝগড়াঝাঁটি হয় নি, এই এমনি কথা কাটাকাটি মান-অভিমান।'

'ও এমন রোজই হয় আমাদের, দাম্পত্য কলহ—একটু চা-টা খাওয়াও এবার—মিসেসের যদি ফিরতে দেরি হয় তোমার ঝিকে না-হয়—'

'ডাকছি, ডাকছি।' হীরেন নড়ে বসে। ঘাড় ফেরালো, 'মালু, মালতী—'

'এই-যে, নমস্কার।'

হীরেন চমকে মুখ তুললো।

সামনের দরজায় গলা বাড়িয়ে দিয়ে আর্টিস্ট হাসছে। 'কই, আসুন-না, দুটো ভালো ছবি দেখবেন—'

'যাই, যাচ্ছি।' হীরেনের গলা আটকে যায়। হঠাৎ কি-এক আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে ওঠে।

'কি হ'লো, কি ভাবছো?' বিপদ বন্ধুর গায়ে হাত রাখে। 'কিসের ছবি?' বিপদ পরে প্রশ্ন করলো।

'না না, এই এমনি। ওঁর হাতের আঁকা কয়েকটা নতুন টেকনিকেব স্কেচ, স্কেচই তো ও গুলো, আপনি কি বলেন?' হীরেন আর্টিস্টের দিকে তাকালো না যদিও, উকিল বন্ধুর ভুরুর দিকে চোখ রেখে যতটা পারলো চেহারা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। 'ভয়ানক ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল জিনিস, তুমি হয়তো, তুমি হয়তো তেমন—'

'বুঝবে না।' মাথা নেড়ে বিপদ বন্ধুর বাক্য সম্পূর্ণ করলো এবং গলা ঝেড়ে হাসলো।

'এত ইতস্তত বোধ করার কি আছে, আমি ব্রাদার তোমাদের ওই ইন্‌টেলক্‌চুয়্যাল ছবি আর আধুনিক কবিতা সত্যি বুঝি না, অবশ্য বুঝতে চেষ্টাও করি না। আপনি কিছু মনে করবেন না, শিল্পী।' পুরু-ঠোঁট বিপদবরণ হীরেনের মাথার ওপর দিয়ে শিল্পীকে দেখলো। 'বন্ধু জানে ছেলে বেলা থেকেই মোটা জিনিসের দিকে আমার ঝোঁক বেশি , ঝুঁকি বেশি—'

'যেমন?' আর্টিস্ট চুপ, হীরেন হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'খাওয়া, ঘুম, খেলাধুলো?'

'তা ছাড়া কি। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই তো তা চাইছে। নয় কি?'

'সুতরাং মেজরিটি যখন তোমার দিকে, আধুনিক ছবি কবিতা বুঝতে চেষ্টা না-করার জন্য আমরাও তোমাকে দোষ দেবো না। বরং তুমি ততক্ষণ বসে গরম চা সিঙাড়া খাও। মালতী, বাবুকে চা ক'রে দাও।' হীরেন উঠে দাঁড়িয়ে দরজায় দিকে কটাক্ষপাত করলো। তারপর আর্টিস্টের চোখে চোখ রেখে আস্তে বললো, 'চলুন।'

মৃগাঙ্ক মজুমদার কথা কইলো না।

লালচে চোখের দীর্ঘ পল্লব একবার মুদ্রিত করলো। জুতো দিয়ে মেঝেয় সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা চেপে ধরে বাইরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

'সত্যি ব্রাদার।' হীরেন ঘর ছেড়ে যেতে-যেতে বন্ধুকে বললো, যেন উকিলকে বুঝিয়ে গেল,

'ও-সব ছবি বুঝতে না-চাওয়া দেখতে না-যাওয়া একটা আশীর্বাদের মতন, কী যে পেনফুল ওগুলো দেখা, তা...তা...' হীরেনের কথা করিডরে মিলিয়ে গেল।

ঠোঁট তেরছা করে বিপদবরণ নিজের মনে হাসলো। 'কে বলেছে সাধ করে এই যন্ত্রণা পোহাতে। নিজের হাতে মগজে পেরেক ঠোকা আর ওই ছাইভস্মগুলো বুঝতে যাওয়ার মধ্যে তফাৎ কিছুই নেই।' উকিল মনে-মনে বললো। 'হাম্বাগটার খপ্পরে পড়েছে হীরেন। ফ্যামিলি ছাড়া এই কোয়ার্টারে আছে। অভদ্র। হীরুর মন ভিজিয়ে-ভিজিয়ে কোনোদিন ব্যাটা বলে বসবে। 'কই তোমার বউকে এবার আনো, আমার ছবির মডেল হবে।' ইনটেলেকচুয়্যাল ছবি না কচুপোড়া। নিশ্চয় ন্যাংটা মেযে মানুষের কতকগুলো ছবি এঁকে রেখেছে শালা। আজকাল যে যত বেশি কায়দা করে বেখায় রঙে মেয়েদের বুক আর উরু আর পিছনটা আঁকতে পারছে সেই তো তত আধুনিক হচ্ছে। সেদিন বার-লাইব্রেরিতে বসে হরপ্রসাদ গাঙুলি কি এই কথাই বলছিলো না!'

বিপদের মনে পড়লো, হরপ্রসাদ একটা আমেরিকান জার্নাল উলটে সবাইকে নামজাদা কোনো আর্টিস্টের আঁকা ছবি দেখাচ্ছিলো। সুইরিয়্যালিজ্‌ম, ন্যুডিজ্‌ম ইত্যাদি। ভাসা-ভাসা দু-একটা কথা মনে আছে তার, বন্ধুরা ছবির ওপর আঙুল রেখে বলাবলি কবছিলো। বিপদের মাথা ঘুবছিলো। আধুনিক ছবির নামে এখন আবার তার মাথা ধরেছে। তাই দু-জন আর্ট-রসিক ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ঘোঁৎ ক'রে নাকের একটা শব্দ করলো সে। যেন সেই শব্দেব সঙ্গে মাথার ভিতরেব খানিকটা গরম হাওয়া বা'র ক'রে দিয়ে উকিল কিছুটা হালকা বোধ কবলো।

মালতী চা নিয়ে এলো। চা ও চিঁড়েভাজা।

বিপদ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলো, খোঁপা থেকে ঝুলে-পড়া খয়েরি ট্যাসেল দাসীব। তন্বীভাব।

আধুনিক মনিবানীর আধুনিক ঝি।

'ঘিয়ে ভেজে এনেছো দেখছি।' চিঁড়েব দিকে না তাকিযে উকিল মালতীর মুখেব দিকে চোখ ধরে রাখলো। 'বেশ মুড়মুড়ে হয়েছে।'

'মুখে না ঠেকিয়ে কি ক'রে বুঝলেন মুড়মুড়ে হয়েছে কি স্যাঁতসেঁতে হ'য়ে আছে।'

'ও দেখলেই বোঝা যায়।' বিপদ এবার চিঁড়ের দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপর আবার ঝিয়ের চোখের দিকে তাকায়। 'গন্ধে টের পাওয়া যায়। নয় কি?'

'তাই, দাদাবাবুর উকিল-বন্ধু চালাক-রসিক, চোখ দিয়ে দেখে নাক দিয়ে শুঁখেই বলে দেন শক্ত কি নরম, ঝুনো কি চটচটে। আমাদের কপাল মন্দ। অদেষ্ট খারাপ। তাই। না-হলে কি আর...' থুতনি শূন্যে তুলে ঝি লম্বা উদাস ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'কি হ'লো?' বিপদ চারদিকটা একবার দেখে চাপা-গলায হাসলো, 'দাঁতে না ঠেকিযে মন্তব্য করছি বলে আফসোস হয়, দুঃখ হয় নাকি?' গলা বাড়িয়ে সে প্রশ্ন কবছিলো।

'না, দাঁতে ঠেকাবার অনেক বাকি।' এবার মালতী চোখ শানালো। 'এই আক্কেল নিয়ে আর মেয়েমানুষের মন পেতে হয় না। ছি-ছি, কি যক্যি গো কি যক্যি! পুজোর পর থেকে এই নিয়ে তিন দিন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'লো। আট আনার পয়সা হাত দিয়ে গললো না, গলছে না। —নাও মালতী, তোমাকে—আচ্ছা পুজোটা না-হয় ফাঁকি দিয়েছি, এই কালিপুজো কি নক্কিপুজোর বকশিশটা দিলুম।'

বিপদবরণ চুপ ক'রে গেল।

'কি?' মালতীর ঝকঝকে চোখের প্রচ্ছন্ন হাসি চোখা বিদ্রূপ উকিলকে এবার বিঁধছিলো। 'চিঁড়ে ভিজে জল হয়ে গেল নাকি? কথা নেই কেন?'

লজ্জার অথই জলে পড়ে উকিল হাবুডুবু খায়। 'আমার মনে থাকে না, সত্যি মনে থাকে না, নেক্সট-টাইম যখন এ-বাড়ি আসবো—ছি-ছি, সামান্য একটা বকশিশ, বলো কি।'

'না থাকগে।' যেন কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে মালতীরও কেমন-কেমন ঠেকছিলো, 'আমি পয়সা দিয়ে কি করবো। আমার পয়সা খায় কে। আমি কাকে দিয়ে রেখে মরবো। রেখে দিন আপনার পকেটে ওটা। মশায়ের দু-দিনের বাজারখরচ চলবে। আপনার বাচ্চার দুধের দাম দিতে পারবেন। চুল ছাঁটাতে পারবেন, কাপড়জামা ধোপাখানায় দিতে পারবেন, জুতোটা সেলাই করাতে, বিড়ি খেয়ে-খেয়ে গলাটা ঝাঁজরা হ'য়ে যাচ্ছে—দু-এক প্যাকেট সিগারেট খেতে, কেবল পায়ে হেঁটে ফুটপাতে ঘযে জুতোটা ক্ষইয়ে ফেলেছেন—ট্র্যাম-বাসে দিনে অন্তত এক আধবার ওঠা যাবে। অনেক কাজে লাগবে। রেখে দিন, রেখে দিন দাদাবাবু আপনার বকশিশ পকেটে। ব'লে প্রায় শিস দেওয়ার মতো নিশ্বাসের শব্দ করে বকুলগন্ধী খোঁপাটা বাঁ-হাতের ঝাপটায় চকিতে নাড়া দিয়ে কক্ষ থেকে মালতী যখন নিষ্ক্রান্ত হয় তখন বিপদ আর বিপদেব মধ্যে থাকে না।

ট্র্যামে ওঠা জুতো সেলাইয়ের কথাটা মেয়েটার মুখে, অবশ্য রহস্যচ্ছলেই, আরো-একদিন সে শুনেছে।

'এটা অপমান করা ছাড়া আর কি।' বিপদ চায়ে চুমুক দিয়ে টিড়ে চিবোতে-চিবোতে ভাবলো। 'নিজে খুব ফিটফাট কলেজী মেয়ের মতো সেজেগুজে থাকতে পারছে, আর, একজন উকিলেব এই বেশ। এর জনাই অহংকার।'

বিপদ চিড়ে চিবোতে গিয়ে রাগে দাঁতে দাঁত ঘষলো। 'ভ্রষ্টা, বেশ্যা।' যেন বিপদ একলা নির্জন ঘরের দেয়ালগুলোর দিকে তর্জনী তুলে বক্তৃতা করলো, 'তুই অসৎ। অসৎ পথে যদি চলতো তো বিপদের আজ এই অবস্থায় থাকতে হতো নাকি। গাড়ি করতো বাড়ি করতো সেও। কিন্তু নীতিভ্রষ্ট হয নি। তা ছাড়া সে পুরুষ। কোনো প্রশ্নই উঠবে না কি করে পয়সা করেছে। তোর? কিসের জোরে এই অহংকার, এত গরম কেন! বাসন মেজে কত রোজগার করিস, ক টাকা দেন মীরা চক্কোত্তি!'

'কেউটে সাপ।' চা শেষ ক'রে হীরেনের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে উকিল এ-বাড়ির ঝিটাকে আরো বেশ খানিকটা গালাগাল করলো মনে-মনে। 'সাহস, কথার ধার কত! বকশিশ তোমাব পকেটে রেখে দাও! আরে, আরে, তুই যে-সব বাবুব বকশিশ খেয়ে তাদের গা চেটে পা চেটে গা তেলতেলে করেছিস, ফর্সা হচ্ছিস দিনকে দিন, সে-সব বাবুদের তো আব জানতে বাকি নেই উকিলের।'

'সব স্কাউন্ড্রেলের দল! চোর, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার! দেশটা ওরাই তো ডুবিয়েছে, আর ওদের পয়সার জোরেই দেশ ভ'রে পৃথিবী জুড়ে সব দুর্নীতি মাথা তুলেছে।'

সেজন্যই ভালো মানুষ বিপদ, বিপদের দল ডুবতে বসেছে। এত গরম ঝিয়ের এক্সট্রা ইন্‌কাম আছে ব'লে। স্বামী ছেড়ে একটা সিনেমা কোম্পনির ছেলের সঙ্গে আছে মেয়েটা। বিপদ শুনেছে বৈকি।

সেদিন পঙ্কজ রায় বার-লাইব্রেরিতে হীরেনের বাসার এই ঝি-টি সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেছিলো। মনে আছে বিপদের। কি সূত্রে পঙ্কজ হীরেনের পিসতুতো ভাই।

সুতরাং সুবিধা পেলে বিপদ মাগীকে অপমান করতে ছাড়বে না, মনে-মনে ঠিক করলো। 'কেউটে সাপ!' হিস্‌হিস্‌ ক'রে মালতীকে গালাগাল দিতে-দিতে সিগারেটটাকে প্রায় শেষ করে এনে স্তিমিত ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে ম্রিয়মাণ নিস্তেজ চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে বিপদ একটা কথা ভাবছিলো, 'ভিতরটা ভয়ানক রাফ্‌—কিন্তু বাইরেটা। কে বলবে মালতী চাকরানী! অদ্ভুত চেহারা আর এমন ফিটফাট থাকে! দেখে হঠাৎ মনেই হয় না যে—'

ঠিক কার সঙ্গে কিসের তুলনা দিলে মালতীকে ভালো মানাবে মনে-মনে ঠিক করতে-করতে মালতীর দেহের অগাধ সৌন্দর্যের সঙ্গে তার বৃত্তি ও স্বভাবের একটা পার্থক্য ও দূরত্বের হিসাব বার করতে করতে স্থূলমস্তিষ্ক ভোজনবিলাসী বিপদ এ ঘরে যখন একলা চুপচাপ বসে মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস

ফেলছিলো তখন তার তার চোখমুখের অবস্থা দেখে কে না বলবে যে বিপদও কম বড়ো আর্ট-রসিক নয়।

এবার ও ঘরে উঁকি দেওয়া যাক।

প্রথম নজরেই বোঝা গেল সেখানে আর ঠিক ছবির মাধ্যমে আলোচনাটা না-হয়ে দু-জন দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে কথা হচ্ছে।

হীরেন গম্ভীর।

আর্টিস্ট শেষ সিগারেটের নিবন্ত টুকরোটা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। তারপর খালি সিগারেটের টিনটার ওপর আঙুল ঠুকে-ঠুকে ডুগডুগি বাজাতে লাগলো। এই আঙুল তুলি ধরে! হীরেন ভাবলো।

'না, অবশ্য যদি বলে। লেখাপড়া করা দরকার আমি তা-ও করবো। রিয়েলি বলছি। সামনের মাসের গোড়ায় আপনার টাকাটা শোধ করতে পারবো। দেখি যদি রিস্টওয়াচটা বিক্রি করতে পারি।'

হীরেন নিজের হাতঘড়ি দেখলো।

'এ-সব আঁকাআঁকি করছেন কেন? সময় নষ্ট। সাময়িক উত্তেজনা। একজন খারাপ হয়েছে বলে আপনি অ্যাব্‌নর্মাল থাকবেন কেন। চাকরিতে ফিরে যান। এ-সব ছবি—আমি মেনে নিচ্ছি যে আজ যে বেদনাবোধ জেগেছিলো তা-ই প্রেরণা দিয়েছে আঁকতে। এভাবে পৃথিবীতে অনেক প্রতিভাব বিকাশ হয়েছে। তবু তো, তা ছাড়া এই শহব আর কিছু না করে, খেয়ে এবং এত টাকা ঘরভাড়া দিয়ে কেউ এতকাল থাকতে পারে নি। কথাগুলি না-বলে পারলে না হীবেন। এ-ঘরে ঢুকে আজ ছবিগুলোর বিক্রি সম্বন্ধে হঠাৎ সন্দেহ হয়েছিলো তার। এবং এইমাত্র এত সব আর্ট-আলোচনার পর আর্টিস্ট ঝুপ করে তার কাছে পঞ্চাশ টাকা ধারের প্রস্তাব দিতে হীরেন বেশ অস্বস্তি বোধ করলো, বিবক্ত হলো একটু। ধার। না কি এই জন্যেই এত ভূমিকা। বলে কি না হীরেনেরই এখন এমন টানাটানি চলছে। যেন অসৌজন্যতায় পালিশ দিতে পরক্ষণেই হীরেন বললো, 'তা ছাড়া আমার কাছে তো টাকাকড়ি কিছু থাকে না। সব মীরা। মীরাই দেখছেন, করছেন। হাসপাতাল থেকে পঙ্গু হয়ে ফেরার পর থেকে সংসারের সব ভার নিয়েছেন উনি।' কথা শেষ করে হীরেন মৃদু হাসলো।

আর্টিস্ট শুকনো একটা তুলি বুলিয়ে ইজেলের ওপর কাল্পনিক ছবি আঁকছিলো।

'আচ্ছা, তা হলে আমি উঠি এখন, চলি আজ —বন্ধু বসে আছে।' বলে হীরেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো।

এ-ঘরে শূন্য প্লেট আর চা-এর পেয়ালার ওপর দুই পা তুলে দিয়ে বিপদ গভীর চিন্তামগ্ন। যেন চোখ দিয়ে সীলিং জরিপ করছে। কপালে কুঞ্চন। হীরেন ঘরে ঢুকতে বিপদ চোখ নামালো।
' দেখে এলে ছবি?'

'টাকা কর্জ চাইছে।' হীরেন ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলে।

'কস্মিন্‌কালেও ওই কর্ম কোরো না ব্রাদার, দিয়েছো কি মরেছো। ইহজন্মে ফেরত পাবে না। আমি দেখেই বুঝেছি একেবারে ভেরেণ্ডাভাজা আর্টিস্ট। একটা ছবি ওর সাত বছরে বিক্রি হয়?'

হীরেন চুপ ক'রে রইলো।

বিপদ মুখ বিকৃত করে বললো, 'আরে সব শালাই মডার্ন ছবি আঁকে, মডার্ন লেখে—বলি আগে তো বাস্তব দেখ্, তোর চারপাশে কি সব জিনিস আছে মোটা তুলির টানে সেগুলো ভালো ক'রে ফুটিয়ে তোল্। ছবি বিক্রি হয় না তখন কেমন দেখি। তুইও খেয়ে বাঁচবি। কেবল ছাইভস্ম

আঁকলেই হলো না।'

হীরেন এবার না-হেসে পারলো না। 'তুমিও যে একজন মস্ত বড়ো আর্টক্রিটিক হ'য়ে গেলে উকিল—ব্যাপার কি?'

উকিল তৎক্ষণাৎ উত্তর করলে না। কুমারী-মীরার ফটোর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে পরে অল্প হেসে বললো, 'অ্যাটমস্‌ফিয়ার, পরিবেশ তা ক'রে দেয় ব্রাদার। বেশ তো, ছবি আঁকবে তো এই মডেল আঁকুক। এর তুলনা আছে নাকি। সাধারণ অথচ সুন্দর।'

হীরেন ভুল করলো।

'তিনি তো সুন্দর, খুবই পার্ফেক্ট চেহারা। কিন্তু—কিন্তু আমি কি উল্লুকটাকে গিয়ে বলবো তুই মীরা দেবীর ছবি আঁক, এঁকে বাজারে বিক্রি ক'রে অন্নসংস্থান কর্? ব্রাদার, আছো বেশ।'

উকিল ময়লা রুমাল দিয়ে কপাল মুছলো। 'এ সব বাজে ঝোঁক আমার নেই। তা হ'লে তো শোভার মাকেও গিয়ে বলতে পারি, কাপড়চোপড় পরে তৈরি হও, তোমার ছবি আঁকা হবে এবার, বাজারে বিকোবে। তাই কি না? কী আমার আর্টিস্ট রে!'

হীরেন চুপ ক'রে রইলো।

শোভা উকিলের বড়ো সন্তান।

বিপদ গলাটাকে আরো খসখসে করে তুললো, মাথাটা নোয়ালে। হীরেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'গিন্নী তোমার সুন্দরী এবং খুবই মডার্ন। সে-কথা নয়। ভারি চমৎকার একটি মেয়ে জুটিয়েছো ভায়া। যাই বলো একেবারে আলট্রা মডার্ন! দাও-না বলে ও-ঘরের গর্দভটাকে, মালতীর মুখখানা তুলির টানে ফুটিয়ে তুলুক। আরে, ঝি হলে হবে কি, ঝিয়ের মধ্যে বুঝি বিউটি নেই? কি বলো?'

একটু সময় ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হীরেন মৃদু হাসলো।

'না, যাই বলো ব্রাদার, অদ্ভুত ওর নাক চোখ এবং এডির শেপ্। একটা ছন্দ একটা বিভঙ্গ ময়ী ভাব আছে তোমাদের এই মালতীর মধ্যে। ঝি চাকর মালী মেথর ধাঙড় রিকশাওয়ালাদের আমরা এড়িয়ে চলছি, দূরে সরিয়ে রাখছি, তাই আর্টেরও উন্নতি নেই। নেচার ফুটছে না, আড়ষ্টতা থেকে যাচ্ছে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে। মিথ্যে বলছি?'

'আইডিয়াটা তোমার মাথায় মন্দ আসে নি।' উকিলের সামনে টেবিলে চা-জলখাবারের শূন্য বাসনগুলো দেখতে-দেখতে হীরেন বললো, ' বেশ, মৃগাঙ্ক মজুমদারকে আমি এখুনি ডেকে বলে দিচ্ছি। আঁকার ভালো মালমসলা তোমার হাতের কাছে রয়েছে। খামোকা কেন উপোস থাকছো, উকিল-বন্ধুর এই সাজেশন।'

'হেঁ হেঁ।' খুশি হয়ে উকিল ঘাড় নাড়লো। 'কিন্তু শালা কি আঁকবে। ও-সবের দিকে একেবারে নজর নেই। আঁকবে যত—' এবার আর চাপাগলায় না, গলা চড়িয়ে বললো, 'আঁকবে কলেজী মেয়ের মুখ, আই.সি.এস.-এর স্ত্রীর খোঁপা! সব কৃত্রিম, সব ভেজাল। ছবি বিক্রি হবে না আমড়া বিকোবে! সাধারণকে আঁকো, তবেই নাম, তবেই অর্থ।'

হীরেন একটা বড়ো রকমের হাসি গলাধঃকরণ করে তাড়াতাড়ি বললো, 'আর-একটু চা খাবে কি, ডাকবো মালতীকে?'

হীরেন কথাটা বেশ জোরেই বললো, বলে চুপ করে রইলো। উকিল সতৃষ্ণ চোখে পিছনের দরজাটার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে পরে বললো, 'না, আর না, খেয়েছি একবার চা। খাওয়া যেমন-তেমন, অসময়ে চা করার হাঙ্গামাটা কম না।' বলে টুপিটা হাতে নিয়ে আবার এমন কাতরচোখে বিপদ পিছনের দরজার দিকে তাকালো যে দেখে হীরেন ভাবলো, কে বলবে এই বিপদবরণ একটু আগে রেশনের চিন্তা করছিলো, বাচ্চার দুধের দেনা শোধ করার ভাবনায় সে অস্থির।

দেখা গেল, আর্ট রাজনীতি সমাজনীতি সব কিছু নিয়ে বক্তৃতা করার ক্ষমতা রাখে উকিল।

না-হলে আর উকিল! 'ঝি চাকর বলে কথায়-কথায় ওদের চাপ দেওয়াটা আমি পছন্দ করি না। ততটা রিফর্মড্ আমরা হয়ে গেছি বৈকি। তাদের আমরা কাছে রাখবো, কাছে ডাকবো, কি বলো? ওখানেই সাম্য সোশ্যালিজ্‌ম।'

হীরেন ঘাড় নেড়ে বললো, 'নিশ্চয়।'

'যাকগে, তুমি ব্যাটাকে এক-পয়সা ধার দিও না।' বৈষয়িক উকিল দ্বিতীয়বার বন্ধুকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, 'চলি, চললাম আজ।'

হীরেন বিপদকে আর বসতে বললো না।

'এঃ হেঃ, দুটো বেজে গেল, আমার রেশন কার্ডগুলো আজ আর জমা দিতে পারলাম না।' চৌকাঠের বাইরে গিয়ে বিপদ বললো, 'কিন্তু দুঃখ থেকে গেল এতটা সময় ওয়েট্ করেও মিসেসের সঙ্গে দেখা হলো না, হীরেন। কখন ফিরবেন, কখন ফিরছেন ভার্যা?'

হীরেন এ-প্রশ্নের উত্তর দিলে না। বিপদ চলে যেতে একবার হাতঘড়িটা দেখলো। দুটো দশ। ঘড়ি থেকে চোখ তুলতে দেখলো ঘরে মালতী ঢুকছে। পেয়ালা প্লেট সরিয়ে নিতে এসেছে। পেয়ালা পিরিচের টুংটাং আওয়াজের চেয়েও সুন্দর মিঠে গলায় হাসলো মালতী, তারপর অভিযোগের সুরে বললো, 'এমন অসভ্যের মতো মুখের দিকে তাকায় ভদ্রলোক! উকিল না আদালতের কমবেতনী চাপরাসী, ওই রকম নজর।'

হীরেন গম্ভীর হয়ে রইলো।

আর-কিছু বলতে সাহস না-পেয়ে মালতী শূন্য বাসনগুলো তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আলস্য দূর করতে হীরেন একটা সিগারেট ধরায়।

নয়

অবশ্য ভোমরাকেই আগে টাকা দিলে অমরেশ। দিয়ে হাসলো। মীরাকে বললো, 'প্রয়োজনের চেয়ে দুঃখের দাবি আগে, এটা অস্বীকার করতে পারো না।' ভোমরাও মীরার দিকে চেয়ে অল্প-অল্প হাসছিলো। টাকা নিয়ে ভোমরা চলে গেল।

অমরেশ মীরার চোখের দিকে তাকিয়ে এবার কি যেন ভাবছিলো। একটু পরে সে আবার বললো, 'তুমি টাকা চাইছো সেবার মনে নিয়ে, ওর স্বপ্ন এখন সংহারের। সত্যি, কী ট্র্যাজেডি মানুষের জীবনে আসে, দেখ।'

অমরেশ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'মদ খাচ্ছে, আর জাহান্নমের কথা ভাবছে।'

'আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত ওইরকম হয়ে যাবে।' মীরা দীর্ঘশ্বাস ফেললো না, বরং একটু কাটা-গলায় বললো, 'এ-ভাবে এত সেন্টিমেণ্টাল মেয়ে স্বাভাবিক থাকতে পাবে না। নয় তো সুইসাইড করতো, কি বদ্ধ পাগল হয়ে যেতো। একটা কিছু করতেই হতো ওকে।'

অমরেশ চমকে মীরার চোখের দিকে তাকালো। অর্থাৎ, আবেগের ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর ওর অস্বাভাবিক ধারালো হয়ে যেতে অমরেশ কেমন অবাক হলো। 'সত্যি, বিয়ে জিনিসটার ওপর দিন-দিন আমার অশ্রদ্ধা কেবলই বাড়ছে, মীরা। বিশেষ তোমাদের লভ্-ম্যারেজ। উঃ, এ আমি ভাবতেই পারি না। তেলে জলে কখনো মিশ খায়? বলো, খায় কি না? বিয়ে ও প্রেম সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস, আমার তো তাই মনে হয়।' অমরেশ মীরার হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিলে।

মীরা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'যাকগে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভোমরার কথা ভেবে লাভ নেই। আর, তুমি—যা করো নি, যা হয় নি তোমার জীবনে আজও, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কূলকিনারা পাবে না কিছু। এককালে ভোমরা ভালোবেসেছিলো, এককালে ভোমরার বিয়ে হয়েছিলো। তা তো

হচ্ছেই, করছে কেউ-কেউ, কিন্তু তা থেকে তুমি কি সিদ্ধান্ত টানছো?' মীরার মুখাবয়ব আরো কঠিন হয়ে গেল।

অমরেশ তেমনি চুপ করে।

'এসো, তোমার ঘরে।' মীরা অমরেশের হাত ধরে তার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

একটু আগে ভোমরা চা ও খাবার খেয়ে গেছে। শূন্য ঠোঙা ও একটা কাপ অমরেশের খাটের একধারে পড়ে ছিলো। অমরেশ সেগুলোকে নামিয়ে মেঝের ওপর রাখে, তারপর পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় খাটের নিচে।

'তোমায় চা আনিয়ে দিই?' অমরেশ জিজ্ঞাসু চোখে মীরাকে দেখে।

'না।' অমরেশের আয়না তুলে মীরা নিজের মুখ দেখে।

অমরেশ বললো, 'সত্যি, বিয়ের পর তুমি ঢের সুন্দর হয়েছো, অদ্ভুত ভালো লাগছে দেখতে।'

'কতবার বলবে।' আয়নায় আর একবার নিজেকে দেখে মীরা সেটা হাত থেকে নামিয়ে আগে টেবিলের জঞ্জালের ওপর শোয়ানো ছিলো এখন আলাদা জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখলো। এবার আয়নায় অমরেশও ফুটলো। পাশে মীরা।

চেয়ারটা খাটের সঙ্গে ঠেকানো ছিলো। টেবিলের কাছে সেটাকে সরিয়ে দিতে-দিতে মীরা বললো, 'ভোমরা কতক্ষণ ছিলো?'

'এই ঘণ্টাখানেক।'

'এখানে ও থাকে কোথায়, জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'না। মীরার চোখে চোখ রেখে অমরেশ মাথা নাড়লো। 'আমি কিছু জিজ্ঞেস করি নি। ও শুধু বলে গেল ওর গল্প।'

পিঙ্গল চোখ, প্রশস্ত কাঁধ নড়ছিলো অমরেশের। যেন সবটা শরীরই নড়ছিলো ওর আবেগে।

এই 'না'-কে মীরা অবজ্ঞা করতে পারলো না। তাই, যেন হঠাৎ অতি সুস্থির হয়ে খাটের ওপর পা তুলে বসলো।

'কই, তোমার পাখা কোথায়?'

আরও ঠাণ্ডা পাবার আশায় মীরা সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়াতে গেল, আর তার আগেই অমরেশ হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে পাখা ঘুরিয়ে দিলে। দিয়ে নুয়ে প্রশ্ন করলো, 'খুব রোদে পুড়ে এসেছো মনে হয়?'

'হ্যাঁ, খানিকটা রাস্তা হাঁটতে হয়েছে বৈকি।'

'আমি আশা করছিলাম আজ তুমি আসতেও পারো।' অমরেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

'কখন?' চোখ বড়ো করে মীরা।

'এই, ভোমরা আসার আগে।'

মীরা চোখ নামালো। অমরেশ নিঃশব্দে হাসলো।

'মিস্টার চক্রবর্তী আছেন কেমন?' সিগারেট ধরিয়ে অমরেশ পরে বললো, 'পাখাটা আর-একটু বাড়িয়ে দিই?' রুদ্ধস্বরে অমরেশ প্রশ্ন করলো কি দেশলাইয়ের বারুদ জ্বালার শব্দ হলো হঠাৎ পাখা জোরে চলার দরুন তা বোঝা গেল না।

'তোমায় আমি একটা কথা বলি, মনে রেখো।' অমরেশ সিগারেটে টান দিয়ে বললো।

'কি?' ঠিক অবাকও না, উৎসুকও না—এমনি একটুক্ষণ অমরেশের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে মীরা পরে ছোট্ট একটা ঢোক গিলে বললো, 'কি মনে রাখার কথা বলছো?'

'টাকার দরকার হলে চুপ করে থেকো না। চক্রবর্তীকে কাল ইনজেক্শন দেওয়া হয়েছিলো? অমরেশ মীরার হাত ধরলো। ঘাড় নাড়লো মীরা, হয়েছিলো।'

অমরেশের হাতে হাত রেখে মীরা বললো, 'তা লজ্জা করলে আজ আবার এই দুপুর রোদ্দুরে

তোমার কাছে ছুঁটে আসতুম কি?'

মীরা খাটের ওপর অমরেশের পরিত্যক্ত অর্ধমলিন একটা রুমালের ওপর আঁচড় কাটতে লাগলো। ওর পাতলা মাজাঘষা নখে থেকে-থেকে রক্তের আভা খেলছিলো। যেন তাই মনোযোগ দিয়ে দেখতে-দেখতে অমরেশ প্রশ্ন করলো, 'কি জিজ্ঞেস করছিলে তখন, ভোমরার কথায়? সিদ্ধান্ত! কোন সিদ্ধান্ত, কার সিদ্ধান্ত?'

'যে তুমি কাউকে কোনোদিন বিয়ে করবে না।'

মীবার কথায় অমরেশ হঠাৎ অত্যাধিক জোরে হেসে উঠলো। শব্দটা এ-ঘরে ও-ঘরে প্রতিধ্বনিত হলো কতক্ষণ।

মীরা দুই আঙুল দিয়ে কানের ছিদ্র ঢাকলো, একটু পরে হাত নামিয়ে ফিসফিসিয়ে হাসলো 'আশ্চর্য! আমি বাইরে থেকে একটি মেয়ে এসেছি। তোমার ঘরে, হাজার হোক হোটেল তো, করছো কি?'

'ভুলেই ছিলাম, মীরা।' অমরেশ সংযত হলো খানিকটা। 'তা কেউ নেই, এ-সময়ে কেই-বা ঘরে বসে থাকে—আমাব মতো নিষ্কর্মা ঢেঁকি নয় যে—'

মীরা কথা কইলো না।

অমরেশ মীরার ভুরুর দিকে চোখ রেখে স্থিব হয়ে রইলো।

'না, আমি বলছিলাম ওর বিয়ের কথা।' আস্তে-আস্তে অমরেশ বললো, 'সাততাড়াতাড়ি বিয়ে করতে গেল কেন ভোমরা, এই যদি পরিণাম?'

'তা করলোই বা, দোষ কি, বিয়ে খারাপ না।' মীরা চোখ না নামিয়ে উত্তর করলো।'

'জীবনটা নষ্ট হলো তো?' অমরেশ বলতে চাইলো।

'ও নিজে করেছে!'মীরা অমরেশের একটা বালিশ কোলের ওপর টেনে নেয়।

'কি রকম?' অমরেশ মীরার মতো গলার স্বর সহজ করতে পারলো না। 'শক্‌ড সব শুনে। ওর সুন্দর জীবন নষ্ট হয়েছে, সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে।'

মীরা কথা কইলো না।

'উঃ, আমি ভাবতেই পারি না কেন সাধ করে মানুষ ভালোবাসার পাখির পায়ে শিকল পরায়, সোনার শিকল রাতারাতি লোহার শিকল হয়ে যাচ্ছে তোমাদের। বিয়ে!' যেন অস্ফুট আর্তনাদ করলো অমরেশ।

বিয়ে সম্পর্কে এ-ধরনের একটা মন্তব্য করবে ও, মীরা অনুমান করেছিলো, বিশেষ ভোমরার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, এখন। মীরা অমবেশের এলোমেলো টেবিলটা দেখতে লাগলো।

'চলো, আজ একটু বেড়িযে আসি।' অমরেশ হঠাৎ প্রস্তাব করলো।

'চলো। মীরা ঘাড় নাড়লো। 'ঘরের মধ্যে হঠাৎ ভালো লাগছে না কেন।'

অমরেশ খুশি হলো।

এবং যতক্ষণ সে শেভ্ করলো, চুল পাট করলো, স্যুট্ পরলো, টাই বাঁধালো, বহুদিনের অযত্নে রক্ষিত পাইপটাকে স্যুটকেসের তলা থেকে টেনে বার করে তৈরি হয়ে নিলে ততক্ষণ মীরা দু-হাত লাগিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে যতটা পারলে অমরেশের ঘরখানাকে গুছিয়ে ফেললো। 'কী আগোছালো থাকো তুমি!'

'কি হবে গুছিয়ে?' অমরেশ ঈষৎ হাসলো। 'কি হবে সব সাজিয়ে। সাজানো-গোছানো জীবনের মূল্য নেই।'

'কেন?' মীরা অমরেশের চোখে চোখ রেখে পরে ধীরে-ধীরে বললো, 'সাজাতে দোষ কি।'

'বিশ্বাস নেই, মীরা কিছুতেই আর তোমরা আমাকে বিশ্বাস ধরাতে পারলে না এই জীবনের ওপর।'

'তাই তো তুমি সুখী।' বিড়বিড় কবে মীরা বললো, তারপর অমরেশের পিঙ্গল চোখের তারাগুলো অবাক হয়ে দেখলো কতক্ষণ।

রাস্তায় নেমে অমরেশ ট্যাক্সি ডাকলো।

'কোনদিকে যাবে?'

এত আস্তে মীরা প্রশ্ন করলো যে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দে তা চাপা পড়ে গেল। অমরেশ ট্যাক্সিওয়ালাকে কোনদিকে যেতে বললো শুনলো না ও। পাশাপাশি পিছনের সীটে বসলো দু-জন। হোটেল ডি-লুক্স-এর কোলপসিবল গেট-এর সামনে খানিকটা পোড়া পেট্রলের গন্ধ রেখে গাড়ি—গাড়ির স্রোতে ঝাঁপ দিতে মীরা আর-একটু সরে বসলো। অমরেশের কাছ ঘেঁষে। অমরেশ হাত দিয়ে মীরাকে জড়িয়ে ধরলো।

গঙ্গার ধার। নির্জন জায়গা। অপবাহ্ন।

ঘাসের ওপর রুমাল বিছিয়ে বসলো দু-জন।

একটা জাপানি জাহাজ ভেসে গেল সামনে দিয়ে। কমলা-রং রৌদ্র ও অজস্র চিকরি কাটা ছায়ায় ভরা এমন অদ্ভুত সুন্দর বিকেল অনেকদিন দেখে নি তারা। ঘাসফুলটির মতো ছোট্ট শাদা একটা প্রজাপতি মীরার মাথার ওপর উড়লো কতক্ষণ, নেচে-নেচে ঘুরলো।

অমরেশ অবাক চোখে প্রজাপতি নৃত্য দেখছিলো।

মীরা বললো, 'ভোমরার দুঃখটা মোটা রকমের। চোখ দিয়ে দেখা যায়।'

অমরেশের মুখে কথা নেই।

'না, আমায় ব'লে দাও অমরেশ, কি করবো।' যেন হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো মীরা। 'এমন চুপ ক'রে থাকলে তোমায় নিয়ে এখানে আসতুম কি!'

যেন নির্বিকারচিত্ত হ'য়ে অমরেশ বললো, 'ভারি সুন্দর জায়গা।'

মীরা বললো, 'আমি কি বলছি, শোনো।'

'সত্যি, আমি একটা কথা বুঝি না।' অমবেশ এবার মীরার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকালো। 'আমি ভাবতেই পারি না মীরা, কি ক'রে এমন অশান্তি আসে, বিয়ের বছরটি না-পুরতে ভাঙনের গান শুরু হয়।'

'তুমি বুঝবে না, বিয়ে করো নি যখন।' মৃদু অভিযোগের সুরে মীরা বললো।

'ভোমরার অশান্তি—'

'ভোমরা থাক্।' মীরা অমরেশের কাঁধে কনুই রাখলো, 'ভোমরার অবস্থা পর্যন্ত আমি নিজেকে গড়াতে দেবো না। আমার জীবনের মূল্য অনেক বেশি।'

অমরেশ কথা কইলো না।

মীরা বললো, 'সব তুমি পাচ্ছো। ঘরে ব'সে। ভাবতেও হচ্ছে না। ওষুধ পথ্য ফল ফুল, মোটামুটি রকম ভালো জামাকাপড়, এই সেদিনও নিউমার্কেট থেকে মীরা তোমার অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য সুন্দর একটা অ্যাশট্রে কিনে নিয়ে এলো। হ্যাঁ, চাকরি-নেই-অবস্থায়ও তুমি সিগারেট খেতে পারছো, মীরাই খাওয়াচ্ছে। সুখে আছো, বেশ সুখেই ছিলে। বাড়িভাড়া, দু-জনের ভাতের খরচ, ঝি, ইলেক্‌ট্রিক বিল্, মেথর, ধোপার পয়সা—হাসপাতাল থেকে, কেন, তারও উনিশ কুড়ি দিন আগে থাকতে আর ভাবতে হচ্ছিলো না তোমাকে কিছু। সব মীরার ঘাড়ে পড়েছিলো। ঘুরে-ফিরে টাকাকড়ি যোগাড় ক'রে মীরা যখন ঘরে ফিরলো, দেখা গেল, তোমার মুখ মেঘলা আকাশের মতো অন্ধকার—চোখে প্রশ্নের প্রখর বিদ্যুৎ।'

'তুমি চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকলেই পারো।' অমরেশ মীরার চোখের দিকে না তাকিয়ে

একটা সিগারেট ধরায়, জুতো দিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা ঘাসের গালিচার ওপর হালকাভাবে চেপে ধরে।

'আমাকে কিন্তু বেরোতে হবেই, কেননা আমারও ভাত-রুটির এবং লজ্জা নিবারণের জন্য পাটের চট হ'লেও একটা-কিছু কেনার সংস্থান করতে ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি করতেই হবে। হচ্ছে। ধারকর্জ করে আনি কি ভাবিষ্যতে চাকরি করে খাই।'

অমরেশ ঘাড় নাড়লো।

'তা তো করতেই হবে। ভর্তা যখন অক্ষম।'

কথা শেষ করে অমরেশ সিগারেটের ধোঁয়ার সুন্দর একটি রিঙ তৈরি করলো। তারপর মীরার চোখের দিকে চেয়ে বললো, 'ভয়ংকর মানসিক ক্লেশের মধ্যে আছো তা হ'লে তুমি?'

মীরা আর কথা কইলো না।

'আমি তো দেখছি তোমাদের দু-জনের সম্পর্ক ভোমরার সঙ্গে ওর স্বামীর সম্পর্কের চেয়েও জটিল হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে—দাঁড়াবে একদিন।'

'এক্ষুনি দাঁড়িয়েছে,' মীরা বললো, 'বলছি কি তোমায়! উঃ বিয়ে ক'রে আমার কী সর্বনাশ হ'লো। কেন আমি বিয়ে করতে গেলাম, অমরেশ।'

অমরেশ বেশ জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। মীরার চোখে চোখ রেখে কতক্ষণ স্থির হ'য়ে তাকালো। জল চিকচিক করছে মীরার দুই চোখে। গঙ্গার ওপারের সূর্যাস্তের লাল আভা লেগেছে ওব কালো জল-চকচকে ঝকঝকে নীলাভ সুন্দর চোখের তারায়।

অমরেশ আরও কতক্ষণ তাকিয়ে থাকতো। মীরার হাতের ধাক্কায় তন্ময়তা কাটলো।

'আমায় বুদ্ধি দাও, আমায তুমি যে-পরামর্শ দেবে সেই পরামর্শ শুনবো।'

অমরেশ দুই হাতে মীরাকে জড়িয়ে ওর ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'তুমি অস্থির হ'য়ো না, এতটা অস্থির হওয়া তোমার সাজে না। কী হয়েছে, কিছুই হয় নি। একটা বেবি পর্যন্ত তোমার নেই ভোমরার মতন। কাল থেকে তুমি আলাদাভাবে থাকতে পারো, ইচ্ছে করলে পারো না কি? থাকা উচিত।'

'খারাপ দেখায়, এই যা আপত্তি।' মীরা সন্ধ্যার রক্তিম আকাশের দিকে চোখ ফেরালো। 'না-হ'লে দেড় বছর? দেড় মাস এক সঙ্গে ঘর করার পর মেয়েরা বোঝে এ-ঘর সে রাখবে কি ভাঙবে।'

অমরেশ আক্ষেপের সুরে বললো, 'অত্যন্ত পরিতাপের কথা। আমরা না-হয় যণ্ডাগুণ্ডা মার্কা ছেলে। রেস খেলি, ড্রিঙ্ক করি, নো-ম্যারেজ ক্রীড মেনে নিয়ে মেয়েদের পিছু ছুটি। কিন্তু তোমরা? হীরেন চক্রবর্তী দল? মার্জিতমন সুরুচিসম্পন্ন সব? জীবনের ওপর শুভদৃষ্টি রেখে এ-সব কি করছেন? After all বিয়ে-টিয়ে করে?'

প্রশস্ত কাঁধ একটু পিছনে হেলানো অমরেশের। সূর্যের শেষ রশ্মি পড়েছে ওর পিঙ্গল চোখে। বাঘের চোখের মতো লাগছিলো অমরেশের সবুজ হরিদ্রাভ ঈষৎ রক্তিম চোখ। কিন্তু সেই চোখে হিংসার জ্বালা ছিলো না। চোখের রং, ভেবে-ভেবে মীরার মনে পড়লো, একটু আগে ধর্মতলার একটা হোটেলে ব'সে অমরেশ বীয়ার খাচ্ছিলো কাচের গ্লাসে। সোনালী হরিদ্রাভ পানীয়ের মাথায় রক্তের ছিটার মতো লক্ষ-লক্ষ ফেনার রং ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

অমরেশের প্রশ্নে মীরা চমকে উঠলো।

'তা তুমি এখন ঠিক করলে কি? কি করবে?'

'কিছু না।'

'ক-দিন এখন কিছু না-করাই তোমার ভালো।'

মীরা চুপ ক'রে রইলো।

'কেবল খাটলেই হয় না,' অমরেশ বললো, 'তার দাম পাচ্ছো কই? খাটুনির অনুপাতে তোমার খাওয়া হচ্ছে না, বেশ দেখতে পাচ্ছি। সুন্দর হয়েছো, একটু, কিন্তু তার তুলনায় শরীর ভাঙতে শুরু করেছে বেশি।'

'যদি শরীর ভেঙে দিয়েও স্বামী-দেবতার মন পাই।' হাসলো না, বেশ জোরে একটা নিশ্বাস ফেললো মীরা।

'বাজে সেন্টিমেন্ট, সেন্টিমেন্টও না, সেন্‌স্‌লেস আইডিয়া, এ সেন্‌স্‌লেস টক্‌।' অমরেশ ধমকের সুরে বললো, 'আজ আর এ-সব কথার দাম নেই। যুগ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন তুমি কি করবে, কি করা উচিত সেটাই আগে দেখবে। শিক্ষিতা মেয়ে হ'য়ে বৈজ্ঞানিক সত্যগুলো অস্বীকার করতে পারো না। এ-ভাবে শুধুই একটি লোকের মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করার ফলে তোমার নিজের মনের ওপর যে চাপ পড়ছে তার ফলে তোমার স্বাস্থ্য আরো সকাল-সকাল ভাঙছে। আমি সে-কথাই ভাবছি। ভোমরার মতো বাজে সেন্টিমেন্ট নেই তোমার জানতাম। ওই করতে গিয়ে মেয়েটা মরেছে।'

যেন হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত ওঠানামা শুনতে পেলে মীরা।

'অভিমান, কার ওপর অভিমান করে তুমি নিজেকে কষ্টে রাখছো? প্রকৃতির প্রতিশোধ তোমার ওপর আসবে। না এসে পারে না। মন ও দেহ দুই-ই যখন বিদ্রোহ করছে তখন তা যত চাপবে তত উগ্র হবে তার প্রকাশ। আর শিগগিরই তা দেখতে পাওয়া যায়। পাগল হয়, পার্ভার্ট হয়, স্যুইসাইড করে মরেছে কত মেয়ে। এ-ভাবে অবুঝের মতো নিজেকে ধ্বংস হতে দিও না, লাভ নেই।' অমরেশ মীরার হাতে চাপ দিলে।

'না, শেষ পর্যন্ত আলাদা হয়ে থাকতে হবে আমাকে।' মীরা ঘাড় সোজা করলো। 'আমি দেখছি, অপেক্ষা করছিলাম ওর মতামতের। যদি রাজি হতো এমন ভালো চাকরিটা হাতছাড়া করতাম না। এই দুর্দিনে কিছু-একটা করে চালাতে হবে যখন, কাল থেকেই লেগে পড়তাম।'

'লাভ হতো না কিছু, সন্দেহের একটা খাঁড়া দিবারাত্র তোমার মাথার ওপর ঝুলতো শুধু।'

মীরা কথা কইলো না।

'ভালোবাসা ভালো মীরা, কিন্তু বিয়ে জিনিসটাই বাজে।' অমরেশ আধ-শোয়া হয়েছিলো, সোজা হয়ে বসলো এখন। 'এখানে সন্দেহ-টন্দেহ ঢুকলে আর রক্ষে নেই। পোকায় যেমন আমটাকে খেয়ে ফেলে সন্দেহের কীটও জীবনকে ফোঁপরা করে ছেড়ে দেয়। বাহ্যিক প্রকাশটা চাপা থাকলেও ভিতরে সত্তা থাকে না কিছু।'

'কেন এমন হয়, কেন এমন হচ্ছে আমায় তুমি বোঝাও।' কাতরভাবে মীরা অমরেশের মুখের দিকে তাকায়।

'আমি কি করে বঝুবো, কী তোমায় বোঝাই। ভালোবাসার সোনার আতাকে বিয়ে করার পরদিন থেকে তোমরা কি করে পোকায়-খাওয়া ফলে পরিণত করো সময়-সময় আমিও ভাবি। কী ঠুনকো এই সম্পর্ক, মানুষকে ছোটো করে দেয়,—দুজনই নিচে নেমে যায়।'

মীরা নীরব।

'যাকগে, হুট করে এখন তোমার কিছু করার দরকার নেই। তাঁর যদি পছন্দ না হয়, ভালো না বাসেন রোজ আটঘণ্টা নিয়ম করে বাইরে কাটাও, তো তুমি কিছুদিন বেশ, চুপ করে ঘরেই থাকো না-হয়। তোমার ও রেস্ট নেওয়া হবে। তোমাকে ক-দিন ঘরে থেকে বিশ্রাম নিতে, রাতদিন টাকাপয়সার ভাবনা নিয়ে মাথা গরম না-করতে কি আমি বলতে পারি না মীরা? এটুকু বলার অধিকার আমার আছে। নাও, ধরো এটা। হোটেল থেকেই অমরেশ লিখে এনেছিলো, এখন জামার পকেট থেকে বার করলো। মীরা অন্ধকারে চুপ থেকে মাথা নাড়লো, মাথ নত করলো।

'কি দরকার হলে অধ্যাপককে গিয়ে বলবো, বলতে পারি, মীরার বন্ধু, সুতরাং আপনারও।

হ্যাঁ, আমি হেলপ করছি, দু-জনকেই। দু-জনের স্বাস্থ্য ভালো থাকুক, সুন্দর হোক শুভ হোক জীবন, এই আমার ইচ্ছে। আমি চাইছি। কেন, আমার এই ইচ্ছে কি অস্বাভাবিক, অসুস্থ, মীরা?'

অমরেশের গলায় অসহিষ্ণুতা ফুটলো।

মীরা হাসলো না, হাসির মতো নিশ্বাস ফেলার শব্দ করলো, 'ততটা উদার তিনি নন। বললো ও ধীরে-ধীরে।

'কেন, আমার টাকার মধ্যে গোলাপের গন্ধ লেগে আছে বলে, যে এককালে অধ্যাপক পত্নী মীরাদেবীকে একটু ভালোবেসেছিলাম, সেই কলেজী দিনে?'

মীরা নিরুত্তর।

'তবে তো তাঁর,' অমরেশও ঠিক হাসলো না, গলার একটা শব্দ করলো শুধু 'এই আকালের দিনে বন্ধু বেশি নেই মীরা, এই দুর্ভিক্ষের রাজ্যে মানুষ মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে। টাকার অনেক দাম।'

'তোমার টাকা বাসী গোলাপের গন্ধ না-হয়ে শুকনো মাছের গন্ধ হয়ে ঠেকবে আব-একজনেব নাকে।' মীরা মুখ কালো করে বললো।

'মূর্খ! গম্ভীর গলায় অমরেশ বললো, 'তাই বলছিলাম বিয়ে কবলেই মানুষের মাথা নষ্ট হয়ে যায়। কে-বা কলেজের অধ্যাপক, কে-বা রাস্তার মুটে। সব সমান। বউ-সম্পর্কে সবাই অতিমাত্রায় সচেতন। আশ্চর্য!'

'কোনো মুটের স্ত্রীকেও বুঝি সাহায্য কবতে হয়েছিলো তোমার?' মীরা অল্প হেসে প্রশ্ন করলো।

'থাক, আজ আর সেই গল্পে কাজ নেই। ওঠো, অন্ধকার হযেছে। সাতটা বাজে।' অমরেশ হাতের ঘড়ি দেখলো। তার গলায় থমথমে অন্ধকার। 'কাকে কি সাহায্য করেছি, দিয়েছি না দিয়েছি, আজ তার হিসেব খতিয়ে দেখার ইচ্ছে নেই। অনেক ভালোবাসার অরণ্যপথে হাঁটাহাঁটি করে অনেক অমূলতরুর কাণ্ডে নিজের ও অনেকের কপাল ফাটিয়ে, বহু রক্তপাতের পর এটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, যে ভালোবাসতে নেই। ভালোবাসার পাত্রে টাকা ঢালার চেয়ে তা রাস্তায় ছিটিয়ে দেওয়া ভালো। কী তার দাম যেখানে স্বীকৃতি নেই, শ্রদ্ধা নেই, প্রীতিব প্রাপ্য সম্মানটুকু কেউ দেয় না প্রতিদানে? তাই আজকাল রাস্তার গরিবদুঃখী ভিখিরি রিকশাওয়ালা মুটে মজুরদার সাহায্য করছি। সেখানে ববং দিয়ে অনেকটা সান্ত্বনা পাই, শান্তি আছে।'

একটু চুপ থেকে আস্তে-আস্তে মীরা বললো, 'ভোমরাকে কত টাকা দিলে? সবটা দিয়েই কি ও মদ খাবে? ও যে ওর কাকাবাবুর কাছে মাগনা ভাত পাচ্ছে মনে হয় না কিন্তু। খরচ দিয়ে থাকছে নিশ্চয়। এদিনে যত বড়োলোক আত্মীয় হোক, যত প্রীতির সম্পর্ক থাক বিয়ের আগে, বিবাহিতা মেয়েকে কেউ আর ভাত দেয় না। কেমন?'

'অন্তত দেওয়া উচিত নয়। সেখানেও অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যে দুর্নাম। তোমাদের মেয়েদের এই পৃথিবীতে গড়ে ভগবানও কি কম ফ্যাসাদে পড়েছে!' যেন নিজের মনে কথা বললো অমরেশ। অন্ধকারে তার গলা কাঁপছিলো। আর সেই কণ্ঠস্বরের দৃঢ় সত্যতার ধাক্কায় মীরার গলাও কাঁপছিলো ভয়ে, বিষণ্ণ লজ্জায়।

যেন এই প্রসঙ্গ চাপা দিতে অনুরোধ জানিয়ে মীরা বললো, 'তুমি পারছো বলেই তো হেলপ করছো। প্রতিদানে প্রচুর উপেক্ষা, অকৃতজ্ঞতা, বিস্মৃতি পেয়েছো পরেও। তা-কি আমি জানি না।'

'হ্যাঁ, অনেকে একেবারে ভুলেছে।' অমরেশ আকাশের দিকে চোখ তুললো।

সে কে, কারা কোন মেয়ে, মীরার মনে পড়লো না। অমরেশ এক আশ্চর্য পুরুষ! আজ তার নতুন করে মনে পড়লো। আর মনে পড়লো তার কুমারী-হৃদয়, কৈশোর প্রেমের সবুজ হলুদে মেশানো সেই সোনালী দিন। কামনার কালো ঘন তামাটে প্রলেপ আর স্বার্থপর পৃথিবীর বিদঘুটে রং লেগে-লেগে বিকৃত হয়ে ওঠার আগের জীবন। মনে পড়ে মীরার চোখে প্রায় জল এসে গেল।

মীরা আজ আবার নতুন করে অমরেশকে দেখলো। এক পরম প্রেমিক। সুন্দর বিশাল মহীরুহের মতো। যার অফুরন্ত ফুল, ফুলের সৌরভ, ফল, ফলের শাঁস, পত্র আর পত্রের অফুরন্ত সবুজ লাবণ্য ভোগ করে-করে মেয়েরা, অনেক মেয়ে প্রেমের খেলা খেলেছিলো। তার মধ্যে মীরাও ছিলো। খেলতে-খেলতে বড়ো হয়েছিলো, তারপর উড়ে গেল সব স্বার্থপরের মতো দিগ্বিদিকে। স্বার্থপর পাখিদের ঠোকরে কামড়ে পাখার ঝাপটায় ক্ষতবিক্ষত নিস্পত্র বৈরাগী উদাসী অবিশ্বাসী অমরেশ যেন অন্ধকারে হা-হা করে বলছিলো, 'মদ খেয়ে ও স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নিতে টাকার জন্যে আসুক, কি খোরাকি চলে না বলে বাজে চাল দিয়ে টাকা নিক, বিয়ের পরে এই প্রথম ওকে সাহায্য করলাম এবং এই শেষ। কাল এলে আর পাবে না। টাকার দাম আছে। অন্তত ভোমরার ভালোবাসার চেয়ে আমার টাকার মূল্য বেশি।'

একটু থেমে অমরেশ বললো, 'এবং আমার মনে হয়, ওর স্বামী ওর প্রতি যে-ব্যবহার করছে, ওটাই ওর আসল প্রাপ্য। এই প্রকৃতির মেয়ে ও। মন জুড়ে ধূ-ধূ বালি, মিথ্যের মরুভূমি।'

মীরা চুপ করে শুনলো।

'একটা মিথ্যের করুণ পটভূমিকা রাখছে শুধু এখন পিছনে।'

মীরার বুকের ভিতর দুবদুব করছিলো।

অমরেশের গলা যত জোরে কাঁপলো মীরা নিজেকে তত বেশি অপরাধী বোধ করলো। একটু আগে ভোমরা-সম্পর্কে অমরেশের কথায় ও নিশ্বাসে যে-কাতরতা ও সহানুভূতি ফুটছিলো এখন তা নেই।

'আমি একবার ওব পরীক্ষার ফীজ্ দিয়েছিলাম মীরা, গরিব ও চিরকালই ছিলো, তোমরা জানো।'

মীরা ঘাড় নাড়লো।

'আমি ওকে একটা দামী অংটি প্রেজেন্ট করেছিলাম। হ্যামিল্টন থেকে কেনা হয়েছিলো মনে আছে।'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে এককালে ও খুব মিশেছিলো।' মীরা বললো।

'স্বার্থপর।' পাথরের গায়ে ছুরি শান দেওয়ার আওয়াজ উঠলো অমরেশের গলায়। 'আজ একটা পয়সা দিয়ে ওকে সাহায্য করার আমার ইচ্ছে নেই। হ্যাঁ, যা বললে, ভাত খাওয়ার জন্যে টাকার দরকার হয়, হতে পারে। তাই দিলাম। নিতান্ত করুণা করে।'

'আমার মনে হয় সব-মেয়েদের মধ্যে ও-ই তোমার দিকে ঝুঁকেছিলো বেশি।'

'তাই, এই জন্যেই তিনি সকলের আগে মায়া কাটিয়েছিলেন। স্বপ্নেও ভাবি নি, আঠারো বছরের একটা টুনটুনির মতো দেখতে নাবালিকা কি করে এক সামার-ভেকেশনে বাইরে গিয়ে, মাত্র আঠারো দিন সেখানে বাস করার পর তার মামিমার আলাপিত পাশের বাড়ির এক ইঞ্জিনীয়ার ছোকরার বিবাহিত স্ত্রী হতে রাজি হওয়ার কাজটুকু গুছিয়ে ছুটির শেষে কলেজ করতে কলকাতায় ফিরে এলো।'

'ভোমরা ভয়ানক ডুবে-ডুবে জল খেতো।' মীরা একটা ঢোক গিললো।

'কিন্তু খেয়ে ফল হলো কি? যেন মুখ বিকৃত করে বললো অমরেশ।

. মীরা আবার চুপ করে রইলো।

'ডুমুর ফুল, ঐ অঙ্গশোভা মনোলোভা, তার বেশি নয়।' অমরেশ বললো, 'আরে, কেবল বাইরের চটক থাকলে হয় না, শুধু স্টাইল আর ফ্যাশন, কথা আর চাউনিতে যদি দুনিয়া ভুলতো তো মানুষ এত—বুঝলে মীরা, মানুষ বেজায় কাঠখোট্টা হয়ে গেছে, কঠিন হয়ে গেছে গোটা পৃথিবীর চেহারা হালে। একটু বুঝেশুনে চলতে হয়, দেখেশুনে পা ফেলতে হয়। কী দরকার ছিলো তোমার, অতিরিক্ত ক্ষমতা হাতে ছিলো বলে খোদ কারখানা-মালিকের ছেলেকে বাড়িতে ডেকে খানাপিনা লাগাবার। লোকটা যখন ভালো না। তা তোমার ইচ্ছে অসৎ ছিলো আমি বলি না। স্বামীকে বিলেত

পাঠাবে আকাঙ্ক্ষা ছিলো মনে।'

'বেশি বাড়াবাড়ি করার কোনো মানে হয় না।' নরম সুরে মীরা বললো, ঈশ্বর না দিলে মানুষ কি আর জোর করে অবস্থা ফেরাতে পারে।'

অমরেশ হঠাৎ কথা কইলো না।

একটু পরে মীরার হাতে হাত রেখে আস্তে-আস্তে বললো, 'বাতাসে উড়ে যাবে কাগজটা, তোমার ব্যাগের মধ্যে রাখো।'

মীরা চেকটা থলের মধ্যে পুরলো।

'অবশ্য, তোমার কথা আলাদা। না, এখন হাতে টাকা নেই বলে মিস্টার চক্রবর্তীর চিকিৎসার কথা খরচপত্রের ভাবনা ভেবে মাথা গরম করে তোমার লাভ নেই। এই জন্যে বলছি, টেক্ অ্যানাদার চান্স। অসুখের জন্যে তাঁর মেজাজ এমন খিটখিটে হতে পারে, অনেক সময় হয়। দেখা যাক। কাল ওটা ভাঙিয়ে নাও, চলুক এ-ভাবে কিছুদিন। আমি যখন আছি, যখন রয়ে গেলাম, দেখ না আরো দু-চার মাস। আর—'

'কি, বলো, থামলে কেন?'

অমরেশের ঘাড়ের ওপর হাত রাখলো মীরা।

'যদি বোঝো তিনি টাকাটা দেখেই আজ হঠাৎ যা-তা খুশি তোমায় একটা বলে বসেছেন, কি মাথা গরম করে চেকটাই ছিঁড়ে ফেলছেন, বা ক্রুদ্ধ স্বামী আরো-এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে—'

'আমার গায়ে হাত তুলবেন? আমি ভোমবা? তাই বলছো?'

'না, না, তদ্দুর গড়াতে দেবার দরকার নেই, এবং আমি তো মনে করি সে-স্টেজে পড়ার বহু আগেই তুমি অ্যালার্ট হয়ে গেছো।' একটু থেমে অমরেশ বললো, 'হ্যাঁ, চক্রবর্তীর অসুখই তাঁর মাথায় হঠাৎ নিজের স্ত্রী সম্পর্কে এ-ধরনের একটা দুর্বল অশুভ চিন্তা ধীরে-ধীরে বাষ্পাচ্ছন্ন হতে দিচ্ছে এই জেনে রেখেই তুমি চলবে। তিনি যখন সুস্থ হবেন, যখন কর্মক্ষম হবেন—'

'অর্থাৎ সক্ষম অবস্থায় তাঁর মনের চেহারা কেমন হয় তা দেখার অপেক্ষা করতে বলছো?'

'নিশ্চয়ই।' অমরেশ মীরার কাঁধে অল্প ঝাঁকুনি দিলে। তাতে তুমিও নিজের কাছে নিজে ফর্সা থাকবে। দেখা যাক না, রুজিরোজগারে নেমে তিনি একলা কতটা করেন, কতটা পারেন।'

'তখন আর ঘর থেকেই আমাকে বেরোতে দেবেন না, বলছেন।'

'দেখো না, দেখা যাক।' অমরেশ অন্ধকারে একটু হাসলো, তার দাঁতের অস্পষ্ট শাদা দেখতে পেলে মীরা।

'একবার যখন অধ্যাপকের মাথায় এই রোগের পোকা ঢুকেছে, তখন তার থেকে তিনি অব্যাহতি পাবেন ভরসা পাচ্ছি না। তবু বলছি, এখন তাঁর অসুখ অবস্থায় বিশেষ আর হৈ-চৈ ক'রে লাভ কি। যে-ভাবে চলছে চলুক। ধারকর্জ আমার কাছ থেকে করছো, বেশ তো, না বললে। মেয়েবন্ধু তোমার অনেক আছে নিশ্চয়। সে-ভাবেই একটা মিথ্যে ব'লে দিনকতক চালিয়ে যাও। না, এর জন্যে, এই পাপের জন্যে তোমার অকল্যাণ নেই। আমি বলছি মীরা, স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য স্ত্রীর এটুকু মিথ্যাচারিতার ছাড়পত্র আধুনিক সমাজ দেয়।'

যেন কার একটা গল্প বলতে যাচ্ছিলো অমরেশ। তাই কি? থেমে গেল। 'নাও, ওঠো, রাত হয়েছে, আর ব'সে নয়।' উঠে দাঁড়িয়ে রুমাল ঝাড়তে-ঝাড়তে মীরার সামনে একটু সময় পায়চারি করলো অমরেশ।

মীরা তেমনি বাঁ-হাঁটু ঘাসের ওপর প্রসারিত রেখে ডান-হাঁটুর ওপর থুতনি ঠেকিয়ে গঙ্গার ওপারে তাকিয়ে। কালো চিমনির সারির পিছনে কাস্তের মতো রুপালী চাঁদের ফালি উঁকি দিয়েছে সবে। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছিলো। অন্ধকারে মীরার চুল নড়ছিলো কিনা অমরেশ দেখতে পেলে না।

'চাকরি, চাকরির জন্যে তোমাব ভাবনা নেই।' অমবেশের গলায গুম্‌গুম্‌ আওযাজ হয়। 'আমি বলছি, এখন না, উঃ তোমাকে, মীরাকে ব্যাগ হাতে ক'রে ট্রামে বাসে লিফ্‌টে সিঁড়িতে ছোটাছুটি ওঠানামা করতে হবে আমি কোনোদিন বিশ্বাস করি নি।'

'অদৃষ্টে থাকলে করতে হবে।'

'ভয়ানক অদৃষ্টবাদিনী তুমি।'

যেন ধমক খেয়ে মীবা থামলো।

'আমি বলছি না চাকবি করা খারাপ। সব সভ্য দেশের মেয়েই করছে। কববে দরকার হলে। এখন না। এখন চোখে-দেখা যায় অসুখ হয়েছে বটে তোমার স্বামীর। আব চোখ-দিযে-দেখা-যায়-না অসুখ অশান্তি, বাইরে-থেকে-বোঝা-যায়-না অস্থিরতা অবসাদ নেমেছে তোমার দেহে মনে। সেটা আমি বুঝেছি, দেখছি মীরা। হ্যাঁ, সব দিক দিয়েই ভালো হবে এই ব্যবস্থা। থাকো দিনকতক বাড়িতে। যে-টাকা দিয়েছি রুগীর ওষুধপথ্য ডাক্তার তোমাদেব রেশন বাড়িভাড়া ছ-মাস চলবে। দেখা যাক। সেরে উঠে সবল সুস্থমন অধ্যাপক কি করেন। সে-ভাবে তখন ব্যবস্থা করলেই হবে। ব্যস্তর কিছু নেই।'

মীরা আর কথা কইলো না।

'যদি আরো টাকা তোমার ও হীবেন চক্রবর্তীব সংসাবখচর বাবদ ঢালতে হয় আমাকে, ঢালবো। নিস্বার্থভাবেই দিচ্ছি মীবা, দিয়ে যাবো। এতটুকু আশা না বেখে। তাতেও যদি তিনি রাগ করেন, মন খারাপ কবেন এবং শেষটায় মাথা গরম করেন তো এটা তাঁরই দুর্ভাগ্য, বলো কি না?'

মীবা ঘাড় কাত কবলো। মুখভাব ক'রে বললো, 'মন খাবাপ তিনি সব-কিছুতেই কববেন। আজ তোমার টাকা নিয়ে ঘরে ফিরছি শুনলে মুখে কালো করবেন, একমাস চাকবি না হ'তে ওপরঅলা আমাব দশ টাকা মাইনে বাড়িয়েছেন শুনলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। মন খাবাপ তাঁর ইহজন্মে ঘুচবে না।'

একটু থেমে অমরেশ বললো, 'যা বললাম তাই করো। বেশ তো, টাকা তুমি তোমার দাদাব কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাচ্ছো, দিয়েছেন তিনি, বলবে। যদি কারো ভালো মনে দেওযার মধ্যেও ভদ্রলোক একটা অশুচির গন্ধ পান তো মিছে কথা ব'লেই তাঁকে তা গ্রহণ করাতে হবে। এই টাকাটাই তাঁর এখন ওষুধ বিশেষ। এই দিয়ে তাঁর ফল দুধ ডিম হবে। টাটকা শাকসব্‌জি মাখন মাছ। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আর বাজারেব ভাবনা ভাবতে হবে না। তাঁকে তো নযই, তোমাকেও না। এই টাকা থেকে অনায়াসে ছ-মাসের বাড়িভাড়াও দেওয়া চলবে। ছ-মাসের পুরো চব্বিশটা রেশন আনিয়ে নিও। আর, তিনি যা মনেপ্রাণে চাইছেন, গৃহিনীকে দীর্ঘ ছ-মাসের মধ্যে একটিবার ঘরের বাইরে পা না বাড়িয়ে চলতে। দেখা যাক। হীবেনবাবু তদ্দিনে কতটা সেরে ওঠেন।'

মীরা অমরেশের চোখে চোখ রাখলো।

অমরেশ বললো, 'সিংহ অসুস্থ। সুস্থ হ'য়ে উঠে সোনার হরিণকে কি ক'রে রাখে তার শেষ পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক। তারপর রইলোই তো তোমার স্বাধীনভাবে যা-কিছু করার অধিকার। তখন মহানিন্দুকেরও আর কিছু বলবার থাকবে না। কেননা, পরিবার চালাতে পারছেন না তিনি লোকে যখন দেখবে, তখন তাঁর পরিবার যদি দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে তো তাতে কেউ দোষ ধরবে না। সুতরাং এখন থাক। চক্রবর্তীকে নীরোগ হ'য়ে ওঠার সুযোগ দাও।'

মীরা অমরেশের হাতে হাত রেখে একটা ঢোক গিললো। হঠাৎ অমরেশের গরম নিশ্বাস লাগলো মীরার কানে গালে চুলে অধরে ওষ্ঠে। যেন ছোট্ট একটা ঝড় ব'য়ে গেল মীরার সমস্ত সত্তার ওপর দিয়ে।

আস্তে-আস্তে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে অমরেশ বললো, 'রাগ করলে?'

'না।' হাত দিয়ে কপালের চুল সরিয়ে মীরা গঙ্গার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'কাল দশটার সময় ব্যাঙ্কে গিয়ে ওটা ভাঙিয়ে নিও।'

'আজ কত টাকা দিলে?' মীরা ঘাড় ফেরালো।

'বাড়ি গিয়ে দেখো।' অমরেশ গলা পরিষ্কার ক'রে বললো, 'তোমার স্বামী বিশ্বাস করবে না ঠিকই, কিন্তু তুমি তো করছো, তোমার অজানা রইলো না মীরা। এতটুকু আশা লোভ বা স্বার্থ না রেখে আমি তোমাদের দিচ্ছি—দিলাম। দু-জনে শান্তিতে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আরামে গা ঢেলে দিয়ে ক-দিন কাটাতে পারো এই শুভ ইচ্ছেটাই আজ আমার কাছে সব চেয়ে বড়ো।'

মীরার বাক্‌স্ফূর্তি হ'লো না।

'ঝি-চাকর রাখতে পেরেছো একটা?'

'হ্যাঁ।' মীরা উত্তর করলো।

'এমন কি বাজার বা দোকান করতেও তোমার বেরিয়ে দরকার নেই। বলছি এই জন্যে যে, তুমি তাঁর চোখের আড়াল হবে ব'লে নয়, তুমিই স্বামীকে চোখের আড়াল করবে না। সেবা যত্ন সারাক্ষণের সান্নিধ্য দিয়ে ক-টা দিন ওঁর ভ'রে রাখো। তাতে সংশয়ের বিষ সন্দেহের বীজাণু যদি মরে মন্দ কি।'

মীরা অমরেশের কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে। 'ওঠো, ঠাণ্ডা লাগে।'

'আমি আশাবাদী, মীরা। আশা করছি আবার দু-জনে সুখী হবে। চক্রবর্তী ইজ নট্ এ ফুল। ফিজিক্যালি অসুস্থ তিনি। এটাই আমরা যদি এখন ধ'রে নিই দোষ কি—'

'ক-টা বাজে তোমার ঘড়িতে?' মীরা ব্যাগ হাতে নিলে।

অমরেশ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললো। 'আটটা পঞ্চান্ন।'

'ন-টা বাজে।' মীরা বললো।

অমরেশ মীরার হাত ধ'রে উঠে দাঁড়ায়।

'ঠিকানা তো রাখলামই তোমার।' হাতের কাছে আর কথা খুঁজে না পেয়ে অমরেশ বললো।

ঠিকানা রেখে অমরেশ কি করবে মীরা হঠাৎ ভেবে পেল না। কেননা অমরেশ আর যা-ই করুক, অধ্যাপকের গৃহে হানা দেবে না এ-বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত ছিলো। হীরেন চক্রবর্তীকে অমরেশ ঘৃণা করে। চক্রবর্তীর চেহারা দেখতেই অমরেশের রুচিতে বাধবে। এতক্ষণ ওর সঙ্গে কথা ব'লে এবং কালচার্ড চক্রবর্তী সম্পর্কে অমরেশের মন্তব্য শুনে মীরার বার-বার তাই মনে হ'তে লাগলো। বলতে কি, চেকটা যদি অমরেশ শুধু মীরার জন্যেই দিয়ে থাকে তো অন্তরের সবটুকু অনুরাগ নিয়েই সে তা লিখেছিলো। এর একটা অংশ হীরেনও পাবে, মানে তার ওষুধপত্র বাবদ খরচ হবে। অমরেশের মনে হয়েছিলো যখন নিশ্চয়ই অনুকম্পা ক'রে সে টাকার অঙ্কটা বসিয়েছিলো।

আর-একবার অমরেশকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হ'লো মীরার, কত দিয়েছে সে আজ।

'বলছিলাম দরকার নেই হোটেলে বার-বার এসে, তোমার স্বামী যা পছন্দ করেন না। যদি মনে করো আরো টাকার দরকার তোমাদের, একটা কার্ড লিখে ফেলে দিও আমার ঠিকানায়। রেজিস্ট্রি মনিঅর্ডার যা ক'রে হোক আমি আবার টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। রেবা কুন্তলা হেনা ডায়না যে-কোনো একটা মেয়েলি নাম রেমিটারের ঘরে বসিয়ে দেবো। হীরেনবাবুর আর সন্দেহ থাকবে না। বার-বার দাদার কাছে কর্জ না ক'রে মেয়ে-বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করছো বলবে।'

এলোমেলো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোনাকি পোকাগুলো নেচে নেচে ঘুরছিলো। রেড রোডের আলোর ফুল্‌কির সঙ্গে আড়াআড়ি ক'রে ওরা মাঠের অন্ধকার বিদূরণের চেষ্টা করছিলো কি?

কথা না ক'য়ে মীরা অমরেশের হাত ধ'রে হাঁটলো একটুক্ষণ।

একটু পরে যেন নিজের মনে বললো ও, 'তুমি কত বড়ো, কত ভালো, অমরেশ।'

একবার থেমে মীরা আবার বললো, 'বিয়ে না করলে কত ভালো থাকে মানুষের মন, তাই

ভাবছি।'

'যদি বোঝো কিছুতেই চলছে না সেখানে, চ'লে এসো সোজা আমার কাছে; এখন না। অসুখটা ওর সারুক। আর একটা চান্স দাও।'

'সেদিন একটা ভালো কাজ তুমিই আমায় যোগাড় ক'রে দিও ব'লে রাখছি। আলাদা হ'য়ে যখন থাকবো একটু ভালো ভাবেই থাকবো। রোজ টাকার চিন্তা ক'রে আয়ুক্ষয় আর করবো না।'

অমরেশ কথা কইলো না। মা.ঠে জল নিকাশের একটা ছোটো নালা পার হবার সময় মীরাকে প্রায় কোলে তুলে সে সেটা পার হ'লো।

'ভোমরাকে তুমি ও-সব বাজে আইডিয়া ছেড়ে দিতে বলো। ব'লে-ক'য়ে একটা ভালো চাকরিতে ঢুকিয়ে দাও। কী হবে আর প্রতিশোধ-ট্রতিশোধ নিয়ে, যার সঙ্গে আর সম্পর্কই থাকছে না। না, অমরেশ মনের এক-এক অবস্থায় ভালোবাসার আদর্শের রকমফের হয়, হওয়া উচিত। বিশেষ বিয়ের পর।'

'বুঝি না।' অমরেশ বললো। 'আমি বিয়ে করি নি।'

মীরা কথা কইল না।

'পারি না কি, আজই পারি ওকে আমি সিনেমায় ঢুকিয়ে দিতে। একটি মেয়ের ডিসেন্ট্ ভাবে থাকতে পারাব মতো একটাই তো লাইন আছে এখন মীরা? বিশেষ যে-মেয়ে দেখতে মোটামুটি রকম ভালো। যদিও ভোমরা একটু বেঁটে।' মীরা কথা কইলো না।

অমরেশ বললো, 'ভোমরা ব'লেই এ-কথা বলছি, ও যে-ধরনের মেয়ে যে-রকম সমাজে মিশেছে।'

'আমি অত টাকা চাইছি না। আমায মোটামুটিরকম একটা আফিসে কাজে ঢুকিয়ে দিও।'

'আপিসেও তোমায় মানাবে না মীরা।'

'কেন?' অন্ধকারে মীরার গলা একটু কাঁপলো।

'কেন তা কি তুমি জানো না? হীরেন তোমায় এক মিনিট চোখের আড়াল করতে চায় না? আমিও যদি তোমায় চোখেব আড়াল না ক'রে তোমার নিয়ে বালিগঞ্জে স্টেটের বাড়িতে গিয়ে উঠি? অনেক দিনের হাহাকার-মেশানো হোটেলবাস ছেড়ে দিই এবার, তুমি কি তা চাও না মীরা?'

মীরা কথা কইলো না।

অমরেশ মীরার গালে ঠোঁটে চুম্বন করলো। 'তুমি সুন্দর, তুমি অদ্ভুত সুন্দর, মীরা।'

'এই, রাখো, কেউ দেখবে।'

দূরে চৌরঙ্গির লাল বেগ্নি সবুজ আলোর ঢেউগুলো থর্থর্ ক'রে কাঁপছিলো।

'কি, ভুল করেছি, আমি কি ভুল করেছি?'

মীরা অস্ফুট যন্ত্রণায় একটু ককিয়ে উঠলো। হাত দিয়ে খোঁপা ঠিক করলো। হাসলো একটু এবং অমরেশকে তিরস্কার করলো। তারপর অমরেশের হাত ধ'রে আবার হাঁটতে লাগলো। একটু পরেই দিনের আলোর মতো ফুটফুটে চৌরঙ্গির পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত পেভমেন্টে উঠে এলো দু-জন।

রাস্তার কিনারে সারিবাঁধা কালো-কালো গাড়ি। মসৃণ ঝকঝকে উজ্জ্বল গাড়ির ঢেউ।

'সেদিন আমি গাড়ি কিনবো মীরা।' অমরেশ গদগদ গলায় বললো, 'কোনোদিন ইচ্ছে হ'লো দু-জনে ফিরপোয় চ'লে এলাম। ঝি-চাকরদের এই কার্তিক মাসের শীত-পড়ি-পড়ি কলকাতার সুন্দর-সুন্দর সন্ধ্যায় একটু হাওয়া খাওয়ার ছুটি দিয়ে রাতের আহারটা দু-জনে বাইরে সারি তো ভগবান কি আমাদের ওপর খুশি হবেন না, মীরা?'

'পারোই তো, সে-ভাবে জীবনযাপন করার সংগতি তোমার আছে।'

'এবং সামর্থ্য।' মীরার হাতে বলদৃপ্ত একটা চাপ দিয়ে অমরেশ চকিতে হাত সরিয়ে নিলে। তির্যকভাবে একটা গাড়ির হেডলাইট এসে দু-জনের চোখে বিঁধেছে তখন। মীরা চোখ বুঝলো।

অমরেশ বুজলো কি না মীরা বুঝতে পারলো না। আলোর তীব্রতা কমলে চোখ মেলে মীরা আর চোখ সরাতে পারলে না।

'সংসারে যে কত মুখ আমরা ভুলে যাই।' ব'লে হেসে সুকোমল সেন মীরার চোখে চোখ রেখে দুই হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকালো।

'নমস্কার।'

'নমস্কার।' মীরা হাত তুললো ও হাসলো। 'আমি কিন্তু ভুলি নি।'

সুকোমলের সঙ্গে জীবনে এই প্রথম সে কথা বলছে।

'আমার সৌভাগ্য।' অমরেশের বন্ধু এবং মীরাদের সময়ের সবচেয়ে ধনী, সুশ্রী ও অভিজাত সুকোমল এতকাল বাদে এই প্রথম দেখা হওয়াতে এমন ব্যগ্রভাবে হাত তুলবে মীরার ধারণায় ছিলো না। মীরার বুকের মধ্যে দোলা লাগলো।

'কেমন আছেন, মীরা?' পরিচ্ছন্ন হেসে সুকোমল প্রশ্ন করলো। 'এঞ্জেল মুখার্জিকে কতকাল পরে দেখলাম।'

'আর মুখার্জি নেই, অনেকদিন চক্রবর্তী হ'যে গেছেন।' অমরেশ সিগারেটের টিন বন্ধুকে বাড়িয়ে দিলে।

'আই সী।' সুকোমল লজ্জিত হ'লো। কিন্তু তার লজ্জিত হবার কিছু ছিলো না। বিয়ের সময় মীরা অমরেশের এই বন্ধুটিকে নিমন্ত্রণই করে নি। মনে প'ড়ে মীরা এখন লাল হ'য়ে উঠছিলো।

'কিন্তু ভালো নেই।' অমরেশ বললো, 'বিয়ের পরেই ট্রাবল্‌স্‌-এ প'ড়ে গেছে বেচারা।'

'কি কি?' সুকোমল গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। 'চলো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি।'

'না, রাত হ'য়ে যাচ্ছে। ও বাড়ি ফিরবে। ইনজেক্‌শন কিনতে এসেছিলো। চক্রবর্তী অসুস্থ।'

সুকোমল রুমাল দিয়ে কপাল মুছলো। 'আই সী।' টাটকা একটা বন্য ফুলের গন্ধে জায়গাটা মদির হ'য়ে উঠলো।

'সত্যি, সংসারে কোনো লোক নিরবচ্ছিন্ন সুখ পায় না।' সকলের সঙ্গে একটু নীরব থেকে সুকোমল পরে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললো। 'চলি ব্রাদার।'

'কোন্‌দিকে এসেছিলে।'

অমরেশ মীরাকে দেখছিলো, বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো।

'একটু মার্কেটিং।' ঈষৎ হেসে সুকোমল বললো, 'বউয়ের কন্‌ফাইনমেন্ট পিরিয়ড চলছে জানো না বুঝি, শোনো নি তুমি। একেবারে খরচের সমুদ্রে প'ড়ে গেছি।'

'কি ক'রে জানবো, কি ক'রে বুঝবো। বাড়ির খবর তো আর সহজে দিতে চাও না তোমরা, বন্ধুরা।'

'ঘরের ঝামেলা অনেক বেশি।' আর একবার মুখভার দৃপ্ত ক'রে সুকোমল মীরার সঙ্গে চকিতে দৃষ্টিবিনিময় ক'রে পরে অমরেশের দিকে তাকালো। 'সকলের চেয়ে তুমিই ভালো আছো, অমর।'

'তোমার ব্যবসার খবর কি? রেডিওর দোকান?'

'ভালো।' সোনার সিগারেট-কেস বাড়িয়ে দিলে সুকোমল বন্ধুকে। 'জীবনে যেটিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছি তার খবর কোনোদিন আমার মন্দ হয় না ভায়া।' ব'লে নিজেও একটা সিগারেট মুখে গুঁজে আর একবারও মীরার দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠলো। 'চললাম।'

এক অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলে। আবার কলেজের দিন মনে পড়লো মীরার। বড়ো ওয়াইন মার্চেন্ট সুকোমলের বাবা। কিন্তু একটি পয়সা নিজে অপব্যয় করবে দূরে থাক, সেই ছাত্রাবস্থা থেকে সতর্ক প্রহরীর মতো আগলে রেখেছে বাবার প্রত্যেকটি পাই। শুধু তাই নয়, নিজে একটা ছোটোখাটো রেডিওর দোকান খুলেছিলো কলেজ স্ট্রীটে। কলেজ ছুটির পর দোকান দেখতে। মেয়েরা এমন সুন্দর ঝকঝকে বড়োলোকের ছেলের এই খাপছাড়া স্বভাব দেখে নাম দিয়েছিলো ওর 'জ্যু'। সুকোমল সম্পর্কে কোনো

কথা উঠলে রাগত গলায় সবাই বলতো, 'ইহুদি সেন।'

সব মেয়েই এক-দু-দিন সুকোমলের দিকে তাকাতে চেষ্টা করেছিলো, সুকোমল একজনের দিকেও তাকায় নি।

'লোকটা চিরকালই এম্নি। স্বার্থপর। আপনমুখী।'

'কিন্তু বউকে ও খুব ভালোবাসে। দেখা হ'লেই বউ সম্পর্কে একটা দুটো কথা বলেছে। সবটাই ওর স্বার্থপর নয়।'

'কোথায় বিয়ে করলো?' মীরা একটু ভাঙা-গলায় প্রশ্ন করলো, 'ছেলে-মেয়ে ক-টি?'

'অনেক।' অমরেশ ঈষৎ হেসে বললো, 'বিয়ে করেছে বর্ধমানের রাজ-পরিবারের মেয়ে।'

'ও, এই জন্যেই বউকে খুব ভালোবাসে বললে? এরি মধ্যে অনেকগুলো বাচ্চা এনে দিলে বলে?' মীবাও হাসলো। যেন মীবা ইচ্ছে ক'রে অমরেশকে খোঁচাটা দিলে। অমরেশ একটু সময় ওব মুখের দিকে তাকিয়ে পরে সুকোমলের সোনার কেস থেকে তুলে দেওয়া সিগারেটটা পরম তৃপ্তির সঙ্গে টানতে লাগলো। মীরা ঘাড় ফিরিয়ে আলোর মালা-পরা মেট্রো সিনেমার বারান্দা দেখছিলো।

অমরেশ বললো, 'আমার তো মনে হয বিয়ের পব ওটাই ভালোবাসার ব্যারোমিটার।'

'বিয়ে যখন করো নি তোমায় আমি ওসব বোঝাতে পাববো না, অমর। চলি, অনেক রাত হ'লো।'

'হ্যাঁ, যাও। তোমার বাস এসে গেছে। কালই চক্রবর্তীকে আব একজন ভালো ডাক্তার দেখাও। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমায় টাকার জন্যে ভাববে না।' বলতে-বলতে অমরেশ, একটু অবাক হ'লো মীরা, আর এক সেকেণ্ড অপেক্ষা না ক'রে দ্রুত রাস্তাব ওপাবে চ'লে গেল। তাব শ্যামবাজারের বাস এসে গেছে কি?

মীরা তখুনি বাসে উঠলো না। বরং সাউথের গাড়ি এসে গেছে দেখে যেন ইচ্ছে ক'রে ও অন্যদিকে মুখে ফেরালো। তারপর আস্তে-আস্তে রাস্তা পার হ'য়ে আবার ধর্মতলার দিকে এগিয়ে গেল। দুপুরে তখন কলেজ স্ট্রীটের বাস ধরার আগে যে-চায়ের দোকানে ঢুকেছিলো সেই দোকানটায় আবার ও ঢুকলো। একটা নিরিবিলি কামরা পেলো। সচরাচর যা ঘটে না। কাচ-পরানো চৌকোণ ছোট্ট সবুজ টেবিলের ওপর হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে মীরা চারদিকে উৎসুক চোখে খুঁজতে লাগলো একটা আয়না কোথাও দেখতে পাওয়া যায় কি না। না পেয়ে অগত্যা এমনি হাত দিয়ে চুল ঠিক করলো, রুমাল চেপে-চেপে মুখ ও চিবুকেব নিচেটা ঠিক করলে। তারপর বয়কে ডেকে শুধু এক কাপ চায়ের কথা ব'লে দিয়ে নিশব্দে ব্যাগটা খুলে চেকটা বার করলো। কাগজের ভাঁজ খুলে মীরা অঙ্কটা পড়লো। তারপর, যেন ছবি দেখছিলো ও, ওটা চোখের সামনে ধ'রে রেখে চুপ ক'রে রইলো। পর-পর অনেকগুলো ছবি মীরার সামনে এসে গেছে। অমরেশের হোটেলের বারান্দা, ঘরের ভিতর, হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠা; একটা বড়ো রেস্টুরেন্টে ঢুকছে দু-জন, মীরা সেখানে একটা ব্রেস্ট্ কাটলেট্ ছাড়া আর কিছুই খায় নি যদিও, রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধার, ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসা, ওপারে অন্ধকার, কালো চিমনির সারি, কাস্তের মতো রুপালী চাঁদের ফালি উঁকি দিয়েছে পিছনে, অনেক কথার পর দু-জনের অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকা, তারপর এক-সময়ে আবার মাঠে ফিরে আসা। মাঠের জলনিকাশের নালা পার হবার সময় অমরেশ তাকে প্রায় কোলে তুলে নিয়েছিলো কি? ন্যাড়া বিলিতি আমলকী গাছ থেকে ক-লক্ষ গজ দূরে ছিলো কার্জন পার্ক, চৌরঙ্গির লাল রোশনাই? অমরেশের প্রখর তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের কাছে সবটুকু ছেড়ে দেওয়া সবটুকু মেলে ধরা। সম্পূর্ণরূপে মীরা নিজেকে বিকশিত ক'রে দিলে। মীরা যে বেঁচে আছে,

ম'রে যায় নি, ইচ্ছে ক'রে আজ অমরেশের সঙ্গে বেরিয়ে সে তা প্রমাণ করলো। এ যেন নিজের কাছে নিজেই পরীক্ষা নেওয়া হ'লো। এই পরীক্ষার খুব বেশি প্রয়োজন ছিলো মীরার।

চা এলো। চেকটা ভাঁজ ক'রে মীরা ব্যাগে পুরলো। তারপর পেয়ালায় একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে দিয়ে সোজা চোখে নির্জীবের মতো কাটালো একটু সময়।

আরো ছবি দেখতে লাগলো মীরা মনের পটে, আরো অনেক কথা ভাবলো ও। সুকোমল এসেছে সামনে। গর্বিত স্বার্থপর যুবক। সুকোমলের কথা মনে হ'তে অমরেশের মন্তব্যটা মনে পড়লো মীরার। কি ক'রে সে টের পেলো যে যেহেতু সুকোমল প্রতি বছর বউকে আঁতুড়-ঘরে পাঠিয়ে রাশি-রাশি টাকা ঢালছে ব'লে তার পত্নী-প্রেমের তুলনা নেই! বিবাহিত একটি যুবক সম্পর্কে ব্যাচেলার অমরেশ, চিরকাল যার হোটেলে কাটলো, এর চেয়ে পাকা কোনো অভিমত পোষণ করবে মীরা তা আশা করে না যদিও। বস্তুত বিয়ে করে নি ব'লে অমরেশকে কত কচি ও অসহায় মনে হয় মীরার। আর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে ওর অনভিজ্ঞ অপক্ক মনের ধারণাগুলো প্রায় উপভোগ করার মতন। ওর মতামতগুলো নিজের মনের মধ্যে নাড়াচাড়া ক'রে দেখলো মীরা আর নিজের মনে হাসলো। তবু চক্রবর্তী এদিক থেকে ভালো, ভাবতে ভাবতে ঠাণ্ডা হ'য়ে আসা চা-টুকু লম্বা চুমুক দিয়ে শেষ করলো ও।

নিশ্চয়ই, অমরেশ স্বামী হ'লে তার সন্তানপ্রীতির ঠেলায় অ্যাদ্দিনে যেটুকু স্বাস্থ্য ছিলো মীরার তা-ও থাকতো না, এতটুকু লাবণ্য।

মীরার স্বাস্থ্যের অবনতি দেখে আজ অমরেশ যেমন আঁৎকে উঠলো সেদিন উঠতো কি না আর না ভেবে দোকানের বিল মিটিয়ে এক-চিমটি ভাজা মসলা মুখে ফেলে মীরা উঠে দাঁড়ালো। প্রায় এগারোটা বাজে।

না, রাত বেশি হচ্ছে ভয়ে যে মীরা বাস ধরতে দোকান থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় ছুটে এলো তা নয়। বরং ভালো লাগছিলো তার রাত্রির ঠাণ্ডা ঝলক লাগা হাওয়া। গঙ্গার বুক থেকে উঠে এসেছে, গড়ের মাঠের বুক ছুঁয়ে এসেছে এই হাওয়া, ভাবলো সে। ভারি মোলায়েম মিষ্টি লাগছিলো মীরার। আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে বুক পুরে এই হাওয়া নিয়ে ঘরে ফিরলে ভালো হ'তো, ঘুমটা ভালো হ'তো, মাথা ঠাণ্ডা থাকতো। কিন্তু উপায় নেই। এর পর আর বাস না পাওয়ার সম্ভবনা বেশি। সঙ্গে আজ পয়সা নেই। অমরেশ চেক দিয়েছে। এবং ঘরে গিয়েও যে ট্যাক্সিওয়ালাকে টাকা দিতে পারবে মীরা, তারও ভরসা নেই। সুতরাং বাসই সম্বল।

না-হ'লে—

না-ই বা হবে কেন। হামেশা হচ্ছে। কালও বেশ রাত হয়েছিলো মীরার ঘরে ফিরতে। ইচ্ছে ক'রেই করেছিলো ও। কাল হাতে টাকা ছিলো। বাজার সওদা সেরে তাই ট্যাক্সি ক'রে ফিরেছিলো। আজ হাতে কিছু নেই। আজ সে কর্জ পায় নি।

তাই ভালো। তাই-বা মন্দ কি। যদি গিয়ে সে হীরেনকে বলে, 'অমরেশ, যার নামে তুমি আঁৎকে ওঠো, পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা করলাম কি না করলাম শুনে তোমার হৃদ্‌পিণ্ড অহর্নিশি কাঁপছে—কই, দেয় নি তো কিছু। কাল চেয়ে এনেছিলাম, আজ টাকা চাইতেই অমরেশ মুখ ঘুরিয়েছে। বুঝলে, ঘরে ব'সে তুমি যা ভাবছো তা নয়। সেই দিন নেই। বাজারের হালচাল এখন অন্যরকম। অমরেশ টের পেয়েছে তার টাকা আমি শোধ করতে পারবো না, কাজেই—'

'প্রেম?'

হীরেন নির্লজ্জ হ'লে মীরাও জিহ্বা চোখা করবে। লজ্জা ত্যাগ করবে।

'তোমরা ভালো ছেলেরা প্রেমের মত মর্যাদা দিচ্ছো। রোলাঁ রবীন্দ্রনাথ পড়া ধীমানেরা। ওরা চিরটা কাল খেলার মাঠে কাটিয়েছে, চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়েছে। একছত্র বই না প'ড়ে কেবলই

মেয়েদের পিছনে ছুটেছে। মেয়েরা শেষ পর্যন্ত ওদের দিকে তাকায় নি, ভালোছেলে বর জুটিয়ে সব স'রে গেছে। ওরা একদিকে করলো ক্লাসের পরীক্ষায় ফেল, অন্যদিকে ডাল থেকে সোনালী পাখিদের উড়ে যেতে দেখে লক্ষ্মীছাড়া গাছের মনের যা অবস্থা হয় তাই হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'হ্যাঁ, কোনো মেয়ে আশ্রয় চাইতে গেলে সাহায্য চাইলে কি আর ফিরিয়ে দিচ্ছে, দেয় না। কিন্তু এবার প্রেমের মুল্য দিচ্ছে একটু হিসেব ক'রে। আগের বারের মতো লক্ষ্মীছাড়ারা এবার ঠকতে নারাজ।'

'কি বললে, 'কি বলছিলো অমরেশ শুনি, আজ আবার যখন তুমি টাকা চেয়েছিলে?'

উৎসুক হীরেনের চোখের কাতরতা কণ্ঠস্বরের অসহায়তা মীরা এখানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনলো, দেখলো।

'কি আর বলবে', উত্তর করবে মীরা, 'ব্যাচেলার মানুষ। কোনো মেয়ে যদি বিয়ের পরে হঠাৎ একদিন গিয়ে বলে, সংসার চলছে না আমাদেব, কাঠ চাল তেল নুন আটকে গেছে, এইবেলা কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করো বন্ধু। শুনে অমরেশ হাসছিলো—হেসে বলছিলো তাই, আমিও ভাবছি না-হ'লে মীরা দেবীর অভাগার হোটেলে পর-পর দু-দিন আবির্ভাব হবে কেন? মন্দার বাজার, তাই মন্দ ছেলেকে মনে পড়লো। কিন্তু তোমার আগে আরো -অনেকে এসে গেছে যে। অনেকেরই এই অবস্থা। মাসের পনেরো দিন টাকায় কুলোয় না কারোর। সত্যি বড্ড ক্রাইসিস, মীরা, মেয়েদের চাকরিবাকরি জোটানোও এই বাজারে মুশকিল হ'য়ে পড়ছে। কিন্তু, আমি, আমিও বা আর কত দেবো, চিরটা কাল তো দিয়েই এলাম। এখন, মনে-মনে ঠিক করেছি, সবাই যখন টাকা-আনা পাই এর সঙ্গে পা-মিলিয়ে চলে আমিও চলবো। আমিও এখন থেকে কোনো সংসারের জন্যে খয়রাতি সাহায্য না ক'রে খয়রাতি ঋণ দেবো মেয়েদের ভেবেছি, যাতে ওরা ধীরে সুস্থে ঘরদরজা গ'ড়েপিটে তুলতে পারে, ভাঙাচোড়া সারিয়ে। পরে আমার টাকা ফিরিয়ে দিক। আর সুদ। হ্যাঁ, আমি এখন পর। বাইরের লোক। তাই সুদ নিচ্ছি। যে-টাকা প্রথম যৌবনে তোমাদের মতো ভালো সুন্দরী মেয়েদের সিনেমা দেখিয়ে, রেস্টুরেন্টে খাইয়ে, আংটি আর ইয়ারিং উপহার দিয়ে খুইয়েছি সেই টাকা আমি সুদে-আসলে ফিরিয়ে নেবো। না-হ'লে আমার লাভ কি থাকছে বলো?'

'ডিমাণ্ড থেকে সাপ্লাইটা এখন বেশি হচ্ছে ব'লে প্রেমিক বুঝি সস্তায় আর ভালোবাসা দিতে চাইছে না।'

অধ্যাপকের চোখে এই প্রশ্ন লিকলিকিয়ে উঠবে মীরা জানে। তাই মীরাও তার যথাযোগ্য উত্তর দেবে। 'হ্যাঁ, সুদ, এবং সেটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আগাম আদায় ক'রে নিতে চেয়েছিলো।'

'কি রকম?' হীরেনের ফ্যালফ্যাল্ ক'রে তাকানো ও হাঁ ক'রে থাকার পেছনে কি ঝড় বইবে মীরা তা মনের চোখে দেখলো। তাই ঝড়ের মুখে আগুন ছুঁড়ে দেওয়ার মতো হেসে ও বলবে, 'একটা চুমু।'

অধ্যাপক আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠবে কি? তার চাউনির মধ্যে মীরার আপাদমস্তক তাকানোর ভিতর অপবিসীম হর্ষ ও কৃতজ্ঞতা ফুটিয়ে হালকা নিশ্বাস ছেড়ে বলবে, 'যাক্—তবু যে তুমি টাকা না নিয়ে সসম্মানে ফিরে এসেছো। হোটেল। দুপুরবেলা। বেশির ভাগ হয়তো বাইরে ছিলো। হাম্বাগটা যদি জোর জবরদস্তি করতো তো সেখানে তোমার কিছু করবার ছিলো না।'

মীরা হয়তো কথা না ক'য়ে কাপড়-জামা ছাড়ছে তখন। হঠাৎ তার চুপ থাকার কারণ অনুধাবন করতে না পারলেও হীরেন নিজের মার্জিত মসৃণ রুচিবান গলাকে, মীরা শুনুক না শুনুক, অধিকতর সূক্ষ্ম ক'রে দেয়ালের দিকে চোখ রেখে বলবে, 'আশ্চর্য মানুষের রুচি মন, অমরেশ কি অন্যভাবে মেয়েদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারছে না। না, আমি কক্খনো বিশ্বাস করি না, যদি ও রবীন্দ্রনাথ পড়তো, যদি একদিনও ও রোলাঁকে হাতে নিতো—ছি-ছি, আরে ক্রাইসিস তো সব সময়ই আসে, তোরও টাকা আছে স্বীকার করছি, কিন্তু তাই ব'লে কি মনটাকে এমন নরক ক'রে রাখবি। স্কাউন্ড্রেল!

যাকগে, তারপর কোথায় গেলে, শুনি?'

'কোথায়, আর যাবার জায়গা আছে কোথায় এই শহরে!' কাপড়-জামা ছেড়ে মীরা বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে বলতে পারবে তখন, 'কে আর আমার জন্যে মুঠি ভ'রে টাকা না নিয়ে ব'সে আছে যে চট্ ক'রে গিয়ে হাত পাতলে উপুড় ক'রে ঢেলে দেবে। পুষ্পর কাছে লজ্জায় যাই না। তোমায় কাল বলেছি। আর থাকেন দাদা। তা সে-সব তুমি জানো। সুতরাং—'

তারপর হীরেন আর প্রশ্নই করবে না। আর-কোথাও গিয়ে মীরা টাকা পেলে কি না। তখন মীরা বলবে। হীরেন চুপ ক'রে যাওয়ার পরেই মীরা মুখ খুলবে। কেননা এতক্ষণ আলাপটা বেড়ানোর বেড়া বেয়ে চলছিলো, এবার কাজের পাথরে পা ঠেকলো।

'সুতরাং কাল আর রেশন আসছে না। রেশন কেন, তোমার সকালের দুধ-পাউরুটির পয়সাও বোধহয় ঘরে নেই! আমি আর কাল থেকে বেরুচ্ছি না। বাব্বাঃ, পুরো একটা সেক্‌শন, তিন মাইল রাস্তা পয়সার অভাবে আজ আমাকে হাঁটতে হয়েছিলো। তাই না রাত বারোটা বাজলো ঘরে ফিরতে।'

কে না জানে স্ত্রীব পায়ে হাঁটার কষ্ট লাঘব করতে স্বামীরা মৌখিক সান্ত্বনার প্রলেপ দেয় ঃ 'দরকার নেই আর এ-ভাবে বেরিয়ে, সত্যি কষ্ট হচ্ছে তোমার।'

কিন্তু এখানে হীরেন নীরব। বলার কিছু থাকবে না। 'কাল থেকে আমি চেষ্টা ক'রে দেখছি দুটো টাকাও মেলে কি না।' হীরেন বলবে কি?

ইজিচেয়ারে শুয়ে রুগ্ন অধ্যাপক নিজের অক্ষমতাব লজ্জা ঢাকতে হলদে শীর্ণ হেসে (রাত্রে বাল্‌বের নিচে কতদিন এই অদ্ভুত হাসি লক্ষ্য করেছে মীরা) যখন নতুন ক'রে স্ত্রীর স্তুতি আরম্ভ করবে মীরা কিছুতেই তা সহ্য করতে পারবে না। হাত-মুখ ধুয়ে, হীবেন খাক না খাক, সেই প্রশ্নও না ক'রে মীরা যখন সারাদিনের ক্ষুধা মেটাতে দিদিমণির জন্যে আলাদা ক'রে রেখে দেওয়া মালতীর হাতের তৈরি খাবারের ঢাকনাটি ব্যগ্র হাতে তুলতে যাবে ঠিক তখন হীরেন মুখ খুলবে। 'না, সেজন্যে আমি চিন্তা করছিলাম না, বরং আজ একটু ভালো ছিলাম। সন্ধ্যের পর 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট' নিয়ে বসেছিলাম। পড়া যদিও বিশেষ হয়নি—'

শীর্ণ হলুদ, বোতলে পচানো আচার রঙেব হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে হীরেন বলবে, 'খুব বেশি না ঠেকলে কি আর তুমি অত রাত করছো, ভাবছিলাম। দেখলাম তা-ই সত্য হ'লো। দেখ, মীরা, আমি আমার হৃদয়ের সবচেয়ে তলাকার মহলের খবর বলছি, সেখানে আমার শান্তি, আমি ঘুমিয়ে আছি বললে চলে, এতটুকু ভাবনা নেই।।'

'কি রকম?'

খুঁচিয়ে কি একটা বা'র করার চেষ্টায় মীরা যদি হঠাৎ ভ্রূযুগল ধারালো ও দৃষ্টিকে প্রখর ক'রে তোলে তো হীরেনের সেখানে করার কিছু থাকে না। কেননা নিজের অসুস্থতা এবং সংসারেব শত অভাবের মধ্যে স্বামী শান্তি ও আরাম পায়, কারণটা স্ত্রীকে জেনে রাখতে হয় বৈকি।

মীরা চোখ ফেরায় না।

হীরেন দেয়ালে চোখ রাখতে চেষ্টা করে যদিও।

'কি, খুলেই বলো না।' হীরেনকে ভীত দেখলে মীরা আরো অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠবে।

'তুমি, মীরা, তুমি।' ঠোঁটের আগায় আবার মোলায়েম আচার রং হাসি ফুটবে হীরেনের। 'তুমি যে চার আনার পয়সাও স্কাউণ্ড্রেলটার কাছ থেকে চেয়ে আনো নি, তোমার রুচি, সংযম— ওখানেই আমার শান্তি, আমার বড়ো সম্পদ। অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছিলো বুঝি?'

মীরা আর কথা কইবে না। আঁচাবে, মুখ মুছবে। কিন্তু অধ্যাপক সেখানেই যদি থামতো। ঘরের আলো নিববে, মীরা শোবে। হয়তো নিজে তখন বিছানায় না গিয়ে, মীরা যদি মশারিও ফেলে দেয়, বিছানায় কাছে ইজিচেয়ারটি টেনে ব'সে হীরেন রাত একটার পর সিগারেট মুখে গুঁজে কথা শুরু করবে। বিশেষ, বেশিরাত্রে মীরার ঘরে ফেরার মহৎ কারণ আজ এ-ভাবে ঘটেছে অধ্যাপক

যখন শুনলো। হীরেন মশারি তুলে মীরাকে চুমো খেয়ে অভিনন্দন জানাতে সাহস পাবে না ঠিক, সারাদিনের ছুটোছুটির পর ঘরে ফিরে মীরা এত বেশি ক্লান্ত বোধ করে যে রাত্রে একবার বিছানায় গেলে আর একটাও কথা বলতে ইচ্ছে হয় না তার। হীরেন হাসপাতাল থেকে ফেরার পর থেকে এটা বেশি হয়েছে।

কিন্তু তা হ'লে হবে কি।

এ-সব ব্যাপারে একলা বকতেও হীরেনের জুড়ি নেই। অসম্ভব জোর পায় সে তখন। অসুখবিসুখ মনে থাকে না। রাত একটার পর ইজিচেয়ার ছেড়ে একলা ঘরে রীতিমতো পায়চারি আরম্ভ করবে। মীরা ঘুমিয়েছে টের পেলে হীরেন দেয়ালের সঙ্গে কথা বলবে। দেয়ালে মীরার ফটোর দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক তার বাছা-বাছা নীতিগর্ভমূলক শব্দগুলি প্রয়োগ ক'রে বক্তৃতা করবে ঃ 'তার চেয়ে উপোস থাকা ভালো, বললে না কেন স্কাউন্ড্রেলটাকে—হোয়াট এ প্রোপোজাল—কেন, তিনি বিয়েটিয়ে না ক'রে বাপ টাকা রেখে গেছে ব'লে ওই কর্মই করছেন নাকি? আর-একজনের বিয়ে করা বউয়ের গালে—হাউ সিলি, কত বড়ো ক্রাইম! অমি ভাবতেই পারি না—

'অথচ এই অমরেশের দল সমাজের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে, মীরা। এরা কম ক্ষতি করছে? ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারকে চোরকে আমরা গালাগাল দিই, জেলে পুরি, খুনীকে ধ'রে ফাঁসি দিই, টি-বি ম্যালেরিয়ায় দেশ লোপাট হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে হাহাকার করছি। কিন্তু এ-সময়ে ক্রিমিন্যালকে কি করা উচিত কি ভাবে শাস্তি দিতে হয় আমি জানি না।'

রাত দুটো বাজলেও হীরেন চুপ করবে না।

তার গলা গুমগুম করতে থাকবে দেয়ালে-দেয়ালে। 'তুমি যে ফিরে আসতে পেরেছো, তুমি যে রাস্কেলটার খপ্পরে পড়ো নি। স্রেফ্ গুলি ক'রে মারতে হয়। ব্যাক্টেরিয়া। সমাজ-দেহের আসল রোগজীবাণু এরা। চিরকাল, চিরটাকাল মানুষের শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা ধ্বংস ক'রে এসেছে। শুধুই অভাবে মেয়েরা আর নষ্ট হচ্ছে কত, নষ্ট হচ্ছে বেশি ওই ইতরগুলোর জন্যে। লোফার্স—

'তুমি ভাবছো রেশনের অভাবে আমরা মরবো, মরছি; আমি ভাবছি যে ক-টা দিন বাঁচলাম দু-জনে সুন্দরভাবে বেঁচে গেলাম, মীরা।

'মরলাম, কিন্তু তোমাকে হারালুম না। এই আমার সন্তোষ। ওষুধ পথ্য আরামের অভাবে ম'রে গিয়েও মনে এই সান্ত্বনা থাকবে। সত্যি, তোমার অমর্যাদা হচ্ছিলো, শুচিতায় লাগছিলো, আজ দুপুরবেলা বলতে গেলে আমার জন্যেই টাকা যোগাড় করতে বেরিয়ে একটা জানোয়ারের সামনে গিয়ে পড়েছিলে।' হীরেনের গলা গদগদ করতে থাকবে। 'না, আলিঙ্গন চুম্বন গায়ে দাগ রাখে না সবাই জানে।'

সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে হীরেন এক সময় বলবে, 'ও-রকম একটা কিছুর এক্সচেঞ্জে অমরেশ, এক-শ' কেন, লাখ টাকা দিতে পারে তোমায়, দিতো! ভালোবাসা কী না করে, মীরা, বলো—উঃ ভালোবাসা।'

একবার চুপ থেকে, কতক্ষণ পায়চারি করার পর, মীরা ঘুমিয়ে পড়েছে টের পেলে হীরেন আর হাঁটবে না। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিতে-দিতে মশারির দিকে তাকাবে। মীরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে হীরেন নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে একবার ঘাড় সোজা ক'রে ধরবে। তারপর ক্লান্ত শরীর চেয়ারের ক্যানভাসে ছড়িয়ে দিয়ে অভ্রভেদী দীর্ঘশ্বাসে ঘরের অন্ধকার মথিত ক'রে আরম্ভ করবে, 'না, কিছুই করার থাকে না, একটা কিছু ক'রে এসে তুমি যদি লুকোও, আমি কি ক'রে জানবো—অসম্ভব, তাই নয় কী মীরা?

'লাখ টাকার একটা আণবিক অংশ খরচ করলে শুধু কমলালেবু কেন, আঙুর, আপেল, দিশি ইনজেক্শনে ভালো কাজ হচ্ছে না ব'লে বিলিতি ওষুধ, মাখন-পাউরুটি, কয়েক রকমের ভিটামিন বড়ি, বাড়িতে ব'সে আছি সত্ত্বেও আমার আবার একসেট্ জামাকাপড় জুতো, সবে বেরিয়েছে নামকরা

বিলিতি বই ম্যাগাজিনের গাদা ও প্রকাণ্ড একটা রজনীগন্ধার ঝাড় নিয়ে আজ যদি দুপুর রাতে ঘরে ফিরতে, তোমার পাতিব্রত্য দেখে আমার দু-চোখ উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হ'তো মীরা, কিন্তু—'

যেন ঢোক গিলতে গিয়ে সেই ফাঁকে হীরেন ঈষৎ হাসবে। অন্ধকারে শিশিতে পচানো আচার রং হাসিটা মীরা দেখতে পাবে না যদিও, আচারের অম্লমধুর ঝাল ও নুন মেশানো বাক্যগুলো শুনবে। রোগা লোকের কথার ঝাঁজ বেশি।

'ওষুধ খাবো রুটি-মাখন ফলও খাবো ধোপদুরস্ত জামাকাপড় প'রে, কোথাও যখন বেরুবো না এই ইজিচেয়ারে শুয়ে-ব'সে কাল সকালে তোমার কিনে আনা নতুন বই পড়তে ও বুক ভ'রে রজনীগন্ধার সৌরভ নিতে আমার আটকাবে না মীরা, আটকাতো না যদিও, কিন্তু—

'তার আগেই হীরেন শেষ হ'য়ে যেতো, যাবে। আমি বিষ খাবো। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতে ঠাণ্ডা নীল শক্ত হ'য়ে প'ড়ে আছি, এখানে, এই চেয়ারে।

'চুম্বনে দোষ নেই, মীরা।'

আবার একটা দীর্ঘশ্বাসের ঝলক দিয়ে অন্ধকারের পেট চিরতে-চিরতে অধ্যাপক মশারির দিকে সন্তর্পণে মুখ ফেরাবে। 'দোষ প্রতারণার। দোষ সব কিছু দেওয়ার পিছনে কিছুই না দেওয়ার বঞ্চনার। এ আমি সহ্য করতে পারবো না। টের পাবো, আমি ঠিক টের পেয়ে যেতাম তুমি যদি এসে কিছু না-ও বলতে। কেন, কি ক'রে, তা বলা মুশকিল যদিও, আর মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবো না ব'লেই তো সব বলা অন্যভাবে শেষ করতাম তখন। মেয়েদের মধ্যে জিজ্ঞাসার কোনো চিহ্ন যখন খুঁজে পায় না পুরুষ তখনই সে সবচেয়ে বেশি দিশাহারা হয়, পাগল হয়, আত্মহত্যা করে।'

এত সব কথা।

লম্বা-লম্বা নিশ্বাসের করাত চালিয়ে হীরেন ব'লে শেষ করবে। না, বিষ খাবে না সে। ঘরে এক ফিনাইল ছাড়া অন্য কোনো বিষ বা বিষাক্ত ওষুধ নেই যদিও। মীরার চেয়ে হীরেন তা জানে বেশি। আর শত মান অভিমান রাগারাগির মধ্যেও রাস্তার ট্রাম-বাসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে চলতে মীরাকে যেমন সতর্ক হ'য়ে পা ফেলতে হয় তেমনি ফিনাইলের ড্রাম তো মোটা জিনিস, সাধারণ আয়োডিনের শিশি বেঞ্জিনের কৌটোটাও ভুলক্রমে খাবার ওষুধের সঙ্গে মিশবে ভয়ে হীরেন সর্বদা তটস্থ থাকে। ঘরে জায়গা কম। একটা শেল্‌ফেই ওর টুকিটাকি সব ধরাতে হয়। তাই দিনের বেলায় ভাবনার কিছু নেই, রাত্রে ওষুধ খেতে হ'লে পাঁচ বার আলোর নিচে ফালইলটা ধ'রে লেখাটা প'ড়ে তবে সে ছিপি খোলে। অনেক রাত হ'য়ে যাচ্ছে মীরা ঘরে ফিরছে না দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হ'লেও। হীরেন কোনো সময় দিশা হারায় না। আর, এক সিগারেট খাওয়া ছাড়া কোনোরকম অনিয়মও পারতপক্ষে সে করে না। সুতরাং—

দীর্ঘশ্বাসের করাত চালিয়ে রাত্রির বাকি অন্ধকারটুকু চিরে ফালিফালি ক'রে হীরেন ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘরে সকাল এনে ফেলবে। আর মীরা ঘুম থেকে ওঠা মাত্র হেসে বলবে, 'বায়ু চড়া হয়েছিলো কাল, ঘুম আর এলো না। তা না হ'লেও আমার, আমি খারাপ বোধ করছি না, বরং অন্যদিন ঘুম না-হ'লে পেটে উইণ্ড হয়, আজ তা-ও না। বেশ ভালো বোধ করছি।'

এতটা—

এত প্রফুল্ল ও সজীব বোধ করবে হীরেন কাল মীরা একটি কপর্দকও অমরেশের কাছ থেকে গ্রহণ না ক'রে হেঁটে ঘরে ফিরেছে শুনলে। মীরার তা-ও সহ্য হবে। সহ্য হবে না কাল দিনের বেলা থেকে-থেকে হীরেন যখন কথার ঘাড়ে আর-একটি ছেলেকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকবে। 'ইডিয়ট—

ইডিয়ট কি আর কাউকে এই প্রোপোজাল দিতে পারলো না। শেষটা'য় তোমার মতো মেয়েকে—ননসেন্স। মুখে চাবুক মারতে হয়। আমি বলবো নিশ্চয় এই ধরনের কোনো মেয়ের, হয়তো বিয়েও হয়েছে, দেখা পেয়েছে সে। তাই ওর বুকের পাটা এত বড়ো হয়েছে। তাই না ঝুপ্ ক'রে আজ তোমাকেও এমন প্রস্তাব—আরে সবাই তো একরকম না, সব কি তোর মতন।'

হয়তো মীরা তখন রেশনের চিন্তা করছে, বাড়িভাড়া ঝিয়ের মাইনের কথা ভাবছে।

'বুঝেছো মীরা, মানুষের আসল চেহারাটা বাইরে থেকে বোঝা কঠিন। কী করে তুমি বুঝবে, কী ক'রে জানবে যে অমরেশের প্রকৃতি এই। আমাদের সমাজে সভ্যতার পলস্তারা লাগিয়ে এরা বেঁচে তো আছেই, ঘাড়ে-গর্দানে দিব্যি মোটা হচ্ছে, বাড়ছে, কেউ আটকাচ্ছে না। পাঁচজনের সঙ্গে হোটেলে বাস করছে, দশজনের সঙ্গে সমান আসনে পাশাপাশি ব'সে ট্র্যামে-বাসে চলছে, সভাসমিতি করছে, রাজনীতি করছে, ভোট দিচ্ছে। সমাজের কোনো ক্ষেত্রে এদের চেক্ করা হয় না, হচ্ছে না ব'লে এই সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। প্রগতিতে আমি বিশ্বাস করি, আমিও প্রগতিবাদী, কিন্তু তার আগে এই কুকুরগুলোকে গুলি ক'রে—' ইত্যাদি।

দশ

ধর্মতলা স্ট্রীটের রাত এগারোটা।

পেভমেন্টে লোকজন কম চলাফেরা করছিলো কি! রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কমতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তবু মীরার মনে হ'লো সে এই মুখর চলমান ফুরফুরে হাওয়ায় নাওয়া আলোর নিশান ওড়ানো সুন্দর পরিবেশে নেই। রাসবিহারী অ্যাভিনিউর দোতলার খুপ্রিতে হীরেনের কথা শুনছে, ঘরের গুমোটে ঘামছে।

এমন কি এখানে এই বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে মীরার কপালের রগ দুটো টিপ্‌টিপ্ করছিলো। এত বিচিত্র গন্ধ ছাপিয়ে তার নাকে এসে লাগছে আচারের বয়ামের মধ্যে ধ'রে রাখা ঘরের টকো পচা পুরোনো গন্ধ।

সত্যি, কী অবিশ্বাস্য রকম খারাপ লাগে মীরার হীরেন যখন রোগা শরীরটা ইজিচেয়ারে ছড়িয়ে দিয়ে ফ্যাকাশে হেসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমাজ সংসার নিয়ে বক্তৃতা করে। এত বড়ো বক্তৃতা মীরার শুনবার সময় কই। মীরার একটিও কথা না বলা দেখে কি হীরেন তা বুঝতে পারে না?

কিন্তু এত বড়ো বক্তৃতা, এত সব কথা হীরেনকে আজ বা কাল বলার সুযোগ মীরা দেবেই বা কেন। মীরা দু-পায়ের ওপর শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়। ইঞ্জিনের শব্দের মতো ওর বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ শব্দ হয়।

ছি-ছি, যদি সত্যি সে এ-ধরনের একটা কথা গিয়ে বলে তো অমরেশ সম্পর্কে মীরাই কি সবচেয়ে বেশি অবিচার করলো না?

অথচ মীরার সংসারখরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকার এই চেক বলতে গেলে একটি কথা বলার আগে অমরেশ লিখে দিয়েছিলো।

হ্যাঁ, হোটেল থেকে এক সঙ্গে দু-জনে বেড়াতে বেরোবার আগে। গঙ্গার পারে গিয়ে ঘাসের ওপর বসবার আগে। কার্জনপার্কের আধোআলো ও অন্ধকারে দু-জনে হাত ধরাধরি ক'রে হাঁটছিলো না তখনও।

এই টাকার বিনিময়ে মীরা অমরেশকে কতটুকু দিলো, কি দিতে পেরেছে? বলতে গেলে কিছুই না। অথচ কোনো শর্ত বা সুদ রাখা দূরের কথা, চেকটা মীরার হাতে তুলে দিয়েই সে

সকলের আগে বললো, 'ভালো ক'রে হীরেনের চিকিৎসা করিয়ো।'

ভাবতে-ভাবতে মীরার দু-চোখের কোনা চক্‌চক্ ক'রে উঠলো।

'না, অমরেশ এত হীন নয়, অমরেশ নীচ নয়।' এখান থেকে স্বামীর কানে কথাগুলো ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে হ'লো মীরার। যদি সে তা পারতো।

বাসে উঠে মীরার মনে হ'লো, অমরেশের এটা বাড়াবাড়ি। 'দরকার হ'লে তুমি আমার হোটেলে তো না-ই, দিনকতক বাড়ি থেকে বেরোনোই বন্ধ ক'রে দাও।'

এ কি ক'রে সম্ভব মীরা ভেবে পেল না। অমরেশের টাকা ভেঙে-ভেঙে খাবে, ইচ্ছে মতো সারদিন ঘরে থেকে হীরেনকে সাহচর্য দেবে, আর, ইচ্ছে থাকলেও সে একদিন বেরোতে পারবে না একবার অমরেশকে গিয়ে দেখতে। একটা কঠিন আদেশ মাথার ওপর চাপিয়ে দিলে ব'লে মীরার অমরেশের ওপর কেমন রাগ হ'লো, অভিমান। বস্তুত মানুষের ভালোবাসার কত রূপ কত বিচিত্র এর অভিব্যক্তি মীব তাও ভাবলো। আর সবচেয়ে মজার, একজনের সঙ্গে আর একজনের ভালোবাসা মেলে না। মীবা সুখে থাকুক, মীবার স্বামী ভালো হ'য়ে উঠুক, দূর থেকে দেখেই অমরেশ সুখী।

আর কাছে পেয়ে, শরীরেব নাগালেব মধ্যে মীরাকে চব্বিশ ঘণ্টা আটকে বাখাব লাইসেন্স নিয়ে হীবেন তার ভালোবাসাব রংকে দিন থেকে দিন কেমন গাঢ় ক'বে তুলছে, মনে করাব চেষ্টা কবলো ও। না, একদিনও আব অমবেশকে দেখতে যাবে না, একটা কথা নয়। অমবেশ মহৎ, মানুষ হিসেবে হীরেনের চেয়ে অনেক বড়ো, মীরাব চেয়ে এ-কথা আর কেউ বেশি জানে না।

একগাদা যাত্রীর সামনেই মীরা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এক-শ জোড়া লোলুপ সতৃষ্ণ চোখ ওর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে—শুধু এইটুকু উপলব্ধি ক'রে কোনার একটা সীটে ও চোখ বুজে চুপচাপ ব'সে রইলো। জানলার খড়খড়ির গায়ে ওর মাথা ঠেকানো।

না, মীরা শুধু এক জোড়া চোখই ভাবছিলো, একটু মুখ, একজনেব শূন্য বুক, অমরেশের শূন্য ঘর। আব সেই নিঃসঙ্গ শূন্য বুকের ভিতর লুকোনো হীরাব পিণ্ডের মতো ভালোবাসা।

যা-ই বলুক হীরেন, মীবা মনে-মনে স্থির করলো, দিন-রাত চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে একবার অন্তত সে না বেরিয়ে পারবে না, অমরেশকে একটি বার না দেখে। অমরেশের নিষেধ শুনছে না ও। ছলছুতো ক'রে যে-কোনো একটা কাজের দরকার নিয়ে রোজ দুপুরে একবাব তাকে হ্যারিসন রোডেব দিকে আসতেই হচ্ছে।

চোখ বুজে মীরা তাই ভাবছিলো।

কখন সুবিধা হয়?

এমন কোন্ সময়টি তাদের জীবনে আসে যখন মীরাকে দিয়ে হীরেনের অন্তত তখনকার মতো আর কিছুর দরকার থাকে না; এমন একটা ফাঁক। যাতে না অমরেশের নির্দেশেরও অমান্য করা হ'লো।

স্বামীর সেবাশুশ্রূষা ভোগ সান্নিধ্যলিপ্সার পেয়ালাগুলো পূর্ণ ক'রে দিয়েই ও বাড়ির বাইরে পা বাড়াচ্ছে। হোটেলে এসেছে। 'তোমায় দেখতে এসেছি।' বলবে মীরা। না-হ'লে অমরেশ বেজায় ধমক দেবে।

একদিন থেকে সে হীরেনের চেয়েও বেশি গোঁড়া, কঠিন। মীরার মনে হ'লো। না-হ'লে ঘর থেকে চিরকালেব মতো বেরিয়ে আসা ভোমরাকে ওই ক-টা টাকা দিয়ে বিদায় করবে, আব হীরেনের অসুখ শুনে বিয়ের পর থেকে মীরাব অভাব যাচ্ছে শুনে ফস্ ক'রে এত টাকার একটা চেক কাটে সে?

মীরার কপালের রগ দুটো টিপ্‌টিপ্ করছিলো। ইঞ্জিনের শব্দের মতো বুকের ভিতর দুব্‌দুব্ আওয়াজ হচ্ছিলো; হীরেনের চেয়ে অনেক বেশি সেন্টিমেন্টাল অমরেশ। মীরা তার অভিজ্ঞতার কাঁটাকম্পাস দিয়ে আবার দুটি পুরুষ-চরিত্র জরিপ করলো। করতে হয় তাঁকে। কেননা আজ শুধু

দিয়ে যাওয়ার মধ্যে যখন এত উৎসাহ, এই উত্তাপ—যদি কখনো পায়, যখন অমরেশ একটি মেয়ের কাছ থেকে পেতে শুরু করবে তখন তার চাওয়ার দাবিতে পাওয়ার অধিকারে সে কতটা উত্তাল হ'য়ে উঠবে মীরা তা কল্পনা করতে পারে না কি?

সেটা অবশ্য ভবিষ্যতের কথা। তখন মীরা তাকে কি দিতে পারে!

কিন্তু এখন?

অমরেশকে ও কতটা দিয়ে এলো এই অপরাধ-বোধ মীরার বুকের ভিতর ভার-ভার ঠেকছিলো। কিছু না, কিছুই দেওয়া হয় নি।

তাই মীরা ঠিক করলো, ওর চেক রাখা চলবে না।

পুরুষ তার মর্জি মতো বলে, চলে। কিন্তু নারী হ'য়ে মীরা তা হ'তে দিচ্ছে কেন। একদিকের বিশ্বাস রাখতে কি আর একদিকের বিশ্বাসকে সে পুড়িয়ে মারছে না? অমরেশ ভেতরে-ভেতরে কতটা দগ্ধ হচ্ছে চিন্তা ক'রে মীরা শিউরে উঠলো।

না, কিছুতেই সে এই চেক ভাঙাবে না। 'আমি কিছু পাই নি। হেঁটে আজ বাড়ি ফিরেছি। অমরেশ কে আমি জানি না, চিনি না ওকে।' মীরা ঘরে ফিরে বলবে, 'কাল থেকে রেশন বন্ধ।'

কাল পরশু যেদিন হোক একটা সময় ক'রে ও চেকটা ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। কথাটা চিন্তা ক'রে মীরার এখন ভালো লাগলো। ঘুণাক্ষরেও তার সংসারে অমরেশের প্রসঙ্গ উঠবে আর বেচারা এখন-তখন লাঞ্ছিত হবে, অপমানিত হবে, মীরা চায় না। তার সদিচ্ছা, শুভ্র আকাঙ্ক্ষা, মীরাকে স্বামীর ঘরে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে দেখার সোনালী বাসনার গায়েও হীরেন কাদা ছিটোতে থাকবে, মীরা তা হ'তে দিতে রাজি নয়। না, একটি কপর্দকও অমরেশের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না।

প্রতিদানে মীরা তাকে কিছু দিতে না পারুক, তার আকাশের মতো নীল সুন্দর প্রশস্ত ইচ্ছাকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর খুপ্‌রির মধ্যে টেনে এনে খামোকা একজোড়া চটির তলায় থ্যাঁতলাতে দেওয়া কেন?

মীরার চোখের কোনা আবার চক্‌চক্‌ ক'রে উঠলো। বিয়ের পর অমরেশকে সে অনেকদিন দেখে নি। একরকম ভুলে ছিলো। আবার তাই হোক। আবার তা না-হ'লে মীরা স্বামীর সেবা শুশ্রূষা সান্নিধ্য-সুখের জন্যে শরীরপাত করতে পারবে কেন। সব না ভুললে!

কী ক'রে ভোলা যায়, কী করলে একেবারে ভুলে থাকতে পারবে, মীরা নতুন ক'রে ভাবতে লাগলো। ঘিঞ্জি বাসের গুমোট থেকে জানলার বাইরে মাথা রেখে যখন চিন্তা করছিলো ও, আর তার এই অসহায় অবস্থা থেকে রক্ষা করতে ঈশ্বরকে মনে-মনে ডাকছিলো, তখন হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা দাঁড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে একটা সোরগোল শুনতে পেলে মীরা। বস্তুত গণ্ডগোলটা গাড়ি থামাবার আগেই শুরু হয়েছে কি না অন্যমনস্ক থাকার দরুন ঠিক বুঝতে পারলো না ও।

চোখ মেলে যেন এই প্রথম দেখলো মীরা বেশ বড়োসড়ো গাড়ি। স্টেট-বাস। ডবল-ডেকার।

ভিতরে অনেকগুলো আলো।

অনেক লোকই তো এক সময় উঠেছিলো।

এতটা রাস্তা আসতে-আসতে অনেক যাত্রী নেমে গেছে। ভিতরটা তাই এখন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছিলো। সবাই সবার মুখ দেখতে পারছে এমন।

মীরা চমকে উঠলো, মীরা একটি মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেল, লজ্জায় তার দুই কর্ণমূল লাল হ'য়ে উঠলো।

সব ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা বাবু।

আর এত রাত্রে বাবুপাড়ামুখো বাসে বাবুরা ছাড়া অন্য যাত্রী বড়ো একটা থাকে না, এ মীরা রোজই দেখছে।

কার পকেট যাচ্ছিলো তাই হৈ-চৈ।

'এমনি তো বেশ টাই-স্যুট পরা ভদ্রলোক।' একজন চিৎকার ক'রে বললো।

'মশাই, শালারা বেজায় ধূর্ত। বাইরের চেহারা দেখে কিছু বুঝবেন না। চুরি ডাকাতি, মেয়ে বাগানো থেকে শুরু ক'রে যত শালা গুণ্ডা পিকপকেট স্যুট প'রে এখন ঘোরাফেরা করছে, টের পান না?'

'হ্যাঁ, যুদ্ধের পর বাঁদরগুলো সংখ্যায়ও বেড়েছে।' একজন বললো, 'রুজি-রোজগার নেই, লোকের পকেট কাটবে না তো কি, তাকিয়ে দেখছেন কি, দিন-রাত মশাই দু-ঘা বসিয়ে।'

'আর্টিস্ট, বলছেন উনি একজন শিল্পী। এই ধরনের জঘন্য কাজ ম'রে গেলেও তাঁর দ্বারা সম্ভব হ'তো না।' কে-একজন দো-ভাষী হ'য়ে বললো।

'চুপ্, স্কাউন্ড্রেল! নিজেব চোখে দেখলাম ভদ্রলোকের পকেটেব মধ্যে হাত যাচ্ছিলো। আমার চোখকে ফাঁকি! আমি সি আই ডি ইন্সপেক্টর নিবাবণ গুপ্ত। একবাব দেখেই মালুম করতে পাবি কোন্‌টা ক্রিমিন্যাল।'

'পুলিশে হ্যাণ্ডোভার করুন।' রাশভারী গলায় পিছনে এক ভদ্রলোক বললো, 'খেতে না পাস রিক্‌শা টান্‌গে। হেডিং-ফেডিং ক'রে লোকের চোখে ধোকা লাগিয়ে ইতরোমো ক'রে বেঁচে থাকার শখ কেন।'

'আগে দু-ঘা দিন-না বসিয়ে আপনারা, আগে তো হাতেব সুখটা করুন। তা তিনি ছবি আঁকেন কি পকেটমারের দলের সর্দার সে-বিচার পরে হবে। আমার তো মনে হয় ওই শালার পিছনেও মস্তবড়ো একটা গ্যাঙ রয়েছে। চোর গুণ্ডা বদমায়েস পিকপকেট শহরে বড়ো বেশি বেড়ে গেছে।'

'এখানে আপনার বাড়ির নম্বর কত, রাস্তার নাম কি?' সি আই ডি নিবাবণ গুপ্ত মুখ খিঁচিয়ে উঠলো।

মৃগাঙ্ক মজুমদার বাড়ির নম্বর বললো, রাস্তার নাম। তারপর সকলেব চোখে পড়ে এ-ভাবে মীরার মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

গাড়িতে আর যাত্রিণী ছিলো না। এমনি এক-একজন লক্ষ বার ক'বে মীরাকে দেখছিলো, এই চুরির হামলা সামনে রেখেই। এবার চোর ঘন-ঘন মীরাব দিকে তাকাতে সবাইব চোখ ও গলা নীরব নীরব হ'য়ে গেল।

মীরা ঘেমে উঠলো।

নিবারণ গুপ্ত বেশ কায়দা ক'রে মীরাকে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি মনে করেন যেভাবে ওর হাতটা বুড়ো ভদ্রলোকের পকেটের দিকে যাচ্ছিলো তাতে—আপনার কি ধারণা?'

'না, এঁকে আমি চিনি। আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। আর্টিস্ট। অতি সৎ, লোক উনি।'

'তো আপনি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন কেন, অনেকক্ষণ আগেই এ-কথা বলা উচিত ছিলো। প্রতিবেশী বিপন্ন হ'লে সামাজিক কর্তব্য হিসেবে এখানে সকলের আগে আপনাকেই তাকে রক্ষা করতে হবে। সৎ অসৎ আমরা জানি কি।' যার পকেটে মারা যাচ্ছিলো সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মীরার মুখের কাছে মুখ বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলো। যেন বিরক্তি ও বিদ্রূপ দুই-ই ছিলো তার কথায়। আর একজন মীরার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো। 'নিশ্চয়, বুড়ো মানুষ। চোখের ভ্রম হ'তে পারে। তা ট্র্যামে-বাসে কে কাকে চিনছে বলুন। চোর সাধু বাইরে থেকে আজকাল বোঝা যায় কিছু?'

মীরা চোখ নামালো।

কিন্তু নামিয়ে রাখবে কোথায়।

বিশ জোড়া জুতো ও চটি তার পায়ের কাছে গিস্‌গিস্ করছিলো। চোখ তুলতে এবার নিবারণ গুপ্তর সঙ্গে মীরার চোখোচোখি হ'লো। একটা নোট-বই হাতে সি আই ডি মীরার বুকের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়বার চেষ্টায় ছিলো। তার দুই জুল্‌পি বেয়ে দর্‌দর্ ক'রে ঘাম ঝরছে।

'যাকগে, যা হবার হয়েছে। আপনি কিছু মনে করবেন না। নিতান্তই পুলিশের লোক উপস্থিত আছি ব'লে কয়েকটা ফরম্যালিটিজ আমাকে সারতে হচ্ছে, যদি—' গুপ্তর মুখের জর্দা-পানের গন্ধটাও মীরার নাকে এসে লাগছিলো।

মাথাটা পিছনের দিকে সরিয়ে নিলে মীবা। গলাব স্বর ও মুখের বং যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা ক'বে বললো, 'আপনার যা প্রশ্ন কবার করুন।'

'আপনাদের বাড়িব রাস্তার নাম কি?'

মীরা বাস্তার নাম বললো।

'বাড়ির নম্বর?'

মীরা নম্বব বললো।

'আপনি—মানে ওই বাড়িতে আপনার সঙ্গে আর কে আছে?' গুপ্তর কপালে কুঞ্চন।

'স্বামী। নাম শ্রীহীবেন চক্রবর্তী।' রুদ্ধস্বরে মীরা বললো।

'ব্যস্, আর কিছু লাগবে না, আর দবকার নেই।' বত্রিশটা দাঁত বা'ব ক'বে অফুরন্ত জর্দা পানের গন্ধে গাড়ির বাতাস আমোদিত ক'বে সি আই ডি হাসলো। 'মানে ছিটেফোঁটা সংশয় থাকা পর্যন্ত আমরা কেস্ হাতছাড়া করি না। তা আপনার কথাব চেয়ে আর সত্য এখানে কিছু হ'তে পারে না, মানে হওয়া উচিত নয়। যাকগে, আপনি না বাঁচালে অর্থাৎ মুখ না খুললে আর্টিস্ট ভদ্দরলোকেব আজ কী দুর্ভোগ পোহাতে হ'তো, ছি-ছি।' গাড়িসুদ্ধু লোক হেঁ-হেঁ ক'রে উঠলো।

বাতাস পাতলা হয়ে গেছে, মামলার রসতসও আর রইলো না কিছু টের পেয়ে কণ্ডাক্টর এবাব ঘণ্টি বাজিয়ে চিৎকার ক'রে বললো, 'তব্ উতার যাইয়ে মাঈজী, আপকা স্টপেজ আ গিয়া।'

বস্তুত স্টপেজ এসে গেছে টের পেয়ে চোর চুরি কবতে উদ্যত হয়েছিলো কিনা মীরা ঠিক বলতে পাবলে না, তবে নিজেব স্টপেজেব নাম শুনে ও চমকে উঠলো। এতক্ষণ খেয়াল কবে নি।

গাড়ি থেকে মীবা আগে মজুমদাবকে নামতে দিলে, পিছনে নামলো ও। আর কেউ নামলো না।

একটু জ্যোৎস্না, একটু বিজলী আলো, ফুবফুবে হাওযা ও কৃষ্ণচূড়ার সুন্দর ঝিলমিলে ছায়াভরা নির্জন পেভমেন্টেব পটভূমিকায় দু-জনের দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যটা উপভোগ করতে বাসের যাত্রীরা জানলার বাইরে এক সঙ্গে গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলো, মীরা লক্ষ্য করলো। ঝুলন্ত অনেকগুলো মুখ বোঝাই হ'য়ে সরকারি ডবল ডেকার রাত্রির অন্ধকারে সাঁতাব কাটতে-কাটতে দূরে মিলিয়ে গেল।

'আপনি এত বাত্রে?' মজুমদার প্রথম কথা বললো এবং ঈষৎ হাসতে চেষ্টা করলো।

মীরা গম্ভীর হ'য়ে রইলো।

একটা ট্যাক্সি চ'লে গেল সামনে দিয়ে। উলটো দিকের ফুট্‌পাথ ধ'বে দুটি ছেলে শিস দিতে-দিতে যাচ্ছিলো।

'এত রাত কি, এগারোটা পঞ্চাশ। লাস্ট্ বাসে রোজই তো ক-দিন ধ'বে বাড়ি ফিরছি।'

'তা আমি লক্ষ্য করি। প্রায়ই দেখছি বেশ রাত হয় আপনার বাড়ি ফিরতে।' মজুমদার অল্প শব্দ ক'রে হেসে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলো। মীরা তেমনি গম্ভীর। গম্ভীর থেকে পরে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'বউবাজার, এক বন্ধুর কাছে।' আর্টিস্ট এবার আর হাসলো না।

ট্র্যামের শব্দ হ'লো যেন হঠাৎ দূরে।

ট্র্যামে উঠবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো দু-জন। এখনো ট্র্যাম চলে কি?

দু-জনই নিশ্বাস ফেলার শব্দ করলো। আর সেই শেষ হ'তে না হ'তে দেখা গেল লাল আলোর ডুম ঝুলিয়ে ঘণ্টা বাজতে-বাজতে ট্র্যামের তার মেরামতের গাড়ি এসে গেছে। অর্থাৎ অনেকক্ষণ তার ছিঁড়ে আছে এ-লাইনের। মই খাটিয়ে এবার ছেঁড়া তার জোড়া দিতে এসেছে মিস্ত্রি।

ট্র্যামের আশা গেল।' আক্ষেপের সুরে মীরা বললো।

কিন্তু উৎসাহের সুরে মজুমদার তৎক্ষণাৎ বললো, 'এইটুকু তো রাস্তা, মন্দ কি হেঁটে কথা বলতে-বলতে যাওয়া যাবে দু-জনে, চলুন। এসে তো প্রায় গেছি।'

'এইটুকু রাস্তা হাঁটতেও আমি টায়ার্ড ফীল্ করছি।' মীরা অসম্ভব গম্ভীর হ'তে চেষ্টা করলো। রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলো ও। রিক্‌শাগুলোকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো না।

'সবাই বলে এ-পাড়ায় এখন প্রাইভেট কারের ছড়াছড়ি, তাই এ দুর্দশা।' গলা পবিষ্কার ক'রে মৃগাঙ্ক বললো, 'ট্যাক্সি রিক্‌শা কিছু চোখে পড়ছে না।'

'না, ট্যাক্সি ডেকে আমার পোষাবেও না। পয়সা নেই।' শুকনো উদাসীন গলা মীরাব এবং একটু বিরক্তিও ছিলো।

'আমার অবস্থা আরো কাহিল।' মজুমদার আবাব হাসতে চেষ্টা করলো। 'আজ ব'লে নয়, রোজ আমি এই মোড় থেকে হেঁটে চ'লে যাই। অভ্যেস হ'য়ে গেছে। তাই বলছিলাম আপনার যদি—'

মীরা কথা কইলো না।

'তার চেয়ে বরং এক কাজ করা যাক। আসুন, ওই একটা চা-এব দোকান খোলা আছে। দু-কাপ তো আগে খেযে বিশ্রাম করি। চাই -কি ইতিমধ্যে যদি এক-আধটা বিক্‌শা এসে যায়।'

প্রস্তাবটা মীবার মন্দ লাগলো না।

চোব গুন্ডা বদমায়েস পিকপকেট না কি আসলেই শিল্পী এই নিয়ে প্রতিবেশীর চরিত্র সমালোচনা করার সময় ছিলো না ওর। আব একটি মানবচরিত্র তাকে সেই কঠিন মুহূর্তে আবাব ভাবিযে তুলেছে।

হীরেন ঘুমোবে না। কিছুতেই ঘুমোতে পারে না মীরা যতক্ষণ না ঘরে ফিরছে। রাত বা দিনদুপুর সকল সময়েই এক অবস্থা। জানলায় উঁকি দিয়ে হাজাব বার বাস্তা দেখবে আর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে টেবিলের ঘড়ি। ছবিটা মীরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। এখন এই মধ্যবাত্রে ঘরে ফেরার সময় যদি পাশের ঘরের হাম্বাগ'টা থাকে তো মীরাকে, অত্যন্ত করুণ গলায় যদিও, জেরা ক'রে-ক'বে হীরেন রাত ভোর ক'রে ফেলবে।

আর মীবা ঘুমিয়ে পড়লে অন্ধকার দেয়ালের সঙ্গে কথা শুরু হবে।

'বুঝি না কি ক'রে মানুষ নির্লজ্জ হয়। না, আমি একটু সেরে উঠি। ঠিক ইজেক্টমেন্টের নোটিশ আনবো। দ্যাট্ উইল বি মাই ফার্স্ট ডিউটি। দেখতে পাচ্ছিস ভদ্রমহিলা সঙ্গে কেউ নেই। কোন লজ্জায় তুই তাঁর পিছু পিছু হেঁটে বাড়িতে ঢুকছিলি। আমি জানি তোব সঙ্গে মীবা একটাও কথা বলে নি। আমার ওয়াইফ মনে-মনে তোকে ঘৃণা করে। কারণ ভদ্রতার মাথা খেয়ে তুই একটা ফ্যামিলি কোয়ার্টারে এসে বাঁসা বেঁধেছিস। পাড়ার আর দশটা লোক ওপ্‌ন এয়ারেব জন্যে জানলায় নাক জাগিয়ে ব'সে থাকে। তারা নিশ্চয় দৃশ্যটা দেখেছে। তোর সম্বন্ধে তাদের কি রকম ধারণা জন্মাবে? আর্টের দোহাই দিয়ে তুই ফর্সা করতে পারিস, কিন্তু, কিন্তু আর দশটা লোক আমাকে মীরাকেও ক্ষমা করবে না। তাবা দেখবে বাস্তব দিকটা। মানুষ হিসেবে তুই কতটা কাণ্ডজ্ঞান রাখিস?'

কিন্তু শুধুই দেয়ালের সঙ্গে কথা ব'লে কবে হীরেন নিবৃত্ত হয়েছে।

পরদিন সকালে তার প্রথম প্রশ্ন হবে, 'বাসে কোথায় তোমার সঙ্গে রাস্কেলটার দেখা হয়েছিলো? কি বলছিলো? গাড়ি থেকে নেমেও সারাক্ষণ বকর-বকর করছিলো? আর্ট, মর্ডার্ন ছবির কথা?'

মীরা চুপ থাকবে। কিন্তু হীরেন থামবে না।

ঘরময় পায়চারি করবে আর দেয়ালের সঙ্গে কথা বলবে। 'তুমি একটিও কথা বালো নি আমি জানি। কিন্তু, কিন্তু তাতে এ-সব লোক লজ্জা অপমান বোধ করে না, ঠিক তুমি জেনো। এদের শিক্ষা দিতে একমাত্র চাবুক, চাবুক। পুলিশে ধরিয়ে দিও আর একদিন এমন অভদ্র ব্যবহার

দেখলে।' বাতাসের গায়ে ধারালো ছুরি চালাবার মতন জিহ্বার হিস্‌হিস্‌ শব্দ তুলে অধ্যাপক রাত্রির প্রসঙ্গটাকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত টেনে নিতে কসুর করবে না। মীরা যতই চুপ থাক। রেশনের চিন্তায় যতই সে ছিন্নভিন্ন হোক।

এখন, এক সঙ্গে এত রাত্রে শুধু ঘরে ফেরাই নয়, এইমাত্র পকেটমারের মামলা থেকে শিল্পীকে মীরা বাঁচিয়ে এনেছে।

আবার বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এখুনি না বেচারাকে আর-একটা মামলায় পড়তে হয় সেজন্যে মীরা ভাবছে কি ব'লে আগে ওকে ঘরের দিকে পাঠায় বা নিজে আগে যায়। প্রস্তাবটা ভদ্রতার বাইরে। ভাবতে-ভাবতে ভয়ানক বিব্রত বোধ করতে চা-এর দোকানের প্রস্তাব হঠাৎ মীরার ভালো লাগলো।

বাড়ির কাছে এসে এত রাত্রে পেভমেন্টের ওপর এ-ভাবে দু-জনের দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে অন্তত ভালো।

'আজ সারাদিন চা-এর মুখ দেখি নি।'

দোকানে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে মজুমদার ব'সে পড়লো। মীরা উলটোদিকের চেয়ারে বললো। চুপ ছিলো ও।

'আপনাকে বলতে বাধা নেই মিসেস চক্রবর্তী ক-টা দিন ভীষণ অভাবের মধ্যে আছি।'

মীরা এবারও কথা বললো না। আর্টিস্ট লম্বা আঙুল দিয়ে কপালের লালচে ঝাঁকড়া চুল পিছনের দিকে সরিয়ে দিতে-দিতে করুণভাবে মীরার মুখের দিকে তাকায়।

মীরার বুকের মধ্যে কেমন খুট্‌ ক'রে ওঠে।

একটু আগে গাড়িতে যা ঘটতে চেয়েছিলো তার সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে কি। ভাবলো ও। বয় এসে দাঁড়াতে মীরা দুটো চা-এর অর্ডার দিলে।

'কোথায় গিয়েছিলেন।' মীরা আবার প্রশ্ন করলো।

'বউবাজারে এক বন্ধুর কাছে।' আর্টিস্ট স্থির অপলক চোখে মীরাকে দেখছিলো। 'কিছু টাকার জন্য যেতে হয়েছিলো, পাই নি যদিও।' কথা শেষ ক'রে একটা পোড়া সিগারেট পকেট থেকে বা'র ক'রে যেন সিগারেট ধরাতে হঠাৎ উঠে কোন্‌ দিকে গেল।

মীরা আজ এই প্রথম লক্ষ্য করলো প্রতিবেশীর গায়ের কোটটা পিঠের দিকে অনেকটা ছেঁড়া। ওই একটা প্যান্টলুন যেন মাসাধিক পরছে কোথাও বেরুচ্ছে যখন। গোড়ালি ক্ষ'য়ে গিয়ে জুতো দুটো চ্যাপ্টা মেরে গেছে। বেশ দুর্দশায় পড়েছে মজুমদার, মীরার বুঝতে কষ্ট হ'লো না।

মজুমদার সিগারেট ধরিয়ে ফিরে এলো। ইতিমধ্যে চা এসে গেছে। মুখের ভার ডুবিয়ে দিয়ে চোখেমুখে এবার প্রফুল্লতা আনতে চেষ্টা করলো মীরা। মেধাবী হাসি ফুটলো ওর সুন্দর দুই ঠোঁটে।

'আর্টিস্ট, শিল্পী আপনি। মনের আনন্দে আঁকবেন আর দুই হাতে পয়সা লুটবেন। অভাব কেন?'

মজুমদার নীরব।

'চা খান।' ব'লে মীরা নিজের বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে পরে চোখ তুললো।

'আমাদের বাঁধা-মইনের চাকরি। তা-ও মিস্টার চক্রবর্তী দু-মাসের ওপর অসুস্থ হ'য়ে ঘরে বসা। অভাবটা যে আমাদের কানের কাছে বেশি সাঁই-সাঁই করছে।'

একচুমুক চা গিলে মৃগাঙ্ক মাথা নাড়লো।

'হ্যাঁ, বলছেন ঠিক কথাই। মনের সবটুকু আনন্দ ঢেলে দিয়ে উৎসাহের সঙ্গে যদি আঁকতে পারতুম অর্থাভাব হ'তো না।' কথা শেষ ক'রে হাত দিয়ে ধরা যাচ্ছে না সিগারেটের টুকরোটায়

দ্রুত দুটো টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে মীরার চোখে চোখ রাখলো।

'তবে আঁকুন।' মীরা বললো, 'আপনার ঝঞ্ঝাট নেই, একলা মানুষ, সারাদিন ব'সে কত ছবি আঁকতে পারেন। তা ছাড়া এ যখন পরের চাকরি নয়। যত ছবি তত পয়সা।'

'কিন্তু ছবি যদি বিক্রি না হয়?' মৃগাঙ্ক বাঁকা হাসলো।

'ভালো ছবি আঁকলে বিক্রি হবেই।' যেন অন্যমনস্কের মতো কথাটা ব'লে মীরা হঠাৎ চুপ করলো। কেননা সেই মুহূর্তে আবার তার মন খারাপ হ'য়ে গেছে। ছক্ ক'রে কথাটা মনে হয়েছে। এখানে চা খেতে গল্প করতেই মীরা আসে নি। একটা বড়ো বিশ্রী অভদ্র কাপুরুষোচিত প্রস্তাব শেষ ক'রে এখুনি তাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

কিন্তু তথাপি মীরা হাতের ঘড়ি দেখলো না।

এ-ধরনের একটা প্রস্তাব কোনো ভদ্রলোককে দেওয়া যায় না। বলা যায় না যেহেতু এত রাতে আমি ও আপনি এক সঙ্গে বাড়িতে ঢুকলে আমার স্বামী অন্যরকম কিছু ভাববেন সুতরাং আগে পিছনে আমাদের যেতে হচ্ছে। ঘৃণা ও অপমান বোধে মীরার দুই কান লাল হ'তে লাগলো। বুকের ভিতর কেমন জ্বলছিলো।

ঘড়ি দেখলো না সে এই কারণে দেরি হওয়াকে সে ভয় করছে না। ধর্মতলা থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরতে রাত ক-টা বাজতে পারে ঘরে ব'সে তা অনুমান করা চলে না। তা ছাড়া আজই তার বাইরে যাওয়া শেষ। কাল থেকে ঘর আর ঘর। আর উপোস।

ধারকর্জ চাওয়ার মতো জানাশোনা লোক কলকাতায় তার ফুরিয়েছে। যাদের কাছ থেকে কর্জ করা যায় তাদের টাকা মীরা ঘরে আনবে না নানা কারণে।

কালই অমরেশের চেকটাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে মনে পাকাপাকি ক'রে মীরা মৃগাঙ্কর চোখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসলো।

'ভালো ক'রে আঁকুন। আপনার অভাব থাকবে না।'

'মুশকিল হচ্ছে এই ভালো ক'রে আঁকতেই পারছি না। অনুপ্রেরণার অভাব। মাঝে মাঝে ভিতরে আশা জাগে, শক্তি টের পাই। মনে হয়, ভালো একটা মডেল পেলে এমন ছবি আঁকবো যা বিক্রি ক'রে লক্ষ রজতমুদ্রা আমি ঘরে আনতে পারবো। সুন্দর ছবির মূল্য দিতে এ শহরে লক্ষপতির অভাব নেই।'

'তবে আঁকছেন না কেন,' মীরা বলতে পারলো না। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চোখে আর্টিস্টের চোখের রক্তের ছিটা দেখতে লাগলো।

'আমার একটা মডেল ছিলো মিসেস চক্রবর্তী। কিন্তু যখন আঁকলাম দেখা গেল তার প্রত্যেকটা রেখা আমাকে বিদ্রূপ করেছে। রূপের পরিবর্তে ফুটেছে বিদ্রূপ, লাবণ্য এনে দিয়েছে বীভৎসতা। সেই ছবি দেখেই মানুষ আঁৎকে উঠছে, কিনে নিয়ে দেয়ালে টাঙাবে কি?'

মীরা কথা কইলো না।

'তাই আমার দারিদ্র্য। না-হ'লে—না-হ'লে রং তুলি উদ্যম ইচ্ছে কোনোটার অভাব ছিল না।' ব'লে চুপ ক'রে পেয়ালার চা-টুকু শেষ করলো মৃগাঙ্ক।

'আর চা খাবেন?' মীরা প্রশ্ন করলো।

মৃগাঙ্ক মাথা নাড়লো।

'বাসে সি আই ডি-র লোকটা কেমন কড়াভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলো আপনার মনে পড়ে?'

মীরা মাথা নাড়লো। বাসের কোনো কথাই এখন তার মনে নেই। বার-বার মনে হচ্ছে আর একজোড়া কঠিন চোখ। হাতের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললো, 'ভালো সুন্দর একটা মডেল কি কোথাও পাওয়া যায় না?'

'যায়, মীরা দেবী, কিন্তু কম, লাখে একটি পাওয়া কঠিন। সত্যিকারের সুন্দর মডেল বলতে যা বোঝায়। তাই না আমাদের আঁকিয়েদের এই দুর্দশা। চা আর দরকার নেই। আপনি বরং আমায় একটা সিগারেট আনিয়ে দিন।'

মীরা তৎক্ষণাৎ বয়কে ডেকে সিগারেটের কথা ব'লে দিলে। তারপর ক্লান্ত বিষণ্ন ভঙ্গিতে টেবিলের কোনায় দুটি কনুইয়ের ভর রেখে হাতের তেলোয় চিবুক ঠেকিয়ে আস্তে-আস্তে বললো, 'সুন্দর মডেল আপনি কাকে বলছেন?'

'আপনার দেরি হচ্ছে খুব, মিসেস চক্রবর্তী। তা ছাড়া বাড়িতে কর্তা অসুস্থ। রিক্‌শা-টিক্‌শা বুঝি আর আসবে না। দেখবো একবার উঠে গিয়ে?'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না।' মীরা বললো, 'দেরি আমার রোজই হচ্ছে। হবে। একলা মানুষ বাইরের দশটা কাজ সেরে সন্ধেয় ঘরে ফিরবো, এ আমি তো নয়ই, তিনিও আশা করেন না।'

'রোজ দেখি অনেক রাত ক'রে আপনার ঘরে ফেবা। রাস্তার দিকের জানলাটায় আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকি তখন। উঃ, কী কষ্টসহিষ্ণু আপনি!

মীরা চুপ।

বয় এক প্যাকেট সিগাবেট ও একটা দেশলাই টেবিলে রেখে গেল।

মৃগাঙ্ক নতুন সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'সত্যি, সুন্দব মডেল লাখে একটা মেলে মীরা দেবী। তা-ও না।'

'রাত্রে একলা জানলায় ব'সে কেবল ছবির কথা ভাবেন বুঝি?'

মজুমদার তার উত্তর দিলে না। বললো, 'আপনি সুন্দর। আপনাকে দেখে যে-কোনো শিল্পী স্বীকার করবে, এই হ'লো রূপ, আসল রূপের মডেল।'

মীরার দুই কান লাল হ'য়ে উঠলো।

'না, আর-একটু চা খাওয়া যাক, আমি ভয়ানক টায়ার্ড, মৃগাঙ্কবাবু। সারাদিন কী ভীষণ ঘুরতে হয়েছে আজ।'

মৃগাঙ্ক চুপ।

মীরা আরো দু-কাপ চা আনালে।

'আমার মধ্যে আপনি এত কি রূপ দেখলেন?' নিজরে এবং মৃগাঙ্কের বাটিতে আরো এক চামচ চিনি বেশি মিশিয়ে মীরা বললো, 'সব শিল্পী যে আপনার সঙ্গে একমত হবে তা-ই বা জানছেন কি ক'রে, চা খান।'

মৃগাঙ্ক চায়ে চুমুক দিয়ে মীরার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। অমরেশ ও হীরেন ছাড়া তৃতীয় এক পুরুষের চোখে নিজেকে এই প্রথম দেখে মীরার কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। তাই সে আর মডেলের কথা তুললো না। না-তুলে, যেন তখনও তার পেয়ালার চিনি গললো না, চামচটা আস্তে-আস্তে নাড়তে লাগলো। তারপর এক-সময়ে আস্তে-আস্তে বললো, 'না, গাড়ির আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। আপনি আঁকুন। আমি বলছি। আপনার এ-অবস্থা থাকবে না। '

মৃগাঙ্ক তেমনি চুপ থেকে সিগারেট টানতে-টানতে মীরাকে দেখছিলো। রেস্টুরেন্টে আর দ্বিতীয় খদ্দের নেই। সামনের প্রকাণ্ড দরজা দুটো দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ভিতরে ঢুকলো। এলো খানিকটা ফুলের সৌরভ। কাদের বাগানে এরি মধ্যে যেন হাস্নুহানা ফুটেছে। মীরা ভাবলো।

'আপনি বিশ্বাস করবেন না মিসেস চক্রবর্তী, যখন বাসে সবাই আমাকে মারতে উদ্যত, পুলিশে হ্যাণ্ডোভার করার কথা হচ্ছে, আমি অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখছিলাম। রিয়েলী।'

মীরা কথা কইলো না।

'রূপ, রূপ। আর সেই রূপের মন্দিরের মধ্যে জ্বলছে ত্যাগ তিতিক্ষা সংযম সেবা স্নেহ প্রেম মমতার মোমবাতিগুলো। আমি চোখ ফেরাতে পারি না।'

'চা খান।'

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বর মীরার। আর কোনো কথা বলতে পারলো না ও। কপালের রগ দুটো আবার বিশ্রীরকম টিপ্‌টিপ্ করছিলো।

'ইউ আর বিউটি অব বিউটিজ। ভিতর ও বাইরের রূপের এই সমন্বয় আমি আর কোনো মেয়েতে দেখবো না। কী আশ্চর্যভাবে টিউন্‌ড হ'য়ে আছে।' মৃগাঙ্কর গলা গুনগুন ক'রে উঠলো।

'কি রকম?' প্রশ্ন করতে গিয়ে মীরা থেমে যায়। ঘড়িও আর অবশ্য দেখলো না ও। চুপ ক'রে শুনলো প্রতিবেশী চিত্রকরের কথা। খোঁপাটা হাওয়ার ঠেলায় খুলে গিয়ে কালো ফুলের তোড়া হ'য়ে ওর কাঁধের ওপর ঝুলছিলো।

'যে-মেয়ের মন সুন্দর না, লাখ মন সৌন্দর্য প্রকৃতি থেকে চুরি ক'রে আনলেও পুরুষ তাকে ঘৃণা করে এটা স্বীকার করেন তো? আমি করি। আমার মডেলটা জঘন্যরকম ফাঁকি দিয়েছিলো। তাই এমন গরিব হ'য়ে আছি মিসেস চক্রবর্তী।'

মীরা হাত দিয়ে খোঁপা ঠিক করলো।

'আপনার হৃদয়ের সুষমাই শরীরের সবগুলো রেখাকে এমন সুন্দর সিমেট্রিক্যাল ক'রে দিয়েছে। মনের গাঢ় রং গায়ের রঙে বুলিয়েছে গ্রীষ্মের চাঁপার উজ্জ্বলতা।'

'আপনি কি আমায় আগে দেখেছিলেন, বিয়ের আগে?' মীরার গলায় বেহালার ছড় টানার সুন্দর একটা শব্দ হয়।

'নিশ্চয়, হান্‌ড্রেড টাইমস।' মৃগাঙ্ক আর একটা তাজা সিগারেট বা'র ক'রে ঠোঁটে গুঁজলো। সিগারেট ধরিয়ে দুই চোখ আধবোজা রেখে ধোঁয়াটা গলাধকরণ ক'রে বললো, 'শিল্পীর চোখ সবাইর দিকে থাকে। সব-মেয়ের আগে-পিছনে তার দৃষ্টি। বিফোর অ্যাণ্ড আফ্‌টার ম্যারেজ। অ্যাণ্ড ইউ আর দি বেস্ট।'

একটা সুন্দর শিহরণ মীরার কাঁধ ও মেরুদাঁড়া বেয়ে পায়ের দিকে নেমে গেল।

'কী চোখ নাক চিবুক পা বাহু গলা! আমরা তরুণ শিল্পীরা তখন আপনার নাম দিয়েছিলাম মিস ক্যাল্‌কাটা।' মজুমদার টেবিলের ওপর থুতনিটা বাড়িয়ে দিলে। 'এ গার্ল অব এক্সকুইজিট বিউটি, অ্যাণ্ড নাউ এ বিউটিফুল লেডি।' কথা শেষ ক'রে মৃগাঙ্ক ক্ষীণ হাসলো।

মন্দিরের ঘণ্টা বাজলো মীরার বুকের মধ্যে। পুরুষের মুখে শিল্পীর মুখে রূপস্তুতি শুনে কোন্ মেয়ে আছে মীরার বয়সের যে সারা গায়ে রোমাঞ্চ অনুভব করে না! মীরা টেবিলের কাছে ঘন হ'য়ে এলো। কথা বলতে পারলো না যদিও। যেমন পারছিলো না ও হাত তুলে ঘড়ি দেখতে।

'তার ওপর এসে মিশেছে প্রেম মমতা সেবা। অপূর্ব!'

রূপমুগ্ধ শিল্পী মৃগাঙ্কর চোখে লাল মশাল জ্বালিয়েছিলো। সেই মশালের আলোয় চুপ ক'রে ব'সে মীরা ঘামতে লাগলো। কাঁপছিলো ও একটু-একটু। আর অভিমানের নিঃশব্দ ফেনা বুকের মধ্যে ফুলে-ফুলে গলা পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠলো।

মৃগাঙ্ক মীরার রূপ সম্পর্কে আরো কি বলছিলো, মীরা কান দিলে না কতকটা সময়। ভাবছিলো ও রূপের ব্যর্থতা।

'মিথ্যে কথা।' চিৎকার ক'রে তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো, 'যে প্রেম সেবা ও মমতার আলোয় উদ্ভাসিত উজ্জ্বল কল্যাণীরূপ আমার দেখছো, সে আমার আসল রূপ নয় শিল্পী, এগুলো আমার অনেকদিন খ'সে পড়েছে। এগুলো ছাড়া অমনি আমি রূপসী—প্রেম মমতা ও সেবাপরায়ণতার কোনো মূল্য দেয় নি ব'লে মীরাও এগুলোর আর দাম দিচ্ছে না এখন। সুতরাং এ-সব বাদ দিয়ে তোমার মডেল হিসেবে আমি কতদূর কাজে লাগবো বলো।' বলতে পারলো কই মীরা।

'যখন ভিড়ের মধ্যে প্রায় মার খেয়ে মরছিলাম হঠাৎ এক এঞ্জেল এসে আমাকে রক্ষা করলো। কেন, তার সার্থকতাটা কি এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

'কি সার্থকতা?' খসখসে গলায় এক সময় মীরা প্রশ্ন করলো।

'তোমার দেবীমূর্তি?' খসখসে গলায় উত্তর করলো মৃগাঙ্ক।

'অদ্ভুত, অদ্ভুত! রোজ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে যত দেখছি ভাবছি, আঃ, এই মডেল আঁকবো, এই ছবি তুলির টানে ফুটিয়ে তুলতে পারলে আমি গরিব থাকবো না।' যেন শিল্পীর চোখের সেই গাঢ় রক্তিম আলো ক্রমশ নিস্তেজ হ'য়ে এলো। দৃষ্টিটা রোদ-লাগা জলের মতো এখন ঝলমল টলমল করছিলো মৃগাঙ্কর।

মীরা এবার স্বাভাবিক গলায় বলতে পারলো, 'আঁকুন। ভালো মডেল আঁকলে আপনার ছবি কাটবেই।'

'আমার আগের মডেলটা কে ছিলো আপনি কিন্তু একবারও প্রশ্ন করলেন না।'

'কে?' চমকে চোখ তুললো মীরা।

'আমার স্ত্রী।' মৃগাঙ্ক নিঃশব্দে হাসলো।

যেন হঠাৎ কাব কথা মনে প'ড়ে মীরা চুপ ক'রে রইলো।

'অবশ্য মিস্টার চক্রবর্তীকেও কম ঈর্ষা করি না সেজন্যে।' মজুমদার এবাব চোখে নয় দাঁত বের ক'রে কুটিল হাসলো। 'কী রাইট আছে হীরেন চক্রবতীব শতেক শিল্পীর ধ্যানের ছবি ঘরে ধ'রে রাখার, একলা ইন্দ্রের সহস্র সুখ ভোগ করার?'

মীরা কথা কইতে পারলো না। চোখ নামলো।

'অবশ্য এই ঈর্ষাও আমাদের ভুল।' গলায় একটা বড়ো হাসি টেনে শিল্পী নিজেকে সংশোধন করলো। 'হীরেন ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড আছে ব'লেই তো মীরা এত সুন্দর।'

মীরা গম্ভীর।

'ভোমরাকে তো আপনি চেনেন?'

মৃগাঙ্কর প্রশ্নের জবাব দিলে মীরা শুধু মাথা নেড়ে।

'একজনের অ্যাম্বিশনের সঙ্গে আর একজনের অ্যাম্বিনেশন কত তফাৎ সেটাই দেখছি।' লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মজুমদার কড়িকাঠের দিকে তাকয়ে : 'রূপের বিকৃতি এঁকে হাত কালো করছিলাম, এই বেলা তার মহীয়সী মূর্তি এঁকে পাপস্খালন করবো।'

মীরা সত্যি তখন অপ্রস্তুত হ'য়ে গেছে। নার্ভাস বোধ করছিলো। মহীয়সী...সেবা...প্রেম...। কিন্তু এ যে কত ভঙ্গুর কত ক্ষীণায়ু!

মীরা অসহায় বোধ করছিলো এই ভেবে যে কি ক'রে এখন এই জঘন্য প্রস্তাবটা সে মৃগাঙ্কব কানে তোলে; একসঙ্গে দু-জন বাড়িতে ঢুকবো না। তা হ'লে বেচারা হীরেনের রাত্রের ঘুম চ'টে যাবে। সুতরাং—

রাগে দুঃখে মীরার কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। মনে-মনে সে ঈশ্বরকে ডাকলো।

আর সঙ্গে-সঙ্গে কালান্তক যমের মতো কোথা থেকে রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকলো বিপদ উকিল।

তারও দোয নেই। রেস্টুরেন্টের মালিক নিরাপদ তার বন্ধু। ঘরে একটু কন্‌ট্রোলের চিনি জমেছিলো। তাই বেশি রাত ক'রে একটা মুনাফা রেখে চিনিটা সে বন্ধুকে ছেড়ে দিতে এসেছে।

মীরা দেবী ও মজুমদার একটা টেবিলে মুখোমুখি ব'সে আছে দেখতে পেয়েই বিপদ যেন সেদিকে তাকাবে না ঠিক ক'রে কড়িকাঠের দিকে চোখ রাখলো। একটু পরে টেবিলের ওপর শূন্য চা-এর বাটি রুটি ও ডিমের টুকরো এবং ছাইদানি ভরতি পোড়া সিগারেটের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বিপদ, মৃগাঙ্ককে না, মীরাকে প্রশ্ন করলো, 'গাড়ি-টাড়ি আর পেলেন না বুঝি?'

তাকাবার মতো ক'রে চেয়ে হাতের ব্যাগটা ঠিক করতে-করতে মীরা বললো, 'আপনি, এখানে এত রাত্রে?'

'হ্যাঁ, আমি যে এর পিছনটাতে থাকি মিসেস চক্রবর্তী? এই এলুম খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু

হাওয়া খেতে, ম্যানেজার আমার ফ্রেণ্ড কিনা।' ব'লে থুতনি নেড়ে অদূরে ক্যাশবাক্সের ওপর হুমড়ি খেয়ে ব'সে থাকা নিরাপদকে দেখিয়ে দিয়ে বিপদ বললো, 'পর-পর দু-দিন ভবনে গিয়ে ঘুরে এসেছি, মিসেসের সাক্ষাৎ পাই নি।'

'হ্যাঁ, বড়ো বেশি ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে আমাকে। ওর শরীরটা সারছে না আর চোখেমুখে আমি চারদিক অন্ধকার দেখছি।'

'হুঁ, তা কি আর বুঝি না, তা কি আর বোঝাতে হবে আমাকে।' ব'লে উকিল কুটিল দৃষ্টিটা একটু মোলায়েম করার চেষ্টায় ঈষৎ হাসলো, 'তা—তবু তো আপনি চালাচ্ছেন, চালিয়ে নিচ্ছেন যা-হোক ক'রে কেন ভালোভাবেই। বিকেলে হীরেনভায়াকে বার-বার সে-কথাই বলছিলাম, আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে তুই হলি সবচেয়ে লাকি হীরেন।'

মীরা শব্দ করলো না।

পরনে একটা লুঙ্গি, উলঙ্গগাত্র, পান খাওয়া ঠোঁটের কিনাবে রস জমেছিলো বিপদের। জিভ দিয়ে রসটা চেখে নিয়ে বললো, 'তা কদ্দুর, কোথায় গিয়েছিলেন?'

'দাদার কাছে। ওর আবার ইনজেক্‌শন কিনতে হচ্ছে কাল।' ব'লে মীরা ভুরু দুটো একটু রুষ্ট করলো। এবং উকিলকে আর কোনো প্রশ্ন করতে না দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে মৃগাঙ্ককে বললো, 'আমি উঠি, আপনি তো আপনার সেই বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করবেন?'

'কোন্ বন্ধু?' চমকে উঠলো মৃগাঙ্ক। মীরাব চোখে চোখ রাখলো। তারপর চোখে নয় মীরার ঠোঁটের বাঁক দেখে সে ধাঁধার অর্থ বুঝতে পারলো। অল্প হেসে বললো, 'হ্যাঁ, ও ব্যাটা যদি মডেলটা না নিয়ে আসে কালও আর ছবি আঁকা হবে না। তাব অর্থ কালও উপোস।'

মীরা গম্ভীরভাবে বললো, 'আচ্ছা আমি চলি, আমার হাতে টাকা নেই, বেবিযেছিলাম, কেউ একটা আধুলি কর্জ দেয় নি।'

আর্টিস্ট তেমনি মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে বললো, 'তা কি আর আমি বুঝি না মিসেস চক্রবর্তী। হার্ড ডেজ্। আচ্ছা থাক, দেখি, আর কারো কাছে পাই কি না।'

আর বাক্য ব্যয় না ক'রে এবং স্বামীর বন্ধু দণ্ডায়মান বিপদবরণের দিকে আর একবারও কটাক্ষপাত না ক'রে মীরা কাউন্টারে গিয়ে বিলের টাকা মিটিয়ে দেয় ও আস্তে-আস্তে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে যায়। মৃগাঙ্ক গম্ভীরভাবে সিগারেট ধরায়। এবং টাকা কর্জ না পেয়ে যেন অন্য কিছু পেয়েছি চোখমুখের এমনি প্রফুল্ল ভাব ক'রে শিস দিয়ে ধোঁয়াটা মুখ থেকে ঠেলে বের ক'রে দেওয়ার চেষ্টায় সে যখন বিপদ উকিলের দিকে তাকায়, দেখা যায়, রাগে কট্‌মট্ করছে উকিল।

অর্থাৎ এ-ভাবে দু-জনের সহসা পৃথক হ'য়ে যাওয়া এবং বন্ধুপত্নীর শিষ্টাচার জনোচিত 'আচ্ছা চললাম, বিপদবাবু,' সম্বোধনটা না ক'রে মীরাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে জালে বাড়ি খাওয়া বোয়াল মাছের মতো বিপদের মাথার ভিতরটা বোঁ-বোঁ করছিলো।

ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চোখে উকিল ফের টেবিলের বাসনকোসন ছাইদানির ছাই ও রুটি ডিমের টুকরোগুলোর দিকে তাকালো।

একটু পরিহাসের সুরে মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করলো, 'দাদার খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেছে? বউদি এ-বেলা কি রান্না করেছিলেন?'

উকিল তৎক্ষণাৎ কথা বললো না। কেননা এই ধরনের জীবনগুলোকে সে ঘৃণা ভয় দুই-ই করে।

'কেন, আমরা বাড়িতে বউয়ের হাতের তৈরি পুঁই ছাঁচিকুমড়োর চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাই ব'লে ঠাট্টা করছেন নাকি? আপনারা না-হয় রেস্টুরেন্টে স্টাইল ক'রে ব'সে কারি কাবাব কোর্মা কোপ্তা খাচ্ছেন।'

যেন অনেকদিক থেকে ঘা খেয়ে খিঁচড়ে গিয়ে উকিল তেরছাভাবে কথার জবাব দিলে। কিন্তু

উল্লুকটার মাথায় এই খোঁচাটুকু ঢুকলো না, মজুমদারের চেহারা দেখেই বিপদ বুঝলো।

কাপ-ডিশের মাঝখানে জুতোসুদ্ধু, পা তুলে দিয়ে তেমনি শিস দিতে-দিতে রবীন্দ্রসংগীত ভাঁজছে। দেখে উকিল আরো জ্ব'লে উঠলো। হৈ-হৈ ক'রে বললো, 'আছেন আনন্দে। চক্রবর্তীর গিন্নী বুঝি খাইয়ে গেলেন।'

মৃগাঙ্ক এবার একটু গম্ভীর দেখাবার চেষ্টা করলো।

'বলি কদ্দুর যাওয়া হয়েছিলো দু-জনের?' উকিল আর এক পা এগিয়ে টেবিল ঘেঁষে দাঁড়ায়।

মৃগাঙ্ক পা নামিয়ে সোজা হ'য়ে বসলো। 'বাসে ওঁর সঙ্গে দেখা।'

'হুঁ, তা আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি।' উকিল চোখ দুটো আরো গোল করলো। 'তা কেমন চলছে আপনার ব্যবসা। কি রকম বিক্রি-টিক্রি হচ্ছে ছবি?'

'কোথায় আর!' হাই তুলে মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়ায়। 'ছবির বাজাব মন্দা।'

উকিল খলখল হেসে উঠলো। 'বাজার মন্দা!' বলি মশাই, আপনারা সব আকাশে থেকে ছবি আঁকবেন, যা-খুশি তা, সে-সব লোকে কিনবে কেন। যা বোঝে না পাব্লিক তা কিনে পয়সা নষ্ট করে না। এটা সর্বদা মনে রেখে ছবি আঁকবেন।'

মৃগাঙ্ক সকৌতুকে হীরেনের বন্ধু বিপদ উকিলকে দেখছিলো। উকিলের চোখের তারা দুটো গুল্‌তির গুলি হ'য়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছিলো।

একগাল হেসে উকিল বললো, 'মশাই, মডেল-মডেল ক'রে আকাশপাতাল হাতড়ান তরুণ শিল্পীর দল আর উপোস থাকেন। আবে প্র্যাক্‌টিক্যাল জিনিস আঁকুন। হাতের কাছে যেমনটি দেখেন, রোজ আপনার পাশের ঘরে দেখছেন। তাই আঁকুন, কাটবে খুব।' ব'লে বিপদ উচ্চরবে না, এবার নীববে ঠোঁট কাঁপিয়ে এবং উলঙ্গ রোমশ ভুঁড়িখানা নাচিয়ে-নাচিয়ে হাসতে লাগলো। 'কি, মিথ্যে বলছি আমি, খারাপ প্রস্তাব?'

মৃগাঙ্ক অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলো।

'কি, মিথ্যে বললাম?' ব'লে অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করতে উকিল মজুমদারের ঘাড়ের ওপর হাত রাখলো।

'হাতটা নামিয়ে নিন।' মৃগাঙ্ক চোখ লাল করলো। হাসি বন্ধ হ'লো বিপদের এবং ভুঁড়ি নড়া থামলো।

'আপনি যেন কেমন চটে গেলেন।'

'নিশ্চয়।' রুক্ষ গলায় মৃগাঙ্ক উত্তর করলো, 'একজন ভদ্রমহিলাকে ইন্‌সাল্ট করছেন আপনি।'

'কে ভদ্রমহিলা, কাকে আবার ইন্‌সাল্ট করলাম!' বিপদ আকাশ থেকে পড়লো। 'আপনি কি বলতে চাইছেন দয়া ক'রে একবার খুলে বলুন না।'

'ঐ যে মডেল, এই মডেল আঁকুন—'

'তাই বলুন।' সেয়ানা সুরে উকিল হাসলো। 'হীরেনের স্ত্রী আমাদের বন্ধুপত্নী। আপনি তাঁর সঙ্গে নিরিবিলি এখানে ব'সে একটু চা খেয়েছেন ব'লে আমি যাচ্ছে তাই বলবো আর এই নিয়ে ঠাট্টামস্করা করবো আমায় এমন অপদার্থ ঠাওরাবেন না।'

মৃগাঙ্ক চুপ।

'কেন, রবিবাবুর গান গাই না ব'লে বাব্‌রি রাখি না ব'লে হাওয়াই শার্ট গায়ে চড়াই না ব'লে আর্ট সম্পর্কে দুটো কথা বলার অধিকার নেই আমাদের।' উলটো চাপ দিয়ে উকিল আবার চাপা হেসে নতুন ক'রে ঠোঁট ও ভুঁড়ি কাঁপাতে শুরু করলো। 'আরে মশাই এক বাড়িতে থাকছেন, রাতদিন দেখছেন, হীরেনের বউ কেমন একখানা ঝি জুটিয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি? ইয়েস, মহিলার রুচির সুখ্যাতি করছিলাম বরং এতক্ষণ। আপনারা অজন্ত ইলোরার গর্ত হাঁট্‌কে মরছেন। বলি, ঘরের পাশে কি আছে একবার চোখ মেলে তাকান। ঐ প্র্যাক্‌টিক্যাল মালতীকে এবার তুলির টানে গানের

লাইনে নাচের ঠমকে গল্পের খাতায় ফুটিয়ে তুলুন। তবে তো লোকে তা গ্রহণ করবে। সাধারণ লোক ছবির মধ্যে সাধারণ মেয়ে মালতীকে দেখতে চায়।' তারপর ফস্ ক'রে বিপদ মুখটা মৃগাঙ্কর কানের কাছে সরিয়ে নিয়ে বললো, 'এক নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে শুরু ক'রে তিন-শ' বাষট্টি নম্বরে বাড়ি খুঁজে দেখুন—পাবেন না। টাসেল-বাঁধনেওয়ালী রঙিন শাড়ি পরা চটি পায়ে পান খাওয়া লাল ঠোঁট টাপুসটুপুস মালতী এ-পাড়ায় দুটি নেই। তাই বলছিলাম, ঝি চাকর কুলি মজুরকে শিল্পের উপজীব্য ক'রে তুলুন, আপনাদেরও পয়সা হবে আর প্রকৃত গণ-শিল্পের পুনর্জাগরণ হবে।'

বিপদের কম্পমান ভুঁড়ি চকচকে চোখ ঠোঁটের বিস্ফার আর বত্রিশ-পাটি দাঁতের বিরাট নিঃশব্দ হাসি দেখে মৃগাঙ্কর বুকের মধ্যে ধুপ্ ক'রে উঠলো।

তথাপি উকিলের হাসি থেকেই যেন খানিকটা হাসি ধার ক'রে নিয়ে মৃগাঙ্ক বললো, 'আপনার অবজারভেশন চমৎকার। ঠিক বলেছেন। চেষ্টা করবো। কিন্তু জানেন কি—'

'কি, কি?' উকিল চোখ পাকালো।

বিপদ মৃগাঙ্কর চেয়ে অনেক বেঁটে। থুতনি তুলে প্রশ্ন করলো, 'আপনি অধ্যাপক পরিবার সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকেফহাল। নেক্সট্-ডোর নেবার ওদের। আপত্তি করে নাকি হীরেন? কিছু বলেছে?'

মৃগাঙ্ক কথা বলার আগে বিপদ, যেন কি একটা ধরতে পেরেছে, ঘনঘন মাথা নাড়লো।

'ও-সব হ'লো গিয়ে বুর্জোয়া মেন্টালিটি, মশাই। তা আর আপনি আমায় বলবেন কি, আমি জানি না? অধ্যাপক হয়েছেন, দশ পাঁচখানা জ্ঞানীগুণীর বই পড়ছেন অস্বীকার করছি না। সুনীতি বোঝেন, সুনীতির চর্চা করেন। ভালো। কিন্তু সেটা খাটাতে গেলে চলবে কেন। মালতী বেচারা আপনার ঘরে মানে স্টুডিওতে গিয়ে কিছুটা সময় ব'সে দু-চারখানা ভালো মডেল দিয়ে যদি পয়সা উপ্‌রি রোজগার করে তো তোর তাতে আপত্তি করার আছে কি উল্লুক।' উকিল কুপিত হ'য়ে অদৃশ্য হীরেনকে ধমক দিলে।

'তোর ঘরের স্ত্রীলোকের রূপ আর একজন নিতে পারবে না এই আব্দার তুই তোর বউয়ের ওপর খাটা। ঝি-র ওপর কেন। কি বলেন?'

মৃগাঙ্ক এবার বেশ রসানুভব করছিলো। হেসে মাথা নেড়ে বললো, 'নিশ্চয়।'

'আরে মশাই, সাইকলজি কি আমরা বুঝি না। ওটাও হ'লো এক ভাবের এক্সপ্লয়টেশন। সুনীতির নামে নিজে একলা দুনিয়ার বেবাক রূপ-রসগন্ধ ভোগের বাসনা। কেন, মালতী আপনার ঘরে গেলে, ও নিজে থেকে আপনাকে যদি ওর ছবি আঁকতে দেয় তো তুই বাধা দিস কেন। নীতি খসবে? তুই কি করছিস? কাজ করাচ্ছিস আর সারাদিন ইজিচেয়ারে শুয়ে-শুয়ে মেয়েটা রূপযৌবন চোখ দিয়ে চাটছিস, হ্যাঁ, আমরা বুঝি না, দেখি না এ-সব?'

উকিল মধ্যরাত্রে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর চা-এর দোকানের সিলিং কাঁপিয়ে বক্তৃতা শুরু করলো।

'এরা হ'লো আসল জ্ঞান-পাপী মশাই, সমাজের বড়ো শত্রু। জ্ঞানের আড়াল দিয়ে সর্বপ্রকারের পাপ স্বার্থপরতা সেরে নিচ্ছে। অথচ ধরতে ছুঁতে পাচ্ছেন না। এদের আগে গুলি ক'রে মারুন। সুনীতি।'

রেস্টুরেন্ট মালিক নিরাপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে উত্তপ্ত বিপদের কাঁধে হাত রাখলো। বিপদ তা ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মৃগাঙ্ককে বললো, 'মশাই, আপনি আলাদাভাবে মালতীর সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করুন। চক্রবর্তীর ঝি হিসাবে না। আমরা দশজন আছি মালতীর ক্যাণ্ডিডেট, বুঝেছেন। দশজন ওর ছবি কিনবো। আঁকুন। টু-পাইস আপনারও থাকবে।'

'আঁকবো।' মৃগাঙ্ক ঘাড় নাড়লো। মীরা চক্রবর্তীর দাসী সম্পর্কে বিপদ উকিলের এই উৎসাহ

তাকে মুগ্ধ করলো। 'গুড্ আইডিয়া।'

কিন্তু সেই রসের আসরে জল ঢেলে দিতে এসেছে নিরাপদ। বিপদের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছে, 'এটা দোকান। ও-সব নোংরা আলাপ কবতে তোকে এখানে কে ডেকেছে। এর বাড়ির ঝি আর ওর বাড়ির বউ ছাড়া কি তোর গল্প জমে না। দিন-দিন বুড়ো হচ্ছিস আর মেয়ে-মানুষের নামে ক্ষেপে উঠছিস।'

ধমক খেয়ে বিপদ মুখ নামালো।

গলার স্বর তেমনি চড়া বেখে নিরাপদ মৃগাঙ্ককে বললো, 'আপনাদের বিল চুকিয়ে দিয়ে তিনি তো কখোন বেরিয়ে গেছেন। খামোকা আর ব'সে আছেন কেন আপনি। উঠুন এইবেলা, আমি দরজা বন্ধ করবো।'

মৃগাঙ্ক উঠে বেরিয়ে যেতে নিরাপদ বললো, 'কি বলছিলি এতক্ষণ বক্‌বক্ ক'রে?'

'আর বলবো কি।' যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বিপদ থুতনি নামালো। 'আমরা ক্ষেপে উঠি, আর এই যে এতক্ষণ ব'সে থেকে খাইয়ে গেল!'

যেন নিরাপদর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ আদায়ের চেষ্টায় উকিল কট্‌মট্ ক'রে নিরাপদের মুখের দিকে তাকায়। 'এ-ব্যাপারে তুমি কি মন্তব্য করছো বন্ধু, শুনি? এ-পাড়ার ঝি ও-পাড়ার ধোবানীর জন্যে গরীবদের জিভে জল আসে মাঝে-মাঝে স্বীকার করি, কিন্তু তোর কফিখানায় দেখছি রাত বারোটার পর মিলন-বাসর বসে।'

'তা তোর অত বুক টাটায় কেন।' নিরাপদ এবার না-হেসে পারে না। 'যার যা খুশি করুক। খরচ করেছে, তা তুইও একটা জোটা না। খুব খরচ ক'রে এই চেয়ার টেবিলে ব'সে খাবি দু-জনে। পারিস না?'

'না রে দাদা, আমাদের জীবনে হবে না।' মর্মান্তিক করুণ গলায় বিপদ উত্তর করলো প্রথমটায়, তারপর যেন হঠাৎ কি মনে পড়তে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

'তোর মাথা খাবাপ হ'য়ে গেল নাকি?' নিরাপদ প্রশ্ন করলো।

'একদম, বিলকুল খারাপ হয়েছে।' উকিল হঠাৎ বন্ধুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠলো, 'একদিকে কনকচাঁপা অন্যদিকে রজনীগন্ধা। দরজায় জানলায় রঙিন পর্দার বাহার, আহা তুই যদি দেখতিস নিরাপদ। আর স্বয়ং তিনি নিশ্চিন্তে লম্বা হ'য়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে রুটি মাখন ওভালটিন দুধ বিস্কুট টাট্‌কা মাছের ঝোলটি সব্‌জিটি খাচ্ছেন। মাথা আমার খারাপ হয়েছে বৈকি নিরাপদ। তোরা দশজন আমার মাথাটা খারাপ ক'রে দিলি?'

'বেশ তো, তুইও এমন বউ জোটা না। মজা ক'রে ইজিচেয়ারে শুয়ে বিস্কুট ওভালটিন খাবি।'

'কোন্ দুঃখে? আমার কি পেটে আলসার হয়েছে, যে বিস্কুট মাখন! দেখ্ নিরাপদ—' বিপদের গলা আরো চ'ড়ে গেল, চোখ গোল-গোল। 'যদি বউ রোজ এনে মাংস মিহিদানা খাওয়াবারও লোভ দেখায় আমি গলি না, টলি না।'

'মানে বউকে ঘর থেকে বাইরে ছাড়িস না, এই তো?'

'আলবৎ!' আঙুল দিয়ে বিপদ মীরা ও মৃগাঙ্কর পরিত্যক্ত শূন্য বাসন-কোসন রুটি ও ডিমের গুঁড়ো ছড়ানো টেবিলটা দেখিয়ে দাঁত বা'র করে ঠোঁট কাঁপিয়ে, ভুঁড়ি নাচিয়ে একটু আগে যেমন গুজ্‌গুজ্ ক'রে হেসে উঠেছিলো তেমনি হেসে উঠলো।

'দেখছো তো ব্যাপার-স্যাপার, বলি কতক্ষণ ছিলো, কত টাকার খাওয়ালো?'

'তা তোর সেই খবরে কাজ কি?'

ব্যবসায়ী নিরাপদ গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'কতটা চিনি এনেছিস বা'র কর্।'

গুজগুজে হাসি থামিয়ে উকিল বললো, 'তুই পাকা ক্যাপিট্যালিস্ট ব'নে গেছিস নিরাপদ; এমন রসের বুকে ছুরি চালিয়ে নিজের চিনির কথাটা আগে তুলছিস। আরে, ভয় নেই, হীরেনের কানে আমি তুলতে যাচ্ছি না এ-সব। আমার দরকার কি পরের বেড়ার ফুটোয় নাক ঢুকিয়ে। রোজ দু-জনে এসে তোর দোকানে ফাউল মটন চালাক, যত খুশি।' একটু থেমে পরে বললো, 'আইনের বইগুলো মুখস্থ ক'রে শালা কিচ্ছু হ'লো না তাই বে-আইনী রসের গল্পগুলো শুনে এবং পাঁচজনকে শুনিয়ে প্রাণটা তাজা রাখি, বুঝলি না।'

উকিলের কথায় কান না দিয়ে নিরাপদ টপাটপ পাখা বন্ধ ক'রে সামনের দিকের প্রায় সব ক-টা আলো নিবিয়ে দিলে। বিপদ একদৃষ্টে টেবিলের শূন্য বাসনকোসনগুলির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার পুরু কালো ঠোঁটে নিঃশব্দ কুটিল হাসি।

এগারো

মীরা আস্তে পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো। প্যাসেজটা অন্ধকার। রাত দশটা বাজতে এ-বাড়ির নিচের ভাড়াটেরা আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ দিন নিজেদের ঘরের দরজায় খিল দেবার আগে ওপরে যাবার রাস্তার আলোও নিবিয়ে দেয়।

মীরা সিঁড়ির গোড়ায় এসে রোজ আলোটা জ্বেলে নেয় এবং তখন বেশ বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে জিহ্বা ও ঠোঁট দিয়ে। 'অভদ্র।' নিচের ভাড়াটেদের মনে-মনে গালগালা দিয়ে ও সিঁড়ি ভাঙে।

আজ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো।

আজ আলোটা জ্বলছিলো না দেখে ওর ববং ভালো লাগছিলো। ভয়ানক ক্লান্ত সে। কোনোরকমে ওপরে গিয়ে বিছানা নিতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু সিঁড়ি ক-টা ডিঙিয়ে দোতলার বারান্দায় পৌঁছে মীরা চমকে উঠলো। এ-বাড়িতে এসে এই দৃশ্য আর ও দেখেছে মনে করতে পারলে না।

মীরা ঘরে না থাকলে হীরেন আলো নিবিয়ে দিয়ে আরামকেদারায় ব'সে অপেক্ষা করে, কি পায়চারি করে। ঘুমোয় না। বিছানা তো নয়ই, ইজিচেয়ারে শুয়ে কোনো কোনো দিন ঘুমের ভান করে মাত্র। মীরার পায়ের শব্দে চোখ মেলে তাকায়, হাই তোলে, তারপর, অভ্যাস অনুযায়ী দুই হাতের তেলো দিয়ে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে প্রশ্ন করে, 'ক-টা বাজে, ক-টা বাজলো? ব'সে থেকে-থেকে আমি যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

অপেক্ষামাণ স্বামীর এটা অভিযোগ না ঘুমজড়িত গলার চমক মীরাকে হীরেন হঠাৎ বুঝতে দেবে না।

মীরাও এ-সম্বন্ধে কিছু চিন্তা না ক'রে ঘরে ঢুকেই আগে সুইচ্ টিপে আলো জ্বালবে।

অর্থাৎ মীরার হাতঘড়িতে রাত এখন ক-টা না ব'লে চেয়ারের পাশে টেবিলে রক্ষিত ঘরেব ঘড়িতে সময় কত দেখুক, যেন হীরেনকে ইঙ্গিতে তা জানিয়ে দিয়ে মীরা হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রাখবে। তারপর জুতো খুলবে, শাড়ি ছাড়বে। সকলের শেষ জামা।

হলদে শীর্ণ হাসি ঠোঁটে জিইয়ে রেখে হীরেন টেবিলের ঘড়ি ও মীরাকে প্রায় একসঙ্গে দেখতে চেষ্টা করবে।

পরবর্তী কোন্ প্রশ্নের জন্যে হীরেন তৈরি হচ্ছে মীরা তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তোয়ালে

ও সাবান হাতে বাথরুমের দিকে যাবে। কেননা স্বামীর পরের প্রশ্নও তার অজানা ছিলো না, এবং প্রশ্নের সঙ্গে শুকনো হলদে হাসি।

'না, তুমি ফেরো নি ব'লে যে আমি খাই নি তা নয়, এমনি, পেটটা ভার-ভার ঠেকছে, তুমি খাবে তো?'

বাথরুম থেকে মীরা শুনবে স্বামীর খণ্ড-খণ্ড হ'য়ে ভেসে আসা ভাঙা দীর্ণ গলার আলাপন। 'দেখছো, সারাদিন একরকম ঠাণ্ডা থাকার পর সন্ধে থেকে কেমন গুমোট চালাচ্ছে। আজ বিছানায় পিঠ ছোঁয়ানো দায়, আমি ভাবছি এই চেয়াবে শুয়ে কাটাবো। তুমি বুঝি স্নান করছো মীরা? রাত বেশি হয়েছে, কত জল ঢাললে শেষটায় না একটা কিছু অসুখ-বিসুখ—'

হীরেনের কথা একেবারে শোনা যাবে না ব'লে বালতি উপুড় ক'রে মীরা হুড়মুড় জল ঢালে মাথায় ঘাড়ে গলায় পিঠে বুকে উরুতে দুধেব মতো শাদা ঈষৎ উত্তুঙ্গ নরম নাভিদেশে।

সারাদিনের পরিশ্রমের যন্ত্রণায় পেশীগুলো নিস্তেজ হয়েছিলো, ঠাণ্ডা জলের আদরে আবার সব সতেজ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠছে দেখে মীরার ভালো লাগে। ভালো লাগে এবং বাথরুমে ব'সে রোজ সে অনেকক্ষণ ধ'রে নিজের সুন্দর উলঙ্গ বিস্ফাবিত পেশীগুলো দেখে। একটা কথা মনে পড়ে মীরার তখন, হীরেনেই মনে করিয়ে দেয়। তার ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ ভাঙা গলার স্বর বাথরুমের শ্যাওলা-ধরা-দরজায় এসে আস্তে-আস্তে মাথা ঠোকে। 'ইস্, কতক্ষণ চান করছো তুমি মীরা, কত জল ঢালছো, এত রাত ক'রে পুরো দুই ড্রাম জল ঢেলেও তোমার অসুখ করে না, তোমার কি একদিনও অসুখ কববে না, এমন নিটোল দীপ্ত স্বাস্থ্য আমি আবার কবে ফিবে পাবো কে জানে।'

তোয়ালে দিয়ে ঘাড় মুছতে-মছতে মীরা অনেকদিন স্নানের ঘরের পাতলা প্লাইউডের দরজার ওপর আছাড় খেয়ে-পড়া দীর্ঘশ্বাসের একটা কাঁপুনি শুনেছে।

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগে স্নান সেরে মীরা যখন ঘরে ঢোকে।

আধশোয়া হীরেন তৎক্ষণাৎ মাথাটা তুলে ধরে।

'সবচেয়ে সুন্দর লাগে তোমাকে স্নানের পর। অদ্ভুত। দৃষ্টি ফেরানো যায় না। বৃষ্টিধোয়া বজনীগন্ধাকে মনে পড়ে।'

মীরার তখন আরো-বেশি রাগ হয়।

এই ইনটেলেক্‌চুয়্যাল জীবটি মনের ভাব গোপন করতে রাতদিন কত চেষ্টাই না করছে।

তাই রজনীগন্ধার মতো ফুল্ল বিকশিত মুখ কালো রেখেই মীরা উত্তর করে, 'তবে আর কি। সারাদিন ঘরে থেকে যখন-তখন স্নান ক'রে কাটানো যাবে। কিন্তু তাতে পেট ভরবে না। কাল রেশন আসছে না জেনে রেখো। একটা আধুলি কর্জ দিলে না কেউ। মিছিমিছি ট্র্যামে-বাসে ঘুরে হাতের শেষ সম্বল কয়েক আনা পয়সাও ফুরোলো।'

হীনের যেমন মনের ভাব লুকোবে মীরাও তেমনি সারাদুপুর, দুপুর থেকে রাত বারোটা অবধি যা-কিছু তার বাইরের জীবনে ঘটলো অক্লেশে গোপন রেখে বলবে, 'আমিও আর পারছি না। কাল থেকে আমাকেও আতুর হ'য়ে ঘরে ব'সে থাকতে হচ্ছে। মন্দ হ'লো না। দেখা যাক ঈশ্বর যদি এবার এই সংসার চালায়। মানুষ যখন ইচ্ছে করলেই চালাতে পারে না, চেষ্টা করলেও তাতে বাধা আসে তখন ঈশ্বরের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। মনে-মনে এই ঠিক ক'রে আজ হেঁটে বাড়ি ফিরেছি।'

এ-কথার পর হীরেনের চেহারা কেমন হয় দেখবার অধীর আগ্রহ নিয়ে মীরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিলো। প্রায় দুপ্‌দাপ্ শব্দ ক'রে।

আর, মিথ্যে কি।

হীরেন ছলনা জানে।

মীরার ছলনা নেই।

অমরেশের দেওয়া এই পাঁচ হাজার টাকাই কাল দুপুরে এক ফাঁকে হ্যারিসন রোডে ওর হোটেলে গিয়ে ফিরিয়ে দেওযার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মীরা দুপুর রাতে ঘরে ফিরলো।

কিন্তু সে-সব কিছুই বলা হ'লো না।

উপযুক্ত সময়ে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বাধা পেলে মানুষ যেমন বিমূঢ়-বিব্রত হয়, তেমন ততটা না হ'লেও, মীরা বেশ একটু অবাক ও আড়ষ্ট হ'য়ে গেল।

সিঁড়ির দুটো ধাপ বাকি থাকতেই ও বেশ দেখতে পেলে ঘবের দরজার একটা পাল্লা খোলা, একটা বন্ধ করো। খোলা এক পাল্লার দৌলতেই মীরার দক্ষিণ খোলা ঘরে হু-হু হাওয়া ঢুকছিলো। নৌকোর পালের মতন মশারির পেটটা ফুলে-ফুলে উঠছে। হীরেন গাঢ় নিদ্রায অভিভূত, মীবা বুঝতে পারলো।

কিন্তু অস্থির হ'লো না ও।

বরং ধীর-স্থির পায়ে বাকি সিঁড়িগুলো ভেঙে বারান্দায় এবং বারান্দা পার হ'যে পরে ঘরে ঢুকলো। আলো জ্বাললো। হীরেন-সম্পর্কে মীরার নিশ্চিন্ত থাকার প্রচুর কারণ ছিলো। আলো জ্বেলে সকলের আগে টেবিলটার দিকে এক নজর তাকিয়ে ও আবো-বেশি নিশ্চিন্ত হয়।

মীরার অনুমান মিথ্যে হয়নি।

ঘুমের ওষুধের ফাইলটা টেবিলের ওপর এমন জায়গায় দাঁড় করানো যে সকলের আগে সেটা চোখে পড়ে।

রাগ হ'লো মীরার এই জন্যেই।

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ও চোখ সরিয়ে নিলে সেদিক থেকে এবং তারপর সোজা আলনার কাছে চ'লে গেল। পাশে একটা স্যুটকেশের মধ্যে ব্যাগটা রাখলো ও। তারপর এক টানে পরনের শাড়ি খুললো, ব্লাউজ। রইলো শুধু সায়া আর ব্রেসিয়ার। এই বেশে ঘরের ভিতর একটু হাঁটতে ইচ্ছে করছিলো মীরার। এই অবস্থায় অনেকদিন সে হাঁটে না। এ-ভাবে নিজের বেডরুমে স্বাধীনভাবে পায়চারি করার মধ্যে যে প্রগল্‌ভতা ফোটে, জীবন যৌবনের ছন্দ হঠাৎ বাইরে থেকে ঘুরে এসে মীরার মধ্যে তা জাগলো দেখে ঈর্ষায় হীরেনের চোখ ছোটো হ'য়ে যায়। অনেকদিন গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্যাকাশে হেসে কালিদাস বিদ্যাপতি উপুড় ক'রে দিয়ে অর্ধনগ্না মীবাব রূপ বর্ণনায় হীরেন যখন উচ্ছ্বাস দেখাতে আরম্ভ কবে, দাঁড়িয়ে দেখার ধৈর্য থাকে না মীরাব। তাড়াতাড়ি তোয়ালে আর সাবান হাতে ও বাথরুমে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

আজও সে হাঁটলো না।

ঘুমিয়ে থেকেও হীরেন টেবিলে, যাতে আলো জ্বাললে সকলের আগে চোখে পড়ে, একটা আলপিন উঁচিয়ে রেখেছে। যাতে ঘরে ঢোকামাত্র মীরার খোঁচা লাগে।

হাঁটলো না, কিন্তু কতকাল পরে আজ নিশ্চিন্তমনে ও আয়নায় নিজের বসনমুক্ত সুন্দর শরীরটা দেখতে পারতো। দেখা উচিত ছিলো। হ'লো না। পারলো না। যতবার আয়নায় চোখ রাখতে গেল, চোখ খ'সে গেল টেবিলে। আলোর নিচে দাঁড় করানো ঘুমের ওষুধের শিশি।

ঘুমের জন্য ডাক্তাররা রুগীদের পারতপক্ষে এই ওষুধ খেতে নিষেধ করেন।

কিন্তু তা হ'লেও এর বিষের মাত্রা এমন অঙ্ক ক'ষে মাপা যে ভোর পাঁচটায় কাক ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে রুগী চোখ মেলে তাকাবে, বলবে, 'খিদে পেয়েছে, খেতে দাও আমায়।'

বিষের পরিমাণ যতই কম থাক শিশিটা টেবিলে এমন প্রকাশ্যভাবে সব ওষুধ থেকে সরিয়ে আলাদা ক'রে রাখার অর্থ বুঝতে মীরার কষ্ট হ'লো না।

কষ্ট হ'লো না, আর রাগে তার দুই কানের মূল লাল হ'য়ে উঠলো। এ যেন শুকনো এক চিল্‌তে ঘাস গলায় জড়িয়ে ফাঁসি পরার ভয় দেখানো। ইনটেলেকচুয়্যাল হীরেন চক্রবর্তী অধিকারাত্রে স্ত্রীর ঘরে ফেরার দুঃখ প্রতিবাদ ও কোপ প্রকাশ করতে আজ এ-রকম একটা স্থূল জিনিসের আশ্রয় নিয়েছে ভাবতে-ভাবতে এক সময় রাগ প'ড়ে গিয়ে মীরার কেমন হাসি পেলো, অনুকম্পা হ'লো। 'চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে রাখার ক্ষমতা এই ওষুধের নেই, তাই।' ঘর ছেড়ে বাথরুমে যেতে-যেতে মীরা মনে-মনে বললো।

হীরেন জেগে ইজিচেয়ারে ব'সে থাকলে নগ্নদেহে আয়নায় দাঁড়ানো তার পক্ষে যেমন অসম্ভব হ'তো, ঘুমন্ত হীরেনের জায়গায় এখন টেবিলে শিশিটা সেই কাজ করছে। উপায় নেই, কোনোমতেই অনেকক্ষণ এ-ঘরে থাকা সম্ভব না। মীরার দুই কান দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছিলো। তাই আরো-বেশি ত্রস্ত পায়ে অস্থির চিত্তে ও ছুটে গেল স্নানের ঘরে। ভিতর থেকে পাতলা প্লাইউডের দরজায় খিল এঁটে দিলে। আলুলায়িতকুন্তলা হ'য়ে ট্যাঙ্কের ট্যাপ্‌ এর নিচে মাথা রেখে চুপচাপ ব'সে ও নিজেকে এবার ভালো ক'রে দেখতে লাগলো, ভাবলো।

না, এ-কী ক'রে সম্ভব!

ঠাণ্ডা জলের ধারা ওর শরীরে বেয়ে নামলো, প্রত্যেকটি রোমকূপের মধ্যে সাবানের ফেনাগুলো ঢুকে প'ড়ে শরীরকে কোমল পেশীগুলোকে মোলায়েম ক'রে দিলো। শ্রান্তি দূর হ'তে উত্তেজনা কমতে স্থির স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে মীরা আবার সবটা বিচার ক'রে দেখলো।

না, কোনোরকমেই তা ভালো দেখাবে না।

টাকা ফিরিয়ে দিতে গেলে অমরেশ ভীষণ শক্‌ পাবে। এবং চটবে। মীরা যা একেবারেই চায় না।

পেয়ে নয়, দিয়ে, ত্যাগ ক'রে অমরেশের সুখ।

মীরা স্বামী নিয়ে সুখে থাকুক এই দেখেই অমরেশ তৃপ্ত? কোনো পুরুষ এ-ভাবে চিরকাল তৃপ্ত থাকতে পেরেছে কি না ট্যাপ্‌-এর নিচে থেকে উঠে তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে-মুছতে মীরা চিন্তা ক'রে বিচলিত হ'লো বটে কিন্তু তার চেয়ে বেশি মুহ্যমান হ'লো ও, দুঃখ পেলো, যখন মনে পড়লো চেক ফিরিয়ে দেওয়ার সময় অমরেশ কী ভাববে। কেমন হবে তার চাউনি।

এ কি দু-জনের সম্পর্কটাকেই চিরদিনের মতো আবার ছিঁড়ে দেওয়ার মতো কাজ করতে যাচ্ছে না মীরা।

অমরেশ তখন ভাববে না, যেহেতু মীরা তার সঙ্গে বঞ্চনা করতে চাইছে না ব'লে সবটা টাকা ফিরিয়ে দিতে এলো। ভাববে মীরার পাতিব্রত্য এতই প্রবল যে ওর থেকে একটি পয়সা গ্রহণ করা পাপ, চেকটা এক রাত ও একটি দুপুর ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রেখে চিন্তা ক'রে পরে মীরা এখন তা ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

এর কতটা সত্য?

স্বামী তার পাতিব্রত্যের কতটা দাম দিলে আজ অবধি? তোয়ালের জল নিঃশেষে নিংড়ে বা'র ক'রে দিয়ে মীরা সেটা খোপায় জড়ালো। না, দরকার নেই, অমরেশের হোটেলে ক-দিন ও না যায় না যাবে, কিন্তু চেক ফিরিয়ে দিয়ে এতটা অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে আর যাকেই রাখুক, অমরেশকে সে রাখতে চায় না।

হ্যাঁ, মিথ্যে কথাই বলতে হবে এখানে মীরার। জীবনের একটা মিথ্যের ফাটল ভরাট করতে মানুষকে ছোটো-ছোটো মিথ্যের কত নুড়ি কুড়িয়ে চলতে হয় মীরা ভাবলো, আর এখন চিন্তা ক'রে সে অবাক হ'লো কী ক'রে রাস্তায় চেকটা ফিরিয়ে দেবে ভাবতে-ভাবতে এসেছিলো ও। তা হয় না, মীরা তা হ'তে দিতে পারে না।

বারো

ভারি মনোরম একটি সকাল।

শীতের দুরন্তপনা শুরু হয়নি, অথচ রৌদ্রে ঈষৎ হালকা ঈষৎ মধুর আধপাকা কমলালেবুর মনোহর রং লেগেছে।

যেন সেই কমলা রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে মীরা আটপৌরে ধনেখালি পরলো।

আর ওর কমলা-রং ব্লাউজ। হাতায় দুটি করে কচি সবুজ পাতা।

'একটা কথা বললে তুমি রাগ করবে?'

'কি কথা।' মীরা গম্ভীর হয়ে হরলিক্সের বাটি হীরেনের সামনে টিপয়ের ওপর রাখলো।

যেন কথাটা হীরেন হঠাৎ বলতে সাহস পেলো না। মীরাকে আবার অতিরিক্ত গম্ভীর দেখে প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা সে গোপন করলো।

'বলো, আমার কাজ আছে।'

ঠিক অসহিষ্ণু না হলেও মীরা গলায় একটু ধার আনলো।

কথাটা না বললে মীরা আরো-বেশি বিরক্ত হবে অনুমান করে হীরেন হরলিকসে চুমুক দিয়েই মুখচোখ আবার হাসি-হাসি করে বললো, 'অর্ডিনারি শাড়ি-ব্লাউজে মাঝে-মাঝে এত ভালো দেখায় তোমাকে, ব্রিলিয়ান্ট লাগছে এখন।'

মীরা ততোধিক গম্ভীর গলায় বললো, 'অর্ডিনারিকে অর্ডিনারিতেই তো ভালো দেখাবে, রোজ আর তা বলে লাভ কি।'

আবার হীরেনের হাসি নিবলো। যেন আশ্রয়-স্বরূপ বাটিতে দীর্ঘ সময়ের জন্যে একটা চুমুক দিতে চুপ করে রইলো সে।

মীরা বললো, 'আটপৌরে কাপড়ে ভালো দেখায়, তা আটপৌরে হবার বাকি আছে কি। বলো, চুপ করে গেলে কেন।'

হীরেন বাটি থেকে সভয়ে মুখ তুললো।

'না কি এসপ্লানেড থেকে গভীর রাত্রে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু তুমি দেখতে পাচ্ছো, তা-ও দুঃসাহসিকতার পরীক্ষা বলে ধরে নিতে পারতে যদি অলিম্পিকে হাঁটার কম্পিটিশনে নাম পাঠাতুম। দুঃখের বিষয় নিতান্তই পয়সার অভাবে বেকার ভিক্ষুনীর মতো গাড়ির আশা বাদ দিয়ে কাজটি করতে হয়েছিলো, কাজেই অর্ডিনারি ছাড়া—'

মীরা থামলো।

হীরেনের দু-কান দিয়ে গরম বাতাস বেরুচ্ছিলো। হেমন্তের যে-সকালটি ঘুম থেকে উঠেই মীরার কথা শোনার পর থেকে হীরেনের চোখে এত ভালো লাগছিলো এখন আবার যেন কেমন কালো ঝাপসা হয়ে এলো।

'সে তো শুনলাম, সেজন্যে কি আমি, আমার কষ্ট হচ্ছে না মীরা?' হীরেন যথাসম্ভব গলা মোলায়েম করলো। 'তুমি যে কেন এ-রকম করতে গেলে, দাদার বাসায় রাত্রে থেকে গেলে এবং সকালে ফিরে এলে কি যে মহাভারত অশুদ্ধ হতো। আমি তো—'

মীরা সম্পূর্ণ পিছন ফিরে বাকি দুটো জানলার পর্দা সরিয়ে সবটা রোদ ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিতে অকস্মাৎ কেমন ব্যস্ত হয়ে গেল। যেন হীরেনের কথা ভালো করে শুনলো না।

জানলা থেকে যখন ফিরে এলো মীরার মুখাবয়ব সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেছে।

'কেন আবার দাদার বাসায় ফিরে যাইনি, সামান্য দু-আনিও আমার কাছে নেই, বা দাদা-বউদির কাছ থেকে ট্রামের পয়সা কর্জ আনিনি, চাইতে বাধলো, সে তুমি বুঝবে না—তা ছাড়া রাত্রে স্ত্রীর ফিরতে দেরি হওয়ার অসহ্য যন্ত্রণা ভুলতে তুমি ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, সারারাত

না-ফিরলে সকালে এসে দেখতুম অন্য কিছু খেয়ে—খেতে কি?'

ঝকঝকে হাসির আভায় চোখমুখ বিচ্ছুরিত মীরার। কণ্ঠস্বরে কপট ক্রোধ যদিও।

যেন ক্ষমা চাওয়ার মতো তৎক্ষণাৎ গলার সুর করে অধ্যাপক বললো, 'ভুল মীরা, সত্যি তুমি আমায় ভুল বোঝো, ঘুম আসছিলো না বলেই একটা বড়ি—তা ছাড়া, তুমি যে খুব বেশি দূরে গিয়েছিলে কারো কাছে টাকার জন্যে আমি কি তা—আমি কি তা—'

মীরার কণ্ঠস্বরে আর ক্রোধ নেই।

'সত্যি তোমার মনে হয়েছিলো, কোথাও টাকা না-পেলে শেষ পর্যন্ত আমি দাদার কাছে যাবো?'

'যদি তা মনে না করতুম তো তোমার কথাই যে ঠিক হতো। ছ-ঘণ্টা কেন ছ-হাজার বছর ঘুমোনো যায় সেই ওষুধই খেতুম। আমি জানতাম শেষ অবধি অঞ্জনবাবুর কাছেই আমাদেব যেতে হবে। তিনি ছাড়া আমাদের আর আছে কে যে—'

মীরা শূন্য হরলিক্‌সের বাটিটা তুলে নেওয়ার ব্যস্ততায় যেন হঠাৎ কথা বলতে পারলো না।

'যাকগে, শেষ পর্যন্ত যে কিছু পাওয়া গেল।' পরম নিশ্চিন্ততায় ইজিচেয়ারে পিঠ ঢেলে দিতে-দিতে হীরেন হরলিক্‌সের একটা ছোট্ট ঢেকুর তুললো। 'কখন যেতে বললেন তোমাকে টাকাটা আনতে।'

'দুপুরবেলা। বোধহয় ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দেবেন।'

'তাই হবে।' হীরেন ঘড়ির দিকে তাকালো। ' পৌনে সাতটা, মালতীর এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিলো—উনুনে আঁচ দিয়ে বাজারে যাবে, দুপুরে খেয়ে একটু বিশ্রাম না করে অমনি বেরুবেই বা কি করে—' হীরেন ঘড়ি থেকে তুলে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকায, মীরা চোখ সরিয়ে নেয় বাইরে, দূরে, আকাশের গায়ে। শাদা মেঘের টুকরো হয়ে বি.ও.এ.সি-র প্লেন যাচ্ছে কি ওটা। শব্দের একটা সুর যেন চোখ দিয়ে দেখতে-দেখতে মীরা ছোট্ট নিশ্বাস ফেললো।

'বাজার-বাজার করছো, ঘরে আর একটা আধুলি নেই তুমি জানো না। বোধহয়।'

মীরা হাসছিলো।

হীরেনকে আবার অল্প-অল্প চিন্তিত হতে দেখে হাসিটাকে ঈষৎ মদির ও একটু বক্র করে তুললো ও।

'পারবে নাকি চেয়ে-চিন্তে কারো কাছ থেকে একটা দুটো টাকা যোগাড় করতে? এখনকার মতো চালিয়ে দাও। আমি বিকেলে এসে ফিরিয়ে দিচ্ছি। পারো তুমি? আছে কেউ জানাশোনা ওপরে বা নিচে?'

হীরেনের ওপর হঠাৎ এ-কাজের দায়িত্ব চাপাতে অসহায়ভাবে সে হাসলো। এবং ইজিচেয়ারের ক্যানভাস থেকে মাথাটা না তুলে আস্তে-আস্তে নাড়লো।

'নিচে যারা আছে তাদের কাছে চাওয়া যায় না।' মীরা বললো, 'আজ পর্যন্ত এ-বাড়ির কারো সঙ্গে পরিচয় করতে পারলাম না। ধারে-কাছের লোকের সঙ্গে জানাশোনা না থাকার এই বিপদ।' বলে মীরা আবার টেবিল পরিষ্কার করতে, আলনা গুছোতে লাগলো।

হীরেনকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকতে দেখে, অথবা চুপ থাকতে দিয়ে মীরা আঙুল দিয়ে পাশের ঘরের দরজা দেখাবার ইঙ্গিত করে বললো, 'ওঁর কাছে একবার চাইলে হয় না?'

' কে?' হীরেন প্রথমটায় চমকে উঠলো, তারপর বিমর্ষ হেসে ধীরে-ধীরে বললো, 'কাল তুমি বাড়ি ছিলে না। আর্টিস্ট আমার কাছে টাকার জন্যে এসেছিলো। ছবি-টবি মোটে বিক্রি হচ্ছে না বললো। অবস্থা তার আরও কাহিল।' কথার শেষে একটু টেনে-টেনে হাসবারই চেষ্টা করলো হীরেন।

প্রতিবেশীর দুরবস্থার আরো দু-একটা বিবরণ হীরেন নিশ্চয় দেবে কিন্তু তা শোনার ধৈর্য, সময় ও উৎসাহ নেই মীরার, চোখের এমন ভাব করে একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলে বললো, 'তা

দেখি কি করা যায়—একটা-কিছু করতে তো হবে।'

বলতে-বলতে ও দরজার চৌকাঠ পার হয়ে ভিতর-বারান্দার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। হীরেন ডাকলো, 'শোনো।'

'কি?'

মীরা আধখানা হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

'মালতীর কাছে চেয়ে দেখতে পারো, একটা দুটো দিয়েও চালাতে পারবে। ও এখুনি এসে যাবে।'

নিঃশব্দে মীরা একবার মাথা নাড়লো শুধু।

তার দুই কানের ডগা লাল হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি বারান্দায় চলে গেল বলে হীরেন আর দেখতে পেলে না।

টাকা চাইতে মালতী আঁচল খুলে পাঁচ টাকার একটা নোট দাদাবাবু বা দিদিমণি কারুর হাতে না দিয়ে টেবিলের ওপর রাখলো।

দু-পাঁচ টাকা সর্বদাই তার আঁচলে বাঁধা থাকে। এমন হাস্য ও লাস্যভবে কথাটা ঘোষণা করে ঝি টাকাটা টেবিলের ওপর রাখছিলো যে অন্যদিন হলে হীরেনের চেহারার কি রং ধরতো মীরা ঠিক মনে করতে না পারলেও এখন বুঝলো, এই মুহূর্তে হীরেনের চেয়ে সরল কৃতজ্ঞ ও দরদী মানুষ খুব বেশি পৃথিবীতে নেই।

'তুমি বলে দাও মীরা কি আনতে হবে বাজার থেকে। মালতী বরং এখুনি চলে যাক। আমার শাকসবজি যে খুব একটা আজ বাছাবাছি করে আনার দরকার তা মনে করি না। কাল ডিম খেয়েছো, বরং তোমার জন্যে একটু ভালো মাছ নিয়ে আসুক—কি বলো?'

বৈজ্ঞানিক চুলকে সহস্রভাগে চিরতে পারে। নারী পাবে চুলচেরা হাসির লক্ষ ভাগের একটা চির ঠোঁটে ফোটাতে।

ঘরে বসেই পাঁচ টাকা ধার পাওয়াতে একটু বেশি আনন্দিত হওয়ায় মীরার ঠোঁটের সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হাসি হীরেনের চোখে ঠেকলো না।

'বেশ তো দু-জনের জন্যে এ-বেলা মাছ আসুক।' মীরা প্রস্তাব দিতে হীরেন বললো, 'আমার আপত্তি নেই। খামোকা কতকগুলো রান্নাবান্নার না ওদিকে বেলা হয়ে যায়, তোমাকে যেতে হচ্ছে আবার সেই আলিপুর।'

মীরা একবার সিলিং-এর দিকে তাকালো।

'তা না-হয় দাদার কাছে কাল যাবো। কালকের এত হাঁটার পর আজ আর আমি খাওয়া-দাওয়ার পর ছুটোছুটি করতে পারবো বলে মনে হয় না।'

'আজ তুমি বিশ্রাম করো মীরা, আজ সারাদিন তোমার রেস্ট্ নেওয়া উচিত।' অতিরিক্ত উৎসাহে হীরেন চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং একটু পায়চারি করলো।

'বলেছেন যখন টাকা দেবেনই। যেখান থেকে হোক নিশ্চয়ই যোগাড় করে রাখবেন। আর, সত্যি, তোমার দাদা অঞ্জনবাবুর মতো হার্ট কারোর হয় না। অবিশ্যি বলতে পারো মা-র পেটেরই বোন তুমি, তোমার অসুবিধেটা তাঁর বুকে যতখানি লাগবে অন্যের লাগবে না। কিন্তু তা হলেও এ-দিনে বিয়ের পরও টাকাপয়সা দিয়ে—বুঝতে পারছো না?'

মীরা কথা বললো না।

'কাল যেয়ো।' হীরেন হাত নেড়ে বললো, 'মালতী যখন পাঁচ টাকা দিয়েছে দু-দিন আমরা খুব চালিয়ে নিতে পারবো। পোনামাছ, মানে পুকুরের যেটা, কত এখন দর মালতী?'

'কাটা সাড়ে তিন, গোটা তিন টাকা?'

'কই?'

'চার।'

'গুলসা মাছ ওঠে? বরফচাপা নয়, বেশ নড়ছে এমন?' হীরেন হাত নেড়ে মালতীকে বোঝালো। 'অত্যন্ত ভালো মাছ। রুগীর পক্ষে খুবই উপকারী, আবার এমনিতেও সকলেরই প্রিয়।'

হীরেন মীরার দিকে তাকিয়ে এবার একটু ফ্যাকাশে রকম হাসলো।

'আঃ, কতদিন বাজারে যাই না। বাজারে কিন্তু, একটু খেয়াল রাখলে, পুকুর থেকে সবে তুলে এনেছে এমন মাছও পাওয়া যায় মীরা।'

'তা তুমি বরং যাও, দেখে-শুনে আনতে পারবে। বলছো ঘুম থেকে উঠে অন্যদিনের চেয়েও ভালো বোধ করছো। বরং একটা রিক্‌শা ডেকে নাও না-হয়।'

হাসিটা আরও একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল হীরেনের। 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস কবো মীরা, ভয় হচ্ছিলো পীলটা খাওয়ার দরুন সকালে অসুবিধেয় পড়বো। কিচ্ছু না, আমি অত্যন্ত ফ্রেশ বোধ করছি, ইচ্ছেও হচ্ছে একটু বাইরে যাই।'

'যাও।' মীরা গম্ভীর হয়ে বললো, 'এক টুকরো কাগজ-টাগজ নিয়ে যাও। শুধু মাছই এনো, খামোকা ভারি কিছু বইতে যেও না। বাজার সেরে রিক্‌শা করে ফিরে এসো।'

'তা দেখা যাবে।' হীরেন উৎসাহভরে মাথা নেড়ে বললো, 'তুমি আমার পাঞ্জাবি পাম্পশু বার করে দাও।'

মীরা জুতো জামা নিয়ে এলো।

'সকালে উঠে তোমার বেজায় মুখ দেখে মনটা এমন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো আমার!' হীরেন জামার বোতাম আঁটতে-আঁটতে বললো, 'খুব সহজেই তুমি মন খারাপ করে ফেলো।'

' যে-ওষুধ তোমার পক্ষে অনিষ্টকর তা খেতে দেখলে মন খারাপ না হবার আছে কি।' মীরা হীরেনের দিকে না তাকিয়ে পুরোনো খবর-কাগজের খানিকটা ছিঁড়ে ভাঁজ করতে লাগলো।

'অনিষ্ট করেনি, মীরা, তাই তো বলছিলাম সব-সময় তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো না। তুমি আমায় মঝে-মাঝে এমন অবিশ্বাস করো দেখে আমার মন এক-এক সময় খুব খারাপ হয়ে যায়।'

'ভুল, ভুল।' ভাঁজ-করা কাগজটা হীরেনের হাতে তুলে দিয়ে দুই চোখ আধবোজা করে মীরা মদির একটুখানি হাসলো, বরং উলটো, তুমি, তুমিই আমায় মুহুর্মুহু—'

মীরাকে কথা শেষ করতে না দিতে হীরেন ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়িয়েছিলো স্ত্রীর মুখ চেপে ধরতে।

মীরা সরে গেল।

'না সত্যি, সত্যি বলছি, তোমার এই রকম ধারণা পোষণ করা খারাপ মীরা, অন্যায়, অন্যায়।'

উত্তেজনায় অধ্যাপক কাঁপছিলো। আবেগ-অচ্ছন্ন গলার স্বর।

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।' জলতরঙ্গের মতো শব্দ করে অনেকদিন পরে মীরা আনন্দে হাসলো, 'বিশ্বাস করি যে তুমি আমায় অবিশ্বাস করো না—যাও, দেরি কেরো না, রোদ চড়ছে।'

অপরিমেয় স্বস্তি হীরেনের চোখে-মুখে ফুটলো। আর রুগি নয়, সতেজ সুস্থ মানুষের মতো পা বাড়িয়ে চৌকাঠ পার হয়ে সে কতকাল পরে বাইরে বেরুলো।

হেমন্তের রৌদ্রে হেলেদুলে রিকশায় চেপে বাজার করতে চললো হীরেন।

দৃশ্যটা দেখবার জন্যই মীরা বাইরের বারান্দার রেলিং-এ ঝুঁকে কতক্ষণ নিচের দিকে চেয়ে রইলো।

অঞ্জনবাবুর টাকা এনেছে মীরা।

আনেনি, আনতে যাবে। আজ যাবে না, কাল দুপুরে যাবে।

আজ বাড়ির ঝি দু-টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা ধার দিয়েছে। সুতরাং অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও

বাজারে যাওয়া তাজা মাছ কিনে আনা এবং বাড়িতে ঢুকেই দু-পদের জায়গায় তিন পদ রান্নার ফরমায়েস করা এক হীরেনকে দিয়েই সম্ভব। স্বামীর চরিত্র নিয়ে আর আলোচনা করা নিরর্থক ভেবে মীরা অন্য ভাবনা ভাবতে লাগলো।

কেন, আজও সে একবার বেরুতে পারে।

চেক ভাঙিয়ে ব্যাঙ্কে সবটা রেখে হাত-খরচের দু-দশ টাকা নিয়ে এসে বলবে, মাত্র ক-টা টাকা যোগাড় করতে পেরেছিলো দাদা, আবার কাল যেতে বললো। মীরা কাল দুপুরে আবার পাড়ি দেবে আলিপুর।

পরশু।

রোজই দাদা কিছু-কিছু করে দিতে পারছে।

এক সঙ্গে ছ-মাস বসে খাবে এমন যে একটা চালু উকিল অঞ্জন মুখার্জি, তাকেও আজকাল কেউ ধার দিচ্ছে না।

সুতরাং—মীরা অনায়াসে রোজ একবার করে অমরেশকে গিয়ে দেখে আসতে পারে।

বাড়ির সব কর্তব্য সারা করে ও বেড়াতে এসেছে হোটেলে। স্বামীর সেবা-যত্ন শুশ্রূষা কোনোটার ত্রুটি রেখে ও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। অমরেশকে বুঝিয়ে বলবে ও। যদি বিশ্বাস না করে অমরেশ একবার চলুক রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। গিয়ে দেখবে দিবানিদ্রার পর হীরেন এখন ইজিচেয়ারে বসে টোস্ট ওভালটিন খাচ্ছে, টলস্টয় পড়ছে, আর মাঝে-মাঝে জানলার বাইরে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন চোখ রেখে পরিতৃপ্তির ঘন নিশ্বাস ফেলে কল্পনায় দেখছে মীরা দাদার কাছে আরো-কিছু টাকা পেয়ে পরদিনের বাজার নিয়ে ঘরে ফিরছে। নিজের এবং স্বামীর জন্যে অতিরিক্ত টুকিটাকি সব জিনিস নিয়ে ঘরে ফিরতে মীরার একদিন ভুল হয় না। রোজ রাত্রে গাওয়া-ঘিয়ে ভাজা গরম পরটা ফুলকপি ভাজা ও সবে-বেরুনো মটরশুটি দিয়ে নামমাত্র মসলায় তৈরি আলুর দম। হালকা অথচ স্বাদু ও পুষ্টিকর। হীরেন যা চাইছে মীরা তাই দিয়ে যাচ্ছে, দিচ্ছে, খাওয়াচ্ছে। সব দাবি পূরণ হবার পর স্বামী যদি স্ত্রীকে সানন্দে বাইরে বেরুনোর অনুমতি দেন এবং সেই সুযোগ নিয়ে মীরা দুপুরে একটি বার করে অমরেশকে দেখতে আসে দোষ নেই তাতে।

কিন্তু তবু, মীরা দেখতে পাচ্ছে যেন, অমরেশ তাকে গালমন্দ করছে। 'প্রথম থেকেই নিয়ম ভাঙছো, ভেঙে আমার কাছে আসছো, তার অর্থ সন্দেহটা তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনে গা-সওয়া হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে মিথ্যে বলো আর সত্যি বলো হীরেনবাবু জানছেন দিনের শেষে তুমি ঘরে ফিরে যেতে ভুল করবে না, কাল দুপুরে বেরোবার আগে একটি আলো-নেবানো ঘরের নিভৃতিতে দু-জনের আবার একটা রাত কাটবে।'

অভিমানী অমরেশ, একগুঁয়ে অমরেশ।

মীরা জানে স্বামীকে-ফাঁকি-দিয়ে-এসেছিলো ভালোবাসায় অমরেশের আস্থা কম।

একেবারে ছেড়ে চলে এসো।

চিরকালের মতো বন্ধন টেঁকে কিনা পরীক্ষা করতে যে তোমায়, তোমাদের এতগুলো টাকা দিলাম।

'আমি অপেক্ষা করবো। ছ-মাস, একবছর। যদ্দিন-না হীরেনবাবু সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম হবেন। তার আগে ঝুপ করে একটা কিছু করার পক্ষপাতী আমি নই।'

বারান্দায় রেলিং-এর গায়ে গাল ঠেকিয়ে মীরা আজই অমরেশের হোটেলে যাওয়ার বাসনা অগত্যা ত্যাগ করলো। বলতে কি, মীরার ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল মনের বিশ্লেষণীতে দুই পুরুষ-চরিত্র হঠাৎ একরকম হয়ে ফুটে উঠলো। হীরেন এক অর্থে গোঁড়া, অমরেশ অন্যভাবে।

ঈর্ষা, সন্দেহ ও হীনতার আঁকশি দিয়ে ঘরের প্রেমকে ঘরোয়া করবার জন্যে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হীরেন।

অর্থ, উদারতা ও এক অতি মানবীয় ত্যাগের দাঁড়িপাল্লায় রেখে মীরার প্রেমকে ওজন করতে তেমনি অমরেশরও আগ্রহ কম না। দু-জনই সমান।

যেন দু-জনই তারা মীরাকে দেখছে না, দেখছে তার অন্য কিছু। দুয়ের প্রেমের বিচারে রক্তমাংসের মীরা অনুপস্থিত।

ভাবলো, হীরেন বেরিয়ে যেতে ঘরের সামনের বারান্দায় পায়চারি করতে-করতে একটা অস্বস্তির আলপিনের খোঁচা খেয়ে মীরা ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভেবে যখন সারা হচ্ছিলো তার সামনে এসে দাঁড়ালো মৃগাঙ্ক।

ফোলা-ফোলা চোখ। চুল উস্কুখুস্কু। ইংরেজিতে যাকে bow করা বলে সে-ভাবে শরীরটাকে একটু সামনের দিকে বাড়িয়ে মৃদু হেসে মৃগাঙ্ক অভিবাদন জানালো। 'গুড মর্নিং মিসেস চক্রবর্তী।'

সুস্মিত হেসে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে মীরা বললো, 'নমস্কার, এই আপনার ঘুম ভাঙলো বুঝি?'

'ভেঙেছে অনেকক্ষণ।' মৃগাঙ্ক সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আপনার কালকের দেওয়া সিগারেটগুলো টানছিলাম।'

'ভারি তো এক প্যাকেট সিগারেট।' অত্যন্ত নিম্ন ও ক্ষীণকণ্ঠে অভিযোগ করে পরে স্বচ্ছতর গলায় মীরা হাসলো, 'চা খেয়েছেন?'

'না খাইনি, স্টোভে তেল ছিলো না—'

মীরা এবার মৃদুমন্দ গলায় হাসলো। 'তা স্টোভের তেল আনবেন তারপর চা হবে, বেলা দশটা বাজবে সকালের চা খেতে-খেতে।'

'অনেকটা সেইরকম।' মজুমদারও মৃদুমন্দ হাসলো।

খোঁপা থেকে আঁচলটা খসে গিয়েছিলো অনেকক্ষণ। মীরা বাঁ-হাতের দুই আঙুল দিয়ে ওটা যথাস্থানে দু-বার তুলে দেবার চেষ্টা করলো, আবার পড়ে গেল।

'শুয়ে-শুয়ে আপনার কথা শুনছিলাম।'

'কখন, কি কথা?'

'এই তো এখন, একটু আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হীরেনবাবুকে যখন বাজারের ফর্দ-মুখে বলে দিচ্ছিলেন।'

'অ, মস্ত কথা!' মীরা সুন্দর ভ্রূভঙ্গি করে হাসলো। 'তা হলে ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ, জেগে শুয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, ঘরে তেল নেই মনে পড়তে আর উঠতে ইচ্ছে করছিলো না।'

'শিল্পীরা এমনি হন।' সূক্ষ্ম ক্ষীণতর কণ্ঠে মীরা আবার অভিযোগ করলো। ' কেন, কাল রাত্রেই তো আপনার ওটি যোগাড় করে রাখা উচিত ছিলো।'

'ছিলো এবং ঘরে আরো কি ছিলো না ছিলো সেই সম্পর্কে কাল বিকেলের পর থেকে একটু বেশি সচেতন ও চিন্তিত হয়েছিলাম বলে রাত্রে বন্ধুর কাছ থেকে ফেরার পথে বাসে ওই কুকাণ্ডটি করেছিলাম।' ক্ষীণকণ্ঠে হাসছিলো মৃগাঙ্ক।

মীরার দুই কান লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু বেশি ও তা হতে দিলে না। মীরা যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি অদ্ভুত সুন্দর ওর মনের ভাব গোপন করার কৌশলটুকু। হাসিকে আরো মদিরায়ত করে বললো, ও কী বুদ্ধি আপনার! টুকিটাকি দুটো-একটা জিনিস ঘরে না থাকলে আমাদের কাছে চাইতে পারেন। এতে এতটুকু লজ্জা করা উচিত না। তবে আর প্রতিবেশী বলা কেন। আমার দু-বোতল কেরোসিন এখনো ঘরে জমা আছে। আমি এ-সব আগে থাকতেই যোগাড় করে রাখি।'

চুপ থেকে লাল ফোলা-ফোলা চোখে মৃগাঙ্ক মীরাকে দেখছিলো, মীরার দাঁত, ঠোঁট, কুটিল-প্রসন্ন-বঙ্কিম-বিলসিত সুন্দর ভ্রূযুগলের ভৎর্সনা।

'আপনার কথা আলাদা, আপনি ম্যাগনেনিমাস মীরা। প্রথম থেকে লক্ষ্য করছি। বলেছি কাল। বলতে কি, আপনি না থাকলে মিস্টর চক্রবর্তী যেমন অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরেছিলেন, এত সকাল-সকাল সেরে উঠতে পারতেন না। স্টোভের তেল তো বটেই, এই ক্রাইসিসের বাজারে আপনি একটা স্টীমারকে একলা হাতে চালিয়ে নিচ্ছেন দেখে অবাক, মুগ্ধ আমরা।

মীরা কথা কইলো না।

বাইরে হেমন্তের আশ্চর্য সুন্দর রৌদ্রে একটা প্রজাপতি অবিশ্রাম ঘুরে-ঘুরে নেচে-নেচে মনে হয় যেন নতুন আইভিলতাটার সঙ্গে প্রেম করছিলো।

ভেতরে আসুন, চা খাবেন।'

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীর চা-তৈরি করা নিয়ে এত কথার পর তাকে চা খেতে না বলা যে-কোনো শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না গৃহিণীর চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। অন্তত মীরা তাই মনে করে।

পর্দাটা বাঁ-হাতে সরিয়ে মীরা মৃগাঙ্ককে ডাকলো।

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে চট করে আমার হয়ে যাবে, দেরি হবে না।' একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিলে মীরা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বললো, 'মালতী, উনুনে কেট্‌লি চাপা, দু-কাপ জল দিবি।'

প্রতিবেশী পুরুষকে ঘরে ঢুকতে দেখে মালতী খোঁপায় আঁচল তুলে দিয়েছে। কিন্তু তা হলেও হীরেন ঘরে না থাকাতে ওকে বেশ চটপটে প্রগল্‌ভ দেখাচ্ছিলো। হাতে একটা ঝাড়ন। হীরেনের রুটি হবলিক্‌স খাওয়া বাসন সরিয়ে টিপয় মুছতে এসেছে।

'ওটা এখন রেখে দে।' মীরা বললো, 'জল চাপিয়ে দিয়ে তুই চট করে দুটো সিঙাড়া নিয়ে আয়। মোড়ে যেতে হবে না। সামনের দোকান থেকে নিয়ে আয়।' ব্যাগ থেকে নিজের মুখ-মোছা ছোট্ট গোলাপী রুমাল বার করে মীরা একটা সিকি খুললো। 'দুটো সিঙাড়া আর দুটো ভালো সিগারেট আনবি।'

'আপনি একটা অনুষ্ঠান আরম্ভ করে দিলেন, মিসেস চক্রবর্তী।'

'যা, দেরি করিসনি।' যেন মৃগাঙ্কর কথা কানে তুলতে ইচ্ছে নেই মীরার, চৌকাঠ পর্যন্ত ঝি-র পিছু ধাওয়া করলো। 'ছুটে যাবি আর আসবি।'

'ভয় নেই দিদিমণি। আজ তুমি সারাদিন বাড়িতে আছো, নিজের হাতে রান্নাবান্না করছো শুনেই দাদাবাবুর মনমেজাজ খুলে গেছে, অসুখ-বিসুখ নেই। বেলা দশটা অবধি বাজারে ঘুরে জ্যান্ত মাছ আর টাটকা শাকসবজি কিনবে।'

'যা বলেছিস।' পলকে মৃগাঙ্ককে দেখে মীরা আবার মালতীর দিকে তাকায়। ' রোগা লোক চলতে-ফিরতে এমনিও একটু দেরি হবে, আর কোনো জিনিসের তো দাম জানে না—তা হলেও চা-এর জল নামিয়ে ভাত চাপাতে হবে বলছি, তোর আবার রাস্তায় দোকানে মেলা বন্ধু কিনা। একবার বাইরে পা বাড়ালে আর বাড়ি ফেরার নাম করিস না।'

'হ্যাঁ, আমার বদনাম তো তোমার মুখে লেগেই আছে, উপকারীকে বাঘে খায়, তোমার জন্যে এত করছি কিনা।' রাগের সুর মালতীর। 'তা বন্ধুর মতো বন্ধুর যদি দেখা পাই এই চাকরি ছেড়ে দেবো। রোজ তো বড়ো গলায় জানিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। মালতীর বয়সের এখনো ভরাদুপুর।'

'তা যাস চলে।' সুন্দর মসৃণ গলায় হেসে মালতীকে বিদায় করে দিয়ে মীরা মৃগাঙ্কর কাছে ফিরে এলো।

'বাবুরা বাড়িতে না থাকলে সমবয়সী ঝি মনিবানীর সখী হয়।'

মীরার কথায় মৃগাঙ্ক অন্যমনস্কের মতো একটু হাসলো আর স্থির চোখে মীরাকে দেখলো।

'আপনার ছবির মডেল হিসেবে মালতী মন্দ কি।' মীরা বললো।

এবার আর অন্যমনস্কের মতো শুধু মীরাকে না দেখে মৃগাঙ্ক ঘরের ভিতরের চারদিক দেখলো।

'হেভ্‌ন হেভ্‌ন! আপনি স্বর্গ গড়ে রেখেছেন চক্রবর্তীর জন্য, মীরা।' মীরার দিকে চোখ ফেরায় শিল্পী।

গত রাত্রিব রেস্টুরেন্টের কথাগুলো মনে হলো মীরার।

'আপনি বসুন, আমি জলটা দেখে আসছি।' বলে আর-একটা টিপয় মৃগাঙ্কর সামনে টেনে এনে লণ্ড্রি থেকে আসা একটা সবুজ ঢাকনা পাট ভেঙে তার ওপর বিছিয়ে দিয়ে মীরা রান্নাঘরের দিকে গেল।

রূপ, রূপ, আর সেই রূপের মন্দিরের মধ্যে জ্বলছে সেবা-মমতা-সংযম ও প্রেমের মোমবাতিগুলো।

রূপের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা মীরা আর-কোনোদিন কারুর মুখে শোনেনি। কাল দুপুরে অমরেশও হোটেলে তার রূপের ব্যাখা করছিলো। কিন্তু তাতে আব এতে আকাশপাতাল তফাৎ। তাই কি। উনুনেব পাশে দাঁড়িয়ে মীরা তার চুলচেরা হিসেব করলে না যদিও। কেবল অমরেশের চোখের রং আব মৃগাঙ্কর চোখের রংটা পাশাপাশি মনে পড়ে গেল তাব।

একটা লালচে, একটা পিঙ্গল।

মেয়েরা, সব মেয়েই পুরুষের মুখে রূপের স্তুতি শুনলে তাদের চোখের রং কি দাঁড়ায় আগে তা দেখে তারপর দেখে পুরুষের হাসি। আর পুরুষ, মেয়ের চোখ দেখাব আগে ঠোঁট দেখে। পুরুষ চিরকালই অন্ধ কিনা!

কেটলির জল ফুটছে। মীরা আরও খানিকটা জল ঢেলে দেয় তাতে। তারপর ভাবে, একটা চেক-এর দাম বেশি না তুলির একটা আঁচড়। কোনটাতে হৃদয় ফোটে বেশি?

চার কাপ জল মীবা গবম হতে দিলে। দেরি হোক। ইচ্ছে করে মৃগাঙ্ককে দেরি করে চা দেওয়াব কারণ, মীরা চাইছে না চোরের মতো কাজটা সম্পন্ন হোক। বাজাব করে ঘরে ফিরে হীরেন দেখুক দাদার দেওযা টাকা হাতে আসছে বলে মীরার দিনকতক বাইরে বেরুনো বন্ধ হলেও ঘরের নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলাগুলো সে যে-ভাবেই হোক বজায় রাখছে, এ-ক্ষেত্রে হীরেনের বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হওয়া নিতান্তই মূর্খতা।

পাশের ঘরে থাকেন ভদ্রলোক।

শিল্পী বাউণ্ডুলে বলে যতই নাক-সিঁটকানি থাক হীরেনের, একজন মানুষ তো বটে। ওপরের এই একজন।

আর আছে নিচে দু-চার ঘর বাসিন্দা।

বলতে কি, এই একটি মানুষের সঙ্গেও যদি তারা পরিচয় ও মেলামেশা না রাখতে পারে তো তাদের, মীরা ও হীরেনের, অরণ্য আশ্রয় নেওয়া উচিত।

হ্যাঁ, ভদ্রলোক ঠেকেছেন। যেমন মীরা ঠেকেছে।

পাঁচটা টাকা কর্জ চাইতে এসেছেন মজুমদার মীরার কাছে। তা মীরার হাতে তো আজ টাকা নেই, বলেছে, কাল দিতে পারবে। এবং এই সকালে প্রতিবেশী যখন তাদের ঘরে এসেছেন তখন তাঁকে বসতে ও একটু চা খেতে বলা একজন শিক্ষিতা আধুনিক গৃহিণীর ধর্ম।

হীরেন মহা অস্বস্তিবোধ করলেও মীরাকে তা পালন করে যেতেই হবে। এ-সব পালন না করার পিছনে যে অশ্রদ্ধা শ্লেষ ও ঘৃণা আছে তা পেতে মীরাকেই পাবে, হীরেনকে ছোঁবে না। এরা বলবে এমন একজন কৃতবিদ্য মার্জিতরুচিসম্পন্ন অধ্যাপকের এ কি জংলি মূর্খ স্ত্রী! কেউ বলবে অহংকার—মারাত্মক রকম অসামাজিক জীব।

আবার, এ-সব ভাববার পর হয়তো সবাই বলাবলি করবে, আসলে, তলা একেবারে ফুটো হয়ে গেছে, ইজিচেয়ারে চেপেচুপে বসে সকালে-বিকেলে হরলিক্‌স খাওয়া ফুলের গন্ধ শোঁকা ও রবীন্দ্রনাথ-টলস্টয় পড়া আর বেশিদিন চলছে না। ডুববে। আমাদের চেয়েও সাংঘাতিকভাবে ডুবতে

বসেছে এই পরিবারটা, এক-কাপ চা দিয়েও বাড়ির লোকগুলোকে একদিন সমাদর করতে পারে না। এমন লক্ষ্মীছাড়া।

তা ছাড়া আর কি।

ভাগ্যে যখন-তখন আবার আগুন লাগতে পারে মীরার, এটা ও ভালোরকম জেনে রেখেছে বলেই অন্তত এদের দু-একজনের সঙ্গে একটু পরিচয় ও কথাবার্তা রাখার রেওয়াজ রেখেছে। রাত দুপুরে হীরেনের পেটে পেন আরম্ভ হতে পারে। এ-বাড়ির কারো ঘরে টেলিফোন নেই। অথবা ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হীরেনকে হাসপাতালে পাঠাবার সময় না-ও থাকতে পারে। তখন ট্যাক্সি ডাকো, মুমূর্ষু রুগীকে গাড়িতে তোলো, এ-সব কাজ একলা হাতে মীরা সামাল দিতে পারবে এই ভয়ংকর বিশ্বাসই হীরেনের মৃত্যুর কারণ হবে।

মৃগাঙ্কর জন্য চা তৈরি করতে-করতে মীরা আজ এ-সম্পর্কে কোনোরকম কথাবার্তা উঠলেই এই কথাগুলি বলবে ঠিক করে রাখলো।

'আরো খান, আরো দুটো সিঙাড়া নিয়ে আয় মালতী।'

আশ্চর্য, এ আপনি করছেন কি!'

মৃগাঙ্ক শিশুর মতো সরল সুন্দর চোখে মীরাকে দেখছিলো না। তা দেখতো অমরেশ। এই অবস্থায় অমরেশের দৃষ্টি বিকেলের পড়ন্ত রোদের মতো ঝিলমিল করতো, যদি এমনি এ-ঘরে দু-জন মুখোমুখি চা খেতে বসতো।

মৃগাঙ্কর চোখের রক্তের ছিটেগুলোকে রক্তমুখী ছোটো-ছোটো অসংখ্য চোখের মতো মনে হচ্ছিলো মীরার।

এতগুলো চোখের আগুনের সামনে চিরকালের রূপসীরা পতঙ্গের মতো পাখা বাড়িয়ে দিয়েছে। দিতে চেষ্টা করেছে, না দিতে পারলে ব্যর্থ মনে করেছে নিজেদের।

কাপে চিনি ঢালবার সময় মীরার দুধের মতো শাদা ধবধবে কনুইটা মৃগাঙ্কর থুতনির কাছে চলে গেল।

'আপনি আবার আরম্ভ করুন। হবে। সব ফিরে পাবেন। একটা মডেল নষ্ট হয়ে গেলে জীবনের সব ছন্দ চলে গেল এ আমি বিশ্বাস করি না মৃগাঙ্কবাবু।'

'কিন্তু এমনটি হবে না। এই রকম পাবো না।' জানলার দিকে মজুমদার চোখ ফেরালো।

মীরা বললো, 'নিন। সিগারেট ধরান।'

শিল্পী ঠোঁটে সিগারেট গুঁজলো, মীরা তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। 'সত্যি, জীবনকে যে-ভাবে চাওয়া যায় সে-ভাবে জীবন না এলে বুক মরুভূমি মনে হয়, আর, আরও যদি কবিও শিল্পীমন হয় তো সে সিনিক হতে বাধ্য।' বলে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে মীরা জানলার প্রজাপতিটার লাফালাফি দেখতে লাগলো।

'হীরেনবাবুকে আঁকা-মডেলটা দেখিয়েছি। ওর অ্যাম্বিশন আমার জন্য এনেছিলো আগ্নেগিরির গর্ভনিঃসৃত লাভা, আপনার অ্যাম্বিশন আনলো, মন্দাকিনীর ধারা। তা ছাড়া ভোমরার চেয়ে কত বেশি রূপসী আপনি, মীরা।'

গল্পটা শুনে ক্ষুণ্ণ ও ঈষৎ কাঁপা গলায় মীরা বললো, 'অথচ ভোমরাটাকে চিরকালই আমরা খুব বুদ্ধিমতী বলে জানতাম।'

'বুদ্ধি ছিলো, হৃদয় ছিলো না।' মৃগাঙ্ক স্বচ্ছতর গলায় বললো, 'ও যখন জানতো পান্না সিন্ধিয়ার সঙ্গে মেলামেশা আমি পছন্দ করি না। আমরা যে-অবস্থায় ছিলাম তাতেই কি সুখী ছিলাম না, মিসেস চক্রবর্তী। সেখানেই তো স্বর্গ গড়া যেতো।'

মীরা কথা কইলো না। পলকহীন চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে ও।

'তাই বলছিলাম, রূপ ও হৃদয় দিয়ে গড়া তাজমহল আছে হীরেনবাবুর ঘরে।' অনেকটা

নিজের মনে কথা বলতে-বলতে সামনের দিকে ঝুঁকে একেবারে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চা-এর কাপটা মৃগাঙ্ক ঠোঁটের কাছে তুললো।

'আর-একটু চা করে দিই আপনাকে?' মীরা আদরের সুরে বললো।

মাথার লম্বা লাল চুলে মৃদু ঝাঁকুনি লাগলো, হাসলো মৃগাঙ্ক। 'আর না, সারাদিন চা-এর জল ফুটলে আপনার ভাত-তরকারি আর রান্না হবে না। মীরা দেবী।' শিল্পী উঠে দাঁড়ালো, মীরাও উঠলো।

'তা হয়, হয়ে যাচ্ছে। কতবার রান্না করতে-করতে হরলিক্স-ওভালটিনের জল গরম হয় আমার ঘরে।'

'সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। কি বলবো? এঞ্জেল-টেঞ্জেল বলে বাঙালির ঘরের রূপবতী গৃহিণীর বর্ণনা ঠিক হয় না।'

মীরা কিছু বললো না। শাদা সুন্দর দাঁতে হাসলো একটু।

'তার ওপর এত বিদ্যাবুদ্ধি এমন আশ্চর্য রুচি। আহা, বিশ্বকর্মা কোনোটার খুঁত রাখেনি।'

'কিন্তু পারছি কই, তেমন করে পারলাম কোথায়, ইচ্ছে ছিলো ভালো করে সংসারটাকে সাজাবো, কিন্তু ঈশ্বর—'

'হবে, হয়ে যাবে।' মৃগাঙ্ক সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানিতে ফেললো। 'ইচ্ছে করলে সব পারা যায়—এই বাণী আপনিই আমার একটু আগে শুনিয়েছেন।'

'বলছেন ডিগ্রী আছে বলে তোমায় আমি আপিসে ঠেলে পাঠাবো অন্নের জন্যে, বেঁচে থাকতে তা আমি দেখতে চাই না। চিরকাল তো আর আমি অসুস্থ পড়ে থাকবো না।'

'কে? মিস্টার চক্রবর্তী?' মৃগাঙ্ক ক্ষীণ হাসলো, 'অবশ্য দেখলে তাঁকে মনে হয় না যে এ-সব বিষয়ে তিনি এতটা—'

'ভয়ানক, ভীষণ গোঁড়া।' মীরা বললো, 'অথচ এ-দিকে সংসারখরচ—'

'কোথাও কোনো স্কুলে—' মৃগাঙ্ক ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেশলাই খুঁজছিলো।

মাথা নেড়ে মীরা বললো, 'না, এখনো পাইনি। সাধারণ একটা স্কুলের মাস্টারির জন্যে কি হাঁটাহাঁটি করছি কম। দুটো প্রাইভেট ট্যুইশানি আছে।'

'কী নিষ্ঠা, কী সংযম!' অস্পষ্ট গলায় নিজের মনে কথাগুলি বলে পরে মৃগাঙ্ক জানলার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে শিস দিতে লাগলো। বনের পাখিকে আদর করে ডাকতে গিয়ে মানুষ যেমন শিস দেয় সেই সুর। মীরা পরিষ্কার দেখলো, মৃগাঙ্কর দুই চোখ ছলছল করছে। ভোমরাকে মনে পড়ছে?'

'ভোমরাটা কী বোকা!' মৃগাঙ্ক চলে যেতে মীরা ভাবলো। 'কী পেতে গিয়ে কী হারালে ও। তুচ্ছ গাড়ি-বাড়ির জন্যে এই চোখ—' চোখে রক্তের ছিটে আর কোন শিল্পীর ছিলো মীরা হঠাৎ মনে করতে পারলে না এখন। হ্যাঁ, এই সেই রক্তচক্ষু শিল্পী-সন্ন্যাসীর রূপপিপাসা। প্রেমিক? প্রেমিকের চেয়েও শিল্পীদের উঁচুতে স্থান দেয় মীরা। এদের গলায় সব মেয়ের বরমাল্য পরানো উচিত। মীরার ইচ্ছে করছিলো ভোমরাকে এখন হাতের কাছে পেলে বেশ দু-কথা শুনিয়ে দেয়। মিথ্যুক।

ঘটা করে মীরা রান্নাঘরে ঢুকলো। অমরেশের এই ইচ্ছে। ছ-মাস, ছ-টা মাস চোখমুখ বুজে আর-একবার সে চেষ্টা করে দেখুক। যেমনটি করলে হীরেনবাবু সুখী হন। এবং তাতে যদি তাঁর মনের কালো দূর হয়।

খুশি বৈই কি। আহ্লাদে হীরেন উথলে উঠছিলো। রান্নাঘরের চৌকাঠ ছেড়ে আজ আর উঠতে তার মন নেই।

'বুঝলে মীরা, মেয়েদের উনুনের গোড়ায় বসতে দেখলে আমার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যায়—মাকে দেখতুম। গৌববর্ণ মুখ আগুনের আভায় দেবীর মুখের মতো জ্বলতো। ছুটির দিন এলেই বাবা নিজের হাতে বাজার করে এনে সেই যে মোড়া পেতে হুঁকো হাতে বসতেন মা-র রান্না শেষ না হওয়া তক উনুনের কাছ থেকে নড়তেন না।'

উত্তরে একটুখানি শুধু 'হুঁ' করলো মীরা। কেননা তার কড়াই তেতে গেছে। হলুদ-লঙ্কা মেখে মাছটা তাড়াতাড়ি না ছেড়ে দিলে তেলে আগুন লাগে।

কাজটি শেষ করে মীরা আবার ঘুরে বসলো আনাজ কুটতে।

'কী অদ্ভুত, কী আশ্চর্য সুন্দর লাগছে তোমার আঙুলগুলো সবুজ শাকের মধ্যে।'

'তাই কি?' হীরেনের কথায় মীরা হলুদ-ছোপানো নিজের আঙুলগুলো দেখলো। সোনালি বর্শা। সোনালি বর্শারা কচি পলতা পাতার বুক চিরছে।

'মাছ হয়ে গেলে আমাব শুক্তো চাপাবে বুঝি?' হীরেন প্রশ্ন কবলো। একটু থেমে পরে বললো, 'এই আঙুল, আঙুলেব এমন বং ও ছন্দ টাইপ-রাইটাররেব চাবির ওপব কি করে মানায় আমি ভেবে পাই না।'

বুঝি অমরেশও তা পায না, তাই ইচ্ছে করে মীরাকে চাকবিতে না দিয়ে হেঁশেলে পাঠালো। আশ্চর্য, এরা দু-জনই একরকম। কিন্তু সব অবস্থায়ই মেয়েদের আঙুল সুন্দর দেখে কে, কার সেই দিব্য চোখ? শুক্তো চাপিয়ে মীরা ভাবতে লাগলো।

মলতী ছুটে এসে বললো বিপদ উকিল দেখা করতে এসেছে।

হীরেনের মাথায় বাড়ি পড়লো। 'এই অবেলায় এসেছে, কমসে-কম দুটো ঘণ্টা বকর-বকর করে কানের মাথা খাবে।'

অসময়ে লোকটার আবির্ভাব হয়েছে শুনে মীরাও খুব বিরক্ত হলো। বলে আয় মালতী, বাবু এইমাত্র ঢুকেছেন বাথরুমে। স্নান করবেন খাবেন বিশ্রাম করবেন। অতক্ষণ কি তিনি বসতে পারবেন? দিদিমণি রান্নাঘরে ব্যস্ত। তার চেয়ে আপনি ও বেলায় আসুন।'

'দুঃখিত হবে উকিল।' হীবেন অল্প হাসলো।

'হোক দুঃখিত।' মীরা ভুরু কোঁচকালো। 'আমি চাই না এখন-তখন বাড়িতে এত লোকের আনাগোনা। কোথায় খাবো-দাবো-শোবো দু-জনে বসে একটু বেশিক্ষণ গল্প করবো—জেনেশুনে পাজি এসেছে সব পণ্ড করতে।'

হীরেন চুপ করে রইলো।

'যা বলে আয় বিকেলেও দেখা হবে না, দু-জনে আজ সিনেমায় যাচ্ছি, সুতরাং দেখা পেতে-পেতে সেই কাল বিকেল।'

মালতী মীরার আদেশ নিয়ে নিচে চলে গেল।

'কী ভীষণ আড্ডাবাজ তোমার উকিল বন্ধুটি।'

মীরার অভিযোগ হীরেন রুষ্ট হলো না, বরং ভালো লাগলো তার কথাগুলি। অল্প মাথা নাড়ালো।

দু-জনে বসে একটু বেশি সময় কতকাল গল্প করা হয় না। হীরেন মনে-মনে দুপুরগুলি হিসেব নিচ্ছিলো।

মীরা বললো, 'এইবেলা তুমি ওঠো, আমার রান্না খতম। বাকি কাজ এখন সেরে ফেলা যাক।'

স্নানের জন্য হীরেনকে উঠতে হয়।

এত কাছে বসেছিলো বলে মীরার সদ্য সাবান ধোয়া গায়ের গন্ধ-চুলের গন্ধ-শাড়িসায়ার গন্ধটা যেন অনেকক্ষণ হীরেনের বুকের মধ্যে আটকে রইলো। বাথরুমে ঢুকে চার বালতি জল ঢেলেও সে-গন্ধটা দূর করতে পারলো না। কি করে পারবে, হীরেন আবার ভাবলো, মীরা যে তেল মাথায় দিচ্ছে হীরেনও তা-ই মাথায় ঘষেছে, একই সোপ-কেসের সাবান মাখছে দু-জন। এমন কি, এমন কি—গভীর এক সুখানুভূতিতে হীরেন মীরার তোয়ালে দিয়ে চেপে-চেপে ঘাড় মুছলো, সমস্ত শরীর মুছলো।

'ভিজে কাপড় গামছা ফেলে রেখে তুমি চলে এসো, মালতী ধুয়ে দেবে।'

মীরার ডাকে হীরেন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো।

হীরেন যখন চুল আঁচড়ায় মীরা সেই ফাঁকে আলুকপিব ডালনাটা উনুন থেকে নামিয়ে রান্না শেষ করে।

নতুন ফুলকপির ডালনার গন্ধ-ভিজে চুলের গন্ধ-চুড়ির নিক্বণ আর মীরা ও মালতীর হাস্যালাপ ঘরের ভিতর উৎসব ডেকে এনেছিলো।

খেতে-খেতে হীরেন এক-সময় ভাবলো, আজকের এই মধুর মধ্যাহ্ন জীবনে চিরকাল লেগে থাকে না কেন। কেন আপিস-আদালত-কারখানা—

'শুনছো, মালতীর কথা!' জল খেয়ে ভাতের গ্রাস গলা থেকে নিচে নামিয়ে মীরা হীরেনকে ডাকলো, 'তোমার বিপদবন্ধু বিশেষ সুবিধের লোক নন।'

'না, আমিও ওকে অ্যাভয়েড করতে চাইছি। না-ডাকলেও আসছে, না-বললেও বসে থাকে, কী বোরিং!'

এক-একটা পুরুষ কি করে চোখ দিয়ে মেয়েদের গায়ের মাংস কুরে খায় মালতী তা রান্নাঘরে দিদিমণিকে বুঝিয়ে এসেছে।

মীরা এখন সেই ইঙ্গিতটা করতেই ওর বেদম হাসি পেয়েছে। দাদাবাবুর সামনে সব ক-টা সুন্দর দাঁত বেরিয়ে পড়ে তাই গোপন করতে হাসিতে ওর আঁচল-চাপা। হাসিটা মুখ দিয়ে বেরুতে না পেরে যেন শরীর বেয়ে নদীর ঢেউ হয়ে নিচে নামছিলো। মালতী তাই কাঁপছে।

হঠাৎ এই আনন্দঘন এক মুহূর্তে হীরেন আবিষ্কার করলো মীরা প্রায় কিছুই খাচ্ছে না।

'ব্যাপার কি? হীরেন মীরার পাতের দিকে তাকালো।

'ভীষণ অম্বল হচ্ছে। তুমি বাজারে গেছো পর দু-বার চা খেয়েছি।'

হীরেন কথা না ক'য়ে নিজের খাওয়ায় মনোযোগ দিলে।

মীরা বললো, 'তা দাদা হয়তো একটু মোটারকমের লোন নেবার ব্যবস্থা করছেন আমাদের দেবেন বলে। রোজ দুপুরে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতার লজ্জা আমার না থাকুক, দু-দিন একদিন পর-পর দু-চার-পাঁচ টাকা করে তাঁর পক্ষে দেওয়াও মুশকিল।'

হীরেন কথা বললো না, কিন্তু তার চোখ আগের চেয়ে উজ্জ্বল। মাথা নাড়লো। মীরা তাতেই সন্তুষ্ট।

'মুখ ধোবো, জল দে মালতী।'

মালতী মগ থেকে জল ঢেলে দেয় দিদিমণির গ্লাসে। মীরা মুখ ধুয়ে নিঃশব্দে উঠে পড়লো।

আবহাওয়াটা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেছে, হীরেনও বুঝলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাতের কাছে সুবিধা মতো কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অগত্যা নীরবে হাতমুখ ধোয়া শেষ করলো। পরে মীরাকে খুশি

করতে মুখে একটা লবঙ্গ ফেলে বললো, 'শোনো, বলছিলাম ক-দিন যখন না বেরিয়ে রেস্ট নিচ্ছো, এই ফাঁকে একটু ডাক্তার দেখাও। তোমার চেহারার লাবণ্য অনেক কমে গেছে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।'

'ডাক্তার দেখালেই কি লাবণ্য বাড়বে?' মীরা হাত বাড়িয়ে মালতীর হাত থেকে মিঠেপানের খিলিটা তুলে মুখে পুরলো।

'না, না, অম্বল হয় বলছো মাঝে-মাঝে।' হীরেন ব্যস্ত হয়ে বললো।

'ও কিছু না, এম্নি সেরে যাবে।' বলে মীরা চুনের বোঁটাটা জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললো।

না কি তবে সব অসুখ ওর মনের? হীরেন বিষণ্ণ ব্যাকুল চোখে স্ত্রীর এই অসুখ বুঝতে চেষ্টা করলো।

কিন্তু মীরা কি সেই কারণে গম্ভীর? যে-কারণে গম্ভীর তাব সঙ্গে টাকাপয়সার, ওর ঘোরাঘুরির, স্বাস্থ্যের, দাদার এমন কি অমরেশের পর্যন্ত সম্পর্ক নেই। আবার কারণটা যে একেবারে কায়াহীন ও অদৃশ্য তা-ও নয়।

দূরে কাদের ব্যালকনি থেকে একটা গোলাপ নীল আকাশের রৌদ্রে গলা বাড়িয়ে দিয়ে মিটিমিটি হাসছিলো। মীরার খেতে ব'সে এক-সময় গম্ভীর হয়ে যাওয়ার কারণটা ওই আকাশচারিণী হাস্যমুখী গোলাপের মতো। পার্থিব বস্তুর সঙ্গে এর যোগাযোগের মীরা খুব বেশি রাখতে চায় না।

পাছে না হীরেনের নানারকম প্রশ্নের খোঁচা লেগে মীরার এই গোলাপটারও আবার পাপড়ি খসতে শুরু করে, তাই, যেন একটু ভয় পেয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি হেসে বললো, 'আচ্ছা, না-হয় ডাক্তার একজন দেখানো যাবে—তুমি যখন এত করে বলছো।' জানলার শার্সিগুলো বন্ধ করে দিয়ে মীরা ঘরময় ঘুমোঘুমো সুন্দর অন্ধকার ডেকে নিয়ে এলো। 'তুমি কি রাগ গায়ে দেবে?'

'না।' হীরেন মাথা নাড়লো।

'আমি দেবো, কেমন শীত-শীত করছে।'

স্যুটকেস খুলে মীরা ভাঁজ করা রাগ বার করে। তাদের বিয়েতে পাওয়া সেই ব্রাউন রাগটা। শাড়ি খুলে ফেলেছিলো আগেই। পরনে জংলি সায়া। পানের রসে অধরোষ্ঠ রাঙা। স্যুটকেস খোলার ঝাঁকুনিতে খোঁপাটা মুখ থুবড়ে পড়েছে এসে ঘাড়ে, গালে। হীরেন কতক্ষণ নিশ্বাস ফেলতে পারলো না।

মীরা ডাকলো, 'এসো।'

সেই ডাক মৃত্যুর মতো সুন্দর হীরেন খাটের কাছে যেতে-যেতে ভাবলো, এমন শান্ত ঠাণ্ডা শরীর জুড়োনো ডাক আর কোনোদিন সে মীরার কাছ থেকে পায়নি।

'কি, বলো।' বালিশে মাথা রাখতে-রাখতে মীরা হীরেনের গলা জড়িয়ে ধরলো। 'কাল দুপুরে আমায় তুমি খামোকা সন্দেহ করছিলে।'

'না না—' আবেগে দুঃখে নরম হয়ে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার মতন গলার সুর করলো হীরেন। 'আমি কি জানি না, অমরেশের কাছ থেকে আর যে-ই আনুক, তুমি রোজ-রোজ টাকা ধার আনবে না।'

মীরার কাজল-পরা চোখে ঘুমের বান ডেকেছিলো। বাহুবন্ধনে ওর মাথাটা বুকের কাছে ধ'রে হীরেন কান পেতে কথা শুনলো।

'তবু তুমি যখন চাইছো না ইচ্ছে করেই আর গেলাম না ওর কাছে, যাইনি আজ।'

'আমি জানি তুমি যাবে না।' হীরেন পরিতৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেললো। 'আনলেই তো ঋণ করা হয়, তার প্রতিদানে তুমি কিছু দিতে পারছো না ওকে।' হীরেন কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব

করলে মীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, আর ঘুমের সেই অতল সমুদ্র হীরেনকে আস্তে-আস্তে কখন তলিয়ে নিয়ে গেল তা সে টের পেলে না।

দশ মিনিট পর মীরা চোখ মেললো। হীরেন গাঢ় নিদ্রাভিভূত।

মীরার কাজল পরা চোখ আয়নার মতো চকচক করছে। আস্তে খুব আস্তে হীরেনের গায়ে একটু না ধাক্কা লাগে এমনভাবে হাত পা ওর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে আনলো। খাট থেকে নেমে ও মেঝেয দাঁড়ালো। তারপর আয়নার কাছে স'বে গিয়ে হাতের তেলো দিয়ে চেপে খোঁপাটাকে ঠিক করলো। আলনা থেকে টেনে নামালো ওর ধান-রং শাড়ি। আটপৌরের মধ্যে এটাই মীবার সবচেয়ে পছন্দ। বৌদ্রঘন দুপুরে সবুজ না পরলে মানাবে কেন।

শাড়ির আঁচলটা মীরা আবার খসে না যায় এমনভাবে পিন দিয়ে খোঁপায় এঁটে দিলে, কিন্তু এমনভাবে দিলো যে এক দিকটা সবুজ নিশান হয়ে ঝুলতে লাগলো। বাকি অর্ধেকটা খোঁপাকে মনে হচ্ছিলো সবুজ পাতাব আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা একটা মৌচাক।

স্নো পাউডার মাখলো না মীরা। ভিজে গামছা দিয়ে মুখখানা শুধু মুছলো। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে ঢাকনা দেওয়া সাজানো থালাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

অপরাধ? কোনো অপরাধ মীরা করছে না। যেন অমরেশকে সে বোঝালো। হ্যাঁ, হীরেনকে সেবায সান্নিধ্যে স্নেহে যত্নে এমন পরিতুষ্ট করে দিয়েছে সে যে এখন থেকে হীরেন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এই ভরদুপুরে। চেক লিখে দেওয়ার শর্ত—অমরেশের টাকার সদ্ব্যবহার মীরা পুরোপুরি কবছে। বিশ্বাস না হয় অমরেশ একবার এসে এ-বাড়িতে উঁকি দিয়ে দেখুক। হীরেন ঘুমিযে আছে, সে জানে না। কাজটার জন্যে, মৃগাঙ্কব ঘবে ভাতের থালা নিয়ে যাওয়া, মীরা ভাবলো, অমরেশের কাছেই যা-একটু অপরাধ করা হ'লো, তাই মনে-মনে সে অমরেশেব সঙ্গে এতগুলো কথা বললো।

তারপর আর বললো না। পার্টিশনের ওপারে গিয়ে ও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হ'য়ে গেল এপারের জগৎ।

তেরো

পায়ের লঘু শব্দে মৃগাঙ্ক চোখ তুললো। অস্নাত অভুক্ত চেহারা।

ভাতের থালাটা একটা টিপয়ের ওপর রাখলো মীরা।

'আঁকছেন নাকি?'

'না, ভাবছিলাম।' হাত দিয়ে কপালের চুল পিছনে ঠেলে দিয়ে মৃগাঙ্ক হাসলো, আপাদমস্তক মীরাকে দেখলো একবার, তারপর ভাত দেখলো। 'ইস্, কত কি রান্না করেছেন!' একটু থেমে পরে মীরার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলো, 'মিস্টার চক্রবর্তী খেয়েছেন?'

'খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবেই এসেছি। আসতে পারলাম।' একটু গম্ভীরভাবে মীরা বললো। 'আর দেরি করবেন না, উঠুন, চট্ করে সেরে ফেলুন।' যেন মৃগাঙ্কর অতিরিক্ত মন্থরভাব দেখে মীরা না-ব'লে পারলো না, আর বলার সেই মুহূর্তে করুণ বিষণ্ন একটা ছায়া ওর চোখে ভেসে উঠলো, মৃগাঙ্কর চোখে তা এড়ালো না।

তথাপি ব্যস্ততার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিলো না মৃগাঙ্কর লালচে চোখে। 'একটা সিগারেট খাবো। আপনি বসুন।'

'না, এখন আর সিগারেট না, এখন ভাত।' মীরা এমনভাবে অনুনয় করলো যে মৃগাঙ্ক সিগারেটের জন্যে আর হাত বাড়াতে সাহস পেলে না। কিন্তু সেজন্য যে সে রুষ্ট হ'লো তাও না, বরং বিহ্বল আবিষ্ট চোখ মেলে মীরাকে দেখলো। 'অরণ্যচারিণী ডায়নার মতো সুন্দর লাগছে আপনাকে, মীরা।'

'আপনি আঁকুন, আমি বলছি এঁকে যান। আপনাব এই অভাব দুঃখ থাকবে না।' সান্ত্বনার শিশিরবিন্দু ঝরছিলো মীরার চোখ থেকে, ঠোঁট থেকে।

যেন তার উত্তরে মৃগাঙ্ক কি বলতো। বলা হ'লো না। বাতাসের ঝাপটায় হঠাৎ একদিকেব জানলাব একটা কাচ এমন ঝনঝন শব্দ ক'রে উঠলো যে দু-জনেই চমকে উঠলো। মীরার চেয়ে বেশি চমকে ওঠে মৃগাঙ্ক। অল্প হেসে মীরা প্রশ্ন করলো, 'আপনি ভয় পেয়েছেন?'

'তাই।' ঈষৎ হেসে ঘাড় নেড়ে মৃগাঙ্ক স্বীকার না ক'রে পারলো না। 'আজকাল একটুতে কেমন ভয়ে পাই, ভীরু হয়ে গেছি কেন বলুন তো?'

যেন উত্তর তৈরি ছিলো। স্থিব শান্ত গলায় মীরা বললো, 'শিল্পী যখন মরতে বসে তখন এই হ্য। রক্তমাংসের মানুষের ভয়-ভাবনাগুলো তাকে বেশি কাবু ক'বে ফেলে।'

'কেন এমন হয়?' মৃগাঙ্ক মুখে প্রশ্ন করলো না, সেই জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে নাবীকে দেখলো।

মীরা বললো, 'অনন্ত রূপময় ব্রাহ্মাণ্ড। আপনি শুধু একটি রূপের ধ্যান নিয়ে শিল্পী হ'তে চেয়েছিলেন, তাই এমন করুণভাবে ব্যর্থ হলেন। এখনো যে টিকে আছেন, ম'বে যান নি দেখে অবাক হচ্ছি। না-স্নান না-খাওয়া হ'য়ে একটা ঘরে আটক থেকে যক্ষ্মাতে ভুগছেন না এটাও আশ্চর্য। তাই বলছিলাম, পুরষ হিসেবেও আপনি দুর্বল, শিল্পী অনেক বড়ো। নিন্ উঠুন এ-সব কথা পরে হবে, এখন খেয়ে নিন্।'

'বুঝতে পেরেছি।' মৃগাঙ্ক লজ্জায় এবার অধোবদন হ'লো। 'ভোমরাকে নিয়ে আমার এখনো ঠাট্টা করছেন?'

কেন করবো না, প্রত্যেক নাবীই হিংসা করবে আপনাকে আপনার এই অবস্থা দেখলে। সহস্র রক্তচক্ষু যার, তার শুধু একটি জায়গায় দৃষ্টি রেখে পুড়ে ম'রে যেতে দেখা কোনো মেয়েই সহ্য করতে পারে না।' ব'লে মীরা হঠাৎ চুপ ক'রে রইলো।

মৃগাঙ্ক বললো, 'আপনার মতো মমতাময়ী সে এটা সহ্য করতে পারে না আমি বিশ্বাস করি। আর কাউকে জানি না, মীরা আব-কোনো মেয়ের সঙ্গে বিশেষ তেমন মিশিনি।'

মীরা চুপ ছিলো।

মৃগাঙ্কর চোখ ছলছল করতে লাগলো। সিগারেট খাবার জন্যে তৃষ্ণায় তার বুকের ছাতা ফেটে যাচ্ছিলো, কিন্তু তবু সে আর-একটা সিগারেট ধরায় না শুধু মীরাকে দেখে।

'আসুন, খাই।' মৃগাঙ্ক সতৃষ্ণ চোখে যত্নে সাজানো ভাতের থালা, কৌটোয় একটুখানি গরম ঘি, পটল ভাজা, ডালনা, আলু-কই-এব ঝোল, চাটনি ও দই দেখলো।

'আপানার নিশ্চয় ভালো ক'রে খাওয়া হয় নি।' মৃগাঙ্ক অবাক চোখে মীরাকে দেখলো। 'এতগুলো আমার জন্যে নিয়ে এলেন!'

না না, আমি খেয়েছি, বিশ্বাস করুন।' মীরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বললো, আপনার জন্যে আলাদা ক'রে এ-সব রান্না হয়েছে।'

মৃগাঙ্ক মীরার চোখের ভিতর তাকায়।

'কখন রাঁধলেন? মিস্টার চক্রবর্তী নিশ্চয় আজ হেঁশেলের দরজা ছেড়ে কোথাও যাননি।' মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করবে কি যেন মীরা সেই উত্তরের জন্যে তৈরি হচ্ছিলো মনে-মনে। কিন্তু মৃগাঙ্ক সেদিকে আর এক-চুল অগ্রসর হয় না, মাথার চুলের মধ্যে অস্থির আঙুল চালিয়ে দমকা হাওয়া যেমন হা-

হা ক'রে ওঠে তেমনি গলার এক উত্তাল অদ্ভুত স্বর বা'র ক'রে বললো, 'আমি ভুলে গেছি সেই ছবি, মন থেকে মুছে ফেলেছি সেই মডেল, মীরা, বিশ্বাস করুন। আর অপরাধ নেবেন না। নতুন রূপ নতুন মডেল পেয়ে গেছি যখন, আবার আমি বাঁচবো, বেঁচে উঠেছি।'

পরিতৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেললো মীরা। কপালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমছিলো আঁচল দিয়ে তা মুছে ফেললো। মৃগাঙ্কর চোখের আশ্চর্য রং দেখে মীরা প্রশ্ন করার লোভ সংবরণ করতে পারলো না, যদিও ঠোঁট চেপে হাসছিলো ও। 'কি রূপ, কেমন মডেল?'

'এ-ভাবে এই মডেল—' বলদৃপ্ত কঠিন বাহু বাড়িয়ে মীরাকে আকর্ষণ ক'রে মৃগাঙ্ক খাটের ওপর তার পাশে বসায়। 'নিন্, আপনিও আমার সঙ্গে হাত চালান। আপনি কিছু খান নি আমি বেশ বুঝতে পারছি।' ব'লে মীরার হাত ও নিজের হাত যুক্ত ক'রে সে ভাতের থালায় ঠেকালো।

হাসলো না মীরা কি অতিরিক্ত রকম গম্ভীর হ'য়ে রইলো না, পরিচ্ছন্ন ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'দাঁড়ান, হাতটা ধুয়ে নি।'

কুঁজো থেকে কাচের গ্লাসে জল গড়িয়ে নিয়ে মীরা সোজা হয়ে দাঁড়াবে এমন সময় পাশের ঘর থেকে বিশ্রীরকম একটা শব্দ তার কানে ভেসে এলো, চমকে উঠলো ও। মৃগাঙ্ক টের পেলে না।

'এক সেকেণ্ড, আপনি খান আমি আসছি।' ব'লে রুদ্ধশ্বাসে মীরা মৃগাঙ্কর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল।

মালতী বাইরে গিয়েছিলো। এইমাত্র ফিরেছে। কাঁপছে ও। শব্দটা মালতীর কান্নার, ওর চাপা আর্তনাদের—ঘরে ঢুকে মীরা টের পেলে।

রক্তের নদীতে হীরেন ঢলে পড়েছে। দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাঁ করা ক্ষত গলায়।

অত্যন্ত স্থির ও সংযত থাকতে চেষ্টা করলো মীরা। রক্তের নদী ও হীরেনের রেজার ছাড়া ঘরের মেঝেয় আর-কিছু প'ড়ে আছে কি না অপলক চোখে খুঁজতে গিয়ে এবার সে আর-একটা জিনিস দেখতে পেলে। বাংলা খবরকাগজ একটা গড়াগড়ি যাচ্ছে। লাল দাগ দেওয়া একটা অংশ। ছোঁ মেরে মীরা কাগজটা মেঝে থেকে তুললো। রক্তের ছিটে এখানেও লেগেছে। তা হলেও দাগ দেওয়া অংশটা পড়তে মীরার অসুবিধা হলো না। কাল রাতের সেই ঘটনা। বাসে এক ভবঘুরে পিক্‌পকেটকে এক মহিলার নিজের স্বামী ব'লে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর গল্প। আসলে তাঁরা একবাড়িতে দুটো পাশাপাশি ফ্ল্যাটের ভাড়াটে মাত্র। রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বর পর্যন্ত তুলে দিতে কাগজের রিপোর্টার ভুল করেন নি। একজন পুলিশের লোক সাক্ষী আছেন।

খবরটা এ-ভাবে রংচং মেখে কাগজে কি করে আত্মপ্রকাশ করলো সেকথা না ভেবে মীরা অবাক হলো এই ভেবে, কাগজটা এখানে আনলো কে। হীরেন বাজার থেকে ফেরার সময় কোনো কাগজ তো কিনে আনে নি।

সব পরিষ্কার ক'রে দিলো মালতী। চোখ মুছে ধরা-গলায় বললো, 'আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোই বিপদ উকিলকে দেখলাম রাস্তায় আমাদের ফটকের সামনে আলোর থামের নিচে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা কাগজ।'

রাত্রের রেস্টুরেন্টের ঘটনাও মীরার এই সঙ্গে চট্ ক'রে মনে পড়লো। কিন্তু মাথা গরম করলো না সে।

খবর দেওয়া মাত্র লোকজন আসবে, পুলিশ আসবে এবং সকলের আগে ছুটে আসবে মৃগাঙ্ক।

এবং মৃগাঙ্ক আসছে কি না শুনতে মীরা মুহূর্তকাল কান খাড়া ক'রে রাখলো, তারপর ত্রস্ত কম্পিত গলায় মালতীকে বললো, 'রান্না ঘরে গিয়ে তুই আগে কাগজটাকে পুড়িয়ে ফেল।' মালতী কাগজটা নিয়ে ছুটে রান্নাঘরে চ'লে গেল। মীরা আস্তে ব্যাগ খুলে অমরেশের চেকটা বা'র করলো।

চেক দেখে মৃগাঙ্ক কিছু বললো না। নিঃশব্দে হীরেনের মৃতদেহ দেখতে লাগলো। চোখ মোছা শেষ ক'রে মৃগাঙ্কর হাত থেকে চেকটা নিয়ে সেটা ভাঁজ করতে-কবতে মীরা আস্তে বললো, 'বরং আমার চেয়ে কলেজে ওর সঙ্গেই অমরেশের বন্ধুত্ব ছিলো বেশি, বাল্যবন্ধু। অপরাধ হয়েছে কাল দুপুরে ওকে না-ব'লে অমরেশের কাছ থেকে চেক আনলাম কেন। অথচ অমরেশ সবটা টাকাই ওর চিকিৎসার জন্য দিয়েছে। বললাম। কিন্তু তবু কাল থেকে আমার সঙ্গে আর ভালো ক'রে কথা বলেনি।'

'যাকগে, এটা আপনি চেপে যান।' শান্ত গম্ভীর গলায় মৃগাঙ্ক বললো, 'অনেকদিন থেকেই তো মিস্টার চক্রবর্তী পেটের ঘায়ে ভুগছিলেন। হাসপাতালের রিপোর্ট ডাক্তারের প্রেসকৃপশন-টেসকৃপশন যা আছে সব বা'র ক'রে রাখুন। দৈহিক অসুস্থতা মিস্টার চক্রবর্তীর জীবনকে দুর্বিষহ ক'রে তুলেছিলো কথাটার ওপর জোর দিতে হবে, অন্তত পুলিশের কাছে।'

'তাই দেবো, তাই আমাকে বলতে হবে।' আর-একটা কান্নার ধমক চাপতে গিয়ে মীরা ঢোক গিললো। 'বিনা দোষে আমায় এত বড়ো শাস্তি দিয়ে যাওয়ার ওর কোনো অধিকার নেই, ছিলো না—এর সাক্ষী আপনি মৃগাঙ্কবাবু, আপনি ছাড়া আমার নিকটতম প্রতিবেশী আব কেউ নেই। চোখের ওপর দেখেছেন কী না করেছি শেষ পর্যন্ত ওর জন্যে।'

মৃগাঙ্ক কিছু বললো না।

মীরা মেডিকেল রিপোর্টগুলো খোঁজাখুঁজি করতে তৈরি হচ্ছিলো।'

পরিশিষ্ট

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

অগ্নীশ্বর : বনফুল

বিচিত্র বিষয় এবং বিচিত্র উপস্থাপনার জন্য স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত লেখক বনফুলের প্রকৃত নাম যে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, এ কথা তাঁর প্রিয় পাঠকদের প্রায় সকলেরই জানা। অনেকের ধারণা এটি তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস, অর্থাৎ ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখুজ্যের কাহিনির সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য আছে।

চলচ্চিত্রের কল্যাণে এই কাহিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

লেখক হিসাবে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদামণি এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও নজরুল ইসলামের জীবনীকার রূপে পাঠকদের কাছে পরিচিত হলেও তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কল্লোল যুগে রবীন্দ্র-বিরোধী কবি ও গল্পকার হিসাবেই। বস্তুত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থটিই একসময় অতিবিখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

অচিন্ত্যকুমার উপন্যাস রচনাতেও যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এই গ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাঁর ওপর একটি জনপ্রিয় প্রেমের উপন্যাস 'প্রথম কদম ফুল'।

শবনম্ : সৈয়দ মুজতবা আলী

প্রথম বিশ্ববাণী সংস্করণের প্রকাশকাল মাঘ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ। প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন খালেদ চৌধুরী।

উৎসর্গপত্রটি ছিল এইরকম :

— অমরাত্মা রাজশেখরকে —

সাহিত্যাচার্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজশেখর বসুকে একখানা পুস্তক উৎসর্গ করিবার বাসনা আমি বহুকাল ধরিয়া মনে মনে পোষণ করিয়াছি, কিন্তু স্বরচনার মূল্য সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিহান থাকি বলিয়া সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই। গত পৌষে তাঁহার শরীর অকস্মাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়াতে সর্ব শঙ্কা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া তাঁহার দৌহিত্রের মাধ্যমে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করি। রাজশেখর সহৃদয় সজ্জন ছিলেন—তাঁহার সদয় অনুমতি লাভ করিয়া অকিঞ্চন কৃতকৃতার্থ হয়।

আজ আমার ক্ষোভ অপরিসীম যে স্বহস্তে তাঁহার চরণকমলে পুস্তিকাখানি নিবেদন করিতে পারিলাম না।

শান্তিনিকেতন — সৈয়দ মুজতবা আলী
রাখী পূর্ণিমা, ১৩৬৭

এই উৎসর্গপত্র মূল্যবান এই কারণে যে, লেখক চলিত ভাষা (যা প্রায় মৌখিক ভাষারই নামান্তর) প্রায় সর্বত্র প্রয়োগ করেছেন। অথচ উৎসর্গপত্রে ব্যবহার করেছেন সাধুভাষা। এতে রাজশেখর বসু সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা কী পরিমাণ ছিল, খানিকটা বোঝা যাবে।

প্রিয়বান্ধবী : প্রবোধকুমার সান্যাল

লেখকের একদাখ্যাত প্রেমের উপন্যাস। অন্য দুটি শক্তিশালী উপন্যাস 'হাসুবানু' ও 'আঁকাবাঁকা'।

অচিন রাগিনী ঃ সতীনাথ ভাদুড়ী

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন বেঙ্গল পাবলিশার্স অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ সালে।

এই উপন্যাস সম্পর্কে সম্পাদক স্বয়ং (শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) লিখেছেন ঃ "অচিন রাগিনীতে তিনি একটি অন্য সুর লাগালেন। ঠিক প্রেম নয়, ঠিক স্নেহও নয়—তার মাঝামাঝিও আর একটা কিছু থাকে—সতীনাথ সেইটি আবিষ্কার করেছেন, নাম দিয়েছেন 'টান-ভালবাসা'—অথবা এর কোনো নাম নেই। এই সম্পর্ক কখনো ব্যক্ত হয় না, তাই একে বলা হয় অচিন রাগিনী।"

এবিষয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে গোপাল হালদারের মন্তব্য ঃ 'নিশ্চয়ই মনোবিকাশের ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সতীনাথের পঠিত ও অধিগত ছিল, সে তত্ত্বকে হয়তো একেবারে আজগুবি বলেও মনে করতেন না—অন্তত নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় যতটা তা গ্রাহ্য তা মানতেন। অচিন রাগিনীর পরিবেশটা অজ্ঞাত নয়, তবু তার নিগূঢ়স্থিত মর্মশেষ অচিন।'

চতুষ্কোণ ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা উল্লেখ না করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বাভাষ হিসাবে যে কথাগুলি লিখেছিলেন তা এই ঃ

রাজকুমারের মতো অসংখ্য ছেলে দেখেছি। তারা নানারকম, কিন্তু আসলে এক। রাজকুমারকে 'টাইপ' বলে ধরলে ভুল করা হবে। একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই অনেক যারা, তাদের মধ্যে মূলগত মিল আছে, তাই এটা সম্ভব হল। বাজকুমার একটু বেলুনেব মতো ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু তাতে কিছু আসবে যাবে কি? আমার উদ্দেশ্যও তাই ছিল।

যেদিন ফুটলো কমল ঃ বুদ্ধদেব বসু

প্রধানত কবি হিসাবে পরিচিত, আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা এবং 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদির মতো উপন্যাসও লিখেছেন বহু। সাধারণভাবে উপন্যাসগুলির আয়তন ছোটই হয়, এর ব্যতিক্রম 'তিথিডোর'।

এই উপন্যাসটি বুদ্ধদেবের একেবারে প্রথম দিকের বচনা। মাত্র আঠারো বছর বয়সে একসঙ্গেই প্রকাশিত হয কবিতাব বই 'বন্দীর বন্দনা' এবং প্রথম উপন্যাস 'সাড়া'; এটি বাইশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে পাঠকমহলে সাড়া পড়ে গিযেছিল, বিভিন্ন সূত্র থেকে সে খবর আমরা জানতে পারি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বুদ্ধদেবকে অভিনন্দিত করেছিলেন। এর একটা কারণ হতেই পারে, এই তরুণপ্রতিভাকে সাধুবাদ জানানো তিনি কর্তব্য বিবেচনা কবেছিলেন, অথবা এমনও হতে পারে, তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের বিষয় ও ভাষাভঙ্গির সঙ্গে হযতো তিনি কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। কোন সম্ভাবনাটা অধিক, পাঠক তা বিচার করবেন।

বিকাশ ক্লাসিক সংস্করণ হিসাবে ২০০১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় দময়ন্তী বসু সিং মন্তব্য করেছেন ঃ 'কোনো লেখকেরই প্রতিটি বই সমমানের হয় না। বিশেষ করে গল্প উপন্যাস যাঁরা লেখেন—প্রথম দিকে নিজের উৎসাহে লিখলেও, প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই বহু রচনা লিখতে হয় পত্রপত্রিকার অনুরোধে। শেষ পর্যন্ত সেটাই অভ্যেসে দাঁড়ায়। বিখ্যাত লেখকরা প্রায় ভুলেই যান স্বেচ্ছায় গল্প উপন্যাস লেখার সুখ। কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্যিকের প্রথম দিকের রচনা হয় স্বতঃস্ফূর্ত, অনুপ্রেরিত, এবং উৎকৃষ্ট মানের।'

জিয়াভরলি ঃ সুবোধ ঘোষ

প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকার পূজা সংখ্যায়।

মীরার দুপুর ঃ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

প্রথম মুদ্রণ বিষয়ে যে আখ্যাপত্র ছিল সেটি এরকম ঃ
প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ খালেদ চৌধুরী

প্রথম মুদ্রণ ঃ ভাদ্র ১৩৬০, অগস্ট ১৯৫৩

দাম ঃ তিন টাকা

—0—